৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বৈশাখ প্রবাসী ১৩৭৪

UTTARPARA
JAIKRISHNA PUBLIC LIBRARY

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৭৪

সূচীপত্র

'THE PRABASI', 'THE MODERN REVIEW'

77/2/1 Dharamtala Street,

Calcutta-13

Phone : 24-5520

Please send :

All correspondence, M.O.s, Advt. orders etc., to the above address.

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

জ্যৈষ্ঠ **প্রবাসী** ১৩৭৪

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪—সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

আষাঢ় ১৩৭৪

প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৭৪—সূচীপত্র

প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৭৪

সূচীপত্র

ভাদ্র : ১৩৭৪

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

আশ্বিন

১৩৭৪

সূচীপত্র

মধ্যাহ্ন-গায়ত্রী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শিল্পী—নরেন্দ্র মল্লিক

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৭৪

৬ষ্ঠ সংখ্যা

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম শতবার্ষিকী

যে সকল মহাশিল্পী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে বহু রূপ রস স্রষ্টার নামই আমাদিগের জানা নাই। যে সম্রাট ও নৃপতির আদেশে কোন মন্দির, প্রাসাদ স্মৃতি-সৌধ তোরণ বা স্তম্ভ গঠিত হইত তাঁহাদিগের নামই লোকে শুনিত, স্থপত, ভাস্কর বা চিত্রকরের নাম কখন জানা যাইত কখনও বা তাঁহারা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেন। এই ভাবে অজন্তার মহাশিল্পীগণের মধ্যে কে কোন্ গুহায় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন অথবা এলোরার ভাস্কর কাহারা কোন কোন মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহাবলিপুরম কোনারক বা খাজুরাহের শিল্পীগণ ভারতের কৃষ্টির ইতিহাসে অমরত্বের অধিকারী কিন্তু তাঁহাদিগের বিষয় আমাদিগের পূর্ণ জ্ঞান নাই বলিয়াই আমরা শুধু বিস্ময়াপ্লুত নয়নে তাঁহাদিগের অমর কীর্ত্তি দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হই। মুসলমান যুগের যে সকল চিত্রকর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অনেকের বিষয় আমাদিগের কিছু কিছু জানা আছে, কিন্তু অনেকের বিষয় আমরা বিশেষ কিছু জানিনা, যথা, তাজমহল কে গড়িয়াছিলেন সে কথাই আমাদিগের জ্ঞাত নাই। বর্ত্তমান যুগে মুদ্রণ কার্য্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়ের সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞানও ক্রমশঃ পূর্ণ পরিস্ফুট ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। এখন আর কোন মহাশিল্পী চিত্র ভাস্কর্য্য অথবা স্থাপত্যে প্রসিদ্ধি লাভের অধিকারী হইলে তাঁহাকে কেহ ভুলিয়া যাইবে সে আশঙ্কা আমাদিগের হয় না। কারণ খ্যাতি বর্ত্তমান কালে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া জগতের সম্মুখে ব্যক্ত হয় ও বিস্মৃতির কীর্ত্তিনাশা ধারায় কাহারও খ্যাতি অথবা ধুইয়া মুছিয়া মানব-মন হইতে লুপ্ত হইতে পারে না। ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ বিগত দুইশত বৎসর ধরিয়া লক্ষিত হইতেছে তাহার বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে চিত্র-শিল্প একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলার অজন্তার যুগের অথবা রাজপুত মোগল চিত্রের প্রেরণা আবার নবকলেবর ধারণ করিয়া বিভিন্ন শিল্পীর তুলিকার দ্বারা ব্যক্ত হইতে সক্ষম হইয়াছে এবং সেই প্রেরণা কখন কখন সম্পূর্ণ নূতন পথেও চলিয়া নূতন পদ্ধতি ও রীতির সাহায্যে অপরূপ রসের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণ শুধু অজন্তা বা

মোগল রাজপুত সংস্কারের পুনরাবৃত্তি বলিলে মানুষকে বিষয়টা অত্যন্তই ভুল বুঝান হইবে। রীতি, পদ্ধতি বা সংস্কার অবলম্বন করা হইলেও তাহা প্রেরণাশীল ও প্রাণবান সৃষ্টির পর্য্যায়ে পড়িলে রূপকার ,চিত্রকর বা স্থপত পুরাতনের মৃত অনুকরণ মাত্র করিয়াছেন এ কথা কেহ বলিতে পারে না। পুরাতন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নূতন প্রেরণা যদি জাগ্রত-ভাবে ব্যক্ত হয় ও তাহা দেখিয়া যদি দর্শকের প্রাণে স্রষ্টার অনুভূতি পূর্ণ আবেগে অনুভূত হইতে পারে, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে শিল্পী রসসৃষ্টি ক্ষেত্রে কীর্ত্তিমান ও যশস্বী। নূতন পদ্ধতি ও রীতি অবলম্বন অথবা বিজাতীয় সংস্কারের অনুকরণ করিয়া যদি কোন শিল্পী দর্শকের অনুভূতির স্রোতে সামান্য কোনো তরঙ্গেরও কম্পন জাগাইতে না পারেন তাহা হইলে বলিতে হইবে রূপ বা রসের কোন সৃষ্টি হয় নাই এবং শিল্পী শুধু প্রেরণাপ্রাপ্তির অভিনয় করিয়াই দর্শকদিগকে প্রতারণা করিয়াছেন।

গগনেন্দ্র নাথ শিল্পীশ্রেষ্ঠ রূপরস স্রষ্টা ছিলেন। তিনি যাহাই করিতেন তাহার মধ্যেই তাঁহার অনন্যসাধারণ রসবোধ মূর্ত্ত হইয়া উঠিত। তাহা অভিনয় মঞ্চের সাজেই হউক, জাপানী ধরনের বাগানের পরিকল্পনাতেই হউক কিম্বা বিভিন্ন ধরনের চিত্র অঙ্কনেই হউক। গগনেন্দ্রনাথ নিজের প্রেরণাকে কোন পদ্ধতি রীতি বা সংস্কারের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে রাজী ছিলেন না। তিনি দেখিতেন কোন ভাবে মনের ছবি বাইরে প্রকাশ করিলে তাঁহার নিজের রূপ অনুভূতি পূর্ণ ব্যক্ত ও সংরক্ষিত হয়। ইহার জন্য তিনি বিভিন্ন সংস্কারের সমন্বয় সৃষ্টি করিতেও অপারগ ছিলেন না। তাঁহার চিত্রকলায় নানান "ইজমের" প্রকাশ নানান সমালোচক দেখিয়া থাকেন কিন্তু একথা সর্ব্বাগ্রে সকলের উপলব্ধি করা আবশ্যক যে তিনি বিভিন্ন রীতি ও সংস্কারের অস্ত্রে শুধু অভিব্যক্তির মাধ্যমের জড়তা নাশ করিয়া পূর্ণ প্রকাশের আলোকে অঙ্কিত চিত্রকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতেন। তিনি শতবর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও তৎকালীন অভিজাত পরিবেশে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ার ফলে গগনেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই নানান সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার শিল্প ক্ষেত্রে বিচরণের আগ্রহ বাল্যকাল হইতেই পূর্ণ জাগ্রত ছিল। তিনি চিত্রকলার প্রাচীন ও নূতন ধরণ ধারণ উভয়রূপেই উপলব্ধি করিয়া লইয়াছিলেন ও সেই কারণে তাঁহার চিত্রকলার অনুশীলন করিয়া এই কথাটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে যেরূপ ভাষা ভাবের অনুগত ও ভাব কখনও যদি ভাষার খাতিরে নিজেকে আড়ষ্টতায় আবদ্ধ করিয়া ফেলে তাহা হইলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য খর্ব্ব হয়; চিত্রকলাতেও তেমনি অঙ্কন রীতি প্রেরণার অভিব্যক্তির অনুগত হইয়া না চলিলে চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য লুপ্ত ও চিত্র প্রাণহীন হইয়া পড়ে। গগনেন্দ্রনাথ যে অঙ্কন সংস্কারকেই অবলম্বন করিতেন সেই সংস্কারের ব্যবহারেই তিনি অন্তরের অনুভূতি ও রসবোধের পূর্ণ প্রকাশে সক্ষম হইতেন। তাঁহার চিত্র কখন জড় ও প্রাণহীন রীতি-বিশ্লেষণ-উদাহরণের নকসা হইত না।

বর্ত্তমান ভারতে যে সকল মহা শিল্পী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও যাঁহাদিগের কীর্ত্তির ভিতর দিয়া ভারত কৃষ্টি জগতের সম্মুখে পুনর্ব্বার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে; গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে সক্ষম ও প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি কোন পদ্ধতি অথবা রীতির অনুসরণকারীদিগের নেতৃত্ব করিতেন না। শিল্পপ্রেরণার সীমাহীন অন্তরীক্ষে মুক্ত স্বাধীনগতিতে বিচরণক্ষম এই মহা মানব যাঁহারা দেখিতে পারিতেন তাঁহাদের দেখিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ছিল শুধু পথ প্রদর্শনের কথা; কোন নূতন শাস্ত্র রচনা করিয়া গুরুগিরির চেষ্টা সেই রূপরসঅনুসন্ধিৎসায় গতিমান মহা শিল্পীর মধ্যে কেহ কখন দেখে নাই। আজ আমরা তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে তাঁহার নিকট আমাদিগের জাতীয় ঋণ স্বীকার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমাদিগের এই উপলক্ষে কর্ত্তব্য হইবে তাঁহার কীর্তি সেই ভাবে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করা, যাহাতে পরবর্ত্তি যুগের ভারতবাসীরা তাঁহাকে সহজ সরল ভাবে শ্রদ্ধাদান করিতে সক্ষম হয়। আজকালকার সমাজতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রগত জাতীয়তার যুগে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়ভাবে এই জাতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করা। ইহা করা হইবে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ রাষ্ট্র আজ বহু সংশয়ের আক্রমণে বিভ্রান্ত। উচিত অনুচিত

প্রভৃতি থিটারে যে শুদ্ধ শান্ত পরিস্থিতিতে হওয়া সম্ভব তাহার আজ অভাব। তাহা হইলেও আমাদিগের আশা যে দেশবাসী মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি উপযুক্তভাবে শ্রদ্ধানিবেদনের আয়োজন করিতে সক্ষম হইবেন।

মিশনারী বিদায় চেষ্টা

ভারতে খৃষ্টীয় মিশনারীগণ বহুকাল হইতেই আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দেশের মঙ্গলের জন্য বহু কার্য্য করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। অল্প কয়েকজন হয়ত ভারতের ক্ষতিকর কার্য্যের সহিত সংযুক্ত ছিলেন ও আছেন। কিন্তু লাভ লোকসানের হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে মিশনারীগণ শিক্ষা, দরিদ্র-সেবা, আর্ত্তসেবা প্রভৃতি কার্য্যই এত অধিক করিয়াছেন যে একজন দুইজন মাইকেল স্কট থাকিলেও তাহাতে তাঁহাদিগকে সমষ্টিগত ভাবে বহিষ্কার করিবার চেষ্টার কোন অর্থ হয় না। যাঁহারা এই চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগের সম্ভবত ভিতরের অন্য কোন অভিসন্ধি আছে, অথবা তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিদ্বেষ থাকাতেই এই চেষ্টা করিতেছেন। নয়ত সকল দিক দেখিয়া কেহই একথা বলিতে পারেন না যে খৃষ্টীয় মিশনারীগণ ভারতের ক্ষতিকর কার্য্য করেন। এই সকল বিদেশী ধর্ম্মযাজকগণ বহুকাল হইতেই ভারতের ভাষাগুলির উন্নতির জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। যথা বাংলা ভাষার গঠন ও উন্নতির সহিত মিশনারীদিগের যোগ বহুল পরিমাণে দেখা যায়। মিশনারীগণই বাংলা ছাপার অক্ষর প্রথমে প্রস্তুত করান ও অনেক পুস্তক মুদ্রিত করাইবার ব্যবস্থা করান। পার্ব্বত্য জাতিগুলির ভাষার গঠনের জন্যও মিশনারীদিগের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এই সকল জাতিদিগের মধ্যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থাও প্রায় সর্ব্বত্রই মিশনারীগণই করিয়াছেন। কুষ্ঠ ও অপরাপর দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আশ্রম খুলিয়া ব্যাধিগ্রস্ত লোকেদের সেবা করিয়া মিশনারীগণ আমাদিগকে যে আদর্শশিক্ষা দিয়াছেন, শুধু তাহারই প্রতিদান দিবার ক্ষমতা এদেশে কাহারও নাই। এই সকল কারণে জনসাধারণের উচিত যাঁহারা বিদেশী মিশনারীদিগকে বহিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা করা। সকল বা অধিকাংশ মিশনারীগণ ভারতের ক্ষতি করিতেছেন কথাটি সর্ব্বৈব মিথ্যা। শিক্ষার কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে মিশনারীগণ না থাকিলে। মিশনারীগণ চলিয়া যাইলে অনুন্নত জাতির লোকেদের ক্ষতি বহুরূপে ও আরো বিস্তৃত ভাবে হইতে থাকিবে।

হিন্দি ভাষার প্রভাব

হিন্দিভাষা বলিয়া যে ভাষা চালান হইতেছে তাহা ভারতের অল্প লোকেরই মাতৃভাষা। যাহাদিগের মাতৃভাষা হিন্দি বলিয়া প্রচার করা হয় তাহার প্রায় সকলেই ভিন্ন ভিন্ন হিন্দির স্বজাতীয় ভাষা বলে বলিয়া প্রচার করা হয় সেই ভাষাগুলি হিন্দির স্বজাতীয় কি না তাহা ভাষাবিদরা বলিতে পারিবেন। মৈথিলী ভাষার হিন্দি ও বাংলা উভয় ভাষার সহিত সংযোগ আছে। ভোজপুরী, মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী ভাষাও হিন্দি ও বাংলা উভয় ভাষার সহিত সংযুক্ত। অপরাপর হিন্দি জাতীয় ভাষা যথা পূর্ব্ব রাজস্থানী, বিভিন্ন পাহাড়ী ভাষাগুলি প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ সেগুলি বাংলার সহিত হিন্দি অপেক্ষা নিকটতর ভাবে সংযুক্ত। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালীর হিন্দি শিখিয়া কোন লাভ হইবে না। বাক্যালাপের প্রয়োজন অনুসারে যেটুকু হিন্দি বোধ আবশ্যক তাহা বাঙ্গালীগণের হিন্দি না শিখিলেও, নিজ হইতেই থাকে সুতরাং বাংলা দেশে হিন্দি শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই এবং একটা তৃতীয় ভাষা শিখিলে তাহা সংস্কৃত ভাষা হইলেই জ্ঞানার্জ্জনের দিক হইতে লাভজনক। আমরা যাহারা বাল্যকাল হইতে বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছি, তাহাদিগের হিন্দি শিখিবার কোন প্রয়োজন কখনও হয় নাই। হিন্দি বুঝিতেও আমাদিগের কোন অসুবিধা হয় নাই এবং আমাদিগের সহিত হিন্দি ভাষাভাষীগণ বাক্যালাপ করিতেও কখনও অসুবিধা বোধ করেন নাই। সংযোগ রক্ষার ভাষা বা 'লিঙ্ক' স্কুলে পড়িয়া শিখিবার প্রয়োজন হয় না। তাহা অশিক্ষিত লোকেও কথা বলিতে ও শুনিতে শুনিতেই শিখিয়া লয়। স্কুলে কলেজে বা অফিস দফতরে বাংলা দেশে হিন্দি

চালাইবার কোন আবশ্যক নাই। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ থাকিলেও আমাদের সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করা প্রয়োজন।

বিভীষণ

গৃহে শত্রু থাকিলে বাহিরের শত্রুকে দমন করা কঠিন হয় এ কথা রামায়ণের যুগ হইতেই সর্ব্বজন বিদিত। পরবর্ত্তি যুগেও দেখা গিয়াছে যে গৃহের শত্রু দেশের সর্ব্বনাশের কারণ বারবার হইয়াছে। বাহিরের শত্রুর সহায়তা করিয়া ও বাহিরের শত্রুকে পথ দেখাইয়া নিজদেশে আনিয়া এই সর্ব্বনাশের কার্য্য করা হইয়া থাকে এবং ইতিহাসে তাহার উদাহরণ সর্ব্বত্রই সকল সময়েই দেখা যায়। ভারতে জয়চাঁদ ও মিরজাফরের সংখ্যা অল্প হয় নাই। যুগে যুগে দেশশত্রুর আবির্ভাব হইয়াছে ও ফলে দেশের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে এই বিশ্বাসঘাতকতার বিষ জাতির অন্তর হইতে দুর হইয়া যায় নাই। যখনই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে কোনও না কোন দেশবাসী বিদেশীর সাহায্য লইয়া নিজের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর ইতিহাসে ভারত পাকিস্থান বিভাগের মত বৃহৎ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের উদাহরণ বড় একটা দেখা যায় না! এই বিভাগ দেশের অধিকাংশ লোকের মতে না করা হইয়া থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের তথাকথিত নেতাগণ দেশশত্রু ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সেই সময় যে সকল রাজনৈতিক দলের লোক এই বিভাগ করাইয়া নিজেদের আর্থিক ও সমাজে প্রতিষ্ঠাগত সুবিধা করাইয়া লইয়াছিলেন, আজও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ও দেশবাসীর নিকটে নিজেদের দেশভক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছেন দেশবাসীও সেই প্রচারের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু একটা করিতেছেন না। কিন্তু এই বিভাগের পরেও পাকিস্থান প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ভারতের আরোও কোন কোন অংশ নিজ করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া চলিতেছে। এই কর্ম্মে ভারতেরও অনেক ব্যক্তি গোপনে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে! এই দল হইল কম্যুনিষ্ট দল। তাহারা সাক্ষাৎভাবে, পাকিস্থানের সাহায্যে অবতীর্ণ না হইয়া পরোক্ষভাবে ভারতশত্রু ও পাকিস্থান-বন্ধু চীনের সহায়তা করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশে নিযুক্ত হইয়াছে। ভারতের উপর চীনের প্রভাব বিস্তার সম্পূর্ণ হইলেই ভারত পাকিস্থান উভয় দেশই চীনের অনুগত বা চীনরাষ্ট্র অন্তর্গত হইয়া যাইবে। কম্যুনিষ্টদল তাহা হইলে এক হস্ত বাড়াইয়া চীনকে ভারতে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে ও অপর হস্তে পাকিস্থানকে বন্ধুত্বের অভিবাদন জানাইতেছে। কম্যুনিষ্টগণ দেশের সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে সব্যসাচী ও তাহাদিগের দেশশত্রুতার আবেগ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়া এখন সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রোগের প্রতিকার অবিলম্বে করা প্রয়োজন। বিলম্ব করিলে সর্ব্বনাশ।

জাতীয় ঐক্য ও সংগঠনের কথা

ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। এই সকল জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী এবং ভারতের জনগণের মধ্যে ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও সামাজিক আকাঙ্খা, আগ্রহ ও আদর্শের পার্থক্যও লক্ষিত হয়। এই সকল পার্থক্য থাকিলেও ভারতবর্ষ এক দেশ ও ভারতবাসী জনসাধারণ এক মহাজাতি। ভাষা ও ধর্ম্মের উপর যে জাতীয়তা নির্ভর করে না তাহা পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের জাতীয়তা বিশ্লেষণ করিলেও পরিষ্কার বুঝা যায়। বৃটেনে ওয়েলশ, স্কচ, ইংরেজ ও আইরিশগণ এক মহাজাতির অন্তর্গত ও তাহাদিগের ধর্ম্ম এক হইলেও প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক বিভাগে বিভক্ত। বেলজিয়াম দেশে ফরাসী ও ফ্লেমিশ ভাষ প্রায় সমান সমান ভাবে চলিয়া থাকে। সুইৎজারল্যাণ্ডে জার্ম্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান ও রোমানশ্ ভাষা রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবহার হয়। আরও অনেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও ধর্ম্ম থাকিলেও জাতীয় একতা ও সংগঠনে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। ইহার কারণ এই সকল দেশে জাতীয় আকাঙ্খা, আগ্রহ ও আদর্শ সর্ব্বসাধারণের সমবেত ইচ্ছার অভিব্যক্তি; কোন ক্ষুদ্র গণ্ডি বা গোষ্ঠীর স্বার্থপরতা বা লোভ তাহার ভিতর দিয়া দেখা দেয় না। ভারতবর্ষে বহু জাতি, ভাষা ও ধর্ম্ম থাকিলেও ভারতীয় মহাজাতির ঐক্য ও সংগঠিত রূপ কখন খর্ব্ব বা ম্লান হইতে পারিত না যদি না ভারতের কোন কোন

ক্ষুদ্র গণ্ডির লোকেরা অপর ভারতবাসীদিগের ন্যায্য প্রাপ্য যাহা তাহা নিজেদের লাভের জন্য অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিত। এই অপর ভারতবাসীকে বঞ্চনা করিয়া নিজেদের লাভের চেষ্টা করার নিদর্শন প্রদেশ গঠন, জাতীয় অর্থে ব্যবসায় ও কারবার গড়িয়া তোলা, প্রাপ্যের অধিক সুবিধা করিয়া লওয়া প্রভৃতি নানা ভাবের কার্য্যে দেখা যায়। বিহারের সহিত বাংলার কয়েকটি জেলা জুড়িয়া দেওয়া, বৃহৎ বৃহৎ কারখানা প্রদেশ বিশেষে স্থাপিত করার ব্যবস্থা, হিন্দি ভাষা সর্ব্বত্র চালাইবার চেষ্টা ইত্যাদি অনেক কিছু ভারতবর্ষে ঘটে যাহা অন্য সভ্য দেশে হইতে পারিত না। কারণ ভারতবর্ষের জননেতাগণ জাতীয়তার আদর্শ পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে এখনও শিখেন নাই। নিজ নিজ সুবিধা করিয়া লওয়া অথবা স্বজাতীয় লোকের লাভের ব্যবস্থা করা নেতাদিগের মনে প্রকট-ভাবে বর্ত্তমান এবং সেই জন্যই ভারতের বৃহত্তর জাতীয়--তার আদর্শ যথাযথভাবে সংগঠিত হইতেছে না। অসংখ্য স্বার্থপর লোকের স্বার্থরক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে গিয়াই পণ্ডিত নেহেরু বহু সংখ্যক প্রদেশের সৃষ্টি করেন ও সেই সকল প্রদেশের নানাগণ্ডি ও গোষ্ঠীর পেট পুরাইতে গিয়া বিষয়টা আরই ক্ষুদ্র স্বার্থগত হইয়া পড়ে। ইহার সুবিধা করা, তাহার সুযোগ রক্ষা ও অপর কাহারও ক্ষতি করিয়া ভারতের জননেতাগণ ক্রমশঃ সমগ্র জাতির উন্নতির কথা চিন্তা করিতেই ভুলিয়া গিয়াছেন। জাতির ঐক্য ও সংগঠিত শক্তি বৃদ্ধি করিবার ভার যদি ক্ষুদ্রচেতা লোকেদের হস্তে দেওয়া হয় তাহা হইলে সফলতা আহরণের আশা ক্রমশঃ দূর হইতে আরও দূরে সরিয়া যায়। ভারতীয় জাতির শক্তি বাড়াইতে হইলে আমাদিগকে ছোট ছোট কথা ভুলিয়া শুধু সেই সকল কথাই সর্ব্বক্ষণ সম্মুখে রাখিতে হইবে যাহাদ্বারা সমগ্র জাতি লাভবান হয়। শুধু এই প্রদেশ, ঐ ভাষা অথবা দল বিশেষের সুবিধার কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে জাতি গঠন কখন হইবে না। অন্যায় ভাবে ও দুর্নীতির আশ্রয়ে পরস্ব অপহরণ চেষ্টা বাদ দিয়া শুধু যদি ভাগবাটের কথাই ধরা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে ভারতের বহু জাতি, গণ্ডি ও গোষ্ঠী আছে যাহাদিগের উপর কোন কার্য্যের ভার দিলে শুধু খরচের খাতায় খরচই লিখা হয়, কার্য্য কিছুই হয় না। শুনা যায় যে কোন একটি নদীর গঠনের খরচ মিটাইয়া দিবার কিছু দিন পরে সেতু [illegible] হয় নাই কেন প্রশ্ন উঠায়, উক্ত সেতু ভাঙ্গিয়া আবার নি[illegible] করা হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশের সৃষ্টি করাইয়াও সেতু ভা[illegible] খরচের টাকা আদায় করিয়া সমস্যার সমাধান করা এই সকল অর্থ অপহরণ কার্য্যের যে সকল বিশেষজ্ঞ [illegible] আছেন, ইঁহারা প্রায় সকল কার্য্যই না করিয়া হইয়াছে প্রমাণ করিতে পারেন। অন্তত অতি নিকৃষ্ট [illegible] কার্য্য করিয়া জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও বিপদে ফেলায় ইঁহারা প্রসিদ্ধ। যথা শুনা যায় যে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা [illegible] সরবরাহ না করিয়া ইঁহারা শুধু মূল্য আদায় করিয়া [illegible] কর্ত্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হইতে পারেন; কাদার গাঁথুনি বিরাট বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেও ইঁহারা পারেন এবং চা[illegible] মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ ধুলা ও কাঁকর মিশাইয়া ব্য[illegible] লাভ বাড়াইতে পারেন। এই সকল ব্যক্তি ভারতীয় ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাদেশিক অধিকারলব্ধ দাবী করিয়া কার্য্যভার আদায় করিয়া করিয়া লইয়া থাকেন ভারতের জাতীয় মঙ্গলের আদর্শ এইভাবে ক্রমাগতই করা হইয়া থাকে। প্রাদেশিক অধিকার এবং গো[illegible] দাবী বড় না ভারতের জাতীয়তার আদর্শ বড় এই [illegible] বিচারে দেখা যায় যে জাতীয় আদর্শের কোনই মূল্য নাই

মিথ্যার শেষ নাই

পাকিস্থানের নেতাগণের মধ্যে মানব সভ্যতার যে [illegible] গুণ মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসি[illegible] তাহার প্রায় কোনটিই দেখা যায় না। পাকিস্থান ন[illegible] একটা পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করিবার মতলব প্রথমত [illegible] সাম্রাজ্যবাদীদিগের মনে জন্মলাভ করে। এমন কি নামটিও ১৯২৬ খৃঃঅব্দে লণ্ডনের ফ্লিট ষ্ট্রীটে এক ভারত-বিদ্বেষী ইংরেজ ভাবিয়া বাহির করে ও তৎ[illegible] নামটি মুসলমান নেতা মহম্মদ আলি জিন্না ও তাঁ[illegible] অনুচরবর্গ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। যাঁহাদিগের [illegible] মাতৃভূমিকে দুইখণ্ডে ভাগ করিবার আগ্রহ বিদেশী শা[illegible] দিগের প্ররোচনায় জাগ্রত হয় তাঁহাদিগকে জাতীয় বোধের দিক হইতে উচ্চ শ্রেণীর মানুষ ঠিক বলা চলে [illegible]

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঐ সকল ব্যক্তি বৃটিশ শাসকদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে শত শত বার দাঙ্গা করিয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ করাইয়াছিলেন। পরে দেশ ভাগ হইলে পরে বৃহত্তর ভাবে ঐ হত্যাকাণ্ড চরমে পৌঁছায় ও লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু ঐ সকল দাঙ্গায় নিহত হয়। পাকিস্থান ভারতের কোন কোন অংশ লইয়া গঠিত হইবে তাহা পরিষ্কার জানা থাকিলেও পাকিস্থানের নেতাগণ দেশ ভাগ হইবার পরেও বার বার বেয়াইনি ভাবে ভারতের উপর হানা দিয়া নিজেদের অধিকৃত জমি আরও বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানে পাকিস্থানীগণ এইভাবে অনুপ্রবেশ করিয়া দেশ দখল করিয়াছে। ইহা নীচ লুণ্ঠনবৃত্তির পরিচায়ক এবং এইভাবে অপরের দেশ দখল করিবার জন্য পাকিস্থানীদিগকে কেহই সুসভ্য ও ন্যায়বান বলিয়া মনে করেন না। মাতৃভূমির সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া পাকিস্থান সুযশ অর্জ্জন করে নাই ও পরে ইসলাম ইসলাম বলিয়া চিৎকার করিয়া সকলের নিদ্রানাশের কারণ হইয়া ইসলাম তথা সকল ধর্ম্মের শত্রু কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া জগতের চক্ষে নিজেকে হেয় প্রমাণ করেন। আমেরিকা যদি চীনের শত্রু হয় তাহা হইলে পাকিস্থান এক হস্তে আমেরিকার সাহায্য লইয়া ও অপর হস্তে চীনের সহিত করমর্দ্দন করিয়া নিজের ন্যায়ধর্ম্মবোধের অভাব আরো প্রকটভাবে বিশ্বমানবকে দেখাইয়াছে। অবশ্য ইহার পূর্ব্বেই পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া "কাওয়ালি" সাজিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করে ও বহুদিন ধরিয়া ঐ বিষয়ে পুরাপুরি মিথ্যাকথা বলিয়া নিজেদের নির্দ্দোষ প্রমাণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে মানিয়া লইতে বাধ্য হয় যে "কাওয়ালি"গণ পাকিস্থানেরই সৈন্য অর্থাৎ পাকিস্থান আরম্ভ হইতেই শুধু মিথ্যার উপরই আস্থাবান। মুসলমানগণ একটি দ্বিতীয় ও বিভিন্ন জাতির মানুষ, তাঁহাদিগের মাতৃভাষা উর্দ্দু ও আরও অনেক মিথ্যার উপর পাকিস্থান নিজের মিথ্যাস্বরূপ গড়িয়া তুলিয়াছিল। পরে সর্ব্বঘটে, সর্ব্ববিষয়ে পাকিস্থান শুধু মিথ্যা কথা বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এখন নিজবন্ধু চীন দেশের সম্বন্ধেও পাকিস্থান ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলিয়া চলিয়াছে। চীন দেশ না কি কোন অন্যায় কখনও করে নাই। অপরের দেশ লুণ্ঠন ও আক্রমণ চীন কখনও করে না। কেহ সেইরূপ কথা বলিলে তাহা মিথ্যা কথা। ভারত চীনের নামে অপবাদ দিয়া থাকে যে চীন ১৯৬২ খৃঃঅব্দে ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। আসলে ভারতই চীন দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। ভারত আরও অনেক মিথ্যা চীন ও পাকিস্থানের নামে প্রচার করিয়া থাকে। পাকিস্থান ১৯৬৫ খৃঃঅব্দে কাশ্মীর দখল চেষ্টা করে নাই। আত্মরক্ষার জন্যই কোথাও কোথাও তাহাদিগকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বস্তুত ভারতই পাকিস্থান আক্রমণ করিয়াছিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি। পাকিস্থান মিথ্যা কথা বলার জন্য কোন প্রতিযোগিতা থাকিলে অনায়াসেই তাহাতে প্রথম পুরস্কার পাইত। আয়ুব খান যে রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা না কি স্বাধীন, সাধারণতন্ত্র ও জনগণের ইচ্ছায়ই তাহা চলিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত পাকিস্থানে শুধু এক ব্যক্তিরই আধিপত্য ও এই একমাত্র লোক হইল আয়ুব খান। চীনে যেরূপ মাও ৎসে তুঙ, পাকিস্থানে সেইরূপ আয়ুব খান। নিজ দেশে আয়ুব খান সকলের রাষ্ট্রীয় অধিকার কাড়িয়া লইয়া এক অপরূপ ইসলামী সাধারণতন্ত্র গঠন করিয়াছেন যে রাষ্ট্রে জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের কোন বাস্তব রাষ্ট্রাধিকার নাই ও সে রাষ্ট্র এক দিকে ধননৈতিক খৃষ্টান আমেরিকার ও অপরদিকে ধর্ম্মবিদ্বেষী কম্যুনিষ্ট চীনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া চলে। উপরন্তু পরস্ব অপহরণ চেষ্টায় এবং চুরী করিয়া পাওয়া জমি চীনকে দান করিয়া কম্যুনিষ্টের সহিত বন্ধুত্ব প্রগাঢ় করিতে পাকিস্থান সর্ব্বদা ব্যস্ত। এইরূপ একটি ধর্ম্মপ্রাণ রাষ্ট্র যখন ভারতের বিরুদ্ধে নানান মিথ্যা প্রচার করে তখন সে কথায় কে বিশ্বাস করে তাহা বলা কঠিন নহে। বুদ্ধিমান ও সত্যানুরাগী কোন লোকই পাকিস্থানী প্রচারকে নিছক মিথ্যা ব্যতীত আর কিছু মনে করেন না। পাকিস্থান এই প্রচার কার্য্য যে সকল দেশের ও দলের প্রয়োচনায় চালায় সেই সকল দেশ অবশ্য মিথ্যা জানিয়াও এই প্রচারের সমর্থন করে। ভারতীয় বাম কম্যুনিষ্ট দল এই মিথ্যা প্রচারের সমর্থন করিয়া থাকে ও নানা ভাবে পাকিস্থান ও চীনের মিথ্যা গুলি ভারতের বাজারে ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে।

এই দেশদ্রোহিতার জন্য ভারতে ইহাদিগের কোন শাস্তির ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। কিন্তু দেশের ঐক্য ও সংগঠিত রাষ্ট্রীয়শক্তি যথাযথ ভাবে বাড়াইয়া তুলিতে হইলে ভারতীয় জনসাধারণকে এই জাতীয় ঘৃণ্য স্বদেশবিরুদ্ধতা দূর করিতে হইবে।

সময়ে রেল চালান

সময় ঠিক করিয়া রেলগাড়ী চালাইলে যদি এঞ্জিন ঠিকমত চলে ও কয়লার অভাব না ঘটে তাহা হইলে গাড়ীগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট পথ একটা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিয়া যথাকালে কোন স্থানবিশেষে নিশ্চয়ই পৌছাইতে পারে। পারে না যদি সময় অনুসারে মানুষেরা গাড়ীগুলি চালাইয়া না লইয়া যায়। যেখানে চব্বিশ ঘন্টায় বহু সংখ্যক গাড়ী যায় ও আসে সেখানে সকলকে সমবেত ভাবে সময় ঠিক রাখিয়া চলিতে হয়, নতুবা একজনের বিলম্বে সকলের গমনেই বিলম্ব ঘটে। আজকাল ট্রেন যে ঠিক সময় চলে না তাহার মূলে আছে কোন কোন লোকের বিলম্ব ঘটাইবার অভ্যাস। ইঁহারা যে সকলেই এঞ্জিন-চালক বা ষ্টেশন-মাষ্টার এমন নহে। যাঁহারা ট্রেন বিলম্বে চলিলে ইষ্টক নিক্ষেপ ইত্যাদি করেন তাঁহাদিগের সহযাত্রীদিগের মধ্যেও অনেকে অকারণে ট্রেন থামাইবার চেন টানিয়া ট্রেন চলায় বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অকারণে বা অতি অল্প কারণে চেন টানিয়া গাড়ী থামান আজকাল একটা রেওয়াজ হইয়াছে এবং কোন দিনই কোন ট্রেন পূর্ণ পথ চলিবার মধ্যে কয়েকবার চেন টানিবার ফলে না থামিয়া গন্তব্য-স্থলে পৌছাইবার সুবিধা পায় না। ইঁহাদিগের হাত কাটাইয়া যদি বা ট্রেনগুলি কোন প্রকারে ঠিক সময়ে চলিতে পারে তাহা হইলে অসময়ে অতিরিক্ত ট্রেন চালাইয়া রোজকার ট্রেনগুলির গমনে বাধা সৃষ্টি করিবার লোকের অভাব হয় না। বিশেষ সামরিক ট্রেন বা বিশে[illegible] মালবাহক ট্রেন অথবা অপর কোন প্রকার বিশেষ ট্রে[illegible] আসিয়া উপস্থিত হইতে কোন ব্যবস্থার অভাব হয় না। ফলে নিত্যকার ট্রেনগুলিকে সাইডিংএ দাঁড় করাইয়া 'রাখ[illegible] হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা একটা ট্রেনে কলিকা[illegible] আসিতেছিলাম। ঐ ট্রেনটি লিলুয়া অবধি ঠিক সম[illegible] আসিয়া সেইখানে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল ও পূর্ণ ২॥০ ঘ[illegible] ঐখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে বহু ট্রেন হাও[illegible] হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল কিন্তু হাওড়ার দি[illegible] কোন ট্রেনই যাইতে দেখিলাম না। ট্রেন চলাচলের বি[illegible] আমরা বিশেষজ্ঞ নহি, কিন্তু এটুকু আমরা বুঝি যে ট্রে[illegible] যতগুলি যায় প্রায় ততগুলিই আসে। সুতরাং শুধু এ[illegible] মুখে ট্রেন চলিলে মনে হয় যে কাজ নিয়মমত চলিতেছে না[illegible] আমাদের মনে হয় যে ট্রেন চলাচলে বিলম্বের সৃষ্টি করি[illegible] কাহারও কোন শাস্তির ব্যবস্থা নাই। যদি শাস্তি হই[illegible] তাহা হইলে এতদিনে এই বিষয়ের একটা মীমাংসা হই[illegible] যাইত। কিন্তু অযথা বিলম্ব ঘটাইয়া যদি কাহারও কো[illegible] শাস্তি না হয় তাহা হইলে ইহার মীমাংসা কোন দিন হই[illegible] বলিয়া মনে হয় না। অতএব যাঁহারা শাস্তি দিবার মা[illegible] সর্ব্বপ্রথমে দোষীকে শাস্তি না দিবার জন্য ইঁহাদের শা[illegible] হওয়া প্রয়োজন। ইহা না করিলে গোড়ায় গ[illegible] থাকিয়া যাইবে।

চীনাদিগের উদ্ধত ভাব

কম্যুনিষ্ট চীন দেশের রাষ্ট্রনেতাদিগের ধারণা হইয়া[illegible] যে তাঁহাদিগের কথায় জগতের সকল জাতিকে চলি[illegible] হইবে। কেন যে হইবে এ কথাটা তাঁহারা কখন ভাবি[illegible] দেখেন না। নিজ মতের উপরে কাহার অগাধ বিশ্বা[illegible] থাকিলেই যে সেই মত অপরকেও মানিয়া লইতে হই[illegible] এইরূপ একটা মনের অবস্থা পৃথিবীতে বহুকাল ধরি[illegible]

দেখা যায় এবং সকল ধর্মান্ধতা এই মানসিক অবস্থা প্রসূত। অন্যান্য অন্ধ বিশ্বাসও যদি কখনও মানুষের মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তখন সেই সকল মানুষও নিজের বিশ্বাস গায়ের জোরে অপরের উপর চাপাইবার চেষ্টা করেন। কম্যুনিজম্ এই জাতীয় একটা অন্ধবিশ্বাসজাত অর্থ-নীতিগত ও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। কম্যুনিষ্টদিগের বিশ্বাস যে পৃথিবীতে একটা শ্রেণী সংগ্রাম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সেই সংগ্রামই পৃথিবীর মানবের সকল সমস্যার কারণ। সেই সংগ্রামে শেষ অবধি কর্ম্মীদিগের জয় ও ধনবানদিগের পরাজয় হইবে ও তখন মানুষের সকল বিষয়ে চরম উন্নতি সাধিত হইয়া যাইবে। এই অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর কয়েকটি দেশের লোক নিজ নিজ দেশে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া অপরাপর দেশেও দল গঠন করিয়া ঐ মতবাদ চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কোন কোন দেশের লোকেরা স্বদেশেই নিজমতবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন। পরের দেশে গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন না। অনেকগুলি কম্যুনিষ্ট দেশ কিন্তু এই পরদেশে প্রচার অর্থব্যয় করিয়া চালাইয়া থাকেন; এমন কি অন্য দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব করাইবার চেষ্টাও করিয়া থাকেন। চীনদেশ এই কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৎপর এবং চীনদেশের প্রচারক ও রাষ্ট্রনেতাগণ বর্ব্বরের ন্যায় উদ্ধত ও অসভ্য ভাবে এই কার্য্য চালাইয়া থাকেন। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া অকারণে পরদেশে অনুপ্রবেশ চেষ্টা ও গুপ্তঘাতকের মত হঠাৎ কাহাকেও গুলি চালাইয়া হত্যা করাও চীনদেশের কম্যুনিষ্টদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়া পরদেশে বিপ্লব ঘটাইবার ব্যবস্থাও চীনাগণ করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে চীনা ও তাহাদিগের বন্ধু পাকিস্থান সম্বন্ধে ভারতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কঠোর ও চিরজাগ্রত ভাবে করা প্রয়োজন। এই দুই দেশের সহিত সখ্য স্থাপন চেষ্টা করিয়া আত্মরক্ষা কার্য্যে ঢিলা দেওয়া মহা বিপদের কারণ হইবে। কেন না এই দুই দেশই বিশ্বাসঘাতকতায় বিশেষজ্ঞ ও ভারতের মহাশত্রু।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

তেরো

চেতলার একপ্রান্তে পূব পশ্চিমে বিস্তৃত বড় একটা রাস্তার থেকে বেরিয়ে একটা গলি চলে গিয়েছে দক্ষিণ দিকে। খানিক দূর গিয়েই গলিটা শেষ হয়েছে একটা বাজারের পিছন দিক্‌কার দেয়ালে।

গলিটার গায়ে পশ্চিম দিকে বড় রাস্তার উপরে ছোট একটি বস্তি। বেশীর ভাগই খোলার ঘর, দু-একটা ঘরের চাল যে কি দিয়ে তৈরি, অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে না দেখলে সেটা বোঝা যায় না। তারপরে বাজারের দেয়াল অবধি একটা খাটাল গলিটার প্রায় আধখানা জুড়ে রয়েছে। বড় রাস্তার এইদিক্‌টার এক কোণে একটা জলের কল। কলের সামনে দুই সারিতে গুটি আষ্টেক ড্রাম, বস্তিবাসী প্রতিটি পরিবারের এক-একটি করে। এই ড্রামে যে জল ধরা থাকে তা দিয়ে তাদের স্নান, কাপড় কাচা ও বাসন মাজা হয়। খাবার জলটা কল থেকে সোজাসুজি ধরে তারা ঘরে তুলে রাখে। জলের বখরা নিয়ে ছোটদের মধ্যে কখনো সখনো এক-আধটু কথা কাটাকাটি হয়, সেটা ছেড়ে দিলে বেশ শান্ত ভদ্র পল্লী। যদিও খোলার ঘরে অকল্পনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, তবু মানুষগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন। হয়ত পরিচ্ছন্ন থাকতে চায় বলেই জল নিয়ে বচসা হয়।

একমাত্র গোবর সম্বন্ধে এদের পরিচ্ছন্নতা বোধ কম, কিন্তু ঘুঁটে না হলে এদের চলে না। গোবরের গন্ধে নাক সেঁটকাবার সুবিধা কোথায় এদের?

বড় রাস্তার উপরে গলিটার পূবদিকে কাঠের কারখানাটা ও তারপর একটুখানি জমি ছেড়ে দিলে খাটাল ও বস্তির উল্টোদিকে গলিটার বাকী সবটা জুড়েই লম্বা একতলা একটি বাড়ী। খালি জমিটুকুও এই বাড়ীটারই আওতায় পড়ে। সেখানে সার সার দুটি করে পাইখানা ও দুটি করে দেয়াল-ঘেরা স্নানের জায়গা, মাঝখানে পার্টিশন দেওয়া বাড়ীটার পূবদিক্‌কার ও পশ্চিম দিক্‌কার চারটি করে আটটি ঘরের বাসিন্দাদের জন্যে আলাদা করা। দুটি ঘরের জন্যে একটি স্নানের জায়গা ও পাইখানা এই হিসেবে, ভিতরের লোকদের জন্যে ভিতরের দুটি ও বাইরের লোকদের জন্যে বাইরের দুটি, মাঝখানে উঁচু পাঁচিল।

বাড়ীটার টিনের চাল, পাকা মেজে ও ইঁটের দেয়াল। কাঠের কারখানার গায়ে পূবদিকে একটুখানি ফাঁকা জায়গা, যা দিয়ে বাড়ীটার ভিতরদিক্‌কার উঠোনে ও পূবদিকের পোড়ো জমিটায় যাওয়া যায়। মালিকানা নিয়ে মামলা চলছে বলে ছ' কাঠা পরিমিত এই পোড়ো জমিটা হয়ত আরও অনেককাল পড়েই থাকবে।

লম্বালম্বি দেয়াল দিয়ে দুভাগ করা বাড়ীটার দুদিকেই সমান মাপের চারটি করে ঘর। দক্ষিণ দিক্ থেকে শুরু করে গলির দিক্‌কার ঘরগুলির প্রথমটাতে থাকে কয়েকজন গোয়ালা, তার পরেরটাতে কয়েকজন ধোপা, তারপর একটি মুদির দোকান, ও একটা টায়ার সারাবার কারখানা। পোড়ো জমিটার দিকে ফাঁকা জমিটা দিয়ে সামনের উঠোনটাতে ঢুকেই প্রথমেই যে ঘরটা, তাতে সস্ত্রীক একজন ড্রাইভার থাকে। পরেরটা মুদিখানার ঠিক পিছনে মুদিরই গুদাম ঘর, এদিক্‌টায় তালা বন্ধ থাকে। গুদাম ঘরটার ভিতরকার একটা দরজা দিয়ে তার পরের ঘরটায় যাওয়া যায়, সেটাতে আধা পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা দুটি খুপরির একটিতে মুদি থাকে, অন্যটিতে থাকে তার বুড়ী মা। মুদি

তার থাকবার ঘরটার যাওয়া আসা গুদাম ঘরটার ভিতর দিয়েই করতে পারে বলে বড় রাস্তা দিয়ে তাকে ঘুরে যেতে হয় না, যেজন্যে এদিক্‌কার বাসিন্দারা মুদিকে দেখতে পায় না বড় একটা। সব শেষের অর্থাৎ একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের ঘরটাতে জগন্নাথ তার মাসীকে এনে তুলেছে। এই ঘরটির মাঝখানে আধা পার্টিশন। সামনে চওড়া বারান্দা ঘরগুলির মাপে মাপে দেয়াল দিয়ে আড়াল করা। বারান্দার একপাশে রান্নার জায়গা, তারও উঠোনের দিক্‌টায় নীচু একটুখানি একটা দেয়াল।

জগন্নাথ বলল, "কেমন বাড়ী মাসী ?"

দুচোখ দিয়ে খুশি উপচে পড়ছে। সচরাচর যতটা করে, আজ যেন দাঁতগুলিও তার চেয়ে বেশী চকচক করছে তার।

নির্ম্মলারও বেশ ভালই লাগছিল ঘরটা। বলল "ভালই ত। ভাড়া কত ?"

জগন্নাথ বলল, "সতেরো টাকা, আর তিনটাকা বাতির জন্যে।"

নির্ম্মলা বলল, "ভাড়া খুব বেশী নয় ত।"

জগন্নাথ একটু বিনয় করে বলল, "ঘরদুটিও ত বড় নয়।"

নির্ম্মলা বলল, "ঘর একটু ছোট হওয়াই ত ভাল। বেশ সহজে ঝেড়েঝুড়ে ঝকঝকে করে রাখা যায়।"

জগন্নাথ বলল, "ঘরদুটোকে আমরা সাজাব মাসী।"

নির্ম্মলা বলল, "সাজাবই ত।"

সামান্য জিনিষপত্র যা তাদের ছিল, দুজনে হাতাহাতি গুছিয়ে ফেলল তারা। দুঘরে দুটি দড়ির খাটিয়া আগেই এনে পেতে রেখেছিল জগন্নাথ, হোটেলে থাকতে বিছানা বালিশ কেনা হয়েছিল।

অকারণেই কয়েকবার হেসে, নির্ম্মলাকে নিয়ে গিয়ে একবার স্নানের জায়গাটা দেখিয়ে এনে, জগন্নাথ বলল, "বাজারটা একটু ঘুরে আসি। যাব মাসী ?"

নির্ম্মলা বলল, "হ্যাঁ, যাও।"

জগন্নাথ চলে গেলে বারান্দায় বসেই সে ভাবল কিছুক্ষণ। তার নিজের টাকাকড়ি যা আছে, তাতে কাজ জুটতে যদি আরো কিছুদিন দেরিও হয়, তাদের একেবারে আথান্তরে পড়তে হবে না। কিন্তু সেটা হবে না বলে কাজ খুঁজতে জগন্নাথ যদি ঢিলেমি করে তবেই হবে বিপদ্‌। সেটা তাকে কিছুতেই করতে দিলে চলবে না।

দেয়াল ঘেরা স্নানের জায়গাটার থেকে এক বালতি জল নিয়ে বেশ সুশ্রী চেহারার একটি বৌ ও পাশের শেষ ঘরটাতে ঢুকল। যেতে যেতে এক নজর দেখে গেল নির্ম্মলাকে।

একটু পরেই একটুখানি হাসি মুখে নিয়ে সে চলে এল নির্ম্মলার কাছে। নির্ম্মলার পাশেই বারান্দায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তার নাম চাঁপা, তার সোয়ামী একটা খুব বড় অফিসে ড্রাইভারের কাজ করে। মাইনে ভালই পায়, তাছাড়া উপরি পায় অনেক। সেই ভোর না হতেই বেরিয়ে যায় আর বেশ রাত করে ফেরে ত ? তাই ওভারটাইম না কি যে বলে তাই পাওনা হয়। আর মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে চলে গিয়ে একটানা সাত আটদিন কাটিয়ে আসে। তখন একেবারে একলা থাকতে হয় তাকে। বেশ হল, নির্ম্মলা এল। কাছাকাছি মেয়েছেলে আরো আছে জানলে মনে তবু সাহস পাওয়া যায়। মুদীর বুড়ী মা পাশের ঐ ঘরটায় থাকে বটে, তবে সে নামেই মানুষ। কানেও শোনে না, চোখেও দেখে না, কেবল অভ্যাস মত রান্নাবাড়ার কাজগুলি ঠিক ঠিক করে যায়।

নির্ম্মলাদেরও খোঁজখবর সে নিতে চেষ্টা করল একটু। জগন্নাথের সে কে হয় জানতে চাইলে সম্পর্কটা যে পাতানো সেটা তাকে বলতে পারল না নির্ম্মলা। বলল, "মাসী হই।"

এমন সময়ে একটি ঝাঁকামুটে সঙ্গে করে একটা বালতি হাতে জগন্নাথ এল ! বৌটি ঘোমটা টেনে প্রায় ছুটে চলে গেল সেখান থেকে।

বালতিটা রেখে মুটের মাথা থেকে ঝাঁকাটার একদিক্‌ ধরে নামাতে নামাতে জগন্নাথ বলল, "এস ত মাসী, দেখত সব ঠিক ঠিক এনেছি কি না।"

ঝাঁকা থেকে তুলে একটা একটা করে জিনিষ বারান্দায়

রাখতে লাগল জগন্নাথ। এলুমিনিয়মের কিছু হাঁড়িকুঁড়ি, শিল-নোড়া, চাকী-বেলুন, বঁটি, নারকেল কুরুণি, হাতা-খুন্তি-চামচ, কলাই করা লোহার দুটি দুটি করে থালা, গেলাস, বাটি, পেয়ালা-পিরীচ, একটা কুঁজো, তা ছাড়া চাল-ডালের ঠোঙা ও কিছু তরিতরকারি।

বলল, "তেল নুন মশলাপাতি ও পাশের মুদির দোকান থেকে আনা যাবে।"

নির্ম্মলা বলল, "বাবা রে, একটা ঝাঁকায় করে কত জিনিষ এনেছ?"

মুটে বলল, "দেখিয়ে না। আঠ আনাসে এক পয়সা কমতি নেহি লেগা, হুঁ।"

জগন্নাথ বলল, "এসবই ত দরকারী জিনিষ। এখন আবার কাঠ-কয়লা কিনতে বেরুতে হবে।"

তেরো চৌদ্দ বছর বয়সের একটু খোঁড়া রোগা মতন একটি ছেলে জগন্নাথের পিছন পিছন এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল, বলল, "কাঠ-কয়লা আমাদের দোকানে আছে, তেল নুন ঘি মশলা কাপড়-কাচা সাবান সব আছে। কি কি চান একটা ফর্দ্দ করে দিন, এনে দিচ্ছি।"

জগন্নাথ বলল, "তুমি কে?"

ছেলেটি বলল, 'আমার নাম তিনকড়ি, সবাই তিনু বলে ডাকে। ও পাশের মুদির দোকানে কাজ করি।"

ছ' আনা নিয়ে বেশ কিছু গোলমাল করে মুটে বিদায় হলে, এবং পয়সা ও ফর্দ্দ নিয়ে তিনু চলে গেলে নির্ম্মলা জিনিষগুলিকে তুলে রাখল যথাস্থানে। তারপর বলল, "শুধুই আনাজ তরকারি আনলে, মাছ একটু ত আনতে পারতে নিজের জন্যে।"

জগন্নাথ বলল, "আজ থেকে আমিও নিরিমিষ্যি খাব ঠিক করেছি মাসী, মাছ মাংস আর ছোঁব না।"

"তা কখনো হয়?"

"কেন হবে না? মাছ মাংস খাওয়াটা ভাল কাজত নয়?"

"না, তুমি মাছ খাবে, আমি রেঁধে দেব তোমাকে।"

"না মাসী, আমি জানি মাছের গন্ধ তুমি সইতে পার না। আমার জন্যে মাছ রাঁধতে তোমাকে কিছুতেই দেব না আমি। রেঁধে দিলেও আমি খাব না, বলেই দিলুম।"

নির্ম্মলা করুণ করে হাসল একটু।

কয়েকটা দিন কাটল। একদিন দুপুরের দিকে দুহাতে হাঁটুদুটো জড়িয়ে বারান্দার সিঁড়ির পাশে বসে আছে জগন্নাথ, ভাতের হাঁড়িটা নামাতে নামাতে নির্ম্মলা বলল, "আচ্ছা জগন্নাথ, প্রায়ই ত দেখি সারাদিনটি বাড়ীতে বসে থাক, তোমার কাজ কি সবই রাত্তিরে?"

তারকের সঙ্গে পরামর্শ করে এই প্রশ্নের উত্তর একটা তৈরি করেই রেখেছিল জগন্নাথ, বলল, "আমি ত একটা সিনেমায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করি মাসী। তবে কিনা এটা বদলির কাজ; যে লোকটা ছুটিতে গেছে ফিরে এলেই আমাকে ছাড়িয়ে দেবে, তাই তোমাকে এটার কথা বলিনি।' সত্য কথাটা নির্ম্মলাকে বললে সে কি মনে করবে কে জানে?

নির্ম্মলা বলল, "পাশের বাড়ীর বৌটি নানারকম কথা বলে, তাই বলছিলাম আর কি। আমারও মনে হয় বাড়ী বসে না থেকে দুজনেরই জন্যে পাকাপাকি ধরণের কাজ আরও বেশী ভাল করে খোঁজা উচিত তোমার।"

জগন্নাথ হাঁটুর বাঁধন আলগা করে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল, বলল, "তা ত করছিলুমই, আচ্ছা, কাল থেকে আরও নাহয় বেশী করে করব। কিন্তু বৌটি কি বলে? কি বলে শুনি?"

নির্ম্মলা বলল, "সে যাকগে, ওর আসল বলবার কথা হল, দুপুরে যখন কাজ থাকে না হাতে, তখন চায় আমার সঙ্গে গল্প করতে, কিন্তু তুমি থাক বলে পারে না।"

"এলেই পারে গল্প করতে, কে বারণ করছে?"

"বৌ মানুষ, তোমার সামনে বেরোতে লজ্জা করে।"

জগন্নাথ হেসে ফেলল। বলল, "জানো মাসী—না, থাক, বলব না।"

বলতে চেয়েছিল, এতই যদি লজ্জা ত ফাঁকা জমিটার উপর দিয়ে আমি যখন আসি যাই, আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হলে মুখ টিপে হাসে কেন ও?

এটা সত্যিই কথা, যে, সকালে বাজার করতে যাওয়ার

সময় ছাড়া দিনের বেশীর ভাগটা সে বাড়ীতেই কাটিয়েছে এই ক'দিন। মাসীর কাছে থাকতে পেলে তার ভাল লাগে সে ত ঠিকই কিন্তু কোথায় যে যাবে, কি কাজ খুঁজবে তাও ভেবে পায় না। হয়ত দুজনের কাজ জুটলে এই ঘরটা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, অন্ততঃ নির্ম্মলা চলে যাবে; আর কিছু না হোক, হয়ত ও পাশের ঘরের ড্রাইভারটির মত বাড়ীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক তার থাকবে না। কোনটাই ভাবতে ভাল লাগে না তার। শুঁড়িখানার কাজটাতে এত ভাল রোজগার হচ্ছে তার যে, অন্য কাজ খুঁজবার জন্য মনের মধ্যে কোন জোর তাগিদও অনুভব করছে না সে।

এই কাজটার একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে, বাড়ী ফিরতে প্রায়ই খুব রাত হয়ে যায়। তবে যত রাতই হোক, তাতে রাত জাগার কষ্ট ছাড়া আর কোন অসুবিধা নির্ম্মলার নেই। আশেপাশের মানুষগুলো খুব ভাল। গোয়ালাদের, ধোপাদের ঘরের মধ্যে জায়গা হয় না, ঘরে থাকতে বোধহয় ভালও লাগে না তাদের। গলির মধ্যে, বড় রাস্তাটার ফুট-পাথের উপর এখানে-সেখানে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে তারা রাত কাটায়। এতগুলি লোকের অনিচ্ছিত পাহারায় পাড়াটা খুবই নিরাপদ আর নিরুপদ্রব। একলা থাকতে ভয় করে না নির্ম্মলার। পোড়ো জমিটার ওদিকে একটা দুতলা বাড়ীর জানলা থেকে একটি ছেলে বাইনোকুলার লাগিয়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করে মাঝে মাঝে; কিন্তু সে নিতান্তই ছেলেমানুষ, দূর থেকে দেখে ত মনে হয়, মুদির দোকানের তিনুরই মত বয়স হবে।

গয়লারা ধোপারা নির্ম্মলার একটু খবরদারি করবারও চেষ্টা করে মাঝে মাঝে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জগন্নাথ আর তিনুর দেখাদেখি নির্ম্মলাকে মাসী বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। ড্রাইভারের বৌটি 'দিদি' বলে ডাকে আর ফাঁক পেলেই এসে গল্প জোড়ে।

সব জড়িয়ে বেশ শান্তিতেই নির্ম্মলার দিনগুলি কেটে যাচ্ছে।

জগন্নাথ যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণই বরং নির্ম্মলা অসুবিধা বোধ করে একটু। একে ত ছোট বাড়ীটাতে দুজনের মাথা ঠোকাঠুকি হবার অবস্থা হয়। এক-একবার, তার উপর পোষা কুকুরের মত কেমন এক রকম বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে নির্ম্মলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে সে। তার সেই দৃষ্টিতে অপরিসীম সম্ভ্রম, তাই তা নিয়ে কিছু মনে করা চলে না, কিন্তু নির্ম্মলা খুবই বিব্রত বোধ করে।

নির্ম্মলার সম্বন্ধে জগন্নাথের সম্ভ্রম বোধটা সত্যিই আন্তরিক। একদিন রাত্রিতে নিজের খাটিয়াটিকে বারান্দায় টেনে নিয়ে শুয়েছে জগন্নাথ, শেষ রাত্রির দিকে উঠে সেটার পাশ কাটিয়ে বাইরে যাবার সময় জগন্নাথের একটা পায়ে পা ঠেকে গিয়েছিল নির্ম্মলার। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে হাতড়ে খুঁজে নির্ম্মলার পা ছুঁয়ে মাথায় বুকে হাত ঠেকিয়েছিল জগন্নাথ। বারান্দায় পাতা খাটিয়ার পাশে একটুখানি জায়গায় আধ অন্ধকারে সে এক পর্ব্ব। আর একটু হলেই নির্ম্মলা হুমড়ি খেয়ে জগন্নাথেরই উপর পড়েছিল আর কি!

এর মধ্যে সস্তায় পুরনো নড়বড়ে একটা সাইকেল কিনে নিজেই সেটাকে ভাল করে সারিয়ে নিয়েছে জগন্নাথ। এখন সে রাত দশটার মধ্যে বাড়ী ফিরে আসে, আর দিনের বেলায় অনেকটা সময় বাইরে কাটিয়েও মাসীর কাছে বেশ খানিকক্ষণ থাকতে পায়। আগে সকাল বেলা বাজার করতে গিয়ে এক' ঘণ্টার আগে সে বাড়ী ফিরতে পারত না বলে তার খুব মন খারাপ লাগত। এখন শিস দিতে দিতে যায়, আর আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বাজারের থলেটা সাইকেলের হাতলে ঝুলিয়ে শিস দিতে দিতে ফিরে আসে।

এসব ত হল, কিন্তু নির্ম্মলার যে কাজ একটা জুটল না এখন অবধি, তার কি হবে?

অবশ্য, এক-একবার তার মনে হয়, যেভাবে চলছে চলুক না? সকলের চোখের আড়ালে, সকলের অবজ্ঞাত একটা বস্তির মধ্যে এই যে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা, লোভ একটু হয় বই কি এটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে। কাজে ঢোকা মানেই ত নিজেকে অনেক লোকের চোখের সামনে মেলে ধরা? তাদের মধ্যে তার আগেকার আমি-টার, যার নাম ছিল নিরুপমা, চেনা লোক যে থাকবে না, বা সেরকম কেউ যে এসে পড়বে না তখন জীবনযাত্রার পরিধির মধ্যে, তা কে বলতে পারে? স্বল্প পরিচিত কোনো

মানুষের সঙ্গেও যদি তার দেখা হয়ে যায়, আর সেই মানুষটির মনে সন্দেহ জাগে যে সে নিরুপমা, তাহলেই সে ত পুলিশকে সেটা জানাতে পারে ?

পুলিশের কথা মনে হলেই নির্ম্মলার শরীরটা কি এক-রকম যেন হয়ে যায় এখনো। আর পুলিশ দেখলে ত কথাই নেই। চৌরাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে পুলিশরা হাতের ইঙ্গিতে গাড়ী থামায় ছাড়ে, তাদের পাশ দিয়ে যেতে হলেও বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে তার, আর সে ধড়ফড়ানি তারপর আর থামে না সহজে। এমন মানুষের পক্ষে বাইরে বেরিয়ে কাজ করাও ত সহজ নয় ?

অথচ যেভাবে তার দিন চলছে বেশীদিন সেভাবেও চলতে পারে না।

রোজগারের টাকাটার বেশীর ভাগ জগন্নাথ নির্ম্মলারই হাতে এনে তুলে দেয়, নির্মলা হিসাবের খাতায় সেটা জমা করে। জগন্নাথের সঙ্গে তার কথা হয়ে গিয়েছে বাড়ীভাড়া ও বাড়ী-খরচের অর্দ্ধেকটা সে দেবে। জগন্নাথ বলেছিল, "আমার একলার রোজগারে যতদিন চলছে দুজনের চলুক না, গয়না বেচা টাকা ক'টা কেন খরচ করবে তুমি ? তোমার জন্যে একটা সুখা কাজ খুঁজছি, যদি পেয়ে যাই ত তখন খরচ দিও, বা আমার যদি কখনও কাজকর্ম্ম না থাকে, খরচ চালাবার মত অবস্থা না থাকে ত তখন দিও।" নির্মলা বলেছিল, "খরচের অর্দ্ধেকটা আমাকে দিতে না দাও যদি ত আর এক বেলাও আমি থাকব না এ বাড়ীতে।" অগত্যা জগন্নাথকে রাজী হতে হয়েছিল।

কিন্তু নির্ম্মলার সামান্য যা পুঁজিপাটা, বসে খেলে তা একদিন না একদিন ত শেষ হয়ে যাবেই ? তখন একটি দরিদ্র, অপরিণত বয়সের অনাত্মীয় ছেলের রোজগারে বসে বসে খাওয়ার যে গ্লানি তা সহ্য করে সে কি বাঁচতে পারবে ?

কি করবে ভেবে না পেয়ে আপাততঃ কিছুদিন আবার পড়াশোনা করবে ঠিক করে জগন্নাথকে দিয়ে কিছু বই খাতাপত্র কিনিয়ে আনল। নির্ম্মলা পড়ে লেখে, জগন্নাথ একটু দূরে বসে দেখে। কথা বলতে গেলে তাড়া খায়। একদিন নিজেও ভটিচুই বাংলা বই ও ইংরেজী প্রথম পাঠ কিনে এনে বলল, "মাসী, আমিও পড়ব। তুমি পড়াবে আমাকে ?" নির্মলা 'না' বলতে পারল না।

চোদ্দ

সেদিন সাহস করে নির্ম্মলাকে বলতে পারেনি কথাটা, কিন্তু শুঁড়ির দোকানের কাজটা যখন নিয়েছিল জগন্নাথ, তখন তার নিজের একবারও মনে হয়নি যে, সে অন্যায় কিছু করছে।

যে পরিবেশে সে মানুষ, তাতে মদ্য পান পাপ না পুণ্য তা জানবার তার কথা নয়, কারণ বাংলার গ্রাম্য-সমাজে তামাকের হুঁকো, গাঁজার কলকে চলে, মদ চলে না। জিনিষটার সঙ্গে তার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় বিজিতেন্দ্র নারায়ণের বাড়ীতে কাজ করতে এসে।

বিজিতেন্দ্র প্রত্যহ সন্ধ্যায় বরাদ্দ মত পান করতেন। বরাদ্দটা পরিমাণে খুব যে কম ছিল তা নয়, কিন্তু সেটাকে কখনো, কোন অবস্থাতেই তিনি অতিক্রম করতেন না। আর পান করবার সময় বা তার পরে তাঁর মধ্যে কোনদিকে কোন শৈথিল্য বা ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেত না।

নির্ম্মলাকে জগন্নাথ একদিন বলেছিল, কর্ত্তাবাবু খুব ভাল লোক, মদ খান কিনা ? আসলে সে বলতে চেয়েছিল, ভাল লোক যারা মদ খায় তারা আরও ভাল লোক হয়ে যায় ; আর এটা তার নিজের কথা নয়। জমিদার বাড়ীর ঠাকুর-চাকর, আমলা মুহুরি, কোচম্যান, ড্রাইভার, প্রায় সকলেরই মুখে ঐ কথাটা সে অসংখ্য বার শুনেছে, আর এত লোকে কথাটা বলছে বলে শুনে বিশ্বাসও করেছে।

তারপর এই অসময়ে মদের জোগান দেওয়া।

মানুষ রাত নটা অবধি মদে হাবুডুবু খেলে সেটা দোষের হয় না, নটা বেজে এক মিনিট হলে ওটা ছুঁলেই পাপ, এরও মর্ম্মার্থ সে বুঝতে পারে না। অসময়ে তৃষ্ণার্ত মানুষ-

গুলিকে মদ জোগানোটাকে একটা পুণ্য কর্ম্ম না ভাবুক, পুলিশের সঙ্গে বেশ মজার একটা লুকোচুরি খেলার মতই মনে হয় তার সেটাকে, যেরকম মজার মনে হত খিড়কির বাগানে সুধীর প্রবীরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।

কিন্তু সে জানত না যে, মানুষের বৃত্তি বা পেশা, তার যেটা উপজীবিকা, তার প্রায় সব কটিরই নিজস্ব পৃথক্ এক-একটা পরিমণ্ডল রয়েছে, একটা বিশেষ ধরণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্র, ভিতরে একবার প্রবেশ করলে যার প্রভাব থেকে কোন মানুষই নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারে না।

কাজ করলাম, মাইনে নিলাম; বা নিজের লভ্যাংশ হিসেব করে বুঝে পেলাম; এরই মধ্যে জিনিষটার পরিসমাপ্তি হয় না।

রাত করে মদ কিনতে যারা আসে তারা যে বিজিতেন্দ্রের জাতের লোক নয় এটা সে প্রথম দুতিন দিনেই বুঝতে পেরেছিল। ভাল লোক তাদের মধ্যে একেবারে যে নেই তা নয়, ছেলে-ছোকরারাও মাঝে মাঝে দল বেঁধে আসে মদের নামে কিঞ্চিৎ বাহাদুরি কিনতে; কিন্তু রোজই দেখত, এমন অনেকে আসে, যাদের কাজ হল, সারারাত নানারকমের কুকীর্ত্তি করে বেড়ানো, যা করতে হলে একটু নেশা না চড়ালে চলে না।

দোকানের বাঁধা দামটা দিতেই এদের ফাটাফাটি, তার চেয়ে বেশী চাইলে তেড়ে মারতে আসে। জগন্নাথ চায় এদের খুরে খুরে প্রণাম করে তফাতে থাকতে, কিন্তু সাধ্য কি তার? এরা ভয় দেখায় বলে, "খুব যে লায়েক হয়েছিস ছোঁড়া। আমরা ইচ্ছে করলে তোর এই গলিতে ঢোকা কালকেই বন্ধ করে দিতে পারি, জানিস?" তা এরা পারে। আবার এরা ভাবও করে। চায়ের দোকানে বসিয়ে চা আর বাসি শুকনো স্পঞ্জ কেক খাওয়ায়, ছেলের অন্নপ্রাশনে, বিশ্বকর্মা পূজোয় নেমন্তন্ন করে। অবশ্য জগন্নাথকে দিয়ে নানারকমের কাজও করিয়ে নেয় তারা। বাড়ীর কাজ, ট্যাক্সি গাড়ীর কাজ, এটা বসানো, ওটা সারানো। সে যে "সকল কাজের কাজী", সেটা তার মুখে শুনেই সকলে জেনে গিয়েছে।

এমনি করে এদের কোন কুকীর্ত্তিতে যোগ না দিয়েও জগন্নাথ দ্রুতগতিতে এদের অন্তরঙ্গ দলেরই একজন হয়ে উঠছিল। বিপদ্ যে একদিন এইদিক্ থেকেই এসে দেখা দিতে পারে সেটা একবারও তার মনে হয় নি সেসময়।

শীতকাল। ভোরের কুয়াসা কাটতে আরম্ভ করবার আগেই তার সঙ্গে নানারকমের ধোঁয়া এসে মিশছে। নির্ম্মলা উনুন ধরাচ্ছিল, জগন্নাথ এসে সেখানে দাঁড়িয়ে বলল, "জ্যাঠাইমাকে স্বপ্ন দেখেছি কাল রাত্তিরে; তাঁর ভালমন্দ কিছু হল কি না কে জানে? অনেকদিন দেখিনি, তাঁর খবর একবার নিতে হয়। সাইকেলটা রয়েছে, যাওয়া আসার খরচ কিছু নেই। দুবেলার খাওয়াদাওয়া আজ ঠাকুরপুকুরেই করব, তারপর রাতটা সেখানে কাটিয়ে কাল দুপুরের আগেই বাড়ী ফিরে আসব। যাব মাসী?"

নির্ম্মলা বলল, 'যাবে বই কি। তোমার একমাত্র আপনার জন জ্যাঠাইমা; আরও আগেই কেন তাঁর খবর নাওনি জানি না।"

সকাল সকাল চা খাওয়া সেরে সাইকেল চ'ড়ে জগন্নাথ বেরিয়ে গেল।

দিনের বেলাটা নিজের কাজকর্ম্ম লেখাপড়া নিয়ে আর ওপাশের ঘরের বৌটি, চাঁপা যার নাম, তার সঙ্গে গল্প করে নির্ম্মলার রোজ যেমন কাটে আজও তাই কাটল, কিন্তু একটু রাত হতেই নিজেকে বড় বেশী একলা মনে হতে লাগল তার। ভুলতে পারছে না যে, জীবনে এই বোধহয় প্রথম একটা বাড়ীতে একেবারে একলা রাত কাটাবে সে।

খাওয়াদাওয়া সেরে রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে লেপ গায়ে দিয়ে শুল, কিন্তু শীত শীত ভাবটা কেন কিছুতেই কাটছে না? শরীরটা কি রকম কেঁপে কেঁপে উঠছে। এরকম ত হয় না অন্যদিন?

তার কি একটু ভয় ভয় করছে?

কিন্তু কেন ভয়? বাড়ীটাতে নামেই সে একলা। পাশের ঘরে মুদি আর তার মা রয়েছে। একটা ঘর ছেড়ে চাঁপা বৌ রয়েছে। চাঁপা বৌএর সোয়ামীও ফিরেছে দুদিন হল, পাটনা থেকে। আর তার খুব কাছেই এধারে ওধারে গোয়ালারা আর ধোপারা শুয়ে আছে খাটিয়া পেতে।

বস্তির লোকগুলি ত অত্যন্তই নিরীহ আর ভদ্র। ভয় পাবার কোন কারণই নেই তার।

যাইহোক, অন্ধকারটা তার ভাল লাগছে না। উঠে গিয়ে আলোটা জ্বেলে একটা বই নিয়ে আবার শুল নির্ম্মলা। পাতার পর পাতা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে গেল সে, তারপর এক সময় বুঝতে পারল, এতক্ষণ ধরে যা সে পড়েছে তার এক বর্ণও তার মাথায় ঢোকেনি, কচুপাতার উপর দিয়ে বৃষ্টির জল যেমন কোন চিহ্ন না রেখে গড়িয়ে যায় সেইরকম করে গড়িয়ে গেছে। এরকম হবার কারণটা আসলে যে কি তা সে জানে না, তবে এটা ঠিক যে, জগন্নাথের জন্যেও তার একটু ভাবনা হচ্ছে। ঠাকুরপুকুর কলকাতার খুব কাছে নয় বলেই সে শুনেছে, চাঁপা বৌ তার সোয়ামীর কাছে শুনে তাকে বলেছে। তাছাড়া রাস্তাটাও নাকি তত ভাল নয়, আর প্রচণ্ড ভিড় ট্রাম-বাসের। একটা পল্কা সাইকেলে চড়ে এতটা পথ যাবে আসবে,—বিপদাপদ্ কিছু ঘটবে না ত ছেলেটার ?

রাত যখন প্রায় দুটোর কাছাকাছি তখন তার একবার মনে হল, দরজার কড়াটা যেন নড়ে উঠল। কান খাড়া করে শুনে কোন সন্দেহ রইল না যে, কেউ খুব সন্তর্পণে কড়াটা নাড়ছে।

প্রথমে গা-হাতপা ভয়ে অবশ হয়ে এল তার, তারপরেই মনে হল, চাঁপা বৌএর সোয়ামী পাটনা থেকে জ্বর নিয়ে ফিরেছিল, আজ কাজে বেরোয়নি, তার অসুখটা বাড়ল কি, যেজন্যে চাঁপা বৌ তাকে ডাকতে এসেছে? হতে যে না পারে তা ত নয়? উঠে গিয়ে বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলল, "কে?"

বাইরে থেকে জগন্নাথের গলায় শোনা গেল, 'মাসী"।

"কি কাণ্ড, কি দরকার ছিল রাত্তিরেই ফিরে [illegible]াসবার?" বলে দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে সে হাঁ হয়ে [illegible]েল। কুয়াশা ও আধ-অন্ধকারে দেখল, দুহাতে দুজন [illegible]াকের গলা জড়িয়ে জগন্নাথ দাঁড়িয়ে আছে, না ঝুলছে, [illegible]ক বোঝা যাচ্ছে না। মুখ দিয়ে মৃদু কাতরোক্তি বের [illegible]চ্ছে তার।

নির্ম্মলা এগিয়ে গিয়ে বলল, "কি হয়েছে জগন্নাথ, কি হয়েছে তোমার ?"

লোক দুটির মধ্যে যেটি বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা কুস্তিগিরের মত দেখতে, সে বলল, "ওকে আগে কোথাও একটু শুইয়ে দাও, তারপর শুনবে কি হয়েছে।"

তিনজনে ধরাধরি করে জগন্নাথকে তার খাটিয়ার বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে পর সেই লোকটি নির্ম্মলার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে ফাঁকা জমিটার পাশে গলিতে রাখা রিক্শয় চড়ল। তার সঙ্গীটি রিক্শওয়ালা।

জগন্নাথের খাটিয়ার পাশে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে নির্ম্মলা বলল, "কি হয়েছে জগন্নাথ! পায়ে চোট লেগেছে? কোথায় লেগেছে?"

ডান পায়ের গোড়ালিটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জগন্নাথ বাবা রে, মা রে, বলে কাৎরাতে লাগল। নির্ম্মলাকে সে কিছুতেই তার পায়ে হাত দিয়ে দেখতে দেবে না, লাগিয়ে দেবে না সেটা নির্ম্মলা বারবার বলা সত্ত্বেও। অগত্যা তার পাটার উপরে একটু ঝুঁকে যতটা দেখা গেল দেখে নির্ম্মলার মনে হল, বেশ ভালরকম চোটই লেগেছে। পায়ের নীচের দিকটা ফুলেছে খুব, গোড়ালির কাছে কোন হাড় না যদি ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলেই বাঁচোয়া।

এত কাৎরাচ্ছে ছেলেটা, একটা কিছু ত করতে হয়। পা ভাঙলে গরমজলের সেঁক দিতে হয়, না বরফ দিতে হয় ঠিক জানে না নির্ম্মলা। জগন্নাথকে জিজ্ঞেস করল, পায়ে কি দিলে তার একটু আরাম বোধ হবে, ঠাণ্ডা, না গরম। জগন্নাথ বলল, "মাসী, আমার পায়ে ঠাণ্ডা বা গরম কিছুই তোমাকে আমি দিতে দেব না, কাল সকালে নিজে যা পারি করব। এখন তুমি চুপ করে একটু কেবল বস আমার কাছে।"

এই ভাবেই রাতটা কাটল।

ভোর হতেই, যে গোয়ালা তাদের চায়ের দুধ দিয়ে যায় তাকে ধরে নির্ম্মলা জগন্নাথকে একটা হাসপাতালের আউট-ডোরে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। পা-টা যদি ভেঙে থাকে [illegible] তার জন্যে সেখানকার ডাক্তাররা কি করতে হবে তা বলে

দেবে। যদি হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার হয়, তাও তারা বলবে।

দুপুরের আগেই জগন্নাথ ফিরে এল, ডান পায়ে প্ল্যাষ্টারের মোটা একটা হাফ-মোজার মত পরে। হাসপাতালের ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, একুশ দিন এই প্ল্যাষ্টারের মোজা পরে থাকতে হবে জগন্নাথকে।

তার ঝকঝকে হাসিটি হেসে জগন্নাথ বলল, 'জান মাসী, ডাক্তারবাবুরা বলে দিয়েছেন, আমার যা ইচ্ছে আমি খেতে পারি।"

তার বিছানাটা ঠিক করে দিতে দিতে নির্ম্মলা বলল, "তবে আর ভাবনা কি?" গোয়ালা ও রিক্‌শওয়ালা জগন্নাথকে শুইয়ে দিয়ে গেল বিছানায়।

তাকে খাওয়ানো, তার মুখ ধুইয়ে দেওয়া, তার মাথা ধুইয়ে দেওয়া, এসব নিয়ে অসুবিধা কিছু নেই, কিন্তু দিনের মধ্যে বারকয়েক বাধ্য হয়েই ত স্নানের ঘরগুলির এলাকায় যেতে হয় জগন্নাথকে। তখন গোয়ালাদের বা ধোপাদের একজনকে ডাকতে হয়, ডানপাশের দিকে তাকে ধরে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু এক এক সময় তারা কেউ বাড়ীতে থাকে না। তখন হয় মুশকিল।

চাঁপা বৌ শুনে বলল "তা তুমি একলা ত পারবে না? আমাকে ডেকো, দুজনে মিলে নিয়ে যাব। পা ভেঙে পড়ে আছেন, অসহায় অক্ষম মানুষ, এখন ওঁকে কি লজ্জা করলে চলে ভাই?"

ব্যবস্থাটা খুব আরামদায়ক হল না জগন্নাথের পক্ষে, কিন্তু চাঁপা বৌএর পরামর্শ মতই কাজ হতে লাগল। তিনু এসে মাঝে মাঝে তাদের সাহায্য করে একটু, কিন্তু সেটা বিশেষ যে প্রয়োজনে লাগে তাদের তা নয়।

একদিন স্নানের ঘর থেকে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে একটু শব্দ করেই হাসছিল জগন্নাথ। নির্ম্মলা বলল, "রকম দেখ। হাসছ কেন মিছিমিছি?"

জগন্নাথ হাসতে হাসতেই বলল, "মাসী, তুমি সেদিন বেশ বলেছিলে যা হোক।"

"কি বলেছিলাম?"

"বলেছিলে, ও বৌ মানুষ, আমার সামনে বেরোতে লজ্জা পায়। কিন্তু ও কেন টিপুনি দিতে লজ্জা পায় না একটু জিজ্ঞেস করো ত ওকে।"

নির্ম্মলাও কিছু একটা লক্ষ্য করেছে এই কদিন, তবু ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর। এত করছে বৌটি তোমার জন্যে, আর তাকে নিয়েই ঠাট্টা?"

জগন্নাথ হয়ত আরও কিছুক্ষণ হাসত, এবং নিশ্চয়ই আরও কিছু বলত বৌটির সম্বন্ধে, কিন্তু নির্ম্মলার বকুনি খেয়ে চুপ করে গেল।

নির্ম্মলা তখন থেকে ভাবছে, এই মানুষটির স্বভাবে কৃতজ্ঞতা বলে সত্যিই কি কিছু নেই? এত যে করছি আমিও তার জন্যে, নিজে থেকে একবার বললও না, কোথায় কিরকম করে তার চোট লেগেছিল। বার দুই জিজ্ঞেস করে দেখলাম, হয় কাৎরাতে থাকে নয়ত অন্য কথা পাড়ে। যাক, এখন ওকে বলব না কিছু, ওর পাটা সারুক আগে।

সেদিন কলতলায় দেখা হতে চাঁপা বৌ বলল, "মিস্তিরির সাইকেলটা ত দেখছি না? ওঁর সাইকেলটা কি হল?"

নির্ম্মলা বলল, "কি জানি ভাই কি হয়েছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে বোধহয় দুর্ঘটনার কথাটা মনে পড়ে ওর মুখটা কালো হয়ে যায়, তাই কিছুই আমি এখন জিজ্ঞেস করি না ওকে। নয়ত সাইকেল যে নেই তা কি আর আমি লক্ষ্য করিনি? হয়ত দুমড়ে ভেঙে গেছে বলে পথেই কোথাও ফেলে দিয়ে চলে এসেছে।"

চাঁপা বৌ বলল, "না ভাই, তা হতে পারে না। তেমনটি হলে মিস্তিরি কেবল একটা ভাঙ্গা গোড়ালি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতেন না।"

নির্ম্মলার মনে সাপুড়েদের ঝুড়ির সাপের মত একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিচ্ছে, ফণা তুলছে। কিন্তু এ সাপ ফণাই তুলবে, ছোবল দেবে না। সে জানে, চাঁপা বৌ খুব খাঁটি কথাই বলেছে। জগন্নাথের মত মিস্ত্রি সাইকেলটা তিনটুকরো হয়ে গেলেও সেটাকে নিয়ে এসে সারাবার চেষ্টা করত। ফেলে দিয়ে আসত না।

যেদিন আবার গোয়ালাদের একজনের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে পা থেকে প্ল্যাষ্টারের আবরণ খুলে ফেলে অল্প একটু খুঁড়িয়ে এসে খাটিয়ার বিছানাটায় হাসিমুখে

বসল জগন্নাথ, নির্ম্মলা জিজ্ঞেস করল, "আজ কেমন লাগছে জগন্নাথ ?"

জগন্নাথ বলল, "পা-টা ত একদমই সেরে গেছে মাসী। খুব ভাল লাগছে আজ। যা ভীষণ চুলকোচ্ছিল এই ক'দিন, ইচ্ছে হত একটা লোহার শলা প্ল্যাষ্টারের ভিতর চালিয়ে আচ্ছা করে খুঁচিয়ে দিই।"

নির্ম্মলা বলল, "আচ্ছা, বেশ। তাহলে এখন আমি কয়েকটা কথা জানতে চাইতে পারি তোমার কাছে। যদি কোনো কথার জবাব দিতে ইচ্ছে না হয় ত দিও না, কিন্তু যদি জবাব দাও ত ঠিক কথাটা বলবে।"

নির্ম্মলার মুখের ভাবে, কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পেল, যেটা প্রায় কঠোরতার সামিল। জগন্নাথের মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল চোখের পলকে, বলল, "আচ্ছা।"

জগন্নাথের ঘরের দরজার পাশে একটা মোড়া টেনে নিয়ে কপাটে হেলান দিয়ে বসল নির্ম্মলা। বলল, "তোমার পা-টা কি করে ভেঙেছিল ?"

জগন্নাথ বলল, "পড়ে গিয়েছিলুম মাসী।"

নির্ম্মলা বলল, "কি করে পড়ে গিয়েছিলে, কোথায় পড়ে গিয়েছিলে ?"

জগন্নাথ চুপ করে রইল।

নির্ম্মলা বলল, "আমি আশা করেছিলাম, তুমি নিজে থেকেই সব কথা আমাকে বলবে। এখন যখন আমি জানতে চাইছি, কথা জোগাচ্ছে না তোমার মুখে। ব্যাপারটা কি ?"

একটু পরে সে আবার বলল, "আচ্ছা, সেদিন তুমি ঠাকুরপুকুরে যাওনি, না ?"

জগন্নাথ মুখটা অত্যন্ত কাঁচুমাচু করে বলল, "না মাসী, যাইনি।".

নির্ম্মলা বলল, "সেটা আমি বুঝতেই পেরেছিলাম। কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?"

জগন্নাথ চুপ। বিছানার চাদরের একটা প্রান্ত টেনে মুঠোর মধ্যে পুরছে।

নির্ম্মলা বলল, "সাইকেলটা কি হল ? সেটাও কি ভেঙে গিয়েছে ?"

জগন্নাথ বলল, "না মাসী, ভেঙে যায় নি। ওটা, ওটা হারিয়ে গেছে।"

নির্ম্মলা বলল, "হারিয়ে গেছে মানে ?"

জগন্নাথ এবারেও চুপ করে রইল।

নির্ম্মলা উঠে গিয়ে রাতের রান্নাটা শেষ করল। তার পর হাতমুখ ধুয়ে এসে জগন্নাথকে বলল, "আজ ত হাঁটাচলা করতে অসুবিধে নেই ? ভাত বেড়ে নিয়ে খেও।" বলে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়েই নির্ম্মলা বুঝতে পারছিল, জগন্নাথ বাইরে বেরুল, কিন্তু রান্নাঘরটার দিকে গেল না। খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে খাটিয়াটাকে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। তার পর সব চুপচাপ।

তখন হয়ত রাত অনেক হবে। ঘুমিয়ে পড়েছিল নির্ম্মলা। একবার আধ ঘুমন্ত অবস্থায় তার মনে হল, দরজায় খুব মৃদু টোকার শব্দ শুনতে পেল সে। কিন্তু সে শব্দটাও সেই একবারের বেশী আর হল না।

ভোর হবার পর নির্ম্মলা যখন দরজা খুলল, দেখল, তার দরজার ঠিক বাইরেই এক পাশে বারান্দার মেজের উপর জগন্নাথ হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। কে জানে কখন থেকে সে এইভাবে বসে আছে। নির্ম্মলার মনে হল, সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

নির্ম্মলার কেমন মায়া হল দেখে, বলল, "কি হয়েছে তোমার ? ওখানে ওরকম করে বসে আছ কেন ?"

গুটনো হাঁটুদুটোর মধ্যে মাথাটাকে আরও একটু গুঁজে দিয়ে জগন্নাথ কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মাসী, মাসী, আমি সব কথা বলব তোমাকে, কিছু লুকোব না।"

ছলছল করছে নির্ম্মলারও চোখ। দুজনে হাত মুখ ধুয়ে দুটো মোড়া নিয়ে শীতের রোদে বসল বারান্দায়। উনুন ধরানো, চায়ের জল গরমে বসানো এসবই রইল পড়ে।

প্রথমেই শুঁড়ির দোকানের কাজটার কথা বলল জগন্নাথ। তার রোজগারের সব টাকাটাই যে সেটার থেকে

আসে তা বলল। বলল, যেদিন কিছু হয় না সেদিনও দুটো টাকা থাকে। প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগছিল কিন্তু কিছুদিন থেকে কাজটাতে অরুচি ধরে গিয়েছে তার। কাজটা রাখবার জন্যে যাদের মন জুগিয়ে তাকে চলতে হয়, তাদের কথা বলল। তাদেরই একজন সেই রাত্তিরে রিকশয় করে তাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। আগে থেকে সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ওরা তাকে খুব সকালেই একটা জুয়ার আড্ডায় নিয়ে গিয়েছিল সেদিন। কথা ছিল সারা-দিন ও সারা রাত খেলা হবে। পরের দিন ভোর ছটায় খেলা শেষ হবে, তার মধ্যে যে জিতল সে জিতল, যে হারল সে হারল।

তিন তাসের খেলা।

কিছুদিন আগে একবার ঘণ্টাখানেক বসে খেলাটা দেখেছিল জগন্নাথ। সেদিন একটা লোক কেবলই জিত-ছিল। ঐ একঘণ্টার মধ্যে কিছু না হোক, দু শ টাকা ত সে জিতলই।

জগন্নাথ নিজের পায়ের উপর চোখ রেখে বলে যাচ্ছিল এসব কাহিনী, নির্ম্মলার চোখে তার চোখ পড়ছিল না। যদি পড়ত, বোধহয় সেইখানেই দাঁড়ি টানতে হ'ত।

ওরা তাকে বলেছিল, "তোর এখন রোজগারের কপাল, যেদিকে হাত বাড়াবি, দেখবি সেদিকেই পয়সা। একশ'টা টাকা নিয়ে আসিস, সেটাকে হাজার টাকা করে নিয়ে যাবি।"

হরিশ মুখুজ্জে রোডের পাশে একটা গলিতে একটা বাড়ীর দুতলায় খেলা হচ্ছিল। বাড়ীটার দুতলায় লোক কেউ থাকে না, কেবল ঐ তিন তাসের খেলা হয়। এক তলায় যে বনমালী সরকার দর্জির দোকান করে তারই দখলে দুতলাটা।

দুপুরের একটু পরেই একশটা টাকা বেমালুম উবে গিয়েছিল তার।

বাড়ীর মালিক বনমালী সরকার তখন ওকে প্রথমে এক শ টাকা ধার দিলেন, পরে আরও এক শ দিলেন, দুটো কাগজে দুবার তার সই নিয়ে। শেষবারে নেওয়া টাকাটা উবে গেল রাত বারোটার কাছাকাছি সময়ে। তখনও বনমালী তাকে আরও টাকা ধার দিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ নিল না। বসে বসে অন্যদের খেলা দেখছিল সে, এমন সময় 'পালাও, পালাও, পুলিশ, পুলিশ' বলে একটা রব উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। দুতলার একটা বাথরুমের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জলের পাইপটা ধরে বেরিয়ে গেল জগন্নাথ।

অনেকটা নেমে এসেছে পাইপ বেয়ে, এমন সময় ঐ আনাড়ি লোকটা, যে এসে জগন্নাথকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেল সেই রাত্তিরে, জগন্নাথের দেখাদেখি ঐ পাইপটা বেয়ে নামতে গিয়ে পিছলে এসে পড়ল জগন্নাথের ঘাড়ে। খুব দুর্ব্বল নয় ত ঘাড়টা, লোকটাকে ঘাড়ে নিয়েই জগন্নাথ পড়ল এসে নীচে। লোকটার নিজের কিছুই হল না, কিন্তু তার চাপে পড়ে জগন্নাথের পাটা ভাঙল।

অবিশ্যি তারপর ঐ লোকটাই তাকে প্রায় ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছিল হরিশ মুখুজ্জে রোডের মোড়ে আর সেখান থেকে একটা রিকশ ধরে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল বাড়ীতে।

লোকটি এর মধ্যে আর একদিন এসেছিল জগন্নাথকে দেখতে। সে বলে গেছে, বনমালী সরকার আর তার বন্ধুরা যারা আড্ডাটা চালাত, তাসগুলির পিছনে ক্ষুদে ক্ষুদে এমন সব ফুটকি দিয়ে রাখত, খুব নজর করে দেখলেও যা চোখে পড়ত না। এতে করে কেবল তারা বুঝতে পারত কার হাতে কোন তাস যাচ্ছে আর সেই বুঝে বাজি ধরত বা তাস ফেলে দিত। একজন জুয়াড়ির সন্দেহ হওয়ায় সে পুলিশে খবর দেয়। বনমালী আর তার দুজন বন্ধুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং আদালতে হাজির করেছিল। মামলা মুলতুবি আছে, আর ওরা জামিনে খালাস পেয়েছে।

জুয়াড়িদের মধ্যে কেউ একজন হয়ত জগন্নাথের সাইকেলটা চড়ে পালিয়েছিল সে রাত্তিরে। তা যদি হয় ত সাইকেলটা সে ফিরে পাবে। কিন্তু সেটা যদি থানায় জমা হয়ে গিয়ে থাকে কোন গতিকে, তাহলে সেটা গেল। কারণ, নিজের বলে সেটাকে দাবী করতে যেতে সে নিশ্চয়ই পারবে না।

জগন্নাথের যা বলবার ছিল বলা হয়ে যাবার পর নির্ম্মলা

চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ; তারপর একটাও কথা না বলে উঠে চলে গেল নিজের শোবার ঘরটার দিকে।

সে ফিরে এসে উনুন ধরাবে আশা করে জগন্নাথ বসে রইল বারান্দার রোদটায় পিঠ দিয়ে। মিনিট পনেরো কেটে যাবার পরেও যখন নির্ম্মলা এল না তখন উঠে গিয়ে দাঁড়াল তার ঘরের দরজায়। ভিতরে তাকিয়ে বলল, "কি করছ মাসী? ও তুমি কি করছ?"

নির্ম্মলা জবাব দিল না।

"মাসী, কি করছ? বিছানার চাদরে কি বাঁধছ?" জগন্নাথের গলার সুরে ভয়ার্ত্ততা।

নির্ম্মলা এবারেও কিছুই বলল না, জগন্নাথের দিকে তাকালও না। পোঁটলাটার চারকোণ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে তার পাশ কাটিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বারান্দায় সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ তার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে তার পথ আগলে বসে পড়ল জগন্নাথ।

"মাসী, তুমি চলে যাচ্ছ? মাসী, তুমি চলে যাচ্ছ? তুমি যেও না, যেও না মাসী।"

আতঙ্কে জলজলে সুন্দর মুখটি বিকৃত হয়ে গিয়েছে তার। হাত দুটি জোড় করে নির্ম্মলার দিকে তুলে করুণ মিনতির সুরে সে বারবার বলছে, "তুমি যেও না, না, তুমি যাবে না।" বলছে, "মা কালীর দিব্বি, ওসব নোংরা কাজ আর আমি করব না, আর কখনও করব না দেহে প্রাণ থাকতে। যদি করি, আমি যেন অন্ধ হয়ে যাই, আমার যেন মহারোগ হয়। মা কালীর দিব্বি মাসী।"

নির্ম্মলার পায়ে একবার হাত দেবার চেষ্টা করল সে, পাটা সরিয়ে নিল নির্ম্মলা। বলল, "পথ ছাড়।"

তখন নির্ম্মলার পথ ছেড়ে দিয়ে সেই পথের পাশে মেজের উপর গড়াগড়ি দিয়ে "মাসী, মাসী" বলে তার সে কি কান্না!

অনেকদিন পর নির্ম্মলাও আজ কাঁদছে, বারান্দার সিঁড়ির একটা ধাপে বসে, কোলে মাথা গুঁজে।

পোঁটলাটা পড়ে আছে তার পায়ের কাছে এক ধারে। সেটা পড়েই রইল।

পনেরো

একশটা টাকাকে হাজার টাকা করে নেবার লোভ সেদিন কেন এত বেশী পেয়ে বসেছিল জগন্নাথকে, দুপুরে খেতে বসে সেটা শুনে নিল নির্ম্মলা।

একটা কারণ তারক। ওরকম একটা লোকের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা পড়ে থাকতে কি কারও ইচ্ছে করে? দিনে এক পাঁইট করে বাংলা পেয়েও সে খুশী নয়। মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে আসে, সেদিনগুলিতে একটার জায়গায় পাঁচ ছটা পাঁইট দরকার হয় তার। যাবার সময় খুব চাল দেখিয়ে হাত নেড়ে বলে যায়, "হিসেব রেখ; বেশী যা নিলাম তার দামটা দিয়ে দেব।" কিন্তু ঐ বলা পর্য্যন্তই; চিৎ হাত উপুড় করে না কোনোদিন।

শুধু তাই নয়, তার ধারণা জগন্নাথ তার কেনা গোলাম হয়ে গিয়েছে। সে যা বলবে, জগন্নাথকে তা শুনতেই হবে। কিছুদিন ধরে ক্রমাগত বলছে, "তোমার মাসীর রান্নার হাত খুব ভাল, হোটেলে ওঁর রান্না ত খেয়েছি, আবার একদিন খাওয়াতে হবে, কবে খাওয়াবে?" কোন্‌দিন বলে বসবে, কাল রাত্তিরে খাব তোমাদের ওখানে, বাড়ী গিয়ে বলো তোমার মাসীকে।

জগন্নাথ তাই ভেবেছিল, কিছু বেশী টাকা হাতে পেলে শুঁড়ির দোকানের কাজটা ছেড়ে দেবে; দিয়ে দরকারী যন্ত্রপাতি যতগুলি পারবে কিনে গাড়ী মেরামতের কাজ শুরু করবে। কিন্তু তার এমনই কপাল, উলটে তিন শ টাকা গচ্চা গেল। বনমালী সরকার তার পাওনা দু'শ টাকা কি আর ছেড়ে দেবে?

নির্ম্মলা বলল, "গাড়ী মেরামতের কাজে যা রোজগার হবে, তাতে চলবে তোমার? চাঁপাবৌ বলছিল, তোমার যদি লাইসেন্স আছে ত ড্রাইভারের কাজ কর না কেন; তার সোয়ামী মাস গেলে প্রায় দেড় শ টাকা ঘরে আনে।"

জগন্নাথ বলল, "কি বলছ মাসী? গাড়ী মেরামতির কাজে চলবে না কি? ড্রাইভাররা মাইনে কি পায়?

পেট্রল সরিয়ে আর মিস্ত্রিদের কাছে দস্তুরি নিয়েই ত তাদের চলে। মিস্ত্রিদের রোজগার তাদের চেয়ে ঢের বেশী।'

"তুমি সব রকম মেরামতির কাজ জান?"

"সব রকম কাজ কোন মিস্ত্রিই ভাল জানে না মাসী। কেউ বডির কাজ ভাল জানে, কেউ ইঞ্জিনের; কেউ ক্লাচের ব্যাপারটা বেশী বোঝে, কেউ গিয়ার বোঝে ভাল; এছাড়া ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, দরজার লক্ সারাবার মিস্ত্রি, রাং ঝালাই, পেতল ঝালাইয়ের মিস্ত্রি, রং-এর মিস্ত্রি সব দেখবে আলাদা। সবরকম কাজই একটু একটু যারা জানে আমি হলুম তাদের দলের।"

"তোমার ঐ একটু একটু জানার বিদ্যে নিয়ে গাড়ীর কাজ করতে পারবে তুমি?"

"কেন পারব না মাসী? বই পড়ে ত গাড়ীর মিস্ত্রি হয় না কেউ, কাজ করে করেই শেখে; আমিও শিখব। এক বার একটা কাজ করে যদি দেখি হল না, খুলে ফেলে আবার করব। দুবার করব, তিনবার করব, তাতেও যদি না হয়, চারবারের বার নিশ্চয় হবে। সময় একটু বেশী যাবে, মেহনত একটু বেশী হবে, এই যা। সব মিস্ত্রিরাই তাই করে মাসী, কেউ কিছু বেশী কেউ কিছু কম।"

"একেবারে শুরুতে কারুর কাছ থেকে কিছু ত শিখেছিলে?"

"তা অবিশ্যি শিখেছিলুম। কিছুদিন জোগানদারের কাজ করেছিলুম তার।"

"বেশ ভাল মিস্ত্রি ছিল সে?"

"কে, কালী মিস্ত্রি? ভবানীপুর আর কালিঘাটের আদ্ধেকেরও বেশী মিস্ত্রি তার কাছে কাজ শিখেছে, এখনও অনেকে শিখছে। কলকাতা শহরে তার জুড়ি আছে কি না সন্দেহ। দোষের মধ্যে ফটাফট থাপ্পড় মারে গালে।"

"তা না হয় আবার তার কাছে গিয়ে আরও কয়েকটা থাপ্পড় খেয়ে এস, কাজটা যদি তাতে আর একটু তাড়াতাড়ি শেখা হয় ত তাতে তোমার লাভ বই লোকসান নেই। না হয় এক বেলা তার কাছে কাজ শিখবে আর এক বেলা গাড়ী সারিয়ে নিজে রোজগার করবে।"

জগন্নাথ ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "তুমি যখন বলছ মাসী, তাই করব। তবে হেতেরপাতি আমার ত কিছুই প্রায় নেই, দুপয়সা আসে এমন কাজ কিছু ধরতে পারব না।"

নির্ম্মলার রান্নার জায়গাটার খুব কাছেই একটা মোড়া নিয়ে এসে বসেছে জগন্নাথ। সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ, আজ ভরসা করে সে বাড়ী ছেড়ে বেরুতে পারেনি। কালী মিস্ত্রির কাছে যাবে কথা দিয়েছে নির্ম্মলাকে; আজকের রাতটা কেটে যাক, কাল সকালে উঠে যদি দেখে অবস্থাটা বেশ স্বাভাবিকই রয়েছে, তখন যাবে। নির্ম্মলার ভাত নামল, আর সেই সঙ্গে তরকারি কোটা শেষ হল। তরকারি রাঁধবার কড়াটাকে উনুনে বসিয়ে নির্ম্মলা বলল, "আচ্ছা জগন্নাথ, তুমি যে আমার জন্যে কাজ খুঁজছিলে তার কি হল?"

অত্যন্ত উসখুস করতে লাগল জগন্নাথ। বলল, "কাজের খোঁজ কিছু কিছু ত পাচ্ছি, কিন্তু তোমার যুগ্যি কাজ তার একটাও নয়।"

কড়াতে খানিকটা সরষের তেল ঢেলে নির্ম্মলা বলল, "কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগেও বলেছি, আজ আবার বলছি। আমরা দুজনে এখানে একটি মেস্ ক'রে রয়েছি, এর যা খরচ, হিসেব ক'রে তার ঠিক অর্দ্ধেকটা আমার। মেসের যা নিয়ম। বসে খেলে আমার জমানো টাকা যা আছে একদিন ত তা শেষ হবে? তখন আর যাই করি—"

কাঁচা কুমড়ো, কচি বেগুন, কচি লাল ডাঁটা, নতুন ছোট আলু, লম্বার দিকে দুফালি ক'রে কাটা কাঁচা ঝাল লঙ্কা সমেত কড়ায় চাপিয়ে একবার সেগুলিকে খুব করে নেড়েচড়ে দিয়ে নির্ম্মলা কথাটা শেষ করল, "তখন একদিনও আর এ বাড়ীতে আমি থাকব না।"

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল জগন্নাথ, সামনের দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকে বলল, "আচ্ছা মাসী! আমিও তাহলে বলি। এই যে তুমি দুবেলা রান্না করছ, আর দুবেলা চা জলখাবার তৈরী করছ, তরকারি কুটছ, এগুলোর কি কোন দাম নেই? আমি ত বাটনা বাটা আর রান্নার বাসনগুলি মাজা ছাড়া আর কিছুই ক'রে উঠতে পারি না।"

নির্ম্মলা বলল, "আমি যা করি তার দাম নেই তা

বলব না। তুমিও এমন কিছু কিছু কাজ কর যা আমার দ্বারা হয় না, যেমন বাজার করা, আলো ফিউজ হয়ে গেলে সারানো, ডাক্তার ডাকা। কিন্তু আমি যা করি তার দামটা ধরা যাক অনেক বেশী। তুমি কি ইচ্ছে কর যে, তোমার বাড়ীতে সারা জীবন রাঁধুনীগিরি ক'রে আমি পেট চালাই ?"

জগন্নাথ বলল, ''তুমি ওরকম ক'রে ব'লো না মাসী ! শুনলে আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে করে।''

নির্ম্মলা কড়ার তরকারিগুলিকে খুন্তি দিয়ে ওল্টাচ্ছে পাল্টাচ্ছে। বলল, "গাড়ী সারাবার কাজ যদি তোমাকে করতে হয়, ত তার জন্যে প্রথমে দরকার একটা জায়গা।"

জগন্নাথ বলল, "তার জন্যে খুব আটকাবে না মাসী। যতদিন জায়গা না পাই, বাড়ী বাড়ী ঘুরে কাজ করব। সব কাজ ওরকম ক'রে করা যায় না তা ঠিক; কিন্তু যতটা পারা যায় করব। তড়িঘড়ি যেসব কাজ করানো দরকার, সেগুলি কেউ যদি বাড়ী বয়ে এসে ক'রে দিয়ে যায় ত গাড়ীর মালিকরাও সেটাই বেশী পছন্দ করেন।"

নির্ম্মলা বলল, "দিনেমানে কাজ শেষ হতে পারে এমন গাড়ী এনে ঐ পোড়ো জমিটাতে রেখে তুমি সারাতে পার। এখন ত ওখানে রাজ্যের যতরকম আগাছাই কেবল জন্মাচ্ছে।"

জগন্নাথ অন্ধকার জমিটার দিকে একবার তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল, "তুমি ত ঠিক বলেছ মাসী। ইস, এতবড় এই কথাটা একবারও আমার মাথায় আসেনি !''

নির্ম্মলা বলল, "তারপর দরকার হাতিয়ারপাতি। তোমার মোটামুটি বেশ সচ্ছলভাবে চ'লে যেতে পারে, এতটা রোজগার করতে হলে কত টাকার হাতিয়ারপাতি তোমার দরকার ?"

জগন্নাথের মুখ ঝলমল ক'রে উঠল হাসিতে, জলজল করতে লাগল তার চোখ। বলল, "তুমি টাকা দেবে মাসী ?'' তার কথার সুরে উল্লাস।

কিন্তু তার এ উল্লাস কয়েকটা টাকা পাওয়ার সম্ভাবনাতে নয়। নির্ম্মলার কথায় তার সামনেকার একটা পাথরের দেয়াল যেন ধ্বসে গেল। এই দেয়ালটায় মনে মনে অনেক মাথা ঠুকেছে সে এতদিন।

বাস্তবিক তার নিজের যথেষ্ট টাকা যদি থাকতও, মাসীর কাছ থেকেই টাকাটা সে নিত। কারণ সে জানে, এ-কাজটার থেকে দুটো মানুষের স্বচ্ছন্দে দিন-গুজরাণ হবে, আর সে আশা করে, তার মাসী যদি টাকা দেয় ত রোজগারের একটা ভাগ নিতে আপত্তি করবে না। মাসীকে তাহলে আর কোথাও গিয়ে কাজ নিতে হবে না, বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবার কথাও আর উঠবে না। কত কি হয়ে যাবে একসঙ্গে।

নির্ম্মলা তরকারিগুলিকে আর একবার উল্টে পাল্টে টাকা দিয়ে দিল। বলল, "আমার যা আছে সে ত পোস্টা-ফিসেই আছে, আর সে যে কত তা ত তুমি জানো।"

জগন্নাথ আরও অনেক বেশী উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, "অত ও লাগবে না মাসী। মাসী, কি ভাগ্যি কথাটা তোমার মাথায় এল, অনেক কিছুর ভাবনাই আর আমাদের ভাবতে হবে না। টাকাটা তুমি দাও, আমি গতর খাটাব। দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেব রোজগারের টাকা। তোমাকে পরের বাড়ীতে ঝি-গিরি, বা ধাইগিরি বা মাষ্টারণীর কাজ করে খেতে হবে না।"

নির্ম্মলা বলল, "তোমার ঐ গতর খাটানোর কাজে একটুও সাহায্য কি আমি করতে পারি না ? যদি তা না পারি ত রোজগারের টাকায় এত বড় ভাগ বসাব কি বলে ?"

জগন্নাথ বলল, ''অনেক রকমের অনেক কাজই তুমি করতে পারবে মাসী, সে যখন যেমন দরকার হবে তোমাকে আমি বলব। তুমি কিছু ভেবো না সে জন্যে।"

শুরু হয়ে গেল শুভদিন দেখে এই দুটি তরুণ মানুষের ভাগের কারবার। মূলধনের মধ্যে টাকা যতটা, উৎসাহটা তার সহস্রগুণ বেশী।

দেখা গেল, গতর খাটানোর কাজে ভাগ নেওয়ার প্রয়োজন নির্ম্মলার তখনই বিশেষ হচ্ছে না, কারণ মিস্ত্রির কাজ শিখতে কয়েকটা ছেলে এসে জুটেছে। প্রথমে এরা কিছুই পাবে না, পরে খানিকটা কাজ শিখলে জগন্নাথ তার খুশি মত কিছু কিছু তাদের দেবে। কিন্তু কয়েকটা খুব দরকারী কাজ আছে যা নির্ম্মলাকেই করতে হয়। হিসাবের খাতা তাকেই লিখতে হয়, যদিও তার ঝামেলা বিস্তর।

একরাশ যন্ত্রপাতি কিনেছে জগন্নাথ, একসুতো, দেড় সুতো, দু-সুতো করে নানা সাইজের নানা আকারের রেঞ্চ, বক্স রেঞ্চ, হুইল রেঞ্চ, প্লায়ার্স, ভাইস, ছোট বড় জ্যাক, ছেনি, হাতুড়ি, নেহাই, ছোট বড় অনেকগুলি স্ক্রু ড্রাইভার, রাত্তিরে কাজ করবার জন্যে হ্যাণ্ড লাইট, আরো কত কি। কিন্তু কোন্‌টার জন্যে কত দাম দিতে হয়েছে কিছুতেই সে মনে করে বলতে পারছে না। বলল, "ওরা কিছুতেই যে মেমো দিলে না মাসী। বললে, মেমো দিতে হলে দাম বেশী নেবে।" মাথা চুলকে, রগ টিপে যতটা সে বলতে পারল বলল, বাকীটা গোঁজামিল দিয়ে সারতে হল নির্ম্মলাকে।

নির্ম্মলার এমনও মনে হল একবার, যে, জগন্নাথ হয়ত তাকে লুকিয়ে নিজের টাকা ঢালছে কারবারে, আর সেই জন্যেই জিনিষগুলির দাম বলছে না।

বিল বানাতে হয় নির্ম্মলাকে। কাউকে দুলাইন চিঠি লিখতে হলে তাও নির্ম্মলাকেই লিখতে হয়। এখানটাতে মুশকিল হয়, কতগুলি জিনিষের নাম নিয়ে। অন্য অনেক মিস্ত্রির মত জগন্নাথও জ্যাককে বলে জক, রেডিএটারকে বলে রেডী ওয়াটার, হর্ণকে বলে হরেন, শেভ্রলেকে চেভরলেট এবং এমনিধারা আরো সব। ঠিক কথাগুলি সবই যে নির্ম্মলার জানা তা নয়। কতগুলি কথার উচ্চারণ সে জানে, বানান জানে না; কতগুলি কথা আসলে যে কি তাও সে জানে না; কেবল এইটুকু বুঝতে পারে, জগন্নাথ যা বলছে কথাগুলি তা নয়।

এক বেলার কাজে জগন্নাথের রোজগার হচ্ছিল সামান্যই, কিন্তু কালীমিস্ত্রির কাছে তার যা শিখবার ছিল, মাস-দুয়েকের মধ্যেই তা শেখা হয়ে গেল। কালী-মিস্ত্রিকে প্রণাম করে এসে এরপর সে পুরোদস্তুর মিস্ত্রিখানা খুলে বসল।

দুপুরে সবদিন খাওয়া হয় না জগন্নাথের। গাড়ী নিয়ে যারা আসে, তারা বসে থাকে গ্যাঁট হয়ে। তাদের এত তাড়া এবং এতই খুশী হয়ে মিস্ত্রিকে তার প্রাপ্য মজুরি দিয়ে যায়, যে তাদের বসিয়ে রেখে খেতে যেতে মন সরে না জগন্নাথের। নির্ম্মলা এ নিয়ে অনুযোগ করে না তাকে। নির্ম্মলা জানে, একটা কারবার গড়ে তুলতে হলে গোড়ার দিকে ঐটুকু কষ্ট স্বীকার না করলে চলে না।

তবে, আজকাল সকালের চায়ের সঙ্গে জগন্নাথকে ভর-পেট খাইয়ে দেয় নির্ম্মলা।

একদিন সেই প্রথম সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দশ টাকা রোজগার হয়েছে তার। মহাখুশী হয়ে নোটটি এনে নির্ম্মলার হাতে দিয়ে তার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল জগন্নাথ, নির্ম্মলা বলল, "খবর্দ্দার, পায়ে হাত দেবে না।" হাতটা চট করে গুটিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল জগন্নাথ, তারপর দুজনেই শব্দ করে হাসছে।

নির্ম্মলা বলল, "কালীমিস্ত্রির কাছে আরও খানিকটা কাজ শিখে এসে তুমি ভালই করেছ। তবু এমন কাজ হয়ত কখনও সখনও তুমি পাবে যা তুমি করতে পারবে না। সেরকম কাজ হাতে নিও না।"

জগন্নাথ বলল, "ও নিয়ে তুমি ভেবো না। যে কাজটা সামাল দিতে পারব না বুঝব, সেটায় বেলায় অন্য মিস্ত্রিরা যা করে আমিও তাই করব। বলব, জিনিষটার মধ্যে কিছু আর নেই বাবু; দেখছেন না, এদিক্‌টা কি রকম ক্ষয়ে গিয়েছে? এখানটায় আঙ্গুল বুলিয়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন। ওটা ফেলে দিন, দিয়ে নতুন একটা লাগিয়ে নিন। যদি বলেন, ত আমি দিতে পারি সারিয়ে, কিন্তু হঠাৎ যদি রাস্তার মাঝখানে ধপ করে গাড়ী বসে যায় ত আমি জানি না। আমাকে তখন দোষ দিতে পারবেন না।"

অভিনয়ের ধরণে কথাগুলি বলে খুব হাসতে লাগল জগন্নাথ। বলল, "নতুন জিনিষ কিনে লাগিয়ে দিতে মেহনত ত কিছুই নেই কিন্তু কিছু পয়সা তাতেও পাওয়া যায়।"

নির্ম্মলা বলল, "না, না, সে বড় অন্যায় হবে। তুমি মোটেই সেরকম কিছু করবে না। তুমি সত্যি কথাটাই বলবে। তুমি বলবে, আমি এ কাজটা ভাল জানি না, তাই পারব না, আপনি অন্য কোন মিস্ত্রিকে দেখান।"

কথাটা জগন্নাথের খুব যে মনে ধরল তা নয়, কিন্তু নির্ম্মলার পরামর্শ মতই কাজ সে করে যেতে লাগল।

একদিন সকালে চায়ের সঙ্গে গোটা-তিনেক পরোটা

ডিমভাজা ও বেগুনভাজা সহযোগে খেয়ে এক গেলাস দুধে একটা চুমুক দিয়ে জগন্নাথ বলল, "মাসী তোমাকে না বলে ত করতে পারিনে কিছু, চাইও না' তাই বলছি। কলকাতার সব মিস্ত্রিরা কি করে জানো? একটা কিছু সারায় ত এখানে একটা স্ক্রু, ওখানে একটা স্প্রিং ঢিলে করে রেখে দেয়। তখন তখনই মালিক জানতে পারে না, কিন্তু গাড়ী আবার কারখানায় নিয়ে আসতে হয় কিছুদিনের মধ্যে। তুমি যদি অনুমতি দাও—"

নির্ম্মলা বলল, "খবরদার বলছি, ওরকম কিছু করেছ যদি ত দেখাব মজা।"

দুধটা শেষ করে জগন্নাথ বলল, "কাজটা আমারও খুব ভাল মনে হয় না মাসী, কিন্তু সকলেই করে ত?"

নির্ম্মলা বলল, "করুক। তুমি জগন্নাথ মিস্ত্রি, সবাই জানবে, তুমি এধরণের কিছু কর না।"

জগন্নাথ মিস্ত্রি এরপর কেবল যে ওধরণের কিছু করে না তা নয়, একটা কিছু সারানো হবার পর গাড়ীর ছোটখাটো অন্য কতগুলি কাজ এমনিই করে দেয়। অন্য কোথাও স্ক্রু ঢিলে করে দেবার বদলে, ঢিলে কিছু কোথাও চোখে পড়লে সেটাকে এঁটে দেয়, প্লাগ সাফ করে দেয়, ইঞ্জিন টিউন করে দেয়।

কিছুদিন যেতে দেখা গেল, খদ্দের মহলে তার সুনাম ও কদর বাড়ছে। এত কাজ আসছে হাতে যে, শেষ করে উঠতে পারে না। অনেক কাজ ফিরিয়ে দিতে হয়।

যে ছেলেগুলি কাজ শিখতে এসেছে, কারুর বয়স এগারো, কারুর বারো, এই রকম। গাড়ীর চাকার বলটু খোলা, লাগানো; জ্যাক লাগিয়ে বডিটাকে তোলা, নামানো; দরকার মত গাড়ীর নীচে জগন্নাথকে রেঞ্চ, প্লায়ার্স ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া; ছুটে গিয়ে মোটর পার্টসের দোকান থেকে মাপ মতন নাট বলটু, ওয়াশার, এইসব কিনে আনা; এছাড়া আরও নানারকমের ছুটকো ফাই-ফরমাসের কাজ এরা করে। কাজের চাপ যেদিন বেশী থাকে, সেদিন মিস্ত্রির সঙ্গে এরাও উপোস দেয়। অন্য অনেকদিন দুপুরে নাওয়া-খাওয়া করবার জন্যে বাড়ী যাবার সময় পায় না এরা। সেদিন নির্ম্মলাই রান্না করে এদের খাওয়ায়। তার খুব ইচ্ছে করে, বাচ্চাগুলি খেয়ে খুশী হোক, কিন্তু কি খেতে দেবে এদের? বাঙালীর ছেলে, ভাতের সঙ্গে এক টুকরো মাছ না খেতে পেলে তাদের পেটই ভরে না।

সেদিন দুপুরে ছেলেরা খাবে ঠিক ছিল। বাজার খরচ দিতে গিয়ে নির্ম্মলা জগন্নাথকে দুটো টাকা বেশী দিল। বলল, "আজ মাছ এনো।"

জগন্নাথ বলল, "মাছ?"

নির্ম্মলা বলল, "হ্যাঁ, মাছ। ছেলেরা খাবে, তুমি খাবে।"

"তুমি যে মাছের গন্ধ সইতে পার না, মাসী?"

"পেট্রলের গন্ধ সইতে যখন পারছি, তখন আশা হচ্ছে ওটাও পারব।"

নির্ম্মলার ভয় ছিল, সে না খেলে জগন্নাথ মাছ খেতে চাইবে না। কিন্তু জগন্নাথ আজ কোন আপত্তি তুলল না দেখে নির্ম্মলা খুশী হল। বড্ড বেশী পরিশ্রম করে ছেলেটা, সে অনুপাতে খাওয়া তার কম হয়। নির্ম্মলা কুচো চিংড়ি বেটে বড়া ভেজেছিল নারকেল কোরা দিয়ে, আর রেঁধেছিল ডালের বড়ি ও কচি ডাঁটা দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল। নিরামিষ তরকারিটাও খেতে হয়েছিল অপূর্ব্ব। জগন্নাথ আর ছেলেরা এত খেল যে, নির্ম্মলার জন্যে বাসমতি চালের ভাত একমুঠোও অবশিষ্ট রইল না।

এরপর কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। নির্ম্মলা ও জগন্নাথের ভাগের কারবার বেশ ভালই চলছে। সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হয়ে উদ্বৃত্ত টাকায় তাদের পুঁজি বাড়ছে। অবশ্য সংসার খরচ খুব হাত টান ক'রে করে নির্ম্মলা ভাতের ফেনটা ফেলে দেয় না, একটু ডাল মিশিয়ে বাটিতে করে নিয়ে দুজনেই খায়, গরম গরম খেতে বেশ ভাল লাগে তাদের। আলুর খোসার বড়া, লাউয়ের খোসা কুচিয়ে কেটে শুকনো লঙ্কা দিয়ে ভাজা, এসব ত তারা প্রায়ই খাচ্ছে। মিষ্টি কুমড়োর বীচি ধুয়ে শুকিয়ে রাখে নির্ম্মলা, সেগুলিকে কড়া করে ভাজলে খেতেও ভাল লাগে, আবার বড়বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচলে প্রায় কুমড়োটারই সমান দাম পাওয়া যায়। কুমড়োবীচির শাঁস দিয়ে খুব ভাল ভাল

মিঠাই তৈরি করে পশ্চিমীরা। সেইজন্যে জিনিষটার এত চাহিদা।

মাঝে মাঝে কচুরি পানার ফুল আনিয়ে বেসন দিয়ে ভেজে চায়ের সঙ্গে গরম গরম খেতে দেয় সে জগন্নাথ ও তার বালখিল্য মিস্ত্রিদের। খেয়ে খুব তারিফ করে তারা। কচুরি পানার ফুল যে বেশ সুস্বাদু খাদ্য সেটা নির্ম্মলা শিখেছিল তার মায়ের কাছ থেকে, যিনি জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মাছ ভাজতেন। ফুলকপি, বাঁধাকপির দাঁড়ার ভিতরকার শাঁসগুলি তরকারিতে দিয়ে দিতেন, নির্ম্মলাও দেয়।

মেরামতের জন্যে গাড়ী নিয়ে জগন্নাথ এখন দরকার হলে রাত্তিরেও রেখে দেয়। পোড়ো জমিটাতে দু-তিনটে গাড়ী সহজেই রাখা যায়, আর আজকাল প্রায়শঃ দু-তিনটে গাড়ী থাকেও সেখানে। নিজে সে তারই একটাতে শুয়ে রাত কাটায়, যাতে গাড়ী বা তার কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চুরি না হতে পারে।

জমির মালিকানা নিয়ে যারা মামলা করছিল, কোর্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারা কেউ সেখানে একটা খুঁটি পুঁততেও পারছিল না। খোলা জমিটাকেই কাজে লাগিয়ে জগন্নাথ পয়সা কামাচ্ছে দেখে দু তরফের লোকই এসেছিল তার কাছে। জগন্নাথ নির্ম্মলাকে বলাতে সে বলল, "তুমি দু তরফকেই জিজ্ঞেস কর জমিটার ন্যায্য ভাড়া কত হতে পারে। আমার মনে হয় না অসম্ভব রকম বেশী কিছু ভাড়া বলবে। যদি তা না বলে ত যে যা চাইবে সেই ভাড়া তার জন্যে সাব্যস্ত করে তাকে দেবে ও রসিদ নেবে। যতদিন নিজেরা জমি কিনতে বা বন্দোবস্ত নিতে না পারব, ততদিন দুদিক্ রক্ষা করেই আমাদের চলতে হবে।"

জগন্নাথ তাই করল, ফলে জমি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা কিছু আর রইল না।

কিন্তু এরকম করে ত বরাবর চলবে না? এর অসুবিধাও আছে বিস্তর, তাই তারা টাকা জমাচ্ছে এই আশা নিয়ে যে, নিজেরাই একদিন কোথাও জমি কিনে কারখানার জন্যে শেড একটা তুলতে পারবে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে একটা ষ্টুডিবেকার গাড়ীর এ-সি পাম্পটা সারানো হবার পর জগন্নাথ এসে বলল, "মামী এসে অবধি ত বেরোওনি একদিনও। ষ্টুডিটা এখন ট্রাই হবে। চল না ঘুরে আসবে একটু?"

নির্ম্মলার মনে এতদিনে একটু স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। আনন্দোজ্জ্বল কোনো ভবিষ্যৎ তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই এটা সে যেমন জানে, তেমনি এখন এও জানে যে, সে ভবিষ্যৎ আগের মত অনিশ্চয়তার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াবহও আর নেই। একটু অন্য মানুষগুলির মত হবার ইচ্ছা সেই সঙ্গে জাগ্রত হয়েছে মনে। বলল, "যাব।"

কলতলায় চাঁপা বৌ-এর সঙ্গে দেখা। বলল, দিনকয়েকের জন্যে কেষ্টনগর গিয়েছেন তার কর্ত্তা। নির্ম্মলা মোটরগাড়ী চড়ে ঘুরতে যাচ্ছে শুনে বলল, "আমার সোয়ামী ড্রাইভার কিন্তু তাঁর গাড়ীর ধারে কাছে যাওয়ার হুকুম নেই আমার। তুমি আমায় সঙ্গে নেবে ভাই? যদি নাও ত আমারও একটু বেড়ানো হয় গাড়ী চড়ে।"

নির্ম্মলা বলল, "তুমি যাবে তার আর কথা কি? যাও, তৈরি হয়ে এস তাড়াতাড়ি। পরের গাড়ী ত? নিতে এসে না দেখে আমরা তারই গাড়ী নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।"

জগন্নাথ চালাচ্ছে। পিছনে চাঁপা বৌ ও নির্ম্মলা বসেছে। ঢাকুরিয়ার লেকের ধার ঘুরে আসবে তারা, তাই জগন্নাথ কালিঘাটের পুল পার হয়ে হাজরা রোড ধরে ল্যান্সডাউন রোডে এসে পড়ল। তার পর ডান দিকে খানিকদূর গিয়ে ভিড় এড়াবার জন্যে বাঁদিকে মনোহরপুকুর রোডে ঢুকল। বন্ধ গাড়ীতে বসে আছে তবু নির্ম্মলার মনে হল, কে যেন শক্ত মুঠিতে তার গলার কাছটা চেপে ধরেছে। এই পথ দিয়ে আর খানিকদূর গেলেই ত মহানির্ব্বাণ মঠ, আর তার পিছনের একটা রাস্তাতেই ত তার দাদা বিকাশের বাড়ী।

জগন্নাথ নিশ্চয়ই সেদিকে যাবে না, কেনই বা যাবে?

কিন্তু তাই ত যাচ্ছে সে। সে যেন সবকিছু জানে, যেন বিকাশকে চেনে সে, যেন ইচ্ছে করেই তার কাছে নির্ম্মলাকে সে নিয়ে চলেছে আজ, এমনি ভাবে বিকাশের বাড়ীর রাস্তাটা সে ধরল।

তখনও অন্ধকার হয়নি। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে

নির্ম্মলা একবার মাত্র তাকাল তার দাদার বাড়ীটার দিকে তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু সেই এক নজরেই সে যা দেখল তাতে তার মনে কোনো সন্দেহই রইল না যে, দুতলার ছোট বারান্দাটায় রেলিঙে বুকের ভর দিয়ে আধ অন্ধকারে যে দাঁড়িয়ে আছে সে অঙ্কু। রক্তস্রোত এক মুহূর্ত্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তার, পরক্ষণেই প্রখর গতিতে বইতে লাগল।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে অশ্রুর স্রোত উদ্বেল হয়ে উঠল তার। আবার বহুদিন পরে অঙ্কু, অঙ্কুরে! শঙ্কু, শঙ্কুরে! দাদা, দাদা! বাবা, বাবা গো! আমি আর পারছি না, আমার সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু মনে মনেও সে বলতে পারছে না, তোমরা এস, এসে আমাকে নিয়ে যাও তোমাদের কাছে, তারপর আমার যা হবার তা হোক।

বাবাকে ভাইদের লুকিয়ে বেশ খানিকটা দূর থেকেও যদি দেখে নেওয়া যায় ত মন্দ কি? তাদের একটু দেখতে জীবের আগ্রহ নির্ম্মলার মনটাকে নেশার মত পেয়ে বসল। কিছু দিনের মধ্যেই আরও দুবার জগন্নাথের গাড়ী ট্রাই হওয়া উপলক্ষে চাঁপা বৌকে সঙ্গে করে সন্ধ্যার অন্ধকারে তার দাদার বাড়ীটার পাশ দিয়ে ঘুরে এসেছে সে। লেকে বেড়াতে যাব বলে গিয়েছে আর মন্দিরটা দেখতে তার খুব ভাল লাগে বলে ঐ পথ দিয়ে যেতে বলেছে জগন্নাথকে। কিন্তু একবারও সে অঙ্কু, শঙ্কু, তার দাদা বা তার বাবাকে তাদের বাড়ীর বারান্দায় বা জানালায় বা আশেপাশে পথে কোথাও দেখতে পায়নি। যতটা আশা নিয়ে সে গিয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশী নৈরাশ্যের দুঃখ নিয়ে সে ফিরেছে।

তবু আবার সে গেল। সেদিন একটু রাত হয়ে গিয়েছিল, মোড়ের কাছে রাস্তার আলোয় বিকাশকে সে দেখল। বোধহয় কোর্ট থেকে বাড়ী ফিরছে। চকিতের মত বিকাশও তাকে দেখল।

গাড়ীটার চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল বিকাশ, তারপর ভাবল, আমার মাথা খারাপ। অনেকটা এক রকম দেখতে দুজন মানুষ কি পৃথিবীতে থাকে না?

মাথা নীচু করে পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগল, নিরুপমা এ হতেই পারে না। তাকে মমীনপুরের গুণ্ডারা যদি ছেড়েই দিয়ে থাকে সে নিজের বাড়ীতে ফিরে এল না কেন? ফিরবার অসুবিধা কিছু থাকলে একটা খবর ত সহজেই দিতে পারত; এক লাইন চিঠি লিখে বলতে পারত আমি বেঁচে আছি। আর গুণ্ডাদের কবলেই যদি সে রয়েছে ত শুধু আর একটি মেয়েকে সঙ্গে করে মোটরে চড়ে কলকাতার রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছে, এটাই বা কি করে সম্ভব?

কিন্তু মেয়েটির চোখে যখন চোখ পড়েছিল বিকাশের, তখন সেই একপলকের চাওয়াতেই তার মনে হয়েছিল, মেয়েটির দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা সচকিত ত্রস্তভাব। মেয়েটির চোখদুটিও সত্যিই খুব বেশী নিরুপমার চোখের মত।

ভাবল, গাড়ীর নম্বরটা দেখে রাখলে হ'ত। কথাটা যখন মনে পড়ল তখন মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে গাড়ীটা। আমি সে সময়ে গাড়ীর পিছনের কাঁচের মধ্যে দিয়ে মেয়েটিকে আর একবার দেখবার চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিলাম। পিছন দিক্ থেকেও মেয়েটিকে নিরুপমারই মত দেখাচ্ছিল।

না, ভুল হয়ে গেছে। মহা ভুল। মোড় ঘুরে ছুটে গিয়ে গাড়ীর নম্বরটা দেখতে পাওয়া যায় কি না সেটা তার দেখা উচিত ছিল।

খুব সম্ভব দেখতে পাওয়া যেত না, কিন্তু দেখবার চেষ্টাটা করা হল না যে, এজন্যে বাকী জীবন পরিতাপ করতে হবে তাকে।

কিছুক্ষণ দোনামনা করে মহেন্দ্রকে সে বলল কথাটা। একজন কাউকে না বলে সে আর থাকতে পারছিল না কারণ, তার মনটা একটু শান্ত হয়, যদি শুনে কেউ বলে, মেয়েটি নিরুপমা হতেই পারে না। মহেন্দ্রকে বলাই সবচেয়ে নিরাপদ সবদিক্ দিয়ে। আর, নিরুপমাকে উদ্ধার করা বিষয়ে তাঁর উৎসাহ এতই কম, যে আজকের দেখা মেয়েটি কেন যে নিরুপমা নয় সে বিষয়ে হয়ত তাঁর মুখে এমন কোনো যুক্তি সে শুনতে পাবে যেটা তার নিজের মনে আসেনি। শুনে আশ্বস্ত হতে পারবে সে।

কিন্তু মহেন্দ্র বললেন, "আমারও মনে হয় তুমি

নিরুপমাকেই আজ দেখেছ। সে লুকিয়ে তোমাদের দেখতে এসেছিল।"

বিকাশ বলল, "লুকিয়ে কেন?"

মহেন্দ্র বললেন, "হয়ত এমন জীবন যাপন করতে সে বাধ্য হয়েছে যার পরে নিজের আত্মীয়দের মুখ দেখাতে সে পারছে না। সে যে বেঁচে আছে, হয়ত চাইছে না লোকে সেটা জানুক। আমাদের দেশে যে মেয়েরা গুণ্ডাদের হাতে পড়ে তাদের প্রায় সকলেরই শেষ পর্য্যন্ত ঐ গতিই হয়।"

বিকাশ বলল, "যে গতিই তার হয়ে থাকুক, সেটাই একমাত্র গতি, এ আমি মানতে রাজী নয় বাবা। আমি আবার বিজ্ঞাপন দেব। এবারে বিজ্ঞাপনে এই কথাটাই তাকে বলব, তোমার যাই হয়ে থাকুক, যে কোনো অবস্থার মধ্যেই তুমি পড়ে থাকো, এমন কি, কোনো অন্যায়ও যদি করে থাকো তুমি, তাতে কিছুই এসে যাবে না। নিরুপমা বোন, তুমি ফিরে এস।"

গলার স্বর বন্ধ হবার উপক্রম হল বিকাশের।

মহেন্দ্র বললেন, "ভুল করবে। ওর দুঃখ আরো বাড়াবে। নিজে যে দূরে থাকতে চাইছে তাকে কেনই বা ডাকাডাকি করবে অকারণ? অবস্থাটা হয়ত এমনই যে আমাদের দিকে চালের কিছু ভুল হলে মেয়েটা গলায় দড়ি দেবে। ওকে বাঁচতে দাও, ফিরিয়ে এনে ওকে মেরে ফেলবার কোনো অর্থ হয় না।"

বিকাশ বলল, "বিজ্ঞাপন আমি আবার দেবই।"

অঙ্কু শঙ্কু এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। তারা কি যে বুঝল তা তারাই জানে। অঙ্কু বলল "দিদি-ভাইয়ের খোঁজ পেয়েছ দাদা?" শঙ্কু বলল, "দিদিভাই কবে ফিরে আসবে দাদা?

"না না, কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি তার, চুপ কর্ দেখি তোরা।"

একতলায় নিজের অফিস ঘরে টেবিলের উপর বাহুদুটি রেখে তার মধ্যে মাথাটাকে গুঁজে বসে ছিল বিকাশ। মহেন্দ্র নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন দরজায়। বললেন, "অকারণ মন খারাপ করো না বিকাশ। আমাদের সমাজ যে কি নিষ্ঠুর, মেয়েদের সম্বন্ধে ঐ একটা জায়গায় দেশের সমস্ত মানুষই যে কি নিষ্ঠুর তা তুমি জানো না। যদি জানতে, নিরুপমাকে উদ্ধার করবার কথা ভাবতে না। আমি নিষ্ঠুর হচ্ছি, তাকে সেই অমানুষিক নিষ্ঠুরতার থেকে রক্ষা করবার জন্যেই।"

বিকাশ মুখ তুলে বলল, "বিজ্ঞাপন আমি দেবই বাবা। সে যদি না আসতে চায় ত আসবে না। যদি আসে, তোমার সমাজ তোমার দেশকে আমি খোড়াই কেয়ার করব।"

ক্রমশঃ
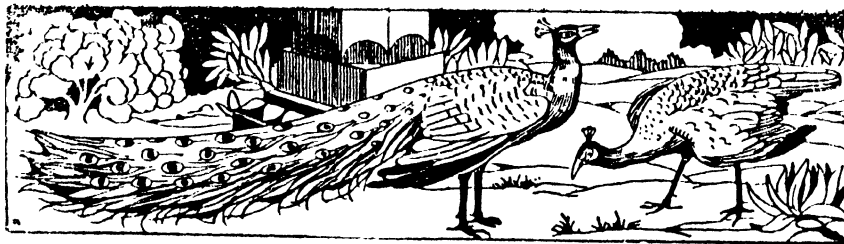
দন্ কি হোতের তৃতীয় রণযাত্রা

শ্রীসচিৎকুমার ধরমজুমদার

১৯৩৯-এর নব্য ও নিতান্ত নীরব স্পেনের নেতৃত্ব নিতে যারা বেরিয়ে এলেন, তাঁরা অধিকাংশই "নতুন লোক"। স্পেনের লেখকগোষ্ঠির সর্বাধুনিক generacion' (পর্যায়) -এর এঁদের মধ্য থেকেই উদ্ভব। বিখ্যাত "Generacion del'98 (1898)"-ই এই ধাঁচে স্পেনের মানসিক ইতিহাসের ক্রমিক পর্যায়গুলিকে নির্দেশ করার রীতি প্রবর্তন করে। ওঁদের, অর্থাৎ Unamuno, Macztu, Baroja Machado, ও Azorin-দের উত্তেজনাময় ও "তিক্ত" স্বদেশানুরাগ, এরই পরবর্তী, generacion del'15 (1915)"-নামে অভিহিত গোষ্ঠীর দ্বারা রহিত হয়। এঁরাই (অর্থাৎ '১৫ র গোষ্ঠি) সেই "europeista"-র দল যাদের নেতা ছিলেন Ortegay Y Gassett ও যাদের উপনেতৃত্বে ছিলেন Marnon, D'Ors, Perez de Ayala, Madariaga, ও Herrera। এর পরে দেখা দিল, Primo de Rivera র এক নায়কত্ব-কালের ও 'প্রজাতন্ত্র'-কালের মতবাদের অসাধারণ বিহ্বলতা সম্পন্ন ও ক্রমবর্ধমান বিরোধমগ্ন এক গোষ্ঠী, যারা অগ্নিপরীক্ষা দিলেন 'গৃহযুদ্ধ'-এ।

বর্তমান নিবন্ধ অবশ্য ওই প্রথমোক্ত "নতুন" generacion" ও তাঁদের পরবর্তীকালে (অর্থাৎ ৪০-এর দশকের দ্বিতীয় অর্ধে) যারা সর্বজনসমক্ষে বেরিয়ে এলেন তাঁদের নিয়ে; এঁরা সকলেই এখন ৩০ থেকে ৫০-এর কোঠায়। এদের মধ্যে কয়েকজন মিলে 'Arbor' ১ নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেন ১৯৪৪ থেকে। "Arbor" -এর স্থাপনাকাল থেকে বর্তমান স্পেনের মানসিক জগতের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই এতে লিখেছেন। (বাংলায় তথা ভারতে ঠিক ওই প্রকৃতির কোনো পত্রিকার খবর আমাদের জানা নেই বলে এখানে তুলনামূলক কোনো নামের উল্লেখ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হল।) ১৯৫৩-এ, "Arbor"-পত্রিকার কর্তৃপক্ষ প্রায় ৮০০ পাতার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন; গ্রন্থটি, ১৯৪৪ থেকে সুরু করে, তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত স্পেনের ইতিহাস ও বর্তমান জগৎ সমস্যা সকল সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধের কালানুক্রমিক সংকলন।২ প্রকৃত পক্ষে, এইরূপে পূর্বপ্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২-এর মধ্যে। এই সংকলনের বিশেষ করে দুইটি বিভাগের লেখা আমাদের বিবেচনায় বর্তমান স্পেনের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করার কাজে অত্যন্ত মূল্যবান। এক, স্পেনের "স্বর্ণযুগ" ও "অবক্ষয়" সম্বন্ধে রচনাসকল, আর দুই, স্পেনের ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য এবং আশু ভাগ্যসম্ভাবনা সম্বন্ধে। বর্তমান নিবন্ধে এই দুইটির নিবিড় সংযোগ আমরা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করব। ওই দুইটি বিভাগের রচনাগুলির প্রায় সবকটিই 'গৃহযুদ্ধোত্তর' generacion দ্বারা রচিত, প্রত্যেকেই তাঁরা "বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক" ও অধিকাংশই পেশাদার ঐতিহাসিক। প্রায় সকলেই এঁরা (অন্ততঃ ১৯৫৩ অথবা ১৯৫৪ অবধি) স্পেনের মানসিক জীবনের নির্দেশক যে-পরিষদ "Consejo Superior de Inveetigaciones Cientificas" ৩ বলে (১৯৪২ থেকে) পরিচিত, তাতে কোনও না কোনও প্রকারে সংশ্লিষ্ট।

স্পেনের ইতিহাসতত্ত্বের (historiography) বর্তমান কর্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে Vicente Palacio Atard (Valladolid) লিখছেন :-

"আমাদের দেশের ঐতিহাসিক অসাফল্য থেকেই 'দুইটি স্পেন নামক সমস্যার উদ্ভব। ১৭-শতাব্দে আমাদের পরাজয়ের পর থেকে স্পেনবাসী তাদের ইতিহাসের দ্বারা

সম্মুখস্থ হল। তারপর থেকে স্পেনের ইতিহাস আমাদের কাছে দুইটি সর্বতোরূপে বিপরীতধর্মী অর্থ নিল। সময়-কালীন প্রশ্নগুলির সমাধানের অন্বেষণে একদল অথবা অপর এক বিপরীতধর্মী দল আমাদের দেশের ইতিহাসের কাছেই যেতে লাগল ; কেউ বা গৃহাকুল প্রত্যানয়ন খুঁজতে, কেউ বা অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদন করার দুরাশা নিয়ে। দুইটি মিথ্যা দাবিই অসংগত, কারণ উভয়েই অসম্ভবের পায়ে মাথা খোঁড়া মাত্র। এই যে দুইটি বিপরীতভাবে দেখা স্পেনের ইতিহাস, এই-ই স্পেনবাসীদের গত তিন শতাব্দ ধরে বিভক্ত করে রেখেছে। অতএব, 'দুইটি স্পেন' নামক সমস্যাটি ঐতিহাসিকভাবে স্পষ্টই নির্দেশিত হতে পারে। এবং এর একটি সর্বশেষকালিক সীমা অবশ্যই থাকা সম্ভব। আমরা স্পেনের ইতিহাসের সেই চরম মুহূর্তে তখনই পৌছব যখন সকল স্পেনবাসীর পক্ষে গ্রহণীয় স্পেনের এক ইতিহাস লেখা হবে। এই কথাটি একটি নতুন প্রশ্নের উত্থাপন করল। ওইরূপ কোন ইতিহাসের কথা কি চিন্তা করা সম্ভব? আমার উত্তর: হ্যাঁ।" (Arbor" গ্রন্থ, পৃ: ৭৩৩)

Pedro Lain Entralgo, Madrid বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Rector (এঁর লেখা দুইটি রচনা এই "Arbor" সংকলনের অন্তর্ভুক্ত) 'গৃহযুদ্ধ' শেষের প্রায় সাথে সাথেই ওঁর সঙ্গে একত্রে যারা সর্বজনসমক্ষে বেরিয়ে এলেন তাঁদের সম্পর্কে অন্য আর এক স্থানে বলতে গিয়ে লিখেছেন:-

"স্পেন-সমস্যার প্রতি তাঁদের যে মনোভাব তা' তিনটি বিশ্বাসের দ্বারা গঠিত আদ্যানুমানের ওপর নির্ভর করে: ক্যাথলিক ধর্ম; সেই ধর্মের ঐতিহ্যে কাজ করলেই স্পেন তা'র শ্রেষ্ঠ স্বধর্মের পরিচয় পায়; স্পেন সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করে সমস্ত বিশ্বকে একটি সুপরিষ্কার নেতৃত্ব যোগাতে পারে।"

যুদ্ধক্ষেত্রের গন্ধকি গন্ধ যখন উড়ে যেতে সুরু করল ও দৈনন্দিন সত্যের মাঝে নীতিকে নিজের প্রমাণ দাখিল করতে হল, তখন ঐ তিনটি বিশ্বাস আরও দানা বাঁধলো ব্যক্ত উক্তিতে:

"ঐতিহ্য-বিরোধী প্রাগ্রসরবাদ ও সেকেলে অথবা বর্তমান অগ্রাহ্যকারী ঐতিহ্যবাদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে যে অমীমাংসিত বিতর্ক চলে আসছে তা'র সমাধানের আবশ্যকতা। রাজনৈতিক আত্ম-নির্ধারণ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য প্রত্যাভূতির আবশ্যকতা। অত্যন্ত যত্নে স্পেনের জীবনে যা' চিরন্তন ও যা' পরিবর্তন সাপক্ষে তা' নিধারণের আবশ্যকতা। ঐ প্রথমোক্তটির, অর্থাৎ যা' চিরন্তন তার রূপ নির্ধারিত হবে জীবনসত্তার ক্যাথলিক ব্যাখ্যান দ্বারা, স্পেনের ঐক্য ও তার রাজনৈতিক এবং আর্থিক স্বাধীনতা দ্বারা, মানবীয় ব্যক্তিসত্তার মর্যাদার প্রতি কর্মপ্রমাণিত সম্মানের দ্বারা, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি মনোযোগ, এবং, পরিশেষে, কতকগুলি সবিশেষ আবশ্যক অভ্যাস ও রীতি, যার মধ্যে ভাষা একটি। মৃত্যু সাক্ষী করে অপরিহার্য বিষয়গুলির প্রতি বিশ্বাস-রক্ষার আবশ্যকতা, ও অনাবশ্যক যা ধার্য্য হবে তা'র প্রতি নিরাসক্তি। যা চিরন্তন তা'র রূপবর্ণনে মৌলিকত্বের অবশ্যকতা,......এবং বিশ্ব ইতিহাসের মধ্যেই দুই পায়ে দাঁড়ানো ও অন্ধ দেশাচার পূজাকে ঘৃণা করার আবশ্যকতা।"

Perez Embid, "Arbor"-এর কার্য্যসচিব, ঐ নীতিগুলির সত্যার্পণের উপর মতামত দিতে গিয়ে ১৯৪৯-এ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে "৯৮-এর পৌত্র"-দের দলে এক সম্প্রদায় অবশ্য ছিলেন যাঁরা (যদিও Lain Entralgoর সাথে সাথেই ১৯৩৯-এ প্রাপ্তবয়স্কতা লাভ করেছিলেন) ঐ সকল নীতিকে কিছুটা পরিবর্তন না করে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না।

"এবং তবুও, উনি (Lain Entralgo) যখন অনুমান করে নেন ও বলেন যে উনি কেবল একাই নীতিগুলি ব্যক্ত করেননি, তখন উনি নিতান্তই সত্য কথা বলছেন। অন্যান্য আরও কতকগুলি জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উপরোক্ত মনোভাবটির মূল সূত্রগুলি এই গত কয়েক বছর ধরে বিশেষ এক সর্বজনস্বীকৃত সত্যতা লাভ করেছে; এর দ্বারা আমাদের সংস্কৃতির বর্তমান মুহূর্তের জন্য এক প্রামাণিক ঐক্যের অন্তর্ভূমি তৈরি হয়ে রয়েছে..." ("Arbor" গ্রন্থ, পৃ: ৬৮৮)

Palacio Atard ও Lain Entralgo-র রচনা থেকে ঐ সকল উদ্ধৃতি সম্ভবত সংকলনের এই লেখাগুলির সমষ্টিগত কতক বিশেষ অন্তবর্তী নীতি ও পূর্বানুমানের] কিছুটা রূপ পরিস্ফুট করতে পেরেছে। এখানে বোঝা বিশেষ আবশ্যক যে বর্তমান স্পেনের আভ্যন্তরিক রাজনীতিক্ষেত্রের "নীরবতা' ও স্পেনের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র থেকে আরো পাকাপাকি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হওয়ার পরিবর্তনকালের এখনও অকৃতকার্য্য অবস্থার সম্মুখস্থ হয়ে এই সকল নতুন চিন্তানায়কদের এক দ্বিবিধ নাট্যাংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। একদিকে, এঁরা "বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক,' তাঁদের পণ্ডিতসুলভ পেশাদারী কাজে নিমগ্ন। অপর দিকে, এঁরা স্পেনের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিতত্ত্বের গবেষণাকারী এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তিত। এঁদের মতামতের সঙ্গে ও এঁদের দিক থেকে বর্তমান শাসন-ক্ষমতার প্রতি মোটামুটি বাধ্যতা, এই দুইটি গভীর প্রভিন্নতা আমরা যদি বাদ দিই, তাহলে এঁদের নাট্যাংশটি Primo de Rivera-র একনায়কত্ব-কালীন বিরোধীপক্ষের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তুলনীয়। সেই সময়কার ঐ শেষোক্ত দলই বিখ্যাত "la Republica de profesores সৃষ্টি করতে সাহায্য করেন।

নানান কারণে স্পেনবাসী তাঁদের ইতিহাসের Fernando el Catolico থেকে "Westphalia-র শান্তি-র মধ্যবর্ত্তিকালীন যুগের সম্বন্ধে সর্বাগ্রে উৎসুক। আলোচ্য আধুনিক স্পেনের বুদ্ধিজীবীদের কাছে—তাঁদের উক্ত দ্বিবিধ নাট্যাংশের দিক থেকে—এর কারণ বিশেষ করে এই আটটি:

(১) ঐ যুগেই Fernando el Catolic-দ্বারা জাতীয় রাষ্ট্রের স্থাপনা;

(২) বিরাট সাগরপারীয় প্রসারণের সুরু;

(৩) স্পেনীয় সংস্কৃতির সব কয়টি শাখার সর্বোৎকৃষ্ট ক্রমবিকাশ,

(৪) ইউরোপীয় রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্পেনের প্রথম নির্গতি;

(৫) স্পেন সম্বন্ধে (বিশেষ করে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে) সেই তথাকথিত 'Black Legend"-এর উদ্ভব যা' স্পেনকে আজ অবধি ধাওয়া করে আসছে এবং যা প্রত্যেক স্পেনবাসীর জীবনে এক কুৎসিত প্রেতের ন্যায় উপস্থিত;

(৬) সমগ্র আধুনিক স্পেনীয় ইতিহাস যে অবনতির দ্বারা দূষিত সেই অবক্ষয়ের সুরু;

(৭) "Westphalia'র চুক্তিদ্বারা নিদর্শিত স্পেনের ধ্যানরূপ বিশেষ এক "ইউরোপ" এর পরাজয়; এবং ফলে ইউরোপীয় নাট্যক্ষেত্র থেকে স্পেনের প্রস্থান ও তার আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নকরণ;

(৮) শেষে আলোচ্য "generacion" এর দৃঢ়সংকল্প (হয় ব্যক্ত, নয় অপ্রকাশিত) যে ১৭ শতকের পথ তাঁরা আবার ধরবেন ও সেই স্থান থেকেই নবযাত্রা সুরু করবেন। (আমরা ঐ শেষোক্ত কথাটি পুনর্বার উত্থাপন করব।)

ঐ সম্পূর্ণ যুগটি Jose Maria Jover (Valencia) রচিত 'উচ্চ আধুনিক যুগ" নামক অসামান্য ও সমন্বয়ধর্মী গবেষণা প্রবন্ধটির দ্বারা আলোচিত; ঐ প্রবন্ধে বিশেষ করে তিনটি কথা তিনি বলেছেন যা ভাল করে আমাদের চিন্তা করে দেখার যোগ্য—যদি আমরা ঐ তিনটির কথাকে একত্রে দেখি। (তাঁর রচনায় এ কথাগুলি বিশদভাবে ব্যক্ত হয়েছে।)

(১) Fernando el Catolico স্পেনে এমন একপ্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থাপনা করেন যাতে ঐতিহ্যপূর্ণ ক্যাথলিকবাদ ও আধুনিকতার ঐক্য সাধিত হয়।

"প্রয়োগ প্রণালীর দিক থেকে দেখলে Fernando সেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থাপনায় কৃতকার্য হন যা' মধ্যযুগের শেষ পর্য্যায়ের ধারায় গঠিত ও যা ফ্রান্সদ্বারা প্রবর্তিত না হলেও, অন্তত রাজনীতি তত্ত্বের দৃষ্টিতে, সে দেশে প্রতিরক্ষিত, এবং Louis xI এর কৃপায়, বাস্তবক্ষেত্রে নির্বাহিত; তথাপি Fernando el Catolico-র ভিতর আমরা সেই ক্যাথলিক ঐতিহ্যের জোরালো রূপ এখনও পাই যা উপস্থিত ছিল মধ্যযুগীয় স্পেনের রাজত্বগুলির ঐতিহ্যে।' [Arbor-গ্রন্থ পৃঃ ২০৮)

(২) অভাবনীয় কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ যা'র শেষে Charles V সম্রাট হিসাবে নির্বাচিত হন ও যার ফলে ঐ উক্ত ক্রমবিকাশে বাধা পড়ে এবং যার ফলে স্পেনের ভাগ্য সম্ভাবনা এক পুনরুত্থিত ও প্রকৃত পক্ষে মধ্যযুগীয় আদর্শের সহিত গ্রথিত হয়।

"'এ কথা নিশ্চিত যে শাসনপটু Don Fernando দ্বারা বহু কষ্টে গঠিত 'আধুনিক ক্যথলিক রাষ্ট্রের যে আশাপ্রদ বাস্তবরূপটি দেখা দিয়েছিল তা' Charles অপরিণত অবস্থাতেই ভাঙলেন।" (Arbor গ্রন্থ পৃঃ ৩০৯)

Jover এর প্রবন্ধে এই প্রস্তাবগুলির অনুক্রম বিশেষ লক্ষ্যণীয় কারণ আধুনিক স্পেনীয় ঐতিহাসিকদের ধারণায় সর্বজনবিদিত একটি প্রসঙ্গ এতে প্রকাশিত, যথা, "Westphalia-র শান্তি ইউরোপায় আধুনিকতার 'দুইটি সম্ভবপর আদর্শরূপের' একটির নিশ্চিত পরাজয় নির্দেশ করে। অর্থাৎ universitas Christiana" রূপ "স্পেনীয়" আদর্শের পূর্বী আধুনিকতার দ্বারা পরাজয়। ঐ শেষোক্ত আদর্শটি প পায় 'জাতীয় রাষ্ট্রে' (national state"-এ), ক্ষমতার ভারসাম্যে, (balance of power'"-এ), ব্যক্তিতাবাদে' (individualism"-এ), এবং 'রাষ্ট্রের নীতি-তে (raison d' Etat" এ)। এই প্রসঙ্গ কতকগুলি প্রশ্নের উত্থাপন করে আলোচ্য সংকলনে যার কোন জবাব নেই। যথা আধুনিকতার স্পেনীয় ক্যাথলিক রাজা প্রকৃতপক্ষে কি ছিল—Fernando el Catolico সৃষ্ট জাতীয় আধুনিক রাষ্ট্র না উক্ত "universitas christiana যা কতকগুলি পরিস্থিতির সমাবেশ, রাজনীতি, ক্ষেত্র, Charles V এর উপর প্রায় জবরদস্ত চাপিয়ে দেয়, ও যা তাঁর স্পেনীয় উত্তরাধিকারীরা বহুমূল্য পিতৃদান হিসাবে পুত্রসুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিরক্ষা করেন। যে Charles V আধুনিক বাস্তবতার মাঝে মধ্যযুগীয় আদর্শের জন্য লড়েছিলেন তিনি কি নিজে প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগীয় ছিলেন না আধুনিক?

(৬) Charles—এর রাজনৈতিক আদর্শের চূড়ান্ত প্রভাব তাঁর "hispanizacion—এ ('স্পেনীকরণ"-এ)।

এটি Hapsburg-দের সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত নয় কারণ—Henry VII এর রোমীয় স্বপ্ন বাদ দিলে—তাঁরা সকলেই আধুনিকতার সঙ্গে আপস করেন ও তাঁদের বংশগত ভূসম্পত্তি দৃঢ়ীকরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং এক জয়রমান স্লাভিয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলছিলেন। Danto-র ঐতিহ্যের ghibelline যে gattinara, তাঁর প্রভাবও চূড়ান্ত রকমের হয় নি।৫ Charles V-এর Universitas christiana'"—রূপ আদর্শ আক্রমণের অংশে দেখলে, এবং জীবন্ত স্পেনীয় "Crusade"—মন্য ঐতিহ্যের ফল, এবং, রাজনীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্পেনিয় "Renaissance"-এর ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের বিশেষতঃ Fray Antonio de Guevara-র, কীর্তি।

আলোচ্য ঐতিহাসিক রচনাগুলির এক ক্ষুদ্র অংশ যদিও ঐতিহাসিক গবেষণা" বলে পরিবেষিত, তবুও এতই সমর্থন-কাতরতা ও কার্যগত ঔৎসুক্যদ্বারা দূষিত যে বাস্তবপক্ষে অসন্তোষজনক হয়ে পড়েছে। Palacio Atard বিরচিত একটি পুস্তক *, সংকলনে Juan Sanchez Montes Granada দ্বারা সমলোচিত, ঐরূপ রচনার একটি নিদর্শন। একজন স্পেনীয় ঐতিহাসিকের পক্ষে স্পেনের "অবক্ষয়'-এর সম্বন্ধে লেখার সময় নিদানশালাসুলভ আবেগহীন থাকা যে কষ্টসাধ্য তা সহজেই বোধ্য, কারণ ঐ-"অবক্ষয়'-এর প্রসঙ্গ পরবর্তী স্পেনীয় ইতিহাসে সদাই বর্তমান। Palacio Atard এর পুস্তকটি অবক্ষয়ের কারণগুলি দক্ষতার সঙ্গে এবং বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেছে—অর্থনৈতিক কুপরিচালনা, শিল্পের ও কৃষির অবনতি, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সমুদ্রমন্য চেতনার অভাব, ও শেষে নৈতিক নৈরাশ্য। কিন্তু 'অপর স্পেন—'এর ঐতিহাসিকদের দ্বারা ব্যক্ত ঐ অবক্ষয়ের ব্যাখ্যাগুলি খণ্ডনের ইচ্ছা ওঁকে ঐতিহাসিকসুলভ মনোভাব ছেড়ে মাঝে মাঝে স্বসাধুতা প্রচারকমন্য রাজনৈতিক তার্কিক করে তুলেছে। "দুইটি স্পেন'-সম্বন্ধে Pidal এর একটি প্রস্তাবের, উল্লেখ করে Palacio Atard প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন:

"আমরা কেবল একই স্পেন জানি। সমগ্র পৃথিবী কেবল একটাই জানে। একমাত্র সম্ভবপর......সেই-স্পেন

যার সুনির্দিষ্ট একটি ব্যক্তিত্ব আছে, যা' আধুনিক ইউরোপের মধ্যেও বেঁচে থাকতে পেরেছে, যদিও তা লৌহবর্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও পরীক্ষাগার দ্বারা পরিপূর্ণ।' (Arbor গ্রন্থ পৃ: ১৭৯-১৮০)

অথবা আবার—

"আমরা যারা ইউরোপের জন্য নিজেদের সর্বস্বান্ত ও রক্তহীন করেছি আমরা যারা নিজেদের কেবল ইউরোপে বা আমেরিকাতেই নয়, সমগ্র দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত করেছি সেই আমরা "ইউরোপ-বিরোধী বলে অভিযুক্ত। হ্যাঁ, আমরা আধুনিক ইউরোপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করি, কারণ তা' কেবল লঘুতার দৃষ্টিতেই ইউরোপ। কারণ স্পেন তার স্বধর্ম রেখেছে ও আমাদের সনাতন মূল্যবোধের অবক্ষয় নেই বরং তা' এ কালে চরমরূপে মূল্যবান।" ("Arbor'—গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৩)

"উদারতার শতাব্দ"—শিরোনামায় ২০০ পৃষ্ঠা ১৯ ও ২০ শতকে প্রদত্ত হয়েছে। Suarez Verdeguer দৃশ্যস্থাপন করেন এই দিয়ে :

"স্পেনের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগগুলি খুব অসমানভাবে জ্ঞাত, যদি প্রথম দৃষ্টিতে এ কথাটি কূটাভাস বলে মনে হবে তবুও ১৯-শতকই এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম পরিচিত। (Arbor'—গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭১)

১৯—শতকের জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন "ন্যায়সঙ্গত তথ্যের অনুক্রমণ 'বিদ্যমান নেই যার দ্বারা তাতে কোনো ব্যঞ্জনা দর্শায়। যদি কোনো অর্থ থেকে থাকে তা' হলে তা'—

"……মন্ত্রী ও মন্ত্রিত্ব, সেনাপতি ও সেনাধ্যক্ষ ঘোষণা' বিদ্রোহ ও দাঙ্গা, তুচ্ছ ও অবোধ্য বিপ্লব, দল ও চক্রান্ত দ্বারা গুপ্ত ও আচ্ছন্ন এক বিরামহীন তালিকামাত্র। সে-সর্ব তথ্যের এলোমেলো বিশৃঙ্খলার সমাবেশ বলে মনে হয়, যেন অনুক্রমতা ব্যতীত তাতে কোনো সম্বন্ধই নেই, প্রত্যক্ষ কারণসকল ব্যতীত (যে—কারণগুলি সে ঘটনাবলীকে জাগিয়ে মাত্র তোলে অথচ উৎপন্ন করে না) তাদের প্রকাশের যেন কোন কারণই নেই। যে কেউ স্পেনের জীবনের এই অংশটুকু দেখে সেই হতবুদ্ধি হয়……অবাক হয় এক শতাব্দ দেখে সর্বদা যার দশা, এক অস্থির ভারসাম্য। স্পেনীয় ১৯ শতক কি কেবলই ঐরূপ, না আরও অধিক কিছু?" ("Arbor গ্রন্থ পৃঃ ৪৭১)

Suarez Verdeguer বিশ্বাস করেন যে তার অর্থ আরও অধিক কিছু এবং সে শতাব্দের মতামতের মূলগুলির পরীক্ষা-কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই গুপ্ত অর্থের সংসক্তি খুঁজেছেন "বিপ্লব" এর বছরগুলিতে ও Ferna-ndine প্রতিক্রিয়ার, ও উদারতার জয়ের (১৮২৩) কালে। এটি যদিও এমন এক যুগ যা আজ অবধি প্রধানতঃ কেবল দেশীয় প্রচারকার্য্যের রসদ জুগিয়ে এসেছে, তবুও তিনি তাতে পরিষ্কার রাস্তা খুঁজছেন। Napoleon এর বছর-গুলির রাজনৈতিক সংক্ষোভ তাঁর পরীক্ষায় প্রমাণ করে যে সর্বপ্রকার সদ্বিবেকী রাজনৈতিক মতাবলম্বীরা Charles Iv ও তাঁর মন্ত্রী godoy—দ্বারা মূর্ত পুরাতন শাসন ব্যবস্থার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিরোধিতা করতেন। কিন্তু, উক্তমতে আবার আবশ্যক সংস্কারের বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ প্রভিন্নতা বর্তমান ছিল। একদিকে, উদারতার দল, "Ilustracion-এর সন্তান, ফরাসী বিপ্লবের নতুন রাজনৈতিক রূপে বিমুগ্ধ; অপর পক্ষে বাস্তবতার দল, স্পেনের রাজতন্ত্রের চিরাচরিত সংবিধানের প্রত্যানয়নে উৎসাহবান; তবে ও সংবিধান আইনত বলবৎ থাকলেও কারণ তা' রদ করা হয়নি—বস্তুতঃ অকর্মণ্য হয়েই ছিল, কারণ মন্ত্রীতন্ত্রের এক শাসন-ব্যবস্থা তা' আড়ালে রহিত করে এমন ভাবেই কাজ করে যেতো যেন সে সংবিধান অবর্তমান। প্রথমোক্ত দল তাঁদের শত্রুদের অভিহিত করেন "স্বেচ্ছাতন্ত্র" বলে, দ্বিতীয়টি 'মন্ত্রীদের "স্বৈরতন্ত্র" বলে। এইরূপে সচরাচর যে সন্নিধি 'উদারতা' ও 'প্রতিক্রিয়া'র মধ্যে করা হয় (এবং যা ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকে প্রায় সবদা বিদ্যমান) তা' এখানে রূপান্তরিত হল 'পুরাতন শাসনব্যবস্থা'—Suarez-এর ভাষায় "পূর্ণজাড্য"—ও দুইটি পরস্পর-বিরোধী সংস্কারমন্য শক্তির সন্নিধিতে যা'র মধ্যে একটি উদারতার, অপরটি বাস্তবতার স্বপক্ষে।

"পুরাতন শাসনব্যবস্থা'-র পতন হল এবং ঐ উভয় [শক্তিই] বর্তাল ও নতুন দুনিয়া সৃষ্টির জন্য তাদের দ্বন্দ্ব চালিয়ে গেল।' (Arbor'-গ্রন্থ পৃঃ ৪৭৭)

উক্ত দ্বন্দ্বের প্রারম্ভিক ভাগ্যাবস্থাগুলিই Suarez Ver-degner-এর পরীক্ষার বিষয়বস্তু—১৮১৪-র পরে বাস্তবতার

(পরে 'Carlist'-দের) কর্মসূচীর সত্যপ্রকৃতি, ১৮২৩-র পরে Fernando VII এর নায়কত্বে, যে তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল দল গড়ে উঠেছিল তা'র সত্য গঠন (যেহেতু, আপাতদৃষ্টিতে অসংগত তথ্যটি বর্তমান যে Fernando ৮ বছরের মধ্যেই উদারপন্থীদের হাতে শক্তি ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন); প্রথম Carlist যুদ্ধে Carlist-দের প্রতি জনমতের সমর্থনের পরিমাণ ও তাঁদের পরাজয়ের কারণ সমূহ, এক কথায়, রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের মুগ্ধকর এক ব্যাজলক্ষণা যা ২০ বছরের মধ্যে দেশের শাসনভার ছেড়ে দিল এমন কতকগুলি বিশেষ বিপ্লবী মতামতের হাতে যার বিরুদ্ধে সমস্ত স্পেনবাসী এক কায়মনোবাক্যে লড়েছিল।

আজকের স্পেনীয়দের কাছে যে ঘটনাসকল তাঁদের ঐতিহাসিক গতকালসম, সেই Maura, 'একনায়কত্ব' ও সিংহাসন পরিত্যাগ' সম্বন্ধে লিখেছেন Jose Maria Garcia Escudero। তাঁরা লেখা "De Canovas a la Republica" পুস্তকটি স্পেনের ১৮৭৪ থেকে ১৯৩৬-এর ইতিহাসের প্রধান রেখাগুলির একটি সুষম, সুরচিত, চিন্তাশীল ব্যাখ্যা এবং বর্তমান স্পেন হৃদয়ঙ্গমের কাজে মৌলিক: এই কারণে এবং যেহেতু "Arbor Generacion তাঁদের প্রত্যক্ষ অতীতের যে-ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন তা'র বহুলাংশের নমুনাস্বরূপ বলে—হয়ত তা এখানে এই ১০ টি উক্তিতে সংক্ষেপ করে দেওয়া অসমীচীন হবে না:

উক্ত গ্রন্থের 'ভূমিকা'-টির সুরু এই দিয়ে:

"এক শতাব্দ কালের ৩।৪ অংশ আগে ১৮৭৪-এ স্পেনবাসী তাদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল গৃহযুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করে; ১৫ বছর আগে, ১৯৩৬ এ আমরা সেই স্পেনবাসী আমাদের রাজনৈতিক সমস্যা থেকে মুক্তি খুঁজলাম গৃহযুদ্ধে। এই পুস্তকে আমি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি কেন, প্রথমটি সত্ত্বেও, দ্বিতীয়টির আগমন হয়েছিল এমন এক কাহিনীর শেষে যার সুরু Canovas থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি শেষ স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রে।'

অর্থাৎ:

(১) Canovas, দুইটি স্পেন'—নামক অমীমাংসিত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, মধ্যপথগামী ১৮৭৬ এর 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংবিধান'-এ সমাধান খুঁজেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক নৈপুণ্য 'গৃহযুদ্ধ ৫০ বছর কাল স্থগিত রাখতে পেরেছিল।

(২) গোড়া থেকেই উদারতার সংবিধান স্পেনীয় চরিত্রের পক্ষে মূলতঃ অনুপযোগী হয়েছিল এবং সে-চরিত্রের নঞর্থক গুণগুলির সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় ও তাঁর সদর্থক গুণগুলিকে কোন সুযোগই দেয়নি।

(৩) ইংরেজী ছাঁচে গড়া দল-পদ্ধতি (Canovas এর যা' আকাঙ্খা ছিল এবং যা তিনি কিছুকালের জন্য পূর্ণ করতে পেরেছিলেন) সহযোগিতা-চেতনার অভাবদ্বারা অধিঃ-ক্ষয়িত হয়; বস্তুতঃ, সংবিধানধন্য বামপন্থিদের দ্বারা সংবিধান-অগ্রাহ্যকারী বামপন্থীদের রীতিবদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতা, অর্থাৎ, উদারপন্থিদের দ্বারা প্রজাতন্ত্রীদের এবং সমাজ-বাদীদের।

(৪) শাসনব্যবস্থা একটি শাসকশ্রেণীর সংরক্ষারূপেই ছিল, তাতে জনসাধারণের সংলগ্নতার অভাব ছিল, এবং তার সামাজিক নীতি ছিল না, ও তা' কোন জাতীয় আদর্শ যোগায়নি।

(৫) Carlist ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী যে সংবিধান-অগ্রাহ্যকারী ডানপন্থিরা ছিল, তারা সংবিধান অগ্রাহ্যকারী-রূপে থেকে দোষাবহ হয় অর্থাৎ, তাদের অপ্রসন্ন-চিত্ত নিবৃত্তি দ্বারা। যে সময়ে তারা বিদ্বেষ সঞ্চয় করে চলেছিল ও নিজেদের মধ্যে পণ্ডিতি বিবাদে ব্যস্ত ছিল, সে কালে সমাজবাদীরা পৌর-শ্রমিকদের এক বৃহৎঅংশ লাভ করে এবং Institucion Libre de Ensenanza ক্যাথলিকবিরোধী, বিদেশকারী extranjerizante কতকগুলি মানসিক Genenracion তৈরী করতে সক্ষম হয় স্পেনের বুদ্ধি-জগতের নেতৃত্ব যোগাতে যাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী মিলল না।

(৬) শাসনব্যবস্থা হয়ত বাঁচত ও রূপান্তরিত হত, যদি Alfonso xiii রাজত্ব করতে মনস্থির করতেন, অথবা Maura-কে তা করতে দিতেন। কিন্তু নিশ্চিতবিশ্বাসী উদার-পন্থীরূপে তিনি নিজেও শাসন করবেননা এবং তাঁর নীতি-অনুযায়ী বিরোধীদলের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের নিরস্ত্র করা তাঁকে moura-র সমর্থন করতেও দিল না।

(৭) Rrivera de Pirra শাসন ব্যবস্থা বাঁচাতে পারতেন যদি তিনি আরও বিচক্ষণ হতেন, যদি না তিনি অত আত্ম-সমর্থনেচ্ছু হতেন—তাঁর শাসনের সাময়িক প্রকৃতি দ্বারা তিনি যেহেতু প্রায় বাতিকগ্রস্ত ছিলেন—ও যদি না বুদ্ধিজীবিরা ওঁর বিরুদ্ধে থাকতেন। তা সত্ত্বেও তিনি তা বাঁচাতে পারতেন যদি তিনি যুবকশ্রেণীকে আকর্ষণ করার জন্য ও একটি স্থায়ীদল গঠন করার জন্য তাঁর একনায়কত্ব ব্যবহার করতেন। কার্য্যত তিনি প্রজাতন্ত্রকে ৮ বছরকাল পেছিয়ে দিতেই কেবল পেরেছিলেন।

(৮) ১৯৩১ এর মধ্যে Alfouso XIII এক রাজতন্ত্রী-দলহীন রাজা হয়ে পড়লেন। চিন্তাশীল লোকেদের মধ্যে অধিকাংশ, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দলের সমর্থক হয়েও, আশার সহিত প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাকায়, অথবা রাজাকে জব্দ করতে প্রজাতন্ত্রকে নির্বাচন করতে রাজী ছিল। (কয়েক বছরের মধ্যে এদের অনেকের মোহ কেটে গিয়েছিল।)

(৯) প্রজাতন্ত্রের শাসনের সময় বামপন্থার দিকে বিশ্বাস-ঘাতকতার নীতি চলল এবং প্রজাতন্ত্রী-বামপন্থীরা সমাজ-তন্ত্রীদের নিয়ে এল ভিতরে ও সমাজতন্ত্রীরাও সাম্যবাদীদের।

(১০) শৃঙ্খলার ধ্বংস, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ ও Gil Robles-এর নেতৃত্বে ক্যাথলিক ralliement-র সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারে অস্বীকৃতি গৃহযুদ্ধ উৎপন্ন করল। সৈন্যদল দ্বারা প্রথমে নেতৃত্ব প্রদত্ত হলেও, এটা বস্তুতঃ জনসাধারণের উত্থান, কারণ ১৯ শতকের যুদ্ধ-গুলির গ্রাম্য, Carlist জনগণের উত্তরাধিকারীরাই তার দৃঢ়কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

Lain Entralgo-এর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—ও Calvo Serer "Generacion del' 98"—এর উপর প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমে তাঁরা ঐ গোষ্ঠির কি ছিলেন, কি ভাবতেন, কি চাইতেন, তা নিয়ে আলোচনা স্থুরু করেছেন, una-muno, Baroja, Azorin, Machado, Maeztu অর্থাৎ সেই স্পেনবাসীগণ যাঁরা প্রাপ্তবয়স্কতা লাভ করলেন এমন এক সময়ে, যখন সাগরপারীয় সাম্রাজ্যের শেষ উপনিবেশগুলি এক "দোকানদারের জাতি"-র হাতে মরল। আদর্শহীন ও পরাজয়প্রয়াসী এক স্পেনে বড় হয়ে, নিশ্চল প্রতিক্রিয়া ও আমদানীকরা আধুনিকতার মধ্যে অমীমাংসিত উভয় সংকটের দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে, তাঁরা স্পেনের প্রতি এক তীব্র প্রেম অনুভব করতেন, ও চতুর্দিকে দৃষ্ট-অবস্থার প্রতি ঘৃণায় জ্বলতেন। উভয় দিককে সমালোচনা করে ও ইতিহাসের মধ্যে তাঁদের ঈপ্সিত স্পেনকে অনুসন্ধান করে, তাঁরা, একদিকে, ১৬ ও ১৭ শতককে (ঐতিহ্যবাদীদের 'রামরাজ্য') ও অপর পক্ষে, ১৮ শতাব্দকে (আধুনিকতা-বাদীদের স্বচ্ছ প্রস্রবণ!) প্রত্যাখ্যান করে, স্পেনীয় মধ্য-যুগের পরিষ্কার, অকলুষিত হাওয়ায় তা খুঁজে পেলেন। প্রথমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন চাইলেন স্পেনের তৎকালীন প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করতে ইউরোপের দিককার জানালাগুলি খুলে দিয়ে। পরে অবশ্য, তাঁরা ১৬ ও ১৭ শতককে মানেন স্পেনের প্রকৃত ও মূল আধ্যাত্মিক জীবনোদ্দেশ্যের ঐতিহাসিক প্রতিভূরূপে। ভৌগোলিক পরিসীমাক্ষেত্রের লোক হয়ে Castile-এর স্থলচিত্রের কঠিন সৌন্দর্য্যে ও Castile-এর চেতনার আবেগে তাঁরা শেষে খুঁজে পেলেন স্পেনের সেই অন্তর্বর্ত্তী সাহিত্য, যা সাহিত্যে তাঁদের কাছে মূর্ত্ত হয়ে ছিল Don Quijote-র লোকোত্তর মূর্ত্তিতে এবং তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন স্পেনের পৃথিবী মধ্যে নতুন আধ্যাত্মিক জীবনোদ্দেশ্যের Don Quijote-র তৃতীয় রণযাত্রার।

'৯৮-এর গোষ্ঠী এই প্রকারে চিন্তা করতেন ও আশা করতেন। তাঁদের কর্ম্মের সাহিত্যমূল্য যে অবিসংবাদিত তা' ছেড়ে দিয়ে ধরলে আজকের স্পেনবাসীর কাছে তাঁদের অর্থ কি? স্পেন-প্রেম, তাঁদের গভীর অস্বস্তি—তাঁদের "dolor de Espana"—তাঁদের পরিপূর্ণতার জন্য ঔৎসুক্য ও তাঁদের মধ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বর্ত্তমান দ্বারা পূর্ণ মাত্রায় প্রশংসিত। কিন্তু, তাঁদের ক্যাথলিক ধর্ম্মকে রূঢ়ভাবে বিচার করার ঝোঁক (কিছু সংখ্যক ক্যাথলিকদের কার্য্যের দরুণ) ও তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের—Unamuno, "স্পেনীয় Luther"—ক্যাথলিক নৈষ্ঠিকতার সঙ্গে অনিশ্চিত সম্পর্ক তাঁদের প্রভাবকে প্রত্যক্ষ ও সজীব হতে রোধ করে এমন এক generacion-এর উপর যাদের কাছে সেই ক্যাথলিক নৈষ্ঠিকতা মূলসূত্রস্বরূপ। কখনও জ্ঞানতঃ, কিন্তু প্রধানতঃ অজ্ঞানতঃ, তাঁদের সমালোচনা যে "স্পেনবিরোধী"-

দের ও ধ্বংসবিশ্বাসীদলকে অস্ত্র যুগিয়েছিল এবং তদোপরি তাঁরা যে 'প্রজাতন্ত্র'-তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন (যা' 'গৃহযুদ্ধ' নিঃশেষ করে)—এই দুইটি তথ্যের অবস্থানহেতু তাঁদের মানসিক গুরু রূপে ধার্য হওয়া অসিদ্ধাচার প্রমাণ হয় এমন এক generacion এর কাছে যাঁরা "উদারতার শতাব্দী" ও 'প্রজাতন্ত্রে' যার নির্দ্দেশক তার প্রতি দৃঢ়ভাবে মুখ ফিরিয়ে আছেন "আর কখনও না!" বলে।

কেবল Maeztu তাঁর পরবর্তীকালীন ক্যাথলিক নৈষ্ঠিকতায় ও জাতীয় আদর্শে "ধর্ম্মান্তর"-এর দ্বারা ৯৮ ও "আমাদের কালের" মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ।

"যে স্পেন তাঁরা এতো সতেজে বর্ণনা করেন, সে-স্পেনের নিদান ও পুনর্স্থিতির যখন প্রশ্ন উঠে, তখন তাঁরা এক পৌরাণিক বস্তুরই বিস্তার সাধন করেন, ও তাঁদের মধ্যে, কেবল Maeztu-ই নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন সেই নঞর্থাধিক্যতা ও অরাজকতামগ্ন সমালোচনা থেকে যা ঐ গোষ্ঠীর অন্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারে অনুর্ব্বর করে দিয়েছিলেন।" (Calvo Serer "Arbor গ্রন্থ, পৃঃ ৬০৮)

গ্রন্থটির শেষের দিকের গবেষণা-প্রবন্ধ পূর্ব্বালোচিত রচনাগুলির অপেক্ষা কিছুটা সাধারণ প্রকৃতির। প্রবন্ধ-গুলির উদ্দেশ্য স্পেনের ইতিহাস থেকে সন্ধান করে বার করা স্পেন সত্যই কী এবং সে-ইতিহাসে স্পেনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের পথনির্দ্দেশ গোজা। ঐ প্রবন্ধসকল বহুলাংশে একই চেতনায় মিলিত এবং বহু খুঁটিনাটিতেও তাদের পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। ভালই হোক, মন্দই হোক বর্ত্তমান স্পেনের সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত চিন্তাধারার নির্দ্দেশক ঐ প্রবন্ধগুলি এবং জীবন-দর্শন ও রাজনীতি-দর্শন হিসাবে স্পেনের আশু ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কার্য্যে সবিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ বলেও ধর্তব্য।

এই লেখাগুলি আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও আত্মপ্রসাদ থেকে বহুদূরে। কর্ম্মেচ্ছায় লেখা-গুলি গভীরভাবে উত্তেজিত। বুদ্ধি ইচ্ছার গোড়ায় জল দেয়। লেখাগুলিতে ইতিহাসের ব্যবহারিকবোধ ১৭-শতাব্দে পায় তার প্রাণকেন্দ্র ও সে স্থানে তাঁদের কাছে দৃষ্ট হয় ১৬-শতকে সম্ভবপর দুইটি ইউরোপীয় "আধুনিকতার"-র মধ্যে সুপরিষ্কার পথপার্থক্য। একদিকে স্পেন দ্বারা সমর্থিত, ঐতিহ্যবাদী পরিকল্পনা "মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার বুনিয়াদি উপাদান"-গুলির সংরক্ষণ অথচ 'অপসারণ সাপেক্ষ সব উপাদানগুলির স্থানান্তর" স্বীকার (Palacio Atard, 'Arbor" গ্রন্থ পৃঃ ৭২৩) অপরদিকে "বৈপ্লবিক" পরিকল্পনা: ব্যক্তিবাদী ও ক্যাথলিকবিরোধী শেষোক্তটির ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি আধুনিক ইউরোপের জন্মকাহিনীরই বলা যেতে পারে—তাঁদের কাছে পরিস্ফুট "রেনেসাঁসীয় অখৃষ্টীয়করণে" (haganising Renaspisance), "ধর্মসংস্কার"-এ ("Reformation") "১৭-শতাব্দের ধ্রুপদান্ধতায়" ও "আলোকপ্রাপ্তির সংস্কৃতিতে"। (বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় তথা ভারতবর্ষীয় বা ইঙ্গ-স্যাক্সন্ দেশগুলির ক'জন ইতিহাসবিদ আজকেও আধুনিক ইউ-রোপের ঐ-কুলজীটি মেনে নিতে পারবেন?) কিন্তু স্পেনের "উত্তর রেনেসাঁসীয় Christendom—এর পরিকল্পনা" (Lain Entralgo), যদিও বস্তুগত পরাজিত এবং তৎপর-বর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল ও যথেচ্ছাচারীরূপে জারমানীয় ও প্রটেস্ট্যাণ্ট দেশগুলির চক্ষে পরিদৃষ্ট, তবুও তা তার যাথার্থ রক্ষা করে এসেছে ও আজকেও করছে। বর্ত্তমানের ভগ্নগতি ইউরোপীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে যে-উপাদানের সাহায্যে নবকলেবরপ্রাপ্ত হতে পারে সেইগুলিই যেন তাতে বিদ্যমান। (Francisco de Ayale Palacio Atard দ্বারা উদ্ধৃত, "Arbor"-গ্রন্থ, পৃঃ ৭২৪)

"যে বন্ধনীচিহ্ন Westphalia-য় ১৬৪৮-এ প্রথম আঁকা হয়েছে, ঠিক সেইটিই আমরা আজ শেষ করছি।"—লিখলেন perez Embid ১৯৪৮-এ।

"Westphalia: স্পেনকল্পিত ইউরোপের সঙ্গে...... ইউরোপীয় আধুনিকতার বর্দ্ধিষ্ণু শক্তির সংঘর্ষের প্রথম ফল। ১৯৪৮ বিজ্ঞানক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপের সম্বন্ধে স্পেনের হীনতাবোধের জয় এবং—ইউরোপে উদারপন্থার সামগ্রিক ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে—Westphalia অবধি স্পেনদ্বারা সংরক্ষিত নীতিগুলির বিশ্বব্যাপী যাথার্থ্যের পক্ষে এক নতুন প্রাসঙ্গিকতা।" ("Arbor" গ্রন্থ, পৃঃ ৬৮৯)

কিন্তু ১৭-শতকে ফিরে যাওয়ার সংকল্প তাঁদের যদিও
ন এক প্রকৃত স্পেনীয় ঐতিহ্যের খোঁজে যার উৎস থেকে
রা চান বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মহত্তের এক নতুন যুগের
ক এবং সকল স্পেনবাসীকে একত্রিত করার ভিত্তি,
ও তার অর্থ অতীতাভিযানে নয়। Rerez Embid
লন, তার অর্থ।

"স্পেনীয় সারপদার্থ থেকে সঠিক সিদ্ধান্তকৃত এক
তিহাসিক আচরণের প্রধান রেখাগুলির পুনরাবিষ্কার…
প্রকার "Casticism0"-র (সংকীর্ণ স্পেনীয় ঐতিহ্যবাদ)
(হয়েও), আমরা ঐতিহাসিক সরলাধিক্য-দোষে দুষ্ট
, আমাদের অতীতের যে অংশ আমরা অপ্রীতিকর মনে
তা' সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করব না। বাদ না দিয়ে সে-
তকে মূল্যায়ন করা ও আমাদের বলে স্বীকার করা
র্মোচনের দ্বারা তাকে অতিক্রম করার পক্ষে অপরিহার্য
সূচক।"

অপচয়কৃত ১৯ শতক কিন্তু তাঁদের উপর গুরুভার স্থাপন
আছে। আভ্যন্তরিক বিভক্তি ও সাগরপারীয় দুর্ঘটনায়
ন্ন সে-শতাব্দ স্বগৃহে "আড়ম্বরসর্ব্বস্ব casticismo ও
তাবোধের" দ্বারা প্রতিধ্বনিত। (Perez Embid,
rbor" গ্রন্থ, পৃঃ ৬৮৯) "১৮৪৮ এর ইউরোপীয় বিপ্লবের
বহুলাংশে স্থাপিত উদার জগতের ধারণার
আবার কোন প্রকার পরিমাণরক্ষায় সুদৃঢ় অস্বীকৃতি
র পরিষ্কার। স্পেনের নতুন পথ "ঐতিহ্যবিরোধি প্রাগ্র-
াদ" ও বর্ত্তমান অগ্রাহ্যকারী এক প্রতিক্রিয়াশীল
ভাবের থেকে সমদূরবর্তী।

সাম্প্রতিক স্পেনের ইতিহাসে এতো গোলযোগের
যে ফরাসীধাঁচের অত্যধিক কেন্দ্রীভূতির পুরাতন ভুল,
আবার না করা চাই। স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির
যত্নের বিকাশ চাই, অবশ্য জাতীয় ঐক্যের কাঠামোয়।
কিন্তু উদারতাবিরোধী ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যসন্ধান
বলে এঁরা ধরেন না। সদর্থক দিকে, এই বুদ্ধি-
রা "অপর স্পেন," অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনতিপ্রত্যক্ষ
তের দ্বারা রূপায়িত স্পেন সম্পর্কে সহানুভূতি ও
তাসম্পন্ন এক বিশেষ মনোভাবের প্রমাণ দেন, যদিও
অনহুমোদনও বর্তমান। ঐ সকল 'অপর' স্পেনীয়দের
কার্য্যফল বর্তমানের চক্ষে মূল্যায়ন অপেক্ষা তাঁদের আচরণের
নিহিতোদ্দেশ্যগুলি দিয়েই তাঁদের বিচার করার ইচ্ছা এঁদের
মধ্যে পরিস্ফুট। এইরূপ সহনশীলতাগুণ স্পেনীয় চরিত্রে
ইতিপূর্বে বড় একটা প্রবলভাবে দর্শায় না।

এরই সঙ্গে, বর্তমান মানসিক আন্দোলনের গুরু ও
আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকরূপে Menendez Pelayo-কে গণ্য
করার এক অসাধারণ মতৈক্য বিদ্যমান। সম্পূর্ণ একলা
এবং বিশেষ দুঃসময়ে MenindezPelaya যার প্রতিরূপ
ছিলেন, তার প্রতি Perez Embid, "Arbor" এর
কার্য্যসচিব হিসাবে, আলোচ্য পত্রিকাটির সন্দেহাতীত
আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। ("Arbor' গ্রন্থ, পৃঃ ৬৯১)

আর এক বিষয়েও ঐরূপ মতৈক্য বর্তমান: তার
সীমানার বাহিরে বর্তমান স্পেনের প্রথম কর্তব্যকার্য্য হল
স্পেনীয় আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক
ঐক্য গঠন।

আজকের ইউরোপের সম্বন্ধে আলোচ্য লেখকগোষ্ঠীর
ধারণা অত্যন্ত হতাশাপূর্ণ, এবং, অপর দিকে, তাঁরা স্পেনের
আধুনিক জগতে জীবনোদ্দেশ্য বিষয়ে ঠিক ততখানিই আশা-
বান, যদিও সে-আশা প্রায় লঘুচিত্ততা ও তারুণ্যের
পর্যায়ে পড়ে। ঐরূপে জীবনোদ্দেশ্যের সম্ভবপর সাফল্যের
চিন্তা তাঁদের আশার হিসাব-নিকাশে সর্বশেষের লাভাঙ্ক
হয়েই থাকে।

"আমরা জানি যে ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়তি-
সবশ হয়ে কেবল দুর্ঘটনায়ই পরিসমাপ্ত হয় না। বরং
পক্ষান্তরে, সুচৈতন্য কর্মের বিদারণ একটি সংস্কৃতিকে
বাঁচাতে পারে ও তার সৃষ্টিশীল শক্তিগুলিকে নবীভূত
করতে পারে।" (Calvo Serer, "Arbor"-
গ্রন্থ, পৃ: ৭৬৫)

স্পেনের নাট্যাংশ নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন:-

"সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমাদের যাত্রারম্ভের স্থান ইউরোপের
অন্য অংশের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, যদিও অর্থনৈতিক
দৃষ্টিতে আমরা নিম্নতর।" (Arbor"-গ্রন্থ, পৃ: ৬১৯)

"বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ইঙ্গ-স্ক্যান দেশগুলি তাদের
উদ্যমশীল আশাপূর্ণতা হারিয়েছে, যা' তাদের ল্যাটিনদের
ঘৃণা করতে প্রবৃত্ত করত। প্রটেস্টান্টইসম্ অত্যন্ত দুর্বল

দের ও ধ্বংসবিশ্বাসীদলকে অস্ত্র যুগিয়েছিল এবং তদোপরি তাঁরা যে 'প্রজাতন্ত্র'-তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন (যা' 'গৃহযুদ্ধ' নিঃশেষ করে)—এই দুইটি তথ্যের অবস্থানহেতু তাঁদের মানসিক গুরু রূপে ধার্য হওয়া অসিদ্ধাচার প্রমাণ হয় এমন এক generacion এর কাছে যাঁরা "উদারতার শতাব্দী" ও 'প্রজাতন্ত্রে' যার নির্দেশক তার প্রতি দৃঢ়ভাবে মুখ ফিরিয়ে আছেন "আর কখনও না!" বলে।

কেবল Maeztu তাঁর পরবর্তীকালীন ক্যাথলিক নৈষ্ঠিকতায় ও জাতীয় আদর্শে "ধর্মান্তর"-এর দ্বারা ৯৮ ও "আমাদের কালের" মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ।

"যে স্পেন তাঁরা এতো সতেজে বর্ণনা করেন, সে-স্পেনের নিদান ও পুনর্সৃষ্টির যখন প্রশ্ন উঠে, তখন তাঁরা এক পৌরাণিক বস্তুরই বিস্তার সাধন করেন, ও তাঁদের মধ্যে, কেবল Maeztu-ই নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন সেই নঞনাধিক্যতা ও অরাজকতামন্ত্র সমালোচনা থেকে যা ঐ গোষ্ঠীর অন্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারে অনুর্বর করে দিয়েছিলেন।" (Calvo Serer "Arbor গ্রন্থ, পৃঃ ৬০৮)

গ্রন্থটির শেষের দিকের গবেষণা-প্রবন্ধ পূর্বালোচিত রচনাগুলির অপেক্ষা কিছুটা সাধারণ প্রকৃতির। প্রবন্ধ-গুলির উদ্দেশ্য স্পেনের ইতিহাস থেকে সন্ধান করে বার করা স্পেন সত্যই কী এবং সে-ইতিহাসে স্পেনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যের পথনির্দেশ খোঁজা। ঐ প্রবন্ধসকল বহুলাংশে একই চেতনায় মিলিত এবং বহু খুঁটিনাটিতেও তাদের পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। ভালই হোক, মন্দই হোক বর্তমান স্পেনের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চিন্তাধারার নির্দেশক ঐ প্রবন্ধগুলি এবং জীবন-দর্শন ও রাজনীতি-দর্শন হিসাবে স্পেনের আশু ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কার্যে সবিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ বলেও ধর্তব্য।

এই লেখাগুলি আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও আত্মপ্রসাদ থেকে বহুদূরে। কর্মেচ্ছায় লেখা-গুলি গভীরভাবে উত্তেজিত। বুদ্ধি ইচ্ছার গোড়ায় জল দেয়। লেখাগুলিতে ইতিহাসের ব্যবহারিকবোধ ১৭-শতাব্দে পায় তার প্রাণকেন্দ্র ও সে স্থানে তাঁদের কাছে দৃষ্ট হয় ১৬-শতকে সম্ভবপর দুইটি ইউরোপীয় "আধু-নিকতার"-র মধ্যে সুপরিষ্কার পথপার্থক্য। একদিকে, স্পেন দ্বারা সমর্থিত, ঐতিহ্যবাদী পরিকল্পনা "মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার বুনিয়াদি উপাদান"-গুলির সংরক্ষণ অথচ 'অপসারণ সাপেক্ষ সব উপাদানগুলির স্থানান্তর" স্বীকার। (Palacio Atard, 'Arbor" গ্রন্থ পৃঃ ৭২৩) অপরদিকে "বৈপ্লবিক" পরিকল্পনা: ব্যক্তিবাদী ও ক্যাথলিকবিরোধী শেষোক্তটির ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি আধুনিক ইউরোপের জন্মকাহিনীরই বলা যেতে পারে—তাঁদের কাছে পরিস্ফুট "রেনেসাঁসীয় অখৃষ্টীয়করণে" (haganising Renaspi-sance), "ধর্মসংস্কার"-এ ("Reformation") "১৭-শতাব্দের ধ্রুপদান্ধতায়" ও "আলোকপ্রাপ্তির সংস্কৃতিতে"। (বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় তথা ভারতবর্ষীয় বা ইঙ্গ-স্যাক্সন্ দেশগুলির ক'জন ইতিহাসবিদ আজকেও আধুনিক ইউ-রোপের ঐ-কুলজীটি মেনে নিতে পারবেন?) কিন্তু স্পেনের "উত্তর রেনেসাঁসীয় Christendom—এর পরিকল্পনা" (Lain Entralgo), যদিও বস্তুগত পরাজিত এবং তৎপর-বর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল ও যথেচ্ছাচারীরূপে জারমানীয় ও প্রটেস্ট্যান্ট দেশগুলির চক্ষে পরিদৃষ্ট, তবুও তা তার যাথার্থ রক্ষা করে এসেছে ও আজকেও করছে। বর্তমানের ভগ্নগতি ইউরোপীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে যে-উপাদানের সাহায্যে নবকলেবরপ্রাপ্ত হতে পারে সেইগুলিই যেন তাতে বিদ্যমান। (Francisco de Ayale Palacio Atard দ্বারা উদ্ধৃত, "Arbor"-গ্রন্থ, পৃঃ ৭২৪)

"যে বন্ধনীচিহ্ন Westphalia-য় ১৬৪৮-এ প্রথম আঁকা হয়েছে, ঠিক সেইটিই আমরা আজ শেষ করছি।"— লিখলেন perez Embid ১৯৪৮-এ।

"Westphalia: স্পেনকল্পিত ইউরোপের সঙ্গে...... ইউরোপীয় আধুনিকতার বর্ধিষ্ণু শক্তির সংঘর্ষের প্রথম ফল। ১৯৪৮ বিজ্ঞানক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপের সম্বন্ধে স্পেনের হীনতাবোধের জয় এবং—ইউরোপে উদারপন্থার সামগ্রিক ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে—Westphalia অবধি স্পেনদ্বারা সংরক্ষিত নীতিগুলির বিশ্বব্যাপী যাথার্থের পক্ষে এক নতুন প্রাসঙ্গিকতা।" ("Arbor" গ্রন্থ, পৃঃ ৬৮৯)

কিন্তু ১৭-শতকে ফিরে যাওয়ার সংকল্প তাঁদের যদিও এমন এক প্রকৃত স্পেনীয় ঐতিহ্যের খোঁজে যার উৎস থেকে তাঁরা চান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মহত্তের এক নতুন যুগের সুরু এবং সকল স্পেনবাসীকে একত্রিত করার ভিত্তি, তবুও তার অর্থ অতীতাভিযানে নয়। Rerez Embid বলেন, তার অর্থ।

"স্পেনীয় সারপদার্থ থেকে সঠিক সিদ্ধান্তকৃত এক ঐতিহাসিক আচরণের প্রধান রেখাগুলির পুনরাবিষ্কার··· সর্বপ্রকার "Casticism0"-র (সংকীর্ণ স্পেনীয় ঐতিহ্যবাদ) শত্রু (হয়েও), আমরা ঐতিহাসিক সরলাধিক্য-দোষে দুষ্ট হয়ে, আমাদের অতীতের যে অংশ আমরা অপ্রীতিকর মনে করি তা' সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করব না। বাদ না দিয়ে সে-অতীতকে মূল্যায়ন করা ও আমাদের বলে স্বীকার করা পুনর্মোচনের দ্বারা তাকে অতিক্রম করার পক্ষে অপরিহার্য সর্তসূচক।"

অপচয়কৃত ১৯ শতক কিন্তু তাঁদের উপর গুরুভার স্থাপন করে আছে। আভ্যন্তরিক বিভক্তি ও সাগরপারীয় দুর্ঘটনায় আচ্ছন্ন সে-শতাব্দ স্বগৃহে "আড়ম্বরসর্বস্ব casticismo ও হীনম্মন্যবোধের" দ্বারা প্রতিধ্বনিত। (Perez Embid, "Arbor" গ্রন্থ, পৃ: ৬৮৯) "১৮৪৮ এর ইউরোপীয় বিপ্লবের দ্বারা বহুলাংশে স্থাপিত উদার জগতের ধারণার সঙ্গে আবার কোন প্রকার পরিমাণরক্ষায় সুদৃঢ় অস্বীকৃতি এদের পরিষ্কার। স্পেনের নতুন পথ "ঐতিহ্যবিরোধি প্রাগ্রসরবাদ" ও বর্তমান অগ্রাহ্যকারী এক প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের থেকে সমদূরবর্তী।

সাম্প্রতিক স্পেনের ইতিহাসে এতো গোলযোগের কারণ যে ফরাসীধাঁচের অত্যধিক কেন্দ্রীভূতির পুরাতন ভুল, তা' আবার না করা চাই। স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিশেষত্বের বিকাশ চাই, অবশ্য জাতীয় ঐক্যের কাঠামোয়।

কিন্তু উদারতাবিরোধী ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যসন্ধান যথেষ্ট বলে এঁরা ধরেন না। সদর্থক দিকে, এই বুদ্ধিজীবীরা "অপর স্পেন," অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনতিপ্রত্যক্ষ অতীতের দ্বারা রূপায়িত স্পেন সম্পর্কে সহানুভূতি ও হৃদ্যতাসম্পন্ন এক বিশেষ মনোভাবের প্রমাণ দেন, যদিও তাতে অনমুমোদনও বর্তমান। ঐ সকল 'অপর' স্পেনীয়দের কার্যফল বর্তমানের চক্ষে মূল্যায়ন অপেক্ষা তাঁদের আচরণের নিহিতোদ্দেশ্যগুলি দিয়েই তাঁদের বিচার করার ইচ্ছা এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। এইরূপ সহনশীলতাগুণ স্পেনীয় চরিত্রে ইতিপূর্বে বড় একটা প্রবলভাবে দর্শায় না।

এরই সঙ্গে, বর্তমান মানসিক আন্দোলনের গুরু ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকরূপে Menendez Pelayo-কে গণ্য করার এক অসাধারণ মতৈক্য বিদ্যমান। সম্পূর্ণ একলা এবং বিশেষ দুঃসময়ে MenindezPelaya যার প্রতিরূপ ছিলেন, তার প্রতি Perez Embid, "Arbor" এর কার্যসচিব হিসাবে, আলোচ্য পত্রিকাটির সন্দেহাতীত আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। ("Arbor' গ্রন্থ, পৃঃ ৬৯১)

আর এক বিষয়েও ঐরূপ মতৈক্য বর্তমান: তার সীমানার বাহিরে বর্তমান স্পেনের প্রথম কর্তব্যকার্য হল স্পেনীয় আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠন।

আজকের ইউরোপের সম্বন্ধে আলোচ্য লেখকগোষ্ঠীর ধারণা অত্যন্ত হতাশাপূর্ণ, এবং, অপর দিকে, তারা স্পেনের আধুনিক জগতে জীবনোদ্দেশ্য বিষয়ে ঠিক ততখানিই আশাবান, যদিও সে-আশা প্রায় লঘুচিত্ততা ও তারুণ্যের পর্যায়ে পড়ে। ঐরূপে জীবনোদ্দেশ্যের সম্ভবপর সাফল্যের চিন্তা তাঁদের আশার হিসাব-নিকাশে সর্বশেষের লাভাঙ্ক হয়েই থাকে।

"আমরা জানি যে ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়তি-সবশ হয়ে কেবল দুর্ঘটনায়ই পরিসমাপ্ত হয় না। বরং পক্ষান্তরে, সুচৈতন্য কর্মের বিদারণ একটি সংস্কৃতিকে বাঁচাতে পারে ও তার সৃষ্টিশীল শক্তিগুলিকে নবীভূত করতে পারে।" (Calvo Serer, "Arbor"-গ্রন্থ, পৃ: ৭৬৫)

স্পেনের নাট্যাংশ নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন :-

"সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমাদের যাত্রারম্ভের স্থান ইউরোপের অন্য অংশের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, যদিও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে আমরা নিম্নতর।" (Arbor"-গ্রন্থ, পৃ: ৬৯৯)

"বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ইঙ্গ-স্ক্যান দেশগুলি তাদের উদ্যমশীল আশাপূর্ণতা হারিয়েছে, যা' তাদের ল্যাটিনদের ঘৃণা করতে প্রবৃত্ত করত। প্রটেস্টাণ্টইস্‌ম্ অত্যন্ত দুর্বল

দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে……'ধর্মসংস্কার' (Reformation') ও রেনেসাঁস আজকে গত শতাব্দী থেকে বিশেষরূপে প্রভিন্ন আলোয় পরিদৃষ্ট হচ্ছে। স্পেনের ইতিহাস তাই তার প্রকৃত বৈষম্য ও তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হতে সুরু করেছে।" ('A bor'-গ্রন্থ, পৃঃ ৬১৮।

কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে স্পেন একাই নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। সব কটি লেখকই তার শিল্প-কৌশল সম্পর্কে অনুন্নতির কথা ও প্রায় সবপ্রকার বিদ্যার ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌বর্তীতার কথা বলেছেন।

"আমাদের সজাগ, সতর্ক হয়ে বাঁচতে হবে, মনের রাজত্বে সর্বপ্রকার চেষ্টার সঙ্গে পরিচয় রেখে বাস করতে হবে। যা' কিছু মূল্যবান প্রস্তুত করা হবে বা চেষ্টা করা হবে তা আমরা আত্মীকরণ করব এমন ভাবে যা'তে তা' আমাদের সারমর্মে পর্য্যবসিত হয়; এবং আমরা, আমাদের তরফ থেকে, সাহায্য প্রদান করব।" (Calvo Serer, "Arbor"—গ্রন্থ, পৃঃ ৬১৭)

Perez Embid ইউরোপীয় ও স্পেনীয় ঐতিহ্যের ভিতর পুরাতন দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেন এই সংকেত দিয়েঃ "উদ্দেশ্যের স্পেনীয়করণ ও উপায়ের ইউরোপীয়করণ।"

স্পেনের মত "ক্রুসেডীয়"—ইতিহাস ও জীবনোদ্দেশ্য-সম্পন্ন এক জাতির পক্ষে সাধারণ ইউরোপীয় নরমানুষের সঙ্গে সমপদে ও অপমানহীন ভাবে কথোপকথন কষ্টসাধ্য। বিশেষ কতকগুলি পারিপার্শ্বিকাবস্থার বিবিধ পারম্পর্য্যে, স্পেনীয় ক্যাথলিক জাতিটির ইতিহাস প্রায় সর্বানুক্রমে 'অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ও খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের রক্ষার্থে যা' করণীয় তা'র সঙ্গে, স্পেনীয়দের যথার্থ মতে সমপাতকঃ- জাতীয় রাজ্যক্ষেত্র পুনর্দখল (মুর-দের বিরুদ্ধে ক্রুসেড), ভূমধ্যসাগরে প্রসারণ (তুর্কীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড) সাগরপারীয় এক সাম্রাজ্যের জয় (অখ্রীষ্টানদের দীক্ষা-প্রদান), অষ্ট্রিয়াসকলের রাজবংশীয় স্বার্থগুলি (অসনাতন ধর্মীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড), ওলন্দাজ জাতীয়তবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (অসনাতনধর্মমত উচ্ছেদের চেষ্টা), ৩০-বছরের যুদ্ধে পরাজয় (Christendom-এর জন্য আত্মত্যাগ), Napoleon-এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-যুদ্ধ (নাস্তিক বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড), ১৯৩৬ ১৯৩৯ এর গৃহযুদ্ধ (উদারতাবাদ সমাজবাদ ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড, কারণ ঐ প্রত্যেকটিই খৃষ্টধর্মের শত্রু)। ঐরূপ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীদের পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য যে কালো ও সাদার মধ্যবর্তী অনেকগুলি রঙমাত্রা বর্তমান এবং কাস্তিলিয়ান ছাড়াও ভগবান অন্য ভাষা বোঝেন। এমন কি আলোচ্য লেখকগোষ্ঠীও ঐ-ভাবের হাত থেকে সর্বদা রেহাই পান না, যদিও তাঁরা ঐরূপ আত্মনিষ্ঠকর মনোভাবের বিরুদ্ধে সজ্ঞানে লড়ছেন।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েক বছর কাটাবার জন্য যাত্রারম্ভের আগে, ১৯৪৫-এ, Calvo Serer-বিরচিত স্পেনের ইতিহাস সম্পর্কে একটি সর্বসাধারণ প্রবন্ধে এই নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পাওয়া যায়ঃ

"সংস্কৃতির দোলকের আন্দোলনে যা' খৃষ্টান তা' কখন কখন নাকচ করা হয়েছে, এবং, তার সাথে, যা' স্পেনীয় কারণ ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে তার একাত্মভাব রয়েছে; ঐ-কারণেই আধুনিক সংস্কৃতির অভ্যন্তরে স্পেনীয় সংস্কৃতি খৃষ্টধর্মের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে; শেষোক্তটির সম্মান অথবা অসম্মান স্পেনের প্রতি অশ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধারই দ্যোতক।"

("Arbor"—গ্রন্থ, পৃঃ ২)

কিন্তু আজকের দিনেও Calvo Serer যে ঠিক ঐরূপ কথবার্তা বলবেন তা' নয়। অন্যত্র বিপ্লবের উত্তরাধিকারী-রূপ ইউরোপের বর্তমান দূরবস্থাসম্পর্কে—অর্থাৎ "ইউরোপ"-কে সর্বদাই "স্পেন"-এর সন্নিধিতে রেখে লিখতে গিয়ে, Palacio Atard বলেছেন যে প্রকৃত শান্তি সে কেবল তবেই পেতে পারে যদি সে "প্রগাঢ় অনুশোচনাবোধ করে ও তার আচরণের সুনিশ্চিত সংশোধন" করে।

(Arbor"—গ্রন্থ, পৃঃ ৩০০)

Perez Embid, যদিও স্পেনের নব্য জীবনোদ্দেশ্যে উৎসাহী (আমরা সে তথ্যটি উপরন্তু আলোচনায় লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছি) তবুও তার বিপদ সম্ভাবনা সজাগ—অর্থাৎ, "অশিষ্ট ত্রাণকর্তা এবং, কার্যক্ষেত্রে ধর্মগত ও সামাজিক রাজনৈতিক প্রদেশগুলির ঐক্যভ্রম।" ("Arbor"—গ্রন্থ পৃঃ ৭৫১)

স্পেনের আভ্যন্তারক কোন দল-ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে তিনি লিখেছেন :

"যেহেতু আমরা (এখন যে-অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি) একমাত্র সম্ভবপর স্পেনের একটি মাত্র সরল রেখার উপর এসে পড়েছি, সেহেতু আমরা নিজেদের মনে করি [গৃহযুদ্ধে] পরাজিতদের মতবাদ-বিকটত্ব এবং বিজয়ীদের মধ্যে কোন কারণে অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক লোকের দোষ ও কপট-সাধুতার প্রতি একই পরিমাণে বৈরীভাবাপন্ন। আমাদের বিচারে, সূর্য-নক্ষত্রটি বহুদূর উপর থেকে তাপদান করে, স্পেনের ইতিহাসের চেয়ে অনেক উপর থেকে। দ্বন্দ্বারম্ভের মুহূর্তে এইটাই হয়ত আমাদের সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত সৌভাগ্য।" ("Arbor"—গ্রন্থ, পৃ : ৬৯৭)

একজন Unamuno-র আত্মাকে দগ্ধানোর জন্য "স্পেন সমস্যা"—নামে যা কথিত হয়ে আসত তা'র অবসান বোধহয় সবজনস্বীকৃত। তাঁরা বলেন, "সমস্যা"-টির সমাধান হয়েছে, কিন্তু স্পেনবাসী বহু "সমস্যাসকল" দ্বারা সম্মুখস্থ।

"নিজেদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বোধ অনীহার অতল গহ্বরে আমাদের যে জগত টেনে নিতে চায় তা'র সাথে আমাদের সম্পর্কের সমস্যাগুলি [রয়েছে];········ সুদৃঢ় নিয়মানুষ্ঠান [সৃষ্টি করা সমস্যাগুলি]; শিল্পকরণ ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যাগুলি; সামাজিক সংগঠনের সমস্যাগুলি; ······নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের সমস্যাগুলি।" (Calvo Serer, "Arbor"—গ্রন্থ, পৃ : ৭৬৫)

"Arbor"—গোষ্ঠীর লেখকগণ বিশ্বাস করেন যে আভ্যন্তরিক রাজনীতির এক মূল্যবান অন্তর্বর্তীকালের তাঁরা সুযোগ নিচ্ছেন এমন এক মানসিক বায়ুমণ্ডল প্রস্তুত করতে যা' স্পেনের জাতীয় ও ক্যাথলিক ঐতিহ্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়মানুষ্ঠানের সৃষ্টিকার্যে সাহায্য করবে; সাধারণতঃ এঁরা এর বেশী এগোন না। Calvo Serer-ই এর ব্যতিক্রম। তাঁর এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক বুদ্ধিজীবিদের রাজনৈতিক মতবাদ আজকের স্পেনে ভবিষ্যৎ-সৃষ্টিকার্যে অগ্রসর দুইটি কিংবা তিনটি রাজনৈতিক মতের মধ্যে একটি। অন্য রাজনৈতিক ধারাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগলভ অবশ্য "Falange" কিন্তু তার সম্বন্ধে নীতিগত ঐক্য আরোপ আজকে অসত্যাচার। তদ্‌পরিবর্তে দুইটি ধারা তাতে বর্তমান :- একটি ডান পক্ষ, অথবা "Falange Old Guard", Fuhrerprinzip" ও Jose Antonio Primo de Rivera-র "fascist" নীতি আঁকড়ে বসে আছে; এবং একটি, বামপক্ষ, প্রজাতন্ত্র ঝোঁকের, যা'র মধ্যে Pedro Lain Entralgo. Antonio Tovar (Salamanca বিশ্ববিদ্যালয়ের Rector), ও Ruiz Siminez (শিক্ষা-মন্ত্রী) প্রমুখ প্রসিদ্ধ লোকেরাও আছেন। Falangist বাম পক্ষে Lian Entralgo-র অবস্থান প্রমাণ করে যে "Arbor" গোষ্ঠীর লেখকদের একই ও অভিন্ন ইতিহাস দর্শনে বিশ্বাস ফলিতরাজনীতি ক্ষেত্রে উপাদানের প্রভিন্নতা বর্জন করে না।

প্রধানতঃ, ১৯৫২-এ প্রকাশিত, "Teoria de la Restauracion"—নামক পুস্তকটিতেই Calvo Serer-এর রাজনৈতিক মতবাদের পরিচয় মেলে। আলোচ্য "Arbor" গ্রন্থটিতে একটি বিশেষ বাক্য কিন্তু পাওয়া যায়, যা' তাঁর ধারণাগুলির প্রায় সারংসকলনস্বরূপ।

তিনি লিখেছেন :

"স্পেনের ঐতিহ্যজাত রাজনৈতিক মতবাদের নব্য জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী মূল্য [সম্বন্ধে]। সভাসদ্‌বর্জিত একটি রাজতন্ত্র, কিন্তু ঐতিহ্য পূর্ণ, বংশপরম্পরাগত, লোকসভাহীন ও বিকেন্দ্রিকৃত।" ("Arbor" গ্রন্থ, পৃ : ৭৬৪)

এর সঙ্গে আমার যদি এই তথ্যটি যোগ করি যে তাঁর পুস্তকটি থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্রস্তাবিত রাজতন্ত্রটি প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বিপ্লববাদ, ঐ উভয় পন্থার ঊর্দ্ধে অবস্থিত একটি গতি নেবে এবং তার সামাজিক-নীতিই তার প্রধান অধিকারপত্রস্বরূপ হবে—তা' হলে আমরা বুঝতে পারব যে প্রস্তাবিত প্রত্যানয়নটি নিম্নোক্ত বস্তুগুলির সম্মেলনে :- Carlist-রা যে-বংশের রাজার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন সে-বংশের একজন রাজা এবং তার সঙ্গে Carlist-দের রাজনৈতিক মতবাদ, ২০ শতাব্দের সামাজিক সদ্‌বিবেক ও রাজনৈতিক চিন্তার একপ্রকার ঐতিহ্য যা' Burke ও

Gorres-এ সুরু হবে, আমাদের কালে, Peter Wust ও Charles Maurras-এ শেষ হয়েছে।

টীকা-টিপ্পনীর যৎসামান্য উপরের আলোচনায় আমরা চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছি স্পেনের একটি বিশেষ generacion এর ইতিহাসবিদ্‌দের মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থানীয় এবং প্রতিনিধিস্থানীয় এই গোষ্ঠী তাঁদের দেশের অতীতকে কি চোখে দেখেন। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, তাঁরা বর্তমানের স্পেন এবং বিশ্বকে কি ভাবে দেখেন তারও কিছুটা ধারণা দেওয়া আবশ্যক। সাধারণত আলোচ্য-গোষ্ঠী সফলকাম হয়েছেন—তাঁদের স্পেনীয় পূর্বগামীদের অপেক্ষা অনেক বেশী সফল—তাঁদের বর্তমান সম্পর্কে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য দ্বারা অতীতের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করার দুরভিসন্ধি রোধ করে। আমাদের বিনীত অভিমত, ভারতীয় ইতিহাসবিদদের পক্ষেই শুধু নয়, রাজনীতিবিদ এবং সাধারণ চিন্তাশীল দেশ-প্রেমিকদের পক্ষেও তাঁদের এই মানসিক চেষ্টার অভিজ্ঞতা সবিশেষ লক্ষণীয় এবং তাঁদের উদ্যম পূর্ণরূপে অনুকরণীয়।

---

1. "Arbor"—Revista General de la Investigacion y la cultura, Madrid.

2. Historia de Espana, Estudios publicados en la Revista ARBOR, Madrid, 130 ptas··· বিভাগ: 1) **Espsna en la Antiguedad,**
2) **La Espana Visagoda,**
3) **La Espana Medieval,**
4) **La Espana de los Reyes Cato' licos y de los Austrias,**
5) El siglo XVIII,
6) Espana en las Indias,
7) El siglo liberal,
8) Valoraciones actuales de la Historia de Espana.

3. (Higher Council of Scientific Research.)

4. Espana como Problema. Seminario de Problemas Hispanoamericanos' Madrid, ১৯৪৯। "Arbor"—গ্রন্থে, পৃ: ৫৮৮-৮৯, Perez Embid—দ্বারা উদ্ধৃত।

5. ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে Kachiavelli র নামে সাধারণত জড়িত হলেও তা' অধুনা পরিত্যাজ্য; Karl Brandi-র "Kaiser Karl V" (Quelleu und Erorterungen Volll; Munich, 1941)-এ সাম্রাজ্যিক বাদানুবাদে "De Monarchia"-র ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

6. Derrota, agotamiento y decadencia en la Espana del siglo XVII. **Madrid, Rialp,** ১৯৪৯।

ওরে আমার কাঁচা

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

(১)

হতভাগ্য বিপত্নীক চিরঞ্জীব হতাশভাবে দেখলেন সত্যিই কিছুই তাঁর করবার নেই। সারা দিনমানের অচল অলসকে অপসারিত করে সন্ধ্যা বেলায় বসতে লাগলেন গিয়ে পার্কটার উত্তরে তাঁরই মতো অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের দলে। সেখানে গিয়ে দেখলেন সকলের মুখে একই ধরণের কথা—কি করে সারা জীবন কেটেছে, আগেকার দিনে ছিল সবই সস্তা, এখন সবই মাগ্‌গি। আর অতি বৃদ্ধরা বলেন আরও আগেকার কথা। সে যেন রূপকথার মতো মনে হয়। তখনকার মেয়েদের পাল্কীতে গিয়ে চড়বার হ্রস্ব অবকাশটুকুতে যে সূর্য্যদেব উঁকি মারবেন সে যোটিও ছিল না। ঘোমটার বিস্তৃতি কোন্ পাড়ায় বা কোন্ পরিবারে কত দীর্ঘ ছিল তারই হিসাব করতে এ যুগের অতিবৃদ্ধরা মনোনিবেশে মেতেছেন। এ কালের মেয়েরা মাথা খুলে চুল এলিয়ে হাত দুলিয়ে রাস্তায় চলে। পরামর্শ চলে রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একালের' একটা দ্বিতীয় ভাগ এঁরা লিখবেন।

চিরঞ্জীবের এসব আলোচনা ভাল লাগে না। তাঁর নিজের অবস্থাটা যেন কারো সঙ্গে খাপ খায় না। তাঁর পরিস্থিতি যেন সকলের পরিপন্থী। তিনি এ সব কথায় কান না দিয়ে তাকিয়ে থাকেন পার্কের অপর প্রান্তে যেখানে ছোট ছোট শিশুর দল দোলনায় দুলছে বা কচি ঘাসের গালিচায় গড়াগড়ি দিয়ে কোলাহল করছে।

পৃথিবীর ঊর্দ্ধস্তরে এমন একটি মহাকাশে গিয়ে উপনীত হওয়া যেতে পারে যেখানে গেলে পৃথিবীর আকর্ষণ আর থাকে না, আর অন্যগ্রহের ফাঁদেও তখন পর্যন্ত পতিত নাও হতে পারা যায়। সকল প্রকার আকর্ষণের অতীত এই অবস্থান-টুকুর মধ্যে এসে পৌঁছেছেন চিরঞ্জীব ত্রিশঙ্কু রাজার মতো। যখন দেখলেন পৃথিবীর যাবতীয় কর্তব্য সমাধান হয়েছে, সংসারের সুখ-দুঃখের সহস্র রকমের হাবুডুবু সবই সাঙ্গ হয়েছে, যে কন্যারত্ন ক'টি ছিল সকলকেই যথাবিধি—যথাসাধ্য বা সাধ্যাতীতরূপে সমর্পণ করা গেছে, যখন দেখলেন পুত্র যথেষ্ট রোজগার করছে এবং পুত্রবধূ দিব্যি সংসারের ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে বললে "বাবা" আপনি এইবার বিশ্রাম করুন, আপনাকে আর কোন বিষয়ে ভাববারও অবসর দেবো না আমরা, আপনি সব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোন।" তখন চিরঞ্জীব বুঝলেন বিরাট অবসরের একটা জগদ্দল পাথরের মতো তাঁর বুকে মুখে চেপে বসে পড়লো, দম আটকাবার মতো। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় বা। এ বিশ্রাম বুঝি আসন্ন অনন্ত বিশ্রামের পূর্বে গঙ্গাযাত্রীর অবসরটুকু! ফাঁসীর পূর্বকার কাম্য প্রিয় বস্তুর আলিঙ্গন বা।

(২)

আধুনিক প্রথামত প্রসূতির পরিচর্যা ও যাবতীয় কর্তব্য সেবাসদনেই সম্পন্ন হয়েছে। কৃতী পুত্র এতটুকু ত্রুটি হতে দেয়নি। সেবাসদনের শ্রেষ্ঠ কামরাটা রিজার্ভ রেখেছিল। নার্স দাই সবই বৌমা ও সদ্যপ্রসূত কন্যারত্নের সেবায় ঘড়ির কাঁটার মতো চলেছে অর্থের দম খেয়ে। চিরঞ্জীবের পুত্র পূর্বেই বলে রেখেছিল, 'বাবা? তুমি কিছু ভেবো না, আমিই সব ব্যবস্থা করে ফেলবো।" আর করেওছিলো তা। হাসপাতালে নবপ্রসূতা কন্যা ও প্রসূতিকে দেখতে যাবার সময়ও পিতাকে প্রতিদিনই বলে গেছে, "বাবা" তোমাকে কষ্ট করে যেতে হবে না, আমিই গিয়ে দেখে আসছি।" এই বলেই মোটরে গিয়ে উঠেছে একা, আর বৃদ্ধ বাপ কষ্ট করে মোটরে না চড়ে আরামে হেলতে দুলতে সুদূর পার্কটার উত্তরের সেই বৈঠকে গিয়ে উপনীত।

পট পরিবর্তন সইতে হবে বই কি। চিরকালই কি একইভাবে যায়? আমাদের কালে যা ছিল তা-ই যে চরম থাকা তা কে বলবে? হ্যাঁ, অন্তরে শক্তি চাই। কাজ করবার শক্তি ছিল সারা জীবন, তাই বহু কর্তব্য অবলীলায় ক'রে এসেছেন এত কাল। আজ কাজ না করে অলসে অবস্থান করবার প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন অন্তরে। সেই শক্তি লাভের সাধনায় আজ তিনি বসেছেন। অতীতকে সম্পূর্ণ মনে রেখেও সহনশক্তি, বর্তমানকে সম্পূর্ণ সমাদরে গ্রহণ করবার শক্তি, ভবিষ্যতের দিকে—হ্যাঁ, অজানা অনিশ্চিতের দিকে নির্ভয়ে ঝুঁকে পড়বার চমকচুম্বি শক্তি চাই তাঁর আজ। তারই সাধনা এই একক জীবনে। বিধাতা দয়া করেই তাঁকে একাকী করে দিয়েছেন। সাধনার অনুকূল অবস্থা।

(৩)

বহু দাস দাসাতে ভরা ও মাঝে মাঝে দমকা আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের বন্যায় প্লাবিত, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনীর এই বিরাট বাড়ীটাতে তিনি নিতান্ত একা। বহু কর্মে বহু লোক প্রতিদিন ব্যস্ত, তাঁর করবার কিছু নেই। বালিকা নাতনীর পরিচর্যায় এবং নবাগত শিশু নাতিটির রক্ষণাবেক্ষণে আয়া দাই সব এসেছে। তাদের খেলাধূলার সরঞ্জামে সারা বাড়ী পুষ্পিত। নাতিনাতনীদের সারা দিবসের রুটিন পরিচারিকাদিগের দ্বারা এমন নিরেট করে ঠাসা যে তার এমন কোন অসাবধান ফাঁক থাকে না যেখান দিয়ে কোনো পিতামহ উঁকি মেরে হাত লাগাতে পারেন। পিতামহ তাই তাঁর নিজ শক্তি সাধনায় নিবিষ্ট। এমনি করে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটে। পুত্র পুত্রবধূর কড়া নিয়ম সর্বত্র।

(৪)

কিন্তু বিধাতার ব্যবস্থাপনায় সাধকের আত্ম-প্রত্যয়রূপ অভিমান এসে যখন আবির্ভূত হয়, তখন তিনি বুঝি একটু হেসে অবস্থার একটু পরিবর্তন ক'রে দেন। বুঝি তিনি বলেন, "এই তৃণগাছটি এইখানে স্থাপন করলাম, তোমার শক্তি দিয়ে উড়াও দেখি এটিকে।"

দ্রোণাচার্য্যের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঘৃণিত, অস্পৃশ্য একলব্য বনের গভীরে ধ্যানস্তিমিত। অকস্মাৎ পিছন থেকে এসে কে করলে স্পর্শ অস্পৃশ্যকে? একলব্য চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখে—একটি মৃগশিশু! আহা, কী সুন্দর? সুন্দর এই মৃগশিশু, সুন্দর তার অজ্ঞান নির্ভীক মন। আর সুন্দর এই স্পর্শ—যে স্পর্শ অস্পৃশ্যকে সবাই করে রেখেছে পৃথক। একলব্য পুলকিত হয়ে উঠলো।

অচলায়তনের দীর্ঘ ছয় বৎসরের রুদ্ধ উত্তরের জানলাটা অকস্মাৎ একদিন কে যেন দেয় খুলে।

চিরঞ্জীব বেরুচ্ছিলেন সেদিন সান্ধ্য-ভ্রমণে। গেট পেরিয়ে রাস্তায় কিছু দূর গেছেন এমন সময় পিছনে দ্রুতপদ-ক্ষেপের শব্দ শুনে ফিরে দেখেন তাঁর নাতনীটি ছুটে আসছে এবং এসেই তাঁর একখানা হাত শক্ত করে ধরলো নিজের দুটি কচি হাতের মুঠোর মধ্যে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "চল দাদু, আজ যাবই তোমার সঙ্গে বেড়াতে। রোজ তুমি কোথা যাও দেখবো চল।" বৃদ্ধ ত অবাক হয়ে বিরাট দৃষ্টিটা মেলে তাকিয়ে থাকেন বালিকার দিকে। কিন্তু দৃষ্টিটা পর-মুহূর্তেই পড়ে গিয়ে আরও পিছনের দিকে। আয়া বাবুর্চি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে পালিয়ে-আসা কয়েদীর পিছু। পাকড়াও করে আবার পিঞ্জরে পুরতে না পারলে তাদের চাকরীই বা যায় আজ!

কিন্তু বালিকা শিখা অগ্নিশিখার ন্যায় রুখে দাঁড়ালো। হিন্দী, ইংরেজী ও বাংলা মিশিয়ে হুকুম করে বললে—যেন শিবানীর ত্রিশূলের খোঁচা দিয়ে—"তোরা আবার ছুটে এলি কেন? যা যা ফিরে যা শীগ্‌গির। তবু দাঁড়িয়ে রইলি, আমার হুকুম যা বলছি। চিরঞ্জীব অবাক হয়ে নাতনীর বলবার ভঙ্গী ও হুকুমদারী রঙ্গ দেখতে লাগলেন। এ যেন দেবী চৌধুরাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ। এ হেন হুকুম না মেনে পারবে কেন দাস দাসীরা। তারা যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লো। শুধু মনিবের তাড়া খেয়ে সুট্‌ সুট্‌ করে চলে গেল কিন্তু বাপ মায়ের কাছে বালিকার কপালে আজ দুঃখ আছে সেই তথ্যটা ভাল করে বোঝাতেও কসুর করলো না।

বালিকা নির্ভীকচিত্তে জবাব দিল, আমি দাতুর সঙ্গে যাচ্ছি, একলা যাচ্ছি না। তোরা বরং খোকাকে দেখ্ গিয়ে পড়ে-টড়ে না যায়। তারা ভাবতে ভাবতে যায়—সত্যি ত, এক কয়েদী উধাও, অপরটি না অনর্থ বাধায় কিছু।

এইবার শিখা তুই হাতে দাতুর হাতটা উল্লাস ভরে ঝাকানি দিয়ে বলে, "জান দাতু, আমাদের ক্লাশের উমা বলে তার দাতুর সঙ্গে তার নাকি 'খুব ভাব।' তার দাতু ঘোড়া হয়, আর সে তাঁর পিঠে চ'ড়ে বসে, বলে হ্যাট হ্যাট। আচ্ছা দাতু! তুমি ঘোড়া হতে পার?"

খুব পারি, কিন্তু তুই আসিস কোথা দিদিমণি আমার কাছে?

"এখন থেকে আসব। কিন্তু তুমিই পালিয়ে পালিয়ে থাক। আর যা গোমরা মুখ করে থাকো সারাদিন! আবার খুব ভোরে যে দিন উঠেছি হঠাৎ, দেখেছি পূবপানে মুখ করে চুপ করে বসে আছ যেন বুদ্ধদেব।"

চিরঞ্জীব সাহাস্যে নাতনীকে কাছে টেনে নিয়ে গালে হাত বুলোতে বুলোতে চলতে থাকেন। তারপর বলেন, "আজ রাতে তোর বাপ মায়ের কাছে খুব বকুনি খাবি দিদি। জানিস্?"

শিখা গম্ভীর মুখ ক'রে বলে "জানি।" তারপর চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকে। যেন মনে মনে পাল্টা জবাবের খসড়া গুছিয়ে নিতে থাকে।

কিছু পরে পার্কটাতে এসে পড়ে তুজনে। বসন্তের হাওয়া ছুঁয়ে গেছে গাছপালার চূড়ায় শস্পাস্তরণের গালিচায়। দাতুর হাত ছেড়ে দিয়ে প্রথমটায় মারলে একটা লম্বা দৌড়। পার্কের অপর প্রান্তে পৌছে একটু কদমতালে নৃত্যের ভঙ্গীতে আসে ফিরে। চিরঞ্জীব তৃপ্তির দৃষ্টি মেলে ভাবতে থাকেন—যেন হরিণ ছানা! ওর ঘন ঘন স্ফীত পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, ভাল লাগছে এ জায়গাটা?"

ঝাঁকরা চুলের গুচ্ছ তুলিয়ে শিখা উত্তর দেয়, "খু-ব।" চিরঞ্জীব তুই হাতের আবেষ্টনে বেঁধে ফেলেন নাতনীকে—যেন হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি। ভাবেন তবে কি আজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলো। তা ত নয়, এও ত ক্ষণভঙ্গুর। এ বুঝি তবে উষর পথের একটি মরূদ্যান! এটি না হলে যে আমার পথ চলা চলে না। আবার এ বুড়োকেও না হ'লে কচির চলে না। কিন্তু ওর বাপ মা এ কথা বোঝে না। তারা চায় বুড়ো বাপকে সকল কর্ম হতে অবসর দিতে, তাঁকে কোনো ঝঞ্ঝাটে যেন না আসতে হয়। ইচ্ছা, তাদের মঙ্গল ইচ্ছা সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ইচ্ছা ভ্রান্তি-ভরা। আর একটা তাদের মনে হয় এই যে তাদের ধারণা এই, দাতুর কাছে বেশী আদর পেয়ে ছোটরা আতুরে হয়ে যায়। কিন্তু সূর্যের কিরণ ও মেঘের বর্ষণ তু-ই যে চাই চারা গাছ গজিয়ে উঠতে এ কথা তারা বোঝে না।

(৫)

গৃহ আজ বিচারালয়।

—"কারুকে না বলে আজ বেড়াতে চলে গেলে কেন, শিখা?"

—"দাতুর সঙ্গেই ত বেড়াতে গেলাম, বলবো কা..., বাবা?"

মেয়ের মুখে এমনতর সাফ্ নির্ভীক জবাব মা বাবা পূর্বে কখনো শোনে নি। তুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

—"দাতুর সঙ্গে ত তুমি বেড়াতে যাও না।"

—"এখন থেকে রোজই যাবো দাতুর সঙ্গে।"

নিজের যাবার ব্যবস্থা নিজেই ক'রে বসলো এই জোরালো কয়েকটা কথা দিয়ে। মা বাবা চমকে উঠলো তার এই ঔদ্ধত্য দেখে। পিতা তখন স্তব্ধ হয়েই রইল। মাতা এইবার শুরু করলো "কেন তুমি ত আমার সঙ্গে রোজ যাও, এখনও তাই যাবে। মিছে কেন তোমার দাতুকে বিরক্ত করবে?"

—"মোটেই উনি বিরক্ত হন না, ওরও খুব ভাল লেগেছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে। তাই না দাতু?"

এই বলে দাতুর দিকে তাকায়। তিনি হেসে নাতনীর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

না তুমি দাতুকে খাটাতে পাবে না। কে এমন করে?

—"হ্যা, মা, উমা তার দাতুর সঙ্গে বেড়াতে যায়।"

—"উমার বাড়ীতে লোকজন নেই, তাই তার দাদুকে যেতে হয়। তোমার ত আম্মা রয়েছে।"

—"আম্মাকে আমি বিদায় করে দেবো।"

এইবার তার মা গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে। এ যে বাড়ীর কর্ত্রীর আসন নিতে চায়! পিতা তখন ধমক দেন—"শিখা!"

শিখা কোনো কথা না বলে দাদুর গা ঘেঁষে ব'সে পড়ে এবং মুখখানা তাঁর বিপুল বুকের মধ্যে গুঁজে দেয়। দুই চোখ থেকে জল ঝড়ে পড়তে থাকে। বৃদ্ধর আঁখিও শুষ্ক থাকে না—ঝাপসা হয়ে যায়। তিনি নাতনীকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে অপর হাত বুলোতে থাকেন তার অশ্রুসিক্ত সুডোল কপোল দুটিতে। শিখার মা বাবা হতাশভাবে বসে থাকে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে দু'বছরের ছেলেটি। দাদুর কাছ থেকে দিদি প্রচুর আদর আদায় করছে দেখে সেও অনাস্বাদিতপূর্ব অথচ পরমাকাঙ্খিত দাদুর আদরটুকুর আশায় তাঁর হাটু দুটো জড়িয়ে ধরে। আর দাদুও আগ্রহ-ভরে তাকে এক হাতেই তুলে নেন বুকের কাছে। অপর হাতখানা ছিল কিনা শিখাকে জড়িয়ে।

এর পর পিতামাতাকে রণে ভঙ্গ দিতে হলো।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন ও বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

বাংলাদেশে শিক্ষাসংস্কারের ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি ভাগে ফেলা যায়। প্রথম: ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির পাঠন। দ্বিতীয়: বাংলাভাষাকে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা, তৃতীয় স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন ও চতুর্থ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার বিলোপ। সংস্কারের এই প্রতিটি বিভাগেই নেতৃত্ব করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বস্তুতঃ শুধুমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তির জন্যই 'বিদ্যাসাগর' নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের প্রথম কলেজ ফোর্টউইলিয়ম কলেজ। লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। ইউরোপ থেকে সিভিলিয়নদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওয়েলেসলী এই কলেজ স্থাপন করেন। ১৮১১ সালে লর্ড মিন্টোর রিপোর্টে বাংলাদেশে একটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। ১৮১৪ সালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে চুঁচুড়াতে একটি ইংরেজীস্কুল স্থাপিত হয়। পরের বছরেই শ্রীরামপুরে কেরী ও মার্সম্যানের যুগ্ম প্রচেষ্টায় একটি কলেজ স্থাপিত হল। আর ১৮১৭ সালে স্থাপিত হল হিন্দুকলেজ। হিন্দু কলেজের সূচনায় যাঁরা সক্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম স্মরণীয়।

১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তখনও রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত। ১৮২৩ সালে তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড আমহার্ষ্টকে লেখা তাঁর চিঠি শিক্ষাবিপ্লবের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। তখন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান করাই ছিল ইংরেজ সরকারের নীতি। রামমোহন এই নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যমে করতে চেয়েছিলেন। ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা। এই সংস্কৃত কলেজেই নিঃশব্দে তাঁর শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ করছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তখন ঠিক তার পাশাপাশি ভবনে হিন্দুকলেজে শিক্ষক ডিরোজিয়োর অনুসরণে একটি নতুন দল গড়ে উঠেছিল, যারা ইয়ং বেঙ্গল বলে নিজেদের পরিচয় দিতো। ইউরোপীয় আচার-ব্যবহারের পুরোপুরি সমর্থক এই দলটি শুধু যে সুরাপান ও নিষিদ্ধ-মাংস ভক্ষণ করেই ক্ষান্ত ছিল তা নয়, তারা যা কিছু ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক তাই খারাপ—এইকথা প্রমাণ করবার চেষ্টায় সর্বদা সোচ্চার ছিল। এদের মধ্যেই একজন সেদিন বলেছিল—If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism. অপরদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ—যারা শুধুমাত্র ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যয়নেই নিজেদের পণ্ডিত বলে ভাব্‌তো—তারা সমস্ত কিছু সংস্কারের বিরোধী। তারা শুধু মনুসংহিতার চর্চাকেই শাস্ত্রচর্চা বলে ভাব্‌তো এবং এককথায় চরম প্রগতি-বিরোধী ছিল।

এরই মধ্য দিয়ে ধীরগতিতে সূর্যের মত বিকাশ ঘটছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। এবং দেখা গেল যা কিছু অন্যায়, যা অসত্য ও সমাজ-মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের বিরোধী তারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, অন্যদিক থেকেও তাঁর শক্তি গঠনমূলক। একহাতে যেমন ভাঙছিলেন অন্যহাতে তেমনি তিনিই গড়ছিলেন। শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে তাঁর রিপোর্ট, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, বাংলাভাষাকে পাঠ্য করে তোলা এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার সবদিকেই সজাগ ও সক্রিয় নেতৃত্ব তাঁর। শিক্ষাবিভাগে থাকার সময়ে হুগলী বর্দ্ধমান নদীয়া ও মেদিনীপুরে পঁয়ত্রিশটি বালিকাবিদ্যালয়, অনেকগুলি নর্মাল স্কুল ও স্কুল তিনি স্থাপন করেন। কিন্তু আদর্শগত বিরোধে ১৮৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা-বিভাগ ত্যাগ করে যখন বেরিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র, আর্থিক দিক থেকে তখন তিনি নিঃস্ব। শুধু নিঃস্ব বললে সব বলা হয়না, তাঁর ব্যক্তিগত দান ও ব্যয়ের জন্য তিনি প্রচুর ঋণ করেছেন। সেই ঋণের ভারে তিনি বিপর্য্যস্ত।

কিন্তু দেশ ও সমাজকে যিনি নতুন করে গড়তে এসেছেন, তাঁকে স্তব্ধ করবে কে? পারিপার্শ্বিকতার কোন চাপেই তিনি নত হন না। বিশ্বস্ত সৈনিকের মত তিনি জয়ধ্বজাকে বহন করে নিয়ে যান।

চাকরি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা পেলাম মেট্রোপলিটান কলেজ। সরকারী সাহায্য ছাড়াই যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত; কোন ইংরাজ অধ্যাপক না রেখেও যে কলেজ প্রথমশ্রেণীর কলেজরূপে পরিগণিত, যা সেদিনের রাজপুরুষবৃন্দকে বিস্মিত করেছিল।

১৮৫৯ সালে কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উদ্যমে "ক্যালকাটা ট্রেনিংস্কুল' এর প্রতিষ্ঠা। এঁদের মধ্যে ছিলেন বৈষ্ণবচরণ আঢ্য, গঙ্গাচরণ সেন প্রমুখ। কয়েকমাসের মধ্যেই পরিচালনার কাজে নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় এঁরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে যান এবং বিদ্যাসাগর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরূপে যোগদান করেন। ১৮৬১ সালে এঁদের মধ্যে মতভেদ গোলমাল হওয়ায় বিদ্যাসাগর স্কুলের ভার পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নেন। স্কুলের সম্পাদক হিসেবে প্রথমেই তিনি নিয়মাবলী প্রণয়ন করলেন। নিয়মাবলীর প্রথমেই ঘোষণা করলেন—The object of the Institution is to give an efficient elementary education to Hindu youths in the English as well as the Bengali language and literature. বিদ্যাসাগর অতঃপর নিয়মাবলীতে মাসিক মাইনের হার ঠিক করে দিলেন। মাইনের হার ছিল শিশু-বিভাগে একটাকা, অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীগুলিতে দুইটাকা ও উচ্চশ্রেণী সমূহে তিন টাকা। এছাড়া আধুনিক বিদ্যালয়-গুলিতে যে ভাবে পরিচালনার কাজ করা হয়ে থাকে, অনুরূপভাবেই নিয়ম তৈরী করলেন বিদ্যাসাগর। স্কুলের উদ্বৃত্ত অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্য ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলে এ্যাকাউন্টও খোলা হল। ১৮৬৪ সালে স্কুলের নাম বদলিয়ে করা হল মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আবেদন পাঠিয়ে বিদ্যাসাগর অনুরোধ করলেন বি, এ ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠনের অনুমতি দিতে। বিশ্ববিদ্যালয় সে আবেদন মঞ্জুর করলেন না। বললেন—বাঙ্গালীর এখনও ইংরেজী কলেজ পরিচালনা করার ক্ষমতা হয়নি। এর বছর দুই পরে পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও হরচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করায় সমস্ত দায়িত্ব বিদ্যাসাগর একাই গ্রহণ করলেন। ১৮৭২ সালে তিনি পুনরায় আবেদন পাঠালেন। এই সময় রেজিষ্ট্রার ছিলেন সাটক্লিফ সাহেব। বিদ্যাসাগর অনুমোদন চেয়ে যে আবেদন-পত্রটি দাখিল করলেন তাতে তিনি ছাড়াও সই দিলেন—দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল। বিদ্যাসাগর অতঃপর সিণ্ডিকেটের সদস্য E C Bayley-র কাছে একটি ব্যক্তিগত পত্র দিয়ে তাঁর যুক্তি প্রদর্শন করলেন। এই বেলে সায়েবের চেষ্টাতেই অনুমোদন পাওয়া গেল—কিন্তু এফ এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়াবার জন্য।

অনুমোদন পাওয়া গেল বটে কিন্তু কেউই তখন বিশ্বাস করতে রাজী ছিল না যে, নেটিভ্ কলেজে নেটিভ শিক্ষকের দ্বারা ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আপন সংকল্পে সুদৃঢ় পুরুষ বিদ্যাসাগর। কোন বাধাই তাঁর কাছে বাধা নয়। জীবনে হতাশ হওয়ার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নেটিভ কলেজ থেকেই ছাত্রেরা এফ এ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করলো।

অতি পরিশ্রমে ও মানসিক পীড়নে বিদ্যাসাগর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলেজের সমস্ত ব্যয়ভার তখন তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদি কেনার খরচ ছাড়াও বছরে তাঁকে তিনহাজার টাকা দিতে হয়। কলেজ তুলে এনেছেন নিজের বাসভবনে—৬৩ নম্বর আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে। কারণ শঙ্কর ঘোষ লেনে জায়গা নেই। তা ছাড়া কলেজে বি এ ক্লাস পর্য্যন্ত অনুমোদন পেতেই হবে। প্রতিষ্ঠান যাতে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে তার জন্যও তাঁর একান্ত উদ্বেগ। তিনি কলেজ পরিচালনার জন্য হেয়ার স্কুলের তরুণ শিক্ষক সূর্য্যকুমার অধিকারীকে মনোনীত করেন। "সূর্যবাবুকে ঐ পদ পরিত্যাগ করাইয়া মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সূর্যবাবু প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করেন, অনেক বাদানুবাদের পর দাদার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ও অনুরোধ

এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। সূর্যবাবু হেয়ার স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর জীবন চরিত।)'

সূর্যবাবু কলেজের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর হাতে কলেজের পুরো দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাঁকে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে মনোনীত করেন। তাঁর চেষ্টাতেই ১৮৭৯ সালে বি এ ক্লাস খোলা হয়। ১৮৮১ সালে অর্থাৎ প্রথম বছরেই ষোলজন ছাত্র বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। কলেজের পক্ষে এ এক মহা-গৌরবময় সাফল্য। ১৮৮৪ সালে ল ক্লাস খোলা হলো এবং ১৮৮৫তে বি এ'তে অনার্স পড়ানোর ব্যবস্থা করা হল। মেট্রোপলিটান কলেজ ফার্ষ্টগ্রেড কলেজ বলে স্বীকৃত হল। শুধু তাই নয়, কলেজের এতই কলাফল ভাল হল যে ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাঅধিকর্তার রিপোর্টে কলেজ সম্বন্ধে লেখা হল :

In the B. A. Examination the Govt Colleges passed 43.8 percent, the aided college 40 percent while the un-aided Metropoliton Institution passed 45.3 percent. The success of the Institution reflects great credit on its manager and the teaching staff. এডুকেশন কমিশন তার রিপোর্টে লিখলো : Natives have shown their capacity for maintaining institutions of a very high type and keeping up a very high standard of education.

সুকিয়াষ্ট্রীটের মোড়ে আমহার্ষ্টষ্ট্রীটের ৬১, ৬২ ও ৬৩ নম্বর বাড়ী তখন বিদ্যাসাগর ভাড়া নিয়েছিলেন। ৬৩ নং বাড়ীতেই কলেজ বসতো। কিন্তু পরে অসুবিধে হওয়ায় কলেজের নিজস্ব ভবন তৈরী করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অধ্যক্ষ সূর্যবাবুর চেষ্টায় শঙ্কর ঘোষ লেনে প্রায় ত্রিশহাজার টাকা দামে কলেজের জন্য জমি কেনা হয়। এই জমির ওপর প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয়ে কলেজের ভবন নির্মিত হয়। এই ভবন নির্মাণের জন্য বিদ্যাসাগরকে বহু টাকা ঋণ করতে হয়েছিল। এই কলেজের প্রসঙ্গেই কিছু দিন পরে C E Buckland তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Bengal under the Lieutenant Governors"-এ লেখেন—The establishment of the Metropolitan Institution in Calcutta in 1864, and its successful working under his management as a first grade college, are well-known to the educational history of Bengal."

বিদ্যাসাগর চরিত্রের অদম্য জেদ ও প্রবল পুরুষকারের ফলেই সেদিন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাকে তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে বর্ণনা করে যা বলেছিলেন সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করেই এই নিবন্ধটি সমাপ্ত করছি। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোক হিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূর সম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসেনা, এই বুদ্ধি..... দ্বিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মত কাজ করিয়া যায়।"

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৫—১৯৩৩)

হাসিরাশি দেবী

উনিশ শতকের বাংলায় যে কয়জন শিক্ষাবিদ এবং সমাজ-সংস্কারককে দেশ ও দশের কল্যাণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়,—৺মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল (বাংলা, ১১ই বৈশাখ ১২৭২) মুরলীধর জন্মগ্রহণ করেন হাবড়া থানার অন্তর্গত খাঁটুরা' নামক গ্রামে। (২৪ পরগণা)

কিছুকাল পযন্ত এই অঞ্চল যদিও 'কুশদ্বীপ বা কুশদহ নামে পরিচিত ছিল কিন্তু বর্তমানে তার কোন চিহ্নিত সীমারেখা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে, যেটুকু অনুমান করা যায়—তাও ইংরাজ আমল থেকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড আকারের এবং জেলার অন্তর্গত রূপে।

খাঁটুরার উত্তর পাড়ায়, যে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ মুরলী-ধরের জন্ম, সেই বংশের আদি পুরুষ পূর্বে সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে জানা যায়; পরে এই অঞ্চলেরই বেড়েলা-বৈঁচি গ্রামে বসবাস স্থাপনা করেন এবং তাঁর পরবর্তী পুরুষ আনুমানিক ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে খাঁটুরা গ্রামবাসী হন।

এই বংশের প্রায় সকল সন্তানই শাস্ত্রালোচনা ও অধ্যাপনাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দুই একজন আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসক হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেন এবং এই বংশোদ্ভূত কবি রামধন তর্কবাগীশের নাম এখনও যে অতীতের কথককুলের প্রাতঃস্মরণীয়,—একথা স্বীকারে বাধা নাই।

এই বংশেই মুরলীধরের জন্ম এবং তাঁর পিতার নাম ধরণীধর শিরোমনি, ও মাতার নাম জগত্তারিণী দেবী। মাতামহের নাম মহামহোপাধ্যায় ভগবানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

মুরলীধর বাল্যকালেই পিতৃহীন হন, তার পিতা ধরণীধরের যে সময়ে মৃত্যু হয়, তখন মুরলীধরের বয়স দশ বৎসর মাত্র।

পারিবারিক প্রথানুযায়ী গৃহ-শিক্ষকের দ্বারায়, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে মুরলীধরের প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুরু হয়, পরে খাঁটুরা, মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও গোবরডাঙ্গা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র হন।

চার বৎসর পরে, অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসর বয়সে গ্রাম ছেড়ে আসেন কলকাতায়, এবং তাঁর পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন।

উচ্চ শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ নিয়ে তিনি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন, ঐ শ্রেণী অনুযায়ী বয়স কিছু বেশী হলেও নিজের চেষ্টা ও যত্নে তিনি প্রতিবৎসর ডবল প্রমোশন লাভ করে বয়সের ঐ ত্রুটি পূর্ণ করেন এবং ঐ স্কুল থেকেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই, এ' পাশ করেন, এবং সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, পাশ করেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত নিয়ে এম, এ তে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন!

নানা অসুবিধার জন্য ছাত্রাবস্থা থেকেই মুরলীধরকে সংসার পালনের যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল, তার জন্য প্রথম জীবনে তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়ে—

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনের আশানুরূপ সময় করে উঠতে পারেন নাই।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় তিনি কটকের র‍্যাভানশ কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ বার বৎসর কাল উক্ত কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃত পাঠনের কাজে ব্যাপৃত থাকেন

কটক থেকে কলকাতার কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এবং ঐ সময় থেকে তাঁর প্রিয় সংস্কৃত কলেজ, ইংরেজী, সংস্কৃত, ইতিহাস ও শাস্ত্রে সমান দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনা করেন।

ঐ কাজে নিযুক্ত থাকা কালে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ঐ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং পরে অধ্যক্ষের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ঐ ছাড়াও,—তাঁর নিভৃত সাধনালব্ধ যে অগাধ পাণ্ডিত্য তা' তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় একটি বিশেষ রূপপরিগ্রহ করে, এবং সেই মৌলিক চিন্তাধারার কিছু অংশের প্রকাশ দেখা যায়--তাঁর—রচিত পুস্তকে।

মুরলীধরের রচিত পুস্তকের সংখ্যা অল্পই কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর এত স্বাতন্ত্রের পরিচয় স্পষ্ট। এর একটি প্রমাণ—যে তিনি নিজে শিক্ষাব্রতী থাকলেও শিক্ষার্থীকে কেবল মাত্র তার স্মরণশক্তির সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ বা তার অন্ধ অনুকরণ করার সমর্থন তিনি কখনও করেন নাই—এ সম্বন্ধে প্রথাগত শাস্ত্রীয় উপদেশ দানেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। মানুষ মাত্রেরই বোধশক্তির বিকাশ ও অনুশীলনের দ্বারায় জ্ঞান লাভের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল।

এমন কি ছোটদের বর্ণশিক্ষালাভের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণেরও তিনি বিপক্ষে ছিলেন। ছোটরা যাতে আরও সহজে এবং সাধারণ ভাবে বর্ণশিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য তিনি এক নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এই শিক্ষাপ্রণালীকে The genetie Methad of teaching the Bengali Alphabet বা জনানুক্রমিক পদ্ধতি নাম দেন ও এই প্রণালীতে বাংলা অক্ষর পরিচয় নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন।

এ ছাড়া—বিভিন্ন বিষয়,—যেমন সাহিত্য প্রবেশ (বাংলা সাহিত্য সংকলন) রচনা এবং The Desinammala of Hemachandra একটি প্রাকৃত ভাষার দুষ্প্রাপ্য অভিধান ও Sanskrit Grammar of Thibaut' গ্রন্থের আমূল সংস্কার করেন।

হেমচন্দ্রের দেশী নামমালা" গ্রন্থটি ঐ সময় দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত Pischel এই গ্রন্থটির সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। পরে মুরলীধরের সম্পাদনায় এই প্রসিদ্ধ ও দুর্মূল্য গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়!

মুরলীধরের স্বাধীন ও সরল চিন্তাধারার বেশীর ভাগ প্রকাশ ঘটেছিল তার দার্শনিক গবেষণায়; এই বিষয়ে তাঁর বরাবরের আশা ছিল, বিশ্বের সকল দর্শনশাস্ত্রের তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করা ও তার একটি ইতিহাস রচনা।

এর জন্য তিনি যে বিশেষ রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন, তার নাম দেন "জনানুক্রমিক আলোচনা;

মুরলীধরের স্বাধীন চিন্তাধারা একদিকে অপরিসীম জ্ঞান-তৃষ্ণায়, নিভৃত গবেষণার পথে এই ভাবে এগিয়ে চললেও আর একদিকে জনসমাজ ও তার ভবিষ্যৎকল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে ছড়িয়ে পড়েছিল অসংখ্য কাজের মধ্যে।

নূতন প্রেরণায় জাতির ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠন করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সমাজ-সংস্কারের যে সমস্ত কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তার জন্য তাঁকে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম যে সমাজ-সম্মেলনীর বৈঠক হয়,—তার সভাপতির ভাষণে মুরলীধর হিন্দুধর্মের বিরাটত্ব সম্বন্ধে বলেন:

"মন্ত্র ও উপনিষদাত্মক শ্রুতি যে ধর্মের মূল বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম যাহার শাখা, গীতা পুরাণ ও তন্ত্র যাহার সমন্বয়, তাহা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নহে।'

(আশা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মারক পুস্তিকা; পৃঃ ৮)

এই নির্ভীক ও স্বল্পভাষী মানুষটি যখন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্যাটেল আইন অনুযায়ী অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করেন

তখন তাঁর বিপক্ষে সংস্কার-বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনা ও কর্ম্মপথের বহু বিঘ্ন দেখা দেয়; যার জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুরলীধরকে সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, এবং এই কারণ সে সময়ের বিদ্বজ্জন মণ্ডলী ও সংস্কারপন্থী বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ রূপে আলোচনার সৃষ্টি করে।

এই বিষয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন—:

"মুরলীধরের সমাজ সংস্কার বিষয়ক কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে, সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত গো-ব্রাহ্মণ পালক, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয় আচার, দেশাচার ও লোকাচারে পরম হিন্দু বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের কাজ ছাড়িয়া অবসর লইতে বাধ্য করেন।

ইহা কি সত্য?"

(প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ; ১৩৩১ পৃ—২৮২)

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় নিখিল ভারতীয় সামাজিক সভার অধিবেশনে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

সেই সময়ের জনসমাজে, সমস্ত উৎপীড়ন ও লোক-নিন্দার ভয় বর্জন করে মুরলীধরের পরিচালনায় 'বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কার সমিতি যেমন বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থায় অগ্রসর হয়, তেমনি এই সকল কাজের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব সানন্দে পালন করেন মুরলীধর নিজেই।

এই সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন—

"পণ্ডিত মহোদয়ের সহৃদয়তা, সত্যনিষ্ঠ ও সৎসাহস অতীব প্রশংসনীয়।"

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১,—পৃ…২৮২)

সমাজজীবন সম্বন্ধে মুরলীধরের মতামত ছিল পারিবারিক জীবনের উপর সামাজিক জীবন নির্ভর করে, সামাজিক জীবনের উপর ধর্ম্মজীবন নির্ভর করে; এবং রাজনৈতিক উন্নতি বা অবনতি এই সকলের সম্মিলিত ফল, অথচ তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থা রাজনৈতিক জীবনের উপর নির্ভর করে। সমাজ শব্দ এই ব্যাপক অর্থে লইলে সবগুলিই সমাজ জীবনের অন্তর্গত হয়! মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর সমাজ সংস্কার সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ)

শুধু সমাজ নয়, শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁর মতামত এই যে—

"স্ত্রী পুরুষের শিক্ষা সামঞ্জস্যের অভাবে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিরোধ ও অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এবং তাহার জন্য উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে—স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাব জ্ঞানালোচনার অভাবে অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে।

(মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—৪৭)

হিন্দুধর্ম্মের উদার আদর্শ ও বিরাট সমাজনীতির প্রসারতার বদলে সংরক্ষণশীল মতবাদের প্রচলিত পন্থার বিরুদ্ধে মুরলীধরকে যে অবিচলিত সঙ্কল্প নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল, একমাত্র সেই কারণেই তিনি I, E, S, হতে পারেন নাই।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে বহুদিনের কুসংস্কার ও অন্যায় হিন্দুসমাজের প্রাণশক্তিকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে চলেছিল। এই সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে—"ভি, জি প্যাটেল ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইন সভায় অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে আইনের প্রস্তাব (The Hindu marriages Validity Bill) করেন। কিন্তু আইন সভার অভ্যন্তরে ও বাইরে রক্ষণশীল মতের সমর্থকেরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

(মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা—৪২)

এই সম্পর্কীয় যুক্তিতর্কের পুনরুল্লেখ না করে কেবল যাঁরা বিলের বিপক্ষতাচরণ করেন মোটামুটি ভাবে তাঁদের সংখ্যার উল্লেখ করছি—

"এই প্যাটেল বিলের বিরুদ্ধে ১০ মহারাজা, ২২ রাজা, ৬ নাইট, ১৩ মহামহোপাধ্যায়, ৯-আইনসভার সদস্য, ৯০০—এর বেশী গ্রাজুয়েট, ৪০০ আইনজীবি এবং ২০০ ডাক্তার সরকারের নিকটে আবেদন পেশ করেন।

(মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ ৪৩)

সারাজীবনের উচ্চাশা ও সাধনার পথে বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মুরলীধর কখনও একদিনের জন্যও কর্ম্মহীন ভাবে সময়ের অপচয় করেন নাই ; শিক্ষা-বিভাগও পরিত্যাগ করেন নাই।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রাকৃত সাহিত্যের এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সংস্কৃত পাঠনের দায়িত্ব বহন করেন।

দার্শনিক গবেষণালব্ধ রচনার আকাঙ্খা মুরলীধরের মনে বহুকাল আগে থেকেই বাসা বেঁধেছিল—তার জন্য জনানুক্রমিক আলোচনা" বা the Genetic Method এর প্রয়োগ-রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু জনকল্যাণকর নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এই ইতিহাস রচনার কাজ শেষ করতে পারেন নাই। বইখানির একটি খসড়া বা তার Synopssis প্রস্তুত করেন।

"তা ছাড়া তাঁর বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে একটি পরিচয় এবং গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ পর্যন্ত রচনা করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর পক্ষে গ্রন্থ রচনার পরিশ্রম করা সম্ভব হয়নি। ঠিক হয় মুরলীধরের Synopsis কে ভিত্তি করে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরলীধরের তৃতীয় পুত্র) এই গ্রন্থ রচনা করবেন ,......

মৃত্যুর পূর্বে এ গ্রন্থ রচনার কাজ যে শেষ হয়েছে তা তিনি শুনে যান।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১০ শে নভেম্বর মুরলীধরের দেহাবসান হয়।

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

1st January, 1922. ইংরেজী মতে আজ নববর্ষ। কাল মাঝরাতে প্রবল কোলাহল করে এই দিনটিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন অনেকে।

স্কুলের ছুটি অনেক দিন হয়ে গেছে, দিনগুলো ঘরে বসে একরকম কাটছে।

আমাদের Fraternity চলছে একরকম, যদিও মাঝে একটা বেশ বড় গোছের গোলমাল হয়ে গেল। সেটা সামলাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হল। ১৭ই ডিসেম্বর একটা অধিবেশন হয়েছিল। সেদিন লোকজন অনেক হয়েছিল, মেয়ে ত অনেকগুলিই। সেদিন প্রশান্ত একটা প্রবন্ধ পড়ল রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের লেখা সম্বন্ধে। ভালই হল, তবে শ্রোতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের রচনা ক'জন পড়েছেন তা জানি না।

২৩শে তারিখে আর একটা meeting হল। সেদিন কথা ছিল প্রশান্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে নিয়ে আসবে। সভাও আরম্ভ হল, কিন্তু মহামান্য অতিথির দেখা নেই। অগত্যা তখন আর একজন সদস্য তাঁর একটা লেখা পড়তে আরম্ভ করলেন, তাঁকে আগে থেকে বলা ছিল। প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছেছেন এমন সময় প্রশান্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসাবার পর তিনি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একখানা ছোট বক্তৃতা দিয়ে চলে গেলেন। বক্তৃতা ত অবশ্যই ভাল হল, কিন্তু তখনও হাতে ঢের সময়, কি করে কাটান যায়? পূর্বোক্ত সদস্যটি আবার তাঁর বক্তব্য সুরু করলেন এবং ভাল ভাবেই শেষ করলেন। সেই সময় একজন অপ্রত্যাশিত অতিথির অভ্যর্থনার ব্যাপার নিয়ে খানিক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। প্রায় Tempest in a tea cup। এ হাঙ্গাম মিটতে সময় লাগল। বাক্যব্যয় করতে হল অনেক। প্রশান্ত, আমি আর সুশোভন একবার পদত্যাগও করলাম। তারপর সমস্ত সভ্যদের সমবেত গভীর চেঁচামেচিতে আবার সেটা প্রত্যাহারও করলাম। সে এক তাজ্জব ব্যাপার।

তখন ব্যাপারটাকে খুবই সাঙ্ঘাতিক মনে হয়েছিল, তবে যখন দেখলাম যে সেটা বিশেষ কোন bitterness রেখে গেল না, তখন সবাই নিশ্চিন্ত মনে সেটা ভুলে গেলাম।

মাঝে ২৪শে এক হরতাল হয়ে গেল। মোটের উপর নির্ব্বিবাদে দিনটা কেটেছিল এই ঢের, একেবারে নির্ব্বিবাদে আর হতে দিল কই? কতগুলো বাজে লোক যদি অত হৈ হৈ না করত ত আরো ভাল হত। কাল সারা দুপুরটা দুটো art exhibition দেখেই কাটালাম। Oriental Art Exhibition টা 22nd December আগে একবার দেখেছিলাম। হেমুকে নিয়ে প্রথমবার গিয়েছিলাম। লোকজন বেশী ছিল না, ঘুরে ফিরে দেখলাম। দিদির ছবিও ছিল। অনেকগুলি যথার্থ সুন্দর ছবি দেখে ফিরলাম, সবগুলির চিত্রকরের নাম চেনা নয়। কাল কিন্তু দুটো প্রদর্শনীতেই এত ভীড় ছিল যে ভাল করে enjoy করা গেল না কিছু। তবে বাড়ীর অনেকে এবং বন্ধুবান্ধব কয়েকজন দল বেঁধে গিয়েছিলাম, কাজেই বেড়ানর দিক্ দিয়ে ভালই লাগল। আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীতে প্রথমে গিয়ে সেখানকার কুরুচির displayতে বিরক্তই হয়ে উঠতে হল। একপাল ছোট ছেলের সঙ্গে গিয়ে সে এক বিপদ্! তবে রং চং খুব, প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকগুলি বেশ সুন্দর ছিল। সমবার ম্যানসনস্-এ আর একবার গেলাম; সেখানে দেখি চেনা লোকেরই ভীড়। সিদ্ধান্তরা দুই ভাই গিয়েছিলেন, ভাবী কুটুম্বিনীদেরও দেখলাম। ছবি প্রায়ই সব দেখাই, তবু আর একবার দেখলাম। Paris Exhibition এ যে-সব ছবি যাবে তা

বাছা হচ্ছিল, দিদির একখানা ছবি চিহ্নিত হওয়াতে হেমুর আনন্দটা বড় সরবে প্রকাশ পেয়ে গেল।

2nd January. খুব নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়ান হচ্ছে, যদিও সেগুলি খুব বেশী উপভোগ করছি মনে হয় না। তবে চেনা শোনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎটা খারাপ লাগে না। ২৮শে December একজন খোকাবাবুর জন্মদিনে গিয়ে খুব খেয়ে এলাম। গল্পগাছা খুব হয় বটে, কিন্তু invariably কিছুক্ষণ পরে non-co-operation নিয়ে তর্ক বেধে যায় এবং মাঝে মাঝে মারামারি হয়ে যাবার উপক্রম হয়।

এর পরদিন আবার গড়পারে গেলাম, সেখানেও জন্মদিনের ব্যাপার। সেখানেও সেই রাজনৈতিক তর্ক। এক ভদ্রমহিলা অতিরিক্ত রাজভক্তি দেখিয়ে আমাকে বেজায় চটিয়ে দিলেন। তাঁকে একটা lecture দিলাম, তাতে তাঁর রাজভক্তি কমল কিনা জানি না। খাওয়া হল, দুচারটা গানও হল। তারপর মিনিদের সঙ্গে বাড়ী ফিরলাম, গঙ্গার ধার ইত্যাদি ঘুরে। তখনও Prince of Walesএর আগমন উপলক্ষ্যে যে illumination হয়েছিল তার খানিক খানিক ছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেগুলো চোখে পড়ল।

তারপর বাবলির জন্মদিনে তাদের বাড়ীও একদিন খাওয়া গেল। সেই একই দল, তবে এখানে গল্পটা জমল ভাল। বাড়ী ফিরবার জন্যে গাড়ী ডাকতে হবে না কাজেই নিশ্চিন্ত মনে বসে অনেক রাত অবধি আড্ডা দেওয়া গেল।

কিন্তু গাড়ীর ভাবনা আজই যেন ভাবতে হল না। এর পর ত সমাজ পাড়ায় আসতে হলে গাড়ী ডাকতেই হবে। এবাড়ী ছেড়ে যাওয়া ত ঠিকই হয়ে গেল। দাদার বিয়ে হয়ে গেলে এখানে আর কুলোবে কি করে? কাজেই গড়পারে বড় বাড়ীতে উঠে যাচ্ছি। কলকাতায় এসে অবধি এই বাড়ীতেই আছি, এতদিনে পাট উঠল। অনেক জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু ঘুরে ফিরে এইখানেই ফিরে এসেছি। এরপর আর এখানে ফিরব না। মনে করতেও কি রকম লাগে, বিশ্বাস হয় না। কলকাতার এই বিশেষ একটা ছোট্ট কোণ, চোখ তাকালেই সেটা আর দেখতে পাব না। আর এই সরু গলিটার মায়া জীবনে বোধহয় কোনদিন কাটাতে পারব না।

25th January 8 Rammohan Roy Road.

জীবনের আসল অংশটা যেখানে কাটালাম, সে ঘর ত ছেড়ে এলাম। আসবার দিন কি ভারই মনের উপর চেপেছিল। ঠিক তিন-চার ঘন্টা আগে জানলাম যে, সেদিনই আমাদের বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। জিনিষপত্র গোছান তার আগে থাকতেই হয়ে ছিল। বাড়ীময় সব লণ্ডভণ্ড ছড়াছড়ি, পরিচিত ঘরের চেহারা ক্রমেই অপরিচিত হয়ে আসছে। প্রতিবেশীরা একজন দুজন করে বিদায় নিতে আসছেন।

যাবার সময় হল, সমস্ত বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে নেমে এলাম। নীচে এসে হেমুকে বলে রাখলাম next Fraternity meetingএর সব ব্যবস্থা করে রাখতে। অতঃপর গাড়ী ছেড়ে দিল। সেদিনটা ছিল শনিবার, বোধ হয় 7th January। নূতন আস্তানায় পৌছে দেখলাম, সব খোলা প'ড়ে। একটা বিরাট্ শূন্য বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় গিয়ে উঠলে কি রকম যে লাগে তা বর্ণনা করা শক্ত। একে বাসযোগ্য করে গুছিয়ে তুলতে অনেকখানি খাটতে হবে বুঝলাম, কিন্তু খাটার ইচ্ছাটাই তখন মন থেকে চ'লে গেল। সমস্ত বাড়ীটা একবার ঘুরে এলাম। কোনো কিছুই ভাল লাগল না। বিষম একটা desolation মনকে চেপে ধরল।

যাই হোক, রান্নাবান্না করতে হবে, খেতে হবে, ঘুমোতেও হবে। রান্নাঘরে উনান জ্বালান হতেই সেই ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। রান্নাঘর জায়গাটার মেয়েদের মনের উপর একটা প্রভাব আছে। একটু না একটু comfort এখান থেকে পাওয়াই যায়। তার উপর বন্ধু-বান্ধব দু-একজন এসে গল্প ক'রে গেল। রাতটা যেখানে সেখানে শুয়ে প'ড়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠে ঘরের ভিতর একটুখানি শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠতে হল। সকালেও দুচারজন বন্ধু এসে নূতন বাড়ী দেখে গেল। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, এই বাড়ীতেই আমরা ঘরকন্না পাততে এসেছি, মনে হচ্ছিল যেন দু-এক মাসের মত বেড়াতে এসেছি, বেড়ান শেষ হলেই পোট্‌লা পুঁটলি বেঁধে নিয়ে সেই গলির কোণের ছোট

নানাভাবে সাহায্য করল। নিমন্ত্রণ করার কাজটা করল বেশীর ভাগই হেমু এবং ছোটমামা।

বিয়ের দিনটা মন্দ লাগল না, যতক্ষণ যাওয়ার আয়োজন হচ্ছিল। কত লোকজন আসছে, বেশ একটা উৎসবের ভাব। বরযাত্রীর দল যা বেরোল তা প্রায় সনাতনীদের বরযাত্রার দলকেও হার মানায়। একটা গড়ের বাদ্যি সঙ্গে ছিল না এই যা তফাৎ। দাদাকে এতখানি সাজগোজ করে বেশ নূতন মানুষ মনে হচ্ছিল। সে এমনিতেই খুব সুন্দর দেখতে, তার উপর এত সুসজ্জিত। বাঙালীর ঘরে এত ভাল দেখতে বর ক'টাই বা দেখা যায়?

আমাদের সঙ্গে নিমন্ত্রিতা মহিলা বেশী ছিলেন না, তাঁদের সহজেই সামলে নেওয়া গেল। ছেলের দল জুটেছিলেন প্রচুর। যাঁদের উপর তাঁদের অভ্যর্থনার ভার ছিল তাঁরা খানিক হাবুডুবু খেলেন। এ পাড়ায় আমরা ত একেবারে নূতন, কাজেই আশে পাশের বাড়ীগুলির যত অধিবাসী ছিলেন, সবাই জানালা, দরজা, ছাদ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে কি উৎসুক ভাবে সব দেখছিলেন তা বলবার নয়।

যখন মহা সোরগোল করে গাড়ীতে চড়ছি তখন কে একটা হতভাগা রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হায়, হায়, আমার কবে বিয়ে হবে গো।" এমন হাসি পেয়েছিল। রাস্তা জুড়ে সার দিয়ে যখন বেরোন গেল তখন অদ্ভুত লাগছিল বেশ, যদিও মজাও লাগছিল। বরের ফুল দিয়ে সাজান গাড়ীটা দেখলাম মাঝ পথে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সঙ্গ নেবার জন্যে।

কনেদের বাড়ী ত পৌছলাম। এদের সঙ্গে এতকালের আলাপ পরিচয় যে ঠিক বরের বাড়ীর কুটুম্বের মত behave করতে পারিনি বোধহয়। কেমন যেন সব unreal লাগছিল। আমাদের বেশী করে সবাই খাতির করছে, তাতে হাসিও পাচ্ছিল। ফিরতে অনেক রাত হল।

পরদিন বৌ আনার কথা। আমি আর হেমু গেলাম বৌ আনতে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। বৌ সাজল গুজল, উপাসনা হল, জলযোগ হল, বিদায় নেওয়া হল, তারপর বেরোন গেল। বাড়ী পৌছে দেখি আলপনা দেওয়া, গেট সাজান সব ভালই হয়েছে কিন্তু আর কিছু হ'ল না। সোজাসুজি বৌকে ঘরে তুলে নেওয়া হল। পরদিন ফুলশয্যার তত্ত্ব এল ঘটা করে, তবে বৌভাত হল পাঁচ ছ'দিন পরে। বৌভাতের আগের দিন থেকে এমন গোলমাল সুরু হল যে কান পাতা দায়। বাড়ীর লোক যত না চেঁচাল, দাদার বন্ধুরা তার পাঁচ গুণ চেঁচাল, তবে তারা খেটেও ছিল খুব। তরকারি কুটতে যখন সন্ধ্যাবেলা মহিলা-সমাগম হল, তখন বুঝলাম, হ্যাঁ, বিয়ে-বাড়া বটে! অনেক ছোট বাচ্চা এসে খুব জমিয়ে তুলল। বৌভাতের দিনের গোলমাল মনে করলে এখনও মাথার ভিতর ঝন্ ঝন্ করে। সারা সকাল গেল তরকারি আর মশলার ব্যবস্থা করতে, দুপুরে নাডু পাকান, আর বিকেল থেকেই অভ্যর্থনা। বৌকে নীল আর silver সাজে বেশ দেখাচ্ছিল। Thompson সাহেব বাঁকুড়া থেকে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে entertain করবার সব ভার আমাকেই নিতে হ'ল। কত যে বাজে বকলেন ভদ্রলোক তার ঠিক নেই! অবশ্য শ্রবণযোগ্য গল্পও ঢের করেছিলেন। খুব daisppointed হতে হল তাঁকে এক দিক্ দিয়ে। অনেক বন্ধুকে meet করবেন ভেবে এসে ছিলেন কিন্তু এতই আগে এসেছিলেন যে বন্ধুর দলের কেউই এসে পৌছয়নি। অগত্যা খেয়ে দেয়ে বিদায় হলেন। মাকে বললেন, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ করি।"

লোকজন খুব হয়েছিল, খাওয়ানো দাওয়ানোও হল lavish ভাবে। অনেক মিষ্টি বেঁচে গেল। তার খানিক একটা অনাথআশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন বাবা। বাকিগুলির সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও চাকর-বাকরদের মধ্যে অনেকে কাত হলেন। যাক্, সব ভাল যার শেষ ভাল। সকলেই সেরে উঠল মানে মানে। বাড়ীর একজনের বিয়ে হ'ল ত আরো দুজনের বিয়ের গুজব চারিদিকে রটে গেল।

বৌভাত চুকবার পর ক'দিন গেল গায়ের ব্যথা মরতে আর বাড়ীঘর ঠিকঠাক করতে। অভ্যস্ত grooveএ

জীবনটাকে আবার চালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ঠিক আগের মত যে আর চলবে না এটা বুঝতেই পারলাম।

February মাসের শেষ শনিবারটাতে বোধহয় এক-বার Four Arts Clubএ ঘুরে এলাম। নিমন্ত্রণ ত বহু দিন থেকে standing, কিন্তু যাওয়া হ'ল এই প্রথম। সেদিন তাদের musical evening ছিল। হেমুকে কর্ণধার করে যাওয়া গেল, কারণ বাড়ী আর কেউ চিনি না। বাড়ীর সামনে নেমে হেমু যখন গাড়োয়ানকে পয়সা দিচ্ছে তখন দু-চারটি ছেলে বেরিয়ে আমাদের দেখে গেল। চেনে না বলে অভ্যর্থনা করতে সাহস করল না। তারা ভিতরে গিয়ে একজন চেনা মানুষকে ডেকে আনল। তার সঙ্গে ভিতরে গিয়ে বসলাম। চেনাশোনা নারী ও পুরুষ আরো কয়েকজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই গল্পসল্প করতে লাগলাম। যখন সব অভ্যাগতগুলি এসে পৌঁছল তখন দেখা গেল যে, আমাদের Fraternityর দলই প্রায় বাড়ী জুড়ে ব'সে আছি, যারা নিমন্ত্রণ করেছিল তারা একে-বারে হারিয়ে গেছে।

প্রথমে যে ঘরে বসেছিলাম সে ঘর ছেড়ে উঠে তদপেক্ষা বড় একটা ঘরে যাওয়া হল। নেপথ্য থেকে গান বাজনা করে আমাদের entertain করা হল। আমাদের দলের একটি যুবক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে খাওয়াটাও নেপথ্যে হবে কিনা। অবশ্য তা হয়নি এবং solo কয়েকটা গান নিমন্ত্রিতদের সামনে এসেই হয়েছিল।

শেষ গান হল "ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।" ভাবলাম, ঘরে ফিরবার বেলা এ মন্দ আশীর্বাদ নয়। জলযোগ হ'ল, গল্পগাছাও হ'ল আরও কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে চললাম। ট্রামেই ফিরলাম এবার।

25th April শোনা গেল Miss Stella Kramrish নাম্নী একজন ইউরোপীয় মহিলা সমবায় ম্যানসন্স্-এ একটা বক্তৃতা দেবেন। ইনি বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত, তাই ভাবলাম একটু গিয়ে শুনে আসা যাক। আর কিছু না হোক নিশ্চয়ই অনেক চেনাশোনা মানুষের সঙ্গে দেখা হবে।

তবে গিয়ে যাদের দেখব ভেবেছিলাম, তাদের কাউকে বিশেষ দেখলাম না। যে-সব শ্রোতারা ঘর জুড়ে বসে ছিলেন তাঁরা artএর বিষয় বিশেষ কিছু বোঝেন বলে মনে হল না। বক্তৃতাকারিণী ভালই দেখতে, বলেনও ভাল। প্রতিমা তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতঃপর আর-একজনের গাড়ী চড়ে বাড়ী ফেরা গেল।

Fraternityর meeting নিয়মিত হয়ে চলেছে। লোক বাড়ছে, সদস্যরা সবাই co operate করতে সুরু করেছেন, কাজেই প্রোগ্রাম করবার কোনো অসুবিধা হয় না। লেখক লেখিকা অনেকগুলি আমাদের দলে, তাদের সকলেই প্রায় এক-একদিন কাজ চালাবার ভার নিয়েছিলেন। আমরা দুই বোনেই গল্প পড়েছিলাম, মণীন্দ্রলাল বসুও একদিন পড়লেন। গল্পের নাম "সব পেয়েছির দেশ" এবং নায়িকার নাম সাকী। বন্ধুবর হিরণ কুমার সান্যাল বললেন যে, তিনিও একটি লেখা পড়বেন, সেটার নাম হবে "কিছু না পাওয়ার দেশ" এবং নায়িকার নাম হবে "ফাঁকি।"

আর একদিন একজন উদীয়মান লেখক একখানা অতি realistic গল্প পড়ে সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে একেবারে হতবুদ্ধি করে দিলেন। এমন ব্যাপার ঘটবে তা কেউ ভাবেনি। অবশ্য ওটা swallow করে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব ছিল না।

এরই মধ্যে একদিন একটা বিয়েও হয়ে গেল, জানা-শোনার মধ্যেই। সেদিন আবার ছিল "হরতাল", কি কারণে তা ভুলে গেছি। যাক, হরতালটা ৪টার সময় সমাপ্ত হওয়াতে যাওয়ার অসুবিধা হল না। বিয়ে যেমন হয় তেমন হল, বিশেষত্ব কিছু ছিল না। খেতে বসে দেখলাম, দুতিনজন পরিবেশনকারী যুবক ভোক্তাদের পাতে খাবার না দিয়ে তাঁদের মাথায় দেবারই বেশী পক্ষপাতী। ভয়ে ভয়ে রইলাম, কখন আবার আমার নিজের অভিষেক হয়ে যায়। সুখের বিষয় সেটা আর হল না।

রবীন্দ্রনাথ এসে একদিন ঘুরে গেলেন, কিছু বললেন. গানও দুচারটে হল।

আজ অপ্রত্যাশিতভাবে একবার Sir Jagadish Chandraর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গিয়েছিলাম অবশ্য বেবুদির সঙ্গে দেখা করতে। সে তখন phone করতে ব্যস্ত, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলল, "কি গো, তোমরা সব কেমন আছ ?" ফিরে দেখলাম স্বয়ং জগদীশচন্দ্র। তাঁকে প্রণাম করাতে তিনি এত বেশী আদর করলেন যে একটু অপ্রস্তুতই হয়ে গেলাম। আবার নিজেই বললেন, "জান, নাতনীদের আমি ভয়ানক spoil করি।" তাঁর সঙ্গে এবং লেডী বোসের সঙ্গে খানিক গল্প করে বাড়ী ফিরলাম। স্যার জগদীশ কোথায় যাচ্ছিলেন, নিজের গাড়ীতেই আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

১২ই এপ্রিল Four Arts Clubএর নিমন্ত্রণে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে অনেক গান গল্প বেড়ান ও খাওয়া হ'ল। আরো দু-একজনকে সঙ্গে নিতে হ'ল, সেখানে কিছু দেরি হ'ল। তারপর এমন এক পক্ষীরাজ-বাহিত ছ্যাকড়া গাড়ীতে উঠলাম যে, কতক্ষণে যে পৌঁছব গন্তব্য স্থানে তা প্রায় ঠিকই করা গেল না। চলেছে ত চলেইছে। বাঙালী পাড়া, মুসলমান পাড়া, ফিরিঙ্গী পাড়া সব পার হলাম কিন্তু আলিপুরের বাগানের আর দেখাই নেই। ব'সে ব'সে ঘুম এসে যাবার জোগাড়, কথাবার্ত্তাও কেউ কিছু বলছিল না। রোদ থাকতে বেরিয়েছিলাম, একেবারে ভরা সন্ধ্যার সময় গিয়ে বাগানের দরজায় দাঁড়ালাম। সামনেই দেখলাম, কালিদাস নাগের বড়মামা বিজয়চন্দ্র বসু মহাশয় দাঁড়িয়ে, তিনিই প্রথম অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "নিমন্ত্রণকারীর দলের কি এসেছেন কেউ ?" তিনি বললেন "কই; কেউ আসে নি বোধহয়।" ভাবলাম এমন্দ নয় নিমন্ত্রিতদল এসে গেল অথচ নিমন্ত্রণকারীরা কোথায় রইল বসে। বিজয় বাবুর স্ত্রী বাগানে বসে আছেন দেখে তাঁর কাছেই গিয়ে বসলাম। এই সময় গোকুলচন্দ্র নাগ আবির্ভূত হলেন এবং দূরেও আর একদল ভদ্রলোককে দেখা গেল। মহিলারাও বেশ কয়েকজন এসে গেলেন। সেইখানে বসে গল্প করার চেষ্টাটা খুব সফল না হওয়াতে সবাই বেড়াবার জন্যে উঠে পড়ল। বাগানে এসে যদি বেড়ানই না হল ত হল কি ? বুলা বাঁশি নিয়ে এসেছিল, সে বাজাতে বাজাতে চলল, যদিও চিড়িয়াখানার দু চারটি চিড়িয়া এতে সরবে আপত্তি তুলল, তাদের বোধ হয় তখন ঘুমের সময়।

বেশ ঘন্টাদেড়েক বেড়িয়ে সভাস্থলে ফেরা গেল এবং চা খাওয়াও হল, যদিও চায়ের পক্ষে তখন বেশ late। তারপর ঐ অতখানি পথ টিকোতে টিকোতে বাড়ী ফেরা গেল।

May, 1922, গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেছে। ছুটির ভিতর ক' দিন বাইরে বেরিয়েছি বা বাইরের লোকের মুখ দেখেছি তা আঙ্গুলে গুনে বলা যায়। স্কুল বন্ধ হওয়ার আগের দিন মেয়েরা বাসন্তীদিকে farewell দিল। স্বর্ণদি হঠাৎ মারা যাওয়ায় বাসন্তীদিই এতকাল তাঁর হয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজে officiate করেছিলেন। অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবের জন্যে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়। বেশ চলছিল, হঠাৎ তাঁর মা বাবা এক বর ধ'রে নিয়ে এলেন, বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। অতএব বাসন্তীদি আমাদের ছেড়ে চললেন। চামেলীদি (জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের নূতন অধ্যক্ষা) মেয়েদের মাথায় কি এক tableau করা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তারা এখন সুবিধা পেলেই tableau করে। মেয়েদের বুদ্ধি আছে, তারা ঠিক করল উমার তপস্যা তাদের subject হবে। গোড়ায় "ধ্রুব" বলে একটা ছোট অভিনয় করল। tableau খানা মন্দ হয় নি, তবে উমা মহাদেবের দিকে ভাল করে তাকায়নি। শেষের scene এ tableau আর অভিনয় মিলে গেল। ছবির মত দাঁড়ানও হল আবার উলু দেওয়া, হই চড়ান, শাঁখ বাজানও হল। অতঃপর জলযোগ। কবিতা পড়া, address দেওয়া হল।

এর পরদিন বাসন্তীদির সহকর্ম্মিণীরা মিলে তাঁকে বিদায় ভোজ দিলেন। তাঁকে আলতা পরান হল বলে আমরাও সকলে আলতা পরে ফেললাম। খাওয়া-দাওয়া চেঁচামেচি গল্প সবই প্রচুর হল, তারপর নিরানন্দ মনে যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

July, 1922. বেশ অসুখ বাধিয়েছি। একেবারে ৯৯এর ধাক্কা। রোজ সকালে জ্বর ছাড়ছে আর বিকেলে উঠছে। কেউ ভেবেই পাচ্ছে না যে আমার কি হল। ডাক্তাররাও না। শুয়ে শুয়ে বেজায় ক্লান্ত আর নির্জ্জীব হয়ে গেছি।

জুলাই মাসে শেলীর শত বার্ষিকীর সভায় সভাপতিত্ব করতে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। শয্যাগত তখন, সে অবস্থায় সভায় যাওয়া ত হলই না, জোড়াসাঁকোতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যে দেখা করে আসব তাও পারলাম না। আমার অসুখের কথাটা তাঁর কানে গিয়ে থাকবে, নিজেই একদিন আমাকে দেখতে এসে উপস্থিত হলেন। মাসখানেক খালি ৯৯ জ্বর উঠছে, বাড়েও না, ছাড়ে ও না, শুনে বললেন, "এ আবার কি? একটা decent রকম অসুখও করতে পার না? এই রকম জ্বরে শুয়ে থাকতে ত লজ্জা হওয়া উচিত।"

সমাপ্ত

অপচয়

।। গল্প ।।

সমর বসু

সিপ্রা দেখল,—ছোড়দা জানালার ধারে এসে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোড়দার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে সিপ্রা দেখতে পেল,—দূরে বড় রাস্তা দিয়ে খাঁকি প্যান্ট এবং খাঁকি জামা-পরা একটি লোক এগিয়ে আসছে। হাতে কতকগুলো কাগজ-পত্তর। একটু কাছে আসতেই —সিপ্রা বুঝতে পারল লোকটা ডাক পিয়ন। সামনের বাড়ির কড়া নেড়ে চিঠি দিয়ে লোকটি বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে ওদিকে চলে গেল।

এ-বাড়ির কোনও চিঠি আসেনি। আসবেই বা কোত্থেকে! এ-বাড়িতে কেউ চিঠি দেয় না। অথচ ছোড়দা রোজই ঐ পিয়নের পথ চেয়ে ব'সে থাকে। ক'দিন ধরেই সিপ্রা লক্ষ্য করছে,—ছোড়দা ঠিক এই সময়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। পিয়ন চলে যাবার পর হাফশার্টটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায় সিপ্রা তা' জানে না।

ডাক-পিয়ন চলে যাবার পর ছোড়দা যেন খুব মুষড়ে পড়ল। জানালার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, হঠাৎ ধপাস ক'রে ব'সে পড়ল তক্তপোষের ওপর। তারপর একটা বালিশ টেনে নিয়ে আড় হয়ে শুয়ে রইল। চোখ দুটো বোজা। মুখটা কেমন যেন থমথমে।

সিপ্রা একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছিল। সেলাই থেকে মুখ না তুলেই বলল,—কিরে, হঠাৎ শুয়ে পড়লি! বেরুবিনা?

ছোড়দা কোনও জবাব দিলনা।

—কি রে ঘুমলি নাকি!—এই ছোড়দা,—শোন না!

—কি তখন থেকে ফ্যাচর ফ্যাচর করছিস। আমার ভাল লাগছে না। একটু চুপচাপ থাকতে দে!

—কে তাকে চিঠি দেবে! তুই যে রোজ পিয়নের আশায় দাঁড়িয়ে থাকিস!

—বেশ,—কাল থেকে থাকবোনা।

অন্তু উঠে পড়ল। হাফ শার্টটা টেনে নিল আলনা থেকে ক'টা বাজল বল তো?

সূচে সুতো পরাতে পারছিলনা সিপ্রা? বলল,—তুই সুতোটা পরিয়ে দে। আমি ওপর থেকে দেখে আসি ক'টা বাজল।

—নাঃ, তোমায় আর ওপরে যেতে হবেনা।

সিপ্রার মুখ-কাণ লাল হ'য়ে উঠল। ঘাম মোছবার অছিলায় আঁচল নিয়ে সমস্ত মুখটাই সে ঢেকে ফেলল।

সূচে সুতো পরিয়ে দিয়ে অন্তু জিজ্ঞেস করল—রাজেন দা আজ অফিস যান নি কেন?

তা আমি কি জানি!—সিপ্রা ঝেঁজে উঠল।—এই দুপুর রোদ্দুরে রোজ তুই কোথায় যাস বল তো?

—কোথায় আর যাবো! মোড়ের ঐ বটগাছটার তলায় গিয়ে বসে থাকি। ঝির ঝির ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস দেয়। পাখিগুলো কিচিরমিচির করে, আর বটফল খায়, টুপটাপ করে গাছ থেকে ফল পড়ে,—তাই দেখি। বেশ ভাল লাগে। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

—আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি।

অন্তু হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল। বলল,—ঠিক বলেছিস, এই সময় একটা পাগলাও আসে ঐ বটতলায়। বিড় বিড় করে কি বলে আর মাঝে মাঝে ওপরে হাত তুলে নমস্কার করে। আমি কিন্তু ও-রকম করতে পারিনা। তা হলে এখনও আমি পাগল হইনি, কি বলিস! তবে

ঐ ভাবে থাকতে থাকতে একদিন হয়ে যাবো। ওঃ, তখন যা মজা হবে।

সিপ্রা ভয় পেয়ে ছোড়দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখটা কেমন যেন অন্য রকম হ'য়ে গেছে। সেলাই রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সিপ্রা। ছোড়দার হাত ধ'রে তক্তপোষের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল,—আজ তোর কোথাও যাওয়া হবে না। দিদি আজ সকাল সকাল ফিরবে বলেছে। দিদি এলে—

—তাই নাকি! তা' হলে তো এক্ষুণি আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়।—বলতে বলতে অন্তু আবার উঠে দাঁড়াল। —সেই সন্ধ্যে বেলায় ফিরব। ভয় নেই, এত শীগগীর আমি পাগল হবনা।—মুচকে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অন্তু। আর সিপ্রা জানালা দিয়ে ওকে দেখতে লাগল।

অন্তু কিন্তু মোড়ের ধারের বটতলায় গিয়ে বসল না। বড় রাস্তা ধ'রে যেমন রোজ যায়, তেমনি সোজা চলে গেল গার্লস কলেজের কাছে। ওপাশে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। রাস্তার ওপরই একটা বেঞ্চ পাতা। তার ওপর গিয়ে বসল। রোজই বসে। কিছুক্ষণ পরেই কলেজের ছুটী হবে। দলে দলে বই খাতা নিয়ে মেয়েরা বেরুবে। নানা বয়সের মেয়ে। নানারকম তাদের সাজ সজ্জা। খলখল হাসি, কলকল কথা। হেলে দুলে দল বেঁধে ওরা যাবে। আর অন্তু বসে বসে ওদের দেখবে। প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাসে ওরা কেমন উচ্ছল। প্রচণ্ড রোদ্দুরের তাপে নির্জীব সরীসৃপের মত যে-রাস্তাটা এখন শুয়ে শুয়ে ধুকছে, ওদের পাদস্পর্শে তাতে যেন প্রাণ সঞ্চার হবে। সেও চঞ্চল হয়ে উঠবে।

পোশাকের পরিপাট্যে কার যৌবন উদ্ধত হয়ে উঠেছে, কার সলজ্জ ভঙ্গী পথচারীদের উলঙ্গ দৃষ্টির সামনে আরও একটু কামনীয় হয়ে উঠল—অন্তু এ সব লক্ষ্য করে না। অন্তু দেখে এদের মধ্যে সিপ্রার মত মেয়ে একটাও আছে কিনা কিংবা ওর দিদিকে এদের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

সিপ্রা অন্তুর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে। আর পড়া হলনা। কেন না সেই সময় মা মারা গেলেন। ছোট বেলা থেকে সংসারের যাবতীয় কাজকর্মে সিপ্রা ছিল মায়ের বিশেষ সহকারী; সুতরাং মা মারা যাওয়ার পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের দায়িত্ব ঐ ছোট মেয়েটার কাঁধে এসে চাপল। ওর তখন বয়স বড় জোর তেরো। রান্নাবান্না, ঘর-দোর পরিষ্কার, বাবার পরিচর্য্যা, সিপ্রা সব একাই করে। ঝি শুধু বাসন মাজে বাটনা বাটে, আর কলতলা থেকে জল তুলে দেয়।

রাস্তা দিয়ে যে মেয়েগুলো বই হাতে করে একটু পরেই কলকল করতে করতে বাড়ি যাবে তাদের মধ্যে অনেকেই সিপ্রার চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু কেউ তারা সিপ্রার মত হতে পারবে না,—এটা অন্তুর ধারণা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস। অথচ সিপ্রার চেয়ে কত আগে এদের বিয়ে হয়ে যাবে। ঘর-করনার কাজ না-ই বা জানল,—লেখা পড়াতো শিখেছে। এরপর অফিসে একটা কাজ জুটিয়ে নেবে, তারপর ইচ্ছে হলে বিয়ে করবে, নয়তো দিদির মত চির-কাল আইবুড়ো হ'য়ে থাকবে। কিন্তু সিপ্রা তো আর চাকরি করবে না, সুতরাং ওকে বিয়ে করতেই হবে! রাজেনদা যদি রাজী না হন, তাহলে অন্যত্র কোথাও চেষ্টা করতে হবে। দিদিই করবে সে-সব ব্যবস্থা, অন্তু ও-সব ভাবনা ভাবে না।

কলেজের মেয়েগুলো কেউ কিন্তু দিদির মত গম্ভীর নয়। তা'হলে ওরা চাকরি করবে কি করে! কথায় অত হাসি, হাসতে হাসতে গায়ে ঢলে পড়া—অমন করলে কি আর চাকরি পাওয়া যায়! চাকরি পেতে গেলে দিদির মত গম্ভীর হতে হবে! আজ বলে নয়, ছোটবেলা থেকেই ঐ রকম। দিদিকে ভীষণ ভয় খায় অন্তু। ভালও বাসে খুব। দিদিও এই কলেজে পড়ত। এইখান থেকেই বি. এ. পাশ করেছে। তারপরই চাকরিটা পেয়ে গেল। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় পাঁচ-ছ বছর আগেই বাবাকে রিটায়ার করতে হল। সেইজন্যই এম, এ, না পড়ে দিদি চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। এবং পেয়েও গেল খুব তাড়াতাড়ি। যদিও মাইনে তখন খুব বেশি ছিলনা, তবুও সেই সময় ঐ-কটা টাকারই মূল্য ছিল অনেক। অবশ্য দাদা বেঁচে থাকলে দিদিকে নিশ্চয়ই চাকরির জন্যে পথে বেরুতে হতনা। কলেজে পড়তে

ুতে মাত্র কয়েকদিনের জ্বরেই দাদা মারা গেল। সেই াকেই মায়ের শরীর ভেঙে পড়ল। তারপর মা একদিন য্যা নিলেন। সে শয্যা ছেড়ে আর উঠতে পারলেন না।

অন্তুর ধারণা দিদি যদি মেয়ে না হত, এবং দেখতে ত ভাল না হত, তাহলে কিছুতেই অত তাড়াতাড়ি করি জোটাতে পারত না। কলেজের মেয়েগুলো কেউ দির মত নয়, সিপ্রার মতও নয়। তাই বোধ হয় ওদের ার বার দেখতে ইচ্ছে করে। নইলে কিসের টানে রোজ ই সময় ও এখানে আসে!—অন্তু ঠিক জানে না, কি সে য়! কেনই বা মেয়েগুলোকে দেখে! কোনও বিশেষ য়ের প্রতি ওর নজর নেই। অতগুলো মেয়েকে একসঙ্গে খেতে পাওয়া যায় বলেই বোধ হয় অন্তু এখানে আসে।

কিন্তু আজ সব চুপচাপ কেন! ওদিকে তো কোনও াড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, কলেজের কি ছুটি হয়ে গেছে? াজ কি কারও জন্মদিন! কারও তিরোভাব দিবস! সপ্রা বলছিল—দিদি আজ সকাল সকাল বাড়ি আসবে। াহলে তাই হবে বোধ হয়। কলেজের ছুটি হয়ে গেছে।

অন্তু উঠে পড়ল। ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গল ষ্টেশন ধারে। সেখানে একটা সিনেমা-হাউস। ্যাটিনী শো এখনও হচ্ছে। একটু পরেই শেষ হবে। খন ঐ হাউস থেকে দলে দলে মেয়ে পুরুষ বেরুবে। এসময় মেয়েদেরই ভীড় বেশি। কলেজের মেয়েদের মত যদিও রা সবাই তরুণী নয়, তবুও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্তু ওদের দখবে। সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেছে যখন তখন কলেজ থেকেও কেউ কেউ ওরা নিশ্চয়ই গিয়েছে সিনেমা দখতে।

দেওয়ালে লাগানো ছবিগুলো দেখতে লাগল অন্তু। একটা মেয়ে সাঁতারের পোষাক পরে সমুদ্রের ধারে শুয়ে আছে। তার গায়ের ওপর হ্যালান দিয়ে একটা ছেলে বসে াছে। তারও পরনে সাঁতারের পোষাক। আর একটা ছবিতে একটা মেয়ের গলা টিপে ধরেছে একটা লোক। দূরে পিস্তল হাতে প্রায় অর্দ্ধনগ্ন অন্য একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে।

অন্তুর ইচ্ছে হল ইভনিং-শো তে সিনেমাটা দেখে। কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। অন্তু ছবিগুলো আবার দেখতে লাগল।

একজন ভদ্রলোক এসে বলল,—এ্যায়, ছোকরা, এখানে কি করছ। যাও বাড়ি যাও। এ-ছবি তোমাদের জন্যে নয়। রোববারে সকালে এসো টারজনের ছবি দেখতে পাবে।

হাউসের সীমানা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ও-পাশে রিক্সা-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল অন্তু। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। সিনেমা ভাঙতেই সমস্ত চত্বরটা যেন কলবল করে উঠল। কত মেয়ে এসেছে, কত পুরুষ। বেশির ভাগ স্বামী-স্ত্রী। দুএকটা কলেজের মেয়েও এসেছে।......ভোমলাও এসেছিল। কি করে টিকিট পেল! এ-ছবিটা তো প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে! ভীড়ের মধ্যে ভোমলা কি করে, লুকিয়ে লুকিয়ে অন্তু তা' দেখতে লাগল। ভোমলা এতক্ষণ অন্তুকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ ওর চোখে চোখ পড়ে গেল। ভোমলা চিৎকার করে ডাকল অন্তুকে। অন্তু এগিয়ে এলনা। ঐ খানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

ওর কাঁধের ওপর সজোরে নিজের হাতখানা রেখে ভোমলা জিজ্ঞেস করল—তুই কি করে ম্যানেজ করলি?

—কিসের?

—টিকিটের।

—আমি তো যাইনি।

—যাসনি! সত্যি বলছিস! খুব ভাল করেছিস। যা, ভেবেছিলাম তা' কিস্যু নেই। দুবার না তিনবার সাঁতার কাটাকাটি অবশ্য আছে, কিন্তু সে-সব তো জলের তলায়। কিছুই দেখা যায় না। একটা ভাল নাচ নেই, গান নেই। খামোকা দু-দুটো টাকা খরচা হয়ে গেল।

—দুটো টাকা?

—হ্যাঁ! টিপস দিতে হল যে। নইলে কি আর ঢুকতে দিত! কিস্যু নেই। সব ফক্কা। চ, এখানে দাঁড়িয়ে

আর মায়া বাড়াতে হবে না। ভীষণ মাথা ধরেছে। একটু চা খাইগে চ।

অন্তুকে নিয়ে ভোমলা একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল। অন্তু কেমন যেন বিমর্ষ হ'য়ে পড়ল। ঠিক এই সময় ভোমলার সঙ্গ তার ভাল লাগছেনা। ভোমলার সঙ্গে মেলামেশা করা দিদি একটুও পছন্দ করেনা। সিপ্রাও বারণ করে। অন্তু তবু ওদের বারণ শোনে না। এই মুহূর্তে কিন্তু অন্তুর মনে হচ্ছে,--ওরা ঠিকই বলে, ভোমলার কথাবার্তাগুলো কেমন যেন বিশ্রী। সব সময় শুনতে ভাল লাগে না।

—কি রে গম্ভীর হয়ে কি ভাবছিস? ছবিটা 'মিস্' করলি ব'লে আফশোস্ হ'চ্ছে!

—না, তার জন্যে নয়, আমি ভাবছি অন্য কথা।

—অন্য কথা!—ভোমলা আশ্চর্য হয়ে অন্তুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে দুটো সিগারেট তুলে নিল। একটা নিজে ধরাল, অপরটা অন্তুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কি চলবে নাকি।

নাঃ! মুখে ভারী গন্ধ ছাড়ে। সেদিন ধরা পড়ে গেছলুম। দিদি সব জানতে পেরে গেছল!

তোর ঐ দিদির জন্যে তোর জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে দেখছি। নইলে এই বয়সে অমন গোমড়ামুখো হয়ে পড়িস। কি অত ভাবিস বলতো রাত দিন।

—কি আর ভাবব। পড়াশোনা হলনা, সেই সব কথাই ভাবি।

—পড়াশোনা তো তুই ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলি।

—ইচ্ছে ক'রে বৈকি! অন্তু যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল। কলেজে কলেজে ধর্ণা দিয়ে হাড়-মাস কালি করে ফেলেছি, কোথাও দরজা খোলা পাই নি। থার্ড ডিভিশনের জায়গা নেই কোথাও।

—তাতে অত মুষড়ে পড়বার কি আছে! প্রাইভেটে দিবি।

—হ্যাঁ, তা'হলেই হয়েছে। বাড়িতে বসে ঐ অত পড়া! ও আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

—কেন, গ্রাজুয়েট দিদি রয়েছে, তোর আবার ভাবনা কি। সে-ইতো তোকে পড়াতে পারবে। অবশ্য সে আর কতদিন! আসছে মাসেই তো বিয়ে হয়ে যাবে।

—কার বিয়ে?—অন্তু চমকে উঠল।

—কেন, তোর দিদির। তুই কিছু জানিস না?

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—মাথা আমার খারাপ হয়নি, তোরও হয়নি, হয়েছে তোর দিদির।

—মানে?

—মানে বলছি। সব খুলে বলব। কিন্তু এখানে সুবিধে হবেনা। গঙ্গার ধারে চল।

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে, হতভম্ব অন্তুকে সঙ্গে নিয়ে ভোমলা গঙ্গার দিকে হাঁটতে লাগল।

পশ্চিম আকাশে রঙের ছটা। তারই ছায়া এসে পড়েছে গঙ্গার বুকে। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভোমলা গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে লাগল। মাঝে মাঝে শিষ দিতে লাগল। তারপর একসময় অন্তুর হাতটা চেপে ধরে বলল,—ব্যস্ এইখানেই ব'সে পড়া যাক।

ওরা দুজনে পাশাপাশি বসল। ঠিক এই জায়গাটাতে না হলেও এ-রকম অনেক সন্ধ্যাতেই ওরা গঙ্গার ধারে এসে বসে, গল্প করে। ভোমলা ছাড়া আরও দু'তিনজন সঙ্গীও এসে জোটে। কিন্তু আজ অন্য কেউ নেই। তাতে ভোমলার সুবিধে হয়েছে। অন্য বন্ধুরা থাকলে এ-সব-কথা ভোমলা আলোচনা করত না। হাজার হোক এটা একটা প্রাইভেট অ্যাফেয়ার।

অন্তু যেমন চুপচাপ ছিল, তেমনি চুপচাপ ব'সেই রইল।

অন্তুর দিকে না চেয়ে ভোমলা বলল,—দ্যাখ, আমি যে-সব কথা তোকে বলব তা' যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। এবং এ-সব ব্যাপার নিয়ে তুমি যদি বাড়িতে আলোচনা কর, তাহলেও আমার নাম করবে না। স্রেফ বলবে,—খুব রিলায়েবল্ সোর্স থেকে খবর পেয়েছি। ব্যস এর বেশি নয়।

—বেশ, তাই হবে। অন্তু উদাসভাবে বলল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ভোমলা। কেমন করে সুরু করবে হয়তো সেই কথাই ভাবতে লাগল। আর একটা সিগারেট ধরাল। এবার আর অন্তুকে 'অফার' করলনা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল,—তোর দিদির নাম কি বল তো!

—কেন! ডাক নাম টুনী। অবশ্য ও-নামে এখন আর কেউ ডাকে না। মা যদ্দিন বেঁচেছিলেন, তদ্দিন মা এবং মাঝে মাঝে বাবা ঐ নামে ডাকতেন। ভাল নাম রেবা। এখন বাবাও রেবা বলেই ডাকেন।

—আমি কি অত ফিরিস্তী তোকে দিতে বলেছি। ভোমলা যেন একটু বিরক্ত হল। বলল,—ওর অফিসিয়াল নাম কি!

অফিসিয়ল নাম!—অফিসে আবার অন্য নাম হয় নাকি!

—হয়। কারও কারও হয়। যেমন তোর দিদির। তোর দিদির অফিসিয়ল নাম হ'ল শ্বেতপদ্ম। সাদা কাপড়, সাদা ব্লাউজ আর ধবধবে গায়ের রঙ। সেই জন্য সবাই শ্বেতপদ্ম বলে ডাকে, অবশ্য আড়ালে।

—তুই কি ক'রে জানলি!

—সে পরে বলব। মোট কথা জেনে রেখে দাও আমার 'সোর্স' খুব অথেনটিক্। —বলেই সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল ভোমলা। তারপর রিং করতে লাগল।

অন্তু মুখ নিচু করে আছে দেখে 'রিং' করা বন্ধ করে ভোমলা বলল,—অবশ্য 'শ্বেতপদ্ম' নামকরণের একটা রোম্যান্টিক ইতিহাস আছে। তোর দিদির অফিসর মিঃ সুব্রহ্মণ্যম্ তোর দিদিকে খুব লাইক্ করে। ওর পোষাক-আশাক, কথাবার্তা, কাজ-কর্ম—সবই ভাল লাগে এই মাদ্রাজী সাহেবের। খুশী হয়েই একদিন সে একটা শ্বেতপদ্ম উপহার দিয়েছিল তোর দিদিকে। দিদি সেটা হাতে করে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে অফিসরের জলের গ্লাশের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। পরের দিনই অফিসর একটা ফ্লাওয়ার ভাস কিনে নিয়ে এসেছিল, এবং গোটা পাঁচেক শ্বেতপদ্ম। তোর দিদিকে ডেকে ফুল আর 'ভাস' দিয়ে বলেছিল, তুমি সাজিয়ে দাও। তারপর থেকে রোজই ফুল নিয়ে আসে। অন্য কোনও ফুল নয়, শ্বেতপদ্ম। আর তোর দিদি রোজই তা ফুলদানীতে সাজিয়ে দেয়। অ্যাটেণ্ড্যান্স রেজিষ্টারে সই করার মত এটাও তোর দিদির সকালের সর্বপ্রথম করণীয় কাজ। এমন একটা ঘটনা অফিসে কি আর চাপা থাকে। সুতরাং নানারকম কথা ওঠে। আর এ সব নিয়ে কথা মানেই কুৎসা। তাই সুব্রহ্মণ্যমই প্রস্তাব করেছে; এবং অনেক ভেবে রেবাদিও রাজী হয়েছে। সামনের মাসেই রেজিষ্ট্রি হবে। তখন নিশ্চয়ই তোরা সব জানতে পারবি।

অন্তু আর বসে থাকতে পারল না। বলল,—শরীরটা কেমন করছে, আমি বাড়ি চললুম।

ভোমলা ওর হাত ধরে টেনে আবার পাশে বসাল। ধমক দিয়ে বলল,—আর ন্যাকামো করতে হ'বে না। শরীর খারাপ, মন খারাপ,—যত সব…। তারপর শোন, আরও অনেক কথা আছে।

আমার আর কিছু শুনতে ভাল লাগছেনা ভাই। অন্তু যেন ককিয়ে উঠল।

—ভাল লাগবে বন্ধু, ভাল লাগবে। ধৈর্য্য ধরে শোনই না।

অন্তু চুপ করে ব'সে রইল। আর কোনও অনুযোগ করল না।

ভোমলা বলতে লাগল,—মাদ্রাজী সাহেব কিন্তু তোমার দিদিকে এমনি বিয়ে করছেনা। রীতিমত যৌতুক দিতে হচ্ছে। আর রেবাদিও তো বোকা মেয়ে নয়, যে হুট্ ক'রে বুড়ো ইন্‌ভ্যালিড্ বাবা, আইবুড়ো বোন আর একটি বেকার ভাইকে ফেলে ড্যাংডেঙিয়ে ওর সঙ্গে গিয়ে ঘর বাঁধবে। বিয়ে হয়ে গেলেই তো ল্যাটা চুকে গেল,—তখন তোমাদের দেখবে কে, আর তোমাদের ঐ সংসারটাই বা চলবে কি করে। তাই তোমার দিদি মাদ্রাজী সাহেবকে বলেছে,—যদি আমার ভাইকে এই অফিসে ঢুকিয়ে নিতে পার, তা হ'লে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব, নচেৎ নয়।

—সব মিথ্যে কথা। দিদি কখ্‌খনো এ-সব কথা বলেনি।—অন্তু আবার উঠে পড়ল। নাঃ, আর আমি

তোর একটা কথাও শুনবো না। আমি এক্ষুণি গিয়ে দিদিকে সব ব'লে দেব।

ভোমলাও উঠে পড়ল। বলল,—যদি সত্যি হয়, কত বাজী!

অন্তু থমকে দাঁড়াল। বলল, বুঝতে পেরেছি, শ্যামল তোকে এই সব কথা বলেছে।

—ঠিক ধরেছিস। শ্যামলের কাছ থেকেই—সব শুনেছি। শ্যামল জেনেছে ওর বৌদির কাছ থেকে। ওর বৌদি, যেহেতু তোর দিদির অফিসেই কাজ করে, এবং তোর দিদির অন্তরঙ্গ বন্ধু, তখন বুঝতেই পারছিস যে খবরটা আর যাই হোক,-মিথ্যে নয়।

—তা বুঝতে পারছি; তবুও শ্যামলকে আমি সব নিজেই জিজ্ঞেস করব।

তা করতে পারিস। তবে আমার নাম বলিসনি যেন। এমন ভাবে বলবি, যেন তুই কিছুই শুনিসনি, দেখবি নিজের থেকেই ও সব বলে ফেলবে। ওর পেটে কথা থাকে না। তোর সম্বন্ধে ও-কি বলছিল জানিস।

--কি! অন্তু যেন একটু আগ্রহ প্রকাশ করল।

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার কাছে এল। ভোমলা বলল, তুই তো এক্ষুণি বাসায় চলে যাবি। তাহলে সব কথা হবে কি করে!

ক'টা বাজল বল দিকি। এতক্ষণে একটু সহজ হয়েছে অন্তু। ভোমলার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু সে জানতে চায়। শুধু দিদির সম্বন্ধে নয় ওর নিজের সম্বন্ধেও। এ অবস্থায় ওর কি করা উচিত। এই মুহূর্তে অন্তুর মনে হচ্ছে, ভোমলা যেন ওর চেয়ে অনেক বড়, অনেক অভিজ্ঞ, অনেক বিচক্ষণ।

ভোমলা হাত ঘড়ি দেখে বলল,—সাতটা প্রায় বাজে। এত সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে করবি কি! চল বরং শ্যামলদের রোয়াকে গিয়ে বসি। এই সময় ও-দিকটা বেশ নিরিবিলি থাকে। শ্যামলও বোধহয় বাড়ি আছে। ডাক দিলেই বেরিয়ে আসবে। ওর সামনেই সব কথা হ'বেখন।

—কিন্তু তুই তো বললি, ওর কাছে আমি যেন তোর নাম না করি।

—ও, সে আমি সব ম্যানেজ করে নেব। তুই শুধু আমায় 'ডিটো' দিবি। তাহলেই হ'বে।—বলতে বলতে হঠাৎ ভোমলা চুপ হ'য়ে গেল।—তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—তোর 'লাক'টা খুব ভাল, বুঝলি। তাই ব'লে আমি হিংসে করছি না, তবে হিংসে করার মত।

—কেন?—অন্তু আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করল। পরক্ষণেই বলল,—একটা চাকরি পেয়ে যাবো বলে বলছিস। তোর কি মাথা খারাপ,—আমি ও চাকরি অ্যাকসেপটই করব না।

—নাঃ, আমি সে-কথা বলছিনা।—ভোমলা অভিনয়ের ঢঙে অত্যন্ত উদাসভাবে কথাগুলো বলেই পকেট থেকে সিগারেট বার করল।---এক্‌স্‌কিউজ্‌ মী, আমি আর একটা ধরাচ্ছি।

অন্তু বলল,—আমাকেও একটা দে। মুখটা কি রকম ফস্‌ ফস্‌ করছে।

সরি, একটাই আছে।

তবে থাক!

থাক কেন! ভাগ কার নেওয়া যাক।

সিগারেটটাকে দু'টুকরো করতে করতে ভোমলা বলল,—এই বরং ভাল হ'ল বুঝলি। শ্যামলদের বাড়িতো আর বেশি দূর নয়। গোটা সিগারেটটা ফুরুতো না। ফেলে দিতে হ'ত। ওখানে ব'সে তো আর সিগারেট খাওয়া চলবে না। গন্ধ পেলেই বুড়ো বেরিয়ে আসবে। তারপর এমন খিস্তী সুরু করবে যে কা'র সাধ্যি সেখানে দাঁড়ায়।

—কে বুড়ো!

—কেন শ্যামলের বাবা। ওরা তো এই সময় বাইরের ঘরে বসে দাবা খেলে।—নিজের টুকরোটা ধরিয়ে, অন্তুকে দেশলাইটা দিয়ে দিল ভোমলা।

অন্তু পরপর দু'টো নষ্ট করল, কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারল না।

—নাঃ, তোর কম্ম নয়।—ভোমলা বিরক্ত হয়ে বলল, দে আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ভোমলা হঠাৎ বলল,—মাদ্রাজী সাহেবের কোনও দোষ নেই বুঝলি। তোর দিদির যা চেহারা তাতে অনেক ব্রহ্মচারী তপস্বীরও বিন্দু টলে যায়।

—বিন্দু। সে আবার কি!

—মানে কুলকুণ্ডলিনী আর কি!—ব'লেই ভোমলা হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, এই তো কলেজের মেয়েগুলোকে রোজ দেখছিস,—তোর দিদির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে এমন একটা মেয়েও কি তোর নজরে পড়েছে। আসলে তোর বোন-ভাগ্যিটাই খুব ভাল বুঝলি। সিপ্রাকেও দেখতে মন্দ নয়। তবে তোর দিদির কাছে লাগে না তোর দিদির যেমন রঙ তেমনি স্বাস্থ্য। শরীর তো নয় যেন একটা চাবুক।

—হ্যাঁ! শপাং শপাং করে তোমার পিঠে পড়লে ভাল হয়।—অন্তুর গলাটা একটু কর্কশ হয়ে উঠল।

ভোমলা ঠিক বুঝতে পারল না অন্তু সত্যি সত্যি রাগ করেছে কি না। তবুও বলল,—এতে রাগের কি আছে! যা সত্যি তাই বলেছি। আমার কাছে ও-সব ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। স্পষ্ট কথা বলব, তা আবার অত ভয় কিসের।—বাই দি বাই,—তোদের ঐ বাড়িওয়ালার ছেলেটার কি যেন নাম,—ব্রজেন না রাজেন, ও তো সিপ্রাকে বিয়ে করবে বলেছে। শেষ পর্যন্ত করবে তো। দেখিস আবার, ফ্যাসাদ বাধিয়ে না কেটে পড়ে।

—কে তোকে বলল, যে রাজেনদা সিপ্রাকে বিয়ে করবে।

—কেন, তুইতো নিজেই একদিন বলেছিলিস,—রাজেনদা আমাদের খুব ভালবাসে, সিপ্রাকে খুব স্নেহ করে। ভাড়ার জন্যে বিশেষ তাগাদা দেয় না। বাকি পড়ে গেলে ঝামেলা করে না।—

—হ্যাঁ, তা বলেছিলুম। কিন্তু তা থেকে কি এ-কথা বোঝায়,—যে রাজেনদা বিয়ে করবে।

—তা অবশ্য বোঝায় না। তবে এ কথা সত্যি, রাজেনদার সঙ্গে তোমার ঐ ছোট বোনটির একটু নটঘট হ'য়েছে—মানে মন দেওয়া-নেওয়া আর কি।

—কি ক'রে বুঝলি।

—ও বোঝা যায়। একটু 'ষ্টাডি' করলেই সব ক্লিয়ার হয়ে যায়। স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভক্তি, ও-সব কিছু নয়, আসলে হ'ল মুহব্বত। সে যা হবার হয়ে গেছে, এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন যাতে শেষ রক্ষা হয় সেই দিকেই বরং আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। রাজেন যেন কেটে না পড়ে।

অন্তু বিরক্ত হয়ে বলল,—তুই নিজের ভাবনা ভাব দেখি। পরের জন্যে তোকে আর অত মাথা ঘামাতে হ'বে না। যত সব আজে বাজে কথা। তোর তো টাকার অভাব নেই, কলেজে ভর্তি হলিনা কেন?

—কি হ'বে পড়ে! চাকরিবাকরি তো করব না! বাবা তাই বললেন—আর পড়তে হবেনা। ব্যস্ আমিও বেঁচে গেলাম। বেশি পড়াশোনা করলে বাবার ব্যবসা-পত্তর দেখবে কে? বড়দা তো পড়াশোনা ক'রে অধ্যাপক হয়েছেন। তিনি তো আর নাট্-বল্টু, সকেট-পাইপ, নাড়া চাড়া করবেন না। মেজদা আর্টিষ্ট। বসে বসে শুধু ছবি আঁকেন। সমাজ-সংসার তাঁর কাছে সবই মিছে। সুতরাং আমিই বাবার একমাত্র ভরসা। সামনের বছরেই গদীতে বসব বুঝলি!

—তা হলেই হয়েছে। দুদিনেই সব ফর্সা হয়ে যাবে।

—মোটেই তা হবেনা। ও গদীর মাহাত্ম্যই আলাদা। দুদিন বসলেই, পয়সা কি জিনিস টের পাইয়ে দেবে। তখন তোরাই বলবি,—ভোমলাটা টাকা চিনেছে বটে।

শ্যামলকে ডাকতে হলনা। দোতলার বারান্দা থেকে বোধহয় এদের গলা পেয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি নেমে এল। ওকে দেখেই ভোমলা বলল,—কিরে, তুই যে একেবারে গুড্ বয় হয়ে গেছিস। ব্যাপারখানা কি! একেবারে ঘরকুনো।

শ্যামল গম্ভীরভাবে বলল—হ্যাঁ, এবার থেকে আড্ডা-

ফাড্ডা সব ছাড়তে হবে। নইলে ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার।

—কোনও জ্যোতিষীর কাছে গেছলি বুঝি! গলায় শ্লেষ মিশিয়ে ভোমলা বলল—তা আমায় একদিন নিয়ে চলনা। দেখে আসি আমার ভবিষ্যৎটা কি রকম। আলোয় আলোকময় না একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

অন্তু হেসে উঠল। শ্যামল কিন্তু হাসলনা। বলল,—সত্যি বলছি, এবার থেকে আমার সিরিয়স্ হতে হবে। একটু পড়াশোনা করতে হবে।

—তাহলে অ্যাদ্দিন পড়াশোনা করতিস না! স্রেফ টাকার জোরেই কলেজে গিয়ে ঢুকেছিস।—কথাগুলো বলেই ভোমলা তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে লাগল।

অন্তু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। ভোমলা অন্যমনস্ক হতেই জিজ্ঞেস করল,—হঠাৎ এসব কথা কি বলছিস। কালও তো রাত দশটা পর্যন্ত গঙ্গার ধারে বসে আড্ডা দিলি। আর আজ একেবারে বদলে গেলি। কি ব্যাপার?

—ব্যাপার তাহলে খুলেই বলি। তবে এখানে নয়। কেউ হয়ত শুনতে পাবে।

—তাহলে চল, খেলার মাঠে গিয়ে বসিগে।

অন্তুর প্রস্তাবে ওরা দুজনেই রাজী হয়ে গেল। অন্ধকারে ঘনঘাসের সবুজে ওরা যে কোথায় ডুবে গেল রাস্তা থেকে তা ঠাওর করা চলেনা। মাঠের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির আলো নেই এবং সেই জন্যেই অনেকের অনেক সুবিধে। ওদিকে হয়ত আরও অনেক ছেলেমেয়ে একত্র জড়ো হয়ে গালগল্প করছে। দূরের থেকে একদল অপর দলকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়না। দেখতে চায়ওনা বোধহয়। সন্ধ্যার পর এই মাঠটা তীব্র আকর্ষণে অনেককেই টেনে আনে তার অন্ধকার বুকের মধ্যে। কিন্তু অন্তুরা নিতান্ত খেয়ালবশেই এখানে এসেছে। কোন মেয়েও নেই ওদের সঙ্গে। এত অন্ধকারে ওরা না এলেও পারত।

পরস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে পাশাপাশি ওরা বসল। কোনও ভূমিকা না করেই শ্যামল বলল,—খুব শীগগীর আমি আমেরিকা যাচ্ছি!

—সে কি!—অন্তু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।—বি.এ. পরীক্ষা না দিয়েই চলে যাবি!

—হ্যাঁ! একটা চান্স যখন পাওয়া গেছে! তখন আর সময় নষ্ট করা উচিত হবেনা।

—চান্স কি করে পেলি?—ভোমলা জিজ্ঞেস করল।

—সে সব পরে বলব।—জামাইবাবুই সব ব্যবস্থা করেছেন।

—তাহলে অন্তুরও একটা ব্যবস্থা করে দেনা।—খুব হাল্কাভাবে কথাটা বলেই ভোমলা গম্ভীর হয়ে গেল।

—ঠাট্টা নয়। সত্যিই আমি যাবো। অনেক টাকার ব্যাপার,—সেটা জোগাড় করতে পারলেই,—ব্যস্, আমায় পায় কে!

ভোমলা এবার ভাল করে সোজা হয়ে বসল। বলল,—যাক, তোদের যাহোক হিল্লে হয়ে গেল। তুই আমেরিকা চল্লি, অন্তু চাকরি পেয়ে গেল,—আমিই যা পড়ে রইলাম।

—অন্তু আবার চাকরি পেল কোথায়!—কই আমাকে তো কিছু বলিসনি।

—ওর কথা শুনিস কেন?—অন্তু বিষণ্ণভাবে বলল।

শ্যামলের উরুতে চিমটি কেটে ভোমলা বলল,—তুই কি মনে করিস তোরই শুধু জামাইবাবু আছে, আর কারোর নেই! অবশ্য এখনও হয়নি, তবে হতে কতক্ষণ।—বলতে বলতে ভোমলা শব্দ করে হেসে উঠল।

আর অন্তু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল।

—ওঃ, বুঝেছি। মিঃ সুব্রহ্মণ্যম্!—ভোমলা বুঝি তোকে সব কথা বলেছে। তা ভালই করেছে, নইলে আমাকেই বলতে হত। বৌদিই তোকে সব কথা বলতে বলেছে। কেননা শেষকালে যদি কোনও গোলমাল হয়, তখন সবাই বলবে আমরা সব জেনেশুনে কেন চুপচাপ ছিলাম। এখনও তোর বাবা বেঁচে রয়েছেন। তাঁর অমতে তোর দিদির কিন্তু বিয়ে করা উচিত হবেনা। তোর দিদি হয়তো বাবাকে কিছু বলবেনা। কিন্তু আমাদের তো উচিত তাকে সব কথা জানানো।

—কি দরকার। —ভোমলা বলল।—এ সব ব্যাপারে কারও কোনও মন্তব্য করা ঠিক নয়। তার চেয়ে রেবাদি যদি 'টুইষ্ট' করে মাদ্রাজী সাহেবের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করতে পারে অন্তুর বরং সেই চেষ্টাই করা উচিত। তাতে সিপ্রারও একটা গতি হয়ে যেতে পারে।—তুই এক কাজ কর অন্তু!—ভোমলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে সুরু করল,—দিদিকে বল, যে তুইও শ্যামলের সঙ্গে আমেরিকা যেতে চাস। দিদি যেন মাদ্রাজী সাহেবকে বলে সব ব্যবস্থা করে দেয়।

ওকে বাধা দিয়ে শ্যামল বলল,—নাঃ, সে ওর দ্বারা সম্ভব হবেনা। বরং চাকরিটা যাতে হয়ে যায় সেই চেষ্টাই ও করুক।

—ঐ অফিসে আমি কিছুতেই চাকরি করতে পারবনা।

—অন্তুর ভারী গলা, শ্যামল এবং ভোমলাকে একটু বিস্মিত করল। তবুও সহজ সুরে শ্যামল জিজ্ঞেস করল,—তাহলে করবি কি!

—অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে এসেছি।

—তাই নাকি! ক'দিন আগে? ভোমলা একটু আগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করল।

—তা প্রায় মাস তিনেক হল। এবার নিশ্চয়ই একটা 'কল' আসবে।—কি বলিস। আমি তো রোজই চিঠির প্রত্যাশায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকি!

—তারপর পিয়নটা যখন তোদের বাড়ির দিকে না গিয়ে অন্য রাস্তা ধরে তখন হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়িস এই তো!—ভোমলা বয়োজ্যেষ্ঠদের মত গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলে ঘন অন্ধকারের মধ্যেই অন্তুর মুখের দিকে তাকাল।

অন্তু ঘাড় নেড়ে বলল,—হ্যা, ঠিক বলেছিস।

—ঠিক বলব বৈকি! ও-সব আমার অনেকদিন আগে 'ষ্টাডি' করা হয়ে গেছে। এই তো সবে তিনমাস হয়েছে, তিনবছর পার হয়ে গেলেও পিয়ন তোমাদের দরজায় গিয়ে ঘা দেবেনা। সুতরাং লক্ষীছেলের মত মাদ্রাজী সাহেবের শরণাপন্ন হও,—আখেরে ভালই হবে।

—না, তা আমি কক্ষণো পারবনা, কক্ষণো না।—অন্তু আর্তনাদ করে উঠল।

ভোমলা চুপ করে গেল। শ্যামলও আর কোনও কথা বললনা।

গভীর নিস্তব্ধতায় কিছু সময় কাটবার পর শ্যামলের মনে হল অন্তু বোধহয় কাঁদছে। ভোমলার জামা ধরে একটু টান দিয়ে শ্যামল বলল,—কি হল রে ভোমলা, অন্তু কাঁদছে কেন?

—কাঁদছে! ভালই হয়েছে। খানিকক্ষণ কাঁদুক। কাঁদলে মনটা হালকা হবে।

আমার হাতা দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে অন্তু বলল,—নাঃ, কাঁদবোনা। যা হোক একটা কিছু স্থির করতে হবে। এবং তা আজ রাত্রের মধ্যেই।

অন্তু উঠে দাঁড়াল।—চল এবার বাড়ি ফেরা যাক।

ওরা দুজনও উঠে পড়ল। শ্যামলের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে অন্তু বলল,—একটা কথা তোদের জিজ্ঞেস করছি,—বাড়িতে গিয়ে আমি কি চুপচাপ থাকব, না, এইসব কথা দিদিকে জিজ্ঞেস করব।

ভোমলা বলল,—আমার মতে চুপচাপ থাকাই ভাল। কেননা, এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে গেলেই নানান রকম কথা উঠবে। তারপর ঝগড়াঝাঁটি, চেঁচামিচি।—তার চেয়ে চুপচাপ থাকা অনেক ভাল।

শ্যামল বলল,—দিদির মন বুঝে, ভালভাবে সব কথা জিজ্ঞেস করলে, আমার মনে হয়, কোনও গণ্ডগোল হবেনা। তাতে বরং তোর দিদির সুবিধেই হবে। লজ্জায় হয়তো সে কোনও কথা বলতে পারছেনা। তাছাড়া তোর চাকরির ব্যাপারটাও তুই ভাল করে জেনে নিতে পারবি।

—আবার সেই চাকরি! আমি পাঁচশোবার বলছি ওখানে আমি চাকরি করতে পারবোনা। দিদিকে বিক্রী করে আমি চাকরি কিনতে চাইনা। তাতে খেতে না পাই সেও ভাল।

এমন দৃঢ়ভাবে কথাগুলো বলল অন্তু যে শ্যামল কিছু মন্তব্য করতে সাহস করল না।

ভোমলা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলল,—তোর ভাগাটা নেহাতই খারাপ, নইলে এতদিনেও তোর দিদি তোকে চিনতে পারেনা। এমন নীতিনিষ্ঠ ভাই,—তার কোনও মর্য্যাদাই সে দিলনা।—ছি:।

ওদের সঙ্গ ছেড়ে অন্তু একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। ক্রমশ ওদের মধ্যে ব্যবধানটা বড় হতে লাগল। শ্যামল কিংবা ভোমলা কেউই আর ওকে ডাকল না। অন্তুও আর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলনা ওরা কতদূরে পড়ে আছে।

বাড়িতে এসেই অন্তু চমকে উঠল। দিদি একটা ডুরে শাড়ি পরে রান্না করছে। অন্তু প্রথমে মনে করেছিল সিপ্রা। কেননা শাড়িটা তারই। কাছে এসে বুঝতে পারল,—দিদি।

অন্তুকে দেখে একগাল হেসে দিদি বলল,—কিরে, অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন, চিনতে পারিসনি বুঝি!

অন্তু চুপ করে রইল।

ছোড়দা এসেছে বুঝতে পেরে সিপ্রাও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দুইবোনকে একসঙ্গে দেখে অন্তুর মনে পড়ে গেল রাজেনদার কথা, সুব্রহ্মণ্যমের কথা। মনে পড়তেই মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু কোনও কথা বলতে পারলনা। দিদির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নামিয়ে নিয়ে বলল,—একটু জল দিস তো, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।

একটা ডিশে করে দুটো মিষ্টি এবং একগ্লাস জল নিয়ে দিদিই এল,—সিপ্রা নয়। যদিও সিপ্রাকেই জল আনতে বলেছিল অন্তু।

—মিষ্টি কোত্থেকে এল?—অন্তু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল!

মৃদুহেসে দিদি বলল,—আজ বোনাস্ পেয়েছি।

—এখন বোনাস! বোনাস্ তো পুজোর সময় দেয়।

—না, এটা হাফ ইয়ারলি ক্লোজিং বোনাস। এই বছরেই প্রথম দিল। নে, গ্লাসটা ধর। ও-দিকে বোধ হয় তরকারি পুড়ে গেল!

—সিপ্রা রাঁধছে না!

—কেন, আমার হাতের রান্না বুঝি তোর ভাল লাগেনা?

অন্তু বুঝতে পারল দিদি হাসছে। কিন্তু মুখতুলে তাকাতেও পারল না। হাসিটা গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে আটকে গেল।

অনেক কিছুই রান্না করেছিল দিদি। কিন্তু অন্তুর কিছুই ভাল লাগেনি। দিদি একবার জিজ্ঞেস করেছিল,—তোর আজ কি হয়েছে বলতো, অমন চুপচাপ আছিস কেন?—অত রাত্তির পর্যন্ত কোথায় থাকিস!

অন্তু কোনও কথার জবাব দিলনা।

সিপ্রা বলল,—তুমি অ্যাডভান্স ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেয়েছ এ-কথা না বলে বোনাস পেয়েছ বললে কেন?—সত্যি কথা বলনি বলেই ও রাগ করেছে!

—তাই নাকি! তুই বুঝি আগেই সব বলে দিয়েছিলিস। তা এখন তো সত্যি কথা শুনলি, এবার খেয়ে নে।—দিদি হাসতে হাসতে কথা বলতে শুরু করলেও, কথাগুলো শেষ হবার আগেই হাসিটা ঠোঁটের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

অন্তু অস্ফুটভাবে বিস্ময় প্রকাশ করল—অ্যাডভান্স ইন্‌ক্রিমেণ্ট!

—কেন?……মাছ-মাংস, তরিতরকারি কিছুই আর ভাল লাগল না। প্রায় আধখাওয়া করে অন্তু উঠে পড়ল।

রোজ রাত্রে শোবার আগে বাবাকে পায়ে মালিশ করতে হয়। আজও সিপ্রা তাই করছিল। অন্তু এসে বলল, তুই শুগে যা, আমি মালিশ করছি। বলেই সিপ্রার হাত থেকে মালিশের শিশিটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগল।

সিপ্রা ছোড়দার দিকে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল,—না, তোকে আর এসব

করতে হবে না। শরীর খারাপ, শুয়ে পড়গে যা।

—কে বললে শরীর খারাপ!

তবে তুই কিছু খেলিনা কেন। অমন সুন্দর রান্না হয়েছে,—সব ফেলে দিয়ে এলি!

—কি জানি, গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল।

—তাইতো বলছি,—শুয়ে পড়তে। অন্তুর হাত থেকে মালিশের শিশিটা কেড়ে নিয়ে আলমারির ভেতর রেখে দিল সিপ্রা। তারপর আলমারিটাকে চাবি বন্ধ করে, অন্তুর মশারি ফেলে দিতে এল।

অন্তু জিজ্ঞেস করল, মালিশটা চাবি বন্ধ করে রাখলি কেন?

রাত্রে যদি দরকার হয়।

—হবে না।—দিদি বলেছে ওটা সাবধানে রাখতে। ওটা বিষ।

অন্তু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

—অমন করে হেসে উঠলি কেন, বাবার ঘুম ভেঙে যাবে যে।

—ওঃ ভুল হয়ে গেছে। অন্তু নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

মশারি গুঁজতে গুঁজতে সিপ্রা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—দিদি, হায়ার পোষ্টে প্রোমশন পেয়েছে। বাবাকে বলছিল শুনলুম। আসছে মাসে তোরও নাকি দিদির অফিসে চাকরি হবে। তখন কিন্তু আমাকে একটা ভাল শাড়ি দিতে হবে বলে রাখছি।

অন্তু চুপ করে রইল।

—এখনও অবশ্য পাকাপাকি কথা হয় নি।—সিপ্রা বলতে লাগল। কাল সকালেই বোধহয় তোকে অ্যাপ্লিকেশন করতে বলবে।

অন্তু হাই তুলে পাশ ফিরে শুলো। ঘুম-জড়ানো গলায় বলল—আমি এখন চাকরি করবনা ঘুমুবো।

মৃদু হেসে সিপ্রা চলে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত অন্তু ঘুমুতে পারেনি। ছটফট করেছে। বিছানার ওপর উঠে বসেছে। জল খেয়েছে, আবার শুয়ে পড়েছে।

পরের দিন অন্য দিনের তুলনায় অনেক সকালে উঠল অন্তু। মুখ হাত ধুয়ে সিপ্রাকে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁরে আজ বাজারে যেতে হবে।

সিপ্রা আশ্চর্য হয়ে গেল। যাকে বলে' বলে' বাজারে পাঠানো যায়না, সে আজ নিজে থেকেই বাজার করতে চাইছে কেন! বোধহয় পয়সার দরকার হয়েছে।

দিদির কাছ থেকে ছোড়দা কোনদিন মুখ ফুটে কিছু চায় না। ওর যে দু-এক পয়সা দরকার হতে পারে দিদিরও তা খেয়াল থাকেনা। কিন্তু সিপ্রাকে সব দিকে নজর রাখতে হয়। এই ছোট্ট সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী সে। তাই সবদিকেই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

মাঝে মাঝে ছোড়দার পকেটে কিছু খুচরো রেখে দেয় সিপ্রা। জিজ্ঞেস করলে বলে—হাতের কাছে ব্যাগটা পাইনি তাই তোর পকেটে রেখে দিয়েছিলুম। খরচ করে ফেলেছিস তো, বেশ করেছিস। আমি হিসেবের খাতায় লিখে রেখে দেবখন।

বেশ কিছুদিন হল সিপ্রা ওর পকেটে কিছু রাখতে পারেনি। নিশ্চয়ই ওর পয়সার দরকার হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার করে ছোড়দার হাতে দিয়ে সিপ্রা বলল অন্য কিছু আনতে হবেনা বাবার জন্যে গোটা তিনেক সিগারেট নিয়ে আসিস। এখুনি বেরুচ্ছিস কেন, চা খেয়ে যাবি।

অন্তু কিন্তু চা খাবার জন্যে অপেক্ষা করলনা। টাকাটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। দিদি তখনও ঘুমুচ্ছে।

ফিরল অনেক বেলায়। দিদি তখন অফিস বেরিয়ে গেছে। সিপ্রা কুলোয় করে গম পাশড়াচ্ছিল। চুপি চুপি চোরের মত ছোড়দাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সিপ্রা আর হাসি চাপতে পারলনা। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলিস বলত? দিদি যাবার সময় বলে গেছে, ভাল জামা কাপড় পরে—

ওর কথায় বাধা দিয়ে অন্তু বলল, ভাত বাড় দেখি, আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়ে গেছে।

—চান করবিনা।

চান করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। বলতে বলতে জামাটা খুলে ফেলল। তক্তপোষের ওপর বসে বসে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর হঠাৎ বলল—আচ্ছা বোঁ করে চানটা করেই আসি।

সিপ্রা তেলের বাটি আর গামছা দিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—সাবান মাখবি নাকি। দিদি বলেছে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে। তাই ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী বার করে রেখেছি।

অন্তু যেন ওর কথাগুলো শুনতেই পায়নি। জিজ্ঞেস করল কি রেঁধেছিস আজ।

সিপ্রা ওর দিকে তাকাল। অন্তু তখন পাতকুয়া থেকে জল তুলছে। কুয়োতলার কাছে এসে সিপ্রা বলল, আয় তোর পিঠে সাবান মাখিয়ে দি; গায়ে যা ময়লা।

অন্তু মুচকে হাসল। নাঃ তোমায় আর অত গিন্নীপণা করতে হবেনা। সাবানটা দে আমি নিজেই মাখতে পারব। কি রেঁধেছিস বললি না তো।

কি আর রাঁধবো। কালকের মাছ মাংস, সবই আছে। তুই তো কাল ভাল করে কিছুই খাসনি। তোর রকমসকম দেখে দিদিও বিশেষ কিছুই মুখে দেয়নি। ওপরে রাজেনদাকে কত খাবার দাবার দিয়ে এল।

—তাই নাকি। তা ভাল!—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অন্তু।

সিপ্রা বোধ হয় সেটা লক্ষ্য করেনি। বলল—তোর জন্য একটু দই পেতেছি। দইয়ের যাত্রা ভাল।

খেয়ে দেয়ে ধুতি পাঞ্জাবী না পরে পায়জামা আর হাফশার্ট গায়ে দিয়েই অন্তু বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় ওর ছোট স্যুটকেশ থেকে কি-সব কাগজপত্তর বার করে পকেটের মধ্যে পুরে নিল।

সিপ্রা জিজ্ঞেস করল—এখন আবার বেরুচ্ছিস কোথা. দিদির অফিসে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।

অন্তু বলল—কলকাতায় যাচ্ছি, তবে দিদির অফিসে

অনেক দূরে এগিয়ে গেছে দেখে সিপ্রা চিৎকার করে বলল—তা হলে জামা প্যান্ট বদলে যা। শোন্ ওগুলো ভারি ময়লা হয়ে গেছে; ছেড়ে দিয়ে যা আমি কেচে দে'ব।

অন্তু কোনও কথা বললনা। ফিরেও তাকালনা। আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। এগারোটার ট্রেনটা ধরতে হবে।

ডালহৌসী পাড়ায় এসে অন্তু একেবারে হকচকিয়ে গেল। উঁচু উঁচু বিরাট বাড়ি দেখে নিজেকে ভারি ছোট বলে মনে হল। ভারি গরীব। এখানে কে চাকরি দেবে ওকে! কে ওকে চেনে! কোথা দিয়ে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করবে, কার কাছে জিজ্ঞেস করবে চাকরি খালি আছে কিনা, অথচ কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে কত কথাই না সে ভেবেছিল: কেমন করে সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে, চট্‌পট্‌ ইংরেজীতে কথা বলবে,—সাহেব খুশী হ'বে, খুশী হয়ে চাকরি অফার করবে।

সাহেব কি প্রশ্ন করতে পারে মনে মনে তা ভেবে নিয়ে, তার জবাব কি হবে সেটা ইংরিজীতে তৈরি করে কতবার সে আবৃত্তি করেছিল—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে,—এই ভাবে এখানে চলে আসা তার উচিত হয়নি। কাজটা অত সহজ নয়। একটু দূরে দিদির অফিস দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একবার ভাবল দিদির সঙ্গে গিয়ে দেখা করে কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, তা হলে দিদি কিছুতেই ছাড়বেনা, জোর করে নিয়ে যাবে সুব্রহ্মণ্যমের কাছে। তারপর সেই মাদ্রাজী সাহেব মৃদু হেসে অন্তুকে আহ্বান করবে, ভাল ভাল কথা বলবে;—নাঃ তা কিছুতেই হবেনা।

ভোমলার কথা মনে পড়ে গেল অন্তুর। ভোমলা একদিন বলেছিল—সাহস করে কোনও অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে—একটু বিনীতভাবে নিজের দুরবস্থার কথা নিবেদন করতে পারলে,—চাকরি একটা জুটে যায়। এখনও অনেক ভাল ভাল সাহেব এদেশে আছে। তাদের মনটা অনেক বড়। ঠিক সময়ে ঘা দিতে পারলেই দরজা খুলে যায়।

এই সব ভাবতে ভাবতে একটা অফিসের ভেতর ঢুকে পড়ল অন্তু। দ্বারোয়ান বাধা দেবার আগেই সামনে যে-ঘরটা দেখতে পেল, তার সুইং-ডোর ঠেলে একটু-খানি ভেতরে ঢুকে অন্তু সাহসে ভর দিয়ে জিজ্ঞেস করল—মে আই কাম ইন স্যার।

সাহেব পাইপ নামিয়ে মুখ তুলে একবার তাকালেন। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। নিজের কাজে পুনরায় মন দেবার আগে টেবিলে লাগানো একটা বোতাম টিপলেন।

ক্রিং করে ঘণ্টা বেজে উঠতেই পাগড়ী বাঁধা একজন পিয়ন এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

সাহেব তাকে কি বললেন অন্তু তা বুঝতে না পেরে ঘরের মধ্যে আরও একটু এগিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পিয়ন ধমক দিয়ে উঠল। ইধর কুছ মিলেগা নেহী। নিকালো। জলদি নিকালো।—বলতে বলতে অফিস থেকে বার করে একেবারে ফুটপাথে নামিয়ে দিল অন্তুকে।

বিমূঢ়াবস্থায় সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অন্তু। লজ্জায় অপমানে কিছুটা বা ভয়ে অন্তু একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। হাতের পাতায় কপালের ঘাম মুছে, এক পা, দু'পা করে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে হাঁটতে লাগল। একটুখানি গিয়েই শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল।

······এখন সে কোথায় যাবে! একটা চাকরি কিংবা কোথাও একটু আশ্বাস না পেলে বাড়ি ফিরে সে করবে কি! সন্ধ্যে বেলায় দিদি যখন বকাবকি সুরু করবে,—তখন সে কী জবাব দেবে।······ওর জন্যে সিপ্রাও বকুনি খাবে, তারপর ওপর থেকে নেমে আসবে রাজেনদা, তার মা ছোট ছোট ভাইবোনেরা। সবাই মজা দেখবে।··· নাঃ তা কিছুতেই হবেনা। একটা যে কোনও কাজ তাকে জোগাড় করতেই হবে। দিদি যদি জিজ্ঞেস করে,—দিদিকে স্পষ্ট বলে দিতে হবে—তোমার যা খুশি তা তুমি করতে পার আমার চাকরির জন্যে তোমাকে ভাবতে হবেনা।

এই সব কথা মনে হতেই অন্তু যেন একটু উৎসাহ পেল। দূরে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ হাতে কোট প্যান্ট টাই-পরা এক ভদ্রলোককে আসতে দেখে অন্তু অপেক্ষা করতে লাগল। ভদ্রলোকের রঙ ফর্সা কিন্তু সাহেবদের মত লাল নয়। অন্তু বুঝতে পারল— ভদ্রলোক ইংরেজ নন, তবে বাঙালীও নন।

ভদ্রলোক কাছে আসতেই অন্তু ঘাড় নেড়ে বলল,—গুড্ আফটার নুন্ স্যার।

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

অন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে—মুখস্থ করা কতকগুলো ইংরেজী শব্দ গড়গড় করে আবৃত্তি করল। ভেবেচিন্তে তার তর্জমা করলে দাঁড়ায়—আমার একটা চাকরির দরকার আমরা খুব গরীব! আপনি দয়া করে আমায় একটা চাকরি দিন।

ভদ্রলোক মুচকে হাসলেন। তারপর কিছু না বলে অন্তুকে পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গেলেন। খানিকটা গিয়ে থামলেন। ইশারায় ডাকলেন অন্তুকে। অন্তু তাড়াতাড়ি ছুটে এল।

ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, অন্তু রান্নাবান্নার কাজ জানে কি না। কেন না তার একটা বাঙালী সারভেন্ট-কাম-কুকের দরকার।

অন্তু আশ্চর্য হয়ে বলল—রান্নাবান্না! সে কি! আমি তো অফিসের কাজের কথা বলছি। আমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছি স্যার! সার্টিফিকেট দেখাতে পারি।—বলেই বিনীতভাবে মাথা নিচু করে নেয়। ওঁর ব্যাগটা দেখতে লাগল অন্তু। হঠাৎ নজর পড়ল ওপরের খাপে রাখা টাইপ করা একটা কার্ড। সেখানে লেখা রয়েছে এস, কে সুব্রহ্মণ্যম্।—নিচে বোধহয় অফিসের নাম। সেটা ভাল করে পড়বার আগেই ভদ্রলোক চলে গেলেন।

গভীর উত্তেজনায় অন্তুর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। তবুও নিজেকে কোনও ক্রমে স্থির রেখে রুদ্ধশ্বাস হয়ে অন্তু দেখল—ভদ্রলোক দিদির অফিসেই ঢুকলেন।

এস, কে সুব্রহ্মণ্যম্! বাঙালী কুকের দরকার!—অস্ফুট ভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অন্তু। তার পর ধীরে পায়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে বড় বাজারের ভেতর দিয়ে পোস্তার দিকে এগোতে লাগল।

কোনও দোকানে যদি কেউ নেয়। কিন্তু কাউকে কোনও কথা বলতে পারলনা। এখানকার মানুষগুলো সবাই ব্যস্ত। অন্তুর কথা শোনার মত এতটুকু ফুরসৎ কারোর নেই।

একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকল অন্তু। যেমন ক্ষিধে পেয়েছে, তেমনি তেষ্টা। কিছু কচুরি তরকারি কিনে খেতে লাগল। খেতে খেতে হঠাৎ নজরে পড়ল, —ফুটপাথের ওপাশে একটা চত্বরের ওপর মাদুর বিছিয়ে কতকগুলো ছেলে বসে বসে ঠোঙা তৈরি করছে। ছেলেগুলো সবাই ছোট। অন্তুর বয়সীও দু একজন আছে।

ঢক্ ঢক্ করে এক গ্লাশ জল খেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে সেই ছেলেদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল অন্তু। একটা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল,—তোমরা যে ঠোঙা তৈরি করছ তার জন্যে পয়সা পাও?

হ্যা তা না হলে ব্যাগার খাটছি নাকি।

—আমাকে তোমরা দলে নেবে।

—তুমি এ-কাজ জান? না জান তো শিখে নিতে হবে। যদ্দিন না শিখতে পারবে তদ্দিন গ্যাটের পয়সা খরচ করে এখানে আসতে হবে। পারবে?

হুঁ! নিশ্চয়ই পারব। অন্তু চত্বরের ওপর উঠে গিয়ে বলল।

ওপাশের পর্দা সরিয়ে নিকেলের চশমা-পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—কি চাই এখানে।

—আমি এদের মত এখানে কাজ করতে চাই।

—বেশ তো আরম্ভ করে দাও। নিয়মকানুন এরাই সব বলে দেবে। বলেই ভদ্রলোক আবার ভেতরে চলে গেলেন।

সেই ছেলেটি এসে বলল—কাগজ নিয়ে এসেছ তো! এই নাও কাঁচি। এইভাবে কাটতে হবে। এইভাবে আঠা দিয়ে জুড়তে হবে। সব এক রকমের সাইজ হওয়া চাই।

অন্তু বলল---কাগজ তো আমার কাছে নেই।

—তা হলে কিছু খবরের কাগজ নিয়ে কাল সকালে এসো।

অন্তু বলল,—আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি! বলে আমার পকেট থেকে ভাঁজকরা একটি রঙীন কাগজ বার করল। ছেলেটি যেমন ভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল সেইভাবে কেটে, সেইভাবে আটা দিয়ে জুড়ে দিতেই সুন্দর একটা ঠোঙা হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে অন্তু চিৎকার করে বলল, —এই দেখ আমার হয়ে গেছে।

ছেলেটি মুচকে হেসে বলল—যাও বাবুকে দেখিয়ে এস।

অন্তু ঠোঙা হাতে করে ভয়ে ভয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছেন। অন্তু এসেছে জানতেই পারেন নি।

অন্তু বলল—এই দেখুন আমি তৈরি করেছি।

ভদ্রলোক ঠোঙাটা হাতে করে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ চমকে উঠলেন। গম্ভীর অথচ কেমন যেন বিহ্বল গলায় বললেন—এটা তুমি তৈরি করেছ?

অন্তু ভয়ে ভয়ে বলল—হ্যাঁ স্যার।

—এ কাগজ তুমি কোথায় পেলে? এটা যে সার্টিফিকেট!

—আমার কাছে ছিল স্যার। ওরা কেউ দেয়নি।

ভদ্রলোক ঠোঙাটা চোখের ওপর তুলে ভেতরটা ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন,,...শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

—হ্যাঁ স্যার আমারই নাম শ্রীঅনন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

—তুমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছ?

হ্যাঁ স্যার।

ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে অন্তুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অন্তু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—ঠোঙাটা ঠিক হয়েছে স্যার?

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে নূতন শ্রমিক ইউনিয়নের অসংখ্য অতি-বৃদ্ধি

১৯৬৭ সালের ১৫ই মার্চ হইতে ৩০এ জুলাই পর্য্যন্ত এ রাজ্যে প্রায় ৩৬০টি নূতন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। গত বিশ বৎসরের মধ্যে কোন বছরেই শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যার এমন বৃদ্ধি (প্রায় দ্বিগুণ) দেখা যায় নাই। এই প্রকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে মনে করা যাইতে পারে যে রাজ্য সরকার যে সর্তে এবং যেভাবে ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিধি বিধানগুলি গঠনের পূর্ব্বে ইতিপূর্ব্বে সবিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, বর্ত্তমান রাজ্যসরকারের শ্রমদপ্তর এখন তাহা করিতেছে না। এবিষয়ে হয়ত আমাদের বর্ত্তমান শ্রমমন্ত্রীর কিছু হাত থাকিতে পারে। তাঁহার মতে কংগ্রেসী সরকারের আমলে শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্টারী বা সরকারী স্বীকৃতি দিবার বিষয়ে রাজনৈতিক তথা কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস সমর্থিত আই এন টি-ইউ-সির স্বার্থ এবং কর্তৃত্ব যাহাতে কোন ভাবে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার বিষয় কর্তৃপক্ষ সদা সতর্ক থাকিতেন: কিছু বলা সম্ভব নয়, কিন্তু শ্রমমন্ত্রী যাহা বলিতেছেন, শ্রমমন্ত্রীর এমন প্রকার মতামতের উপর আমাদের পক্ষে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও—অন্য পক্ষ আজ (অ-) সংযুক্ত দলীয় সরকার সম্পর্কে শ্রমিক ইউনিয়নের সরকারী স্বীকৃতি সম্পর্কে একই অভিযোগ করিতে পারে না কি?

"একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে একটি শ্রমিক ইউনিয়ন"—এই নীতিতে শ্রমমন্ত্রী বিশ্বাস করেন না।" এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে ভাবে দুই, তিন, চার বা ততোধিক ইউনিয়ন গঠিত হইতেছে, তাহাতে শ্রমিকদের ঠিক কি সুবিধা হইবে জানি না, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা কর্তৃপক্ষকে যে ক্রমশ অশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আসানসোল অঞ্চলের, একটি ভারতবিখ্যাত ইস্পাত কারখানার কথা বলা যায়। বর্ত্তমানে সেখানে চারটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে এবং বিবিধ দাবীদাওয়া লইয়া এই চারিটি ইউনিয়নের মধ্যেই মতের মিল হইতেছে না, মাঝে মাঝে সংঘর্ষও দেখা দেবার উপক্রম হইতেছে। বিরোধ মীমাংসা করিতে হইলে কর্তৃপক্ষ কাহার সহিত, কোন ইউনিয়নের সহিত আলোচনা করিবেন? এক একটি ইউনিয়নের দাবী এক এক প্রকার এবং সব দাবী এবং বিরোধ স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সহিত আলোচনা দ্বারা মিটাইতে হইলে, কোন কালে তাহা মিটিবে কি? 'ক'-ইউনিয়নের সহিত যাহা স্থির হইবে, 'খ'-ইউনিয়ন তাহা মানিবে না, 'ক' এবং 'খ' ইউনিয়নের সহিত বিরোধ যে-সর্ত্তে মিটমাট হইল, 'গ' এবং 'ঘ' ইউনিয়ন তাহা বাতিল করিয়া দিতে বিলম্ব করিবে না? বাস্তবেও ইহাই দেখা যাইতেছে। ইহা ছাড়া ইউনিয়নগুলির শ্রমিক সদস্যদের মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত যে 'ক্রসিং দি ফ্লোর'—নীতি গৃহীত হইবে না, তাহারই স্থিরতা কি?

শ্রমিক ইউনিয়নের আধিক্য অর্থাৎ সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে কর্ম্মীদের মধ্যে আজ হঠাৎ ট্রেড ইউনিয়ন জ্ঞান জাগ্রত হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেকটি ট্রেড ইউনিয়নই কোন না কোন পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা পরিচালিত এবং পার্টির নেতারা শ্রমিক স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা

নিজ নিজ পার্টির স্বার্থ এক (তথাকথিত প্রেষ্টিজ রক্ষায় অধিকতর তৎপর) এবং এবিষয়ে বর্ত্তমানে শ্রমমন্ত্রীকেও একেবারে নির্দোষ বলা যায় না। এইভাবে শ্রমিক ইউনিয়ন সংখ্যা (এক একটি সংস্থায়) যদি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শ্রমিকদের মঙ্গল অর্থাৎ স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা শ্রমিকদের মধ্যে দলাদলি এবং শেষ পর্য্যন্ত নানা সংঘর্ষ বাধিতে বাধ্য। কলকারখানার মধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করাও অসম্ভব হইবে, যাহার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হইবেই কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রমিকদের দাবীর মাত্রাও ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী হইয়া শেষ পর্য্যন্ত হয়ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে সমস্তই বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য করিবেন।

শ্রমমন্ত্রী একটি বিশেষ উপদেশ হয়ত অতি মহৎ এবং উদার, তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে শ্রমিকদের বোনাস, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবীগুলি মিটাইয়া দেওয়া মালিকদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য—এবং ইহা একবার করিতে পারিলেই শ্রমিক মহলে চিরশান্তি স্থাপিত হইবে, মালিক এবং শ্রমিক একেবারে "ভাই ভাই" গদগদ প্রেমে মসগুল হইবেন…'শ্রমমন্ত্রীর এই উপদেশামৃত বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই প্রতিশ্রুতিও দিতে পারিতেন যে—"১৯৬৭ সালের পূজার পূর্ব্বে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া মিটাইয়া দিলে, শ্রমিকমহল হইতে আগামী ১৫ বৎসর নূতন কোন দাবী উঠিবে না এবং শ্রমিক মালিক ঠেঙ্গানো এবং 'ঘেরাও' অবরোধ প্রথা চিরতরে বর্জ্জন করিবে"—কাজের কাজ কিছু হয়ত হইত।

আমাদের শ্রমিক গতত্রাণ নবীন শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের যেভাবে হাঁস মারিয়া ডিম খাওয়াইবার' রেওয়াজ চালু করিয়াছেন, হঠাৎ এই (অ-) সংযুক্ত সরকারের পতন না হইলে, তাহার কোন প্রতিকার হইবে না এবং এই নীতির ফলে কেবল মালিকপক্ষই মরিবে না, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকপক্ষও মরিবে—শ্রমমন্ত্রীও সহযাত্রী হইবেন।

শ্রমিক ইউনিয়নে পার্টি বিশেষের আধিপত্য বিস্তার

এরাজ্যে এই বৎসর মার্চ মাস হইতে সি পি আই (এম) এক একটি করিয়া ক্রমশ শতকরা শতটি ইউনিয়নই নিজেদের 'দখলে' আনিতে প্রবল প্রয়াস চালাইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় আই এন টি ইউ সি'র অন্তর্গত কয়েকটি ইউনিয়নের নেতৃত্ব সি পি আই (এম) দখল করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের নেতৃত্ব বদল হইলেও, মেম্বারদিগের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে যে সকল পার্টি লেবার ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব এখন করিতেছে, সেই পার্টিগুলির মধ্যে প্রবল সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম নহে এবং এই সংঘর্ষ বাধিলে একবার দেশব্যাপী যে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং কলকারখানার নিয়মিত উৎপাদনে যে বিষম বিঘ্নবাধার সৃষ্টি হইবে, তাহার মারাত্মক ফল কেবল মালিকপক্ষ এবং দেশবাসীই নহে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, বেকার হইয়া ভোগ করিবে!

এরাজ্যের বর্তমান 'জোড়াতালি'-সরকার—(দেশের সব কিছুতেই একটা রিভলিউসন এবং সংগ্রামের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়াসী। বিশেষ কয়েকজন অতি-সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন মন্ত্রী এবিষয় প্রবল আগ্রহী। শ্রমিক সাধারণকে পার্টির'বুলি-বিভ্রান্ত'করিয়া বিশেষ একটি পার্টি রাজ্যে তাহাদের একাধিপত্য বা সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে অতি অভিলাষী—শ্রমিকের সত্যকার কল্যাণ-অকল্যাণ এই বিশেষ পার্টির কাছে একেবারে গৌণ বিষয়, মুখ্য উদ্দেশ্য রাজ্যে সকল দিকে, সকলভাবে এবং সকল ব্যাপারে অরাজকতা সৃষ্টি এবং সেই ফাঁকে পার্টি নেতৃত্বের আসল মতলব চরিতার্থ করা। রাজ্য সরকার সবই দেখিতেছেন, কয়েকজন মন্ত্রী বুঝেনও সবই কিন্তু কেন্দ্রের মতই এরাজ্যের এক একজন মন্ত্রী স্ব স্ব দপ্তরে স্বাধীন নৃপতি সমান কারণ তাহা না হইলে, যে 'ঘেরাও' ভারতের অন্য সকল রাজ্যে কঠিন হস্তে দমিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের একজন মন্ত্রীর উন্মাদোচিত খামখেয়ালিকে চরিতার্থ করিবার জন্য এরাজ্যে 'ঘেরাও' নামক দুষ্ট শিল্প-বাণিজ্য-সংহারী বীজাণুকে এভাবে বিষ ছড়াইবার অবকাশ কেন দেওয়া হইতেছে বুঝা অসম্ভব! শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী এবং তাহাদের বাঁচিবার মত অর্থ সংস্থান অবশ্যই করা প্রয়োজন, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্য-কলকারখানা যাহাতে অচল না হয় অর্থাভাবে, তাহাও দেখিতে হইবে। দেশের শিল্পবাণিজ্য কলকারখানায় শ্রমিকদের গুরুত্ব এবং প্রয়োজন

কহ অস্বীকার করে না, কিন্তু এক পক্ষের সকল দাবী রাজ্য সরকার স্বীকার করিয়া লইবে নতমস্তকে, কিন্তু অন্য পক্ষের ন্যায্য দাবীর কোন মূল্য যদি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহার কিছু নমুনা পাওয়া গিয়াছে গত কয়েক মাসে। এ রাজ্যে প্রায় ৪৬টি কলকারখানা বাধ্য হইয়া বন্ধ হওয়ায় এবং তাহার ফলে একমাত্র কলিকাতায় প্রায় ৭,৫০০০ লোকের বেকারত্ব লাভে! অবস্থার প্রতিকার না হইলে অদূর ভবিষ্যতে আরো বহু বহু কলকারখানা দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে এবং আরো বেশ কয়েক লক্ষ লোক বেকার হইবে! বেকারের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, রাজ্যে নানা প্রকার অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতিও বাড়িতে বাধ্য। এমনিতেই বর্ত্তমানে এ রাজ্যে কোন প্রকার আইন, শৃঙ্খলা, মানুষের নিরাপত্তা বলিয়া কিছু নাই বলিলেই চলে, যদিও অতি মহাশয় শ্রীজ্যোতি বসুর মতে এ রাজ্যে ল অ্যাণ্ড অর্ডার অতি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, (বি-) যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের পরম সতর্ক দৃষ্টি এবং শাসন ব্যবস্থার কল্যাণে!

শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের মূল্য অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নকে যদি প্রকৃত কল্যাণময় করিতে হয়, তাহা হইলে কতকগুলি ন্যায্য বিধি-বিধান ও ইউনিয়নকে স্বীকার করিতে হইবে। ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক দলাদলি এবং পার্টি পলিটিক্সের বাহিরে অবশ্যই রাখা দরকার। কিন্তু যতদিন বাহিরের ভাড়াটে এবং পেশাদার ইউনিয়ন-লিডার শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে পরিচালনা করিবেন (ব্যতিক্রম কিছু কিছু অবশ্যই আছে) ততদিন ইউনিয়নগুলি ইহাদের শিকারের ক্ষেত্রই থাকিবে। বর্ত্তমান রাজ্য সরকার—প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর 'পোষ্টার' ট্রেড ইউনিয়ন লীডারদের শিকার ক্ষেত্র বিস্তারিত করিবার সর্ব্বপ্রকার অবকাশ দান করিতেছেন! ইহার ফলে সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেণ্টের বুকে ছোরা বসান হইতেছে কি না বিচার্য। কলিকাতায় এমন কতকগুলি শ্রমিক ইউনিয়ন আছে—যাহাদের 'ফাণ্ড' সম্পর্কে বিশেষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই ফাণ্ডের' অর্থ ব্যবহারের সম্পর্কে নানা প্রকার কথা শুনা যায়, সত্য হইলে তাহার বিচার বিভাগীয় প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

'মাও বাদ'

ভারত সরকার দেশে 'মাও বাদ' প্রচার নিষিদ্ধ এবং বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছে। সমীচীন ঘোষণা সন্দেহ নাই। কিন্তু হঠাৎ এক সংবাদে দেখা গেল যে একজন প্রখ্যাত বাঙ্গালী থিয়েটার এবং ফিলম্ অভিনেতা, জলপাইগুড়িতে এক জনসভায় অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেন যে চীন নেতা মাও-এর চিন্তাধারা এবং নীতি ভারতে সোস্যালিজম্ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ, যে-নীতি কিছুকাল পূর্ব্বে নাক্সাল বাড়ীতে প্রকট হয়।

এই জনসভাতেই উক্ত নট-ঠাকুর পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কুঙার (সি পি আই এম) মহাশয়কে কংগ্রেসী দালাল বলিয়া অভিহিত করেন এবং আরো বলেন যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়েই মার্কিণ তাঁবেদার দালাল। কেন্দ্র সরকারকে নিন্দা করিবার সুযোগ এই সি, পি, আই (এম) নটরাজ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন, স্বভাবধর্ম্ম বশতঃ, কিন্তু তিনি 'সেমসাইড গোল' কেন করিলেন বুঝিলাম না। গোপন কোন কারণ যদি থাকে তাহা আমাদের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

প্রাকাশ্য ভাবে সি, পি আই (এম) যখন লাল-চীনের কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়া, তাঁহাদের নীতি এবং কার্য্যক্রম স্বাধীনভাবে স্থির করিবেন, চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া, সেই সময় মাও-ভক্ত এই বাঙ্গালী নটরাজ হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া দেশে লাল চীনের পক্ষ হইলেন কেন জানি না। 'চীনের দালাল' কথাটা ভাল নহে, তাহা না হইলে এই নটরাজকে ঐ ভাবেই অভিহিত করা বেঠিক হইত না।

"জনগণই আমাদের কাজের বিচার করবেন।"—মুখ্যমন্ত্রী

কিছুদিন পূর্ব্বে এক আলোচনা সভায় শ্রীঅজয় মুখার্জি বলেন—"যুক্তফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে বড় কোন কাজ দেখাইবার সুযোগ পান নাই (কথাটা ঠিক হইল কি? বলা উচিত ছিল বড় কোন কাজ দেখাইতে পারে নাই)। কিন্তু জনগণের কর্তৃত্ব ও অধিকার বজায় রাখিয়া শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন যে "জনগণের বিচার

করা কর্তব্য আমরা সেই আদর্শের পথে চলিয়াছি না পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছি। সমালোচনাই ঠিক পথে চালায়। তাই সমালোচনাই চাই, সুখ্যাতি চাই না।"

আজ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দেখিয়া বলিতে দ্বিধা নাই যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সূচনাকালে বাঙ্গালী, শতকরা আশীজন বাঙ্গালী, যে আশা করিয়াছিল, তাহা গভীর নিরাশাতে পরিণত হইয়াছে। আমরা এই অকংগ্রেসী সরকারের জন্মকালে বলিয়াছিলাম কংগ্রেসী শাসন মুক্ত হইয়া দেশের শাপমোচন হইল—কিন্তু আজ দেখিতেছি আমরা 'ফ্রাইং প্যান হইতে ফায়ারে' পড়িয়াছি তপ্ত কটাহ হইতে উনানের আগুনে পড়িয়া বাঙ্গলা দেশ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। এ ডাক হয়ত রাজভবনে, কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে প্রবেশের পথ পাইতেছে না, কিন্তু জনগণের মধ্যে কান খোলা রাখিয়া দাঁড়াইলে যে কেহ কষ্টাগ্নিদগ্ধ মানুষের ক্রন্দন শুনিতে পাইবে, আর চোখ বন্ধ না থাকিলে মানুষের বিষম যন্ত্রণার ছটফটানিও দেখিতে পাইবেন।

সাধারণ মানুষ আজ স্পষ্টই বলিতেছে—কংগ্রেসী শাসন দীর্ঘ বিশ বৎসরে সাধারণ মানুষের যে-দুর্দশা দুঃখ-দারিদ্র্য এবং শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের যে সর্বনাশ সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই—তথাকথিত এই যুক্তফ্রন্ট (না জোড়াতালি। সরকার তাহা মাত্র ছয় মাসের মধ্যে অবলীলাক্রমে সার্থক করিয়াছে।

কেবল মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ এবং সর্বপ্রকার অসহনীয় কষ্ট বৃদ্ধিই নহে, রাজ্যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক সুষ্ঠু ব্যবস্থারও শ্রাদ্ধ করিতে এই সরকার যে তৎপরতা দেখাইয়াছে, ভারতে তাহার তুলনা অন্যত্র পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

পশ্চিমবঙ্গের জেলা শাসকগণ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এই বলিয়া যে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যে কেবল হস্তক্ষেপই নহে, বিবিধপ্রকার বাধার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। 'কাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে, কাহাকে হইবে না, কাহাকে ধরিয়াও ছাড়িয়া দিতে হইবে আর কাহাকে হইবে না' এই সব ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মেম্বার (বিশেষ করিয়া একটি লোহিত পার্টির) যে দাপট দেখাইতেছে, তাহা একদিকে যেমন দেখিতে হাস্যকর—অন্যদিকে তেমনি পদস্থ অফিসারদের পক্ষে অবমাননাকর। সাক্ষাৎ ভাবে জানা আছে, এক স্থান হইতে একজন পার্টি মেম্বার বৃহত্তর কলিকাতার এক থানা অফিসারকে টেলিফোনে বিশেষ এক বা কয়েকজন ব্যক্তির উপর (অন্য পার্টির) নজর রাখিবার নির্দেশ দিতেছেন। নির্দেশে ইহাও বলা হইল যে সুযোগ পাইলেই, কিংবা সুযোগ না থাকিলেও তাহা সৃষ্টি করিয়া লইয়া অমুক ব্যক্তিটিকে যেমন করিয়া হউক আটকাইয়া লক-আপে রাখিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত থানা অফিসার কি করেন তাহা জানা নাই, তবে প্রাণের দায়ে তাঁহাকে বোধহয় নত মস্তকে "নির্দেশ" মানিতে হয়—। ইহা প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। ইহার শেষ কোথায়?

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের অতি স্পষ্ট নির্দেশ দান করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন কর্তব্য কার্যে, কোন পার্টির বা পার্টি লিডারের মতামত কিংবা নির্দেশের কাছে নতি স্বীকার না করিয়া, করিয়া যান। রাজনৈতিক দল-গুলির প্রাণের বাসনা এই যে পশ্চিমবঙ্গের জেলা শাসকগণ তাঁহাদের কথা মত কাজ করিবেন এবং এই বাসনা পূর্ণ হইলে, এক একটি রাজনৈতিক দল, বিরুদ্ধ দলগুলিকে যথাক্রমে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিতে পারিবেন!

বর্তমানে অবস্থা যে-প্রকার তাহাতে পুলিশকে অথবা বেকার না রাখিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্-টেনডেন্টদের পূর্ণ আজ্ঞাধীন করা একান্ত প্রয়োজন। রাজ্যের চারিদিকে যখন তখন কারণে অকারণে যে প্রকার হৈ-হল্লা, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকর্ম এবং খুন জখমের প্রাবল্য দেখা দিয়াছে, তাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা পুলিশকে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান বর্তমানে অত্যাবশক। পার্টি নায়ক এবং পদাতিকদের দাবীমত পুলিশ অফিসারদের সাসপেণ্ড করা এবং 'দাবীর' জোর থাকিলে বরখাস্ত বন্ধ করা প্রয়োজন অবিলম্বে।

মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গের শতকরা অন্তত আশীজন মানুষ বর্তমান রাজ্য সরকারকে সত্যই 'যুক্তফ্রন্ট' সরকার মনে

করিয়া এই সরকারের উপর যে-আশা, যে-বিশ্বাস এবং যে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, মাত্র ছয়মাসকাল মধ্যে সবই মিথ্যা ও বৃথা বলিয়া প্রমাণিত হইল। বাস্তবে দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান সরকার 'যুক্ত' নহে—'অসংযুক্ত ফ্রণ্ট সরকার'। মন্ত্রীমণ্ডলে ঐক্যের পরিবর্ত্তে অনৈক্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এবং ব্যাপারে কেবিনেট সদস্যদের কয়েকজন অন্তত, যাহাকে বলে 'মেছোবাজারী' কাণ্ড—তাহাই প্রকাশ্যে সুরু করিয়াছেন! এমন অদ্ভুত একটি অসংযুক্ত এবং অসংযত দলসমষ্টির হাতে দেশের শাসন ভার যদি আরো কিছুকাল থাকে তাহা হইলে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভীষণ উজ্জ্বল ছাড়া আর কি ভাবিতে পারা যায়?

মুখ্যমন্ত্রী যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন আজ রাজ্যব্যাপী জনগণ তাহাই করিতে অর্থাৎ বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজের বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিচারের রায় কি হইবে তাহা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। এখনো হয়ত সময় আছে, যদি মুখ্যমন্ত্রী কঠোর হস্তে তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীর বিশেষ জন চার-পাঁচ সদস্য বা সরিকদারকে সংযত কিংবা প্রয়োজন হইলে দমন করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর অবশ্য পালনীয় 'কোডের' মধ্যে আনিতে পারেন। সাধারণ মানুষ আশা করে দেশ শাসনের ভার যে সব মানুষ (মন্ত্রী) লইবেন, তাঁহারা আর কিছু না হউন—ভদ্র এবং মন্ত্রীমণ্ডলীকে দেখিবেন পার্টির বা পার্টি-স্বার্থের ঊর্দ্ধে। বর্ত্তমানে ইহারই একান্ত অভাব দেখা দিয়াছে।

———

পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমান শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা

একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে বর্ত্তমান তথাকথিত যুক্ত-ফ্রণ্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প, কল-কারখানা, এবং অন্যান্য প্রকার প্রায় সকল সংস্থাগুলিতে (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতিও বাদ যায় নাই) শ্রম এবং অন্যান্য প্রকার বিরোধ কারণ, সামান্য কারণ এমন কি অকারণেও সবিশেষ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং আজ এই বিষম সংক্রামক ব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে।

আমাদের রাজ্যে, একদা ট্রেড-ইউনিয়ন লীডার বর্ত্তমান শ্রমমন্ত্রী শ্রম দপ্তরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হিসাবে আসরে অবতরণ করিয়াই তাঁহার মালিক-বধ অস্ত্র সুদর্শনচক্রের বর্ত্তমান সংস্করণ "ঘেরাও" দ্বারা বাঙ্গলার শিল্পক্ষেত্রে 'কুরুক্ষেত্রে'র সূচনা করিলেন। রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে পাপী মালিক পক্ষের দমনকারী এই অবতারের মারণ অস্ত্র প্রয়োগের ফলে মাত্র ছয় মাসে যাহা ঘটিল, ভারতের অন্যরাজ্য শাসকগণ তাহা বিস্ফারিত নয়নে দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে "ঘেরাও" মহাস্ত্র যাহাতে প্রয়োগ না করা হয় সে-বিষয় সতর্ক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া "ঘেরাওকে" প্রকারান্তরে ঘেরাও করিয়া রাখিলেন। এমন কি ভারতের লাল-রাজ্য কেরলেও "ঘেরাও" অস্ত্র প্রয়োগ নামবুদ্রিপাদ সরকার কঠোর হস্তে দমিত রাখিতে দ্বিধা করেন নাই।

সত্যকথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীর শ্রমনীতি আমাদের পক্ষে সুবোধ না হইয়া দুর্বোধই হইয়াছে। কোন রাজ্যসরকার রাজ্যের প্রশাসন বিষয়ে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করিতে পারে এতদিন তাহা ভাবিতে পারি নাই।

শিল্পক্ষেত্রে তিনটি পক্ষ আছে (১) মালিকপক্ষ (২) সরকার এবং (৩) শ্রমিক। কিন্তু গত কয়মাসের রাজ্যের শ্রম-প্রশাসন পদ্ধতি দেখিয়া নিরপেক্ষ মানুষের এই ধারণাই হইবে যে শিল্প বাণিজ্যক্ষেত্রে এখন পক্ষ মাত্র দুইটি শ্রমিক এবং সরকার। মালিকপক্ষ, এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণপক্ষ হইয়া পড়িয়াছেন অর্থাৎ শ্রমবিরোধে শ্রমিকদের দাবীমত সরকার একতরফা বিচার করিয়া যে রায় দিবে মালিকপক্ষ তাহা মানিতে বাধ্য। কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিলে হঠাৎ ঘেরাও (সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার অফিসারদের জোর করিয়া রৌদ্র বৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখা, (অবশ্য শান্ত ভাবে) এবং তাহার পর ষ্ট্রাইক (ফিজিক্যাল এবং মেটিরিয়্যাল) খুসী এবং ইচ্ছামত।

বিবিধ প্রকার শ্রমবিরোধের ফলে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত-পক্ষে ৫০টি কলকারখানা দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে গত মার্চ হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত। লক্-আউটের সংখ্যা প্রায় ৮৫, যাহার ফলে প্রায় ৮৪,০০০ শ্রমিক সাময়িকভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য আপোষ

চুক্তির ফলে মিটমাট হইয়া কলকারখানা আবার চালু হইলেও, শ্রমিক মহলের যে প্রকার মতিগতি এবং মেজাজ যে প্রকার মিলিটারী, তাহাতে আবার কোথায় কি ঘটে কেহই বলিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে মন্দা এবং গোল-যোগের ফলে প্রায় ৫৭,০০০ শ্রমিক ছাটাই কিংবা লে-অফ করা হইয়াছে। এই সংখ্যা গত একমাসে বৃদ্ধি পথে চলিয়াছে। আমাদের শ্রমমন্ত্রী বোধহয় এখন নূতন কোন অস্ত্রের কথা চিন্তা করিতেছেন যাহা দ্বারা এই সবের প্রতিরোধ করা চলিবে। শ্রমমন্ত্রী কি পারিবেন, না পারিবেন জানিনা কিন্তু 'মরা হাঁসগুলিকে' না বাঁচাইয়া অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিকদের কিসের ডিম খাওয়াইবেন ?

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে অর্থনিয়োগে বাধার সৃষ্টি

শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের ধারণা বা বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, গত কয়েকমাস হইতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে নূতন অর্থ বিনিয়োগ করিতে কোন শিল্পপতি ভরসা পাইতেছেন না, বা কাহারো ইচ্ছাও নাই। ইহার প্রধানতম কারণ ক্রমশ শ্রমিক সমস্যা যেমন 'ঘেরাও' ঘোরালো তেমনি জটিল হইয়াছে। শ্রমমন্ত্রীর নির্ব্বাচিত 'ঘেরাও' হাতিয়ারটি এ-রাজ্যের শিল্পের বুকে ক্রমাগত ছোরার আঘাত চালাইতেছে এবং যত দিন যাইতেছে ঘেরাও এর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে, কেবল শিল্পক্ষেত্রেই নহে, প্রায় সর্ব্বপ্রকার সংস্থাতেই! এখন অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে শ্রমমন্ত্রী এবং ট্রেড ইউনিয়ন লিডাররাও শ্রমিক (বেপরোয়া) আন্দোলন দমন করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। শ্রমমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে ঘেরাও এবং অন্য প্রকার অযথা শ্রমিক আন্দোলন একটু (?) মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? শ্রমিক-কল্যাণ করিতে গিয়া শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের এত বড় অকল্যাণ করিবেন তাহা বোধহয় তাঁহার বিচার বুদ্ধিতে ইতিপূর্ব্বে আসে নাই।

শ্রমমন্ত্রীর, উসকানী বলিব না, মৌন সম্মতিতে রাজ্যের বহু ছোট ছোট কলকারখানা দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী এবং ঘেরাও প্রভৃতির কল্যাণে। যে সব কলকারখানা এতদিন কোন রকমে ঠাট বজায় রাখিয়াছিল সুদিনের আশায়, নূতন শ্রমমন্ত্রী গদি আরোহণ করিয়াই তাহাদের ক্ষীণ আশার প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন। তাঁহার একটি মাত্র ফুৎকার!

ট্রেড ইউনিয়ন লীডার সাধারণত এক চক্ষু হরিণের মত—তিনি কেবল শ্রমিকের দিকটাই দেখিতে অভ্যস্ত। শ্রমিকের দাবী তাঁহার নিকট শেষ কথা, কিন্তু যাহাকে এই দাবী মিটাইতে হইবে, তাহারও যে একটা দিক আছে, সাধ্য অসাধ্য আছে, লীডার মহাশয়ের তাহা দেখিবার দায় নাই, কারণ ঐদিকটা দেখিতে গেলে লীডারত্ব লোপ পাইতে সময় লাগিবে না, আজকের লীডার কালই মালিকের 'দালালে' পরিণত হইবেন। আমাদের নবীন শ্রমমন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়ন লীডার হইতে হঠাৎ শ্রমমন্ত্রী হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার দোষ নাই, এখনও তিনি এক চক্ষু হরিণের মত এক দিকেই দৃষ্টি দিতেছেন। পূর্ব্বে যদি এই ভদ্রলোক কোন ক্ষুদ্র কলকারখানা কিংবা সামান্য ব্যবসায় সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব পাইতেন বা লইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার দুইটি চক্ষুই সমান কাজ করিত এবং তিনি মালিকপক্ষেরও দায়-দায়িত্ব এবং সুবিধা অসুবিধার কথা বুঝিয়া শ্রমিকের দাবী দাওয়ার সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রায় দিতেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গে নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপন করিবার সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন সত্য কথা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে যে অরাজকতা এবং 'ডাণ্ডাবাজী' চলিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কোন শিল্পপতি কিংবা দুর্গত ক্যাপিট্যালিষ্ট নূতন করিয়া আবার এ রাজ্যে নূতন কিছু করিতে বিন্দুমাত্র ভরসা এবং সামান্য উৎসাহও বোধ করিতেছেন না। অথচ চাহিয়া দেখুন, কেরল, ওড়িষ্যা মহীশূর বিহার প্রভৃতি রাজ্যে কি ভাবে শিল্প প্রসার হইতেছে।

আমাদের শিল্পমন্ত্রী যদি কোনক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটু সামলাইতে পারেন, কিছু কাজের কাজ হয়ত হইবে।

রাজ্যে যুক্ত-ফ্রন্ট মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যগণ কি অসহায় ভাবে রাজ্যের সর্ব্বনাশ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দেখিতে

কিবেন? কোনো বিশেষ মন্ত্রী যদি উন্মাদের মত ব্যবহার রিতে থাকেন তাহা হইলেও কি রাজ্যের পক্ষে এই পরম তিকর সর্বনাশা উন্মাদনা রোধ করিবার কোন ক্ষমতা বা রসা অন্যান্য মন্ত্রীদের নাই? এরাজ্যে শিল্প বাণিজ্যের শ্রাদ্ধ দূর গড়াইয়াছে—আর বেশি দূর গড়াইলে, পশ্চিমবঙ্গে ল্প ব্যবসা বাণিজ্য এখনো যতটুকু বাঁচিয়া আছে তাহারও র সমাপ্তি ঘটিতে আর অধিক দিন প্রয়োজন হইবে না।

অজয়বাবু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাঁহার প্রতি রাজ্য-সীর শ্রদ্ধা আছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্থির এবং ধীর-দ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি যদি রাজ্যের শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের তি একটু দৃষ্টি দেন তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে ও দেখিতে রিবেন শ্রমিক মহলের অরাজকতা এবং বেপরোয়া ক্রিয়া-র্মের ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি হইয়াছে। আমরা ই শ্রমিক সুবিচার লাভ করুক। তাহাদের ন্যায্য দাবী সম্ভব না হইলে, মিটানো হউক কিন্তু একের বী মিটাইবার অজুহাতে অন্যপক্ষের বাঁচিবার অধিকার ন কোনক্রমেই সঙ্কুচিত না হয়।

—- —

শ্রমমন্ত্রীর নিকট করজোড়ে নিবেদন—

আমাদের শ্রমমন্ত্রী শ্রমিক দরদী এবং শ্রমিক কল্যাণেই তাহার মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহা সত্যই মতি আনন্দের কথা। লোকমুখে শুনি যে বন্দ্যোপাধ্যায় হাশয় শ্রমদপ্তরের মালিকপদ গ্রহণ করার পর হইতেই াকি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সাধারণ (শতকরা ৭০ জনই অবাঙ্গালী) দুঃখ কষ্ট বলিয়া আর কিছু জানে না। শ্রমিকের াবী শ্রমমন্ত্রী অহরহ মালিকদের স্বীকার করিয়া লইতে আবেদন এবং নির্দ্দেশদান করিতেছেন। ঘৃণিত মালিক 'অ্যাণ্ড মর ক্যাপিট্যালিস্ট' সবই হয়ত মানিতে রাজী হইবেন শ্রমমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে যদি শ্রমিকদের তাহাদের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য, কাজকর্ম প্রভৃতি যথাযথ এবং যথোপযুক্ত নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের সহিত পালন করিতে উপদেশ দেন। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত শ্রমিক সাধারণকে এখন কোন উপদেশ তিনি দেন নাই। শ্রমিকের যেমন দাবী থাকিতে পারে কলকারখানা এবং অন্যবিধ সংস্থার মালিক কিংবা কর্তৃপক্ষের দাবীও নিশ্চয় কিছু থাকিবে। সোজা এবং সহজ কথায় শ্রমিককে তাহার দাবীমত প্রাপ্য কম বেশী যাহাই হউক, 'আর্ণ' অর্থাৎ পরিশ্রমে এবং কাজ দিয়া উপার্জ্জন করিতে হইবে। ধনীদের আমরা নিন্দা করি, তাহারা আনুআর্নড্ ইনকাম ভোগ করে বলিয়া, ঠিক তেমনি কোন শ্রমিক কোন্ বিশেষ অধিকারে কাজ না করিয়া, কাজে ফাঁকি দিয়া কিংবা যে পরিমাণ অর্থ দাবী করিবে, তাহার মূল্য হিসাবে যথা পরিমাণ প্রোডাকসন না করিয়া অর্থ পাইবে বা চাহিবে? কথাটা সাধারণভাবে বলা হইতেছে কারণ এমন দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক অবশ্যই আছে কোন কোন প্রতিষ্ঠান যাহারা কাজেও যেমন নিষ্ঠা দেখায়, পরিশ্রমেও তেমনি কাতর নহে এবং এই শ্রেণীর শ্রমিককে মালিকপক্ষ যথোপযুক্ত অর্থ দিতেও কোন প্রকার কিন্তু করেন না। দুঃখের বিষয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শ্রমিকের সংখ্যা যেন ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে ইহার জন্য বেশ খানিকটা দাবী করা যাইতে পারে সেইসব ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের যাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা রাখিতে এবং মান বাড়াইতে কথায় কথায় সিংহনাদ ছাড়েন দাবী পেশ করিবার বেলায়। কিন্তু এই সকল আপ-কাম-ওয়াস্তে নেতা শ্রমিকদের কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে বলিবার ভরসা রাখেন না। প্রডাকসন বৃদ্ধি করিয়া বোনাস আদায়ের কথা চিন্তাও করিতে পারেন না। ইহারা মনে করেন চাপ বৃদ্ধি করিলেই মালিক পক্ষ তাঁহাদের টাকশাল হইতে টাকা ছাপাইয়া দরাজ হস্তে শ্রমিকদের দিবেন এবং শ্রমিকরাও ইউনিয়ন নেতার জয়ধ্বনি করিতে করিতে—কোথায় যাইবে, জানা থাকিলেও বলিবার ভরসা নাই' এবং বলাটা বুদ্ধিমানের কাজও হয়ত হইবে না।

শ্রমমন্ত্রী মালিকপক্ষকে (এমপ্লয়ার) যেমন সৎ এবং অসৎ দুই শ্রেণী ভুক্তি করিয়াছেন এবং ব্যাড্ এমপ্লয়ারদের পি ডি আক্টো আটক করিবার হুমকি দিতেছেন, সমভাবে তেমনি শ্রমিকদের বেলাতেও কেন করিতেছেন না? ইহা না করাতে আমরা কি মনে করিব যে শ্রমিক মাত্রেই সৎ এবং কোন অন্যায় তাহারা চিন্তাও করিতে পারে না। শ্রমমন্ত্রী খোঁজ লইয়া দেখিবেন—প্রায় সকল কলকারখানাতেই

উৎপাদন দিনের পর দিন দ্রুত কেমন ও কেন কমিয়া যাইতেছে।

———

শ্রীত্রিগুণা সেন ও শ্রীচাগলা

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা নীতির পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী চাগলা (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, বর্ত্তমানে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত, পদত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা মন্তব্য করি যে শ্রী সেনের প্রদত্ত দুই ভাষা সূত্র গৃহীত না হইলে—অথবা পরিত্যক্ত হইলে তাঁহার পদত্যাগ করা উচিত। সকল বিদ্যার ধারক এবং বাহক মোরারজীর চাপে দুই ভাষার স্থলে কেন্দ্রে গৃহীত হইল ত্রিভাষা সূত্র—এবং এই ত্রিভাষা সূত্রে সেই পুরাতন দাবী হিন্দীকেই করা হইল মধ্যমনি। আরো বহু প্রকার পরিবর্তন উদ্ভাবন মোরারজী নামক ব্যক্তির অতি উর্ব্বর মস্তক হইতে বাহির হইয়া লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রী চাগলা ইংরেজীকে হটাইবার বিকট তাড়াহুড়া এবং সেই সঙ্গে হিন্দীকে দেশের রাজভাষা করিবার অতিব্যস্ততার প্রতিবাদে শ্রী চাগলা পদত্যাগ করিলেন। আমাদের আশা ছিল শ্রীত্রিগুণা সেন এই কাজটি করিয়া আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার অধিকারী হইবেন কিন্তু আমরা নিরাশ হইলাম! ভাষ সঙ্কটে তাঁহার প্রস্তাব অবহেলা অগ্রাহ্যের অবমাননা তিনি হজম করিলেন?

দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর রাজত্ব চলিবে না স্পষ্টভাবেই ঘোষিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ভারতে কি হইবে? আমরা কি হিন্দী বরণ করিয়া 'জয় হিন্দী ধ্বনি তুলিব? এখনও পশ্চিমবঙ্গ আসাম এবং উড়িষ্যা নীরব কেন বলিতে পারি না। কাহার ভয়ে?

ইংরেজী তাড়াইয়া চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা এবং রাজ্যের সরকারী প্রশাসন কার্য অবিলম্বে কার্যকর করিতে হিন্দীওয়ালাদের অতি উৎসাহ এবং আগ্রহ কেন তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। ভারতের এই সবজান্তা-লরেন্স মোরারজি দেশাই অন্তের যুক্তিসঙ্গত আপত্তিও (হিন্দীর বিরুদ্ধে) 'স্বীকার করি না' এই মোক্ষম যুক্তি দিয়া অগ্রাহ্য করিবেনই। মোরারজী বেকুফ নহেন, তাঁহার প্ল্যান বোধহয় এই প্রকার।

১। ইংরেজীকে ফেয়ারওয়েল দিয়া ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার ওয়েলফেয়ার করিবার অজুহাতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় রাজ্যের প্রশাসনিক কার্য্যাদিও।

২। আইনের ভাষান্তর আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম যদি আঞ্চলিক ভাষা হয়, পরীক্ষার মাধ্যমও, তবে প্রত্যেকটি রাজ্যে আইনের পুস্তকাদি এবং আদালতের কাজকর্ম্মও আঞ্চলিক ভাষায় আবশ্যকীয় করিতেই হইবে—অর্থাৎ সর্ব্বক্ষেত্রে ইংরেজীকে বিদায় দিতে হইবে এবং এই কাজটি একবার সার্থক করিতে পারিলেই সর্ব্বভারতীয় ভাষা এবং লিঙ্ক ল্যানগুয়েজ হিসাবে অবশ্যই হিন্দী ভাষাকে সিংহাসনে বসাইতে আর বেগ পাইতে হইবে না!—

মোরারজীর এই মহৎ পরিকল্পনা লোকের চোখে পরিষ্কার হইয়া ধরা পড়িবে। ইংরেজির পরিবর্ত্তে রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক ভাষা একবার চালু হইয়া গেলে—একটা সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা অবশ্যই চাই—এবং মহাভারতে সংযোগ এবং ঐক্য-রক্ষাকারী ভাষা হিন্দী ছাড়া আর কি হইতে পারে? অতএব বিদ্যাপতি মোরারজীর প্রাণের ইচ্ছা—সমগ্র ভারতে আচরে ঐক্যতান উঠিবে—"জয় হিন্দী!

হিন্দীর অধিপত্য স্থাপন প্রচেষ্টা করিতে মোরারজীর মত দাম্ভিক এবং সর্ব্ববিষয়ে পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল সুযুক্তি-বাদী জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু উৎকট হিন্দী-প্রেমিক দেশে হিন্দীকে লিঙ্ক" ভাষা করিতে গিয়া দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে যতটুকু link বাকি আছে, তাহাও ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে।

ভাষা প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে যে শিক্ষা-কমিশন বসে, সেই কমিশনের সুপারিশগুলিকে বর্ত্তমানে গৃহীত নীতিতে সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১। শিক্ষা কমিশন স্পষ্টভাবে বলেন যে কি পদ্ধতিতে এবং কত শীঘ্র আঞ্চলিক ভাষা গৃহীত হইবে তাহা বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির উপর ন্যস্ত থাকা উচিত।

২। এই কমিশন আরো সুপারিশ করেন যে পাঁচ ছয়টি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে

[ক]র্ত্তব্য কারণ ইহা করিলে সমগ্র দেশেই অধ্যাপক এবং ছাত্র চলাচল করিতে সক্ষম হইবেন।

ডঃ ত্রিগুণা সেন উক্ত শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং এসব কথা তিনি নিশ্চয় জানেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শিক্ষা মন্ত্রকের ব্যাপারে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই প্রকার মন্তব্য যাহারা করিতেছেন, তাঁহারা অর্থ মন্ত্রীর বেলায় কোন কথা কেন বলেন না অর্থ-মন্ত্রী শিক্ষা, আইন এবং অন্যান্য প্রায় সকল মন্ত্রকের সকল ব্যাপারেই নাসিকা প্রবেশ করাইয়া অনাবশ্যক অনর্থের সৃষ্টি করিতেছেন কোন্ বিশেষ অধিকারে? প্রধান মন্ত্রী এ-বিষয় তাঁহাকে কোন গোপন নির্দ্দেশ যদি দিয়া থাকেন, তাহা প্রকাশ করা উচিত এই সময়।

দেশে আজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা এবং প্রশ্ন খাদ্য, প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়ন, বিশেষ করিয়া কৃষি। ভাষার প্রশ্ন এমন কিছু নয় যাহার সমাধান বিলম্ব সহিবে না। শিক্ষা-ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিয়া দেশের জীবন মরণ সমস্যা গুলির সমাধান সর্ব্বাগ্রে করিলে কি ক্ষতি হইত জানি না।

হিন্দী দেশের রাজভাষা হইলেই কি চীন এবং পাকিস্তানকে ঠেকানো সম্ভব হইবে? অবশ্য মন্ত্রী শ্রী প্রকাশের মতে হিন্দী পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা জোরালো ভাষা।

অযোধ্যার নবাব

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১)

ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী

সেকালের কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণে, গঙ্গাতীরবর্তী আর একটি স্বনামপ্রসিদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম গোবিন্দপুরকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্পানীর বিশাল, সুপরিকল্পিত দুর্গ ১৭৭৩ খৃঃ সম্পূর্ণ হয়েছিল। ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে ভারতে ইংরেজ শক্তির এই সুদৃঢ় কেল্লার নামকরণ হল—ফোর্ট উইলিয়ম।

তারও আট বছর আগে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের আট বছর পরে, ১৭৬৫ খৃঃ ১২ই আগষ্ট্ নামেমাত্র মোগল বাদশা দ্বিতীয় শাহ্ আলমের ফরমান অনুসারে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেছিল।

সুদূর ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়মের নামাঙ্কিত সেই দুর্গের কিছু দক্ষিণে আদি গঙ্গা প্রবাহিনী। আদি গঙ্গার উত্তর তীরে কুলি বাজার পল্লী মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির চিহ্নিত স্থান তারই সংলগ্ন অঞ্চল নন্দকুমারের ধ্বংসকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংসের স্মৃতি আজো বাঁচিয়ে রেখেছে হেস্টিংস নামে পরিচিতি বহন করে।

পূর্ববর্তী কালের গোবিন্দপুর গ্রাম ও হেস্টিংসের পরপারে অর্থাৎ আদি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে খিদিরপুর পল্লী। খিদিরপুরের প্রধান পথ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড বরাবর দক্ষিণ পশ্চিম অভিমুখে এসে মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে উপনীত হয়েছে। হুগলী নদীর পূর্বতীরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের মেটিয়াবরুজ। মেটিয়াবরুজের সংলগ্ন গঙ্গাতীরবর্তী এলাকা মুচিখোলা নামেও পরিচিত।

এই পল্লীতে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁর নির্বাসিত জীবন যাপন করবার জন্যে জলপথে উপস্থিত হলেন।

মেটিয়াবুরুজে বড় গঙ্গার ধারে বাংলার পুরনো নবাবী আমলে, একটি সামান্য কেল্লা ছিল। মাটির দুর্গ। তারই অবস্থানের সূত্রে জায়গাটির ক্রমে নাম হয়ে যায় মেটিয়াবরুজ। সেই মাটির বুরুজ পরবর্তী কালের ইংরেজ আমলে খিদিরপুর ডকের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। Charnock's battery ছিল সেই মাটির বুরুজে। রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫০ খৃঃ ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনের সময় তাকে নতুন করে গড়ে নিয়েছিলেন।

সুতানুটি কলিকাতা গোবিন্দপুরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে, হুগলী নদীর পূব তীরে সেই মাটির দুর্গ (মেটিয়াবুরুজ) এবং তার বিপরীত দিকে, গঙ্গার পশ্চিম ধারে শিবপুর পল্লীর টানা দুর্গ। আগে নাম ছিল থানা, ইংরেজদের মুখে মুখে হয়ে যায় টানা। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বাড় এখন যেখানে, সেখানেই ছিল সেই টানা বা থানা নামের গড়টি।

গঙ্গার দুই তীরে স্থাপিত এই দুর্গদ্বয় সমুদ্র থেকে জলপথে আগত শত্রু বাহিনীর প্রহরায় থাকত। হুগলী নদীর এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জলতলে পূব পশ্চিমে আলম্বিত থাকতে যে বিরাট লৌহ শিকল, তার দুই প্রান্ত আবদ্ধ করা হত মেটিয়াবুরুজ ও টানা দুর্গে। অবাঞ্ছিত জাহাজকে প্রয়োজন মত এই দুটি দুর্গ থেকে শিকলের সাহায্যে গতিরুদ্ধ করা যেত। এসব অবশ্য নবাব ওয়াজিদ আলীর এখানে আগমনের অনেক আগেকার কথা।

নবাব যখন এখানে এলেন তখন মেটিয়াবুরুজ বা মুচিখোলা অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অধ্যুষিত অঞ্চল।

মেটিয়াবুরুজের কোন গৃহে ওয়াজিদ আলী প্রথম বাস আরম্ভ করেছিলেন সেবিষয়ে দ্বিমত আছে। তাঁর সম্পর্কিত

কোন কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে যে নবাবের এখানে প্রথম আবাস ছিল বর্ধমান মহারাজার একটি সৌধ। এই ধারণা সম্ভবত সত্য নয়। কারণ স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা যায় যে নবাবের কলকাতায় উপনীত হবার অব্যবহিত পূর্বে অবসর নেওয়া স্যর উইলিয়ম পীল তাঁর যে আবাস গৃহটি বিক্রয় করেছিলেন, সেটিই ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজে প্রথম বাসভবন। কিছুকাল এখানে বাস করবার পর নবাব আরো কটি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন অনুযায়ী। প্রথম আগমনের সময়ে তাঁর পরিবার পরিজন খুব বেশি সংখ্যায় ছিলেন না এবং যতদূর জানা যায় প্রথম দলে সঙ্গীতজ্ঞও আসেন নি। তাঁরা এসেছিলেন পরে পরে। ফোর্ট উইলিয়মের বন্দীশালায় ওয়াজিদ আলী শাহের অবস্থানের আগে ও পরে। বেশীর ভাগ কলাবৎ ও বাইজী প্রভৃতির আগমন নবাবের ফোর্ট উইলিয়ম থেকে মুক্তি পাবার পরে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালে। কারণ তাঁর সঙ্গীতের দরবার প্রকৃতপক্ষে উক্ত সালের পরই স্থাপিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উত্থাপন করা হবে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে।

নবাবের মেটিয়াবুরুজে আগমনের অব্যবহিত কালের ঘটনাবলী এখানে বর্ণনার বিষয়।

লক্ষ্ণৌ থেকে সুদূর বাংলাদেশের এই ভিন্ন আবহাওয়া ও স্বতন্ত্র পরিবেশে বাস করতে এসে ওয়াজিদ আলী শাহ্ কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিদারুণ অবস্থা বিপর্যয়ের জন্যে এবং তার আনুষঙ্গিক মানসিক যন্ত্রণা ও গ্লানি বোধও সম্ভবত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তাঁর দেহের ওপর।

কোথায় লক্ষ্ণৌতে স্বাধীন ও ব্যয় ভাবনাহীন নবাবী জীবন আর কোথায় মেটিয়াবুরুজে ইংরেজের সীমাবদ্ধ বৃত্তিভোগী রূপে নির্বাসন বাস! বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তিও তাঁর অভ্যস্ত আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসজীবনের পক্ষে যথোপযুক্ত ছিলনা এবং তাতে তাঁর সব দিকে সঙ্কুলানও হতনা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হীরা মুক্তা সোনাদানার ধন সম্পদ যা সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন তার মূল্য নাকি অল্প নয়।

যা হোক মেটিয়াবুরুজে পৌঁছবার কয়েক দিনের মধ্যেই নবাবের শারীরিক অসুস্থতা ঘটে এবং রোগমুক্ত হতে বেশ সময় লেগেছিল।

নিরাময় হবার পর সঙ্গীতপ্রেমী নবাব একটি জলসার আয়োজন করেন মেটিয়াবুরুজে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর এই মজলিসে কথাকার কলাবতেরা বা বাঈজীরা অংশ নেন তা জানা যায়নি। মনে হয়, ইতোমধ্যে লক্ষ্ণৌ থেকে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতিকে আমদানি করা হয় মেটিয়াবুরুজে। নবাবের হয়ত এইসময় থেকেই লক্ষ্ণৌর ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে মেটিয়াবুরুজে একটি সঙ্গীতের দরবার কায়েম করবার ইচ্ছা হতে পারে। কারণ নৃত্য ও সঙ্গীতাদির পরিবেশ ভিন্ন দিনযাপন করতে পারতেন না তিনি। কলকাতায় তিনি নবাগত। এখানকার সঙ্গীত-জগতের সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল নন। সুতরাং তাঁর পরিচিত লক্ষ্ণৌর গায়ক বাদক বাঈজীদের মেটিয়াবুরুজে আনাই স্বাভাবিক।

হয়ত নবাব ভেবেছিলেন, এত কাণ্ডের পর এবার বোধহয় তিনি নিরুপদ্রবে মেটিয়াবুরুজে দিন গুজরান্ করতে পারবেন।

কিন্তু ভাগ্যে তাঁর আরো বেদনা ও বিপত্তি তখনো বাকি ছিল।......

জলসা সেদিন বেশ বড়ই হয়েছিল এবং রাত হয়ে যায় মজলিস শেষ হতে।

তারপর গভীর রাতে, নবাব তখন শয়নকক্ষের শয্যায়, ইংরেজ সেপাইরা অকস্মাৎ এসে তাঁর গৃহ পরিবেষ্টন করে' ফেলল্লে।

নবাবকে সংবাদ পাঠানো হল বাইরে এসে সাক্ষাৎ করবার জন্যে। সেপাইদের সঙ্গে বড়লাটের সেক্রেটারি এসেছিলেন।

তিনি নবাবকে ইংরেজপক্ষের বক্তব্য জানালেন—লক্ষ্ণৌর রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। সেখানে বিদ্রোহীদের মধ্যে তৎপরতা দেখা দিয়েছে। এই সব কারণে নবাবকে বৃটিশরা সন্দেহের চোখে দেখছেন। এ সময়ে কিছুকাল নবাব ফোর্টের মধ্যে থাকলে ভাল হয়।

ফোর্টের মধ্যে থাকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করলেন ওয়াজিদ আলী। তিনি লাট সাহেবের দূতকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তিনি নির্দোষ। বিদ্রোহীদের বিষয়ে তিনি সত্যই কিছু জানেন না।

কিন্তু ইংরেজ দূত কানে নিলেননা নবাবের কোন যুক্তি। তাঁর নির্দেশও পরিবর্তন করলেন না। ফোর্ট উইলিয়মে যেতে হল নবাবকে।

ইংরেজদের এই আদেশের কথা শুনে নবাবপক্ষীয় অনেকেই তখন তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় প্রথমত তাঁর পাঁচজন দোস্তকে। তাঁদের নাম মোশাহেদ উদদৌলা, দেয়ানৎ উদ্‌দৌলা, জুল্‌ফ্‌কার উদ্‌দৌলা, ফতাহুদ দৌলা ও মহ তামিম্‌ উদ্‌ দৌলা।

নবাবের কোন বেগমকেই তাঁর সঙ্গে যেতে দেওয়া হয়নি।

উক্ত পাঁচজন বন্ধু ভিন্ন আরো কয়েকজন নবাবের সঙ্গে ফোর্টে বাস করবার আদেশ পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন— নবাবের হাকিম তবিবুদ দৌলা। কাজিম্‌ আলী সওয়াদ, বাকর আলী, মহম্মদ জান চোপদার, হুবদার খাঁ কাওয়াল্‌ বরদার, জামাল উদদীন চাপরাশি, শেখ ইমাম বখশ্‌ কুলিয়ান বরদার, আমীর বেগ খোয়াশ, ওয়ালী মহম্মদ বোল্‌দান (পিকদান) বরদার, মহম্মদ শের খাঁ গোলন্দাজ, আব্‌দুর রেজ্জাক আরাম গে.শ্‌ (নবাবের আরামের তদারককারী করীম বকৃশ আবকশ্‌ (জল দেবার লোক), হাজী কাদের বখশ্‌ কুমহার (কুম্ভকার), ইমামী গাড়ি পোঁছ (গাড়ি পরিষ্কারক) প্রভৃতি পরিচারকবর্গ। তা ছাড়া কয়েকজন পরিচারিকা— দারোগা রাহাতুস্‌ সুলতান (সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্যে), খাসা বরদার (খানা পরিবেশনকারিণী), কারবলাই আব্‌ খাসা বরদার (জল দেবার জন্যে নিযুক্তা), হুসেনী খাদ দান বরদার (তাম্বুল বাহিনী), মহম্মদ ই খানাম পোষাক দোজ পোষাক পরিচ্ছদের ভারপ্রাপ্তা), ইত্যাদি।

মোট ৩৩ জন পুরুষ ও নারী সমভিব্যাহারে নবাব ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী জীবন যাপন করতে গেলেন।

ফোর্ট উইলিয়মের একটি ফটকের নাম কুলিগেট। কুলিগেট সংলগ্ন গৃহ বালাখানা! সেই বালাখানায় নবাব সদলে প্রথম আটদিন রইলেন।

সেখানে থাকবার সময় নবাবকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন ভাইসরয়। তাতে জানানো হয় যে, অনেক বিদ্রোহীরা নবাবের কথা বলেছে। সেজন্যে নবাবকে কিছু দুর্গে অবস্থান করতে হবে। নবাবকে সব রকম সুখ সুবি দেবার চেষ্টা করবেন কর্তৃপক্ষ।

বালাখানায় আট দিন অতিবাহিত করবার পর নবাবে ফোর্ট উইলিয়মে বাসের জন্যে আর একটি কোঠি বন্দোব করে দেওয়া হল।

তাঁর সঙ্গী পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে ফতাহুদ্‌ দৌলার বেশি বয় হয়েছিল। কিছুদিন পরে তিনি মারা যান। ফোর্ট উইলিয়মে নবাবের কাব্য রচনার বিষয়ে ফতাহুদ দৌলা নাকি ওস্তা ছিলেন।

এখানে নবাবপক্ষীয় কারুরই বাইরে যাবার অধিকার ছিল এবং বাইরে থেকেও কাউকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় ন তাঁর সঙ্গে। দেয়ানৎ উল্লা নামে নবাবের এক বন্ধু ফী যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাননি।

এমন কি নবাবের পরিচারকবর্গের ওপরও ছিল কড় পাহারা। নবাবের হকিম তাবিবুদ্‌ দৌলা এই বন্দী জীবন একেবারে বরদাস্ত করতে পারেননি। তিনি অনেক প্রতিবাদের পর দুর্গ ত্যাগ করে মেটিয়াবুরুজে চলে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন। নবাবের প্রয়োজন হলে আনানো হত চিকিৎসককে।

জল দেবার জন্যে নিযুক্ত দাসী কারবলাই কিছুদিন পরে এমন হয়ে যায় যে সে নবাবকেই গালমন্দ করে বসত। সেও চলে যায় কেল্লা থেকে।

রাত্রে ইউরোপীয় পাহারাদাররা নবাবের কাছে এসে দেখে যেত। এই যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তা নবাবের ফোর্ট উইলিয়মে আসবার বেশ কিছুকাল পরে। লক্ষ্ণৌতে তখন বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করেছে। কলকাতায় ইংরেজ সরকারের তাই অতন্দ্র দৃষ্টি নবাবের ওপর। তাই ইংরেজ সেপাই রাত্রেও এসে নবাবের তল্লাস নিয়ে যেত।

একদিন এমনি একজন পাহারাদার তাঁর ঘরের কাছে এসেছে। নবাব তখনো জেগে। সেপাইটার একজন আত্মীয় লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিল। লোকটা সেই আক্রোশে নবাবকে তাঁর ঘরে এসেই গালাগালি দিয়ে চলে গেল।

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে নবাব পরের দিন অভিযোগ করলেন ইংরেজ সেপাইটার বিরুদ্ধে। নবাবের মান রক্ষা করে কর্তৃপক্ষ সে প্রহরীকে বরখাস্ত করে দেয়।

বন্দী নিবাসের এই গ্লানিকর, বদ্ধ পরিবেশে নবাবের নিজের অনুচর পরিজনদের মধ্যেও বদমেজাজ এমনভাবে প্রকাশ পেতে লাগল যে ঝগড়া থেকে মারপিট পর্যন্ত হয়ে যেত নিজেদের মধ্যে।

এমনি এক বিবাদের মধ্যে মহম্মদ শের খাঁ বাকর আলীর নাক কেটে যায়। সেই অপরাধে বিতাড়িত করা হয় তাকে।

নবাব একদিন ওই বাকর আলীকে বাইরে পাঠাবার জন্যে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। প্রহরীদের এমন শ্যেন দৃষ্টি যে বাকর আলীকে পাকড়াও করে রেখে দেওয়া হয় আলাদা একটি কারাকক্ষে।

একদিন ভিস্তিকেও সন্দেহ করে জবাব দিয়ে দেওয়া হয়। এমনি ভাবে নবাব-পক্ষের মোট সাত জনকে কায থেকে বরখাস্ত করে দুর্গের কর্তৃপক্ষ।

নবাবকে লেখা তাঁর আত্মীয় স্বজনদের চিঠি অবশ্য তাঁকে দেওয়া হত। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়মে বন্দীজীবনের প্রথম দিকে নবাব জননী ও ভ্রাতার পত্রাদি পেতেন লণ্ডন থেকে। পরে তাঁদের ইউরোপে মৃত্যুর সংবাদও নবাব চিঠি মারফৎ জানতে পেরেছিলেন।

লক্ষ্ণৌতে যিনি তাঁর বিষয়সম্পত্তির তদারক করবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এসময় তাঁর কাছ থেকেও একটি পত্র পান নবাব। সেই চিঠিতে উক্ত লক্ষ্ণৌ নিবাসী লিখেছিলেন যে তিনি বিদ্রোহের মধ্যে কজন ইউরোপীয়ের প্রাণ রক্ষা করেন। লক্ষ্ণৌর আর সব খবর ভাল। কিন্তু তলব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেককে উপবাসে থাকতে হয়েছে।

লক্ষ্ণৌতে নবাবের প্রাসাদ ইত্যাদি সংক্রান্ত কর্মচারীদের বেতন এবং তাঁর সেখানকার পরিবারবর্গের ভাতাও বোধহয় সব ঠিকমতন ও সময় মতন দেওয়া হয়নি, বিদ্রোহের ফলে সেখানকার রেসিডেন্ট প্রভৃতি ইংরেজ শাসকরা বিপর্যস্ত থাকবার জন্যে।

পত্রে লক্ষ্ণৌতে বেতন বন্ধ থাকবার কথা জেনে ওয়াজিদ আলী শাহ বিচলিত হলেন।

নবাব এই চিঠিখানির সঙ্গে একটি দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দিলেন কর্তৃপক্ষকে। উত্তরে নবাবকে সান্ত্বনা দিয়ে জানানো হয় যে, লক্ষ্ণৌতে সমস্ত বিষয়ে যথোচিত লক্ষ্য দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় খরচপত্রের জন্যে দু লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছে।

বড় লাটের কথা মতন ব্যবস্থা হয়েছিল লক্ষ্ণৌতে।

(৮)

'আখ্‌তারের বেদনা।'

ফোর্ট উইলিয়মে বন্দীজীবনে নবাব ওয়াজিদ আলী যে-সব রচনাকার্য করেছিলেন তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখ্য হল তাঁর আত্মকথা—'হুজন-ই আখ্‌তার' অর্থাৎ আখ্‌তারের বেদনা। আখ্‌তার তাঁর নিজের লেখনী নাম। উর্দু ভাষায় এবং মসনবীর আকারে তাঁর এই আত্মকাহিনী রচিত।

এই পুস্তিকাটি নবাবের এ পর্যন্ত কালের সম্পূর্ণ আত্মজীবনী অবশ্য নয়। লক্ষ্ণৌতে রাজ্য থেকে নির্বাসন এবং কলকাতায় আগমন করবার পরে গ্রেপ্তার ইত্যাদি বর্ণনার শেষে প্রধানত ফোর্ট উইলিয়মে তাঁর অবস্থানকালের অভিজ্ঞতাই 'হুজন-ই-আখ্‌তার এর বিষয়বস্তু। বন্দীনিবাসে এটি রচনার ছ বছর পরে মেটিয়াবুরুজে তাঁর নিজস্ব মুদ্রণালয় 'মতবা-ই সুলতানি (সুলতানের ছাপাখানা) থেকে প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থটি, তাঁর অন্যান্য পুস্তকের মতন, বিক্রয় না করে বিতরণ করা হয়েছিল বন্ধু বান্ধব, সভাসদ পরিচারক প্রভৃতির মধ্যে। আধুনিক কালে দুষ্প্রাপ্য এই পুস্তিকা পুনরায় ১৯২২ খৃ লক্ষ্ণৌর একটি সাহিত্য সমিতির সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নবাবের মেটিয়াবুরুজে গ্রেপ্তার এবং পরে ফোর্ট উইলিয়মে তাঁর বন্দী জীবন সম্পর্কে যে সব তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা উক্ত পুস্তকের অনুক্রমনিকা থেকে প্রাপ্ত। ওই অংশ নবাব রচিত মূল বিষয়ের অন্তর্গত নয়, অন্যের রচনা। নবাব বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে এগুলির কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় আগের অধ্যায়ে সে সব প্রকাশ করা হয়েছিল। এই অংশে নবাব সম্পর্কে আরো কোন কোন কথা জানা যায়। এখানে তা প্রকাশ করে নবাবের স্বরচিত আত্মকথার অনুবাদ পরে আরম্ভ করা হবে।

তাঁর সম্বন্ধে এখানে জানানো হয়েছে যে, তিনি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। ফার্সী ভাষায় তাঁর অধিকার আছে, তবে আরবী জানেন না। লেখবার জন্যে তিনি টেবিলে বসেন না কখনো। শায়িত অবস্থায় রচনা করে থাকেন। বেশির ভাগ রচনা তিনি স্বহস্তে লেখেন না। তিনি মুখে মুখে বলে যান, অন্যে লেখে। কখনো কখনো একসঙ্গে দুজনকে লিখিতব্য বিষয় বলেন এবং তাও দুটি বিভিন্ন বিষয়ে।

'হুজন্-ই-আখ্তার মসনবীতে তিনি তাঁর কষ্ট এবং কারাবাসের দুঃখ বেদনা অতি আন্তরিকভাবে প্রকাশ করেছেন। এখান থেকে আরম্ভ করা হল 'আখ্তারের বেদনা।'

নবাব তাঁর এই মসনবী রচনার প্রারম্ভে প্রার্থনা জানিয়েছেন প্রথমে আল্লাহ-কে তারপর মহম্মদকে তারপর আলীকে।

পরে তিনি খানিক লাল সুরার জন্যে আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, তাহলে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে একটি মানুষের কাহিনী বিবৃত করতে পারেন—যার দিন কাটছে কারাগৃহে আর যে ভয় করে বিচারের দিনটিকে আর মাসের পর মাস যে (প্রিয়জনদের সঙ্গে) মিলনের কামনা করছে।

'না চাঁদ, না সূর্য, না বাতাস এদিকে আসে। বন্ধুদের এখানে পাওয়া যায়না, পরিচিতজনও নেই এখানে। প্রত্যেকেই আমায় ত্যাগ করেছে। ধন দৌলৎ ও বিষয়-সম্পত্তির ওপর আমার কোন আকাঙ্খা নেই। আমার সব সন্তান ও আত্মীয়দের ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে। তারা সবাই কাঁদছে। আমিও অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি এ জন্যে। রাত্রে আমার নিদ্রা হয় না। খাদ্য পাই না। জল নেই।'

তারপর তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁর ওয়ার্ডেন প্লেটুন মেজর 'কর্নেল কোনিয়া বাহাদুরের' প্রশংসা করে তাঁর উচ্চ পদ লাভের প্রার্থনা জানিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে। প্রখর গ্রীষ্মকালীন সেই সময়, প্রতিদিন আট সের হিসাবে বরফের কথা, টানা পাখা, তাঁর পরিচর্যার জন্যে নিযুক্ত এত পরিচারক ইত্যাদির কথাও নবাব এখানে বলেছেন।

এ সবের পর তিনি এইভাবে দিয়েছেন 'কুঠরিতে আসার বিবরণ,—ও আমার হৃদয়, তুমি এবার তোমার কাহিনীর বর্ণনা আরম্ভ করো। আমার অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিকৃত হয়েছে আমার মুখ। সর্বাঙ্গ খারাপ লাগছে। মাথার প্রত্যেকটি চুল আমার কাছে বিরক্তিকর। অশান্ত হয়ে আমি কাঁদছি। সরু হয়ে গেছে আমার হাতের কব্জি। পাঞ্জা দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাতের ওপর ফুটে উঠেছে সব শিরা উপশিরা।

কি নিস্তেজ হয়ে গেছি আমি। আমার নিজের হাতে খাদ্য তুলতে পারি না।......

আগে আমার মুখ ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মতন। এখন হয়েছে যেন প্রতিপদের চাঁদ। হাতের তালু আগে কি লাবণ্যময় ছিল। আর এখন হয়েছে বিবর্ণ, কর্কশ। ক'মাসে আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছি যে চলতে পারিনা।'

তারপর শৌচাগারের উল্লেখ করে নবাব জানিয়েছেন যে, তাঁর ঘরের কাছেই তাদের অস্তিত্ব তাঁকে পীড়িত করে তুলেছে। সেই বর্ষার সময়ে সেখানে হাওয়া নেই। গুমোট, নোংরা আর দুর্গন্ধময়।

মশার কথায় নবাব বলেছেন—'খোদা জানেন কত মশা সেখানে আছে। হাতে করে মারতে গেলে হাতেও কামড়ায় তারা। তেমনি ছারপোকাও।......

'ও আমার হৃদয়, থামাও তোমার বিষণ্ণ কাহিনী। একেবারে প্রথম থেকে বর্ণনা করো তোমার বিবরণ। এমন গল্প বলো যাতে অন্তরকে বিস্মিত করে দেয়। এমন কাহিনী শোনাও যাতে সঞ্চারিত হয় শক্তি, যা অতিক্রম করে যায় রুস্তম ও সামের কথা। সেই সত্য কাহিনী বর্ণনা করো যাতে তা সাক্ষ্যস্বরূপ থেকে যায়।

এ কাহিনী যখন আমি লিখছি সময়টা তখন অদ্ভুত। আমি বাস করছি কারাগারে। কলম পাইনা, কাগজ পাইনা, কালি পাইনা, দোয়াত পাইনা। এসব জিনিষ এখানে একেবারে দুর্লভ।'

এই আত্মকথায় পরবর্তী অধ্যায়ের 'কাহিনীর শুরু: রাজত্ব থেকে উচ্ছেদ: পাড়ি' নামকরণ করে নবাব লিখেছেন —'ও তরুণ, শুরুটা শেষ করে গোড়া থেকে বর্ণনা আরম্ভ করো। এই ওয়াজিদ, আমজাদের ছেলে, তার করুণ কাহিনীতে শোনাচ্ছে যে সে প্রায় দশ বছর রাজ্য শাসনের পর দেখা দিলে তার দুর্ভাগ্য।

গভর্ণর জেনারেল আমায় হুকুম দিলেন রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে। আমার রাজ্যের অধিবাসী তিন কোটি লোক আমাকে শাসন-ক্ষমতা দিয়েছিল। এই হতভাগ্য মানুষটির নাম শাহে অবধ—অযোধ্যার রাজা। আর এমনি করে আমার রাজত্ব শেষ হয়ে গেল।

লর্ড ডালহাউসি এইসব কথা জানিয়ে আমায় চিঠি লিখেছিলেন—'আপনার প্রজারা আপনাকে নিয়ে সুখী নয় এবং আপনার রাজ্যের বদনাম হয়ে গেছে। প্রজাদের এই দুঃখদুর্দশা আমরা দেখতে চাইনা আর শুধুমাত্র অভিভাবক থাকারও ইচ্ছা নেই আমাদের। আপনি একলাখ টাকা করে প্রতি মাসে পাবেন।'

রেসিডেন্ট জেনারেল মিঃ আউটরাম চিঠিটা আমায় দিলেন। প্রাসাদের প্রত্যেকে ক্রন্দন আরম্ভ করলে। তিনি তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে এনেছিলেন, সংখ্যায় তারা অনেক। আমার মনে বশ্যতা ছাড়া আর কোন ভাব ছিল না। এমন দিনের কথা আমি কখনো ভাবতে পারিনি!

এ বেচারা সে সময় অসুস্থ ছিল।

আমি চিন্তা করতে লাগলুম, কি করা যায়, কি হওয়া উচিত আমার পরবর্তী কায।

আলি নকী খাঁ ছিলেন আমার উজীর ও ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। তখন প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগল যে, যা হবার হয়ে গেছে। এ জন্য আমার আর দুঃখ করা উচিত নয়। আমি সেই চুক্তিপত্রে আমার সীল দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম। আমার রাজত্ব চলে গেল অকারণে।

আমার আত্মীয়রা আমার ওপর পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন আর আমার প্রজারা চীৎকার করত যে এই রাজা তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। অনেক লোকই আলী নকী খাঁকে অভিসম্পাত করত তাঁর কাগের (সন্ধিতে উপদেশ) জন্যে।

আমাকে প্রহরায় রাখা হল। কাউকে আমার কাছে আসতে অনুমতি দেওয়া হত না।

ও হুদর, মাসের ২৭ তারিখে ১২৭১ হিজরিতে আমি হারিয়েছি আমার রাজ্য।

আমরা আবেদন করব স্থির করেছিলুম। তাই আমি আত্মীয় স্বজনদের কাছে বিদায় নিলুম আর তাঁরাও আমায় সম্মতি দিলেন প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে।

আমি জেনারেল আউটরামকে বললুম যে, আমি খোদার কাছে আবেদন করতে যাচ্ছি, যিনি আমায় তখত্‌ দিয়েছেন। আমি আবেদন করব বৃটিশ রাজার কাছে।

তখন মিঃ আউটরাম বললেন, 'তা করবার স্বাধীনতা আপনার আছে। গভর্ণমেণ্ট আপনার আবেদন গ্রহণ করতে পারেন।'

আমি বললুম, 'আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার লিখিত আদেশ দিন এ বিষয়ে, যাতে আমি ইংলণ্ডে যাবার জন্যে পাশ পেতে পারি।'

দশদিন পরে আমায় স্থানত্যাগের অনুমতি দেওয়া হল এবং আমি যাত্রা করা স্থির করলুম।'

আত্মকাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়ের নবাব শিরোনাম দিয়েছেন—'মুনাব্বর উদদৌলা বাহাদুর ও আমার কথাবার্তা' এখানে তিনি লিখেছেন, 'আহম্মদ আলী খাঁ একজন অতি উদার ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁকে বললুম, 'আমরা এই শহর থেকে লণ্ডনে যাব। আমার কোন রাজ্য নেই, অহঙ্কারও নেই। লণ্ডনে আমাদের আবেদনের জন্যে যাওয়া যাক। আমরা আবেদনে জিতে যাব। তারপর লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসে রাজত্বের উন্নতি করব।'

আহম্মদ বললেন, বেশ কথা। এই অপদার্থটা আপনার সঙ্গে যাবে।'

আমি আমার পদস্থ কর্ম্মচারিদের শহরের কাজকর্ম্ম চালাবার জন্যে কিছু নির্দেশ দিলুম। তাঁরা আমার যাত্রার কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে রইলেন। শহরে কোন চোর, খুনী নেই। গরীব লোকদের জ্বালাতন করতে সাহস করেনা কেউ।

যাহোক ১২৭১ হিজরির ৫ই রজব আমি যাত্রা আরম্ভ করলুম আমার মা, ভাই, পাঁচ জন বেগম ও শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে সেই পমছমবার রাতে মাল পত্র নিয়ে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করবার পর আমরা সারা রজব ধরে কানপুরে ব্র্যাণ্ডেনের বাংলোয় রইলুম। রমজানের আগে যখন আমরা শাওনের চাঁদ দেখি তখন সেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করে আটদিনে পৌঁছাই এলাহাবাদে।

তারপর আমরা কাশীতে উপস্থিত হই এবং ১৪দিন রাজার কোঠিতে থাকি। তিনি অতি আন্তরিক ব্যবহার করলেন এবং বৃহৎ সংবর্ধনা জানালেন।

সেখান থেকে একটি প্রকাণ্ড জাহাজে চড়ে আমরা উনিশ বিশ দিন যাবৎ ভ্রমণ করি। রমজানের চাঁদ যখন দেখা গেল, তখন আমরা উপনীত হলুম কলকাতায়।...

প্রত্যেক জায়গায় আমাদের সম্মানে কুচকাওয়াজ এবং আমার সম্মানে তোপধ্বনি করা হয়।

আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লুম আর লণ্ডন যাওয়ার কোন পথ পেলুম না।

তারপর শব্বলের মাস এল। আমি তখন রোগের জন্যে পরিশ্রান্ত। শব্বলের ১৪ তারিখে আমার ছেলে, ভাই ও মা লণ্ডন যাত্রা করলেন।

'তোমরা আমার প্রতিনিধি হয়ে লণ্ডন যাও আর রাজাকে আমার সব কথা জানাও।'

তাঁরা তিনজন চলে গেলে আমি একা রইলুম। আমার খাস বেগম রইলেন আমার সঙ্গে। আমার ভাই সিকন্দর হাসমতের সঙ্গে মা লণ্ডনে গেলেন। আমার মায়ের খেতাব ছিল মালকা-ইর কিসবর।'

তারপরের অধ্যায়ে আলী নকী খাঁ ও আহম্মদ আলী খাঁর কলকাতা ও লক্ষ্ণৌতে যাওয়া আমার কথা নবাব জানিয়েছেন।

তার পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি বর্ণনা করেছেন—বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্তি, তাঁর পীড়া, আরোগ্যলাভ ও আরোগ্যের জন্যে উৎসব।

'এক বছর চলে যাবার পর আমরা সংবাদ পাই যে, (লক্ষ্ণৌতে) বিদ্রোহ হয়ে ইংরেজ সৈন্যদের ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এর কারণ শুনেছি—কার্তুজ সব তৈরি হয়েছে গরুর চর্বিতে। বিদ্রোহের এ-ই আসল কারণ। সে সময় আমার শরীর খুব খারাপ, জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছিল। যখন আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠি তখন ১২৭২ হিজরির শব্বল মাস।

আমার প্রাসাদের সব লোকজন জমায়েৎ হল। তারপরে শুরু হয় নাচ-গানের জলসা। রাত পর্যন্ত আসর চলল। জলসার শেষে শয়ন করতে চলে গেল সকলে।

আমি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় খুব হৈ চৈ আর চীৎকার শুনতে পেলুম। কারা চেঁচিয়ে বলছে—'দয়া করে আসুন, খোদার দোহাই, আসুন। উঠে পড়ুন। আর সবাইকে জাগিয়ে দিন।'

আমি উঠে পড়লুম আর স্তম্ভিত হয়ে দেখি, নদীর ঢেউয়ের মতন সারবন্দী ইংরেজ সৈন্য।

কে যেন বলতে লাগল—ওরা আমাদের উড়িয়ে দেবে। ধ্বংস করে দেবে আমাদের। মুচিখোলা মাটিতে মিশিয়ে ছাড়বে।

অনেকে খোদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল নিরাপত্তার জন্যে।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম—এসব কিসের গোলমাল? কারা এসেছে? ব্যাপার কি?

কে একজন আমাকে বললে—'ও' রাজা, আলী নকী খাঁ গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আমার মুখ হাত ধোবার দরকার। আমি কলঘরে যেতে চাইলুম—'একটু অপেক্ষা করুন। হাতে মুখে জল দিয়ে নিই।'

ওরা বললে 'নিন।'

আমি তাড়াতাড়ি জলসেচ করে এলুম।

গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারি বললেন—'রাজা, আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে চলুন। এটা সরকারী আদেশ দয়া করে আর কিছু করবেন না, আর বিলম্বও নয়। আমার সঙ্গে আসুন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম—'এর কারণ কি? আমার কি অপরাধ বলুন।'

তিনি বললেন—'এ সরকারের আদেশ। তাঁরা আপনাকে সন্দেহ করেন।

সেক্রেটারির নাম মিঃ এ্যাডিনস্টন্।

আমি তাঁকে বললুম—'আমার কোন দোষ নেই। আমি বরাবর এই সব হাঙ্গামা থেকে দূরে থাকি। আপনি দয়া করে' আমায় ব্যাপারটা বলুন। আমি এই ব্যাপারের জন্যে বড়ই দুঃখ বোধ করছি। কি ভুল আমি করেছি যে গভর্নর জেনারেল আমার এত বিরুদ্ধে?'

তিনি বললেন, 'আমি সোজা কথা এইটুকু জানি যে, আপনি এইসব ষড়যন্ত্রে অংশ নিচ্ছেন।'

আমি তাঁকে বারংবার জোর দিয়ে জানালুম যে এসব জিনিষের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আর সে সময় আমার শরীরও অসুস্থ ছিল।

আপনি অনুগ্রহ করে এই ব্যাপারটার ফয়শালা করে ফেলুন আমার এখানেই। আর আমার কি দোষ প্রমাণ করুন।'

তিনি আমার এ কথায় রাজি হলেন না এবং আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে কে আপনার সঙ্গে যাবে?'

তাতে আমি বললুম, 'এখানে যাঁরা আছেন সবাই আমার বন্ধু। তাঁরা আমার সঙ্গী হবেন। এঁদের নাম লিখে নিন।'

তখন তিনি বললেন, 'আট জনের আপনার সঙ্গে যাওয়া হবে। তাঁদের নাম আপনি ঠিক করুন।'

আমি তাঁদের নাম জানিয়ে দিলুম।......

সেক্রেটারি, আমি, মুজাহেদ উদ্ দৌলা ও দেয়ানৎ উদ্দৌলা একটা গাড়িতে যাত্রা করলুম।

তারপর কুলি গেটে আমায় রাখা হল।

কলকাতার কেল্লায় বাস করবার সময় আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন এবং যাঁরা আমার পরিচর্যা করেছিলেন তাঁদের নাম আমি জানাচ্ছি।'

তারপর নবাব তাঁদের নাম দিয়ে তবিবুদ্দৌলার (হকিম) কথা বর্ণনা করে' লিখেছেন যে নবাবের চিকিৎসক উক্ত তবিবুদ্দৌলাও ফোর্ট উইলিয়মে বন্দীরূপ ছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি অতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসতে চান। 'আমি তাঁকে বলি—আমি তোমায় গত বিশ বছর যাবৎ পোষণ করে আসছি। তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। কিন্তু তিনি চলে গেলেন।'

পরবর্তী অধ্যায়ে নবাব তাঁর পরিচারক ও পরিচারিকাদের নাম পরিচয়ের ফিরিস্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে কুলি গেটের বাড়িতে তাঁরা আট দিন ছিলেন।

লর্ড ডালহাউসির পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এসময় নবাবকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তা সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করে' উদ্ধৃত করেছেন নবাব—

'ব্যাপারটি বড়ই দুঃখের এবং এ বিষয়ে আমি একেবারে অসহায়। একথা সকলেই জানে যে সব বিদ্রোহীরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা আপনার নাম করছে এবং কাউন্সিলে স্থির হয়েছে যে আপনি কিছুকাল এখানে থাকবেন। আমরা আপনার গৃহ পরিবর্তন করে দেব যাতে তারা আপনার কথা না জানতে পারে। যখন থেকে আপনি কলকাতায় এসেছেন আমরা আপনাকে কোন কষ্ট দিইনি। আপনি আপনার লোকজন নিয়ে স্বাধীনভাবে ছিলেন এবং কোন বিধি-নিষেধও আরোপ করা হয়নি আপনার প্রতি। এতে করে' আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না এবং আমরা ও অফিসাররা আপনাকে সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমরা আপনার ও আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখব। আপনার সব প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করা হবে এবং আপনি সমস্তই বিনা মূল্যে পাবেন সরকারী আদেশে।'

নবাব এই পত্রের যে উত্তর দেন তাতে প্রকাশ করেছেন—'আমি এমন কদাচার মানুষ নই এবং আমি খোদার নামে শপথ করছি যে এই সব বিদ্রোহে আমার কোন অংশ নেই। আমার ছেলে আর ভাই ওর মধ্যে থাকলে, আমি সে বিষয়ে কোন খবর রাখিনা। আমি শপথ করে' বলছি যে, আমি এই সব দুষ্কার্যের সম্পর্কে কিছু জানি না এবং আমার বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ মিথ্যা। এখানে যদি আরো কিছুদিন আমি থাকি, আমি বড়ই দুর্ভোগ ও কষ্ট ভোগ করব। আপনি অনুগ্রহ করে' আদেশ দিন যেন আমি আমার গৃহে গিয়ে বাস করতে পারি। আমি আমার বিশ্বস্ততা দেখাব। আমি সর্বদা আপনার প্রশংসা করব, কিন্তু এই বন্দীদশায় আমি অত্যন্ত হতাশ্বাস ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েছি।'

নবাব লিখেছেন যে তাঁর এই পত্রের কোন উত্তর পাননি এবং তাকে আর কেউ কোন চিঠি লেখেন নি।

তারপর তিনি ফোর্ট উইলিয়মে তাঁর বাস পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন—'আমরা যখন আটদিন কুলি গেটে অবস্থান করি, আমার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেল্লার মাঝখানে একটা কোঠি আছে, আমাকে তারা বদলি করে দিলে সেখানে।

ওঃ ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করো। এমন কেউ সেখানে নেই যার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি। এমন কি একটা পাখীও আসতে পারে না ভেতরে। আর যখন সেই কুঠুরির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় আমি একেবারে মুষড়ে পড়ি।

আমার সঙ্গে যে ৩৩ জন নারী ও পুরুষ ছিল, তাদেরও আনা হয় সেই কোঠিতে।

তারপর নবাব তাঁর ফুফা (পিসেমশায়) মুজাহেদ উদ্দৌলা মীর্জা জয়নুল আবেদীন খান বাহাদুরের প্রশংসা করে লিখেছেন যে, তিনি অতি দয়ালু ও অতি উদার ব্যক্তি। 'আমার জন্যে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে সদাই প্রস্তুত ছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলুম যে আমি নির্দোষ, তিনি যেন আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন আমার এই দুঃসময়ে।

তারপরে নবাব তাঁর সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ দেয়ানৎ উদ্দৌলা মুলক মহম্মদ মওতামিদ আলী খান বাহাদুর আসমৎ জঙ্গ কামেদাম পল্টনে আখতারির বর্ণনা করেছেন। 'দেয়ানৎ উদ্দৌলা আমার সঙ্গে ছিলেন এবং আলোকশিখার ওপর পতঙ্গ যেমন করে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে তেমনি ব্যবহার করছিলেন আমার সঙ্গে।'

তারপর নবাব তাঁর শিক্ষক বৃদ্ধ ফতে উদ্দৌলার কথায় লিখেছেন, 'আমি তাঁকে বার বার জানাতুম যে তিনি এ ধরণের কষ্ট সহ্য করবার পক্ষে অশক্ত। কিন্তু তিনি বলতেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমায় ছেড়ে যাবনা। পরে তিনি সাফর মাসে মারা যান এবং এমনি করে পালন করেন তাঁর প্রতিশ্রুতি। এই ঘটনায় আমার মন অত্যন্ত দমে যায়।

নবাব তারপর মহ্তামিম উদ্দৌলা ও নিশাদ মহল সাহেবার ভাই জলফুকার উদ্দৌলার নাম করে এবং পুরুষ নারী অন্যান্য তাঁর সহবাসিন্দাদের সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে তারা সকলেই তাঁর প্রতি অনুগত।

'দেয়ানৎ উদ্দৌলা তীর্থে যাবার জন্যে আবেদন জানালে কাউন্সিল তা প্রত্যাখ্যান করে।...

মহ্তামিম উদ্দৌলা পাগল হয়ে যান এবং এই কারণে মুক্তি পান কারাগার থেকে। তিনি অন্যদের সঙ্গে মারপিট আরম্ভ করেছিলেন—আর সে জন্যেই ছাড়া পেয়ে মুচিখোলা চলে যান।'

তারপর নবাব তাঁর (জল দেবার) পরিচারিকা কারবলাই আব্খানা বরদারের বন্দী নিবাস থেকে চলে যাবার বর্ণনা করে লিখেছেন—'ও আমার হৃদয়, একটি রমণীর কাহিনী শোনাও আর কুঠুরিটার কথা বলো। চারজনের মধ্যে কারবলাই ছিল সর্বকনিষ্ঠা আর সাপিনীর মতন তার বিষ। তার মাথা গরম, অপরের সঙ্গে সে ঝগড়া করত, আমায় গালি দিত। সে বলত—আমায় ছেড়ে দাও, আমি কারুর বিবি নই, আমি কারুর মেহ্বুবা প্রিয়া নই। আর সে এমন জ্বালাতন করত আমায় যে তাকে বরখাস্ত করতে হল। কারবলাইয়ের প্রসঙ্গের পরে নবাব বলেছেন এক মাতাল, বদরাগী সার্জেন্ট মেজরের কথা।

'এক রাতে আমি ঘুমোবার চেষ্টা করছি এমন সময় একজন আমার ঘরে ঢুকে এমন সব কথা উচ্চারণ করতে লাগল যে, খোদা যেন এমন দিন আর না দেন যাতে তেমন কথা শুনতে হয়। সে ক্লান্ত হয়ে পড়া পর্যন্ত যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগল আমায়। সে বলছিল, 'ওই যে রাজা, ওকে খতম করে দাও। আমার ছেলে আর বৌ খুন হয়েছে, আমার সব আপনার জন শেষ হয়ে গেছে। এমন রাজাকে খুন করে ফেলো।...

পরের দিন আমি কর্ণেলের কাছে এই লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলুম। তখনি তাঁর উদারতা ও দয়ার জন্যে তার বন্ধ হল কেল্লায় আসা। ভবিষ্যতেও তার পাহারা দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। লোকটা মাতাল হয়েছিল বলেই অমন ভাষা বেরিয়েছিল তার মুখ দিয়ে।

সেই তারিখ থেকে পাহারা দিয়ে থাকা কিংবা আমাকে ওই রকম কিছু বলা বন্ধ হয়ে যায়। আমি শুনলুম যে লোকটিকে বরখাস্ত করা হয়েছে কবে থেকে।

তারপর তার ছেলেরা এসে আমার কাছে আবেদন করে বললে—যা হয়ে গেছে আপনি অনুগ্রহ করে সেজন্যে তাকে ক্ষমা করুন।

আমি বললুম—আমি আর কিছু জানিনা। আমি জানি শুধু কর্ণেল সাহাবকে।

এ প্রসঙ্গের পরে, মহম্মদ শের খাঁর দাঁতে বাকর আলী চোপদারের নাসিকা কর্তনের কথা এবং সেজন্যে মহম্মদ শের

ার চাকরি যাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন নবাব। তারপর লিখেছেন —

একদিন আমি আমার প্রাসাদের লোককে একটা চিঠি লিখি আর আমার ফুফুকে কথাটা গোপন রাখতে বলি। ওইসব দিনগুলিতে আমি কখনো কিছু লিখিনি। এ চিঠিটা লেখেছিলুম ফুকার কথায়। আমি শুধু আমার টাকার হিসাব দিয়ে লিখি যে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী সব টাকা যেন খরচ করা হয়।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে লোকটার বোকামির ফলে আমার লেখা চিরকুটটা কি করে পাহারাদারের হাতে পড়ে এবং এই ব্যাপারে আমাদের ওপর রেগে যান সরকার বাহাদুর। বাকর আলীকে অন্য একটি কুঠরিতে বদলি করে দেওয়া হয়। গভর্ণমেন্টের ধারণা হয়েছিল আমি কোন গুপ্ত কথা লিখেছি চিরকুটটাতে।...আমার এমনি বরাত।'

তারপর নবাব করীম বক্স নামে তাঁর জল দেবার সাকটির যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়া ও সে জন্যে কেল্লা থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন--'মোট সাতজন কারাগার থেকে চলে যায় ফতেদ্দৌলার জন্যে আমার মন বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। খোদা তাঁকে ক্ষমা করুন। তিনি অতি উঁচু দরের কবি ছিলেন আর আমি কবিতা লেখার ব্যাপারে তাঁর সাগীরদ্।

গত প্রায় দু'বছর যাবৎ আমি এখানে আছি। রোজ বার করে আমার খাদ্য আসে। ওরা ডেগ্‌চি পরীক্ষা করে দেখে দেয় আমার সামনে। যখনই বাড়ি থেকে কিছু আসে চৌকিদাররা তা লক্ষ্য রাখে এবং আমাকে দেবার আগে পরীক্ষা করে দেখে।

আমার মাথার চুলে উকুন বাসা বেঁধেছে আর আকাশ যেনো আমার প্রতি অবিচার করছে।

আরো দুঃখের কথা বলি। লণ্ডন থেকে আমি চিঠি পাচ্ছি আর তাঁদেরও চিঠি লিখছি আমি। এইসব চিঠির কথা বলতে গেলে একটা কেতাব হয়ে যাবে।'

একথা উল্লেখের পর নবাব বর্ণনা করেছেন তাঁর জননী মালিকা-ই-কিশওয়র তাজ আরা বেগম সাহেবা, ভ্রাতা সিকান্দার হাসমৎ ও ভ্রাতুষ্পুত্রী হাসমতের মেয়ে রাফৎ আরা বেগমের মৃত্যু প্রসঙ্গ।

'ও আমার লেখনী, এবার কালো কাপড় গায়ে দাও, কারণ দুর্ভাগ্যের রঙ দেখা দিয়েছে।

তোমার বুক ছিন্ন করো আর এই কাগজের ওপর কালো চোখের জলের ধারা।

নিজের মুখে চপেটাঘাত করো আর দুঃখের মুখের আবরণ খসিয়ে দাও।

তোমার চুল ছিঁড়ে ফেলো আর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পাতাও মিতালী।

একদিন লণ্ডন থেকে একটা চিঠি এল। আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে রজবের আগের মাসে। সে মাসের ৯ তারিখে বুধবার সেই মৃত্যু হয়—চিঠিতে ছিল। রজবের মাসে আর একটি চিঠি পাই—হাসমৎ আর নেই। এ মাসের ১০ তারিখে শুক্রবার রাতে মৃত্যু হয়েছে হাসমতের।

আমি সব মনোবল হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমি জীবন্ত থেকেও যেন মৃত।

শাবনের ৯ তারিখে আমি একটি চিঠিতে জানতে পারি যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাফৎ আরা মারা গেছে।

আমার জননীর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর, ভ্রাতার ৩০ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর ১ বছর।

আমার জননী ও ভ্রাতার মৃত্যু হয় একই স্থানে ফ্রান্সে।

তারপর নবাব তাঁর রাণী মাল্‌কা-এ-অবধ আখতার মহল সাহেবার একটি পুত্র সন্তান লাভের উল্লেখ করে বেগম সাহেবার বর্ণনা করেছেন—

'১২৭৪ হিজরিতে যখন এইসব দুঃসংবাদ পাই, তখন আমার বয়স ৩৩ বছর এবং তখনো আমি সেই কারা-কুঠরিতে আছি। তারপব একটি সংবাদ আসে যে, আয়-আখতারের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। তিনি অমবার দ্বিতীয় পত্নী, আলী নকী খাঁর কন্যা। তিনি অবধের রাণী; তিনি যেন একটি ফুল। একটি মঞ্জুরী। আর সপ্রতিভ, সুদর্শনা, সুন্দরী আখতার মহল। তাঁর মুখ ফুলের মতন রক্তাভ আর তাঁর যৌবন যেন বাগিচার বসন্ত। লালার মতন লাল তাঁর গাল দুটি। পরীরা হিংসা করে তাঁর ধরণ ধারণ। কালো সাপের মতন তাঁর মাথার চুল। দাঁত-

গুলি যেন হীরা মুক্তা। কাঁধ দুটি যেন আলোর বেলুন আর হাত দুখানি যেন আল্‌মাশ পান্নার মতন। অতি ক্ষীণ কটি তাঁর।...তিনি বাগানের মতন, ফুলের মতন, চাঁদের মতন, হুরির মতন। তাঁর গাল দুটি যেন স্বর্গের আভা। ভারি মিষ্টি, একেবারেই মাথা গরম নন আর গাছের মতন সোজা! বয়স ১৭ বছর। কিন্তু হায়, আমি এখন বন্দী-শালায়। তাঁর বিষয়ে আমি জানি না, তিনি হীরা কিংবা পাথর।

এই বেগম একটি চাঁদের জন্ম দিয়েছেন আর তার মুখ বা অবয়ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। তার মুখ তার মায়ের মতন কিংবা বাবার মতন।

খোদা যদি আমায় কারার বাইরে নিয়ে রাখেন তাহলে সব বৃত্তান্ত বলি।

তা ছাড়া, রউনক্ আরা বেগম আছেন।

আমি আমার পুত্রের কোন নাম দিইনি। আল্লা যেন তার শরীর বাড়িয়ে তোলেন আর সে যেন এই মসনবীর ছায়ায় উন্নতি করতে পারে।

পরবর্তী অধ্যায়ের শিরোনাম—'লক্ষ্ণৌ থেকে যে বেগমরা এসে এখন মুচিখোলা নামে অভিহিত মেটিয়াবুরুজে বাস করছেন তাঁদের বর্ণনা এবং কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মের বন্দীশালা নিবাসী মসনবী লেখক। সাকীনামা।

ও সাকী, এমন সুস্বাদু সুরা আমায় দাও যাতে আমি এই দুঃখের পাত্র বিস্মৃত হতে পারি। এই পেয়ালা যেন পরিপূর্ণ, বর্ণচ্ছটাময় হয়; এমন কি নষ্ট করে দিতে পারে আমাদের শত্রুপক্ষের মাদকতা আর এই বেশি বয়সে আমি যেন হতে পারি তরুণ। আমি যেন এই কাবাগারেও এটা উপভোগ করতে পারি।

লক্ষ্ণৌ থেকে আমি কয়েকজন নরনারীকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি। এঁদের মধ্যে আছেন লেখকরা, সৈন্যরা এবং তাঁদের সংখ্যা পাঁচশ'র কম নয়। আমার পরিচারকরা, বেগমরা আর বন্ধুবান্ধবরাও এর মধ্যে গণনীয়।

শাহজাদার জননী এখানে আছেন।

দ্বিতীয়ত, মালকা-ই-মুলক্, জার্নেল (জেনারেল) সাব্-এর জননী। তিনি আমার পত্নী, আমার প্রিয়া। আমার গোপন কথা তিনি জানেন এবং আমার সব বেগমের চেয়ে বিশ্বস্তা। তাঁর নাম তাজ উন্নিসা। তিনি যেন এ জগতে দীর্ঘকাল থাকেন।

তৃতীয় বেগম আমার প্রিয়তমা, সঙ্গদানের যোগ্যা তিনি। তাঁর খেতাব মহবুব-ই খাস (বিশেষ প্রিয়া)। তিনি অতি রমণীয়া এবং তার নাম আশিক্ সুমা। সুযোগ্যা সঙ্গিনী তিনি আর কি অপরূপ তার নামটি।

আমার চতুর্থা পত্নীর নাম জানে জান্। তিনি এখন পীড়িত। ওঃ খোদা, তাঁকে নিরাময় করে দিন যাতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

তারপর বড়ী বেগম। তাঁর খেতাব আনীক-এ সুলতান এবং তাঁর নাম মুমতাজ আলম্। এই নামটি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তার পরেরটি হলেন কাইসর বেগম আর এ নামটি আমি লিখছি ভারি মনে। তাঁকে আমি নিকা কিংবা মুতা কিছুই করিনি (অর্থাৎ তিনি নবাবের বিবাহিতা নন)। তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যে এসেছেন। কিছুকাল পরে তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরে যাওয়া স্থির করেন আর আমায় ব্যথা দিয়ে চলে যানও। আমি তাঁকে এগারো হাজার টাকা দিতে মনস্থ করেছিলুম যাতে তিনি আমার সঙ্গে থাকেন। কিন্তু তাঁর মন এত খারাপ হয়েছিল যে তিনি চলে গেলেন।

আর একজন বেগম, খুর্জিস্তা মহল, কারবালায় তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, তিনি এখন মুচিখোলায়।

তার পরেরটি হলেন জাফরি বেগম। তাঁর ঠোঁট বাগিচার ফুলের মতন লাল আর দাঁত যেন শাদা মুক্তো। তাঁর মুখ ফুলের মতন দেখায়। তাঁর চুলের গন্ধ যেন কস্তুরির খোশবু। তাঁর চোখ দুটি আমার মনের পাখীকে শিকার করে বেড়ায় আর তাঁর মুখের জন্যে ছাড়তে প্রস্তুত আছি ফিরদৌসীর সমস্ত কবিতা। তাঁর ভ্রূযুগল এমনভাবে বাঁকা যে মনে হয় দুই পালোয়ান মল্ল যুদ্ধ করছে। তাঁর বুক দুটি যেন খালের মধ্যে বুদ্বুদ, যেন সাগরের ঢেউ। তিনি অতি চমৎকার সপ্রতিভ আর কি মিষ্টি তাঁর কথা। তাঁকে সব হুরদের মধ্যে মুকুট বললেই ঠিক হয়।...আমি তাঁর বিরহে জলে যাচ্ছি। কত বার তিনি আমায় পান সেজে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই কুঠুরিতে। আবার এক এক সময় বন্ধ

রেখেছেন, বলে পাঠিয়েছেন—তাঁর হাত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কখনো কখনো তিনি চলে যেতে চান লক্ষ্ণৌ, কখনো বা কোন তীর্থে, কখনো আসতে চান আমার এই কুঠরিতে। এক এক সময় আমার কাছে টাকা চান। কখনো এক হাজার কখনো ছ' হাজার টাকা। আমি বড়ই মুস্কিলে পড়েছি, এই নারীর বিষয়ে বিমূঢ় হয়ে যাই আমি। বুঝতে পারিনা, তিনি আমায় ছেড়ে চলে যাবেন কি না।

তাঁর মুহব্বতে আমি নিজেকে নষ্ট করে ফেল্‌ব। তাঁর বিরহে মৃত্যু হবে আমার, আর সেজন্যে তিনিও হবেন অনুতপ্তা।

মাসের পর মাস আমার প্রিয়াদের বিচ্ছেদ আমি ভোগ করছি আর বিষাদ বেদনার ধোঁয়া আমার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে।

(ক্রমশঃ)

ফিন্‌ল্যাণ্ডের খেলোয়াড় প্রেসিডেন্ট ডঃ কেক্কোনেন

নামটা সত্যিই বিদঘুটে, কিন্তু খেলার জগতের খবর যাঁরা রেখে থাকেন, তাঁদের অনেকের কাছেই ডঃ উরহো কেক্কোনেনের (Dr Urho Kekkonen) নাম সুপরিচিত। ইনি ফিন্‌ল্যাণ্ড রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন।

বয়স হল পঁয়ষট্টি বছর, তবুও রোজ ঘণ্টাখানেক শরীর-চর্চা করে থাকেন।

ওঁর গ্রীষ্মাবাস কুলতারাস্তা ভারী মনোরম জায়গা। আশে পাশে ঘন পাইন বন।

ডঃ কেক্কোনেন যে কয়মাস ওখানে থাকেন, প্রত্যহ দশ বার মাইল বনের মধ্যে ঘুরে ফেরেন। অবসর জুটলেই ছোটেন ফিনিস ল্যাপল্যাণ্ডে,—যেখানে মাইলের পর মাইল উঁচু নীচু পতিত জলাভূমি ও জঙ্গল, মাঝে সুনীল হ্রদ ও পাইনের অরণ্য। ইচ্ছেমত বেড়িয়ে বেড়ান (ইংরেজরা যাকে বলে হাইক্ ইং) সেখানে। হ্যাভারস্যাকে কিছু খাবার ও টুকিটাকি জিনিষ ভরে নিয়ে,—গ্রীষ্মকালে পদব্রজে, শীতকালে পায়ে শী (Ski) এঁটে, বরফের ওপর দিয়ে।...

১৯২০ সালে বয়স যখন তাঁর কুড়ি বছর হেলসিং ফোরস (বর্ত্তমানে হেলসিন্‌স্কী) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উরহো ক্রীড়াবিদ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বহু ট্রফী ও মেডেল পেয়েছেন। এই বয়সে দু দুবার হাই-জাম্প চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়ে গেল, আজও তিনি লাফ ঝাঁপের অভ্যেস রেখেছেন।

১৯৬১ সালে নরওয়ের হলমেনকোলেনে (Holmenkollen) বাৎসরিক শীতকালীন ক্রীড়ার উদ্বোধন উৎসবে তিনি যখন রাজা ওলাভের (Olav) সঙ্গে শী চেপে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন, তখন হাজার হাজার নরওয়ে-বাসীর উল্লসিত কণ্ঠ তাঁকে উচ্চকিত অভিনন্দন জানিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট কেক্কোনেনের মত ওস্তাদ শী-চালক (Skier) খুব কম দেখা যায়। পায়ে শী লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে যাঁরা ভ্রমণে সহযাত্রী হয়েছেন, তাঁরা সবাই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করবেন। দিনে উনি এখনও অক্লেশে একশো মাইল শী চেপে পর্যটন করতে পারেন।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-জগতে ফিনল্যাণ্ড একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, আর এই ঐতিহ্য স্রষ্টাদের অন্যতম হচ্ছেন উরহো কেক্কোনেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে স্থানীয় ক্রীড়ায় তিনি পাঁচ পাঁচটা বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করেন।

চার বছর বাদ তিনি তিনটি বিষয়ে ফিনিস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন (হাই জাম্প, ষ্ট্যাণ্ডিং হাই জাম্প এবং হপষ্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প)। তখনকার ষ্ট্যাণ্ডার্ডে তাঁর রেকর্ড খুব উঁচুই ছিল।

কেক্কোনেনের ক্রীড়া-প্রতিভা বহুমুখী—যেমনি দৌড়ে, তেমনি উল্লম্ফনে, তেমনি গোলা ছোঁড়ায়, তেমনি পায়ে শী লাগিয়ে ছোটায়।

He had in fact, a most versatile athletics career, being a sprinter, middle distance runner, jumper, hurdler and thrower, as well as being a skier.

সাতাশ বছর বয়সে উরহো কেক্কোনেন ফিনল্যাণ্ডের সেন্ট্রাল স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের এ্যাথলেটিক্স বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। পরের বছর হলেন এই বিভাগের চেয়ারম্যান। সে যুগে তাঁর মত চৌকস ও সুদক্ষ খেলোয়াড় ফিনল্যাণ্ডে আর দুটি ছিল না।

এরপর তিনি এ্যাথেলেটিক্স সেকশনটা একটি স্বতন্ত্র সংস্থায় পরিণত করেন। এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দীর্ঘ আঠার বছর তিনি কাজ চালিয়ে এসেছেন। মাঝে আবার

কয়েক বছর তিনি ফিন্‌ল্যাণ্ডের ওলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবেও কাজ করেছেন।

সংগঠন ও পরিচালনা কার্য্যে তাঁর নৈপুণ্য যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই দেখা গেছে। আজ তাঁর পারদর্শিতা অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োজিত হয়েছে।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ এই দশ বছর, ফিনিস ক্রীড়া-জগতের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেই আমলের বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড়েরা সবাই কৃতজ্ঞচিত্তে আজও তাঁদের ঋণ স্বীকার করে থাকেন, কেক্কোনেনের কাছে।

১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলেসের ওলিম্পিকে যে ফিন্ দল প্রেরিত হয়েছিল ডঃ কেক্কোনেন ছিলেন তাঁর ক্যাপ্টেন। ১৯৩৪ সালে তুরিণে যে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতেও তিনি অধিনায়কত্ব করেন। এরপর ১৯৩৬ সালে বার্লিন ওলিম্পিক গেমসে, ১৯৩৮ সালে প্যারীতে ও ১৯৪৬ সালে অসালোর ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায়ও তিনি তাঁর দেশের দল নিয়ে যোগ দেন এবং এর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ফিন্ খেলোয়াড়েরা অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

প্রেসিডেণ্ট উরহো কেক্কোনেন এখনও দেশে বিদেশে তার ভূতপূর্ব খেলোয়াড় বন্ধুবান্ধবদের নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন, তাদের জন্মদিনে অভিনন্দন জানান, উপহার পাঠান, কখনও কখনও তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে থাকেন।

তাঁর অতীত কার্য্যের স্বীকৃতি হিসাবে ফিন্ সরকার তাঁকে ১৯৬৪ সালে Grand Cross of Finnish Sports নামক পদকে ভূষিত করেছেন।

হীন যান

(উপন্যাস)

সুবোধ বসু

বারো

কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়াই জরুরি তূর্যধ্বনি শোনা যাইতেছিল। বড়বাজারের যত যানবাহনবহুল রাস্তায়ও তাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বনমালী ও নিমাই উভয়েই অর্ডারী মাল সাজাইতে ব্যস্ত ছিল। বনমালীই প্রথমে রাস্তার দিকে লক্ষ্য করিল; নিমাইকে কহিল, যা তো নিমাই, চৌধুরী-মেমসাহেব কি চাইছেন শুনে আয়। ড্রাইভারকে দোকানে পাঠিয়ে দিলেই হয়। নিত্যনিত্য সিঙ্গা বাজিয়ে দোকানের লোককে মোটরের কাছে তলব করে পাঠান: আমাদের মেহনতের কথা কে ভাবতে যায়। বড় লোকের চাল জারি রাখা চাই···দাঁড়ান, দাঁড়ান, যাচ্ছে। বাঁ হাতের পাতা রাস্তার দিকে নাড়িয়া সে মূল্যবান খদ্দেরের আহবানের সাড়া দিল।

নিমাই উঠিয়া পড়িল। চৌধুরি মেমসাহেব দোকানের নিয়মিত ও মূল্যবান ক্রেতা। এ পথে তার গাড়ী গেলেই তিনি গাড়ী থামাইয়া কিছু না কিছু কিনিয়া লইয়া যান। সেই কিছুর দাম পাঁচ দশ হইতে কুড়ি পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। মিসেস চৌধুরি কখনও বা মিষ্টির তারিফ করেন, কখনও কোনও বিশেষ খাবারের উৎকৃষ্ট উন্নয়ন সম্পর্কে উপদেশ দেন, কোনও দিন বা আগের দিনের ভাজা খাবারের ঘিয়ের সমালোচনা করেন। কিন্তু মিষ্টান্নের যে তিনি একজন সমজদার, এটা দোকানের সবাই বুঝিয়া লইয়াছে। রসিক ক্রেতা এবং মূল্যবান ক্রেতা উভয় দিক দিয়াই তাঁর বিশেষ সম্মান করা হয়।

'তোকে দিয়ে হবে না। ডাক বনমালীকে।' নিমাই সসম্মানে মোটর গাড়ীর কাছে হাজির হইবার পর ভিতরের আসন হইতে মিসেস চৌধুরী যথোচিত মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে কহিলেন। ফর্সা মোটাসোটা সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত চেহারার মহিলা নলিনী চৌধুরি। এখনও পঞ্চাশে পৌঁছায় নাই, তবে চল্লিশ ছাড়াইয়া অনেক আগাইয়া আসিয়াছে। বিলিতী সওদাগরী অফিসের বড় সাহেব, স্বামীর প্রকাণ্ড আয়ের সব চিহ্ন রহিয়াছে তার চার পাশে। বাইশ পঁচিশ হাজার টাকা দামের মোটর গাড়ী ও তার উপযুক্ত সাজের শোফেয়ার, কানে দামী হীরার ফুল। পাশে সম্ভ্রান্ত কুকুর গাড়ীর পিঠ রাখিবার জায়গার ঠিক উপরে ব্যাক স্ক্রীণের গা ঘেঁষিয়া, দামী দোকানের সম্ভ্রান্ত সওদায় ভরা একাধিক কাগজের বাক্স। সারাটা দুপুরই চৌরঙ্গী পাড়ায়, কিছুটা হোটেলে এবং বেশির ভাগ দোকানে দোকানে কাটিয়াছে। বাড়ী ফিরিবার পথে এখানটায় থামিয়াছেন।

শীঘ্রই বনমালী স্বয়ং সবিনয়ে হাজির হইল।

'এই লিষ্টি নাও। পরশু তিনটের মধ্যে চাই এ সব। চারটেয় পার্টি। সময় গোলমাল করো না। আর সেরা জিনিষ চাই। খারাপ হলে আমার তো নিন্দে হবেই, সারা বাঙালীর নামই খারাপ হবে। পার্টিতে অনেক বিদেশী মেয়ে পুরুষ আসছেন। তাদের বাঙালী মিষ্টি খাওয়াতে চাই। দেখো যেন বদনাম করো না। রঘুনাথবাবু দোকানে আছেন?

'আজ্ঞে না মালিক নেই।' বনমালী কহিল। 'তিনি পাঁচটার আগে আসেন না।'

'ঠিক আছে। এলে বলো তাঁকে, আমি নিজে এসে অর্ডার দিয়ে গেছি। বিশেষ যত্ন নিয়ে যেন বানানো হয়। আমি একবার পড়ে দিচ্ছি! ভালো করে' শুনে নাও······

মনোযোগ দিয়ে শুনিবার পর লিস্টি হাতে পাইয়া বনমালী নিজেও একবার সশব্দে মিষ্টিগুলির নাম ও পরিমাণ পাঠ করিল।

আপনি কিছু ভাববেন না, মেমসাহেব। সব দেখে করে' দেব। কোনও দিনই কি খারাপ মিষ্টি দিয়েছি?

মেমসাহেব কথাটা সহজেই মানিয়া লইলেন। তবু সাবধানতা হিসাবে প্রশ্ন করিলেন, 'সব পুরানো কারিগর আছে তো?' এবং বনমালীর ঘাড় নাড়া জবাব পাইলেন। কাজ সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া গাড়ী স্টার্ট দিল।

'আর শুনছ, বনমালী, বনমালী ফুটপাথ অর্দ্ধেক অতিক্রম করিয়া দোকানের দিকে আগাইয়া যাইবার পর মেমসাহেবের পুনশ্চ আহবান আসিল, 'গগনকে দিচ্ছ কবে?'

'গগন!' বুঝিতে না পারিয়া বনমালী আবার গাড়ীর দিকে দু'পা আগাইয়া আসিল।

'এই যে তোমার ছোকরাটা! বেশ চালাক ছেলে মনে হয়। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ভালো হয়ে থাকলে সারাজীবন কাটাতে পারবে। তুমিই তো এর কথা বলেছিলে।"

'ও, নিমাইয়ের কথা বলছেন।' বনমালী বুঝিয়া কহিল। ভুতো ফিরে আসার আগে তো দেবার জো নেই। মোটে লোক নেই দোকানে। আমি বলে রেখেছি ওকে……

'কবে আসবে সেটা?

'হপ্তা দু'তিনেক মধ্যেই এসে পড়বে।'

'ঠিক আছে।'

নিমাই বহুবার চৌধুরী মেমসাহেবের গাড়ীতে মিষ্টি পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ভদ্র লাজুক ও সুশ্রী ছেলেটা মিষ্টির দোকানের এঁচোড়ে-পাকা ছোকরাদের মতোই নয়। ছোকরা চাকর হিসাবে ছেলেটা ভাল উৎরাইবে, চৌধুরি মেমসাহেব প্রথম দিনের দর্শনের পরই তাহা মনে মনে ভাবিয়াছেন। বনমালীর কাছে নিমাই সম্পর্কে অনুসন্ধানের পর তিনি প্রস্তাব করেন যে, দোকানের স্থায়ি ছোকরাটা ছুটি হইতে ফিরিয়া আসিলে নিমাইকে যেন তাহাকে দেওয়া হয়। ফাই-ফরমাস খাটিবার জন্য তিনি একটি উপযুক্ত ছোকরার সন্ধান করিতেছেন।

নিমাই প্রস্তাবটা শুনিয়াছে। স্পষ্ট হ্যাঁ না কিছু করে নাই। সে জানে, 'রাজাবাবুর কাছে একবার হাজির হইতে পারিলে এসবের প্রয়োজনই হইবে না। তবু কাজটা একেবারে হাতছাড়া করা ঠিক নয়। ধনীর বাড়ি। মনিব আগ্রহ করিতেছেন। এমন আশ্রয় কম লোভনীয় নয়। এক সময় সে ইহা কল্পনাও করিতে পারিত না। হয়তো মোটর গাড়ী করিয়া সে-ও গৃহস্বামিনীর সঙ্গে সওদায় বাহির হইবে, যেমন অন্যান্য চাকরদের কাউকে সে আসিতে দেখে।

তবে রাজাবাবুর চাকরি স্বতন্ত্রশ্রেণীর। সেটা অফিসের চাকরি! সম্মানের কাজ! তুলী ও ও ননীদির সঙ্গে আবার মিলন হইলে তারা যখন জানিতে পারিবে, নিমাই অফিসে চাকরি করে তখন নিশ্চয়ই তারা খুশিতে এবং নিমাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ হইবে। এই সম্ভাবনায় রাজাবাবুর সম্ভাব্য চাকরিটা আরও মূল্যবান এবং নাটকীয় মনে হয়।

পরের রবিবার, সকালে দুঘণ্টার জন্য ছুটি নিমাই আগেই চাহিয়া রাখিয়াছে। রাজাবাবু যে সময় নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা হাজির হইয়াছে। তবু নিমাই ইচ্ছা করিয়াই দু পাঁচ দিন দেরি করিতেছে, পাছে ঠিকানামত হাজির হইয়া দেখে যাঁর কাছে গিয়াছে তিনি তখনও বিদেশ হইতে ফেরেনই নাই। ভুতোর ফিরিয়া আসিতে এখনও কোন্ না দিন দশেক বাকি।

'ওরে নেমাই দিদিমণি একবার ডাকছেন।' দোকানের মেঝেতে গামছা বিছাইয়া নিমাই দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের আয়োজন করিয়াছে, এমন সময় উপরতলার গঙ্গাঝি আসিয়া সমন জারি করিল।

'দিদি! নিমাই বিপন্নের দৃষ্টিতে চাহিয়া সেকেণ্ড পরে সাড়া দিল। 'যাবো খন! একটু জিরিয়ে নিয়ে যাবো, বলে দিও গঙ্গা দি। খুব মেহনত গেছে…।

'ছেলে ছোকরার এত আলিসি দেখি নি বাবু!' গঙ্গা প্রশ্রয়ের কণ্ঠে কহিলেন। 'তা ঠিক আছে। এমন কিছু জরুরী নয়। কিন্তু বেমালুম ভুলে গিয়ে আমাকে বকুনি খাইও না যেন। আমি কিন্তু যেমন হুকুম বলে গেলুম…কাজ কাজ, কাজ! কাজের অন্ত নেই। চিটি নিয়ে যাচ্ছি থিয়েটারের অফিসে। ফিরতে তিনটে বেজে যাবে। তার আগেই যেন দেখা করে এসো। বুঝলি ছোঁড়া? কিরে, ঘুমুচ্ছিস নাকি…'

'তুমি যাও গঙ্গা দি। আমি শুনে রেখেছি। সময় মত একবার ঘুরে আসব।' ধরাশায়ী নিমাই চোখের পাতা না খুলিয়াই কহিল।

বাইজী নয়নতারার ডাককে নিমাই ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থাৎ ব্যবসাসম্পর্কহীন দুপুরের এই আহ্বান। নয়নতারার প্রস্তাব লোভনীয়। ইহাতে রাজী হইলে মহা আরামে পায়ের উপর পা তুলিয়া সে থাকিতে পারে এবং উহার একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু নিমাই এমন লোভনীয় প্রস্তাবেও আকৃষ্ট হইতেছে না। একে তো বনমালীদার সাবধানবাণী সর্ব্বদাই মনের ভিতর প্রহরা দিতেছে এবং বাইউজী সম্পর্কে নিজস্ব সংস্কার প্রবল আছে। তার উপর ভয়ের কারণ নয়নতারার সাম্প্রতিক আচরণ। প্রায় প্রত্যহ দুপুর বেলা তার ডাক আসিবে। তার শয়নকক্ষে হাজির হইয়া নিমাইকে তার বিছানার কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিতে হইবে। প্রলাপের মত করিয়া কথা বলিবে নয়নতারা। অদ্ভুত দৃষ্টিতে নিমাইয়ের দিকে চাহিবে। ইদানীং সে হাত বাড়াইয়া নিমাইয়ের হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরা শুরু করিয়াছে। নিমাই সভয়ে সেই হাত মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে নয়নতারা আহত কণ্ঠে বলে, 'মা কি ছেলেকে এতটুকু আদরও করতে পারবে না? ছেলের স্থান যে মায়ের বুকে।'

ততটা এখনও আসে নাই। কিন্তু নিমাইয়ের আশঙ্কার অন্ত নাই। গত ক'দিন হইতেই সে না যাইবার নানা অজুহাত সৃষ্টির চেষ্টায় আছে।

'বনমালী দা, এখন তো কাজকর্ম কিছু নেই। আমি একবার বেরিয়ে আসি। এখন দুটোও বাজেনি, চারটের আগেই ফিরে আসব।' গঙ্গা ঝি রাস্তায় নিষ্ক্রান্ত হইবার পরই নিমাই চকিতে নিদ্রাত্যাগ করিয়া বনমালীর কাছে উপস্থিত হইল।

'কোথা যাবি রে? বনমালী প্রশ্ন করিল।

'বেলেঘাটায় রাজাবাবুর বাড়ীটা আরেক বার ভালো করে চিনে আসি। অনেক দিন আগে গিয়েছিলাম। ভালো করে' মনে নেই।'

'রব্‌বার তো যাচ্ছিসই। একটু সকাল করে' বেরুলেই হতো। আচ্ছা যাবি যা। চারটের মধ্যেই ফিরে আসিস। বনমালী সহানুভূতির সঙ্গেই কহিল। রাজাবাবুর কাছে যাওয়াটা নিমাইয়ের কাছে কতটা তাৎপর্য্য পূর্ণ উচ্চাভিলাষ তাহা বনমালী বেশ ভালো ভাবেই জানে। ভগবান করুন অসহায় গৃহহীন ছেলেটার একটা হিল্লে হইয়া যাক।

যখনই নিমাই শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছাকাছি দিয়া যাতায়াত করে তখনই একবার সেদিকে আত্মীয়সুলভ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে চাহিয়া দেখে। প্রায় নিজের দেশ বলিয়া মনে হয় জায়গাটাকে। গৃহ হারাইবার পর এটাই গৃহ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ তাকাইয়া দেখিল, ষ্টেশনের স-কোন ছাদের উপর প্রকাণ্ড আষাঢ়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হই াছে।

দুপুরের রোদ ঢাকা পড়াটাকে নিমাই সৌভাগ্যই মনে করিল। রাস্তাঘাট তার মুখস্থ। বনমালীকে বাড়ী চিনিয়া আসিবার অজুহাত দিলেও বাড়ী চেনা তার কাছে সমস্যা নয়। ইতিমধ্যে পাঁচ সাতবার সে এই রাস্তায় রাজাবাবুর রাজপ্রাসাদের দিকে থাম। আগাইয়া গিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যায় নাই। দূর হইতে বাড়ীটা নজরে পড়িলেই যথেষ্ট। তার মুক্তির উপায় রহিয়াছে ঐ রহস্যময় মহামূল্য প্রাসাদে। বেশি কাছে আগাইয়া গিয়া হ্যাংলাপনা করিতে চায় না। ইহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। তারপর সময় উপস্থিত হইলে সে দরবারে হাজির হইবে!

রাজাবাবু কত উদার, দুঃখীর প্রতি কত সহানুভূতিশীল তাহা নিমাই নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানে। তিনি যখন নিমাইয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন তখন আর চিন্তা নাই। বনমালীদা বলে, ঐ কার্ডটাই তোর ভেতরে ঢুকবার টিকিট, ওটা হারাস নে যেন'

হারাইবে! কথা শোন! বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছে নিমাই ওটাকে। জামার নিচের ফতুয়ার বুক-পকেট হইতে খামে মোড়া ভিসিটিং কার্ডটা সসম্ভ্রমে বাহির করিয়া বহুবার পড়া লাইনকয়টি আবার সে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িল। স্যর! স্যর নাকি খুব নামী লোক হইলে খেতাব পায়। রাজাবাবু যে, যে সে লোক নন তাহা নিমাই অতসব না জানিয়াও প্রথমেই বুঝিয়া লইয়াছিল। অত বড় লোক না হইলে অত বড় মন হয়। দুঃখী, অসহায়ের জন্য এত দরদ থাকে।

নিমাই উৎসাহের সঙ্গে রাজবাড়ীর দিকে আগাইয়া চলিল।

রাজাবাবুর সঙ্গে ভেট হইলে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, কি চাকরি পাইলে নিমাই খুসি হয়, তখন কি জবাব দিবে

নিমাই? ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছে সে। অফিসের পিয়নের কাজ চাহিলে কম চাওয়া হইবে নাকি? অবশ্য অফিসের যে কোনও কাজ পাইলেই সে সন্তুষ্ট হয়, তবু একবার ছোটখাটো কেরাণীর কাজ চাহিয়া দেখিলে কেমন—হয়?

নিমাই মনশ্চক্ষে নিজেকে টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে আসীন হইয়া খাতায় কলমের আঁচড় দেওয়ায় ব্যাপৃত দেখিল। মাস শেষে মাহিনা পকেটে পুরিয়া কি তার আনন্দ! প্রথমেই মন্দিরে গিয়া বাতাসা ও ফুল বেলপাতা কিনিয়া পূজা দিবে। তারপর ভিখিরীদের একটা পুরো টাকা বিলাইয়া দিবে। বড় দুঃখী বেচারিরা! নিজের দুঃখ দিয়া সে উহাদের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। তার পরই সে ছুটিয়া যাইবে খবরের কাগজের অফিসে। মস্ত একটা বিজ্ঞাপন দিবে—তুলী ও ননীদির সন্ধানে। সে বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। অনেক লোকে তো পড়ে কাগজ, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খবর দিতে পারিবে। ওদের চেয়ে আর কে বেশি আপনার জন আছে নিমাইয়ের। এদের নিয়াই বাড়ী হইবে তার। তুলী আর ননীদি। হয়তো ননীদি বলিবে, তুলীকে বিয়া কর নিমাই। ওরও আর কেউ নাই।' যেমন আগে বলিয়াছে। ভারি লজ্জা করে নিমাইয়ের এ কথা শুনিলে। তুলী ফর্শা সুন্দরী মেয়ে। বউ হইবারই উপযুক্ত। আর অসহায় তো বটেই। ননীদি জোর করিলে নিমাই অবশ্যই··· ·

আরে, এ কি ব্যাপার! রাজবাড়ীর সামনে রাস্তার দু ধারে এত গাড়ী কেন? কাতারে কাতারে মোটর দাঁড়াইয়া গেছে। যেন গাড়ীর শোভাযাত্রা। গেটের সামনে লোকের ভিড়, পাচীলের লোহার রেলিং ধরিয়া ফুটপাথের উপর শত শত লোক দাঁড়াইয়া গেছে।

এত সমারোহ! রাজাবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ প্রত্যাশীতে রাজবাড়ীর আশপাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভাগ্যিস নিমাই কার্ডটা সঙ্গে আনিয়াছে। সুযোগ পাইলে আজই সে কাজটা সমাপ্ত করিয়া যাইবে।

'শুনছ দারোয়ানজী। রাজাবাবু কি ফিরে এসেছেন? দারোয়ানজী গেটের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতে হিমসিম খাইয়া যাইতেছিল, নিমাইয়ের শঙ্কিত ক্ষীণ কণ্ঠ তার কানের ধারে-কাছেও পৌছিল না।

'এই যে সরকার মশায়। নমস্কার হই। আমাকে কি চিনতে পারছেন।

সরকার মশায় উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে বাহিরের ভদ্র অভদ্র ভীড় লক্ষ্য করিবার জন্য বা অন্য কোনও কারণে সেন্ট্রি বক্সের পিছনে রেলিংয়ের ধারে আসিয়া বাহিরে উঁকি মারিয়াছিলেন, নিমাই সুযোগ বুঝিয়া এদিকে ছুটিয়া আসিল।

ভুরু কুঁচকাইয়া তাকাইলেন সরকার মহাশয়। প্রশ্ন করিলেন। 'কে তুই'?

'মাস দুয়েক আগে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। রাজাবাবুর কার্ড দেখিয়েছিলাম। আপনি বললেন, তিনি আরও দু'তিন মাস পরে আসবেন। এখন কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি? এই যে কার্ডটা। তিনি নিজে আমাকে···'

'কোন রাজ্যে বাস করিস তুই? কিছু জানিস নে দেখছি? সরকার মশায় সবিস্ময়ে চোখ বড় করিয়া কহিলেন। 'যে খবর সারা দেশ জানে, কাগজে কাগজে মোটা মোটা হরফে খবর, এত বড় শোভাযাত্রা, এত শোকসভা, কোনও কিছুরই খবর রাখিস নে? দার্জিলিং থেকে শবদেহ স্পেশাল প্লেনে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। কত সোরগোল।··· আর সে দেবতুল্য মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই রে ভাই।' বলিতে বলিতে সরকার মশায়ের কণ্ঠস্বর অশ্রু বিকৃত হইয়া উঠিল। পলকে নিমাইয়ের অস্পষ্ট দৃষ্টির মধ্যে বাড়ীর বাগানের সুদূর বামপ্রান্তে নবনির্মিত বেড়াহীন শনের চালাঘর, তার চারদিকের মানুষের ভিড় ও যজ্ঞধূমের কুণ্ডলী অস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িল। নজরে পড়িল দক্ষিণ দিকের কাছারীবাড়ির সামনে কাঙালী, কলাপাতা, শাদা শাদা লুচি ও পরিবেশকের ব্যস্ততা। মাথাটা যেন ঘুরিয়া গেল।

'খেয়ে যাস ছোকরা। কর্তাবাবুর শেষ কাজ এটা। তিনি নিজে তোকে ডেকেছিলেন।···এ কি! হল কি? অমন ছুটছিস কেন? পাগল নাকি রে এটা!'

সরকার মশায় স্তম্ভিত হইয়া ছুটন্ত নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তেরো

প্রকাণ্ড বাড়ী। বাবুর্চ্চী, বেয়ারা, ড্রাইভার, আয়া, বাসন-মাজার ঝি ও সর্ব্বশেষ সংযোজন ছোক্‌রা। অর্থাৎ নিমাই।

গৃহস্থালির রুটিনে সামান্য ডিউটী থাকিলেও ফাইফরমাস খাটাটাই তার প্রধান কাজ। ওকে ডাক, তাকে ডাক, এটা নিয়ে যা, সেটা রেখে আয়, স্নানের সময় সাবানের কথা মনে হয়েছে, ছুটে যা দোকানে; বড় বাবা, মেজো বাবা বা ছোট বাবার হঠাৎ এটা-ওটার প্রয়োজন হয়েছে, ছুটে যা তার সন্ধানে। সাহেবের চুরুটের দরকার, ডাক পড়ল ছোকরার। তবে প্রধানত মেম সাহেবেরই কাজ।

ভাঁড়ার নিচ্ছে 'বোর্চ্চি'—যা, গিয়ে দাঁড়া। চোরের হাড়ি ওটা। তালা বন্ধ করে ভাল করে টেনে দেখে চাবি এনে ফিরিয়ে দিবি। আয়া বাবুর্চ্চিখানায় ক'বার কখন কখন যায়, সে খবর মেমসাহেবের পাওয়া চাই। বইটা এগিয়ে দে, পা রাখবার মোড়াটা কাছে টেনে আন। পাটা টিপে দে তো ছোকরা! কাল রাতে যে চিঠি দিয়েছিলাম, সাহেবের হাতে পৌঁছে দিয়েছিস? কে নিলে, সাহেব নিজে? মেমসাহেব বাড়ী ছিল? বস্তুতঃ নানা ঠিকানায়, মেমসাহেবের জানাশোনা বিভিন্ন লোকের বাড়ী চিঠি পৌঁছাইয়া দেওয়া নিমাইয়ের অন্যতম প্রধান কাজ। অল্প কয়দিনেই সে বাড়ীগুলি চিনিয়া লইয়াছে। ট্রামে বাসে চড়িয়া গন্তব্যস্থানে হাজির হইতে কষ্ট হয় না। চিঠির উপর নাম ঠিকানা সে সহজেই পড়িয়া লইতে পারে।

মাত্র মাস কয়েকের মধ্যে সে বেশ মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে মেমসাহেবের কাছে। গালাগালি খাইতে হয় না, এমন নয়। বাড়ীতে এমন কে আছে মেম সাহেবের কাছে যাকে গালি খাইতে না হয়। মায় স্বয়ং সাহেবকে। কতবার নিমাই তাঁকে কশাই, 'ড্রাংকার্ড', 'ব্রুট' প্রভৃতি গালি হজম করিতে দেখিয়াছে। 'ব্রুট' এবং 'ড্রাংকার্ড' দুটো শব্দের মানেই নিমাই জানে। সাহেব দু এক সময় জ্বলিয়া উঠিতেন। তবে প্রায়ই মুখে বিরক্তির রেখা ছাড়া অন্য কোনও প্রতিবাদ প্রকাশ পাইত না।

নিমাই সাহেবকে ভয় করে। কথা তিনি কম বলতেন। তবে তাঁর মধ্যে জোর আছে এটা সে সহজেই বুঝিতে পারে। বেয়ারাকে মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় সাহেবকে মদ পরিবেশন করিতে দেখিয়াছে নিমাই। তবে প্রায় সন্ধ্যায়ই তিনি বাড়ী থাকেন না। ক্লাব হইতে ফিরিতে প্রায়ই দেরী হয়। মাঝে মাঝে বাড়ীতে পার্টি হয়। ডিনার পার্টি থাকিলে বাড়ীর আলমারী হইতে মদের নানা রকম বোতল বাহির হয়। পুরুষ অতিথিরাই সাধারণত সে সব খায়। মেয়েরাও কেউ কেউ সন্দেহজনক বর্ণের পানীয় খায় না, এমন নয়।

প্রথম প্রথম এসবে তার বড় ভয় হইত। মেমসাহেবের গালি, দিদিমণিদের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ও মিষ্টত্বহীন হুকুম, মদ খাওয়া-খাওয়ি, নানা ধরণের যুবকদের সাথে অল্প বয়সী দিদিমণিদের নির্লজ্জ মাখামাখি, এ সমস্তই তার গ্রাম্য-সংস্কারের পরিপন্থী। ক্রমে এসব অনেকটা সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এসবই নাকি বড় সমাজের আদব। তা ছাড়া মেমসাহেব গালি দিলেও কিছুটা স্নেহ করেন। এই স্নেহ নিমাইকে বশ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম খাওয়া লইয়া অভিমান হইত নিমাইয়ের। চাকরদের খাওয়া মনিবদের খাওয়া হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা ভাল খাওয়া খায় ঐটা অভিমানের কারণ নয়। চাকরদের মার্কা-মারা আরেক রকম খাওয়া আছে ঐটাই আপত্তি। ক্রমে ইহাতেও নিমাই অভ্যস্ত হইয়া গেল। একগাদা চাকর; এতগুলি করিয়া প্রত্যেকে খায়। উহাদের কে রোজ ভাল ভাল খাওয়ার খাওয়াইতে পারে। বিউলির ডাল, ছোট সস্তা আলু ও শাকের চচ্চড়ি, কখনও বা চুনো মাছের ঝাল। এমন কিছু মন্দ খাওয়ার নয়।

মেমসাহেব আবার খাতির করিয়া কখনও কখনও নিজেদের খাদ্যের অবশিষ্ট অতি সামান্য পরিমাণ বজায় থাকিলে 'ফ্রিজ'-জাত না করিয়া নিমাইকে দান করেন। বলেন, 'এই ছোকরা, একটু মাংস রয়ে গেছে। খেয়ে নিস। হারামজাদা বোর্চ্চি অর্দ্ধেকটা সরিয়ে ফেলেছে, দেখে আয় আয়া মাংস খাচ্ছে কি না। হারামজাদীকে বাড়ী থেকে না তাড়ালে শান্তি নেই। হাংলা, পাজি, বদমায়েস মেয়েমানুষ…'

আয়ার আচার-আচরণের উপর নজর রাখার জন্য সর্ব্বদাই নিমাইয়ের প্রতি আদেশ হয়। কারও নামে নালিশ করা নিমাইয়ের স্বভাব নয়। এ কাজটা তার পছন্দ নয়। সৌভাগ্যক্রমে, নিমাইয়ের সংবাদের উপর ভরসা না করিয়া মেমসাহেব নিজেই উহার চলা-ফেরার উপর নজর রাখেন।

অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা মেয়ে আয়া। চাকর মহলে তাকে লইয়া নানান আলোচনা হয়। বাবুর্চ্চির সঙ্গে তার মাখামাখিটা বেশি। মেমসাহেব এটা মোটেই পছন্দ করেন না। বাবুর্চিখানায় বিনা প্রয়োজনে প্রবেশ করা তার নিষেধ। রাতে তার শোয়ার জায়গা মেমসাহেবের বেড-রুমের বাহিরের করিডরে। তা সত্বেও বাবুর্চ্চির সঙ্গে হাসিঠাট্টা করিবার অভিযোগে হপ্তায় দুচার বার করিয়া আয়াকে সগর্জ্জন শাসন হয়।

'আয়া। আয়া।

'যাচ্ছি।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়াইয়া প্রবেশ করিল আয়া।

কোথায় ছিলি? এতক্ষণ ধরে চেঁচাচ্ছি।' নলিনী চৌধুরী ড্রেসিং টেবিলের পূর্ণ আকার আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলায় পাউডারের পাফ্ এর ঘা মারিতে মারিতে কহিলেন। 'বাবুর্চ্চিখানায় গিয়ে ইয়ার্কি করছিলি বুঝি? লজ্জা করে না তোর?. নানা মিষ্টি কথা বলে ফুসলাচ্ছে। বদমাসের হাঁড়ি এই বাবুর্চ্চিটা। বিধবা মেয়েমানুষ, এ কুল ও কুল দু কুল খোয়াবি।…'

'না তো মেমসাহেব, আয়া বিনীত প্রতিবাদ করিয়া কহিল। 'আমি ছোটবাবার ঘরে তাকে জামা পরতে সাহায্য করছিলাম। ডেকে জিজ্ঞেস…

'বড় বাবা কোথায়? নলিনী সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিলেন। 'তাকেও বল, আমার সঙ্গে বের হ'তে হবে। সে তো তৈরিই আছে।'

আয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া বড় দিদিমণিকে খবর দিতে গেল।

শমিতা নিজের দোতলার বেড রুমের গরাদহীন জানালা দিয়া যথাসম্ভব ঝুঁকিয়া বাহিরে লক্ষ্য করিতেছিল, আয়ার কথা শুনিয়া চমকাইয়া নিজেকে ভিতরে আনিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

'যেতে হবে? কোথায় যেতে হবে?'

'মেমসাহেব মার্কেটে যাচ্ছেন।' আয়া জানাইল।

শমিতা বছর বাবিশের সুশ্রী মেয়ে। বব্ কাটা চুল, লম্বা দোহারা গড়ন, মুখ দামি অঙ্গরাগে মাজা-দেওয়া। ভাবটা চটপটে, চোখের দৃষ্টি চঞ্চল।

'না না। আমি যেতে পারব না।' শমিতা বেশ বিরক্তিস্বরেই কহিল। 'বারে, বলা নেই, কহা নেই—শোন্ বল গিয়ে মাকে, আমার মাথা ধরেছে। ভিড় আর আলোর মধ্যে গেলে খুব খারাপ হবে। আমি শুয়ে পড়ব। চুপ করে শুয়ে থাকব। আর কে যাচ্ছে? নমিতা যাচ্ছে কি?

'মেজো 'বাবা' সাজ করেন নি। ছোট বাবা যাচ্ছেন।' আয়া জানাইল।

'কেউ একজন সঙ্গে গেলেই হল। তা ছাড়া, ছোকরা বা বাবুর্চ্চী কেউ তো সঙ্গে থাকবেই।

ছোক্‌রা, মা বেরিয়ে গেছেন?

'এখনই বের হবেন।'

ড্রইংরুমের কাছ দিয়া নিমাই মেমসাহেবের এক গাদা জিনিষ নিচে গাড়িতে পৌছাইয়া দিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, মেজো 'বাবা' কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দরজার পর্দাটা ঈষৎ সরাইয়া জবাব দিল।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি কখন যে নমিতার টেলিফোন করার দরকার থাকে না, নিমাই ভাবিয়া পায় না। অহরহ সে টেলিফোন করে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তার বলিবার মত কথা থাকে।

শমিতার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট সে। চুলের ছাঁট ও সাজ-পোশাকের কায়দা একই শ্রেণীয়। তবে মেজাজটা বড় বাবার চেয়ে বেশ একটু উগ্র। আদব-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া নিমাই প্রথম হইতেই তাহার কাছ হইতে ধমক খাইয়া আসিয়াছে।

'জবাব দেবার জন্য পর্দাটা ফাঁক করবার কোনই দরকার ছিল না।

'আজ্ঞে?' হকচকাইয়া নিমাই কহিল।

'যাও। নিজের কাজে যাও।' নিমাইয়ের দিকে না চাহিয়া নাকের উপর-অংশে বিরক্তির কয়টা কুঞ্চন রেখা

আকিয়া নমিতা ঝাঁজের সঙ্গে কহিল। 'এক্‌স্‌কিউজ মি, ধমকটি তোমাকে নয়।' টেলিফোনের রিসিভারের মুখে মুখ ন্যস্ত করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'মা বেরিয়ে যাচ্ছেন। অনায়াসে তুমি এখানে আসতে পার।' তারের অপর প্রান্তের বক্তব্যের প্রতি দু' তিন সেকেণ্ড কর্ণপাত করিবার পর নমিতা কহিল। মার মার্কেটে যাওয়া মানেই ঘণ্টা তিনেকের ব্যাপার। খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, উপহার্য্য, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় এমন কিছু নেই যা সংগ্রহ না করতে হবে।' আবার সে দুষ্টহাস্যে টেলিফোনের মাউথপীস্ পূর্ণ করিল।

'হ্যালো। আসছ তো? দেরি করো না। টা টা!' বলিয়া তৃপ্তমুখে নমিতা টেলিফোন রিসিভার আধারে রাখিয়া দিল। কিন্তু ঘরের বাহির হইল না। দরজার কাছে চুপি চুপি আগাইয়া গিয়া পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া মায়ের বেডরুমের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিল।

ইচ্ছা করিয়াই সে সাজ করে নাই। মা দলবল লইয়া বাজার করিতে পছন্দ করেন। তৈরি থাকিলে তার আর নিস্তার থাকিত না! কিন্তু এবার চটপট করিয়া লইতে হইবে। রঞ্জিত আসিবার আগেই।

হরিশ বেয়ারা মেমসাহেবের সঙ্গে গিয়াছে। উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু সওদার পক্ষে সে অপরিহার্য্য। তা ছাড়া সব দিকেই সে চটপটে ওস্তাদ ব্যক্তি। মেমসাহেব সর্ব্বদাই তাকে প্রকাণ্ড চোর বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু বেশি বাজার করিতে হইলে তাকেই বাজার পাঠান।

মেমসাহেব অবশিষ্ট জিনিষপত্র মোটরে উঠাইয়া দিবার পর নিমাইয়ের কোনও কাজ ছিল না। সাহেব বাহিরে চা খাইবেন, আগেই ঠিক আছে। হয়তো ডিনারও বাহিরে খাইবেন। অন্তত রাত দশটার আগে তিনি বাড়ী ফিরিবেন না। দুই দিদিমণি বাড়ী আছেন; আয়াই তাদের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

রাস্তার মোড়ের পান-সিগারেটের দোকান হইতে ছয় বোতল সোডা আনিয়া রাখিবার জন্য হরিশ নিমাইকে পয়সা দিয়া গেছে। এটা বেয়ারারই কাজ, কিন্তু তাড়াতাড়ি মেমসাহেবের সাথে বাহির হইতে হওয়ায় সময় পায় নাই। ছয়টা শূন্য বোতলভরা বেতের সোডাওয়াটার ক্যারিয়র হাতে নিমাই মোড়ের দিকে আগাইয়া গেল।

সম্রান্ত বাসপল্লী এটা। দোকান পসার, এমন কি পদাতিকদের ভিড়ও নাই রাস্তায়। বাড়ী হইতে পাঁচ মিনিট হাঁটিয়া গেলে বাস-চলার রাস্তা পড়ে। এই পথের মোড়ে দুর্য্যোধন নায়েকের জলুসদার পান সিগারেট সোডা লিমনেড কোকাকোলার দোকান। নিমাই পান-বিড়ি খায় না, কিন্তু মনিব বাড়ীর কাজে এখানে এত আসিতে হয় যে, দুর্য্যোধনের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা হইয়া গেছে। দোকানে আসিলেই দু-পাঁচ মিনিট কথাবার্ত্তা হয়। চার মাথার মোড় বলিয়া লোকজন যান-বাহনের বৈচিত্র্যও বেশি। বেশ লাগে নিমাইয়ের এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে।

রাস্তাটা পার হইলেই দুর্য্যোধনের দোকান। বড় ডাক্তারখানাটার দুই রাস্তায় দুটো চওড়া দরজা। এই দুই দরজার মধ্যবর্ত্তী দেওয়ালে ছুতোর মিস্ত্রীর দক্ষতায় মনোরম পান বিড়ির নীড় তৈরি হইয়াছে। আলোর জেল্লায় ওষুধের প্রকাণ্ড দোকানটাকেও কানা করিয়া দিত যদি না উহার এদিককার প্রকাণ্ড কাচের শো-কেস এর মধ্যে সবুজ ও কমলা রঙের কাচের প্রকাণ্ড দুটো আলোকিত মটকা ওষুধের দোকানকে এমন বিশেষ ও রহস্যময় না করিয়া রাখিত। রাস্তাটা আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করিলে সরাসরি দুর্য্যোধনের ষ্টলে যাওয়া যাইত, কিন্তু নিমাই ইচ্ছা করিয়াই ওষুধের দোকানের শো-কেসের কাছ ঘেঁসিয়া যায়। কমলা ও সবুজ রঙের আলো আসিয়া গায়ে পড়ে, রঙিন হইয়া উঠে জামাকাপড়, হাত-পা···

সহসা সুতীব্র ব্রেক কষার আওয়াজে চমকাইয়া উঠিয়া অবলীলাক্রমে নিমাই আধ হাত লাফাইয়া উঠিয়া তিন হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। ওষুধের দোকানের রঙিন আলো-ভরা ভাণ্ড দুটিই তাকে অন্যমনস্ক করিয়াছিল। বরাতজোরে বাঁচিয়া গিয়াছে।

মোটর চালকের বিরক্ত তিরস্কার নিমাইয়ের কানেই প্রবেশ করে নাই। যে বিপদ হইতে বাঁচিল তার চেহারাটা কি রকম তাহা জানিবার স্বাভাবিক কৌতূহলবশতই সে আক্রমণকারী গাড়ির দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড চকচকে গাড়িটা চলিতে

শুরু করিয়াছে। গাড়িটা নিমাইয়ের চেনা-চেনা মনে হইল। পলকে সে চালকদের বাঁ দিকে বড় দিদিমণিকে লক্ষ্য করিল। তখন চালককেও সনাক্ত করিতে কষ্ট হইল না। পরক্ষণে গাড়ি রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চৌধুরি বাড়ীর নিমন্ত্রণে সর্ব্বদাই আসেন হারিৎ সাহেব। বড় দিদিমণির সাথে যে সব যুবকদের বেশি অন্তরঙ্গতা, ইনি তাহাদের অন্যতম।

বড় দিদিমণির মাথা ধরাটা বেশ তাড়াতাড়িই ছাড়িয়া গেছে।

'কে, নিমাই? এনেছিস সোডা? দে, ফ্রিজে নিয়ে রেখে দিই। তোরই অপিক্ষে করছিলাম।'

বাবুর্চ্চিখানায় নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই দৃষ্টিপাত করিয়াছিল নিমাই। সদর দরজা বন্ধ থাকে। চাকর বাকরদের সর্ব্বদার প্রয়োজনে এ পথেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। বস-তঅংশে ঢুকিবার সিঁড়িতে পা দিলেই বাবুর্চ্চীখানার ভিতরটা নজরে পড়ে। নইলে আয়া বাবুর্চ্চীর কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ফিস ফিস করিতেছে, এ দৃশ্য মোটেই তার চোখে পড়িত না। বোধহয় বাবুর্চ্চীই প্রথম নিমাইকে প্রথম লক্ষ্য করে এবং ইহার প্রতি আয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আয়া ভীত সচকিত হইয়া এদিকে তাকাইয়া তাড়াতাড়ি নিমাইয়ের কাছে আগাইয়া তার হাত হইতে সোডা-ওয়াটারের ঝুড়ি নিজের হাতে লইল।

'মেজো "বাবা" ছোকরা ছোকরা বলে হাঁকছিল এই মাত্তর। একবার গিয়ে দেখে আয়। বুঝবেনা তুই কাজে গিয়েছিলি। রেগে কাঁই হবে।' সুন্দরী আয়া মিষ্টিমুখে সহানুভূতির সঙ্গে কহিল।

নিমাই উপরতলায় উঠিয়া গেল। ড্রইংরুমের কাছাকাছি পৌঁছিতেই নমিতার কলহাস্যমুখর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এটাই তার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলার ধরণ। চাকর-বাকরদের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। নিমাই তাকে টেলিফোন করিতে দেখিয়া গেছে। কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া টেলিফোনে কথা চালানো তার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

কিছুক্ষণ আগের বকুনির কথা বেমালুম ভুলিয়া নিমাই আবার দরজার পর্দা সামান্য ফাঁক করিল। কিন্তু পলকের জন্য মাত্র। তাড়াতাড়ি সে পর্দা ছাড়িয়া দিল। দিদিমণি কৌচের উপর আরাম কেদারায় শোয়ার ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন, আর তার পিছনে পটের শ্রীকৃষ্ণের মত দাঁড়াইয়া তার চোখ নিজের হাত চাপিয়া রাখিয়াছেন রঞ্জিত সাহেব।

অগত্যা গলা খাঁকারি দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

'কে? ছোকরা। ভেতরে আয়। কোথায় গিয়েছিলিরে হনুমান? ডেকে ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেলেছি··নাও, বলে দাও কি সিগ্রেট আনবে?···' বলা বাহুল্য; শেষোক্ত বাক্যটি রঞ্জিত সাহেবের প্রতি। ইতিমধ্যেই তিনি ভদ্র দূরত্বে ভদ্রভাবে আসীন হইয়াছেন।

'ছুটে যাবি, ছুটে আসবি।' নমিতা শাসাইয়া কহিল।

নিমাই ভিক্ষা করিয়াছে, উপোস করিয়াছে, দোকানের কাজ করিয়াছে। সবটার মধ্যেই দুঃখের অংশ আছে। কিন্তু বাড়ীর চাকর হইবার এই দুঃখটাই সবচেয়ে অসহনীয়। আদেশ আসিবে রূঢ় ভাষায়, আদেশ আসিবে যে কোনও সময়, যে কোন রকম। গাধাকে যেমন বোঝা বহনের যন্ত্র বিবেচনা করা হয়, চাকরও তেমনি হুকুম পালনের যন্ত্র। সেও যে পরিশ্রান্ত হয়, তারও যে শরীর খারাপ লাগিতে পারে, তারও যে জলতৃষ্ণা বা অন্য স্বাভাবিক প্রয়োজন থাকিতে পারে, মনিবের প্রয়োজন তার পরোয়াই করে না। ডাকা মাত্র হাজির না হইলে চোখরাঙা তিরস্কার। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হইলেও নিস্তার নাই। এমন ভাষায় হুকুম করিবে যে, তাহা গায়ে ছুঁচ হইয়া বেঁধে কথা আর একটু মিষ্টি করিয়া বলিলে কি ক্ষতি হইত, নিমাই আহত হইয়া প্রায়ই ভাবিয়াছে।

আবার দুর্য্যোধনের দোকানের দিকে। দিনের পর দিন এই চলিবে। রাজাবাবুর মৃত্যু তার সকল আশা চুরমার করিয়া দিয়াছে। কত স্বাধীনতা অফিসের চাকরির। তার সময় আছে, তার নিয়ম আছে, তার ছুটি আছে। নিজের ছোট্ট একটা বাসা, ননীদি আর দুলী রান্না করিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতেছে, ছুটির দিনে নানা দ্রষ্টব্য দেখাইতে লইয়া যাইতেছে উহাদের। হয়তো বা দুলী তার বউই হইয়া গেল! কত সোনার স্বপ্নই তো বুনিয়াছে নিমাই। স্নেহহীন দাসত্বের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

এবার সাবধানেই নিমাই রাস্তা অতিক্রম করিল। ক্রমশঃ

নৌকো

—নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

অমানিশা ঘোর কখন কাটবে কে জানে ?
বেণুবাজে আজ বিরল সভার মাঝে
সবুজ দেশেতে সিক্ত বসনে অপরূপ সুরতানে
আছ কে সুদূরে তুমি একান্ত সাজে !

জননী যদিও করেনি নিমন্ত্রণ
ভাষাহীন দীপ নিবে গেছে কালরাতে
অঞ্চলে তুমি কে লুকালে মুখ, মন,
শিশির ঝরেছে ওষ্ঠ যুগলে প্রাতে ।

বহুদূর দ্বীপে তোমার বসতি জানি,
নৌকো রিক্ত চলেছে আমাকে নিয়ে,
নিরালায় একা বসে থাক অভিমানী
মাঝি চলে গেছে শেষ তরীখানি বেয়ে ।

তারুণ্যের আবেদন

বাঁশরী দত্ত

আমি চাইনা মোক্ষ,
হে সন্ন্যাসী, তুমি ফিরে যাও,
এনোনা তোমার মুক্তির বাণী মর্ত্যের এই
লীলা চঞ্চলের মাঝে ।
সরস প্রকৃতির শ্যামলীমায়,
এনোনা শীতের অভিশাপ ।
যৌবনোচ্ছল তারুণ্য তোমাকে চায়না,
হে সন্ন্যাসী, তুমি ফিরে যাও,
হাসি অশ্রুর কলরোলে-ভরা বাস্তব এই
জীবনের মূল্যে
তারুণ্য চায়না অমৃতের আস্বাদ
তারুণ্যের প্রতিটি রক্তবিন্দুর আবেদন,
হে সন্ন্যাসী, তুমি ফিরে যাও ।
যৌবনের উচ্ছ্বসিত রক্তজোয়ার শান্ত হবেনা
তোমার মুক্তির আশ্বাসে ।
কোমল কঠোর এ জীবনে,
এনোনা স্বর্গের অভিশাপ ।
যৌবনের কাছে তুমি পরাস্ত,
হে সন্ন্যাসী, তুমি ফিরে যাও,
শোক অশ্রুর কালিমা ভরা কঠোর এই
জীবনের বিনিময়েও
তারুণ্য চায়না মুক্তির স্বর্গে উত্তরিতে ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কাজ করো তার

(স্কটলণ্ডের ডঃ নরম্যানের কবিতার অনুবাদ)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সাহস করিও, ভাই, খেয়োনা হোঁচট,
যদিও তোমার পথ নৈশ অন্ধকার;
সজ্জনে চালাতে আছে তারা সন্নিকট—
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কাজ করো তার।

হোক্ পন্থা যতদীর্ঘ নিরানন্দময়,
অন্ত দূরে থাকে যদি দৃষ্টি-সীমানার;
সাহসে চলিও পথে,—সবল নির্ভয়—
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কাজ করো তার।

ধ্বংস করো চতুরতা আর প্রতারণা,
ধ্বংস করো আলোকেতে ভয় হয় যার,
ক্ষতিকর কিংবা হোক লাভের সূচনা,
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কাজ করো তার।

বিশ্বাস করো না সঙ্ঘ, গির্জ্জা, দলাদলি,
বিশ্বাস কোরো না দ্বন্দ্বে নেতাকে আবার;
কিন্তু প্রতিবাক্যে কার্য্যে হয়ে মনোবলী
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কাজ করো তার।

বিশ্বাস করো না দোষী রিপু-দাস জনে,
শয়তান ধরে দেবদূতের আকার,
বিশ্বাস কোরো না প্রথা, শ্রেণী ও ফ্যাসনে—
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কাজ করো তার।

কেহ বা করিবে ঘৃণা, কেহ দিবে প্রীতি,
কেহ বা তুষিবে, দোষ ধরিবে তোমার—
দূরে থাকো মানুষের, ঊর্দ্ধে চাহ নিতি,
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কাজ করো তার।

দৃঢ়তম বিধি আর নির্বিঘ্ন গমন;
মানসিক শক্তি আর আলোক সম্ভার;
আমাদের পথে আছে তারা সুশোভন—
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কাজ করো তার।

ভূমধ্য সাগর

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

প্রেমের মনের মতো নীল আর সবুজের দোলা
তোমার বুকেতে দোলে; গভীর তোমার কালো চোখ ;
ধরণীর বাহুবন্ধে বাক্যহারা কোন আত্মভোলা
অনাবিল শুয়ে আছো। পৃথিবীর যতো পণ্যলোক
তোমার বন্দরে পায় বাণিজ্যের তীর্থের সাধন,
তোমার জলেতে কাঁপে কতো সভ্যতার ওঠা নামা,
কতো ইতিহাস কথা ঢেউয়ে ঢেউয়ে করে সন্তরণ।
ডিডোর কার্থেজ, ক্লিওপাত্রার একৃটিয়মে থামা
কথা ছিলো একদিন তোমার হাতটি ধরে হাতে,
নেপ্‌ল্‌সের তীর ধরে চলে যাবো শেলীর সন্ধানে ;
যেখানে এপোলো এসে ভীনাসকে ধরেছিলো রাতে,
গুঁড়ো গুঁড়ো বালুবেলা শিহরিত সিবিলের গানে।
এখানে জ্যোৎস্নাহীন আকাশেতে কাঁপে শুধু তারা।
বলোতো এ ছবিটার কোনখানে তোমার ইশারা ?

গ্রীসের মাটি

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

কর্কশ বন্ধুর মাটি ! জলপাই বনে গরু চরে।
রাখালেরা উদাসীন। মাঠে ক্ষেতে জল দেয় চাষা।
একটা হঠাৎ ভেড়া একা একা ফিরে যায় ঘরে,
দূরে ওড়া শঙ্খচিল। আকাশে হালকা মেঘ ভাসা।
তরুণী কিষাণী তার রঙীন রুমাল খুলে নিয়ে
চুলটা জড়িয়ে বাঁধে। ঘাম মুছে এবার তাকায়।
ঘন নীল চোখ তার। হেলেনের স্বদেশিনী কি এ ?
পীন বক্ষ ওঠে নামে' কে আবার গীটার বাজায়।
দূরে এক ফালি নদী। জোলো মনে আকাশ-আল্‌পোনা
গ্রামে ফেরা সরু পথ। সীডারের চাকায় মৌচাক।
বুড়োটা পড়িয়ে দিলো এর মাঝে কালান্তর গোণা।
এ দেশ প্লাতো-র দেশ। এখানে সকলে শান্তি পাক।
পুব চায় এনে দিতে পশ্চিমের আকাশেতে আলো।
পশ্চিমের জ্যোতিরূপ। পূর্বাচলে অনিবার্য কালো।

হারজিত

গল্প

সুধীর রাহা

নীলমণি চক্রবর্তী ও হারাণ পাঠক এঁরা প্রতিবেশী। এঁরা আবার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ও বটেন। উভয়ের বাড়ী প্রায় গায়ে গায়ে একরকম লাগালাগি। মাঝে মাত্র একটি বাগানের ব্যবধান। উভয়েরই বেশ বয়স হইয়াছে, মাথার চুল সবই সাদা এবং দুজনেরই দাঁত পড়িয়াছে। নীলমণি দাঁত বাঁধাইয়াছেন, কিন্তু হারাণ পাঠক দাঁত বাঁধান নাই। পাঠক বলেন, দেখ ভগবানের দেওয়া বস্তু যখন চলে গেল, তখন নকল জিনিষ মুখে ঢুকিয়ে, খোদার ওপর খোদকারী করি কেন? আর দরকারই বা কী। ওদিকে বেলাও তো যায়—তাছাড়া এই নকল দাঁত দিয়ে কি আর চাল ছোলা ভাজা চিবিয়ে খেতে পারব? শুধু শুধু মাঝখান থেকে গুচ্ছের অর্থদণ্ড। উভয়ের দেহ অশক্ত—এটা সেটা অসুখ লাগিয়াই আছে। কিন্তু গলার জোর কাহারও কম নয়। দুপুরের আহার সারিয়া দুই বৃদ্ধ যখন বাঁহাতে হুঁকা ধরিয়া, ডান হাতে পাশার গুটি চালেন, তখন মাঝে মাঝে খেলার মধ্যে উল্লাসের যে বিকট শব্দ হয়, তাহাতে সকলে চমকাইয়া ওঠে। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত সমান তালে পাশার চাল দিয়া, কখনও উল্লাসে চীৎকার ও হুঙ্কার দিয়া, কখনও বা খেলার চাল লইয়া তর্ক, কথান্তর, ও ঝগড়া শুনিয়া পাড়ার লোক ছুটিয়া আসে। আবার দুইজনের ভাব হইতেও সময় লয় না। কিছুক্ষণ উভয়েই গুম্ হইয়া থাকিয়া একজন বলেন – না: জুৎ করে তামাক সাজ দেখি – শরীরটা টিস টিস করছে। কাল বোধ করি একাদশী—দেখ দেখি পাঁজী খুলে কখন একাদশী লাগছে। তামাক টানিতে টানিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। হারাণের বাড়ীতে গরম চা খাইয়া লাঠিগাছটি ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে নীলমণি চক্রবর্ত্তী বাড়ী ফেরেন। এমনি করিয়া দিন চলিতে থাকে।

উভয়ের পুত্র কন্যার সংখ্যা মন্দ নয়। উভয়েরই দুটি একটি ছেলে বিদেশে চাকরী করে। মাঝে মাঝে টাকা পাঠায়। দুই জনেরই যৎসামান্য জমি-জমা আছে। ধান, পাট, রবিখন্দ হয়, বাড়ীর বাগানের কলা, মুলো, শাকপাতা হয়। এমনি ভাবে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, এই দুই বৃদ্ধ লাঠি হাতে করিয়া বাগান তদারক করেন, গরুর দুধ কেন কম হইল তাহা লইয়া আলোচনা করেন। পাড়ার কাহার গরু ভাল, কত দুধ দেয়, কে জমি কিনিল, এবার ধান কেমন হইবে, পাড়ার কোন্ কোন্ মেয়ে বড় হইয়াছে অথচ বাপ-মারা বিবাহ দিতেছে না ইত্যাদি লইয়াও এইসব ভীষণ সমস্যার সমাধান লইয়া কখনও কখনও তর্কাতর্কি লাগিয়া যায়। মনে হয় বুঝিবা মারামারি সুরু হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হয় না, শুধু গলার জোরে স্থান ও আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। তৎপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, দুইজনে বসিয়া বসিয়া আকাশের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে থাকেন।

হারাণ পাঠকের মাথায় চুল নাই বলিলেই হয়। তামাক সাজিবার পর হাত ধুইবার প্রয়োজন বোধ করেন না—বা আবশ্যকও হয় না। মলিন হাতটি চক্ চকে টাক মাথায় ঘসিয়া ফেলেন। দুজনের সুরু হয় খক্ খক্ কাশি, আর আজে-বাজে বক্ বক্ কথা। অনেকক্ষণ চলিয়া যায়—তামাকের পোড়া গন্ধ ওঠে—বিশ্রী গন্ধে ঘর ভরিয়া যায়। উভয়ে বাগানে আসিয়া গাছের গোঁড়ায় মাটি, খোন্তা দিয়া খুঁড়িতে থাকেন, আর চোখ কুঁচকাইয়া আন্দাজ করিতে থাকেন, গাছটা ফজলী না হিমসাগর—

দুই বৃদ্ধের বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই দিন চলিতেছিল। তামাক, পাশা, বাগান-তদারক, পরনিন্দা প্রভৃতিতে দিনগুলি বেশ চলিতেছিল। কিন্তু মনে হয়, ভগবান নামক ভদ্রলোকটি বেশ বে-রসিক। তিনি মাঝে মাঝে এমন

সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া রসিকতা সুরু করিয়া দেন যে, তাহাতে মানুষের প্রাণ-পক্ষী খাঁচা ছাড়িয়া উধাও হয়। এই প্রকার একটি রসিকতার তীর, তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বোধ করি একটু মজা দেখিবার লোভেই এই কার্য্য করিয়া থাকিবেন।

এক শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে চক্রবর্ত্তী মশায়ের বড় ছেলে কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল। ব্রজেন্দ্র কলিকাতায় যেন কি একটা কাজ করে। কিন্তু কি কাজ করে, কত বা মাহিনা, তা পিতার অজ্ঞাত। মাঝে মাঝে ব্রজেন্দ্র মণি-অর্ডারে টাকা পাঠায়, তখন নীলমণি চক্রবর্ত্তী, এখান ওখান হইতে খুঁজিয়া বহুকালের চশমাটি নাকে লাগাইয়া কোনমতে নাম সহি করিয়া টাকা কাপড়ের খুঁটে বাঁধেন। পাঠক বলেন, কি হে ছেলে টাকা পাঠাল বুঝি! ওঃ তা বেশ। তারপর পিওনকে বলেন, কি হে আমার নামে টাকা আসেনি। পিওন ঘাড় নাড়িয়া বলে, না আসে নি। কিন্তু হারাণ পাঠকের তা বিশ্বাস হয় না। তাই তামাক টানা বন্ধ করিয়া বলেন, একবার ভাল করে দেখ দেখি। বলি ভুলও তো হতে পারে। হাসিয়া পিওন বলে, না এসব কাজে কি ভুল হলে চলে। পিওন একটা সিকি বখশীস লইয়া চলিয়া যায়।

ব্রজেন্দ্র কলিকাতা হইতে বাবার জন্য ভাল তামাক, চা ভাল বোনদের জন্য জামা কাপড় আনিয়াছে।

তাই বাড়ীতে সমারোহ। ব্রজেন্দ্র এখন হাতে ঘড়ি বাঁধিতেছে চোখে কালো রংয়ের একটি চশমা। ধুতি ছাড়িয়া পায়জামা আর ছোট জামা গায়ে চড়াইয়াছে। মাথায় দিব্য টেরী, নাকের তলায় সূক্ষ্ম গোঁপ বেশ বাহারী কায়দায় ছাঁটা। দেখিয়া মনে হইবে ইহা মাছি নয়, বরং কালো রংয়ের ছোট্ট প্রজাপতি নাকের তলায় ডানা মেলিয়া বসিয়াছে। ব্রজেন্দ্র এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সকাল হইলে ব্রজেন্দ্র চা পান করিয়া গম্ভীর মুখে ঠোঁটের বাঁ পাশে একটি সিগারেট গুঁজিয়া বাগানে পায়চারী করিতেছিল। ছোট ভাই বোনেরা আজ বেশ শান্ত, আজ তাই তাদের পড়া শোনা হইতেছে। অন্যদিন হইলে বাড়ীতে এতক্ষণ কাক চিল পড়িত। ব্রজেন্দ্র সিগারেট টানিতে টানিতে বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়াইল। তারপর এদিক-ওদিক ভালরূপে দেখিতে লাগিল। এই বাগানের সীমার পরই পায়ে-চলার সরু পথ। উহা এই দুটি বাড়ীর বাগানের মাঝ দিয়া বরাবর সদর রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। ইহা সরকারী কোন রাস্তা নয়, দুই জনেই যাতায়াতের সুবিধার জন্য কিছুটা জায়গা ছাড়িয়া বাগানের বেড়া দিয়াছে। নীলমণি চক্রবর্ত্তীর অন্য দিক দিয়া সদর রাস্তায় যাওয়া যায়, কিন্তু পাঠকের সে সুবিধা নাই। এই পথ কোন ক্রমে বন্ধ হইলে, অনেকটা ঘোরা-পথে সদর রাস্তায় যাওয়া যায়।

এক সময় হাতের লাঠি ঠুক ঠুক করিতে করিতে চক্রবর্ত্তী বাগানে আসিতেই, ব্রজেন্দ্র সিগারেট ফেলিয়া বলিল, বাবা একটা কথা। আমি ভাবছি, বাগানের চারদিকে পাচীল দিয়ে ঘিরে ফেলব।

—পাচীল দিয়ে? বাঃ সে তো ভালই হয়। বছর বছর বাঁশ দড়ির খরচ বাঁচে। ছাগল, গরু, মানুষের উৎপাতও বন্ধ হয়। কিন্তু বাবা, খরচ তো অনেক পড়বে—

—তা পড়বে। আচ্ছা বাগানের সীমানা কদ্দুর? এই বেড়ার গায়ে ঐ রাস্তাটা ওটা কাদের? আপনার বর্ত্তমানে, সব ঠিকঠাক থাকা দরকার, নতুবা ভবিষ্যতে গোলমাল হতে পারে।

—তাতো পারেই। বেড়ার ওধারে পাকা চহাত জায়গা আমার, যাওয়া-আসার জন্যেই ছেড়ে দেওয়া।

ব্রজেন্দ্র বলল, আমি পাচীল তুলব। পাচীলের বাইরে কোন জায়গা ফেলে রাখব না। এদিকে আমাদের রাস্তার দরকার নেই। বাগানের ভেতর দিয়ে থাকবে রাস্তা।

উৎসাহিত হইয়া চক্রবর্ত্তী বলেন, খুব ভাল কথা। বুঝলে বাবা, এটা হল তিনশো বায়ান্ন খতনের দুশো আশির দাগ। বাড়ী বাগানশুদ্ধ জমি হল তিন বিঘে সতের কাঠা আট ছটাক—

ব্রজেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, বেশ। আমি মাল মসলা ইট সব এনে দিয়ে যাব। তমেজ মিস্ত্রীকে খবর দিতে হবে—ইট ক'হাজার লাগবে—চুন সুরকী মাটিই বা কত লাগবে সব ঠিকঠাক হিসেব করে আনতে হবে। আর

মাঝ দিয়ে হবে রাস্তা—একটা বড় দরজা থাকবে ব্যস—

ব্যবস্থা শেষ করিয়া ব্রজেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেল।

ইট চুন সুরকী আসিতেই পাঠক বলিল, কিহে, ছেলে বুঝি বাড়ী করছে। নীলমণি বলিলেন,—হাঁ ঘর পরে হবে। এখন বাগানের চারদিকে পাচীল গাঁথা হবে।

—পাচীল? ওঃ—বাগানটিকে তবে ঘিরে ফেলবে। তা বেশ—কিন্তু পাঠক মুখে বলিলেও, মনে হইল, তিনি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন না। তাঁর ছেলেও চাকরী করে, কিন্তু তিন মাস চার মাস অন্তর যৎসামান্য টাকা পাঠায়। যদি কখনও বাড়ী আসে, বুড়ো বাবার জন্যে ভালমন্দ কোন সামগ্রী আনেনা। বহুবার চিঠি দেওয়ার পর যৎসামান্য টাকা পাঠায়। আর ব্রজেন্দ্র? দেখ, কি মা বাপের ওপর ভক্তি! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাঠক শূন্য নয়নে তাকান। এদিকে নিষ্ফল হতাশা—অন্যদিকে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ, হিংসার বিষ তাঁর সমস্ত মনে ছড়াইয়া পড়ে। নীলমণি চক্রবর্তীর সৌভাগ্য যেন তাকে ব্যঙ্গ করে। পুত্রের বিরুদ্ধে যতটুকুন ক্রোধ হয়, তাহার দ্বিগুণ ক্রোধ ও হিংসা হয় চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে।

চক্রবর্তীর বাগানে মাল মসলা আসিয়াছে। মিস্ত্রী বাগানে সব হাজির। বাগানের বেড়া কাটা শেষ হইয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠক একটি কথাও বলেন নাই। নিজ বাগানের সীমানায় দাঁড়াইয়া, লাঠিগাছটিতে ভর দিয়া, নিঃশব্দে ও উদাসীনভাবে-ইহাদের কার্যকলাপ দেখিতে-ছিলেন। এধারে নাতি নাতিনীসহ নীলমণি চক্রবর্তী তামাক টানিতে টানিতে সীমানা নির্দেশ করিতেছিলেন। রাস্তার আধাআধি জমির উপর যখন সীমানা নির্দেশ করা হইল, তখনই গোলমাল বাধিল। হুঙ্কার ছাড়িয়া পাঠক বলিলেন, বলি হচ্ছে কি? কোদাল থামাও—বলি ও জায়গা রাস্তার। ওখানে সীমানা হবে না।

নীলমণি চক্রবর্তী বলিলেন, তার মানে। ও জায়গা তা আমার—নাও ভিত কাট।

—কাটাচ্ছি ভিত। খবদ্দার, ওখানে পাচীল উঠবে না। ওটা রাস্তার জায়গা। নিজের বেড়ার ওধারে পাঁচীল তোল।

ফুরুৎ করিয়া তামাকের ধোঁয়া ছাড়িয়া, নীলমণি বলিলেন, বাঃ বেশ কথা। এ জায়গা যে আমার তা তুমি জান। শুধু যাতায়াতের সুবিধের জন্যে এতখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু যখন বাগান ঘিরছি, তখন পাঁচীলের বাইরে কোন জায়গা ফেলে রাখব না। মিস্ত্রী হাতগুটিয়ে থেক না। ভিত কাট—

তবেরে—। হঠাৎ পাঠক হুঙ্কার ছাড়িয়া, লাঠিগাছটা সজোরে মাটিতে আপসাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য বৃদ্ধ পাঠকের দেহে যেন হঠাৎ কোথা হইতে বিপুল শক্তি আসিয়া গিয়াছে। ছেলেরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল। দুইবাড়ীর বৌয়েরা ছুটিয়া আসিল। তখন নীলমণি চক্রবর্তীও হুঙ্কার দিতেছেন—লাঠিগাছটি মাটিতে, আছড়াইতে আছড়াইতে চক্রবর্তী বলিতেছেন—ওরে হারাণে ভাল চাস তো পালা। এই আমি সীমানায় দাঁড়ালাম। মিস্ত্রী ভিৎ-কাট, কোদাল চালাও। বুঝলি হারাণ, আমি এখনও রেগে উঠিনি, আর রাগলে সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে তা কিন্তু আগে ভাগে বলে রাখছি—

কিন্তু হারাণ পাঠকও কম যান না। হাতের লাঠিগাছটা লইয়া তিড়িং বিড়িং করিয়া লাফাইতে লাফাইতে বলিল, এখানে পাঁচীল তোলা হবে না বলে। এ কথা বলে রাখলাম কিন্তু।

কিন্তু নীলমণি চক্রবর্তী কম যান না। দুই বৃদ্ধ তখন অসংলগ্ন বস্ত্রে মুক্তকচ্ছ হইয়া, গাছের ডাল লইয়া কখনও মাটিতে আছড়াইয়া, কখনও শূন্যে আস্ফালন করিয়া, আন্দোলিত করিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজমিস্ত্রী যোগানদার দল, পাড়ার লোকে দল বাঁধিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিল। ছোকরা যোগালেরা বলিল, বুড়ো হলে কি হবে, গায়ের ক্ষেমতা আছে। দেখনা কেমন লাঠি[illegible] ঘু। একসময় দুইজনেই ক্লান্ত হইয়া, বসিয়া পড়িলেন। উভয়েই বুক চাপিয়া ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। ছেলেরা কেহ পাখা, কেহ জল লইয়া আসিল। উভয়েই ঢক্ ঢক্ করিয়া জল খাইয়া—কিছুটা শান্ত হইলেন।

পাঠকগিন্নী বলিলেন, বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে।

ঠেলে দিলে যে মানুষ পড়ে যায়, তিনি আবার সজনের ডাল নিয়ে মারামারি করতে গেছেন। পাঠকগিন্নী পাঠককে লইয়া চলিয়া যাইতেই, নীলমণি চক্রবর্ত্তী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—নে-নে হাত চালা সব। দাঁত বের করে যে হাঁসছিস্। দশটা বাজলেই তো জলখাবার খেতে চাইবি।

পাঠক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলনা। এই সব ঘটনা জানাইয়া পুত্রকে একখানা দীর্ঘ-পত্র দিলেন। কিন্তু পত্রের উত্তর আসিল না। পাঠক কাহাকেও কিছু না বলিয়া সদরে যাইয়া মকর্দ্দমা রুজু করিয়া আসিলেন। মকর্দ্দমার কথা অজানা রহিলনা। নীলমণি চক্রবর্ত্তী পুত্রকে পত্র দিয়া, উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিল। নীলমণি চক্রবর্ত্তী পাঠকের নামে ফৌজদারী মকর্দ্দমা রুজু করিলেন। উভয়েই সাক্ষী মানিলেন, পয়সা থাকিলে সাক্ষীর অভাব হয় না। বেশ তোড়জোড় করিয়া মকর্দ্দমা সুরু হইল। কিন্তু হারাণ পাঠকের অবস্থা স্বতন্ত্র। নিজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়—তদুপরি ছেলের নিকট হইতে কোনও সাহায্য পাইবার আশা নাই। অথচ অপর পক্ষের অবস্থা ভাল। বাবার চিঠি পাইয়া, ব্রজেন্দ্র চলিয়া আসিয়াছে। এদিকে পনর দিন পর মকর্দ্দমার তারিখ। পাঠকের মনে শান্তি নাই। কোথা হইতে, মকর্দ্দমা খরচের টাকা আসিবে, তাই চিন্তা। তদুপরি গৃহিনীর অবিরাম বাক্য যন্ত্রণা। এই সব কারণে এখন একমাত্র অবলম্বন হুঁকা হাতে করিয়া, বাহিরের ভগ্নঘরে বসিয়া শুধু চিন্তা। অবশেষে দুটি আমগাছ বিক্রয় করিয়া আপাততঃ টাকার সমস্যার সমাধান হইল।

মকর্দ্দমার দিন আসিল। পাঠক মশায়ের পুত্রের নিকট হইতে টাকা বা পত্র কিছু আসিল না। হাত নাড়িয়া পাঠক গিন্নী বলিলেন, যাদের পেটে নেই ভাত, পরনে নেই কাপড় তারা যায় মকর্দ্দমা বাধাতে। এখন ঠেলা সামলাও। তামাক টানা বন্ধ করিয়া, পাঠক বলেন, এসব বিষয়ে সম্পত্তির কথা বুঝবেনা। এতে নাক গলাতে এসোনা—

ওরে বাপরে। কি আমার মস্ত পুরুষ মানুষের—।

এই মকর্দ্দমার জন্য যেমন লাঞ্ছনার শেষ নাই-তেমনি শরীর আর বহিতে চাহে না। ছেলের নিকট হইতে কোনও সাহায্য আসে নাই। মকর্দ্দমার খরচ যোগাইতে আরও আম কাঁটাল গাছ চলিয়া গেল।

পাঠকের মনে হইল, শেষ পর্য্যন্ত বোধ করি ভিটাটুকুও চলিয়া যাইবে। বৃদ্ধ পাঠক মাথায় হাত দিয়া, শূন্য নয়নে তাকাইয়া থাকেন। মনে মনে ডাকেন—নারায়ণ-নারায়ণ! বেলা প্রায় দুইটার সময় মকর্দ্দমা উঠিল। আসামীর কাঠ-গড়ায় নীলমণি চক্রবর্ত্তী দাঁড়াইয়া। উভয় পক্ষেই উকীল মোক্তার আছেন। পাঠকের সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে উঠিল। কিন্তু একি ব্যাপার! একে একে সকল সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দিল যে, সবাই তাঁহার বিরুদ্ধে যাইল।

মকর্দ্দমার রায় বাহির হইল সন্ধ্যার কাছাকাছি। পাঠকের হার হইয়াছে। রায় শুনিয়া, নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সাক্ষীগণ আনন্দে ফাটিয়া পড়িল। তারপর আদালত হইতে রিকশা চাপিয়া চক্রবর্ত্তী সদলবলে আদালত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পাঠক এখন একা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই। এখন আদালতভবন শূন্য। কোর্টের লোকজন একে একে চলিয়া যাইতেছে শুধু তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে দূর রাস্তা। তাঁহাকে এইবার হাঁটিয়া হাঁটিয়া বাস ছাড়িবার জায়গায় যাইতে হইবে। পয়সা খরচ করিবার আর উপায় নাই। সমস্তদিনের ক্লান্তি দুশ্চিন্তা ও ক্ষুধায় এখন শরীর অবসন্ন। পা আর যেন চলিতে চাহে না। কিন্তু যাইতে তো হইবেই। পাঠকমশাই সম্মুখের রাস্তার দিকে চাহিয়া, একটি নিঃশ্বাস ফেলেন। লাঠিগাছটির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু এখন আর দেহে শক্তি নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে রাস্তার আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, হারাণ পাঠক অতি সন্তর্পণে, রাস্তার একপাশ দিয়া চলিতে থাকেন। পা চলিতে চাহেনা, দম যেন ফুরাইয়া আসিতেছে, মাথায় দারুণ যন্ত্রণা সুরু হইয়াছে। একটু ঠাণ্ডা জল পাইলে হয়। এদিক ওদিক তাকাইয়া জলের সন্ধান করিলেন। না —কোথাও জলের কল দেখা যাইতেছেনা। তিনি আবার হাঁটিতে সুরু করিলেন। এদিকে বাস ছাড়িবার সময় হইয় আসিতেছে' নীলমণি চক্রবর্ত্তী সদলবলে বাসের মধ্যে বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। পাঠক মশাই লাঠির উপর ভর দিয়া কোনমতে বাসের ভিতর উঠিয়া, একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু যেমন গর' তেমনি ভীড়। চক্রবর্ত্তী পাঠককে দেখিলেন, অন্যান্য

দেখিল। উহারা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করিয়া, হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পাঠক বুঝিলেন, এ সবই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া। আজ উহারা হাসিবে, বৈকী! শ্রান্ত ক্লান্ত বৃদ্ধ পাঠক পৈতাগাছটা আঙ্গুলে জড়াইয়া, নিঃশব্দে জপ্ করিতে লাগিলেন। একদৃষ্টে নীলমণি চক্রবর্ত্তীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে হইল, এই সেই নীলমণি। তাহারা দুইজনে আজ কতদিন হইতে পাশাপাশি বাস করিতেছেন। কত সুখ দুঃখের কথা হইয়াছে, দুইজনের কত বন্ধুত্ব কত ভালবাসা। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠিক একে অপরের ছায়ার মত একসঙ্গে থাকিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ জীবনের কত আঘাত কত দুঃখ কত বেদনা আসিয়াছে, তখনও দুইজনের ছাড়াছাড়ি হয় নাই। কিন্তু আজ একি হইল! এতদিনের সব বন্ধুত্ব ভালবাসা সমস্তই এক ফুৎকারে উবিয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটকণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করিলেন—ভগবান! বাস্ ছাড়িয়া দিয়াছে, অন্ধকার রাস্তা ভেদ করিয়া বাস ছুটিতেছে। বাসের সম্মুখের আলোয় রাস্তাঘাট দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখাইতেছে। লোকজন মাঝে মাঝে নামিতেছে—কেহ গল্প করিতেছে। কিন্তু হারাণ পাঠক আজ একা। কেহ কথা বলিতেছে না—কুশল জিজ্ঞাসাও করিতেছেনা—। পাঠকের ক্লান্ত শরীর আর যেন বহিতে চাহেনা—একটু বিশ্রাম একটু ঘুমাইলেই যেন শান্তি। হঠাৎ কি যেন কি ঘটিয়া গেল। সম্মুখে কিছু একটা বাধা দেখিয়া বাস্খানি গতির মুখে পাশ কাটাইতে যাইয়া, ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটাইয়া ফেলিল। রাস্তা হইতে বাস্খানি পাশের খাদে গড়াইয়া পড়িল। আলো নিভিয়া গিয়াছে—চারিদিকে হৈ চৈ—আর আর্ত্ত চীৎকার। কেহ জানালার ভিতর দিয়া, খোলা দরজার ভিতর দিয়া হুড়মুড় করিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছে। গাড়ির একটা দিক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আগুন আর চীৎকারে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকজন ছুটিয়া আসিয়াছে। নীলমণি চক্রবর্ত্তী আহত হন নাই, তাঁহার সঙ্গের লোকদের যৎসামান্য আঘাত লাগিয়াছে। সকলে গোলমাল করিতেছে—চীৎকার করিতেছে।—হঠাৎ চক্রবর্ত্তীর মনে হইল পাঠকের কথা। ব্যস্ত হইয়া দলের লোকজনকে চক্রবর্ত্তী বলিলেন—নিবারণ, দেখতো পাঠক কোথায়? কই তাকে তো দেখছিনে। খোঁজ-খোঁজ সব—। সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। সত্যই হারাণ পাঠক কোথায়? সকলে লণ্ঠন লইয়া খুঁজিতে দেখিল, খাদের মাঝে জলে আর কাদার মধ্যে বৃদ্ধ পাঠক পড়িয়া আছেন।

নীলমণি চক্রবর্ত্তী ডাকিলেন—হারাণ—হারাণ—! সকলে তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কপাল কাটিয়া গিয়াছে, মাথা ফাটিয়াছে—মুখে মাথায় শুধু রক্ত। নিঃশ্বাস পরিতেছেনা, বুকের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। নাকের ভিতর দিয়া একটা ক্ষীণ রক্তধারা নামিয়া আসিয়াছে—।

নীলমণি চক্রবর্ত্তী হু হু শব্দে কাঁদিয়া বলিলেন—ওরে হারাণ, শেষে এই হল? হারাণ শোন্ আমারই হার, আমারই হার; কিন্তু কে শুনিবে? এতদিনের ভালবাসা—বন্ধুত্ব, তুচ্ছ একটা ইট, চুন, সুরকীর আড়ালে চলিয়া গেল। এখন মৃত্যুর রহস্যময় স্থির অন্ধকার, সব কিছুকে অন্তরাল করিয়া, চিরকালের মত একটা দুর্ভেদ্য চিরস্থায়ী প্রাচীর তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল? এ প্রাচীর আর ভাঙ্গিবে না।

আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থিয়েটার

অশোক সেন

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটারগুলো অনেকদিন থেকেই ওদেশের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হয়। ১৮০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতি বছরই কিছুসংখ্যক নাটক মঞ্চস্থ করেন। এই বাবদে ছাত্রছাত্রীরা অভিনয় এবং পরিচালনা শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পায়। জনসাধারণও ভাল ভাল নাটক দেখতে পায়। নতুন নাট্যকারেরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক লিখে ইউনিভার্সিটি থিয়েটারে মঞ্চস্থ করে নাট্য-আন্দোলনের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করেন। পেশাদারী মঞ্চে এই সব নাটকের অভিনয় হওয়া তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তারা চায় কনভেনশনাল নাটক—যে নাটক দেখতে সাধারণ দর্শক অভ্যস্ত—যা মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে কোনো রিস্ক নেই—সহজেই যা থেকে পয়সা আসবে। আর সাধারণতই বাজারে যাঁদের নাম আছে সেই ধরণের লেখকরাই এইসব নাটক রচনা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটারগুলি দ্বিবিধ উপায়ে আমেরিকার নাট্যচর্চাকে এগিয়ে দিচ্ছে—প্রথমতঃ নতুন ধরণের নাটক মঞ্চস্থ করে এবং দ্বিতীয়তঃ নতুন শক্তিশালী নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৯৫৮ সালে ইয়েল ইউনিভার্সিটি থিয়েটারে আর্চিবল্ড ম্যাকলিশের জে, বি, নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এই প্রডাকশনটি নিউইয়র্কের কয়েকজন সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। তাছাড়া কয়েকজন নামকরা পরিচালকও এই নাট্যাভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। ফলে এ নাটকের ব্রডওয়ে রাইটসের জন্যও ম্যানেজারদের ভেতরে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

ইয়েল প্রডাকশনটির ভেতর যে ভুলত্রুটি ছিল না তা নয়। ছাত্র এ্যাকটরদের সবার একরকম অভিনয়-পারদর্শিতা থাকে না। কিন্তু তারা নাটকটি এভাবে মঞ্চস্থ করেছিল যাতে তার নাটকীয় গুণাবলী এবং দুর্বলতা উভয়দিকেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে পড়েছিল। একথা নিসংশয়ে বলা চলে যে, জে, বি, নাটকটি আরও বহু কলেজে এবং কমিউনিটি থিয়েটারে অভিনীত হবে এবং মঞ্চস্থ হলেই নাটকটি উত্তেজনা এবং নানা ধরণের সমস্যার অবতারণা করবে দর্শকদের মনে।

সারা যুক্তরাষ্ট্রেই নানা জায়গায় বহু ইউনিভার্সিটি থিয়েটার রয়েছে—এদের প্রত্যেকটিতেই কল্পনাপ্রবণ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে। কেউ যেন একথা না মনে করেন, শুধু বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে—যেমন ইয়েল—তাল ভাল নাটকের মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। স্যানমাটিওর একটি কলেজ থিয়েটারের (ক্যালিফোর্নিয়াতে) নাম হচ্ছে 'দি' হিলবার্ণ থিয়েটার একটি চ্যাপেলকে সংস্কার করে এই রঙ্গগৃহটি তৈরি করা হয়েছে। মৌলিক নাটক এবং অবহেলিত নাটকের সুষ্ঠু মঞ্চরূপায়ণের জন্য এদের বেশ নামডাক আছে। বহু ধরণের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য এরা বিখ্যাত। যেমন ধরুন, কখনও এদের অভিনয়স্থানের চারপাশ ঘিরে বসে দর্শকেরা, আবার এমনও হয় দর্শকদের চারপাশ ঘিরেই অভিনেতারা অভিনয় করে, আবার সময় সময় দর্শক এবং অভিনেতাদের সমস্ত ভেতরকার ব্যবধান একেবারে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

শিকাগোর রাইট থিয়েটারে ১৯৫৮ সালে যেসব নাটক অভিনয় করা হয়েছিল তার ভেতরে গতানুগতিকতার নাম গন্ধ পর্যন্ত ছিল না। এর ভেতর একটির নাম ছিল 'ওপাশ-ফোর' এটি একটি মৌলিক নাটক—অভিব্যক্তিবাদী ভঙ্গিতে লেখা। এর রচয়িতা কেনেথ ডব্লিউ জেকস্ ওই জায়গারই অধিবাসী।

অনেক ইউনিভার্সিটি থিয়েটার আবার ছাত্রদের লেখা নাটকের অভিনয় দেখিয়ে থাকেন। এবিষয়ে জর্জিয়ার ডেকাটুরের ব্ল্যাকফ্রায়ার্স অভ এ্যাসনেশস্কট কলেজ, ক্যালি-

প্রতিবারের মত এবারেও

প্রবাসী শারদীয়া সংখ্যা

বাহির হইতেছে

তবে ইহা অতিরিক্ত সংখ্যা নয়, কার্ত্তিক সংখ্যাই
বর্দ্ধিত আকারে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অন্যান্য বারের মত এবারেও প্রবাসীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন ঃ
গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্যাসে ছবিতে ইহার আভিজাত্য সর্ব্বজনবিদিত

খ্যাতনামা সাহিত্যিকরাই ইহাতে লিখিতেছেন ঃ

যেমন গল্প লিখিতেছেন—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, কুমারলাল দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, শশাঙ্কশেখর সান্যাল প্রভৃতি।

প্রবন্ধ লিখিতেছেন—যোগেশচন্দ্র বাগল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, কালীচরণ ঘোষ, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কবিতায় আছেন—দিলীপকুমার রায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জগদানন্দ বাজপেয়ী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, মনোরমা সিংহরায়, সুধীর গুপ্ত প্রভৃতি।

ইহা ছাড়া
একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের
পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখিয়াছেন ঃ
বিশ্বজিৎ ঘটক।

গ্রাহকদের সুবিধার জন্য
প্রতি সংখ্যার মূল্য একটাকা চারি আনাই রহিল।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

ফোর্নিয়ার স্যানডিয়েষ্টেট কলেজ, মণ্টানা ষ্টেট ইউনিভার্সিটির মণ্টানা মাস্কার্স এবং ইউনিভার্সিটি অভ টেক্সাসের ড্রামা ডিপার্টমেণ্ট সমধিক প্রসিদ্ধ।

টেক্সাসের ওয়াকোতে রয়েছে বেলুড় বিশ্ববিদ্যালয়—এদের থিয়েটারটি সবদিক দিয়ে প্রগ্রেসিভ এবং অত্যন্ত বৈচিত্র্যমূলক। এরা সেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের এক অদ্ভুত ধরণের প্রডাকশন করেন। এই প্রডাকশনের ডকুমেণ্টারী ছবি তুলে ১৯৫৮ সালে ব্রাসেলসের কেয়ারে পাঠানো হয়, এবং ছবিটি সেখানে পুরস্কৃত হয়। হ্যামলেট নাটকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর ষ্টুডিওতে মঞ্চস্থ হয়—এখানকার প্লেহাউস ছোট—দর্শকদের চারপাশ দিয়ে পাঁচটি ষ্টেজ ইউ আকারে সজ্জিত—এই প্রডাকশনে চিরাচরিত অভিনয়-রীতিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রধান চরিত্রে তিনজন করে অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে। অর্থাৎ ঐসব চরিত্রের বিভক্ত সত্তার পরিস্ফুটনে বিভিন্ন অভিনেতা অভিনয় করে দেখিয়েছেন।

ইউনিভারসিটি থিয়েটারগুলি প্রধানত সেক্সপীয়ারের নাটকগুলোই মঞ্চস্থ করে থাকেন। তাছাড়া গ্রীক ড্রামা, র‍্যাসিন, মলিয়ের এবং অন্যান্য দেশের বিখ্যাত নাটকগুলিও এঁরা নিয়মিতভাবে অভিনয় করেন। আধুনিক ভাল নাটকও যথা মিলারের 'ডেথ অভ এ সেল্‌সম্যান, ওয়াইল্ডারের 'দি ম্যাচমেকার, প্যাট্রিকের 'টি হাউস অভ দি অগাষ্টমুন' বা বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো—আমেরিকার নানা জায়গার বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে।

নাট্যের প্রসারের জন্য আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাগুলি প্রায়ই নাট্য উৎসবের আয়োজন করছেন। এর দ্বারা নাট্য-আন্দোলনকে যথেষ্ট সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ থিয়েটারগুলোকে কার্যকরী করে তোলবার জন্য আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নাট্যশিক্ষা দেবার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

নাট্যশিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব বিষয়ে প্রধানত পাঠ দেওয়া হয় তা হচ্ছে—(১) অভিনয় (২) রূপসজ্জা (৩) মঞ্চসজ্জা, (৪) আলোক নিয়ন্ত্রণ, (৫) পরিচালনা। তাছাড়া থিওরির দিকটাও বিশদভাবে পড়ানো হয়ে থাকে।

গ্রেট বৃটেনে প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি বা কলেজে কোনো আলাদাভাবে অভিনয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নেই। তবে রয়াল একাডেমী অভ ড্রামাটিক আর্টস—সেখানে শুধুমাত্র নাটক সম্বন্ধে প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। রয়াল একাডেমী থেকে পাশ করা বহু ছাত্রছাত্রী পরবর্তী জীবনে লণ্ডনের পেশাদারী থিয়েটারে ঢুকে নিজেদের অভিনয়-কৃতিত্বে ষ্টার পর্যায়ে পর্য্যন্ত উঠতে পেরেছেন। লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতেও দেখেছি থিয়েটার সম্বন্ধে এক্সটেনশেন লেকচারের বন্দোবস্ত করা হয়। এই সব লেকচার দিতে আসেন নামকরা সব পেশাদারী অভিনেতা বা অভিনেত্রী, ভাল ভাল পরিচালক এবং ষ্টেজ-টেক্‌নিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের দল।

এছাড়াও গ্রেট বৃটেনে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। লণ্ডনে এই ধরণের দুটি নামকরা প্রতিষ্ঠান হোল 'দি সেন্ট্রাল স্কুল ফর মিউজিক এ্যাণ্ড স্পিচ ট্রেনিং' এবং 'দি বৃটিশ ড্রামা লীগ।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

এক বৎসরের আর্থিক হিসাব নিকাশ—

গত বারো মাসে দেশের আর্থিক অবস্থা তার পূর্ব্বেকার বারো মাসের তুলনায় আরো দ্রুততর গতিতে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে একথা সকলেই শুধু মুখে স্বীকার করবেন তাই নয়, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধিও করছেন। কিন্তু সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় এই যে দেশের সরকারী অথবা বেসরকারী নেতৃত্বের উচ্চতম পর্য্যায়েও এই বিষয়টি সম্বন্ধে কোনো সম্যক বা স্পষ্ট অভিব্যক্তির কোনো পরিচয় আজিও পাওয়া যায় নি।

বর্ত্তমানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা এবং সমগ্রভাবে ব্যাপক লোক-কৃচ্ছ্রতার সৃষ্টি করেছে সেইটির কথাই প্রথম ধরা যাক। সরকারী তথ্যপত্রাদিতে এবং পরিসংখ্যান বিশ্লেষণাদিতে বলা হয়েছে যে পর পর দুইটি বৎসরের অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যশস্যের ফসল গত দুই বৎসরে খুব কম হয়েছে। সমগ্রভাবে ভারতে ১৯৬৪-৬৫ সনে আজ পর্য্যন্ত সবচেয়ে বেশী ফসল হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপিত তথ্য অনুযায়ী ঐ বৎসরের মোট খাদ্য শস্যের ফসলের পরিমাণ ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন বা ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন বলে হিসাব করা হয়েছিল। ১৯৬৫-৬৬ সনের খাদ্যশস্যের ফসলের পরিমাণ ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টন এবং ১৯৬৬-৬৭ সনে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টন হয়েছিল বলে হিসাব করা হয়। এই তিন বৎসরে দেশের জনসংখ্যা ৫০ কোটি গড়পড়তা হিসাবে ধরে নিলে এবং ০—৮ বৎসর বয়স্কদের খাদ্যশস্যের বরাদ্দ ৮ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের অর্দ্ধ পরিমাণ হিসাবে নিলে ১৯৬৪-৬৫ সনের বৃহত্তম ফসলের মাথা-পিছু পরিমাণ দাঁড়ায় দৈনিক ১৭'৬ আউন্স, ১৯৬৫-৬৬ সনে ফসলের পরিমাণ ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টন হলে এর পরিমাণ হয় মাথাপিছু ১৬'৪ আউন্স এবং ১৯৬৬-৬৭ সনের ৭ কোটি ২০ লক্ষ টন ফসলে মাথাপিছু দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫'৬ আউন্স। ১৯৬৪ ৬৫ সনে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ ছিল সামান্য মাত্র। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সন থেকে এই আমদানীর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। ১৯৬৫-৬৬ সনে বিদেশ থেকে গম আমদানী হয়েছে ১ কোটি টন এবং ১৯৬৬-৬৭ সনে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন। আমদানী গমের পরিমাণ দেশে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ফসলের সঙ্গে যোগ করলে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের মোট সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় দৈনিক মাথাপিছু ১৭'২ আউন্স। এর থেকে ১০% বীজশস্য ও অনিবার্য্য অপচয় ও বাজার চাহিদার ঘাট্‌তি বাড়তি মেটাবার জন্য বাদ দিয়ে হিসাব করলে মাথাপিছু ভোগ-চাহিদার জন্য সরবরাহের দৈনিক পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫'৪৮ আউন্স।

যে সকল এলাকায় বিধিবদ্ধ র‍্যাশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে

সেখানে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ উপরোক্ত অঙ্ক থেকে অনেকটাই কম। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কলিকাতা এলাকায় যখন প্রথম বিধিবদ্ধ র‍্যাশন প্রবর্তন করা হয় তখন প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য) ৮ ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক) সপ্তাহে মোট ২ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ দৈনিক ৯'৪ আউন্স খাদ্যশস্যের বরাদ্দ করা হয়, ০ থেকে ৮ বৎসর বয়স্কদের জন্য এই পরিমাণের ঠিক অর্দ্ধেক বরাদ্দ হয়। বিধিবদ্ধ র‍্যাশন বিশিষ্ট এলাকাগুলিতে বাহির থেকে কোনও প্রকার খাদ্যশস্যের আদান-প্রদান বা চলাচল আইনতঃ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। অতএব সরকারী ব্যবস্থায় মাথাপিছু যেটুকু খাদ্যশস্যের বরাদ্দ করা হল সেটা মানুষের জীবন ধারণের জন্য পর্য্যাপ্ত বলে ধরে নিতে হবে, অন্যথায় দেশের রাষ্ট্র-সরকার যে দেশবাসীর প্রতি তার প্রাথমিক ও মৌলিক (primary and elementary) দায়িত্ব বহনে এবং পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, এই অভিযোগটুকু বিনা প্রতিবাদে এবং সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে হয়।

সরকারী খাদ্যশস্যের মাথাপিছু বরাদ্দের অঙ্কটিকে যদি দেশের সমগ্র ভোগচাহিদার একটা বাস্তব প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে খাদ্যশস্যের ভোগচাহিদার মোট অঙ্কটির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭০ হাজার টন। এর সঙ্গে অনিবার্য্য অপচয় এবং বীজ শস্যের জন্য অতিরিক্ত ১০% যোগ করলে অঙ্কটির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৪ হাজার ১০০ টন। এর সঙ্গে বাজার উঠতি ঘাটতির জন্য আরো ১০% যোগ করলে সরকারী র‍্যাশন বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যশস্যের মোট বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৫১০ টন। তাহা হলে খাদ্যশস্য নিয়ে এতটা আশঙ্কার কারণ কি?

বিষয়টির অন্য আর একটি দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা স্পস্ট এবং সম্যক বুঝতে সহজ হবে। ১৯৬৪-৬৫ সনের সর্ব্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সনের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টন, অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১২'৫% কম। ১৯৬৬-৬৭ সনের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ৭ কোটি ২০ লক্ষ টন অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ সনের তুলনায় ১৮'২% কম। ১৯৬৪-৬৫ সনে আমাদের বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী মোটামুটি বন্ধ ছিল। ১২'৫% মানে বৎসরে ৩২ দিন। সমগ্র দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহে ৬৫ দিনের আংশিক ঘাটতি কিম্বা ১৮'২% বৎসরে গড়পড়তা ৫৩ দিন মাত্র। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ এবং সনের আমদানী (imported) খাদ্যশস্যের পরিমাণ যোগ করলে মোট সরবরাহের পরিমাণ ১৯৬৪-৬৫ সনের তুলনায় মাত্র ১০ লক্ষ টন আন্দাজ কম ছিলো।

অর্থাৎ বর্ত্তমান দেশজোড়া অন্ন সঙ্কট প্রধানতঃ সরবরাহে প্রভূততম ঘাটতি জনিত নয়। সরবরাহে ঘাটতির পরিমাণ উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণ হবে সামান্য মাত্র (only marginal)। কিন্তু দেশজোড়া গভীর খাদ্য সঙ্কটের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনরকম অস্পষ্টতার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই, এও সত্য।

১৯৬৪-৬৫ সনে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের খুচরা মূল্য বৎসরের প্রথম ছয়মাস ছিল গড়পড়তা কিলো প্রতি ৬৭ পয়সা থেকে ৭২ পয়সা পর্য্যন্ত। ঐ বৎসরের ৭ম মাস থেকে দাম বাড়তে সুরু হয় এবং পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে ঐ দামের হার বাড়তে বাড়তে আশ্বিন-কার্ত্তিক নাগাদ প্রায় কিলোগ্রাম প্রতি ২ টাকায় দাঁড়ায়, অগ্রহায়ণ পৌষ মাস নাগাদ নূতন ফসল ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে খুচরা দাম কিলো প্রতি ১, টাকায় নেবে আসে, কিন্তু মাঘের শেষ, ফাল্গুনের প্রথম দিক থেকেই দাম বাড়তে সুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ ২টাকা এবং ভাদ্র আশ্বিন নাগাদ আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা পর্য্যন্ত ওঠে। ১৯৬৫-৬৬ সনের নূতন ফসল ওঠবার (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ-পৌষ বা ১৯৬৫-৬৬ সনের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস) সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বাভাবিক কারণেই দাম পড়ে যায়, কিন্তু এবার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় নিম্নতম দামের হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২৫.৩০% বেশী ছিল। শুধু তাই নয় খাদ্যশস্য সরবরাহের কৃষ ঋতু সুরু হবার বহু পূর্ব্বেই, অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ) মাসের মধ্যেই দামের হার

পূর্ব্ব বৎসরের উচ্চতম পর্য্যায়ে পৌঁছে যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার সন্নিহিত এলাকাগুলির খোলা বাজারে খুচরা দর কিলোপ্রতি তিন টাকায় পৌঁছে যায়। এই প্রসঙ্গে চাউলের সরবরাহ ও মূল্যমানকে কেন্দ্র করে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ইঙ্গিতে বা নেতৃত্বে যে প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল তার আর পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ব্যাপক আন্দোলন সাময়িক ভাবে একটা সুফল প্রসব করেছিল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ব্যাপকভাবে মডিফায়েড র‍্যাশনিং চালু করে, বিধিবদ্ধ র‍্যাশন বহির্ভূত শহর এবং শহরতলীতে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম করে চাউল বণ্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তার ফলে খোলা বাজারে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির ধারা সাময়িকভাবে কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল। বস্তুতঃ এর ফলে খোলা বাজারে চাউলের কিলো প্রতি খুচরা মূল্যমান আড়াই টাকার কাছাকাছি স্থির হয়ে ছিল। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সনের নূতন ফসল ওঠবার পরেও এবার সেই মূল্যমানে কোন ঘাটতি দেখা যায় নি।

১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজ্যসরকার সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থায় অনেকটা ঢিলে দেন। তার ফলে কলিকাতার বিধিবদ্ধ র‍্যাশন এলাকার চতুষ্পার্শ্বের বর্ডন একরকম তুলেই দেওয়া হয় এবং প্রচুর চাউল আনাগোনা করতে থাকে। সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল ঘোষণা করবার পর যখন দেখা গেল যে কংগ্রেসী দলের রাজ্য বিধান সভায় প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংখ্যা-লঘুতায় পরিণত হয়েছে, তখন খোলা বাজারে চাউলের দাম দ্রুতগতিতে নেবে যেতে থাকে! দুই সপ্তাহের মধ্যে এবং নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পূর্ব্বেই চাউলের খুচরা দাম আড়াই টাকা থেকে দেড় টাকায় নেবে যায় এবং প্রচুর বাজার সরবরাহ চলতে থাকে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করবার পরে এই মূল্যমান আরো কমে যায়—এক টাকা কুড়ি পয়সা থেকে এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সায় ওঠানামা করতে থাকে—এবং সরবরাহের পরিমাণও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চাউলের বাজারে এই অবস্থাটির কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়। সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী ধানের দর আঠারো টাকায় বাঁধা ছিল। মিলগুলির ওপর সরকারী লেভীর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে চাউল কলের মালিকেরাই সরকারী এজেন্ট হিসাবে চাষীর কাছ থেকে এই দামে ধান খরিদ করতেন। অন্যান্য সরকারী এজেন্টরাও এই দরেই ধান সরকারের পক্ষ থেকে খরিদ করতেন। কিন্তু যতটা ধান এঁরা সরকারী হিসাবে খরিদ করতেন, তার অনেক বেশী পরিমাণ এঁরা নিজস্ব আড়তগুলির জন্যও খরিদ করতেন, তার হিসাব সরকারী নথিপত্রে উঠতো না। চাষীর দর-কষাকষির ক্ষমতা (bargaining power) অত্যন্ত সীমিত। আমরা পূর্ব্বের আলোচনায় দেখিয়েছি যে বাংলা দেশের সমগ্র চাষী জনসংখ্যার গড়পড়তা মাত্র ১০ উদ্বৃত্ত উৎপাদক অর্থাৎ এই রাজ্যের শতকরা প্রায় ৯০ জন চাষীর আর্থিক সঙ্গতি এমন ক্ষীণ যে তাঁদের পণ্যের দরকষাকষির ক্ষমতা এঁদের প্রায় নাই বললেই চলে। নূতন ফসল ওঠবার পূর্ব্ব থেকেই ধারে কর্জে এঁদের আর্থিক অবস্থা এমন সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে নূতন ফসল ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ধান বিক্রয় করতে না পারলে এদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। এটা প্রমাণ করা কঠিন নয় যে গত ২০ বৎসরের খাদ্যশস্যের ৪৫০ মূল্যবৃদ্ধির সামান্য মাত্র অংশ চাষীরা পেয়েছেন, এর বৃহত্তম অংশ সরকারী ও বেসরকারী দালালরাই আত্মসাৎ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে দেশের পুঁজি বাজারে (credit market প্রভূত পরিমাণ কালোবাজারী (nauccounted) অর্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের গত চার বৎসরের ধানের ফসলের চাউলের হিসাবে গড়পড়তা বার্ষিক পরিমাণ ছিল ৫০,০০,০০০ টন। এই ফসলের অর্দ্ধ পরিমাণ সরকারী লেভী ইত্যাদির দ্বারা নিয়মিত হত বলে যদি ধরে নেওয়া হয় (যদিও রাজ্য সরকার লেভীর দ্বারা যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তার পরিমাণ কখনোই ১৫,০০,০০০ টন চাউল অথবা ২৪,০০,০০০ টন ধানের সীমানা অতিক্রম করে নি; তাহলে বাকী পরিমাণের সবটা না হলেও অন্ততঃ ৮০ ৯০-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কুক্ষিগত যে হয়েছিল সে কথা সহজেই

অনুমেয়) তা হলেও বাকী অর্দ্ধেকটা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মুনাফাবাজীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিমাণ চাউলের জন্য ধান নির্দ্দিষ্ট সরকারী মূল্যেও সংগ্রহ করতে হলে অন্তত ২০৮ কোটি টাকার প্রয়োজন। এই অর্থের অধিকাংশ অংশই যে কালোবাজারী পুঁজি থেকে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। উচ্চতম সরকারী পর্য্যায়ে এই কালোবাজারী পুঁজির সরকারী রাজস্বের—এবং তার চেয়েও অনেক গুণ বেশী পণ্যমূল্যের এবং বিশেষ করে ভোগ্য-পণ্যাদির উপরে বিষময় প্রতিঘাতের কথা বারংবার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই অবৈধ পুঁজির ক্রিয়া সার্থক ভাবে বন্ধ করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কোনোই আয়োজন উদ্ভাবিত বা প্রযুক্ত হয় নি। এই অবৈধ অর্থের পরিমাণ ঠিক কতটা হতে পারে তা নির্ণয় করবার কোনোই উপায় নেই। তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অনুমান করেন যে এর পরিমাণ ৩,৫০০ কোটি টাকার কম হবার কথা নয়। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী স্বর্গগত লালবাহাদুর শাস্ত্রী একবার বলেছিলেন যে এর পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকা হওয়াও অসম্ভব নয়।

খাদ্য বাজারে যে সঙ্কট গত কয়েক বৎসর ধরে চলেছে তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে বাংলা দেশ সম্বন্ধে উপরে যা বলা হয়েছে, সমগ্র ভারত সম্বন্ধেও সেই একই বিচার। গত চার বৎসরের গড়পড়তা বার্ষিক খাদ্য শস্যের ফসলের পরিমাণ যদি ৮ কোটি টন বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে এর মধ্যে মোটামুটি ২৫ বা একচতুর্থাংশের বেশী নানাবিধ সরকারী প্রয়োগাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাকী ৭৫ বা তিন চতুর্থাংশ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দ্বারা অধিকৃত হয়ে এসেছে। এই ৮ কোটি টন শস্যের মধ্যে গড়পড়তা ৪ কোটি টন চাউল, দেড় কোটি টন গম এবং বাকী আড়াই কোটি টন বাজরা, যব, ভুট্টা ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্য শস্য। সরকারী ১৮ টাকা মন ধানের দরে এক টন চাউলের মূল্য পড়ে ৮৮০, টাকা। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সরকারী দরে ফসলের তিন চতুর্থাংশ অথবা ৩ কোটি টন চাউল সংগ্রহ করবার জন্য ২,৬৪০ কোটি টাকার প্রয়োজন। দেড় কোটা টনের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১ কোটি সাড়ে বার লক্ষ টন গম সংগ্রহ করতে প্রয়োজন ৬০৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; অন্যান্য শস্যের (এদের সরবরাহ বা বণ্টনের উপরে কোনো সরকারী বিধিনিষেধ নাই) তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন পরিমাণ অংশ সংগ্রহ করতে ন্যূনপক্ষে ৭৬০ কোটি টাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ সমগ্র ভারতের খাদ্যশস্যের বাজারে বার্ষিক অন্ততঃ মোট ৪,০০০ কোটি টাকা পুঁজি প্রয়োজন। এই পুঁজি একমাত্র কালোবাজারী অর্থ থেকেই আসা সম্ভব। খাদ্য-শস্যের ব্যবসায়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর বিধি-নিষেধ অনুযায়ী দেশের ব্যাঙ্কগুলির কোন বিশেষ বা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভূমিকা নাই। অন্য পক্ষে সরকারী রাজস্ব বিভাগের হিসাব নিকাশ থেকে বোঝা যায় যে এই প্রভূত পরিমাণ অর্থের বৈধ এবং প্রকাশ্য ভাবে লগ্নীর থেকে সরকারী কোষাগারে যে পরিমাণ রাজস্ব আমদানীর কথা, তার কিছুমাত্র সরকারের হস্তগত হয় না। ফলে এই অর্থ যে কালোবাজারী পুঁজি থেকে আনাগোনা করছে এবং তাকেই উত্তরোত্তর পুষ্ট করে তুলছে এটা সোজা অঙ্কের নির্ভুল হিসাব।

প্রসঙ্গতঃ খাদ্য শস্যের ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কের আমানতী লগ্নীর বিষয়েও কিছুটা অনুমান করবার অবকাশ রয়েছে। খাদ্য শস্যের আমানতীতে ব্যাঙ্কের সমগ্র লগ্নীর পরিমাণ সামান্য মাত্র এই বিষয়ে ভুল নাই। কিন্তু ১৯৬৫ সনের ব্যাঙ্গালোর কংগ্রেসের অধিবেশনের পর কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটির নয়া দিল্লীতে যে বৈঠক বসে, সেই বৈঠকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশ গুলিই অপ্রযুক্ত ফেলে রাখা হয়। এর মধ্যে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত এই ছিল যে খাদ্য শস্যের বেসরকারী মজুত অর্ডিন্যান্স জারী করে সরকারে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে, তার দ্বারা একটি উপযুক্ত পরিমাণ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্যের মজুত (buffer stock) গড়ে তোলা হবে। এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত এবং বিজ্ঞাপিত হবার পর দেশের কম্যার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির তরফ থেকে প্রধান মন্ত্রীর নিকট নিবেদন জানানো হয় যে তাঁদের নিকট আমানতী খাদ্যশস্যের মজুতের ওপর যেন সিদ্ধান্তটি প্রযুক্ত না হয়। প্রধান মন্ত্রীও প্রকাশ্য ভাবে তাঁদের আশ্বাস দেন যে এই সিদ্ধান্তটি কেবল মাত্র অবৈধ মজুতদারীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে এবং ব্যাঙ্কের নিকট আমানতী শস্যের মজুতকে যখন অবৈধ বলা চলে না, তখন সেই মজুতের উপরে এই সিদ্ধান্তটি প্রযুক্ত হবার কোনো আশঙ্কা নাই।

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদেশে অনুরূপ পরিস্থিতিতে জেনারেল নে উইনের বিপ্লবী সরকার কি প্রয়োগ গ্রহণ করেছিলেন

তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রহ্ম দেশে খাদ্য শস্যের (বিশেষ করে ধান ও চাউলের) আমানতীতে ব্যাঙ্কগুলি প্রভূত পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর লগ্নী করতো। ব্রহ্ম সরকার সব ব্যাঙ্কগুলিকে জানান যে সকল প্রকার খাদ্য শস্যের মজুত একমাত্র সরকারী অধিকারে রক্ষিত হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের নিকট আমানতী সকল শস্য সম্পূর্ণ পরিমাণে সরকারে হস্তান্তরিত করতে হবে। এই শস্যের আমানতীতে লগ্নীকৃত সমগ্র পুঁজি সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী অধিকার ভুক্তির আট-দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেন। ভারত সরকারের যদি সকল খাদ্য শস্যের মজুত সরকারী অধিকারভুক্ত করবার সত্যকার সদিচ্ছা থাকতো তাহলে ব্যাঙ্কগুলিকে এই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ থেকে অব্যাহিত দেবার কোনো কারণ ছিল না। অন্যপক্ষে ব্যাঙ্কের আমানতী লগ্নীর পক্ষচ্ছায়ার অন্তরালে কালোবাজারী প্রভাব যে খাদ্য শস্যের ব্যবসায়ে আরো বিস্তার লাভ করার আশঙ্কা ছিল একথা সহজেই অনুমেয়।

বস্তুতঃ খাদ্যশস্যের আমানতী লগ্নীর দ্বারা ব্যাঙ্কগুলির নিকট থেকে পুঁজি সংগ্রহ করবার কোনো প্রয়োজন খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ীর নাই। তাহার নিকট এই মজুতদারীর জন্য প্রয়োজন প্রভূত কালোবাজারী পুঁজি আগাগোড়াই আছে। তার যা আসল প্রয়োজন সেটা সরকারী বা বেসরকারী বাজেয়াপ্তি থেকে তার মজুতটিকে রক্ষা করা। প্রধানমন্ত্রীর ব্যাঙ্কগুলির নিকট আশ্বাস তাদের সেই রক্ষা কবচটি এনে দিয়েছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে খাদ্যশস্যের মজুতদার গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। কম্যার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির কর্তৃপক্ষদের মধ্যেও কেহ কেহ যে প্রত্যপশালী খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সে কথাটা অজানা নয়। ব্যাঙ্কের নিকট আমানতী মজুত যদি সরকারী বা বেসরকারী বাজেয়াপ্তির আশঙ্কা থেকে মুক্তি পায়, তাহলে মজুত শস্যের মূল্যের কিয়দংশ মাত্র শতকরা সাড়ে আট টাকা সুদে ব্যাঙ্কের নিকট আমানতী ঋণ গ্রহণ করে সমগ্র মজুতটির নিরাপত্তা বিধান করা অত্যন্ত সস্তা ব্যবস্থা। আমাদের নিকট কেহ কেহ অভিযোগ জানিয়েছেন যে ব্যাঙ্কগুলির নিকট কয়েক কোটি টাকার শস্য আমানত করে আমানতী অধমর্ণ মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য আমানতী দলিলে সমগ্র মজুতের সম্পূর্ণ মূল্যের হিসাব নথীভুক্ত করা হয় না। ফলে কেবল মাত্র কাগজপত্র থেকে এই লেনদেনের সম্পূর্ণ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়াও সম্ভব নয়।

সে যাহাই হোক, খাদ্য শস্যে মজুতদারী উপেক্ষা করে আমাদের সরকার (এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারই প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী) দেশের দুইটি মূল সমস্যার সমাধানের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে রেখেছেন; একটি খাদ্যসঙ্কট সমস্যা এবং সেই সঙ্গে কালোবাজারী পুঁজির বিসময় ক্রিয়া। এই কালোবাজারী পুঁজি লগ্নীর দুইটি প্রধানতম পথ ছিল; এক সোনার অবৈধ আমদানী এবং, দুই, খাদ্যশস্যের অবৈধ মজুতদারী। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রনাদেশের দ্বারা প্রথমটি বন্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে দাবী করা হয়; কিন্তু বস্তুতঃ ফলা-ফলের দিক থেকে এটাকে হাস্যকর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আবার ব্রহ্মদেশের নে উইন সরকার কি করেছিলেন তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রাদেশ জারী করবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম সরকার, তাঁদের জরুরী ক্ষমতার বলে সকল প্রকার সেফ ডিপোসিট সীল করে দেন; তার পর আদেশ জারী করেন যে সে দেশে যার কাছে যত কিছু সোনা—যে রূপেই হোক—তার সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত হিসাব একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে। হিসাব হস্তগত হবার পর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত তহবিলের সঙ্গে যাচাই করে যে যে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সোনা পাওয়া গেছে সেটুকু সরকারে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। এই ভাবে চলতি আন্তর্জাতিক মূল্যমানে ব্রহ্ম সরকারের পক্ষে ৬৭ কোটি চিয়াট (টাকা) সংগৃহীত হয়। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আদেশ জারী করা হয় যে তাহার অধিকারভুক্ত সোনাটুকু কতটা কখন কিভাবে সংগৃহীত হয়েছিল। তার বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে। অনেকেই এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দাখিল করতে পারেন নি। সে ভাবে ব্রহ্ম সরকারের তহবিলে আরো ৪২ কোটি টাকার বেশী স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত হয়। অতঃপর আদেশ জারী করা হয় যে গহনা বা অন্যান্য আকারে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনার বেশী কেহ রাখতে পারবেন না। এইভাবে আরো ৬০ কোটি টাকার বেশী সোনা ব্রহ্ম সরকার আন্তর্জাতিক মূল্যে ব্রহ্মদেশবাসীদের নিকট কিনে নেন। এর পরে ব্রহ্ম দেশ থেকে সোনার অবৈধ আমদানী, কালোবাজারী লেনদেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের ফলে সোনার অবৈধ লেনদেন বিন্দুমাত্র কমে নি, কেবল কতকগুলি লোকের জীবিকা নষ্ট হয়েছে মাত্র।

খাদ্য শস্যের বেলায় কালোবাজারী লগ্নী ও মজুতদারীর পূর্ব্বেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই মজুতদারী উচ্ছেদ করতে না পারলে কেবল মাত্র যে আমাদের আর্থিক কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়বে শুধু তাই নয়, দেশের সমাজ শৃঙ্খলাও সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয়ে যাবে। তার ব্যাপক এবং স্পষ্ট আভাস আমরা ইতিমধ্যেই অনেক পেয়েছি আরো পেতে থাকবো। আগামী মাসে এ বিষয়ের অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
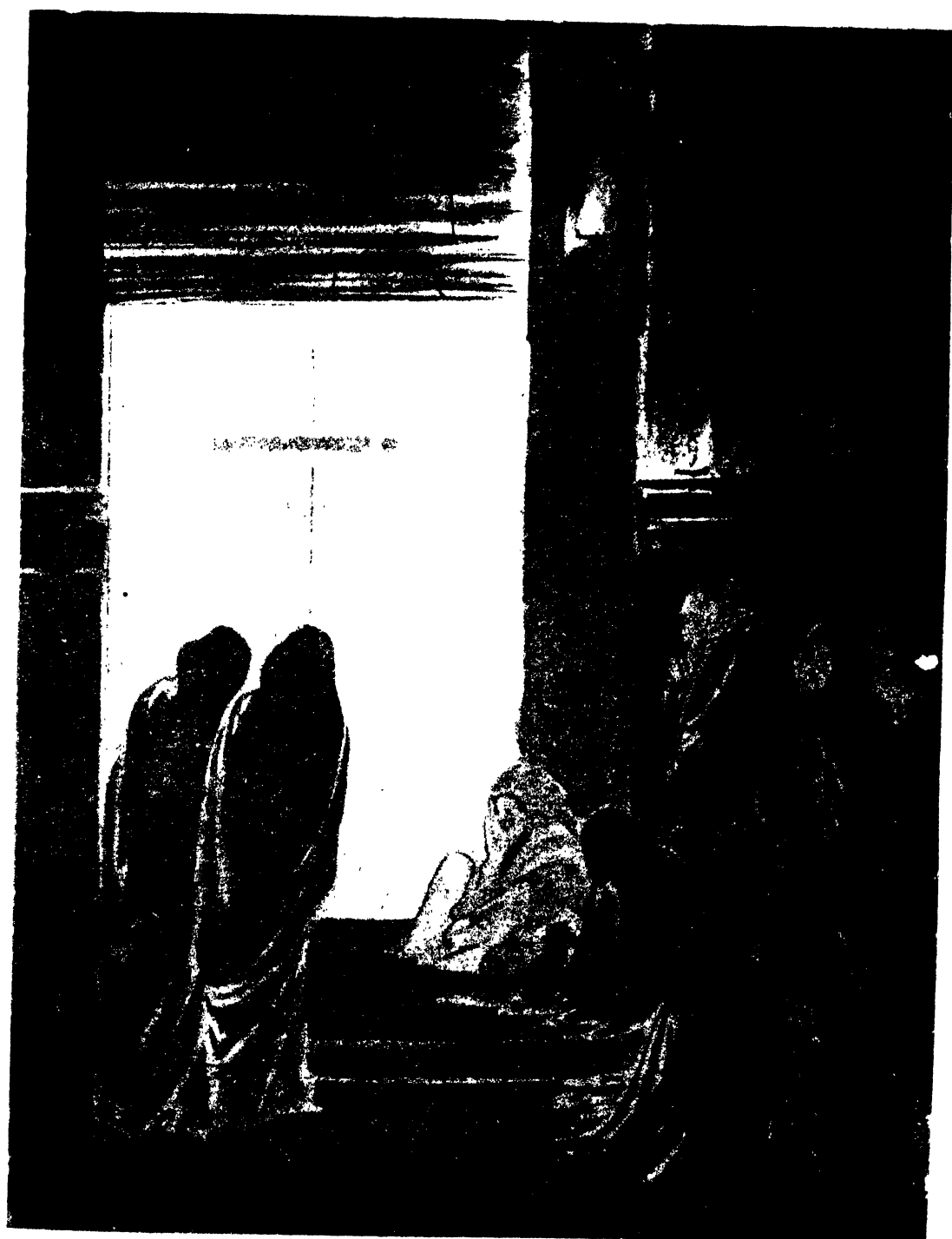
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

মন্দির দ্বারে
শিল্পাচার্য্য গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৭৪

৫ম সংখ্যা

শাসকের স্বেচ্ছাচার

প্রাচীনকালে একছত্র নৃপতিদিগের ইচ্ছা অনুসারে দেশ চলিত। কিন্তু রাজধর্ম্ম বলিয়া একটা সুনীতির সংযম সেই স্বেচ্ছাচারকে দমন করিয়া দেশবাসীর মঙ্গলের পথেই চালাইয়া রাখিত। যে সকল দেশাধিপতি রাজধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছাচার করিতেন তাঁহারা অনেক সময়ই দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারিতেন না। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া রাজপদ হইতে অপসৃত করিবার চেষ্টা করিতেন ও অনেক সময় সেই চেষ্টায় সক্ষম হইতেন। অর্থাৎ একচ্ছত্র নৃপতির একাধিপত্যও কখন স্বেচ্ছাচারের চরমে পৌঁছাইয়া নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত না। প্রজার মঙ্গলের উপরেই রাজা ও শাসকের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অন্যায় আচরণের উপর কোন রাজার রাজত্ব বা রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও সুরক্ষিত থাকিতে পারে না। প্রজারঞ্জন বা প্রজার সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখাই রাজত্ব রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। কোন প্রকার ধর্ম্ম, নীতি বা আদর্শ প্রচার করিলেই প্রজার মঙ্গল করা হইতেছে বলা যায় না। রাজা বা শাসনকর্ত্তা মহা ধার্ম্মিক হইলেও কার্য্যতঃ অকর্ম্মা হইলে তাঁহার দ্বারা প্রজার মঙ্গল হইতে পারে না। সুতরাং শাসকের ধর্ম্মমত অথবা আদর্শবাদ দিয়া তাঁহার রাজ্যশাসন ক্ষমতার বা বাস্তব পদ্ধতির বিচার হইতে পারে না। মহা ধর্ম্মশীল রাজা দেশরক্ষায় অক্ষম হইতে পারেন, প্রজার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার ব্যবস্থা করিতে অপারগ হইতে পারেন, দুষ্ট রাজকর্ম্মচারী পরিবৃত হইতে পারেন এবং রাজ্যের চোর ডাকাতদিগকে দমন করিতেও সক্ষম না হইতে পারেন। সেইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ রাজাকে দিয়া রাজ্য পরিচালনা যথাযথভাবে চলিতে পারে না। সাধারণতন্ত্রে বা অপর প্রকার রাষ্ট্রতন্ত্রেও শাসকগণ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে অক্ষম হইতে পারেন। বক্তৃতায় বৃহস্পতি অথচ কার্য্য ক্ষমতায় সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়া রাষ্ট্রীয়কার্য্য পরিচালনা সম্ভব হয় না। সেই জন্য কাহারও আদর্শবাদ বিচার করিয়া তাহার উপর রাজ্য ভার অর্পণ করা নির্ব্বুদ্ধিতার কথা। কে রাজকার্য্য যথাকর্ত্তব্য সেই ভাবে চালাইবে তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন। পরে তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বিচার করা যাইতে পারে। উচ্চ আদর্শ প্রণোদিত নিষ্কর্ম্মা ও ভণ্ড ব্যক্তির এদেশে অভাব

নাই। অনেক ভণ্ড উচ্চ আদর্শ আওড়াইয়া অকর্ম্ম করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কে ভণ্ড এবং কে সত্য সত্যই আদর্শবাদী তাহা সঠিকভাবে জানা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং জানিবার চেষ্টা করাও সময়ের অপব্যয়। কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একটি মাত্র কথা জনসাধারণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। তাহা রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তব পদ্ধতি। যদি দেখা যায় যে উচ্চ আদর্শ প্রবল রাষ্ট্র গঠন করিয়াও রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে উন্নতলাভ কোথাও দেখা যাইতেছে না। চুরি, ঘুষ, লোক বাছিয়া চাকুরী ও কন্ট্রাক্ট দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের কেতায় যথেচ্ছাচার অবাধ গতিতে চলিতেছে, তাহা হইলে কার্য্যত কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলা চলে না। বেকার সমস্যা প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকিলে সাম্য নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলা যায় না। নানান ক্ষেত্রে অগাধ সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখা গ্রাহ্য হইলেও, কোথাও কোন গ্রামে কোন জোতদারের জমি কাড়াইয়া লওয়াইলেই দেশে একটা নূতন অর্থনৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া মানা যায় না। ইহা ব্যতীত যদি সমষ্টিবাদী মন্ত্রীগণ একক বা সমবেতভাবে পুরাকালের রাজাদিগের মতই যথেচ্ছাচার করিয়া জনসাধারণের জীবন ভ্রবিষহ করিয়া তোলেন এবং সেই উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তৎ-পরিবর্ত্তে যদি সমাজের লোকের কোন বাস্তব উপকার না হয়; তাহা হইলে শুধু আদর্শবাদের ফাঁকা আওয়াজ শুনিয়া কোন ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাচার বরদাস্ত করিবার কোন অন্য কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। পুরাকালে স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণ যে কখন কোন সৎকার্য্য করিতেন না এমন নহে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা সমাজের মঙ্গলকর বহু কার্য্য হঠাৎ হঠাৎ মনের আবেগে করিয়া ফেলিতেন। অনেক সময় অন্যায় কার্য্যও করিতেন। বর্ত্তমানকালের রাষ্ট্রনেতাগণও কখন কখন জনহিতকর কার্য্য করেন। কিন্তু যে সকল জনমঙ্গলকর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা ঘোরেন সেগুলির মধ্যে বহু মন্ত্রই শুধু শব্দমাত্র থাকিয়া যায়। এবং বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে তাঁহারা ঐ মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেন শুধু জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য। সেই অনুসারে কার্য্য যে হইবে না তাহা তাঁহারা পূর্ণরূপে জানেন। রাজাদিগের স্বেচ্ছাচার ছিল সরল ও সহজ স্বেচ্ছাচার। আধুনিক আদর্শবাদীদিগের যথেচ্ছাচার হইয়াছে লোক ঠকান অভিনয়ের ব্যাপার। বড় বড় কথা বলিয়া পরে উল্টা পথে চলা। এই দুই প্রকার অন্যায়ের মধ্যে কোনটি অধিক অন্যায় তাহা স্থির করা বিশেষ কঠিন হইবে না।

রুশ দেশে কম্যুনিজম আরম্ভ হইবার পরে বহু বৎসর তদ্দেশীয় নেতাগণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঠিকভাবে না করিয়া উৎকটভাবে আদর্শ অনুগত রীতি চালাইতে গিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের অশেষ কষ্ট ও অকাল মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করেন। শুধু চাষের কার্য্যেই সমষ্টিবাদ চালাইতে গিয়া প্রায় এক কোটির অধিক লোকের অনাহারে মৃত্যু হয়। পরে রুশ নেতারা ঠেকিয়া শিখিয়া উচিত পথে চলিতে আরম্ভ করেন, ও যদিও সে দেশের জনসাধারণ এক প্রকার রাষ্ট্র-দাসত্ব করিয়াই জীবন নির্ব্বাহ করেন ও ভোগের ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ভাগে বিশেষ কিছু জোটে না, তাহা হইলেও রুশ দেশ বিশ্বের জাতি সভায় জোরাল স্থান অধিকার করিয়া থাকায় বলা যাইতে পারে রুশ দেশীয় লোকের কষ্ট-ভোগ সার্থক হইয়াছে। অন্য কোন দেশে যদি দেখা যায় যে দেশের সকল উৎপাদিত ভোগ্য বস্তুর সমান ভাগ করিলে মাথা পিছু দৈনিক পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র ভাগে পাওয়া যায় তাহা হইলে সে দেশে যাহারা দৈনিক দশ টাকা অথবা ত্রিশ টাকা খরচ করিতে অভ্যস্ত, তাহাদিগের অবস্থা কি হইবে? তাহারা কি দেশ নেতাদিগের আদর্শরক্ষার্থে ক্ষুধার্ত্ত গ্রামবাসীদিগের মত অনাহারে গাছ তলায় দিন কাটাইতে রাজী হইবে? কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীগণ ও তাঁহাদিগের চেলা-চামুণ্ডার দলের লোকেদের কালো পাতলুন, সাদা সার্ট ও সিগারেট বিয়ারের ব্যবস্থা কি দৈনিক পঁচাত্তর পয়সায় হওয়া সম্ভব হইবে? যাহারা কারখানায় দৈনিক পাঁচ দশ টাকা হারে কাজ করে তাহারাই বা দুই তিন টাকা মজুরী মানিয়া লইবে কেন? মন্ত্রী, সেক্রেটারী, কেরানী প্রভৃতি ব্যক্তির বেতন কি হইবে? অর্থাৎ গরীব দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না, এবং হইলেও জনমত তাহার বিরুদ্ধে যাইবে। অন্ততঃ যাহারা সহরে ও

কারখানায় কাজ করে তাহারা বেতন কম হইলে ঘোর আপত্তি জানাইবে। যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে দৈনিক দশটাকা নিয়তম বেতন স্থির করা হয় তাহা হইলেও জাতীয় আয় বার্ষিক ৬০০০০ কোটিতে তুলিতে হইবে। সে কার্য্য করা অসম্ভব নহে; কিন্তু শুধু মিছিল বাহির করিয়া, ঘেরাও বা হরতাল করিয়া সে কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। শ্রমশক্তি ব্যবহারের পূর্ণ ব্যবস্থা করা যাইলে জাতীয় আয় বার্ষিক ক্রমশঃ ৩১০০ কোটিতে তোলা যাইতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থাই বা কে করিবে?

দেশের শত্রু কে?

কোন কোন বিদেশী খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক ভারতের জাতীয় মঙ্গলের প্রতিকূল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় অনেকের মনে এইরূপ ভাব জাগ্রত হইয়াছে যে বিদেশী ধর্মযাজকদিগকে আর ভারতে আসিতে না দেওয়াই জাতীয়ভাবে বাঞ্ছনীয় ও অতঃপর যাঁহারা এ দেশে আছেন তাঁহাদিগকেও নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা। এইরূপ ধারণা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে কয়জন ধর্মযাজক ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক নহে। যাঁহারা ভারতের পরম বন্ধুর মতই কার্য্য আজীবন করিয়াছেন ও স্কুল কলেজ চালাইয়া ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা বহু উন্নত করিতে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের সংখ্যা অনেক। ইহা ব্যতীত আতুরাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অনেক খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক ভারতের সেবাতেই জীবন কাটাইয়াছেন। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম আসিয়াছে ইয়োরোপীয়দিগের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে। দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলন হইয়াছে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে। খৃষ্টধর্ম্মের সহিত বিদেশীদিগের ভারত বিরুদ্ধতার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। যে সকল বিদেশী ভারতের শত্রুতায় জড়িত তাহাদিগের মধ্যে কারখানার পরিচালক, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রভৃতির সংখ্যা ধর্মযাজকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। এই সকল তথাকথিত যন্ত্রবিদ, ব্যবসাদার ও রাষ্ট্র প্রতিনিধিগণকে এদেশের বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় না কেন? আসল কথা ভারতীয় সরকার বিদেশীদিগের কার্য্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিবার ব্যবস্থা করেন না। গা ঢিলা দিয়া চলিয়া পরে যেমন তেমন করিয়া নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য ইহার তাহার উপর দোষারোপ করিয়া কার্য্য শেষ করেন। এই রীতি কোন রাষ্ট্র কার্য্য সুনির্ব্বাহিত করিবার পক্ষে উপযুক্ত নহে। বিদেশীদিগের অবাধ গতিবিধির ফলে ভারতের বহু ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে।

দুই একটি ধর্ম যাজকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দিলেই ভারত সরকারের নিজ দোষ কাটান যায় না। আসামের রাষ্ট্রনেতাদিগের দোষে নাগা মিজো প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে বিদ্রোহ প্রবৃত্তি কতটা বাড়িয়াছে তাহা উত্তমরূপে বিচার করা প্রয়োজন। এই নেতাগণ শুধু পার্বত্য জাতি নহে, ভারতের অপরাপর জাতির প্রতিও নিজেদের শত্রুতা উৎকটভাবে দেখাইতে অপারগ হন নাই। আসাম প্রদেশে তদ্দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির শাসন অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবস্থিত হয় নাই বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই কারণে আসামকে বহু পূর্ব্ব হইতে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পাণ্ডারা নেহেরু কোন কোন দলের প্রতি প্রীতিবশতঃ সে কার্য্য করেন নাই। তাহার ফলে আজ আসাম একটা বিদ্রোহের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে দোষটা এক বা ততোধিক ধর্মযাজকের উপর ন্যস্ত করিলেই ভারত সরকারের অবিবেচনার সাফাই হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখনও আসামে সংখ্যা লঘিষ্ঠদিগের প্রতি সুবিচার হইতেছে কি না তাহার বিচার ও আলোচনা প্রয়োজন। এবং অবিচার যাহারা করিতেছে তাহারা ধর্মযাজক নহে। অপরদিকে দেখা যাইতে পারে যে সকল সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণ নিজ নিজ ধর্মের জন্য কাজ করিতে গিয়া অপরাপর ধর্মাবলম্বিদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়া ভারতের জনসাধারণের মধ্যে কলহ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করেন কি না। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধান কি হইতে পারে? এবং শুধু খৃষ্ট ধর্মাবলম্বি লোকেরাই কি এইরূপ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া থাকেন? আমাদিগের মনে হয় সকল ধর্মের প্রচার কার্য্যেই কিছু কিছু অন্যায় সমালোচনা হইয়া থাকে। ইহার দমন প্রয়োজন। কিন্তু কি ভাবে তাহা হইতে পারে সে কথার আলোচনা অল্প কথায় করা সম্ভব নহে।

ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্থান গঠনের কথা যাহারা আরম্ভ করিয়াছিল তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক, শিক্ষক ও সমাজ-সেবকদিগের সাহায্যেই সেই দেশদ্রোহিতার কার্য্য চালাইয়াছিল। সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকে পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ যায় নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালকবর্গ চেষ্টা করিলে সেই সকল ব্যক্তিরা এখন কোথায় আছে এবং এখনও তাহারা ভারত বিরুদ্ধতায় নিযুক্ত আছে কি না এ কথা জানিতে পারেন। অনেকে আছে নিঃসন্দেহ; কিন্তু সেই লোকগুলিকে দমন করিবার ব্যবস্থা বিশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ মাইকেল স্কট নামক একজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক নাগা বিদ্রোহীদিগের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া সমগ্র বিদেশী ধর্ম্মযাজকদিগেরই বিরুদ্ধে একটা প্রবল আন্দোলন করিবার চেষ্টা হইতেছে। দেশে আরও বহু লোক রহিয়াছে যাহারা দেশের শত্রুদিগের সহায়তা করিয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলে শত্রুদিগকে ভারত আক্রমণ ও দখল করিতেও সাহায্য করিবে। এই সকল লোকের মধ্যে অনেকে ভারতীয় রাষ্ট্রে বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের বিরুদ্ধেই বা আমরা কি করিতে পারি বা করিবার চেষ্টা করিতেছি? শুধু কোন ব্যক্তির বা গণ্ডির ভারত বিরুদ্ধতার ওজন ও ক্ষতি করিবার শক্তি বিচার না করিয়া অযথা হৈ হল্লা করিলেই দেশ রক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় না। সকল দরজায় তালা না লাগাইয়া একটা দুইটা দরজায় দ্বিগুণ চতুর্গুণ তালার ব্যবস্থা করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। শত্রুর ভারত আক্রমণের বহু পথ আছে এবং সকল পথেই পাহারার ও শত্রু দমন ব্যবস্থার প্রয়োজন। শুধু একটা পথে বৃহৎ বৃহৎ কেল্লা গঠন করিয়া বাকি পথগুলি উন্মুক্ত রাখিয়া দেওয়া সাবধানতার চূড়ান্ত নহে। বরঞ্চ অত্যন্তই অসাবধানতার কার্য্য। যাহারা দেশের রক্ষণাবেক্ষণ উত্তম করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পাকিস্থান ও চীনের ভারতে প্রভাব বিস্তারে বা সহায়ক সংগ্রহে বাধা দিবার ব্যবস্থা করা। পার্ব্বত্য জাতিগুলির সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়া সেই সকল স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিদের নিজত্ব বজায় রাখিয়া চলিবার আয়োজন করা প্রয়োজন। আসামী নেতাগণ, অথবা ঝাড়খণ্ডের বেহারী নেতাগণ ঐ সকল জাতির শাসক হইবার উপযুক্ত নহেন। এ কথাটাও মনে রাখা প্রয়োজন।

অভিনব···!

মানুষ যখন সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কোন অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে অক্ষম হয় তখন কখন কখন নিজ অক্ষমতা ঢাকা দিবার জন্য মানুষ নূতনত্বের দাবি ও দোহাই দিতে আরম্ভ করে। যথা চাউল দিতে না পারিলে চাউল খাইবার অসারতা কিম্বা যব অথবা বাজরার উৎকৃষ্ট খাদ্যগুণ প্রচার করিয়া চাউলের অভাব ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইতে পারে। শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কোন এক অতি নূতন শিক্ষাপদ্ধতির কথা বারে বারে বড় গলায় উচ্চারণ করিয়া ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক-দিগকে আশা দেওয়া হয় যে অচিরাৎ শিক্ষা নূতন পথে চলিয়া দেশের সকল ছাত্রের পাঠচর্চ্চা মধুময় করিয়া তুলিবে। পুরাতন পদ্ধতিতে পাঠের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হইত স্কুল কলেজ গৃহ, উপযুক্ত পুস্তকাগার, বিজ্ঞান শিক্ষাগার ভূগোল ও সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত মানচিত্র, বর্ণনা চিত্র প্রভৃতি এবং যথাযথ বেতনে নিযুক্ত উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক। বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে পাঠের ব্যবস্থা ঠিকমত করা হয় না এবং শিক্ষকগণও সমাজের মধ্যে বিদ্যা, চরিত্র, অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতায় অথবা অন্যান্য দেহ মনের কৃষ্টির জন্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ নহেন। শিক্ষাপদ্ধতি যাহাই হউক না কেন তাহার পরিচালনা উপযুক্ত ভাবে না করিলে ছাত্রগণ বিদ্যা অর্জ্জনে সক্ষম হইতে পারে না। সুতরাং নিত্য নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি না করিয়া পুরাতন পদ্ধতিই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া চালাইয়া রাখিলে সমাজে শিক্ষা ঠিক ভাবে চলিতে পারে। শিক্ষা বিশেষ নূতন বিষয় নহে। স্কুল, কলেজ, টোল, পাঠশালা, মখতব শত শত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে। এই বহুশত বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা জলে ফেলিয়া দিবার কোন আবশ্যক নাই। জোর করিয়া নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি করিবারও প্রয়োজন নাই। যাহা আছে তাহা ঠিকভাবে ব্যবহার না করিয়া নূতনত্বের কথা তুলিবারও সার্থকতা নাই। বহুদিন ধরিয়া চালিত পুরাতন পদ্ধতি যাঁহারা

নিজেদের অক্ষমতার জন্য চালাইয়া রাখিতে পারেন না; নূতন পদ্ধতিও তাঁহারা চালাইতে পারিবেন না। আমরা দেখিতে পাইতেছি শিক্ষা ক্রমশঃ অচল হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ পদ্ধতির অনুপযুক্ততা নহে। পরিচালক, শিক্ষক, ছাত্র, ছাত্রের অভিভাবক ও দেশের শাসনকর্ত্তা-দিগের কর্ম্মক্ষমতার অভাবেই শিক্ষা অচল হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি; আবার বলিতেছি যে ভাষা লইয়া যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝগড়া চলিতেছে তাহার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কারণ বহু বিষয়ের শিক্ষার সহিত ভাষার গভীর সম্বন্ধ নাই। যথা শরীর গঠন চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য্য সঙ্গীত নৃত্যনাট্য, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রভৃতি। প্রাচীন ভাষাগুলিও শিক্ষা করার জন্য সেই সেই ভাষার মাধ্যমেই ব্যবস্থা হইতে পারে ও হওয়া উচিত যথা সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা। আধুনিক ভাষাগুলিও নিজ নিজ মাধ্যমে শিক্ষা করাই বিধেয়। যথা ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মন, রাশিয়ান ইত্যাদি ভাষা। সুতরাং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ভাষার কথা উঠে এবং সেই ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই অবশ্য ব্যবহার্য। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অধিকাংশ ভাষাই ব্যবহার করা চলিবে না। সে চেষ্টা করা উচিত কিন্তু তাহা সফল করা তত সহজ হইবে না। অন্তত প্রথমে কয়েক বৎসর সে কার্য্য সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও সহজ হইবে না। এই সকল কারণে বর্ত্তমানে নূতন পদ্ধতির কথা ভুলিয়া পুরাতন পদ্ধতিই চালাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। শিক্ষকদিগের নিয়োগ কার্য্যে আরও বিচার করিয়া চলা প্রয়োজন। বেতন ঠিক মত না দিলে উপযুক্ত ব্যক্তি কার্য্যে আসিতে রাজী হইবেন না। ছাত্রদিগের অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য শিক্ষকদিগের সহিত সহায়তা করা এবং নানা প্রকার অন্যায় অভিযোগ লইয়া আন্দোলনে ছাত্রদিগকে সাহায্য না করা। দেশের রাষ্ট্রীয় পরিচালকদিগেরও অবশ্য কর্ত্তব্য ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত না করা। কংগ্রেস ও তৎপরবর্ত্তী রাষ্ট্রকর্ত্তাগণ সকলেই শিক্ষার প্রতি কর্ত্তব্য করিতে বিশেষ সক্ষমতা দেখান নাই শুধু নিজেদের সুবিধাই খুঁজিয়াছেন ও শিক্ষার সর্ব্বনাশ করিয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চালাইয়াছেন।

ভাষাজ্ঞান ও অর্থোপার্জন ক্ষমতা

এক একটা ভাষা জানা থাকিলে এক এক প্রকার প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া উপার্জন করা সম্ভব হয়। যথা ইংলণ্ডে বহুলোক স্প্যানিশ ও পোর্ত্তুগিজ ভাষা শিক্ষা করেন দক্ষিণ আমেরিকার সহিত কারবার চালাইবার প্রতিষ্ঠানগুলিতে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য। ভারতবর্ষে যে মান্দ্রাজের লোকদিগের সর্ব্বত্র চাকুরী হয় তাহার প্রধান কারণ ঐ প্রদেশের লোকেদের ইংরেজী জ্ঞান। অতঃপর যখন অধিকাংশ ভারতবাসী শুধু মাতৃভাষা শিখিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবেন, তখন তাঁহাদিগের দ্বারা বিদেশী ব্যবসায় চালাইবার কেন্দ্রগুলিতে কোন কাজ করান সম্ভব হইবে না এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠান এংলো ইণ্ডিয়ান কিম্বা মান্দ্রাজী ব্যতীত অপর জাতীয় কর্ম্মী নিয়োগ করিতে চাহিবে না। মান্দ্রাজ এখনও শুধু তামিল শিক্ষা দিবে বলিয়া কোন চেষ্টা করিতেছে না ও সেই প্রদেশের লোকেরা পূর্ব্বের ন্যায় ইংরেজী শিক্ষা করিতে থাকিবে। ভারতে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ব্যবসায়ী দফতরে কাজ করে। অতঃপর অল্পদিন পরেই কোন দফতরে আর বাঙ্গালী দেখা যাইবে না কারণ বাঙ্গালীরা এখনই মান্দ্রাজীদিগের তুলনায় ইংরেজী কম জানে ও অদূর ভবিষ্যতে আরও কম জানিবে। বিদেশীদিগের দ্বারা চালিত দফতরগুলিতে ইংরেজীই ব্যবহৃত হইবে ও আন্তর্জাতিক কারবারের ভাষাও ইংরেজীই থাকিবে। বিদেশী জাতিগণ যে সকল বৃত্তি দিয়া ভারতীয় ছাত্রদিগকে নিজ নিজ দেশে লইয়া যাইবার ও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন সেই সকল বৃত্তি পাইতে হইলেও ইংরেজী বা অপর বিদেশী ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে। ইহার ব্যবস্থাও নূতন অভিনব শিক্ষাপদ্ধতিতে থাকিবে না। সুতরাং সেই সকল বৃত্তিও অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রগণ আর পাইবে না। ভারতীয় ছাত্রদিগের জন্য যে নূতন অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি গঠিত হইতেছে তাহার জন্য শিক্ষক পাওয়াও সহজ হইবে না; কারণ যে সকল শিক্ষক ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দিতে

পারেন তাঁহারা উচ্চশিক্ষা দিতে অক্ষম। অন্তত তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দিতে পারিবেন না। সুতরাং শিক্ষকদিগের শিক্ষাও একটা সমস্যা হইবে। উচ্চশিক্ষার পাঠ্য পুস্তক লিখান আরও কঠিন হইবে। বর্ত্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখিলেই এই কথার সত্যতা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

যুবশক্তির বিকাশ

একটা অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায় যে ভারতবর্ষে যুবশক্তির বিকাশ উপযুক্ত পথে চলিতে পায় না বলিয়াই যুবকদিগের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। কিন্তু কথাটা সত্য নহে। যুবকদিগের মধ্যে যাহাদিগের ইচ্ছা ও আগ্রহ আছে তাহাদিগের পক্ষে উপযুক্ত ভাবে নিজ নিজ শক্তি ফুটাইয়া উঠাইবার পথে কোন বিঘ্ন আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহাদিগের মধ্যে কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই এবং দল বাঁধিয়া বিশৃঙ্খলভাবে অপরের অধিকার খর্ব্ব করিবার ইচ্ছাই অধিক প্রবল তাহারা নানা প্রকার সমাজের ক্ষতিকর কার্য্য করিয়া থাকে। এবং এই জাতীয় কার্য্যে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার দায়িত্ব যাহাদিগের তাহারা প্রায়ই অল্পবয়স্ক নহে—অতি পুরাতন পাপীই তাহাদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। যুবশক্তি যদি কাব্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, অথবা চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, নাট্য প্রভৃতিতে নিজ বিকাশ ইচ্ছা করে তাহা হইলে সেই সকল পথেই চলিতে না পারিবার কোন কারণ নাই। শিক্ষক ও গুরুর কোন অভাব নাই। জনসাধারণও সৃষ্টির ক্ষেত্রে নবনব ব্যক্তির আবির্ভাব হইলে তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আদরে স্থান দিতে কোন আপত্তি করেন না। অতএব সুবিধা বা সুযোগ নাই বলিয়া যুবজনের কৃষ্টি চর্চ্চা সম্ভব হয় না একথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুবিধা ও সুযোগ যথেষ্ট আছে এবং বহু নবীন ও নবীনা কৃষ্টির আসরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ প্রেরণার অভিব্যক্তিতে পূর্ণরূপে সক্ষম হইয়াছেন ও সকল সময়ে হইতেছেন। যাহারা কৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে অনিচ্ছুক তাহারা ফুটবলের মাঠে ইষ্টক নিক্ষেপ ও অন্যান্য অবসর যাপনের উপায় অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। এই বিপরীত আগ্রহ তাহাদিগের সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহার জন্য সুবুদ্ধি ও সুসভ্য তরুণ তরুণীরা দায়ী নহেন। সমাজও দায়ী নহে। অপরাধের অভিরুচি বা নীচ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার প্রকৃতি কি কারণে কাহার মধ্যে জাগ্রত হয় ও হইলে তাহার চিকিৎসা কি এ সকল অপর প্রসঙ্গ।

যে সকল নবীনদিগের আগ্রহ দুরূহ প্রচেষ্টায় ও ক্রীড়া অথবা ব্যায়ামের ক্ষেত্রে তাহাদিগের শক্তি বিকাশের স্থানও উন্মুক্ত ও বিস্তৃত। ক্রীড়া ও ব্যায়ামে ভারতবাসী প্রায় একশত বৎসর কাল পূর্ণরূপে নিজ শক্তি দেখাইবার আয়োজন করিয়া আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ সুযোগ সুবিধা এ বিষয়ে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে ইহাও সর্ব্বজন জ্ঞাত। অর্থাৎ যাহার যে রূপ ইচ্ছা সে বিনা বাধায় সেইরূপ ক্রীড়া, ব্যায়াম প্রভৃতিতে যোগদান করিতে পারে। সন্তরণ, পর্ব্বত আরোহণ, পদব্রজে কিম্বা যানবাহন ব্যবহারে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ, আকাশে বিমান কিম্বা গ্লাইডারে বিচরণ ইত্যাদি বহুদিকে যাইবার পথ খোলা ও সুযোগ সুবিধাও ক্রমবর্দ্ধমান। যদি কোন কারণে যুবশক্তি খেলা, সাঁতার, পর্ব্বত আরোহণ অথবা মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদিতে বিকাশ চেষ্টা না করিয়া পতাকা হস্তে মিছিল গঠন করিয়া যানবাহনের চলাচল বন্ধ করিয়া অন্তরের আগ্রহের অভিব্যক্তি সন্ধান করে তাহা হইলে সেই সকল আগ্রহের উপযুক্ত বিচার সমাজ করিতে বাধ্য; কিন্তু যুবজনের নির্দ্দেশ অনুসারে নহে। যুবশক্তি জনশক্তির অঙ্গ; সুতরাং যুবশক্তির প্রয়োগ সমাজের বিচারাধীন এবং সমাজ নিরপেক্ষভাবে সেই বিচারের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। কিন্তু সমাজকে ভয় দেখাইয়া বা পীড়নের ব্যবস্থা করিয়া বিচার কার্য্যের নিরপেক্ষতা নষ্ট হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। চীন দেশের লাল রক্ষকগণ বহু উৎপাত করিয়া অবশেষে সমাজের সহিত সংঘাতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের দেশে আমরা ঐরূপ কোন অপরিণত বয়স্কদিগের হস্তে সমাজের কার্য্য-ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে প্রস্তুত নহি। যুবজনের অভিযোগ যথাযথ ভাবে শুনিয়া, বিচার করিয়া ব্যবস্থা করিতে আমরা বাধ্য; কিন্তু ভয়-বিধ্বস্ত হইয়া নহে। সকল বিচারই স্থির বুদ্ধিতে করা আবশ্যক।

ভাষার ঝগড়া

ভারতবর্ষে যত লোকের স্কুলে কলেজে যাওয়া প্রয়োজন ততগুলি বালক বালিকা, তরুণ তরুণীর পাঠের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ ইচ্ছা ও অর্থের অভাব। সুতরাং প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ব্যবস্থার অভাবে সরকার শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার মাধ্যম লইয়া ঝগড়ার সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে আসল সমস্যার দিকে না দেখিয়া অবান্তর আলোচনায় সময় নষ্ট করিতে উৎসাহ দিতেছেন। আসল সমস্যা হইল শিক্ষার অভাব। যথেষ্ট স্কুল কলেজ না থাকায় ছেলে মেয়েরা রাস্তায় ঘাটে রাজনীতি শিক্ষা অথবা কারখানায় মজুরদিগের বেতন বোনাস বৃদ্ধি আন্দোলনে সহায়তা করিয়া অবসর সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছে। কখন কখন তাহারা ট্রেন চলাচলের সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় খণ্ডযুদ্ধেও নামিয়া পড়ে। এই প্রকার কার্য্য অল্প বয়স্কদিগের পক্ষে করাই স্বাভাবিক, কারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন বা যাহা অন্যায় মনে হয় তাহার প্রতিকার চেষ্টা তরুণের ধর্ম। তাহারা সংযতভাবে নিজ নিজ শরীর মন গঠন করিলেই জাতির মঙ্গল। কিন্তু জাতীয় সরকার যদি অকর্ম্মণ্য ও সামাজিক মঙ্গল চেষ্টায় অপারগ হয় তাহা হইলে যাহা ঘটিতেছে সেইরূপই ঘটিতে থাকিবে। বর্ত্তমানে যাহাদিগের কলেজে যাইবার বয়স তাহাদিগের মধ্যে শতকরা পাঁচজনও কলেজে পাঠের সুযোগ পায় না। কারণ অভিভাবকদিগের অর্থাভাব ও সরকারের পাঠের ব্যবস্থা করায় অক্ষমতা। শতকরা পঁচানব্বই জন তরুণ বয়স্কগণ যদি পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সমাজের কি অবস্থা হইবে তাহা বুঝিতে অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে ব্যবস্থা কিম্বা তাহার পুর্ব্বে স্কুলে পাঠের ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে না করিলে সামাজিক অবস্থা কখনও ভাল হইতে পারে না। এই ব্যবস্থার চেষ্টা না করিয়া শুধু কোন ভাষায় কাহাকে কি শিক্ষা দেওয়া উচিত এই কথার অবতারণা করিয়া মন্ত্রীগণ সকলের সময় নষ্ট করিতেছেন। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা যে মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন একথা সকলেই জানেন এবং তাহার সমর্থনে কাহারও কোন বক্তৃতা দিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার পুর্ণ ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার অনুচর মন্ত্রী-গণ শুধু কেমন করিয়া সকল লোককে ইংরেজী শিক্ষা ত্যাগ করাইয়া হিন্দি শিখান যাইবে এই মন্ত্রণাতেই তৎপরতা দেখাইতেছেন। হিন্দি ভাষা যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না তাহা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করা হইতেছে না। ভারতের সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করিবে তাহারই ব্যবস্থার জন্য সকলকে হিন্দি শিখান প্রয়োজন বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। ভারতের সকল ব্যক্তির পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করিবার যে কোন প্রয়োজন হয় না এবং হইলে যে তাহারা পরস্পরের ভাষা অল্পবিস্তর ব্যবহার করিতে পারে সে কথা কেহ মানিতে চাহেন না। অর্থাৎ অশিক্ষিত বাঙ্গালী, ওড়িয়া, বেহারী অথবা আসামী যেন তেন প্রকারে কথাবার্ত্তা চালাইয়া লইতে সক্ষম একথা সকলেই জানেন। চিঠিপত্র অপরকে দিয়া লিখান ও পড়াইয়া লওয়ার প্রথাও সর্ব্বজন বিদিত। এই জন্য কাহাকেও হিন্দি শিখিতে হয় না। কারণ একজন বাঙ্গালী ও ওড়িয়া হিন্দি না শিখিয়াও পরস্পরের ভাষা কিছু কিছু বুঝিয়া লয়। বরঞ্চ হিন্দি শিখাই তাহাদিগের পক্ষে কঠিন। কোন ওড়িয়া হিন্দি শিখিয়া মাদ্রাজ গমন করিবে এই কথাও অসম্ভবের কোঠায় পড়ে। এক কথায় পারস্পরিক সম্বন্ধ রক্ষার ভাষাগত কোন প্রয়োজন ভারতে বিস্তৃতভাবে নাই ও থাকিবেও না। ভারতে যত ব্যক্তি অপরের সহিত যতবার বাক্যা-লাপ করে তাহার মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই বার কথা নিজ নিজ গ্রামবাসীর সহিত। তৎপরে হয় শতকরা তিনবার নিজ প্রদেশের লোকের সহিত। বাকি দুইবার হয় নিকটের প্রদেশের লোকের সহিত। হাজারে এক-বারও কেহ দূরের প্রদেশের লোকের সহিত কোন কথা বলিতে যায় না, কারণ সেইরূপ কথাবার্ত্তার কোন প্রয়োজন হয় না! সহরের ব্যবসাদার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইন

ব্যবসায়ী প্রভৃতির নানা প্রকার লোকের সহিত কথা বা পত্রালাপ করিবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু ঐ সকল ব্যবসায় ইংরেজীর সাহায্যেই এখনও চলিতেছে ও পরে আঞ্চলিক ভাষায় চলা সম্ভব হইলেও তাহা কবে হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

হিন্দি শিখিবার কোন প্রয়োজন কোথাও দেখা যায় না। কারণ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বোঝা যায় যে হিন্দি সাধারণের পারস্পরিক যোগ রক্ষার ভাষা হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আঞ্চলিক ভাষাগুলিই মোটামুটি প্রয়োজন মত সকল নিকটের প্রদেশের লোকই বুঝিতে পারে। যাঁহারা সাধারণ লোক নহেন তাঁহারা ত ইংরেজী ব্যবহার করেন ও করিবেন। উচ্চ শিক্ষার ভাষাও যদি আঞ্চলিক ভাষা না হইতে পারে তাহা হইলে হিন্দিও হইতে পারিবে না; কারণ হিন্দি আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প উন্নত ও অগঠিত ভাষা। বিদেশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার ভাষাও হিন্দি হইতে পারে না। সুতরাং তিনভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও ছাত্রদিগের সময় ও শক্তির অপব্যয়ের ব্যবস্থা হইবে। মাতৃভাষা ও তৎসঙ্গে ইংরেজী শিক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক মনে হয়। তৃতীয় ভাষা যদি শিখিতে হয় তাহা হইলে তাহা সংস্কৃত ভাষা হওয়া প্রয়োজন। কারণ সংস্কৃত শিক্ষা করিলে ভারতের সকল ভাষার সহিত একটা জ্ঞানের সংযোগ সৃষ্টি হয়।

আমাদিগের দেশের সকল সর্ব্বনাশের মূলে রহিয়াছে কোন না কোন তথাকথিত মহাপুরুষের নাম করিয়া সকল দেশ ও জাতির অনিষ্টকর বিষয়ের সাফাই গাওয়া। যথা পণ্ডিত নেহেরু ভারত বিভাগ করিয়াছিলেন সুতরাং তাহা চিরকালের মত সকল ভারতবাসীকে মানিয়া চলিতে হইবে। পণ্ডিত নেহেরু পরে কাশ্মীরের এক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন পাকিস্থানের হস্তে সুতরাং তাহাও সকলকে সর্ব্বকালের জন্য মানিয়া লইতে হইবে। পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছিলেন তিব্বত চীনের অংশ, সুতরাং তাহা সত্য না হইলেও সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। পণ্ডিত নেহেরু ভারতের ঋণের বোঝা সতেরগুণ বাড়াইয়া ছিলেন, সুতরাং সে বোঝা অত্যন্তই হাল্কা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহেরু আরও চাহিয়াছিলেন যে বাংলার অনেক অংশ বিহারে যুক্ত থাকিবে, সুতরাং সেই দেশ অপহরণও হাস্যমুখে মানিয়া লইতে হইবে। তিনি সকলকে হিন্দি শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন সুতরাং সকলে হিন্দি শিখিবে। আমাদিগের মতে কোন মহাপুরুষের নির্দ্দেশ মানিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করা অতিবড় মূর্খের কার্য্য। ক্ষতি কোন মহাপুরুষের কথাতেই লাভ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

কবির শেষ উত্তর

অধ্যাপিকা বাসন্তী চক্রবর্ত্তী

সুদীর্ঘ কাব্যজীবন সাধনার ক্ষেত্রে কবিগুরুর সাহিত্য-সাধনায় কোথাও কোন একঘেঁয়েমি আসেনি—ঘটেনি কোথাও কোন বৈচিত্র্যহীনতা। শেষ জীবনের কাজে এই নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্যের স্বাদ পুরোমাত্রাতেই রয়ে গেছে। 'অনন্তসিন্ধুকূলে এসে রবি' তাই 'পূরবদিগন্ত পানে যে অন্তিম পূরবী পাঠান—এ পূরবী রাগিনীর সুর চির-চেনা হলেও যথেষ্ট নূতন। এই নূতনত্ব সব সময়েই যে ভাব বা ভাবনায় এসেছে তা নয়—বরং একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বহু ক্ষেত্রেই ভাব বা ভাবনা—এবং উপলব্ধি বা জীবনচেতনা—পুনরাবৃত্তিই ঘটিয়েছে। কিন্তু সব মিলে তার যে স্বচ্ছ সুন্দর সুস্পষ্ট প্রকাশ—এই প্রকাশই তাকে অভিনবত্ব এনে দিয়েছে। সাহিত্য সম্বন্ধে কবির মন্তব্য প্রসঙ্গে একটা উক্তির কথা মনে পড়ে—'প্রকাশই কবিত্ব'। বাস্তবিক এই প্রকাশের মধ্যে কাব্যের ষোলআনা সার্থকতা নির্ভর করে। কোন কবিতা বা কাজ সার্থক হয়েছে কিনা বিচার করতে বসলে আমরা তার ভাবের প্রগাঢ়ত্ব—ভাষার স্বচ্ছতা—শিল্প-কৌশলের রমণীয়ত্ব—ছন্দ-চিত্রকল্পের স্বতঃস্ফূর্ততা—এই সবকিছুর একটি সার্থক উপস্থাপনা প্রত্যাশা করি—এবং এই সবকিছুর সার্থক সমন্বয়ে কবি-কল্পনার বা উপলব্ধির যদি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ না ঘটে তবে ত কবি রস পরি-বেশনে ব্যর্থ। কিন্তু অশীতিবর্ষে সমাসন্ন কবির শেষ-জীবনের কাব্যগুলিতেও কবিত্বের এই 'প্রকাশ' এমন স্বাভাবিক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে—এ বয়সেও কবির শিল্প-ক্ষমতার পরিচয় পাঠককে যথেষ্ট পরিমাণে বিস্মিত ও পুলকিত করে তোলে।

যদিও 'পরিশেষে' কবি তাঁর কাব্যের সাজিকে নানা ফুলে ভরিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে চেয়েছেন—কিন্তু বৈচিত্র্য-পিয়াসী শিল্পীসত্তা ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবসাধনার মধ্যে আত্মমুক্তির সন্ধান করলেও তা পায় না;—বাইরের এই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জগৎ ও জীবন যে তাকে প্রতিনিয়তই হাতছানি দিয়ে ডাকছে—নানা রূপে নানা রঙে—নানা সুরে —নানা ছন্দে—'নূতনকাল' যে কবিকে আপন দা বা জানায়—কবিও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবার কিছু নূতন দান রেখে গেলেন যাবার পথের ধারে। কিন্তু কবি প্রাণে যে 'পূরবী'র সুর করুণ সন্ধ্যা রাগিনীতে বহু পূর্বেই বেজেছে—'গদ্যছন্দের মধ্যে দিয়েও সেই অন্তিমবাসনা স্বচ্ছ সাবলীল ছন্দে অভিব্যক্ত। রোমান্টিক কবি-মন জগৎ ও জীবনকে এতদিন মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছে,—তিনি লীলাবাদী কবি; জীবজগৎ ও প্রকৃতি জগতের মাঝে—সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তার অপরি-মেয় সত্তার উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। জগতের নানা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-ধ্বনি-স্পর্শের মধ্যে তাঁর দুজ্ঞের্য় রহস্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তাই আপনার মধ্যে জগতকে এবং জগতের মধ্যে আপনাকে স্থাপন করে এই জীবনলীলা রঙ্গ রসে বারে বারে ডুব দিয়ে এর অণুতম মাধুর্য কণাটুকুকে আপন চেতনায় ধরতে চেয়েছেন। ভালবেসেছেন জীবনের এই উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ছন্দের তালে তালে গা ভাসিয়ে দিতে;—জীবনকে ভালবেসে, মর্ত্ত্য পৃথিবীকে ভালবেসে—কবি-মন সার্থক করে নিতে চেয়েছে আপন জন্মকে;—বার বার ফিরে আসতে চেয়েছে এই ধূলিমলিন পৃথিবীর বুকে—দুঃখ-সুখের—দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জীবনছন্দের মাঝে! তাই তাঁকে বলা হয় মানবতাবাদী—জীবনরসিক—ভূমা-কেন্দ্রিক জীবনশিল্পী। এই পৃথিবীর তুচ্ছ ধূলিকণাটুকু, ক্ষুদ্র ঘাসটুকুও তাঁর কাছে প্রিয়—সত্যজীবনের এই স্নেহ-প্রেম-প্রীতি সেবা-মাধুর্যের অমৃত লীলারস স্নিগ্ধ-শ্যামল করে তুলেছে তাঁর কবিমনকে;—কবি স্বীকার

করেছেন অকৃত্রিম ভাবে এর অযাচিত দানকে আপন জীবনছন্দে!

কিন্তু 'শেষসপ্তক' থেকে কবির এই জীবনউপলব্ধির ক্ষেত্রে ভিন্নতর সুর শোনা গেল। কবির আবাল্যের ঔপনিষদিক শিক্ষায় সাধনায় দীক্ষিত জীবন—'পরম অচিনে'র মধ্যে আপনাকে লীন করে দিয়ে মহাশান্তির সন্ধান করতে চাইছে। বাইরের রূপ-রসের জগৎ থেকে কবি-মন মুক্তি নিয়ে বলছে—

হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
সেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।
(শেষ সপ্তক—'সাত')

আবার 'আট' সংখ্যকেও দেখি—

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

জীবনশেষে দাঁড়িয়ে কবির এই অক্ষুব্ধ শান্তি এবং আনন্দের সাধনা—জগৎ ও জীবনের সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে সেই অসীমের পায়ে আত্মসমর্পণের মনোভাবকেই ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে 'প্রান্তিক' 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' 'জন্মদিনে' 'শেষলেখা'য় কবির এই মনোভাব আরও সুস্পষ্ট—আরও গভীর। 'পত্রপুট' কাব্যেও এই একান্ত আকাঙ্ক্ষার কথা শুনি—

আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্‌বলয় থেকে বিচ্ছুরিত
রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত করে দিই আমার জাগরণ;
হে সবিতা,
সরিয়ে দাও এই আমার দেহ, এই আচ্ছাদন
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণুপরমাণু
আরও অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ
তাই প্রসারিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
('পত্রপুট,—'দশ')

এই ভাবে কবি সৃষ্টির মহাসত্যের সঙ্গে অন্তরতম সত্যের যোগ ঘটাতে চান—তাঁর দিব্য চেতনালোকের সঙ্গে আপন চৈতন্যোপলব্ধিকে একাকার করে দিয়ে পরম আনন্দ সাগরে অবগাহন করতে চান। কবি-মনের জগৎ ও জীবন হতে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অসীমের পায়ে একান্তভাবে আত্মসমর্পণের আগ্রহে, মনে হয় এর মধ্যে যে কারণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে—তা কোন কবির বার্দ্ধক্যজনিত পীড়া ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। কবিপ্রাণ সবকিছু থেকে নিজেকে বন্ধন মুক্তির সাধনায় মগ্ন রাখলেও জৈব-চেতনা সাময়িকভাবে তাঁর উপরও প্রভাব বিস্তার করে। তাই সময়ে সময়ে তিনি অসহায় বোধ করেন। 'পত্রপুট' কাব্যের 'বারো' সংখ্যক কবিতায় কবি-মানসের এই বেদনা করুণ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

কবির এই ক্লান্ত করুণ অবসাদে ক্ষীণ জীবনের চরম অভিজ্ঞতার কথাই 'প্রান্তিকে' বর্ণিত হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কবির এ এক নূতন রহস্যময় অভিজ্ঞতা। মৃত্যু আর হিমশীতল স্পর্শে অন্ধকারের ওপার হতে কবি-মনে কেবল ভয়াবহ ছায়াই ফেলেনি;—কবিকে সব ছেড়ে যাবার বেদনায় ভারাক্রান্ত করেনি—কবি-মন জীবন ও মৃত্যু পাওয়া ও হারাণোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে জীবনকে নূতন করে দেখছেন। চেতন এবং অচেতনের মধ্যবর্তী অবস্থায়

মানব-মনের যে গভীর আত্মভাবনা—যে অন্তর্লীন মর্মপীড়ন—তাকে আপনার সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শে রূপ দিয়ে কাব্যে সম্পৃক্ত করে দিয়ে গেলেন। 'প্রান্তিকের' গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষণ এবং সনেটীয় রীতিকৌশল উপলব্ধ বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতার গাঢ়ত্বকে সবিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা কবির নিকটও এক অভিনব জ্ঞান লাভ। এর দুর্জ্ঞেয় রহস্য শিল্পী-মানসকে শান্ত সমাহিত সুদৃঢ় করে তুলেছে।

কবিগুরুর সাহিত্য-সাধনার শুরু থেকেই মৃত্যু সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা নানা আকারে অভিব্যক্ত হতে দেখেছি; কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে এমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান কবি এর আগে আর কখনও লাভ করেন নি। মৃত্যুর করাল মূর্তি কবি তাঁর অবচেতন মনে যেন অনুভব করলেন—আর সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই জগৎ এবং জীবনের আর একবার নূতন করে বীক্ষণ করার চেষ্টা করলেন। কবিতাগুলির কোন নামকরণ নেই। একের পর এক সংখ্যা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা খণ্ড খণ্ড রূপে দেখা দিয়েছে। এ যেন অখণ্ড অব্যক্ত এক বিরাট অমূর্ত্তভাবের বা অনুভূতিপুঞ্জের স্বচ্ছ সুস্পষ্ট শৈল্পিক প্রকাশ।

'জীবন ও মৃত্যু—দুঃখ ও সুখের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'বিশ্বের আলোক লুপ্ত তিমিরের অন্তরালে যখন 'মৃত্যু দূত চুপে চুপে এলো'—তখন সে কবি-জীবনের দিগন্ত আকাশ থেকে যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি সব স্তরে স্তরে ধৌত করে দিল ব্যথার দ্রাবক রসে—এবং এইরূপে কবির চিন্তাকাশে যে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের বিভ্রম দেখা দিয়েছিল—তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কবি 'অন্তঃশীলা, জ্যোতির্ধারা'র প্রবাহে অনুভব করলেন—

পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারা প্রাচীর বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ অভ্যুদয়ে।

* * * *

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
আলোক আলোক তীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

এরপর কবি জীবনের সব পাওয়া এবং হারানো—'লাভক্ষতি' কামনার আবর্জনা যত এবং ক্ষুধিত অহমিকার উঞ্ছবৃত্তি সঞ্চিত জঞ্জালরাশিকে নব আলোকের দানে ধন্য করে তুলতে চেয়েছেন এবং এই নূতন অরুণালোক যেন এ মর্ত্যের প্রান্তপথকে দীপ্ত' করে দেয়—এ প্রার্থনাও তিনি জানিয়েছেন। মৃত্যু তার হিমশীতল স্পর্শে যখন 'এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্রগুলিকে অদৃশ্যখাতে ছিঁড়লো—

সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে।

কবি প্রাণে-মনে অনুভব করলেন—

অকস্মাৎ মহা একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয় তোরণ চূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে
মেলিনু নয়ন;

শুধু তাই নয়; এই বিরাটের মহা ইঙ্গিতময় ঔদার্যের মধ্যে কবি আপন অন্তরলোকের সৃষ্টিসাধনার মহা ইঙ্গিতকেও মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন—

বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টি কাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।

কবি এই বিশ্বসৃষ্টিকর্তার পরম আহ্বানকে আপন অন্তরলোকে একান্ত করে অনুভব করতে চাইলেন। তাই এ বিশ্বসংসারের সব দেনা-পাওনা হিসাব-নিকাশ—স্বার্থের সংঘাত আজ বড় বেশি রূঢ় বাস্তব, বড় নিষ্ঠুররূপে প্রতিভাত হচ্ছে তাঁর কাছে। কবি আজ তাই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে

যে সত্যের আহ্বান কবি আজন্মকাল করে এসেছেন—সংসারের নানা আশা আকাঙ্ক্ষা—কর্মের বন্ধন 'পশ্চাতের নিত্য সহচর' হয়ে সেই অকৃতার্থ অতীত

কবিকে 'অতৃপ্ত তৃষ্ণার ছায়ামূর্তি রূপে এতকাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরে জীবনের যে পরম সত্য পথ হতে কবিকে বিচ্যুত করে রাখে—কবি সেই সত্যের জন্য জীবনের *'সমাপ্ত বেদনার ধন' 'কামনার রঙিন* ব্যর্থতা মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন—

* * *

আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে চাওয়া আকাশেতে, ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

কয়েকটি কবিতার মধ্যে মৃত্যু সম্বন্ধে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা—অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। কবি ভাবে ভাষায় সেই অচৈতন্য লোকের কথাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। মৃত্যুর অস্বাভাবিক আকস্মিকতায় কবি যেন প্রথম অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তার অনিবার্য আহ্বানে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করেন ;—জগৎ এবং জীবন থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলা থেকে মুক্তি নেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই অবচেতন অবস্থা গত হয় ;—অনুভূতির প্রত্যক্ষলোক থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে মৃত্যু কবির কাছে আবার তত্ত্ব রূপে দেখা দেয় ;—কবি সুন্দরভাবে মৃত্যুর হাতে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণের কথা অভিব্যক্ত করেন। 'আট', 'নয়', 'দশ' সংখ্যকে মানসিকতার এই অবচেতন অবস্থার কথা শিল্পসমন্বিত হয়ে রূপ পেয়েছে। 'আট' সংখ্যকে দেখি আপন সত্তার অচৈতন্যলোকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার কথা—

রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপ-শিখা,
রিক্ত হল সভাতল, আঁধারের মসী অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি মুছে যাওয়া সুষুপ্তির মত শান্ত হল
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনী সংকেতে।

তারপর এই ইঙ্গিতকে লক্ষ্য করে কবি যেন পাড়ি জমালেন কোন অনির্দেশ্যলোকে—'নয়' সংখ্যকে—

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি।

* * *

ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ অন্তহীন তমিস্রায়।

এই অবচেতনলোকে কবি সেই চিরন্তন সত্যের সন্ধান করেন ; সৃষ্টিকর্তার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণতম রূপের আবির্ভাব কামনা করেন—

* * * নক্ষত্র বেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল।
এবার প্রকাশ করে তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

'দশ' সংখ্যকেও ঐ একই অভিজ্ঞতার ক্রমাভিসার—

মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ
তব সভা হতে।

কিন্তু 'নিখিল জ্যোতির জ্যোতি'কে কবি আপন অন্তরে অনুভব করে ধন্য হতে পারেন নি। তাই—

বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি
তাই ফিরাইয়া দিলে।

তবুও কবি আশা রাখেন—আসিবে আরেক দিন, যখন কবির বাণী আনন্দের পূর্ণতার ভারে নিঃশব্দে পড়িবে খসি অনন্তের অর্ঘ্যতালি পরে।

কিন্তু এ জীবনের 'কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ' (১১ নং থেকে কবি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছেন। তাই 'বার' সংখ্যকেও শুনি—

শেষের অবগাহন সাঙ্গ কর কবি,

* * *

বাহির দ্বারের যে দক্ষিণা
অন্তরে নিয়ো না টেনে ;

* * *

পুরস্কার প্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত যেতে যেতে ;

*   *   *   এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষা ঝুলি,

পৃথিবীর সব আশা আকাঙ্ক্ষা—সৌভাগ্য গৌরব—নামের মোহ চুকিয়ে দিয়ে পরম প্রশান্ত চিত্তে সৃষ্টির মহাকাল যাত্রার পথে আপন আত্মাকে চিরপথিক রূপে দেখেন—'তের' সংখ্যকে—

তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পাস্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

তাই অতি শান্ত সুরে, প্রশান্ত চিত্তে সেই অনন্ত পথের মহাকাল সঙ্গীতের তানে সুর মিলিয়ে বিদায় ক্ষণটিকে চিরমধুর করে তোলেন। ধরণীর প্রতি তাঁর শেষ প্রণতি নম্রনমস্কারে জানিয়ে যান···যে এতকাল আতিথ্য দিয়েছে তাঁরে—'চোদ্দ' সংখ্যকে—

যাবার সময় হল বিহঙ্গের······
······কত কাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে ;
······সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্রনমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

এইভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে কবি অতি শান্ত-সৌম্য প্রশান্ত চিত্তে আপন মনকে প্রস্তুত করেন। এ কবির মনে কোন ক্ষোভ, কোন বিস্ময়, কোন দার্শনিক জীবন জিজ্ঞাসা আর বর্তমান নেই; চরম সত্য যেন ধীরে ধীরে গভীর উপলব্ধির কাছে ধরা পড়েছে—'পনের' সংখ্যকে—

···আজি হেরি চোখে
কোন অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া।
······সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মত।

তাই এই অনিত্য সংসারের মাঝে সেই অসীমের স্পর্শকেই কবি একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেন—'ষোল' সংখ্যকে—

তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

এই অনিত্য বিশ্বসংসারের বুকে একমাত্র সত্যস্বরূপের উপলব্ধিই কবির একমাত্র কামনার ধন হয়ে ওঠে এবং তাঁর লীলা বিশ্বচরাচরে অনুভব করে কবি আপনাকে ধন্য মনে করেন—তাই এত ভালবাসা এত সুনিবিড় আকর্ষণ এই সত্য পৃথিবীর জন্য। প্রান্তিকে মৃত্যুর আলোকে কবিমনের এই আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কবির এই নির্লিপ্ততা—এই অসুস্থ মানসিকতার কারণ খুঁজলে আমরা দেখি—বার্দ্ধক্যজনিত পীড়া ও দুর্বলতা ধীরে ধীরে কবিকে পঙ্গু করে তুলছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং শারীরিক অসুস্থতাও দেখা দিচ্ছে ক্রমশঃ। কবি-প্রাণ সবকিছু হতে মুক্ত হলেও জৈব-চেতনা তাঁর উপরও সাময়িকভাবে প্রভাব বিস্তার করে; তাই সময়ে সময়ে কবি অসহায় বোধ করেন। কিন্তু আজ যেন মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবিকে এক রহস্যময়ের ঠিকানা দিয়ে অরূপলোকের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে নির্দেশ দিল—একি সত্যি? তবে কি আমরা জীবনরসিক কবিকে হারালাম? কবির সমস্ত স্বাদ···সব আসক্তি—আজ কি পরম অচিনের মধ্যে লীন হয়ে গেল? এইরূপ নানা প্রশ্ন আজ আমাদের বিভ্রান্ত করে তোলে—নানা সন্দেহ আমাদের মনে উঁকি মারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার উত্তরও কবি রেখে যান।

তাই মনে প্রশ্ন জাগে 'অনন্ত সিন্ধু পারে' এসে রবি, আজ যে অন্তিম পূরবী' 'পূরব দিগন্ত পানে পাঠান—তা কি সত্যিই ভিন্নতর সুর? এই অন্তিমবাণী কি কবি-জীবনের সমস্ত রসমাধুর্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা? মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ কি কবির জাগ্রত চেতনালোককে শুব্ধ করে দিয়েছে? কবি ত 'পূরবী'তে যে সুর সেধেছিলেন—তা জীবন ব্যতিরেক নয়—বরং জীবনের অমৃত সুধারসকে

দুহাত ভরে পান করবারই কথা। সেখানে কবি বলেছেন—'যাবো এটা যখন সত্য বলেই জানি—তখন জীবনাকাশকে নব নব রঙের আলিম্পনে রাঙিয়ে দিয়েই যাবো। তাই ত গেয়ে ওঠেন—

এই ভালরে এ সঙ্গমে কান্না হাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নিয়েছি বিদায়।

তাই কবি-মনের এই যে মর্ত্যজীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা-লোভ-মোহ সমস্ত কর্মের বন্ধনকে ছিন্ন করে দিয়ে সত্যের সন্ধানে মুক্তির সন্ধানে অরূপলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা—একেও রোমান্টিক মনের সীমা অসীমের প্রতি মানস অভিসার ছাড়া আর কিছু বলা যায়না। অথচ সীমার মধ্যে কবি-মন যখনই সত্যের সন্ধান করেছে—পরমার্থের সন্ধান করেছে—মুক্তির সন্ধান করেছে তখনই তাঁর আকাঙ্ক্ষা জেগেছে সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে অসীমের অনন্ত ঔদার্যের মধ্যে আপন চৈতন্যকে মিলিয়ে দিতে; আবার অসীমের বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে কোন তল না পেয়ে কবির রসিকচিত্ত—বৈচিত্র্যপিয়াসী মন সীমাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে একান্ত আপন করে। মর্ত্য পৃথিবীর এই তুচ্ছতার মধ্যে খণ্ডতার মধ্যে জীব-জীবনের পরম সার্থকতাকে মিলিয়ে দেখার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সীমা ও অসীমের প্রতি এই আকাঙ্ক্ষা ত কবি-মনের আজন্মের বাসনা। তাই যে মুহূর্তে কবি মন 'অকৃতার্থ অতীতের সব বেদনার ধন, কামনার রঙিন ব্যর্থতাকে মৃত্যুরে ফিরিয়ে দিয়ে জগৎ ও জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে ভারমুক্ত চিরপথিকের বাঁশির সুরে সাড়া দিতে চেয়েছে—সেই মুহূর্তেই বোধহয় কবি-মনে সংশয় জেগেছে—এর সত্যতা নিয়ে এর নিত্যতা নিয়ে, এর মধ্যে যথার্থ আনন্দ আছে কি না—তা নিয়ে। তাই ঐ একই দিনে লেখা পরবর্তী কবিতার মধ্যে আবার দেখি মর্ত্যের এই ধূলিমলিন পৃথিবীর প্রতি একান্ত টান; এরই হাসি কান্নায় দুঃখে-সুখে বিজড়িত জীবনকে একান্ত সত্যি বলে গ্রহণ। এরই মধ্যে মুক্তিকে স্বীকার করা সন্ধান করা :—তাই 'ছয়' সংখ্যকে—

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে
নহে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎ লক্ষ্মীর।

দেহ মন প্রাণকে পীড়িত করে···সমস্ত ভোগ সুখ হতে নিজেকে বঞ্চিত করে কবি আপন আত্মাকে মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত রাখতে রাজি নন। এখানেও সেই এক কথা ভিন্ন সুরে—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

তাই আজ এই জগৎ ও জীবনের মাঝেই মুক্তির সেই সহজ রূপকে সহজেই দেখতে চান, ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণ নিয়ে বৈরাগ্যের হোমাগ্নি শিখা জ্বালিয়ে তার সন্ধান করার বাসনা ত্যাগ করেন। তাই—

আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণ রূপ
ঐ বনস্পতি মাঝে ঊর্দ্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
শরৎ প্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে, লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোকে লোকান্তরে
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে স্ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত উৎসারিত।

কাব্যের শেষে এসে কবির কণ্ঠে তাই সেই চির-পুরাতন অথচ চির-নূতন সুরই ধ্বনিত হয়; এ সুর ত আমাদের অনেক কালের চেনা-জানা—জগৎ এবং জীবনের নানা রূপ-রসের বৈচিত্র্য মাধুরী থেকে কবি ত আপন মনে আজীবন প্রেরণা পেয়েছেন; এ বিশ্বের রূপ রস-ছন্দ-ধ্বনি-মাধুর্য ত কবি-প্রাণে মহাইঙ্গিতময় বাণী-সুষমার সঞ্চার করেছে; আর এই মানব-জীবনের হাসি-আনন্দ প্রেম-প্রীতির স্পর্শও ত মধুময় করে তুলেছে তাঁর জীব-জীবনের ক্ষণকালীন জীবন ইতিহাসকে। তাই মৃত্যুর যে হিমশীতল স্পর্শে, কবি-মানস এ জগতের ধ্বনি গন্ধ স্পর্শ সঙ্গীতময় জীবন মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চেতন ও অবচেতন লোকের মাঝখানে অন্ধকারময় কোন অদৃশ্যলোকে বিহার করছিল—যেখান থেকে 'কবি' শুধু সেই জ্যোতির স্তিমিত শিখার আলোকে আপন চৈতন্য-লোকের তমসাকে ঘুচিয়ে কেবল মুক্তি প্রার্থনাই করছিলেন; সেই পরম অচিনের সৃষ্টিরহস্যকে আপ

অন্তরে 'গভীরভাবে উপলব্ধি করে জীবনকে ধন্য করতে চাইছিলেন—এবং এরই জন্য সংসারের ধূলিলিপ্ত আবর্জনার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি চাইছিলেন ;—সেই সাধনালোকের কৃচ্ছ্রসাধনময় মানসিকতাকে কবি বঞ্চিত প্রাণের আত্ম অস্বীকার বলে ঘোষণা করলেন। কবির অবচেতন মনের এই যে জড়ত্ব থেকে—নিষ্ক্রিয় মনোভাব থেকে একটি সুস্থ সজীব জীবনানুভূতির ক্ষেত্রে পুনঃপ্রত্যাবর্তন এর দ্বারা কবির যে কেবল রোগমুক্তি ঘটে জীবনের পুনর্মুক্তি ঘটলো তাই না—আপন অন্তর জগতেরও জাগ্রত চেতন-লোকে পুনরাবির্ভাব ঘটলো। এই অবচেতনলোকের অসুস্থ মানসিকতাকে এভাবে জীবনী-শক্তির প্রাচুর্যের দ্বারা জয় করতে না পারলে বোধহয় পরবর্ত্তী কালের এতগুলি কাব্যকে আমরা আর পেতাম না। তাই কবির একান্ত আকাঙ্ক্ষা—সেই চিরন্তনকালের আদিমবাসনা—'ছয়' সংখ্যকে—

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন করো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,...

কবির তাই আপন অন্তরের কামনা-বাসনা সম্বন্ধেই প্রশ্ন জাগে—সংশয় দেখা দেয়—'সাত' সংখ্যকে—

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে
বিকারের রোগীসম আকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

কবিমানসের সজীব সক্রিয়তায় যে মানসিক বিকার দেখা দিচ্ছে—এই ভয় তাঁর সচেতন মনকেও পীড়িত করে তোলে। তাই জীবনের সেই চিরন্তন আশা আকাঙ্ক্ষার সুরছন্দকে আর একবার আপন অনুভবের সূক্ষ্ম স্পন্দনে ধরবার চেষ্টা করেন—

ধন্য এ জীবন মোর
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখি
যে সুরে ঘোষণা করে আপনাতে আনন্দ আপন।
দুঃখ দেখা দিয়েছিল, খেলায়েছি দুঃখ নাগিনীরে
ব্যথার বাঁশির সুরে। নানা রন্ধ্রে প্রাণের ফোয়ারা
করিয়াছি উৎসারিত অন্তরের নানা বেদনায়।

* * *

আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি, হে জীবন অস্তিত্বের সারথি আমার
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিজয় যাত্রায়।

তাই প্রত্যক্ষ বাস্তব জগৎ থেকে—তার কর্তব্য চিন্তা ভাবনা থেকেও কবি নিজেকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। তারই প্রমাণ স্বরূপ দেখি দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে মানুষের প্রতি মানুষের যে অন্যায় অত্যাচার তা কবি-মনকে ব্যথিত করে তোলে 'সতেরো' এবং 'আঠারো' সংখ্যকে সেই কথাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে। কবি এখানে 'সেথায় উত্তরী' ফেলি পরি বর্ম সেথায় নির্মম কর্মকে' স্বীকার করে নেন মনে প্রাণে' ; অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবি-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—'সতেরো' সংখ্যকে—

দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।

তাই মানুষের এই হিংস্র উন্মত্ততায় কবি ব্যথিত হন এবং এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত শক্তি আজ আবার প্রার্থনা করেন সেই বিশ্বদেবতার কাছে—

......মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন।

কবি এখানে আর নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারেন নি। বাস্তবের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-বিক্ষোভে সাড়া দিতে

চেয়েছেন—তাই 'খ্রীষ্টজন্মদিনে'—সেইশান্তিদূতের শান্তির বাণী আজ যে ব্যর্থ মানুষের লোভ ঈর্ষার কাছে সেই কথা স্মরণ করে লেখেন

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

আপন কর্তব্যকর্মে কবি আজও অচঞ্চল—আজও তাঁর কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে—অসত্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ—উদাত্ত আহ্বান। কবি-মন এখানে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি। তাই 'অনন্তসিন্ধু কূলে এসে রবি পূরব দিগন্ত পানে যে 'অন্তিম পূরবী' পাঠান—সে পূরবী' রাগিণীর সুর জীবনব্যতিরেক কিছু নয়—জীবনেরই সুস্থ বলিষ্ঠ আত্মসচেতন অভিব্যক্তি। রোগাক্রান্ত দেহের অসুস্থ মানসিকতাকে কাটিয়ে কবি আবার নূতন জীবনীশক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

দশ

কিন্তু কুলোল না সাহসে।

কয়েক পা গিয়েই ফিরে এল নির্ম্মলা। চলে গেল সুরবালার কাছে।

সে জানে, তার এ বিপদের কথা সুরবালাকে বলতে সে পারবে না। একে ত বিনোদ তাঁর ভাই, তার উপর তিনি স্বচ্ছন্দেই বলতে পারবেন, কি এমন হয়েছে যেজন্যে তুমি ভয় পাচ্ছ? এসব তোমার নিছক কল্পনা। সত্যিই ত কিছু হয়নি এখন পর্য্যন্ত।

তবু গেল। মনে এই আশা নিয়ে গেল যে, যদি সুরবালাকে সে বলে, মা, আপনার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই দিই একটু? ততিনি হয়ত 'না' বলবেন না! তারপর তাঁর সারা দেহে এমন মিষ্টি করে হাত বুলোবে সে, যে, যতবারই সে বলবে, আর একটুক্ষণ বুলোব মা? তিনি 'না' বলবেন না। হয়ত বা তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর বিছানার পাশে মেজেতে শুয়ে ফাঁকে ফাঁকে ঘুমিয়েও নিতে পারবে সে। এই রকম করে সে রাতটা কাটিয়ে দেবে। রাত্রিতে সুরবালার কাছে তাঁরই কাজে ব্যস্ত ছিল জানলে বিনোদ কিছুই বলবেন না তাকে।

আজকের বিপদটা ত কাটুক, তারপর কালকের কথা কাল।

সুরবালারও হয়েছে মুশকিল। নির্ম্মলাকে রাখবেন না যে, সেটা ঠিকই করে ফেলেছেন; কিন্তু কথাটা তাকে বলবেন কেমন করে? একে ত সে দোষ কিছু করেনি; তার উপর এতদিনে বাড়ীরই একজন হয়ে গিয়েছে সে; তারও উপর এত সে করছে তাঁর জন্যে। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, তাকে ডেকে এনে বলা কি যায়, তুমি চলে যাও?

সুজন ডাক্তারকে অনুরোধ করলে তিনি হয়ত রাজী হতে পারেন নির্ম্মলাকে এসে বলতে, তুমি চল, তোমাকে নার্সের কাজ আমি শেখাব। আর তখন সুরবালা সহজেই বলতে পারবেন, আমার যতই অসুবিধা হোক, তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি নির্ম্মলা, তুমি যাও; এরকম একটা সুযোগ ছেড়ে দিও না। নির্ম্মলা যদি তখন বলে, আমি যাব না মা। কিংবা যদি বলে, আপনাকে ছেড়ে, সুধীর-প্রবীরকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? অথবা যদি বলে, আপনজনের সেবা করি, করতে ভাল লাগে বলে, তাই বলে নার্সের কাজ আমি করব না। আমার ভাল লাগবে না। যদি বলে, তাহলে?

মাথাটার কাজ ত বেশী নেই? শরীরটা অবিশ্যি খায়দায় নায়, আর ঘুমোয়। হয়ত তাই একটা দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এল সুরবালার। ভাবলেন, নির্ম্মলাকে রেখে দিলে বিনুদা যে তাকে জ্বালাতন করে মারবেন তা ত জানি। এও জানি যে, নির্ম্মলা মেয়েটা সত্যিই ভাল। সত্যিই সে নির্ম্মল। তাই, কি রকম লোকের পাল্লায় সে পড়েছে সেটা একটু জানতে পেলে হয়ত নিজে থেকেই এসে কাল বলবে, আমায় ছেড়ে দিন মা। আর বিনুদা ত দেখবামাত্র তাকে গিলে খাবেন না—

এমন সময় নির্ম্মলা এল।

সুরবালা বললেন, "তুমি এসে গিয়েছ নির্ম্মলা? খুব ভাল হ'ল। আমার সেই মাথাধরার মালিশটা কোথায় আছে একটু দেখ ত? বিনুদা চেয়েছিলেন তখন কিন্তু নেত্য, চারু, এরা কোথাও সেটাকে খুঁজে পেল না, আর তুমিও ছিলে না কাছাকাছি। দেখ ত কি হল? ওটা নিয়ে বিনুদাকে দিয়ে এস চট ক'রে।"

পাশের একটা ছোট আলমারিতে অন্য নানারকম ওষুধের সঙ্গে একটা শিশিতে মালিশের ওষুধটাও রাখা ছিল। সেটা হাতে করে নিয়ে অত্যন্ত কাতর মুখ করে বেরিয়ে গেল নির্ম্মলা।

বিনোদের লাইব্রেরীর দরজার পর্দ্দা সরিয়ে নির্ম্মলা কাউকে দেখতে পেল না। এত বড় ঘরটার মাঝখান বরাবর একটি মাত্র আঢাকা বাল্‌ব্‌ জ্বলছে। সেটার একটু ওদিকে একপাশে আড়াআড়ি ভাবে একটা বইয়ের আলমারি, যার আড়ালে ওদিকটায় একটা ঈজিচেয়ারে ব'সে বিনোদ পড়াশুনো করেন। সেখানটাতেই আধ-অন্ধকারে তিনি ব'সে ছিলেন। সামনে ঝুঁকে মাথাটাকে আলোয় বের করে পুরু দুটো ঠোঁট টক খাওয়া ঢঙের হাসিতে ভরে বললেন, "এসেছ? এস, এস। জানতামই তুমি আসবে।"

নির্ম্মলা কাছে এলে তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বললেন, "হাতে ওটা কি?"

'মাথা ধরার মালিশ, আপনি চেয়েছিলেন।"

"ও! বাঃ, বেশ, বেশ! একটা কাজ নিয়ে যে আসতে হয় তাও জানো দেখছি। এরকম হলে ত কথাই নেই, এ বাড়ীতে রাণীর হালে থাকবে তুমি। তোমার ভাবনারও কিছু নেই। আমি সন্তু-পদ্মদের বলেই রেখেছি, সুরোকেও বলেছি, সুরোর কাজ করে সময় পেলে অসুখে বিসুখে বাড়ীর অন্যদেরও তুমি একটু আধটু দেখবে। তোমার ত নার্সেরই কাজ? আজ তোমার আমাকে দেখবার পালা।"

খুব সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে নির্ম্মলা বলল, "শিশিটা কোথায় রাখব? মাথ ধরার মালিশ বলেছি, কিন্তু এটা মালিশ করতে হয় না। ঝাঁঝালো তেলের মত ওষুধ, আঙ্গুলের ডগায় করে নিয়ে আস্তে কপালে মাখাতে হয়।"

ঈজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে বিনোদ আবার একটু টক-খাওয়া হাসি হাসলেন, বললেন, "কাছে এস, কি করে মাখাতে হয় মাখিয়ে দাও দেখি আমার কপালের এদিকটায়।" নির্ম্মলা দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর ডানদিকে, উল্টোদিকের কপালটা দেখালেন তিনি। ঘুরে গিয়ে সেদিকটায় দাঁড়ান সম্ভব নয়, কারণ, যে জায়গা নেই।

নির্ম্মলার পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে, তবু সাহস ক শিশিটার ছিপি খুলে দু আঙ্গুলের ডগায় করে এ ওষুধ নিয়ে মাখিয়ে দিতে গেল বিনোদের কপালে।

সব কিছুই ধীরে সুস্থে সইয়ে সইয়ে করবেন, ছিল বিনোদের অভিপ্রায়। আজকেই একটা কিছু হয়ে যাবে এটা তিনি আশা করেননি, আর তা চানওনি কিন্তু নির্ম্মলার সুন্দর সুডোল হাতটি এমনভাবে প্রসারি হয়ে রয়েছে তাঁর মুখের উপর দিয়ে আর তার বাহু তাঁর মুখ চোখের এতই কাছে যে, প্রলোভন সংবরণ ক তাঁর অসাধ্য হল। মাথাটাকে একটু তুললেন বিনে আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুরু ঠোঁটের ছোঁওয়ায় এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। নির্ম্মলার বাঁহাতে র ছিপি খোলা শিশিটা নড়ে গিয়ে সেই ঝাঁঝালো ওষু খানিকটা ছিটকে বিনোদের ডান চোখটাতে পড়ল।

কপালের ওষুধ চোখে; কপালের লিখন যাকে ব আর কি।

হিসহিসিয়ে, "ইস্‌, বাবা রে, গেছি রে, চোখট গেছে বুঝি রে!" বলতে বলতে বিনোদ অন্ধের প্রসারিত দুহাতে পথ ঠাহর করে ছুটে পাশের ব রুমটায় ঢুকে গেলেন। নির্ম্মলা নিঃশব্দে সরে প সেখান থেকে। যেতে যেতে পিছন ফিরে একব ভাবল, এ আবার কি করে বসলাম? মানুষটার চো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না ত? অবশ্যি দো মোটেই আমার নয়। কিন্তু এরপর উনি কি আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন?

ত্রস্তপদে উঠোনটা পার হয়ে এসে এদিক বারান্দার সিঁড়ির একটা ধাপের উপর সে চুপ বসে রইল খানিকক্ষণ। বুকটা এত বেশী ঢিপ করছে তার, যে সে ভাল করে চলতেও পারছে না।

বিনোদ যে কি চান, তাঁর কথা শুনে চলার যে

অর্থ তা ত বোঝা গেল। হয় তাতে রাজী হতে হবে, নয়ত পুলিশ। কিন্তু এ দুয়ের একটা ছাড়া আর যে তার গতি নেই তা ত নয়? নিজের বাড়ীঘর ছেড়ে যে পালিয়ে এসেছে, পরের বাড়ী ছেড়ে পালানো তার পক্ষে কি আর এমন একটা শক্ত কাজ? বাড়ীটাতে মনটা তার বেশ বসে গিয়েছিল, এই যা। তা হোক, সে পালাবে। কলকাতার পথঘাট সম্বন্ধে তার জ্ঞান অতি সামান্য; তা হোক। কাশীপুর, ভবানীপুর আর বালিগঞ্জ, এই তিনটি জায়গা থেকে দূরে যে-কোন পাড়ায়, নয়ত কলকাতার বাইরে বহরমপুর বা বর্দ্ধমানের মত কোন শহরে গিয়ে সে খোঁজ করবে, ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো বা খুব বুড়ো মানুষ বা রুগীর দেখাশোনা করার কাজ খালি আছে কি না। কোথাও না কোথাও কাজ একটা সে পেয়েই যাবে।

সদু-পদ্মরা তখন এদিক্ ওদিকে যে যার কাজে ব্যস্ত। ঝিদের মহলে তার ছোট ঘরটার মেজেতে ব'সে, জগন্নাথের তৈরি ছোট আলমারিটার থেকে তার গয়নাগুলি আর দুটি দুটি শাড়ী জামা বের ক'রে নির্ম্মলা অনেকদিন পর আবার তার ছোট পুঁটলিটি বাঁধছে। তফাতের মধ্যে আজ তার বালিকা বয়সের অবসান হয়েছে, এক দুর্বৃত্ত পুরুষের কলুষিত সান্নিধ্যে এসে, তার ঘৃণ্য অশুচি স্পর্শে। আজ সে বুঝেছে, কি কুৎসিত এই পৃথিবী, আর কি নির্ম্মম এই পৃথিবীর মানুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আত্মসুখ-স্পৃহা। কাশীপুরের এই বাড়ীটা এতদিনে তার নিজেরই মত হয়ে গিয়েছিল; সুবীর প্রবীরের উপরও বড় বেশী মায়া পড়ে গিয়েছিল তার; ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে খুবই, কিন্তু আজ চোখে জল নেই তার। যেন আগুন ধরে গিয়েছে, এত বেশী চোখ দুটো আজ জ্বালা করছে। সেই আগুনের তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে চোখের জল।

অনেকক্ষণ এক জায়গায় একই ভাবে ব'সে থেকে থেকে জগন্নাথের ঢুলুনি আসছিল। মাসী ব'লে গিয়েছে আমি এই এলাম বলে, কিন্তু অনেকক্ষণ ত হয়ে গেল, কোথায় গেল সে? উঠে কোমরটাকে টান করে দাঁড়াল, তারপর আলোটা নিবিয়ে দিল। সুবীর প্রবীর দুজনেই দুটো সোফাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আলোটা জ্বালা থাকলে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। এরপর পিছনের জানালাটার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল।

চোখ থেকে তন্দ্রার ঘোরটা কিছুতে কাটছে না। ঢুলতে ঢুলতে এর মধ্যে একটা স্বপ্নও দেখে নিয়েছে সে। দেখেছে, পাহাড়ের উঁচু দেয়াল বেয়ে উঠে রাক্ষসের পুরীতে ঢুকে গিয়েছে সে। রাজকন্যা যেখানে বসে সুতো কাটছেন সেখানে গিয়ে বলছে, শীগগির আমার পিঠে চড়, দেয়াল বেয়ে নেমে যাচ্ছি তোমাকে নিয়ে, তারপর যেদিকে ইচ্ছে চলে যেতে পারবে তুমি। রাজকন্যা কিছুতে তার পিঠে চড়তে রাজী হচ্ছেন না।

বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না, তার উপর দুতলার কয়েকটা জানালার আলো এসে প'ড়ে খিড়কির বাগানটার অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলি ঝোপঝাড় গাছপালার দু তিনটে করে ছায়া এক বিচিত্র মোহজালের সৃষ্টি করেছে। জগন্নাথের তন্দ্রাচ্ছন্ন মনটা তখনও রূপকথার রাক্ষসপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবকিছুতে দেখছে রাক্ষসী মায়া।

বন্দিনীটি অনেকটাই তার মাসীর মত দেখতে। কি এক রকম ক'রে সে যেন তার মাসীই! তাই তার হঠাৎ মনে হল, চরকাবুড়ীর দেওয়া তুলোয় সুতো না কেটে সে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে চলল কোথায়? এরকম ত কথা ছিল না?

জগন্নাথের মনটা প্রচণ্ড একটা হোঁচট খেয়ে ফিরে এল জমিদার-বাড়ীর অন্দর মহলের একতলায়। খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে ভেজিয়ে দিয়েছিল নির্ম্মলা। কিন্তু তারই মধ্যে পিছনের গলির আলো পশ্চাৎপটে তার রাশীকৃত চুলের বিশেষ এক ধরণের শিথিল খোঁপা, তার সুন্দর সুগঠিত গ্রীবা, আর তার সুডোল টান টান শরীরের পিছনদিক্‌টা চৌকাটের ফ্রেমে আঁটা একটি সুন্দর সিলুএটের মত দেখতে পেল জগন্নাথ।

পা টিপে টিপে ঘরটার থেকে বেরিয়ে এক ছুটে সে

খিড়কির বাগানটা পার হল। তারপর খিড়কির দরজাটা খুলে নিজেও বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

যাবার সময় ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।

সুবীর-প্রবীরকে ঠিক সময়ে উপরে শোয়াতে নিয়ে এল না দেখে সুরবালা ধরেই নিলেন, তাঁর গুণধর ভাইটির কাছে নির্ম্মলা আটকা পড়েছে। নেত্যকে দিয়ে ছেলে দুটোকে আনিয়ে নিয়েছিলেন উপরে। বয়ে যাবার ইচ্ছে যদি কারও থাকে ত সে বয়ে যাক, তাকে নিয়ে কেউ টানাটানি করে না এ বাড়ীতে।

তবু রাত্তিরেই চাঞ্চল্য একটু শুরু হয়েছিল যখন নির্ম্মলা ও জগন্নাথ দুজনের একজনও খেতে এল না। পরদিন একে বারে হুলুস্থুল বেধে গেল বাড়ীতে। কাউকে কিছু না ব'লে একসঙ্গে একজন চাকর ও একজন দাসীর বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার মত চমকপ্রদ ঘটনা বিজিতেন্দ্রের সংসারে ইতিপূর্ব্বে আর ঘটেনি। কাজে বহাল হতেই লোকে এ বাড়ীতে আসে, কাজ ছেড়ে এমনিতেও চ'লে কেউ যায় না।

এ ব্যাপারে পুলিশের করণীয় কি থাকতে পারে তা না ভেবেই কেউ কেউ পুলিশে খবর দেবার কথা তুলেছিল। বাড়া ভাতে ছাই পড়াতে বিনোদের দুঃখ যতই হয়ে থাকুক, তিনি বিচক্ষণ মানুষ, ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইলেন না। তাঁর ডান চোখটা টকটকে লাল হয়ে ফুলে আছে। মালিশের ওষুধটা তাঁর নিজের অসাবধানতায় চোখে প'ড়ে গিয়েছিল, তিনি বলেছেন সবাইকে। নির্ম্মলা ফিরে এলে আসলে কি যে ঘটেছিল সেটা জানাজানি হয়ে যাবেই। হয়ত বিজিতেন্দ্রের কানেও উঠবে কথাটা। বললেন, "পুলিশকে কি বলব? কিছু কি তারা নিয়ে পালিয়েছে?" জানতেন, কিছু নিয়ে পালাবার ব্যাপার এটা একেবারেই নয়। কিন্তু তাঁর এ কথার পর তিন মহল তোলপাড় ক'রে খোঁজাখুজি চলতে লাগল, কিছু খোওয়া গিয়েছে কি না দেখতে।

কে যেন বলল, "এই ত। এই ঘরে যে দেয়াল-ঘড়িটা ছিল সেটা কোথায় গেল?" অমনি সকলে মিলে, "দেয়াল-ঘড়িটা নেই, দেয়াল-ঘড়িটা নেই" ব'লে কোলাহল করতে লাগল। একটু পরে আর একজন কে এসে বলল, "কেন চেঁচাচ্ছ ওরকম গাধার মত বল ত? আচ্ছা হরিলাল, তুইই ত সেদিন রিকৃশ করে নিয়ে গিয়ে সেটাকে সারাতে দিয়ে এলি, আর এখন চুপ ক'রে আছিস?" প্রায় নেই, এই রকম একটি চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে হরিলাল বলল, "ওটা ত সারাতে দেওয়া হয়েছে। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে তবে ত আমি বলব?" কে একজন বলল, "কালকেই হয়ত কিছু নেয়নি, কিন্তু এই যে মাস দুই আগে কর্ত্তাবাবুর কাশ্মীরী দোশালাটা গেল, কে নিলে সেটা?" কথাটা ভাল ক'রে না শুনেই "কর্ত্তাবাবুর দোশালা নিয়ে গেছে, কর্ত্তাবাবুর দোশালা নিয়ে গেছে" ব'লে সকলে মিলে আবার সোরগোল শুরু করল। আমলা-মুহুরিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ এক ব্যক্তি বললেন, "কি চুরি গেছে তা কি আর সব সময় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায়? ক্রমে সেটা ধরা পড়ে। যেমন ধর, যারা পাকা চোর, তারা শীতকালে শাল, কম্বল, বর্ষাকালে ছাতা বর্ষাতি চুরি করে না।"

ক্রমে সবাই খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দিয়ে যার যত রকমের আশ্চর্য্য চুরির গল্প জানা আছে অন্যদের তাই শুনিয়ে আসর জমাতে লাগল।

সুজন ডাক্তার আর আসবেন না শুনবার পর সুরবালা একটাও কথা বলেননি সারাদিন। বিকেলের দিকে বিনোদ তাঁর খবর নিতে এলে বললেন, "যে ডাক্তারের চিকিৎসায় এতদিন ছিলাম, তিনিও আর আসবেন না, আর যে মেয়েটা নিজের লোকের মত ক'রে একটু দেখাশোনা করত আমার, সেও গেল পালিয়ে; আমার যেমন কপাল! আচ্ছা বিনুদা!"

"বল বোন।"

"আমার চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করছ তোমরা?"

"খুব ভাল ব্যবস্থাই হচ্ছে সুরো। ডাক্তার পরিমল মজুমদারকে ডেকে দেখাতে বলেছেন বিজিতেন্দ্র। মেয়ে ডাক্তার হলে হবে কি? জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে কলকাতায় এখন এঁর খুবই নামডাক।"

"থাক, কাউকে ডাকতে হবে না।"

"সে কি? কেন?

'চিকিৎসা ত অনেক করিয়েছি, কিছুদিন বিনা চিকিৎসায় থেকে দেখতে চাই, কেমন থাকি।"

"কি যে বল!"

"ঠিকই বলছি। ওঁকে বলে দিও তুমি।"

জমিদার-বাড়ীর দুটো ঝি চাকর চলে গিয়েছে তাদের জায়গায় কালকেই আর দুটো আসবে। যারা গেছে তারা কারও কাছে কিছু ধার রেখে যায়নি, কিছু নিয়েও পালায়নি। তাই তাদের নিয়ে উত্তেজনাটা খুবই ক্ষণস্থায়ী হল। কেবল, দুটোতে একসঙ্গে কেন পালাল তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলল কিছুদিন। জগন্নাথ মাসী বলে ডাকত নির্ম্মলাকে, সেকথার উল্লেখ করে কেউ কেউ মন্তব্য করল, মেয়েটা নিশ্চয় শাঁসালো একটা খদ্দের জুটিয়ে তার সঙ্গে পালিয়েছে, দালালিটা করেছে জগন্নাথ।

কাছাকাছি যখন আর কেউ নেই, এমন একটা সময়ে সদুকে বলেছিলেন সুরবালা, "হ্যাঁরে, মেয়েটা পালিয়ে কেন গেল, বুঝতে পারছিস কিছু?"

সদু বলেছিল, "ঝিগিরি করতে কি সকলের ভাল লাগে মা! কেনই বা করবে, কি দরকার ওর?"

সুরবালা বলেছিলেন, "না রে না, তা বোধহয় নয়। ঝি-এর মত ত সে থাকত না এ বাড়ীতে? আর যদি দুটো দিন থাকত, নার্সের কাজ শিখবার জন্যে আমিই ত তাকে সুজন ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। সেটা অবিশ্যি সে জানত না, জানলে হয়ত পালাত না।"

একটু পরে আবার বলেছিলেন, "বিমুদার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে, সে ত তুই জানিস। মেয়েটাকে প্রথম দেখেই বিমুদা কি একরকম যেন হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর উল্টোপাল্টা কথাও বলেছিলেন কয়েকটা। তিনিই কি এমন কিছু—"

সদু জিভ কেটে বলেছিল, "ছি! মায়ের যে কথা। মামাবাবু দেবতুল্য মানুষ। আমি ত জানি সেদিন আপনিই ওকে পাঠিয়েছিলেন মামাবাবুর কাছে। সেই ত প্রথম সে গেল তাঁর ঘরে। তখন কিছু হয়ে থাকলে সে ত একলা পালাত। আগে থেকে পালানোটা ঠিক না থাকলে ঐ ছোঁড়াটা জুটবে কেন তার সঙ্গে?"

সুরবালা বলেছিলেন, "তা অবিশ্যি ঠিক, কিন্তু মেয়েটাকে খুব ভাল মনে হয়েছিল আমার। তার এতও ছিল পেটে পেটে? ঐটুকুন ত মেয়ে!"

সদু বলেছিল, "আজকালকার মেয়েদের কার পেটে পেটে যে কি আছে মা, কেবা তার খবর নিচ্ছে?"

একসঙ্গে দুটি বন্ধু ও খেলার সাথী উধাও হওয়াতে সুবীর-প্রবীর কিছুদিন মনমরা হয়ে রইল। তারপর একজন লোক কাজ নিয়ে এল, যে এতদিন বহুরূপী সেজেছে। বহুরূপীর সাজ দেখে এখন আর কেউ পয়সা দেয় না বলে জমিদার-বাড়ীতে চাকরের কাজ নিয়ে এসেছে। আসলে খুবই ওস্তাদ বহুরূপী।

প্রথম যেদিন সে এল, সে এক কাণ্ড। মাথার মাপে মাঝখানটা কাটা একটা খড়্গ তার মাথায়, দুদিক্ দিয়ে রক্ত ঝরছে, সুবীর প্রবীর বাবা রে মা রে, করে ত পালিয়ে গেল তখন। কিন্তু তারপর থেকে তাকে নিয়ে এমনই মেতে গিয়েছে তারা যে নির্ম্মলা ও জগন্নাথকে ভুলে যেতে তাদের বেশী সময়ের দরকার হল না।

একদিন বেশ একটু রাত করেই বিজিতেন্দ্র এলেন সুরবালার ঘরে। বললেন, 'সুরো, তুমি নাকি বলেছ আর ডাক্তার দেখাবে না?''

সুরবালা বললেন, "হ্যাঁ, বলেছি! কেন?"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "এতদিন ত বলনি, এখন বলছ, তাই জানতে চাইছি।"

"দেখব, বিনা চিকিৎসায় কিরকম থাকি।"

"বোধ হয় ভালই থাকবে। কিন্তু কথাটা কি রাগ করে বলেছ?"

"রাগ আবার কার উপরে করব?"

"না, আমি ভাবছিলাম, যদি তুমি ইচ্ছে কর ত সুজনকেই নাহয় আবার—"

সুরবালা বললেন, "ওঁকে একবার যেতে দিয়ে তারপর ফিরে ডাকাটা খুব ভাল দেখাবে না। আর ফিরে ডাকলেই যে তিনি ছুটতে ছুটতে এসে জী হুজুর

বলে সেলাম করে দাঁড়াবেন, তাও ত মনে হচ্ছে না আমার।''

বিজিতেন্দ্র বললেন, "যদি শোনে, যে তুমি আর-কোনো ডাক্তারকে দেখাবে না ঠিক করেছ, তাহলে আসতেও পারে।''

সুরবালা বললেন, ''তুমি ত বেশ থাকো নিজেকে নিয়ে, আজ কেন জ্বালাতে এলে আমাকে? দয়া করে চলে যাও।''

বিজিতেন্দ্র চলে গেলেন।

যারা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে বদ্ধ-পরিকর স্বয়ং ভগবান্‌ও কি পারেন তাদের একসঙ্গে করে মেলাতে?

এগারো

বাড়ীর পিছনের গলিটা পার হয়ে নির্মলা তখন বড় রাস্তায় পড়েছে, গলির ভিতর থেকে জগন্নাথ ডাকল, "মাসী!"

নির্মলা খুব জোরে পা চালাল, কিন্তু জগন্নাথের সঙ্গে পারবে কেন? সে এখন ঠিক তার পিছনেই। ডাকল, "মাসী!"

তার দিকে ফিরে না তাকিয়েই নির্মলা বলল, ''আঃ! তুমি কেন এসেছ? চলে যাও।''

এই ভাবেই চলেছে তারা, একজন আগে আগে, আর একজন একটু পিছনে; আর দুজনেই খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছে। একটু পরে নির্মলা তার দিকে ফিরল, বলল, ''চলে যেতে বলছি, যাচ্ছ না কেন?''

জগন্নাথ বলল, "যাব, কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ মাসী?"

"যেখানে খুশি, তাতে তোমার কি দরকার?''

''অমন করে বলো না মাসী।''

"তবে কি রকম করে বলব? আর কথা তোমার সঙ্গে আমার বলতেই বা হবে কেন? তোমাকে চলে যেতে বলা হয়েছে, তুমি চলে যাও।''

জগন্নাথ গেল না। চলল নির্মলার পিছন পিছন। বলল, "তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ মাসী?"

''যাচ্ছি যে, দেখতেই ত পাচ্ছ।''

''কেন ছেড়ে যাচ্ছ? কি হয়েছে মাসী?''

''বলব না।''

''আচ্ছা, বলো না। আমি ত জানি কি হয়েছে।''

ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে জগন্নাথকে আড়চোখে একটু দেখে নিল নির্মলা। বলল, "কিছু জানো না তুমি।"

দুপা এগিয়ে এসে জগন্নাথ এখন নির্মলার পাশে পাশে চলছে। বলল, "মামাবাবু তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, তোমাকে তিনি কাজ দেন নি, দেবেনও না। কেমন, ঠিক বলেছি কি না বল।"

নির্মলা বলল, ''কেউ আমাকে তাড়িয়ে দেয়নি, আমি নিজে থেকেই চলে যাচ্ছি।''

জগন্নাথ বলল, ''কিন্তু বেশ রাত হয়েছে, সারারাত ত তুমি পথে পথে ঘুরতে পারবে না? কোথাও ত রাতটা কাটাতে হবে? তোমার চেনাজানা কেউ আছে কলকাতায়?''

নির্মলা দাঁড়িয়ে গেল, বেশ একটু কঠোর হয়েই বলল, "এ ত আচ্ছা জ্বালা! এইরকম করে তুমি কথা বের করবে আমার কাছ থেকে? পারবে না। যাও দেখি, তুমি চলে যাও। তুমি ভাবছ, খুব উপকার করছ আমার, কিন্তু আসলে আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে তুমি।"

এরপর নিঃশব্দে দুজনে পথ চলল কিছুক্ষণ। জগন্নাথের চলে যাবার কোন লক্ষণ নেই দেখে একটু নিরিবিলি ছোট একটা মাঠের ধারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে শক্ত হয়ে দাঁড়াল নির্মলা। বলল, ''ব্যাপারটা আসলে কি বল ত? মামাবাবু তোমাকে আমার পিছনে লাগিয়েছেন? তাই পিছু নিয়েছ?''

যেন পথে পায়ের কাছে হঠাৎ একটা সাপ দেখেছে, এমন ভাবে চমকাল জগন্নাথ। এতক্ষণ তার স্বভাবের সদা-প্রসন্নতাটাকে অনেকখানিই বজায় রেখে চলেছিল সে, আর পারল না। ''আমি মামাবাবুর কথায় তোমার পিছু নিয়েছি, একথা তুমি বলতে পারলে মাসী?'' বলতে গিয়ে তার মুখটা কালো হয়ে গেল।

দুটি হাত জোড় করে নির্মলার পায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম জানাল সে, তারপর হনহনিয়ে চলে গেল, যেদিক্ থেকে তারা এসেছিল সেইদিকে।

নির্মলা তাকিয়ে একবার দেখল পিছন ফিরে। তার মনে হল, জগন্নাথ চোখ মুছতে মুছতে গেল।

বোধহয় খুব আঘাত পেয়ে গেল।

এত মাসী মাসী করত সারাক্ষণ। মাসীর মত ব্যবহার সে পেল না নির্ম্মলার কাছ থেকে।

কি দরকার ছিল ওরকম একটা শক্ত কথা তাকে বলবার? বেশ কিছুক্ষণ বিমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নির্ম্মলা, তারপর মাথা নীচু করে ধীরপদে পথ চলতে লাগল।

বোধহয় আধ মাইলটাক পথ এসেছে, এমন সময় একটা কুকুর পিছু নিল নির্ম্মলার। কলকাতার রাস্তায় অসংখ্য মালিকহীন কুকুরদের একটা। নির্ম্মলা দাঁড়ালে সেও দাঁড়াচ্ছে, চললে চলছে। ভীষণ একটা ব্যতিব্যস্ত ভাব। মাঝে মাঝে নির্ম্মলার একেবারে পাশ ঘেঁষে এসে তার পা শুঁকবার চেষ্টা করছে। তখন শিঁটকে উঠছে নির্ম্মলা।

একবার নির্ম্মলা রাস্তাটা পার হয়ে ওদিক্‌কার ফুট-পাথে গিয়ে উঠল। কুকুরটাও গেল তার সঙ্গে।

হয়ত কামড়াবে না, কিন্তু ভাল লাগছে না নির্ম্মলার।

কি করে যে ওটাকে ভয় পাওয়ানো যায়, তাড়ানো যায়, তাও সে ভেবে পাচ্ছে না। অনেক সময় ভয় পেলে কুকুররা গোলমাল করে বেশী। চেঁচিয়ে যদি তখন রাস্তার লোক জড় করে ত বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে।

কতক্ষণ যে এইভাবে চলল তার ঠিক নেই। শেষটায় কান্না পেতে লাগল নির্ম্মলার।

ভাগ্যিস পাশের একটা গলি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আর একটা কুকুর স্বকীয় ভাষায় যুদ্ধং দেহি বলে একে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করে নিয়ে গেল; তাইতেই অব্যাহতি পেয়ে গেল নির্ম্মলা।

কিন্তু নিজেকে অব্যাহতি সে দিল না।

ছি ছি, শেষটা একটা কুকুর তাকে এই রকম করে ভয় পাওয়াল!

এটা হ'ল কি সে মেয়ে বলে?

হয়ত তাই, নইলে কেন এতক্ষণ কেবলই তার মনে হয়েছে, ছেলেটাকে না তাড়ালেই হত। না হয় দমদম বা শেয়ালদা, কোন একটা রেল-ষ্টেশন অবধি সে সঙ্গেই যেত। আজকের রাতটা সেও যদি থাকত সেখানে তার সঙ্গে, তাতেই বা ক্ষতি কি ছিল? কাল সকালে তাকে সঙ্গে ক'রে কোনো একটা স্যাকরার দোকানে গিয়ে গয়নাগুলি বিক্রির ব্যবস্থা তাহলে সে করতে পারত। তারপর দরকারী কয়েকটা জিনিষ কিনে তাকে দিয়ে টিকিট করিয়ে বর্দ্ধমান বা বহরমপুর কোথাও সে চলে যেতে পারত।

কিন্তু কেন? এইটুকুনের জন্যে আর একটা মানুষের উপর নির্ভর তাকে করতে হবে কেন? নাহয় মেয়ে হয়ে জন্মেছে, তা ব'লে সে কি মানুষ নয়? যে-কোনো পুরুষ মানুষের মত তারও দুটো হাত আছে, দুটো পা আছে, আছে নাক মুখ চোখ; বুদ্ধি যা আছে অনেক পুরুষ মানুষের তা নেই, আর সাহসের অভাব যেটা আছে তাও সে পুরিয়ে নেবে। তারপর নিজের ভার নিজে কেন সে বইতে পারবে না?

সে ভার যদি একেবারেই দুর্ব্বহ হয়, বিপদ্‌ যদি কখনো চারদিক্‌ থেকেই তাকে ঘিরে আসে, তাহলে মুক্তির একটা পথ, সকলের জন্যে যেমন, তারও জন্যে ত তেমনি খোলা আছে?

একটা রেল-পুলের মাঝামাঝি এসেছে সে তখন। একবার সত্যিই তার মনে হল, ঐ যে ট্রেনটা আসছে, ওটার সামনে লাফিয়ে পড়লে কত সহজে এখনই তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে, পাশের দেয়ালটার উপর দিয়ে দেখছে সে, শিটি দিতে দিতে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেনটা আসছে। যদি এখন—

"মাসী!"

ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে জগন্নাথ, বড় রকমের একটা পোঁটলা তার বগলে। যে বাসটা ধরে সে এসেছে সেটা চলে গেল পাশ দিয়ে।

নির্ম্মলা ফিরে দাঁড়াল, তারও মুখে একটু যেন হাসি হাসি ভাব। বলল, "তুমি না চলে গেলে?"

জগন্নাথ বলল, "ফিরে এলুম মাসী। কাজটা ছেড়ে দিয়ে এলুম।"

"কেন?"

"ঐ মামাবাবুটা মানুষ নয় মাসী, ওটা একটা

আনোয়ার। ওর কাছে আর আমি কাজ করব না।”

“চলে যে এলে, ওরা বলল না তোমাকে কিছু? জানতে চাইল না কেন চলে যাচ্ছ?”

“আমি কাউকে কি বলে এসেছি যে জানতে চাইবে?”

“কাজটা ছেড়ে দিয়ে এলে বললে যে!”

“বাঃ, চলে এলুম, আর ফিরে যাব না, এতে কাজ ছেড়ে দিয়ে আসা হ'ল না?”

আর কোন কথা হ'ল না দুজনের।

ট্রেনটা এমন ভীষণ শব্দ ক'রে যাচ্ছে পুলের নীচে দিয়ে সে, ইচ্ছে থাকলেও কোন কথা কেউ কাউকে শোনাতে পারত না।

দুজনে পাশাপাশি যাচ্ছে তারা।

জগন্নাথ বলল, “আমরা কোথায় যাচ্ছি মাসী?”

নির্ম্মলা বলল, “আমি যাচ্ছি আমার যেদিকে দুচোখ যায়। তুমি কোথায় যাচ্ছ সে তুমি জান।”

জগন্নাথ বলল, “আমিও ত সেই দিকেই যাচ্ছি মাসী, যেদিকে দুচোখ যায়। চল, চল।” তারপর নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে খুব হাসতে লাগল।

নির্ম্মলা রাগ দেখিয়ে বলল, “তার মানে, তুমি আমার কাছ ছেড়ে নড়বে না, এই ত?”

জগন্নাথ বলল, “তুমি আমায় তাড়িয়ে দিও না মাসী!...মাসী, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।”

জগন্নাথ হেঁট হচ্ছিল, নির্ম্মলা স'রে গেল দু পা। এবারে সত্যিই রাগ। বলল, “খবর্দ্দার, পায়ে হাত দেবে না।”

আবার কিছুক্ষণ চলল দুজনে পাশাপাশি, তারপর এক সময় নির্ম্মলা বলল, “এখান থেকে হাওড়া ষ্টেশনটা কাছে হবে, না দমদম?”

জগন্নাথ বলল, “দমদম। কেন জানতে চাইছ?”

নির্ম্মলা বলল, “ভাবছি ত আজকের রাতটা কোনো একটা রেল-ষ্টেশনে কাটিয়ে কাল আমার গয়নাগুলো বেচব। তারপর ভেবে ঠিক করব কি করা যায়। সুবীরদের বাড়ীতে আমি ঐ বালাজোড়াই পেয়েছি, মাইনে ব'লে ত কিছু পাই নি? কথা ছিল, মামাবাবু এসে মাইনে ঠিক করে দিলে যা আমার পাওনা হবে, হিসেব ক'রে আমাকে দেওয়া হবে।”

জগন্নাথ বলল, “কালই গিয়ে নিয়ে আসব তোমার মাইনের টাকা। আমারও ত মাসের এই ক'টা দিনের মাইনে পাওনা হয়েছে।”

নির্ম্মলা বলল, “না, মোটেই তুমি যাবে না ওদের কাছে তোমার বা আমার মাইনে আনতে। যাও যদি ত ফিরে এসে আমার দেখা আর পাবে না। যেখানেই আমাকে রেখে যাও।”

জগন্নাথ বলল, “আচ্ছা যাব না।” তারপর চুপ করে একটুক্ষণ ভেবে দুটো চোখ উজ্জ্বল করে বলল, “মিথ্যে আমরা ভাবছি মাসী। সুজন ডাক্তার বলেছিলেন না, একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে তুমি খুব ভাল নার্স হতে পার? চল তোমাকে নিয়ে যাই তাঁর কাছে”

নির্ম্মলা বলল, “না, না, ওঁর কাছে না। ঐ এক ঝাড়েরই ত বাঁশ? ঠিক নিয়ে গিয়ে মামাবাবুরই খপ্পরে আবার ফেলবেন আমাকে।”

জগন্নাথ বলল, “না না মাসী। জানো না তুমি ওঁকে। কখনোই তিনি তা করবেন না।”

নির্ম্মলা বলল, “নিশ্চয় করবেন। মা যেই শুনবেন, আমি তাঁর কাছে রয়েছি, বলবেন, ওকে আমার চাই, আর মার কথা সুজন ডাক্তার কিছুতেই ঠেলতে পারবেন না।”

জগন্নাথ বলল, “তাহলে এক কাজ করা যাক চল মাসী। ঠাকুরপুকুরে আমার এক জ্যাঠাইমা থাকেন। বিধবা মানুষ, ছেলেপুলে নেই। অনেকবার বলেছেন আমাকে, ওরে গাধা, আমার কাছে থেকে বাড়ীঘর জোত-জিরেতগুলো দেখ্ না? চাকরি করে খেতে হচ্ছে কেন তোকে? তোদের বংশে পরের চাকরি কেউ কখনও করেছে? তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব মাসী? খুব খুশী হবেন আমরা গেলে।”

নির্ম্মলা বলল, “আমার ত জোত-জিরেত নেই? চাকরি করেই খেতে হবে আমাকে। কাজেই চাকরি খুঁজতেও হবে। ঠাকুরপুকুরে থেকে সেটা করা সহজ হবে না।”

জগন্নাথ বলল, "তা অবিশ্যি সত্যি। আর ওসব জোতদারি আমাকে দিয়েও পোষাবে না। কে যাবে ওঁর কাছে মরতে, মশার কামড় খেয়ে?"

তারপর একটু থেমে গম্ভীর গলা করে বলল, "তবে মাসী, এখন আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, তোমাকে কোন কিছু নিয়েই ভাবতে হবে না আর। কাজ খুঁজতে হয় আমিই খুঁজব। আমার জন্যেও, তোমার জন্যেও। আমার উপরে সব ছেড়ে দাও তুমি।"

একটু পরে নির্ম্মলার পুঁটলিটিও জগন্নাথ নিয়ে নিল নিজের হাতে, বলল, "চল মাসী, ট্রাম ধরি। শেয়ালদার কাছে একটা হোটেলে একটানা কয়েক মাস কাজ করেছিলুম আমি। থাকতে খেতে পেতুম, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে গাড়ী চালাতে আর সারাতে শিখতুম। আজ এই রাত্তিরে সেইখানেই গিয়ে দুজনে উঠব।"

নির্ম্মলার খিদে পাচ্ছিল খুব। হোটেল যখন, খেতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সে খুশীই হল। ভাবল, আজকের রাতটা ত খাইদাই থাকি, তারপর কালকের কথা কাল।

ফরডাইস লেনটা যেখানে একটা বাঁক ঘুরে গিয়ে সার্পেন্টাইন লেনে পড়েছে, সেখানে, সেই বাঁকের মাথায় দেয়াল-ঘেরা ছোট এক টুকরো জমি, আর সেই জমি-টুকুকে সামনে করে সাতকেলে পুরণো নড়বড়ে দুতলা একটি বাড়ী। কোন অতীতকালে তার আভিজাত্য যে কিছু ছিল তার পরিচয় এখনও বহন করছে খড়খড়ি দেওয়া বড় বড় জানলাগুলো আর দুতলার ছাতে সিঁড়ির ঘরের উপরকার গম্বুজটা। দুতলায় উঠবার সিঁড়িটা কাঠের, চলতে গেলে সেটা শুধু যে নড়ে তা নয়, দোলে।

উপরতলার তিনটি ঘরের মাঝেরটি বেশ বড়, তাতে দুপাশে তিনটি করে ছ'টি তক্তপোশ আর দুদিককার ছোট ঘরদুটিতে চারটি করে আটটি মোট চোদ্দটি তক্তপোশ। এর কোনটিই প্রায় কোন সময় খালি থাকে না, তার কারণ, মাসে ছটাকা সীট রেণ্ট আর ছত্রিশ টাকা খাই-খরচ দিয়ে দুবেলা ভাত ডাল তরকারি মাছের ঝোল, সকালে চা রুটি, বিকেলে চা রুটি খেতে পাওয়া যায় এমন সস্তা হোটেল কলকাতায় এ যুগে বেশী আর নেই।

বোর্ডারদের বেশীর ভাগ মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণী, দুএকজন আছেন সরকারী চাকুরে, আর দু একজন নানা রকমের দালালির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এ ছাড়া কিছু লোক আছেন যাঁরা থাকেন না হোটেলে কিন্তু কেউ বা দুবেলা, কেউ বা এক বেলা বাঁধা নিয়মে এসে খেয়ে যান। কিন্তু এসে পয়সা দিলেই খেতে পাওয়া যায়, সে ধরণের অবারিতদ্বার হোটেল এটা নয়।

উপরের ঘরগুলির মাপে মাপে নীচেও তিনটি ঘর, তবে সেগুলি পার্টিশন দিয়ে ভাগ ভাগ করা। এর একটাতে ভাঁড়ার রাখা হয়, একটা গুদোমের মত রাজ্যের যত ভাঙাচোরা জিনিষ দিয়ে ভরতি করা, বাকি-গুলিতে হোটেলের মালিক নক্ষত্র শাহু, তাঁর স্ত্রী শৈলবালা এবং যুবাবয়সী একমাত্র পুত্র নিরঞ্জনকে নিয়ে বাস করেন।

দুতলা বাড়ীটার একপাশে একটু জমি ছেড়ে বেশ বড় একটা খাবার ঘর ও রান্নাঘর আছে আলাদা। কলতলাটাও সেদিকে।

নক্ষত্র শাহুর ইচ্ছে, সিঁড়ির পাশে ছোট গুদোম ঘরটা খালি করে সেখানে আরও দুজন লোকের থাকার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু শৈলবালার এতে ঘোরতর আপত্তি। বলেন, "তাহলে তোমার হোটেল চালাবার জন্যে মাইনে করে লোক রাখ তুমি। যত রাজ্যের অখদ্যেপানা লোক ধরে নিয়ে আসবে, এক-একটাকে দেখলেই গা ঘিনঘিন করে। তারপর তাদের একেবারে আমার ঘাড়ের উপর এনে ফেলবে তুমি আর তাদের গায়ের গন্ধে সারারাত আমার ঘুম হবে না, সে আমি কিছুতেই সইব না। চলে যাব তোমার বাড়ী ছেড়ে।" স্ত্রীর এতটা অমতে কিছু করা নক্ষত্র শাহুর সাধ্য নয়, তার একটা কারণ, যদিও হোটেলের তিনি মালিক, হোটেলটা চালান প্রায় একলা হাতে শৈলবালা। একটা ছোকরা চাকর আছে, ঘর ঝাঁটপাট

দেয়, কয়লা ভাঙে, বাসন মাজে। আর একটা চাকর বাজার করে মশলা বাটে আর রান্নার জোগান দেয়। বাকী সব কাজ শৈলবালা নিজে করেন, এমন কি হিসেব রাখা পর্য্যন্ত। সার্কুলার রোডের মোড়ের উপর নক্ষত্র শাহুর যে মনিহারী দোকানটা আছে সেটাতে তিনি আর নিরঞ্জন বেশীর ভাগ সময় একসঙ্গে বসেন; একজন জিনিস বেচেন আর একজন ক্যাশমেমো লেখেন, চেঞ্জ গুনে দেন। নাওয়া খাওয়ার সময়টায় কেবল পালা করে যখন একজন বাড়ী যান আর একজন তখন দুজনের কাজ একলা করেন। খদ্দেরের ভিড় কোনো সময়ে বেশী থাকে না, এসময়টায় আরও কম। যাই হোক, হোটেলের জন্যে কিছু করবার সময় হয় না তাঁদের।

ছেলেকে দোকান বন্ধ করতে রেখে এসে নক্ষত্র শাহু চাঁদের আলোয় কলতলায় হাত-পা ধুচ্ছিলেন। বললেন, "আরে, কেও? জগন্নাথ না? তুমি এতকাল পরে কোথা থেকে?"

জগন্নাথ বলল, "এই এলুম চলে।"

এক-একটি করে পা উঠিয়ে গামছায় মুছতে মুছতে নক্ষত্র বললেন, "ও গো! এদিকে এস একবার? দেখে যাও কে এসেছে।"

জগন্নাথ এখানে চাকরের কাজ করত বটে, কিন্তু বাড়ীর লোকরা তাকে চাকরের মত দেখত না। কিছু একটা ছিল তার মধ্যে যাতে তাকে চাকরের পর্য্যায়ে রাখা যেত না, যদিও কাজ অন্যদের চেয়ে সে বেশীই করত।

শৈলবালা এসে দাঁড়ালেন, সামনের খোলা বারান্দায়। উঠোনে চাঁদের আলো। তাঁর চোখ প্রথমেই পড়ল নির্ম্মলার উপর, বললেন, "সঙ্গে ও কে তোমার?"

জগন্নাথ বলল, "ওঁকে আমি মাসী ব'লে ডাকি বৌঠান। আমরা একই জায়গায় কাজ করতুম। একটা বাঁদরকে সইতে পারলুম না বলে, একসঙ্গে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। আমাদের ক'টা দিন এখানে একটু থাকতে দিতে হবে বৌঠান।"

শৈলবালা বললেন, "এ ত ভাই বলতে গেলে তোমার নিজেরই বাড়ী, তুমি থাকবে তার আর কি? কিন্তু জায়গা ত নেই?"

নক্ষত্র শাহু বললেন, "জগন্নাথ তখন যেমন নিশ্চয় থাকত খেত, এখন নিশ্চয়ই তা করতে চাইছে না? কি বল জগন্নাথ?"

জগন্নাথ বলল, "বৌঠান, তুমি খরচার কথা ভাব সে ত আমি দেবই। আগাম নিয়ে রাখ না?"

শৈলবালা নির্ম্মলাকে দেখছেন। বললেন, "সে না হল, কিন্তু শোবে কোথায় তোমরা? আর এত র তোমাদের জন্যে নতুন করে ত আবার রান্না চড় পারব না?"

জগন্নাথ বলল, "আমাদের খাওয়া নিয়ে ভেবো না বৌঠান। আমি ত জানি, পাড়ার খাবারের দোকান কত রাত অবধি খোলা থা আর আমি দুপা গিয়ে শেয়ালদার ইষ্টিশানে শুয়ে রা কাটিয়ে দেব। তুমি কেবল দেখ বৌঠান এঁর কো একটু শোবার ব্যবস্থা হতে পারে কি না।"

একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে রাতটা কাটা হবে ভাবতে নির্ম্মলার ভাল লাগল না। বলল, "ষ্টে আমিও গিয়ে শোব। কোন অসুবিধা ত নেই?"

নক্ষত্র বললেন, "তোমাদের কাউকেই বো যেতে হবে না; দুজনেই যাতে এখানে অন্ততঃ আজ রাতটা থেকে যেতে পার তার জন্যে কি করতে প দেখছি।"

দুই পোঁটলার মাঝখানে নির্ম্মলাকে বারান্দায় ব রেখে জগন্নাথ দোকান থেকে শালপাতার বড় ঠোঙ্গায় ক'রে গরম গরম আটার পুরি, চিচিঙ্গের ঝ তরকারি, ছোলার ডাল আর আমের টক আচার নিয়ে এল। আর নিয়ে এল মুখভরা হাসি। দেখতে দেখ খাবারগুলি শেষ হয়ে গেল। নির্ম্মলার মনে হল, বহুক এমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে আহার করে নি। কলতল নেমে গিয়ে দুজনে আঁজলা ক'রে জল খাচ্ছে এমন স নিরঞ্জন এল।

নির্ম্মলার দিকে একটু অবাক্ হয়ে তাকিয়ে নির বলল, "কেমন আছ জগন্নাথ?" তারপর উত্তরের অপে না করে ভিতরে চলে গেল।

একটু পরে ভিতর থেকে নক্ষত্রের গলা শোনা গেল, ডাকছেন, "ও গো।"

"কি বলছ?"

"এরা শোবে কোথায়?"

"তার আমি কি জানি? বিছানাপত্রও ত কিছু সঙ্গে আনে নি।"

এরপর কিছুক্ষণ দুজনে চাপা গলায় কি কথা হ'ল নির্ম্মলারা শুনতে পেল না। সেটা থামলে দেখা গেল, নিরঞ্জন একটা দরজার পর্দা টেনে ধরে দাঁড়িয়েছে, আর নক্ষত্র একটা শতরঞ্জি, একটা মাদুর ও দুটো বালিশ দুহাতে বুকে চেপে বেরিয়ে আসছেন। জগন্নাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজে নিয়ে নিল সেগুলোকে।

নক্ষত্র বললেন, "এগুলো নিয়ে ছাতে চলে যাও। হাওয়া আছে, বেশ আরামেই শুতে পারবে।"

ছাতের মাঝ বরাবর সিঁড়ির ঘর। তার একদিকে শতরঞ্জি পেতে নির্ম্মলার শোবার জায়গা ক'রে দিয়ে, অন্যদিকে, বেশ অনেকটা দূরে মাদুর পেতে শুল জগন্নাথ, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

নির্ম্মলার ছোট মাথাটিতে যত রাজ্যের যত চিন্তা। কোথায় চলেছে সে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কি আছে তার কপালে? নিজের অজানা ভবিষ্যৎটাকে নানাভাবে সে কল্পনা করবার চেষ্টা করছে, কোনটাই সুখ-কল্পনা নয়। এক-একবার চোখে একটু ঘুম জড়িয়ে আসে আর কি একটা অজানা আতঙ্কে প্রায় তখনই সেটা ভেঙ্গে যায়, তখন আবার ছিঁড়ে যাওয়া চিন্তার সূত্র ধ'রে মনটা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে।

এমনি করে ঘুমটা একবার ভেঙ্গে গেলে সে দেখল, ছাতের আলসেতে পিঠের ভর রেখে কে একজন লোক তার দিকে মুখ করে অল্প একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোতে নির্ম্মলাকেই যেন দেখতে চেষ্টা করছে সে।

কেন দেখতে চেষ্টা করছে? কি মতলব নিয়ে এসেছে সে? সে কি তার চেনা কোন লোক? গয়না-কাপড়ের পোঁটলাটাকে বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে যে-চাদরটা গায়ে দিয়ে শুয়েছিল সেটাকে আরও ভাল ক'রে জড়িয়ে সে পাশ ফিরে শুল। বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল তার।

যেখানে সে শুয়েছে সেখান থেকে জগন্নাথকে দেখতে পাওয়া যায় না, যদি যেত, ভয়টা তার এত বেশী হ'ত না।

একটু পরেই সিঁড়ির মুখ থেকে শোনা গেল, "তারকবাবু!"

নিরঞ্জনের গলা একবারই একটু শুনেছিল নির্ম্মলা, তবু বুঝতে পারল যে এটা তারই গলা।

তারক বলল, "কি বলছেন?"

নিরঞ্জন বলল, "ছাত থেকে নেমে আসুন।"

তারক বলল, "কেন? কি হয়েছে?"

নিরঞ্জন বলল, "কারণটা এইখানে এসে শুনুন। অত দূর থেকে দুজন মানুষ চেঁচিয়ে কথা বলতে থাকলে ছাতে যারা ঘুমোচ্ছে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে।"

তারক এল সিঁড়ির মুখে।

নিরঞ্জন বলল, "ছাতে কি করছেন?"

তারক বলল, "কি আবার করব? গরমে নীচে টেঁকা যাচ্ছিল না, তাই এসেছিলাম।"

"ছাতে একটি মেয়েছেলে শুয়ে আছে দেখেও চ'লে আসেন নি কেন?"

"আজ্ঞে, যিনি শুয়ে আছেন ছাতে, তিনি যে ব্যাটা ছেলে নন, সেটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার ডাক শুনতে পেলাম।"

"ঢের হয়েছে, এবার নীচে যান।"

তারক গজরাতে গজরাতে গেল। "পয়সা নিয়ে যা খেতে দেন তাতে পেট ভরে না। বিনি পয়সায় যে একটু হাওয়া খাব তারও জো রাখবেন না আপনারা। কেন একটা মেয়েছেলেকে শুতে দিয়েছেন খোলা ছাতে? কাজটা কি ভাল হয়েছে আপনাদের?"

এই তারক লোকটিকে নিরঞ্জন একেবারে দেখতে পারে না, অথচ তাকে হোটেল ছেড়ে চলে যেতে বলবারও কোনও কথা উঠতে পারে না, কারণ, সে এই হোটেলে রয়েছেও বহুকাল আর হোটেলের কাছে কোনো দিন এক পয়সা ধারও সে রাখে না। বরঞ্চ অন্য বোর্ডারদের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায়ের ব্যাপারে

নক্ষত্রকে সে সাহায্য করে। দুষ্ট লোক কেউ এসে বোর্ডার হয়ে ঢুকলে তাকে কি করে তাড়ানো যায় সে বিষয়েও তারকই উদ্যোগী হয় সকলের আগে।

বয়স কম, মানুষটাও সৌখীন একটু, সাজগোজও সেইরকম করে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সি করে হোটেলে ফেরে। অথচ কি যে সে করে, টাকাকড়ি কোথায় যে সে পায় তা কেউ জানে না।

পরদিন সকাল হতেই একতলার সিঁড়ির পাশের ছোট ঘ টার থেকে ভাঙ্গা চেয়ার, ফুটোফাটা এলুমিনিয়মর হাড়ি ডেকচি, ছেঁড়া চটিজুতো, ঠ্যাং ভাঙ্গা বঁটি, ক্যাম্বিসের তোবড়ানো সুটকেস, ভাঙ্গা কুলো, পুরণো ক্যালেণ্ডার, পোঁটলা বাঁধা পচা তুলো, বহুকাল আগেকার কতগুলি হিসেবের খাতা, এই ধরণের জঞ্জাল সব সরানো হচ্ছে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে নিরঞ্জন।

মা আর ছেলে দুজনেরই নির্ম্মলাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছে, তাদের যা সামাজিক পরিবেশ তাতে এরকমের মেয়ে খুব বেশী ত তারা দেখতে পায় না? দুজনাতে মিলে পরামর্শ করে ঠিক হয়েছে, আজ রাত থেকে নির্ম্মলা এই ঘরে শোবে, আর ঘরটাকে এরপর মেয়ে-বোর্ডারদের জন্যেই আলাদা করে রাখা হবে।

শৈলবালা কথাটা বলেওছেন নির্ম্মলাকে ডেকে। সেইসঙ্গে এও বলেছেন, "তোমরা কাজ খোঁজ। যতদিন না পাচ্ছ, এখানেই থাকবে। জগন্নাথ ছাতে শোবে, বিষ্টি-টিষ্টি হলে মাদুর বালিশ নিয়ে চিলেকোঠায় ঢুকবে। একটা লোকের শোবার জায়গা সেখানে ত আছেই?"

নিরঞ্জন মাকে প্রায়ই শোনাত, সে যদি বিয়ে কখনও করে ত বৌ নিয়ে ফরডাইস লেনের বাড়ীতে এসে উঠবে না। এখন তার মনে হচ্ছে, বাড়ীটা এমনই কি খারাপ? তবে কিনা, বৌ নিয়ে এখানে থাকতে হলে তারকের মত লোকদের ধারে কাছে থাকতে দেওয়া চলবে না।

এ বাড়ীতে বৌ নিয়ে যদি থাকতেই হয় তাকে, ত এই ঘরটাতেই থাকবে সে।

যেন বৌ এসেছে, এঘরটাতেই বৌকে নিয়ে সে থাকবে, এই রকম করেই সেদিন বিকেল হবার আগে ঘরটাকে সাজিয়ে দিল সে। মাকে সে বলল, "কাজটা সেরে রাখছি; একটা কাজ দুবার করে কেন করব?"

মা একটু হেসে বললেন, "ঠিকই ত করছ। সত্যি বাপের উপযুক্ত ছেলে। অপচয় সইতে পার না।"

এল ছত্রিওয়ালা মজবুত একটা তক্তপোশ, সে কাঠের তৈরি; এল কাঠেরই তৈরি কোলাপ্‌সিবল অর্থাৎ টেনে লম্বাও করা যায়, আবার গুটিয়েও নেওয়া যায় এইরকম, একটা দেয়াল আলনা আর এক দেরাজ-ওয়ালা ছোট একটা টেবিল। টেবিলের দেরাজ, নিজের ভাবী বৌটির কথা ভেবেই নিজের দোকান থেকে এনে ছোট একটা আয়না, একটি চিরুণি, কিছু চুলের ফিতে আর কাঁটা, একশিশি সুগন্ধি তেল, আর গায়ে মাখা বিলিতি সাবান একটা রেখে দিল নিরঞ্জন। ফুলকাটা-ওয়ালা ছিটের পরদা ঝুলল ঘরটার দরজা আর জানালা দুটোয়। প্রসাধনের জিনিষগুলি নির্ম্মলা অবশ্য ছোঁয়নি কোনোদিন।

নক্ষত্র শাহু এসে দেখে বললেন, "খুব ভাল হয়েছে, ঘরটাকে চেনাই যাচ্ছে না একেবারে।...আচ্ছা, এঘরের সীট-রেণ্টটা অবিশ্যি ত বেশী করবে?"

নিরঞ্জন বলল, "তা কেন করব? মেয়েদের জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা ত রাখতেই হবে, তা না হলে তারা আসবে কেন এখানে?"

বারো

সে রাত্তিরে সিঁড়ি নামতে নামতে তারক নিরঞ্জনকে বলেছিল, "পয়সা নিয়ে আপনারা যা খেতে দেন তাতে পেট ভরে না," কথাটা সে মিথ্যে বলেনি। প্রথম দিন থেকেই নির্ম্মলারা সেটা বুঝতে পারছে। পয়সা যা নেয় তার পক্ষে দেয় হয়ত কিছু কম নয়, কিন্তু যা দেয় তাতে পেট সত্যিই ভরে না।

বয়স কম বলে টাকাকড়ির প্রতি মমতা নিরঞ্জনের কিছু কম। বোর্ডারদের জন্যে একটু কিছু করতে পারলে সে করে, কিন্তু মা বাবার জন্যে পেরে ওঠে না। মাকে প্রায়ই শোনাচ্ছে, মেয়েটা নিরিমিষ খায়, রোজ দুবেলা তাকে ভুমি কলায়ের ডাল, পোস্ত চচ্চড়ি আর

কুমড়োর ছোঁকা নয়ত ডালের ধোঁকা খাওয়াচ্ছে, ও তোমাকে কি ভাবছে বল দেখি ?"

আমিষ যারা খায় তাদের অবস্থাও তথৈবচ। ছোঁকা বা ধোঁকার বদলে তাদের জোটে বাটি ভরতি ঝোল, আর সেই ঝোলে ডোবানো কড়া করে ভাজা এক টুকরো মাছ আর দুটুকরো আলু।

তারকের কিঞ্চিৎ নেশা করা অভ্যাস, তাই সে প্রায়ই একটু রাত করে ফেরে। খাবার ঘরে তার জন্যে ঢাকা দিয়ে রাখা ভাত খিতে খেতে সে হাঁক দেয়, "বৌঠান, আর দুটো আলু দিয়ে যান।" কোথায় বা আলু আর কোথায় বা তার বৌঠান! তারকের সেই ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে কেউ শোনেনি কোনদিন।

কিন্তু খাওয়ার কষ্টটাকে কোনদিনই কষ্ট বলে মনে হয় না নির্ম্মলার। যদি বা হত, জগন্নাথ কিছুতেই সে কষ্টটা তাকে ভোগ করতে দেয় না। কি রান্না হয়েছে দেখে ছুটে গিয়ে দোকান থেকে হয় এক খুরি চিনিপাতা দই, নয়ত গরম গরম তেলেভাজা কিছু কিনে নিয়ে আসে তার জন্যে। পেটে খিদে রেখে পাত ছেড়ে তাকে উঠতে হয় না।

নিজের জন্যে আনে না কিছু। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে, মাছটা যতই ছোট হোক শৈল বৌঠানের রান্নার গুণে ঝোলটা খেতে নাকি হয় অপূর্ব্ব। আর একথালা ভাত শুধু তাইতেই উঠে যায় স্বচ্ছন্দে। বলে, "তুমি ত খাবে না মাসী; যদি খেতে ত বুঝতে। ও রকম মাছের ঝোলে মাছটা না থাকলেও এসে যায় না কিছু।" কিন্তু মাছটা থাকে, আর সেটাকে এত কড়া করে ভাজবার উদ্দেশ্যটাও কিছু খারাপ নয়; একটু সস্তায় কেনা নরম মাছের উগ্র আঁশটে গন্ধটা তাতে কেটে যায়।

নক্ষত্র শাহুর পক্ষে নিয়ে বলা যেতে পারে, যে, তিনি বোর্ডারদের যা খেতে দেন, পুত্রকলত্র নিয়ে নিজেও তাই খান। একটুও ইতর বিশেষ হয় না সেখানে।

এর মধ্যে একদিন ফরডাইস লেনের কাছেই বৌবাজারের একটা বড় গয়নার দোকানে জগন্নাথকে সঙ্গে করে নিয়ে তার বিছে হার, চুড়ি ক'গাছা, দুটি দুল ও সুরবালার দেওয়া মকরমুখো ডায়মনকাটা বালা জোড়া নির্ম্মলা বেচে দিয়ে এসেছে।

যা পেয়েছে তাতে হয়ত বছর দুই তার চলে যাবে। কিন্তু তারপর? এই তারপরটা একদিন না একদিন ত আসবেই? তখন কি হবে তার?

সকালে উঠে চটাওঠা কলাই করা পেয়ালায় খানিকটা কালচে রঙের গরম চা আর দুটো টোষ্ট খেয়ে বেরিয়ে যায় জগন্নাথ। দুপুরে এসে নীচের কলতলায় বড় চৌবাচ্চাটার ধারে ধারে রাখা গুটিআষ্টেক মগের একটা নিয়ে বেশ কয়েক মগ জল গায়ে মাথায় ঢেলে স্নান করে সে। তারপর নির্ম্মলার খাওয়ার তদারক করে নিজে ভাত খেয়েই আবার বেরিয়ে যায়। কোন কোন দিন বেশ রাত করে ফেরে।

দিন এবং রাত্রির বেশীর ভাগ সময়টা একলাই থাকে নির্ম্মলা। দিনের বেলা শৈলবালার কাজে নানারকম সাহায্য করে সে। খতিয়ে দেখলে হয়ত দেখা যাবে যে, রান্নাবাড়ার কাজের বেশীর ভাগটা নির্ম্মলাই করে এক-একদিন। কাজ ভালবাসে বলেই এটা করছে সে, যদিও শৈলবালাকেও তার ভাল লেগে গিয়েছে খুব। তাঁর মেহনত একটু যে কমিয়ে দিতে পারছে সে, এতে সে খুশীই হচ্ছে। শৈলবালা অবশ্য তার কাছ থেকে কাজ নিতে আপত্তি করছেন বিধিমত।

রাত হলেই কিন্তু নানারকমের দুর্ভাবনার ভার তার মাথায় চাপে। সে এখন দেখছে যে, জগন্নাথ ফিরতে যদি বেশী রাত করে ত তা নিয়েও তার দুর্ভাবনা হয়। কেন দুর্ভাবনা? হয়ত জগন্নাথ আর ফিরে আসবে না। বেশ ত, না হয় আর আসবেই না। জীবনের পথে একলা চলবে ভেবেই ত সে পথে বেরিয়েছে? একলাই সে চলবে।

কিন্তু যত রাতই হোক, জগন্নাথ হোটেলে ফিরে আসেই। আর রোজ সকালে কিছুক্ষণের জন্যে তার সঙ্গে দেখাও হয় নির্ম্মলার।

কাজের জোগাড় কতদিনে হওয়া সম্ভব জানতে চাইলে সুন্দর মুখটি ঝকঝকে হাসিতে ভরে জগন্নাথ বলে,

"হবে, হবে, সময়ে সব হবে; তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মাসী?"

নির্মলা একদিন বলল, "আচ্ছা, আমার জন্যে কি রকমের কাজ খুঁজছ তুমি?"

জগন্নাথ বলল, "যাদের কাছে কাজ তুমি করতে পারবে সেই রকম লোক খুঁজছি। একবার কাজ করতে গিয়ে ত দেখলে?"

আর একদিন নির্মলা বলল, "আচ্ছা আমি যদি বাড়ী বসে আমলকি, বেল, সেতুরের মোরব্বা, আমের আচার, কুলের আচার, তেঁতুলের আচার, পেয়ারার জেলী, এইসব বানাই, আর তুমি বাড়ী বাড়ী ঘুরে তা বিক্রি কর ত কেমন হয়? এটা করা যায় না?"

নির্মলার খুব আশা ছিল, জগন্নাথ উৎসাহ সহকারেই রাজী হবে, কিন্তু সে বলল, "পাগল! ওতে দুটো লোকের পেট চলতে পারে কখনও? তার উপর আমি পেটুক মানুষ, খেতে পাই না ভাল করে; তোমার আচার মোরব্বাগুলো বেচতে নিয়ে বেরিয়ে কোথাও বসে হয়ত নিজেই খেয়ে রাখব।"

দুজনে হাসল একটু, তারপর জগন্নাথ বেরিয়ে গেল, রোজ যেমন যায়।

অঙ্কু-শঙ্কুর কথা, দাদার কথা, বাবার কথা সারাক্ষণই যে আজকাল ভাবে নির্মলা তা নয়। বেঁচে থাকার সমস্যাগুলি অন্য সব চিন্তাকেই দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু প্রায়ই স্বপ্ন দেখে তাদের। আটপাড়ার বন্ধুগুলির স্বপ্ন বোধহয় বেশী দেখে। একদিন ঘুমটা ভাঙার আগে স্পষ্ট শুনল, নন্দরাণী খুব হাসতে হাসতে আর হাততালি দিতে দিতে ছড়া বলছে,—

বেশ গো দিদি, বাতাসা,
আন্নি চিরা গুইলা খা,
ছিনাই দিয়া তুইলা খা,
বেশ, বেশ, বেশ।......

নন্দরাণীর বাপের বাড়ীর দেশের ছড়া।

এরপর আর ঘুম হল না, কাঁদল।

কোনদিন বা দেখে খড়িমাটি দিয়ে মেজেতে ঘর এঁকে সখীদের সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলছে। কিংবা দেখে, পাঁ[illegible] বাড়ি, যাকে এরা বলে শলা, হাতে নিয়ে একদল রাখা[illegible] ছেলে এসেছে, এবং উঠোনের একটা জায়গায় পাচনব[illegible] ঠুকে ঠুকে ঘুরছে আর গাইছে,—

এই বাড়ীত আইলাম রে
শইলা নলের বেড়া।
পাঠা বলি দেয় রে
দয়-দক্ষিণ পাড়া।......

একটা সিকি বা এক খুঁচি ধান না নিয়ে তারা য[illegible] না। যথেষ্ট টাকা আর ধান জমলে গাঁয়ের সব রাখা[illegible] মিলে বনভাত খাবে, অর্থাৎ চড়িভাতি করবে। যখন দেখে, এই সবই দেখে।

ঘুমটা ভেঙে গেলে জেগে জেগেই সে স্বপ্ন দে[illegible] চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে সে আটপাড়াতেই রয়ে[illegible] তার একদিকে অঙ্কু আর একদিকে শঙ্কু ঘুমোচ্ছে, বাড়ালেই তাদের সে ছুঁতে পারে, সেটা করছে না [illegible] জেগে যাবে বলে।

সেদিন রবিবার। হোটেলে অন্যদিন না খাওয়া[illegible] রবিবার দিনটায় তার উপর খেতে পাওয়া যায় খানি[illegible] লাল শাক ভাজা, বেগুন বা পটল ভাজা, মাছের [illegible] ঝাল, আর কামরাঙ্গা বা চালতের অম্বল। [illegible] যেমনই শোনাক, বেশ সুস্বাদু হয় খাবারগুলো। [illegible] শাকভাজা হয় সেদিন তার সঙ্গে নিজের তৈরি কা[illegible] একটু করে দিয়ে দেন শৈল বৌঠান। ঝোলের মাছটাকেও বেশি খোঁজাখুঁজি না করেই পাওয়া সেদিন।

খাওয়াদাওয়ার পর, মোড়ের দোকানে পান গিয়ে জগন্নাথ দেখল, তারকও পান খেতে [illegible] সেখানে। জগন্নাথের আপত্তি অগ্রাহ্য করে দু[illegible] পান তাকে কিনে খাওয়াল তারক, তারপর কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল, "এখনো ছাতে শু[illegible] মুখের পানটাকে একটা গালের মধ্যে একটু ক[illegible] এনে জগন্নাথ বলল, "হ্যাঁ।"

পানের বোঁটার চুণটা জিভে ঠেকিয়ে তারক

"সেই মেয়েটি ত দেখছি এখন নীচের একটা ঘরে শুচ্ছে।"

"হ্যাঁ, কেন?"

"না, এমনি। সেদিন তুমি তার পাশে শুয়েছিলে কিনা, তাই ভাবছি ছাড়াছাড়িটা হ'ল কেন।"

"আমি ওঁর পাশে শুয়েছিলুম কেন বলছেন? শুয়েছিলুম চিলে কোঠার অন্য দিক্‌টায় যেখান থেকে ওঁকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না।"

"দেখবার বাসনা মনে জাগলে রুখবার ত কেউ ছিল না?"

"ওরকম ক'রে বলবেন না।"

হোটেলের দিকে যাচ্ছে তারা তখন। তারক বলল, "মেয়েটা কেউ হয় তোমার?"

জগন্নাথ বলল, "এক জায়গায় কাজ করতুম, আর ওকে আমি মাসী বলে ডাকি।"

"কি বলে ডাকো?" রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল তারক। "মাসী?" তারপর শব্দ ক'রে হেসে উঠল। বলল, "বাঃ, ওটা বেশ ভাল বুদ্ধি বের করেছ ত? মাসী বলে ডাকো! মাসী! হাঃ হাঃ হাঃ! একেবারে মালিনী মাসী, না কি বল? হাঃ হাঃ হাঃ! তা মালটি জুটিয়েছ বেশ ভালই, কিন্তু রাখতে পারবে কি শেষ পর্য্যন্ত?"

জগন্নাথও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বলল, "আপনি ভদ্রলোক, আমি যেমন আপনার সম্মান রেখে কথা কইছি, আপনিও তেমনি আমার সম্মান রেখে কথা কইবেন।"

তারক একমুখ পানের পিচ শব্দ ক'রে পথে ফেলে বলল, "কিছু অন্যায় বলেছি?"

পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে লোহার মত শক্ত সুগঠিত ডান হাতটা তারককে দেখাল জগন্নাথ। তারপর কনুই মুড়ে ফুলে-ওঠা পেশীর উপর তারকের একটা হাত টেনে এনে রেখে বলল, "অন্যায় বলেছেন কি না সেটা বুঝিয়ে দেব একটু?"

এর ফল হল ম্যাজিকের মত। জগন্নাথের হাতটা হাতে নিয়ে তাতে একটা চাপ দিয়ে তারক বলল, "ব্যস, এর উপর আর কথা নেই। তোমার মাসীকে নিয়ে কিছুই আর আমি বলব না কথা দিচ্ছি। চল, আজ তোমাকে নিয়ে বেড়াব, সিনেমা দেখাব, খাওয়াব। এই হোটেলে রবিবারে যে ফিষ্টি হয়, তাও যদি দুবেলা খাও রোজ ত মাসকেলের ঐ চেহারা থাকবে না বেশীদিন।"

একটু বেলাবেলি তারকের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে একটা সিনেমা দেখল জগন্নাথ। তারপর একটা মদের দোকানে ঢুকে তারক মদ খেল। অনেক চেষ্টা করেও জগন্নাথকে খাওয়াতে পারল না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে একটা পাঞ্জাবী হোটেলে ঢুকল দুজনে।

দু প্লেট মুর্গ মসল্লম্ নিয়ে তন্দুরী রুটি দিয়ে খেতে খেতে দুজনে অনেক কাজের কথা বলল তারা।

তারক বলল, "শুনলাম কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছ?"

জগন্নাথ বলল, "ঠিকই শুনেছেন।"

"কি কাজ জানো?"

"ক্লিনার ড্রাইভারের কাজ করেছি।"

"ড্রাইভারের লাইসেন্স আছে তোমার?"

"আছে।"

"কতদিনের লাইসেন্স?"

"তা প্রায় বছর চারেকের। বয়সটা একটু বাড়িয়ে লিখেছিলুম কিনা।"

"এখন ঠিক বয়সটা বলতে ত আর বাধা নেই? ড্রাইভারি করবে?"

"না। এখুনি ত নয়ই। গাড়ি চালাতে ত শিখিনি। গারাজে তুলতুম, বের করতুম, এই পর্য্যন্ত।"

"ভাল ক'রে শিখে নিতে কতদিন লাগবে?"

"তা, কম ক'রেও ছ'মাস ত বটেই।"

"এই ছ'মাস কি করে চলবে তোমার?"

"কোথাও গাড়ি ধোবার কাজ নেব আর ড্রাইভারকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে সেই গাড়িটা নিয়ে মাঝে মাঝে একটা চক্কর দেব। চারপাঁচটা গাড়ি ধোবার কাজ যদি জোগাড় হয় ত গাড়ি চালানো শেখার সুবিধেও বাড়বে।"

"তাতে রোজগার ক'পয়সা হবে, আর অতগুলো কাজ পাবেই যে তার স্থিরতা কি ?"

জগন্নাথ চুপ করে রইল।

তারক বলল, "শোন তোমাকে আমি একটা কাজ দিতে পারি, যদি কর।"

জগন্নাথ বলল, "কি কাজ ?"

তারক বুঝিয়ে বলল তাকে।

মদের দোকানগুলিকে গোড়ার রাত্তিরেই এক সময় বন্ধ ক'রে দিতে হয়, পুলিশী নিয়ম। কিন্তু মদের চাহিদা তার পরেও অনেক রাত অবধি থাকে। সেই সময় লুকিয়ে মদ বিক্রী করতে পারলে ন্যায্য দামের চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া যায়। এটা এমন এক ব্যবসা যার মার নেই।

জগন্নাথ বলল, "মদ পাব কোথায় যে বেচব ?"

দু প্লেট রসগোল্লা অর্ডার দিয়ে তারক বলল, "তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। মালটা কিনে নিয়ে পাড়ারই একজন লোকের বাড়ীতে রাখবে, সে আমার চেনা লোক। তোমার যদি টাকায় চার আনা লাভ থাকে ত, তার এক আনা তাকে দেবে। সে-সব ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা ত চাই, তা না হলে রোজগারটা হবে কি দিয়ে ?"

জগন্নাথ বলল, "পঞ্চাশটা টাকার জন্যে আটকাবে না।"

তারক বলল, "অবিশ্যি টাকাটা খুব বড় কথা নয় এ জায়গায়। ও পাড়ার যে লোকটির সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে দেব, সে পানের দোকান ক'রে টালিগঞ্জে চারতলা বাড়ী করেছে, মাসে পাঁচশ টাকা ভাড়া পায়। কথাটা কি জানো ? কাজটা যে করবে সেই মানুষটাই আসল। এখন দেখ ভেবে করবে কি না কাজটা।"

জগন্নাথ বলল, "আমাকে ঠিক কি করতে হবে একটু বলে দিন।"

তারক বলল "বিশেষ কিছুই করতে হবে না। দোকান বন্ধ হয়ে যাবার পর কাছাকাছি ঘুরবে। খদ্দের জোগাড় করে আনতে হবে না, মদের গন্ধে গন্ধে তারা নিজে থেকেই এসে জুটবে। তোমাকে একটু বুদ্ধি খরচ করে বুঝতে হবে কারা মদের খোঁজে এসেছে। ব্যস। দেখবে, যারা বেচছে, ওদের চেয়ে যারা কিনছে তাদেরই গরজ বেশী।"

জগন্নাথ রাজী হয়ে গেল। এতদিন খোরাঘুরি করে যে দুটি কাজের খোঁজ সে পেয়েছিল, তার যে কোন একটা নিলে একটা মানুষের চলে যেতে পারত। কিন্তু মাসী ? মাসীর কথাটা ত ভাবতে হবে ?

তারক বলল, "তোমার রোজগার থেকে রোজ এক পাঁইট বাংলার দাম আমাকে তুমি দেবে। ওটা তোমার গায়ে লাগবে না, ভয় নেই।"

দুটো গাড়ি ধোওয়া-মোছার কাজ করত সেই সঙ্গে সুবীর ও প্রবীরের খবরদারি করত, খুচরো নানারকম মেরামতির কাজও করত মাঝে মাঝে, তাই অন্য সাধারণ চাকরদের দুগুণের চেয়েও বেশী মাইনে সে পেত। জমিদার-বাড়ীতে বিছানা বালিশ, কাপড়চোপড়, ধোপা-নাপিতের খরচ, এমন কি তেল সাবান পান তামাকের খরচও অন্য ঝি চাকরদের মত তার লাগত না। তাই তার মাইনের বেশীর ভাগটাই পোষ্টাফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমত তার। এইরকম ক'রে প্রায় শ' পাঁচেক টাকার মত জমেছিল। পঞ্চাশ টাকা পুঁজি নিয়ে পরদিন থেকেই শুঁড়িখানার কাজটা শুরু করে দিল জগন্নাথ।

ক'দিন যেতেই দেখল, চার আনার এক আনা পাড়ার সে লোকটিকে দিয়ে, আর তারকের পাওনা বাংলা মদের একটি পাঁইটের দাম রেখেও কাজটাতে রোজগার তার বেশ ভালই হচ্ছে। টাকায় তিন আনা ত সে পায়ই, কখনো কখনো, বিশেষতঃ রাত একটু বেশী হলে, পাঁচ আনা পর্য্যন্ত থাকে তার। এর উপর দরাজ মনের মদ্যপায়ীদের শুভাগমন হলে ত কথাই নেই। একটা প্লিমাথ গাড়ি চ'ড়ে ঠিক সাহেবের মত দেখতে অল্পবয়সী এক বাঙালী ভদ্রলোক এসেছিলেন দুটি বন্ধু সঙ্গে ক'রে। বত্রিশ টাকার মদ কিনে চারখানা কড়কড়ে দশ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে যাবার সময় ইংরেজীতে বলেছিলেন, keep the change, ভাঙানিটা

তুমি নিয়ে নাও। কাজটা যদি চালিয়ে যেতে পারে ত তার মাসী পায়ের উপর পা তুলে বসে খেতে পারবে।

তারক জগন্নাথকে কথা দিয়েছিল, তার মাসী সম্বন্ধে কিছু সে আর বলবে না; কথাটা সে রেখেছে। নির্মলার নামোল্লেখ সে আর কোনোদিন করেনি। কিন্তু যখনই জগন্নাথকে আর নির্মলাকে একসঙ্গে দেখে, "আচ্ছা, জগন্নাথ,"—ব'লে সে সেখানে এসে জোটে; তারকের কাছে এতই কৃতজ্ঞ জগন্নাথ, যে এ বিষয়ে তাকে কিছু বলে না। "আচ্ছা মাসী, পরে কথা হবে" বলে তারককে নিয়ে সে চ'লে যায় সেখান থেকে।

নির্মলার সঙ্গে দুটো একটার বেশী কথা হওয়াই দুষ্কর হয়ে উঠেছে তার।

জগন্নাথ যখন হোটেলে থাকে না, সেই সময়টা একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে নির্মলাকে দেখতে চেষ্টা করে তারক। নির্মলার সঙ্গে চোখাচোখি হলে হাসে মিষ্টি করে। পাছে একটা মারপিট বেধে গিয়ে লোক জানাজানি হয়, এই ভয়ে কথাটা জগন্নাথকে বলে না নির্মলা।

কিন্তু নিরঞ্জন এখন মধ্যে মধ্যে বেখবর বাড়ীতে এসে হাজির হয়। নক্ষত্রকে বলে আসে, পেটটা একটু গোলমাল করছে বাবা কিছুদিন থেকে। তারপর যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, তারককে চোখে চোখে রাখে।

খাবার ঘর ও কলতলায় বাড়ীটার দুদিক্ দিয়েই যাওয়া যায়। নির্মলার ঘরটা যেদিকটায় সেদিকে রাস্তাটা অত্যন্ত সরু। বিশেষ কারণ ছাড়া সেদিকে যাওয়া আসা প্রায় কেউই করে না। মাঝে মাঝে শোনা যায় নিরঞ্জন বলছে, "এদিকে কি? এদিকে কেন? আটকে যাবেন যে, ও তারকবাবু! দুটো দেয়ালের মধ্যে আটকে যাবেন। এদিক্ দিয়ে ঘুরে যান।"

সেদিন মহানবমী। পুজোর এই ক'দিন নির্মলা একবারও ঠাকুর দেখতে বেরোয়নি। জগন্নাথ অনেক ক'রে বলেছে, "চল না মাসী, এই দু-আড়াই মাইলের মধ্যে অন্ততঃ চোদ্দ পনেরোটি পুজো হচ্ছে। তুমি না হয় বেশীদূর যেও না, খুব কাছাকাছি যে তিনচারটি ঠাকুর আছে তাই দেখে চলে এস।" শৈল বৌঠান বলেছেন একাধিকবার। নির্মলা যাবে না, তার ভাল লাগে না।

শৈল বৌঠানের একবার মনে হয়েছে, কি রে বাবা! কেরেস্তান নয় ত?

সেদিন সন্ধ্যায় হোটেলে কেউ থাকবে না, ফিরতেও একটু রাত হবে সকলের, রাত্রির আহারের ব্যবস্থা সব শেষ করে চাকরদুটি ছুটি নিয়েছে। জগন্নাথও কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। এমন অবস্থায় নির্মলা একলা থাকবেই বা কি করে? কাজেই নিরুপায় হয়ে আজ সে শৈল বৌঠানের সঙ্গে বেরোতে রাজী হয়েছে।

বিকেলে নির্মলাকে বসিয়ে চুল বেঁধে দিলেন শৈল বৌঠান, তার কপালে পরিয়ে দিলেন খয়েরের টিপ, তারপর তাঁরই একখানা পেঁয়াজী রঙের শাড়ী পরে ও কপালের আধখানা ঘোমটায় ঢেকে নির্মলা যখন ফিরে এল তাঁর কাছে, তিনি বললেন, "ও মা, মা! ঘোমটা দিয়ে কি মিষ্টি দেখাচ্ছে তোমাকে! ওগো, কোথায় আছ, একবার এসে দেখে যাও।"

নক্ষত্র সাড়া দেবার আগেই, পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে নিরঞ্জন বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখল নির্মলাকে। নির্মলা ভাবছে, মানুষ ভাবে এক, হয় আর; কি ভেবে ঘোমটা দিলাম আর তার ফল কি হল দেখ!

ফিরতে রাত হল বেশ। জগন্নাথ তখনও ফেরেনি, তার আজ ফলাও কারবার।

কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে নিয়ে নির্মলা ঢুকেছিল একতলার স্নানের ছোট ঘরটায়; অন্ধকার পথটা দিয়ে টলতে টলতে এসে সেই ঘরের জানালার বহু প্রাচীন খড়খড়ির একটা ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়াল তারক। নেশাটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল তার সেদিন। অবশ্য আরও বেশী হত বছরকার এই দিনে, যদি হোটেলে ফিরে আসবার জন্যে তার মনটা হঠাৎ এত চঞ্চল না হয়ে উঠত। দৃষ্টির সম্মুখে তার ঈপ্সিত সৌন্দর্য্য-লোক ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, নিঃশ্বাস ঘনঘন বইছে তার, এমন সময়ে তার চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে তার একটা

কানের উপর প্রচণ্ড এক ঘুঁষি যে লাগাল, সে জগন্নাথ নয়, নিরঞ্জন।

তারক একটুও প্রতিবাদ করল না। এক হাতে কানটা চেপে "সরি" বলে সে চলে গেল উপরে। ব্যাপারটা নিরঞ্জন আর তারক ছাড়া জানল না আর কেউ।

রাত্তিরে শুতে যাবার আগে শৈলবালার কাছে এসে একবার দাঁড়াল নিরঞ্জন, বলল, "মা।"

শৈলবালা বললেন, "কি রে?"

"নাঃ, কিছু না মা," বলে শুতে চলে গেল নিরঞ্জন।

পরদিন ভোরে উঠেই জগন্নাথকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে শৈলবালা বললেন, "মেয়েটিকে আমাদের বড্ড ভাল লেগে গিয়েছে। ওরা কি জাত, ও কাদের মেয়ে কিছু কি জানো তুমি?"

"উনি বলেন ওঁরা কায়েত, এছাড়া আর কিছু জানি না বৌঠান। সৎমা বুড়ো বর ধরে বিয়ে দিচ্ছিল বলে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। পাছে কেউ তাদের খবর দেয় আর তারা এসে জোর করে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়, এই ভয়ে নিজের পরিচয় দিতে পারেন না কারুকে।"

দুপুরে নিরঞ্জন খেতে এলে তাকে বলতে সে বলল, "আমরা কোথাকার নৈকিষ্যি কুলীন ব্রাহ্মণ এসেছি যে, মেয়ের বংশলতিকা না দেখে একটা বিয়েও করতে পারব না? মেয়েটির কাছে তুমি কথাটা একটু পেড়ে দেখ না মা? ওকে দেখে বামুন-কায়েতের মেয়ে বলেই ত মনে হয়, তাই আমরা নীচু জাত বলে আপত্তি তার দিক্ থেকে থাকতে পারে।"

তারপরের রাত্রির কথা। খাওয়াদাওয়া করে এসে শুয়েছে নির্মলা, কিন্তু রোজ রাত্রিতে যেমন হয়, চট করে তার চোখে ঘুম আসছে না। ভাবছে, এই একটা কাজ জোটানোর ব্যাপারে আমি এত বেশী জগন্নাথের মুখ তাকিয়ে বসে আছি কেন? নিজের পায়ে দাঁড়াব, নিজের বেছে নেওয়া পথে চলব, এই সঙ্কল্প নিয়েই ত পথে বেরিয়েছিলাম? আর একটা লোক এসে সঙ্গে জুটবে এমন কোন কথা ত তখন ছিল না? আজ তবে কেন সব বিষয়ে ঐ ছেলেটার উপর এত বেশী নির্ভর করে চলেছি?

এই ত রাত প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। মহা-নবমীর রাত্রিতে, বিজয়া দশমীর রাত্রিতেও এর আগেই জগন্নাথ হোটেলে ফিরে এসেছে, আজ আসেনি। নির্মলাকে না বলে তাকে ফেলে সে চলে যাবে না, নির্মলা সেটা জানে। কিন্তু শেয়ালদার কাছে এদিক্‌টায় গাড়ীঘোড়ার যা ভিড়,—কিন্তু না, এসব ভাবনা সে ভাবছেই বা কেন? তার একমাত্র ভাবনা এখন হওয়া উচিত, তার মত বয়সের একজন মেয়ের পক্ষে জীবনের পথে একলা চলা একেবারেই অসম্ভব কি না। যে কোন কারণেই হোক, ভগবান্ করুন তার বিপদাপদ্ কিছু না হোক,—জগন্নাথ যদি আর না-ই ফিরে আসে, নির্মলার বিপদের কি শেষ থাকবে না? তাই কি জগন্নাথের দেরি দেখে এত বেশী অস্থির হচ্ছে সে, মনে মনে চাইছে সে ফিরে আসুক?

রাত সওয়া একটা বাজিয়ে জগন্নাথ ফিরল। শৈল বৌঠান জেগে ছিলেন, একতলায় তাঁর শোবার ঘরের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বললেন, "এত রাত অবধি কি করছিলে জগন্নাথ, কোথায় ছিলে?"

জগন্নাথ বলল, "কাজের খোঁজে ঘুরছিলুম বৌঠান।"

শৈলবালা বললেন, "তোমার কাজের বাজার দেখি অনেক রাত অবধি খোলা থাকে? কি ধরণের কাজ? নিজে এখানে অনেক দিন কাজ করেছ বলে তুমি বেশ ভাল করেই জানো, চাকরদের আমি সাড়ে এগারোটার মধ্যে ছুটি দিই। তা জেনেও এত রাত করে এসেছ। আমার এখানে এসব চলবে না, বলে দিচ্ছি।"

ভিতর থেকে নিদ্রাজড়িত স্বরে নক্ষত্র বললেন, "কি হয়েছে? কেন বকছ ওকে?"

শৈলবালা বললেন, "বকছি কি আর সাধে? একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসে কি রকম জোগাচ্ছে দেখ না।"

তার পরের দিন ভোর হতেই ছাত থেকে নেমে এসে নির্মলাকে বলল জগন্নাথ, "মাসী, চল।"

"কোথায় চলব?"

"একটা ঘর নিয়েছি।"

"একটা ঘর ভাড়া নেওয়া এমন আর কি শক্ত কাজ? যদি এসে বলতে কাজের জোগাড় হয়েছে তোমার বা আমার দুজনেরই, ত সত্যিই খুশী হতাম।"

জগন্নাথ বলল, "সে চেষ্টা হচ্ছে মাসী। ভাল জায়গা না হলে আমরা কাজ করব না ঠিক করেছি বলেই দেরি হচ্ছে। নয়ত কলকাতা শহরে কাজের ভাবনা?"

নির্মলা বলল, "সেই চেষ্টাটা এখানে থেকেই চলুক না? উঠবার যখন, একবারই উঠব।"

জগন্নাথ বলল, "খরচের কথাটা ভাবতে হবে ত

মাসী? এখানে আমাদের খরচ পড়ছে কত? মাসে প্রায় নব্বুই টাকা। আর নিজেরা ঘর নিয়ে থাকলে ষাট টাকার বেশী খরচ আমরা করেই উঠতে পারব না।"

নির্ম্মলা বলল, "আমি ত আর এখানে বরাবর থাকবার কথা বলছি না?"

আসলে নির্ম্মলা বুঝতে পারছে না, একটি অনাত্মীয় ছেলের সঙ্গে একলা এক বাড়ীতে বাস করার ব্যবস্থাটা কি রকমের হবে। লোকে কি চোখে দেখবে সেটাকে। অবশ্য লোক বলতে কার সঙ্গে কিই বা তার সম্পর্ক, আর যাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় তাদের অতশত ভাবলে চলে না। জগন্নাথ যে বাড়ীটা নিয়েছে, নাহয় কয়েকটা দিন সেখানে থেকে, একটা কাজ জুটবামাত্র চলে যাবে।

তবু এ নিয়ে দোনামনা কিছুটা তার রইলই। সেটা কেটে গেল যখন দুপুরে শৈলবালা তাকে নিয়ে খেতে বসে, নিরঞ্জনের কথাটা পাড়লেন। বললেন, "ছেলে ত তোমার নামে পাগল। সেদিন দেখলে না, ভিড়ের মধ্যে মা বুড়ী কোথায় প'ড়ে মরল তার খোঁজ নেই, সারাক্ষণ সে কেবল তোমাকেই আগলাচ্ছিল? বলেছে, তুমি কে, কি বৃত্তান্ত কিছুই সে জানতে চাইবে না, তুমি হাঁ বললেই তোমাকে বিয়ে করবে। আর ওকে খুব কাছে থেকেই তুমি দেখেছ ত? ওর কোন দোষ পেয়েছ স্বভাবের? অমন ছেলে আজকালকার বাঙালীর ঘরে খুব কমই জন্মায়।'

নির্ম্মলা বলল, "বিয়ে করার কথা আমি এখন একেবারেই ভাবছি না। আর তার অসুবিধাও গুটিকত এখন আছে।"

"কি অসুবিধা?"

"সে আপনার শুনে কাজ নেই।"

"আচ্ছা, বলব ছেলেকে। তারপর সে যা করে।"

সেদিনই যে তারা হোটেল ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, সে খবরটা একটু পরেই শৈলবালাকে ব'লে গেল নির্ম্মলা।

শৈলবালা বললেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

নির্ম্মলা বলল "দেখি, কোথায় যাই।"

তারপর যতক্ষণ তারা রইল হোটেলে, শৈলবালা তাদের সঙ্গে একটাও কথা বললেন না। নিরঞ্জন এক ফাঁকে এসে খবরটা শুনে সেই যে গেল, রাত দশটার আগে আর ফিরল না। জগন্নাথ যদিও ছাতে শুত, তবু তার কাছ থেকে সীট রেন্টটা নক্ষত্র শাহু পুরোই আদায় করে নিলেন। কিন্তু নির্ম্মলার বিলটা জগন্নাথের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে শৈলবালা নিজের কাছে রেখে দিলেন। কেবল বললেন, "তুমি যখন নিখরচায় এই হোটেলে থাকতে খেতে তখন যা কাজ করতে, নির্ম্মলা তার চেয়ে কিছু কি কম করেছে? ওর থাকা-খাওয়ার আবার বিল কি?"

ক্রমশঃ

ভয়

(গল্প)

সুধীরচন্দ্র রাহা

প্রায় সমস্ত রাত জেগে ভোর বেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মুরারীবাবু। জেগে থাকারই খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা শেষ পর্য্যন্ত পারেন নি। নিজের শরীরও ভাল নয়, মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে মাথা ধরে—একটু জরও যেন হয়। কিন্তু নিজের শরীরের দিকে আজ কদিন ধরে ভালরূপ লক্ষ্য করতে পারছিলেন না। সময়মত, ঠিক ঘড়ি ধরে খাওয়া, বেড়ান, ঔষধ খাওয়া, এগুলো কোনটাই আর পূবের নিয়মমত হচ্ছিলনা। মনে হয় তাই শরীরটা খারাপ হয়েছে।

স্ত্রীর অসুখ চলছিল কদিন থেকে। প্রথম প্রথম উনি বিশেষ গ্রাহ্যই করেন নি। জর গায়েই রান্নাবান্না করেছিলেন। মুরারীবাবুকে প্রথমটা জানতে দেননি। একমাত্র ঠিকে ঝি ভোর বেলায় আসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাসি কাপড় চোপড়, এঁটো বাসনকোশন ধুয়ে দিয়ে চলে যায়। আবার আসবে বিকেলে। সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী। একটি মাত্র মেয়ে শান্তি। তার বিয়ে হয়ে গেছে। নিজের ঘর-সংসার নিয়ে সে এখন নিজেই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শান্তির চিঠি আসে। ছোট খোকার দাঁত উঠেছে। বড়টি ক্লাস থ্রিতে পড়ে। ভারী দুষ্টু, দিনরাত খেলা করে বেড়ায়। কোন কথা শোনে না। এই সব কথায় ভরা থাকে চিঠিখানা। নাকের ডগায় ভাঙ্গা চশমাটা লাগিয়ে, মহামায়া মেয়ের চিঠি পড়েন। গোটাকতক কথা বার বার পড়েন। চিঠিখানা হাতে করে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকেন। ঐ একটি মাত্র মেয়ে। শান্তির পর আর একটি খোকা হয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন বাঁচেনি। আজ বেঁচে থাকলে কত বড় হত। অ্যাদ্দিন কলেজে পড়ত। এই শূন্য ঘর সে একাই পূর্ণ করে রাখত। তাঁর খোকা। মহামায়ার বুকখানা হু হু করে ওঠে। সেই কচি-বাচ্চাটির জন্য আবার নূতন করে শোক দেখা দেয়। দুর্জ্জয় শোক। কখন যে অজান্তে দুই চোখ অশ্রু পূর্ণ হয়েছে তাও আর জানতে পারেন না।

আজকাল মহামায়া প্রায়ই সেই হারানো ছেলেটির কথা ভাবেন। রাতে ঘুমুতে পারেন না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেন। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, ছেলেরা স্কুল কলেজে যাচ্ছে। মহামায়া দেখেন আর ভাবেন। তাঁর খোকা বেঁচে থাকলে আজ ঠিক অত বড়টাই হত। সেই বাচ্চা ছেলেটিকে যখন বুকে চেপে ধরে দুধ খাওয়াতেন তখন থেকেই কত স্বপ্নই না দেখতেন। খোকনের কি নাম হবে তাও ঠিক করে রেখেছিলেন। ছেলে তার বড় হবে, সাজিয়েগুজিয়ে স্কুলে পাঠাবেন। ছেলে সংসারের এটাসেটা জিনিষ ভাঙ্গবে চুরবে কিন্তু কিছুতেই বকবেন না। ঐ তো মাত্র একটি ছেলে। ছেলে জুতো পায়ে দিয়ে, হাফ্-প্যাণ্ট পরে, হাতে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাবে। তারপর স্কুলের পড়া শেষ হলে—কলেজে পড়বে। দুটো তিনটে পাস করলে, অনেক টাকার ভাল চাকরী করবে। তারপর হবে খোকনের বিয়ে। খুব ফরসা দেখে বৌ আনবেন। এমনি কত চিন্তা কত সুখ-স্বপ্নই না দেখেছিলেন মহামায়া। কিন্তু সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, বিধাতাই বাদ সাধলেন। কেবল খালি করে নিয়ে গেলেন তাকে। সেই চাঁদের মত ছেলে—তার সোনার খোকন কোলজোড়া মানিক এখন কোথায়—কোথায়? হঠাৎ মহামায়া হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে ছিলেন মহামায়া— একটুও ঘুম আসেনি। বার বার এপাশ ওপাশ করেছেন। মাঝরাতে—হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল মুরারীরবাবুর। এমনি তো ঘুম খুব পাতলা—তারওপর কদিন থেকে শরীর ভাল যাচ্ছেনা। মাথার কাছে লণ্ঠনটি কমান ছিল, হাত বাড়িয়ে উস্‌কে দিয়ে অবাক হলেন মুরারীবাবু। স্ত্রীকে বললেন এ কি ঘুমোওনি? জেগে বসে আছ কেন—মহামায়া কোন কথা বললেন না। মুরারীবাবু গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, গা বেশ গরম।

—একি জ্বর হয়েছে যে। গা যে পুড়ে যাচ্ছে—। সেই রাত থেকেই জ্বর বাড়তে লাগল। ঐ ভাবে সাতদিন কেটে গেল। ডাক্তার আসছে, ওষুধ চলছে। কিন্তু রোগের কোন উপশমের লক্ষণ নেই। মেয়েকে চিঠি দিয়েছেন। শান্তিরও এসে পড়ার কথা। কিন্তু দেখতে দেখতে— কদিন হয়ে গেল, শান্তি এখনও এসে পৌছালনা।

আজও ঠিক তাই। অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল মুরারী বাবুর। মহামায়া যেন কেমন করছেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মহামায়া আশে-পাশে যেন কি খুঁজছেন। দুহাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজছেন। কাকে যেন চান, কাকে যেন খোঁজেন। মুরারীবাবু বললেন, বল কি কষ্ট হচ্ছে, কাকে খুঁজছ—। মহামায়া অনেকক্ষণ মুরারীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বল্লেন, কষ্ট? তারপর একটু থেমে অস্বাভাবিক ভাবে হেঁসে বলেন কিসের কষ্ট? কিছুনা— শান্তি এলোনা আর দেখা হবেনা।

মুরারীবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, কি যে বল। ছিঃ ও কথা বলতে নেই। বল, কি কষ্ট হচ্ছে?

আবার হাসেন মহামায়া। এ হাসিটা যেন বড় অস্বা-ভাবিক। মহামায়ার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, মুরারীবাবুর যেন কিছু ভাল লাগেনা। ডাক্তার ডাকতে উঠবার উপক্রম করেন। কিন্তু মহামায়া মুরারীবাবুকে বারণ করেন—বলেন, না যেওনা—

রাত তখনও বেশ রয়েছে। ভোর হতে—অনেক দেরী। ঘরের ভেতর টিপ টিপ করে আলো জ্বলছিল। সেটাকে বাড়িয়ে দেন মুরারীবাবু। সকাল হলেই মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে না হয় ডাকবেন। তাঁর ভিজিট একটু বেশী। তা হোক, জীবনের কাছে তো টাকাটা বড় নয়। কি ভেবে, মুরারী বাবু বললেন, একটু জল খাবে? খাবে না। আচ্ছা একটু —চা খাও তবে। কেমন?

—চা। তা কর। তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু এইতো শেষ। আর তো খেতে আসছিনে। মুরারীবাবু ষ্টোভ জ্বালালেন। সোঁ সোঁ করে ষ্টোভ জ্বলে উঠল। জল চাপিয়ে. চা চিনি সব ঠিক করলেন। চা তৈরী করে নিজে নিলেন এক কাপ। আধ-কাপ চা দিলেন স্ত্রীকে। আস্তে আস্তে স্ত্রীকে বসিয়ে দিয়ে, হাতে দিলেন চায়ের কাপ। কিন্তু দু'এক ঢোক খেয়েই চা নামিয়ে রাখলেন মহামায়া।

—কি হ'ল খেলেনা—

—না। ভাল লাগছেনা—কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার দুই হাত বাড়িয়ে সারা বিছানায় কি যেন খুঁজতে সুরু করেন মহামায়া। —কি খুঁজছ। বল কি চাই—। এবার বেশ স্পষ্টকণ্ঠে বলেন মহামায়া।—বাঃ আমার খোকা কোথায় গেল। খোকা—আমার সোনার খোকন—অবাক হন মুরারীবাবু। তাঁর চোখের উপর থেকে একটা কালো ভারী পরদা যেন সরে গেল। তাঁর সেই ছেলে। ওঃ সে তো কত দিনের কথা। তার কথা মুরারীবাবু অনেক-দিন ভুলে ছিলেন। সেই মৃত বাচ্চাটির কথা তাঁর মনেই নেই। জলের বুদ্‌বুদের মত, দেখা দিয়ে আবার জলেই তো মিশে গেছে। মুরারীবাবু মনে মনে সেই শিশু-পুত্রের মুখখানি মনে আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুখখানিকে আর মনে করতে পারেন না। ঠিক কি রকম ছিল—তার চোখ, মুখ, নাক এ সব ভাবতে থাকেন। কিন্তু কিছু মনে হয় না। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই ছেলে। কোন চিহ্নই নেই। মুরারীবাবু এক মুখ বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান। মহামায়ার দুই চোখ বন্ধ। বোধ হয় ঘুম এসেছে। একবার খুব আস্তে করে ডাকলেন মুরারী বাবু। আবার ডাকলেন। মুরারীবাবু ভাবলেন, না— এখন আর বিরক্ত করবেন না, সকাল হোক ডাক্তার ডেকে আনতে হবে। তারপর কোন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। সদর দরজায় ঠিকে ঝি অনেকক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছে।

তাড়াতাড়ি করছে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মুরারী বাবু। অন্য সময়, ভোরবেলা মহামায়াই দরজা খোলেন, দরজায় জল দেন—নিজেহাতে সদর দরজায় ঝাঁট দিতেন। কিন্তু আজ আর তা হ'ল না। মুরারীবাবু দরজা খুলে দেন।

ঝি বলল, আজ দেরী হয়ে গেল বাবু। আরও দু বাড়ীর কাজ করতে হ'বে। গিন্নীমা কোথায়?

—সেই জন্যেই তো। অসুখ খুব– নড়বার ক্ষমতা নেই। এখন চা একটু খেয়েই মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে আনব। ঝি ঘরদোর ঝাঁট দিতে লাগল। উঠোনের একপাশে এঁটো বাসন জড় করল। এক সময় ঘরের ভেতর থেকে মুরারী বাবু আর্তনাদ করে উঠলেন। ঝি এঁটো হাতে ছুটে গেল—কি হল—কি হল—

মুরারীবাবু বললেন—হারাণের মা, সব শেষ—

—কি সব্যনাশ—গিন্নীমা মারা গেছেন! একি হল—

মহামায়া মারা গেছেন। চোখের কোণে জলের রেখা। হাত দুটো মুঠো করা। দুই চোখ বন্ধ। বোধ করি হারাণো খোকার জন্যে মরার অগেও কেঁদেছিলেন। মুরারীবাবু উঠে বসলেন। তাঁর নিজের শরীর খারাপ। এই আকস্মিক বিপদে, তিনি যেন এক মুহূর্তের মধ্যে আরও যেন বুড়ো হয়ে গেছেন।

পাড়ার ছেলেরাই এগিয়ে এল। হারাণের মা পাড়ার ছেলেদের খবর দিয়েছিল। তারা গামছা কোমরে বেঁধে এসে গেল। মহামায়ার সারা শরীর ধোয়া চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। পায়ে আলতা, মাথায় মোটা করে সিঁদুর দিল। ফুল দিয়ে ফের নূতন করে সাজিয়ে দিল মহামায়াকে। মহামায়ার নূতন জীবনের যাত্রাপথ যেন সুন্দর হয়, ফুলের মত সুষমামণ্ডিত হয় এই বুঝি ওদের মনোগত কামনা। প্রতিবেশিনীরা কেহ কেহ শোক করছিলেন।

—কই, মেয়ে তো আসেনি। তাদের খবর—দেওয়া উচিত।

—এই বুড়ো বয়সে দেখ কি গেরো। কে দেখে ভাত জল করে—সবই অদেষ্ট দিদি। বিধাতার লেখন কে খণ্ডাবে। আহা ভাগ্যিমান, সতীলক্ষ্মী ছিলেন গো। আমায় দিদি দিদি করে কত সুখ-দুঃখের গল্প করতেন—আহাঃ। প্রতিবেশিনী চোখ মুছলেন। মুরারীবাবু নির্ব্বাক! চুপ করে সব শুনতে লাগলেন। একসময় মৃতদেহ নিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলের দল। মুরারীবাবু দেয়াল ধরে, শেষবারের মত তাকিয়ে থাকলেন। শেষ দেখা দেখে নিলেন। মহামায়া চলে যাচ্ছেন। ঘর ছেড়ে উঠোন পেরিয়ে, খোলা দরজা দিয়ে চলে গেলেন মহামায়া। সংসার ঘর দোর,—এমনকি মুরারীবাবুকেও আর দেখলেন না। উঠোনের ওপর এঁটোবাসন ডাঁই হয়ে রয়েছে। এটা সেটা জিনিষপত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। দরজা খোলা—হাঁ হাঁ করছে। সেই শূন্য পুরীতে নিঃশব্দে, একজায়গায় স্থাণুর মত বসে থাকেন মুরারী বাবু। তাঁর উঠবার ক্ষমতা নেই।

অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। অনেক বেলা হয়েছে। সূর্য মাথার ওপর থেকে সরে গেছে।

মুরারীবাবু ভাবতে লাগলেন। শান্তি এখনও এলোনা কি হল আবার মেয়েটার। তার আসার সময় পেরিয়ে গেছে। হয়ত অসুখ বিসুখ। মুরারীবাবু অস্থির হ[য়ে] উঠেন। এতক্ষণ তাঁর মনে হল, এক কাপ চা হ'লে ভা[ল] হত। সমস্ত দিন খাওয়া নেই, শরীর আর মনের ওপর ব[ড়] ধকল যাচ্ছে। একটু হাত পা ছড়িয়ে শুলেও হত। মা[থা] যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা।

—বাবু—

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মুরারীবাবু। নিস্তব্ধ বাড়িটা যে[ন] প্রাণ ফিরে পেল। একটা মৃত্যু যেন সমস্ত প্রাণ-স্পন্দন[কে] কেড়ে নিয়ে গেছে। মুরারীবাবু ভাবতে লাগলেন অনে[ক] কথা। পুরাতন বহু স্মৃতি একসঙ্গে ভীড় করে এসে[ছে] সব।

—কে হারাণের মা? আগে উনুনটা জেলে, এ[ক]টু চায়ের জল বসাও। চা চিনি আন—আমিই চা ক[রে] নিই।

অনেকদিন পর মুরারীবাবু শুধু নিজের জন্যে নিজ হা[তে] চা করে নিলেন। ঠোঁটের কাছে চয়ের কাপ তুলে শূন্য ঘ[রের] দিকে তাকালেন। এই রোয়াক—এই ছোট্ট উ[ঠোন]

পেরিয়ে, খোলা দরজা দিয়ে মহামায়া চিরকালের মত চলে গেছেন। ঐ দরজা দিয়ে আর ঘরে ঢুকবেন না।

—বাবু—

—কি বলছ হারাণের মা ?

—আমি তবে যাই। সন্ধ্যে হয়ে গেল। কিন্তু—দিদি-মণি এলেন না। একটা খপর দিন। নইলে কে দেখবে শুনবে—

—দেব। দেব বই কি। কালই দেব—

—যাচ্ছি। সদর দরজা বন্ধ করুন। লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে, বন্ধ করে এলেন দরজা। আপনমনেই বললেন, দরজা বন্ধ করলাম। চিরকালের মতই দরজা বন্ধ করলাম। এ দরজা দিয়ে আর ফিরবেনা—আর ফিরবেনা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। চারদিকে অন্ধকার করে রাত নেমে আসছে। রোয়াক উঠোন ঘর সব আঁধারে ভরে গেছে। কোথাও আলো নেই। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থেমে গেলেন মুরারীবাবু। ঐ ঘরে ঢুকতে আর সাহস হচ্ছেনা। এতদিনের চেনা ঘর একনিমেষে যেন অচেনা হয়ে উঠেছে। ঘরের ভেতরে কি যেন ছিল—এখন আর নেই। তবুও কি যেন সারা ঘরে ভরে রয়েছে—। তাঁর সাহস নেই—সব সাহস কে যেন কেড়ে নিয়ে গেছে। সেই ঘরের সম্মুখে, অসহায়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মুরারীবাবু।

লেখক-পাঠক-ঘটক সংবাদ

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

ঘটক। ঘটক কথাটায় সকলেরই মায়া আছে।

কথাটা হঠাৎ শুনলে সবারিরই মনে হবে বর কনে প্রজাপতির নির্বন্ধ কুলকারিকা গোত্রপ্রবর পর্য্যায় মেল ইত্যাদি ঘটক-বিজ্ঞানের নানা পারিভাষিক শব্দসমন্বিত কুললতিকা বা তালিকার পুঁথি হাতে গলায় মোটা যজ্ঞ সূত্র খাটো ধরণের শুভ্রবস্ত্রপরিহিত পায়ে খড়ম বা তাল-তলার চটি পরা মানুষদের বা মানুষকে। যাঁরা এই সেদিনো লোকের কুলকারিকা শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। কুলীন অকুলীনদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন।

সবাই এসব তথ্য সেকালের দেবীবর আদি মহামহা ঘটকদের কথায় পড়েছেন। এবং এখনও কিছু ঘটক আছেন। তাঁদের কাজকর্ম প্রজাপতি-আপিসের ঠিকানায় খবর কাগজের রবিবারের পাতায় পাওয়া যাবে। এ সবই বিবাহের ব্যাপার।

এক কথায় এই ঘটক মানে তো একাল অবধি যিনি বিবাহ-ঘটনা ঘটাতে পারেন, অথবা বিবাহে অঘটনও ঘটাতে পারেন। ঘটনা সংঘটন করতে পারেন। পুরাণের হরণ করা বিয়েতেও গোপন ঘটক থাকতেন।

কিন্তু তাই বলে যেন কেউ মনে করবেন না যে শুধু বিয়ের ব্যাপারে প্রজাপতির নির্বন্ধেই ঘটকের মহিমা আছে, প্রয়োজন আছে। তা নয়, ঘটক পৃথিবীতে নানা সংজ্ঞা ও নামে বিরাজিত আছেন দেখা যাবে।

আগেই বলেছি তিনি ঘটনা ঘটাতে পারেন। এক কথায় দুপক্ষের মিলন-সংঘটক।

যে মিলন বিবাহ-জগৎ ছাড়া অন্য অন্য জায়গায় কম দরকারী নয়।

যেমন ধর্ম-কর্মে গুরু পুরোহিত। তীর্থ-ধর্মে পাণ্ডা পূজারী। দেশ ভ্রমণে সাথী গাইড। রাজনীতি জগতে দূত। অর্থাৎ শুভ বিবাহের ব্যাপারে যিনি শুভ মিলনের ঘটক, মন্দিরে দেবালয়ে দেবতার সঙ্গে মিলনের জায়গায় তাঁর সংজ্ঞা হল পুরোহিত। তাঁকে না পেলে আপনার পূজা দেবতার কাছে পৌছবে না। নৈবেদ্য সাজানো পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ কোশাকুশী শাঁখ ঘণ্টা বাজানো সব অসিদ্ধ হয়ে যাবে। দক্ষিণান্তও হবে না। 'সুফল' অর্থাৎ 'সফল' হবে না যতক্ষণ না ঐ খালি গা পৈতাপরা পুরোহিত তথা মধ্যস্থ মানুষটি পূজার মন্ত্র শুদ্ধ অশুদ্ধ যাই হোক উচ্চারণ করছেন।

অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী সমাজেও ঐ মধ্যস্থরা আছেন পীর পয়গম্বর নামে, (যীশু) ঈশ্বর পুত্র নামে, শিখ, ব্রাহ্ম ধর্মে গ্রন্থ সাহেব আচার্য্য নামে। তিনিই প্রধান উপাসক।

দীক্ষার জগতেও গুরু তেমনি আত্মজ্ঞানের তত্বের দিশারী। গুরুদীক্ষা না হলে বুদ্ধিমান লোকেরা বলেন, বীজ মন্ত্রনাম ছাড়া ইষ্টলাভ হবে না। মুক্তির পথ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে।

বিদ্যামন্দিরেও ঘটক আছেন। শিক্ষাগুরু। মাষ্টার মশাই। তাঁর নোট তাঁর পড়ানোর গুণে ছাত্ররা সিদ্ধকাম হয়। তাঁর নির্দেশিত নোটবই মুখস্থ করলে পাশজগতের কেল্লায় ঢুকে যায়। এঁরা হলেন সারস্বত পরিচয়ের ঘটক বা দূত।

তীর্থ-ভ্রমণে পাণ্ডারা। তিন চারশো বছর আগের কথা স্মরণ করুন। হাঁটা পথ নদী পথ গো যান, অশ্বযান, নৌ যানে চলেছেন। পাণ্ডা বা সেথো (সাথী) সঙ্গে নেই,বনের মধ্যে ঘুরবেন। ঠগী ঠ্যাঙাড়ের হাতে সবান্ধবে পড়বেন। পথ হারাবেন হাটেবাটে মাঠে। এখন ওসব না হোক পাণ্ডা ঠাকুর নাহলে তীর্থকৃত্য করতে পারবেন না। পাশ করার নোটের বইয়ের কুঞ্জিকার মত তীর্থের দেবতাদের অর্দ্ধেকের সন্ধান পাবেন না। কিংবদন্তী ইতিহাস জানতে পারবেন না।

নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় পাবেন না। পাণ্ডা চাইই।

গাইডও চাই। দিল্লী আগ্রার লাল কেল্লাই দেখুন আর তাজমহল ফতেপুরসিক্রিই দেখতে যান, হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষই দেখতে যান, কিংবা বিষ্ণুপুর বিক্রমপুর কোনারক বদরীকেদার দক্ষিণভারত যেখানেই যান পাণ্ডা ও গাইড চাইই। সে 'পথ নির্দেশক' 'দো ভাষী' সব।

রাজনীতিতে এঁরাই দূত নামে অভিহিত। দুদেশের মিলন বা বিচ্ছেদের মহারাজনীতির ঘটনায় এঁরা মহা ঘটক। যুদ্ধে সন্ধিতে এঁরা অপরিহার্য্য ঘটক।

স্বাধীন প্রেমের ক্ষেত্রে ও তাঁরা ঘটকিনী রূপে ছিলেন। 'দূতী'নামে দূত'নামে। তাঁদের পরাক্রমও প্রবল ছিল। রাধিকার অষ্টসখী ছিলেন।

বৃন্দা বিশাখা ললিতদের স্মরণ করুন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণ বিরহ মিলনের ঘটকিনী।

তাছাড়া আরও নানা শ্রেণীর অবাস্তব দূত ছিলেন যেমন মেঘদূতে 'মেঘ'। নলদময়ন্তী পরিণয়ে মানবেতর জীব হংসদূত। অশরীরি মেঘকে ঘটক বা দূত বানিয়ে কবি এক অমর বিরহের কাব্য লিখে ফেললেন। আরব্য উপন্যাসে মঙ্গল কাব্যেও এই 'ঘটকিনীর' অভাব নেই।

আরও ঘটক আছেন। এঁরা ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবাহ পাশ যেন পাণ্ডিত্য জগতের ঘটক নন। এরা নিতান্ত জাগতিক স্থূল জগতের ঘটনা ঘটান। ব্যাপারী। যাঁদের কেউ বলেন এজেন্ট। কেউ বলেন গ্রাম্য সংজ্ঞায় "দালাল"। সে যাই হোক এঁরা এই ঘটক বা মধ্যস্থ মানুষ ছাড়া সোনারূপা তেল পাট লোহা থেকে কালো সাদা শেয়ার মার্কেটের বাজার অন্ধকার হয়ে যাবে। এইসব জিনিসের প্রতিদিনের উত্থান-পতনের ইতিহাস এই মধ্যস্থ বা দালাল অথবা ঘটকমশাইদের নখদর্পণে। দেশবিদেশ কলকাতা বম্বে বিলেত নিউইয়র্কআদির তেজীমন্দী লেনদেনের লীলারও ঘটক এঁরা। আজকালের ছোট জিনিষ চাল ডাল চিঁড়ে চিনি শাক পাতা মাছ মাংস—এক কথায় অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য পরিকল্পনাও এঁদের ইঙ্গিতে অদৃশ্যভাবে অলৌকিক ও লৌকিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত। কখনও যুদ্ধের ভয়ে কখনও দুর্ভিক্ষের বিভীষিকায়—সবত্র এদের 'মধ্যস্থ' 'দূত' 'ঘটক' আছেন।

পৃথিবীতে আরও ঘটক আছেন হয়ত। আমার সব জানা নেই।

কিন্তু যেখানে কখনও কোন মহাজন (মহৎজন?) মধ্যস্থ মানুষ ছিলেন না সত্য ত্রেতা দ্বাপরে; এই কলিযুগের তিন চারশো বছর আগেও, - সেখানে সহসা এই শ'খানেক বছর হবে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছে। এবং সেই আবির্ভাবের জগতটিকে বিপুল প্রভাবে ও প্রভায় নিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত করে তাঁরা বিরাজ করছেন।

সেটি হচ্ছে একালের সাহিত্য-জগত। লেখক ও পাঠকের মধ্যবর্তী মধ্যস্থের জগত। সাহিত্য-জগতে সম্পাদক ও প্রকাশকের জগত।

সেই সেকালের হাতে-লেখা তাল পাতা ভূর্জপত্রের পুঁথি-পত্রের যুগে এঁরা ছিলেন না।

যখন কাগজ ছিল না, ছাপাখানা ছিল না, এমন কি পাঠকও ছিলেন না।

ছিলেন ও থাকতেন শুধু লেখক এবং তাঁর শ্রোতার দল। কথক এবং শ্রোতা। আর যাঁরা অসংখ্য মূঢ় মূক নিরক্ষর শ্রোতা।

কল্পনা করুন, লেখক সূর্য্যের আলোয় অথবা রাত্রে মৃত্‌ প্রদীপের আলোয় বসে বসে যা খুশী লিখছেন তালপাতায় ভূর্জপত্রে।

তারপর বসে বসে শোনাচ্ছেন ঐ নিরক্ষর আমাদের মত সাধারণ মানুষদের। ক্বচিৎ রসগ্রাহী সহৃদয় শ্রোতাদের।

যে লেখা না শুনিয়ে লেখকের স্বস্তি শান্তি নেই। চিরকালের লেখক-স্বভাব তাই। গল্প আছে শ্রোতার অভাবে গাছকেও শ্রোতা করে নিয়েছেন এক অধ্যাপক।

জনসভা মুনিসভা রাজসভায় ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস লেখা নিয়ে শুনিয়েছেন।

পানিনি বোপদেবরা তাই করেছেন। বেদ উপনিষদ ষড়দর্শনও তাই করে শোনানো ও লেখা হয়েছে। সূর্য্যের আলোয় আর মাটীর প্রদীপের আলোয়। কাগজ নেই।

তাতে কিছু যায় আসেনি। লেখা সবই ছিল তালপাতায় ভূর্জ পাতায়। আর ছিল সেই মানুষের অনুরাগী শিষ্য ভক্ত ছাত্রদের শ্রুতি ও স্মৃতিতে মনের পাতায় পাতায়।

আর ছিল অনুরাগী ভক্তদের কণ্ঠের কথকতায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কবির কথা তাঁরা বহন করে কণ্ঠে ধরে নিয়ে পুঁথিতে লিখে গেছেন। দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন কাব্য সাহিত্য দর্শন গান শাস্ত্র ধর্ম বিদ্যা সব। "কণ্ঠে নিলাম গানের" মত। (রবীন্দ্রনাথ)

পাঠক সেই সেকালে কেউ ছিল না। কবি তাঁর হাতের বই পুঁথি কারুকে দেবেন কি করে পাঠক থাকলেও? পড়তে জানতেন যাঁরা তাঁরা বইখানি পাবেন কি করে? কাজেই সেকালে তাঁরা সবাই শ্রোতাই ছিলেন।

এককথায় সেকালে লেখক বা কবি একজন। শ্রোতা লক্ষ লক্ষ। পুঁথি দু একটি। কথক কয়েকটি। আর বাকি সবাই শ্রোতা। পড়তে জানুন বা না জানুন তাতে কিছু তারতম্য হবার উপায় নেই। কেন না পুঁথি একটি মাত্র থাকে কথক বা লেখকের পীঠস্থানে। সবাই জড় হতেন লেখকের পাশে। কথকের পাশে। চাঁদের আলোয় প্রদীপের-আলোয় সূর্যের আলোয়। যেমন এখনও তীর্থ-ক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে মন্দিরের লোকে কথকতা শোনেন। যেমন এখনো লোকে গান শোনেন। সভায় বক্তৃতা শোনেন। একজন গান গায় সবাই শোনে। একজন নাচে সবাই দেখে। থিয়েটার যাত্রা দেখার মত। (রেডিও শোনার মত? সবটাই শ্রুতির ব্যাপার)।

সেকালে লেখকের কাজ ছিল পড়ে শোনানো। পাঠকের কাজ ছিল শ্রোতারূপে চারদিকে জড় হয়ে বসা।

এককথায় 'কাল'টা ছিল "পড়া শোনার" কাল। "লেখা পড়ার" কাল নয়। দেখবেন তাই এখনও লোকে বলেন পড়াশোনা করা। সবটাই শ্রুতির জগত ছিল সে যুগটা, একালের মত বই কিনে 'লেখাপড়া'র যুগ নয়।

*

হায়! তারপর দেখতে দেখতে কাগজের যুগ এসে পড়ল। তালপাতা ভূর্জপত্র জোগাড় করা সমানকরে পুঁথি বানানো, কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো, রাখা—উই ইঁদুরের হাত থেকে—সেই ঝামেলাময় লেখক পাঠকদের যুগ মিলিয়ে যেতে লাগল।

এল কাগজ। হল ছাপাখানা। জন্মাতে লাগলেন অসংখ্য লেখক। এবং অসংখ্য বই ও পাঠক। আর সেই একটি করে যুগ একটি দুটি মহাকবি আর কোটি কোটি রসিক শ্রোতার যুগের চির অবসান হয়ে গেল। লেখকদের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেল।

*

তারপর? আমাদের সামনে এল নিজে নিজে পড়ার জন্য এনতার বই। খবরের কাগজ। বিপুল সমারোহে আসতে লাগল ছাপা বইয়ের সঙ্গে সাপ্তা হক পাক্ষিক দৈনিক মাসিক বার্ষিক পত্রিকাবলী। চিত্রে বিচিত্র। স্বনামধন্য অখ্যাত অনামিক লেখকের লেখা কাব্যে সাহিত্যে গল্পে উপন্যাসে সমৃদ্ধ; যার পাঠকও যেমন অগণন, লেখক তেমনি অসংখ্য।

যেমন নিজে নিজে পড়ার এযুগ, এ তেমনি নিজেই য লেখারও যুগ। নির্ভয়ে লেখকরা কাগজ কিনে পাতায় পাতা ভরিয়ে লিখছেন যতখুশী। যা খুশী। পাঠকরা পয়সা ফেলে কিনছেন বই পত্রিকা যতখুশী। যা খুশী।

এবং সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক কেনা-বেচার বিপু বিস্তৃত জগত। নানা ভাষায় নানা ধরণের সাহিত্যের।

কে কিনবে? কে পড়বে? কোনটা পড়বে? কো গুলো বাদ যাবে? সে আবার এক বিরাট সমস্যা।

সমস্যার সমাধানের জন্য সহসা দেখা গেল 'ঘট এসেছেন। মধ্যস্থ এসেছেন লেখক আর পাঠকদের মা প্রণয় ঘটিয়ে দেবার জন্য (পরিণয় নয়)। এসেছেন পত্রি পত্রের সম্পাদক। নতুন নতুন বইয়ের প্রকা এসেছেন তাঁদের পাশে, সঙ্গে সমালোচক।

এঁরা এক এক নামের হলেও সকলেই ঘটক। লে পাঠক সমাজে মিলন বিরহ সংঘটক।

ক্রমে এল উঁচু নীচু নানা শ্রেণীর নানা ধাপের পত্রি লেখকের খ্যাতি প্রতিষ্ঠারও ধাপ তাঁরা রচনা করে পাঠকের কাছে পরিচিতিরও সিঁড়ি দেখিয়ে দেন। প আপনাদের আর ভাবতে হবে না লেখকের কুলজী কাি

কথা, গোত্র প্রবরের হিসাব। কোন্‌টা পড়বেন—কিনবেন ওঁরাই ঠিক করে দেবেন।

চারদিকে বিশাল বিপুল এক ক্ষুদ্র বীণকারের পত্রিকা ও পত্রিকা আলয়গুলি তাঁদের সম্পাদক মহলের জগত (ছোটবড়) দুটি গোচর হচ্ছে। আর তেমনি নানা নামের গ্রন্থ প্রকাশভবন। গ্রন্থালয়।

অতঃপর সেখানে লেখক ও পাঠকের মধুর মিলন সংঘটিত হবে। সে বড় কম কথা নয় কম আশার কথা নয় লেখকদের কাছে।

নতুন লেখকদল উৎকণ্ঠিত উন্মুখ হয়ে প্রকাশভবনে পত্রিকা সম্পাদক ভবনের দিকে ধাবিত হন।

চেয়ে থাকেন। গিয়ে দাঁড়ান।

'কি চাই'? কি চাই তাঁদের?

বিখ্যাত সম্পাদক ভবন হলে চাই তাঁর কৃপাদৃষ্টি। রচনাটি চোখে দেখার। আর সুপ্রতিষ্ঠ প্রকাশ ভবন হলে কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ বা করুণা লাভ। বইটা নেওয়া হবে বা না নেওয়া হবে।

যে সব ভাগ্যবান লেখক ঐ সব স্বনামধন্য মধ্যস্থ মহাশয়দের অনুগ্রহ বা কৃপালাভ করলেন—তাঁরা ধন্য হয়ে গেলেন কিছুকালের জন্য। চিরকালের কথা ত একালে প্রায় আর নেই। সে কালোত্তীর্ণতা সত্য ত্রেতা দ্বাপরেই কবিদের ছিল। কাগজের কালে নয়, পুঁথির কালে।

কিন্তু যাঁরা ঐ বিখ্যাত লেখক-পাঠক পরিচয়ের সংঘটকদের কৃপা পেলেন না, অনুগ্রহ লাভ করলেন না—কি হল তাঁর? কি করলেন তিনি, কি করবেন তিনি? হায় লেখা ছেড়ে দিলেন ত?

সেকথা থাক্‌। সে কথা আমি আর বলতে পারব না। সেকথা আপনারা সবাই জানেন।

শুধু ভাবছি ভাগ্যিস বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে 'বালক' তারপর 'ভারতী' 'সাধনা' পরে বঙ্গদর্শন ছিল।

নইলে? সে নইলের কথা শুনলেও বঙ্গ সাহিত্য শতদলবাসিনী বঙ্গ সরস্বতীর হৃৎকম্প হবে।

বিমুখ সম্পাদকের আসর থেকে ফিরে এল 'কপালকুণ্ডলা'। উপেক্ষিত হল কমলাকান্তের দপ্তর কৃষ্ণকান্তের উইল! ইত্যাদি। ফিরে এল অমনোনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিনের কড়ি ও কোমল, সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত। ফিরে এল 'মানসী', 'চিরকুমার সভা', চোখের বালি।

আর বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী সম্বরণ করে প্রবল পরাক্রমে মহকুমা মফঃস্বলে ডেপুটিগিরি করছেন। এবং রবীন্দ্রনাথ বিমনা রবীন্দ্রনাথ বিমর্ষ প্রতাপে শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে বসে জমীদারী সেরেস্তার খাতাপত্র দেখছেন। 'আকাশে জালফেলা ব্যবসা'' ছেড়ে দিয়ে "মথুর কুণ্ডু শিবুদার'' সঙ্গে পাটের বাজারের আলোচনা করছেন।

তাঁদের হাতে "বঙ্গদর্শন" নেই "প্রচার" নেই। 'সাধনা' নেই 'ভারতী' নেই। "প্রবাসীর" রবীন্দ্র গুণগ্রাহী সহৃদয় সম্পাদকমশাই নেই। 'প্রবাসীর' পাতায় জায়গা নেই। লেখা ফিরে আসছে? কিন্তু এসব মহা প্রতিভাদের নিয়ে কৌতুক কথা থাক।

বোধহয় সকলেই বুঝতে পারছেন বিমুখ সম্পাদক আর প্রকাশকদের কাছে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত বিমূঢ় অভাগা লেখকদের অবস্থার কথা।

আজকাল এই জন্যেই বুঝি লেখকরা প্রায়ই লেখক বনাম পত্রিকা-সম্পাদক তথা প্রকাশক হয়ে উঠছেন। কেন না এ ছাড়া গতি কই তাঁদের।

কিন্তু এ পথেও বিস্তর ঝামেলা। মা সরস্বতী বড় কঠিন কামিনী। ব্যবসা বাণিজ্যের শেঠানীগিরি আর সাহিত্যের 'ব্যাপার তিনি এক সঙ্গে নিজেও করেন না', করলে সহ্যও করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর শ্রেষ্ঠানী রূপকে বরাবর পূজা করতে পারেন নি। বঙ্গদর্শন সাধনাকে নামিয়ে বেঁচেছিলেন। লক্ষ্মীসরস্বতীর বিবাদ ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

হায় সেই তালপাতা ভুর্জপত্রের স্বর্ণ যুগ। পুঁথিপত্রের লেখকদের সোনার সেকাল। হায়! সবাই নিরক্ষর পাঠক ও শ্রোতা। যুগে যুগে একটি দুটি লেখক।

যুগে যুগে দু' একখানি বই! 'সত্যে' পুরাণ। 'ত্রেতায়' রামায়ণ। 'দ্বাপরে' মহাভারত। আর তারপর বিক্রমাদিত্যের কালিদাসের যুগ। একখানি মাত্র অমর বিরহ সাহিত্য মেঘদূত। এবং হায়, সবাই লেখক কাগজ ও অসংখ্য ছাপার বই।

হীন যান

(উপন্যাস)

সুবোধ বসু

নয়

রণচণ্ডী প্রকৃতই খুশি হইল। এমন সুবুদ্ধির উদয় দেখিলে কে না খুশি হয়। একটিমাত্র কথায় ননী তাহাকে যতটা সন্তুষ্ট করিয়াছে শত চণ্ডীমঙ্গলব্রত করিয়াও তাহা পারিত না। মেয়েমানুষের কখনও অত বেয়াড়া হওয়া সাজে? এর চেয়ে বেশি আর কি চান? কোন্ গরিবের বউ হইয়া হেঁসেল ঠেলিয়া ও কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজিয়া শেষ হইতিস। তার জায়গায় রাজকন্যার হালে থাকিবি। হাসি-খেলা, সাজ-পোষাক, খানা-পিনা, অভাব কিসের? চণ্ডীর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল।

বস্তুতঃ, এ দুটো মেয়ে তাকে রীতিমত ভয় পাওয়াইয়া ছাড়িয়া ছিল। সকলেই জানে, মেয়েমানুষ ফুসলাইতে ও পোষ মানাইতে চণ্ডীর মার জুড়ি নাই। কত মেয়েকে সে এ পথে টানিয়াছে, তাহা আঙুলে গোণা যায় না। অথচ এই ননী ছুঁড়ী তাকে রীতিমত হিমসিম খাওয়াইয়া ছাড়িয়াছে। যতই সে ভয় দেখাইয়াছে, ননীর জেদ আরও চড়িয়া গিয়াছে। আর ভয় দেখানো এক কথা আর তাকে কাজে পরিণত করা আলাদা। বেশি হৈ চৈ হইলে পাড়ার লোকেরাই হয়তো গোলমাল বাধাইবে; নিজেরা আসিয়াই হয়তো হামলা করিবে বা পুলিশের বড় কর্ম্মচারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তখন থানার দারোগাবাবু ইচ্ছা করিলেও সাহায্য করিতে পারিবেন না। এমন জাকানো ব্যবসা মাটি হইবে। কাজেই বেশি জোর করা চলে না। বুঝাইয়া, লোভ দেখাইয়া এবং মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া মতলব হাঁসিল করিতে হয়।

বিকেল হইতে না হইতেই সে ননী-তুলীর ঘরে হাজির হইল। একগাল হাসিয়া কহিল, আমি নিজ হাতে তোদের সাজিয়ে দেব। মেয়েমানষের শ্রী খোলে সাজে-গয়নায়। কত পেঁচী-খেঁদীকে সাতসাফাইয়ের কায়দায় নিশিপদ্ম বানিয়ে ছেড়েছি, তোরা তো ছিরিমন্ত মেয়েমানুষ।

'আপনে ক্যান কষ্ট করবেন।' ননী আশ্চর্য্য রকম খাতিরের স্বরে কহিল।' 'আমিই অরে সাজাইয়া দিমুনে। যা লাজুক!'

ও কিছু নয়। পয়লা দিন আমিই সব করে' দিচ্ছি। কিছু ভুলচুকে সব ভণ্ডুল না হয়। যাও তো বাছারা এবার গা ধুয়ে এসো। সুগন্ধি সাবান বেশি করে লাগাবে। পায়ের তলায় বালিশ দিয়ে শুধু মাথায় দুপুরে শুতে বলেছিলাম। করোনি বুঝি। এটি অবহেলা করো না।

'আইজ ভুইলা গেছি। দুই চাইর দিন না গেলে রপ্ত হইব না।' ননী বিনীত জবাব দিল।

'কিছু ভেবো না। পাউডার স্নো রুজ দিয়ে আমি সব ত্রুটি সেরে দেব। পয়লা দিন, বিশেষ দিন। যাও, বাছারা, আর দেরিটি করো না। গা ধুয়ে এসো। আমি একবার ঘুরে আস'ছ। তারপর তোমাদের নিয়ে পড়ব। আজ হলো তোমাদের শুভ মহরৎ! মনে রাখবার মত দিন।' বলিয়া চণ্ডীর মা ডিউটিতে বাহির হইয়া গেল।

'না, ননীদি, আমার বড় ডর করতে আছে।' রণচণ্ডীর গমন-পথ হইতে ভীতদৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া তুলী প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে কহিল। বেচারীর চোখে ও

মুখরেখায় অনেক ঘণ্টার উদ্বেগ সঞ্চিত হইয়া যেন পুরু হইয়া উঠিয়াছে!

'দূর বলদ, ডর কি। সাহস না করলে কিছু করন যায়।' ননী অভয় দিয়া কহিল। 'কোনও টুঁ-ট্যাঁ করিস না। চুপ মাইরা রণচণ্ডীর কথায় সায় দিয়া যা। সময়মত যা করণের আমি কইয়া দিমুনে। যদি বরাত থাকে, ব্যাধের জালের থন ছাড়া পাবি। সব ঠিক আছে।'

এক 'সব ঠিক আছে' ছাড়া ননীদি দুলীকে আর বড় কিছু বলে নাই। দুলী ভাবিয়াই পায় না, কি করিয়া এই কারাগার হইতে ছাড়া পাওয়া সম্ভব। সারাক্ষণ তারা তালাবন্ধ থাকে। প্রতি তলার সিঁড়ির মুখের দরজায়ই একটা করিয়া প্রকাণ্ড তালা। নিচে যমদূতের মতো দারোয়ান। ননী বলিয়াছে, সাহস করিয়া একবার তাহাদের হাসপাতালের তেতলায় যেখানে সাজিয়া গুজিয়া একগাদা অদ্ভুত মেয়েকে প্রথম দিন তাহারা বসিয়া হাসি-মস্করা করিতে দেখিয়াছিল সেখানে হাজির হইতে হইবে। ইহাতে রণচণ্ডীর সহর্ষ সমর্থন আছে। সুতরাং উপরতলার তালাগুলি সহজেই খুলিয়া যাইবে। তারপর কি করা হইবে, বহু প্রশ্ন সত্ত্বেও ননী সে রহস্য ফাঁস করে নাই।

সন্ধ্যা ঘোর হইবার আগেই রণচণ্ডীর তত্ত্বাবধানে উভয়ের প্রসাধন, কেশবিন্যাস ও সাজসজ্জা সমাপ্ত হইল। চণ্ডীর মা দক্ষ শিল্পীর তৃপ্তির সঙ্গে দুলীর রূপান্তর লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সপুলকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, 'যা, একবার আর্শির সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখানা দেখে নে। নিজেকেই চিনতে পারবি নে।''

ইতিপূর্বেই দুলী ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজেকে দেখিয়াছে। তারও আগে ননীদির পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছে। গালে লাল রং; চোখে কাজল; কপালে কাচের টিপ। নখের আঙুলে রং, পায়ের আঙুলে রং। খাটো ব্লাউজ কোমর হইতে অনেকটা উপরে পড়িয়া আছে,—গাটা সম্পূর্ণ আবৃত করে নাই। এ কি নির্লজ্জের সাজ। দুলী লজ্জায় ঘামিয়া উঠিয়াছে। অসহায়ভাবে বারবার ননীদির চোখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু ননীদির দৃষ্টির নাগাল পাইতেছে না।

সহসা সিঁড়ির দরজায় তালা খোলার আওয়াজ আসিল। কড় কড় শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। এই আওয়াজের পিছন হইতে কর্কশকণ্ঠে ডাক আসিল। 'টেম হয়ে গেলো। লড়কীদের সব ভেজিয়ে দেও।'

'সব তৈরি আছে, দারোয়ানজী।' চণ্ডীর মা সচকিত হইয়া কহিল। 'দাঁড়িয়ে যাও, সব তোমার জিম্মে করে দিচ্ছি।'

'না, ননীদি, তোমার পায়ে পড়ি, আমি যামুনা।' কয়েক ধাপ বেশ সাহসের সঙ্গে দুলী আসিয়াছিল, সহসা চাপা কান্নায় সে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল!

'চুপ কর বলদা মাথারি।' ননী প্রায় তার কানের কাছে মুখ আনিয়া ধমকাইয়া উঠিল। 'অখন কান্দলে সব নষ্ট করবি। কোনও ডর নাই, চইলা আয়। আমারেও বিশ্বাস নাই?'

দুলী আবার চলা শুরু করিল। চণ্ডীর মা ইতিপূর্বেই সিঁড়ির দরজার মুখে হাজির হইয়া দারোয়ানের সহিত পরামর্শে লিপ্ত ছিল, হাঁক দিয়া কহিল, 'একটু পা চালিয়ে এসো বাছারা। দারোয়ানজীর হাজার কাজ; নার্সেরা সব এসে পৌঁচচ্ছে, এখুনি রোগীরা সব এসে পৌঁছবে; দু মিনিটের দাম এখন দু ঘণ্টা। তা ছাড়া, তোমরা নতুন; তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে একটু দেখে শুনে নিতে হবে তো! চটপট সব শিখে নিতে হবে…'

দারোয়ানজী নিম্নস্বরে কি রসিকতা করিল চণ্ডীর মার সঙ্গে তাহা শুনা গেল না, কিন্তু দারোয়ানের রসিকতার হাসির কর্কশ আওয়াজ দুলীর বুকে যেন একই সঙ্গে অনেকগুলি পেরেক ঠুকিয়া দিল। ননীদির মুখের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া দেখিল, সে যেন পাথরের মূর্তি। ভয়, আশঙ্কা, উদ্বেগ, হাসি, কান্না, লাভ, লোকসান কোনও কিছুর আভাসই তাতে নাই। দুলী আরও ভয় পাইয়া গেল। তারপর তালা আটকাইবার আওয়াজে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, অস্পষ্ট আলোকিত

সিঁড়ি দিয়া ননীর পিছনে পিছনে সে নিচে নামিতেছে। দারোয়ানের খড়মের আওয়াজ হইতেছে খটাস খটাস। শুটকী মাছের গন্ধ ক্রমে জোর করিতেছে। সব কিছু যেন তালগোল পাকাইয়া যাইতেছে।

সবচেয়ে বিস্মিত করিল ননীদির আচরণ। মুখে রং মাখা, কামানো ভুরুতে কাজল-লেপা, এক গাদা নির্লজ্জ মেয়ে বড় গোল-টেবিলটার চার দিকে বসিয়া কেউ উচ্চহাস্য করিতেছে, কেউ গানের সুর ভাঁজিতেছে, কেউ বা সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। ঘৃণায় ও ভয়ে কাঠ হইয়া গেছে দুলী। তার রূপ লইয়া ইহাদের রসিকতা কিছু বা তার কানে প্রবেশ করিয়াছে, কিছু বা প্রবেশই করে নাই, এমন ঘাবড়াইয়া গিয়াছে সে। অথচ ননীদির কাণ্ড দেখ। এই কয় মিনিটের মধ্যেই দারুণ জমাইয়া লইয়াছে। হাসিতেছে, রসিকতা করিতেছে, তামাশা করিয়া কাহারও বা গায়ে গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। যেন এই খারাপ মেয়েগুলির সঙ্গে কত কালের ভাব!

'দে না, নীহার, একটা সিগারেট খাইয়া দেখি কেমন লাগে। খুব মিঠা কি?'

'আহা রে আমার ঢেঁকু বাঙাল! ভাজা মাছটি উলটিয়ে খেতে জানো না। কিন্তু আমার যে ভাই বক্স খালি! পয়সা দিচ্ছি। নিচের পানের দোকান থেকে এক বাক্স নিয়ে আয়...'

স্তম্ভিত হইয়া গেল দুলী। এ কি ব্যবহার ননীদির! সিগারেট খাইবে সে? অথচ নিজের কানে তার অনুরোধ শুনিয়াছে দুলী। ননীদির মতলব কি? অবলীলাক্রমে সে ইহাদের একজন হইয়া উঠিয়াছে! তাহাকেও ননীদি এ দলেই ভর্তি করিতে চায়? চণ্ডীর মার সঙ্গে গত ক'দিন ধরিয়া তাহার নানা সলাপরামর্শ চলিয়াছে। কিন্তু তাহার পরিণতি যে এমন হইবে দুলী ভাবিতেও পারে নাই। ননীদিকে এতটা বিশ্বাস করা ঠিক হয় নাই।

'দারোয়ানরে কও না। সেই আইনা দিব। উপরেই তো খাড়াইয়া আছে।' ননী সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল।

'ও দারোয়ানজী, একবার শুনে যাও তো, মালিক।' নীহার ভাঙাগলায় সরস হাঁক ছাড়িয়া কহিল। 'দয়া করে এক বাক্স সিগারেট এনে দিয়ে যাও। নয়া বিবির ফরমাস!'

'ফরমাইয়ে!" অতিরিক্ত আজ্ঞানুবর্তিতার সঙ্গে দারোয়ান নিকটে হাজির হইল। 'আপকী সেবামেঁ হরবক্তহী হাজির হুঁ। ক্যায়া লাউঁজী? বীয়র?

'বিয়ার নিজের পয়সায়! হাসালে দারোয়ানজী! এখানে কি এতই রোগীর অভাব! আপাতত এক বাক্স নাম্বার টেন্ হলেই চলবে।' বলিয়া হাতের রেশমী রুমালের গিঁঠ খুলিয়া নীহার দারোয়ানের হাতে একটা সিকি গুঁজিয়া দিল।

'শীগগির কর্। আর দেরি করিস না। সিগারেট কিননের অজুহাতে দারোয়ানজী কটকের মুখের থন লইয়া গেছে। সিঁড়ি দিয়া সিধা নাইমা যেই দিকে চউখ যায় ছুইটা পালা। যদি কেউরে সত্যই ভদ্দরলোক বইলা মনে হয়, তবে তার কাছেই বিপদের কথা কইয়া সাহায্য চাইস। ঠগ গুণ্ডার হাতে য্যান আবার পড়িস না...'

'আর তুমি যাইবা না, ননীদি?' সোদ্বেগে দুলীর প্রশ্ন।

'না। দুই জনের যাওন চলব না। দারোয়ানজী লইতে রাজি না। কয়, তবে আমারে খুন কইরা ফালাইব দুইজনের একজন রইয়া গেলে দারোয়ানজীর উপর কোনও সন্দেহ হইতে পারব না। কিন্তু আর কথা কওনের সময় নাই। এই সুযোগে পালা। কোনও দিকে চাইছ না। সিধা ছুইটা যাবি। এই নরককুণ্ডে যেন আর ফিরা না আইতে হয়।'

'আর তোমার কি হইব, ননীদি?'

'আমায় যা হওনের হইব। তুই জনে ক্যান না

হয়? আমিই তরে এই বিপদে টাইনা আনছিলাম। তরে বাচাইতে পারলে মনে শান্তি পামু। যা, পোড়ারমুখী। খাড়াইয়া রই স ক্যান। তুইও আমার লগে ডুবতে চাস নাকি?

'আমি যামুনা ননীদি। তোমরা ফালাইয়া যামুনা।' তুলী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

'পালা হারামজাদী মাইয়া। দেরী কইরা তুই সর্বনাশ করবি। সক্কলেরে ডুবাবি।' বলিয়া প্রায় ধাক্কা দিয়া তুলীকে সিঁড়িতে ঠেলিয়া দিল ননী। চাপা তর্জ্জনের সঙ্গে কহিতে লাগিল 'পালা বান্দরী। দৌড়াইয়া পালা। প্রাণ লইয়া, মান লইয়া পালা।'

স্বপ্নাবিষ্টের মত স্খলিতপায়ে সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করিতে লাগিল তুলী। যেন ননীর আওয়াজের ধাক্কা খাইয়া অবলীলাক্রমে অতল গভীরতার মধ্যে নিমজ্জিতা হইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত উপরতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ননী এ অপটু মরিয়ার পলায়ন মহা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিল। তুলীকে নিচের রাস্তায় পা দিয়া অদৃশ্য হইতে দেখিবার পরও মিনিট দুয়েক সে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। দুরু দুরু বুকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, আবার যেন তাকে ফিরিয়া আসিতে না হয়।

অকস্মাৎ উদ্গত অশ্রুতে তার দুই চোখ আপ্লুত হইয়া গেল। মনে মনে সে কহিল, এইবার আমার যা হয় হউক। আমার তো আর কোনও উপায় নাই।'

দশ

তাপস মিত্র নামকরা আর্টিষ্ট। লম্বা, সুদর্শন শান্ত প্রকৃতির মানুষ। চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি ও সহানুভূতির শিল্পীসুলভ সংমিশ্রণ। বয়স পঞ্চাশের কোঠার দু এক ধাপ নিচে আছে মাত্র, কিন্তু চেহারা বয়সের তুলনায় অনেকটা কাঁচা। চুলেতে এখনও শাদার ছাপ লাগে নাই।

বয়স যখন কম ছিল, তখন সে মাষ্টারপীস আঁকিয়া রেমব্রাণ্ট বা বতিচেল্লী হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছে। শক্তি সত্যই ছিল, বহু চিত্র-সমালোচক ও রসিকের তারিফ লাভ করিয়াছে তার আঁকা বহু ছবি। কিন্তু না পারিয়াছে জগৎবিখ্যাত হইতে, না পারিয়াছে টাকা উপার্জ্জন করিতে। দারিদ্র্যে ভুগিয়া স্ত্রী উমা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয় এবং অর্থাভাবে যথোচিত চিকিৎসা না পাইয়া মারা যায়। সে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। এই পঁচিশ বৎসরে তাপস অনেক কিছু শিখিয়াছে, অনেক বেশি সংসার-অভিজ্ঞ হইয়াছে। তার বর্ত্তমান খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি উভয়ই বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিয়া। কলিকাতার একাধিক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাপন-এজেন্সীর প্রধান চিত্রশিল্পী তাপস মিত্র। পয়সা ও খাতিরের অভাব নাই।

ইণ্টারন্যাশানাল অ্যাডভারটাইসিংএর সহকারী ম্যানেজার প্যাটার্সন সাহেবের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল পার্ক ষ্ট্রীটের এক জলুসদার রেস্তরাঁয়। চা পর্ব্ব শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। প্যাটার্সন বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। তাপস সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই। পথ হাঁটা স্বাস্থ্য এবং আইডিয়া সংগ্রহ উভয়ের জন্যই প্রয়োজন। ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট ধরিয়া উত্তর মুখে নিজের আস্তানার দিকে সে মন্থর গতিতে পা চালাইল।

পথে ঘাটে সর্ব্বদা দ্রষ্টব্য অনেক কিছু থাকে। তার জন্য সমজদারের চোখ চাই। শুধু দোকান আর, বাড়ি গাড়ি পদাতিকের মিছিলই রাস্তায় দেখিবার জিনিষ নয়। অনেক হাসি ও কান্নার উপাদান, অনেক নাটকীয় ঘটনা চক্ষুষ্মানের চোখে পড়ে তাপস মিত্র এরই সন্ধানে পথ চলে। ছবির এবং মানসিক আনন্দের অনেক উপাদান সংগ্রহ হয় রাস্তার ঘটনা হইতে।

কিন্তু সেদিনের ঘটনা তার নাটক-উপভোগের ক্ষমতাকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে ওয়েলেসলি ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডের সংযোগ স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রিটে অবস্থিত নিজ ফ্ল্যাট আর দূরে নয়। পশ্চিমের ফুটপাথ হইতে পূবের ফুটপাথে আসিবার জন্য

রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। দুপা নামিয়াও পড়িয়াছে দুইদিকে সাবধানতা হিসাবে তাকাইয়া দেখিয়া। এমন সময় প্রায় হুড়মুড় করিয়া কে যেন তার সামনে আসিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া না নিলে পা চাপা পড়িত তাপসের।

আমারে বাচায়ন বাবু! আমারে রক্ষা করেন। নরপিচাশের থাবার মধ্যের থন আমি পলাইয়া আইছি। ধর্ম্মের দোহাই।

বছর সতেরো আঠারো বছরের কিশোরী। তন্বী, প্রায় গৌরাঙ্গী, লম্বাটে সুশ্রী মুখ, টিকলো নাক। মুখের রেখায় ও দীর্ঘ চোখদুটির দৃষ্টিতে ভীত ও অসহায় ভাব। পিছনে পিছনে যেন সত্যই পিশাচ ছুটিয়া আসিতেছে।

তাপস তাড়াতাড়ি পিছনের ফুটপাথে ও সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই কাহারা পিছনে পিছনে আসিতেছে কিনা। বহু সন্দেহযোগ্য লোক এ রাস্তায় সর্ব্বদাই ঘোরাফেরা করে, গুণ্ডা বদমাস ও বারবনিতার দালালের আনাগোনা সর্ব্বদা কিন্তু কাছাকাছি অনুসরণরত কোনও সন্দেহভাজন লোক নজরে পড়িল না।

'ওঠ, ওঠ। উঠে পড়ো। গাড়ি চাপা পড়বে। কি হয়েছে তোমার ?'

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাপস নিজেও ফুটপাথের উপর উঠিয়া আসিল।

'কোথায় থাক?' কিশোরী সভয় দৃষ্টিতে চলন্ত গাড়ি ও ট্রাম লক্ষ্য করিয়া রাস্তা হইতে ফুটপাথে পা দিবার পর তাপস আবার প্রশ্ন করিল।

'শিয়ালদ ইষ্টিশনে থাকতাম। রিফুজী। তারপর হাসপাতালে নার্সের কামের লোভ দেখাইয়া দুষ্ট লোক ননীদিরে ফুসলায়। ননীদি আমারেও লইয়া যায়। কয়, ভিক্ষুকের জীবন আর সহ্য হয় না হাসপাতালের ঝিয়ের কাম পাইলেও ভাল...'

'ননীদি কে? কোথায় সে?'

'আমারে বাঁচাইয়া সে ইহজীব নর জন্ম পাপপুরীতে আটকা পইড়া গেছে। সন্ত্রম লইয়া আমি ছুটতে ছুটতে পালাইয়া আইছি। জানিনা অখন কি করুম, কই যামু। আমারে বাচায়ন বাবু। ধর্ম্মের দোহাই, আমারে বাচায়ন।'

'তোমার কোনও ভয় নেই।' তাপস সহানুভূতির কণ্ঠে আশ্বাস দিয়া কহিল। 'আমার বাড়ি কাছেই। আগে সেখানে চল। তারপর আমি পুলিশকে খবর দিচ্ছি।'

'পুলিশ।' দুলীর দুই চোখে ভয়ের স্রোত খেলিয়া গেল। 'না, না। আমি পুলিশের কাছে যামুনা। পুলিশই আমাগো পাপপুরীতে লইয়া গেছিলা মোটর গাড়ীতে চড়াইয়া। ননীদি কইয়া দিছে, আর কারোরে বিশ্বাস করিস না। যদি কারোরে সত্যই ভদ্রলোক মনে হয়, তার কাছেই যাইয়া পড়িছ। যাউক বাবু। আমি যাই। অখন তবে যাই...'

দুই চোখে ছুটিবার দৃষ্টি! মুখে মরিয়ার কাঠিন্য। অনায়াসে ট্রামের সামনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। তাপসের অভ্যস্ত চোখে সামান্যতম মুখরেখার তাৎপর্য্যও অগোচর রহিল না।

'থামো!' সে প্রায় ধমক দিয়া কহিল। 'ছুটোছুটি করতে গেলে গাড়ীচাপা পড়ে মরবে! ঠিক আছে তোমার পুলিশের কাছে যেতে হবে না। আমার বাড়ীতেই চল। কিন্তু কোন্ বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে বলতে পার? রাস্তার নাম জানো? অন্তত দরকার হলে সঙ্গে নিয়ে চেনাতে পারবে? হয়তো তা হলে তোমার ননীদিকেও বাঁচান যাবে...'

তাপসের সঙ্গে পুলিশের বড় কর্ত্তাদের জানাশোনা আছে। সহজেই তাহাদের সহায়তা লাভ করা যায় একবার চেষ্টা করা যাইতে পারে মেয়েটার অন্য সঙ্গিনীকে উদ্ধার করিতে। কিন্তু কি করিয়া বাঁচানো যায়, সে সম্বন্ধে ইহার কাছে কিছু বলিয়া আর তাহাকে আতঙ্কগ্রস্ত করিল না।

'আচ্ছা। ঠিক আছে। মানে আমার বাড়ি চল। তারপর কি করা যায় ভেবে দেখব। গুণ্ডারা যদি পিছু নিয়ে থাকে, তবে রাস্তায় থাকা ঠিক হবে না। এসো আমার সঙ্গে।'

আতঙ্কে একবার সম্ভাব্য অনুসরণকারীর খোঁজে দৃষ্টিপাত করিয়া দুলী কামড়-খাওয়া কুকুরের মতো পিঠ বাঁকাইয়া তাপসের পিছনে পিছনে রাস্তা অতিক্রম করিল।

ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের মাঝামাঝি বাড়ীটা। নিচের তলাটায় ছাপাখানা। ইহার ডানদিকে উপরতলার ফ্ল্যাটে যাইবার রাস্তা। রাস্তার শেষে একটা গ্যারাজ। পশ্চিম দিকের এই শান-বাঁধানো রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণদিকে আট দশ পা হাঁটিলেই উপরে চড়িবার সিঁড়ি। ক্রীম রঙের মোজাইকের এই সিঁড়ি দিয়া দুলী তাপসের পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া আসিল। দোতলার দরজার সামনে ইলেক্‌ট্রিক বেলের বোতাম। এই বোতাম টেপা মাত্র কোথায় যেন ক্রিরি রিং করিয়া আওয়াজ শুরু হইল। আরও হকচকাইয়া গেল দুলী। আবার কোনও নূতন বিপদে পড়িবে না তো? বাবুকে তো খুব ভাল লোক মনে হইয়াছে। গম্ভীর ভদ্র চেহারা, গলার আওয়াজ ও চোখের দৃষ্টি করুণা ও সহানুভূতিতে ভরা। এখন ভাগ্য যা করে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজা খুলিয়া এক বুড়ী বাহিরে উঁকি দিয়া তাপসকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিল।

'এ হচ্ছে যশোদার মা। আমার বাড়ীর ম্যানেজার। তাপস একটু মজা করিয়াই কহিল 'জানো তো, যশোদার মা, আমার এক বোনের বাঙাল দেশে বিয়ে হয়েছিল। সেই বোনের মেয়ে এটি। নাম দোলন। এসো দোলন, ভেতরে এসো। এর জন্য ভাত রাঁধতে হবে যশোর মা। বাঙাল দেশের মেয়ে, ভাত ছাড়া কিছু খাবে না। মাছ আর ভাত।...যশোর মাকে কিছু বলতে হলে একটু জোরে বলবে, নইলে শুনতে পাবে না, কিন্তু মানুষটি বড় ভালো। উচ্চকণ্ঠে সহসা খাদে নামাইয়া তাপস ঈষৎ হাস্যমুখে দুলীর উদ্দেশে কহিল।

ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই এক ফালি বারান্দা। পাখি-আঁকা জাপানী পার্টিশন সদর অন্দর বিভাগ করিয়াছে। ডান দিকের দরজা দিয়া বসা-কামরায় ঢুকিতে হয়।

ঘরের চারদিকের দেওয়াল বরাবর দুই প্রস্থ সোফা সেট। দুদিকের দেওয়ালে সবুজ রঙের ডিস্টেম্পার। অপর দুটি দেওয়াল জুড়িয়া প্রকাণ্ড আকারে ফ্রেস্কো—তাপসের বন্ধু সুব্রতের আঁকা। ডাহিনের দেওয়ালের দক্ষিণ প্রান্তে কালো ষ্ট্যাণ্ডের উপর স্খলিতবাস এক সাদা পাথরের নারী মূর্ত্তি। সবুজ সিল্কের শেডের নিচে দুইটি বিজলী বাতি বিলম্বিত। মেঝের ভিতরের অংশ সবুজ বর্ণের গালিচা, বাহিরের অংশ অনাবৃত শ্বেত।

'বসো।' তাপস আঙুল দিয়া একটা কৌচ দেখাইয়া কহিল।

এমন ঘর, এমন আসবাব ও গৃহসজ্জা দুলী জীবনে দেখে নাই। বাস করিবার জায়গা যে এমন বিচিত্র ও অদ্ভুত হইতে পারে তাহা তাহার ধারণাতীত ছিল। তাপসের নির্দ্দেশ তার কানেই পৌঁছাইল না।

'চা খাও তো দোলন? রান্না হতে এখনও দেরি আছে। তুমি এখানটায় বসো আমি সব ব্যবস্থা করছি। বাড়ীতে তো আর কেউ নেই। বলিয়া দুলীর ডান হাতের ডানা ধরিয়া তাপস তাহাকে প্রকাণ্ড একটা কৌচের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া ভিতরে প্রস্থান করিল।

ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম হইল দুলী। চেয়ারের স্প্রীংয়ের জন্য যতটা না ঝাঁকুনি খাইল, তার চেয়ে বেশি ঝাঁকুনি খাইল তাপসের হাত ধরিয়া বসানোতে। বাপের মতো বয়স হইলে কি হইবে, পরপুরুষতো বটে! এক বিপদ হইতে পালাইয়া আবার আরেক বিপদে পড়িবে না তো? বাড়িতে যশোর মা ছাড়া আর কেহ নাই। এটাও ভয়ের কথা। তবে বাবুকে বেশ ভালো মানুষ মনে হইতেছে। এখন

ভগবানের দয়ায় সত্যই ভালোমানুষ হন, তবেই একমাত্র ভরসা। সচকিতভাবে বারবার সে ঘরের চার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার আবেষ্টনীসম্বন্ধে সচেতন হইতে তৎপর হইল। কোণার শ্লথবাস নারীমূর্ত্তিটা দেখিয়া তার মোটেই ভাল বোধ হইল না। প্রকাশ্যভাবে এমন মূর্ত্তি রাখিতে লজ্জা হইবার কথা! এ যে ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি নয়, তাহা খুবই স্পষ্ট। বাবু সত্যই লোক ভালো তো?

প্রায় মিনিট দশেক পরে তাপস ফিরিয়া আসিল। এক কোণায় এক ছোট টেবিলের উপর টেলিফোনযন্ত্রটি ও ডিরেক্টরি ছিল। তার কাছে গিয়া ডিরেক্টরি খুলিতে খুলিতে দুলীর প্রতি কহিল, 'চলো খাওয়া-দাওয়ার পর শিয়ালদা ষ্টেশনটা একবার ঘুরে আসি। হয়তো তোমার আত্মীয় স্বজনদের কারুও দেখা পাওয়া যেতে পারে। অনেকেই তো অনেকদিন ধরে সেখানে পড়ে আছে ··

'না আমি আর সেইখানে যামুনা। কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিবার পর গলা সাফ করিয়া দুলী সিদ্ধান্তের কণ্ঠে কহিল।

'নিজের লোকের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করেনা? ডিরেক্টরীর পাতা উল্টানো স্থগিত রাখিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাইল তাপস।

'সেইখানে আর আমার জাগা নাই। আপনার পায়ে পড়ি বাবু, কোনও বাড়ীতে আমারে কাজে লাগাইয়া দেন। আমি রান্ধতে জানি, বাড়ীর কাজকর্ম্ম জানি। আমি আর কারও কাছে যাইতে চাইনা···'

দীর্ঘ দুই চোখ বাষ্পে আচ্ছন্ন। বঙ্কিম ভুরু যুগলে টান পড়িয়াছে। কপালের এক পাশ হইতে কয়েক গাছ চুল খসিয়া পড়িয়া চোখের জলে ভিজিয়া গালে অাঁটিয়া গেছে। নাসারন্ধ্র ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। যেমন সুন্দর তেমন অসহায়তার মূর্ত্তি।

পলায়িতার প্রতি গুণ্ডার পুনরাক্রমণ এড়াইতে এবং বিশেষ করিয়া পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য কি ঠাণ্ডা মাথায় তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্যই তাপস ইহাকে বাড়ী লইয়া আসিয়াছিল। ইহার সঙ্গিনীকে পুলিশের সহায়তায় উদ্ধার করা যায় কিনা, তাহাও একবার চেষ্টা করিবার ইচ্ছা। কিন্তু আগে সব দিক না ভাবিয়া হট করিয়া পুলিশ টানিয়া আনার সে পক্ষপাতী নয়। এদিকে পুলিশের নামে দোলন ভয়ে সারা। নিজের চেষ্টায় ইহার আত্মীয়স্বজনের কাছে ইহাকে ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব যদি ইহার আত্মীয়েরা এখন শিয়ালদহ ষ্টেশনেই থাকে। কিন্তু মেয়ে তাহাদের কাছে ফিরিতে অস্বীকার করিয়া সমাধানকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে।

'তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল, কি যেন তার নাম বলেছিলে? তোমরা একই গাঁয়ের মেয়ে?'

'ননীদি?' হ্যাঁ একই গ্রামের।'

'কোন বাড়ীটায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে, চেনাতে পারবে?'

'বাড়ীটা দেখলে কইতে পারি।'

'রাস্তার নাম জানো না?'

'না। কইলকাতা শহরের আমি কিছুই চিনি না।'

'সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে সে রাস্তায় যেতে পারবে? মানে, যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলে, ঠিক সেই রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে পারবে?

'না।'

হাত হইতে টেলিফোন-গাইড নামাইয়া রাখি- তাপস। চট্ করিয়া চাঞ্চল্যকর কিছু করা যাইবে না আগে বেচারি প্রকৃতিস্থ হউক, তারপর যদি কিছু কর যায়।

'চা খাও ত?' যশোর মা নিঃশব্দে তাপসে পার্শ্ববর্তী তেপায়ার উপর চায়ের ট্রে নামাইয়া রাখি প্রস্থান করিবার পর তাপস কহিল। 'চায়ের স সিঙাড়া খেতে চমৎকার লাগে। ওপাশের দরজা দিে গেলেই গোসলখানা। কল আছে। মুখ ধোবা বেসিন আছে। হাতমুখ ধুয়ে এস। আমি চা তৈ করছি···'

কিন্তু অত সহজে অ্যাটাচড্ বাথরুমের তাৎপ দুলীর মাথায় প্রবেশ করিল না। অগত্যা নিজে উঠি

গিয়া গোসলখানার বার্ণিশোজ্জ্বল দরজাটা খুলিয়া ধরিয়া তাপস গোসলখানার অভ্যন্তরটা দেখাইয়া দিল। কহিল, 'ও রকম করে' তাকিয়ে আছ কেন? ভয় কি? এত ভয় পেলে এখানে থাকবে কি করে? শিয়ালদা-এই তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে দেখছি…'

এবার তুলী আপনা হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

এগারো

ভুতো আরও এক মাস ছুটি বাড়াইয়াছে। নিমাই কাজকর্ম ভালোই চালাইতেছে। চটপটে সুদর্শন ছেলেটি। মিষ্ট স্বভাবের জন্য গ্রাহকেরা পছন্দ করে। ভুতো মোটেই না আসিলে মালিক খুশিই হয়। কিন্তু ভুতোর দাদা মালিকের বহুদিনের চেনা লোক। ছুট করিয়া ভুতোকে সারানো যাইবে না। কিন্তু ভুতোর ছুটি বৃদ্ধিতে নিমাইয়ের সুবিধাই হইয়াছে। বৃষ্টি পড়িলে রাজাবাবু পাহাড় হইতে নামিবেন। আষাঢ় মাস পড় পড়। শহরে ইতিমধ্যেই দু চার দিন বৃষ্টি হইয়া গেছে। হয়ত রাজাবাবু আসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিমাই হতাশ হইতে চায় না। সে আরও সপ্তাহ দুয়েক দেরি করিয়া যাইতে চায়।

দোকানের পেছন দিকে বসিয়া বনমালীর সহিত একই সঙ্গে নিমাই দুপুরের আহার শেষ করিয়াছে। এখনও বাসন ধোওয়া হয় নাই। এমন সময়ে উপর তলার বাইজির ঝি আসিয়া কহিল, 'শুনচো বনমালী, আধসের গরম সিঙ্গারা ভেজে নিমাইয়ের হাতে উপরে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন দিদিমণি। আমি যাচ্ছি ঠনঠনে চিঠি নিয়ে। ওপরে কেউ থাকবে না। দেরি করোনি যেন, শুনচো…

'আধ ঘণ্টা দেরি হবে, বলে যাও। খাওয়া শেষ করে এখনও আঁচাই নি।'

বাঁধা এবং বড় খদ্দেরদের খুশি রাখিতে হয়। খদ্দেরের কাছে খাবার পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজটি ভুতো করিত। এখন ইহার ভার নিমাইয়ের উপর পড়িয়াছে। দিনে ও রাতে বহু নারী ক্রেতাকে মিষ্টি পৌঁছাইয়া দিতে হয় তাকে। বাইজি নয়নতারা থাকে দোকানের উপর তলায়ই। খাবারও নেয় প্রচুর। তাকে খুশি রাখিতে হয়।

আধ ঘণ্টারও কিছু পরে এক ঠোঙা গরম সিঙাড়া হাতে লইয়া নিমাই উপরে গেল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া প্রথমেই জলসাঘর। তার বাঁ পাশে নয়নতারার শয়ন ঘর। অপরিসর বারান্দা দিয়া নিমাই উহার বন্ধ দরজার কাছে হাজির হইল। দুয়েকবার কাশিয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে অসমর্থ হইবার পর দরজার গায়ে মৃদু টোকা মারিয়া সে ডাকিল, 'দিদি, সিঙাড়া নিয়ে এসেছি।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাট নড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। শীঘ্রই দরজার এক পাট খুলিয়া নয়নতারা আলস্য-মন্থর কণ্ঠে কহিল, 'কে, নিমাই। এত দেরি। বসে বসে আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। আয় ভেতরে আয়।'

নিদ্রালস দীর্ঘ সুর্মা-আঁকা চোখ। খোলাচুল এলোমেলো। আঁচল বিস্রস্ত। বছর চল্লিশের গৌরাঙ্গী সুন্দরী নারী। দেহের বাঁধুনি এখনও আঁটসাঁট ও সুঠাম।

'এই নেন সিঙাড়া। এখন বসতে পারব না, বনমালী দা তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।'

'বনমালীর ত ঐ দোস। কাউকে পেলে সব কাজ তার কাঁধে চাপিয়ে নিজে বসে আলসেমি করবে।' বেশ বিরক্তির সঙ্গেই নয়নতারা কহিল। 'কোথায় ঐ শাদা পাথরের টেবিলটার ওপর রাখ ঠোঙাটা। একটু পরে চা করব। তখন খাওয়া যাবে। এখনও খানিকক্ষণ বিছানায় পড়াতে হবে। ঐ হাতলছাড়া ছোট চেয়ারটা টেনে এনে খাটের পাশে একটু বোস। তোর সঙ্গে একটু গল্প করি…।

'গঙ্গাদিদি বলল, খুব তাড়াতাড়ি। তাই সব কাজ রেখে আগে সিঙাড়া ভেজে…।

'গঙ্গার ওরকমই কথা। কিছুই তাড়া ছিল না। ভয় কি। বস না। দরকার হলে বনমালীর মালিককেও আমি বলতে পারি…।

বস্তুত: গঙ্গা ঝিকে নয়নতারা নিজেই তাড়া দিতে

বলিয়াছিল। এতটা সিঙাড়ারও তার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু নিমাইকে তার বড় ভাল লাগিয়া গেছে। মুখে কৈশোরের সারল্য, চোখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, আচরণ ব্যবহারে ভীরু সৌজন্য। ওর বাঙাল কথা শুনিয়া নয়নতারার খুব মজা লাগিত। তারপর বনমালী ও দোকানের খদ্দেরদের প্রভাবে সে অত্যল্পকালের মধ্যে চলনসই রকম পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বলিতে শিখিয়াছে। নিমাইয়ের দুঃখের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়া নয়নতারার মন ওর জন্য সহানুভূতি ও স্নেহে ভরিয়া উঠিয়াছে। নানা অজুহাত করিয়া সে ছেলেটাকে কাছে ডাকিয়া আনে। নানারকম খাতির করে। এটা দেয়, সেটা দেয়। নিমাই আরও ভয় পাইয়া যায়।

বনমালী তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। 'ওদের কিছু বিশ্বেস নেই। যতটা পারিস এড়িয়ে চলবি। তবে একেবারে চটিয়ে দিসনি। সব দিক মানিয়ে চলবি...'

নিমাই মানাইয়া চলে। নয়নতারা বেশি খাতির করিলে সে ভয় পাইয়া যায়। কিন্তু আদর তার খুব খারাপ লাগে না। সানন্দেই আহ্লাদে ছেলের মত এসব সে গ্রহণ করিত, যদি না সন্ধ্যাবেলায় এত সব লোক নয়নতারার কাছে হাজির না হইত এবং ইহাদের মাঝে বসিয়া এত সাজ পোশাক করিয়া মুখে ও চোখে বিভিন্ন রকমের রং মাখিয়া নয়নতারা হাসি-মস্করার সঙ্গে এত রাত পর্য্যন্ত ইহাদের কাছে গান বাজনা না করিত। এ সকলের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও জিনিষটা যে ভাল নয় তাহা নিমাই অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছে। তাই নয়নতারার ডাক আসিলে সে একটু ভয়ে ভয়েই থাকে।

'ওদিকের ছোট চেয়ারটা খাটের কাছে এনে একটু বস। আমি একটু না শুয়ে পারছি নে।' নয়নতারা কহিল। 'ভুতো এলে কি করবি কিছু ঠিক করেছিস?'

'না।'

'রাজাবাবু'র কাছে গেলেই চাকরি হইয়া যাইবে, এই পরম আশ্বাসের কথা সে কাহাকেও বলিতে চায় না।

'থেকে যা না আমার কাছেই।' নয়নতারা বিছানায় গড়াইয়া কহিল। 'তোরও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। অসুখ হয়ে যদি মরেও নাই, একটা লোকও একবার উঁকি দিয়ে দেখবে না। আপনার জন না থাকার মত দুঃখ দুনিয়ায় আর নেই...বস না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এখানে তোর কোনও কষ্ট হবে না। আমার একটা ছেলে থাকলে সে যেমন থাকত, তুই তেমনি...।

'আমি তো রাস্তার ছেলে দিদি। আমার কোন গুণ...'

'আমিও রাস্তার মেয়ে। সম্মান নেই, সমাজ নেই, আত্মীয়স্বজন পর্য্যন্ত নেই।' নয়নতারা উত্তেজনা প্রাবল্যে উঠিয়া বসিল। 'আমিও তোরই মত অসহায়, তোর চেয়েও বেশি অসহায় হয়ে একদিন এই প্রকাণ্ড শহরে উড়ে এসে পড়েছিলাম। কি বিপন্ন, কি অসহায় যে ছিলাম, ভাবলে এখনও শিউরে উঠি। আমার নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতি দিয়ে আমি সকল অসহায়ের দুঃখ বুঝতে পারি।...আমি বাইজি বলে খুব ঘেন্না বুঝি তোর?...'

'না না, তা ক্যান্!' নিমাই ঘাবড়াইয়া গিয়া পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় তোতলাইয়া কহিল।

'তবে আর আপত্তি করিস নি। ভুতো এসে পড়লে তুই সরাসরি ওপরে উঠে আসিস। আমি তোকে আবার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দেব। ম্যাট্রিক পাশ করবি, বি এ এম এ পাশ করবি। লোকের কাছে আমি গর্ব করে বলব, আমার ছেলে! চারটে পাশ করেছে। রাজি আছিস? রাজি হতেই হবে তোকে।' বলিয়া হাত বাড়াইয়া নয়নতারা নিমাইয়ের ডান হাতটা নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

নিমাই ভয় পাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'এখন অনেক কাজ পড়ে আছে, দিদি। এখন যাই। এখনও অনেক দিন বাকি আছে। আপনি স্নেহ করলে তা কি তুচ্ছ করতে পারি।' বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

নয়নতারা যেন প্রবল ধাক্কা খাইয়াছিল, নিমাইয়ের শেষোক্ত বাক্যে আশ্বাস পাইল। কিন্তু যাওয়াতে বাধা দিল না। নিমাই দরজার কাছে পৌঁছিবার পর কহিল।' ওপাশের বাড়ীর মেয়েগুলিকে যে তুই খাবার পৌঁছে দিতে যাস, সে আমার মোটেই ভালো লাগে না। খুব খারাপ মেয়ে ওগুলো। তাদের কোনও কথা শুনিস নি। তোদের মালিককে দেখলেই আমি বলে দেব, বাজে মেয়েদের বাড়িতে যেন তোকে না পাঠায়। পূবের কোণের ঘরের কিশোরী মেয়েটাকে মোটেই আস্কারা দিবি নে। ওর সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক যে হাসিতে ঢলে পড়ে? তোর আখেরটা নষ্ট করতে চায়, এই তো। ও রাক্ষসীদের কি দয়ামায়া আছে?...'

'না দিদি, ঐ বাড়ীতে আমি প্রায় যাইই না। বনমালীদা ওদের অর্ডার নিতেই চায় না...'নিমাই আত্ম-পক্ষসমর্থনে কহিল।

'ওরা কি পয়সা দেবার লোক! পয়সা মারতে পারলে কখনও পাওনা মেটাবার নামও করবে না। কেন যে ওদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়, বুঝতে পারিনে। যাই হোক, যতদিন দোকানে আছিস, তাদের হুকুম তামিল করতেই হবে। কিন্তু হুঁসিয়ার থাকিস। যেন কোনও প্যাঁচে আবার পড়ে যাস না।...যাবার পথে দেখে যাস ত নিমাই, গঙ্গা ফিরেছে কিনা। বাসে যাতায়াতের পয়সা দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে চট করে ফিরে আসতে পারে...'

'আমি দেখে যাব।' নিমাই দরজা দিয়া বাহির হইতে হইতে কহিল।

পালাইবার জন্য সেও ব্যগ্র। নয়নতারার প্রস্তাবে সে রাজি নয়, কিন্তু তাকে আঘাত করিতেও তার কষ্ট হয়। চেষ্টা করিয়া তার জবাবটাকে সে অস্পষ্ট রাখিয়াছে। এইবার বনবালীকে গিয়া সব কথা বলা দরকার। তার চেয়েও ভাল হয়, যদি রাজাবাবু দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া থাকেন। তাঁকে ধরিয়া একটা স্থায়ি চাকরি জোগাড় করিতে পারিলে সব সমস্যার সমাধান হয়। তখন সে নিজের একটা ঘর ভাড়া নিবে। অবসর সময় দুলী ও ননীদির খোঁজ করিবে। তাদের সন্ধান পাইলে তাহাদের বাড়ী আনিয়া একসঙ্গে বাস করিবে। এর চেয়ে বড় আনন্দের কথা সে ভাবিতেই পারে না। ক্রমশঃ—
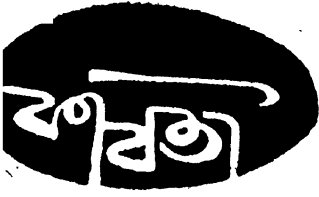
ঝড়

সন্তোষকুমার অধিকারী

ঝড়ের গর্জন এক আসন্ন বর্ষার অঙ্গীকার।
বিক্ষিপ্ত ধূলির পুঞ্জে অবলুপ্ত প্রত্যয় সবুজ—
পৃথিবীর বুক,
বাতাসে অস্থির দোলে ঊর্ধ্বমুখী তৃণের প্রত্যাশ
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ক্ষোভ
তীব্র দাবানল।

অনেক রাত্রির বুকে জমে থাকে নীল নির্জনতা
বয়ে যায় দীর্ঘদিন কুয়াশার ছায়ায় নির্বাক,
রক্ত হিম হয়ে থাকে ; সাপের খোলসে
অলস স্বপ্নের ঘুম।
সহসা উত্তর মেঘে কুণ্ডলিত দুরন্ত বিক্ষোভ
ঝড় হ'য়ে ফেটে পড়ে,
নাচে চৈত্রদিন তপ্ত অগ্নির ঝলকে।

আগুন লেগেছে কোথা? এ আগুন ক্ষুব্ধ জীবনের।
চিরায়ত বিশ্বাসের জতুগৃহ এ আগুনে
পুড়ে ছাই হয় ;
রঙের নিশানে জ্বলে রাত্রির আকাশে দিক্‌রেখা

ঝড়ের গর্জন এক প্রত্যাসন্ন বৈশাখের
রুদ্র অঙ্গীকার॥

জন্মদিনে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কতকাল আগে এই পঁচিশে ভাদ্দর
আসিলাম ধরণীতে! তোমার অধর
অমৃতে করিব সিক্ত,—তাই তো আমায়
বাঁধিলে এ ঘূর্ণ্যমান সংসার-চাকায়!
আমিতো মৃত্তিকা; প্রভু, তুমি কুম্ভকার!
ক্ষণে ক্ষণে দাও তুমি আমারে আকার।
জীবনের পানপাত্র তুলি লবে মুখে!
আনন্দে করিবে পান চুমুকে চুমুকে
ফেনোচ্ছল সোমরস;—তাই বেদনার
অগ্নিতে আমারে দগ্ধ করো বারম্বার!
তুমি স্রষ্টা! আমি তব সাধের পেয়ালা
যাহা ইচ্ছা করো তুমি। যত দুঃখ-জ্বালা
পাই আমি—বলে যাবো তোমার সৃষ্টির
প্রকল্পে কোথাও নাই এতটুকু চিড়

অহল্যা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

অহল্যার রূপ-স্নাত ঋষি-তপোবন
দুলায়—ভুলায় মন। ইন্দ্রও ভুলিয়া
প্রস্ফুটিত পদ্ম-যুগ্ম হৃদয়ে তুলিয়া
মুহূর্ত্তেক মাধুর্য্যের লভে আস্বাদন।
মর্ত্ত্যের আসঙ্গ মত্ত রূপার্ত্ত নন্দন;
রূপ-শরে মন্মথ যে বিদ্ধ করে হিয়া;
রূপ-বহ্নি—কাম-বহ্নি; পোড়ায়, পুড়িয়া
শুদ্ধ স্বর্ণে বিবর্ত্তিত করে জৈব মন।

বিষামৃতে ব্যাপ্ত হোলো চিত্ত যুগলের।
তপশ্চর্য্যা বিহনে যে শান্তি নাহি আর!
গৌতমের ব্রহ্মশাপ—দণ্ড সমাজের;
অহল্যার পাষাণীত্ব—ধ্যান-শুদ্ধাচার;
রাম-স্পর্শ—পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা প্রেমের।
ধ্যান-ধন্য দীপ্ত মূর্ত্তি অহো, অহল্যার!

স্মরণীয় সন্ধ্যা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বহুদিন পরে জীবনে মিলেছে আজ
স্থির-নম্র, শান্ত-স্নিগ্ধ শ্যামল-সুন্দর
ফুল-সুবাসিত একটি লোভনীয় স্মরণীয় সন্ধ্যা!
লবণাম্বু-উচ্ছল কল্লোল-কেলিচঞ্চল অম্বুধির মাঝখানে
দারুচিনি-লবঙ্গতরুচ্ছায়া-সমাকুল
একটি মনোহর দ্বীপের মত
এই আশ্চর্য সুন্দর অপ্রত্যাশিত সন্ধ্যা।
তার কমনীয় কম্বু কণ্ঠতটে
কোটি নক্ষত্রের স্বচ্ছ সফেদ স্ফটিক-মালিকা;
সীমন্তে শিশুশশীর স্বর্ণসিন্দুর-রাগ;
কক্ষে তরল তিমির গাগরী।
তার ললিত বিলোল নিচোলপ্রান্ত—স্খলিত
নিলীন ভৃঙ্গ কেতকী চম্পক-গন্ধে
বিবশ বিহ্বল মূর্ছিত মন্দ গন্ধবহ
এই বল্লীবেণীরম্যা বিহগ কলকাকলি-উল্লাসিনী
মায়াবিনী পল্লীপ্রকৃতির কোমল উৎসঙ্গে
আজ এই মদির মধুর তন্দ্রাতুর সন্ধ্যায়
আমার জীবনমরণশ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত দেহভার
দিলেম এলিয়ে!
নারিকেল—তালীবন—সুশীতল
এই চিক্কণ দূর্বাদল-খচিত করবী-রঞ্জন-রঞ্জিত
তুলসীমঞ্চ সুশোভিত শুভ্র গৃহপ্রাঙ্গণ;
ঝিল্লী-ঝঙ্কার-পুলকিত খদ্যোত-ঝলকিত এই বনপথ;
হংস সারস-ক্রৌঞ্চ-সুরধারা-সিঞ্চিত
স্ফুটকোকনদ তড়াগ তীর;
চারু বলয় শিঞ্জনশব্দিত মঙ্গল শঙ্খমন্দ্রিত পর্ণকুটির,
এই ত আমার কল্পনার সুখ স্বর্গধাম,—
স্বর্ণাভ দিবাস্বপ্নের অপরূপ রূপায়ণ!
ঈশ্বরের প্রসাদের মত পরম স্পৃহনীয়
এই পুষ্পপরিমলবিধুর মধুর দুর্লভ সন্ধ্যা!
আজ তাকে আমার সমগ্র সত্তায় করবো উপভোগ,
তার স্নিগ্ধতাকে চন্দনের মত মাখব তপ্তললাটপটে।
তার নিরন্ধ্র নিবিড় তমসার তরঙ্গে
কল্লোলিনী কালিন্দীর কলস্রোতে কলসীর মত
রঙ্গে ভাসিয়ে দেব অঙ্গখানি;
তার অতল শুদ্ধতাকে করব ভুঞ্জন—আস্বাদন!
এই মিথর নিশ্চিন্ত সন্ধ্যার মসৃণ শান্তি
ত্রিযামার সুখস্বপ্নের মত জেগে রইবে
আমার অন্তরের নিভৃত কোণে।
আজ নয়—অশ্রুলাঞ্ছিত ঘৃণ্য উঞ্ছ আহরণের
বেদনা-বিজড়িত ব্যর্থ প্রয়াস;
আজ শুধু অলস স্বপ্নবিলাস,—
ক্লান্ত হৃদয়ের সাথে নিরালায় ক্ষণিকের আলাপন
এই স্মরণীয় রমণীয় সন্ধ্যায়!

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

24th October, 1921. Allahabad. দিনকতক হ'ল এখানে এসে পৌঁছেছি। গত বৎসর যখন এসেছিলাম, তখন সেটা হয়েছিল দশ বৎসর পরে আসা, আর এবার যখন এলাম সেটা হল মাত্র এক বৎসর পরে আসা, কাজেই impressionটা মোটেই একরকম হওয়ার কথা নয়। তবুও যখন যমুনা ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেণটা আসছিল তখন আগেরই মত মনের ভিতর দিয়ে একটা ভাবের প্রবাহ বয়ে গেল। জগৎটাকে চিনেছিলাম প্রথম এই দেশের আলোয় চোখ মেলে, তাই একে আমার একটু বিশেষভাবে ভাল লাগে। শুধু জায়গাটা সুন্দর বলেই নয়।

এবার আসা নিয়ে বেশ কিছুদিন যাব কি যাব না ভাবনাটা চলছিল। অবশেষে যাওয়াটাই ঠিক হল। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় কলকাতা ছেড়ে চললাম বোম্বাই মেল ধরতে। দাদা জামশেদপুরে গিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর এক বন্ধু তাঁর বদ্‌লিস্বরূপ আমাদের অনেক কাজকর্ম্ম করে দিলেন। রাস্তায় তখন বিষম ভীড়, প্রতিমা বেরিয়ে পড়েছে অনেক, দর্শকের সংখ্যা গোনাই যায় না। বাঙালী crowdএর মত এমন বিচিত্র সাজে সজ্জিত জীবের দল খুব সম্ভব পৃথিবীর আর কোনো কোণে খুঁজে পাওয়া যায় না। এক দিক্ দিয়ে এটা হয়ত ভাল। এতে প্রমাণ হয় যে, বাঙালীর মন খুব receptive, সব-দেশী জিনিষই সে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এটাও প্রমাণ হয় যে, সে গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা কিছুমাত্র রুচি বা বেছে নেবার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে না।

ভেবেছিলাম সব লোকেই যখন রাস্তায় তখন ষ্টেশনে বুঝি ভীড় কিছু কম হবে, তা কিন্তু বিশেষ বোধ হল না। প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার মুখে ত রীতিমত গুঁতোগুঁতি চলেছে দেখা গেল। যাক্ কোনোমতে ত ঢুকে পড়লাম।

কামরা reserve পাবার কথা ছিল, কিন্তু ঐ কথা অবধিই রইল। শেষঅবধি চারখানা বার্থ reserve নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। এই ব্যাপারটাতে আমি চিরকালই আপত্তি আর অসুবিধা অনুভব করি। কিন্তু প্রায় প্রতি পূজোর ছুটিতেই এই ব্যবস্থাই হয়। পথে নিয়মরক্ষা করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু কতকগুলো নিয়ম আছে যা ভঙ্গ ক'রে আরাম অনুভব করা সুকঠিন। একপাল অপরিচিত-পুরুষের মধ্যে শুয়ে ঘুমনো তার মধ্যে অন্যতম। সারারাত শুয়ে ত রইলাম কিন্তু সর্ব্বক্ষণ লোক ওঠা নামা এবং তাদের সঙ্গে তর্কবিতর্কের চোটে ঘুম যে কোন্ দেশে পালাল তার ঠিকানা নেই।

সকাল বেলা উঠে বসে চা জলখাবার খেয়ে মন্দ লাগল না। উত্তর পশ্চিমের মাটির প্রতি কেমন একটা আশ্চর্য টান আমার আছে। দেশটা দেখতে সুন্দর, আমার শৈশবের আবাসভূমিও বটে, তাই এত ভাল লাগে বোধহয়। জন্ম-জন্মান্তরের কোনো বন্ধন এর মধ্যে লুকিয়ে আছে কি না কে জানে? আমার প্রায় বিশ্বাস যে এই মাটির বুকে আমি অনেকবার জন্ম নিয়েছি।

চুনারের দুর্গ যতক্ষণ দেখা গেল, খুব হাঁ করে দেখলাম। এরই কত কথা সেদিন ছাত্রীদের পড়িয়ে এসেছি। বিদেশী ভাষায় লেখা, নিরস পাঠ্য পুস্তকে, কিই বা তারা রস পাবে? তার চেয়ে একবার যদি এই দেশটা কেউ তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে জীবনে আর ইতিহাস ভাল না লাগার কথা তাদের মুখে শোনা যাবে না। বিন্ধ্যাচলের দৃশ্য সুন্দর, তবে হিমালয়ের পর এর মধ্যে grandeur-এর কিছু যেন অভাব লাগে। তবু নীচু নীচু পাহাড়ের শ্রেণী প্রান্তরের বুকে ঢেউয়ের মত কেবলই ফুলে ফুলে চলেছে এও একরকম দেখতে বেশ। এদেশে গাছের মধ্যে বাবলা নিম, অশ্বত্থ আর তেঁতুলেরই প্রাচুর্য বেশী। শ্যামলতার ঘটা কম, বন্ধুর অনুর্ব্বরতা বরং বেশী, কিন্তু সুজলা, সুফলার চেয়ে একে আমার বেশী সুন্দর লাগে। গাড়ীতে বসে বসেই ঠিক হতে লাগল যে চুণারে বেড়াতে আসা যাবে।

Bombay mail-এর এক হাঙ্গাম যে সোজা এলাহাবাদে পৌছান যায় না। চিওকিতে বদল করে আবার এক shuttle train-এ উঠতে হয়। খানিক হুড়োহুড়ি করে গাড়ী বদল করা গেল। নূতন গাড়ীতে দুটি সাহেব সহযাত্রী দেখলাম, একটি যুবক, আর একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধটি শুধুই মোটা, যুবকটি লম্বায় চওড়ায় অসাধারণ। চিওকির থেকে ঘণ্টা খানিকের মধ্যে এলাহাবাদে এসে হাজির হলাম।

ষ্টেশনে লোক থাকবে আশা করা গিয়েছিল, তা বিশেষ কাউকে দেখা গেল না। পরে তার কারণ শুনলাম যে, চিঠি তাঁরা কেউই পাননি। খানিক অপেক্ষা করার পর কুলি এবং গাড়োয়ান প্রভৃতির সঙ্গে প্রচুর তর্কাতর্কি ও মারামারি গোছের রফা করে অবশেষে বেলা ১২টায় মেজর বসুদের বাড়ী অতর্কিতে আক্রমণ করা গেল। বেশ খানিকটা চেঁচামেচি এবং ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ কলধ্বনি উপভোগ করা গেল।

কথা ছিল আমরা প্রথম তাঁদের বাড়ী উঠব বটে, তবে অবিলম্বে অন্য বাড়ী ঠিক ক'রে সেখানে চ'লে যাব। গঙ্গার ধারের বাড়ীই মায়ের পছন্দ, সেই গোছের বাড়া গোটা দুই এঁচেও রাখা হয়েছিল। আহার বিশ্রামান্তে বাড়ী দেখবার জন্যে দারাগঞ্জের দিকে যাত্রা করা গেল। এই পাড়াটি বাহাদুরগঞ্জ থেকে অনেক দূরে। Drive-টা খুব উপভোগ করা গেল, কারণ রাস্তাটা সবই প্রায় শহরের বাইরে দিয়ে। মস্ত মস্ত মাঠ, ঘাসের বনে ঢাকা, একটার পর একটা চলেইছে, চলেইছে। এদিকের রাস্তাগুলি বড় সুন্দর, তবে ধূলো অসাধারণ রকম বেশী। Traffic-এর ঘটা বড় একটা নেই, কদাচিৎ দু একটা এক্কা বা গরুর গাড়ী। আকবরের ফোর্টের সামনের দিকের দরজা বোধ হয় এই দিকে। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছিল, সেটা এইরকম প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপরে আরো একটু বেশী মহিমা আরোপ করে দিল।

দারাগঞ্জে পৌছে প্রথম গাইড সংগ্রহের আশায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হলাম। ইনি বাবার বিশেষ বন্ধু, মহা পণ্ডিত বলে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এঁর খুব খ্যাতি। শুনলাম, পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত। বামনদাস বাবু নেমে গেলেন। বাবাও গেলেই পারতেন, কারণ এর ক'দিন পরেই ভদ্রলোক মারা গেলেন।

এইখানটি একেবারে গঙ্গার উপরে। বর্ষার সময় গঙ্গা নাকি এগিয়ে এসে সামনের বাড়ীগুলির সিঁড়ির তলায় হাজির হন। বামনদাস বাবুর দেরি দেখে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ে নদীর ধারে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। সূর্য্য তখন অস্ত যাবার মুখে। এখানে লোকজন বেশী নেই, যা আছে অধিকাংশই সাধু সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী গোছের। বাড়ীগুলিও বেশীর ভাগ ধর্ম্মশালা বা মন্দির। গঙ্গার ধারটি খুবই সুন্দর হ'ত যদি না আমাদের দেশে লোকের পবিত্র জিনিষকে অভ্যাসদোষে অপবিত্র করা উৎপাতটা থাকত। একটি মানুষ দেখলাম নদীর স্রোতের মধ্যে একখানি তক্তপোশ খানিকদূর নামিয়ে বসে আছে, মাথার উপর একটুখানি হোগ্লা পাতা না কিসের ছাউনি, এই তার বাসস্থান। অমন করে থাকতে পারলে অনেক আপদ চুকে যায়।

পণ্ডিত মহাশয়ের ছেলে সত্যব্রত বাবুকে গাইড রূপে নিয়ে ত বাড়ী দেখতে চললাম। বাড়ী যা দেখলাম তাতে চোখ কপালে উঠবার জো হ'ল। যেমন সিঁড়ি, তেমন ঘর, তেমনি; privacy একমাত্র redeeming featu[re] হ'ল যে সামনে গঙ্গার view ভারি সুন্দর। কিন্তু view খাওয়াও চলে না, পরাও চলে না। গোটা চার-পাঁচ বাড়ী lodging দেখা গেল। একটা দেখতে বেশ সুন্দর, পুরা[নো] মোগল রাজপ্রাসাদের ছাঁচে তৈরী। দেওয়াল ও ছ[াদ] নানা কারুকার্য্যে ভরা। একে নিয়ে গল্প লেখা চলে বে[শ,] তবে থাকতে যে বিশেষ comfortable হবে, তা ম[নে] হল না। সর্ব্বত্রই দেখলাম প্রয়োজনাতীত আনন্দ লাগ[ে] ব্যবস্থা বেশ ভালই আছে, তবে প্রয়োজনাতীত পূরণের ব্য[বস্থা] কোথাও বিশেষ কিছু দেখা গেল না। আকাশে মেঘ আ[রো] ঘনিয়ে আসাতে ঘরগুলি বড় বেশী রকম অন্ধকার দেখাচ্ছি[ল।] সব কিছু দেখে শুনে একান্ত নিরাশভাবে আবার [ফি]রে গাড়ীতে ওঠা গেল। বেড়ান এবং দৃশ্য দেখা হিসা[বে] সময়টা বেশ ভালই কেটেছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির [দিক] দিয়ে একেবারেই নিষ্ফল। ফিরবার পথে বেশ ঝ[ড়]

ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল, অন্ধকারটাও এমন জমাট বেঁধে উঠল যে ভাল ক'রে কিছু আর দেখা গেল না।

সেদিন ক্লান্তও হয়েছিলাম এবং অনভ্যস্ত পরিবেশে মনটাও খানিকটা depressed লাগছিল, কাজেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হতেই ঘুমের চেষ্টা দেখলাম। কিন্তু কতগুলি অতিকায় মশকের অত্যাচারে ঘুমটা যে খুব জমল তা বলা যায় না। সকালে উঠে হাতের আর মুখের যে দশা দেখলাম তাতে হাসব কি কাঁদব তা ভেবে পেলাম না।

26th October, এখানে এসে আর কিছু জোগাড় করি বা নাই করি, দিবানিদ্রাটি বেশ পাকারকম জোগাড় করেছি। রোজ ভাবি যে দুপুরে একটু লিখতে বসব কিন্তু ঘুমে চোখের পাতা এমন জুড়ে আসে যে আর কিছু করা চলে না। আজ সকালে দুজন visitor এসেছিলেন একজন ন—এবং আর একজন অভিধান প্রণেতা জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস। বাবা সম্প্রতি note লেখা নিয়ে এমন ব্যস্ত যে তাঁরা ঘরে ঢুকে একটু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে বেরিয়ে এলেন। ন—বাবুকে মাঝপথে আটকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করেই আতিথ্য করলাম। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলার ভার মা নিলেন। সে ভদ্রলোক আমাদের এমন অপোগণ্ড stage-এ দেখেছেন যে তাঁর সঙ্গে এখন গিয়ে কি যে কথা বলব তা ভেবে পাওয়াও শক্ত।

আমরা দ্বারাগঞ্জে বাড়ী দেখে নিরাশ হয়ে ফেরার পর বাবা দিনকতক সকাল সন্ধ্যা বাড়ী দেখে বেড়ালেন, কিন্তু সুবিধা মত কোনো কিছুর সন্ধান মিলল না। এরপর ক্ষুণ্ণমনে কলকাতায় ফিরে যাওয়ারই ব্যবস্থা হতে লাগল, যদিও বামনদাসবাবুরা এতে অত্যন্তই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন।

যাক্, বেড়িয়ে চেড়িয়ে খানিকটা নেওয়া হচ্ছিল এরই মধ্যে। পরদিন দ্বাদশী ছিল বোধহয়, বাড়ীর গৃহিণী গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। আমরা দুই বোন আর মা, তিন জনে তাঁর সঙ্গ নিলাম। গাড়ী করে মনস্কামনেশ্বরের ঘাটে গিয়ে গাড়ী ছেড়ে দেওয়া গেল। নৌকা করে এরপর বেণীঘাটের দিকে যাত্রা করা যাবে। এই মনস্কামনেশ্বর ঘাট এবং মন্দিরের কথা আগে কখনও শুনিনি যদিও তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। গাড়ী চড়ে আসতে আসতেই পথে পাণ্ডার আবির্ভাব দেখা গেল। আমরা যাত্রী নয় বলে সব ক'জনকেই ভাগিয়ে দেওয়া হ'ল। একজন enterprising ছোকরা কিন্তু শেষ অবধি টিঁকেই রইল। ঘাটে পৌছে নৌকাওয়ালা-দের সঙ্গে কিছু বাক্‌বিতণ্ডার পর একখানা ছোট নৌকাতে আমরা ছ' সাতজন ত উঠলাম। যমুনা সেদিন বেশ "তরঙ্গ আকুলা", ভারি সুন্দর দেখতে। তবে recent বৃষ্টির কল্যাণে জলের রং ঘোলা হয়ে গিয়েছে। ওপারের "আড়াইল" গ্রাম ও ঝুঁশির চিত্র আকাশের গায়ে ম্লান রঙে আঁকা। নদীর বুকে আরো কত নৌকা যে চলেছে তার ঠিকানা নেই। যেমন বিচিত্র তাদের আরোহীদের বেশ ভূষা, তেমনি বিভিন্ন তাদের জাতি। মারাঠী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, বাঙালী, উড়িষ্যাবাসী সবরকম আছে। যাত্রিণীদের নানারঙের শাড়ী দৃশ্যপটে বেশ রঙের ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। আকবর শাহের পুরণো দুর্গের গা ঘেঁষে নৌকা চলতে লাগল। এখানটা এখন সেনাবাস। যমুনার উপর পুরণো দুর্গের পাষাণ গায়ে সৈন্যদলের জন্য সারিসারি হালকা ও আধুনিক ঝোলান বারান্দা চোখের পীড়া উৎপাদন করছিল। এখানে বসে নদীর শোভা দেখার খুব সুবিধে। এগুলি এবং উপরের একজায়গায় খানিকটা তারের বেড়া বাদ দিলে আর বিশেষ কিছু আধুনিক উৎপাত চোখে পড়ে না। দু'চার জায়গায় পাথরের জালি ভেঙে পড়ায় লোহার রেলিং লাগান হয়েছে। মোটের উপর মোগল বাদশাহের দুর্গ এখনও আপনার আসল পরিচয় লোকের কাছে দিতে পারছে, তাকে আধুনিকতার আবরণে অবলুপ্ত করে ফেলা হয়নি। এটিও লাল পাথরে তৈরী। যমুনায় নামবার পুরণো যে সব পথ ছিল তার বেশীর ভাগই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ত্রিবেণী সঙ্গম এবার চোখে পড়ল। নামে ত্রিবেণী হলেও কার্য্যতঃ দুটির বেশী বেণী এখন দেখা যায় না। গঙ্গা আর যমুনার রঙের পার্থক্য দূর থেকে যেমন পরিষ্কার দেখায়, কাছে এলে ততটা বোঝা যায় না। তবে দুটি আলাদা স্রোত যে পাশাপাশি যাচ্ছে তা বোঝা যায়। গঙ্গার জলের গভীরতা খুবই কম, কিন্তু টান ভয়ানক। নৌকা আসল সঙ্গমের ধারে কাছেও গেল না। বেণী ঘাট বলে সবাই যেখানে ভক্তিভরে স্নান করছে, তর্পণ করছে, অস্থি বিসর্জ্জন

করছে, তা একান্তই খাঁটি যমুনা, তাতে গঙ্গার নামগন্ধও নেই। সবাই কিন্তু এতেই মহাখুশী। ঘাটে যখন এসে নৌকা বাঁধল তখন সেই তুমুল কোলাহলে স্বভাব শোভায় মগ্ন মন একেবারে চমকে গেল। যমুনার উদার বুকে যে নৌকাগুলিকে এবং তাদের যে আরোহীগুলিকে ছবির মত সুন্দর লাগছিল, তারা যখন অনাবশ্যক রকম কাছে ঘেঁষে এসে ঘাটের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে সবাই স্থান নিল এবং নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণ করতে বসল যে তারা সজীব মানুষ, আঁকা ছবি নয়, তখন তাদের একেবারেই মনোহর লাগল না। লোকের কি ভীড়, আর ঐ একটুখানি ঘোলা জলের ভিতর কি ঠেলাঠেলি। অতখানি জায়গা জুড়ে যে গঙ্গা যমুনা বয়ে চলেছে, তাতে ঘাটেরও অন্ত নেই, কিন্তু সবাইকে এখানে এসেই কাদাজলে চুবুনি খেতে হবে। তাও যদি বুঝতাম যে স্থান-মাহাত্ম্য। আসল সঙ্গম কোথায় রইল প'ড়ে তার ঠিকানা নেই, যমুনার পাঁচ হাত জায়গায় এই লাফালাফি। মনে পড়ে ছেলেবেলায় কত শত বার এসেছি এখানে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে। ভীড়, কল-কোলাহল, পাণ্ডাদের হরেক রকম অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা, সবই খুব কৌতূহল নিয়ে দেখতাম, কিন্তু জলে নামবার কথা উঠলেই ভয় পেয়ে যেতাম। ঘাটের কাছে, যাত্রীদের গায়ের উপরেই অনেক সময় ভুস্ ভুস্ করে শুশুক ভেসে উঠত, আর ছেলেপিলেরা আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠত। আমাকে কিছুতেই জলে নামান যেত না, মা বা আর কেউ অঞ্জলি করে জল নিয়ে মাথায় দিয়ে দিতেন।

তবুও ঘাটটার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, তা স্বীকার করতেই হয়। নানা জাতির লোক, জলের প্রবাহ, তীর-ভূমিতে শত শত ধ্বজা পোঁতা, মানুষের হাজার ভাষায় কোলাহল এও সেদিন সকাল বেলা বেশ লাগছিল। তীর্থ-স্থানের এমন একটা মহিমা আছে যা তার আনুষঙ্গিক আবিলতাকে ভেদ করেও বেশ সহজে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এটা পুরীর মন্দিরেও মনে হয়েছিল। আমাদের বাঙালী মেয়েদের লজ্জাশীলা বলে খুব নাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় পথে ঘাটে বা তীর্থক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় না। স্নানার্থীদের কাণ্ড দেখে নিজেদেরেই লজ্জা করে।

পাণ্ডারা মহাব্যস্তভাবে সবাইকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একজনের আমাদের নৌকাতেও আগমন হ'ল, যদিও তিনি বিশেষ আমল পেলেন না। আমরা সকলকে যত দেখছিলাম, সকলে তার চেয়েও ঢের বেশী ক'রে আমাদে দেখছিল, তাতেই যা একটু অসুবিধা হচ্ছিল। সঙ্গিনীদে স্নানান্তে, যে পথে এসেছিলাম, সে পথেই ফেরা গেল। রো বেশ প্রখর হয়ে উঠেছিল তবে নদীর বুকে হাওয়াও তখ প্রবল, গরমটা তেমন লাগেনি।

এরপর হঠাৎ একটা বাড়ী জুটে গেল কেমন করে ছোট একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী, অনেকখানি ঝোপ ঝাড় ভরা জমির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা বে মেরামত হয়ে গেছে, তবে একটু সারিয়ে সুরিয়ে নি কয়েকটা দিন থাকা যাবে।

29th October, আমার মত অকারণে সময় অপব্য করতে আর বোধ হয় কেউ পারে না। পরশু ছুতো বা করলাম যে দুপুরে যখন বামনদাসবাবুদের বাড়ী নিমন্ত্র যেতে হবে তখন আজ আর কিছু করা চলে না। ত ওখানে গিয়ে কিছু সুবিধা বোধ হল না। আর দু'চারজ যে অভ্যাগত ছিলেন তাঁরা এমনই সভ্যভব্য মানুষ যে একবার কথা বললেন না। প্রভার অসুখ, এবং সুজাতা কা ব্যস্ত। আর একটি বালিকা বন্ধু ঘন ঘন রাগ করে গোস ঘরে খিল দিচ্ছে। রান্না বান্না হতেও দেরী হচ্ছে। কোন মতে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে বেলা আড়াইটে আন্দাজ খুব খানি খেয়ে প্রস্থান করা গেল। কাল সারাদিন শরীরটা কে যেন খারাপ হয়ে রইল। আজও recover করেছি ব মনে হচ্ছে না। কাল বিকেলে নৌকা চড়ে নদীতে খানি বেড়িয়ে এলাম, এবার বেণী ঘাটের উল্টো দিক্ বরু ঘাটের দিকে। উঠেছিলাম যখন নদী বেশ "বীচি-বিক্ষো শালিনী" তবে অত্যন্ত রোদের জন্য খুব বেশী enjoy করা পারলাম না। বরুয়া ঘাট পার হয়ে খানিকটা জায়গা ঠি পাহাড়ে দেশের মত, খুব সুন্দর দেখতে। নদীর উপরে খুব উঁচু পাড়, তার গা বেয়ে সরু সরু আঁকা বাঁকা পথ উঠে তার এধার ওধার গরু চরছে, আর হিন্দুস্থানী মেয়ের দ পিতলের ঝক্‌ঝকে কলসীতে নদীর জল ভ'রে নিয়ে ভ ঘট মাথায় দিব্য ঐ খাড়া পথগুলি দিয়ে উঠে যাচ্ছে।

আর একদিন এখানকার water works দেখে এলাম জায়গাটার নাম করেলা বাগ। এমন অসাধারণ দুর্গন্ধ

পাঁচমিনিট দাঁড়ান যায় না। যা হোক, সেখানে নেমে অনেকগুলি কলকব্জা দেখা গেল। সে গুলির বেশী কাছাকাছি যাবার সাহস হল না। তখনো অন্ধকার হয়নি, কাজেই খসরুবাগে ঢুকে পড়া গেল। সাধারণ লোকের কাছে এ সময় গেট বন্ধ, আমরা অন্য দিকের ছোট গেট দিয়ে ঢুকে কিছু সুবিধা পেলাম। জলের tankগুলির উপর জ্যোৎস্না পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। এ দিকটায় বাগান ব'লে কিছু নেই, একেবারে wilderness. এখানকার কর্ম্মকর্ত্তা এক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী এইদিকে। বাড়ীটি আলোকিত এবং সেখান থেকে হার্মোনিয়মের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাঙালী মানুষ দেখে তাঁদের হয়ত কৌতুহল হয়ে থাকবে, অথবা বাবাকে নামে চিনেছিলেন। একটি ছোট খুকী হঠাৎ বেরিয়ে এসে বলল "জ্যাঠাইমা বাড়ী আছেন।" তখন চন্দ্রালোকে খসরুবাগের রূপ দেখতে ব্যস্ত ছিলাম, কাজেই জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করাটা আর তখন হয়ে উঠল না। জ্যোৎস্নায় তাজ দেখতে যাওয়ার একটা নিয়ম আছে বটে, কিন্তু সত্যিই এ ধরণের জায়গা দিনের আলোয় তত ভাল লাগে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা যমুনা ব্রিজে বেড়িয়ে এলাম। নিতান্তই সাধারণ একটা ব্রিজ, অথচ ছেলেবেলায় এর মধ্যে কত রোমান্স, কত আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যই না দেখেছি। এখন মনে করলে অবাক্ লাগে। সে সব দিনই ছিল অন্যরকম।

নূতন বাড়ীতে উঠে আসার পর একদিন যেখানে যেখানে দেখা করা দরকার ও visit return করা দরকার, তা করবার জন্যে বেরোলাম। প্রথম গেলাম বামনদাস বাবুদের বাড়ী। সেখান থেকে জন-দুই সঙ্গিনী জুটিয়ে চললাম। জগত্তারণ স্কুলে। তবে সেখানে যাঁদের চিনতাম তাঁদের বেশী কাউকে পাওয়া গেল না, সব বেড়াতে গেছেন। জন-দুই ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা ব'লে আমার এক বহু পুরাতন বন্ধুর সন্ধানে চললাম। তিনি নাকি দুবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আমরা তখন বাড়ী ছিলাম না। প্রথম একটু কোম্পানীর বাগানে ঢুকে ঘুরে গেলাম। বন্ধুর বাড়ী পৌছে আমরাও অবশ্য তাঁর দেখা পেলাম না, তিনিও বেড়াতে গেছেন। তাঁর পুত্রকন্যাগুলিকে দেখলাম; একটি মেয়ে বেশ সুন্দর। বাড়ীটি খুবই সাহেবী ফ্যাশানে সজ্জিত, তবে বাড়ীর গৃহিনী, অর্থাৎ আমার বন্ধুর মা নিতান্তই ঘরোয়া বাঙালী বেশে বারান্দায় বসে খাবার করছিলেন। আমরাও সেখানে মাদুর পেতে বসে খানিক গল্প করলাম। অতঃপর বাচ্চাদের বিদ্যার পরিচয় নিয়ে এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করে বাড়ী ফিরলাম। আর একদিন boating excursion করে আসা গেল, তবে প্রথম দিনের মত অত ভাল লাগল না।

মধ্যে মধ্যে বাহাদুরগঞ্জ থেকে একটি বালিকা এসে আমাদের খুব entertain করে যেত সারা দুপুর ধরে। গল্পের বিষয় ছিল আমাদের নামে সকলে কি বলে, বিশেষ ক'রে ঘরে বাইরে ভদ্রলোকের দল। এক ভদ্রলোক এইসব গল্পে খুব figure করতেন, তিনি উক্ত মহিলার প্রাইভেট্ টিউটর। তিনি নাকি দিদির খুব প্রশংসা করেছেন, তার কারণ দিদি খুব মিষ্টি করে কথা বলে। আমি দেখতে সুন্দর সেটা তিনি স্বীকার করেছেন বটে, তবে কথাবার্ত্তা তত ভাল লাগেনি বোধহয়। একটা বিষয় তাঁর আশ্চয্য লেগেছে যে আমরা বি. এ. পাশ এবং এত নামজাদা মানুষ হয়েও ঠিক সাধারণ মানুষের মত চলি ফিরি, কিছুই চাল মারি না। বাস্তবিকই আশ্চর্য্য বটে। চাল মারবার ইচ্ছাটা একেবারেই নেই তা নয় তবে হাড়ে হাড়ে সাধারণত্বটা এমনই বসে গেছে, যে সেটাই সব পালিশ ভেদ করে লোকের চোখে ধরা পড়ে। যশ আমার একটা হয় বটে, তবে যে কারণে হয় আমার সেটা খুব পছন্দ নয়।

30th October. ছুটিটা প্রায় শেষ হয়ে এল। একটা সপ্তাহ আর হাতে আছে। তারপর লক্ষ্ণৌ ঘুরেই হোক কি সোজা এখান থেকে হোক, কলকাতার দিকে রওনা হতে হবে। আবার সেই স্কুলের গাড়ীর সহিসের ডাক, গলি দিয়ে নিত্য যাওয়া আসা, আর যত ছাত্রী খেদিয়ে বেড়ান। অবশ্য এরও মধ্যে interesting জিনিষ দু-চারটে আছে।

নূতন বাড়ীটা comfortable নয়, বেশীরকম বুনো। অনেকটা জমি আছে আগাছায় ভরা, একটা কুঁয়োও আছে। যদি পৌর কর্তৃপক্ষ জল না দেন, তাহলেও শুকিয়ে মরব না। বড় বড় গাছও আছে গোটা কয়েক, দেখতে মোটের উপর ভালই। দিদির ছবি আঁকার খুব সুবিধে হয়েছে। আমার লেখার সুবিধা ততটা কিছু হয়নি।

4th November, Calcutta. পরশু প্রবাসযাত্রা শেষ করে আবার স্বস্থানে ফেরা গেছে। ফেরার পর ঘর গোছান আর কাপড় চোপড় গোছান ছাড়া আর যে কিছু করেছি ব'লে মনে পড়ছে না। সেই যে তেতলার ঘরে উঠেছি, সেখান থেকে নামিনি একবারও। ট্রেণের journey-টা বড় unpleasant হয়েছিল। সাক্ষাৎ পেত্নী-রূপিণী গুটিকয়েক মহিলা তাঁদের সঙ্গসুখে আমাদের মোহিত করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গী পুরুষগুলিও ভব্যতায় ছিলেন অসাধারণ। এই সময় শান্তিনিকেতনের দল সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন এখানে "বর্ষামঙ্গল" করবার জন্য। খুব কদিন ছুটোছুটি করা গেল, জোড়াসাঁকোয় rehearsal শুনবার জন্যে। "বর্ষামঙ্গল" জোড়াসাঁকোর লাল বাড়ীর পাশের জমিতে প্যাণ্ডাল বেঁধে হল। দুদিন অনুষ্ঠান হয়েছিল, দ্বিতীয় দিনেরটাই জমেছিল বেশী। ঢের নূতন গান তৈরী হয়ে গেল এর জন্যে। দু-দিনই অবশ্য গিয়েছিলাম। আর একদিন হবার কথা ছিল, কিন্তু কবিবর হঠাৎ শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়াতে আর কিছু হল না।

6th December. আমি মানুষটা স্বভাবতই কুঁড়ে তার উপর থেকে থেকে এমন একটা আশ্চর্য আলস্যের বান ডাকে যে, যেসব কাজ কেউ ঘাড়ে ধরে করিয়ে না নেয়, তা আর হয়েই ওঠে না। কাজের বোঝা যতই বিরাট্ হয়ে উঠতে থাকে মন ততই বেশী ক'রে খারাপ হয় কিন্তু কুঁড়েমির মায়া কাটিয়ে হাত পা নাড়া আর হয়ে ওঠে না। এবারেও কিছু কাল যাবৎ এইভাবেই দিন কাটছে। "রজনীগন্ধা"র instalment বাকি পড়েছে, স্কুলের পরীক্ষার খাতার ঠেলায় প্রায় চাপা পড়ার জোগাড়, একে ওকে তাকে লেখা দেব ব'লে কথা দিয়ে রেখেছি, কিন্তু কাউকে এখনও দিইনি। স্কুল থেকে ছুটিও মধ্যে মধ্যে দু চারদিন পাচ্ছি, সেগুলো কাটছে হয় লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেয়ে, না হয় আর কিছু ঐ রকম অপকর্ম্ম ক'রে।

গত শনিবারটা এক সহকর্ম্মিণীর বাড়ী বেড়াতে গিয়েই দিন কেটে গেল। অনেকদিন হ'ল সে ব'লে রেখেছে, যাওয়া আর কিছুতেই ঘটে ওঠে না। একবার নিতান্ত যেতেই হয়; দারোয়ান একজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। বাড়ী খুঁজতে একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল, তা বেশী কিছু নয়। এক প্রেসের উপর দিয়ে ত সোজা উপরে উঠে এক পাল ছাত্রী ও সহকর্ম্মিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এরপর আর কোনো ভাবনা রইল না। বেশ কয়েকজন কাচ্চাবাচ্চা মিলে এমন জমিয়ে তুলল যে, বড়দের আর কথা বলবারও দরকার হল না। সহকর্ম্মিণী নিশ্চিন্ত মনে রান্না করতে প্রস্থান করলেন, অতিথিকে খাওয়াতে হবে ত? সনাতনপন্থী খানিকটা হলেও এরা খুব বেশী গোঁড়া নয়, কাজেই আমাদের আবির্ভাবে বিশেষ কিছু বিস্ময়ের উদ্রেক হল না। দুচার জনের একটু সচকিত ভাব দেখলাম। ছোট খোকাখুকীর দল এবং ছাত্রীর দল গান শুনিয়ে এবং গল্প করে বেশ সময় কাটিয়ে দিল। তাপর পেট ভরে খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরলাম। ফিরবার আগে বাড়ীর খোদ গৃহিণী ফিরে এলেন, তিনি এতক্ষণ পিত্রালয়ে ছিলেন। আমার চেহারা দেখে তিনি নাকি বেজায় অবাক্। আবার বসে তাঁকে দুটো গানও শোনাতে হল।

পরদিন বন্ধুর কাছে শুনলাম যে সকল দিক্ দিয়ে আমা হেন সুপাত্রীর এখন পর্য্যন্ত বিয়ে না হওয়াতে তিনি অত্যন্তই বিস্মিত হয়ে গিয়েছেন।

স্কুলটা ত খুলেছে একমাস হতে চলল, কিন্তু সেখানে এখন খারাপ সময় যাচ্ছে, ফুর্ত্তি করবার কোনো আয়োজন আর সেখানে নেই। নেহাৎ চলতে হয় তাই কোনমতে টেনে বুনে দিন কাটছে। প্রথমেইত যেদিন স্কুল খুলল, সেদিনই রাত্রে সদ্য বিলাত প্রত্যাগতা Lady Principal স্বর্ণদি stroke হয়ে মারা গেলেন। সে এক ব্যাপার! দুদিন ত স্কুল হলই না, তারপর কোনমতে কর্ণধারহীন নৌকাকে সামলান হল। আবার আস্তে আস্তে কাজ সুরু হল। দুচারদিন যেতে না যেতে হেমবালাদি তাঁর ছোট বোন সুনীতির অসুখে বিষম ব্যস্ত হয়ে রাঁচি চলে গেলেন। সেখান থেকে অত্যন্ত depressing রকম চিঠিপত্র আসতে লাগল। দুজন সহকর্ম্মিণী, যারা বিশেষ বন্ধু ছিল, তারাও পাকাপাকি স্বামীর ঘর করতে প্রস্থান করল। আর একজনের বেশ অসুখ করল, ডাক্তার তাকে কিছু কালের জন্য কলকাতা

ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। সব জড়িয়ে সে যে একখানা অবস্থা হ'ল তা আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

যাক্, কয়েকদিন পরে একটু ক'রে উন্নতির লক্ষণও দেখা দিল। যারা পাকাপাকি প্রস্থান করেছিল, তারা অবশ্য আর ফিরল না, তবে তাদের অদর্শনটা সয়ে এল। হেম-বালাদির চিঠির সুর ফিরল, তাঁকে নানা রসিকতাপূর্ণ চিঠি লিখে বেশ খানিকটা সময় কাটতে লাগল। যাঁকে 'ডাক্তার change-এ পাঠাচ্ছিলেন তিনি বললেন যে এখন তিনি যাবেন না, শরীর এখানে ভালই আছে।

12th December আজকে "দরবার ডে" উপলক্ষ্যে স্কুল বন্ধ, কাজে কাজেই সারাটা দিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিলাম। অবশ্য রোজই যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে তা নয়, বসেই থাকতে হয় বেশীর ভাগ দিন। তবে গত শুক্রবারে একটা ছোটখাট কাণ্ড হয়ে গেল বটে। স্কুল থেকে ফিরে চা খাবার জোগাড় করছি এমন সময় রাস্তায় গোলমাল শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। চারুবাবু রাস্তার দিক্ থেকে ফিরছেন দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কি হয়েছে। তিনি বললেন "কয়েকজন ভলাণ্টিয়ারকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। বামনদাসবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি তাদের দেখে চেঁচিয়ে বলছেন "বন্দে মাতরম্" তাই তাঁকেও arrest করল, আবার ক'মিনিট পরে ছেড়েও দিল। শুনে ঘরে ঢুকেছি এমন সময় বাবা এসে বললেন হেমুকে আর সুধীরবাবুকেও ধরে নিয়ে গেছে।*

আমরা ত অবাক্। এ সব উৎপাতের কথা কাগজেই পড়ি, চোখে ইতিপূর্ব্বে দেখিনি।

সেদিন আবার আমাদের পাড়ার clubটির meeting ছিল। আমি Secretary, কাজেই আমাকেই স্থির করতে হল যে সভা বসবে কি না। সহকারীদের ডাকাতে তাঁরা বললেন যে notice যখন দেওয়া হয়েছে তখন করতেই হবে। অগত্যা বেরোলাম। মিনিদের বাড়ী গিয়ে খানিক-ক্ষণ বসলাম। আরও দু'চারজনও এল। আলোচনার ঐ এক topic। কয়েকজন মেয়ে মিলে অতঃপর Social Fraternity-র নির্দ্দিষ্ট ঘরে গেলাম। দেখলাম, ছেলেরা তখনও কেউ আসেনি। একটা শতরঞ্চি টেনে নিয়ে ত ছাদে বসা গেল। ছেলেরা ক্রমে দু'চারজন ক'রে আসতে লাগল। নানা খবর শুনলাম। যা হোক কথাবার্ত্তা ব'লে মনের শঙ্কাকুল ভাব খানিকটা কেটে গেল।

ছাদে বেশ হিম পড়তে আরম্ভ হওয়ায় ঘরে ঢুকতে হল। কিন্তু সভ্যদের attendance সেদিন এমন বেড়ে গেল যে ঘরে ধরানো দায়। যাঁরা কোনদিন আসেন না, তাঁরাও অনেকে এসে জুটলেন। প্রোগ্রামে আগে যা ঠিক ছিল তার খানিক খানিক হল। হিতেন্দ্রমোহন বসু পারসিক কবিতা সম্বন্ধে একটা বেশ interesting paper পড়লেন। পুলিশের উৎপাতের বিষয় সারাক্ষণই আলোচনা চলতে লাগল। প্রশান্ত থেকে আরম্ভ করে কয়েকজন ছেলেই দেখলাম এই arrest-এর বিরুদ্ধে protest জানাবার জন্যে নূতন কেনা খদ্দর পরে এসেছে। ওখানকার কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ী ফিরলাম, শুনলাম বাবা ধৃত ব্যক্তিদুটির খবর নিতে বেরিয়েছেন। তিনি ফিরলে শুনলাম রাত্রে তাদের লাল-বাজার থানায় রাখা হয়েছে।

রাতটা ভাল কাটল না। শোবার পরই দিদির অসুখ করল। খুব কাশি, হাঁপানীর টানের মত ভাব। তার সেবা মা করতে বসলেন, অতএব আমি একটু ঘুমোবার আশায়, দাদার তক্তপোশে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। সে তখন গিরিধিতে আছে ব'লে জানি। যেই না শোওয়া অমনি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে সদর দরজায় দুমদাম শব্দ এবং দাদার হাঁক, "দরজা খোল।" ভীষণ চটে আবার বালিশ বিছানা টানতে টানতে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ঘুম আর হল না, বলাই বাহুল্য। ভোরের বেলা উঠে শুনলাম, বাবা আরো ভোরে উঠে বেরিয়ে গিয়েছেন কোথায় যে গিয়েছেন তা বলেও যাননি। প্রায় বেলা বারোটায় প্রশান্তর বাবা খবর দিলেন যে বাবা লালবাজার থেকে ফোনে জানাচ্ছেন যে তিনি হেমুদের জামিনে খালাশ করিয়ে ফিরে আসছেন। এ পর্ব্ব ত চুকল একরকম করে। তবে দিনটা ভাল ছিল না। সেইদিন রাত্রেই কলকাতায় জননায়কদের wholesale গ্রেপ্তার করা হ'ল। রাস্তা ঘাটে ভীষণ গোলমাল হ'ল,

*হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ও সুধীর চৌধুরী, প্রবাসীর তৎকালীন দুজন সহকারী সম্পাদক।

বৃদ্ধ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পরোপকার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হলেন।

কলকাতার আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠেছে। ঘরে বসে তত খবর পাইনা তবে বাইরে বেরলেই এর উত্তাপ গায়ে এসে লাগে। স্কুল ছাড়া আজকাল আর যাইই বা কোথায়? আর এক আছে Social Fraternity. আমি এটির Secretary কাজেই সব অধিবেশনেই আমাকে হাজির থাকতে হয়। সেটা বেশ ভালই লাগে, অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। প্রথমে মনে করেছিলাম এটা টি'কবে না, কিন্তু এখন দেখছি বেশ টিকেও যাচ্ছে, এবং small beginning থেকে বেশ বড় হয়ে উঠছে। প্রথম ১৭ই নভেম্বর বোধহয় অধিবেশন হল। সেদিন আবার হরতাল ছিল। তবু দশবারজন সভ্য এসে জুটেছিল। কিছু কাজের কথা হবার পর সবাই উঠে পড়ল। পরের অধিবেশনটা খানিকটা social functionএর মত হল। লোক জন চব্বিশ এসেছিল, গান, গল্প, খেলা সবই হল কিছু কিছু। তৃতীয় অধিবেশনে একটু খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল; কাজেই সেদিন ত attendance একেবারে পুরোপুরি। আমাদের সভার জায়গা হচ্ছে দেবীপ্রসন্নবাবুর বাড়ীর ছাদ, সুতরাং আমার যাবার কোনো অসুবিধা নেই। কাজ বেশী কাজেই একটু আগেই গিয়েছিলাম। সেদিন মুখোমুখি একটি বারোয়ারী উপন্যাস চালাবার খেলা ছিল। অনেকেই participate করলেন ফাঁকিও দিলেন বেশ কেউ কেউ। মণীন্দ্রলাল বসু এক লাইন বলেই থেমে গেলেন। জীবনদা এবং প্রশান্ত ভালই বলেছিল। আমি নামে মাত্র যোগ দিলাম। হিরণকুমার সান্ন্যাল 'একটা হতাশ প্রেমের আবর্ত্ত' আনবার জন্য খুব আগ্রহ দেখালেন, কিন্তু শেষ অবধি "আবর্ত্ত"-টার সন্ধান পাওয়া গেল না। জীবনদা একটা গান শুনিয়ে দিলেন। পরে কাজকর্ম্মের কথা কিছু কিছু হল।

ক্রমশঃ

জগদীশচন্দ্র ও ডি, পি, আই

রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান—জগদীশচন্দ্র বসু কেমব্রিজের ট্রাইপস এবং লণ্ডনের বি, এস, সি, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।

অর্থনীতিবিদ মিঃ ফচেট তখন ইংলণ্ডের পোস্টমাষ্টার জেনারেল। তিনি ছিলেন জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি (প্রথম ভারতীয় রেংলার) আনন্দমোহন বসুর সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরবার সময় মিঃ ফচেটের কাছ থেকে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড রিপনের নিকট একখানি পরিচয়পত্র নিয়ে আসেন এবং স্বদেশে পদার্পণ করার পর ঐ পরিচয়পত্র নিয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। লর্ড রিপন মিঃ ফচেটের পরিচয়পত্রে জগদীশের কৃতিত্বের বিষয় অবগত হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূবক তাঁকে অধ্যাপক হিসাবে আই, ই, এস গ্রেডে নিযুক্ত করার আশ্বাস দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সরকারকে আদেশ দেন যেন অনতিবিলম্বে জগদীশচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে আই, ই, এস গ্রেডে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

তদনুসারে বাঙ্গলা সরকার তদানীন্তন ডি পি, আইকে লর্ড রিপনের আদেশের কথা জানিয়ে দেন এবং ডি, পি, আই জগদীশচন্দ্রকে ডেকে পাঠান, জগদীশচন্দ্রও ডি, পি আইর নির্দেশ অনুসারে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর অফিসে গিয়ে উপস্থিত হন।

ডি, পি, আইর কক্ষ

ডি, পি, আই—মিঃ বোস আমি বাংলা সরকারের নিকট থেকে আপনাকে অনতিবিলম্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে আই, ই, এস গ্রেডে নিযুক্ত করবার নির্দেশ-পত্র পেয়েছি। চাকরির জন্য প্রার্থীরা সকলেই সরাসরি আমার কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং তাদের প্রার্থনা জানায়—আপনি একেবারে আমাকে ডিঙ্গিয়ে শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের নিকট থেকে সুপারিশ-পত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন—আমার চাকরি জীবনে এ জাতীয় নজির এই প্রথম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে জানাতে হচ্ছে যে বর্তমানে আই, ই এস গ্রেডে পদার্থবিদ্যা বিভাগে কোন পদখালি নাই—তবে প্রভিন্সিয়েল গ্রেডে একটি আসন খালি আছে—আপনি ইচ্ছা করলে সেটি গ্রহণ করতে পারেন। পরে কখনো যদি আই, ই, এস গ্রেডে কোন পদ খালি হয় তখন আপনার কথা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে—কাজেই আপনাকে হয় প্রভিন্সিয়েল গ্রেডের শূন্যপদটি গ্রহণ আর তা না হলে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে আমার পক্ষে আপনার জন্য আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

জগদীশ—আপনার এই অকৃপণ সহৃদয়তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

কিন্তু এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না যে আপনি কি করে একজন কেমব্রিজের ট্রাইপস এবং লণ্ডনের—বি, এস, সিকে প্রভিন্সিয়েল গ্রেডে নিযুক্ত করবার কথা ভাবতে পারেন। এ ত আমি কল্পনাও করতে পারি না। ফলে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব কতখানি ক্ষুন্ন হতে পারে আপনি তা ভেবে দেখেছেন কি? পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য-দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আসন অতি উচ্চে, আপনি তাকে তার সেই গৌরবময় উচ্চ আসন থেকে টেনে নামিয়ে আনতে চাইছেন।

ডি, পি, আই—তা কেন হবে? সূর্য্যের কিরণ যার

উপরেই পড়ুক না কেন (তা সে পর্বত শৃঙ্গই হোক বা পুতি-গন্ধময় নরকের নিম্নতম প্রদেশই হোক) তাকেই উজ্জ্বল করে তোলে, তা বলে স্বর্য্যের কিরণে কোনরূপ মলিনতা স্পর্শ করে না। তাছাড়া মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট মাথায় নিয়ে রাজা যখন সিংহাসন থেকে জনসাধারণের মধ্যে নেমে আসেন তখন তাঁর মুকুটের মণিমুক্তাগুলি আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর ভবিষ্যতে যদি কখনো আই, ই, এস গ্রেডে পদ খালি হয় তাহলে আপনার কথা বিবেচনা করে দেখা হবে আমি ত আপনাকে সে আশ্বাস দিচ্ছিই।

জগদীশ—আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি—আপনি কি কখনো আপনার স্বজাতীয় কোন কেমব্রিজের ট্রাইপস এবং লণ্ডনের বি, এস, সি কে এরূপ অনুরোধ করবার সাহস দেখাতে পারতেন ?

ডি, পি, আই—মিঃ বোস ভুলে যাবেন না যে আপনি বাঙ্গলার ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের সঙ্গে কথা বলছেন—আপনার রসনা আরও সংযত হওয়া দরকার। (তাছাড়া) কোন ভারতীয় নেটিভকে এ পর্যন্ত আই, এ, এস, গ্রেডের চাকরিতে বহাল করা হয় নি। আপনার বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

ভারতীয় নেটিভরা এখনো বিজ্ঞানে শিক্ষকতা করবার উপযুক্ততা অর্জন করে উঠতে পারে নি। আই, ই, এস, গ্রেডের চাকরিতে বহাল হতে হলে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া দরকার।

জগদীশ—আপনি আমাকে দয়া করে আপনার উচ্চ পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয় দেখাবেন না। মনে রাখবেন আমরা বাঙ্গালী, সুন্দর বনের বাঘ দেখেও ভয় পাই না—আপনার ঐ রক্ত চক্ষু কখনো আমার উচ্চ শির নত করতে পারবে না। সেদিন ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের নিকট আমি যে আন্তরিকতা এবং ভদ্রতার পরিচয় পেয়েছি তার শতাংশও আপনার ভিতর দেখতে পাচ্ছি না—একি দেশে আপনাদের উভয়ের জন্মস্থান, একি দেশের জলবায়ুতে আপনাদের দেহ ও মন পুষ্ট। একবার ভেবে দেখুন ত সৌজন্যের দিক থেকে আপনাদের দুজনের মধ্যে এই পার্থক্য কতদূর বিস্ময়কর। ভারতীয়রা বিজ্ঞানে শিক্ষকতা করার পক্ষে অনুপযুক্ত আপনার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বিজ্ঞানে শিক্ষকতা করবার উপযুক্ততার সঙ্গে গায়ের চামরার বা রঙের সম্বন্ধ কোন নেই। আর একটি বিষয় আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি ? আপনার স্বজাতীয়দের মধ্যে যারা ভারতবর্ষে আই, ই, এস গ্রেডে চাকরি নিয়ে আসেন তারা অধ্যাপক হিসাবে পূর্বে কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসেন কি ?

ডি, পি, আই—তাদের কথা ছেড়ে দিন। একজন ইংরেজ আর একজন কৃষ্ণকায় ভারতীয় নেটিভ এক কথা নয়। তাও কি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ?

জগদীশ— আজ্ঞে না—তা অবশ্য আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না—আমার কিন্তু মনে হয় গায়ের চামরার রং এবং পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছাড়া এই দুয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই। যা হোক আমি ঘৃণার সঙ্গে আপনার এই অযাচিত কৃপার দান প্রত্যাখ্যান করছি—এবং শীঘ্রই ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে আপনার সঙ্গে আমার এই আলোচনার কথা পত্রযোগে জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি তাঁর নিকট থেকে এ বিষয়ে তার বক্তব্য জানতে পারবেন—হয়ত তখন আপনার পক্ষে আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সহজতর হবে—নমস্কার।

জগদীশের প্রস্থান।

ডি আই, পি—(স্বগতঃ) এখন দেখছি সাহেব থেকে গোলাম বড়। বিলেতে শিক্ষা পেয়ে দেখতে পাচ্ছি এদেশের নেটিভদের ভিতর স্পিরিট অফ রিভোল্ট ধীরে ধীরে ডেভালাপ করছে। এখন থেকেই আমাদের সতর্ক হতে হবে। তা না হলে পরে এদের দাবিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে শক্ত হবে।

অযোধ্যার নবাব

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৫)

গীতি নাট্য রচনা ও পরিচালনা।

অযোধ্যার নবাবী রাজ্যে রাষ্ট্রনীতিক সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে চরমপত্র নবাব দরবারে এসে পৌঁছল, ওয়াজিদ আলী শাহের অদূরদর্শী জীবন তরণী তখনো যে ঐশ্বর্যের স্রোতে ও বিলাসের তরঙ্গে ভেসে চলেছিল—তার বিস্তৃত পরিচয় পূর্ব্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য সেই বাগ বাগিচা প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং নৃত্য গীত বাইজী বেগম বিলাসিতার সঙ্গে ছিল নবাবের শিল্পী-জীবনও। তাঁর সেই সৃজনশীল সত্তার প্রসঙ্গে ঠুংরি প্রভৃতি গান ও সেতার চর্চা এবং কাব্য রচনার কথা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাঁর রাজ্য-চ্যুতি ও নির্বাসন বর্ণনা করবার আগে তাঁর অপর একটি বিষয়ে রচনাশক্তির নিদর্শন উপস্থাপিত করা হবে।

ঠুংরি ও অন্যান্য রীতির গান, কাব্য ও মসনবী, সঙ্গীততত্ব ও বিভিন্ন বিষয়ে গদ্য সাহিত্য, আত্মজীবনী ও পত্রধারা ইত্যাদি রচনা ভিন্ন ওয়াজীদ আলী শাহ ছিলেন গীতি-নাট্যকার বা অপেরা রচয়িতা। তাঁর রচিত 'রাধা কানৃহাইয়াকা এক কিস্সা' (রাধাকৃষ্ণের একটি কাহিনী) এই বিষয়ে উর্দু সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে স্বীকৃত আছে।

উক্ত গীতিনাটিকাটি তিনি মসনদ লাভ করবার কয়েক বছর পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং পরীখানার সুন্দরীদের দ্বারা তা অভিনীত হয় তাঁরই পরিচালনাধীনে। এটিই নবাব রচিত প্রথম গীতিনাট্য।

নবাবের যে 'তারিখ-এ-পরীখানা' বা পরীখানার বৃত্তান্ত পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার শেষাংশে 'রাসলীলা' গীতিনাটিকা পরীখানায় মঞ্চস্থ হবার কথা পাওয়া যায়। সুলতান পরী, মাহরোক পরী, আশমান পরী, ইজ্জৎ পরী প্রভৃতির সে অভিনয়ে অংশ নেবার কথাও উল্লেখ করেছেন নবাব। 'রাধা কানহাইয়াকা এক কিস্সার বিষয়বস্তুও অনুরূপ। তবে দুটি অভিন্ন কিংবা আংশিক ভিন্ন তা সঠিক জানা যায় না কারণ এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্টভাবে কোথাও বলা হয়নি। যতদূর অনুমান করা যায়, পরীখানার অভিনীত রাসলীলা এবং রাধা কানহাইয়া কা এক কিসসার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। দুটির বিষয়বস্তুও এক।

অবশ্য লক্ষ্ণৌর নবাবের হারেমে মঞ্চস্থ করা রাসলীলা কিংবা রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সঙ্গে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে আশমান-জমিন স্বতন্ত্র। নবাব রচিত রাধা কানহাইয়াকা এক কিসসার অনুবাদ পাঠ করলে পাঠক পাঠিকাদের ধারণা হবে, রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্ণৌ দরবারে কি পরিমাণ কিম্ভুৎ কিমাকার ধারণ করেছেন। ভিন্ন 'সাংস্কৃতিক' পরিবেশে রাধাকৃষ্ণের ঐতিহ্যের এই বিবর্ত্তন লক্ষ্য করবার বিষয়। বিধর্মী ও বিদেশীর পক্ষে ভারতীয় কোন ভাব বস্তুর মর্ম্মসন্ধানের প্রয়াস কতখানি বহির্মুখী, এমন কি হাস্যকর হতে পারে নবাবের এই গীতিনাটিকা তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাঁর প্রথম রচিত উক্ত গীতিনাট্যটির অনুবাদ প্রকাশ করবার আগে এ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল।

রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এই নৃত্যগীত-প্রধান নাটিকা বা অপেরা লক্ষ্ণৌতে ওয়াজিদ আলীর পরিচালনায় প্রথম অভিনীত হয় ১৮৪৩ খৃঃ অর্থাৎ নবাবের সিংহাসন প্রাপ্তির চার বছর আগে। তার পর ১৮৪৭ খৃঃ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে নাট্যটির পুনরাভিনয়ে সম্ভবত হয়েছিল। ওই সনে গীতি তাঁর পরীখানা শূন্য হয়ে যায় পরীদের পত্নীত্বে বরণ করে

নেওয়ার ফলে। যতদিন পরীখানা ও পরীদের অস্তিত্ব ছিল—অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃঃ পর্যন্ত, তাদের নিয়ে সেখানে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য গীত অনুষ্ঠিত হত। তাই রাধা কানহাই-য়াকা এক কিসসা একাধিকবার মঞ্চস্থ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

তাঁর উদ্যোগে আফ্সানা-ই-ইসাক (প্রেমের কাহিনী) ইত্যাদি নাটিকার লক্ষ্ণৌতে অভিনয় থেকে বোঝা যায় যে এ ধরণের জলসা নবাবের বিশেষ প্রিয় ছিল। তা ছাড়া তাঁর রচিত তিনটি মস্নবী নাটকা-কারে রূপান্তরিত করেন হাকিম আসঘর আলী খাঁ। সেসবই অভিনীত হয় লক্ষ্ণৌতে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, অযোধ্যা রাজ্য থেকে নির্বাসিত হবার প্রায় কুড়ি বছর পরেও মেটিয়াবুরুজে এই ধরণের গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হত নবাবের নির্দেশে। নিয়মিত অভিনয় করবার জন্যে উত্তরকালের সেই নির্বাসিত জীবনেও তিনি অনেক সময় একটি অভিনেতৃগোষ্ঠী পোষণ করতেন। এ সময় (আনুমানিক ১৮৭৫ খৃঃ) তিনি রাধাকৃষ্ণের কাহিনী 'অবলম্বনে' অন্য একটি গীতিনাটিকা রচনা করেন। তখন, তাঁর সঙ্গীত নৃত্য ও নাটকাভিনয়ের জন্যে মাসিক ব্যয়বরাদ্দ ছিল প্রায় তের হাজার টাকা কলকাতায় অর্থাৎ মেটিয়াবুরুজে তাঁর গীতিনাট্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ পরবর্তী একাধিক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

এখানে, ব্রজধামের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা লক্ষ্ণৌর নবাবের হাতে যে রূপ পরিগ্রহ করেছেন 'রাধা কানহাইয়া কা এক কিসসা গীতিনাট্যের অনুবাদের মাধ্যমে তার পরিচয় দেওয়া হল :—

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী

নাটিকার পাত্র পাত্রীগণ

১। সাহারা (যোগিনী)।
২। ঘুরবৎ (সাহারার ভৃত্য)।
৩। আফ্রিয়ৎ (দানব)।
৪। আর্ঘোয়ান (গাঢ় লাল) পরী } পরীদ্বয়
৫। জাফরান (কমলা) পরী
৬। কানহাইয়া (নায়ক)।
৭। রাধা (নায়িকা)।
৮। ললিতা } সখী চতুষ্টয়
৯। শাখা
১০। চুনীয়া
১১। লাড়োয়া
১২। রামচিরা (কানাইয়ের পরিচারক)।
১৩। মুসাফির (পথিক—মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাত্রী)
(১৪-১৭) চারজন পনহরণে (কলস বাহিকা)
(১৮-২১) চারজন মাখনওয়ালী।

[দৃশ্য আরম্ভের সময় মঞ্চের উপর দেখা যায়—দুই (পরী) তাদের হাতের ওপর ডানা; একটি কুৎসিত মুখ লোক (আফ্রিয়ৎ), এক যোগিনী (সাহারা) ও তার ভৃত্য (ঘুরবৎ)।

একদল নর্তক বৃত্তাকারে নৃত্য করে, তারপর মঞ্চের ওপর বসে। পরী দুজন কেদারায় থাকে। আফ্রিয়ৎ গদা হাতে পরীদের সামনে দাঁড়িয়ে। মঞ্চের অন্যদিকে একটি কেদারায় সাহারা বসে। তার সামনে হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে ভৃত্য ঘুরবৎ।

আর এক কোণে রাধা ও কানাই কেদারায় বসে। কানাইয়ের মাথায় মুকুট। রাধার নাকে নথ, কপালে ঝাপটা, মাথায় বাঙ্গালী ঘোমটা।* রামচিরা সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে। ললিতা, শাখা, চুনিয়া, লড়োয়া মাথায় গয়না পরে, অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে। চারজন কলসধারিণী কুয়ো থেকে গাগরীতে জল ভরছে। জল নেবার সময় ঠুংরি গাইছে : পাণি ভরতি হুয়ি হুঁ।… মুসাফির, হাতে লাঠি আর গাঁটরি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলে। চারজন মাখনওয়ালীর হোরি গান গাইতে গাইতে মাখন তৈরীর ভঙ্গী।

যোগিনীর দুঃখিত হাবভাব।]

ঘুরবৎ (সাহারাকে)—যুগ যুগ বেঁচে থাকুন। আনন্দে থাকুন। যোগিনি সাহেবা, আপনি মনমরা হয়ে রয়েছেন কেন? আপনার কিসের দুঃখ?

* "ঘুঙ্ঘুটে বাঙ্গলা"।

ধরেন। আবার পিছিয়ে যাবার সময় কাপড়টা আলগা করে দেন। (গানের স্থায়ী)

হাণ্ডোলা ঝুলে শ্যামা শ্যাম ঘনে
সে ঘনা চলৎ পবন না নানা না নানা না নানা ॥
(প্রথম অন্তরায়)
সব সখীয়াঁ মিল পিঙ্গ বাঢ়াও লেকে তান
নানা নানা নানা নানা।
(দ্বিতীয় অন্তরা)
মোর মুকুট কাট রাখেরওয়া
ঘুঙুর পায়েল বাজে ঝনা নানা ঝনা নানা ঝনা নানা ॥

হাণ্ডোলা শেষ হলে সখীরা বলে ওঠে; জয় রামচন্দ্র কী জয়। তারপর রাধা ও কৃষ্ণ মুখোমুখী দাঁড়ান। আর অর্ধেক সখীরা রাধার দিকে, অর্ধেক সখীরা কৃষ্ণের দিকে ভাগ হয়ে যায়। তারপর রাধা ও কৃষ্ণ উর্দু ও হিন্দী দোহরায় পরস্পরকে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করেন, ভাও বাতলাবার সঙ্গে (অর্থাৎ ভঙ্গী সহ)।

রাধা—আমার প্রিয় পীড়ন করতে বড় ভালবাসে। যাদের সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সে তাদেরই হাতে। তিলেকের জন্যেও তার মনে পড়ে না আমাকে। প্রিয়ের প্রতীক্ষায় আমি দিন কাটাই। কেউ আমার কাছে নেই। হাত আমার পুড়ে গেছে প্রতীক্ষার জ্বালায় ॥

কানাই—আমার নাম কানাই। আমি চিনি তোমাকে। তোমার ওপরে টান আমার নিজের জীবনের চেয়েও। রাধার কপালে বিঁদিয়া-টি * মানিয়েছে কি সুন্দর। যেন কেতকী ফুলে বসেছে একটি ভ্রমর।

রাধা—আমি তোমার জন্মে পাগলিনী ওগো কানাই। নিজের চেয়েও তোমার জন্যে ভাবনা আমার বেশি। তুমি আমার চোখের মধ্যে এস। চোখের পাতায় লুকিয়ে রাখি তোমায়। আর কেউ তোমায় দেখতে পায়, এ আমি চাইনা।

কানাই—তোমার প্রেমে বনে বনে ঘুরেছি এখানে সেখানে। এই সব পরী আর দানোরাও চিনতে পারেনি আমায়।

* অলঙ্কার

রাধা—আমার মনের মণিকোঠায় আছ তুমি বিহারীলাল, তোমার মুরলী, তোমার মুকুটও আছে আমার হৃদয়ে।

কানাই—রাধার দুয়ার অনেক দূরে, খেজুরের মতন। যে উঁচুতে উঠতে পারে, সেই পায় খেজুর। না হলে, যদি তা মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে নব নষ্ট।

[এই দোহরার পর কানাই শ্রোতাদের কি বিতরণ করেন। সকলে তা কপালে, চোখে স্পর্শ ও চুম্বন করে।]

রাধা—যখন নদী কিনারে ধোঁয়া ওঠেরে,
বুঝি সেখানে একটা কিছু ঘটছে।
যার জন্যে যোগ নিয়েছি, সে হয়ত আর নেই।
তার দেহ জ্বলছে সেখানে।
তার মুখ চাঁদের মতন, চোখ দুটি গোলাপী, হাত-
ভরা ফুল।
আমি নিজের মনকে খুঁজেছি, গিয়েছি দেশ বিদেশ,
পুরাণ পথ ধরে বেড়িয়েছি এখানে সেখানে।

ও আমার বৈদ্য, তুমি এসব বাঁধন খুলো না। হাত দিও না আমার ক্ষতস্থানে, তারা বড় স্পর্শ-কাতর। আমার দুঃখের ভাগ যদি নাও, প্রিয় আমার চলে যাবে তাহলে। একা আমি প্রিয় চিন্তায় ছিলেম বিভোর। তুমি কেন ছিন্ন করলে গো। তুমি দুই জগতের দাতা। আমি তোমার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। জাহাজের ওপর ওড়ে যে কাক, সে আর কিছু দেখতে পায় না। আমিও তেমনি, কিছু আর নজরে পড়ে না তুমি ছাড়া। ও কানাই, তুমি ভেবনা এই বিরহ শেষ করেছে আমাদের প্রেম।
কিংবা আমি বিচ্ছিন্ন হলে, তোমার প্রেম যাই ভুলে ॥
আমাদের প্রেম যেন একটি পুঁয়ে লতা,
সবুজ থেকে সবুজতর হয় দিনের পর দিন ॥
ও কাক, মরণ হলে আমার শরীরের সব কিছু খেও,
শুধু নষ্ট করনা আমার দুটি চোখ।
কারণ তাদের প্রিয় দর্শনের আশা চিরকাল ধরে ॥

ওগো বংশীধারী মোহন, দয়া করে চাও আমার দিকে।
তোমায় রেখে দেব আমার চোখের মধ্যে, কাজলের
রেখার মতন।

কানাই—ও রাধা, তুমি যখন দূরে যাও চলে,
আমার কোন সুখ থাকে না ঘরে।
আমার দশা হয় ওই মেহেদী পাতার মতন,
যাতে আর লেখা যায় না লাল রঙে॥

রাধা—ওগো রাজার রাজা, অধিরাজ, মহারাজ। তুমি যুগ যুগ বেঁচে থাকো। সুখে থাকো। তোমার সেই মুরলী কোথায়, যাতে বাজ'ও ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী? সে বাঁশী তুমি কোথায় রেখেছ? দয়া করে সেই মুরলী বাজাও।

কানাই—ও রাণীর রাণি, অধিরাণি, মহারাণি। কানাই তোমায় আশীষ জানায়—যুগ যুগ বাঁচো। আনন্দে থাকো। দোহাই তোমার—আমি আমার বাঁশী হারিয়ে ফেলেছি।

রাধা—মহারাজ, তুমি সেই কুব্‌জাকে তোমার বাঁশী দিয়েছ।

(রাধা রাগ করে মঞ্চের আর এক পাশে চলে যান, কানাইয়ের কাছ থেকে অনেকটা দূরে। তখন কানাই যথোচিত ভাবভঙ্গীর সঙ্গে এই ঠুংরিটি গান করেন, রাধাকে তুষ্ট করবার জন্যে।)

স্থায়ী: মেরি মহারাণী অধিরাণী
অন্তরা: কা মোখে কুছ চুক প'ঢ় মোরি রাণী,
আকতার কদর না জানি॥

(শেষে কানাই তাঁকে ভৃত্যকে ডাকেন।)

কানাই—রাম্‌চিরা।

রামচিরা—হাজির, মহারাজ, হাজির।

(সে সামনে উপস্থিত হয়।)

—রাজার রাজা, অধিরাজ, মহারাজ, শিবপ্রধান, ছত্রপতি। বলুন ত কি হয়েছে?

কানাই—রাধার রাগ হয়েছে। তিনি ভেবেছেন, কুব্জাকে আমি মুরলী দিয়েছি।"

রামচিরা—মহারাজ, তাঁর মানভঙ্গ করুন।

(এই ভাবে রামচিরাকে কানাই তিনবার ডাকেন এবং সে তিনবার রাধার মান ভঙ্গ করবার উপদেশ দেয়। চতুর্থবার ডাকা হলে—)

রাম্‌চিরা—মহারাজ, রাধার কোন সখীকে বলুন তাঁর অভিযোগ দূর করতে -

কানাই—ও ললিতা।

ললিতা—আসছি, মহারাজ!

(ললিতা ১, ২ ১, ২ তাল দিতে দিতে আর নাচতে নাচতে উপস্থিত হয়ে তার জায়গায় বসে)

কানাই—ও ললিতা, আমার রাধা আমার কথা শুনছেন না, মান করেছেন। এখন আমি কি করি?

ললিতা—অনুনয় করুন, বিনতি করুন, নাক খৎ দিন, পায়ে পড়ুন, মাটিতে কপাল ঘষুন, তবে তিনি আপনার কথা শুনবেন।

কানাই—আমি সব রকম চেষ্টা করে দেখেছি। রাধাকে রাজি করাতে পারিনি। এখন তোমার কথায় আবার চেষ্টা করি।

(কানাই দ্বিতীয় বার চেষ্টা করেন এবং আগেকার মতন ভাব-ভঙ্গীর সঙ্গে এই ঠুংরিটি গান।)

স্থায়ী: রাধাজী মোসে বোলো কিঁউ না রে,
অন্তরা: কা মোসে কুছ চুক্ পঢ়ি, মেরি রাণী;
হস হস ঘুঙ্ঘ্‌ট খোলে, কিঁউ না রে॥

[রাধার সব সখীরা তাল দিতে দিতে ওই ঠুংরি থাকে। তারপর যখন রাধার চতুর্থ সখী মঞ্চে প্রবেশ করে, কানাই তখন এই ঠুংরি গান করেন:]

অস্থায়ী: মোরি তু জীবন রাধা
অন্তরা: পাঁইয়া পঁরু ম্যয় তোরি ললিতা তোরি শাখা,
তোরি চুণিয়া, তোরি লড়োয়া, তোরে বিন দেখে
নেহি বেন।

[গান গাইবার সময় কোন সখীকে সম্বোধন করতে গিয়ে কানাই মাথা নীচু করেন। রাধা কিন্তু বসে

পান ঘট্‌ওয়া গাগর উলট্‌ গয়ো।
ক্যর পাক্‌রৎ কঙ্গন উচট গয়ো
চল্‌ ছাড় দে আফ্‌তার বা নগরিয়া ॥

(শেষে কানাই হতাশ বোধ করেন এবং মুসাফিরকে জিজ্ঞেস করেন :)—পথিক তুমি কোথা থেকে আসছ ?

মুসাফির—মথুরা বৃন্দাবন থেকে।

কানাই—আমার মুরলী কারো কাছে দেখেছ ?

মুসাফির—হ্যাঁ, আমি দেখেছি। ওদের মধ্যে যে সব চেয়ে ফরসা আর মাথায় ছোট, তার কাছে মুরলী আছে।

কানাই (হাত জোর করে)—আমি তোমাদের লাড্ডু দেব। তুমি দয়া করে' আমায় মুরলীটি দাও।

(তারা চারজন কানাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে)

—যাও যাও, সে এখানে নেই। আমাদের কাছে নেই।

(তারপর কানাই একে একে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেন এবং প্রত্যেকেই জবাবে তাঁকে একটি করে ধাক্কা দেন। শেষে যে মুরলীটি অপহরণ করেছিল, সে বললে)

—রাজার রাজা, অধিরাজ, মহারাজ, শিবপ্রধান ছত্রপতি। যুগ যুগ বাঁচো। আনন্দে থাকো। টাটকা টাটকা মাখন নিয়ে এস ত বলি।

(কানাই সম্মত হয়ে মাখন খোঁজার ভাবভঙ্গী করতে থাকেন এবং চারজন গাগরিধারিণী অবিরাম সেই ঠুংরিটি গেয়ে চলে।)

কানাই (চারজন মাখনওয়ালীকে)—যুগ যুগ বেঁচে থাকো। আনন্দে থাকো। আমায় কিছু মাখন দাওনা।

(মাখনওয়ালীরা ক'টি ট্রের ওপর পাত্রগুলি রাখে আর যেন মাখন তৈরি করছে এমন অভিনয় করে। আর এই হোরি গানটি গায় :)

স্থায়ী : এ দায় ম্যয় মাখন বেচন যাত।
অন্তরা : না লো কান্‌হা তুম্‌ মাখন মোরা
বেচুঁ আফতার হাত ॥

(তারপর যখন কানাই মাখন চান, মাখনওয়ালীরা জবাবে গানের অন্তরাটি গাইতে থাকে।

শেষে তিনি তাদের অলক্ষিতে একটি ট্রে না বলে' নিয়ে নেন এবং কলসধারিণীদের দেন। তখন তিনি তাঁর মুরলীটি ফিরে পান তাদের কাছ থেকে। তারপর তিনি মুরলী বাজাতে আরম্ভ করেন। সেই বংশীধ্বনি শুনে রাধা ছুটে গিয়ে তাঁর কণ্ঠে আলিঙ্গন ও আন্তরিক সম্মতি দেন।)

রাধা (কানাইকে)—মহারাজ,

এখন আর আমার মনে কোন দুঃখ নেই। আমি বড় খুসি হয়েছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে গদীতে বসুন। আমি আপনার সামনে নৃত্য-গীত করি।

(এ কথার পর রাধা এই ঠুংরিটি গাইতে আরম্ভ করেন, ভাও বাৎলাবার (ভাব প্রদর্শনের) সঙ্গে :

স্থায়ী : বাজন্‌ লাগি শ্যাম কি বাঁশরী রে।
অন্তরা : নদীয়া কিনারে আফতার বাঁশরী বাজাওৎ
নিকস যাত জীয়াসে সাঁস রি রে ॥
'কিস্‌সা খতম্‌ হুয়া' অর্থাৎ যবনিকা

৬

নির্বাসন ও কলকাতায় আগমন।

লক্ষ্ণৌ দরবারে নবনিযুক্ত বৃটিশ রেসিডেণ্ট জেনারেল আউটরাম ১৮৫৬ খৃঃ ৩, জানুয়ারী তারিখে অযোধ্যার রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসির নিকট থেকে আনা অযোধ্যার নবাবের ভাগ্যনিয়ন্তা বার্তা।

জেনারেল আউটরাম লক্ষ্ণৌতে উপনীত হবার পরেই নবাবকে লর্ড ডালহাউসির লিপি কিংবা ঘোষণার বিষয়ে কিছু জানাননি। তিনি নবাবের উজীর ও অন্যতম নবাব আলী নকী খাঁকে আহ্বান করে তাঁকে ব্যাখ্যা করে বলেন বৃটিশ সরকারের বক্তব্য। তার মূল কথা—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানী অযোধ্যা রাজ্য অধিকার করে নেওয়া সাব্যস্ত করেছেন এবং নবাবকে বারো লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি এবং তিন লক্ষ টাকা তাঁর পরিবারের জন্যে ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব করেছেন। রেসিডেণ্ট উজীরকে এই ঘোষণার কথা জানিয়ে অনুরোধ করেন যে, আলী নকী খাঁ যেন নবাবের ওপর প্রভাবের সাহায্যে এই প্রস্তাবে

সম্মত করান তাঁকে (নবাবকে)। তাহলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানী উজীরকে নেকনজরে দেখবে।

আলী নকী খাঁ বৃটিশের সরকারী ইচ্ছার কথা জ্ঞাত করালেন ওয়াজিদ আলী শাহকে। এবং যথাসাধ্য তাঁকে রাজি করাবার চেষ্টা করলেন।

নবাব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এই সাংঘাতিক প্রস্তাব শুনে। তাঁর বেদনাহত মনে এই ধারণা হল যে তাঁর প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়েছে। তিনি এই ধরণের যুক্তি দেখালেন যে, রাজ্যের বিশৃঙ্খলার জন্যে দায়ী ত রাজকর্মচারিবৃন্দ। রাজা কেন সেজন্যে রাজ্য হারাবেন?...

কিন্তু এসব যুক্তি শুনতে বৃটিশ সরকার নারাজ।

রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলল একটি চুক্তি বা বা সম্মতিপত্রে ওয়াজিদ আলী শাহের দস্তখৎ আদায় করবার। নবাব যাতে সই দেন সেজন্যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। কিন্তু সম্মত হলেন না ওয়াজিদ আলী শাহ।

অবশেষে নবাবকে আনুষ্ঠানিকভাবে অযোধ্যা রাজ্যের মসনদ হারাতে হল ৪, ফেব্রুয়ারী (১৮৫৬ খৃঃ) তারিখে। ওই দিন রেসিডেন্ট আউটরাম তাঁর অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে এসে ওয়াজিদ আলী শাহকে সরকারী নির্দেশ জানালেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানী তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবার ও অযোধ্যার রাজ্য অধিকার করে নেবার সংকল্প করেছেন।

নবাবকে তিনদিন সময় দেওয়া হল চুক্তিপত্রে দস্তখৎ করবার জন্যে।

ওয়াজিদ আলী শাহ সই দিতে যথাবিধি অস্বীকৃত হলেন। চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় সমানে সমানে। তিনি এখন বিজিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানী বিজেতা।

বিজয়ী বৃটিশ-পক্ষের কাছে নবাব প্রতিবাদও জানালেন যে, তাঁর রাজত্ব এমনিভাবে বাহুবলে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে তাঁর প্রতি গুরুতর অবিচার করা হচ্ছে। কিন্তু অরণ্যে রোদন করার সামিল হল তাঁর সমস্ত আকুতি।

জেনারেল আউটরাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানীর পক্ষে এবং লর্ড ডালহাউসির প্রতিনিধিস্বরূপ অযোধ্যার রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করলেন। নবাব কার্যত বন্দী হয়ে রইলেন কাইসর বাগের প্রাসাদে। তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হল।

রেসিডেন্টের তরফ থেকে অযোধ্যাবাসীদের কাছে ঘোষণা করা হল যে, তারা কুশাসন ও বিশৃঙ্খলার জন্যে কষ্ট পাচ্ছিল। তাই এই নতুন ব্যবস্থা। নবাবকে অবশ্য অত্যাচারী বলা হয়নি।

এতবড় রাষ্ট্রীয় ঘনঘটা ও পালা বদলের মধ্যে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নবাব আদৌ বিদ্রোহের চেষ্টা কিংবা বিদ্রোহের মনোভাবও প্রদর্শন করেননি। ইংরেজদের অভিসন্ধি জানবার পরও তিনি যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন আত্মরক্ষা করবার এবং সৈন্যে রেসিডেন্টকে বাধা দেবার। কিন্তু তাঁর চরিত্র সে ধাতুতে গঠিত ছিলনা—পূর্ব্বাপর সমগ্র ঘটনাবলী থেকে এই ধারণা সমর্থিত হয়।

বরং ওয়াজিদ আলী শাহের পক্ষে ঘোষিত হল যে, তাঁর সব উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, মন্ত্রী, চাকলাদার, নাজিম, পুলিশ ও গ্রামের পদস্থ কর্ম্মচারী প্রভৃতি যেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানীর নিযুক্ত অফিসারদের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেন।...

সরকারীভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হল তাঁর আমলের সৈন্যবাহিনী, রক্ষীদল এবং সহর ও রাজ্যের গোলন্দাজ বহর।

নবাব পক্ষে বৃটিশের তৎপরতার জবাবে কোনপ্রকার প্রতিরোধের চিহ্ন যে প্রকাশ পায়নি, সে বিষয়ে এলিছ জানের কাহিনী প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ থাকবে। এখানে উদ্ধৃত করা যায় একজনের কথা।

ওয়াজিদ আলী শাহের গদীচ্যুতির সংবাদে তখনকার অযোধ্যার এক জমিদার মন্তব্য করেছিলেন—সরকার কেন যে নবাবকে সিংহাসন থেকে নামালেন। তিনি ত নেহাৎ গোবেচারা জীব...তাঁকে একেবারে উচ্ছেদ করবার কি দরকার হয়েছিল?

রাজ্য হারাবার পরও প্রায় একমাস ওয়াজিদ আলী

অবস্থান করেন লক্ষ্ণৌতে ; এই সময়টি তিনি বরাবর কলকাতায় ঊর্ধতন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দরবারে আবেদন নিবেদন এবং তদ্বির তদারক করেছিলেন—তাঁর প্রতি যেন সুবিচার করা হয়, তাঁর রাজ্য যেন তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

তাঁর পক্ষে ওকালতী করবার জন্যে, তাঁর বিষয়ে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে তিনি নানা প্রতিনিধিদের এই সময়ে প্রেরণ করেন কলকাতায়। কিন্তু তাঁরা সকলেই ব্যর্থ ও হতাশ্বাস হয়ে লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন। তাজুদ্দিন হোসেন খাঁ, আহমদ হোসেন খাঁ, হকিম আবুল হাসান, গুলাম জিলানী এবং অন্যান্য। শেষ পাঠালেন মহম্মদ মসিহুদ্দিনকে। তাঁর দৌত্যও বিফল হল।

অনন্যোপায় নবাব লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করলেন ৩, মার্চ, ১৮৫৬ খৃঃ।

ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ তারিখে যেদিন জেনারেল আউটরাম সরকারীভাবে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করবার কথা জানান তার পর এবং লক্ষ্ণৌ থেকে বিদায় পূর্ব্বে ওয়াজিদ আলী তাঁর মর্মক্রন্দন এই দুটি ঠুংরি গান রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন :—

(১) যব ছোড় চলি লখনৌ নগরী,
কহ হাল আদম প্যারে ক্যা গুজারি।
আদম গুজারি সদম গুজারি,
যব হাম গুজারি দুনিয়া গুজারি।

(২) বাবুল মেরা নৈহারা ছুট যায়। ইত্যাদি

এ বিষয়ে তাঁর আরো একটি গান রচিত আছে, এটিও সম্ভবত ওই সময়ে লক্ষ্ণৌতে তিনি রচনা করেছিলেন।

আংরেজ বাহাদুর জুলুম কিয়া,
মেরা মাল মুলুকো সব লুঠ লিয়া।...

প্রথম দুটি নবাব রচিত গান আজো সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত হয়ে আছে তাঁর রচনা-শক্তির দুটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ।... ...

নবাব ওয়াজিদ আলীর রাজ্যচ্যুতি ও নির্বাসনের সমকালীন রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরীন অবস্থার কিছু ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায়—William Kinglton লিখিত Elihu Jan's Story or Private Life of an Eastern Queen পুস্তকটি থেকে। বইখানি যদিও ইংরাজপক্ষীয়ের লেখা—উক্ত উইলিয়ম নাইটন ছিলেন অযোধ্যার এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার, তবু এর মধ্যে সত্য আছে মনে হয়।

যে এলিহু জানের কৌতুহলউদ্দীপক কাহিনী উক্ত বইটির উল্লেখ্য বিষয়, সে ছিল ওয়াজিদ আলী জননীর এক জন (আমজাদ আলীর বেগম খাস পরিচারিকা। তার সম্পর্কে পুস্তকের ভূমিকায় উইলিয়ম নাইটন লিখেছেন—'এলিহু কাল্পনিক চরিত্র নয়। সে লক্ষ্ণৌ নবাব অন্তঃপুরে তার সাত বছর বয়স থেকে অনেক বছর প্রতিপালিত হয়েছিল। অযোধ্যার রাণীর (অর্থাৎ ওয়াজিদ আলীর মাতার) হুকাবর দার ছিল সে এবং সেই হেতু প্রাসাদের অনেক ঘটনার সম্পর্কে তার ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বিদ্রোহের পরে প্রথমে সে লক্ষ্ণৌর ধনী বণিক মিঃ জোহানেসের পরিবারে আয়ার কাজ করে এবং পরে আমার পত্নীর কাছে একই কর্মে নিযুক্ত হয়। আমাদের সঙ্গে সে প্রায় তিন বছর থাকে ও এখনো আছে এবং আমি যতদূর পযন্ত রাণীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত তার বিবরণ যাচাই করেছি তাতে আমি দেখেছি যে, সে সব সত্য। সুতরাং আমি আগাগোড়া সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং আমি যতখানি সম্ভব তার নিজের কথা ও তার নিজের ধারণা সমেত বিবৃত করেছি।'

Elihu Jon's story or the private life of an Eastern Queen পুস্তকটি থেকে এখানে অংশ বিশেষ অনুবাদ করে দেওয়া হল :—

আমজাদ আলী শাহ্ তাঁর কাঁধের ওপর একটা ফোড়া কিংবা কোন রকম ঘার ফলে মারা যান আর আমি আমার মনিব, রাণীমাকে বলতে শুনেছি যে ঘাটা নিশ্চয় কেউ বিষাক্ত করে দিয়েছিল। খুব সম্ভব তাঁর চিকিৎসকদের মধ্যে কেউ এ কাজ করে, তাঁর মৃত্যুতে

সবচেয়ে লাভবান হবে এমন কারুর উৎকোচে বশীভূত হয়ে !...

...প্রাসাদে একজন কথা বলাবলি হত...ওয়াজিদ আমজাদকে হত্যা করেছে।...

'বছর গড়িয়ে চলে, আর কানাঘুষা শোনা যায় যে গতিক খুব ভাল নয়। বলাবলি হতে থাকে, ইংরেজ খুব রেগে গেছে রাজার ওপর, তিনি সারা সময় নাচ, গান আর বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করেন—কখনো মেয়ে মানুষের বেশে কখনো পুরুষের পোষাকে, তাঁকে ঘিরে থাকে বেগমরা আর খোজারা আমার মনিব, রাণী মা, প্রায়ই তাঁকে তিরস্কার করেন আর তাঁর নির্বুদ্ধিতা ও তিরস্কারে কর্ণপাত না করার জন্যে খুবই কাঁদেন।

শেষ পর্য্যন্ত চূড়ান্ত কাণ্ড ঘটল। একদিন সকাল বেলা রোজকার মতন রাণীমা স্নানের পরে সাজগোছ করছিলেন এমন সময় তাঁর কাছে আনা হল একটি বড় সিল করা চিঠি। যে সেটি এনেছিল সে জানালে যে, উজীর পাঠিয়েছেন আর ওটা বড় জরুরি। রাণী মা খামখানি খুলে চিঠি পড়লেন। আমি তখন আলবোলায় তামাক সাজছিলুম সেই ঘরেই। দেখলুম চিঠিটা খোলা আর তা পড়তে পড়তে রাণীমার মুখ ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে তিনি চিঠিটা হাতে নিয়ে, জুতো পরবার জন্যে না থেমেই প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন উঠানে, 'রাজ্য খতম হয়ে গেল' বলতে বলতে।

'সেই উঠান আর দৌলৎখানার পরেই রাজার মহল। সেই দিকে ছুটে চললেন রাণী মা, খালি মাথা আর খালি পায়ে। আমরা কজনও তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়লুম; কেউ মসলিন চাদর বা ওড়নি নিয়ে, কারুর হাতে জুতো, কেউ নিয়েছে ছাতা। আমরা তাঁকে যখন এসব জিনিষ এক একটা দিতে গেলুম, তিনি আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

'না, না,' তিনি বলে উঠলেন, 'আমার কোন লোক না হলেও চলবে। মসনদ খুইয়েও বাঁচতে হবে ত'—এই বুড়ো বয়সে হয়ত বাড়ি ছাড়া হয়ে না খেয়ে দিন কাটবে।'

'রাণী মা কাঁদতে কাঁদতে চললেন আর তাঁর সঙ্গে আমরাও চললুম বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, যদিও আমরা জানতুম না ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছে।

'রাণী মা বিনা ঘোষণায় এবং কিছু না জানিয়ে সোজা রাজার, তাঁর ছেলের ঘরের মধ্যে চলে এলেন। কেউ তাঁকে বাধা দিলে না, সকলেই সরে দাঁড়াল নির্বাক বিস্ময়ে।

'রাজা একলা বসে কাঁদছিলেন। তিনি যখন তাঁর মাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেন, দুহাতে মুখ ঢেকে সজোরে কেঁদে উঠলেন।

'রাণী মা এগিয়ে যেতে যেতে তিনবার কুর্ণিস করে বললেন—এবার আশ মিটেছে? নাচ, গান আর হৈ-হল্লার মাশুল এখন পেলি ত? আমি তোকে কতবার বলেছি না ওসবের শেষ এই রকমই হয়? তোর কোন বাপ, দাদা কখনো নাচ, গান আর হল্লা করেছে মেয়েমানুষ সেজে?'

'রাজা একটা কথাও বললেন না।

'রাণী মা আমাদের দিকে ফিরে বললেন,—আমাদের একা থাকতে দে।' তখন আমরা সবই ঘুরে চলে এলুম। রাণী মা আমাদের একজনের কাছ থেকে তাঁর ওড়নি নিয়ে রইলেন ছেলের কাছে।

'বিকাল দুটো না তিনটের সময় ইংরেজ রেসিডেণ্ট এলেন আর সেখানে একটা বড় বৈঠক বসল, তাতে রাণী মাও উপস্থিত থাকলেন।

'লক্ষ্ণৌর ছাউনি থেকে সৈন্যরা এসেছিল, প্রাসাদ থেকে সব কামান সরিয়ে নেওয়া হল আর আমরা শুনলুম যে রাজার রাজত্ব শেষ হয়ে গেল। আরম্ভ হল ইংরেজ-রাজ।

'রাজ্যের বড় বড় লোকেরা এসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সৈন্য আর গোলাবারুদ দিতে চাইলেন। কিন্তু তাতে রাজি হলেন না রাজা। তাঁরা তখন রাণী মার কাছে এলেন। তিনি তাঁদের কাছে এক রাত সময়

চাইলেন প্রস্তাবটা ভেবে দেখবার জন্যে। পরের দিন সকালে তিনি জানালেন—'না'।

'সেদিনই রাণী মা আমাদের সকলের কাছে ঘোষণা করলেন তাঁর ইংলণ্ডে যাবার সংকল্প। 'আমি যাব, তিনি বললেন, 'ইংরেজদের রাণীর কাছে। তিনিও ছেলের মা। আমি তাঁকে বলব, আমার ছেলের মুকুট যেন তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়। তাঁর কি মুকুট, রাজ্য আর ঐশ্বর্যের কিছু অভাব আছে? পৃথিবী-শুদ্ধ সবই কি হবে একজনের?'…

তারপর—এলিহুজানের এই বিবরণ থেকে জানা যায়—সুদূর যাত্রার জন্যে প্রাসাদে নানা রকমের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি প্রকাণ্ড জলাধারের নীচে গোপনে তৈরি করা হল একটি বিরাট ঘর। তাতে ওয়াজিদ জননীর বহু মূল্য রত্নাদি, সোনা রূপা নানা আসবাবপত্র—যা তিনি ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে চাননি—লুকানো রইল। মাটির নীচের ঘরে সেসব ব্যবস্থা করে রেখে পর পর চাপা দেওয়া হল গদি, অয়েল ক্লথ এবং ওয়াক্স ক্লথ। শেষে সে ঘরের সমতল ছাদ গেঁথে ফেলা হল বড় বড় কড়ির ওপর ভর করে। সেই ছাদই দাঁড়াল চৌবাচ্চার মেঝে। তারপর চৌবাচ্চায় জল ভরে দেওয়া হল।

এমনিভাবে রাজমাতার কয়েকলক্ষ টাকার সম্পদ রয়ে গেল সেই চোরকুঠুরিতে। এলিহুজানের মতন প্রাসাদের কয়েকজন মাত্র ব্যাপারটা জানত, এমন গোপনে সব করা হয়।

এলিহুজানের ঘটনার বিবৃতি থেকে আরো জানা যায় যে, ওয়াজিদ আলীর প্রধানা বেগম খাস মহলের সঙ্গে দীর্ঘকালের মনোমালিন্য ওয়াজিদ জননী স্বয়ং সাক্ষাৎ করে মুছে ফেলেন ইংলণ্ডে যাত্রা করার দিন।

'আকুল হয়ে অতি আকুল হয়ে রাণীমা সেদিন কেঁদে-ছিলেন, যেদিন তিনি ওয়াজিদ আলী ও তাঁর সন্তানদের কাছে বিদায় নিয়ে বিদেশ যাত্রার জন্য ষ্টীমারে উঠতে যান'—এলিহুজানের বিবরণীতে পাওয়া যায়।

সেই ওয়াজিদ জননী মালিকাই-কিশওয়ারের শেষ যাত্রা। তিনি লক্ষ্ণৌ বা ভারতবর্ষে ফিরতে পারেননি। তাঁর ইউরোপ যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন ওয়াজিদ আলীর ভ্রাতা সিকান্দার হাসমৎ ও এক পুত্র। সে যাত্রায় ওয়াজিদের মাতা এবং সিকান্দার হাসমৎ দুজনেরই বিদেশে মৃত্যু ঘটেছিল।

ইংলণ্ডে ওয়াজিদ জননীর দৌত্য ব্যর্থ হয়। তাঁর আবেদন গ্রাহ্য করেননি মহারাণী ভিক্টোরিয়া অর্থাৎ তাঁকে চালিত করতেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেসব কর্ণধার। হতাশায় প্রত্যাবর্তনের পথে প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয় ওয়াজিদ পুত্রের জীবনাবসান হয়েছিল প্যারিসেই কয়েক দিনের আগে পরে এই দুটি মৃত্যু আকস্মিকভাবে সেখানে ঘটে যায়।…

ওয়াজিদ আলী শাহের লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের অ[illegible] পরিচ্ছেদ বর্ণনা করবার আগে তাঁর জননীর গুপ্তরত্ন ভাণ্ডার সম্পর্কে শেষ সংবাদ উল্লেখযোগ্য। এই তথ্য পাওয়া যায় এলিহুজানের কাহিনী থেকে। এটি অব[illegible] নবাবের স্বদেশ ত্যাগের পরবর্তী কালের ঘটনা।

তিনি যখন লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে[illegible] তখন তাঁর অধিকাংশ বেগমই লক্ষ্ণৌতে থেকে যান তাঁদের অন্যতমা ছিলেন হজরৎ মহল। পরের বছ[illegible] লক্ষ্ণৌতে যখন সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, হজর[illegible] মহল তখন বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেন। তাঁর দ[illegible] বর্ষীয় পুত্র বির্জিস কাদেরকে বিদ্রোহী সেনাদল অধি[illegible] করে লক্ষ্ণৌর শূন্য সিংহাসনে। (লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহে[illegible] অন্যতম স্মারকরূপে হজরৎ মহলের মর্মরমূর্তি সিপা[illegible] বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত আ[illegible] একথাও প্রসঙ্গত বলে রাখা চলে।)…

ঠিক কোন্ সময়ে জানা যায়নি, হজরৎ মহল ওয়াজি[illegible] জননীর লুকানো ভাণ্ডারের কথা কিভাবে শোনে[illegible] তারপর অনেককে জিজ্ঞাসা করতে করতে সন্ধান পে[illegible] যান সেই গুপ্তরত্নের; এবং সমস্তই হস্তগত করে নেন।

সে যাই হোক, জননী ও পুত্র ইংলণ্ডের উদ্দেশে যা[illegible]

করবার পরে ওয়াজিদ আলী ত্যাগ করে যান লক্ষ্ণৌ। কিন্তু বোধহয় তাঁরও ইংলণ্ডে দরবার করতে যাওয়ার কথা প্রথমে হয়েছিল। কারণ এইরকম বিষয়বস্তু নিয়ে একটি গান মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে পড়ে এই সময়ে। গানখানি কার রচনা সঠিক বলা যায় না। কোন কোন মতে এ গান নবাবেরই রচিত। কিন্তু তাহলে এখানে নবাবকে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা হবে কেন এবং তাঁর বিরহে গলিতে গলিতে বারাঙ্গনারা বিলাপ করবে এমন উক্তিও কি থাকতে পারত।

গানটির প্রথম চার লাইন হল—

নিমকহারামে মুলুক বিগাড়া,
হজরত যাতে লণ্ডন কো।
মহল মহল মে বেগম রোঁয়ে,
গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া।

লক্ষ্ণৌতে তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে পিসেমশায় নবাব হাসাজুদ্দৌলাকে ভারপ্রাপ্ত রেখে অবশেষে ৩, মার্চ (১৮৫৬ খৃ.) তারিখে নবাব সাদৎ খাঁ বুরহান উল মুলকের বংশধর ওয়াজিদ তাঁদের বংশের দুশ বছরেরও বেশিদিনের বাসভূমি থেকে চির বিদায় নিলেন।

অযোধ্যার ইতিহাসের সে আর একটি পট পরিবর্তন।

নবাব ওয়াজিদ আলীর কলকাতায় আসা সাব্যস্ত ও বন্দোবস্ত কিভাবে হয়েছিল গ্রন্থাদি থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়না। তাঁর কলকাতায় আগমন ও তার দক্ষিণ উপকণ্ঠ মেটিয়াবুরুজে স্থায়ীভাবে বাসপত্তন কি তাঁর স্বেচ্ছাকৃত? অথবা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা অনুসারে সম্পন্ন?

কোন কোন মহলের ধারণা এই যে, তিনি স্বয়ং উদ্‌যোগী হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন এখান থেকে ইংলণ্ডে যাবার উদ্দেশ্যে। কলকাতায় পৌঁছবার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জননীর দৌত্যের ব্যর্থতা ও মৃত্যুর পরে আর এ বিষয়ে সচেষ্ট না হয়ে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

কিন্তু এ বিষয়ে আর একটি মত যে প্রচলিত আছে সেটিই সত্য মনে হয়। তা হল—ইংরেজ কর্তৃপক্ষই এবারের কলকাতা তথা মেটিয়াবুরুজে বাস করবার সিদ্ধান্ত করেন এবং এখানে, অযোধ্যার রাজ্য থেকে দূরে, তাঁকে নিজেদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও ক্ষমতার মধ্যে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করে। মেটিয়াবুরুজ ছিল সেকালের অনেক পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের বাসঅধ্যুসিত অঞ্চল এবং বলা বাহুল্য, কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। তাই স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সরকারের ইচ্ছা ভিন্ন ওয়াজিদ আলী ভারতের এত স্থানের মধ্যে এখানেই বাসপত্তন করতে পারতেন না। তা ছাড়া, রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত নবাবের গতিবিধি অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ছিল, স্থূলভাবে না হলেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষেরই ইঙ্গিতে। স্থায়ী বাসস্থান নির্বাচন করবার স্বাধীনতা তাঁর কি ক'রে থাকবে?...

মার্চ মাসের ৩ তারিখে কাইসর বাগের প্রাসাদ থেকে নবাব সদলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন। খানিক দূর যাবার পর পথে কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন খুশ বখ্‌সের কারবালায়। সেখানে তখন একটি মজলিস চলেছিল। নবাব যখন শকট থেকে নেমে গিয়ে সেই আসরে যোগ দিলেন, তাঁর রচিত একটি মার্সিয়া (বিয়োগ গাথা) শোনান হল আবৃত্তি করে। আর সঙ্গে সঙ্গে এমন বিষাদের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হ'ল যে শ্রোতৃবৃন্দ রুদ্ধ আবেগে রইল। তারপর মার্সিয়ার করুণ বিলাপ ও নবাবের মর্মান্তিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় সকলের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তাদের অন্তর মথিত করা দুঃখ ফুটে বেরুল চোখের জলের ধারায়।

সেখান থেকে নবাব বিদায় নিয়ে এলে শোকমগ্ন যাত্রীবাহিনী আবার চলতে আরম্ভ করলে। সে দলের প্রথমেই উন্মুক্ত শকটে ছিলেন নবাব এবং তাঁর সঙ্গে মিঃ ব্র্যান্ ডন্ ও রাজা ইউসুফ আলী। তাঁদের পিছনে

সারবন্দী গাড়িতে রাজ-মহিলারা, রাজ দরবারের সভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং অসংখ্য অনুগামী ও বিশ্বস্ত প্রজাগণ।

উনাও পৌছতে রাত্রি হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে না থেমে যাত্রীদল অগ্রসর হয়ে যখন গঙ্গা তীরে উপনীত হল তখনো সূর্যোদয়ের অনেক বিলম্ব। স্থানটি পরিষ্কৃত করে তাঁবু খাটান হল। নবাব প্রক্ষালনাদির পরে নমাজ করতে লাগলেন এবং সেই অবসরে তাঁর এঞ্জিনীয়াররা গঙ্গার ওপর সত্বর তৈরি করে দিলে নৌকার সেতু। নবাব তাঁর দীর্ঘ সারিবদ্ধ গাড়ি, অশ্বারোহী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও অনুগামী প্রজাদের শোভাযাত্রা নিয়ে সেই সেতুর ওপর দিয়ে গঙ্গা পার হলেন অশ্ববাহিত-বগিতে অধিষ্ঠিত থেকে উপনীত হলেন কানপুরে।

তারপর কানপুর থেকে বারাণসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কাশী পৌছবার আগে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিলেন এলাহাবাদে।

বারাণসীতে কয়েকদিন বিরতির পর একটি ষ্টীমারে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলেন।

অবশেষে অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ জলপথে এসে পৌছলেন কলকাতার দক্ষিণস্থ মেটিয়াবুরুজে [১৩, মে, ১৮৫৬ খৃঃ]

ক্রমশঃ

ইউরোপে নাটকের নবজন্ম

অশোক সেন

ইবসেন ছিলেন সবদিক দিয়ে একজন দুর্ধর্ষ নাট্যকার। সনাতন প্রথায় নাটক লিখে দিলাম আর জনপ্রিয় অভিনেতারা তার নানা চরিত্রে নেমে আসর মাৎ করতে লাগলো —এ উদ্দেশ্য নিয়ে ইবসেন কখনও নাটক লেখেন নি।

একদিকে তিনি যেমন ছিলেন স্টেজ ক্র্যাফটে্র মাস্টার, অন্যদিকে তেমনি ছিল তাঁর জীবন সম্বন্ধে গভীর কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি। বহু বিষয়েই তিনি চিন্তা করতেন এবং নাটকের মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারা এবং মতবাদকে জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করতেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বালজাক, ডিকেন্স এবং টলষ্টয়ের যা অবদান, নাটকের ক্ষেত্রে ইবসেনের ঠিক সেই একই কনট্রিবিউশন—ইবসেনের আগে নাট্যিক মাধ্যমে এ বস্তু কখনও পরিবেশিত হয়নি। এ জিনিষটা কি? তদানীন্তন সমাজের একটা স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা নাটকের মাধ্যমে মঞ্চের উপর।

ইবসেনের নাটকের সাফল্যের পরিমাপ করতে গেলে এই কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার—তাঁর মূল নাটকগুলোর ভাষা হচ্ছে নরওয়েজিয়ান—নরওয়ের লোকেরা ব্যতীত যে ভাষার সঙ্গে বিশেষ কেউ পরিচিত নন, যে নাটকের বিষয়বস্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি দেশের লোকেদের জীবনের বাস্তব কাহিনী নিয়ে। অথচ এসব নাটকে দেশকালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে যাবার যে একটা বিরাট প্রয়াস দেখা যায়, তাই যেন ইবসেনের রচনাকে ইউরোপে এবং আমেরিকার মঞ্চে এতটা আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় করে তুলেছে। আর একটা কথাও এখানে মনে রাখা দরকার। একদিকে যেমন সারা পৃথিবীর তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন, তেমনি আবার বিদগ্ধ সমাজের অনেকেই তাঁর লেখা পড়ে বা নাটক দেখে বিরক্তি প্রকাশও করেছেন।

ইবসেন রচনার ক্ষেত্রে অনেক শিষ্য এবং অনুকরণকারী পেয়েছেন যাঁরা তাঁর লেখার ধারাটাকে অবলম্বন করে নাট্যসাহিত্যে এক বিশেষ শ্রেণীর নাট্যগোষ্ঠি সৃষ্টি করেছেন।

আজকের দিনে অনেকেই ধারণা করতে পারবেন না যে ইবসেন এসে রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে কি বিরাট আলোড়ন এবং আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আসবার কিছুকাল আগে রঙ্গগৃহকে লোকে মনে করতে সুরু করেছিল একজিবিশন হল। ইবসেনের হাতে পড়ে রঙ্গমঞ্চের চেহারা গেল পাল্টে—রঙ্গভূমিকে তিনি 'এরিনা বা ফোরামে' রূপান্তরিত করে সেখানে তুলে এনে ধরতে লাগলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে দেখা সমাজদর্শনের চিত্র, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের ওঠাপড়া এবং এই ধরণের অন্যান্য বিষয়ের জীবন্ত আলেখ্য।

'আলস্য এবং ঔদাস্যে মগ্ন মজাদার নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শকের দল এইসব নাটক দেখতে এসে প্রথমটায় যেন হকচকিয়ে গেল। তারপর কৃত্রিম মায়াজালের আবরণ কেটে বেরিয়ে এসে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে ওঠল। সমাজচিন্তা, সমাজবোধ, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধে আত্মবোধ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, রঙ্গমঞ্চে এইসব বিষয়ের অবতারণা করে ইবসেন ইউরোপীয় দর্শকদের বাস্তবজীবন, বাস্তবসমস্যা, বাস্তবজীবনের সুখদুঃখ আশা হতাশা সম্বন্ধে অনেক বেশী সজাগ, সচেতন ঘনিষ্ঠ এবং সক্রিয় করে তুললেন। কোনো ব্যাপারের সামগ্রিক ধারণাবোধটা যেন মানুষ প্রায় হারাতে বসেছিল। এই সামগ্রিক বোধটা অত্যন্ত সহজ সুন্দরভাবে জাগিয়ে তুলতে লাগলেন ইবসেন তাঁর দর্শক এবং পাঠকদের মনে।

ডিকেন্সের মত ইবসেনের লেখাতেও সমাজ-সংস্কারের একটা বিরাট এক আন্তরিক প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই।

সমাজের দোষত্রুটির তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ সমালোচক। তাঁর এ'ন্টি আইডিয়ালিষ্টিক প্লে গুলিতে সে আমলের নতুন প্রতিষ্ঠিত আর্থিক সচ্ছলতায় ভরা বুর্জোয়া সোসাইটিকে অতি তীব্রভাবে বারবার আঘাত হেনেছেন।

'Hacking away at the facade of Complacely, self-righteousness and moral smugness, he revealed the routtness of its (bourgeois society) foundations and the cruelty, dishonesty, hypocresy and secret lice that it masked'—Elmer Pice.

ফলে থিয়েটার জগতে সুরু হল এক বিরাট বিক্ষোভ। একদল যাঁরা তাঁর পথানুসারী বা গুণমুগ্ধ, তাঁরা বিজয়দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলেন যে, ইবসেনই হচ্ছেন এ যুগের থিয়েটারের নবজন্মদাতা, মুক্তিদূত আলোকবাহী পথনির্দেশক এবং নাট্যসাহিত্যের বিরাট সৃজনশীল প্রতিভা।

আবার তাঁর বিপক্ষবাদীরা প্রচার করতে লাগলেন যে রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি করে চাকচিক্যপূর্ণ ঘটনার সাহায্যে এবং সবকিছুর ভেতর থেকে নোংরামী আবিষ্কার করে লেখার মাধ্যমে এসবকে লোকের সামনে এনে ইবসেন নিজেকে বড় নাট্যকার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু ইবসেনের বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুন, বা যে ধরণের অপপ্রচারই তাঁর বিরুদ্ধে করুন, তার দ্বারা তাঁকে কোনঠাসা করে রাখা গেল না।

তাঁর নাটক একটা বিপ্লব সুরু করে দিল মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত চিন্তার ক্ষেত্রে এবং নাট্যমঞ্চে এমন একটা প্রাণবন্ততা এবং সমকালীনত্বের ভাব বিরাজ করতে লাগল যা এর আগে একশো বছরের ভেতর কখনও থিয়েটারে কারো চোখে পড়ে নি। সেন্সর তাঁর কিছু কিছু নাটক সময় সময় ব্যান্ করে দিয়েছেন, পুলিশ অনেকসময় প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছে—দর্শক প্রচণ্ড উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্লে'র অভিনয় দেখেছে—আবার এমনও হয়েছে যে দর্শক বিরক্ত হয়ে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি করে ইবসেন প্লে'র প্রদর্শনীকে বরবাদ করে দেবার চেষ্টা করেছে।

ইবসেন-প্লে সম্বন্ধে চিরকালই মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। আজও সেই মতবিরোধের অবসান হয়নি। তবে আজকের দিনে আর অত জোর গলায় এবিষয়ে বাকবিতণ্ডা হয় না।

অবশ্য এখনও বহু নাট্যসমালোচকের মতে ইবসেনের নাটককে অমর ক্ল্যাসিক নামে অভিহিত করা হয়। আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁরা মনে করেন, থিয়েটারের ইতিহাসে এসব নাটকের একটা বিশেষ স্থান আছে, কিন্তু বর্তমানে ইবসেনের নাটক আউট ডেটেড। আর একদল আছেন যাঁরা রঙ্গমঞ্চকে শুধুমাত্র মেকবিলিভের আশ্রয়স্থল হিসাবেই দেখতে চান—ইবসিনিজমের অভ্যাগমকে কোনকালেই এঁরা সুনজরে দেখতে পারেননি! এঁদের ধারণা নাট্যমঞ্চ থেকে পিল্ ভেড এন্ড অভ রোমাণ্টিসিজমের অপসারণের জন্য ইবসেনই সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

ইবসেন (১৮২৮—১৯০৬) বেঁচেছিলেন বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত। তিনি যখন মারা যান সে সময় ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক বড়বড় দেশেই সৃজনশীল প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে গেছে এবং নানা ইউরোপীয় ভাষায় ভাল নাটক রচিত হয়েছে।

ইবসেনের সময়ে নাটক রচনায় যে বিভিন্ন জাতীয় রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু ও বিস্তৃতি দেখা যায়—সমগ্র নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা মেলেনা।

উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপের নাট্যসাহিত্য গ্রীক বা এলিজাবীথান নাটকের হাইটে উঠতে পারেনি একথা অস্বীকার করি না—কিন্তু ব্যাপকতা, বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন বিষয়ক ব্যাপারে এ সময়ের নাটক যে পরিপুষ্টিলাভ করেছে—তার সঙ্গে তুলনায় গ্রীক বা এলিজাবীথান নাটককেও নতিস্বীকার করতে হবে।

এইসব নাট্যকারদের পর্যায় তালিকার দিকে তাকিয়ে দেখলে মন সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। ইবসেন ছাড়াও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে তখন নাটক লিখছিলেন ষ্ট্রিণ্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২) ও বিওর্ণসন (১৮৩২-১৯১০)। অনেকে মনে করেন ষ্ট্রিণ্ডবার্গ ইবসেনের থেকেও বড় নাট্যকার।

জার্মানীতেও আবির্ভাব হয়েছিল হাউপ্টমান (১৮৬২-১৯৪৬) জুডারমান (১৮৫৭-১৯২৮) ও ভেডেকিন্ডের (১৮৬৪-

১৯১৪) এঁরা সবাই বিশ্ববরেণ্য নাট্যকার। অস্ট্রিয়াতে স্নিটজলার (১৮৬২-১৯৩১)। ফন্ হফ মানসথল (১৮৭৪-১৯২৯), ইটালীতে জিয়াকোজা—(১৮৪৭-১৯০৬) বেনেল্লি (১৮৭৫-১৯৪৯)। দানুন্জিও (১৮৬৩-১৯৩৮), পিরান-দেল্লো (১৮৬৭-১৯৩৬), ফ্রান্স ওবেলজিয়ামে, বেক (১৮৩৭-৯৯), রসট্যাণ্ড (১৮৬৮-১৯১৮), হার্ভিউ (১৮৫৭-১৯১৫), ক্রুরেল (১৮৬৮), ব্রিয়া (১৮৫৮-১৯৩২) ও মেটারলিঙ্ক (১৮৬২-১৯৪৯), স্পেনে বেনাভাণ্ডে (১৮৬৬), একিগারে (১৮৬২- ১৯১৬) আয়ার্লাণ্ডে সিন্জ (১৮৭১-১৯০৯)। ইট্স (১৮৬৫-১৯৩৯) ও ডানসেনী (১৮৭৮), রাশিয়াতে শেহভ (১৮৬০-১৯০৪), গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) ও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), ইংলণ্ডে বার্ণাড শ (১৮৫৬-১৯৫০) ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০), পিনেরো (১৮৫৫-১৯৩৪), জোন্স (১৮৫১-১৯২৯), গ্র্যানভিল-বার্কার (১৮৭৭-১৯৪৬), ব্যারি (১৮৬০-১৯৩৭) ও গলস্ ওয়ার্দি (১৮৬৭ ১৯৩৩)।

এঁরা সবাই দিকপাল নাট্যকার—সারা দুনিয়া জুড়ে এদের নামডাক। যদিও এঁরা সবাই ছিলেন ইবসেনের সমকালীন, তবু এঁদের অনেকেই কিন্তু ইবসেনের রচনা-রীতি বা জীবন দর্শন বা রচনাশৈলীর অনুকরণ বা অনুসরণ করেননি। এঁদের কেউ কেউ কাব্যনাট্য এবং সাংকেতিক নাট্য লিখে অদ্ভুত খ্যাতি এবং যশ অর্জ্জন করেন। কিন্তু এসব লেখার ভেতর বিন্দুমাত্র ইবসেনের লেখার প্রভাব দেখা যায় না।

তবে এ সময়ের প্রত্যেকে নাট্যকারের লেখার যে প্রাণবন্ততা এবং সজীবতা দেখা যায় তা এদের পূর্বসূরীদের লেখায় থাকতোনা। ইবসেন যদি আবির্ভূত নাও হতেন তাহলেও এইসব নাট্যকারেরা নিজেদের সৃজনশীল রচনার দ্বারা সারা বিশ্বে প্রচণ্ড নাট্য-আন্দোলনের সৃষ্টি করতে সমর্থ হতেন—সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আসলে তখন ইউরোপীয় সমাজে যেসব ঘটনা ঘটছিল বা যেসব রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে শিল্প ও সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ফুটে উঠেছিল শিল্পীর তুলিকায় এবং লেখকের রচনায়।

এই একই কারণে রেনেসাঁসের সময় সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে বিরাট সৃষ্টির প্রাচুর্য্য দেখা দিয়েছিল—অতোটা না হলেও উনবিংশ শতাব্দীতেও একই কারণে সংগীত সাহিত্য এবং নাট্য রচনায় প্রভূত শক্তির পরিচয় দিচ্ছিলেন শিল্পীরা তাঁদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

ইট্স ক্রুদেল, রসট্যাণ্ড. হফমান্সথল, মেটারলিঙ্ক ও দানুন্জিওকে বাদ দিলে তখনকার বেশীরভাগ নাট্যকারই প্রধানতঃ যে জগতে তাঁরা বাস করছেন এবং সেখানকার মানবচরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করে নাট্যের মাধ্যমে তা সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। রিয়ালিজমকেই সবার ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছিল—আর মঞ্চে সমস্যা-প্রধান নাটকই বেশীরভাগ দর্শকদের কাছে পরিবেশিত হচ্ছিল। এই সময় সামাজিক কাঠামো নতুন আকৃতি নেওয়ায়, নতুন নতুন পরিবেশ এবং সম্পর্কের আবির্ভাব ঘটেছিল। এইসব ব্যাপারের আলোচনা এবং বিশ্লেষণের ফলাফলই উপস্থাপিত করা হোতো নাটকের ভেতর দিয়ে জনসাধারণের কাছে।

ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের বিবর্তিত রূপের এমন কোন দিক বাকী ছিলনা যা নিয়ে নাটক লেখা হচ্ছিল না। এমন অনেক বিষয় যা আগে জনসাধারণের সামনে বিচার বা বিশ্লেষণ করা তো দূরে থাকুক, প্রাইভেটলিও কেউ আলোচনা করতো না, এইসব বিষয় এখন এমন খোলাখুলিভাবে তুলে ধরা হতে লাগল মঞ্চের ওপর জনসাধারণের সামনে যে লোকে বিস্মিত হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেল গোঁড়াপন্থীদের তরফ থেকে—তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করলে এইসব নাটকের বিরুদ্ধে এবং অনেক সময় চক্রান্তের সাহায্যে এই নতুন শ্রেণীর বাস্তববাদী নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করছিল।

শুধু ইবসেনই নয়, বার্ণাডশ, হাউপ্টম্যান, ব্রিয়া, গলসওয়ার্দি স্নিটজলার, গোর্কি, ভেডোকিন্ড, বেক, গ্র্যানভিল বার্কারও এই সময়ের অন্যান্য নাট্যকারেরা, সমাজ এবং রাষ্ট্রিক জীবনের কদর্যতা এবং দুষ্টক্ষত অপসারণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এঁদের নাটকে রাজনীতিক এবং বিচার বিভাগীয় অনাচার, অবিচার, পক্ষপাতিত্ব, স্বৈরীনিবৃত্তি, নারীজাতিকে দাবিয়ে রাখা, কৈশোর বয়সের

আত্মধ্বংসী ক্রিয়াকর্ম, এন্টিসেমিটিজম, ধনিক এবং শ্রমিক-শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষের যৌন অপরাধ, ফৌজদারী আইনের কঠোরতা, যৌনব্যাধি, অর্থবণ্টনের অসাম্যনীতি, ন্যায়পরায়ণতা নির্দ্ধারণের দ্বৈতনীতি, যুদ্ধোপকরণ নির্মাতাদের যুদ্ধে উস্কানি দেবার প্রচেষ্টা, ধর্মসম্বন্ধীয় কপটতা এবং অসহিষ্ণুতা, স্লামলাইফের দুঃখ-দুর্দশা এবং আরও এই জাতীয় বহু সমস্যার পরিষ্কার এবং খোলাখুলি আলোচনা থাকতো। এই প্রথম মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হল জনসাধারণের সামনে। এঁরা অকুণ্ঠ ভাষায় প্রতিপন্ন করে দিলেন যে, মানুষের ভাগ্যবিধাতা বলতে যে এতকাল দৈবিকশক্তি বা রাজশক্তিকে মনে করে আসা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল—আসলে সমাজের জীব মানুষের ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্দ্ধারিত হয় সোস্যাল ফোর্সেসের দ্বারা।

অনেক সময়ে এইসব নাট্যকারেরা প্রায় ভবিষ্যৎ বক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন—যেমন শেহভ তাঁর 'চেরী আচার্ড' নাটকে ডেকেডেন্ট রাশিয়ার অপদার্থ আপার ক্লাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎ রাশিয়ান বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়ে গেছিলেন। স্ট্রিণ্ডবার্গ এবং আরও দু'চারজন নাট্যকার তাঁদের নাট্যিক চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় ভবিষ্যতে ফ্রয়েডের অভ্যাগমের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

একথা অস্বীকার করবো না যে, আজকের দিনে হয়তো এইসব নাটকের সমস্যার দিকগুলো অনেকটাই out-dated হয়ে গেছে—কারণ সমাজ এবং সামাজিক পারিবেশ ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে এবং বিবর্তনের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে সে সময়ের সমাজ এবং আজকের সমাজে অনেক তফাৎ এবং সে সময়ের অনেক সমস্যাই আজকের সমাজে আর দেখা যায় না। তবুও ঐতিহাসিক বিচারের মাপকাঠিতে এসব নাটকের একটা চিরন্তন মূল্য আছে। তাছাড়া সমস্যা বাদেও এসব নাটকের চরিত্র এবং ট্রাকচারের দিকটা, ভাষা এবং ভাবব্যঞ্জনা নাটকগুলিকে কাল শাসনাতীত করে রেখেছে।

খেয়ালী কবি ও শিল্পী কামিংস

জুলফিকার

বয়স নেহাৎ কম হল না, বাহাত্তরের কাছাকাছি। শীর্ণ, ছোট খাট লোকটি। বড় বড় চোখ, লম্বাটে মুখখানায় কেমন যেন একটা সন্দিগ্ধ ভাব। চেহারায় যেন একটু গর্বের ছাপ।

ন্যু ইয়র্কের উপকণ্ঠে গ্রীনিচের ছোট একটা গলির পুরানো একখানা বাড়ীর একতালার ঘরে দীর্ঘ কয়েক যুগ একাদিক্রমে কাটিয়ে এসেছেন। অনেকদিন ধরে শুধু ছবি এঁকেই গেছেন, তেলরঙে। মাঝে মাঝে চলেছে কাব্য-রচনা। নাটকও লিখেছেন দুখানা, তাছাড়া প্রবন্ধ, তাদেরও সংখ্যা খুব কম নয়। বন্ধু বান্ধব বড় একটা নেই। সামাজিক জীবনের বিশেষ ধার ধারেন না। ঘরে না আছে একটা রেডিও, না একটা TV সেট। এগুলো আদপেই সহ্য করতে পারেন না কামিংস। বলেন, ওরা আধুনিক জীবনের অভিশাপ।

লেখাপড়ার চর্চা ইদানীং একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। পড়াশোনার কথা উঠলে বলেন, 'I've my education' (অর্থাৎ ও সব পাট চুকিয়ে এসেছি। ইউনিভারসিটির ডিগ্রি যখন পেয়েছি, অন্ততঃ মূর্খ কেউ বলবে না।)

১৯১৫ সালে হারভার্ড থেকে সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোনোর সময় যে দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় ছিল, আজও তা একটুও শিথিল হয় নি। কামিংস কোন একটা বিশেষ মতবাদ অনুসরণ করা বা কোন একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাকে আত্মবিকাশের পরিপন্থী জ্ঞান করতেন, তাই নিঃসঙ্গ বা দলছাড়া হওয়াটা তাঁর কাছে শুধু কাম্যই ছিল না, ছিল সাধনার অঙ্গ।

সমালোচকেরা এ পর্যন্ত এডোয়ার্ড ইষ্টলীন (E.E) কামিংসের লেখার স্বপক্ষে ও বিরুদ্ধে যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, সবগুলো একত্র করলে তাঁর রচনা যে অভিনব ও জোরালো, সেটা বুঝতে কারো বাকী থাকে না। তাঁর কাব্যের স্বরূপ বোঝাতে বলা হয়েছে :

Most Powerful, experimental, ugly, arbitiary, explosive, awkward, beautiful, incomprehensible, admired and controversial.

যদিও সাহিত্য-রসিক সমাজে কামিংসের অনুরাগীর একান্ত অভাব ছিল না, তবুও বহুদিন যাবৎ তাঁর কবিতা কাব্যের-আসরে একরকম অপাংক্তেয়ই ছিল। অধিকাংশ সময় তা হাসি ও বিদ্রূপের খোরাক যুগিয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর লেখার সুখ্যাতি করবার মত লোকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। পুলিৎসার (Pulitzar) কমিটীতে তাঁর দাবী বহুবার উপেক্ষিত হয়েছে। কামিংস অবিশ্যি এজন্যে বিশেষ ক্ষোভ বা নৈরাশ্য বোধ করেন নি।

তিনি বলেছেন,—'I'm an individual. In an age of standardization, its almost impossible, to express the attitude of an individual. If 1,50.000000 people want to be undead (এই 'undead' শব্দটা কামিংসের স্বরচিত, অর্থ : not dead, but not alive also, এক কথায় জীবন্মৃত। ওঁর মতে বেশীর ভাগ লোকই undead) that's their funeral, but I happen to like being alive,

কামিংসের লেখায় 'individual' শব্দটির প্রয়োগ খুব বেশী। ওঁর ধারণা individual হতে হলে জীবন্ত বা প্রাণোচ্ছল হওয়া চাই। যারা individual নয়, তারাই undead। ··সব দেশেই সাহিত্যিক বা কবিদের নিজ নিজ গোষ্ঠী, groop বা স্কুল আছে, কিন্তু কামিংস কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত নন। সাহিত্যিক বা শিল্পীদের এই groopকে কামিংস ঠাট্টা করে বলে থাকেন 'gang'.

প্যারীতে থাকাকালীন আবার্গ, ব্রেঁত ও পিকাসো গোষ্ঠীর লেখক, গায়ক ও শিল্পীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল, কিন্তু কারো দলেই তিনি যোগ দেন নি, কামিংস বলেছেন,—

'They were group people, intellectual, I was myself It I had n't Known one Soul in Paris, it would n't have made the least differnce Right now I'd rather have two good friends than half a million admirers.

কামিংস একটু লাজুক প্রকৃতির কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্কোচের ভাবটা ঢেকে রাখতে চান, রুক্ষ গাম্ভীর্যের আবরণে। কারো সাথে বাগবিতণ্ডা করবার কিংবা বাক-চাতুর্যে আসর জমিয়ে তুলবার মত দক্ষতা হয়ত তাঁর নেই, কিন্তু যখনই কোন নীতির প্রশ্ন ওঠে তখন তাঁর অদম্য দৃঢ়তা বিস্ময়কর ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

জীবন ভোর কামিংস ষ্টাইলের সন্ধানে ফিরেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কি করে প্রকাশ-ভঙ্গীকে নূতনতর ও প্রখরতর করে তোলা যায়। হারভার্ডে পড়বার সময় KEATS ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। কীটসের প্রভাব তার তরুণ মনটাকে অচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর সে যুগের লেখা থেকে এই প্রভাবটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়, যদিও লিখনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করবার মত :

'With mouth flower-faint and
undiscovered eyes
and dim slow perfect body amorous.'

হারভার্ডে কামিংস গ্রীক ভাষায় বিশেষ পাঠ নিয়েছিলেন। গ্রীক থেকে (এবং খানিকটা ল্যাটিন থেকেও) পরিকল্পনা নিয়ে তিনি আঙ্গিক তৈরীর কাজে লাগালেন,— যেমন, বড় হাতের অক্ষর বর্জন (গ্রীক বইয়ে বাক্যের প্রারম্ভে বড় হাতের অক্ষরের প্রচলন নেই, ল্যাটিনেও নেই। এক ইংরেজীতে আছে)। কামিংস I (আমি)-র স্থানে 'i' ব্যবহার করেছেন। আবার একটা শব্দকে বিচ্ছিন্ন করে (Greek এ যেমন mesis), তার মাঝে পৃথক অন্য একটী শব্দ বা বাক্য বসিয়ে, ব্যঞ্জনাকে গাঢ়তর করবার প্রয়াস করেছেন। Loneliness কে কামিংস লিখেছেন,—

L (a leaf falls) oneliness.

এ ছাড়া আরো করেছেন দুটী শব্দে মধ্যের ব্যবধান লোপ বা দুই শব্দের মাঝের ফাঁকটাকে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি, অহেতুক কমার ব্যবহার বা কমার আগে পিছে কোন ফাঁক না রাখা। ইচ্ছে মত শব্দের মধ্যে কমা বসিয়ে ও ছোট বড় অক্ষরের সাহায্যে তাকে ভেঙে ফেলে, তার অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকট করে তুলবার চেষ্টাও একটা অভিনব কৌশল যেমন :—

SP RIN, k, Ling an instant with Sunlight'! কামিংস এই শব্দ ভাণ্ডার কাজকে বলেছেন 'Scattering'। Sprinkling শব্দটাকে যেন সমস্ত পাতার ওপর গুঁড়ো করে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। শব্দটার ভাবার্থ এতে অনেকখানি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একে আমরা বলতে পারি typographical Onometopoeia। কামিংস লিখছেন—

'with up so floating many bells down' এটা অনেকটা হিং-টিং-ছট এর মত লাগে। সোজাসুজি এটা হচ্ছে with so many bells floating up and down, কিন্তু শব্দগুলো ওলট-পালট করে বসানোতে বক্তব্যটা একটু গভীরতর হয়ে উঠেছে।

সেই রকম,—'our shining present must come to an end বোঝাতে গিয়ে কামিংস লিখছেন—

Shining this our now must come to then. our present এর জায়গায় this our now এবং end এর বদলে then ব্যবহার করে তিনি গতানুগতিক প্রকাশ-ভঙ্গীতে একটা সতেজ নূতনত্ব আরোপ করেছেন।

কমার আগে পিছে জায়গা না ছাড়ার পরিকল্পনা কামিংসের স্বপরিকল্পিত নয়। কামিংস যখন শব্দ ও চিহ্ন নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তখন তাঁর কবিতা ঠিক মত ছাপবার লোক পাওয়া সত্যিই কঠিন ছিল। কেবল একজন মুদ্রাকর স্যাম জেকবস। তিনিই নির্ভুল

ভাবে তাঁর লেখা ছাপতে পারতেন। জেকব্‌স ছিলেন বিদগ্ধ লোক। তিনি বলেছেন,—

In fine old books, especially. French ones then was no space before and after a comma. A comma creates its own space. Mr cammings knows exactly what he's doing.'

কামিংস তাঁর রচনায় আরো অনেক রকম বিমূঢ়কারী উদ্ভট আঙ্গিকের প্রয়োগ করেছেন। যেমন, একসঙ্গে দুইটি বিভিন্ন চিন্তার প্রবাহ, ক্রিয়ার বদলে বিশেষ্যের প্রয়োগ ও বিশেষ্যের স্থলে ক্রিয়ার ব্যবহার, ইচ্ছামত চিহ্নের (punctuation) বিলোপ বা আমদানী, যতিহীন, গায়ে-গায়ে বসাবার অথবা বিভক্ত শব্দ সম্বলিত বাক্য যা পড়তে গেলে হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে কামিংসের টেকনিকের সাথে একবার যার ভাল করে পরিচয় হয়েছে, তার পক্ষে ওর কবিতার মর্ম উপলব্ধি করাটা কঠিন হবে না। কামিংসের প্রবর্তিত বেয়াড়া ঢং-এর অনুকরণে আমেরিকান সাহিত্যিক পত্রিকায় অনেক ব্যঙ্গ রচনা ছাপা হয়েছে। সম্পাদকেরা যখনই কোন মজাদার লেখা দিয়ে পাঠকদের হাসি ফোটাতে চান,—they send out a reporter to do a piece on mock cummingsese.

কামিংসের আঙ্গিক সম্পূর্ণ বাইরের, ভাষণ রীতির মধ্যেই তা নিবদ্ধ। ভাবের রাজ্যে কোন নতুন বিভ্রান্তকারী ঢং-এর প্রয়োগে, তিনি তাঁর কাব্যের অর্থকে ঘোরালো বা অস্পষ্ট করে তুলবার পক্ষপাতী নন। তাঁর রচনায় তাই নেই কোন সিম্বলিজমের বালাই, ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্বের মারপ্যাচ ফিউচারইজম, স্যুররিয়্যালিজম প্রভৃতি অতি আধুনিক দুর্বোধ্য শিল্প-রীতির কারসাজি। বস্তুতঃ তিনি রোমান্টিকধর্মী প্রাচীনপন্থী কবি। তার কবিমানস শেলী কীটসের ঐতিহ্যে গড়ে উঠেছে। সাহিত্য ও শিল্পজগতের বিপ্লব ও নিত্য নতুন আন্দোলনের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ কোন রকম পরিবর্তন ঘটে নি।

সমসাময়িক কোন কবির লেখাই তাই ঠিক মনঃপূত হয় নি, এক এজরা পাউণ্ডের লেখা ছাড়া। পাউণ্ড সম্বন্ধে তিনি সত্যিই খুব উঁচু ধারণা পোষণ করবেন। কামিংস বলেছেন, Everybody in my generation is in debt to pound. He was to the poetry of this century, what Einstein was to physics.'

বসন্ত, চাঁদ প্রকৃতির শোভা, প্রেম, আত্মার রহস্য কামিংসের কাব্যের মূলে এরাই প্রেরণা জোগায়। তবে তিনি আগের দিনের উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতা, riotious lyricism এর ভাব কাটিয়ে উঠেছেন। ভাব এখন অনেক ঘনীভূত, লেখায় এসেছে একটা গাম্ভীর্য, একটা প্রজ্ঞার ছাপ। তাঁর সাম্প্রতিক কাব্য গ্রন্থ 95 POEMS পড়লে এটা বেশ বোঝা যায়। তাঁর অল্প বয়সের লেখা কবিতাও আজকালকার লেখার মধ্যেকার পার্থক্যটা বোঝা যাবে নীচের দুটো উদ্ধৃতি থেকে,—

'In just
Spring when the world is mud
Luscious the little
Lame balloonman
Whistles far and wee
and eddyandbill come
Running from marbles and
piracies and its
spring

when the world is puddle-wonderful.

এটা একটা লিরিক।

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' বোঝাবার জন্য 'Just-spring' শব্দটা ব্যবহার করেছেন কামিংস।

Lame balloonman হচ্ছেন Pagan god Pan তাঁরই বাঁশী শুনে যেন পঙ্ক সরস (mud-luscious), কাদাজল ভরা গর্তে সমাচ্ছন্ন আশ্চর্য পৃথিবীর (puddle-wonderful) যুবক যুবতীরা (eddieandbill—Eddie এবং Bill) চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে।

পরবর্ত্তী কালের লেখাটাও ঋতুর উদ্দেশে

'In time of daffodila (who know
the goal of living is to grow)
forgetting why remembering how.

এটা বাহুল্য-বর্জিত, উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে একটা দার্শনিক সুর জেগে উঠেছে। কামিংসের শেষ দিককার লেখায়

আমরা যে সংযম ও স্বল্প ভাষণের পরিচয় পাই, তা নীচের দুটো লাইনে চমৎকার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—

He sharpens is to am
he sharpens say to sing

[অন্যার্থ: মানুষকে তিনি নগণ্য প্রথম পুরুষ থেকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উত্তম পুরুষে রূপান্তরিত করেন, কথাকে সুর দিয়ে করে তোলেন গান।]

অথবা—

'Precisely as unbig a why as i'm (almost too small for death's because to find) may, give perfect mercy, live a dream.

টিকা: as unbig a why as i'm—

এত ক্ষুদ্র কেন, যা কিছুই নয়, শূন্যের মত তুচ্ছ, যা আমার নিজেরই মত অকিঞ্চিৎকর নিরুত্তর প্রশ্ন।

অর্থ: মৃত্যুর চরমতা যে ক্ষুদ্রকে খুঁজে পাবে না তারও স্বপ্ন বিধাতার কৃপায় একটা আদর্শের মধ্যে আপনাকে রূপায়িত করে তুলবে।)

কামিংসের কাব্যে যেমন একটা Paganism এর সুর রয়েছে, তেমনি রয়েছে গতানুগতিকতার মোহ কাটিয়ে উঠবার আগ্রহ ও একটা বিদ্রোহের উদ্ধত ভঙ্গী। বর্তমান জগতের অন্তঃসারশূন্যতা ও স্বার্থপরায়ণতা তার মনকে পীড়িত করে তোলে।

কিন্তু তাঁর এই বিদ্রোহের ভাব তাঁকে অবিশ্বাসী নাস্তিকে পরিণত করেনি। ঈশ্বর বিশ্বাসে তিনি অবিচল রয়েছেন। তাঁর কবিতায় তিনি যেমন বর্তমান জগতকে তীক্ষ্ণ পরিহাস করেছেন, নির্মম আঘাত হেনেছেন, ঘৃণা ও নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন এর বিরুদ্ধে, গালিগালাজ করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, অন্যদিকে আবার তেমনি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন বিনম্র ভঙ্গীতে, প্রকৃতির এই বিচিত্র সুষমা—রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ যা আমাদের হৃদয়কে আনন্দে ভরে তোলে, তারই মহান স্রষ্টা হিসাবে—

'i thank you God for most this amazing a day: for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true deam of sky; and for everything
Which is natural which is infinite which is yes

(i who here died am alive today and this is the sun's birthday; this is the birth
day of life and of love and wings and of the gay
Great happening illimitably earth)
how should any tasting touching hearing seeing
breathing any lefted pom the no of all nothing—human merely being doubt unimaginable You ?

(Now the ears of ear- awake and now the eyes of my are opened)

ভাষা ও ব্যাকরণকে তুচ্ছ করতে শিখেছিলেন কামিংস, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। তার ভঙ্গী ছিল একান্ত নিজস্ব। ব্যাঙ্কারদের মধ্যে একটা শব্দের চল আছে -'maverick'। অর্থ—আদাগা বা অচিহ্নিত (uhbranded) বাছুর, অর্থাৎ বেওয়ারিশ বলদ।

Cummings সম্বন্ধে Schonberg বলেছেন,—

অ্যামেরিকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে কামিংস হচ্ছেন 'maverick' (অর্থাৎ বিশেষ কোন দলের জন্য চিহ্নিত নন)। উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াল্ট হুইটম্যান যা করেছেন, কামিংস বর্তমান শতাব্দীতে তাই করছেন।......

His importance to the twentieth century is to secure if only for the fact that he, more than any other american poet, helped free the language.'

Marian Moore অ্যামেরিকার কাব্য-জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহিলা কবি। তিনি বলেন, আজকালকার তরুণ কবিদের অনেকের লেখাতেই তিনি কামিংসের ছাপ দেখতে পান। অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারেও ওঁর প্রভাব এসে পড়েছে ওদের লেখায়।

বলতে গেলে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কামিংস একরূপ অনাদৃতই ছিলেন, তাঁর ভাগ্যে সরকারী স্বীকৃতি মেলেনি। কিন্তু কিছুদিন হল তাঁর প্রতি রাষ্ট্রের সুদৃষ্টি পড়েছে।

১৯৫২-৫৩ সালের জন্য হারভার্ড বিশ্ববিত্মালয়ের চার্লস এলিয়ট নর্টন অধ্যাপকের পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কামিংসের বক্তৃতাগুলি যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল এবং ছাত্র মহলে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনতে তাঁর বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের রীতিমত ভিড় জমত। কামিংস American Academy of Poets এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, কবিতার জন্য পেয়েছেন Bollingen Prize

কামিংসের জীবনী লিখেছেন চার্লস নরম্যান, আর ১৯৫৮ সালে প্রসিদ্ধ সমালোচক অধ্যাপক ফায়েডমান তাঁর কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেছেন।

আজ Carl Sandburg, Conrad Auiken Ezra Pound, T.S. Eliot, W.H. Auiden, Dylon Thomas, William Carlos প্রভৃতি খ্যাতনামা কবির সাথে কামিংসও ইয়াংকিদের কাব্য-জগতে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

হারকোর্ট ব্রেস এ্যাণ্ড কোম্পানীর William Jeva-novitch ১৯২৩-৫৪ সালের মধ্যে রচিত কামিংসের কবিতাবলীর এক সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থ (৪৬৮ পৃষ্ঠা) ছেপে বার করেছেন। সাধারণতঃ কবিতার বইয়ের প্রকাশকদের বিশেষ কিছু লাভ থাকে না (শুধু এদেশে নয়, প্রায় সব দেশেই);—কেননা, কাব্য পড়বার ও বুঝবার মত পাঠক পাঠিকার সংখ্যা সব দেশেই সীমিত। এটা সত্যিই বিস্ময়ের কথা যে Jvanovitch এই কাব্যগ্রন্থ ছাপিয়ে আশাতীত লাভ করেছেন, কামিংসের জনপ্রিয়তা এতে নিঃসন্দেহে সূচিত হচ্ছে।

কামিংস শুধু কবিই নন, শিল্পীও। তাই বই ছাপার ব্যাপারে তিনি সামান্যতম সৌন্দর্যহানি বরদাস্ত করতে পারেন না। অনেক সময় ওঁর আপত্তিতে প্রকাশকদের পাতাকে পাতা নতুন করে ছাপতে হয়েছে। তার বইয়ের প্রকাশকদের বেশ কিছু ঝামেলা পোয়াতে হয়, যেমন হয়েছিল তার 95 POEMS ছাপতে গিয়ে Gerald Grossকে।

কামিংস ও তাঁর স্ত্রী মেরিয়ান অধিকাংশ সময় গ্রীনিচ পল্লীতেই কাটান। গ্রীষ্মকালে স্ত্রী চলে যান নিউহ্যাম্প-সায়ারে পৈতৃক খামার-বাড়ীতে। বছরের প্রায় ৩,৪ মাস কামিংসকে একাই কাটাতে হয়।

ওঁদের গ্রামের বাড়ীর ওপর তলার ছোট্ট একটা ঘরে কামিংসের Studio, এখানে বসে কবি ছবি আঁকেন।

লেখার মত ছবিতেও বলিষ্ঠ ভঙ্গীর প্রকাশ সহজেই চোখে পড়ে। তুলির টানে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচের আভাস নেই কোথাও। কবিতার মত চিত্রকলায়ও তাঁর কোন জটীল, দুর্বোধ্য, অতি আধুনিক বস্তুনিরপেক্ষ আর্টের তির্যক ঢং দর্শকচিত্তকে বিভ্রান্ত করে তোলে না।

তাঁর আঙ্গিক ঋজু, স্বচ্ছ ও ব্যঞ্জনা গভীর।

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নব-প্রচেষ্টা ?

রাজ্য-কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র একটি বিবৃতি-প্রসঙ্গে বলিতেছেন। "প্রাক্ নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় (বর্ত্তমান) সরকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দল মানুষের ক্ষুধা ভাঙ্গিয়ে নিজেদের সুবিধার জন্য যে সব গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা মিথ্যা হয়ে গেছে।"

মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে কি না সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করিয়া শুধুমাত্র এইটুকু বলিলেই কি যথেষ্ট হইবে না যে, বিগত যে কয়টি নির্ব্বাচন (১৯৬২ পর্য্যন্ত) হইয়াছে এবং সেই তিনটি নির্ব্বাচনেই 'একদা-মহান' এবং 'বর্ত্তমানে ডি-ভ্যালুড কংগ্রেস জনগণের নিকট যে হাজার হাজার পবিত্র প্রতিশ্রুতি দান করেন, তাহার শতকরা কয়টির মর্য্যাদা কংগ্রেস তথা কংগ্রেস-পতিরা রক্ষা করিয়াছেন কিংবা রক্ষার সামান্য প্রয়াসও করিয়াছেন ? প্রতিশ্রুতি রক্ষার একটা ছোট তালিকা কি কংগ্রেস সম্পাদক মহাশয় দিতে পারিবেন না ?

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা যায় যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী কে—এবং কাহাদের পাহাড় প্রমাণ বিজ্ঞতার কারণে দেশ এবং দেশবাসীকে আজ এক অসহনীয় দুঃখকষ্ট এবং সর্ব্ববিষয়ে বঞ্চিত ভিখারীরও-অধম জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে ? মিশ্র মহাশয় যদি এই সামান্য প্রশ্ন কয়টির জবাব দিতে পারেন, তাঁহার কাছে চিরবাধিত থাকিব। কিন্তু জবাব পাইব কি ?

শ্রীমিশ্র তাঁহার বিবৃতি প্রসঙ্গে আরো বলিতেছেন :

"—বর্ত্তমান সঙ্কট ও সংগ্রামের দিনে কংগ্রেস ও কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। দেশের বর্ত্তমান সংকটের দিন নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কংগ্রেস কমিটি ও কর্মীদের অবহিত হতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁরা যেন জনগণের পাশে এসে সর্ব্বক্ষেত্রে দাঁড়ান, তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা, শক্তি ও পরামর্শ (?) দেন—"

গত ২০ বছরে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া আজ দেশ এবং জনগণকে আবার কি অভিনব নির্জ্জলা নৈতিক সহায়তা, শক্তি এবং পরামর্শ একদা-মহান বর্ত্তমানে হতমান কংগ্রেস আমাদের দিবেন জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসীদের সতর্কতার অতি-প্রয়োজন আছে। কংগ্রেসী, বিশেষ করিয়া নেতৃস্থানীয়রা, যেন হঠাৎ জনগণের কাছে গিয়া নৈতিক পরামর্শ এবং শক্তিমান করিবার উৎসাহ বেশী না দেখান, বিবৃতিদানে বিপদ কম।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, যে-বিষম খাদ্য সঙ্কট দেশে প্রায় অরাজকতার রাজত্ব সূচিত করিয়াছে—সেই বিষম খাদ্য-সঙ্কট বর্ত্তমানে যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের সৃষ্টি নহে। বিগত প্রায় বিশ বৎসরের কুশাসনের কারণেই আজ এই জাতীয়-বিপদের উদ্ভব। বলা বাহুল্য—বিগত বিশ বছর কংগ্রেসী দলই প্রশাসন নৌকার হাল ধরিয়া আজ সেই নৌকাকে আঘাটায় ঠেলিয়া দিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে ! আরামের গদি পরিত্যাগ করিয়া, অবশ্যই বাধ্য হইয়া, কংগ্রেস তথা কংগ্রেসরীরা আজ বিষম মনোকষ্টে এবং সদা সশঙ্ক চিত্তে

আছেন। জনগণের দুঃখে আজ কংগ্রেসীদের বুক প্রায় ফাটিবার মত হইয়াছে—। পূর্ব্বে কংগ্রেসীরা যখন প্রশাসনের গদিতে ছিলেন সেই সময় জনগণের কথা চিন্তা, আজ যাহা বাক্যে করিতেছেন, তাহার হাজার ভাগের এক ভাগও করিয়া যদি দেশের দুঃখ মোচনে সামান্য প্রয়াস এবং কিছু তৎপরতা প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে বোধহয়, আজ কংগ্রেসকে এমন পেট-ফাটা কোলা ব্যাঙের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইত না! একথা একান্ত গর্দ্দভও বুঝিতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আজ ভি-আই-পি রোড ছাড়িয়া গলিপথে পূর্ব্বে গৌরবের আসন অর্থাৎ মহাকরণে মনিবরূপে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, বর্ত্তমান সরকারকে যে-কোন ভাবে ঘায়েল করিয়া! কিন্তু এ অপচেষ্টা সার্থক হইবে কি? কংগ্রেসকে দেশের লোক যদি বিশ বৎসর সময় দিয়া থাকে হাজারো ব্যর্থতা সত্ত্বেও, তাহা হইলে ইউ-এফ সরকারকে—দু-চার বছর মাত্র সময় জনগণ অবশ্যই দিবে —বিশেষ করিয়া যখন শতকরা ৮০।৮৫ জন লোক এই সরকারকে তাহাদের নিজের সরকার বলিয়া মনে করে।

—

কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি রক্ষা?

কংগ্রেস দেশবাসীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিমালা কি ভাবে রক্ষা করিয়াছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রশংসাবাদ সুদূর কাবুলে বসিয়া সীমান্ত গান্ধী (খাঁ আবদুল গাফর খাঁ) শুনিতে পাইয়া আজিকার কংগ্রেসকে তাঁহার সার্টিফিকেট দিতে কোন কার্পণ্য করেন নাই। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সেই প্রশংসা উদ্ধৃতি করিলাম সানন্দ চিত্তে—

> কাবুল, ৪ঠা আগষ্ট (পি, টি, আই)—সীমান্ত গান্ধী এই সপ্তাহের প্রথমদিকে পি, টি, আইর সংবাদ-দাতা ও একদল ভারতীয় তরুণের কাছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধঃপতনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
>
> তিনি দেশের যুবকদের এই অধঃপতন রোধে অগ্রসর হতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণের কাজে কংগ্রেস যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সর্বাগ্রে পূরণ করতে হবে। যদি তা করা হয়, তবে ভারতের স্বাধীনতাও সুদৃঢ় হবে এবং দেশ ও জনগণ উপকৃত হবে।
>
> সীমান্ত গান্ধী বলেন, তিনি কংগ্রেসের অধঃ-পতন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারেন নি। সংবাদপত্র থেকে যেটটু জানা গেছে বা 'যে সব বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁদের কাছ থেকে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, নেতাদের মধ্যে সম্পদের মোহ এবং পদের আকাঙ্ক্ষাই হল কংগ্রেসের পতনের কারণ।'
>
> তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস জনগণকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ করা হয় নি। পাঠানদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও তারা পালন করে নি। দরিদ্র জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাও পালন করা হয় নি।
>
> প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল দুবেলা পেট ভরে খাওয়া, বাসস্থান, পরণের কাপড় ও লেখাপড়ার সুযোগ। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস রাখে নি।

বর্ত্তমান কংগ্রেসী কর্ত্তাদের মতে, আশা করি, সীমান্ত গান্ধী 'বাঙ্গলা-কংগ্রেসের' সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না এবং তাঁহাকে দল ত্যাগী টার্নকোট্ আখ্যাও দেওয়া যাইবে না। আজ যে কথাগুলি শ্রদ্ধেয় গাফর খাঁ বলিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে বহু কংগ্রেসী প্রথম-সারির নেতা কংগ্রেস সম্পর্কে ঠিক এই কথাগুলি পাপমুখে উচ্চারণ করিয়া পবিত্র কংগ্রেসী আস্তাবল (না-গোয়াল?) হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। এই বিতাড়িতদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রও ছিলেন। আচার্য্য কৃপালনী, কে, এম, মুন্সী এবং অন্যান্য জীবিত নেতাদের নাম করিলাম না, কারণ তাহা অতি সুবিদিত।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সীমান্ত গান্ধীর নিন্দাবাদের কিছু প্রতিবাদ করিতে পারিবেন কি? শ্রীমিশ্রের অবশ্য স্বাধীনভাবে কিছু বলিবার অধিকার কতখানি তাহা আমরা জানি না তবে তিনি এ-বিষয় বঙ্গ-সম্রাটকে

গোপনে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার শ্রীউপদেশামৃত প্রকাশ করিতে পারেন, এবং তাহা করিলে আমরা মৃতপ্রায় বঙ্গবাসীরা কংগ্রেস সম্পর্কে নূতন আশায় উদ্বোধিত হইয়া দিনগুণিতে থাকিব কংগ্রেসের পুনঃগদিরূঢ় হইবার দিনের অপেক্ষায়।

—

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শ্রমনীতি

রাজ্য সরকার যে ভাবে 'শ্রমিককল্যাণ' নীতির বিষম পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে এইবার আবার সকল বিষয় ভাল করিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া শ্রমনীতি এবং এক তরফা শ্রমিককল্যাণ (?) প্রচেষ্টার কিছু অদলবদল করা যায় কি না দেখা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে। বিগত মার্চ্চ মাস হইতে ২০এ আগাষ্ট পর্য্যন্ত এ-রাজ্যে কতগুলি ঘেরাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

গত মার্চ হইতে ১৬-৮-৬৭ পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৮৭০০টি ক্ষেত্রে 'ঘেরাও' অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র ওই তথ্য দিয়া বলেন যে, প্রধানত তিনটি কারণে এই ঘেরাও হইতেছে। এই তিনটি কারণ (১) ট্রাইবুন্যাল এবং সালিশীর রায় অমান্য, (২) ছাঁটাই এবং লে-অফ (৩) বোনাস ও অন্যান্য বিষয়।

এই ঘেরাও-এর মধ্যে মার্চ মাসে হয়েছে ১৭টি ক্ষেত্রে, এপ্রিলে ১৬৩টি মে-তে ২৩৭ এবং জুনে ১৬৩টি ক্ষেত্রে! পূর্ণসংখ্যা এখনও পাওয়া যায় না কি।

—

৩৬টি কারখানা বন্ধ

কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৮টি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ। ইহার মধ্যে ৮টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; ২৩টিতে 'লক-আউট' ঘোষিত এবং বাকিগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘট।

উক্ত কারখানাগুলির অধিকাংই লৌহ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সংক্রান্ত। মোট ত্রিশ হাজার শ্রমিকের ভাগ্য এই কারখানাগুলির সঙ্গে জড়িত।

কয়েকটি কারখানা কাঁচামালের অভাবে বন্ধ, তেমনি অন্য কয়েকটি শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বন্ধ। ইহাছাড়া সরকার কর্তৃক নিরাপত্তা দানের অভাবের অভিযোগ তুলিয়া কিছু কারখানা-মালিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এ-রাজ্যে যে সকল কারখানা বন্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৮টি কারখানা বন্ধ হইল 'চিরতরে'!

শ্রমিক-সমস্যা-আক্রান্ত কারখানাগুলির প্রায় সব কয়টিই অবস্থিত—খড়দা বেলঘরিয়া দমদম বেহালা এবং যাদবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। কারখানা বন্ধের ফলে বেকার হইয়াছে প্রায় ৪০,০০০ লোক। সরকারী সমর্থনে শ্রমিক আন্দোলন এই ভাবে যদি আরো কিছুকাল চলে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে বেকারীর সংখ্যা হাজার হাজার হইতে লক্ষ লক্ষ হইতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

ক্ষিপ্ত শ্রমিক এবং জনতা কর্তৃক বিক্ষিপ্ত ঘেরাও-এর সংখ্যাও কম নহে। খাদ্যের দাবীতে বি, ডি, ও, এমন কি মন্ত্রীগণও ঘেরাও হইতে নিস্তার পাইতেছেন না।

আর একটি দিকে আমাদের বয়সে নবীন, কিন্তু-জ্ঞানে-বৃদ্ধ শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টিদান কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তাহা আর কিছুই নহে, ছোট বড় সকল কলকারখানার মালিক এবং অফিসারদের মনে নিরাপত্তার অভাব। একান্ত বিপদে এবং প্রয়োজনেও ইঁহারা পুলিসের সাহায্যে বঞ্চিত হইতেছেন—দেখিয়া মনে হয় যেন পুলিস বাহিনী একমাত্র শ্রমিক স্বার্থেই ব্যবহৃত হইবে। মালিক পক্ষও যে করদাতা এবং ইহাদের প্রতিও যে সরকারের কিছু কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব আছে তাহা যেন যুক্তফ্রণ্ট সরকার ঠিক স্বীকার এখনো করিতেছেন না। পুলিসী ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রমমন্ত্রীর পরামর্শ অবশ্যই থাকিতে পারে, কিন্তু পুলিসকে নির্দ্দেশ দানের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য তাঁহার নহে, সে অধিকারও তাঁহার নাই, এবিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব এবং ক্ষমতা আমাদের মুখ্য তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের।

একথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে মুখ্যমন্ত্রী এবার যেন একটু কঠিন হস্তে তাঁহার চৌদ্দ-ঘোড়ার প্রশাসন যান

চালাইবার প্রয়াস পাইতেছেন এবং দু-এক জন উগ্র-লাল মন্ত্রীকে সংযত করিতেও ভরসা পাইতেছেন।

শ্রমিকদের অকল্যাণ কেহই চাহে না কিন্তু শ্রমিক কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে শ্রমিকদের যাঁহারা কাজ যোগান এবং বিভিন্ন শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিয়া শ্রমিকদের কর্ম্মসংস্থান ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্বার্থ এবং অধিকার, সরকারের বিশেষ বিশেষ অতি-পণ্ডিত কিন্তু সীমিত-বুদ্ধি মন্ত্রীর খাম-খেয়ালীতে, যেন অযথা ক্ষতিগ্রস্ত এবং সঙ্কুচিত না হয়। সকলেই যখন সরকারী "প্রজা" সেই ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর প্রজার স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষা করিতে গিয়া অন্য শ্রেণীর প্রজার স্বার্থ এবং অধিকার নষ্ট করিবার বিশেষ ক্ষমতা কোন মন্ত্রীর থাকা উচিত নহে। এবিষয়ে ইউ-এফ মন্ত্রীদের এবং সমগ্রভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্ব কম নহে।

—

পশ্চিমবঙ্গে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী বিতাড়ন!

এবিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আলোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি কি ভাবে কতকগুলি বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙ্গালী অফিসার, কর্ম্মচারী, এমন কি চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীকেও বিবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিতাড়িত করা হইতেছে। বলা বাহুল্য এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি অবাঙ্গালী মালিকদের। কয়েকটি এমন বাণিজ্য-সংস্থাও আছে যে-গুলির মালিকানা এখনো বিদেশীদের হাতে।

নাম করিয়া দৃষ্টান্ত দিতে পারিলে ভাল হইত কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা করা যাইবে না, নানা কারণে। কলিকাতায় এমন কয়েকটি বাণিজ্য সংস্থা এবং কলকারখানা আছে, যেখানে ক্রমশ বাঙ্গালী অফিসার সরাইয়া পাঞ্জাবী-মাদ্রাজী প্রভৃতি আমদানী করা হইতেছে। কেবল অফিসারই নহে, টাইপিষ্ট, ষ্টেনোগ্রাফার, বেশী বেতনের কেরাণীদের পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য। এক দিকে—ভারতের অন্য কোন রাজ্যে বাঙ্গালীদের কোন স্থান নাই বলিলেই চলে—অন্যদিকে বাঙ্গালী নিজবাসভূমেও কি পরবাসী হইবে? প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকারের আমলে মন্ত্রীদের দৃষ্টি হতভাগ্য বাঙ্গালীদের উপর একটু দিতে কাতর। ডাকে বহু নিবেদন করি, কিন্তু তাহাতে শুভফল কিছুই হয় নাই। বর্ত্তমান সংযুক্ত দলীয় সরকার এবিষয় সক্রিয় ভাবে কিছু করিবেন কি না জানি না। তবে শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি এ-দিকে পড়িয়াছে দেখিয়া আনন্দের সঙ্গে কিছু কিছু আশার সঞ্চারও আমাদের হইতেছে। শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাঙ্গালী বিতাড়ন ব্যাপার লইয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অভিযোগও পেশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ যে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রমমন্ত্রী পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের সাহায্যে এ বিষয়ে একটি নমুনা সমীক্ষাও করিয়াছেন। সেই সমীক্ষার বিবরণটিও শ্রীব্যানার্জী তাঁর মূল অভিযোগের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিয়াছেন।

শ্রমমন্ত্রীর সুপারিশ দুটি। (১) কোন কোন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কীভাবে বাঙ্গালী তাড়াইতেছে পুলিশকে দিয়ে সে ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত করা হউক। (২) এই ভাবে বাঙ্গালী বিতাড়ন বন্ধ করার জন্য সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।

পুলিশের একটি নমুনা সমীক্ষায় নাকি দেখা গিয়াছে যে, বড় বড় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একদিকে যখন উচ্চপদ হইতে বাঙ্গালী সরাইতেছেন, অন্যদিকে তখনই নতুন নিয়োগ শুধুই অবাঙালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতেছেন। এটা যে সুপরিকল্পিত কাজ, গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে নাকি তাহাও বলা হইয়াছে।

লোক বা সরকারকে দেখাইবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অবশ্য উচ্চপদে কিছু বাঙ্গালী রাখিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের হাতে তেমন কোনও ক্ষমতাই নাই। এমন কি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কীভাবে চলে তাহাও নাকি তাঁহাদের জানিতে দেওয়া হয় না।

শ্রীব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রীকে আরও বলিয়াছেন যে এইভাবে কলিকাতার বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিকে চলিতে দেওয়া হইলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে বাঙ্গালী কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে চাকুরি পাইবে না। শ্রমমন্ত্রী অবিলম্বে এ ব্যাপার বন্ধ করিতে চাহেন।

বাঙ্গালীদের জন্য এই একটি মাত্র কাজ তথা উপকার যদি শ্রমমন্ত্রী করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে কি ভাবে এবং কত ধন্যবাদ জানাইব জানি না। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী বিতাড়নকারী ফার্মগুলির নাম নিশ্চয় জানেন। সরকারী ভাবে তাহা গেজেট করিতে কোন বাধা যদি না থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিতে দোষ কি? আমরা অপরাধী কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খবর রাখি এবং যথাকালে তাহা প্রকাশ করিব বলিয়া আশা রাখি।

গত কয়েক বৎসরে বিদেশী এবং অবাঙ্গালী মালিকানার বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে অতি নিষ্ঠার সহিত বাঙ্গালী অফিসার এবং একটু পদস্থ কর্মচারী অতি দক্ষতার সহিত সরানো হইতেছে। অবাঙ্গালী অফিসার চেয়ারে বসিয়াই—কি ভাবে এবং কোন পথে নিজ-রাজ্যবাসীদের কর্মসংস্থান করা যায় সে-বিষয় প্রখর দৃষ্টি রাখেন। নূতন নিয়োগের সময় ত তাঁহাদের পোয়াবারো। বাঙ্গালী কর্মপ্রার্থী যত দক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হউন না কেন, ইণ্টারভিউএর (যদি ভাগ্যক্রমে তাহার সুযোগ আসে) পর দরখাস্তের উপর "নট সুটেবল" মন্তব্য করিয়া অফিসার মহাশয় তাহা ফাইলে চাপা দেন। আর যদি নিজ প্রদেশের যোগ্য প্রার্থী না থাকে বা না পাওয়া যায়, সে সেক্ষেত্রে নিয়োগ কিছুকালের মত বন্ধ থাকে এবং সুবিধা সুযোগমত হঠাৎ একদিন নিয়োগ হইয়া যায় নিজ প্রদেশের প্রার্থী দ্বারা! টাইপিষ্ট এবং ষ্টেনোগ্রাফার নিয়োগের বেলায় অবাঙ্গালী অফিসারদের বাঙ্গালী (একান্ত যোগ্য হইলেও) নিয়োগের অসামান্য পক্ষপাতিত্ব প্রকট হয় বাঙ্গালী প্রার্থীকে 'রিজেক্‌টেড' লিষ্টে ফেলিতে। অযোগ্য বাঙালী প্রার্থীদের সম্পর্কে কোন দাবী আমরা করি না, কিন্তু খাস বাঙ্গালী দেশেও যদি যোগ্য বাঙ্গালী কর্মপ্রার্থীদের জোর করিয়া বেকার রাখিয়া অন্য প্রদেশবাসীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাহাতে আপত্তি এবং প্রতিবাদ করাও কি প্রাদেশিকতা বলিয়া বিবেচিত হইবে দিল্লীর দরবারে?

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলিতে, বিশেষ করিয়া অফিসার নিয়োগে, বাঙ্গালী কোণ ঠাসা হইয়া আছে—বিগত দশ বৎসর হইতে ইহা সবিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। এরাজ্যে অবস্থিত যে-কোন কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কি পরিমাণে এবং হারে বাঙ্গালী অফিসার ক্রমশ কমানো হইতেছে, তাহা অতি সহজেই ধরা পড়িবে। রেল, ডাক ও তার, কাষ্টমস এবং আয়কর বিভাগে দশ বছর পূর্ব্বে বাঙ্গালী অফিসার এবং পদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা কি ছিল এবং আজ সে-সংখ্যা কত কমিয়াছে—দেখিলে অবাক হইতে হয়।

কলিকাতা টেলিফোন গাইডে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার অফিসারদের নামের তালিকাকে কজন বাঙ্গালী আছেন, সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাঙ্গালী অফিসারের সংখ্যা এক হাতের আঙ্গুলে গোনা যাইবে, তাহার বেশী কষ্ট করার প্রয়োজন হইবে না।

কেন্দ্রীয় সরকার ফরেনসার্ভিসে বোধহয় পুরোপুরি বাঙ্গালী বর্জ্জন করিয়াছেন এমন করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কমিশন, কমিটি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নিয়োগ। ইহা কি যোগ্য বাঙ্গালী নাই বলিয়া, না, বাঙ্গালীকে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বাস করেন না বলিয়া? কমিটি, কমিশন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যাঁহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তারা নিযোগ করিতেছেন, তাঁহাদের অযোগ্য বলিবার সাহস নাই, কিন্তু একদেশদর্শী কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের ঝাপসা চোখে যোগ্যতর বাঙালীদের দেখা যায় না কেন? এখানেও সেই দুষ্টচক্র এবং দুষ্টচক্রীদের লীলাখেলা চলিতেছে। এই চক্র ভেদ করিবার মত বাঙালী সংসদ সদস্য কি একজনও নাই? অন্যরাজ্যের সদস্যগণ যেখানে নিজরাজ্যের লোকেদের জন্য প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কাজ গুছাইয়া লইতেছেন, সেই অবস্থায় বাঙ্গালী সংসদ সদস্য মহাশয়গণ কি ভারতের সংহতি এবং দলীয় স্বার্থ রক্ষার কাজেই ব্যস্ত রহিয়াছেন?

স্বর্গত শরৎ সি বাসু, ডঃ মেঘনাদ সাহা এবং শ্যামাপ্রসাদের পর আজ পর্য্যন্ত এমন একজনও বাঙ্গালী এম, পি দেখিলাম না, যিনি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর ন্যায্য দাবী লইয়া পার্লামেণ্টে কিছু বলিলেন, বাঙ্গালা এবং

বাঙ্গালীর প্রতি যে সব ক্ষেত্রে ক্রণিক-অবিচার হইতেছে, সেই সব ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী এম, পিদের মুখ খুলিতে কি লজ্জা হয়? এ কোন দুস্তর লজ্জা।

কোন্ পথে যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার?

পশ্চিমবঙ্গের শতকরা অন্তত আশীজন লোকই আজ জানিতে চাহে—রাজ্য সরকার এবার সর্ব্বপ্রকার অরাজকতা বন্ধ করিয়া রাজ্যে যথাযথ শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন কি, না। জনজীবনে গত কিছুকাল হইতে নিরাপত্তা বলিয়া কোন বস্তু নাই—এমন কি সকালে কাজে বাহির হইয়া বিকালে কোন লোক বাড়ি ফিরিতে পারিবে কি না তাহারও কোন স্থিরতা নাই। এক শ্রেণীর অসামাজিক হৈ-হল্লাকারী তাহাদের খুশীমত হঠাৎ একটা গোলমালের সৃষ্টি করিয়া শহরের স্বাভাবিক জীবন, কাজকর্ম, দোকানপাট সবই বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে, অথচ নাকের ডগায় পুলিশের আড্ডা থাকিতেও পুলিশ নির্বিকার, দেখিলে মনে হয় শান্তি-রক্ষার কোন দায়দায়িত্ব তাহাদের নাই।

পুলিশকে অযথা দোষ দিব না, কারণ বর্ত্তমানে বিশেষ কয়েকজন মন্ত্রী পুলিশকে কার্য্যতঃ একেবারে 'বেকার' করিয়া দিয়াছেন। এই জনকয়েক মন্ত্রীর বিশ্বাস যে—বর্ত্তমান সরকার যখন জনগণের, তখন জনগণই দেশের শান্তি রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব লইতে পারে। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখা যাইতেছে? শান্তিপ্রিয় জনগণ এই "শান্তি-রক্ষক" 'দলীয় ভক্তদের নিকট হইতে বিপদকালে কোন সাহায্য পায়ই না, অন্যদিকে পুলিশও এই "শান্তিরক্ষক" বিশেষ জনগণের "হুকুম মানিতে বাধ্য হইতেছে।" এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যখন অকুস্থলে ধৃত দুইজন গুণ্ডাকেও থানা হইতে পুলিস বিশেষ দলভুক্ত কয়েকজনের চাপে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছে। মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার অনাচার, হৈ-হল্লা লুঠতরাজ বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু সেই একই মন্ত্রী-সভায় এমন কয়েকজন সদস্য আছেন যাঁহারা মুখ্য-মন্ত্রীকে সর্ব্বভাবে ব্যর্থ এবং বেকুফ করিতে কোন চেষ্টাই বাদ দিতেছেন না। এই কার্য্যে সি পি আই (এম) মন্ত্রীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়!

বিধিসঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনে পুলিস হস্তক্ষেপ করিবে না—"ইহার অর্থ বুঝা যায়, যদিও আমাদের নবীন-শ্রমমন্ত্রী শ্রমিক আন্দোলনে 'ন্যায্য' এবং অন্যায্য'র মধ্যে সীমারেখা কোথায় টানিবেন জানি না, তিনি নিজেও এ বিষয় কিছু জানেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। আজ যে ভাবে "ঘেরাও গুণগান" তিনি করিতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে যে শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মশালার কাজকর্ম্ম প্রভৃতিকে একেবারে 'ঘেরাও' করিয়া তবেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিরস্ত হইবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে। শ্রমিককে যাঁহারা শ্রমের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ এবং অবকাশ দেন, সেই হতভাগ্য পক্ষকেই সর্ব্বভাবে নিঃস্ব করিয়া এবং শ্রমের সুযোগ নষ্ট করিয়া শ্রমমন্ত্রী 'সুখী-শ্রমিকরাজ' স্থাপনের জন্যই আজ সর্ব্বতোভাবে কি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন? শ্রমিক থাকিবে, কিন্তু শ্রম করিবার সকল অবকাশ বিনষ্ট হইবে—ইহা অপেক্ষা সুখের এবং কল্যাণকর শ্রমিক-জীবন আর কি হইতে পারে?

এ রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পত্রিকান্তর হইতে কিছু উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:

> "খাদ্যের বদলে গুলী করতে পারব না" মুখ্য-মন্ত্রী প্রকাশ্যে এই বিবৃতি দেওয়ার ফলে সম্ভবতঃ কোন কোন মহলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ট্রেণ বা অন্যান্য যানবাহন আটক করলে এবং রেলকর্ম্মচারীদের ধরে ঠেঙালেও পশ্চিমবঙ্গের সরকার হস্তক্ষেপ করতে আসবেন না। কিন্তু যখন মহেশ-তলার রাস্তায় ও ডায়মণ্ডহারবার রোডে বিরাট পুলিশ বাহিনীকে অবরোধ সরাবার জন্য নামতে দেখা গেল, নবদ্বীপে কোন মন্ত্রী ছুটে না গিয়ে গেলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট তখন অনুমান করা গেল যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ত টনক নড়েছে, তাঁর যেগুলি নিছক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা এমন কি সমাজের স্থিতি রক্ষার সমস্যা

সেগুলিকে খাদ্যের সমস্যার সঙ্গে জড়িত করে রাখতে দিতে প্রস্তুত নন। মানুষের জীবনহানি দুঃখজনক হলেও শান্তিশৃঙ্খলার অজুহাতে বিপজ্জনক একথা তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

আগামী কয়েকদিনে যদি এই অনুমান সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সরকার আইন-অনুযায়ী গঠিত শাসন কর্তৃপক্ষরূপে নিজেদের দায়িত্ব-বোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেবেন। এই কর্তব্য পালনে তাঁরা নিশ্চয়ই সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সহযোগিতা আশা করতে পারেন। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতার প্রয়োজন হবে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির পক্ষ থেকে। এই দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সমর্থকদের আগুন খাইয়ে এসেছেন, খাদ্যের দাবী আদায় করার জন্য কতদূর পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে তার কোন শিক্ষা তাঁদের অনুগামীদের এতদিন পর্যন্ত তাঁরা দেন নি। যাঁরা এতদিন জনবিক্ষোভের উজান টানে ভেসে এসেছেন এখন তাঁদের পক্ষে ক্ষমতার ঘাটে ভিড়ে সেই উজান ঠেকান খুব কঠিন, এবিষয়ে ভুল নেই। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের ভিতরে এমন দলও আছেন যাঁদের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ আজ দলের নেতাদেরও কোণঠাসা করে ফেলতে চাইছে। এই অবস্থায় সমগ্রভাবে যুক্তফ্রন্ট আজ যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির পিছনে এসে না দাঁড়ান পুলিসমন্ত্রী ও খাদ্য-মন্ত্রীর উপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেদের গা বাঁচাবার চেষ্টা করার প্রবণতা যদি বন্ধ না হয় তাহলে কোন কঠোর নীতিই বাস্তবে কার্যকরী করা যাবে না।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের সব কয়টি দলই যদি রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে একমত হইয়া কর্মপন্থা স্থির করেন —দেশের সব কিছুকে আবার স্বাভাবিক করিয়া আনা বিশেষ কষ্টকর হইবে না।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের তরফ হইতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে পরিষদের সম্পাদক শ্রীভবানী সেন রাজ্যের অর্থ-নীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া অচলাবস্থা সৃষ্টির চেষ্টার নিন্দা করিয়াছেন এবং "যানবাহন ও যোগা-যোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করার জন্য উদ্যোগী সমস্ত সমাজ-বিরোধী ব্যক্তির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও কঠোর ব্যবস্থা" গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়াছেন। বোধহয় এই প্রথম যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত একটি দল এমন স্পষ্ট ভাষায় সংযমহীন উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলনের নিন্দা করিলেন এবং এই আন্দোলন দমনের জন্য শাসনশক্তি প্রয়োগেরও সুপারিশ করিলেন।—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্রও এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে দাবী জানাইবার ও আদায় করার জন্য যোগা-যোগ, যাতায়াত, রেল বাস ও লরী পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করার কোন সার্থকতা নাই।

আশা করি যে, অন্যান্য দলগুলি, বিশেষ ভাবে যুক্ত-ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি অনুরূপ বিবৃতি দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করিবেন। একথা মনে রাখা দরকার যে খাদ্য আন্দোলন যদি হতাশা ও অসংগঠিত ক্ষিপ্ততার চোরা গলিতে প্রবেশ করে তাহা হইলে গণতন্ত্রও সেই গলিপথেই অদৃশ্য হইবে এবং সেই জায়গায় যে তন্ত্র আসিবে তাহার মধ্যে আজকের কোন দলেরই স্থান হইবে না।

অন্যান্য দলগুলিকে হয়ত মুখ্যমন্ত্রীকে অকুণ্ঠ সহায়তা দান করিবেন কিন্তু রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কি করিবেন বলা শক্ত। শ্রীবসুর 'তীব্রলাল' দলের সদস্যদের বোলচাল এবং ক্রিয়াকর্ম দেখিয়া সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয় যে সি, পি, আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে বৃহত্তর নক্সালবাড়ীতে পরিণত করিতে সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছে। বাস্তবে যদি এই কুপরিকল্পনা রূপ দিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোক, যাহাদের সি, পি, আই (এম) পার্টির সমর্থক এবং দরদী বলিয়া এই তীব্রলাল মানুষগুলি মনে করিতেছে, তাহাদের হাতেই, তীব্রলালদের লীলা সাঙ্গ হইবে। কথায় ইহারা 'রিভ-লিউশন, রিভলিউশন' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া থাকে, কিন্তু লাল ঝাণ্ডা হাতে লইয়া যাহারা পথচারীদের অযথা এবং

অনাবশ্যক নির্য্যাতীত করে—'ইনকুলাব জিন্দাবাদ' চিৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া দেয়, প্রকৃত বিদ্রোহ—রিভলিউশন তাহাদের দ্বারা হয় না। বাতাসে ঘুসি মারিতে কোন কষ্ট নাই কারণ হাতে আঘাতও লাগে না, কিন্তু বিদ্রোহ করিতে হইলে যেখানে আঘাত করা অত্যাবশ্যক, ডাড়াকরা অজ্ঞ লাল ঝাণ্ডা বহনকারী তাহার কোন সংবাদই রাখে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃত বিদ্রোহীদের গঠন যে 'ধাতুতে' ঝাণ্ডা বহনকারী হল্লা-কারীরা সে-ধাতুতে গঠিত নহে। 'পেপার টাইগারের' মত ইহারাও 'পেপার রিভলিউশনারী'' ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাদের নেতৃস্থানীয় কর্ত্তারা ত সেই বহু নিন্দিত বুর্জ্জয়া শ্রেণীর বংশধর!

———

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গত ত্রাণ

বামপন্থী মন্ত্রী শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ অসহায় দুর্গতদের ত্রাণকার্য্যে সর্ব্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং জয়প্রকাশজী ইহাতে সাড়া দিয়া তাঁহার যোগ্য কাজই করিয়াছেন। আশা করি তিনি বিহারে যে-ভাবে এবং যে-অসীম ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, সাহস এবং মানবতার সহিত ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের সহিত, বলিতে গেলে প্রায় একক ভাবে, যুদ্ধ করিয়া বিহারের প্রায় আড়াই কোটি মানুষকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গেও তাহা করিতে তিনি সক্ষম হইবেন।

বিহারের দুর্ভিক্ষকে শ্রীজয়প্রকাশ অপূর্ব্ব দক্ষতায় সমস্ত জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন এবং তাহার ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ হইতেই বিহারের অনাহার পীড়িত মানুষদের কত ভাবে কত প্রকার সাহায্য এবং দান আসে তাহার পূর্ণ হিসাব দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। দেশের দুর্গতদের জন্য এই ভাবে বিদেশ হইতে সাহায্য বা দান—দাতা-দেশের দিক হইতে অবশ্যই পরম মানবতার এবং মহানুভবতার পরিচায়ক, কিন্তু দান এবং সাহায্য গ্রহণ-কারী দেশের পক্ষে দীনতা এবং হীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। সে যাহাই হউক—পুরাণো কথার আলোচনা বর্ত্তমানে নিরর্থক।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কয়েক অঞ্চলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য আজ অন্য প্রদেশের নেতার কৃপা ভিক্ষা করিতে হইল, ইহা ভাবিতেও লজ্জা এবং দুঃখবোধ করিতেছি। এই সঙ্গে শ্রীজয়প্রকাশকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি বাঙ্গলার দুঃখত্রাণে তাঁহার এই পরম মানবতার জন্য। এই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে তিনি শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডুর আবেদনের অপেক্ষা রাখেন নাই, তাহার পূর্ব্বেই স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করিয়া—পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতদের ত্রাণের জন্য ব্যবসায়ী সমাজের নিকট আবেদন প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—''বিহারের প্রয়োজন এখন মিটিয়াছে—এবার আপনারা বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করুন''—

প্রসঙ্গক্রমে পশ্চিমবঙ্গের যে বিশেষ কয়েকটি রাজ-নৈতিক পার্টি সময়ে-অসময়ে বাঙ্গলার জনগণের জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকেন, জনগণের মঙ্গলের জন্য যাঁহারা প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পথেঘাটে, মাঠে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে জনগণকে জাগাইবার চেষ্টায় অবিরাম পরিশ্রম করিতেছেন, সেই তাঁহারা জনগণের বিপদের সময়, তাহাদের প্রয়োজনের সময় কোথায় আত্মগোপন করেন? কথায় কথায় যে বিশেষ তীব্র লাল পার্টি গণ-আন্দোলনের হুমকি দিয়া থাকে—খাদ্যহীন 'গণপেট' ভরাইবার কোন চেষ্টা তাহারা করে কি? অবশ্য যাহাদের কাছে 'গণগণ্ডগোল'ই গণ আন্দোলন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের নিকট হইতে দেশের এবং দেশের মানুষের প্রকৃত কল্যাণকর কোন আন্দোলন বা 'মুভমেণ্ট' চখে লাল ঠুলি বাঁধা ছাড়া, অন্য কেহই আশা করে না।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এই প্রকার দায়িত্বহীন পার্টি-সর্ব্বস্ব এবং জনস্বার্থের নামে আত্ম তথা দলীয় প্রতিষ্ঠা প্রয়াসকারী দলকে লোকে বোধহয় এত দীর্ঘকাল

সহ্য করিত না। কিন্তু বাঙলাদেশের মানুষের ধৈর্য্য অসীম, নিজ স্বার্থ এবং কল্যাণ কোন্ পথে তাহা জানিবার চেষ্টাও তাহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না।

অদ্যকার বাঙলার ছাত্র-সমাজকে দেখিয়া অনেকের মনেই বাঙলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমে একটা নিরাশার ভাব জাগ্রত হইতেছে। মাত্র ৩০-৪০ বৎসর পূর্ব্বে, কেবল বাঙলাতেই নহে, ভারতের যে কোন অঞ্চলে দুর্গত ত্রাণে বাঙলার ছাত্র-সমাজ ডাকের অপেক্ষা রাখিত না। আর আজ কি দেখা যায়? দুর্গত ত্রাণের-রিলিফের কাজে বাঙালী ছাত্রের দল, একেবারেই যায় না এমন মিথ্যা কথা বলিব না, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নগণ্য। ছাত্র-সমাজের বৃহত্তর অংশই আজ ছাত্র এবং অন্যবিধ পলিটিক্স লইয়া সদা ব্যস্ত। বাঙলার রাজনৈতিক দলগুলিও তেমনি হইয়াছে, ছাত্রদের অপক্ব মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দলের স্বার্থ তথা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টায় ইহারা কোন লজ্জাবোধ করে না। এই সব দেখিয়া মনে হয়—'দেশের কল্যাণ' অর্থই দাঁড়াইয়াছে 'পার্টির সঙ্গে পার্টি-পতিদের স্বার্থ রক্ষা সর্ব্বাগ্রে। দেশ জাহান্নম নামক স্থানে যাক—তাহাতে কাহারও কোন চিন্তা বা ক্ষতি নাই।

শিক্ষার মাধ্যম

কানাইলাল দত্ত

শিক্ষার বাহন বা মাধ্যম নিয়ে আমাদের দেশে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাতৃভাষার অধিকার স্বাভাবিক ও সহজাত। এর কোন বিকল্প নেই। বিকল্প না থাকলেও মাতৃভাষা সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন বলে আমাদের দেশে এখনও গৃহীত হয়নি এবং তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনার শেষ নেই। এবং প্রায়ই দেখা যায় যুক্তির চেয়ে ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে সমস্যাটাকে তীব্র ও বিচিত্র করে তুলেছে।

সাতশ বছরের মুসলমান শাসন সত্ত্বেও আমাদের জীবনে আরবি বা ফার্সি ভাষা কোন স্থায়ী আসন লাভ করেনি। অথচ মাত্র দেড়শ বছর ইংরেজির চর্চা করেই অনেকে ইংরেজি ভাষাকে অপরিহার্য মনে করছেন। কেবল তাই নয়। তারা আরো বলে থাকেন উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো বটেই আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের তথা ভারত-বর্ষের ঐক্য রক্ষা প্রয়াসের ক্ষেত্রেও ইংরেজী বর্জন করলে বিপর্যয় ঘটবে। কেবলমাত্র ভাবালুতা স্বার্থবুদ্ধি কিম্বা ফিলিষ্টাইন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তবলে এটাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গটি জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। অতএব নিরাসক্ত চিত্তে ছোট বড় সকলের সুবিধা অসুবিধার কথা এবং বহু ভাষা, ধর্ম ও জাতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা সম্মুখে রেখে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন।

পাঁচ বছরের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা হবে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর এই সাম্প্রতিক ঘোষণা সকলের মনে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন সমাজে প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। পূর্বযুগে ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা এই ঈপ্সিত ফল লাভ করা যেত বলেই লোকে ইংরেজি শিখতে আগ্রহী হয়েছিল। দেশবাসীর মনে ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে কোন প্রতিকূল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এই আশংকায় ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়াসে নিরপেক্ষতা রক্ষা করে চলবার চেষ্টা করতেন। তথাপি ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। হিন্দুরাই প্রথমে ইংরেজি পড়তে শুরু করেন বলে তারা মুসলমানদের অপেক্ষা এগিয়ে যান, যদিও ইংরেজ-অধিকারের অব্যবহিত পূর্বে মুসলমানদের দেখি অগ্রগামী এবং তারাই ছিলেন শাসন ক্ষমতার আসনে আসীন।

মোটামুটি উনিশ শতকের প্রারম্ভ কাল থেকেই ইংরেজি-শিক্ষার সূত্রপাত। অর্থাৎ প্রায় পৌনে দু'শ বছর ইংরাজিতে আমরা লেখাপড়া শিখছি। দেশের ৮০% নরনারী এখনও নিরক্ষর। শতকরা ১৫ জন লোককে যথার্থভাবে লেখাপড়া জানা বলা যায় কি না সন্দেহ। এতদিন ইংরেজির প্রাবল্য হেতুই যে ইহা সম্ভব হতে পারেনি সে বিষয়ে হয়ত দ্বিমত নেই। স্বাধীনতালাভের পূর্বে আমরা মনে করতাম দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার এই কাঁটাটি তুলে ফেলে দেওয়া যাবে, আর তার ফলে জাপান রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যেমন অল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর হয়ে গেছে, আমাদের দেশেও তাই হবে। বিশ বছর হোল আমরা স্বাধীন হয়েছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের সে-স্বপ্ন বাস্তবরূপ নিতে এখনও অনেক বাকি। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ ও মুদালিয়র এই দুটো খুচরো কমিশন ছাড়া ডক্টর কোটারিকে সভাপতি করে একটা সার্বিক কমিশন ইতিমধ্যে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি অনুসন্ধান করেছেন এবং তার প্রতিকারের উপায় সুপারিশ করেছেন। কোটারি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার সর্বস্তরে আঞ্চলিক ভাষাকেই মাধ্যম করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা। মাতৃস্তন্যের পীযূষ ধারার ন্যায় স্বাভাবিক ও সহজ অধিকার যে ভাষায় তিনি আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর সাধনার ক্ষেত্রে ব্রাত্য হয়ে আছেন। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে ইংরেজি আজও অচল প্রতিষ্ঠ; এখনও সে অভিজাত, বিশেষ সম্ভ্রম ও সম্মানের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত। সহজ জীবন ও সুলভ জীবিকার প্রতিশ্রুতি যেখানে আছে শিক্ষার সেই তীর্থভূমিতে ছাত্রদল ভিড় করবেন এটাই স্বাভাবিক। উচ্চতর জ্ঞানলোক অর্থাৎ অনার্স এবং তার উপরের পঠনপাঠন ইংরেজি ভাষার দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। এখানে পৌঁছিবার দুর্লভ সৌভাগ্য যাদের হয় ইংরেজি ভাষার রথারোহণ করেই তাদের আসতে হয়। সাধারণ বা তারও নীচু মানের ছাত্রগণ ভাল ইংরেজি জানেন না বলেই মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করে থাকেন। ইংরেজিতে পড়া ও মাতৃভাষায় পড়া ছাত্রগণের গুণগত পার্থক্য দিনদিন বেড়েই চলেছে। শিক্ষায় এই ভেদমূলক ব্যবস্থা থাকার ফলে জীবিকার ক্ষেত্রে ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অধিকতর সুযোগ সুবিধার অধিকারী। প্রায়ই দেখা যায়, তারা সর্বদাই এবং সর্বত্র যোগ্যতর বিবেচিত হন এবং পক্ষপাতিত্বের স্বাভাবিক প্রশ্রয়ের দ্বারা সুবিধাভোগী হয়ে ওঠেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিস্তর বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

ইংরেজির অতিরিক্ত কদর না কমিয়ে অর্থাৎ চাকরি ব্যবসায় বাণিজ্য এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজিকে প্রতিষ্ঠিত রেখে, বিদ্যামন্দিরে মাতৃভাষার অধিকারকে স্বীকার করলেই মাতৃভাষা ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না।

একই সঙ্গে ইংরেজি ও মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে জীবন ও জীবিকার তাগিদে উদ্যমশীল ব্যক্তিরা স্বভাবতই ইংরেজির প্রতি আকৃষ্ট হবেন। বর্তমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেটা ক্ষতিকর। পাসকোর্স পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়া যায়, যদিও কিছু ইংরেজি শেখা আবশ্যিক।—কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যার ক্ষেত্রে এবং অনার্স ও এম, এতে ইংরেজি মাধ্যম। এর দ্বারা ইংরেজির অপরিহার্যতা এবং মাতৃভাষা অপেক্ষা তার প্রয়োজনীয়তা যে অধিকতর তা স্বীকার করা হচ্ছে। এ কারণ ইংরেজির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। বিদেশী ভাষা শিখতে যে শ্রম ও শক্তি ব্যয় হয়, সেটা আমরা আর অপচয় মনে করছি না। পুষিয়ে নিতে চাই বাংলাটা না পড়ে। ফলে বাংলায় ফেলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। সর্ববিধ শিক্ষার সকার মাতৃভাষাকে মাধ্যম করতে পারলে সমস্যার সুরাহা হতে পারে। ডক্টর ত্রিগুণা সেন এটাই করতে উদ্যোগী হয়েছেন। পাচ বছরের মধ্যেই তিনি এটা করতে চান। এ রকম প্রস্তাবের কথা অনেকদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে। নীতিগতভাবে তাকে স্বীকার করতে কারো দ্বিধা নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কর্তৃস্থানীয়েরা ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করেছেন বলেই এটা এতদিন কার্যকর হয়নি। এর ফল মারাত্মক হয়েছে। সময় পেলেই যেমন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সংঘবদ্ধ ও বলবান হয়ে প্রগতিকে প্রতিরোধ করবার সামর্থ অর্জন করে। এখানেও তেমনি ইংরেজি ভাষার দৌলতে যে বিশেষ সুবিধাভোগী দল গড়ে উঠেছে, তারা সময় পেয়ে প্রবল হয়েছে। তাই এখন আর বিশেষ কোন ইস্তাহার জারি করে বা আইন পাস করিয়েই শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন করা সম্ভব বলে মনে হয় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনেক কালহরণের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিমিত্ত একটি আইন পাস করিয়েছিলেন। দু-চারদিন খুব উৎসাহ সহকারে মাতৃভাষায় কাজের কোলাহলে মুখরিত ছিল মহাকরণ। তারপর যথাপূর্বং পুরাদমে ইংরেজিই চলছে। কেউ কেউ অসুবিধার কথা বলবেন। দুর্বোধ্য ও অপর্যাপ্ত পরিভাষা, টাইপ রাইটারের অভাব পরিমিত বাংলা ভাষা জ্ঞান ইত্যাদি নানাবিধ ভালমন্দ যুক্তির দীর্ঘ তালিকা আজকেই আমরা সহজেই দিতে পারি। একপ্রকার স্বার্থবুদ্ধি যে আমাদের এইসব নেতিবাচক যুক্তি উদ্ভাবনে প্ররোচিত করে তাতে সন্দেহ করার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

ইংরেজী হটানোর আন্দোলন আর মাতৃভাষার মাধ্যমে

শিক্ষাদানকে এক করে দেখা অন্যায়। ইংরেজি হটানোর মধ্যে থাকে রাজনীতি। আর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ সামাজিক। কিন্তু আজ এ ব্যাপারেও রাজনীতিকে আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না। জীবনের সর্ববিধ প্রয়োজনের জন্য আমরা রাষ্ট্রের উপর উত্তরোত্তর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগ আয়োজন তাই সংকুচিত হচ্ছে। এই সংকোচনের ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় সে স্থান খুব স্বাভাবিক কারণেই পূর্ণ করছে রাজনীতি। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রশ্নটি একান্তভাবে সামাজিক হলেও আজকের দিনে এ বিষয়ে রাজনৈতিক স্তরে বিচার বিবেচনারও প্রয়োজন রয়েছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের পৃথক পৃথক মাতৃভাষা রয়েছে। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ভারতবর্ষের উপর সমগ্রভাবে এর প্রতিক্রিয়া কি হ'তে পারে সেটাও বিশেষ করে ভেবে দেখা প্রয়োজন। ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে জার্মানী, ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ডের তুলনা করে চলে না।

এ কথা স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পরিবেশন করা হয়েছে বলে তা আমাদের নিকট স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। শিক্ষা কথাটি ব্যাপক। ভগিনী নিবেদিতা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিবেদিতারই উক্তি কবি তাঁর নিজের ভাষায় পরিবেশন করেছেন। উক্তিটি এই: "জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের মধ্যে যে জিনিসটা আছে, তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি।" মাতৃভাষার আশীর্বাদ ভিন্ন ব্যক্তিমানসে "ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতা' জাগা দুঃসাধ্য। আমাদের যা কিছু সমস্যা তা ঐ জাতিগত নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেই। আমরা যদি কেবলমাত্র বাঙালী হতাম তা হলে কোন অসুবিধা ছিল না। বাঙালী আমি যেমন সত্য, তেমনি সত্য ভারতীয় আমি। একমাত্র মাতৃ-ভাষাকে অবলম্বন করলে আশংকা হয় আমার ভারতীয় সত্তা ক্ষুণ্ণ হবে। যে চরিত্র গৌরব ঔদার্য এবং নিষ্ঠা থাকলে একজন খাঁটি বাঙালি মাদ্রাজী বা পাঞ্জাবী নানা প্রাদেশিক সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে সর্বাগ্রে ভারতীয় ভাবতে পারেন, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন শিক্ষা ও পরিবেশের এখন বিশেষ অভাব ঘটেছে। কেন এমন হয়েছে তা বিতর্কমূলক এবং স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা সাপেক্ষ। মনীষী আলডস্ হাক্স্লির একটি খ্যাত উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে। বাক্যটি এই: Good education will be fully effective only when there are good social conditions and the beliefs and feelings of individuals will no be altogether satisfactory until there is good education. বর্তমানে Good social condition ব good education উভয়েরই একান্ত অভাব। তাই প্রয়োজনীয় প্রসার ঘটেনি শিক্ষার এবং প্রচলিত শিক্ষা আমাদের চরিত্র গঠন করতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। আমরা সাধারণত পড়ি পরীক্ষায় পাস করার জন্য পরীক্ষা পাস প্রয়োজন হয় চাকরি লাভের পথকে মসৃণ করবার জন্য। শিক্ষার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ সাধিত হলে কী অপূর্ব চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায় তা যেন আমরা ভুলতে বসেছি। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ন্যায় ও নীতি বোধের অপূর্ব নিষ্ঠার ফলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, কলেজে ছেলেরা মিথ্যা বলতে পারে না। এ যে কতবড় সুকৃতি কি অপরিসীম মূল্যে ইহা অর্জন করতে হয়েছে সে কথা যথার্থভাবে অনুভব করাও বুঝি আজ সম্ভব নয়।

কথায় ও কাজে আমাদের জীবনে কত ব্যবধান তা এক ছোট উদাহরণ দেব। ইংরেজির পরিবর্তে মাতৃভাষা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা সাপকে যারা সচেতন তাদের অনেকেরই ছেলেমেয়েরা দেশে বিদেশে 'ইংরেজি মাধ্যম' স্কুলে পড়ে। যারা অক্ষমতায় বা মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের জন্য ইংরেজি ভাল করে শিখছেন না তারা পরবর্তিকালে পস্তাচ্ছেন। এও এক প্রকার রাজনীতি। রাজনীতিতে দেশের স্বার্থে (সংকীর্ণ অর্থে দলের স্বার্থে) মিথ্যা বলা প্রতারণা করা প্রতিপক্ষকে অন্যায় উপায়ে আঘাত করা কিছুমাত্র দূষণীয় বলে বিবেচিত হয় না

উপরন্তু এ ব্যাপারে যথার্থ দক্ষব্যক্তি দেখি প্রায়ই দেশবাসীর সাধুবাদ পান। ইংরেজি রহিত করে মাতৃভাষাকে নিরঙ্কুশ আধিপত্য দেবার কথা যাঁরা বলেন তাঁদের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কতটা সম্ভব? এই জন্যই বোধ হয় স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও মাতৃভাষা পূর্ণ মর্যাদা পায় নি। অনুবাদ, পরিভাষা, পাঠ্য পুস্তকের অভাব, অর্থের অনটন এ সবই সত্য। তথাপি এগুলিকে কেউ দুর্লংঘ্য বাধা নিশ্চয়ই বলবেন না। সত্য সত্যই প্রতিবন্ধকতা যে কিছু রয়েছে আর সে জন্যই মাতৃভাষা এখনও নিরঙ্কুশ অধিকার পায় নি, এ সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা যেমনই হোক না তাকে স্বীকার করতে হবে। বিশাল ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র মানুষ ও তার বহু ভাষা ও সাহিত্য সত্বেও তাদের মধ্যে একটা ঐক্য কোন না কোন আকারে বরাবর বিদ্যমান রয়েছে। ঐ ঐক্যের প্রধানতম সূত্র ছিল ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা। ধর্ম অর্থে পূজা অর্চনা ইত্যাদিই মাত্র নহে। ধর্মভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইনগুলিও এর মধ্যে ধর্তব্য। কালক্রমে ধর্ম এখন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সংস্কৃত ভাষা ধর্মের অনুশাসন আজ ইংরেজি ভাষার আইনের ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনে সংস্কৃত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। অতএব এখন আর আমরা সংস্কৃত পড়ি না, পড়ি ইংরেজি। একদিন ছিল আচার আচরণের সামান্য সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমাদের অনেক খেসারত দিতে হত। সংস্কৃত না জানলে আচার বিচার শেখা যেত না। অসংখ্য আচার বিচার দ্বারা আমাদের নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত ছিল। সংস্কৃত চর্চায় ভাটা পড়ার ফলে এ ক্ষেত্রেও ঔদাসীন্য ও শিথিলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। কারো কারো ধারণা এই ঔদাসীন্য ও শিথিলতাই আমাদের সংস্কৃত চর্চা বিমুখ করে তুলেছে। সে যাই হোক এ কথা তো ঠিক, দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা বিকৃত উচ্চারণের ভুল মন্ত্র আবৃত্তি করে পূজা অর্চনা শ্রাদ্ধ বিয়ে প্রভৃতি সর্বকার্য অন্ধের মত সমাধা করা হচ্ছে। ভুল মন্ত্র বা অশুদ্ধ উচ্চারণ নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই, বিয়েও বাতিল হয়ে যায় নি বা দ্বিতীয়বার শ্রাদ্ধ করতে হয় নি। কিন্তু আজ বিয়ের আইনের কোন ধারা ঠিক মত না মানলে শাস্তি হয় বিয়ে বরবাদ হয়ে যায়। হয় হিন্দী, না হয় ইংরেজি এই নতুন আইনের ভাষা। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মনে হয় সত্যমেব জয়তে ইত্যাদি কয়েকটি শিরোভূষণের মধ্যে এবং গীতা প্রভৃতি কয়েকখানি কালজয়ী গ্রন্থে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ভারতবর্ষে আজ কারো মাথা ব্যথা নেই। তাই হিন্দী অথবা ইংরেজি এই দুটো ভাষার একটা শিখতেই হবে। তা যদি হয় তা হলে মাতৃভাষা চর্চায় ভাটা কিছু পড়বেই। প্রশ্ন উঠতে পারে সকলেই তো আর সর্বভারতীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হবেন না। অতএব প্রত্যেককে হিন্দী বা ইংরেজী না পড়লেও চলবে। কথাটার যাথার্থ কেউ অস্বীকার করেন না। আমার বিবেচনায় সত্যকার অসুবিধাটা তো এখানেই। হিন্দী যদি রাষ্ট্রভাষা হয় তা হলে হিন্দী-ওয়ালারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী হবেন। আর ইংরেজি যদি হয় তবে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া অন্য সকলকেই ইংরেজি শিখে নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া এক প্রকার স্থির। আজকাল একটি নতুন কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে যোগাযোগের ভাষা। রাষ্ট্রভাষা বা যোগাযোগের ভাষা যাই বলুন না কেন, এমনটি হলে হিন্দী ভাষাভাষীদের যে বাড়তি সুবিধা হবে সে চাপ অ-হিন্দী ভারতবর্ষ নীরবে সহ্য করবে না। এর প্রমাণ ইতিমধ্যেই বেশ পাওয়া গিয়েছে। জোর করে এটা করতে গেলে যে অসুয়া সৃষ্টি হবে তার পরিণাম থেকে ভারতবর্ষকে অক্ষত রাখা সহজ হবে না। অতএব ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির জন্য সুবিধা ও স্বাজাত্যবোধের বিকাশের জন্য আমার মনে হয় ইংরেজি থাকবেই। আর এই ইংরেজি থাকবে বলে লেখা পড়ার দুটো ধারা চলতে থাকবে। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার আইনজীবি প্রভৃতিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্র প্রতিযোগিতা ও প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি শিখতেই হবে। ইংরেজির আসল জোরটা এখানেই। ভাল করে ইংরেজি শিখলে

প্রতিষ্ঠালাভ সহজতর হবে। সুতরাং ইংরেজি জানা লোকেরাই সেদিনও সংরক্ষিত স্বার্থ-শ্রেণীতে থাকবেন।

মাতৃভাষায় লেখা পড়া শিখলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চাকরি হয়ত পাওয়া যাবে। বাংলার ডাক্তারের পক্ষে পঞ্জাবের রোগিণীর রোগ-নির্ণয় একান্ত দুঃসাধ্য নাও হতে পারে। কিন্তু ভাল ইংরেজি জানবেন এবং যাঁরা তা জানবেন না এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই একটা বিভেদ থেকেই যাবে। এ কারণে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা হয়তো অধিকতর সুবিধা পাবেন।

আমরা চাই বা না চাই লেখা পড়ার দুটো ধারা মাতৃভাষা ও ইংরেজি ভাষার গঙ্গা যমুনা হয়তো চলতে থাকবে। মাতৃভাষাকে পাস-কোর্সের বেড়া দিয়ে ঘিরে না রেখে তাকে ইংরেজির সঙ্গে সমান আসনে বসাতে হবে। এখানে অবশ্য অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যোগ্যতার সঙ্গে যাঁরা ইংরেজি শিখবেন তাঁরাই কুলীন শ্রেণী বলে বিবেচিত হবেন। এ আশংকা থাকবেই। অনেক প্রখ্যাত গ্রন্থকারকে আমি এই বলে আক্ষেপ করতে শুনেছি যে, তিনি মাতৃভাষার প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত হয়ে তাঁর পুস্তকাদি বাংলায় না লিখে যদি ইংরেজিতে লিখতেন তা হলে ঐ সব বই থেকে প্রচুর অর্থের সঙ্গে সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী হতে পারতেন। কথাটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। তথাপি বিদ্যামন্দিরে মাতৃভাষার আসনটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর জোর করা কখনই সমীচীন হবে না।

রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্বাধিক কাজকর্ম আঞ্চলিক ভাষায় প্রয়োগ আবশ্যিক না করা হলে সর্বস্তরে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান প্রচেষ্টা সুফলপ্রসূ হতে পারে না। এটাও হয়তো খুব সহজসাধ্য নয়। কেননা এই পশ্চিমবঙ্গে যেমন নেপালী ভাষার সমস্যা আছে তেমনি সমস্যা অনেক রাজ্যেই রয়েছে। অতএব কেবল আইনের দ্বারা এই প্রচেষ্টা সুসিদ্ধ হবে না, সকলের আগে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার সর্বাত্মক ও নির্বাধ স্বীকৃতি এবং প্রয়োগ চাই। তখনই মাতৃভাষা আপনার মর্যাদা ফিরে পাবে। শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ভিন্ন এটা সম্ভব নয়। শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন এসেছে বুনিয়াদি শিক্ষাক্রম তার মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন মহাপ্রাণ স্বদেশভক্ত মানুষের সযত্ন সাধনা সত্ত্বেও বুনিয়াদি শিক্ষা কার্যত সফল হয়নি বলা চলে। মানুষকে খাঁটি মানুষ ও কেজো মানুষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য এই বুনিয়াদি শিক্ষার আসলে দুই চারটি বিশেষ ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ স্কুলের সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কোন পার্থক্য এখন আর নেই। অতএব পরিবর্তন আরও বৈপ্লবিক এবং প্রয়োজনানুগ হওয়া চাই। শতবর্ষেরও অধিককাল পূর্বে আদালতে বাংলা-ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু যেসব বিধি ব্যবস্থা উদ্যোগ-আয়োজন থাকলে ভাষার উন্নতি হতে পারে তা ছিল না বলেই আদালতে ব্যবহৃত ভাষার দ্বারা বাংলা ভাষার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। আদালতে বাংলা ব্যবহারও একান্ত সীমাবদ্ধ হয়েই রয়েছে।

শিক্ষা ও জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার গৌরবের স্থান না থাকলে সার্বজনীন শিক্ষা সম্ভব নয় এবং ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতিও হতে পারে না। ইংরেজী ও বাংলার যুগল প্রচলনে দেশে double standard বা দ্বৈতমান হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইংরেজিকে মুছে ফেলার চেষ্টা থেকে যে সব অসুবিধা দেখা দেবে তার তুলনায় এই দ্বৈতমান কিছু না। ইংরেজ শাসন তাকে যেটুকু সহায়তা দান করেছে সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থেকেও একথা বোধ হয় দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় যে, ইংরেজি আপন যোগ্যতায় আমাদের মধ্যে তার আসন ইতিমধ্যেই করে নিয়েছে। তাকে আইন দিয়ে হটাতে চাইলে দ্বৈতমান ক্ষতিকর সংরক্ষিত-স্বার্থে পরিণত হতে পারে। অতএব ইংরেজি শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা ক্ষুণ্ন না করেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে বাহন করে তুলতে হবে। সুতরাং ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে এই ব্যবস্থার মধ্যে যতটুকু অকল্যাণ আছে তা চাঁদের কলঙ্ক বলেই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণীয়।

ভুলের ফসল

চিত্তরঞ্জন দাস

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট একটি অবিস্মরণীয় দিবস। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল সেদিন এই সুবিশাল ভারতবর্ষে। যথাঃ ১। প্রায় দুশ বছরের বৃটিশ শাসনের আকস্মিক অবসান। ২। অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ড করে দুটি পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র গঠন ভারত ও পাকিস্তান। ৩। উভয় রাষ্ট্রের শাসনভার যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে হস্তান্তরের নিমিত্ত, দীর্ঘকাল পরাধীনতার পুঞ্জিভূত গ্লানির সাময়িক নিরসন। সুতরাং একদিকে যেমন বৃটিশপ্রদত্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দাতিশয্য; অন্যদিকে তেমনই উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তায় অনিশ্চয়াতঙ্ক। ভারতীয় সংখ্যালঘুদের সন্ত্রাস অতি অল্পকালের মধ্যেই দূরীভূত হল এবং তারা বহাল তবিয়তেই ভারতের নাগরিক জীবনযাপন করতে লাগলেন। অবশ্য তাদের সংখ্যাও পাকিস্তানের গরিষ্ঠ সংখ্যারই সমতুল্য। কিন্তু পাকিস্তানের ঘটনা হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে শুরু হল সংখ্যালঘুদের উপর দলবদ্ধ পৈশাচিক আক্রমণ, যেহেতু উহা পবিত্র ইসলাম রাষ্ট্র এবং সেখানে বিধর্মী কাফেরের অস্তিত্ব কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে মারাত্মক ঘটনা খুবই সঙ্ঘটিত হয়েছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। অনতিবিলম্বে লোক বিনিময়ের কার্য্য শুরু হয়ে গেল এবং ক্রমশঃ উদ্বাস্তু সমস্যার প্রবল চাপ এসে পড়ল নব গঠিত ভারত সরকারের উপর। বলাবাহুল্য উক্ত সমস্যার আশু সমাধানে, যে কোন কারণেই হউক, ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যত শীঘ্র সম্ভব উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন ও সর্ব্বাধিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে দেখা গেল ভারত সরকারের বিমাতৃসুলভ কঠোর মনোভাব। সেখানে যে নাটকীয় ধ্বংসলীলা সঙ্ঘটিত হয়েছিল, বিশ্বের ইতিহাসে তার কোন নজীর নাই। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ব পাকিস্তানের সর্ব্বত্র শুরু হল পাইকারীহারে সংখ্যালঘু উৎসাদন। সহস্র সহস্র হিন্দু নাগরিক, নারীপুরুষ, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে হল নিহত। অবিরাম হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, ধর্মান্তর করণ প্রভৃতি সর্ব্বাধিক নাগরিক অত্যাচার অবাধে চলতে লাগল নিরপরাধ অসহায় সংখ্যালঘুদের উপর।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাদের চক্রান্তে দেশ বিভাগ হয়েছিল, সেই কংগ্রেসী পাণ্ডাদের প্রয়োজনবোধে লোক-বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি তখন একটা নিছক ধাপ্পা বলেই প্রমাণিত হল। কারণ পূর্ববঙ্গের বিপন্ন হিন্দুদের উদ্ধারের সর্ব্বাধিক ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, যখন হতভাগ্য হিন্দুগণ অবাধে ধর্ম, প্রাণ মান সম্ভ্রম নিয়ে এখানে চলে আসতে পারত, তখন উক্ত পাণ্ডারাই নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করল। দালালগণ সর্ব্বত্র সভাসমিতি করে অভয়বাণী শোনাতে লাগল: "শত অত্যাচারেও জন্মভূমি ছেড়ে তোমরা চলে যেও না। আমরা সকলেই এখানে পাকিস্তানের নাগরিকরূপে বসবাস করব। ইত্যাদি।

কিন্তু দেখা গেল অতি অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত দালালগণ পাকিস্তান ছেড়ে এখানে এসে দালালীর পুরস্কার স্বরূপ সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন। অথচ তাদের কথায় বিশ্বাস করে এবং তাদের ভরসা করে তখন যারা জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করতে পারল না, শেষ পর্য্যন্ত তারাই হলো পাকিস্তানের যূপকাষ্ঠের বলির ছাগ। অতঃপর ক্রমশঃ যখন সর্ব্বাধিক অত্যাচারের মাত্রা দানবীয় পর্য্যায়ে এসে পৌছল, এবং ভারত সরকারও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়, তখন অনন্যোপায় হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী সর্ব্বহারা হয়ে বহুকষ্টে নানা উপায়ে পূর্ব্ব পাকি-

স্তানের সীমানা অতিক্রম করে, ভারতে এসে হল উদ্বাস্তু-আখ্যায় ভূষিত। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্রই হল তখন উদ্বাস্তুর অভাবনীয় ভীড়। রেল ষ্টেশন, রাস্তা, ঘাট, মাঠে ময়দানে সর্ব্বত্র উদ্বাস্তু। সৌভাগ্যক্রমে উদ্বাস্তু সমস্যাই হল তখন ভারত সরকারের অযোগ্যতার একটা প্রধান অজুহাত। সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপার্জ্জন অর্থাৎ উপরি অর্জ্জনের অঙ্কও কমে যায়, তাই উহাকে স্থিতিশীল রাখবার নিমিত্ত মানুষের জীবন-মরণের এই গুরুতর সমস্যাটিকে জীইয়ে রেখে, সুদীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ সুবিধাবাদীর দল শুধু নিজেদের Bank balance এর দিকেই বিশেষ নজর দিয়েছে, অন্যদিকে তাকাবার আর ফুরসৎ হয়নি। তাই অদ্যাবধি সে সমস্যার বিশেষ কোন সমাধান হয়নি, অথবা কোনদিন হবে কি না, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

অন্যদিকে একটিমাত্র সংখ্যালঘুও যতদিন পাকিস্তানে থাকবে ততদিন সেখানকার অত্যাচার কিম্বা পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের উদ্বাস্তু সমাগমও বন্ধ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বলা বাহুল্য যে কিছুদিন পূর্ব্বেও চট্টগ্রামে নিরপরাধ বৌদ্ধদের উপর বর্ব্বরোচিত আক্রমণ তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন পশ্চিম পাকিস্তানে ভারত সরকারের তিনজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীকে যে "প্রহারেন ধনঞ্জয়" করল, তাতেও ভারত সরকারের নাকি "ভদ্রলোকের কীলচুরি" কিম্বা চৈতন্যদেবের নীতি অবলম্বন করা ভিন্ন আর কিছুই করণীয় নাই। চীন কিম্বা পাকিস্তানের সর্ব্বরকম হিংসাত্মক কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে একমাত্র অমোঘ অস্ত্র ভারত সরকারের প্রতিবাদ-লিপি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা কোন ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয়েছে কি না, অথবা উক্ত রাষ্ট্রদ্বয় কর্তৃক সাধিত ভারতের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির আংশিক পরিপূরণও হয়েছে কিনা একমাত্র সরকারই অবহিত আছেন। অবশ্য এ সমস্ত উচ্চপর্য্যায়ের পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ে আমাদের ন্যায় চুনোপুঁটি সাধারণ মানুষের মাথা ঘামানো হয়ত অনাবশ্যক বা অনধিকার চর্চ্চা, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, রাষ্ট্র যখন বিপন্ন হয়, তখন সাধারণ মানুষেরও সামগ্রিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ বিগত ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে যথাক্রমে চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া গিয়েছে। ভারত সরকার তখন জনসাধারণের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সুতরাং সাধারণ মানুষেরও হয়ত এ অধিকার আছে যে দেশ-বিভাগের ফলে উদ্ভূত বহুবিধ সমস্যার দরুণ সাধারণ মানুষ এই বিশ বছর যাবৎ যে চরম দুর্দ্দশা ও নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করে আসছে, তার আশু এবং সন্তোষজনক সমাধানের নিমিত্ত সরকারের নিকট ন্যায্য দাবী উপস্থাপিত করা।

আসমুদ্র হিমাচল প্রসারিত ভারতবর্ষ—কত সহস্র সহস্র যুগ যুগ ধরে স্বীয় গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে, বিরাট বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণরূপে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। যার অনন্ত সম্পদ ও অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে প্রাচীন এবং আধুনিক মনিষীগণ কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে, কত ছন্দে এর সুমহান রূপ বর্ণনা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। একজন আখ্যা দিয়েছেন—"সোনার ভারত" আবার আর একজন গেয়েছেন—"সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম, বন্দে মাতরম' ইত্যাদি। কিন্তু কিন্তু আজ সেই সোনার ভারত কোথায়? কিম্বা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিত্র কি এই? যে মনোরম চিত্র একদিন বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জগৎ সমক্ষে উপস্থাপিত করে, শ্রেষ্ঠত্বের সর্ব্বাধিক দাবী আদায় করে ভারতকে গৌরবের উচ্চ শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজ মনে হয় উহা সর্ব্বতোভাবে ধূলিসাৎ হয়েছে। ভারতের বর্ত্তমান চিত্র এখন জগতের চোখে সম্পূর্ণ বিপরীত। সোনার ভারতে আজ আর এক দানা সোনা মেলে না, কিম্বা ভারতবাসীর পেটে এক মুঠো অন্ন জোটে না। বিশ্বের দরবারে আজ সে অন্নের কাঙাল। গোটা দেশের সাধারণ মানুষ আজ ভিখারীর পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। একেই বলে নিয়তির নির্ম্মম পরিহাস।

ভোর ছটায় রেডিওতে যখন "বন্দেমাতরম' গান শুনি, তখন মনে হয় আর কেন? ও গান শুনিয়ে জনগণের অশান্তির মাত্রা বাড়িয়ে লাভ কি? তদ্ভিন্ন যে মায়ের

অঙ্গে আমরা কুঠার হেনেছি, তাঁকে বন্দনা করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আমাদের আর নেই। যে অধিকার আমরা নিজেদের ভুলেই হারিয়ে ফেলেছি সুতরাং কাটা ঘায়ে নুনের প্রলেপ দেওয়া নিছক বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু কেন? সোনার ভারতে আজ ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি কেন? প্রশ্নের প্রকৃত জবাব পূর্ব্বোল্লিখিত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের সেই অভাবনীয় ঘটনা। যেদিন বিশ্বস্রষ্টার নিপুণ হাতে সৃষ্ট অখণ্ড ভারত একমাত্র রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে ব্যক্তি বিশেষের একটা কলমের খোঁচায় খণ্ড বিখণ্ড হয়ে দুটি পরস্পর বিবদমান রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। বলা বাহুল্য সেদিন থেকেই ভারতের ভাগ্যাকাশে দুষ্টগ্রহ কুখ্যাত রাহুর সঞ্চার হ'য়ে জনগণের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং দেশ বিভাগই যে, মানুষের চরম দুর্দ্দশার মূল কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র থাকা উচিত নয়।

কিন্তু দেশ বিভাগের জন্য দায়ী কে? এ কথা ধ্রুব সত্য যে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের উক্ত কার্য্যে কোন হাত বা অধিকার ছিল না, কিংবা তাদের মতামতেরও কোন প্রয়োজন হয় নি তখন। কংগ্রেসের কতিপয় ক্ষমতালোভী নেতার অদূরদর্শিতার জন্যই এই সর্ব্বনাশা দেশ-বিভাগ সংঘটিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য জন-কল্যাণের চেয়ে দিল্লীর মসনদই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই জল্লাদের কার্য্য ত্বরান্বিত করবার জন্য, ব্যাকুল আগ্রহে বাংলা ও পাঞ্জাবের স্বদলীয় নেতৃবৃন্দের সম্মতির অপেক্ষায় অধৈর্য্য জনৈক নেতা ইহাও উক্তি করেছিলেন যে…

"We shall not wait for Bengal and Panjub any more"

(অর্থাৎ এই সুযোগটি কোনমতে হাতছাড়া করা হবে না। তাতে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে বাদ দিয়াও যদি করিতে হয় তাহাও আমরা করব)।

তাই তাদেরই চক্রান্তে এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত দেশ বিভাগ হল। সম্ভবত এটা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভাগাভাগীর ফলে ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিশেষ কোন ক্ষয়ক্ষতি হবে না। একমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাবের অধিবাসীবৃন্দকেই তার বিষ ফল ভোগ করতে হবে, এবং কার্য্যত তাহাই হয়েছে। প্রয়োজনবোধে লোক বিনিময়ের মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলে বাংলার জনৈক নির্ভরশীল নেতা তখন উক্ত কার্য্যে বিশেষভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি তার ভুলের মাসুল পরিশোধ করেছেন। রহস্যজনক অকাল মৃত্যুর বিনিময়ে।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে তাঁদের ভুলের জন্য দেশের কোটি কোটি মানুষ যে চরম দুর্দ্দশার শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে, সে জন্য কি তারা নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছে? না, তা নয়। তাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার দিল্লীর দরবারে বহুবার বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, নিশ্চয়ই নেতৃবৃন্দের মস্তকে পুষ্প বর্ষণের জন্য নয়, কঠোর অভিশাপের জন্য। সুতরাং তারাও যে ভুলের মাসুল থেকে রেহাই পেয়েছেন সে রূপ মনে করবার কোন হেতু নেই। অবশ্য কংগ্রেসের তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাত্র একজন ভিন্ন (যিনি বহুদিন পূর্ব্বে কংগ্রেস ছেড়ে ভিন্ন দল গঠন করেছেন)। বাকী সকলেই ভবলীলা সাঙ্গ করে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলে গিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন মন্তব্য করা নিরর্থক। কিন্তু তাঁদেরই কৃতকর্ম্মের জন্য তাঁদের সেই দল অর্থাৎ কংগ্রেস, কিংবা দলের বর্তমান সদস্যগণ জনসাধারণের কিরূপ সমর্থন বা অভিনন্দন পাচ্ছেন, বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। অধিকাংশ প্রদেশেই দেখা গেল কংগ্রেসের অভাবনীয় পতন এবং বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন। সুতরাং উহাই হ'ল কংগ্রেসের ভুলের মাসুল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও যে আর উক্ত দলের উত্থান হবে এরূপ আশা করা একেবারেই বৃথা। বৃটিশ-পরিত্যক্ত দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে কংগ্রেসী নেতারা গণতন্ত্রের মুখোস পরে কার্য্যত ধনতন্ত্রের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে গিয়েই তাদের এই শোচনীয় পরিণাম।

অন্যদিকে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ছয় মাসের কার্য্যাবলী দৃষ্টে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও জনমনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। সুতরাং তারা যদি তাঁদের নির্ব্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সচেষ্ট না হন

কিংবা অপরাগ হন, অথবা যদি এই দারুণ সঙ্কট সময়ে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশা, বিশেষত চরম খাদ্যাভাব দূরীকরণের কঠিন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন, তা হলে তাদের কোন কৈফিয়ৎ কিংবা অজুহাত, সাধারণ মানুষের নিকট কোনমতেই আর কার্য্যকরী হবে না। মৃত্যুপথযাত্রী জনগণ কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের পতনও অনিবার্য্য। রাজনৈতিক নেতাদের দেশপ্রেম এবং দেশ-সেবার হাস্যকর প্রহসন, জনসাধারণ এতকাল ধরে দেখে আসছে এবং জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে সভাসমিতিতে তাদের গালভরা ফাঁকা বুলি, সাধারণ মানুষ এখন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে শিখেছে। সুতরাং জনকল্যাণ-বিরোধী কোন কাজ তারা এখন আর নীরবে সহ্য করবে না।

জনকল্যাণ কিংবা জন-জাগরণে দেশের যুব-শক্তিরও বিশেষ দায়িত্ব আছে, কারণ যুব-শক্তিই জাতির প্রাণ। সুতরাং শুধু সরকারের উপর নির্ভর না করে এই চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে যুব-সম্প্রদায়ের উচিত অবিলম্বে এগিয়ে আসা এবং জাতিকে ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধার করবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সরকারকে সাহায্য করা। দেশ আজ স্বাধীন, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অগ্নিযুগের তরুণ ও যুবশক্তির অতুলনীয় অবদানের ইতিহাস, তাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সংগ্রামের মূল সূত্রপাত হয়েছিল এই বাংলাদেশেই বঙ্গবিভাগ রদ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সে সংগ্রামে বাঙালী তখন জয়ী হয়েছিল। তারপর বয়কট বিপ্লব প্রভৃতি আন্দোলনের মাধ্যমে এই বাঙালীই একদিন প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারের সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। বৃটিশ বেয়নেটের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে কিম্বা ফাঁসীর মঞ্চে অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাংলার তরুণ এবং যুবকগণ কখনও ভীত সন্ত্রস্ত হয় নি। শত শত শহীদের তাজা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে বাংলার মাটি এবং সেই জমাট রক্ত দিয়েই ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতার ভিত। কিন্তু তার বিনিময়ে বাঙালী কি পেয়েছে? বঙ্গবিভাগ। যার বিষময় ফল বাঙালীর জীবনে আজ মূর্ত্ত অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালী কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিল? না কখনও নয়।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির মূল কারণ মহাকাল দেশবিভাগ। সুতরাং যে কোন উপায়ে হউক উহা রদ করতে না পারলে, জাতীয় ধ্বংস অনিবার্য্য। তার সে ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় বাংলার যুবশক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে এবং কৃতকার্য্য হবার নিমিত্ত যত শীঘ্রই সম্ভব সর্ব্বতোভাবে তৈরী হতে হবে। কারণ উহা তাদেরই দায় অবাঙালীর নয়।

বাংলার অগ্নিযুগের হোতা শ্রীঅরবিন্দ দেশ বিভাগ প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতীয় উদ্দেশ্যে যে সতর্কবাণী প্রদান করেছিলেন, তার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হল:

"India, if she remains divided, will not herself be sure of her safety. It is therefore, to the interest of all that Union should take place. Only human imbecility and stupid selfishness could prevent it. Against that, it has been said, even the Gods strive in vain; but it cannot stand for ever against the necessity of Nature and the Divine Will.........But by whatever means the division must and will go."
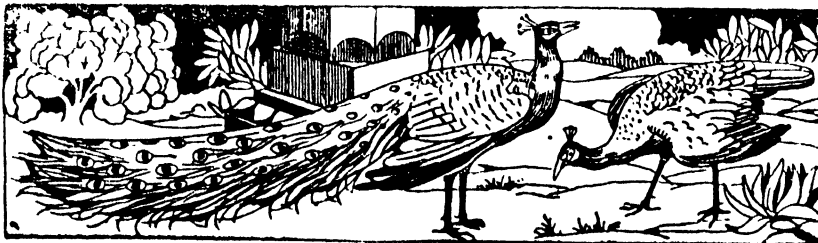
শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সঙ্কট

গত মাসের আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সঙ্কটের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই আলোচনাটুকু যত্নের সঙ্গে অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে এই রাজ্যে খাদ্য সঙ্কট সহসা গত কয়েক মাসে বা সপ্তাহে উপস্থিত হয় নাই, ১৯৬৩ সনের মধ্যভাগ থেকেই খাদ্যে সঙ্কটাবস্থা অল্পাধিক পরিমাণে বরাবরই কায়েম হয়ে রয়েছে। নূতন ফসলের অব্যবহিত পরে অবস্থা খানিকটা পরিমাণে সহজ হয়ে আসে, কিন্তু খাদ্য শস্য সরবরাহের কৃশ ঋতু (lean season) সুরু হবার পূর্ব্ব থেকেই আবার অবস্থা জটীল হতে সুরু করে এবং নূতন ফসলের দুতিন মাস পূর্ব্ব থেকেই আবার সঙ্কট সবচেয়ে প্রবল আকার ধারণ করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বিশেষ লক্ষ্য করবার এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি এই যে ১৯৬৩ সন থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে খাদ্য সঙ্কটের প্রধান প্রকাশ মূল্য সঙ্কটে যতটা ততটা সরবরাহ সঙ্কটে নয়। বস্তুতঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে খাদ্য সঙ্কট প্রধানতঃ দেশজোড়া মূল্যসঙ্কটেরই প্রতিফলন, ফসলের কিম্বা মোটামুটি ভোগ চাহিদার তুলনায় খাদ্য শস্যের সরবরাহে সঙ্কটজনক অপ্রতুলতা-জনিত নয়।

পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে ১৯৬৩-৬৪ সন থেকে ১৯৬৬-৬৭ সন পর্য্যন্ত গত চার বৎসরে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে খাদ্য শস্যের মোট সরবরাহ যতটা ছিল, তাতে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য দৈনিক ১৬ আউন্স বরাদ্দের ভিত্তিতে এই রাজ্যের বাস্তব ভোগ চাহিদা সম্পূর্ণ মিটায়েও গড়পড়তা বার্ষিক অন্ততঃ ৪০ লক্ষ টন খাদ্য শস্যের (গম এবং চাউল মাত্র ; বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্য শস্যের হিসাব সম্পূর্ণ বাদ দিয়া। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি মিশিয়ে পশ্চিম বঙ্গে অন্যান্য রাজ্য সমূহ থেকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টনেরও অধিক শস্যও নিয়মিত আমদানী হয়ে থাকে এবং এই সকল শস্যের মাত্র শতকরা ৪০।৫০ ভাগ খাদ্য উৎপাদক শিল্পাদির দ্বারা ব্যবহার হয়ে থাকে, বাকীটা সরাসরি ক্ষুধার্ত্তের ভোগচাহিদা মিটিয়ে থাকে)। উদ্বৃত্ত মজুদ জমা হবার কথা। আমাদের এই হিসাব যদি বাস্তবানুগ হয় তাহলে বর্ত্তমানে চলতি বৎসরের ফসলের উপরেও আরো অন্ততঃ ৪০ লক্ষ টন (সরকারী হিসাবের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত আমাদের এই হিসাব অনুযায়ী ১০ লক্ষ টন গম এবং ৩০ টন চাউল) গত তিন বৎসরের উদ্বৃত্ত মজুদ থাকবার কথা। তার সঙ্গে বর্ত্তমান বৎসরের আমন ফসলের ৪৪,০০,০০০ টন চাউল, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত ২,০০,০০০ টন চাউল ; ওড়িশা ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত রাজ্য থেকে ক্রীত

আরো লক্ষাধিক টন চাউল এবং ১২,০০,০০০ টন গম মিলিয়ে বর্ত্তমান বৎসরের মোট শস্যের সরবরাহ হওয়া উচিত ৯৯,০০,০০০ টন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী আমাদের মোট ভোগচাহিদার পরিমাণ ৬২,০০,০০০ টন; বাস্তব হিসাবে এর পরিমাণ ৫৭,০০,০০০ টনের বেশী হবার কথা নয়। তা হলে বর্ত্তমান বৎসরেও আমাদের ভোগচাহিদার তুলনায় মোট সরবরাহ থেকে অন্ততঃ ৩৭,০০,০০০ টন থেকে ৪২,০০,০০০ টন উদ্বৃত্ত হবার কথা।

কিন্তু এটা হল আর্থিক হিসাব। এর সঙ্গে রাজনীতির অঙ্কের যোগফল কখনোই মেলে নাই, মিলতে পারে না। এর পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে (বস্তুতঃ সমগ্র ভারত সম্বন্ধেও মোটামুটি সেই একই বিচার প্রযোজ্য) খাদ্য সঙ্কট প্রধানতঃ দেশজোড়া মূল্য সঙ্কটেরই প্রতিফলন মাত্র, বাস্তবপক্ষে সরবরাহ সঙ্কট নয়। কিন্তু খাদ্য শস্যের মূল্য সঙ্কটটির নিজস্ব একটা সঙ্কটময় রূপ দেখা যায়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরীর গত বৎসরের বাজেট ভাষণে বলা হয়েছিল, যে ১৯৫৬ সন থেকে ১৯৬৫ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরে দেশে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছিল শতকরা ৫৪ ভাগ। কিন্তু খাদ্য শস্যের বেলায় এর পরিমাণ ঐ দশ বৎসরে প্রায় শতকরা ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য শস্যের বেলায় এই এতটা মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বটে কিন্তু তার সঙ্গে রাজনীতির ভেজালও যে মিশ্রিত রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কেন্দ্রে এবং কংগ্রেস অধ্যুষিত বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে রাজনীতির অনুলেখই যে প্রধানতঃ ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি রক্ষায় বিশেষ সহায়তা করে এসেছে তাতে সন্দেহ নাই। এবং তার ফলে কেবল খাদ্য সঙ্কট নয়, দেশের সমগ্র আর্থিক কাঠামোয় একটা ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কট যে ঘনিয়ে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। খাদ্য শস্যের মজুতদারী ও মুনাফাবাজী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ আইন কানুন রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সকল আইন কানুন কখনো সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয় নাই। বরং খাদ্যশস্যের উপরে নিয়ন্ত্রণ বিধি ইত্যাদি এমনভাবে রচিত এবং প্রযুক্ত হয়ে এসেছে যে তার অনিবার্য্য ফল হয়েছে খাদ্য সঙ্কটের উত্তোরত্তর বর্দ্ধমান পরিস্থিতি। এটা যে কেবল মাত্র ভুলক্রমে ঘটে নি বরং, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়োগের দ্বারাই ঘটান হয়েছে তারও প্রমাণের অভাব নেই। কেন্দ্রের এবং বিশেষ করে কংগ্রেস শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের খাদ্যনীতি যে এই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন কল্পেই রচিত এবং প্রযুক্ত হয়ে এসেছে, সে কথা প্রমাণ করা সহজ। এর সম্ভবতঃ প্রধান কারণ এই যে খাদ্যশস্যের কারবারীদের অর্থানুকূল্যেই প্রধানতঃ কংগ্রেস দল প্রায় দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল ধরে ক্ষমতার গদী কায়েমীভাবে অধিকার করে থাকতে সমর্থ হয়েছিল।

আসল কথা স্বাভাবিক মধ্যযুগীয় কৃষি ব্যবস্থা এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য কারণ বশতঃ আমাদের খাদ্য শস্যের উৎপাদন আশানুরূপ এবং প্রয়োজনানুযায়ী বৃদ্ধি না পাওয়া সত্বেও, বিদেশ হতে এবং অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত রাজ্য সমূহ থেকে পশ্চিম বঙ্গে যে পরিমাণ শস্য মোট সরবরাহ হয়ে থাকে (আমরা এ স্থলে চার বৎসরের হিসাব মাত্র ধরছি) তাতে সরবরাহে ইচ্ছাকৃত বিঘ্ন না ঘটলে বা ঘটালে এ রাজ্যে খুব একটা গভীর সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবার কোনই সমীচিন কারণ নেই। স্বাভাবিক কারণে এবং সাধারণ মূল্যমানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটা অবশ্যই অনিবার্য ছিল কিন্তু তার পরিমাণ গত দশ বৎসরে শতকরা ৯০% থেকে ১০০% য়ের বেশী হওয়া উচিত ছিল না; বাস্তবপক্ষে কিন্তু খাদ্য শস্যে সত্যকার মূল্যবৃদ্ধির পরিমাপ দাঁড়িয়েছে ১৯৫৬ সনের গড়পড়তা মূল্যমানের তুলনায় প্রায় ৪৫০% এটার প্রধান কারণ যে স্পষ্টতঃ সরকারী উদাসীনতা (বা অক্ষমতা; কেহ কেহ মনে করেন সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্রটি গত ১৯।২০ বৎসরে এমন ঢিলে অপদার্থ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে যে সরকারী

উদ্দেশ্যের সততা সত্বেও সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হয় নি।) কারণে, এমন কি আনুকূল্য, খাদ্যশস্যে সমাজ বিরোধী মজুতদারী ও মুনাফাবাজির পরিমাণ ১৯৬২ সনের শেষ ভাগ থেকে বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিশেষ বৎসরটির উল্লেখ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাৎপর্য্যপূর্ণ। পূর্ব্ব থেকেই আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য পরিকল্পিত পুঁজিসঙ্গতি (resources) সংগ্রহ করবার তথাকথিত উদ্দেশ্যে, দেশে অর্থ সরবরাহ (money supply with the public) অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং সরকারী ভোগপণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে (১৯৫১—১৯৬১) তিনগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। এসকলেরই অনিবার্য্য প্রভাব মূল্যমানের ওপর বর্তিয়েছিল। কিন্তু আনুসঙ্গিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই এবং বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ প্রথমাবধিই ছিল চাহিদার তুলনায় নিতান্ত ক্ষীণ এবং অর্থ সরবরাহের গতি ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষেত্রে অল্পাধিক পরিমাণে মজুতদারী তথা মুনাফাবাজীর খেলা চলতে থাকে। ভোগ্যপণ্যাদির মধ্যে খাদ্যশস্যের এই বিষয়ে ছিল প্রধানতম ভূমিকা।

আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের তুলনায় অসাফল্য, দুইয়ে মিলিয়ে যে মূল্যবৃদ্ধির ধারা প্রবর্ত্তন করেছিল, তার সঙ্গে ১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে ভারতের উপর সশস্ত্র চীনা হামলা এবং তজ্জনিত অনিবার্য্য প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মূল্যবৃদ্ধির ধারাটি যে ভোগ্যপণ্যাদির উপরে সঙ্কটজনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে সে আশঙ্কা অমূলক ছিল না। ১৯৬২ সনের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে যখন তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেন তখন আমরা "প্রবাসীর" এই স্তম্ভে প্রস্তাব করেছিলাম যে অর্থমন্ত্রীর পক্ষে অবিলম্বে নূতন ট্যাক্স বাজেটের দ্বারা আতিরিক্ত অর্থ সরবরাহের

ধারাটি তুলে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় মূল্যবৃদ্ধির ধারা সঙ্কটজনক গতি লাভ করতে বাধ্য হবে এবং তার সবচেয়ে বিষম প্রতিঘাত পড়বে খাদ্যশস্যাদি অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপরে। দেশের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় অর্থশাস্ত্রবিদও পরে একটি যৌথ বিবৃতিতে আমাদের এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এসকল সদুপদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেন। তিনি বলেন আগামী চার মাসের মধ্যেই বার্ষিক বাজেট মঞ্জুরীর জন্য সংসদে দাখিল করতে হবে, তখনই এই কর্ত্তব্যটি পালন করা যাবে, এখনই তাড়াহুড়া করে নূতন ট্যাক্স বাজেট রচনা ও সংসদের মঞ্জুরীর জন্য দাখিল করবার এমন বিশেষ কোনও প্রয়োজন ঘটে নাই। সেই সময় তিনি বলেন যে দেশের ব্যবসায়ী ও ব্যাপারী গোষ্ঠীর শুভবুদ্ধির উপরে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা আছে এবং তিনি ভরসা করেন যে দেশের এই সঙ্কটকালে তাঁরা মুনাফাবাজী, কালোবাজারী ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবেন।

তাঁর এই ভরসা এবং আস্থা কতটা অলীক এবং কাল্পনিক ছিল, তা পরবর্ত্তী তিন-চার মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল। ১৯৬৩ সনের বাজেটে তিনি তখন পর্য্যন্ত বৃহত্তম ট্যাক্স বাজেট দাখিল করেছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির বাজারে সঙ্কটের কালছায়া প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করে বসে। এটা যা ঘটেছিল তারই বাস্তবানুগ পুনরাবৃত্তি মাত্র ঘটে, কিন্তু এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে দেশের আর্থিক কাঠামোতে যে বিপর্য্যয়টি ঘটবার অবকাশ দেওয়া হল, তার মধ্যেই আজকের খাদ্যসঙ্কটের প্রস্তুতির সত্যকার পরিচয়টি পাওয়া যাবে।

মুনাফাবাজীর আশঙ্কার বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রয়োগ প্রতিষ্ঠায় এই বিলম্ব ও তজ্জনিত সঙ্কটাবস্থার সৃষ্টি হওয়া সত্বেও সম্ভবতঃ নূতন ট্যাক্স বাজেট রচনায় মূল্যবৃদ্ধি নিরোধক প্রয়োগ গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে হয়ত খাদ্যসঙ্কটের বিস্তার সার্থকভাবে প্রতিরোধ করা যেত। কিন্তু অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই মূল্য-তথা-খাদ্যসঙ্কটের দ্বারা যে তাঁর নূতন ট্যাক্স বাজেট র[illegible] প্রভাবিত হন নাই, সে সত্যটুকু নূতন ট্যাক্সের কাঠা[illegible] অনুশীলন করলেই বুঝতে পারা যাবে। বস্তুতঃ এই [illegible] বাজেটটি পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে যে অর্থমন্ত্রীর মাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সহজতম উপায়ে প্রভূ[illegible] রাজস্ব সংগ্রহের দ্বারা আর্থিক উন্নয়ন তথা প্রতির দৈত দাবী মেটান, মূল্যসঙ্কট প্রতিরোধ বা মুনাফা[illegible] ও কালোবাজারী বন্ধ করা নয়। এ আলোচনা অ[illegible] পূর্ব্বেও করেছি, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে কথার পুনর আবার প্রয়োজন, যে ১৯৫১ সন থেকে আমাদের [illegible] রাজস্ব তথা শুল্ক কাঠামোটি এমন একটা রূপ পরিগ্রহ এসেছে, যে তার ফলে এই কাঠামোটির মধ্যেই মূল তথা খাদ্য ও ভোগ্য সঙ্কটের বীজ উপ্ত হয়ে রয়ে[illegible] তার সঙ্গে সরকারী শিল্পনীতি ও তার প্রয়োগবিধি বিশেষ করে মুদ্রা (monetary) ও আর্থিক (fiscal)নী[illegible] প্রয়োগ যুক্ত হয়ে এই বীজটিকে প্রবল প্রতাপে অঙ্কু[illegible] ও ফলবতী হতে সাহায্য করেছে। ১৯৫১ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচি[illegible] তখন আমাদের দেশে মোট মাথাপিছু রাজস্বের প[illegible] ছিল মোটামুটি ৮৲ টাকার মতন। তখনকার তু[illegible] মোট অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে মাথাপিছু [illegible] তথা ট্যাক্সের পরিমাণও প্রায় নয় গুণের মতন পেয়েছে। নীতির বা শাস্ত্রের বিচারে এতে আ[illegible] করবার কিছু নেই; বরং নিরপেক্ষ বিচারে মাথ[illegible] ট্যাক্সের পরিমাণ আরো বাড়াবার অবকাশ আছে [illegible] স্বীকার্য্য হবে। কিন্তু আপত্তির একটা বিশেষ তাৎপ[illegible] বিষয় আছে। সেটা এই যে ১৯৫১ সনের তু[illegible] দেশের সমগ্র করভারের বণ্টন ব্যবস্থা (distributi[illegible] the tax) এমন একটি ধারা অনুসরণ করে করে [illegible] হয়ে এসেছে যে ১৯৫১ সন পর্য্যন্ত যে রাজস্বের যে[illegible] টাকার মধ্যে ৭ টাকা ৪৪ পয়সা প্রত্যক্ষ এবং মা[illegible] পয়সা পরোক্ষ ট্যাক্স থেকে আদায় হোত, ১৯৬[illegible]

মোট মাথাপিছু ৫৬ টাকা আন্দাজ ট্যাক্সের মাত্র ২২ টাকা ৪০ পয়সা প্রত্যক্ষ এবং ৩০ টাকা ৬০ পয়সা পরোক্ষ ট্যাক্স থেকে আদায় হোত। নিয়োক্ত অঙ্কের মোট ট্যাক্সের আন্দাজ ২০ টাকা ১৬ পয়সা আমদানী রপ্তানী শুল্ক, শিল্পাদির কাঁচা এবং তৈরী মালের ওপর আবগারী শুল্ক ইত্যাদি থেকে আর ১৩ টাকা ৩০ পয়সা ভোগ্যপণ্যা-দির উপর আবগারী ও অনুরূপ শুল্কাদি থেকে আদায় হোত। ১৯৬২ সনের মোরারজী দেশাই রচিত ট্যাক্স বাজেটে এই ধারাটি আরো বিস্তৃতি লাভ করে; মাথা-পিছু ট্যাক্সের মোট ৭০ টাকা আন্দাজ পরিমাণের মধ্যে মাত্র ১৮ টাকা ২০ পয়সার মতন প্রত্যক্ষ ট্যাক্স এবং ৫১ টাকা ৮০ পয়সার মধ্যে আবার প্রায় ৩১ টাকা ৮ পয়সার মত পরিমাণ ভোগ্যপণ্যাদির উপর শুল্ক থেকে আদায় করবার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে শ্রী টি টি কৃষ্ণ-মাচারী যখন দ্বিতীয় বারের মতন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর দ্বিতীয় দফার প্রথম বাজেট ভাষণে দেশের ট্যাক্স কাঠামোর এই অবৈজ্ঞানিক রূপের স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এই ট্যাক্স কাঠামোটিই যে দেশে প্রভূত পরিমাণ কালোবাজারী অর্থ সঞ্চয়ে সহায়তা করেছে, এবং তার ফলেই যে দেশের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় একটা গভীর সঙ্কটঘনীভূত হয়ে এসেছে, তাতে তারও স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ ১৯৬৬ সালের প্রথম ভাগ থেকে যে দেশ-জোড়া খাদ্যসঙ্কট কায়েমী হয়ে রয়েছে এবং উত্তরোত্তর ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে আসছে, তার প্রধান কারণ যে আমাদের বর্তমান অবৈজ্ঞানিক অর্থ এবং শুল্ক কাঠামোটির বিশেষ রূপ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে হলে কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা তার সমাধান হবে না সেই কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু এই ৫-৬ বৎসর ধরে কায়েমী অর্থ ও শুল্ক ব্যবস্থার অবসরে মজুতদারী, মুনাফাবাজী ও কালোবাজারী শক্তি এমনই প্রবল হয়ে উঠেছে যে একসঙ্গে বিবিধ প্রয়োগের ব্যবস্থা না করলে তাকে কেবলমাত্র আর্থিক ও শুল্ক কাঠামোটির আমূল সংশোধনের দ্বারা দমন করা সম্ভব হবে এমন আশা দুরাশা মাত্র। অবশ্য একথাও সেই সঙ্গে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ না পালটালে—এবং সেরূপ মনোভঙ্গীর আজ পর্য্যন্ত কোনও আভাস দেখতে পাওয়া যায় নি—আমাদের বর্তমান আর্থিক এবং শুল্ক কাঠামোর আমূল সংশোধনের আশাও দুরাশা মাত্র। কিন্তু বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে হলে যে এই সংশোধনটি একান্ত এবং অবশ্য প্রয়োজন সেই সত্যটিকে স্বীকার করতে হবে। এবং এটিকে স্বীকার করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার গতি ও প্রকৃতির আমূল পুনর্বিন্যাস না ঘটলে বর্তমান আর্থিক ও শুল্ক কাঠামোর বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। উৎপাদন বৃদ্ধিও যে একান্তই প্রয়োজন সেটাও স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি সঙ্কটমুক্তি ঘটাতে পারবে না।

বস্তুতঃ গত বিশ্ব মহাযুদ্ধের কাল থেকে দেশে যে আর্থিক শক্তির সংহতি (concentration of economic power) সুরু হয়েছিল এবং তিনটি দফার পঞ্চবার্ষিকী আর্থিক উন্নয়ন প্রয়োগের ফলে যে শক্তি সংহতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে তারই অনিবার্য্য ফল স্বরূপ আমরা বর্তমান সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি। এ থেকে মুক্তি পাবার উপায় উপরে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু সেও যথেষ্ট নয়। আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনানুসরণের লোভে আমাদের রাষ্ট্রনেতারা যে শক্তির দানব গড়ে ফেলেছেন, তাকে বিধ্বস্ত করতে হলে প্রয়োজন প্রবল, একনিষ্ঠ এবং অনমনীয় প্রশাসনিক প্রয়োগ। তার জন্য যে সাহস ও সততার প্রয়োজন বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে তার একান্ত অভাব দেখে কেবল হতাশাই জাগ্রত হয়।

সমগ্র দেশ সম্বন্ধে যে প্রয়োগের ইঙ্গিত করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্বন্ধেও সেই একই বিচার প্রযোজ্য। তার সমাধানের বিবিধ উপায়ের কোন কোনটি মাত্র রাজ্য সরকারের আয়ত্তাধীন। বাকীটুকু তাঁদের

আয়ত্তাতীত, কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব অধিকারভুক্ত। তবু যেটুকু স্থানীয় রাজ্য সরকারের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে সেটুকুর প্রয়োগেও অসামান্য গাফিলতী ও অনিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বর্ত্তমানে খাদ্য সঙ্কট এ রাজ্যে যে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ অধিবাসীদের মনে ক্রমেই হতাশা ও বর্ত্তমান রাজ্য সরকারের উপর আস্থার অভাব বিস্তার লাভ করছে, তার ফলে অনিবার্য্য অরাজকতা ও গোলযোগ দেখা দিয়েছে। সমাধানের—অন্তত আংশিক সমাধানের পথ অবিলম্বে অবলম্বন এবং তার সার্থক প্রয়োগ সুরু না হলে যে অচিরে রাজ্যের সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নে[illegible] এই আংশিক সমাধানের পথ মজুতদারদের কুক্ষি[illegible] মজুত খাদ্য শস্য উদ্ধার করে বাজার সরবরাহে এ[illegible] সহজ গতির প্রতিষ্ঠা করা। মজুত শস্য উদ্ধার সরকারে বাজেয়াপ্ত করবার বিষয়ে রাজ্য সরকা[illegible] বিশেষ আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্ভ[illegible] এবম্বিধ প্রয়োগ সম্বন্ধে বর্ত্তমান রাজ্য সরকারের চৌ[illegible] অংশীদারদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও মতভেদ রয়ে[illegible] এদের অনেকেরই মনে সম্ভবতঃ এই আশঙ্কা [illegible]

করছে যে তাঁরা যে গ্রামীন্ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আজ ক্ষমতার গদী দখল করতে সমর্থ হয়েছেন, এরূপ প্রয়োগ অবলম্বন করলে সম্ভবতঃ সেই পৃষ্ঠপোষকতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাঁরা আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়বেন। ওরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে দুইটি সমালোচনা করা যায়: প্রথমতঃ ক্ষমতা অধিকারই যদি এঁদের একমাত্র কাম্য হয়, জনগণের এবং রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণ হয়, তবে এঁদের ওপরে আস্থা স্থাপন করা দেশের লোকের পক্ষে ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণিত হবে; তাহলে ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেস সরকারও তেমন একটা অপরাধ করেন নি বলে স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ মজুত শস্য উদ্ধার ও সরকারে বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়াস করলে গ্রামীন্ পৃষ্ঠপোষকতা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে এরূপ মনোভাব নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন্ আর্থিক কাঠামোটির বাস্তব রূপটি এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। ১৯৬১ সনের আদম সুমারীর হিসাব থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে ঐ বৎসর পর্যন্ত এ রাজ্যের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল মোট চাষী জন সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের কিছু বেশী। এদের সংখ্যা বার্ষিক শতকরা চার দশমাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে, অর্থাৎ বর্তমানে এঁদের অনুপাত রাজ্যের সমগ্র চাষী জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১২ ভাগ। বাকী চাষী জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ মাত্র আড়াই একর পরিমাণের কম আয়তনের জমী চাষ করে থাকেন, অর্থাৎ তাঁরা যে পরিমাণ উৎপাদন করতে সমর্থ হন তাতে তাঁদের তিন মাসের ভোগ ব্যয় মাত্র নির্বাহ হয়। এর উপরের স্তরের চাষীরা মোট চাষী জনসংখ্যার শতকরা ৩১ ভাগ ৫ একরের কম আয়তনের জমি চাষ করে থাকেন এবং যা উৎপাদন করতে সমর্থ হন তাতে বৎসরে তাঁদের নিজস্ব ভোগব্যয়ের ৩ থেকে ৯ মাস পর্য্যন্ত নির্বাহিত হয়। এর উপরের স্তরের শতকরা ৩৬ ভাগ চাষী ৫ থেকে ১০ একর পর্য্যন্ত জমি চাষ করে থাকেন এবং তাতে উৎপন্ন ফসল থেকে তাঁদের বৎসরের ভোগ ব্যয়টুকু মাত্র নির্বাহ হয়, মজুত করবার মতন উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র শতকরা ১০ ভাগ চাষী ১০ একরের বেশী জমি চাষ করেন এবং অল্পাধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত ফসল উৎপন্ন করেন। এঁরাই একমাত্র মজুত শস্য সঞ্চয় করবার ক্ষমতা রাখেন। এই অবস্থায় মজুতদারি তথা কালোবাজারীর বিরুদ্ধে সার্থক অভিযানের ফলে রাজ্য সরকারের প্রতি গ্রামীন্ আস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অলীক এবং বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত। রাজ্য সরকার যদি অবিলম্বে এই বিষয়ে স্থির এবং অনমনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ না করেন তবে এই বিষয়ে তাঁদের দুর্বলতা রাজ্যের জনগণ আর বেশীদিন ক্ষমা বা সহ্য করবে না এ স্থির নিশ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই কেন্দ্রের উপর প্রবল চাপ দিতে হবে যাতে করে কেন্দ্র থেকে শস্য সরবরাহ উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে গত বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে আমরা প্রস্তাব করেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারকে স্পষ্ট করে জানানো যে এ বিষয়ে কেন্দ্রের অস্বীকৃতি বা উপেক্ষায় রাজ্য সরকারকে বাধ্য করবে এই রাজ্যে যে ১১,০০,০০০ লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপাদন হয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ ধান চাষে নিযুক্ত করা। এর ফলে পাটকলগুলি হয়ত অন্ততঃ আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এবং পাট এবং পাটজাত পণ্যের রপ্তানী থেকে যে বৃহত্তম পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জন হয়ে থাকে তাতে ঘাটতি পড়বে। এই আশঙ্কা যদি বাস্তব হয় তবে যেমন করে হোক কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য শস্য সরবরাহ করতে বাধ্য হবেন। পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পে সরাসরি ভাবে ৩ লক্ষের বেশী মজুর পাটকল গুলিতে কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। পাটকল বন্ধ হলে অবশ্য এঁদের জীবিকার বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু পাট কলের শ্রমিকদের শতকরা ৮০ ভাগ অন্য রাজ্যবাসী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব এই রাজ্যের কায়েমী

অধিবাসীদের প্রতি। দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার অবাঙালী শ্রমিকের জীবিকার বিনিময়ে যদি পশ্চিমবঙ্গবাসীর খাদ্য সংস্থান করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাতে তাঁদের দ্বিধা করা সমীচিন নয়।

যে ভাবেই হোক উপযুক্ত এবং সাধারণের আয়ত্তাধীন মূল্যে পশ্চিমবঙ্গ বাসার খাদ্য সংস্থান অবিলম্বে করতেই হবে, তাতে অন্যথা করলে বর্তমান সরকার টি'কবে না। কি কি উপায়ে সমস্যার আপাতঃ সমাধান হতে পারে তার ইঙ্গিত করা হল। স্থায়ী সমাধা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাতীত এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হল। খাদ্য সঙ্কট বর্ত্তমান সরকারে গদীচ্যুত করুক, কংগ্রেস দলের এ আশাও বাস্তবাতু নয়। এঁরা গদীচ্যুত হলেও কংগ্রেসকে আবার যে এ রাজ্যের লোক ক্ষমতার গদীতে প্রতিষ্ঠা করতে রাজি হবে এমন আশা নাই। বস্তুতঃ একমাত্র বিকল্প অবং অতি ভয়াবহ, সম্পূর্ণ অরাজকতা, এবং সেই কথাটা আজ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

এ যুগের ছাত্র সমস্যা

লীনা নন্দী

ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ত্তমান শিক্ষা জগতে এক বিরাট আলোড়ন এনেছে। বড় বড় মনীষীরা, শিক্ষাবিদেরা বিপর্যস্ত তাঁদের ছাত্রদের নিয়ে। এখানে ওখানে আলোচনা সমালোচনা চলেছে এ প্রসঙ্গ নিয়ে। বড় বড় পুলিশ কর্মচারীরা নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছেন এই সমস্যা নিয়ে। কত কনফারেন্স, কত কমিটি, সাব কমিটি, কিন্তু কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না। বরং উচ্ছৃঙ্খলতা বন্যার বেগে বেড়েই চলেছে। বাঙ্গলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক-শিক্ষাবিদদের কাছে এই ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা এক বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। বহু মত কিন্তু সমস্যার সমাধান ত হচ্ছে না। আমার মনে হয় যাঁরা বাইরে থেকে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন—বহু পুঁথি, আইন ঘাঁটছেন, তাঁরা কোনও দিনই এ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ এ সমস্যা আমাদের খাদ্য বস্ত্রের সমস্যা নয়, এ সমস্যা জীবন্ত, অফুরন্ত প্রাণময় ছাত্রদের নিয়ে। যাদের মনের চকমকিতে জ্বলে উঠছে হাজার স্ফুলিঙ্গ, সেই আগুনই ছড়িয়ে গেল সবখানে সবখানে।" এ সমস্যা কি কোনও একটা চিরাচরিত আইনের বা নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে সমাধান করা যাবে? স্বতঃই এ প্রশ্ন আমাদের মনকে উতলা করেছে বার বার, সমস্ত ছাত্র সমাজ কি আজ অধঃপতনে গিয়েছে, না রাতারাতি শিক্ষার আর শিক্ষকের অধঃপতন ঘটল। আবার আমাদের মধ্যে অনেকেই হতাশ কণ্ঠে বলছেন, আজ ছাত্ররা যে ভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছেন তার ফলে সমগ্র ছাত্র-সমাজের তথা দেশের ভবিষ্যতও অন্ধকার। ছাত্রদের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা শুনি, কাগজ খুললেই সম্পাদকীয় কলমেও ঐ একই কথা, ছাত্ররা অন্যায় করছে। আমার বড় দুঃখ হয়। মনে হয় ছাত্রদের আমরা ঠিক বিচার করছি না। শুধু তাদের উপর অন্যায়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়েই যেন আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হচ্ছি। অথচ প্রতিদিন দেখছি ছাত্ররা কি ভাবে উন্মত্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় যানবাহনে আগুন ধরাচ্ছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে তাদেরই স্কুল কলেজ, লাইব্রেরী, ল্যাবোরেটারী, ডাকঘর বাজার। তাদের এই ধ্বংসাত্মক খেলার পেছনে কি তাদের যুক্তি, কি তাদের অভাব এ জানার প্রয়াস নেই কারোরই আমাদের মধ্যে। আমরা শুধু শাস্তি দিয়ে সঙ্গীন উঁচিয়ে তাদের উন্মত্ততা থামাতে চেয়েছি, ফলে আগুন আরও জ্বলে উঠেছে। বড় ব্যথা পাই এ দৃশ্য দেখে, শক্তির কি অপব্যয়! তাই ত বার বার মনে হয় এই ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার পিছনে কোথায় যেন একটা গলদ রয়েছে, আর সে গলদ একমাত্র খুঁজে বার করতে পারতেন আমাদের দরদী শিক্ষক বন্ধুরা, যাঁরা প্রতি-নিয়তই মানুষ গড়ার কাজে ব্যাপৃত। তাই ত বলি ছাত্রদের দোষারোপ না করে আমাদের গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে এই উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে কি আছে। যার জন্যে ছাত্ররা আজ সমস্ত আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব গ্রহণ করে সে আন্দোলনের এক বীভৎস রূপ দিচ্ছে। তারা একবারও ভেবে দেখছে না, সেই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোনও স্বার্থ জড়িত কিনা। তারা উদ্দাম হয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ভেঙ্গে তছ্‌নছ্‌ করে দিচ্ছে—। শিক্ষার যথার্থ মূল্যবোধ বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে। আবার একথাও আমাদের মধ্যে অনেকে বলছেন, এই ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার পিছনে আছে কোনও রাজনৈতিক দল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা ছাত্র-চরিত্রের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন নি। কারণ তাঁরা বোধহয় জানেন না এই ছাত্র-আন্দোলনের পিছনে যে-

সব ছাত্র আছে তাদের বয়সের ধর্মই হল কোনও কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়া—কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায় এ বিচার করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। একটা স্রোতের টানে তারা ভেসে যায়; তাদের সঙ্ঘশক্তি একমুখী হয়ে অনির্বাণ বেগে ধেয়ে চলে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন ছাত্রদের এই উদ্দাম সঙ্ঘশক্তিকে। তাই তো তিনি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ছাত্রদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সেই সময় লিখেছিলেন,

"I am proud of the sacrifice made by the students. I know that the students have done good service to the country."

সেদিন ছাত্ররা যদি অসহযোগ আন্দোলনে দলে দলে ঝাঁপিয়ে না পড়তো তাহলে জাতির মুক্তি-আন্দোলন কি রূপ নিতো বলা শক্ত। গান্ধীজী এই ছাত্রদের সঙ্ঘশক্তির উপর এতোই আস্থা রাখতেন যে তিনি বলেছেন,

"It is they who will lay the foundation of the golden temple of the goddess of Independence."

[illegible] তাই ভাবি, কি করে গতকালের ইস্পাত-কঠিন সুসংবদ্ধ সৈনিকের দল আজকের দিনের উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পরিণত হলো? যে-ছাত্রসমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামে হাসিমুখে জীবনাহুতি দিয়েছে; যাদের চরিত্রের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস ও সংযম ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিশ্ববাসীকে তাক্‌ লাগিয়েছিল—আজ এই কয়েক বছরের মধ্যে সেই সমস্ত ছাত্রদের নৈতিক-চরিত্রের এই অবনতির কারণ কি, এ আমাজের গভীর ভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে। শিক্ষার গলদ কোথায়? কেন ছাত্ররা সামান্যতম কারণে, ছোটখাট উত্তেজনায় এতো অধৈর্য্য ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে? বহুক্ষেত্রে এই ছাত্র-বিক্ষোভ এমনই রূপ নিয়েছে যে সেই উন্মত্ততাকে শুব্ধ করার জন্য গুলি চালাতে হয়েছে। তার ফলে ছাত্র-রক্তে রাজপথ হয়েছে রক্তিম আর শিক্ষাক্ষেত্র হয়েছে কলুষিত। এককালে যে বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্ররা আমাদের গর্বের বস্তু ছিল আজ তার এই দশা: তাই সমস্ত দেশবাসীকে ও শিক্ষাবিদ্‌দের ভাবিয়ে তুলেছে।

হেতু অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা আবিষ্কার করি যে, বর্তমান শিক্ষার সবচেয়ে বড় গলদ হলো আমরা আমাদের ছাত্রদের মনে তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে যথাযথ মূল্যবোধটুকু জাগ্রত করতে পারি নি; তাই তো শিক্ষাক্ষেত্রে এত বিপর্য্যয়। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। যে পৃথিবীতে বাস করি তার সমাজ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে হিংসার হানাহানি। শাস্তির উদ্যত হস্তের দিকে তাকিয়ে আমরা আইন মানি, আইনের প্রতি আমাদের কোনও আন্তরিক অনুরাগ নেই। সমাজকে মানি তার ন্যায় দণ্ডের ভয়ে। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখি না। আজ আমাদের শিক্ষাজগত, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক-সমাজ সকলেই এই যান্ত্রিক প্রাণহীন শিক্ষাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। সেই গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনীশক্তি, নেতৃত্ব ও বিচারবুদ্ধির সহজ প্রতিভাটুকু লোপ পায় ধীরে ধীরে। বিধি-বিধান, নির্দেশ, উপদেশ আর উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া তথ্যের ভারে তার ঋজু মানসিক গঠন ক্রমে ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে। সহজ সমস্যাটিকে সে হারিয়ে ফেলেছে। গতানুগতিক পথে চলতে চলতে তার মন এমনই নিষ্ক্রিয় এবং যান্ত্রিক হয়ে পড়ে যে তাদের জীবনের সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার দ্বিধাগ্রস্ত মন তার আহত জ্ঞানকে কার্যকরী করে তুলতে পারে না—'না, না' বিধি নিষেধের দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সে তার সহজ চিন্তাশক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে। একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের বিপথগামী লক্ষ্যভ্রষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির জন্যই মাত্র দেশের বুদ্ধিজীবি-সমাজ আজ এতো ব্যাধিগ্রস্ত।

এবার আমাদের শিক্ষক বন্ধুদের কথা বলি, যাঁরা ওতঃপ্রোত ভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত। খুবই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় যে শিক্ষক-সমাজের চিন্তাধারাও আজ বিকারগ্রস্ত। তাঁরা মনে করেন ক্লাশরুমের বিধিবদ্ধ কোর্সটুকু শেষ করাই তাঁদের দায়িত্ব। ছাত্রদের মনে জ্ঞানস্পৃহতা জাগাতে পেরেছেন কিনা, একথা ভেবে দেখার সময় তাঁদের নেই। ছাত্রদের মানসিক উন্নতি ও চরিত্র গঠনে যে তাঁদের বিরাট কর্তব্য রয়েছে, এ

সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থাই সমাজকে পঙ্গু করে দিয়েছে। ছাত্রদের যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাকে কি আমরা ঐ সামান্য ক্লাশ-রুমের রুটিনে বেঁধে রাখতে পারি? তার ঐ উদ্বৃত্ত শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করতে পারছি না বলেই আজ তারা বিপথগামী। তারা তাদের অজস্র শক্তিকে অন্যদিকে চালিত করছে। আমাদের শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে, তাঁরা বিভিন্ন ধরণের জনসেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি তাঁদের ছাত্রদের যুক্ত করে দিতে পারেন তবেই ছাত্রদের এই উদ্বৃত্ত শক্তিটুকু সাংগঠনিক কর্মে প্রযুক্ত হয়ে সমাজরক্ষণে সহায়তা করবে বলে বিশ্বাস করা যায়। প্রসঙ্গত আমরা বলতে পারি যে মার্কিন মুলুকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা মূলতঃ চারটি মূলনীতি লক্ষ্য করি। তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়, যাতে তারা বাস্তব জীবনে হোঁচট না খায়। সেইজন্য তারা তাদের শিক্ষার প্রয়োজনকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে—দৈহিক প্রয়োজন, মানসিক প্রয়োজন, বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো ও সামাজিক-জীবনের প্রয়োজন মেটানো। শিক্ষা তারা বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ রাখে না। আমরা দেখেছি সেখানে শিক্ষকগণ ছাত্রদের নিয়ে নানা শিক্ষামূলক স্থানে যান, লাইব্রেরী, যাদুঘর, চিত্র-প্রদর্শনী ইত্যাদি। তা ছাড়া সমাজের ছোট ছোট কাজে শিক্ষকগণ ছাত্রদের যুক্ত করে দেন। যার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয় জীবনই সুন্দর ও সুখময় হয় এবং অপর দিকে দুর্বার প্রাণশক্তির খোরাক জুগিয়ে সমস্ত ছাত্র-সমাজকে প্রাণবন্ত করে রাখে। একদিকে সুপুষ্ট প্রাণশক্তির দুর্বারতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী শিক্ষার দিক-দর্শন এই দুইয়ে মিলে অসাধারণ শক্তি অর্জন করেছে এবং তার স্বাক্ষর রয়েছে সারা আমেরিকার দেহে মনে। তাই তো এতবড় একটা দেশ এমন সজীব ও প্রাণবন্ত হতে পেরেছে।

মনস্তত্ত্বসম্মত আমরা যদি এই ছাত্রউচ্ছৃঙ্খলতার সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ পন্থায় আলোচনা করে দেখি, তাহলে দেখবো যে ছাত্র-জীবন হলো বয়ঃসন্ধির কাল। এই সময় তরুণ প্রাণে আত্মমর্যাদাবোধের বীজ উপ্ত হয়। সামান্যতম স্নেহভালবাসার আবেদনে হৃদয়কে দুকূলপ্লাবী বন্যায় প্লাবিত করে। আবার সামান্যতম অবহেলায় ও দুঃখে ক্ষোভে, অপমানে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ যখন বিদ্যার ক্ষেত্রে বণিকবৃত্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তখন শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহজ সুন্দর সম্পর্কটুকুর উজ্জীবন সুদূরপরাহত। ছাত্র শিক্ষকের কাছে পেল না সেই ভালবাসা ও সহানুভূতি যা সে একান্তভাবে কামনা করেছিল। তারও হতাশা সীমাহীন। আমাদের ছাত্রসমাজ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের নিয়ে। জন্মাবধি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে তারা। জীবনের কুৎসিত রূপটাকেই সে জেনেছে বারে বারে। বাড়ীতে তুচ্ছতম উপলক্ষ্যে পারিবারিক কলহ প্রত্যক্ষ করেছে প্রতি-নিয়তই। কিউতে দাঁড়িয়ে র‍্যাশনের চাল ও কেরসিন এনে, আধপেটা খেয়ে স্কুলে এসে দেখল মাইনে বাকি পড়ায় তার নাম কেটে দিয়েছে, তখন সে এই অসহ্য বেদনার বোঝাটা লাঘব করার জন্যেই নিজের কাজ থেকে পালিয়ে বাঁচবার পথ খুঁজতে চেয়েছে। তাই তো শহরের সিনেমা-ঘরগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় লেগেই আছে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ছাত্ররা তাদের আদর্শবোধ হারিয়ে ফেলছে। আমরা শিক্ষকরা যদি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে এই ছাত্রদের অভাব-অভিযোগগুলি দেখি এবং কিভাবে তাদের মনের খোরাক দেওয়া যায় সে-কথা চিন্তা করি তাহলে আমার মনে হয় কিশোর-মনগুলি এমনভাবে কলুষিত হতে পারে না। ছাত্রদের মধ্যে যে পুঞ্জিভূত হতাশাবোধ, তার থেকেই জন্ম নিচ্ছে এই হিংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া। ছাত্ররা যখন-হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, কোথাও কোনও প্রতিকারের উপায় পায় না; তাদের চোখের সামনের অন্ধকারটা ক্রমশঃই ভীষণরূপ ধরে এবং তখনই তাদের মধ্যেকার ফ্রাঙ্কেষ্টিনটা বেরিয়ে আসে; চুরমার করতে থাকে সামনে যা পায়

তাকেই। তারই রূপ দেখতে পাই ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে। এযুগের কিশোর-মনগুলি অত্যধিক বুদ্ধিদীপ্ত ও সজাগ; তাদের প্রাণশক্তিও উদ্দাম। এই শক্তিকে আমরা ঠিকভাবে চালিত করতে পারছি না বলেই আজ আমাদের সামনে এতো সমস্যার পাহাড়। আমরা বলবো বর্ত্তমানের ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে শুধু ছাত্রদের বা শিক্ষকদের উপর দোষারোপ করা চলে না। বরং বর্তমানে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে আজকের সমাজের আদর্শভ্রষ্টতা ও তার মূল্যবোধের বিচারই পুরোপুরি দায়ী বলা যেতে পারে। জীবিকার্জন ও জীবন ধারণ আমাদের কাছে এত বড় হয়ে উঠেছে যে, আদর্শবোধ আজ আর তার সঙ্গে পেরে উঠছে না।

উপরিউক্ত ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ বিশ্লেষণের পর এটুকু আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে এই ঘুণধরা শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছু রদবদলের প্রয়োজন। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রথম আদর্শ হওয়া উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি জাগরূক ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রত্যেক ছাত্র মধ্যে এই মনোভাবই উজ্জীবন করতে হবে তারা "এটা আমার দেশ" এই শিক্ষাটি প্রথম লাভ করে। যে মনোভাব একদিন ভারতের ছিল বলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়পতাকা উড়িয়ে ছাত্ররা তাদের দেশাত্মবোধের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখে গিয়েছিল। এ যুগের ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রথম কারণ আমার মনে হয়, আজ ছাত্ররা এই দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। তাই আজ আর তারা জাতীয় উন্নতি-অবনতির সঙ্গে তাদের উন্নতি-অবনতি যে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে যুক্ত এ বিশ্বাস রাখতে পারছে না। ছাত্র-স্বার্থ ও জাতীয়-স্বার্থ যে পরস্পর নির্ভরশীল এই অনুভূতিই আজ ছাত্রদের মধ্যে নেই। তাই তারা অক্লেশে জাতীয় সম্পদ ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। সত্যই আজ দেশের সেই শিক্ষক-নেতৃত্বের অভাব যাঁরা ছাত্রদের ডেকে বলতে পারবেন, "ওহে তোমরা যে কলেজের ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী পোড়াচ্ছ সে যে তোমাদেরই সম্পত্তি"। একবার যদি তাদের মধ্যে এই ধারণা আমরা জাগিয়ে দিতে পারি যে, যা কিছু বিদ্যালয়ের তা তাদেরই এবং বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি উন্নতি-অবনতি তাদেরই উপর নির্ভর করছে, তাহলে আমরা দেখব এই যে তাণ্ডব-লীলা দেশ জুড়ে চলেছে, তা ক্রমশঃই ক্ষীণ এবং সীমিত হয়ে আসবে।

বিপ্রলব্ধ ঃ বিনয় চৌধুরী। প্রকাশিকা: শ্রীমতী কনক দেবী। পরিবেশক:—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৯। দাম দশ টাকা।

উপন্যাস। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৮। এই দীর্ঘ উপন্যাস খানিতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বহু নরনারীর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পুষ্কর এবং সুভদ্রাকে নানা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি পর্য্যন্ত দেখতে পাই। পুষ্কর ব্যাঙ্কে চাকরী করে—অবসর সময় গল্প লেখে। সে গল্প কাগজে ছাপা হয় এবং প্রশংশিত হয়। জীবন সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা কিছুটা আলাদা তাই যা সে চায় তা জোর করে আদায় করতে জানে না। যে কারণে সুভদ্রা তাকে বলতে বাধ্য হয়েছে "এক এক সময় ইচ্ছে হয়, যা হবার হক আমার, গড়ে পিটে পুরুষ করে দিই তোমাকে। এমন অস্থির লাগে এক এক সময়!"

কিন্তু অস্থির লাগলেও গড়ে পিটে পুরুষ করতে পারা সুভদ্রার পক্ষে সত্যই কি সম্ভব। তার যে হাত পা বাঁধা। সুভদ্রার স্বামী আছে, আছে ছেলে, আছে মেয়ে। দেহে সে প্রবীণ কিন্তু, মনটা তার নবীন। কাজ পাগল স্বামী কাশীশ্বর দিন রাত কাজ নিয়ে মেতে আছে। সুভদ্রার আকাঙ্ক্ষা আর প্রাপ্তির মধ্যে রয়ে গেছে এক বিরাট ফাঁক। পুষ্করকে নিয়ে নানাভাবে নাড়াচাড়া করে সেই ফাঁক বোজাতে চেষ্টা করে সুভদ্রা। কিন্তু এগোতে গিয়েও পিছিয়ে যেতে হয় সুভদ্রাকে। অনেক এগিয়েও একদিন তাকে জানাতে হয়, 'আর এসো না।' নিতান্ত অকারণে এই কঠিন নিষেধ বাণী সে জানায় নি। কাশীশ্বর শেষ পর্য্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। বিচিত্র নারী এই সুভদ্রা, বিচিত্র তার চালচলন, তার ব্যবহার, তার উক্তিগুলি। সুভদ্রার মতে ভালবাসলেই কাদা মাখতে হবে এ একটা কথাই নয়। পুষ্করের ভালবাসাকে সে বাধা দেয় নি। বরং প্রশ্রয় দিয়েছে কিন্তু কোন দিন কাদা ঘাঁটতে দেয় নি। বলেছে, এক এক সময় বড় মায়া লাগে তোমায় জন্য পুষ্কর। কিন্তু কি জানো জোর না করলে কিছুই পাওয়া যায় না—এটাই শিখলে না এতদিনে। ঝিমিয়ে পড়তে দেয় নি পুষ্করকে।

পড়তে পড়তে কখনও মনে হয়েছে এ কি করছে সুভদ্রা। এমন নিষ্ঠুর খেলা কি না খেললেই নয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে খেলার ছলে সে যেন নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু শুধুমাত্র সুভদ্রা এবং পুষ্করই নয় এদের আশে-পাশে আরও বহু মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, তাদের কেউ কাগজের সম্পাদক, ব্যাঙ্কের সে অফিসার, পরিচালক, খেলোয়াড় মিঃ দাশ, তার স্ত্রী দেবযানী, মিঃ কৃপা. সিং, সুমন্ত্র, শান্তনু, অবিনাশ কাকা, তাঁর মেয়ে জামাই, অমৃত, কানু, যোড়শীও তার বাবা মা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে।

লেখকের ভাষা সুন্দর বলার ভঙ্গী সহজ এবং সময় মত থামবার ক্ষমতাও রাখেন। তাই বহুক্ষেত্রে ময়লা ঘাঁটতে বসেও গায় লাগল না। ছাপা এবং প্রচ্ছদ প্রশংসার যোগ্য।

অষ্টরম্ভা ঃ ভরদ্বাজ। পরিবেশক: ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্যসেন ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৯। ৩ টাকা।

রম্য রচনা। আপেল মাহাত্ম্য, X X এবং XY, লিঙ্গ বিচার, খাকংরি গুপ্ত, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, স্বর্গ হইতে বিদায়, শিক্ষকের মর্য্যাদা ও অট্টালিকা চাহি মোর চাহি দাস দাসী এই নয়টি রচনা পুস্তকখানিতে স্থান লাভ করেছে। চিন্তার খোরাক আছে, বর্ত্তমান সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দিকের প্রতি নানাভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পড়তে ভাল লাগে। ভেবে দেখতে উৎসাহ দেয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

পরশ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ প্রথম খণ্ড	শ্রাবণ, ১৩৭৪	৪র্থ সংখ্যা

নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গ

মানব-জাতি সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রবাদের ভিতরে সঞ্চিত করিয়া রাখে ও পরে যাহারা জন্মলাভ করে তাহারা পূর্ব্বকালের জ্ঞান প্রবাদের ভিতর দিয়া প্রাপ্ত হয়। নিজের নাক কাটিয়া অন্য লোকের যাত্রাভঙ্গ করিবার চেষ্টা যে শুধু মূর্খ ব্যক্তিরাই করিতে পারে ইহা বুঝিতে অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কারণ অপরের যাত্রাভঙ্গ করিয়া যে আনন্দ হইতে পারে নিজের নাক কাটিবার যাতনা তাহার তুলনায় অনেক অধিক; সুতরাং ঐ মহা কষ্টকর উপায় অবলম্বন করিয়া অতটুকু আনন্দ লাভ করিবার চেষ্টা নির্ব্বোধ ব্যতীত কেহ করিতে পারে না। এই প্রবাদ আমাদিগকে এই জ্ঞানই দান করিতেছে যে ব্যক্তিগত বা সামাজিক সকল প্রচেষ্টারই সর্ব্বদা একটা লাভ-লোকসানের হিসাব করিয়া দেখা দরকার। লাভের তুলনায় লোকসান অধিক হইলে কোন ব্যবসায় বা কার্য্য উপযুক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে না। সহস্র ব্যক্তির মাথা ফাটাইয়া ও শত ব্যক্তির প্রাণনাশ করাইয়া যদি পথে বাস চালান অথবা না চালানর ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সে প্রচেষ্টা অতি বড় মূর্খতার পরিচায়ক। কোন লাভ কাহারও হইতেছে না অথচ দিনের পর দিন বিভিন্ন প্রকার পতাকা বহন করিয়া বিভিন্ন মতাবলম্বি লোকেরা মিছিল বাহির করিয়া জনসাধারণের পথ চলায় ও কাজকর্ম্মে বাধার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে: এই প্রকার সামাজিক ব্যবস্থাও সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর। অকারণে সর্ব্বত্র দোকানপাট কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ও কোন কার্য্যসিদ্ধি হইল না, ইহাও কোন ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। অর্থনীতিতে বলে যে শ্রমিক, মালমশলা, যন্ত্রপাতি ও তত্ত্বাবধানকারকদিগের চলাচলের অনুপাতে ব্যবহার বা বিক্রয়ের বস্তু উৎপাদন যথেষ্ট না হইলে কোন প্রকার ব্যবসা না করাই বিধেয়। রাজনীতিতেও যাহা বলে তাহার তাৎপর্য্য বিশেষ অন্য প্রকার নহে। যথেষ্ট কারণ না থাকিলে কেহ যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এক টাকা খাজনা আদায় করিবার জন্য এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া হৈ-হাল্লা করাও রাজনৈতিক সুব্যবস্থার কথা নহে। বহু অর্থব্যয় করিয়া সৈন্য সামন্ত রাখিয়া রাজ্যরক্ষা না করিতে পারাও রাষ্ট্রনৈতিক অক্ষমতার কথা। অন্যান্য

রাজকার্য্যও ব্যয় অনুপাতে যথাযথভাবে না হইলে সেই সকল কার্য্যব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতার সমালোচনা আবশ্যক হয়।

যে সকল তথাকথিত রাষ্ট্রনৈতিক দল আজকাল সমাজের স্কন্ধে চড়িয়া আস্ফালন করিয়া দিন গুজরান করে তাহার দলপতিদিগের মনে রাখা উচিত যে সমাজের প্রতি তাঁহাদিগের একটা কর্ত্তব্যের দিক আছে। তাঁহারা দল পাকাইবেন ও পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন এই উদ্দেশ্যমাত্র সামাজিক ভাবে মূল্যবান নহে। যদি সমাজের সকল বুদ্ধিমানব্যক্তি কিম্বা অধিকাংশ লোকের মতে রাষ্ট্রীয় দলগুলির কার্য্যকলাপ সমাজের ক্ষতিকর বিবেচিত হয় তাহা হইলে সমাজ বলিতে বাধ্য হইবে যে রাষ্ট্রীয় দলগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত না হওয়াই সামাজিক ভাবে বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্য্য করিবার রীতি একাধারে সংস্কার ও গঠন মূলক। কোথায় কিভাবে রাষ্ট্রকার্য্যের সংস্কার করা প্রয়োজন ও কোথায় নূতন কিছু গড়িয়া তোলা আবশ্যক এই সকল কথা অভিজ্ঞ উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের দ্বারা সম্পন্ন করানই উন্নতির যথার্থ পথ। মিছিল বাহির করিয়া অথবা কোন রাজপথ অথবা রেলপথ বন্ধ করিয়া দিলেই রাষ্ট্রীয় কিম্বা আর্থিক বিলিব্যবস্থা নূতন রূপ ধারণ করিবে এই আশা কখনও পূর্ণ হয় না। ইহার প্রধান কারণ মিছিল অথবা অপরিণত বয়স্কদিগের দলে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও কর্ম্মী লোকের অভাব। অভিজ্ঞ ও কর্ম্মক্ষম লোকেরা সচরাচর সভাস্থলে বুক চাপড়াইয়া বক্তৃতা দিতে চাহেন না। তাঁহারা নানা অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনেও নির্ব্বাচিত হইতে চাহেন না অথবা চাহিলেও পারেন না। কিন্তু সমাজের যে অল্পসংখ্যক লোক বিক্ষোভ ও বিপ্লব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁহারা দেখা যায় অপর সকল কার্য্যেই অক্ষম। যাহারা এক ভোটকে চার ভোটে পরিণত করাইতে অথবা হাওয়া হইতে ভোট সংগ্রহ করিতে সক্ষম, তাঁহারাও সমাজের কল্যাণকর অধিক কার্য্য সম্বন্ধেই কর্ম্মক্ষমতাহীন। ইহা কোন কল্পনার কথা নহে, কারণ বিগত বহু বৎসর ধরিয়াই এই কথা প্রমাণ হইয়া আসিতেছে যে সমাজের সকল সুখ সুবিধার ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রীয় দলপতি ও তাঁহাদিগের অনুচরদিগের অবদান অত্যল্প এবং বহুক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপের ফলে সমাজের কোন সুখ সুবিধাত হয়ই নাই বরং দুঃখ ও অসুবিধাই হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে সমাজের সকল ব্যক্তির ভাবিবার সময় হইয়াছে যে রাষ্ট্রীয় দল গঠন সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর কি না। অথবা রাষ্ট্রীয় দলগুলির সামাজিক সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকা উচিত কি না। কারণ রাষ্ট্রীয় দলগুলি আজকাল সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে প্রকট হইয়া উঠিতেছে ও তাহাদিগের অনুচরবর্গ যথেচ্ছাচার করিয়া সর্ব্বঘটে মানবজীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিতেছে। এই সকল দলেরই উদ্দেশ্য অন্তত কথায় সর্ব্বজনহিতকর ও দেশের উন্নতিকারক। কিন্তু এই উদ্দেশ্যগত জনহিত নানা ভাবে আসিবে বলিয়া প্রচারিত হয়। কোন দলের জনমঙ্গল পরিকল্পনা বিদেশের আমদানি করা কষ্টকল্পনা মাত্র, কোনটি উদ্ভট কল্পনাজাত। এক কথায় প্রায় কোনটিই সুচিন্তিত ও বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করিয়া গঠিত নহে। ইহা ব্যতীত সকল দলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য অপর কোন দল বা একাধিক দলকে ভাঙিয়া দেওয়া। সকলেরই বিক্ষুব্ধভাব, নয়ত শাসনদিগের বিরুদ্ধে, নয়ত আর কাহারও বিরুদ্ধে। এক কথায় সকলেই পরস্পরকে আঘাত ও বিনাশ করিতে উদ্যত ও ব্যস্ত। ফলে সামাজিক ভাবে মনে হয় যেন সমাজ নানাভাবে বিভক্ত হইয়া আত্মঘাতে নিযুক্ত হইয়াছে। কে কাহার বিপক্ষে এবং কে কাহার বিপক্ষে নহে, ইহা ঠিক ভাবে জানা অসম্ভব। কাহারও কোন প্রচেষ্টা কাহারও কোন লাভের কারণ হইতেছে না। কাহারও শত্রু নিপাত হইতেছে কি না তাহাও বোধগম্য হইতেছে না। নিজ নিজ নাসিকা কর্ত্তন সকলেই অল্পবিস্তর করিতেছেন দেখা যাইতেছে।

বাংলার রাষ্ট্রনীতি

বর্ত্তমান বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ছত্রভঙ্গভাব দেখিলে কাহারও কখনও বিশ্বাস হইবে না যে এই দেশ একদিন ভারতকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকরূপে দিক নির্দেশ করিয়া যুক্তি ও স্বাধীনতা আহরণে সক্ষম করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সুভাষচন্দ্র বসু অবধি কত শত বাঙালী যে ভারতের আকাঙ্খা উপলব্ধির প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন সে কথা আজ আলোচনা করিলে

মনে হইবে আমরা কোন অস্তগত সভ্যতার ইতিহাস চর্চ্চা করিতেছি। আজকার অধীর বুদ্ধি, হৃতশক্তি, পরমুখাপেক্ষী, বাংলাবাসী যে সেই একই জাতির মানুষ তাহা বহু চেষ্টা করিয়া বুঝাইতে হইবে; কারণ বাঙ্গালী আজ যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে সেখান হইতে তাহাকে নিজ হারান গৌরবের আসন পুনরাধিকার করিতে হইলে পথ পরিবর্ত্তন করিয়া অশেষ বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া সে কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইবে।

আজকার বাংলায় অধিকাংশ লোকের মধ্যেই আর কোন সবল আত্মনির্ভরশীলতা জীবন্ত নাই। সেই পূর্ব্ব যুগের জাতীয়তাবোধ, আত্মসম্মান জ্ঞান, নিজস্ব অনুভূতি ও নিজ জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজ বাঙালী হারাইতে বসিয়াছে। কিছু লোকের মধ্যে নকল ইয়োরোপীয় ভাব, কিছু রুশ বা চীনের আনুগত্য আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও কিছু অর্থ আহরণার্থে যত্র তত্র আত্মবিক্রয় করিতে সদা প্রস্তুত। যাহারা এই সকল দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন ও যাঁহাদিগের মধ্যে পুরাতন ঐতিহ্য, আভিজাত্য, কৃষ্টি ও আদর্শবাদ এখনও জাগ্রত রহিয়াছে, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ও স্বার্থান্বেষী কূটবুদ্ধি লোকেদের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহারা অপারগ। দল গঠন করিয়া নিজ নিজ মতলব হাসিল করা আজকাল একটা পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জনসাধারণ এখন পূর্ব্বের ন্যায় সাধু, সজ্জন ও পণ্ডিতদিগের প্রতি অনুরাগ পোষণ না করিয়া ঐ সকল পেশাদার দলপতিদিগেরই অনুসরণ করিতে ব্যস্ত। ফলে বাংলার কৃষ্টি, আদর্শবাদ ও সভ্যতা আজ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডি বা গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। বাংলার জনসাধারণ আজ মানসিকভাবে দিশাহারা। চিন্তার ক্ষেত্রে মূল্য বিচার অথবা বাস্তব ক্ষেত্রে পরিণামদর্শিতা আর বিশেষ কাহারও মধ্যে দেখা যাইতেছে না। উদ্দাম যথেচ্ছচার সকল বিষয়ের মূলসূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যদিও সকলের কণ্ঠেই সমষ্টি ও সমাজের অধিকার সম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে, তাহা হইলেও কার্য্যত দেখা যাইতেছে কাহারও কোন অধিকার কেহ মানিতে বা রক্ষা করিতে ব্যস্ত নহে। সকলেই শক্তের ভক্ত ও নরমের যম। অল্পসংখ্যক সবল ও বিকট কণ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমাজের নিরীহ সাধারণের উপর উৎপাত করিয়া জাতীয় জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ঠিক কি কর্ত্তব্য ইহার বিচার সহজে করা যায় না। মনে হয় এই সকল অশুভ পরিণতির মূলে রহিয়াছে আমাদিগের বিগত কয়েক বৎসরের রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন এবং বিভিন্ন দলের ঝগড়া বিবাদ। পূর্ব্বকালে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আরম্ভ হইত কোন বাস্তব ও সাক্ষাৎ অনুভূতি ও আবেগ হইতে। বর্ত্তমানে হয় বিদেশীয়দিগের নির্দ্দেশে অথবা ব্যবসাদারদিগের হুকুমে। অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা সত্য কোন আবেগ এই সকল দল গঠনের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না। ভারত হইতে বৃটিশ রাজ অপসৃত করিবার জন্য যে প্রবল আন্দোলন প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া দেশের উপর দিয়া ঝড়ের মত বহিয়া চলিয়াছিল ও যাহার ফলে সহস্র সহস্র লোক অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ও লক্ষ লক্ষ লোক নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন নাই, সেই সত্য অনুভূতিজাত জন-বিক্ষোভের সহিত আজকার দাবি দাওয়া বা অভিযোগ জ্ঞাপক বিক্ষোভের কোন তুলনা হইতে পারে না। নিয়োক্তা ও নিযুক্তের বিবাদ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যের অধিকৃত দেশ শোষণ বা লুণ্ঠনের কথাও তুলনীয় নহে। জমির দখল লইয়া মারপিট আর্থিক বিষয়। তাহাকে আকাশে তুলিয়া বিশ্বমানবের কোন উচ্চ আদর্শের আসনে বসাইলে সে চেষ্টা কখনও কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখিবে না। এইরূপভাবে ছোট কথাকে বড় করিলে দেওয়ানী আদালতের অভিযোগের তালিকাগুলিও ক্রমশঃ উচ্চ স্থানে পৌঁছাইতে পারিবে। আজকার রাষ্ট্রীয় দলগুলির আদর্শবাদের সহিত দেশবাসীর প্রাণের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ। আদর্শবাদ আদর্শবর্জ্জিতভাবে থাকা সম্ভব কি না তাহাও বিচার্য্য। এই সকল দলগুলির কার্য্যকলাপের ফলে দেশের নানা প্রকার ক্ষতি হইতেছে। সেই সকল ক্ষতিও জাতীয়ভাবে উচ্চাঙ্গের আলোচনার বিষয় নহে। কিন্তু তাহার বিচার প্রয়োজন হইতেছে এই কারণে যে অনেকে ঐ জাতীয় ক্ষতির সৃষ্টিকে রাষ্ট্র বিপ্লবের নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। নির্দ্দোষ লোককে প্রহার করা, পথে অসহায় নরনারীকে অপমান করা, পরের দ্রব্য জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া ইত্যাদিকে

রাষ্ট্রীয় কার্য্য বলা অসঙ্গত। বিপ্লব বা গঠনমূলক কোন কিছুই নহে। সামাজিকভাবে এই সকল কার্য্যই শুধু অপরাধ। কোনটিই দেশরক্ষা, সমাজ নূতন করিয়া গড়া অথবা বিশ্বমানবের মহা উন্নতিকর বলিয়া কেহ মনে করেন না। অন্তত মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই সকল অপরাধ ব্যাপকভাবে করিবার ফলে বাংলা দেশ হইতে মূলধন সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাংলার কর্ম্মী সন্তানগণ নিজ দেশে যথাযথ সম্মান ও সমাদর না পাইয়া বহু সংখ্যায় বিদেশে চলিয়া যাইতেছেন এবং "মনোপলি" ব্যবসার অবস্থা বিচার বাদ দিয়া বলা যায় যে সাধারণ লোকের সাধারণ ব্যবসাগুলি অতি খারাপ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে বাংলার সাধারণকে পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দিন গুজরান করিতে হইবে, অন্য পেশা সহজলভ্য থাকিবে না। পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য যাহারা বিদেশীদিগের নিকট বেতন পাইবেন তাঁহারা হয়ত কোনমতে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু দেশের অধিক লোকই কোন অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া অভাবের তাড়নায় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবেন।

রাজনীতির উদ্দেশ্য সর্ব্বদা সকল দেশেই দেশবাসীর মঙ্গল ও জীবনযাত্রার সুযোগ সুবিধা ও সুগমতার সৃষ্টি করা। কোন রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে রাষ্ট্রনীতি বলা চলে না। তাহার নাম অরাজকতা, বিপ্লববাদ অথবা আর কিছু হইতে পারে। আমরা দেশবাসীরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই সকল রাষ্ট্রনৈতিক-দলগুলিকে সাধারণ নির্ব্বাচনের পন্থায় দেশ-শাসন কার্য্যে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যদি দেশ-শাসন না করিয়া এই সকল দলগুলি পরস্পরের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া সময়ের অপব্যবহার করেন ও কোন কোন দল যদি অপরাধবহুল কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর কর্ত্তব্য হইবে তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রনীতির সর্ব্বস্বীকৃত পথে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করা। তাঁহারা ইহা না মানিলে তাঁহাদিগকে অপর উপায়ে অপসৃত করা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই শাসন-কার্য্যের দোহাই দিয়া কাহাকেও অপরাধবহুল অরাজকতার সৃষ্টি করিতে দেওয়া দেশবাসীর পক্ষে উচিত হইবে না।

বিশ্বাস ও অঙ্গীকার ভঞ্জন

কংগ্রেস দল তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বিশ্বাস ও সর্ত রক্ষা করিয়া চলার জন্য প্রসিদ্ধ নহেন। তাঁহারা যখন যাহা অঙ্গীকার করেন, অন্তত সভাস্থলে ও বক্তৃতামঞ্চে, সেই সকল অঙ্গীকার তাঁহারা সর্ব্বদা মানিয়া চলেন না। যথা স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে তাঁহারা বৃটিশের বহু দুষ্কর্ম্ম সম্বন্ধে বহু সংস্কার কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন যে সকল প্রতিশ্রুতি তাঁহারা সর্ব্বক্ষেত্রে রক্ষা করেন নাই। বাংলার যে সকল জেলা বিহারে সংযুক্ত করিয়া দিয়া বৃটিশগণ বাঙ্গালীকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কংগ্রেস সেই সকল জেলা বাংলাকে ফিরত দিবার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও ফিরত দিবার কার্য্যত কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যতটা দেখা গিয়াছে বিহারের কংগ্রেসীদিগের লাভ ও সন্তোষের জন্য ভারতীয় কংগ্রেস অন্যায়ভাবে বাংলা ভাষাভাষী জেলাগুলিকে বিহারে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ সর্তভঙ্গ ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দান কংগ্রেস করিয়া থাকেন। দেশের গ্রামের উন্নতি ও কারখানাবাদের বিষয়ে সংযম কংগ্রেসের বহু পুরাতন প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু বহুবৎসর উল্টাপথে চলিয়া ভারতের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ করিলেও কোন কংগ্রেসী তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। ভারতবাসী জনসাধারণ বলিতে পারেন যে কংগ্রেস ভারত স্বাধীন করিবার নামে যে ভারতের এক বৃহৎ অংশকে পাকিস্থানে পরিণত করিতে রাজী হইয়াছিলেন তাহাও একটা অতি বড় বিশ্বাস ও অঙ্গীকার ভঙ্গের সাক্ষাৎ প্রমাণ। সুতরাং কংগ্রেসদল সর্ব্বদাই সুবিধাবাদী ও সর্তভঙ্গে তৎপর এইকথা জানিয়াই ভারতের লোকেরা তাঁহাদিগের হস্তে দেশ তুলিয়া দিয়াছিলেন ও দিয়া থাকেন। কনষ্টিটিউশন পরিবর্ত্তন করিয়া যে তাঁহারা দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ অন্য প্রকার করিয়া দিবেন না এরূপ আশা করিবার কোন নির্ভরযোগ্য কারণ আমরা দেখিতে পাই না। এই

কারণে যখন ভারতের রাজা মহারাজাদিগের "ব্যক্তিগত আয়" হিসাবে যে টাকা এখন পর্য্যন্ত ভারত সরকার দিতেছেন তাহা বন্ধ করিবার প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রাহ্য করিলেন তখন রাজা মহারাজারা এই প্রস্তাবকে সর্ত ও কড়ার ভাঙ্গা বলিলে ও সে কথা সত্য হইলেও টাকা যে অদুর ভবিষ্যতে বন্ধ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ কংগ্রেস যখন একবার কোন মতলব করিয়া কাহারও টাকা বন্ধ করিবেন স্থির করিয়াছেন তখন তাঁহারা টাকা বন্ধ করিবেনই বলা যাইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে রাজা মহারাজাগণ কি করিতে পারেন? যদি কিছু করিতে পারেন চাপ দিবার মত, তাহা হইলে টাকা বন্ধ নাও হইতে পারে। নতুবা অঙ্গীকার রক্ষা করার কথা তুলিয়া লাভ নাই। কারণ যখন কাহারও সহিত অঙ্গীকার রক্ষার কোন কথাই কখনও গ্রাহ্য হয় না, তখন রাজা মহারাজাদিগের জন্যই বা তাহা হইবে কেন?

টাকায় জল মিশাইয়া যদি একশত টাকাকে ক্রয়-ক্ষমতায় দশ টাকার সমতুল্য করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেইরূপ টাকার ক্রয়ক্ষমতা লইয়া ছিনিমিনি খেলা কি সাধারণের সহিত বিশ্বাস রক্ষার পরিচায়ক? ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া করিয়া যদি কাহাকেও শতকরা একশত দশ টাকা ট্যাক্স দিতে হয় তাহাও কি অলিখিত সর্ত ভঙ্গ নহে? যদি খাদ্য সরবরাহ করা হইবে বলিয়া না করা হয়, যদি সমষ্টিবাদ আওড়াইয়া কাহাকেও চাকুরী দেওয়া হয় ও কাহাকেও না দেওয়া হয় তাহা হইলে কি অঙ্গীকার অনুচ্চারিত হইলেও তাহা ভাঙ্গা হয় না? আর যে সকল পক্ষপাতদোষে বাছাই করা লোকেদের সব জুটিয়া যায় ও সাধারণে কিছুই পায় না, সে অবস্থাও কি সর্তভঙ্গের চূড়ান্ত নহে? শাসন কার্য্য চালাইব বলিয়া যদি মন্ত্রী-মহলের লোকেরা অরাজকতার সৃষ্টি করিতে থাকেন তাহা হইলেই বা সেই রূপ বিশ্বাস ভঙ্গের সমর্থন কি ভাবে করা চলিতে পারে? এবং যদি স্থির হয় যে বিশ্বাস রক্ষা করা হইতেছে না তাহা হইলেই বা সেই সকল কার্য্যের জন্য মন্ত্রীদিগের কি শাস্তির ব্যবস্থা হইতে পারে? আমরা এই সকল আলোচনার দ্বারা এই কথাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছি যে বিশ্বাস ও অঙ্গীকার ভঙ্গ সর্ব্বব্যাপী এবং তাহার কোন প্রতিকারের উপায় দেখা যাইতেছে না।

শিক্ষার কথা

আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাঁহারা অবান্তর কথা তুলিয়া সময় নষ্ট করেন, তাঁহাদিগকে এক প্রকার উন্মাদের সহিত তুলনা করিয়া প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে পাগলকে ভাত খাইতে বলায় সে কোথায় হাত ধুইবে সে আলোচনায় মত্ত হইয়া উঠিয়া খাওয়ার কথাটাই ভুলিয়া রহিল। ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গিয়া আজকাল আদর্শবাদী মন্ত্রীগণ শুধু উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষায় দিবার আয়োজন কতদিনে সম্পূর্ণ হইবে ও হিন্দিভাষা কেমন করিয়া সকল ভারতবাসীকে শিখান হইবে এই দুই কথা লইয়াই মত্ত থাকেন। শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা কোন কিছুরই যে ভারতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই একথাটা আর যথাযথভাবে আলোচিত হইবার সুবিধা হয় না। সাধারণ বুদ্ধির লোকে জাতীয় ভাবে শিক্ষার কথা আলোচনা করিলে প্রথমে দেখিবে সকল বালক বালিকার অক্ষর পরিচয় ও প্রাথমিক গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে কি না। যদি শতকরা পঞ্চাশজন বালক বালিকা শিক্ষা লাভ না করে, বা স্কুলে যাইবার ব্যবস্থা থাকিলেও স্কুলগুলি গোয়ালঘরের সমতুল্য হয় ও শিক্ষকগণ অক্ষম হন তাহা হইলে প্রথম কর্ত্তব্য হইবে যথেষ্ট স্কুলগৃহ, শিক্ষক, পুস্তক, লিখিবার জন্য আবশ্যকীয় খাতা কলম পেন্সিল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। ইহা না করিয়া বি এস সি পরীক্ষার ও কলেজে পাঠের ব্যবস্থা কোন ভাষায় হইবে ও সকল উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক কি করিয়া ভারতের সকল ভাষায় লিখিত হইবে এই কথা লইয়া ঘোর আন্দোলন করিয়া শুধু মন্ত্রীদিগের মানসিক অবস্থারই পরিচয় দেওয়া হয়। অপর কোন অতি প্রয়োজনীয় জাতীয় কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান জাতীয় কার্য্য হইল সকল বালক বালিকার অক্ষর পরিচয় ও গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা; আইনষ্টাইন, কেনস্, হলডেন, রাসেল বা ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের লিখিত পুস্তকের ওড়িয়া ও আসামী ভাষায় তর্জ্জমার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা নহে। জাতীয় ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমে সকল ব্যক্তির নিরক্ষরতা দূর করা আবশ্যক; তৎপরে পাঠ, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গোড়ার কথাগুলি শিখাইবার ব্যবস্থা আবশ্যক। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ছাত্রদিগের মধ্যে সুনীতি

কৃষ্টি কর্মশক্তি বৃদ্ধির ও শরীর মনের উপযুক্ত গঠন ব্যবস্থার। যদি এই সকল কথা ভুলিয়া কেমন করিয়া হিন্দি শিখান যাইবে এই কথারই জল্পনায় মন্ত্রীগণ বিভোর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কর্তব্যভ্রষ্ট হইতেছেন বলা অতি অবশ্যই প্রয়োজন হইবে।

উচ্চশিক্ষা যে কোন ভাষায় চলিতে পারে। কারণ যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত তাহারা দুই একটা নূতন ভাষা শিখিয়া লইতে সহজেই পারে। যথা আমাদিগের জানাশোনা বহু ভারতীয় পণ্ডিতজন ইংরেজী, জার্মান, ফ্রেঞ্চ অথবা অন্য ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ভারতের নাম জগতসভায় উজ্জ্বল করিয়াছেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে দেখা যায় যে ইংরেজী ভাষায়, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করা ভারতীয়দিগের পক্ষে মহা কঠিন বা অসম্ভব হয় নাই। মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলে হয়ত আরও অধিক ছাত্র বি, এ; এম, এ, পাশ করিত; কিন্তু বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত যত ছাত্র ভারতে আছেন তাঁহারা সকলেই যে দেশের উন্নতির জন্য কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। বরঞ্চ বহুছাত্র বিদেশে গিয়া সেই সকল দেশেই থাকিয়া যাইতেছেন; কারণ তাঁহাদিগের বিদ্যার ব্যবহার বিদেশীরা করিতে পারিতেছে ও ভারত পারিতেছে না। এইরূপ অবস্থায় উচ্চশিক্ষা আরও সহজলভ্য করিতে পারিলে ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ আরও প্রবল হইয়া উঠিবে। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বব্যাপ্ত হইলে জাতীয় কর্মক্ষমতা অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠিবে এবং উচ্চশিক্ষিতেরও বেকার অবস্থা দূর হইতে পারিবে। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার। তাহা মাতৃভাষাতেই হইবে এবং তাহার ব্যবস্থা হইলে পরে শীঘ্রই উচ্চশিক্ষাতেও মাতৃভাষা ব্যবহার সহজ হইবে। হিন্দিভাষা সকলে শিখিবে কিনা সেকথা জাতীয়ভাবে শিক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা হইলে পরে তবে ঠিকভাবে বোধগম্য হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দেশে এখনও বহু বালক বালিকা নিরক্ষর থাকা সত্বেও আমাদিগের মন্ত্রীগণ আসল কথা বাদ দিয়া দেশবাসীর সম্মুখে অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া তাঁহাদিগকে ছেলে ভুলাইয়া রাখার মত করিয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশবাসীর কর্তব্য হইবে প্রথমে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করাইতে মন্ত্রীদিগকে বলা ও তাহা কার্য্যত হইয়াছে দেখিয়া পরে অন্য কথা শুনিতে রাজী হওয়া।

বাল্যকাল হইতে মাতৃ ভাষায় বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিতে থাকিলে মানুষ ক্রমশঃ সেই ভাষাজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয় যাহাতে উচ্চাঙ্গের চিন্তা, বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে তাহার মর্মবোধ করিতে মানুষ অনায়াসে পারে। মাতৃ ভাষায় যাহার শব্দজ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের শতকরা কুড়ি ভাগ, অর্থাৎ যেখানে ৩০,০০০ শব্দের জ্ঞান থাকা সম্ভব সেখানে যদি মানুষ মাত্র ২০০০ হইতে ৬০০০ মাত্র শব্দের অর্থ জানে তাহা হইলে মাতৃ ভাষায় উচ্চ শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করিতে সে মানুষ পারিবে না। এই কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিতর দিয়া অন্তত ৮০০০-১০০০০ শব্দের সহিত পরিচয় হইলে পরে তবে মানুষ ২০০০০-২৫০০০ শব্দের কথা চিন্তা করিতে পারে। এবং পরিভাষা গঠন করিয়া তাহার ব্যবহারিক স্থিতি স্থির নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেও বেশ কিছুকাল সময় লাগে। এই কারণে মাতৃভাষার পূর্ণতর ব্যবহার বেশ কিছুকালাবধি না চালাইয়া লইয়া অকস্মাৎ যদি মাতৃ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞানের বিচার আরম্ভ করা হয় তাহা হইলে তাহার ফল জাতীয়ভাবে লাভজনক হইবে না।

ভারতের সকল ভাষা সমানভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম প্রভৃতি অল্প কয়েকটি ভাষা অন্য সকল ভাষার তুলনায় অধিক পরিণত বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। হিন্দী ভাষা এখনও গঠন করা হইতেছে এবং যাহা গড়িয়া উঠিতেছে তাহা সকল তথাকথিত হিন্দী ভাষাভাষীদিগের বোধগম্য হইতেছে না। সুতরাং ভারতের সকল ভাষা ব্যবহারে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা চালাইতেই কিছু বাধা ও কষ্টের সৃষ্টি হইতে পারে। এই সকল বাধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া ভাষাগুলিকে উপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলিতেও সময় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় প্রয়োজন হইবে। বর্তমানে এই কার্য্য আরম্ভ করিলেই মন্ত্রীদিগের কর্মশক্তি ও গঠন প্রেরণার পূর্ণ ব্যবহার হইবে বলিয়া মনে হয়।

সোস্যালিজমের ফলাফল

কুড়ি বৎসর ভারতবর্ষে তথাকথিত সমাজবাদ বা সোশ্যালিজম্ চলিবার ফলে দেখা যাইতেছে যে বেকার সমস্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। গরীব লোকের খাদ্য সমস্যা এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে যে বহু লোকের খাদ্যের অভাবে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা হইয়াছে। বেকার সমস্যার সহিত খাদ্যাভাব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কারণ খাদ্য মূল্য দিতে পারিলে কালোবাজারে পাওয়া যায় এবং বেকার ব্যক্তির কোন রোজগার নাই বলিয়া খাদ্যমূল্য দিবার ক্ষমতাও নাই, এবং সেই কারণে বাজারে খাদ্য থাকিলেও তাহাকে না খাইয়া মরিতে হয়। ভারতের মানব সমষ্টিবাদের ফাঁকা আওয়াজ ক্রমাগত শুনিয়া থাকিলেও তাহাকে গাছের তলায় বাস করিতে বাধ্য করা হইতেছে এবং তাহার কোন সুখ সুবিধা বা রোজগারের ব্যবস্থা না থাকায় তাহার অবস্থা ধননীতিবাদের অন্তর্গত ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও অনেক অধিক শোচনীয়। সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদের নাম করিয়া বহু রাষ্ট্রসেবক কিন্তু নিজ নিজ ব্যক্তিগত সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। সমাজের নিকট বেতন, বাসস্থান ও ভ্রমণের খরচ ইত্যাদি পাওয়া যাইতেছে ও তাঁহাদিগের পেটোয়া লোকেদেরও সাধারণের তুলনায় সুখ সুবিধা অধিক আছে দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ ধননীতিতে যেরূপ অল্প কিছু বাছা বাছা লোকের সুবিধা করিয়া দিবার রীতি সমাজতন্ত্রেও সেই রূপ শুধু রাষ্ট্রসেবক ও দেশ-নেতাদিগের সুবিধা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের রোজগারের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ভারতীয় সমষ্টিবাদে এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কারণ? কারণ বিদেশীদিগকে দলে দলে ভারতে আনিয়া নেহেরু পদ্ধতিতে জাতির অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থা স্থির করান। এই পর-মুখাপেক্ষিতার আধিক্যেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যদিও কোথাও কোথাও সাধারণের বিনামূল্যে চিকিৎসার আয়োজন আছে; কিন্তু বস্তুত সেই আয়োজন সুপারিশ ব্যতীত কেহ উপভোগ করিতে পায় না। কোথাও কোথাও ডাক্তারগণ পক্ষপাত দোষদুষ্ট, কোথাও ঘুষ চলে ও কোন কোন স্থানে মন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রক্ষেত্রের মুরুব্বি বর্জ্জিত ভাবে কিছু পাওয়া সম্ভব হয় না। ঔষধের কথা না বলাই ভাল এবং নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করার সৌভাগ্য অনেকেরই অদৃষ্টে ঘটে না। যদি পয়সা দিয়া কেহ চিকিৎসা করায় তাহা হইলে তাহার খরচ কন্যার বিবাহের তুলনায়ও অনেক অধিক হইয়া যায়। ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের ডাক্তারদিগের জনহিতের প্রচেষ্টা অতি বিশেষভাবেই অর্থ উপার্জ্জনের ব্যাকুলতায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষকদিগের বিদ্যা দান যেরূপ আজকাল দক্ষিণার উপর নির্ভর করে, ডাক্তারদিগের রোগ যন্ত্রণা হইতে রুগীকে বাঁচাইবার ইচ্ছাও তেমনি "ফিস"এর উপর নির্ভরশীল। এই সকল শিক্ষক ও ডাক্তার যদি সমাজতন্ত্রের বেতনভোগী ব্যক্তি হ'ন, তাহা হইলেও পরোক্ষভাবে দক্ষিণা ও "ফিসের" কথা বহুক্ষেত্রেই উঠিয়া থাকে। মানুষ ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব্ব করিয়া সমষ্টিবাদ মানিয়া লইতে রাজী হয় সর্ব্ব মানবের মঙ্গলের জন্য; কিন্তু সমষ্টিবাদ অর্থে যদি শুধু রাষ্ট্রনেতা ও তাঁহাদিগের দলের পোষ্যগুলিরই সুবিধার ব্যবস্থা হয় অথবা সাম্রাজ্যবাদের সকল পুরাতন পাপ যদি সমষ্টিবাদ সত্ত্বেও পূর্ণরূপে বজায় থাকিয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ কেন অযথা মিছিলের ধাক্কা খাইয়া ও মিথ্যা কথার বন্যাবিধ্বস্ত হইয়া নিজ স্বার্থ ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির লোকেদের সুবিধা করিয়া দিবে? আমাদিগের দেশে ক্রমশঃ শুধু আমলাদিগের ও রাষ্ট্রীয়দলের লোকেদেরই বসবাস ঠিকমত চলিতে পারিবে; সাধারণ লোকের বাস এই সমষ্টিবাদী সাধারণতন্ত্রে সহজ ও সুগম হইবে না!

চীনের প্রগতি

চীনের লাল রক্ষকদিগের উৎপাতের কথা প্রায়ই শুনা যায়। এই লাল রক্ষকবাহিনী একটা অপরিণত যুব-বাহিনী। ইহা গঠন করার কারণ মনে হয় মাও সে টুঙের পরিণতবয়স্ক চীন দেশবাসীর উপর প্রভাব হ্রাস হইয়া যাওয়া। উপরন্তু মাও সে টুঙ একজন নব রসুল বা পয়গম্বর বলিয়া নিজেকে মনে করেন ও সেই অনুসারে তাঁহার নির্দ্দেশে সকলে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইবে বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা। তিনি নিজের নির্দ্দেশ প্রচারার্থে

মাও ৎসে টুঙ্গের চিন্তাকণিকা নিচয় একটি লাল কেতাবে লিখিত ও প্রকাশিত করাইয়াছেন ও সেই পুস্তক অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থের মতই ভক্তিভরে লাল রক্ষকগণ সঙ্গে লইয়া বেড়ান। অথচ ধর্মের বা ঈশ্বরের সহিত মাও ৎসে টুঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই। কম্যুনিজম্ ঈশ্বরবর্জিত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর নির্ভরশীল। মানবজাতির ইতিহাসের কম্যুনিজম্ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে তাহা লইয়া মতভেদ ঘটে ও ঘটিতে পারে। মাও ৎসে টুঙ্গের প্রেরণা নূতন রূপ ধারণ করিয়া মার্কস্‌বাদের চেহারা বদলাইয়া দিবে এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ দেখা যায় না। শুধু লাল রক্ষকদিগের বিশ্বাস যে মাও ৎসে টুঙ্গ কোন এক বিজ্ঞানসম্মত নূতন জ্ঞানের আধার ও সেই অভিনব জ্ঞান তাঁহার চিন্তাকণিকাগুলির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের দূত বা পয়গম্বরগণ যাহা করিতে পারেন বিজ্ঞান ও কম্যুনিজমের দূত মাও ৎসে টুঙ্গ তাহা পারেন কি না আমরা বলিতে পারি না কেন না সেরূপ কথার ভিতর যাওয়া আমাদিগের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। তবে তিনি জ্ঞানে ও উপদেশদান ক্ষমতায় যে ধর্মপ্রবর্ত্তকদিগের মতই প্রভাবশালী তাহা আমরা দেখিতেই পাইতেছি। কনফুসিয়াস, লাও ৎসে, মেন্‌সিয়াস, বুদ্ধ প্রভৃতিকে মাও ৎসে টুঙ্গ বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আগুয়ান হইয়া চীনকে যে কোন এক অজ্ঞানা ভবিষ্যতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন তাহা পৃথিবীবাসী অবাক হইয়া দেখিতেছেন। তিনি যে জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে সকলের উপরে, একথা লালরক্ষকমাত্রই স্বীকার করে। কিন্তু চীন দেশেই অনেক লোক আছেন যাঁহারা এই মহাপুরুষের মহত্ব মানিতে রাজী নহেন। চীনের স্থানে স্থানে মাও ৎসে টুঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া বহু সহস্র লোকও প্রাণ হারাইয়াছে। মনে হইতেছে যেন চীনের এই নূতন পথে চলা সহজ ও বিরোধবর্জিতভাবে হইবে না। মাও ৎসে টুঙ্গের আত্মমহিমা প্রচার ও দেশবাসীকে নিজের ইচ্ছার দাস করিবার চেষ্টার ফল চীনদেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। তাঁহার মতই অপর যে সকল নেতা চীনে আছেন সকলেই তাঁহার এই প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টাকে বিফল করিতে উদ্যত হইতেছেন। কেহ কেহ যুদ্ধ করিতেও অগ্রসর হইতেছেন। লালরক্ষকগণ বহু স্থলে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং মাও ৎসে টুঙ্গ কোথাও কোথাও শত্রুদিগের সহিত রফা করিয়া নিজের ইজ্জত বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা চীনদেশে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল হয় নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে ব্যক্তিগত প্রভুত্বের জন্য লড়াই ঝগড়া হইয়া আসিতেছে। চীনের যোদ্ধা সেনাপতিরাই নিজেদের জোর বাড়িলেই ক্রমশঃ অপর সেনাপতিদিগকে দাবাইয়া একাধিপত্য স্থাপন চেষ্টা করিতেন। মাও ৎসে টুঙ্গের পূর্ব্বে এক সময় চাঙ্গ কাইসেক চীনের যোদ্ধা সেনাপতিদিগের প্রভু ছিলেন। তিনি অপর সকল সেনাপতিদিগকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে বিধ্বস্ত হইয়া চীনের বাহিরে টাইওয়ানে আমেরিকার সাহায্যে অবস্থান করিতেছেন। মাও ৎসে টুঙ্গ ঐ একই পথে চলিতেছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধেও অপর সেনাপতিদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই সংগ্রামের পরিণতি কি হইবে বলা যায় না! কিন্তু মনে হয় যে মাও ৎসে টুঙ্গের একাধিপত্যে কিছু ফাট ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। লালরক্ষকগণও পূর্ব্বের ন্যায় অবাধ গতিতে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিতেছে না।

বাংলা রোমান্টিক উপন্যাসের পূর্ণ বিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে রোমান্টিক সৃষ্টি প্রথম করেন বঙ্কিমচন্দ্র, এ-কথা সর্বজনবিদিত। ব্যাপকভাবে সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের কথা বিবেচনা করলে রোমান্টিক আখ্যায়িকা বা গল্প তাঁর আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রথম পূর্ণাঙ্গ রোমান্স বা রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। ঐ ধরণের উপন্যাসকে সেকালে অনেকে রোমান্স শব্দটির বাংলা করতে চেয়ে "রমন্যাস" বলতেন। এখন দিলীপকুমার রায় তাঁর "অঘটনী" কাহিনীমালাকে ঐ নামে অভিহিত করতে চান। নামটি আপত্তিকর না হলেও রোমান্স শব্দটকে বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত করতে কোন বাধা না থাকায় ঐ শব্দটিও চালানো যেতে পারে। নভেল শব্দটিও বাংলায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করলে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নেই।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা কথাসাহিত্যে তথা রোমান্টিক উপন্যাসে রোমান্সের গতিবেগ শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করে। রোমান্টিক উপন্যাসের পূর্ণবিকাশ এই সময়ে হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত যে-সমাজ ইংরেজের আনুকূল্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, সে-সমাজ সিপাহি বিদ্রোহের পর দ্রুত পরিপুষ্টি লাভ করে এবং ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় পর্যন্ত চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ ইংরেজের সুদৃষ্টিপাতে বঞ্চিত হতে থাকে। তবুও ১৯০৫-৩৯ সাল পর্যন্ত সময় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের সব চেয়ে বেশি সমৃদ্ধি ও বাড়্‌বাড়ন্তের সময়। এই সমাজ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের শীর্ষবিন্দুতে এই সময়টাতে উঠতে ও থাকতে পেরেছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় এই সময়ের বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক চেতনাও পূর্ণ বিকাশ অর্জন করে। বাংলা রোমান্সের শ্রেষ্ঠ না হলেও প্রচুরতম পুষ্পোচ্ছল বিকাশ এই সময়ে সম্ভব হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধার সময় থেকে বিশেষ করে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সমগ্রভাবে বাঙালি জাতির এবং বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দুর্গতি সুরু হয়। বর্তমানে ঐ দুর্গতি ভয়াবহ অবস্থায় এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার রোমান্টিক সাহিত্যে দেখা গেছে বীভৎস অবক্ষয়। এর জন্যে যে সব রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয়, আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক কারণসমূহ দায়ী, সেগুলির আলোচনা সাহিত্যবোধের জন্যে অত্যাবশ্যক হলেও ক্ষুদ্র নিবন্ধে করা অসম্ভব। বাঙালির বিরাট ভ্রান্তি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যই মূল কারণ। সে-বিষয়ে স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার, হেমন্তকুমার সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি একদা অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৬ সাল থেকে ভিয়েৎনামকে লাল সেলাম জানাতে অভ্যস্ত মার্কসবাদ-প্রপীড়িত আত্মঘাতী বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে সে-সব আলোচনা অরণ্যে রোদনের সামিল হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের গতি ক্রমশ রোমান্সের প্রাধান্যের দিকে। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের অল্প দিন পরে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে রোমান্টিক চেতনার পূর্ণ বিকাশ দেখা গেল। এই বিকাশ অচিরে ব্যাহত হল; আজ আর তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়; ভবিষ্যতে এর পুনর্জীবন দুঃসাধ্য না হলেও প্রায় অসম্ভব। তবু একদা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের কমনীয় উদ্যানে যে রমণীয় কুসুমবিকাশ দেখা দিয়েছিল তার সুখস্মৃতি পরম উপভোগ্য; তার স্নিগ্ধ সুরভি আজও রসিকমাত্রকে উন্মনা করে।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৫০) তাঁর প্রথম দিকের গল্প রচনায় মণীন্দ্রলাল বসু ও তাঁর রোমান্টিক লেখক বন্ধুগোষ্ঠীর দ্বারা একটু প্রভাবিত হয়েছিলেন। সে প্রভাব তাঁর উপন্যাসেও কিছু পরিমাণে দেখা যায়। ছোট গল্প রচনায় অসামান্য নৈপুণ্য দেখালেও উপন্যাসেই বিভূতিভূষণ তাঁর প্রতিভার পূর্ণ মৌলিকতা অভিব্যক্ত করতে পারেন। তাঁর সমস্ত

রচনাই বিশেষভাবে রোমাণ্টিক রচনা। বস্তুত বঙ্কিম চন্দ্রের লেখনীতে রোমাণ্টিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গেছে যা পরবর্তীকালে কারও দ্বারা অতিক্রান্ত হয় নি এবং বিভূতিভূষণের রচনায় রোমাণ্টিক উপন্যাসের পূর্ণ বিকাশ দেখা গেল যার পর রোমান্স আর অগ্রসর হতে পারে না, হতে গেলে তাকে হতে হয় মিষ্টিক। বলা হয়ত বাহুল্য নয় যে, বাংলা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, বাঙালির বর্তমান মানসিকতায় মিষ্টিক নভেল একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। যে সুস্থ পরিণত সুদৃঢ় উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তার জন্যে প্রয়োজন তা বাংলা দেশে কখনও ছিল না, দীর্ঘকালের মধ্যে হবে না। একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত কোন দিনই ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসি বা জার্মান মধ্যবিত্তের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকালীন সুদৃঢ় অর্থ নৈতিক কাঠামো পায় নি ; কাজেই ও-সব বৈদেশিক মধ্যবিত্ত সমাজে যা সম্ভবপর হয়েছিল উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বাংলা দেশে তা কিছুতেই হতে পারত না বলেই হয় নি।

শুধু রোমাণ্টিক চেতনার পূর্ণতার দিক থেকে নয়, রোমাণ্টিসিজমের উৎকর্ষের দিক থেকেও বিভূতিভূষণের পরবর্তী কোন ঔপন্যাসিক তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি। পূর্ববর্তীদের মধ্যেও একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন কি না, সন্দেহ। শরৎচন্দ্রের দরদ ও সহানুভূতি ছিল সহজাত অক্ষয় কবচকুণ্ডলের মত ; ও-দুটির ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল ভাব ও আবেগের ওপর ; কিন্তু ভাব ও আবেগ, সেণ্টিমেণ্ট ও ইমোশনকে অতিক্রম করে কোন গভীরতর জীবনবোধ, জীবন সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, জীবন সম্বন্ধে কোন দিশা বা দর্শন শরৎ-চন্দ্রের ছিল না। তাঁর রচনাবলী কোন পাঠককে জীবনে কোন নেতৃত্ব বা পথ-নির্দেশ দিতে অক্ষম। তাঁর মত রসস্রষ্টা এখন একজনও নেই বটে কিন্তু তাঁর অপূর্ণতা বা ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দোষের কিছু নয়। তাঁর লেখাপড়াও বেশি কিছু ছিল না। সে-ক্ষেত্রে বিভূতি ভূষণের দরদ ও সহানুভূতি ত ছিলই, তা ছাড়াও ছিল গভীরতর জীবনবোধ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর তিনি প্রথম ঔপন্যাসিক যাঁর রচনায় আছে সুদূরপ্রসারী জীবনদর্শন, তাঁর পড়াশুনোও ছিল যথেষ্ট। স্নিগ্ধ কমনীয় মানসিকতা ও প্রকৃতি-প্রীতিতে তাঁর কোন তুলনা দেখা যায় না। পারলৌকিক চেতনা আর অতীন্দ্রিয়তার দিকেও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই মাটির পৃথিবীর বুকে পা রেখে দাঁড়িয়েই। এ অতি দুর্লভ সমন্বয় ; ধনী অধ্যাত্মবিলাসী বা জড়বাদী বস্তুসর্বস্ব কথাসাহিত্যিকরা তাঁর অদ্ভুত মানসপ্রগতির নাগাল পান নি।

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি (১৯২৮) থেকে ইছামতী (১৯৫০) পর্যন্ত উপন্যাসমালিকায় যে রসসৃষ্টি, সামর্থ, রোমান্সের রঙিন আবেশ, সুন্দর ভাষাসম্পদ্ আর ভাববৈচিত্র্যের উপাদানপুঞ্জ সঞ্চিত আছে, বিশ্বসাহিত্যেও তার তুলনা বিরল। পথের পাঁচালি, অপরাজিত, দৃষ্টি প্রদীপ, আরণ্যক, অনুবর্তন, আদর্শ হিন্দু হোটেল, দেবযান ও ইছামতী—অন্তত এই আটখানি উপন্যাসে যে আশ্চর্য শিল্পকুশলতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তার জন্যে পরলোকগত সাহিত্য-সমালোচক সজনীকান্ত দাসের একটা কথা মনে পড়ে। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলে-ছিলেন : বিভূতিবাবুর অন্তত সাতবার নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল! বাংলা সাহিত্যে ফরসাইট সাগা ও গ্রেট হাঙ্গারের মত বই, গ্রীন ম্যান্সনের মত রচনা একমাত্র বিভূতিভূষণই রেখে গেছেন—পথের পাঁচালি—অপরাজিত, দৃষ্টি প্রদীপ আর আরণ্যক।

দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫) উপন্যাসে যে অতীন্দ্রিয়তার সূত্র-পাত, দেবযান (১৯৪৪) আর ইছামতী (১৯৫০)-তে তারই পরিপূর্ণতা। দেবযানে পরলোকতত্ত্ব বা থিওসফির প্রভাব প্রবল ; মণীন্দ্রলাল আর সরোজকুমার রায়চৌধুরির সহযোগিতায় মীনকেতুর কৌতুক (১৯৪) উপন্যাসে নিজের অংশটুকু লিখতে বসেও তিনি যে রকম অসঙ্গতভাবে পারলৌকিকতার অবতারণা করতে গেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, তিনি এ সম্বন্ধে অত্যন্ত অভিভূত ছিলেন। এই অভিনব অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় রহস্যমাধুরী সংযুক্ত করে তার চিত্তাকর্ষকতা বাড়িয়ে দিয়েছে। "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প" তার একটি দৃষ্টান্ত।

বিভূতিভূষণের সৌন্দর্য-প্রীতি এবং প্রাকৃতিক শোভার প্রতি অনুরাগ দিলীপকুমারের সঙ্গে তুলনীয়। তবে বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র চৌহদ্দির মধ্যে যে শ্যামসুষমা আছে তার এত সরস ও প্রাণবন্ত বর্ণনা ক'রে তাকে নিজের লেখায় এমন সজীব ক'রে তুলতে আর কোন কথাসাহিত্যিক পারেন নি। ঘাসের উপর একটি শিশির বিন্দুর রূপ এমন ক'রে নয়ন মেলে আর কেউ দেখেন নি। সৌন্দর্য-তৃষ্ণার দিক থেকে বিভূতিভূষণ—হেমেন্দ্রলাল—

দিলীপকুমার—মণীন্দ্রলাল, এই চারজন অনেকটা এক রকম।

সামান্য ভাত-রাঁধা বামুনের জীবন নিয়ে কত সহজে পবিত্র অনবদ্য এক রোমান্স গ'ড়ে তোলা যায়, আদর্শ হিন্দু হোটেলে তা দেখানো হয়েছে। বিকৃত যৌন রোমান্স বা বস্তি-সাহিত্য সৃষ্টি না করেও গ্রাম-বাংলার মাটির দুলালদের নিয়ে, ছোটনাগপুরিয়া অর্ধ-সভ্যদের নিয়ে তিনি যে স্বর্গরাজ্য রচনা করে গেছেন, তাতে ভবিষ্যতের মার্কসবাদী বাংলা তাঁকে কি চোখে দেখবে বলা না গেলেও সাহিত্য-মকরন্দ পিপাসুরা যে তাঁকে অর্চনা করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫), গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৩-১৯২৫), মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭—) এই চারজনও রোমান্টিক প্রকৃতির লেখক। রোমান্টিকতায় সীতা দেবী শান্তা দেবীরাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথশিল্পী মণীন্দ্রলাল একদা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকরূপে পরিগণিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি পরবর্তী রোমান্টিক লেখকেরা তাঁর মতো খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কাঙাল ছিলেন। মণীন্দ্রলালের রচনায় মুখ্যত অভিজাত, সংস্কৃতিমান, সুশিক্ষিত সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর নির্মিত চরিত্রাবলীও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের। শরৎ-পরবর্তী যুগে বিভূতিভূষণের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত অনুরূপা দেবী ও নরেশচন্দ্রের পর তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক ব্যাপ্তি লাভ করে। জনপ্রিয়তার তরঙ্গ-প্লাবনে তিনি "সাহিত্য সম্রাজ্ঞী" ও নরেশচন্দ্রকে দ্রুত অতিক্রম করেন। কল্লোল-যুগের অভ্যুদয়ের পরও তাঁর প্রভাব হ্রাস পায় নি। তিনটিমাত্র উপন্যাস রচনার পর সহসা লেখা ছেড়ে দেওয়ায় তিনি নিজেই নিজের খ্যাতি নাশের অন্যতম কারণ হয়ে পড়েন। বিভূতিভূষণও শৈলজানন্দের আবির্ভাবের পর এবং বিশেষভাবে ১৯৩০ সালের পর কথাসাহিত্যে বস্তু পরতন্ত্রতার বৃদ্ধির ফলে ক্রমশ মণীন্দ্রলাল অন্তরালে সরে যান। শৈলজানন্দ প্রভৃতির নিয়ে-আসা প্রখর বাস্তবতা তাঁর অপসারণের কারণ ততটা নয়, যতটা তাঁর নিজের অনীহা।

রমলা, জীবনায়ন ও সহযাত্রিণী উপন্যাস তিনটি রচনার পর মণীন্দ্রলাল দীর্ঘ বিরতি দিয়ে "এষণা" রচনা করেন। "স্বপ্ন" তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস। রোমান্টিকতার পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর চেয়ে বেশি রোমান্টিক লেখক কল্পনা করা কঠিন। উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করলে বিভূতিভূষণের পরই তাঁর স্থান নির্দেশ করলে অসঙ্গত হবে না। উপন্যাস রচনায় না হলেও রোমান্টিক ছোট গল্প রচনায় হেমেন্দ্রলাল তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। উপন্যাসে মায়াময় স্বপ্নলোক ও সৌন্দর্যস্বপ্ন রচনায় মণীন্দ্রলাল জাদুকরের মত নিপুণ। বাস্তববাদের প্রবল প্রতিবাদ তাঁর চেতনায় ও রচনার ছত্রে ছত্রে। রস ও মাধুর্যের বন্যা বয়ে গেছে তাঁর প্রত্যেক রচনায়। তিনি অল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি রচনা রসের বিচারে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে যে-কথা এখনকার আর একজন কথাসাহিত্যিকের সম্বন্ধেও বলার উপায় নেই।

মণীন্দ্রলালের চরিত্রগুলি ঠিক পদ্মমৃণালভোজী নয়; তারা ক্রমশ জীবনের চূর্ণ তরঙ্গদোদুল স্বপ্নবিলাস থেকে গভীর অনুভবলোকে পাড়ি জমাতে চেয়েছে। সহযাত্রিণীতে এই লক্ষণ প্রবল এবং এষণায় প্রবলতর। এষণার একটি চরিত্রকে দিলীপকুমারের প্রতিরূপ মনে করলে ভুল হবে না।

গোকুলবাবুর পথিক লক্ষণীয় উপন্যাস; তাঁর ছোট গল্পগুলিও প্রথমশ্রেণীর। সুধীরকুমারের "আবছায়া" উপন্যাসটি (১৯৩৪) বাংলা কথাসাহিত্যে সম্ভবত প্রথম প্রেততাত্ত্বিক উপন্যাস। তাঁর লেখা শৃঙ্খল বা এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা উন্নততর রচনা। এই উপন্যাসটির ভাষায় মণীন্দ্রলালের রমলা-র সামান্য প্রভাব থাকলেও চরিত্র-চিত্রণে সুধীরবাবুর স্বকীয়তা সর্বথা স্বীকার্য। অজয়, সুভদ্র ও বিমান যুবকত্রয় সমকালীন সমাজের নিখুঁত প্রতিনিধি। রাহু সর্দারের বালক-চরিত্র আর মন্দিরার শিশুমনস্তত্ত্ব লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তির প্রমাণ। বীণা চরিত্রটি সুসঙ্গত ও স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত। তার বৈধব্যের সংস্কার কাটিয়ে উঠে অজয়ের প্রেমে-পড়া অপূর্ব ক্রমবিবর্তনের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। ঐন্দ্রিলা চরিত্রটি কতকটা অস্বাভাবিক ও অপরিণত, তার দ্বারা লেখক কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন, ঠিক বোঝা যায় না। শৃঙ্খল উপন্যাসের যে সংস্কার ক'রে লেখক তাকে এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গায় দাঁড় করিয়েছেন, তা না করলেই ভাল হত। তাতে অজয় চরিত্রের আকর্ষণীশক্তি হ্রাস পেয়েছে।

অনেক সময় দেখা যায় কথাসাহিত্যে সংস্কারের দ্বারা লেখক পরবর্তী সংস্করণগুলিতে নিজের রচনার ভোল বদলে ফেলেছেন। পুরনো উপন্যাসের নাম বদলে তাকে নতুন নামে নতুন বই ব'লে চালানোও খুব দেখা যাচ্ছে। আগে অবশ্য উপন্যাসের নাম বড়-একটা বদলাত না;

কিন্তু পাঠান্তর ঘটত প্রায়ই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আমল থেকে আজ পর্যন্ত এ কাজ বার বার করা হয়েছে। প্রবন্ধবর্গীয় রচনায় তথ্য ও উপপত্তিসমূহ নির্ভুল, নিখুঁত ও আধুনিকতম করার অপরিহার্য গরজে এ-ধরণের উৎসাহ সমর্থনীয় হলেও কথাসাহিত্যে এর প্রতিক্রিয়া কখনও ভাল হতে দেখা যায় না। লেখা যতদিন প্রকাশিত হয় নি, ততদিন তার হাজার ঘষামাজা চলুক; কিন্তু একবার গল্প-উপন্যাস নাটকের রসরূপ লেখকের মনে ও কলমে গড়ে ওঠার ও তা মুদ্রিত হবার পর সে-রূপে বারবার হস্তাবলেপ না হতে দেওয়াই পরিণত মানসের লক্ষণ। পাঠকের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও রসবোধের দিক থেকেও প্রবীণ লেখকের একই উপন্যাসের ঘন ঘন পরিবর্তন না হওয়া আকাঙ্ক্ষিত।

ভেবে দেখলে দেখা যাবেই যে, মানুষের মন নিয়ত চঞ্চল; কোন পরিবর্তনই তার কাছে স্থায়ী ভাবে কাম্য বিবেচিত হতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রতি সংস্করণে সামান্য পাঠান্তরের কথা বাদ দিয়ে গুরুতর পরিবর্তনের নীতি স্বীকার ক'রে নিলে রচনার স্থায়ী রসরূপ গঠন করা অসম্ভব মনে হবে। এর দ্বারা সাহিত্যিকের অস্থির-মতিত্ব ও চিত্তদৌবল্য সূচিত হয়।

যে রূপতৃষ্ণাতুর কামান্ধ যুবক তার বিবাহিতা স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে পরিত্যাগ করে রূপসী বিধবা প্রণয়িনীকে নিয়ে নিছক কামোত্তেজনা চরিতার্থ করতে চলে যেতে পারে এবং যৌন ঈর্ষ্যাবশত মুহূর্তের উত্তেজনায় সেই প্রণয়িনীকে হত্যা করতে পারে, সে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আর কোন সম্ভাবনা নেই দেখে স্ত্রীর মৃত্যুর পর আত্মহত্যা করবে, ঘটনার নিজস্ব গতি অনুযায়ী এটাই তো স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনও সেই কথাই বলে। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য জীবনবোধ আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাঁর উপন্যাসে প্রথমে তাই দেখিয়েছিলেন। শিল্পীজনোচিত সুবিবেচনার কাজ হয়েছিল নিঃসন্দেহ। ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ পরিত্যাগ করে ভারতীয় জীবনবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে কতকটা সংস্কারমোহের বশবর্তী হয়ে তিনিও গোবিন্দ-লালকে "ভ্রমরাধিক ভ্রমর" পাইয়ে তবে ছাড়লেন। কিন্তু মূল উপন্যাস-কাহিনী বা নামকরণের পরিবর্তন তিনি করেন নি।

গুরুতর পরিবর্তনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে সাম্প্রতিক কালেই। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাড়া উপন্যাসের সংস্কার করেছেন মাত্র এই সত্যটি গোপন করতে যে, একদা তাঁর উপন্যাসেও সেই শরৎচন্দ্রের "দেবদাস"-এর ছায়া পড়েছিল যাঁর প্রভাব তিনি আন্তরিকভাবে অপছন্দ করেন। সুধীরবাবু অজয়-চরিত্রের শারীরিক দুর্বলতা-ঘটিত মানসিক বৈকল্য গোপনের চেষ্টা না করলেই ভালো হত এই জন্যে যে, ঐ অংশটুকুর সাহায্যে অজয়ের স্পর্শকাতর মনের অসহায়তা অতি বাস্তবভাবে ফুটেছিল, যা তার চরিত্র বুঝবার পক্ষে পাঠকের সহায়ক হত। মনীন্দ্রলাল তাঁর জীবনায়ন উপন্যাসে পরাজিত অপমানাহত নায়কের চিত্তগ্লানি সংস্কার করে তাতে শান্তিরসের স্নিগ্ধ প্রলেপ বিলেপন করেছেন। তাতে অরুণ চরিত্রের বয়ঃসন্ধিকালীন অভিমানাহত চিত্তের পূর্ণ রূপ ক্ষুণ্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দিলীপকুমার সম্প্রতি তাঁর দোলা উপন্যাসের ৪০০ পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে, তরঙ্গ রোধিবে কে? উপন্যাসের আমূল সংস্কার করে এবং মনের পরশ, দুধারা ও বহুবল্লভ উপন্যাসগুলির নাম ও অভ্যন্তরভাগ একেবারে বদলে দিয়ে মূল রচনাগুলিকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।

দুএকটি ছোটখাট ভুল ছাড়া এ রকম আমূল সংস্কার বা বড় পরিবর্তন কখনও সুফলপ্রসূ হতে দেখা যায় নি। অন্নদাশঙ্কর "যার যেথা দেশ"-এ পণ্ডিচেরি আশ্রমের উল্লেখ বাদ দিয়ে ভালোই করেছেন; কারণ, শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস সাধনার আর সে-গুরুত্ব জগদ্বাসীর কাছে নেই যা ১৯২৬-৪০ সালে ছিল বলে মনে হত। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'স্বয়ংসিদ্ধা" থেকে "yes, yes, mad as a March-hare" এই ভুল ও অবান্তর সেক্সপিয়ারীয় উদ্ধৃতিটি বাদ দিয়েও সুবিবে-চনার পরিচয় দেন। "নীলকণ্ঠ" উপন্যাস থেকে নারী-ধর্ষণের দৃশ্যটি বাদ দিয়ে তারাশঙ্করও সুরুচির পরিচয় দেন। কিন্তু এর বেশি ব্যাপক পরিবর্তন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭—) উপন্যাসজগতে তাঁর অনন্যসাধারণতার জন্যে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যে রোমান্টিকতা বিভূতিভূষণ ও মণীন্দ্রলালে শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল এবং ক্রমশ আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় ভাব-গভীরতার দিকে মোড় ফিরছিল, তা দিলীপকুমারের মধ্যে এসে বুদ্ধিপ্রবণ রোমান্সের সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত অলৌকিক অঘটনের বর্ণনায় পর্যবসিত হল। বাংলা রোমান্টিক উপন্যাস বঙ্কিমের হাতে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভের পর বিভূতিভূষণ ও মণীন্দ্রলালে পূর্ণ-বিকাশ অর্জন করে। দিলীপকুমারও পরিপূর্ণভাবে

রোমান্টিক ঔপন্যাসিক; কিন্তু তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি বুদ্ধিপ্রবণ রোমান্স এবং শেষ দিকের উপন্যাসগুলি অঘটনের অধ্যাত্মমহিমায় বর্ণনামুখর। তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ রোমান্সগুলিতে বিস্ময় ও সৌন্দর্যবোধের প্রধান অবলম্বন বুদ্ধিপ্রাণ আলোচনা, যাতে ঘটনা ও চরিত্র-চিত্রণের চেয়ে মনোবিশ্লেষণ ও জীবনজিজ্ঞাসার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তাতে যে ইনটেলেকচুয়াল রোমান্স বা বুদ্ধিপ্রাণ রোমান্টিক চেতনার উদ্ভব হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। কিন্তু পরে "অঘটন আজো ঘটে" উপন্যাস থেকে তিনি অধ্যাত্মবাদ ও অলৌকিক অঘটনের ওপর বেশি জোর দেন। শেষোক্ত পর্যায়ের উপন্যাসগুলি থেকে বুদ্ধিপ্রবণতা অন্তর্হিত হলেও তর্ক, আলোচনা ও বিশ্লেষণ আগের মতোই অবস্থান করছে। সেগুলির ভিত্তি অধ্যাত্মবাদ ও দার্শনিকতার ওপর স্থাপিত, বিশেষত ভক্তিধর্ম, শাস্ত্র ও আপ্তবাক্যে বিশ্বাস ঐ সব তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার প্রাণবস্তু। স্বভাবতই রোমান্টিকতা শীর্ষবিন্দু থেকে ক্রমশ নেমে এসেছে বিশেষত তরঙ্গ রোধিবে কে ?-র পর থেকে। তার ক্ষতিপূরণ মিলবে আধ্যাত্মিক মতবাদে ও অঘটনের বর্ণনায়, যদি বিশ্বাস থাকে। যদি না থাকে, তা হলে উপায় নেই।

দিলীপকুমার অধুনা বুদ্ধি-বিরাগী হলেও তাঁকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিপ্রবণ রোমান্স লেখক বলা চলে। পরে অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪—) বুদ্ধিপ্রবণ লেখক হিসেবে আরও বেশি খ্যাতি লাভ করেন বটে, কিন্তু Intellectual উপন্যাসের প্রথম প্রবর্তক দিলীপকুমার। ইউরোপকে ঘটনাস্থলরূপে গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক উপন্যাসও প্রথম রচনা করেন দিলীপকুমার, যদিও গল্পসাহিত্যে এ-ব্যাপারে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) আরও আগে ইউরোপকে আমাদের ঘরে পৌঁছে দেন। আন্তর্জাতিক সামাজিক সম্বন্ধ নিয়ে ছোট গল্প প্রভাতবাবু ছাড়া সরোজ নাথ ঘোষ ও আরও অনেকে লিখলেও এ-ব্যাপারে উপন্যাসের ক্ষেত্রে দিলীপকুমারই অগ্রণী। Continental Novel বা ইউরোপের মহাদেশীয় উপন্যাসগুলির সমকক্ষতা দাবি করতে পারে তাঁর মনের পরশ, দুধারা, বহুবল্লভ, রঙের পরশ, দোলা দুই খণ্ড এবং তরঙ্গ রোধিবে কে দুই খণ্ড—এই ছ'টি উপন্যাস। জীবনায়ন উপন্যাসে মণীন্দ্রলাল দেখিয়েছেন বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর তরুণের চিত্তব্যাকুলতা, মনের পরশে দিলীপকুমার দেখিয়েছেন তার পরের বয়সে এসে তরুণ যুবকের আবেগ, উৎকণ্ঠা ও প্রণয়ভাবনা। জীবনায়নের অরুণের স্বাভাবিক পরিণতি মনের পরশের পল্লবে। তরঙ্গ রোধিবে কে দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস; এতে উপন্যাসের চারটি প্রধান অঙ্গ ঘটনাবর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ, মনোবিশ্লেষণ ও জীবনদর্শন এত সুসমঞ্জসভাবে সমন্বিত হয়েছে যে, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। অবশ্য আমরা প্রথম সংস্করণের কথাই বলছি।

বিশ্বসংস্কৃতির এমন প্রতিফলন আর কারও রচনায় দেখা যায় না। তাঁর রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রজ্ঞা ও বিভূতিভূষণের মানবিক উপাদান না থাকলেও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের দিক থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। রোমান্স লেখকদের মধ্যে এখন যে তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী, এ ব্যাপারে তর্কের অবকাশ নেই।

অপুত্রক

শৈবাল চক্রবর্তী

ছোট ছেলেটার সঙ্গে খেলা করছিলুম।

একটু আগে বড় ছেলে সিতু এসে বলেছিল, বাবা অংকটা একটু দেখিয়ে দাওনা।'

চোখে চশমা এঁটে পাটিগণিত খুলে যখন তাকে সিঁড়ি ভাঙার অংকটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম তখন ছোট পুত্তুর পিঠে সওয়ার হয়ে বলছিল, 'ও বাবা খেল না, খেল না—

বলছিলুম, দাঁড়া দাদার অংকটা আগে করে দি।

মেজ পড়া থামিয়ে মুখ তুলে বলল, বাবা আজ আমি তোমার সঙ্গে চান করবো—হ্যাঁ' ?

এই কথা শুনে সাঁ করে আমার চোখটা কেন যেন গিয়ে পড়ল দেওয়াল-ঘড়ির দিকে। যেন ঠাস করে চড় মারল কে গালে। চুপি চুপি ছোট কাঁটাটা যে ন'টার ঘর ছোঁবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তা জানতে পারিনি। শীতকালের বেলা দেখতে দেখতে গড়িয়ে যায়। সব্বোনাশ।

কোথায় রইল সিঁড়িভাঙা, চুলোয় গেল ঘোড়া ঘোড়া খেলা। আমি তখন নিজেই পক্ষীরাজ হয়ে উঠলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে শুনতে পেলুম সুচন্দ্রার তীক্ষ্ণ স্বর, কটা বাজে খেয়াল আছে ?'

বিয়ের আগে ও রাগপ্রধান শিখত। কানের মধ্যে দিয়ে স্বর মরমে প্রবেশ করলেই সে কথা আমার মনে পড়ে যায়। সুচন্দ্রা সময়ের হিসেব করে রোদ্দুর দেখে। জানলা দিয়ে ঘরের কোথায় কখন রোদ এসে পড়ল তা দেখে বুঝতে পারে বেলা কতটা হয়েছে। রবিবারে ও রোদের দিকে তাকায় না।

তোমার যেন কি কি আনতে হবে বলেছিলে ?

পাঞ্জাবীর ডবল ঘরে প্লাষ্টিকের বোতাম আঁটতে আঁটতে মা'র সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলুম। চোখে চশমা এঁটে মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দৈনিক বসুমতী পড়ছিলেন। বিধবা হবার পর মার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা হয়েছে। ওই জন্যেই কি অতটা দীনহীন ভাব মুখে ?

কাগজ থেকে চোখ তুলে ধীরে-সুস্থে চশমা খুলতে খুলতে মা বললেন, ওই একটু চ্যবন প্রাশ···কাশিটা বেড়েছে আর ওই কি একটা নিমক আছে যেন সেবার অবনী এনে দিয়েছিল। হজমের গোলমালে ভারী কাজ দেয়। সেই আনিস তো এক শিশি।

এরপর হারিয়ে গেলাম বাসের ভীড়ে। একাকার হয়ে গেলাম জীবনের জঞ্জালে। সকালের রোদ, তিনটে ছেলের মুখ সব ভুলে গিয়ে বাসের হাণ্ডেলটা হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

ন্যাশনাল ষ্টীল এণ্ড আয়রন কোম্পানীর ষ্টেটমেণ্টটা তো আপনিই চেক করেছিলেন ? দেশলাইয়ের কাঠি দাঁতের গহ্বরে ঢোকাতে ঢোকাতে বড়বাবু রামনিধিবাবু প্রশ্ন করলেন। পান খাওয়ার বড়বাবুর বিখ্যাত নেশা ! সারাটা দিন তিনি গাল নাচিয়ে নাচিয়ে পান চিবোন। কেরানীরা হাতে কলম পেষে, বড়বাবু দাঁতে পেষেন পান।

কিন্তু যখন কাঠি দিয়ে তিনি সেই পান-খাওয়া দাঁত খুঁটতে থাকেন তখন বুঝতে হবে হয় একটা অনর্থ ঘটে গেছে কিম্বা নিকট ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে একটা সাংঘাতিক বিস্ফোরণ। বড় হল-ঘরটার কোনে ঝুলতে থাকে যেন একটা আষাঢ়ের মেঘ।

ভুল ! আমি চমকে উঠেছিলাম। তিনদিন ধরে ওই ষ্টেটমেণ্টটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আমি ওটা চেক করেছি। ওতে ভুল ! অসম্ভব ! হতেই পারে না !

ভালমানুষীর মাখন-মাখানো বড় বাবুর মুখে। শিবতুল্য, দেবতুল্য কি সব যেন কথা আছে, এখন বড়-বাবুকে দেখলে আমার সেই বিশেষণগুলো মনে পড়ে যায়।

বিলের সঙ্গে ষ্টেটমেণ্ট ফেরৎ দিয়েছে আমীনচাঁদ কোম্পানী। ফাইলটা ছোট সাহেবের কাছে। সেখানে গিয়েই কৈফিয়ৎ দিন।

ছোট সাহেব মানে সুদর্শন মিত্র। আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। বাবা ছিলেন হাইকোর্টের এটর্নী। কলেজে আসত না প্রায়ই। বলত এ সব আমার ভাল লাগে না। আমি ভাই বড় রকমের একটা কিছু করতে চাই।

তাই করল সুদর্শন। আমাদের অফিসের ছোট সাহেব হয়ে এল।

ফাইনাল পরীক্ষার সময় ওর অসুখ শুনলাম। শুনলাম, পরীক্ষা দেবে না। শেষ পর্য্যন্ত দিল সিকবেডে। দেখলাম ওর বাবা এলেন, সঙ্গে বড় ডাক্তার। আলাদা ঘরে বসবার ব্যবস্থা হল। পাশ করে বেরিয়ে গেল সুদর্শন।

তারপরে কেমন করে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়িয়ে ও এই তক্তে উঠে এল। সুদর্শন বরাবরই স্মার্ট আর ধোপদুরস্ত। হয়ত এটা ওর ফিটফাট হয়ে থাকার পুরস্কার। একদিন শুনলাম নতুন সাহেব আসছে। মিত্র সাহেব। কার্যভার বুঝে নেওয়ার পর আমরা দল বেঁধে ওকে স্বাগত জানাতে গেলাম—দেখি চেয়ারে বসে আছে সুদর্শন।

চেহারার ওপর একটা গাম্ভীর্যের মেঘ ছায়া ফেলেছে। মাথার সামনে কপালটা আরও চওড়া হয়ে টাকে পরিণত হয়েছে। একটু মোটা হয়েছে, গাল দুটো নীল হয়ে গেছে দাড়ি কামিয়ে কামিয়ে। কলেজে পড়ার সময়েই সুদর্শন রোজ দাড়ি কামাত।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল ও।

পরে বেয়ারাকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল। বলেছিল 'তোকে এখানে দেখব আশা করিনি।'

ঢোঁক গিলে বলেছিলাম, তুই এখানে কোত্থেকে?

বিলিতি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুদর্শন বলেছিল, আর বলিস নি ভাই, আমি সাতঘাটের জল খাওয়া লোক। বিলেতে গিয়ে বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট পড়বো সব ঠিক, বাবা বাদ সাধলেন। তার আগে ইউরোপে চক্কর মেরেছি দু'বছর। বাবার হুকুমে ফিরে আসতে হল। বুড়ো-বয়সে আমাকে চোখের সামনে দেখে তবে তিনি মরবেন।

একটু থেমে বলেছিল, না হলে এসব কি আমার পোষায়? দুটি বছর কন্টিনেণ্ট ঘুরে এসে এখন ম্যাঙ্গো লেনের এই নড়বড়ে অফিস সামলানো।

আর একদিন বলেছিল, ছাখ বন্ধুত্ব এক জায়গায় আর অফিস এক জায়গায়। এ দুটোকে মিলিয়ে ফেলিসনি কেমন? চা খাবি নাকি?

আমি দেখছিলুম সুদর্শন কি সুন্দর গম্ভীর হতে শিখেছে। এই হাসল ও কোন কথায়, পরমুহূর্তে যখন সামনের ইমিডিয়েট মার্কা ফাইলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন ওর অন্য চেহারা। ওর মেমসাহেব-ষ্টেনোকে ও যখন রাজা-বাদশার মত আরামচেয়ারে হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক চিন্তার ভঙ্গীতে 'ডিকটেশন' দেয়, তখন আমার বলতে ইচ্ছে করে তুমি সার্থক সুদর্শন। এ চেয়ার তোমারই প্রাপ্য।

আজ দুরু দুরু বুকে ওর ঘরে ঢুকতেই ও সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, বোস। কাজকর্ম মাথা ঠাণ্ডা করে করছিস নাকি?

ঠিক ভৎর্সনা নয় বরং স্নেহের ভাবটাই বেশী। যেন আমার বড়দাদা কথা বলছে। চুপ করে ছিলুম আমি। বলতে চাইছিলুম আমি দুঃখিত সুদর্শন, তোমাকে এ সুযোগ দেওয়া আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই এ কথাগুলো মুখ ফুটে বলতে পারছিলুম না। বাইরে অনেক কান সজাগ। আমি যে ছোট সাহেবের কাঁচাবয়সের বন্ধু এ কথা এখন সব টেবিলের আলোচনার বস্তু।

তোরা নাকি ইউনিয়ন নিয়ে খুব মেতেছিস? চুরুটের গোড়াটায় আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ও। আমার দিকে তাকিয়ে একমুখ হাসল। সেই হাসি। বড় ভাইয়ের।

না খুব একটা কিছু নয়, আমি টেবিলের মসৃণতা পরখ করতে করতে বললুম।

'না ভাল। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া খুব ভাল কথা। ওদেশের

সর্বত্র, ফ্যাক্টরীতে আপিসে, জবরদস্ত ইউনিয়ন। শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি এইসব ইউনিয়ন খুব যত্নবান। কিন্তু শুধু দাবী আদায় করা ছাড়া এদের আর একটা কি লক্ষ্য থাকে জানিস?

সুদর্শন থামল। উত্তরটা আমার জানা ছিল না। আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এ্যাশট্রেতে চুরুট ঠুকে সুদর্শন বলল, কাজের এফিশিয়েন্সী। প্রত্যেকটি মেম্বারকে দক্ষ ও পরিশ্রমী করে তোলা ওদের ইউনিয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। তোরা কি এটাকে তোদের প্রোগ্রামের মধ্যে রেখেছিস?

আমি মাথা নীচু করলাম। একবার ক্যাবলার মত হাসলাম। ইউনিয়নের হোমরা-চোমরা না হলেও আমি ছিলাম এর একজন বিশ্বস্ত কর্মী।

খালি দাবী মানতে হবে বললেই হয় না। তোর ছেলে তোর কাছ থেকে এটা-ওটা অনেক জিনিষ চায়। দিতে তোর মন চায়। কিন্তু যদি সে ছেলে বাধ্য হয়, মন দিয়ে পড়াশুনো করে তবে তাকে তুই যেমন খুশীমনে খেলনা, খাবার কিনে দিস, অবাধ্য অলস হলে কি আর সেই খুশী নিয়ে সেগুলো দিতে পারতিস? ওয়ার্কার্স যদি ওবিডিয়েণ্ট হয় যদি তারা ম্যানেজমেণ্টকে দুপয়সা ফয়দা এনে দেয় তাহলে তার আবদার সহ্য করা যায়। আর যদি সব কুঁড়ের বাদশারা জোট পাকিয়ে হ্যান চাই, ত্যান চাই বলে বায়না করে তবে মালিকদের ইচ্ছে করে পায়ের জুতো খুলে—।

হটাৎ থেমে যায় সুদর্শন। পকেট থেকে রুমাল বার করে লাল মুখটা মোছে। তারপর শরীরটাকে পেছনে এলিয়ে দিয়ে অন্যরকম গলায় বলল, তোর ঘরসংসারের খবর বল। বিয়ে নিশ্চয়ই করেছিস? বাচ্চাকাচ্চা ক'টি?

'তোর ক'টি?' সুদর্শনের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েই আমি দুঃসাহসের চূড়োয় উঠেছিলাম।

ও সজোরে এপাশে ওপাশে মাথা নাড়তে লাগল। এমন সময় ওর টেবিলের ওপর টেলিফোন বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে ওকে টেলিফোন তুলে নিতে দেখে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সুদর্শনের তাহলে ছেলেপুলে হয় নি। বিয়ে তো হয়েছে অনেকদিন। ওদের মত বনেদী পরিবারে বিয়েটা হয় বাপের পুঁজির ওপর চোখ রেখে। একমাত্র ছেলের বৌয়ের মুখ দেখবেন বলে ওর বাবা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের সব ব্যাপারেও সুদর্শন তার বাবার বাধ্য ছেলের মত কাজ করেছিল।

সুদর্শন নিঃসন্তান। হয়ত এই নিয়ে ওর মনে কোন চাপা দুঃখ আছে। এতদিনে ওর ছেলেপুলে হয়নি কেন ইত্যাদি প্রশ্নে বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে নিজের সীটে ফিরে এলুম।

ছেলেপুলে থাকার জ্বালা যে কি তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি। আজ এর অসুখ; কাল আর একটার। সিতুর স্কুলের মাইনে বাকি তিনমাসের, নিতুর জুতো নেই। চলতে গিয়ে পায়ে পাথর ফোটে। কিন্তু কিছু করতে পারছি না।

সুচন্দ্রা বলে, পুরণো সোয়েটারগুলো আর আমি পরাতে পারব না বাপু। ওগুলো পরলে ওদের মনে হয় যেন ছোটলোকের ছেলে। এবার যে করে হোক ওদের গরম জামা কিনে দিও।

আমি চুপ করে ছিলাম। মুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধূম্রকুণ্ডলী'র দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এত বলে বলেও সুচন্দ্রা আমার এই অভ্যেস ছাড়াতে পারে নি।

বলেছিল, না হলে উল কিনে দাও। ঘরে বসে বসে বুনবো'খন।

খানিক পরে খেলার মাঠ থেকে ফিরে সিতু বলেছিল, 'বাবা কম্পাউণ্ডার কাকা তোমাকে দেখা করতে বলেছে। আমাদের অনেক টাকা বাকি পড়েছে না বাবা?'

মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ওর দিকে ফিরে বললাম, তুই কি করে জানলি?

না হলে তো কম্পাউণ্ডার-কাকা দোকান যেতে বলে না। সিতু বলল, গালে মুড়ি পুরতে পুরতে, আর একবার যখন বলেছিল সেবার'ও তো অনেক টাকা বাকি পড়েছিল ডাক্তারবাবুর। তুমি গিয়ে দিয়ে এলে।

সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আরও দুটো টান দেওয়া যেত। কিন্তু মুখটা বিস্বাদ লাগছিল।

এসব সমস্যা সুদর্শনের নেই। ও নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব সমস্ত মন দিয়েছে অফিসের কাজে। কিন্তু তাতে কি ওর সন্তানহীনতার দুঃখ ঘুচেছে? বুকের মধ্যে যে একটা ফাঁক থেকে গেছে সেটুকু ভরাট করতে পেরেছে ও ও'র অফিসের পদমর্যাদা, চাপরাশী আর এয়ারকণ্ডিশাণ্ড ঘর দিয়ে?

নিজেকে হঠাৎ গর্বিত, দারিদ্র্যের এই ময়লা কাঁথা গায়ে দিয়ে অত্যন্ত সুখী বলে মনে হল। আমি এখুনি ডাকলে পিতু মোড়ের দোকান থেকে দেশলাই নিয়ে আসবে ছুটে, এক মিনিটের মধ্যে নিতু আনবে ও'র মা'র কাছ থেকে শুপরি, এক কাপ ধোঁয়া-ওড়া চা। চিতুকে কোলে বসিয়ে আদর করতে করতে আমি যখন সেই চায়ে চুমুক দেব তখন নিতু আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে মুখ নীচু করবে! বাবা'র এই সজীব ভাবটা দেখতে ওরা ভালবাসে। হাসলে নিতুর গালে টোল পড়ে। পাড়ার মেয়েরা ওর সঙ্গে বোম্বে চিত্রজগতের এক সুখ্যাতা অভিনেত্রীর মুখের মিল খুঁজে পায়।

আর এই আনন্দ সুদর্শন কোথায় পাবে? কত টাকা দিলে?

সুচন্দ্রা ঠাট্টা করে বলে, কি গো তোমার বন্ধু কি করল?

'আমার কি করল মানে?'

'মানে পোষ্ট বাড়িয়ে দিল না, ইনক্রিমেণ্ট না কি যেন তোমরা বল, তাই কিছু পাইয়ে দিক না।

'অত সোজা। অফিসটা কি মামার বাড়ী। গম্ভীর গলায় বলি।

সুচন্দ্রা আর কিছু বলে না। হাঁড়ি থেকে থালায় ভাত বেড়ে দেয়।

সুচন্দ্রা আগে আমাকে প্রায়ই জীবনে উন্নতি করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করত। জীবনে উন্নতি মানে চাকরিতে মাইনে বাড়া। তা হওয়া যে কত অসম্ভব, আমাদের যে বাঁধা গ্রেডের মধ্যে পা মেপে মেপে চলতে হয় আজীবন তা সুচন্দ্রাকে বোঝাতে আমি যাই নি। সুচন্দ্রা তা বুঝতে পারত না।

এখন আর সুচন্দ্রা আমাকে এই চাকরি ছেড়ে 'ভাল একটা কিছু' করবার জন্যে তাগিদ দেয় না। কথায় কথায় পর আত্মীয় এবং পরিচিতদের মধ্যে কারো ভাল ভাল কাজ করে বাড়ী, গাড়ী, রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করছে তার নজীর দেখায় না।

সুচন্দ্রা এখন আমাকে মেনে নিয়েছে। সংসারে সহজ হয়ে গিয়েছে সে। আমার সুখকে নিজের সুখ, আমার দারিদ্র্যকে নিজের অদৃষ্ট বলে ভাবতে শিখেছে।

মাথা নীচু করে ও থালার সামনে বাটি সাজিয়ে রাখে। আমি যেখানে থাচ্ছি তার দু' হাত দূরে খাটের ওপরে আমার তিন ছেলে পাশাপাশি শুয়ে। গায়ে ওদের মশারি চাপা দেওয়া। আমার খাওয়া হয়ে গেলে মস্তবড় মশারিটা টাঙ্গিয়ে তার তলায় পাঁচজনে শুয়ে ঘুমবো।

সুদর্শনবাবুকে একদিন খেতে বল না।

ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম আমি। সুচন্দ্রা যে একথা বলবে একদিন এ আমার জানা ছিল। ওর ধারণায় মানুষকে একদিন পাত পেড়ে খাওয়ানোই আদর-প্রীতি জানানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সেদিন ও বত্রিশ পদ রান্না করবে, রান্নাঘরে ঘেমে গলে গিয়ে। অতিথির সামনে একটি একটি করে ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়ে হেসে বলবে আজ বিশেষ কিছুই করতে পারলাম না।

'আজ অফিসের পর পালাস নি যেন।' সুদর্শন ডেকে বলল, আমার সঙ্গে যাবি।'

বুঝতেই পারছিলাম অফিসের কোন কাজে নয়। সুদর্শন আমায় একা পেতে চাইছে। ইউনিয়নের কোন ব্যাপারে কি? বুকটা দুরদুর করতে লাগল। একটা অস্বস্তিতে ছেয়ে গেল মন। বলবে, 'তুই ইউনিয়ন ছেড়ে দে। কিংবা তোদের পালের গোদা কে কে রে? ভয় নেই, তুই রিওয়ার্ড পাবি। কোম্পানী তোর গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেবে না। আমি তোর পাশে আছি।'

আর যদি নিঃসন্তান হৃদয়ের কোন কান্না শুনতে হয় আমাকে? যদি বলে জানিস অবিনাশ আমার রাতে ঘুম হয় না রে। কোন বাচ্চা কেঁদে উঠলে আমি চমকে উঠি। আর আমার স্ত্রী? সে তো মাসে চারটে

করে উপোস দেয়। কখন যে কোন বাবার থানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে তা আমি জানতেও পারি না।

মস্ত থামওয়ালা একটা বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে ও বলল, 'আয়'।

ওর ঠাকুর্দার আমলের বাড়ী। আগেকার দিনের জমিদার বাড়ীর মত একটার পর একটা মহল। গাড়ী থেকে নামতেই একজন বেয়ারা এসে ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিল। সিঁড়ি দিয়ে ওর পেছন পেছন উঠতে উঠতে চারদিকে চোখ ফেলতে লাগলুম। বাড়ীটার মধ্যে চলাফেরা করতে করতে মনে হল সুদর্শনরা যেন ঠিক সাধারণ লোক নয়। ওদের মধ্যে যে কিছু অসাধারণত্ব আছে তা এই পুরনো বাড়ীর নোনাধরা ইঁটগুলোর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম।

আমাকে দোতলার একটা ঘরে বসিয়ে সুদর্শন বেরিয়ে গেল। 'বোস তুই, আমি আসছি এখুনি।'

বেশ গদি-আঁটা পুরু সোফা। আরাম করে বসে আছি। সুদর্শন গেছে তো গেছেই। পাশের ঘর থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানীর আওয়াজ ভেসে আসছে। যন্ত্রণাকাতর কোন মানুষ জল চাইছে' নাকি এই প্রাচীন প্রাসাদের প্রেতাত্মা গুমরে গুমরে কাঁদছে!

থাকতে না পেরে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে উঁকি দিলাম। যা দেখলাম তাতে গা শিউরে উঠল। রোগশয্যা, না মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এক বৃদ্ধ, অস্থিচর্মসার দেহ থরথর করে কাঁপছে। শতচ্ছিন্ন বিছানায় অবহেলার মালিন্য। মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে কিন্তু তার একবর্ণ বোঝা আমার সাধ্য হল না।

ভাবছি কুঁজো থেকে একটু জল গড়িয়ে দেব, নাকি বাড়ীর ভেতর কাউকে ডাক দেব এমন সময় কোত্থেকে সুদর্শনই এসে হাজির হল। অফিসের পোষাক বদলে সে এখন পাঞ্জাবী আর ঢোলা পাজামা পরেছে। মুখচোখও চকচকে। বলল, সরি। আমার একটু দেরী হয়ে গেল। দেখ না কোন্ এক মহাত্মা এসে হাজির হয়েছে তার সামনে, দুজনকে হাতজোড় করে বসতে হল এতক্ষণ।

সুদর্শনকে দেখেই বৃদ্ধের কোটরগত ধূসর দুই চোখে যে জ্যোতি ফুটে উঠেছিল তা আমার নজর এড়াল না। ডান হাতটি তুলে বৃদ্ধ যেন কি বললেন। বোধহয় কাছে আসার ইঙ্গিত। আমার দিকে হেসে সুদর্শন বলল, আমার বাবা। এখন ওঁর সামনে বসে আমাকে জলখাবার খেতে হবে।'

ওর কথা শেষেই দেখলাম নীচের সেই চেহারাটি পর্দা সরিয়ে দু'রেকাব খাবার ও পরে দু' গেলাস জল এনে টেবিলের ওপর রাখল। চেয়ার টেনে নিয়ে সুদর্শন বলল, 'আয়।' বোস। অনেকক্ষণ তোকে বসিয়ে রেখেছি, তার সুদে আসলে উশুল করে নে। যা ভাল লাগবে চেয়ে নিবি! লজ্জা করবি নে।'

একটা হিংএর কচুরি মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে চিবোতে সুদর্শন বলল, বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ অসাড় ওঁর। ডান হাত আর পাটাই নাড়তে পারেন মাত্র। এই তুই এখন রয়েছিস নাহলে ওঁর বিছানায় গিয়ে বসতে হত ঝাড়া একটি ঘণ্টা। আচ্ছা, আমি ব্যস্ত মানুষ আমার কি এসব পোষায়? কি বলব, দুঃখের কথা ওঁর জন্যেই আমায় ইউরোপ ছেড়ে আসতে হল……কই তুই খাচ্ছিস না কেন?

আমি দেখেছিলাম সুদর্শনের বাবা'র চোখ কেমন ছেলের ওপর নিবদ্ধ ছিল। আস্তে আস্তে জলে ভরে আসছিল সে দু'টি চোখ। কখন যে সে জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়বে গাল বেয়ে ময়লা বিছানায় তাই ভাবছিলাম আমি।

সুদর্শন চিতুকে দত্তক নিতে চেয়েছিল; আমি হেসে উঠেছিলাম। হাসতে হাসতেই আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলাম। সুদর্শনের দিকে আর ফিরেও তাকাই নি।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

আট

কি ভীষণ ভয় যে সে পেয়েছিল, আর সেই ভয় থেকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যেও নিষ্কৃতি পাবার যে কি আরাম তা নির্ম্মলা ছাড়া আর ক'জন লোক বুঝবে? খুন ক'জন লোক করেছে?

হয়ত দম নেবার মত সময় কেবল সে পেয়েছে একটু, কিন্তু এও ত সে না পেতে পারত? এই সময়টিকে সে কাজে লাগাতে চায়। তার বেদনাতুর ক্লান্ত মনটাকে সে বিশ্রাম দিতে চায় একটু। তাই তার একমাত্র চেষ্টা এখন, যাদের মধ্যে রয়েছে তাদেরই একজন হয়ে তাদের সুখদুঃখের ভাগিদার হয়ে যাওয়া।

সে যেন সে নয়, গোত্র-পরিচয়হীন আর-একটা মানুষ, এই ভাবটা ক্রমশঃ তার মনকে জুড়ে বসছে। সম্ভবতঃ এ না হ'লে সে বাঁচতে পারত না।

বিকাশ বালিগঞ্জে মহানির্ব্বাণ মঠের কাছে ফ্ল্যাট নিয়ে রয়েছে, নির্ম্মলার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ভবানীপুরে পদ্মপুকুর অঞ্চলে। যে জমিদার-বাড়ীতে সে আশ্রয় পেয়েছে সেটা কাশীপুরের একটা পুরণো গলির মধ্যে। দেড় মানুষ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা দুর্গের মত এই বাড়ীটার থেকে সে এসে অবধি বেরোয়নি একদিনও। বেরোবার কোনো প্রয়োজন তার হয় না। বস্তুতঃ সুরবালার মহলের তিনচারটি ঘর, তিন তলার ছাতে চিলে কোঠার পাশের এক চিলতে জায়গা ও খিড়কির বাগানের এই দিক্‌টা, এই নিয়ে এখন তার পৃথিবী। কাজেই অজ্ঞাতবাসের সুবিধা যতটা তার দরকার তা সে এখানে পেয়েছে।

সব জড়িয়ে তার দিনগুলি যেমন নিশ্চিন্ত, মন্থর গতিতে এখন চলছে তাই চলতে পারত, যদি বিনোদ ফিরে এলে কি হবে, এই অনিশ্চয়তার ভয় একটা প্রেতের ছায়ামূর্ত্তির মত তার সঙ্গে সঙ্গে না ফিরত সারাক্ষণ।

সত্যিই ত? বিনোদ ফিরে এলে কি হবে তার? কি বলবে সে তখন? অনেক আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রেখেছিল বলবে, আমি মা বাপ মরা মেয়ে, অনেক দাগা সয়েও সংসার সংসারে টিকে ছিলাম এতদিন, কিন্তু ওরা জোর ক'রে আমাকে এক সেকেলে বুড়ো বর ধ'রে বিয়ে দিচ্ছিল ব'লে পালিয়ে এসেছি। আমাকে মেরে ফেললেও তাদের কাছে ফিরে আমি যাব না। তাই তারা যে কে তাও আমি বলব না। আমাকে রাখতে হয় রাখুন, না রাখেন ত ছুটি ক'রে দিন, আমি চ'লে যাচ্ছি। কিন্তু কথাটা কি তিনি বিশ্বাস করবেন?

আর বিনোদ যদি আটপাড়ার ঘটনার কথা শুনে থাকেন? ঘটনার পরদিন ভোরেই ত হোসেনপুরে এসেছিল সে? যদি দুয়ে দুয়ে চার ক'রে তাঁর সন্দেহ হয় যে, সে-ই নিরুপমা? তারপর তিনি যদি তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেন? দিতে ত পারেন? কি তাহলে করবে সে? আগে ভাগেই পালাবে কি?

বিনোদের ফিরবার সময় যত এগিয়ে আসছে, এ বাড়ী ছেড়ে পালাবার চিন্তাটাও ততই বেশী ক'রে পেয়ে বসছে নির্ম্মলাকে।

কিন্তু বিপদের একবারে মুখে প'ড়ে গিয়ে পালানো, আর বিপদের সম্ভাবনা দেখবামাত্র পালানো, এ দুটোর মধ্যে তফাৎ একটু ত থাকবেই? পালিয়ে যাব বললেই ত আর পালিয়ে যেতে পারে না মানুষে? কোথায় যাবে সে? কার কাছে যাবে? কে তাকে আশ্রয় দেবে? আশ্রয় দেবে ঠিক ক'রে যদি কেউ জানতে চায়,—চাওয়াটাই স্বাভাবিক—, সে কে, কাদের মেয়ে, আগে কোথায় কাজ করেছে, তা হ'লে?

তবু একদিন দুপুরে বাড়ীর প্রায় সকলেই যখন

খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে, চুপি চুপি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। চ'লে যাবে ব'লে নয়, যাওয়ার ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াতে পারে তাই একটু পরখ করে দেখবার জন্যে।

খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে নির্জ্জন গলিটা স্বচ্ছন্দেই পার হয়ে গেল সে। বড় রাস্তায় প'ড়ে খানিকদূর যাবার পর তার মনে হতে লাগল, পথচারীদের অনেকেই যেন কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকে দেখছে। মুখের খানিকটা আঁচল দিয়ে ঢেকে পথ চলতে লাগল সে, কিন্তু তাতে তাদের কৌতূহলের মাত্রাটা যেন আরো বেড়েই গেল। হয়ত মাইল-টাক এসেছিল এইভাবে, এমন সময় তেড়ে বৃষ্টি এল।

শ্রাবণের বর্ষণ শুরু হল যদি ত আর থামতে, চায় না। একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল নির্ম্মলা। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি রাস্তায় আছড়ে প'ড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছুটে আসছে জোরালো হাওয়ায় তাড়ায়। নির্ম্মলার জামা কাপড়ের একটা দিক্‌ চুপচুপে হয়ে ভিজে যেতে লাগল, কিন্তু ভিজতে ভাল লাগছে তার। বৃষ্টির ছাঁটগুলির একটা যেন আর একটাকে তাড়া করে আসছে। যেন লুটোপুটি করে খেলছে। নিজের দুঃখদুর্দ্দশা ভুলে গিয়ে নির্ম্মলা তন্ময় হয়ে দেখছে এই খেলা।

একটা কবিরাজী ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল সে। পিছন ফিরে তাকাল একবার। শিশি-বোতল ভরা পুরণো ময়লা কয়েকটি আলমারি, কাঁচের গায়ে সাত পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। একটি বয়স্ক ভদ্রলোক, হতে পারে তিনিই কবিরাজ, ভিতর থেকে বললেন, "বাইরা খারইয়া ভিজতে আছ ক্যান্, ঘরে আইসা বস "

নির্ম্মলা মাথা নেড়ে জানাল, ভিতরে সে যাবে না।

একটু পরে ভদ্রলোক আবার বললেন, "যাইবা কই ?"

নির্ম্মলা তাঁর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, "এমনি বেরিয়েছিলাম একটু।"

এরই মধ্যে ফুটপাথের ধারে ধারে রাস্তা ধোয়া জল জমা হয়েছে। ভদ্রলোক বললেন, "বাইস্যার দিন কেউ বাইরয় শুধাশুধি, ছাতি না লইয়া ? থাক কোথায় ?"

বোধহয় ইচ্ছে ছিল, পাড়ার মেয়ে যদি হয় ত ছাতা তাকে একটা ধার দেবেন, কিন্তু নির্ম্মলা তার সম্বন্ধে কোন মানুষের কৌতূহলকেই আর সহজ চোখে দেখতে পারে না, তাই তাঁর এই কথার জবাব দিল না।

ভদ্রলোক বললেন, "আমি বয়োবৃদ্ধ, তোমার পিতৃতুল্য ; একটা ভালা কথা জিগাইলাম আর তুমি রাও করলা না, থুম মাইরা রইলা ?"

একটা হাফ পার্টিশনের ওপাশ থেকে কে একজন ভীষণ বাজখাঁই গলায় বলল, "কি অইচে ত্রৈলোক্য মামা ? কার লগে কথা কইতে আছেন ?"

ত্রৈলোক্য বললেন, "আর কইয়েন না, গিরিজা-ভাইগ্‌না। এই আইজকাইলের মাইয়াগুলাইন—"

নির্ম্মলা আর দাঁড়াল না সেখানে, বৃষ্টি মাথায় করেই বাড়ীর দিকে ফিরে চলল।

নাঃ। সুবিধের হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। যেখানে আছে সেখানেই থেকে যাবার চেষ্টাটা ভাল করে করাই বোধহয় ভাল, তারপর যা থাকে অদৃষ্টে।

কিছুই হাতে না রেখে বিজিতেন্দ্রের সংসারে নিজেকে একেবারে অবলুপ্ত করে দিল সে। সুরবালা ও তাঁর ছেলেদুটির নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুতে তার সেবা-নিষ্ঠ নিপুণ হাতের স্পর্শ। তাঁদের সামান্যতম অভাবটিও তার দৃষ্টি এড়ায় না, দূর করবার জন্যে সে যথাসাধ্য করে।

আশ্বিনের শেষে, পুজোর মুখে মুখে তার সেবা-পরায়ণতার পুরস্কার স্বরূপ একজোড়া মকরমুখো ডায়মন-কাটা সোনার বালা পেল সে সুরবালার কাছ থেকে।

জগন্নাথ যখন নির্ম্মলার কাছে খবরটা শুনল, কিছু না বলে এক ঝটকায় সুবীরকে তুলে কাঁধে বসিয়ে নিল। তারপর অবশ্য উবু হয়ে বসতে হল তাকে, আর-এক কাঁধে প্রবীরকে চড়তে দেবার জন্যে।

এই পুরস্কারটি পাওয়া খুব প্রয়োজন ছিল নির্ম্মলার। বিনোদের কলকাতায় ফিরবার সময় হল। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত সাহস বেশ খানিকটা সে এখন মনের

মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে। এ সাহস তাকে জুগিয়েছেন সুরবালা, এই দুটি সোনার বালা তাকে দিয়ে।

তার নিজের চুড়িগুলি, বিছে হারটি আর কানের দুল জোড়া তালাবন্ধ করে রাখা আছে, জগন্নাথের তৈরি ধবধবে শাদা ছোট্ট সুন্দর আলমারিটাতে, ঝিদের মহলে তাকে যে ছোট ঘরটি দেওয়া হয়েছে সেই ঘরে। সোনার বালা জোড়াও সে তুলে রেখে দিল সেখানে।

বর্ষার পিছল পথে তখন শরৎ আসছে খুব সাবধানে পা টিপে টিপে। সেদিন সকালটায় মনে হচ্ছিল, বর্ষারই যেন একাধিপত্য। মেঘান্ধকার আকাশ। নির্ম্মলার ভাগ্যাকাশেও আজ একসঙ্গে দুটি অন্ধকার মেঘের সঞ্চার হয়েছে দুদিক্ থেকে। সকালের এক ট্রেনে বিনোদ ফিরেছেন কলকাতায় আর সেদিনই বিকেলে সুবীরের জন্মদিনের পার্টি, যে পার্টিতে উপস্থিত থাকতে চান বলে কিছু কিছু জরুরী কাজ ফেলে রেখেই বিনোদ চলে এসেছেন মফঃস্বল থেকে।

দুপুরের আগেই বেশ দমে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ কেটে গেল, কিন্তু নির্ম্মলার মনের আকাশ দুর্ভাবনার মেঘে ক্রমশঃ বেশী ক'রে অন্ধকার হয়ে আসছে।

বিনোদের সঙ্গে আজকেই হয়ত তাকে মোকাবিলা করতে হবে না। কারণ, সুবীরের জন্মদিনের পার্টি সংক্রান্ত নানা কাজ নিয়ে আজ তিনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত থাকবেন। সময় যদি বা পান, জায়গা পাবেন না নির্ম্মলাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার। এ কাজে সে কাজে আজ বাড়ীর সর্ব্বত্র সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আপাততঃ আজকের এই পার্টিটাকেই নির্ম্মলা খুব বেশী ভয় পাচ্ছে।

যদি তার আগেকার পরিচিত জগতের কেউ এসে হাজির হয় এ পার্টিতে? শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে তার এক দূর সম্পর্কের পিসীমা থাকেন, তাঁর নাম বিজনবাসিনী। নামটা একটু অসাধারণ বটে ত? নির্ম্মলার মনে হল, সুরবালার মুখে ঐ নামটা সকালে যেন সে শুনতে পেল একবার। কাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল তখন।

সুবীরের জন্মদিন খুব ঘটা করে হচ্ছে। সুরবালার মহল ও বিজিতেন্দ্রের মহলের মাঝখানকার এতবড় উঠানটা কারুকার্য্য করা একটিমাত্র চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে। চারদিকে কানাত পড়েছে। খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণের বহর দেখে নির্ম্মলা বুঝতে পারছে, লোক ডেকেছে এরা অগুনতি। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেবল বিজনবাসিনী কেন, বালিগঞ্জ ভবানীপুর থেকেও চেনাজানা কেউ এসে পড়তে পারে।

আজকের দিনটা যে ক'রেই হোক, তাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতেই হবে। তারপর কালকের কথা কাল।

তিনতলার ছাতে চিলেকোঠার পিছনের দেয়াল ও প্যারাপেটের মধ্যে দেড় হাত চওড়া যে এক চিলতে জায়গার ফাক পেলেই এসে সে লুকিয়ে ব'সে কাঁদে, আজ সুরবালাকে তাঁর দুপুরের খাবার খাইয়ে, তারপর তাঁর পিঠে অনেকক্ষণ ধ'রে হাত বুলিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে, নির্ম্মলা সেইখানটায় এসে বসল। ঠিক করল, অতিথিরা সকলে বিদায় না হওয়া পর্য্যন্ত এ জায়গাটা ছেড়ে নড়বে না।

অনেক জবাবদিহি আছে তারপর। কিন্তু তখনকার কথা তখন।

ঘণ্টাদুই বেশ নির্ব্বিবাদে কেটে যাবার পর হঠাৎ কোঁচানো ধুতি ও সোনালী রঙের মুগার পাঞ্জাবি পরা একটি ন'দশ বছরের ফুটফুটে সুন্দর ছেলে পিছন তাকাতে তাকাতে পা টিপে টিপে এসে ঢুকল সেখানে। নির্ম্মলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, "আমি লুকুচ্ছি এখানে। তুমি ওদের ব'লে দিও না ভাই।"

"না, না, বলব না," ব'লে নির্ম্মলা চ'লে এল জায়গাটা ছেড়ে।

সিঁড়ির মুখে জগন্নাথের সঙ্গে দেখা। সে বলল, "তুমি এইখানে ছিলে মাসী? আমি যে কোথায় না তোমাকে খুঁজেছি!"

"মা বুঝি আমাকে ডেকেছেন?"

"না, না। ভাবছিলুম, তুমি কোথায় গেলে?"

"আমার ভীষণ মাথা ধরেছে জগন্নাথ। চোখে

অন্ধকার দেখছি। আমার ছোট ঘরটায় গিয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে চাই চুপ ক'রে। আজ রাত্তিরে মায়ের জন্যে রান্নার পাট নেই, পার্টির জন্যে যে সব খাবার তৈরি হচ্ছে, তারই থেকে, তিনি যা খেতে পারেন, এমন কিছু কিছু খাবার আনিয়ে নিয়ে তিনি খাবেন। তুমি তবু মাঝে মাঝে গিয়ে একটু খবর নিও তাঁর।"

"তা আমি নেব, কিন্তু মাসী, তোমার শরীর খারাপ করেছে?"

সিঁড়ি নামতে নামতে নির্ম্মলা বলল, "খুব।"

জগন্নাথও নামছে তার পিছন পিছন। বলল, "মাসী।"

নির্ম্মলা নামতে নামতেই বলল, "কি?"

পিছন থেকে জগন্নাথ বলল, "ভেটকি মাছের ফ্রাইটা যা হয়েছে না মাসী! একটু চেখে দেখবে? যদি বল ত লুকিয়ে এনে দি দুখানা।"

"না," ব'লে নির্ম্মলা প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলে গেল ঝিদের মহলের দিকে।

দরজায় হুড়কোটা তুলে দিয়ে মেঝেতে একটি শতরঞ্চি বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ল। ভাবল, আজকের এই একটা ফাঁড়া বোধহয় তার কাটল।

ঝিদের মহলের খুব কাছেই তাঁবু খাটিয়ে রান্নার জায়গা করা হয়েছে। কত রকমের শব্দ আর গন্ধ যে ভেসে আসছে সেখান থেকে। বেগুন ভাজার শব্দ—ওটা ভুল হবার জো নেই, কথায় বলে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা। চিংড়ি মাছের কিছু একটা হচ্ছে, কাটলেট কিংবা মালাইকারী। এটা যে পায়েসের গন্ধ তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এই করে অনেকক্ষণ কাটল। হঠাৎ এক সময় একসঙ্গে অনেকগুলি শাঁখ বেজে উঠল। তারপর বিলিতি ব্যাণ্ডের বাজনা বাজতে লাগল গেটের কাছে।

ক্রমে এত বড় বাড়ীটা গম গম করতে লাগল বহুলোকের সমাগমে।

ঐটুকু ত একটা মেয়ে নির্ম্মলা। তার ইচ্ছে করে না কি, ঐ আনন্দোৎসবের উচ্ছলতায় নিজেও গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে?

কল্পনায় দেখতে পায় সে, তার সমবয়সী ও তার কাছাকাছি বয়সের একদল মেয়ে এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। কত রকমের সাজ তাদের, আর কত রকমের কত গল্প। তারা কে কি রকম দেখতে, কে কি রকম গয়না পরেছে, কার কি রকম শাড়ী জামা, সব যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে। এখন হয়ত তারা স্কুল বা কলেজের কোনো একটি নবাগতা শিক্ষয়িত্রী বা কম বয়সের প্রোফেসারকে নিয়ে গল্প করছে, কিংবা সিনেমার ছবি নিয়ে, কিংবা ক্রিকেট খেলোয়াড়-দের নিয়ে। তার মা বেঁচে থাকতে কতবার এই রকমের কত পার্টিতে সে গিয়েছে। একটা একটা করে সেগুলোর কথা মনে পড়তে লাগল তার। কাঁদল অনেকক্ষণ, তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

সুরবালার তত্ত্বাবধান করবার লোকে সেদিন বাড়ী ভরতি, তাই নির্ম্মলার অনুপস্থিতিতে তাঁর অসুবিধা কিছুই হল না।

পরের দিন সকালে নির্ম্মলা তাঁর ঘরে এলে তিনি কেবল বললেন, "বাড়ীতে এত কাজ জানতামই যে সারাক্ষণ তোমাকে পাব না, কিন্তু দুএকবার এসে একটু খোঁজ নিয়ে যেতে ত পারতে?"

এত সহজে নিষ্কৃতি পেয়ে নির্ম্মলার চোখে জল এসে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছে তখন যিনি দুতলায় উঠছিলেন তিনি নিশ্চয় মামাবাবু। কথা নেই বার্ত্তা নেই অন্দর মহলে ঢুকে একজন পুরুষ মানুষ সুরবালার ঘরের দিকে যাচ্ছে, বিনোদ ছাড়া আর কে হতে পারে সে? এক নজরে তার গোঁফজোড়াটা আর পুরু ঠোঁট দুটো কেবল দেখল নির্ম্মলা। বুকটা এত বেশী ঢিপঢিপ করতে লাগল তার যে, নীচে এসে অনেকক্ষণ কোনো কাজ সে করতে পারল না।

বিনোদের বছর চল্লিশ বয়স, দোহারা তৈলচিক্কণ দেহ। মুখে একটা গদগদ ভাব, চোখদুটি ভিজে ভিজে, যত্ন করে পাকানো গোঁফ, যত্ন করে টেরি-কাটা ঢেউ খেলানো লম্বা চুল। ঠোঁট দুটো এতই মোটা যে, দেখলে হঠাৎ মনে হয় বোলতায় হুল ফুটিয়েছে।

সুরবালার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "কাল মেয়েদের ব্যূহ ভেদ করে তোমার ঘরে ঢুকতে পারিনি, আজ তাই ভোরে উঠেই খবর নিতে এলাম। কেমন আছ তুমি?"

সুরবালা বললেন, "আছি যেমন থাকি। ভালটা আর কোন্‌খানে? এস, ভেতরে এস। তুমি ভাল আছ ত?"

এরপর দুজনে বসে অনেক কথা হল, অবশ্য তার বারো আনাই সুরবালার আধিব্যাধির কথা। এর মধ্যে কোনো এক সময় সুরবালা বললেন, "ভাগ্যিস ঐ মেয়েটা ছিল, নয়ত এবার কি যে দশা হত আমার।"

বিনোদ কথাবার্ত্তার গতিটাকে এইদিকেই চালিয়ে নিয়ে আসছিলেন, বললেন, "কোন্ মেয়েটা? এই একটু আগে যে সিঁড়ি দিয়ে নামল।"

"হ্যাঁ। ওই ত।"

"কে ও?"

"আঃ, ঐ যে এবার এল আমাদের সঙ্গে হোসেনপুর থেকে। তা মেয়েটি কিন্তু বেশ বিনুদা। একটু আলিস্যি নেই, যখনই ডাকো হাজির আছে, আর এত গুছিয়ে সব করে। এদিকে কথাবার্ত্তায় ধরণ-ধারণে ঠিক ভদ্রঘরের মেয়ের মত। বরং একটু বেশী লাজুক, পারতপক্ষে বেরুতে চায় না মানুষের সামনে। কোথায় পেলে তুমি একে?"

"কার কথা বলছ তাই যে বুঝতে পারছি না।"

"কি যে বল। হোসেনপুর ষ্টেশনে তুমি ওকে আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলে না?"

"তোমাকে ঠিকই বলছি সুরো, কোনো নতুন লোককে এবারে হোসেনপুরে তোমাদের সঙ্গে আমি গাড়ীতে তুলে দিইনি।"

সুরবালা একটু ভড়কে গেলেন, কিন্তু হাবভাবে সেটা না দেখিয়ে খুব স্বাভাবিক স্বরে বললেন, "ও কি তাহলে সব বানিয়ে বলেছে?"

"কি সে বলেছে তোমাকে?"

"নিজে সে আমাকে কিছু বলেনি, আমি অবশ্য জানতে চাইওনি। কিন্তু সদু পদ্ম এরা যে বলল, তুমি তাকে ওদিক্‌কারই কোথাও থেকে জুটিয়েছ? আমাদের সঙ্গেই ত এলও দেখলাম।"

"সদু পদ্মদের যদি সে বলে থাকে যে আমি তাকে জুটিয়ে এনে তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছি, তাহলে মিথ্যে কথা বলেছে। কোন্ চোর ছ্যাঁচড়ের পাল্লায় তুমি পড়েছ কে জানে?"

সুরবালা একটুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "হয়ত খুবই অভাবে পড়েছিল, তাই আর উপায় না দেখে ফাঁকি দিয়ে কাজে ঢুকেছে। কিন্তু কাজ করেই ত পয়সা নিচ্ছে, সেখানে ত আর ফাঁকি দিচ্ছে না?"

বিনোদ বললেন, "তা ত বুঝলাম, কিন্তু এত বড় যার বুকের পাটা, নিশ্চয় ধরা পড়বে জেনেও এরকমটা যে করতে পারে; তাকে বাড়ীতে রাখাটা কি খুব নিরাপদ্ হবে?"

সুরবালা বললেন, "কেন, কি করবে?"

বিনোদ বললেন, "অভাবের ত রকমফের আছে? আবার কোনোদিন খুব অভাবে পড়ে বড় রকমের অপকর্ম্মই যদি কিছু করে?"

সুরবালার মুখটা একটু কালো হ'ল। কপালটায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে বললেন, "কি করতে বল? ওকে ছাড়িয়ে দেব?"

বিনোদ বললেন, "তাই করাই ত উচিত! যাহোক, আপাততঃ ওকে একবার ডাকো ত, ওর মূর্ত্তিটা একটু দেখি।"

নির্ম্মলা তখন সুরবালারই কাছে আসছিল। ঘরের মধ্যে বিনোদকে দেখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল একটু।

সুরবালা তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব গলাটাকে কর্কশ করে বললেন, "ভিতরে এস।"

নির্ম্মলা বুঝতেই পারল তার ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে। সেটা জেনেই উপরে এসেছিল, ভাবতে ভাবতে আসছিল, কোন্ কথার কি উত্তর দেবে। ভিতরে ঢুকে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। বুকের ভিতর হাতুড়ি পেটা চলছে তার।

সুরবালা কর্কশ কণ্ঠেই বললেন, "কি করছিলে এতক্ষণ?" যেন বিনোদকে এখনই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই মেয়েটির সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দরদ তাঁর মনে নেই।

স্বাভাবিক নম্রকণ্ঠে নির্ম্মলা বলল, "আপনার জন্যে কমলালেবুর রস করছিলাম। এখন খাবেন মা?"

সুরবালা বললেন, "না। কে বলেছিল তোমাকে কমলালেবুর রস করতে? সবতাতে তোমার সর্দ্দারি। কেন আগে এসে জিজ্ঞেস করনি, তাহলে ত মোসাম্বির রস করতে বলতাম।"

"আচ্ছা, তাই করে আনি গে যাই," বলে নির্ম্মলা যাচ্ছিল, সুরবালা বললেন, "আমার পিঠের কাছে আরও দুটো বালিশ দিয়ে যাও, আমি একটু সোজা হয়ে বসি।"

আরও দুটো বালিশ নিয়ে সব কটাকে এক এক করে চাপড়ে ঝেড়ে সুরবালার পিঠের পিছনে সাজিয়ে তাঁকে সোজা করে বসিয়ে দিল নির্ম্মলা। তারপর চলে গেল ঘর ছেড়ে।

সে বেরিয়ে যেতেই সুরবালা বললেন, "কিরকম দেখলে?"

যেন একটা তন্ময়তার ঘোর কাটল বিনোদের। বললেন, "ও হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে বটে, এই মেয়েটিই। হ্যাঁ, এই মেয়েটিই ত। আমাদের কাঞ্জিপুরের কাছারিতে ওকে নিয়ে ওর মেসো না পিসে কে একজন এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। ওকে দেখবার কেউ নেই, ওর জন্যে কাজ চাই বলাতে আমি বলেছিলাম, আচ্ছা। ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত। ওকে কিন্তু আমি কাজে বাহাল করিনি, হোসেনপুরে ট্রেণে তুলে ত দিইনি।"

সুরবালা এক মুহূর্ত্ত ভুরুদুটোকে একটু কুঁচকে বিনোদের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, "তুমি বলেছিলে কাজ দেবে, সেইটেকেই ওরা কাজ দেওয়া বলে ধরে নিয়েছিল হয়ত।"

বিনোদ বললেন, "তা হতে পারে। যাক গে যাক, ওর কাজে তুমি খুশী ত? বেশ বেশ।"

নীচের যে ছোট ঘরটায় নির্ম্মলা সুরবালার জন্যে ষ্টোভে রান্না করে, তার দরজার সামনে নিজের ছায়া ফেলে এসে দাঁড়ালেন বিনোদ। নির্ম্মলার সামনে তখন একগোছা ঝকঝকে সবুজ তাজা পালং শাক, কিছু লালচে রঙের নতুন আলু, শাদাটে সবুজ ছোট ছোট দুটি বেগুন, পানসে রঙের ছোট এককালি কাঁচা কুমড়ো, মানকচুর শাদা একটি চাকা, ছোট একটি ফুলকপি, আর কিছু কড়াইশুঁটি। আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল, সচকিত হয়ে বিনোদের দিকে তাকাল মুখ তুলে।

সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ নামিয়ে নিল। তারই মধ্যে বিনোদ ভিজে ভিজে চোখের মিটমিটে দৃষ্টি দিয়ে তার দুটি কুণ্ঠিত চোখের ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি থেকে কি রস শুষে খেতে পেলেন তা তিনিই জানেন চাপা গলায় বললেন, "সুরোর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আমার লাইব্রেরী ঘরে একবার আসবে, বুঝেছ? খুব জরুরী কাজ। কিন্তু আসছ যে, সেটা আর কেউ যেন না জানতে পায় তা দেখো।"

বলে তিনি নিজের ছায়াটিকে পিছনে টেনে চ'লে গেলেন, সেখান থেকে। নির্ম্মলার মনে রেখে গেলেন, আর-একটা কদাকার ছায়া। যেটা কিছুতেই সরছে না।

নির্ম্মলার দেহে তখনো যৌবনের লক্ষণগুলি খুব পরিস্ফুট নয়, কিন্তু কথায় বলে, পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা। নাই বা হ'ল ষোল আনা।

আর বয়স ত তার বাড়বেই, কমবে না ত। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবার চেষ্টা বিনোদ না হয় করবেন না।

বিনোদের কথায় নির্ম্মলা এত ভয় পেল যে, সব কাজ ফেলে ছুটে গিয়ে সে সুরবালার বিছানার পাশে বসে রইল অনেকক্ষণ।

সুরবালা এবারেও ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন, বললেন, "কি হয়েছে?"

নির্ম্মলার কানে বাজছে, "আসছ যে সেটা আর কেউ যেন না জানতে পায়।" বলল, "কিছু না মা।"

এদিকে দুজোড়া, ওদিকে দুজোড়া থামওয়ালা ফটক। তা দিয়ে ঢুকে মোরমের রাস্তা। রাস্তার দুধারে দুসার বটল পাম, আর বিলাতী কেতায় সাজানো বাগান। তারপর প্রথমেই দুতলা সদর মহল, তার একতলার

মাঝখানটা ফাঁকা যার ভিতর দিয়ে গাড়ী যায় আসে। এই যাওয়া আসার রাস্তার দুধারে সদর মহলের একতলার একদিকে বিজিতেন্দ্রের অফিস, অন্যদিকে বিনোদের অফিস। দুটো অফিসেরই ঠিক একই রকমের আসবাব, একই পরদা দুটো ঘরেরই দরজা জানালায়।

সবকিছুতে বিজিতেন্দ্রের যেন তিনি সমকক্ষ, বাইরের চালচলনে সেইরকম ভাব নিয়ে চলবার একটা চেষ্টা আছে বিনোদের।

সদর মহলের একতলার অন্য ঘরগুলিতে আমলা-মুহুরিরা কাছারি করে। উপরতলায় তাদের কারও কারও, এবং মফঃস্বল থেকে কাজকর্ম উপলক্ষ্যে যারা সদরে আসে, তাদের রাত্রিবাসের জায়গা। এরপর একটা করে মস্তবড় উঠানের ব্যবধানে বিজিতেন্দ্রের দুতলা ও সুরবালার তিনতলা মহল। বিজিতেন্দ্রের মহলেরও একতলার মাঝখানটা ফাঁকা, যার ভিতর দিয়ে সুরবালার মহল অবধি গাড়ী যাওয়া আসা করে।

সদরের বাগানের দুপাশে গারাজ, আস্তাবল, বিজিতেন্দ্রের ব্রুহাম আর বগী গাড়ী রাখবার ঘর। দুদিক দিয়েই রাস্তা ঘুরে গিয়েছে।

পিছনের দুটি উঠানের দুপাশে যথাযোগ্য স্থানে ঠাকুরদালান, রান্নাবাড়ী, ইত্যাদি। আর খিড়কির বাগানের একপাশে গোয়ালঘর, অন্যপাশে ঝি-চাকরদের মহল। মাঝখানে পুকুর।

মাঝের মহলে বিজিতেন্দ্রের শোবার ঘরের ঠিক নীচেই একতলায় বিনোদের শোবার ঘর, আর তার পাশেই তাঁর বসবার ঘর, যেটাকে তিনি বলেন তাঁর লাইব্রেরী।

আমলা-মুহুরিদের কাছে যেমন, ঝি-চাকরদের কাছেও তেমনি, মুনিব আসলে মামাবাবু। তাঁর হুকুম তামিল করে তবে তাদের অন্য কাজ। তিনি কলকাতায় থাকলে বিজিতেন্দ্রের হুকুমও তাঁকে দিয়ে তারা একবার যাচাই করে নেয়। এটা তাদের শিখিয়েছেন, আর কেউ নয়, স্বয়ং বিজিতেন্দ্র ও সুরবালা, বিনোদের উপর সব বিষয়ে সারাক্ষণ একান্তভাবে নির্ভর করে। তাই বিনোদের লাইব্রেরী ঘরে যদি সে যায়ই একবার ত তা নিয়ে কেউ যে কিছু মনে করবে না, আর করলেও মুখে কিছু বলবে না, নির্মলা তা জানত। জানত বলেই ভয় তার আরো বেশী হল। কেন তা হলে এ নিয়ে বিনোদের এই অতি সতর্কতা? আসল যে, সেটা আর কেউ যেন না জানতে পায় তা দেখো। কেন? সে কে, কোথাকার মেয়ে, কেন ফাঁকি দিয়ে কাজে ঢুকেছে এসব প্রশ্ন ত দশজনের সামনেই তিনি স্বচ্ছন্দে তাকে করতে পারতেন।

এদিকে সুরবালা ভবেছেন, বিনুদা ত "বেশ, বেশ" বলে চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর নিজেরই উল্টোপাল্টা কথা শুনে ব্যাপারটা আমার যে একটুও ভাল ঠেকছে না। কি করি আমি এখন?

নির্মলা ফাঁকি দিয়ে কাজে ঢুকেছে সন্দেহ করে তিনি যে খুব বিচলিত হয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু বিনোদের ব্যবহারে বেশ একটু ভয়ই পেলেন। বুকটা ক্রমাগত ধড়ফড় করতে থাকল তাঁর, আর এরকম অস্বস্থায় আজকাল যা তিনি করেন সচরাচর, তাই করলেন, অর্থাৎ সুজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন।

নয়

মেয়েটাকে ছাড়তেও মন চাইছে না, আবার বিনোদের ভাবসাব দেখে ওকে এখানে রাখতেও ভরসা হচ্ছে না। নিজের এই ভাইটির গুণপনা ত তাঁর অজানা নেই? হয়ত মেয়েটার ভালর জন্যেই তাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।

সুজন ওকে পেলে খুশী হবেন জেনেও নির্মলা পাছে নার্সিং হোমে কাজ শিখতে চলে যায় ভেবে একদিন ভয় পেয়েছিলেন তিনি। আজ যখন নিজে ওকে রাখতে পারছেন না, তখন সুজন ওর ভার নিলে নির্মলা বেঁচে যাবে, আর সুজন খুশী হয়েছেন ভেবে সুরবালা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? সন্ধ্যার দিকে ডাক্তার এলে এইরকম নানা-দিক্ ভেবে সুরবালা বললেন, "আচ্ছা, নির্মলা মেয়েটি ভাল নার্স হতে পারে, আপনি বলেছিলেন না একদিন?"

সুজন বললেন, "বলেছিলাম বটে।"

সুরবালা বললেন, "ওকে আপনি নেবেন আপনার নার্সিং হোমে কাজ শেখাতে?"

সুজন প্রেসক্রিপশন লিখছিলেন, কলমটাকে কাগজের একটু উপরে ধরে রেখে বললেন, 'হঠাৎ ও কথা কেন? ওরকম উদ্দেশ্য নিয়ে ত কথাটা সেদিন আমি বলিনি?"

"তা জানি। আমি নিজে থেকেই বলছি, যদি নিতে চান ত নিতে পারেন। তবে, বুঝতে পারছি না, নিজের বিপদ্‌টাকে আপনার ঘাড়ে চালান করে দিচ্ছি কি না।"

"এর মধ্যে বিপদ্ আবার কোন্‌খানে?"

নির্ম্মলার ফাঁকি দিয়ে কাজে ঢোকার ব্যাপারটা সুজনকে বললেন সুরবালা।

শুনে প্রেসক্রিপশনটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সুজন একটুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন, "বিনোদ বাবু দুবার দুরকম বলেছেন, আর আপনি তাঁর আগের কথাটাই বেশী বিশ্বাস করছেন। হতে ত পারে, উনি পরে যা বলেছেন সেইটেই ঠিক, মেয়েটি যে তাঁর সঙ্গে আগে একদিন দেখা করে গিয়েছিল সেটা সত্যিই তাঁর মনে ছিল না?"

সুরবালা বললেন, "কেন তা বলতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বিনুদার আগের কথাটাই ঠিক। মেয়েটা ফাঁকি দিয়েই কাজে ঢুকেছে।"

সুজন বললেন, "তা যদি করেই থাকে, এতদিন ত আপনার কাছে রয়েছে, তার স্বভাবে দোষ কিছু কি দেখেছেন? আর ঐ ত একরত্তি মেয়ে, ও কি ক্ষতি করতে পারে আপনার?"

সুরবালা বললেন, "আহা, তা আর বলবেন না। দরজা খুলে বাইরের লোক ভিতরে ঢোকাতে পারে ত?"

সুজন বললেন, "আপনাদের এতসব পাইক বরকন্দাজের পাহারা এড়িয়ে? আচ্ছা বেশ, এতই যদি ভয়, দেবেন আমার কাছে পাঠিয়ে, আমি ওকে নেব।"

"ভয় করবে না?"

"একেবারেই না।"

"আচ্ছা, এক কাজ করুন না? ওকে ডেকে পাঠাই, ওর দেশ কোথায়, সংসারে কে কে ওর আছে, তারা কে কি করে, কোথায় থাকে, এসব ওকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন না?"

"মাপ করবেন, ও কাজটি আমার দ্বারা হবে না। ধরে নিচ্ছি ওর জীবনে এমন কিছু আছে বা ঘটেছে যা সে লুকোতে বা ভুলতে চায়। আমরা সেখানটায় বাধা হব কেন?"

কাল সুজন পার্টিতে আসতে পারেননি বলে এই সময় তাঁর জন্যে একটি রূপো'র থালায় করে গঙ্গাজলী নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, সরভাজা, আমের রসে ক্ষীর মিশিয়ে ছাঁচে ঢেলে শুকোনো আমসত্ত্ব, আমসন্দেশ, ছানার জিলিপি প্রভৃতি রকমারি মিষ্টি, রূপোর রেকাবিতে ক'রে আকের কয়েকটি টুকরো, কমলালেবুর কয়েকটি কোয়া, কিছু কিশমিশ, দুটি খেজুর ও একগোছা আঙুর আর রূপোর বাটিতে পায়েস এল। আর এল রূপোর গেলাসে সুবাসিত শীতল পানীয়।

সুজন খেতে খেতে বললেন, "এই দেখুন। এই যে একরাশ মিষ্টি এনে হাজির করল, একবারও কি জানতে চাইল, আমার ডায়েবেটিস আছে কি না, শেষ কবে ব্লাড সুগার কার্ভ দেখেছি, তাতে মিষ্টি খাওয়া আদৌ চলে কি না? দু কারণে জানতে চায়নি। এক, ওরা জানে, ও রকমের একটা অসুখ আছে সেটা সকলকে জানতে দিতে মানুষের ভাল লাগে না। দুই, ওরা এও জানে, যদি বলি, আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ বা মিষ্টি আমি ভালবাসি না, ত এখনই আপনি হুকুম দেবেন, আর মাছের কচুরি, চানাচুর, কুচো নিমকি, চিজ, দুধের সর, পেস্তা বাদাম আখরোট, বাতাবি লেবুর রস, আর সম্ভব হলে অসময়ের কালোজামও কিছুক্ষণের মধ্যে এসে হাজির হবে। তেমনি, যাকে নার্সের কাজ শেখাতে নেব, সে যদি কাজটা না করতে পারে, বা যদি তার স্বভাবের খুব বেশী দোষ কিছু দেখি, ত তাকে ছাড়িয়ে দেব। সে যদি বোঝে যে কাজটা সে করতে পারছে না, বা কাজটা তার ভাল লাগছে না ত সেও কাজটা ছেড়ে দিতে পারবে। সম্পর্কটা যেখানে এই রকমের, সেখানে কুলপঞ্জী দেখতে চাওয়ার কোনো

অর্থ ত হয় না? আর দেখতে চাইলে কেউ যদি বিব্রত হয়, ত অকারণ কেন তা চাইব?"

সুরবালা চুপ ক'রে রইলেন।

ডাক্তারের খাওয়া তখনো শেষ হয়নি, খেতে তিনি বেশ ভালই পারেন। বললেন, "আর জানেন, আমাদের দেশে এমন কত মেয়ে আছে, যাদের নিজেদের কোনো অপরাধ নেই, কিন্তু পরের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয় ব'লে যাদের এমন সব দুঃখ দুর্গতি, এত অনাদর অপমান লাঞ্ছনা সইতে হয় যে তার থেকে আরো বেশী সংখ্যায় যে তারা পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে না সেইটেই আশ্চর্য্য। এই মেয়েটি সত্যিই যদি ফাঁকি দিয়ে কাজে ঢুকে থাকে ত তার জীবনেও সেই রকম দুঃখ নিশ্চয় কিছু আছে। তাই সে যা লুকোতে চায় যদে আমার মনে হবে তা লুকোতে তাতে আমি দেব।"

সুরবালা বললেন, "আপনার মত মানুষের আশ্রয়ে যেতে পারা যে কোনো মেয়ের পক্ষে ভাগ্যের কথা। 'আচ্ছা, তাহলে কবে পাঠাব ওকে?"

সুজন বললেন, "যেদিন ইচ্ছে পাঠাতে পারেন। কালকেই পাঠিয়ে দিন না? আপনাদের ঐ ছোকরা চাকর জগন্নাথ আমার নার্সিং হোম খুব ভাল করেই জানে। ওকে বলবেন, পৌঁছে দেবে। অমনি আমার গাড়িটার টুকিটাকি কাজও একটু ক'রে দিয়ে আসবে।" ব'লে ডাক্তার উঠতে যাচ্ছিলেন, সুরবালা টান হয়ে শুলেন, বললেন, "আর একটুক্ষণ ব'সে যান। আমার মাথাটা কেন এত ঝিম ঝিম করছে? অনেকক্ষণ সোজা হয়ে বসে ছিলাম বলে কি?"

ডাক্তার বললেন, "দেখি হাতটা?"

নাড়ী দেখে বললেন, "ও কিছু নয়। এখুনি ভাল বোধ করবেন।"

সুরবালা বললেন, "আমার কপালে হাত দিয়ে দেখুন ত, একটু কি গরম হয়েছে?"

সুজন তাঁর কপালে হাত রাখলে সুরবালা ডান হাতে সেটাকে চেপে ধরে রইলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আঃ।"

সুজন আস্তে করে হাতটাকে একবার ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তাঁর দুই চোখে করুণা, বললেন, "এটা বাদ দিতে হবে, এতে কারও কোনো লাভ নেই।"

তখন সুরবালা তাঁর হাতটা ছাড়লেন, বললেন, "তা ত জানি, কিন্তু আমি কি করব, আমার ডাক্তার হিসেবেই আপনি সেটা আমাকে ব'লে দিন।"

সুজন বললেন, "জানি না। বুঝতে পারছি না। ডাক্তার বলেই ত আর আমি সবজান্তা নই?"

সুরবালা বললেন, "একটা কথা বলব?"

সুজন বললেন, "নিশ্চয় বলবেন।"

সুরবালা বললেন, "কিছুদিন গিয়ে থেকে আসব আপনার নার্সিং হোমে?"

সুজন বললেন, "আপনার ডাক্তার হিসেবেই বলছি, ওটা করবেন না, ওতে আপনার কষ্ট আরো বাড়বে। আপনি ইচ্ছে করলেই ত দুজন ভাল নার্স বাড়ীতে রাখতে পারেন, তাই বরং করবেন, যদিও আমি তার প্রয়োজন কিছু দেখছি না।"

সুরবালা দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

"আচ্ছা চলি," ব'লে বেরিয়ে যেতে যেতে ডাক্তার দেখলেন, রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে সুরবালার বুক দুলে দুলে উঠছে। সিঁড়ির মুখে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ালেন একটুক্ষণ, তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেলেন বিজিতেন্দ্রের মহলে।

দিনটা শনিবার। বিজিতেন্দ্র জিতে এসেছেন মাঠ থেকে। বাড়ী থেকে যা ভেবে বেরিয়েছিলেন সেই মত যদি খেলতেন, আজকের ট্রেবল টোটটা তাহলে আর দেখতে হ'ত না। কিন্তু ঐ যে প্যাডকে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে একটি ঘোড়ার ঘাড় বেঁকিয়ে খুর উলটিয়ে তড়বড়ে নাচের ভঙ্গি দেখে সব কিছু ভুলে গেলেন, আর তাইতেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। কিন্তু বাড়ী বসে ট্রেবলের তিনটি ঘোড়াই যে ঠিকঠিক বাছতে পেরেছিলেন সে আনন্দ কি কম? বিজিতেন্দ্রের মনের ভাবটা এই যে,

ট্রেবলটা তিনিই জিতেছেন, অবশ্য আর একজন লোকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। তারপর জেতা টাকার নিজের ভাগটা সেই লোকটাকে দিয়ে বাড়ী ফিরেছেন। লোকটা নাকি জীবনে কোনোদিন রেস খেলেনি, আর কোনোদিন নাকি খেলবেও না।

সুজন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলে বিজিতেন্দ্র বললেন, "কি খাবে বল।"

খানসামা এসে দাঁড়ালে বললেন, "তুমি ত নরমপন্থী, কি খাবে, নিম্বুপানি, না টমাটোর রস, না আনারসের রস?"

সুজন বললেন, "একরাশ গিলে এসেছি তোমার গৃহিণীর মহল থেকে। এক গেলাস নিম্বুপানিই দিতে বল, খাই আস্তে আস্তে।"

বিজিতেন্দ্র নিজের হুইস্কির সঙ্গে সোডা মেশালেন, তারপর সুজনের নিম্বুপানি যখন এল, তাতে কয়েক ফোঁটা বিটার্স মিশিয়ে গেলাসটা সুজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তেতো যে কত মিষ্টি হতে পারে তা দেখ। আবশ্যি তেতো খাওয়ানোতে তোমরা ত ওস্তাদ!"

সুজন বললেন, "এ ত কতবারই খেয়েছি তোমার কাছে এসে। নতুন ক'রে আর কি দেখব?"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "কেমন আছেন উনি?"

সুজন বললেন, "বলব না।"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "কেন, কি হল?"

সুজন বললেন, "নিজে গিয়ে জেনে আস না কেন?"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "ও।"

সুজন বললেন, "আগে অন্ততঃ দিনে একবার করে গিয়ে একটুক্ষণ বসে থেকে আসতে, এখন তাও নাকি বন্ধ করেছ।"

বিজিতেন্দ্র হেসে বললেন, "শোন, তুমি ডাক্তার, তোমাকে আমি কি শেখাব? রুগীদের বেশী দেখতে যেতে নেই, ওতে ওরা ভয় পায়। ভয় পাওয়াটা ওদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আর সত্যি যাদের কোনো রোগ নেই অথচ ভাবে যে আছে, তাদের দেখতে যাওয়া ত আরোই বেশী বারণ এই জন্যে যে তাহলেই তাদের ধারণা জন্মায় যে তাদের সত্যিই কিছু হয়েছে।"

সুজন বললেন, "ওঁর তেমন কিছু হয়নি সেটা ঠিক কিন্তু কষ্ট ত উনি ঠিকই পাচ্ছেন। এটাকে তুমি একটা ঠাট্টার জিনিষ বলে মনে করছ কেন?"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "তা করি না বলেই ত তোমার মত একজন ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছি।"

সুজন বললেন, "ভাল ডাক্তারটি হালে পানি পাচ্ছে না, তাই সে আবার এসেছে তোমার কাছে!"

বিজিতেন্দ্র স্বভাবতঃ মৃদু প্রকৃতির লোক, কিন্তু হঠাৎ যেন কঠোর হয়ে উঠলেন একটু। বললেন, "তুমি ব্যবস্থা দিচ্ছ বলেই এতকাল পর আমি সংএর মত আবার আমার স্ত্রীর শোবার ঘরে গিয়ে অধিষ্ঠিত হতে পারব না।"

সুজন বললেন, "তা না করেও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায়।"

বিজিতেন্দ্র হুইস্কির গেলাসটাকে নাড়ছেন, গেলাসের গায়ে লেগে মৃদু টুং টাং শব্দ করছে বরফের টুকরো-গুলো।

সুজন বললেন, 'আজকাল মেয়েরা ত অনেকে রেস-কোর্সে যায়, তুমি ওঁকে শনিবারে শনিবারে নিয়ে যাও না কেন সঙ্গে করে?"

বিজিতেন্দ্র ভুরুদুটো তুলে সুজনের দিকে তাকালেন একবার।

সুজন বললেন, "তোমার সান্ধ্য পানের আসরেও তাঁকে ডাকতে পার।"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "তিনি ড্রিঙ্ক করবেন?"

"যদি করেন।"

"করবেন না, তাছাড়া করতে তাঁকে আমি দেব না।"

"কেন, কি হয়? আমি যদি তাঁর জন্যে উইনকার্নিস কিংবা ঐ জাতীয় কোনো টনিক ওয়াইন প্রেস্ক্রাইব করি, আর তিনি যদি একটা ওয়াইন গ্লাসে করে তারই একটু নিয়ে তোমার সঙ্গে বসে sip করে করে পান কিংবা যদি পোর্ট বা শেরীই একটু খান, আমার ধারণা, ওঁর যে ধরণের অসুখ তাতে ওঁর স্বাস্থ্যের উন্নতিই হবে।"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "তুমি মদ খাও না, কিন্তু বদ্ধ মাতালের মত কথা বলছ।"

সুজন পাতিলেবুর রস মেশানো সোডার জল পান শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। বিজিতেন্দ্রও উঠলেন। সুজন বললেন, "আমার যা বলবার ছিল বললাম। জানতামই যে কোনো লাভ হবে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যে কি হওয়া উচিত তা নিয়ে খুব কম লোকেই স্থির বুদ্ধি নিয়ে ভাবে, তুমিও ভাবতে রাজী নও। বোধহয় ওটাকে ভাববার মত একটা বিষয় বলে মনেই কর না। যাক, আমি আজ থেকে ছুটি নিচ্ছি। কাল থেকে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসার অন্য ব্যবস্থা তুমি ক'রো।"

বিজিতেন্দ্র একটু ভাবলেন, বললেন, "তোমার কথা মত চলতে যখন পারছি না, তখন তোমাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা অন্যায় হবে।"

নীচে নেমে সুরবালার মহলের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করলেন সুজন ডাক্তার। বিদায় নিতে যাবেন, কি যাবেন না। না যাওয়াই ভাল হবে স্থির করে দ্রুতপদে গাড়ীতে এসে উঠলেন।

প্রায় একই সময়ে দুতলার সিঁড়িতে বিনোদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল নির্মলার। চলে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে, বিনোদ বললেন, "কই, তুমি ত গেলে না আমার কাছে? শোন, এ বাড়ীতে আমার হুকুম মেনে চলতে হয়ে, কাজেই অকারণ দেরি করো না।"

নির্মলার হাত পা কাঁপতে লাগল, একটু একটু ঘাম হচ্ছে তার। বলল, "কি বলবেন, এখানেই বলুন না?"

বিনোদ হাসলেন, বললেন, "বোকামি করো না। তাতে লাভ কিছুই হবে না। তোমার ভালর জন্যেই তোমাকে আসতে বলছি।"

অনভিজ্ঞা বালিকার একবার মনে হল, হতে ত পারে, মামাবাবু আমার ভাল করতেই চাইছেন? আমি আগে থেকেই কেন পাঁচরকম ভেবে ভয় পাচ্ছি? বলল, "আমার হাতে এখন একটু সময় আছে। এখনই যাব কি?"

সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও ভাবল, ছাড়ান ত পাব না? মানুষটির মনে কি আছে তা এখনই জেনে নেওয়া ভাল। বাড়ীর সকলেই জেগে আছে এখনো।

একটু পরে তাঁর লাইব্রেরীতে একটি চেয়ারে নির্মলাকে বসিয়ে বিনোদ শুনে নিলেন, হোসেনপুর ষ্টেশনে গোলেমালে ঝিচাকরদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কিরকম করে নির্মলা চলে এসেছিল কলকাতায়। নির্মলা বলল, "টিকিট কাটার পয়সাও ছিল না আমার কাছে। কাজ খুঁজছিলাম, শুনলাম আমার মত একজন লোকের দরকার আছে আপনাদের। সেই থেকে কাজ করছি।"

"আমাদের লোকের দরকার আছে সেটা কখন শুনলে?"

নির্মলা কি বলবে ভাবছে। বিনোদ আবার বললেন, "ট্রেণে চড়বার আগে না পরে?"

নির্মলা বলল, "পরে।"

বিনোদ বললেন "হুঁ। আচ্ছা এবারে বল, তুমি কাদের মেয়ে, কোথায় তোমাদের ঘর।"

নির্মলা বলল, "ওটা আমাকে বলতে বলবেন না। আমি পালিয়ে এসেছি, আর যাদের কাছে থেকে পালিয়েছি তাদের কিছুতেই জানতে দেব না, আমি কোথায় আছি।"

"তারা কারা?"

"আমার সৎমা আর তাঁর ভাইয়েরা।"

"কি করছিল তারা তোমার?"

"সে অনেক কথা, শুনে আপনি কি করবেন? শেষকালে সত্তর বছর বয়সের একজন বর ধরে, বেশ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে আমার বিয়ে দিচ্ছিল, তখন পালিয়েছি।"

"গল্পটা বানিয়েছ ভাল। এখন বল ত, তুমি সেদিন সকালবেলায় হোসেনপুরে কি করতে গিয়েছিলে? ওদিকেই কি তোমাদের দেশ?"

"কাছেই।"

"মিথ্যে কথা। ওদিক্‌কার লোকরা কি ভাষায় কিরকম সুরে কথা বলে তা আমি খুব ভাল করে জানি। তুমি পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে।"

নির্মলা আর পারছিল না, আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সুরবালার মহলের দুতলার উঠোনের দিক্‌কার বারান্দা থেকে সন্তুর গলা শোনা গেল। "নির্ম্মলা! নির্ম্মলা! নির্ম্মলা রয়েছ ওখানে?"

বিনোদ বললেন, "আচ্ছা, তুমি যাও এখন। কিন্তু যত রাতই হোক, আমি আজকেই জানতে চাই, কোথায় কি কীর্ত্তি তুমি ক'রে রেখে এসেছ। শুনেছি সুবীর প্রবীরকে তুমি ঘুম পাড়াও। ওরা ঘুমিয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি পার এই ঘরে চলে আসবে। না যদি এস, ত হয় আজ রাত্তিরেই, নয়ত কাল খুব সকালে পুলিশ ডেকে আমি তাদের হাতে তোমাকে দিয়ে দেব। ওরা জানে, যা জানবার তা কি করে জেনে নিতে হয়। তবে যদি বেশ লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাক, আর আমার কথা শুনে চল তাহলে তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। যাতে না বলে আমিই সেটা দেখব।"

ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ শুক্লা নবমীর চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। ফুরফুরে হাওয়ায় আমলকি গাছের পাতাগুলি কাঁপছে আর আলো প'ড়ে চিকচিক করছে খিড়কির বাগানে। সেই হাওয়াতে দমকে দমকে ভেসে আসছে গন্ধরাজ আর হাসনুহানার গন্ধ। সুবীর, প্রবীর আর জগন্নাথ গল্প শুনছে।

সুবীর বলল, "তারপর?"

প্রবীর বলল, "তারপর?"

"তারপর রাজকন্যা রাক্ষসদের রাজাকে বলে পাঠালেন, তা বেশ, তোমাকেই আমি বিয়ে করব। কিন্তু সেটা এখনই ত হতে পারছে না? আমার একটা ব্রত আছে। এক বৎসর শুদ্ধ শুচি হয়ে থেকে এই ব্রত পালন করতে হয়, না করলে ভাবী স্বামীর অকল্যাণ হয়। কোনো পুরুষের মুখ দেখা এ সময়ে বারণ। দৈত্যদের রাজার সঙ্গে তোমার ত যুদ্ধ চলছে কিছুদিন ধ'রে? এ যুদ্ধে তুমি হারবে যদি এই ব্রত আমাকে না করতে দাও। ব্রত শেষ হলে কত আনন্দ ক'রে আমাকে বিয়ে করবে, তার জন্যে একটা বৎসর তুমি আমার কাছে আসবে না, আমাকে দেখতে চাইবে না, এটা কি খুব বড় কথা হ'ল? রাক্ষস যে, তার আর কত বুদ্ধি হবে? ভাবল, সত্যিই ত, যখনকার যা। যুদ্ধে জেতাটা অবিশ্যি আগে দরকার, তারপর বিয়ের ভাবনা। বারোটা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ততদিন রাজকন্যাও রইল আমার পুরীতে? দরকার হলে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে এনে বিয়ে করব। কে আমাকে রুখবে? সে রাজী হয়ে গেল।"

সুবীর বলল, "তারপর?"

প্রবীর বলল না কিছু, কারণ, তখন তার ঘুম এসে গিয়েছে।

"তারপর রাজকন্যা বাঘছালের আসন পেতে ঘি-এর পঞ্চ প্রদীপ জেলে, ঘরে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া দিয়ে, চরকাবুড়ীর দেওয়া তুলোয় সুতো কাটতে বসলেন। সেই যে চরকাবুড়ীর কথা কাল তোমাদের বলেছি, যার কানের কাছে মুখ নিয়ে রাজকন্যা বলে দিতেন কারা তাকে বুড়ী বলছে, আর যার পান-সুপুরি তিনি হামান-দিস্তায় ছেঁচে দিতেন। চরকাবুড়ীর দেওয়া সে তুলো ফুরোয় না। যথেষ্ট সুতো কাটা হলে তা দিয়ে রাজকন্যা চাদর বুনবেন। সে চাদর গায়ে দিলে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন রাজকন্যা যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারবেন। রাক্ষস তাঁকে দেখতেও পাবে না।"

সুবীরের চোখে ঘুম, একটু জড়িতস্বরে বলল, "আর রাজপুত্র? রাজপুত্র এসে রাক্ষসটাকে মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে না?"

নির্ম্মলা বলল, "সাধ্যি কি রাজপুত্রের? রাক্ষস তাকে কি মায়া ক'রে রেখেছে, তার কেবলই ঘুম পায়। রাজকন্যাকে নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেই করতে হবে।"

জগন্নাথ বলল, "অন্য দুজন? মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্র? তারা কিছু করবে না?"

নির্ম্মলা বলল, "তাদের কথা পরে হবে। আজ এখন এদের কাছে তুমি একটু বস জগন্নাথ। আমি ফিরে এসে এদের উপরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেব।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ মাসী?"

"আমি এই এলাম বলে।"

তার বুক কাঁপছে, তার পা কাঁপছে।

বিজিতেন্দ্রের মহলের দিক্‌কার উঠানটাতে নামল নির্ম্মলা। ক্রমশঃ

মৃত্যু ও অমৃত

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"প্রাণকে প্রণাম করি—যে-প্রাণ জীবন,
যে-প্রাণ মৃত্যু"—অথর্ববেদ, ১১।৪

গৃহে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো—শঙ্খ ও উলুধ্বনির আবাহনে সর্বত্র আনন্দের কোলাহল উঠলো। সকলের নয়নানন্দ সেই শিশু—সেই নন্দন বা নন্দিনী।

ধীরে ধীরে সে বাড়তে লাগলো। ক্রমে ক্রমে, কৈশোর এবং যৌবনে পদার্পণ করলো।

সেই যুবক-যুবতীর মধ্যে পূর্বেকার সেই শিশুর কোন মিল পাওয়া যায় কি? সেই সদ্যোজাত শিশু লুপ্ত হয়ে গেছে।

যুবক যুবতীর যৌবনও স্থায়ী হলো না। ক্রমে ক্রমে তারাও জরাগ্রস্ত হলো। এই জরৎজরতীর মধ্যে সেই যুবক-যুবতীর সন্ধান পাওয়া যায় কি?১

আমরা নিত্য নিয়ত সংসারে এই ঘটতে দেখছি। তাতে আমরা কেউ আশ্চর্য হই না। দুঃখিতও হই না।

আমার নিজের নবজাত সন্তান আমার চোখের সামনেই কিশোর-কিশোরীতে তরুণ তরুণীতে পরিণত হলো। আমার তাতে কোনো দুঃখ নাই।

দীর্ঘজীবী আমার চোখের উপরেই, তাদের মুখে বলি চিহ্ন দেখা দিতে লাগলো। তাদের ভ্রমরকৃষ্ণ ঘনকেশরাশি ক্রমশ শুভ্র এবং বিরল হতে লাগলো। আমার মনে তো কোনো বিকার লক্ষিত হলো না—তেমন দুঃখও তো হলো না।

কিন্তু তাদের মৃত্যু হলে—?

চোখের উপর থেকে সূর্যের আলো মুছে যায়। ভিতর-বাহির সব অন্ধকার হয়ে যায়।

জন্মের পূর্বে কী ছিল—মৃত্যুর পরে কী হবে—আমরা তা জানি না। জাতকের জন্মের পূর্বভাগ কালো যবনিকায় ঢাকা। তার মৃত্যুর পরভাগও তেমনি গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।২

যদি ঐ ঢাকা খুলে যেতো? যদি জন্মজন্মান্তর দেখতে পেতাম? তাহলে মনের অবস্থা কী হতো?

কৈশোর হতে যৌবন, যৌবন হতে জরা যেমন মনে কোনো বিকার আনে নি—তেমনি মৃত্যুতেও হয়তো কোনো মনোবিকার উপস্থিত হতো না।

আমার কাছে মনে হচ্ছে—"হয়তো।" কিন্তু জ্ঞানীর কাছে সত্যদ্রষ্টার কাছে তা "হয়তো" নয়—তা নিশ্চিত।

তাঁদের উপদেশ হতে—শুধু উপদেশ কেন, আচরণ থেকেও আমরা তা বুঝতে পারি।

"যাক-যাক। দেহটা পালটে আসুক।" অনেক মহাপুরুষের মুখে এই বাণী শুনেছি বা অনেকে শুনেছেন।

এ যেন পোষাক বদলে আসা। তো এমনই স্বাভাবিক, এমনই সহজ—তাঁদের কাছে প্রিয়জনের তিরোধান।

হাজার হাজার বছর আগে থেকেই ভারতীয় ঋষিগণ, মহাপুরুষগণ মৃত্যুকে এমনি স্বাভাবিক সহজভাবে দেখে এসেছেন।

বৈদিকযুগের একটি দৃশ্য।

তপোবনে এক ঋষিকুমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত। জীবনের আর কোনো আশা নাই। এখন কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষা। মৃত্যুর মুখোমুখি এসে ঋষিকুমার কি ভয় পেয়েছেন? তাঁর চক্ষের দৃষ্টি কি চকিত হচ্ছে?

শিয়রে বসে তাঁর প্রিয়জন। হয়তো বা পিতা অথবা মাতা। তিনি ধীর স্থির। মনে তাঁর কোনো বিকার নাই। জন্মের পূর্বে কী ছিল, মৃত্যুর পরে কী হবে—তা তাঁর কাছে আমাদের দিনরাত্রের মতই সহজ, স্বাভাবিক।

তিনি বলে উঠলেন।

"ভয় নাই—তুমি মরবে না। তুমি যে অজর—অরিষ্ট। কোনো ক্ষত, কোন ক্ষতি তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যেখানে যাচ্ছ সেখানে কেউ মরে না। চক্ষে অন্ধকার দেখছ? এ আঁধার সাময়িক। সে যে জ্যোতির্ময় লোক। কেউ সেখানে অন্ধকারে থাকে না।"৪

"হে বীর। ওঠ, ওঠ। ওপরে ওঠ। সাবধান। গতি যেন ব্যাহত না হয়। চরণ যেন স্খলিত না হয়। মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করো।৫

আর এক ঋষির কথা বলি।

ভারতের কোথায়, কবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—জানি না। কিন্তু তাঁর চরণরেণু স্পর্শে ধরণী ধন্য হয়ে গেছে।

প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের চক্ষে আঁধার নামে। সমস্ত জগৎ কালো হয়ে যায়!

তাঁর হলো—এর বিপরীত। অন্তর, বাহির, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি আলোয় আলোময় হয়ে গেল।

প্রিয়জনের তর্পণ করতে গিয়ে, তিনি সমস্ত বিশ্বের তর্পণ করলেন। এক প্রিয়জনকে হারিয়ে সমস্ত বিশ্বকে তিনি প্রিয়জনরূপে লাভ করলেন।

তাঁর তর্পণের সেই অতুলনীয় শ্লোকগুলির অর্থ আমাদের মাতৃভাষায় প্রকাশ করি।

"দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রুরসর্প, সুপর্ণ, সরীসৃপ, বিহঙ্গ, বিদ্যাধর প্রভৃতি প্রাণিগণ, জলচরগণ, খেচরগণ যারা যারা পাপে রত, যারা ধর্মে রত, ব্রহ্ম হতে এ ভুবন পর্যন্ত যত লোক, দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ মানবগণ - সমস্ত পিতৃমাতৃগণ, মাতামহগণ সকলে পরিতৃপ্ত হোন।

"যে সমস্ত কোটী কোটী কুল বিগত হয়েছে—তার সেই বিদেহী আত্মাগণ, সপ্তদ্বীপনিবাসী প্রাণিগণ, আমার প্রদত্ত এই পানীয় লাভ করে তৃপ্ত হোন। ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হোন।"

ঋষি তাঁর অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহরসে বিশ্বের সকল প্রাণীকে পরিষিক্ত করেছেন। বরষার বারিধারা যেমন—ধনী, দরিদ্র, দীনহীন, দুরাত্মা, মহাত্মা, পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা, ক্রূর, কারুণিক, সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়, তেমনি ঐ ঋষির হৃদয়ের অফুরন্ত প্রীতি সর্ব্বত্র অঝোর ধারে নির্বিচারে বর্ষিত হলো।

দেবদানবের, সুর-অসুরের ভেদাভেদ নাই। শুদ্ধ-অশুদ্ধের বাছবিচার নাই। দেবর্ষি, মহর্ষি এবং ক্রুর বিষধর সর্প যার কাছে সমান—সেই ব্রহ্মদম ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির হৃদয়ের পরিচয় এই তর্পণ মন্ত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

এই যে অপরিমেয় হৃদয় এই যে গতিহীন নির্ব্বিচার প্রেম, প্রীতি, করুণা—একেই বলি ঈশ্বর।৬

মানবমাত্রই এই ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করে। কিন্তু কয়জন এঁকে লাভ করে? এ ঈশ্বরলাভ অতি কঠিন।

অপরিমেয় প্রেমের এই আনন্দরূপ—অমৃতরূপের আস্বাদ যিনি লাভ করেছেন—তিনি কদাচ, কোথাও ভয় পান না ৭। কোনো কিছুতেই তাঁর মনের শান্তি ক্ষুণ্ণ হয় না।

প্রিয়জনের মৃত্যুতেও তিনি বাতাসে মধুর স্পর্শ পান। স্রোতস্বিনীগণ তার কাছে মধুক্ষরণ করে। রাত্রি তাঁর মধুময় ঊষা মধুময় ধরার ধূলিকণাও তাঁর কাছে মধুময়।

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
...সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি। "আরোগ্য"

দেহত্যাগের সময় তিনি বলেন:

"আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে৮।" "জন্মদিনে"

১। "দেহীর দেহে যেমন কৈশোর, যৌবন ও জরা—

দেহান্তর প্রাপ্তিও তেমনি। জ্ঞানীর তাতে মোহ আসে না।" গীতা, ২। ৩।

২। "জীবগণের আদিভাগ এবং অন্তভাগ অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত, মধ্যভাগ প্রকাশিত, (জ্ঞানিগণ বলেন)—এতে শোকের কি আছে?" ঐ, ২।২৮।

৩। ঐ, ২।২২।

৪। অথর্ববেদ, ৮।২।২৪

৫। ঐ, ৮।১।৪।

৬। "সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থান করেন।" গীতা, ১৮।৬। হৃদয়—অর্থাৎ প্রেম, প্রীতি, করুণার উৎস। ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিন্দুরূপে, মহৎ হৃদয়ে সিন্ধুরূপে ঈশ্বরের অবস্থান।

"অপরিমাণ মানস" বা অপরিমেয় হৃদয়কে (মৈত্রী করুণা মুদিতাকে) বৌদ্ধগণও "ব্রহ্ম বিহার" বলেছেন। সুত্ত নিপাত, ১৮।৭।

৭। "ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন, তিনি কদাচ কোথাও ভয় পান না।" তৈত্তিরীয়, ২।৪।

৮। প্রবহমান নদীগণ যেমন নিজ নিজ নামরূপ বিসর্জন দিয়ে সমুদ্রে অস্তগত হয়, জ্ঞানীগণও তেমনি নামরূপ হতে মুক্ত হয়ে জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে লাভ করেন।" মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।২।৮।

উনবিংশ শতকে ভারতে নাগরিকীকরণ*

শ্রীকরুণাময় নন্দী

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে গ্রামজীবনের গুরুত্ব খুব বেশী। ইহা হইতে অবশ্য এমন কিছু বোঝায় না যে, অতীতে আমাদের দেশে নগরের অস্তিত্ব আদৌ ছিল না অথবা অতীতে ভারতে নাগরিকীকরণ বা পৌর-বিকাশ ঘটে নাই। ভারতে অতীতেও নগরের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু গ্রামজীবনের গুরুত্বের তুলনায় নগর-জীবনের গুরুত্ব খুবই নগণ্য মনে হইয়াছে। ভারতের সুদূর অতীত অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এই ধরণের মন্তব্য যতটা প্রযোজ্য, উনবিংশ শতকের ভারত সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা কম প্রযোজ্য নহে। যদিও ১৮৫৭ সনের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, তবুও এই সময়ে আমরা এমন কোন প্রমাণ পাই না যাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের নগর ও গ্রাম-জীবনের আপেক্ষিক গুরুত্বের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে। বরং, যদি কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা ছিল নগরজীবনের ক্রমশঃ গুরুত্বহ্রাস। একমাত্র ১৮৬৯ সনে সুয়েজখাল খননের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যাতায়াতের পথ অধিকতর সুগম হয় এবং ভারত পাশ্চাত্যের আধুনিক নগর-সভ্যতার প্রথম স্পর্শ লাভ করে।

কোন দেশের পৌর-বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, একটা দেশের কোন নির্দিষ্ট সময়ে পৌরবিকাশের গতি ও প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই দেশের তৎকালীন শিল্পায়নের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ কোন দেশের নাগরিকীকরণের গতিকে সেই দেশের শিল্পায়নের মাপকাঠি হিসাবে ধরা যাইতে পারে। যদিও পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের নাগরিকীকরণ ও শিল্পায়নের গতি মোটামুটি সমান্তরাল, তথাপি এই ধরণের তত্ত্বকে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়াতে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। কারণ অতি সাম্প্রতিককালে একাধিক গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্যের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কিংসলে ডেভিস ১৯৫১—'৬১ এর দশকে ভারতে নাগরিকীকরণ ও শিল্পায়নের গতির মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পান নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতের পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় যে হারে শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে, নাগরিকীকরণের গতি তাহা অপেক্ষা কম। পৌর-বিকাশের গতিকে যাঁহারা শিল্পায়নের মাপকাঠি হিসাবে ধরিয়া থাকেন, তাঁহাদের অভিমত অবশ্য অন্যপ্রকার। তাঁহাদের মতে ১৯৫১-'৬১-তে ভারতে শিল্পায়নের হার বেশী নয় বলিয়াই পৌর-বিকাশের হার কম। এই ধরণের অভিমতও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

কোন দেশে নাগরিকীকরণের হার শিল্পায়নের মাপ-কাঠি কিনা সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও এই মতবাদকে সম্পূর্ণ বাতিল করিবার কোন যুক্তি নাই। তাহা ছাড়া উনবিংশ শতকে ভারতের পৌর-বিকাশকে শিল্পায়নের সূচক হিসাবে গ্রহণ না করিয়াও সাধারণভাবে পৌর-বিকাশের আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ এই ধরণের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি, এই শতকে কোন্ কোন্ শক্তি পৌর-বিকাশের অনুকূল ছিল, কোন্ কোন্ শক্তি প্রতিকূল ছিল, এই উভয়বিধ বিপরীতধর্মী শক্তির ক্রিয়ার ফলে সর্বশেষ পরিস্থিতি কি দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার ফলে এই শতকের শেষ ভাগে ভারতের নাগরিকীকরণ কতটা সাধিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানা প্রয়োজন। যে কোন দেশে নাগরিকীকরণের হার বলিতে আমরা কি বুঝি। সাধারণতঃ কোন দেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ শহরবাসী তাহার উপরেই নাগরিকীকরণের হার নির্ভর করে। এই দিক হইতে বিচার করিলে অবশ্য উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের পৌর-বিকাশ

---

* 'নাগরিকীকরণ' কথাটি ইংরাজী 'Urbanisation' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানিতে পারি। কারণ ১৮৭২ সনের পূর্বে ভারতে কোনরকম লোক গণনাই হয় নাই। কাজেই এই সময়ের পূর্বে ভারতের শহরবাসীর সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ ছিল তাহা বলা কঠিন। তবে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রথমভাগে ভারতে শহরবাসীর শতকরা হার বেশী ছিল। কারণ, যদিও অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে ভারতের হস্ত ও কারুশিল্পের ক্রমাবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি ১৮২৫ সন হইতে ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরেই এই ধরণের শিল্পের নাটকীয় গতিতে অবনতি ঘটিয়াছিল। অথচ এই সময়ে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের কয়েকটি সবে মাত্র জন্মলাভ করিয়াছে। কাজেই এই সময়ে ভারতে নাগরিকীকরণের মান স্বল্প হওয়া খুবই স্বাভাবিক। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ সম্বন্ধে যতটুকু পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৮৭০ সনের পর হইতে ভারতে নাগরিকীকরণের গতি উর্দ্ধগামী বটে তবে দ্রুতগামী নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে ১৮৭০ সনের পর হইতে শহরবাসীর সংখ্যা যখন সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮·৭২ ভাগ, ১৯০১ সনে তাহা শতকরা ৯·৮৮ ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বৎসরে শহরবাসীর মোট বৃদ্ধি শতকরা ১·১৬ ভাগ মাত্র। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে নাগরিকীকরণের হারের যে এই অতি সামান্য বৃদ্ধি তাহা সমগ্র শতাব্দীর হিসাবে একেবারেই নগণ্য। ইহা হইতে অবশ্য এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই যে, সমগ্র উনবিংশ শতকে নাগরিকীকরণের গতি স্থির বা নিশ্চল ছিল। কারণ এই শতকে একদিকে যেমন কতকগুলি অনুকূল শক্তি নাগরিকীকরণের গতিবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে, অপরদিকে তেমনই কতকগুলি প্রতিকূল শক্তি এই গতিকে মন্থর করিয়া দিয়াছে। এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির সংঘাতের ফলে উনবিংশ শতকের প্রথমে ও শেষে ভারতে শহরবাসীর শতকরা হার প্রায় এক রকমই থাকিয়া গিয়াছে। এখন আমরা এই পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

উনবিংশ শতকে ভারতে নাগরিকীকরণের গতি বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হইতেছে রেলপথের প্রবর্তন ও প্রসার। রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ স্থলপথের উন্নয়নেরও প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার ফলে মানুষের যাতায়াত ও জিনিষপত্রের পরিবহণ সহজতর ও দ্রুততর হইয়াছে। রেলপথের সম্প্রসারণ দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। ট্রাঙ্কলাইনগুলি বা প্রধান রেল-পথগুলি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া এবং ব্রাঞ্চলাইনগুলি বা শাখাপথগুলি দূরতম গ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া একদিকে যেমন দেশের রপ্তানীযোগ্য কাঁচামাল বন্দরে লইয়া হাজির করিয়াছে, অপরদিকে তেমনই বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ভোগ্যদ্রব্য সমূহকে দেশীয় ক্রেতার দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। যে সমস্ত অঞ্চল দিয়া রেলপথ প্রসারিত হইয়াছে সেখানকার প্রায় প্রত্যেকটি রেল-ষ্টেশনই ছোট-খাটো শহরে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং তাহাদের অনেক-গুলিই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তবে রেলপথের প্রসার একদিকে শহর গড়িয়া ওঠার পথ প্রশস্ত করিলেও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে উহা চিরাচরিত বাণিজ্য-পথের গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস করিয়াছে। অর্থাৎ পুরাতন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে অতীতের শহরগুলির গুরুত্ব কমিয়াছে এবং তাহাদের স্থান লইয়াছে নবগঠিত রেলষ্টেশন শহরগুলি।

রেলপথের বিস্তার ও বাণিজ্যের উন্নতির মত আধুনিক বৃহদায়তন কারখানা শিল্পের প্রবর্তন ও উন্নয়ন ভারতের নগরগঠনের ক্ষেত্রে আর একটি মূল্যবান সহায়ক। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বোম্বাই প্রদেশে আধুনিক বস্ত্রশিল্পের বিস্তার ও বাংলাদেশে যন্ত্রচালিত পাটশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুই অঞ্চলে বহু নূতন শহরের পত্তন হইয়াছে। ঠিক একই সময় হইতে বাংলা বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশ ও মহীশূরে কয়লা উত্তোলনের কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অঞ্চলে বহু কয়লানগরীর উদ্ভব হইয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের এবং পেট্রোলিয়াম-শিল্পের উন্নয়নের ফলে নাগরিকী-করণের গতি কিছুটা দ্রুত হয়। আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের বিস্তার বহু নুতন শহরের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য কিন্তু ভারতের পুরাতন হস্ত ও কারুশিল্পের ক্রমাবনতির ফলে বহু প্রাচীন শহরের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বলা যাইতে পারে, বোম্বাই ও আমেদাবাদের অভ্যুত্থান ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের পতনের সূচনা করিয়াছে।

ভারতীয় হস্ত ও কারুশিল্পের ক্রমাবলুপ্তির ফলে নগরের অর্থনৈতিক জীবন অপেক্ষা গ্রামীণ অর্থনৈতিক

জীবন বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই হস্ত ও কারুশিল্পীরা সরবরাহ করিত। যখন বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় এই শিল্পীরা ক্রমশঃ বেকার হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন গ্রামীণ অর্থনীতি ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ফলে কৃষিযোগ্য ভূমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ পড়িতে থাকে। তাহার উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে (ঊনবিংশ শতকে যদিও খুব কম ছিল) গ্রামের মানুষ অধিকতর ভূমিনির্ভর হইয়া পড়ে। সীমাবদ্ধ জমির উপর ক্রমাগত অধিকসংখ্যক লোক নির্ভরশীল হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে এক শ্রেণীর ছদ্মবেকারের সৃষ্টি। অর্থাৎ গ্রামের লোকসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশের ভূমিহীন শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়া। এই ভূমিহীন শ্রমিকশ্রেণী বিকল্প কর্মসংস্থানের আশায় শহরের দিকে যাইতে আরম্ভ করায় নাগরিকীকরণের গতি কিছুটা দ্রুত হয়। এই ভাবে কর্মসংস্থানের আশায় যাহারা শহরে আসিয়াছে তাহাদের সকলেই যে ভাল শিল্পসংস্থায় কাজ পাইয়া সুদক্ষ শিল্পশ্রমিকে পরিণত হইয়াছে তাহা নহে; শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনেকে বিভিন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে কাজ পাইয়াছে, অনেকে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, অনেকে অন্যান্য ছোটখাটো বৃত্তিমূলক কাজ লইয়াছে। পারিবারিক চাকর ঝি-অফিস ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দারোয়ান ইত্যাদির প্রয়োজনও গ্রাম হইতে আসা লোকে বহুলাংশে মিটাইয়াছে। এই সমস্ত কারণে শহরের লোকসংখ্যা যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

ভারতের সেচ-ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় বহুকাল হইতেই ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থা প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। মুঘলযুগে যেমন ব্রিটিশযুগেও তেমনই ভারতকে বহুবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় একশত বৎসরের ব্রিটিশশাসনের পরে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগেও ভারতের এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই সময়েও দেখা যায়, গড়ে প্রায় প্রতি নয় বৎসরে দুই বৎসর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিজনিত ব্যাপক শস্যহানি ঘটিয়াছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বিস্তৃত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ কাহারও নিকট কাম্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা খুবই অদ্ভুত যে, দুর্ভিক্ষ নাগরিকীকরণের গতি বাড়াইয়া দেয়। বিভিন্ন সময়ে দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে এই সময় গ্রামাঞ্চলে নিদারুণ খাদ্যসংকট দেখা দেওয়ায় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুলাংশে কমিয়া যাওয়ায় গ্রামের লোকেরা দলে দলে শহরে গিয়া ভীড় করে। শহরে গেলেই যে বুভুক্ষু মানুষ খাইতে পাইয়াছে বা কর্মহীন মানুষ কাজ পাইয়াছে তাহা সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। তথাপি দুর্ভিক্ষের সঙ্গে নাগরিকীকরণের একটা অদ্ভুত ধরণের প্রত্যক্ষ যোগ লক্ষ্য করা গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক অঞ্চলে একটা প্রবাদই গড়িয়া উঠিয়াছিল: 'After ruin go to the city," অর্থাৎ 'ধ্বংসের পর নগরে যাও।" গ্রামের মানুষ যতদিন খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে ততদিন শহরে যাইবার প্রয়োজন অনুভব করে না। খাওয়া-পরার অভাব হইলেই তাহারা চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যেমন নাগরিকীকরণের গতি বাড়াইয়া দেয়, শহরাঞ্চলে মহামারীর প্রাদুর্ভাব তেমনই এই গতিকে অনেকাংশে মন্থর করিয়া দেয়। গ্রামের লোকের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি যতই থাকুক না কেন, বরাবরই দেখা গিয়াছে বড় বড় শহরে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি ব্যাধি যে কত মানুষের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মহামারীর ফলে শহরের বহু লোকের শুধু মৃত্যুই হয় নাই, হাজার হাজার লোক প্রাণভয়ে শহর ছাড়িয়া গ্রামে পলায়ন করিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের একেবারে শেষদিকে বোম্বাই শহরে নিদারুণ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এত অধিক সংখ্যক লোক শহর ছাড়িয়া চলিয়া যায় যে, বোম্বাই-এর বস্ত্র-শিল্প কিছু দিনের জন্য প্রায় পঙ্গু হইয়া পড়ে।

প্রায় প্রত্যেক দেশেই শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। গ্রামে বিত্তশালী লোকের অভাব হয় ত থাকে না, কিন্তু প্রভুত বিত্ত থাকা সত্বেও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার মত উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা গ্রামে সাধারণত কম। তাহার উপর জীবনযাত্রার মান-নির্দেশক দ্রব্যগুলির মধ্যে খাদ্য. বস্ত্র, বাসস্থান ছাড়াও যদি শিক্ষা, সংস্কৃতি, আরাম, বিলাস ইত্যাদি যোগ করা হয়, তবে এ ব্যাপারে শহরের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য। ঊনবিংশ শতকে শহরের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের বহু বিত্তশালী জমিদার আসিয়াছেন। এই প্রসংগে যেসব জমিদার গ্রামের জমিদারির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া সারা বৎসর শহরে বাস করিতেন এবং কদাচিৎ গ্রামে যাইতেন (ইংরাজীতে যাঁহাদিগকে "absentee landlords" বলা হইত) তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জমিদারেরা যে সব সময় শহরের বিলাসব্যসনেই মাতিয়া থাকিতেন তাহা নহে। বরং তাঁহাদের

বদান্যতায় এবং নানা সমাজসংস্কারমূলক কাজের জন্য বহুলাংশে উন্নত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রবোধচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কলিকাতা প্রসংগে বলিয়াছেন, "রাজা রামমোহনে যার আরম্ভ রবীন্দ্রনাথে তার শেস।"

নূতন শাসনকেন্দ্র হিসাবেও ব্রিটিশভারতে বহু নূতন শহরের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটিশ-যুগের পূর্বেও শাসন-কেন্দ্র হিসাবে বহু শহরের গুরুত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইংরেজ-সরকার ভারতের শাসন ব্যবস্থার বহু নূতন নীতি ও পদ্ধতি প্রচলন করায় একশ্রেণীর শহর সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ব্রিটিশের নূতন শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি আধুনিক জিলাশহরে ব্রিটিশের নূতন শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি আধুনিক জিলা শহরগুলি। সাধারণ শাসন-পরিচালনার জন্য জিলা শহরগুলির অনুরূপ কেন্দ্র ব্রিটিশযুগের আগেও ছিল। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় পুরাতন শহরগুলিই যে শাসনকেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সব ক্ষেত্রে ঠিক নয়। সুবিধার জন্য সরকার অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন শহর হইতে নূতন শহরে শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিয়াছে। এইভাবে ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া নাগরিকীকরণের গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ নূতন ব্যবস্থার শাসন-কেন্দ্রগুলি পুরাতন ব্যবস্থার শুধুমাত্র নূতন সংস্করণই নহে, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণও বটে। নূতন ব্যবস্থায় শহরগুলিতে বহু নূতন দপ্তর স্থাপন করিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র বিচার-ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা ধরিলেই দেখা যাইবে যে নূতন ব্যবস্থায় প্রত্যেক জিলা ও মহকুমা শহরে বহু সংখ্যক বিচারক, আইনজ্ঞ ও তাহাদের সহকারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের ক্রম বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত শহরে আরো অধিকসংখ্যক অফিসের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বহু নূতন অফিসার প্রেরিত হইয়াছে। গ্রামের লোকও অধিক সংখ্যায় নিজেদের প্রয়োজনে এই সব শহরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল কারণে নাগরিকী-করণের হার যে কিছুটা বাড়িয়াছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরো একটি কারণে ভারতের শহরগুলি দেশবাসীর কাছে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। তাহা হইতেছে, এই শহরগুলির মাধ্যমেই আমাদের দেশে আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করিবে সে বিতর্ক রামমোহনের সময়েই শেষ হইয়া গিয়াছিল। ভারতবাসী একদিকে যেমন বুঝিতে পারিয়াছিল যে আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত না হইলে বিদেশী সরকারের কাছে চাকুরীর ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাইবে না, অপরদিকে তেমনই আধুনিক বিজ্ঞানের চমকপ্রদ অবদানগুলিকে সাধারণ মানুষের হিতকল্পে প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া তাহারা পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিতেছিল। ইহারই ফলে উনবিংশ শতকের শেষভাগে দেখা যায়, ভারতের বহু শহরে পাশ্চাত্য-শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে অনেকগুলি কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই দেশের মানুষ পাশ্চাত্য সাহিত্যে, দর্শন, ইতিহাস এবং বিশেষ করিয়া আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে সৃষ্ট এবং পাশ্চাত্য-প্রথায় পরিচালিত এই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার উপযোগী কেরানী সৃষ্টির কল হিসাবে আমরা যতই অভিযোগ করি না কেন, এই শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির আশীর্বাদেই যে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার সাহস অতি অল্প লোকেরই আছে। যাহাই হউক, আমাদের শহরগুলিতে এই ধরণের স্কুল কলেজের সংখ্যা ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহাদের বেশীর ভাগই ভবিষ্যৎ কর্মস্থল হিসাবে শহরকেই বাছিয়া লইয়াছে। উনবিংশ শতকে নাগরিকীকরণের হার বৃদ্ধির ইহাও উল্লেখযোগ্য কারণ।

ধর্ম ভারতের জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বহু প্রাচীনকাল হইতেই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে অগণিত তীর্থক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। তীর্থক্ষেত্রগুলি ছোটখাটো শহরে পরিণত

হইয়াছে। তীর্থভ্রমণের তীব্র আকাংখা ভারতবাসীর অতি প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। তবে রেলপথ ও অন্যান্য স্থলপথের উন্নতি হওয়ার ফলে যাতায়াতের পথ সুগম হইয়াছে এবং তীর্থভ্রমণকারীর সংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে। তীর্থযাত্রীরা অবশ্য তীর্থস্থানের স্থায়ী অধিবাসী নহে। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের ভীড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থস্থানগুলিতে যাত্রীদের আহার ও বাসস্থান এবং অন্যান্য সুখসুবিধার ব্যবস্থা হওয়ার ফলে শহর-জীবনের বিকাশ ঘটিয়াছে। আবার তীর্থস্থানগুলিতে প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া যাত্রী সমাগম হইতে থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবেও ইহাদের গুরুত্ব বাড়িয়াছে। বাস্তবধর্মী বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সভ্যতার বিস্তারের ফলে শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে ধর্মভাব কমিয়া গেলেও শহর হিসাবে প্রাচীন তীর্থস্থান-গুলির গুরুত্ব কোন অংশে হ্রাস পায় নাই। কারণ ধর্মভাব কমিলেও শিক্ষিত-সমাজের মনে দেশভ্রমণ স্পৃহা অনেক বাড়িয়াছে। ভারতের বহু তীর্থক্ষেত্র কেবলমাত্র তীর্থক্ষেত্রই নয়, সেখানে বহু দ্রষ্টব্য বস্তুও আছে যাহাদের আকর্ষণ ভ্রমণবিলাসীদের কাছে কম নয়। তীর্থক্ষেত্র ও ভ্রমণকেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এমন শহরের সংখ্যা ভারতে মোটেই নগণ্য নয়।

শহর গড়িয়া ওঠার পক্ষে অনুকূল যেসব কারণ উপরে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই ধরণের কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও অনেক সময় শহরের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন দৃষ্টান্তও ভারতে একেবারে বিরল নয়। বিশেষ কোন কারণ না থাকা সত্বেও অদ্ভুতভাবে ভারতে এমন সব শহরের উদ্ভব হইয়াছে যাহাকে ইতিহাসের ঘটনাচক্র বা ইংরাজীতে যাহাকে বলে "historical accident", তাহা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আধুনিক কলিকাতা যে ভারতের বৃহত্তম নগরী হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পিছনে অনেক অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণ হয়ত আছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ইউরোপীয় বণিকগণ যদি কলিকাতাকে তাহাদের প্রাথমিক বাসস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বাছিয়া না লইত তবে পূর্বভারতের পরবর্তী অর্থনৈতিক ইতিহাস যে অন্যভাবে রচিত হইত, একথা বলিলে কোন অতিশয়োক্তি করা হয় না। এই ব্যাপারে কলিকাতা অপেক্ষা মাদ্রাজকে উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শিল্পকেন্দ্র বা প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে মাদ্রাজশহরের গড়িয়া ওঠা যতটা সহজ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সহজ হইয়াছে বন্দর হিসাবে। অথচ আধুনিক বন্দর-বিজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বন্দর হিসাবে গড়িয়া ওঠার জন্য মাদ্রাজ অপেক্ষা যোগ্যতর স্থানের অভাব ছিল না।

এ পর্য্যন্ত নাগরিকীকরণের সহায়ক শক্তিগুলির বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল শক্তিগুলির বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন একটি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে। অনেকে মনে করেন যে, জাতিবিশেষের নগরবাসের প্রতি বিতৃষ্ণা আছে। তাঁহাদের মতে মঙ্গোলীয় বা অনুরূপ জাতির শহরের প্রতি আকর্ষণ দ্রাবিড় বা আর্য্যদ্রাবিড় জাতি অপেক্ষা কম। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালী বা অসমীয়াদের মধ্যে অতীতে শহর-প্রীতি কম ছিল। এই বিষয়ে এইরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে বলিয়া মনে হয় না। অতীতে বাংলা বা আসাম অঞ্চলের লোকেদের শহরের প্রতি আকর্ষণ কম হওয়ার কারণ হইতেছে, এই সব অঞ্চলের গ্রাম-জীবন ছিল সহজ ও সরল এবং জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ছিল অনায়াসলভ্য। এই ব্যাপার বরং যে প্রশ্নটি বেশী প্রাসঙ্গিক তাহা হইতেছে, গ্রামের কত লোক ক্রমশঃ ছদ্মবেকারে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ কি হারে গ্রামে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সৃষ্টি হইয়াছে। যখনই দেখা যায় যে গ্রামের সীমিত জমির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে কাজের সুযোগ দিতে পারিতেছে না বা তাহাদের খাদ্যের সংস্থান করিতে পারিতেছে না, তখনই গ্রামের লোক বিকল্প কর্মসংস্থানের আশায় শহরমুখী হয়। আসামে বা বাংলাদেশে নাগরিকীকরণের গতি দ্রুত না হওয়ার এই কারণটাই বড় যে এই সব অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা অতীতে এতই শক্তিশালী ছিল যে, গ্রামের

উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় বেশ কিছু পরে শহরগামী হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, উনবিংশ শতকে শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার রেলপথের প্রসার উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ প্রভৃতি কারণে একদিকে যেমন নাগরিকীকরণের গতি কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরদিকে বাণিজ্যপথের পরিবর্ত্তন, হস্ত ও কারুশিল্পের ক্রমাবনতি, মহামারীর প্রকোপ ইত্যাদি কারণে নগর ও নগরবাসীর সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের হিসাবের একদিকে যেমন দেখি, চাল ও কাঠ রপ্তানীর অন্যতম কেন্দ্রহিসাবে রেঙ্গুনের গম রপ্তানীর প্রধান বন্দর হিসাবে করাচীর, আধুনিক কারখানা শিল্পের আমেদাবাদ, কানপুর, মাদুরা প্রভৃতি শহরের, উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে লাহোর, দিল্লী, মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডি, বেরিলী, মীরাট, নারায়ণগঞ্জ, নাগপুর, হুবলী প্রভৃতি শহরের এবং শাসনকেন্দ্র হিসাবে প্রায় প্রত্যেকটি প্রাদেশিক রাজধানীর উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটিয়াছে; হিসাবের অপরদিকে তেমনই দেখি, প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পাটনা ও লক্ষ্ণৌ-এর, পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে গয়া, প্রয়াগ ও মথুরার এবং প্রসিদ্ধ হস্ত ও কারুশিল্পের কেন্দ্রহিসাবে ইন্দোর, বরোদা প্রভৃতি শহরের দুঃখজনক অবনতি ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকের শহরগুলির প্রকৃতির সঙ্গে উনবিংশ শতকের শহরগুলির প্রকৃতির তুলনা করিলে একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় শতকেই ভারতে মোটামুটি তিনশ্রেণীর শহর বিদ্যমান ছিল। এই তিনটি শ্রেণী হইতেছে, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্র, তীর্থস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গুরুত্বের দিক হইতে অষ্টাদশ শতকে শাসন ও বিচারব্যবস্থার কেন্দ্রগুলির স্থান ছিল প্রথম। তারপর গুরুত্বপুর্ণ শহর ছিল তীর্থস্থানগুলি এবং সর্বশেষ স্থান ছিল বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির। উনবিংশ শতকের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। এই শতকে গুরুত্বের দিক দিয়া প্রথম স্থান পাইয়াছে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে শাসনকেন্দ্র হিসাবে রাজধানী শহরগুলি এবং সর্বশেষ স্থান পাইয়াছে তীর্থস্থানগুলি।

নাগরিকীকরণের গতিকে যদি কোন দেশের শিল্পায়নের মাপকাটি হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়, তবে উনবিংশ শতকের শেষে ভারতে যে পরিমাণ নাগরিকীকরণ ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে ঐ সময়ে ভারতের শিল্পায়নের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি? এই প্রশ্নের কোন সহজ ও সরল উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যের দিক হইতে দেখা যাইতেছে যে, উনবিংশ শতকের শেষ তিন দশকে শহরবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ১'১৬ শতাংশ। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, ১৮৭০ এর দশকে ভারতে শহরবাসীর শতকরা হার উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের হার অপেক্ষা কম ছিল, (যাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি) তবে বলা যাইতে পারে, উনবিংশ শতকের প্রথমে ও শেষে নাগরিকীকরণের হার অপরিবর্তিত ছিল। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে যে, উনবিংশ শতকের প্রথমে ও শেষে ভারতে শিল্পায়নের হার প্রায় এক ছিল। শহরের দিক হইতে যেমন দেখি, একদিকে কতকগুলি নূতন শহরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কতকগুলি পুরাতন শহর ধ্বংস হইয়াছে, শিল্পের দিক দিয়াও তেমনই দেখি, কয়েকটি আধুনিক শিল্পের পত্তন হইয়াছে,—বিশেষত বস্ত্র, পাট ও চা-বাগিচা শিল্পের বেশ উন্নতি হইয়াছে কতকগুলি হস্ত ও কারু শিল্পের নাটকীয় অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই নূতন শিল্পগুলির উন্নয়নের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে দেশের যে পরিমাণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি হইতে পারিত, তাহা সম্ভব হয় নাই। কারণ, হস্ত ও কারুশিল্পের অবনতির ফলে কর্মসংস্থানের প্রভূত সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। আধুনিক শিল্পের প্রসার ও পুরাতন শিল্পের অবনতি, এই উভয়ের সর্বশেষ ফল হইতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাহাতে বলা যাইতে পারে যে উনবিংশ শতকের শেষে ভারতে শিল্পায়নের গতি ঐ শতকের প্রথম দিকের গতি অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে ভারতের একটা বিশেষ পার্থক্য

ছিল। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পুরাতন শিল্প ও শহরের অবনতির ফলে শিল্পায়ন ও নাগরিকীকরণের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিতে নূতন শিল্প ও শহরগুলির পঞ্চাশ বৎসরের বেশী লাগে নাই। ভারতের ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণ কিন্তু একশত বৎসরেও সম্ভব হয় নাই।

পরিশেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আলোচনা শেষ করিতে চাই। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের মধ্যে যখন আধুনিক শিল্পের আশানুরূপ বিস্তার ঘটে নাই, তখন আমরা আশা করিতে পারি না যে শিল্পের অত্যধিক স্থানিকতার ফলে বৃহত্তর নগরসমষ্টি বা ইংরাজীতে যাহাকে বলে "Conurbation", তাহা গড়িয়া উঠিবে। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্পবিপ্লবের একশত বৎসরের মধ্যেই একশ্রেণীর বৃহৎ নগরের চারিপাশে একাধিক স্যাটেলাইট নগরীর বা উপগ্রহনগরীর সমাবেশ দেখা যায়। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ভারতের কোথাও এই ধরণের নগর-সমাবেশ দেখা যায় নাই। বিংশ শতকের মধ্যভাগে অবশ্য জামসেদপুর, কলিকাতা, কানপুর প্রভৃতি শহরের চারিপাশে এই ধরণের শহর-সমষ্টির আবির্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

শেক্সপীয়রের একখানি অলৌকিক নাটক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

নাটকীয় উৎকর্ষতার দিক দিয়ে বিচার করলে শেক্সপীয়রের অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক, প্রথম শ্রেণীর নয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর হলেও ভাষার ঔজ্জ্বল্যে ঘটনার অভিনবত্বে সংলাপের চমৎকারিত্বে—বিশেষ করে রোমান্টিক আড়ম্বর ও জৌলুষে এ নাটকখানি শেক্সপিয়রের অন্য সব নাটক দূরে থাক, অনেকাংশে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিং লিয়র, ওথেলো প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নাটকের প্রায় সমগোত্রীয়—একথা স্বীকার করেছেন অনেক শ্রেষ্ঠ সমালোচকও। কবি কোলেরিজ বলেছেন—Of all Shakespeare's historical plays Antony and Cleopatra is by far the most wonderful. বস্তুত শেক্সপীয়রের আর কোন ঐতিহাসিক ট্রাজেডিই এমন নিখুঁত ইতিহাসভিত্তিক নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ট্রাজেডির ক্ষেত্রে তিনি যে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, এ নাটকের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। ইতিহাসকে কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে পুরোপুরি প্লুটার্ক লাইফ অনুসরণ করেই তিনি গড়ে তুলেছেন এ নাটক। প্রখ্যাত শেক্সপিয়র সমালোচিকা মিসেস জেমসন তাঁর Characteristics of Women গ্রন্থেও একথা স্বীকার করে বলেছেন—

"I have not the slightest doubt that Shakespeare's Cleopatra is the real historical Cleopatra—the rare Egyptian individualised and placed before us···she dazzles our faculties, perplexes our judgement, bewilders and bewitches our fancy, from the beginning to the end of the drama we are conscious of a kind of fascinations against which our moral sense rebels, but from which no escape."

নাটকখানি আদ্যোপান্ত নীতি ও সমাজবিরুদ্ধ আচার-আচরণ ও ভাবাদর্শের উৎস হলেও এর বলিষ্ঠ সংলাপ, ঘটনার চমক, অপূর্ব নাটকীয় বিন্যাস ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত নায়ক-নায়িকার উদগ্র আবেগ, বিলাস-আড়ম্বরের চোখ ঝলসানো দীপ্তি, আভিজাত্য গর্বোদ্ধত সদর্প পদক্ষেপ পাঠকের হৃদয়কে আগাগোড়া এমনি অভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে যে তার নৈতিক বিচারবুদ্ধি সেখানে বিমূঢ়, ভালমন্দ প্রশ্ন উচ্চারণের অবকাশটুকুও সেখানে বিলুপ্ত। অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা যেন এক কল্পরাজ্যের অভিশপ্ত মানব-মানবী। তাঁদের রীতিনীতি, আশা-আকাঙ্খা, বিলাস-ব্যসন, প্রেম-বিরহ ক্রোধ-অভিমান, আচার-আচরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অভিনব এবং অলৌকিক। সে অতি মানব-মানবীর রথচক্র যেন ধরণীর ধূলি স্পর্শ করে না—একটা অপার্থিব স্বপ্নলোক যেন তার বিচরণ ক্ষেত্র। প্রখ্যাত সমালোচক হাডসনও তাই অনেকটা মিসেস জেমসনের মতের প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন—

"The drama is equally daring, equally audacious in a moral sense. For as regards the hero and heroine it is noteworthy point how little we feel or think of any moral or immoral quality in their doings. In their intoxication of empire, of self-aggrndizement, and of mutual passion, they fairly overshoot the whole region of duty of obligation."

বস্তুত অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা শেক্সপীয়রের এক অভিনব সৃষ্টি। এ নাটকে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা তাঁর অন্য কোন নাটকে একান্ত দুর্লভ। রঙ্গমঞ্চের সাজানো অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখে কিছুটা প্রেম-প্রণয়, বিরহ-উচ্ছ্বাস, অন্তর্দ্বন্দ্বের তরঙ্গ-বিক্ষোভ জীবন দর্শনের সীমিত সংলাপ আর তার সঙ্গে কিছুটা ঘটনা সংঘাত জুড়ে সচরাচর

যে ছকে নাটক রচিত হয়, এ নাটকের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়র সে গতানুগতিক ধারা একেবারেই পরিহার করে চলেছেন। সমস্ত নৈতিক বিচারবুদ্ধি ও শুচিবোধের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অলঙ্কারমুক্ত ভাষায় পাঠকের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার উদ্দাম প্রেমাভিসারের বহু বিচিত্র বর্ণাঢ্য চিত্র। তাঁর নায়ক-নায়িকার গতি নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাই নাট্যকারের নেই। তাঁরা কি বলবেন, কি করবেন, তাঁদের প্রমোদতরী প্রণয়ের উদ্দাম ঘূর্ণিপাকে কখন কোন্ মুখে ধাবিত হবে সে শুধু তাঁরাই জানেন। শেক্সপিয়র যেন সেই দুর্বার এবং দুর্জ্ঞেয় গতিচ্ছন্দের আবহ পরিবেশক মাত্র।

নিম্নের সামান্য একটু সংলাপের মধ্য দিয়ে দুইটি প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা লক্ষ্য করবার মত। একজন ঈর্ষাবিষদগ্ধা, সদা সংশয়াকুলা, বহু অভিনীত প্রণয়-রজনীর ছলাকলা কুশলা নিপুণা অভিসারিকা, অপরজন যেন জলকেলিরত প্রমত্তবারণ জগৎ সংসারে ভ্রূক্ষেপহীন সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব সঙ্কোচমুক্ত উদ্দাম-প্রেমের স্রোতে গা ভাসানো পুরুষ—

Cleopatra—If it be love indeed, tell me how much?
Antony—There is beggery in love that can be reckon'd.
Cleopatra—I ill set a bourn how far to be belov'd
Antony—Then must thou needs find out new heaven new earth.

রোমক সাম্রাজ্যের দিক্‌পাল অসাধারণ শৌর্য্যের অধিকারী অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার প্রেমে এমনি আত্মহারা যে সে প্রেমের স্রোতে লোক নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব নিজের গৌরবোজ্জল ভবিষ্যৎ, এমন কি অদ্ধ পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যের রাজদণ্ডও তুচ্ছ তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাচ্ছে। তাই অক্টাভিয়সের দূত মিশরে এসে যখন রোমের সঙ্কটে সত্বর অ্যান্টনির রোমে ফিরে যাওয়া অত্যাবশ্যক বলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ক্লিওপেট্রার বাহুপাশবদ্ধ অ্যান্টনি তখন বলে উঠছেন—

Let Rome in Tiber melt, and the wide arch
Of the ranged empire fall! Here is my space
Kingdoms are clay: our dungy earth alike
Feeds beast as man: the nobleness of life
Is to do thus, when such a mutual pair
And such a twain can do't in which I bind
On pain of punishment, the world to weet
We stood up peerless.

যে প্রেমের তীব্র আকর্ষণ মানুষের বিচারবুদ্ধি লোপ করে, অতীত ভবিষ্যৎকে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে সকল পার্থিব যশ-গৌরব, ঐশ্বর্য্য আধিপত্যকে তুচ্ছ কিঞ্চিৎকর করে তোলে এ সেই উদ্দাম প্রেম। বলা বাহুল্য এই প্রেম এবং তার পরিণতিই এ নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু। অন্য সব ঘটনা এবং পার্শ্ব চরিত্র সেই মুখ্য বিষয়ের দিকেই নাটকখানিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক মাত্র। কোন কোন সমালোচক এ নাটকখানির যে বিরূপ সমালোচনা করেছেন তা এই মুখ্য চরিত্র এবং তার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি না করারই ফল।

শেক্সপীয়রের অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রাকে এক হিসেবে বলা যায় ঠিক জুলিয়াস সিজারের পরবর্ত্তী নাটক। জুলিয়াস সিজারে আমরা পাই অ্যান্টনির জীবনের প্রথমাদ্ধ, অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রায় পাই তার শেষাদ্ধ। ফিলিপ্পির যুদ্ধে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে অ্যান্টনি, অক্টাভিয়াস, সিজার ও লেপিডাস—এই তিন রোমকবীর হলেন রোমের সর্ব্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। জুলিয়াস সিজার নাটকের এইখানেই পরিসমাপ্তি। ঠিক এর পরবর্তী অধ্যায় থেকেই অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা নাটকের সূচনা। দুই নাটকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১০।১২ বৎসরের বেশি নয়। প্লুটার্ক বলেন, নায়ক নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকালে উভয়েই প্রায় যৌবনোত্তীর্ণ। অ্যান্টনির বয়স ৪২ আর ক্লিওপেট্রার ২৮। উভয়েই আবার গুটিকতক সন্তানের জনক জননী। সুতরাং যৌবনের দুকূলভাঙ্গা প্রণয়বেগ মন্দীভূত হয়ে উভয়ের মধ্যেই এসেছে তখন বিচারবুদ্ধির সচেতনতা, গভীরতা,

স্থৈর্য্য ও সংযম। যৌবনের পীযূষ তারল্য রূপান্তরিত হয়েছে তখন দুগ্ধের ঘনীভূত সুষমায়।

কিশোরী ক্লিওপেট্রা তাঁর প্রথম যৌবনের সদ্যস্ফুট দেহ-কিশলয়ে একদা পূজা করেছেন মহাবীর পম্পির, তৃপ্ত করেছেন দিগ্বিজয়ী সিজারকে। স্বার্থবিমুক্ত না হলেও সে দেহদানের মধ্যে ছিল তাঁর কৈশোরোচিত প্রেমের খেলা, ছিল না অনুরাগের প্রগাঢ়তা। থাকা সম্ভবও নয়। একজন অপরিণতবুদ্ধি চপলা কিশোরী, অপরজন সাম্রাজ্যশাসন-গুরুভারক্লিষ্ট সমর নায়ক, রাজনীতি-বলি-রেখাঙ্কিত-কপোল প্রৌঢ়। দেহ ও মনে উভয়েরই ব্যবধান এত যে প্রণয় অঙ্কুরিত হওয়ার অনুকূল মৃত্তিকার সেখানে একান্ত অভাব।

কিন্তু অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার ক্ষেত্রে ছিল না এসব প্রতিকূলতা, উভয়েই যোগ্য নায়ক-নায়িকা, উভয়েই প্রণয়-লীলামঞ্চের বহু রজনীর কুশলী শিল্পী। যেন পরস্পর পরস্পরের জন্যই একান্তভাবে সৃষ্ট ক্রৌঞ্চমিথুন। একে অন্যের পরিপূরক—একটি সমগ্রের অবিভাজ্য অবিচ্ছেদ্য দ্বৈত সত্তা। তাই উভয়ের অবচেতন মনের তলায় যে অদম্য বাসনা, উদগ্র বিলাস, অপরিমিত ব্যসনাসক্তি, আকাশচুম্বী উচ্চাভিলাষ অনুকূল বায়ুর প্রতীক্ষায় ছিল সুপ্ত, প্রথম দর্শনেই তা যেন সহসা জাগ্রত হয়ে উঠল প্লাবনের বেগ নিয়ে।

প্লুটার্ক বলেছেন, হ্রস্বকায়া, অটুট স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের অধিকারিণী ক্লিওপেট্রা ছিলেন আবার স্বভাবমিতাঙ্গী। এ শ্রেণীর নারীর যৌবন-স্রোতে ভাটার টান স্বভাবতই মন্থর ও অপরিদৃশ্যমান। তাই বয়সের দিক দিয়ে যৌবন-সায়াহ্নে এসেও ক্লিওপেট্রার দেহে মধ্যাহ্নের দীপ্তি তখনো অটুট অম্লান। অধিকন্তু বয়সের সঙ্গে প্রেমের বহুমুখী ছলাকলা, চটুল লাস্য ও বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি সংযোজিত হয়ে সেই যৌবন-সায়ন্থকে করে তুলেছে আরো রাগ-লোহিত, লীলাচঞ্চল, রহস্যগভীর, আরো বেশি মোহ-মদির। অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রার দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অ্যান্টনির সহকারী সেনানায়ক Enoberbus এর মুখনিঃসৃত সামান্য একটু বর্ণনার মধ্য দিয়ে শেক্সপীয়র প্লুটার্ক বর্ণিত ক্লিওপেট্রার যে বাস্তব ঐতিহাসিক রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যি অপূর্ব্ব—

> Age cannot wither her, nor custom stale
> Her infinite variety. Others women cloy
> the appetites they feed, but she makes
> hungry where most she satisfies.

অটুটযৌবনা এ নারী। বয়সের নিষ্পেষণে এ যৌবনলতার পত্র ঝরে পড়ে না, বিকচকুসুম বৃন্তচ্যুত হয় না। অফুরন্ত রূপ-ঐশ্বর্য্যময়ী এ ললনা—বহু বিচিত্র এর লীলাবিলাসের জৌলুষ। বিদগ্ধিতের দীর্ণতা শীর্ণতা বা পুরাতনের জীর্ণতা স্পর্শ করতে পারে না সে জৌলুষকে, পারে না নিষ্প্রভ নিস্তেজ করতে সে জলদচ্ছি-দীপ্তি। উপভোগের অবারিত অধিকারে পুরুষকে আকণ্ঠ তৃপ্ত করে তার বেগকে স্তিমিত করে তোলে যে সব অপ-রিণামদর্শিনী নায়িকা—এ সে নায়িকা নয়। অসামান্যা এ নারী—সম্ভোগে যত বেশি তৃপ্তি দেয়, আকাঙ্ক্ষার শিখা তত বেশি লেলিহান করে তোলে—এই হল এর বৈশিষ্ট্য।

বৈশিষ্ট্য ক্লিওপেট্রা-চরিত্রের শুধু এইখানেই শেষ নয়। সমগ্র নাটকখানির মধ্য দিয়েই শেক্সপীয়র এ চরিত্রটিকে এমন নিপুণ নিখুঁত এবং বৈদূর্য্যপ্রভায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন যে প্রতি দৃশ্যে তা পাঠক-চিত্তকে করে তোলে বিমোহিত ও চমৎকৃত। এমন কি এ চরিত্রের চোখ-ঝল-সানো দীপ্তির কাছে অ্যান্টনি-চরিত্রও যেন অপেক্ষাকৃত ম্লান ও নিষ্প্রভ।

একদিকে অতুলনীয় মাধুর্য্য, বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি, প্রখর প্রণয় চাতুর্য্য, আর একদিকে প্রগলভ বিলাস-ব্যসন, শিশুসুলভ চাপল্য আর আত্মহারা তোষামোদপ্রীতি। কখনো উৎকট খামখেয়ালীপনা, অসংযত ঈর্ষাক্রতার উগ্র রোষ। কখনো আবার নারীসুলভ কমনীয়তা, নমনীয়তা, প্রেম-বিহ্বলতার উন্মাদ আবেগ। কখনো কুহকিনী, বিলাসবাসকশয্যাশায়িনী মদালসার মোহময়ী রূপ, কখনো আবার অগ্নিশ্বসিত ভুজঙ্গী জিঘাংসা-ক্ষিপ্তা দানবীর রুদ্র-মূর্তি। কখনো সামান্যা নারীর কোমলতা, ভীরুতা আর দীনতা নিয়ে Pardon Pardon বলে অশ্রুসিক্ত চোখে নতজানু হয়—কখনো আবার পরাজয়ের গ্লানি এবং বন্দীত্বের অবমাননার মধ্যেও আভিজাত্যের দীপ্তরোষে গর্জ্জে উঠে—

"I shall show the cinders of my spirit from the ashes of my chance."

এমনি একটি ছলাকলা এবং লীলাচপলা নারীর বহু বিচিত্র যাযাবরী চরিত্রকে যথাযথ রূপায়িত করার দুষ্কর তপস্যায় এক মাত্র শেক্সপীয়রই সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন। শেক্সপীয়রের যাদুস্পর্শে প্লটার্ক বর্ণিত মূক ইতিহাসের শিলীভূত কঙ্কাল রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে আমাদের চোখের সমুখে যেন জীবন্ত ও মুখর হয়ে উঠেছে।

সামান্য এক-একটু বর্ণনার মধ্য দিয়ে এক-একটি অসামান্য এবং বহুবর্ণোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়ে তুলে শেক্সপীয়র এ নাটকের অনেক পাঠককে বার বার চমৎকৃত ও অভিভূত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের আর একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা যেতে পারে—

নীলনদের বক্ষ আলোড়িত করে ছুটে চলেছে একখানি স্বর্ণমণ্ডিত প্রমোদতরী। তরীর কাণ্ডারী সকলেই নারী। মৎস্যকন্যার মত শত শত মিশরী রূপসীর কুসুম-পেলব হস্তে শোভা পাচ্ছে রজতনির্মিত ক্ষেপণি। সুমধুর বংশীধ্বনির তালে তালে সে ক্ষেপণি। নামছে আর উঠছে আর তড়িৎ গতিতে ছুটে চলেছে সে বিদ্যুৎপ্রভ জলযান। শত রূপসীর অঙ্গ সুষমার সঙ্গে মিশরী সুগন্ধীর সৌরভমদিরা বিগলিত হয়ে সমগ্র পরিমণ্ডলকে করে তুলেছে প্রেম-বিহ্বল —স্বর সম্মোহিত। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধবিধুর এই নন্দন পরিবেশে শতদলবেষ্টিতা কমলরাণীর মত শত রূপসী সহচরীর মাঝখানে সকল সৌন্দর্যকে ম্লান করে যিনি অর্দ্ধশায়িতা—তিনিই বিশ্ববিমোহিনী ক্লিওপেট্রা।

বিজিগীষুর রণদুন্দুভি এইখানে এসে স্তব্ধ, শিথিল দিগ্বিজয়ীর তরবারিমুষ্টি। এ কুসুমকুঞ্জে রণদেবতা পতঙ্গের মত বন্দী। মন্দার বিছানো এ লীলাবিতানে কোন ক্ষুদ্র তুচ্ছ বা নগণ্যের স্থান নেই—সবই বিরাট বিশাল এবং রাজসিক। ঐশ্বর্য্য এখানে নীলনদের জলরাশির মতই অগাধ অফুরন্ত কীর্ত্তি—পিরামিডের মত বিশাল অভ্রভেদী। প্রেমও এখানে বিরাট প্রেয়সীর এক ফোঁটা অশ্রুজলে ধুয়ে যায় পরাজয়ের সকল গ্লানি, ভেসে যায় সসাগরা সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য—

Fall not a tear, I say, one of them rates
All that is won and lost, give me a kiss,
Even this repays me.

ক্রোধও এখানে তুচ্ছ বা সাধারণ নয়, ঐশ্বর্য্যদীপ্ত গলিত সুবর্ণের মত ভয়াল সুন্দর—

The gold I give thee will I melt and pour.
Down thy ill-uttering throat.

পরাজয়ের যে গ্লানি তাও এখানে আভিজাত্যের গর্ব্বে উন্নতশির—

A Roman by a Roman valiantly vanquished.

কিন্তু সকল সৌন্দর্য্য এবং সকল আভিজাত্যকে যা ম্লান করে দিয়েছে তা হল এর মহামরণের বিচিত্র রূপসজ্জা। করাল কৃষ্ণসর্পের বক্ষস্তন পানের মতই তা যেমনি ভয়াবহ তেমনি দিগবলয় উদ্ভাসিত মেরুজ্যোতির মত চমকপ্রদ—

Peace Peace
Dost thou not see my baby on my breast,
That sucks the nurse asleep ?

আকৈশোর প্রগলভা স্বৈরিণী, অসূয়া-বিষদগ্ধা, উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল, বিলাস-ঐশ্বর্য্যমত্তা-ভীরু ও অস্থিরচিত্ত এক নারী তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে দুর্ব্বার সাহস ও অসাধারণ মনোবলের পরিচয় দিয়ে মৃত্যুকে যে অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত ও গৌরবদীপ্ত করে তুলেছেন তা সত্যই অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব। এমন অভিজাত এবং অভিনব মৃত্যু-জগতের কোন শ্রেষ্ঠ কবি বা শিল্পীও কোন কালে পরিকল্পনা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

সে মহনীয় মৃত্যু দৃশ্য দেখে বিজয়ী অক্টাভিয়াসের মত আবেগমুক্ত গূঢ় অভিসন্ধিপরায়ণ মুগ্ধ পুরুষও হয়ে বলে উঠেছেন—

She looks like sleep
As she would catch another Antony
In her strong toil of grace—
She shall be buried by her Antony
No grave upon the earth clip in it
A pair so famous.

অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা নাটকের এই সামগ্রিক সৌন্দর্য্য ও রোমান্টিকতায় মুগ্ধ হয়েই প্রখ্যাত সমালোচক Hazlitt বলেছেন—

"Shakespeare's genius has spread over the whole play a richness like the overflowing of the Nile."

কোন কোন সমালোচকের অভিযোগ এই যে অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা নাটকে শেক্সপীয়র শুধু দুটি উচ্ছৃঙ্খল নায়ক-নায়িকার উদ্দাম অসংযত প্রেমের কাহিনীই বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে কোন উচ্চ আদর্শ, কোন মহৎ বা উদার চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস নেই। ইচ্ছে করলে শেক্সপীয়র ঐ দুটি উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী নরনারীর পাশাপাশি মহীয়সী অক্টাভিয়া চরিত্রটিকে সুপরিস্ফুট করতে পারতেন। পারতেন অক্টাভিয়াস সিজারকে উদার ও মহৎগুণে ভূষিত করে নাটকখানিকে কতকটা হ্যামলেট, ম্যাকবেথ বা ওথেলোর মত উচ্চমানে তুলে ধরতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব অভিযোগের উত্তরদানের পূর্ব্বে সিজার ও অক্টাভিয়ার চরিত্র দুটি নিয়ে একটু আলোচনা দরকার। কেননা নায়ক নায়িকার পরই এ নাটকে এ দুটই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

সুন্দরী সাধ্বী, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্ত প্রতীক মহীয়সী অক্টাভিয়া এ কাব্যে যে উপেক্ষিতা, এ সত্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। অ্যাণ্টনি বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল, একপত্নী বর্ত্তমানেও ক্লিওপেট্রার প্রেমাসক্ত হয়ে রাষ্ট্রনায়কের সকল কর্ত্তব্য জলাঞ্জলি দিয়ে মিশরে দিন কাটাচ্ছেন। বয়সের দিক দিয়েও অক্টাভিয়ার সঙ্গে তাঁর ব্যবধান অনেক। কিন্তু এত সব জানা সত্ত্বেও ফুলভিয়ার মৃত্যুর পর বিচক্ষণ এবং নীতিনিষ্ঠ সিজার সেই অ্যাণ্টনির সঙ্গেই তাঁর প্রিয় ভগ্নীর বিবাহ কেন দিলেন—এ একটা প্রশ্ন। উত্তরে বলা যায়, এটা রাজনৈতিক বিবাহ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইতিহাসে এ রকম বিবাহের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অ্যাণ্টনির মত বীর এবং প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় রাখাই যে ছিল এ বিবাহের গূঢ় উদ্দেশ্য তাতে সংশয় নেই। তা ছাড়া সিজার হয়ত ভেবেছিলেন অক্টাভিয়ার মত সুন্দরী সাধ্বী ও আদর্শনিষ্ঠ পত্নীর সংস্পর্শে এসে হয়ত অ্যাণ্টনির জীবনে পরিবর্ত্তন আসবে। ক্লিওপেট্রার মোহ মুক্ত হয়ে আবার তিনি হয়ত রোমের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন। যদিও সে ধারণা অচিরেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল।

অ্যাণ্টনির সঙ্গে বিয়ের পরেই অক্টাভিয়া কিন্তু পড়লেন উভয় সঙ্কটে; তিনি দেখলেন স্বামী ও ভ্রাতা উভয়েই বিবদমান। একে অপরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী অথচ উভয়েই তাঁর প্রিয়। উভয়ের মধ্যে আবার আপোষ মীমাংসার তিনিই একমাত্র যোগসূত্র। শেক্সপীয়রের Corialanus নাটকে ভলামনিয়ারও ছিল কতকটা অনুরূপ সঙ্কট। একদিকে পুত্র আর একদিকে দেশ—একের রক্ষার অর্থই হল অপরের ধ্বংস। কিন্তু প্রৌঢ়া, প্রবীণা ভলামনিয়া তাঁর বয়সোচিত প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত যেমন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন, সংসার অনভিজ্ঞা কোমলপ্রাণা তরুণী অক্টাভিয়ার পক্ষে তা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। ভ্রাতা ও স্বামীর মধ্যে আপোষ মীমাংসার কোন যোগসূত্র খুঁজে না পেয়ে অক্টাভিয়া দিশেহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। শেক্সপীয়র সামান্য কয়েকটি লাইনের মধ্য দিয়ে অক্টাভিয়ার সঙ্কটবিমূঢ় মৌনমধুর ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থাটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

Her tongue will not obey her heart, nor can
Her heart inform her tongue,—the swan's
down feather
That stands upon the swell at full tide,
And neither way inclines.

স্বামীর উপেক্ষিতা এবং পরিত্যক্তা হয়েও অক্টাভিয়া নীরবে সে মর্ম্মব্যথা গোপনই রেখেছেন। ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ দূরে থাক, কখনো স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের মৃদু বাণী উচ্চারণ করে ও ভ্রাতার মনে কোন বিরাগ সৃষ্টির প্রয়াসী হন নি। কিন্তু এত মৃদুতা সহিষ্ণুতা ও কোমলতার মধ্যেও তাঁর আদর্শনিষ্ঠা, আত্মমর্য্যাদাবোধ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির দৃঢ়তা ছিল বিস্ময়কর। অ্যাণ্টনির মৃত্যুর পর ভ্রাতার শত অনুরোধেও তিনি স্বামীগৃহ ছেড়ে কখনো ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। শুধু কি তাই? অ্যাণ্টনির প্রথমা স্ত্রী ফুলভিয়ার সন্তানসন্ততি এবং অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার অনাথ ও অসহায় শিশু সন্তানগুলিকে পর্য্যন্ত

নিজের গর্ভজাত সন্তানদের সঙ্গে সমান মাতৃস্নেহে লালন পালন করে নারীত্ব ও মাতৃত্বের যে আদর্শ রেখে গেছেন, জগতের ইতিহাসে তা সত্যিই অনন্য। কিন্তু, এ নাটকে মাত্র চারিটি দৃশ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য অক্টাভিয়াকে মঞ্চে এনেছেন, শেক্সপীয়র তাও প্রায় মূক ও গৌণ চরিত্র রূপেই। সুতরাং অক্টাভিয়া যে এ কাব্যে উপেক্ষিতা এ অভিযোগ প্রায় সর্ব্বজনস্বীকৃত।

অক্টাভিয়াস সিজার সম্বন্ধে প্লুটার্ক বলেন, এ একটি দোষগুণ মিশ্রিত চরিত্র। মুখে সদ্য গুম্ফরেখার আভাস, ১৯ বৎসরের এ তরুণের মধ্যে যে স্থিতপ্রজ্ঞা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সংযম এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রবীণ এবং অসাধারণ রণকুশল অ্যান্টনির মধ্যে যদি তার এক ভগ্নাংশও থাকত তবে তিনি একাই রোমক সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু অনেক গুণের অধিকারী হয়েও সিজার কিন্তু নির্জলা আদর্শবাদী ছিলেন না। কূটনৈতিক দুরভিসন্ধিতে তিনি ছিলেন যেমন সিদ্ধহস্ত, স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনেও ছিলেন তেমনি নির্ম্মম নিষ্ঠুর। বলাবাহুল্য যে শেক্সপীয়র কোন কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে সিজারের এই ঐতিহাসিক চরিত্রটিকেই এ নাটকে রূপায়িত করেছেন। অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার মত আভিজাত্য, গর্ব্ববোধ সিজারেরও কিছু কম ছিল না কিন্তু প্রয়োজনমত তাকে তিনি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

ভ্রাতা ও স্বামীর ভুল বুঝাবুঝি ও ক্রমবর্দ্ধমান মনোমালিন্য দূর করবার জন্য অক্টাভিয়া যখন নিজের পদমর্য্যাদানুরূপ রোমক আড়ম্বর বর্জন করে গোপনে এবং সাধারণ বেশে এথেন্সে স্বামীর কাছ থেকে রোমে ভ্রাতার প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন, অক্টাভিয়াসের রোমক আভিজাত্য তখন নিদারুণ আহত হল। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—

Like Caesar's sister: the wife of Antony
Should have an army for an usher, and
The neighs of horse to tell of her approach
Long ere she did appear, the trees by the way should have borne men, and expectation fainted.

Longing for what it had not, nay the dust should have ascended to the roof of heaven, Raised by your populous troops, but you are come A market maid to Rome, and have prevented the ostentation of our love, which, left unshown, Is often left unloved, we should have met you by sea and land, supplying every stage with an augmented greeting."

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অক্টাভিয়ার এ অনাড়ম্বর আগমন যে তাঁর নিজেরই ইচ্ছাকৃত; আভিজাত্যগর্ব্বী অ্যান্টনিরও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত এবং এটা তাঁর অজ্ঞাতসারে অক্টাভিয়া নিজের ইচ্ছায়ই করেছে, এ সত্য অক্টাভিয়া সিজারকে বার বার জানানো সত্ত্বেও সিজার তাতে কর্ণপাত না করে এটাকে তাঁর এবং তাঁর ভগ্নীর পদমর্য্যাদার প্রতি অ্যান্টনির ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা ও অবমাননা, অধিকন্তু নিজের বিবাহিতা পত্নীর প্রতি উপেক্ষা—তাঁর অনুরাগী রোমকদের মধ্যে সাড়ম্বরে একথা প্রচার করে অ্যান্টনির বিরুদ্ধে তাঁর কূটনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রস্তুত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলেন না।

অক্টাভিয়াস সিজারের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়র কোন কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক চরিত্রটিকেই ঠিক যতটুকু প্রয়োজন নাটকের ভিতর তুলে ধরেছেন। কিন্তু অক্টাভিয়ার ক্ষেত্রে ঘটিয়েছেন এর ব্যতিক্রম। তিনি সন্তর্পণে এই ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে অন্তরালে রেখে নাটককে গতিশীল করে তুলেছেন। অকুশলী এবং আবেগপ্রবণ নাট্যকাররা নাটকের পার্শ্ব চরিত্রকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সচরাচর নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্যকে যে ভাবে ব্যাহত করেন, শেক্সপীয়রের মত দক্ষ-শিল্পী তা কখনই ঘটতে দিতে পারেন না। এটা তিনি ভালভাবেই জানতেন যে অক্টাভিয়া চরিত্রের যথার্থরূপ পরিস্ফুট করার এটা স্থান নয়, তা করতে গেলে মূল আখ্যায়িকাই শুধু নয়, তার মুখ্য চরিত্র দুটিও সমানভাবে দুর্ব্বল ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। তাই তিনি সযত্নে সে পথ পরিহার করে গেছেন। সুতরাং এক শ্রেণীর উন্নাসিক সমালোচক যে এ নাটকের বিরূপ সমালোচনা করেন সে তাঁদের আবেগ-প্রবণতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম নাট্যরসজ্ঞানের অভাবেরই পরিচায়ক।

অযোধ্যার নবাব

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৪)

ছেলেবেলা, পরীখানা, প্রথম যৌবন—

ওয়াজিদ আলীর জন্ম হয় ১৮২২খৃঃ ১০ই জুলাই। তখন ষষ্ঠ নবাব গাজী-উদ্‌দীন হায়দরের আমল, যাকে লর্ড হেস্টিংস প্রথম 'অযোধ্যার রাজা' খেতাব দেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সহায়তা করার জন্যে।

ওয়াজিদ আলীর যখন চার বছর বয়স, তখন গাজী-উদ্‌দীনের মৃত্যুতে নাসির উদ্‌দীন হায়দর অযোধ্যার মসনদ লাভ করেন। নাসির উদ্‌দীনের দশ বছর রাজত্বকালে (১৮২৭ থেকে ১৮৩৭ খৃঃ) অতিবাহিত হয় ওয়াজিদ আলীর জীবনের প্রথম ১৫ বছর। নাসীর উদ্‌দীন হায়দরের নবাবী জীবন ও বিলাস-ব্যসনের উল্লেখ যথাস্থানে করা হয়েছে।

তৎকালীন হারেমের কি পরিবেশে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছিল, লক্ষ্ণৌ নবাবী-জীবনে অবক্ষয় তখন কতখানি, তা ওয়াজিদ আলীর নিজের বিবৃতি থেকেই জানা যায়। তাঁর বাল্যকালের পারিপার্শ্বিকের কিছু পরিচয় তিনি দিয়েছেন স্বরচিত হারেমের বৃত্তান্ত বা 'তারিখ-এ-পরীখানা' পুস্তকে। হারেমের সুকণ্ঠি গায়িকা নটীদের পরী নামে তিনি অভিহিত করেছেন। তারিখ-এ-পরীখানা থেকে এখানে কিছু অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হল—

'আমার যখন আট বছর বয়স তখন আমি একটি রমণীর সংস্পর্শে আসি। সে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী একজন ধাত্রী। অনেক সময়ে সে আমার কাছেই থাকত। তার নাম রহিমন। এক রাতে আমি অঘোরে ঘুমিয়েছিলুম এমন সময় সে আমায় জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলে। আমি জেগে উঠে পালিয়ে যেতে চাইলে সে আমাকে ছাড়লেনা, বকুনি দিয়ে আটকে রেখে দিলে। সেদিন থেকে সে প্রত্যহ জ্বালাতন করত আমায়। আমার যখন দশ বছর বয়স, তখনো পর্যন্ত এমনি চলেছিল। গোড়া থেকেই আমার স্বভাবের ঝোঁক ছিল মহব্বতের দিকে। আমার ওপর প্রেমের আধিপত্য ছিল।

'আমীরণ আমারণ, আমার জননীর পরিচারিকা, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স। গমের মতন তার গায়ের রঙ, একহারা চেহারা, ডান চোখের ওপর একটা শাদা দাগ। সব সময়েই সে রঙীন পোষাক পরে থাকত। চরিত্র খারাপ ছিল তার। লোকদের শিকার করে বেড়াত। তার তলব ছিল মাসে চার টাকা, কিন্তু সে বাস করত আড়ম্বরের সঙ্গে। সকলে নাসিরুদ্দিনের মজ্লিলে চলে গেলে আমীরণ আমার ঘরে চড়াও হত। আমি ঘুমের ভাণ করে শুয়ে থাকতুম, তাই অসুবিধা হত না তার। প্রায় এক বছর আমি তার প্যার ভোগ করি, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত।

তারপর ওয়াজিদ আলী তাঁর এই তারিখ-এ-পরীখানা বইটিতে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন—'আমি বান্নুর প্রেমে পড়লুম, কিন্তু সে আমায় প্রত্যাখ্যান করলে'। এই পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন—'এগারো বছর বয়স থেকে আমি সুন্দরী নারীদের উপভোগ করতে থাকি। বান্নু সাহেব, তার বাবা নিগ্রো (শোদি সুলতান) আর মা ভারতীয়, আমার জননীর কাছে নিযুক্ত ছিল। পরিচারিকাদের মধ্যে প্রধানা সে। তার বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর নাম মীর্জা জান্। আমি তার প্রেমে পড়ি আর তাকে পেতে চাই। সে বুদ্ধিমতী ও খাঁটি ছিল তাই আমায় এড়িয়ে চলত। বয়স তার তেইশ বছর, রঙ ফর্সা নয়, মাথায় মাঝারি মাপের,

কিন্তু খুব্‌সুরৎ। সে তার ছোট বোন হাজি খানান্‌কে কাযে এনেছিল। তাকে দেখেও আমার মহব্বৎ জাগে। শাওন মাস, বর্ষাকাল। খানানের বয়স বাইশ বছর, অতি সুন্দরী, লম্বা গড়ন। তাকে প্রথম দেখেই আমি নিজের ওপর সব সংযম হারিয়ে ফেলি। খোদার কাছে প্রার্থনা করতে থাকি যেন তাকে দেন আমায়, কিন্তু সুযোগ হচ্ছিল না।

'ওদেরই সম্পর্কে এক বোন ছিল ইমামি খানা নামে। তার বয়স চল্লিশ বছর। কালো, কুৎসিত চেহারা। তাকে আমি মধ্যস্থা করে পাঠালুম হাজি খানানের কাছে। তারপর থেকে হাজি আমার ওপর প্যার করতে আরম্ভ করলে। আমার সঙ্গে হাজি খানানের মিলন ঘটালে ইমামি খানা। হাজি খানান্‌ও বিবাহিতা ছিল।

তারপর আরো এক পরিচারিকার কথা ওয়াজিদ আলী লিখেছেন। তার নাম এলাহি খানান। হাজির ভাই শেদা আমানের হারেমে নিযুক্তা ছিল সে। এলাহি খানান্‌ও ওয়াজিদের প্রেমে পড়ে। তার তেরো-চোদ্দ বছর পর্যন্ত এলাহি খানানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তারপর সে চ'লে যায় ফৈজাবাদ। বিদায়ের সময় তিনি তাকে উপহার দেন একটি আংটি আর তিনটি গজদন্তের চিরুণী।

এই বই থেকেই জানা যায়, ওয়াজিদ আলীর পনেরো বছর বয়সে পিতামাতা তাঁর বিবাহের আয়োজন করেন। প্রথমে বিবাহের কথা হয় মোমিন উদ্‌দৌলার কন্যার সঙ্গে। কিন্তু তাতে অসম্মত হন ওয়াজিদ আলী। তারপর সৈফু-দ্দৌলার কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা হয়, কিন্তু এখানেও বিবাহ হয়নি। তারপর ওয়াজিরণের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবও কার্যকর হলনা মেয়েটির গায়ে শাদা দাগের জন্যে। তখন লক্ষ্ণৌর বিশেষ সম্মানিত পরিবারের আলী নকি খাঁর কন্যার সঙ্গে ওয়াজিদ আলীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের প্রাথমিক উৎসব হবার পর এবারও বাধা পড়ে দুপক্ষেরই এক এক আত্মীয় বিয়োগের ফলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'মাস পরে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। ওয়াজিদ আলী জানিয়েছেন যে, তিনি পাঁচ মাস যাবৎ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলেন মধুচন্দ্রিমা।

তার পরেই নাসিরুদ্দিন হায়দরের মৃত্যু হয় এবং অযোধ্যার মসনদ লাভ করেন ওয়াজিদের পিতামহ মহম্মদ আলী শাহ্‌। রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন তাঁর পুত্র আমজাদ আলী, ওয়াজিদ আলীর পিতা। এই সব পদপ্রাপ্তির জন্যে পরিবারের সকলেই বৃত্তি পেলেন—ওয়াজিদ আলী ভিন্ন, কারণ তিনি পরে নবাবী পাবেন। বৃত্তি না পাওয়ার বিষয়ে এইরকমই মনে হয়েছিল ওয়াজিদ আলীর। এবং তিনি একথা তাঁর উক্ত গ্রন্থে উল্লেখও করেছেন।

তাঁর পিতা অর্থাৎ শাহ্‌জাদা তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে তাঁকে (ওয়াজিদ) পাঁচশ ও তাঁর পত্নীকে চারশ টাকা মাসিক দিতেন।

তখনকার নিজের মতিগতির পরিচয় দিয়ে ওয়াজিদ আলী লিখেছেন যে, প্রাসাদে তিনি গোপনে পরিচারিকাদের উত্যক্ত করে বেড়াতেন। তাঁর পত্নী জানতে পেরে গুরুতরভাবে ব্যাপারটাকে নেন এবং সেই মেয়েদের কায থেকে সরিয়ে দিয়ে স্বামীর ওপর পাহারা বসিয়ে দেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করতে পারেননি। সব সময় কেবল খুঁজে বেড়াতেন মেয়েমানুষ।

পিতা শাহ্‌জাদা হবার এক বছর পরে ওয়াজিদ আলী ও তাঁর পত্নী নবাব আজম বহুসাহেবার পুত্র জন্মাল। পিতামহ খুসী হলেন, ওয়াজিদকে পোষাক দিলেন আর খেতাব—নাজিম উদ্‌-দৌলা ফখ্‌রুল্‌ মুলক্‌ মহম্মদ ওয়াজিদ আলী খাঁ বাহাদুর শৌলৎ জঙ্গ। তখন তাঁর বয়স প্রায় ষোল বছর। তার দুমাস পরে খেতাব বদলে করা হল—মীর্জা খুর্‌শিদ হাশ্‌মৎ মহম্মদ ওয়াজিদ আলী। কারণ তাঁর পুত্রের খেতাব হয়েছিল মীর্জা নওশের্‌ওয়া কাদির বাহাদুর।

তার এক বছর পরে ওয়াজিদের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হল। পিতামহ তার খেতাব দিলেন—মীর্জা ফালেক কাদির বাহাদুর। ওয়াজিদ আলীর বয়স তখন সতের বছর। এ সময়ের কথা নিজেই তিনি লিখেছেন—'তখন আমার যৌবন বলে আমি ভাবতুম কি করে সুন্দরী রমণীদের ভোগ করা যায়। ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত করলুম যে, মেয়েমানুষদের আমার কাযে নিযুক্ত করলে ভোগ করবার বেশ সুবিধা।

এইরকম বুদ্ধি জোগাতে আমি আরাম বোধ করে' মোতি খানাম নামে এক সুন্দরীকে নিযুক্ত করলুম। ফর্সা ছিপছিপে গড়ন, আগে সে আমার পরদাদার নাচওয়ালী ছিল। আমার স্ত্রী সুনজরে ব্যাপারটা দেখলেন না, চেঁচামেচি করে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন আর বরখাস্ত করলেন মোতি খানামকে। বাবাও ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে নজরবন্দী করে রাখলেন।

'এই ঘটনার পর আমি আমার মনকে ফেরালুম কবিতার দিকে। বাবা রেগে আছেন, আমার মনে সুখ নেই। এইভাবে কিছুদিন চলবার পর বাবা হুকুম দিলেন যে মোতি খানামকে আমায় দেয়া হবে। তবে এই সর্তে যে, সে থাকবে আলাদা বাড়িতে। বাবার চোখের সামনে সে যেন আসতে না পারে।...

আমার তখন আঠারো বছর বয়স। এই সময় থেকে আমি কবিতা রচনা আরম্ভ করি আর মোতির মহব্বতের ফলে দুটি দিওয়ান ও তিনটি মসনবী লিখি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তখন সদ্ভাব ছিলনা। তবে তিনি খুব বুদ্ধিমতী। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আমার ক্ষোভের কারণ কি! আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি বুকে নিয়ে বললেন—তুমি যদি আর কারুর সঙ্গে প্রেম করো আমার কোন আপত্তি নেই।

আমি বললুম—যদি তুমি এতে রাজি থাকো, যদি তুমি একথা বলো তাহলে আর আমার কিছু বলবার নেই'।

এই সময়ের কিছু পরেই ওয়াজিদ আলীর তৃতীয় পুত্র জন্মাবার কথা তিনি লিখেছেন। তার নাম মীর্জা কিচন কাদির।

তারপর উল্লিখিত আছে সাহাব খানামের কথা। সাহাব খানামের বত্রিশ বছর বয়স। গানওয়ালী। ওয়াজিদ পিতার কাযে নিযুক্ত ছিল। সাহাব খানামের সঙ্গেও প্রেমের সম্পর্কের কথা নিজেই বলেছেন ওয়াজিদ আলী।

তাঁর এই উনিশ বছর বয়সে প্রথম সেতার বাজনার কথা জানা যায়। সেতারের চর্চা তিনি এসময় করেন এক বছর যাবৎ। তাঁর চতুর্থ সন্তান, একটি মেয়ের জন্মও হয় এইসময়ে। তখন অযোধ্যার তখ্‌তে তাঁর পিতা সুরাইয়া জাহ্‌ আমজাদ আলী শাহ্‌ বসেছেন।

উমদা বেগম নামে একজনের কথাও এসময়ে তাঁর উক্ত লেখা থেকে পাওয়া যায়। এই মহিলার বয়স তখন আন্দাজ সাতাশ বছর। উম্‌দা বেগমের আগে নিযুক্ত থাকার কথা জানা যায় নবাব নাসিরুদ্দিন হায়দরের আমলে। সাহাব খানামের পর যখন চলছিল তখনই ওয়াজিদের সম্পর্কে আসে উম্‌দা বেগম। সাহাব খানাম উম্‌দা বেগমের ওপর ঈর্ষান্বিতা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগে দুজনের মধ্যে। তখন ওয়াজিদ আলী সাহাব খানামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দেন, কারণ তার স্বামী ছিল।

ওয়াজিদ আলী এখন শাহ্‌জাদা। সরফরাজ বেগম আর নাম্নি বেগম নামে তাঁর আরো দুজন প্রণয়িনীর কথা এসময়ে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। নাম্নি বেগম এক সম্মানিত পরিবারের মহিলা, তাঁর স্বামীর মৃত্যুকালে তাঁদের তিন বছরের এক কন্যা বর্তমান। তাঁর জন্যে একটি পৃথক প্রাসাদের বন্দোবস্ত হল, সেই সঙ্গে রূপার বাসনপত্র ইত্যাদি।

শাহ্‌জাদা হবার একমাস পরে ওয়াজিদ আলী উম্‌দা বেগমকে শাদি করলেন। তাঁর নাম দিলেন নবাব উম্‌দা বেগম সাহেবা। তাঁকে নিয়ে দেড় মাস বিবাহিত জীবন ভোগ করলেন। তারপর ঝুঁকলেন নাম্নি বেগমের দিকে। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হল। ওয়াজিদ আলীর এই তৃতীয় বিবাহ। নতুন বেগমের খেতাব দিলেন নিশাদ মহল নবাব নাম্নি বেগম সাহেবা। ইতিমধ্যে নাম্নি বেগমের সেই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিল। ওয়াজিদ আলী লিখেছেন যে, নাম্নি বেগমকে নিয়ে বিবাহের পর তিনি সুখী ছিলেন পনেরো দিন মাত্র।

তারপর তিনি ওয়াজিরান নামে এক বাঈজীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। কসাইয়াপুল নিবাসিনী এই নাচওয়ালীর বয়স আঠারো বছর। তার নাচ আর গানে ওয়াজিদ আলী মুগ্ধ হলেন। এ সময়ে তাঁর প্রাসাদের দারোগা নাজ মুন্নিসা বেগম তাঁর জন্যে নিযুক্ত করেন আঠারোটি সুন্দরী মেয়ে। ওয়াজিদ আলী বলেছেন—'দারোগা খুব চতুরা। সে আমার চোখ দেখে আমার মনের ভাব বুঝতে পারত। ওয়াজিরানের জন্যে আকাঙ্খা দেখে আমার জন্যে

চেষ্টা করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে'। তা ছাড়া আম্মন ও এমামন নামে আরো দুটি গানওয়ালী বোনের কথা জানা যায় যাদের দুজনেরই সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল।

এই সময় ওয়াজিদ আলী ঠুংরি গান রচনা করতে অভ্যস্ত হন। তাঁর একটি ঠুংরির স্থায়ী হল—'শুন্ ও গুঁইয়া সেঁইয়া রহে ওয়াহুদেশ' (ও বঁধু, আমার প্রিয়া রয় বিদেশে)। বয়স তাঁর তখন প্রায় বিশ বছর।

তখন অনেক সময় তিনি বিষণ্ণ হয়ে থাকতেন। হাতে সেতার নিয়ে প্রাসাদে সময় কাটাতেন। সেই ওয়াজিরান বাঈজীর জন্যে এত মন খারাপ হত যে, আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত চেয়েছিলেন। তাইতে দারোগা তাঁর সঙ্গে ওয়াজিরানের মিলনের বন্দোবস্ত করেন মোজাইন্ আমিনোদৌলাতে। সেখানে ওয়াজিদ আলী ওয়াজিরানকে উপহারাদি দেন। তারপর পুরো এক বছর সুখে কাটান তাকে নিয়ে।

সে সময় তাঁর বাইশ বছর বয়স। যে আঠারোটি নতুন মেয়েকে তাঁর প্রাসাদে নিযুক্ত করা হয় তাদের বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন (তারিখ-এ-পরীখানা পুস্তকে)—'দু বছর ধরে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি দুষ্টুমি করতুম। কারণ তারা সকলেই ছিল দুশ্চরিত্রা।··কিছুদিন পরে তাদের সবাইকে আমি ভুলে যাই।

"কুতুব আলী খাঁ সেতারবাজকে আমি নিযুক্ত করেছিলুম। তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত সেতার বাদক। আগে তিনি মোক্তারুদ্দৌলা ইরণে নাসিরুদ্দিনের দরবারে ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা আসেন বেরিলি সহর থেকে। তাঁরা রাজপুত ছিলেন, রাজা জগৎদেবের বংশীয়।···কুতুবের বয়স প্রায় ত্রিশ বছর। মুখে গুম্ফ, ঘন কেশ, গৌরবর্ণ। পঠন ও লিখনে পটু। ভাল কবি এবং সঙ্গীত-জগতে অতি উৎকৃষ্ট শিল্পী বলে তাঁর সময়ের নায়ক বৈজু, নায়ক গোপাল ও তানসেন ছিলেন। আমি তাঁকে নিযুক্ত করি আমার সেতার-শিক্ষক। এই শিল্প আমি এতখানি শিখি যে লোকে আমার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেত। আমি যখন সেতার বাজাতুম, হাস্যময় লোকদের কাঁদাতে আর যারা কাঁদছে তাদের হাসাতে পারতুম। তার কারণ আমি শিখেছিলুম রীতিমতভাবে। প্যারে খাঁ আমায় তারিফ করতেন আর কুতুব আমার হাতে চুম্বন করতেন। আমরা এক সঙ্গে কাটাতুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। কুতুব ছিলেন নাস্তিক আর প্রেম ও অন্য সব জিনিসে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশ ভাল রকম।··· কুতুবের সঙ্গে থাকতুম বলে আমি নাচ গান জানা লোকদের বেশী পছন্দ করতুম। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত গায়ক দিলওয়ার হায়দরিকেও নিযুক্ত রাখি তখন'

তারপর আবার নারী-প্রসঙ্গের কিছু উল্লেখ করে ওয়াজিদ আলী লিখেছেন যে তাঁর হারেমবাসিনীদের জন্যে সঙ্গীত-শিক্ষার তিনি বন্দোবস্ত করতেন।

'আমন আর এমামন জানায় যে তাদের আত্মীয়দের মধ্যে কজন আছেন সুরসঙ্গীতের ওস্তাদ! তাই তাঁদের আনিয়ে একদিন জলসা করি। তাদের বাবা নাথু খাঁ, কাকা গোলাম নবী, ভগ্নিপতি খাম্মন খাঁ আর মামা গোলাম হায়দর এসে সে আসরে সরদ বাজালেন'।

এই জলসার পর থেকে ওয়াজিদ আলীর সঙ্গীতের দরবার আরো জমে উঠল। ওই নাথু খাঁ ও খাম্মান খাঁকে তিনি নিযুক্ত করলেন দরবারের দুটি গায়িকা হুর পরী ও সুলতানকে তালিম দেবার জন্যে। আরো কজন ভাল ওস্তাদকে অন্যান্য মেয়েদের শেখাবার জন্য নিয়োগ করা হল। সাবেৎ আলী, ছজ্জু খাঁ (সহোদর ভাই) প্রভৃতি।

প্রাসাদে দস্তুরমত সঙ্গীতের পাঠ দেওয়া হতে লাগল। ওয়াজিদ আলী নিজে সেখানে নাথু খাঁর কাছে শিখতে লাগলেন। আর ক্রমে এ বিদ্যার এমন তৈরী হয়ে উঠলেন যে ওস্তাদকেও নাকি ছাড়িয়ে গেলেন। এসময় ওস্তাদ গোলাম রেজাও নিযুক্ত হলেন তাঁর দরবারে। গোলাম রেজার সঙ্গে তিনি দিনরাতের অনেকটা সময় কাটাতেন।

গান বাজনা রীতিমত শেখাবার জন্যে একটি আলাদা বাড়ির বন্দোবস্ত হল—তার নাম পাঙ্খানা। সেখানে নবাব ভিন্ন শুধু ওস্তাদদের, দারোগার আর পরীদের প্রবেশের অধিকার ছিল। প্রত্যহ ছটা থেকে নটা পর্যন্ত গোলাম রেজা, খাম্মান খাঁ, ছজ্জু খাঁ ও সাবেৎ আলী শেখাতেন পরীদের অর্থাৎ তাঁর নিযুক্ত গায়িকা নটীদের, তিনি নিজেও সঙ্গীত শিক্ষা করতেন ওস্তাদদের কাছে। নাচ গান জানা

যত মেয়ে লক্ষ্ণৌতে সংগ্রহ করতে পারা যায় তাদের তাঁর প্রাসাদে আনার চেষ্টা করতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখ করা আছে মুন্না নামে ওয়াজিরানের এক সুন্দরী বোন্‌ঝির নাম।

ওয়াজিদের একটি জলসায় তবলার ওস্তাদ ছোটে খাঁ একদিন তাঁর অসাধারণ বাদন-শক্তির পরিচয় দিলেন। তিনি সাহারানপুর থেকে জীবিকার জন্যে লক্ষ্ণৌ দরবারে এসেছিলেন, গোলাম আলীর সুপারিশে। ওয়াজিদ আলী তাঁকে দরবারে নিযুক্ত করলেন। ছোটের তখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, হাসিখুসি স্বভাব, বলিষ্ঠ চেহারা। তিনি তাঁকে খেতাব দিলেন। বাহারে মাইকেল। আর গোলাম রেজার সঙ্গে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন।

হারেমে পরীর সংখ্যা তখন কম নয়। তাদের জন্যে বাড়িঘর, ভরণ পোষণ, পোসাক আসাক, নাচ গানের ব্যবস্থা ইত্যাদি বাবদ বছরে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হত একথা ওয়াজিদ আলী নিজেই লিখেছেন। সুলেমান পরীর নিজের সঙ্গে বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন, এই নিয়ে চতুর্থ বিবাহ। এই সময় তৃতীয় পুত্র মীর্জা বদর বখ্‌তের জন্ম ও পরে মৃত্যুর কথাও তিনি বলেছেন। আর ফরখুণ্ডা খানমের (বেগম) গর্ভে একটি মেয়ে জন্মাবার কথা। আবার সেই সঙ্গে শাহেন্‌সা পরী ও তিনটি মেয়েকে দরবারে রাখবার কথাও লিখেছেন।

তাঁর সঙ্গীতদরবারে নিযুক্ত ওস্তাদদের মধ্যে এইসব নাম পাওয়া যায়—গোলাম আলী খাঁ ও পুত্র গোলাম রেজা খাঁ, গোলাম নবী খাঁ, হায়দর খাঁ, ছোটে খাঁ, ঘসিটে খাঁ, সারঙ্গওয়ালা মহম্মদ আহ্‌সান, এলাহিয়া খাঁ, ছজ্জু খাঁ, হায়দর আলী ও নিসার আলী খাঁ, (কুতুব আলীর সুপারিশে তাঁর ভ্রাতা) খাজা বখস্‌ খাঁ প্রভৃতি। ওয়াজিদ আলী জানিয়েছেন যে, এই সব ওস্তাদরা শিষ্যা হয়ে যান এবং তাঁদের আলাদা আলাদা খেতাব দেওয়া হয়। আর পরীর নাচ গানে এমন নিপুণা হয়ে ওঠে যে ইন্দ্রলোকেরও ঈর্ষা করবার মতন।

এই সময় পুত্র বির্জিস কাদেরের জন্মাবার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তার জননী মাহক পরী। (পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহীরা বির্জিস কাদেরকে লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে বসিয়েছিল, যথাস্থানে সেসব কথা আসবে। তাঁর আর একটি মেয়ের এসময় জন্মের কথা জানা যায়।

তারপর গোহর আলী নামে একজন প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীকে দরবারে নিযুক্ত করার কথা বলেছেন ওয়াজিদ আলী। কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাকে প্রতারণার জন্যে বরখাস্ত করে দেন।

তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, এসময় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, মাত্রাধিক্যের জন্যে।...

হুজুরবাগ বাগানে জলসা চলত। দিবারাত্র সঙ্গীত-শিল্পীরা বিনোদন করত তাঁর চিত্ত। তাঁর জীবনে তখন অন্য কাম ছিলনা। উত্তম খানা, উৎকৃষ্ট পোষাক আর পরী-বিলাস। নিজে গানও গাইতেন।

এই সময় একটি জলসায় রহস্‌ (কৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী বর্ণনা—অপেরা জাতীয় অনুষ্ঠান) দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তারপর পরীদের রাসলীলা গীতিনাট্যের অভি-নয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। ওস্তাদরা তাদের তালিম দিয়েছিলেন। সুলতান পরীর ছিল রাধার ভূমিকা। মাহরোক পরী—বংশীধারী কৃষ্ণ। আর গোপীদের ভূমিকায় দেখা যায় ইজ্জৎ পরী, আস্‌মান পরী, দিলরুবা পরী ও হুর-পরীকে।

কয়েক লক্ষ টাকা এই নাট্যানুষ্ঠানের জন্যে তিনি ব্যয় করেন।

তারপর পিতা আমজাদ আলীর মৃত্যু ও তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তি।

নতুন নবাব দরবারে খেতাব পেলেন ওস্তাদরা। ছোটে খাঁ—আনিস-উদ্‌-দৌলা। গোলাম রেজা—রাজিব উদ্‌ দৌলা। ছজ্জু খাঁ—দেহাজ্‌ উদ দৌলা। কুতুব আলী—কুতুব-উদ্‌-দৌলা।

অনেক পরীকে পত্নীর মর্যাদা দেওয়া হল। নবাব নিজে লিখেছেন—একজন রাজার পক্ষে এত পত্নী থাকা মন্দ নয়। আর ওই পুস্তকের শেষ অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন—'একশ বেগম আর পরীদের স্ত্রীর আসন দেওয়া হল'।

নবাব হয়ে দরবারে আরো নাচওয়ালী নিয়োগ করলেন। তারপর আরো কটি পারিবারিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন

তিনি। মাহ্‌রোক বেগমের মৃত্যু হল। আত্মহত্যা করলেন অন্য এক বেগম। মীর্জা সুলতান কাদের নামে এক পুত্র জন্মাল। শাহ্‌ মঞ্জিল প্রাসাদে বিবাহ হল কন্যার। আর তিনি নিজে নিকা করলেন নবাব সিকান্দার মহলকে।

এই সমস্ত বিবরণ নবাব তাঁর 'তারিখ-এ পরীখানা' পুস্তিকাটিতে দিয়ে এ ধরণের মন্তব্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন যে, খোদা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুর সঙ্গে প্রেমের ছাই মিশিয়ে তিনি গড়েছেন মানুষের শরীর। সেজন্যে আমার দেহও গড়ে উঠেছে জল, কাদা আর প্রেম দিয়ে।

বইখানি ওয়াজির আলী ছাব্বিশ বছর বয়সে লিখে-ছিলেন। তার আগেই লাভ করেছিলেন অযোধ্যার মসনদ (১৮৪৭ খৃঃ)। নবাব হবার পর বেশির ভাগ পরীদের অর্থাৎ নাচ গান-ওয়ালীদের বেগম করে নেন। শূন্য হয়ে পড়ে তাঁর পরীখানা।

পরীখানার মজলিস বন্ধ হয়ে গেলেও নবাবের গান বাজনা ইত্যাদির কমতি হয়নি। বরং নবাবী প্রাপ্তির পর নৃত্য গীতের আসর আরো ভাল চলতে থাকে লক্ষ্ণৌর শাহী দরবারে। সঙ্গীত বিষয়ে তিনি শুধু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেতার বাদন তিনি রীতিমত শিখেছিলেন এবং চর্চা করেছিলেন কণ্ঠসঙ্গীত। সেই সঙ্গে তিনি নৃত্যবিদ্‌ও ছিলেন। প্রসঙ্গত লক্ষ্ণৌ ঘরাণার নৃত্য এবং নবাব ওয়াজিদ আলীর নৃত্যচর্চার কথা এখানে উল্লেখ রাখা যায়।

নৃত্যে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার প্রবর্তক রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন কথক-শিল্পী ঠাকুর প্রসাদ। উনিশ শতকের স্বনাম-ধন্য নৃত্য বিশারদ তিনি। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারে প্রধান নৃত্য-শিল্পী হিসেবে ঠাকুরপ্রসাদ যোগ দেন এবং নবাবের আনুকূল্যে লক্ষ্ণৌতে অবস্থানের ফলে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার কথক-নৃত্যের সূত্রপাত হয়। তারও আগের আমলে ঠাকুর প্রসাদের পিতা, কথক গুণী প্রকাশজী লক্ষ্ণৌ দরবারে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন বটে কিন্তু তাঁকে অবলম্বন করে কোন ধারার পত্তন হয়নি নৃত্যের ক্ষেত্রে। সে পর্যায় ঠাকুর প্রসাদের লক্ষ্ণৌতে নৃত্য জীবন থেকে ধর্তব্য। এই নৃত্যবিদ বংশ রসধারী সম্প্রদায়ের কথক শিল্পী এবং রাজস্থান কিংবা এলাহাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌতে আসেন।

বাল্যকাল থেকে নৃত্য অনুরাগী ওয়াজিদ আলী ঠাকুর প্রসাদের নিকটে নৃত্যশিক্ষা করেছিলেন পদ্ধতি অনুসারে।

ঠাকুর প্রসাদ যেমন সুদক্ষ নৃত্য শিল্পী, তেমনি নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। নবাব তাঁকে অভিনয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং দরবারে নাকি তাঁর স্থান ছিল নবাবের পাশে।

ঠাকুর প্রসাদের তিন শিল্পী পুত্র—বিন্দা দীন, কাল্‌কা প্রসাদ ও ভৈরব প্রসাদ। তাঁদের মধ্যে প্রথম দুজন স্বনাম-খ্যাত নৃত্যবিশারদ এবং ঠাকুর প্রসাদের পরে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার শুধু ধারক বাহক নন প্রবর্তকও। বিন্দা দীন ও কালকাও নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবারে নৃত্যাচার্যরূপে যুক্ত ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ ঘরাণার কথক নৃত্যে বিন্দা দীন ঠুংরি, দাদ্‌রা ভজন ইত্যাদির সংযোগে ভাব সমৃদ্ধি এনেছিলেন এবং এ বিষয়ে ওয়াজিদ আলী শাহের আনুকূল্য ও সাহচর্য উল্লেখনীয়। এই নৃত্যধারার প্রসারে নবাবেরও দান আছে। কথক নৃত্যানুষ্ঠানের জন্যে তিনি অনেক উপযোগী গান রচনা করেন এবং ছত্তর মঞ্জিলে তাঁর নিযুক্ত নটীদের নৃত্যোৎসবে অংশও নিতেন নিজে। কথক নৃত্যে রাধা কৃষ্ণের লীলা কাহিনী এবং ঠুংরি, গজল তাঁরই দৃষ্টান্তে যুক্ত হয়েছিল।...

কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁর অবস্থা হয়ে পড়ল গুরুতর।

একদিকে নবাবের শিল্পীসত্তার সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়াদি বিষয়ে প্রকাশ, যা ব্যয়বাহুল্যে পরিণত হতে থাকে—অন্যদিকে তাঁর বেগম-বিলাসও ক্রমেই স্ফীত হয় চূড়ান্ত অপব্যয়ে। বহুসংখ্যক বেগমদের জন্যে পৃথক পৃথক প্রাসাদ নির্মাণ ও দাসীপরিজন পরিবৃত আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত করতে তিনি অর্থনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হয়ে পড়েন। অযোধ্যা রাজ্যের রাজকোষের অবস্থা দাঁড়ায় শোচনীয়।

প্রাসাদ নির্মাণের জাঁক জমকেই তিনি প্রায় কোটি টাকা ব্যয় করে ফেলেন। শুধু কাইসর বাগের সৌধ-গুলিতেই তিনি খরচ করেছিলেন আশী লক্ষ টাকা। তাছাড়া তাঁর এক প্রিয় বেগম সিকান্দার মহলের জন্যে

তৈরি সিকান্দার বাগ, আর এক বেগমের জন্যে আলম্ বাগ ইত্যাদি প্রাসাদ-উদ্যানেরও এ সম্পর্কে নাম করা যায়।

ওয়াজিদ আলী শাহের আমলে নির্মিত কাইসর বাগ ও এই সব প্রাসাদ বহু মূল্যে নির্মিত হলেও স্থাপত্য কারু হিসাবে উচ্চশ্রেণীর নয়। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায় লক্ষ্ণৌ সহরে। তারমধ্যে কাইসর বাগের আড়ম্বরময় পূর্বরূপ প্রায় সর্বাংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যদিও সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাইসর বাগে যুদ্ধের উত্তাপ খুব বেশি লাগেনি।

নবাব ওয়াজিদ আলীর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাণকর্ম কাইসর বাগের পরিকল্পনায় গুণ অপেক্ষা পরিমাণ বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল—স্থাপত্য বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত। শেষ নবাবের আমলে লক্ষ্ণৌর স্থাপত্যশিল্প আসফ্-উদ্ দৌলা প্রমুখের নিরিখে নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। কাইসর বাগের গঠনে যে বিরাটত্ব ও প্রাচুর্য, সে তুলনায় সূক্ষ্ম কারুকর্মের অভাব। সুষম সামঞ্জস্যের চেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ তার উত্তর পূর্ব কোণের প্রধান তোরণ থেকেই সৃষ্টি করা হয়। তারপর একটি প্রাঙ্গণ পার হয়ে আর এক বিশাল ফটক জিলাউখানা। এখান থেকে শুরু হত নবাবী শোভাযাত্রা। তারপর তৃতীয় তোরণ থেকে চিনি বাগের প্রবেশ পথ—চীনা পাত্র দিয়ে এই বাগান সাজানোর জন্যে এ নামকরণ। তার পরেও আর একটি তোরণ তার দুদিকে সুন্দরী জলকন্যাদের চিত্র এবং চতুর্দিকে উজীরের আবাস-সৌধ। এখান থেকে পৌছতে হয় হজরৎ বাগে। ডান-দিকে চাঁদিওয়ালী বারাদারি, তার মেঝে ঝকঝকে রূপোর পাতে মোড়া। তারপর খাস মুখাম। আর তার কাছেই বাদশা মঞ্জিল, যেখানে নবাব বাস করতেন। এটি আসলে সাদৎ আলী খাঁর (পঞ্চম নবাব) তৈরি, পরে ওয়াজিদ আলী অন্তর্ভুক্ত করে নেন নতুন সৌধমালার মধ্যে। বাম দিকের বাড়ির সারির মধ্যে ছিল বিরুনি অর্থাৎ বেগমদের মহলগুলি ও হারেম। এই প্রাসাদের নাম চৌলাখী। নবাবের নাপিত আজিম্ উল্লা খাঁ এটি তৈরী করে মনিবকে চার লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে, তাই এই নাম। এই গৃহেই বিদ্রোহের সময় নবাবের দশ বছরের পুত্র বির্জিস কাদেরকে অযোধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করে বিদ্রোহীরা এবং বির্জিস জনীন হজরৎ মহল এখানেই সেই দরবার বসিয়েছিলেন। চৌলাখী আর তার কাছাকাছি কয়েকটি প্রাসাদের পর ছিল সেই কালো জামের গাছটি যার তলায় নবাব হলুদ রঙা আলখাল্লা পরে ফকিরের সাজে বসতেন কাইসর বাগের সেই বার্ষিক মেলায়। শাওন মাসের সেই উৎসবে প্রত্যেককে ফকিরের সাজ পরলে তবে পূর্বের এক লাখী ফটক দিয়ে এখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত। পশ্চিমের এক লাখী ফটকের বামদিকে—কাইসর পসন্দ বা রৌশন উদ্-দৌলা কোঠি। নাসিরুদ্দিন হায়দরের আমলে এ প্রাসাদ ছিল তাঁর উজীরের আবাস। নবাব ওয়াজিদ এটি বাজেয়াপ্ত করে নিজের এক প্রিয় বেগমকে দেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই কোঠির একতলায় একদল ইউরোপীয় বন্দীকে রাখা হয় আর বিদ্রোহীরা তাদের হত্যা করে কাইসর বাগের উত্তরপূর্ব ফটকের কাছে, ১৮৫৭ খৃঃ ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে।...

সেকালের কাইসর বাগের মধ্যস্থ বিশাল প্রাঙ্গণের পূর্ব ও দক্ষিণের হলুদ রঙের প্রাসাদগুলি মহা বিদ্রোহের পরে লাভ করেছিলেন অযোধ্যার তালুকদাররা। তার মধ্যে একটির অধিকারী হন তৎকালীন বাংলার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—প্রথম জীবনে বিখ্যাত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা এবং উত্তরকালে অযোধ্যা রাজ্যের একজন সর্ববৃহৎ তালুকদার। উনবিংশ শতকের সুপরিচিত মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী দক্ষিণারঞ্জন, তাঁর বাসস্থান ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ এইভাবে উল্লেখ করেছেন—'লক্ষ্ণৌ নগরে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্নপূর্বক কাইসার বাগস্থ তাঁর অতি শোভনতম রাজভবনবৎ বাটীতে আমাকে ২।৩ দিন রাখেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই একটি প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত খৃষ্টান মিশনারী ডাক্তার ডফ লর্ড ক্যানিং এর নিকট তাঁহার গুণানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন

মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জনকে অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্জন্মদাতা বলিলে হয়। তিনি লক্ষ্ণৌতে ক্যানিং কলেজ ও Oudh British Association সংস্থাপন করেন।

এসব অবশ্য লক্ষ্ণৌ থেকে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের নির্বাসিত হওয়ার অনেক পরের কথা। কিন্তু অযোধ্যার নবাবের নির্বাসনের আগেকার অনেক কথা এখনো বাকি।

তাঁর বেগম, হারেম, প্রাসাদ, বাগ বাগিচা ইত্যাদি বাবদ অপচয়ের ফলাফল রাজ্যের অর্থনীতিক অবস্থার পক্ষে ভয়াবহ হল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে নৃত্য, সঙ্গীত, মজলিস ইত্যাদিতে সময়ক্ষেপে তাঁর বেশি সময় কেটে যেত হারেমে আর সঙ্গীতের দরবারে। এইসব কারণের জন্যে তাঁর রাজকার্যে যে গুরুতর ত্রুটি হতে লাগল একথা অস্বীকার করা যায়না।

রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রায় সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া হল মন্ত্রীদের হাতে। এবং তাঁদের কর্তব্য পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্যে এবং ত্রুটি হলে প্রতিকারের জন্যে কারুর দায়িত্ব নেই। সুতরাং রাজ্যের নানা ব্যাপারে যে অরাজকতা দেখা দেয়, তা শুধু বৃটিশ প্রচার নয়, বাস্তব সত্য। ইংরেজরা এই বাস্তব অবস্থার সুযোগ পূর্ণভাবে নিয়েছিল, এই মাত্র বলা যায়।

নবাবের কয়েক পুরুষ আগে থেকেই শাসন কার্যে অযোগ্যতার সঙ্গে রাজ্যে ক্রমিক বৃদ্ধি পেয়ে আসছিল বৃটিশ প্রভাব প্রতিপত্তি। চতুর্থ নবাব আসফ-উদ্-দৌলার আমল থেকে রাজ্যে বৃটিশ কর্তৃত্বের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল, রাজ্যের এক এক অংশ তাদের হস্তে সমর্পণ করে। রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রাখা হচ্ছিল নিরাপত্তার বিনিময়ে শুধু নয়, বিলাস ব্যসনে উচ্ছৃঙ্খল নবাবী সম্ভোগ চরিতার্থ করবার জন্যে। অবক্ষয়ের এই নিম্নগামী প্রক্রিয়া নবাবী ধারায় পুরুষানুক্রমে এমন ভাবে প্রচলিত হয়ে আসে যে, ওয়াজিদ আলী শাহের ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত জীবনে তা' রোধ করা সাধ্যাতীত ছিল। বৃটিশ প্রভাব মুক্ত করার কথা বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা নবাব কখনো চিন্তা করেছিলেন কিনা সন্দেহ। অথচ বৃটিশ রেসিডেন্ট ও ইংরেজ নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র সৈন্যদল রাজ্যে মোতায়েন। এবং রাজ্যের সব দফতরে বৃটিশ প্রভাব ক্রমবর্দ্ধমান।

তিনি বাল্যকাল থেকে বৃটিশের ছত্রছায়ায় যে সম্ভোগ ব্যসনে মত্ত নবাবী জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন তাই তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শ হয়। আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সংজাত প্রবৃত্তি। নবাবী হল ভোগের জন্যে খোদার দোয়ার দান—এই ধারণা। নচেৎ শুধু তাঁর সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্যাদি রচনার জন্যে রাজ্যে এত বড় বিপর্যয় ঘটত বলে বোধ হয় না। রাজ্যের কাঠামোটা কোনক্রমে বাঁচিয়ে তাঁর শিল্পীসত্তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে' নিতে পারতেন হয়ত।

কিন্তু তা হবার নয়। হারেমের আরামের মধ্যে তিনি সংবাদ রাখবার প্রয়োজন বোধ করতেন না, সোনার অযোধ্যারাজ্যে অরাজকতার পদক্ষেপ কতদূর পর্যন্ত হয়েছে। শাসন-শৈথিল্যের সুযোগে দস্যুতস্করদের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে কতখানি। রাজধানী লক্ষ্ণৌতে পর্যন্ত সাধারণের ধন প্রাণ সম্পত্তি নিরাপদ কিনা। রাজস্বের সদ্ব্যয় কতদূর হচ্ছে। প্রজাসাধারণের দুর্দশার পরিমাণ ও প্রশাসনিক ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা কতখানি, ইত্যাদি।

তিনি এসব লক্ষ্য করেননি বটে, কিন্তু বৃটিশ রেসিডেন্ট ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তা দৃষ্টি এড়ায়নি। এবং তাঁরা সেই সূত্রে স্থির করতে অগ্রসর হল তাঁদের রাষ্ট্রনীতি ও ইতিকর্তব্য।

মসনদ প্রাপ্তির একেবারে প্রথম দিকে ওয়াজিদ আলী নাকি রাজ্যের উন্নতির জন্যে কিছুদিন প্রচেষ্টা করেছিলেন। সেসময় নিয়মিত তিনি পুরনো দৌলৎখানা প্রাসাদে বুদ্ধিমতী জননীর সঙ্গে পরামর্শ করতে যেতেন রাজ্যের বিষয়ে। কোন কোন পুস্তক থেকে এ ধরণের কথা জানা যায়। তাঁর জীবনের প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাও তখনকার—আমিনুদ্দৌলাকে অপসারিত করে দিল্লীর মোগল বংশের আলী নকী খাঁকে উজীর বা প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ।

কিন্তু তারপর প্রশাসনিক তৎপরতা দূরের কথা, সাধারণ কর্তব্য পালনেও আর বিশেষ আগ্রহ নবাবের প্রকাশ

পায়না এবং পূর্বোল্লিখিত ধারায় তাঁর বিলাস-জীবন ও শিল্পী-জীবন চলতে থাকে ।

তিনি তখ্তে বসেন ১৮৪৭ খৃঃ ১২ ফেব্রুয়ারী। ওদিকে বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় তার এগারো মাস পরে (৩, জানুয়ারী, ১৮৪৮ খৃঃ) গভর্ণর জেনারেল রূপে সমাগত হলেন লর্ড ডালহাউসি। পূর্ববর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ তখনো কলকাতায় ছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোধ্যা রাজ্যের পরিস্থিতি তথা নবাব ওয়াজিদ আলীর প্রসঙ্গ লর্ড ডালহাউসির গোচরে আনেন বলে প্রকাশ। তখন নতুন গভর্ণর জেনারেলকে বিদায়ী গভর্ণর জেনারেল নাকি বলেছিলেন যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কম্প্যানীর নামে অযোধ্যার রাজাকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে অযোধ্যা রাজ্যের শাসন কার্যে যে কোন উপায়ে উন্নতি আনা ও সংস্কার করা প্রয়োজন। এই মর্মে লর্ড হার্ডিঞ্জের পক্ষ থেকে একটি পত্র বৃটিশ রেসিডেন্ট লক্ষ্ণৌতে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌কে দেন।

ব্যাপারটি তখন আর বেশিদূর অগ্রসর হয়নি, কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যে বৃটিশ হস্তক্ষেপের সূত্রপাত ওয়াজিদ আলীর আমলে এই সময় থেকেই ধর্তব্য।

আমজাদ আলী শাহের আমলের উজীর আমিনুদ্দৌলাকে বিতাড়িত করার ইচ্ছা বৃটিশ রেসিডেন্টের ছিলনা। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওয়াজিদ আলী তাঁকে অপসারিত করে উজীর পদে স্থাপন করেন আলী নকী খাঁকে। আলী নকী খাঁ নবাবের অন্যতম শ্বশুর।

তার এক বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫০ খৃঃ মে মাসে বৃটিশ রেসিডেন্টের উদ্‌যোগে নবাবের প্রমোদ দরবারের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী রাজিবুদ্দৌলা কুতুবুদ্দৌলা ও ওয়াহাজুদ্দৌলাকে প্রথমে শিখচা ওয়ালা আস্তাবলে পরবর্তীকালের ইংরেজ আমলে মুন্সেফ কোর্ট এখানে স্থাপিত হয়। অন্তরীন ও পরে লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত করা হয়। সম্ভবত নবাবের প্রমোদ জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের সহচর বিবেচনায় উক্ত ব্যক্তিদের অপসৃত করা হয়েছিল নবাবের সঙ্গ থেকে।

নবাবের বিলাসব্যসনের প্ররোচকদের এই বহিষ্কার রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে করা হতে পারে, কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান বৃটিশ প্রভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

তার পরের বছর (৮৫১ ডিসেম্বর) বড়লাট লর্ড ডালহাউসি যুক্তপ্রদেশে আসেন। তিনি লক্ষ্ণৌর নিকটস্থ রামপুর রাজ্য ও সেখান থেকে কানপুর এলাহাবাদ সফরান্তে ফিরে আসেন কলকাতায়। ওয়াজিদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে তিনি লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হননি। অথচ অযোধ্যা রাজ্যের বৃটিশ রেসিডেন্ট স্যর উইলিয়ম শ্লীম্যান কানপুরে লর্ড ডালহাউসির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ইংরেজী ও ফার্সী দলিল দস্তাবেজ এবং তার ইংরেজ ও ফার্সী কর্মচারীদের নিয়ে। নবাব ওয়াজিদ আলী ও অযোধ্যা সম্পর্কে যে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয় এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ লর্ড ডালহাউসি রাজ্য শাসন কার্যে সংস্কার আনবার জন্যে পত্র দিয়েছিলেন নবাবকে। তাতে উল্লেখ ছিল যে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় থেকে যে সংস্কার করবার কথা ছিল সে অনুসারে কাজ হচ্ছে না, ইত্যাদি।

ক্রমে ছোটখাটো ব্যাপারেও নবাব ও রেসিডেন্টের অবনিবনা প্রকাশ পেতে থাকে। দেখা যায়, নবাব সরকার দিন দিন শক্তিহীন, মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ছে। সারা ভারতে তখন বৃটিশ ক্ষমতা প্রবর্ধমান। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নীতি তখন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের। অযোধ্যা রাজ্য সেই হিসাবে বৃটিশের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর তাতে ইন্ধন জোগায় ওয়াজিদ আলীর রাজ কর্তব্যে অমনোযোগ, খামখেয়ালী আচরণ, শাসনকার্যে অতিশয় অবহেলা এবং অপরিমেয় অপচয়। পারস্পরিক দোষারোপের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করলে নবাবের প্রশাসনিক বিষয়ে ব্যর্থতা ও দায়িত্ববোধের অভাব অস্বীকার করা যায় না।

ওয়াজিদ আলীর মসনদ প্রাপ্তির কিছুকাল পরে থেকে তাঁকে এবং অযোধ্যা রাজ্যের অবস্থা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কিভাবে লক্ষ্য করেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন বৃটিশ রেসিডেন্ট স্যর ডব্‌লিউ এইচ্ শ্লীম্যান লিখিত A journey through the kingdom of Oudh in 1849, 50 vol পুস্তক থেকে।

অপর পক্ষের রচিত হলেও সমসাময়িক অযোধ্যা রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি এই গ্রন্থের বিবরণীতে অনেকাংশেই

পরিস্ফুট হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলেনা। রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে এই বইখানি স্যর উইলিয়ম স্লীম্যানের রিপোর্ট স্বরূপ গণনীয়। লর্ড ডালহাউসি এবং এলিয়টকে লেখা তাঁর পত্রাবলী পুস্তকটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেসব চিঠিপত্র থেকে মনে হয় যে, অন্তত রেসিডেন্ট স্লীম্যানের বিবরণের মধ্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অযোধ্যা গ্রাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়নি। এই পর্যন্ত তখন স্লীমানের উদ্দেশ্য ছিল যে, অযোগ্য নবাবকে গদীচ্যুত ও তাঁর কোন পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করে রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করা। অযোধ্যা রাজ্যকে পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা স্লীম্যানের রিপোর্টের ফলে নয়। সেরকম কোন পন্থা নেবার জন্যে তিনি কখনো পরামর্শ দেননি। তাঁর সমস্ত পত্রাবলী এখানে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবেনা। অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা বইখানি আদ্যোপান্ত পড়লে দেখতে পাবেন যে, তাঁর মতামত বরং ছিল বিপরীত। তিনি গভর্ণর জেনারেলকে স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে, অযোধ্যা অধিকার করলে বৃটিশ শক্তিকে তার দশগুণ মূল্য দিতে হবে এবং সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘনিয়ে আসবে। স্লীম্যানের বরাবর এই অভিমত ছিল যে, সীমান্ত রাজ্যগুলি (সিপাহী যুদ্ধের পূর্বেকার বৃটিশ ভারতের মানচিত্রের হিসাবে অযোধ্যাও ছিল একটি সীমান্ত রাজ্য) থাকবে দেশীয় রাজাদের অধীনে, তাহলে লোকেরা নিজেরাই তুলনা করে দেখবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর রাজ্যশাসন আর তাদের দেশের রাজাদের শাসনের মধ্যে পার্থক্য কতখানি। নবাবকে বাইরে থেকে কিভাবে দেখা হত তার একটি জীবন্ত চিত্র স্লীম্যানের এই চিঠিপত্র থেকেও পাওয়া যায়। কয়েকটি পত্রাংশ এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল—

৩০, জানুয়ারী ১৮৪৯ লক্ষ্ণৌ।

'রাজার গুরুতর রোগ এখনো চলছে, কিন্তু তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা বোধহয় নেই। অসুখটার সঙ্গে এমন কয়েকটা অদ্ভুত লক্ষণ রয়েছে যা তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে দেবে আর প্রাণ যতদিন থাকবে ততদিন দুর্বিসহ মনে হবে। এই সমস্ত লক্ষণগুলির কতখানি তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া আর কতখানি নিজেরই মাত্রাধিক্যের জন্যে, তা নিশ্চিত বলা যায়না।...

নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁর 'তারিখ এ পরীখানার' শেষ দিকে নিজের যে গুরুতর পীড়ার কথা বলেছেন স্লীম্যানের উক্ত বিবরণ তাঁর সেই ধরণের রোগ সম্পর্কিত। এরকম অসুস্থ তিনি একাধিক বার হয়েছিলেন।

লক্ষ্ণৌ, ২৩ মার্চ ১৮৪৯।

'একথা বোধহয় সরকারের কাছে জানানো দরকার যে, রাজার মৃত্যু ঘট্‌লে......। 'তাঁর বর্তমান অবস্থা, আর সেই সঙ্গে দেহে মনে দুবল এক মন্ত্রী,বড়ই অসন্তোষজনক। ভাগ্যক্রমে ফসল এবার এত ভাল হয়েছে যা সচরাচর দেখা যায়না।'

উক্ত দুটি চিঠিই ভারত সরকারের সেক্রেটারি এইচ. এম, এলিয়টকে লেখা।

নীচের চিঠিখানি লর্ড ডালহাউসিকে স্লীম্যান লেখেন—

লক্ষ্ণৌ, ৮মে, ১৮৪৯

'গতকাল, প্রায় দুপুরবেলা, তাঁরা তিনজনেই প্রাসাদে গিয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ রাজার কাছে বসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাঁরা দেখেন, তাঁর শারীরিক স্বাস্থ্য আশাতীত ভাবে ভাল আর কথাবার্তার সময় তাঁর কোন ভাবের গোলমালের চিহ্নও তাঁদের নজরে পড়েনি। তাঁদের মত এই যে, কোন সুদক্ষ ইউরোপীয় চিকিৎসকের হাতে থাকলে তিনি শীঘ্রই সেরে যাবেন। রাজা বাহাদুর হলেন অলীক দুঃস্বপ্ন দেখা স্নায়ুরোগী (hypocihrandriac) এবং প্রায়ই অদ্ভুত রকমের ঘোরের প্রভাবে থাকেন যা এ রকমের ব্যক্তিদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দীর্ঘ বিরতির সময় তিনি রীতিমত প্রকৃতিস্থ আর সমস্ত বিষয়ে এই ধরণের ঘোরের সঙ্গে জড়িত থাকেন।

শরীর সুস্থ থাকলে রাজা কাযকর্মে কখনো বিশেষ মনোযোগ দেননা আর সেইজন্যে তাঁর অসুখ হলে কাযের ব্যাপারে তা কমই বোঝা যায় ...

গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক খরচ প্রায় এক কোটি টাকা; আর এ বছর তাঁর রোগ ও শরৎকালের ফসল খারাপ হওয়ায় আদায় হয়েছে ষাট লক্ষ টাকার বেশি নয়। তাই রাজার পিতা যে আলাদা তহবিল মজুদ রেখে গিয়েছিলেন তাতে তাঁর বেশ হাত পড়েছে। যে অপদার্থের দল নিয়ে তিনি নিজের চারদিক ঘিরে রেখেছেন তারা, শোনা যায়, তাঁর অসুখের সময় তার ওপর দস্তুর মতন ভাগ বসিয়েছে শীঘ্রই সব উড়ে যাবে মনে করে'।

এইচ্ এম্ এলিয়টকে লেখা আর একখানি চিঠি।

লক্ষ্ণৌ, ১৮জুন, ১৮৪৯।

'ঘটনা সব দ্রুত সঙ্কটের দিকে ঘনিয়ে আসছে। এ অবস্থায় আমার পরামর্শ দেওয়া এবং কিছু কাযের কায করা উচিত।—জুয়াচোর আর খোজারা তাতে ভয় পায়।·

···অনেক দরকারি কাজ টাকার অভাবে ফেলাফেলা হচ্ছে। ··

মন্ত্রী, গাইয়ের দল আর খোজারা সব পণ করে এক কাঠ্ঠা হয়েছে, কিন্তু এটা বেশিদিন টিঁকতে পারেনা। মাইনের জন্যে চেঁচামেচির ব্যাপারে 'বাইরে কার চাপ' শীঘ্রই মন্ত্রীকে কাৎ করে ফেলবে; কিন্তু এই চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঘাটতি আর শ' খানেক জুয়াচোর আর খোজার ভার সামলাবার মতন আর একজন লোককে পাওয়া তাদের পক্ষে বড়ই শক্ত হবে। এই হতভাগা-গুলোকে একেবারে দূর করে দেবার জন্যে একটা কিছু করা দরকার, না হলে ক্রমে অবস্থা আরোও খারাপ দাঁড়াবে। আমার কাছে সব চেয়ে ভাল উপায় এই মনে হয়—এমন এক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যার কৈফিয়ৎ চাইতে ওরা সাহস করবেনা আর রাজাও বুদ্ধির কিছু করতে পারবেন না; এবং যদি রাজা আপত্তি করেন তাঁকে বলে দিতে হবে যে তিনি তাঁর পুত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করুন। এ-ই সব চেয়ে ভাল পন্থা আর কোন গোলমালও হবেনা; বিয়ের ঘণ্টা'র মতন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে, গভর্ণর জেনারেল এবং আপনার সেক্রেটারির দপ্তরের কোন অশান্তি ঘটবেনা।"

লর্ড ডালহাউসিকে লেখা তাঁর আর একটি চিঠি—

লক্ষ্ণৌ, অগাষ্ট, ১৮৪৯।

'আমার পরের সরকারী বিবরণে দেখাব যে, নবাব প্রশাসনিক কাজকর্মের পক্ষে একেবারে অযোগ্য। দেশে কি ঘটছে বা লোকে কতখানি ভুগছে সে সব বিষয়ে তিনি কখনো কোন আগ্রহ দেখান নি আর কিছুই করেন নি। আমার চিঠিপত্রগুলো তাঁর মনে কিছুমাত্র ছাপ ফেলেনি। সব সময় তিনি গাইয়েদের আর মেয়েমানুষদের নিয়ে কাটান, তারাই তাঁকে আমোদে রাখে আর তিনি সাত আট ঘণ্টা বড় ওস্তাদ রাজী-উদ্-দৌলার সঙ্গে থাকেন তার বাড়ীতে। এই সব গাইয়ে আর খোজারাই এখন দেশের আসল মালিক আর তা থাকবেও যতদিন রাজার হাতে কিছু ক্ষমতা আছে। মন্ত্রীকে ওদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়··· ···।

···আউধে এখন আসলে কোন গভর্ণমেণ্ট নেই। মন্ত্রী রাজার সঙ্গে সপ্তায় কিংবা পনের দিনে একদিন কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা করেন আর সেও সাধারণতঃ উক্ত ওস্তাদের বাড়ীতে। গাইয়ে আর খোজারা ছাড়া রাজা আর কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। দেশের বা সরকারী ব্যাপারের সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্যে তাঁর জ্ঞান পর্যন্ত নেই, এসব তিনি গ্রাহ্যই করেন না। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাঁর এই উদাসীনতার জন্যে লোকে তাঁকে ঘৃণা করে আর যারা তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে ধনী হয়ে উঠছে তাদের ভিন্ন অন্য কারুর সহানুভূতি পাবেন না তিনি।'

স্লীম্যানের এই ডায়ারি পুস্তকে (৩১১ পৃষ্ঠায় পাদটীকায়) আর একদিনের অযোধ্যা রাজধানীর এই সংবাদ লিখিত আছে—

নবেম্বর ৩০, ১৮৫১—সোনার মোহর সমস্ত গালিয়ে ফেলা হয়েছে আর আমাদের গভর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট, চার লক্ষ ছাড়া, দিয়ে দেওয়া হয়, টাকার বিষয়ে, আমার মনে হয়, মাত্র তিন লক্ষ অবশিষ্ট আছে; সুতরাং রিজার্ভ রাখা তহবিল শূন্য হয়ে যাবে; ১৮৫১ সাল শেষ হবার আগেই; ওদিকে রাজ পরিবারের সাংসারিক আর বৃত্তিধারী-দের পাওনা বাকী পড়ে আছে এক বছর থেকে তিন বছর

পর্যন্ত। পঞ্চাশ লক্ষ টাকাতেও এই সব বাকি মেটানো যাবে কিনা সন্দেহ।

এমনিভাবে নবাবী আমলের অযোধ্যার শেষের অধ্যায়ের —আরো পাঁচ ছ' বছর চলে গেল - শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহেরও লক্ষ্ণৌ-জীবনের অন্তিমপর্ব।

তারপর, ১৮৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে অযোধ্যার নবাবের জীবনে চূড়ান্ত সঙ্কটের কাল ঘনিয়ে এল।

লক্ষ্ণৌ দরবারে নিযুক্ত বৃটিশ রেসিডেন্ট স্যার উইলিয়ম স্লীম্যান শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিয়ে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন কলকাতায়। সেই তাঁর শেষ যাত্রা। লক্ষ্ণৌতে আর তিনি ফিরে আসেন নি। কলকাতা থেকে জাহাজে পাড়ি দেন স্বদেশের পথে। কিন্তু স্বদেশে পদার্পণের অনেক আগে সমুদ্র পথেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তারপর স্লীম্যানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে লক্ষ্ণৌতে এসে উপস্থিত হন জেনারেল আউটরাম।

অযোধ্যা রাজ্যের এই নতুন বৃটিশ রেসিডেন্ট গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসির একটি বিশেষ বার্তা সঙ্গে নিয়ে একেবারে লক্ষ্ণৌতে উপনীত হলেন।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অযোধ্যার নবাবের উদ্দেশ্যে চরমপত্র। (ক্রমশঃ)
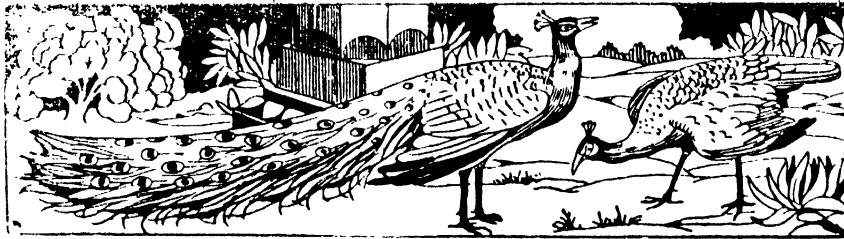
পারস্য ভাষার মাধ্যমে ইংরেজীতে সংস্কৃত শব্দের প্রবেশ

অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিদ্যার্থিগণকে শিক্ষা দেন যে, আর্য্যজাতি পূর্ব্বে মধ্য এসিয়ার কোনস্থানে বাস করিতেন এবং বংশবৃদ্ধিজনিত খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, অথবা পরস্পর কলহের ফলে তাঁহাদের এক দল পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্যদেশে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কয়েকশত বৎসর তথায় বাস করিবার পর পিতৃভূমি হইতে আগত স্বজাতীয়গণের সংখ্যাধিক্যের চাপে পুনরায় তাঁহারা নূতন উপনিবেশের সন্ধানে বহির্গত হন। এই ভাবে আর্য্য জাতির এক শাখা ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অন্যান্য কয়েকটি শাখা বিভিন্ন সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। বস্তুতঃ উল্লিখিত কল্পনা যে সত্য নহে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী একটি প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি (Calcutta Review, 1963. 'The Earliest Abode of the Aryas)

উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছি যে, আর্য্যগণের আদি বাসস্থান ছিল আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যভাগ এবং এখান হইতে বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে তাঁহারা বিদেশে গমন করিয়া পারস্য, গ্রীস, ইটালী, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে বসতি স্থাপন করেন। সংস্কৃতই ছিল আর্য্য জাতির আদি ভাষা। বিদেশে গিয়া তাঁহারা ঐ সকল দেশের ভাষার সঙ্গে নিজেদের ভাষা মিশাইয়া এক একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেশের ভাষাগুলিতে বিদ্যমান সহস্র সহস্র শব্দ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা হইতেই ঐ সকল শব্দ উল্লিখিত ভাষাসমূহে প্রবেশ করিয়াছে।

এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা সম্প্রতি প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, 'ইন্দো-ইউরোপীয় নামে এক অধুনালুপ্ত ভাষায় আর্য্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা কথা বলিতেন, এবং উক্ত ভাষা হইতেই সংস্কৃত, পারসিক, গ্রীক্, ল্যাতিন, জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহারা এ কথাও বলিতে দ্বিধাবোধ করেন না যে, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে আর্য্যেরা কয়েকশত বৎসর পারস্য দেশে বাস করেন, এবং এ দেশে আসিবার সময় বহু পারসিক শব্দ সঙ্গে লইয়া আসেন। এই সকল পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত ও পারসিক শব্দগুলির মধ্যে যে সকল স্থলে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা পারসিক হইতেই সংস্কৃতে আগত। বাস্তবিক এইরূপ ধারণা যে ভুল, তাহা অন্য একটি প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি (প্রবর্ত্তক, মাঘ, ১৩৭১ "ভাষাতত্ত্বের গোড়ার কথা"।

বিভিন্ন ভাষার শব্দগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা হইতেই ঐ সকল শব্দ উল্লিখিত ভাষাসমূহে গিয়াছে, এবং অধিকাংশ শব্দই পারস্য ভাষার মাধ্যমে গ্রীক, ল্যাতিন, জার্ম্মানি, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। মূল সংস্কৃত শব্দগুলি কি ভাবে পারস্য ভাষার মাধ্যমে ইংরেজীতে প্রবেশ করিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিব।

১। কোন কোন স্থলে পারসিক ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই মূল সংস্কৃত শব্দের সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ অবিকৃত আছে। যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
কৃৎ	কৎ	কাৎ (কাট্) cut
চর্ম্ম	চর্ম্ম	চার্ম্ (charm) (ক)
দ্বার	দার	দোর্ (ডোর্) (door)
নাম	নাম্	নেম্ (name)
নাসা	(অথ) নস্	নোস্ (নোজ) (nose) (খ)
রাস	রক্স	রেস্ (race) (গ)

২। কখন কখন পারসিক ও ইংরেজী ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দের প্রথমাংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
কুক্কুট	কতুন	কোক (cock)
গম্	গাম্	গো (go)
মম	মোই	মাই (my)
মূষিক	মুস্	মৌস (মাউস) mouse)
সঙ্গীত	সুরুন্	সঙ্ (song)
সাগর	সাহির্	সী (sea)

৩। কখন কখন মূল শব্দের শেষাংশমাত্র অবশিষ্ট আছে, যথা...

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
অনায়াস	আগানী	ঈস্ (ঈজ্) (ease)
জানু	জানু	নী (knee)
নিখিল	কুল	অল্ (all)
রব	বাং	বাং (bang)
বারুণী	বারাণী	রেইণী (rainy)

৪। কোন কোন স্থলে মূল সংস্কৃত শব্দের প্রথমাংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং তাহার সহিত নূতন বর্ণযোগে নূতন শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে, যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
জল	জুয়	জুছ্ (juice)
নখ	নাখুন্	নেইল্ (nail)

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
পুণ্য	পাক্	পিওর (pure)
বহু	বুশ্	বুশ (bush) (ঘ)
মর্কট	মৈমুন	মাঙ্কি (monkey)
মাস	মাহ্	মান্থ (month)
বিশাল	বসী	বাস্ত্ (ভাষ্ট) (vast)
শুভ্	শুদন্	সাইন্ (shine)

৫। কখন কখন মূল শব্দের শেষাংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে, এবং তাহার সহিত অন্য বর্ণের যোগে নূতন শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে, যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
অসি	সৈফ্	স্বোর্ড (sword)
অংশ	হিস্‌সা	শেয়ার (share)
গৃহ	হায়াত	হাউস (house)
ছাগ	গুছ্	গোট্ (goat)
বক্র	কিজ্	কার্ভ (curve)
স্বর্গ	গদ্দান্	গার্দেন (গার্ডেন) (garden) (ঙ)

৬। কোন কোন স্থলে মূল সংস্কৃত শব্দের প্রথম ও শেষভাগ লোপ পাইয়াছে এবং মধ্যম অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে, যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
অপ্সরস্	পরী	ফেয়ারী (fairy)
কিরন	কিরান্	রে (ray) (চ)
প্রস্তর	পিস্তা	স্তোন্ (ষ্টোন্) (stone)

৭। কখন কখন মূল শব্দের মধ্যমাংশ লোপ পাইয়াছে এবং প্রথম ও শেষের অংশ দুইটি অবশিষ্ট আছে : যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
অক্ষি	আইন্	আই (eye)
অস্মিন্	অস্মি (Av)	অম্ (এম্) (am)
দুহিতৃ	দুখ্‌তর্	দতার (ডটার) (daughter)
নামকরণ	নামীদন্	নেইমিং (naming)

৮। কখন কখন সম্প্রসারণও হইয়াছে [য্, ব্, এবং র্ স্থানে যথাক্রমে ই, উ এবং ঋ হওয়ার নাম সম্প্রসারণ]।

য্ স্থানে ই যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
যূয়ম্	যূহম্	ইউ (you)
পলায়তে	ফিরার	ফ্লি (flee)

ব্ স্থানে উ যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
দ্বার	দার্	দোর [ডোর] (door) (ছ)
নব	নউ	নিউ (new)
বাত	ব'দ	উইণ্ড (wind)

৯। কখন কখন গুণও হইয়াছে, (ই, ঈ স্থানে এ, উ, ঊ স্থানে ও এবং ঋ স্থানে অর্ হওয়ার নাম গুণ।)

ঋ স্থানে অর্ যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
দুহিতৃ	দুখ্‌তর্	ডটার (daughter)
পিতৃ	পিদর্	ফাদার (father)
ভ্রাতৃ	বিরাদর্	ব্রাদার (brother)
মাতৃ	মাদর্	মাদার (mother)

পারসিক ভাষায় মূল ঋকার স্থানে অর্ হইয়াছে এবং ইংরেজী ভাষায় এই অর্ এর অকার বৃদ্ধি পাইয়াছে (দীর্ঘ হইয়াছে)।

১০। অধিকাংশ স্থলেই মূল সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এইরূপ পরিবর্তনে প্রায়ই বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে দ্বিতীয় বর্ণ, চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ, স ও শ স্থানে হ, এবং হ স্থানে গ হইয়াছে।

প্রথম বর্ণ স্থানে ২য় বর্ণ যথা—

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
পঞ্চ	পাঞ্চ	ফাইভ্ (five)
পলায়িত	ফিরার্	ফুজিটিভ্ (fugitive)
পিতৃ	পিদর্	ফাদার্ (father)
পূর্ণ	পুর্	ফুল্ (full)
পূর্ব্ব	পিশিন্	ফোর্ (fore)
প্রিয়	ফ্রিথো (Av)	ফ্রেণ্ড (friend)
রিপু	(হা) রিফ্	ফো (foe)

চতুর্থ বর্ণ স্থানে ৩য় বর্ণ যথা—

অধঃ	দূমন্	দাউন (ডাউন) (down)
বন্ধ্	বন্দ্	বাইন্দ্ (বাইণ্ড) (bind)
ভার	বার্	বার্ডেন (barden)
ভ্রাতৃ	বিরাদর্	ব্রাদার (brother)

স্ স্থানে হ্ যথা—

অস্য	অহ; অহে	হিজ (his)
তস্য	তহে (Av)	হিজ („)
যস্যাঃ	যেইহে (Av)	হার (her)
সঃ		
সো (বৈদিক)	হো (Av)	হি (he)

শ্ স্থানে হ্ যথা—

শস্প	হফ্	হার্ব (herb)
শিলা	কুহ্	হিল (hill)
শূর	হুর (Av)	হিরো (hero)
শ্বন্	সগ্ (ই-তাজি)	হাউণ্ড (hound)
শ্বেত	সফিদ্	হোয়াইট (white)

হ্ স্থানে গ্ যথা—

বৃহৎ	বুজুর্গ	বিগ (big)
হংস	গাজ্	গুজ্ (goose)

১১। সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত নিরুক্ত বিধানগুলিও অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়। নিরুক্ত বিধানগুলি যথা—

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকার নাশৌ
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগে তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্।"

সংস্কৃত	পারসিক	ইংরেজী
বর্ণাগম যথা—		
অধঃ	দূমন	দাউন (ডাউন) (down) (অ)
অসি	সৈদ	সোর্ড (sword)
তারা	সিতারা	স্তার (ষ্টার) (star)
বধূ	বৈহু	ব্রাইড্ (বাইড্) (bride)
ভার	বার্গীর্	বার্ডেন (burden)
ভী	বিম্	ফিয়ার (fear) (ঝ)
ভেক	বক্কাঘ	ফ্রগ্ (frog)
মৃদু	মুলায়েম্	মাইল্ড (mild)
বর্ণ বিপর্য্যয় যথা—		
ছাগ	গুছ	গোট্ (goat) (এ)
বর্ণবিকার যথা—		
নখ	না'খুন	নেইল (nail) (উ)
পততি	পরৎ	পার্ট (পার্ট) (part) (ঠ)
লম্ব	(হ) লণ্ড	লঙ্ (long)
শস্প	হফ্	হার্ব (herb)
শিলা	কুহ্	হিল্ (hill)
সমান	হমান্	কমন্ (common)
বর্ণনাশ যথা—		
অন্ধকার	তারিক্	(দাক্) (ডাক) (dark)
অপ্সরস্	পরী	ফেয়ারী (fairy)
কিরণ	কিরান্	রে (ray)
নিখিল	কুল্	অল্ (all)
পূর্ণ	পুর্	ফুল্ (full)
সঙ্গীত	সুরুদ	সং (বা সঙ্) (song)

এইভাবে অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ পারসিক ভাষার মাধ্যমে ইংরেজীতে প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিলাম।

১। এই স্থলে অর্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরেজী 'চার্ম' শব্দ চর্ম্মের উপরিস্থিত দেহ সৌষ্ঠব অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২। পারসিক ভাষায় 'অখ্‌ংস্‌' শব্দটি সংস্কৃত 'অগ্রনস্‌' বা নাসাগ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩। সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় শব্দটি 'মণ্ডলাকার নৃত্য' (round dance) অর্থে ব্যবহৃত হয় আর ইংরেজীতে 'দৌড়' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—এই মাত্র বিশেষ।

৪। ইংরেজীতে শব্দটি 'ঝোপ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঝোপ বলিতে বৃক্ষাদির সমষ্টিকেই বুঝায়।

৫। ইংরেজী ভাষায় শব্দটি তাহার মৌলিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উদ্যান অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ, উদ্যান স্বর্গের মত মনোরম—এই অভিপ্রায় হইতেই সম্ভবতঃ উল্লিখিত প্রকার অর্থ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

৬। পারসিক ভাষায় শব্দটি কিরণযুক্ত (তারকা) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৭। প্রথমে ব স্থানে উ হইয়া পরে উক্ত উকারের বৃদ্ধি হইয়াছে (উ কার স্থানে ঔ কার হইয়াছে)।

৮। চতুর্থ বর্ণ ধকার তৃতীয় বর্ণ দকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ম এবং ন আগন্তুক।

৯। চতুর্থ বর্ণ ভ স্থানে পারসিক ভাষায় ৩য় বর্ণ এবং ইংরেজী ভাষায় ২য় বর্ণ হইয়াছে।

১০। পারসিক ভাষায় ছ ও গ বর্ণ দুইটির স্থান-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইংরেজীতে আবার ছ স্থানে ট হইয়া গিয়াছে।

১১। ইংরেজীতে মূল খ স্থানে ল হইয়াছে।

১২। মধ্যস্থ ত স্থানে র হইয়াছে।

পিতৃদেবের জীবন কথা

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার পিতামহর নাম ছিল গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাভূষণ। তিনি বাঁকুড়া সহরে টোলের অধ্যাপক ছিলেন, এবং পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ সর্বানন্দ ভট্টাচার্য্য চাণকে (ব্যারেকপুর) বাস করিতেন। বাঁকুড়ার কোনও ভূম্যধিকারী পুরাণ পাঠ শুনিবার জন্য তাঁহাকে চাণক হইতে বাঁকুড়ায় আনিয়াছিলেন। সর্বানন্দের পূর্বপুরুষ নবদ্বীপে বাস করিতেন। গঙ্গানারায়ণরা চারি ভ্রাতা ছিলেন। প্রথম তিনজন অধ্যাপক ছিলেন। কনিষ্ঠ শ্রীনাথ জেলবিভাগে কর্ম করিতেন। তাঁহার পুত্র প্রবাসী ও Modern Review এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আমার পিতৃদেব আট বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামতারণ পৌরোহিত্য করিতেন। তাঁহার উপার্জনে সংসার চলিত। আমার পিতৃদেব রামসদন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া—বাঁকুড়া জেলা স্কুলে পাঠ করিতেন। ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। অর্থাভাবে সন্ধ্যার পর প্রদীপ জ্বালা হইত না। পাশে নাপিতদের বাড়ীতে মনসা ঠাকুর ছিলেন। সেখানে প্রদীপের আলোতে পিতৃদেব পাঠ অভ্যাস করিতেন। কোনও কোনও দিন স্কুল হইতে বাটি আসিয়া দেখেন খাইবার কিছুই নাই। প্রচণ্ড ক্ষুধা হইয়াছে। গাছ হইতে কাঁচা পেয়ারা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। এট্রান্স পরীক্ষায় তিনি ১০ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায়—প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। দুইস্থানে গৃহশিক্ষকতা করিতেন। কিন্তু অর্থ সঙ্কুলান না হওয়াতে General Assembly Institution (পরে Scottish church College নামে পরিচিত) পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন বাঁকুড়া হইতে রাণীগঞ্জ উটের গাড়ীতে আসিয়া ট্রেন ধরিতে হইত। একবার উটের গাড়ীভাড়া বাঁচাইবার জন্য তিনি রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া (১৪ মাইল) হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। পায়ে ফোস্কা পড়িয়া ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক দিন ভুগিতে হইয়াছিল। তিনি First Arts পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। Lord Sinha নবম স্থান পাইয়াছিলেন। ইংরাজিতে এম এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অর্থাভাবে সকল বই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি এম এ পাশ করিয়া 'Accountant general Bengal' আফিসে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পাস করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম প্রাপ্ত হন। অল্পদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঁচ পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া মারা যান। পিতৃদেব তাঁহার ভ্রাতার কন্যাদের বিবাহ দেন। পুত্রদিগকে নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান। পিতৃদেবের দ্বিতীয় অগ্রজ সামান্য বেতনে কর্ম করিতেন। পিতৃদেব একটি দানপত্র সম্পাদন করেন যে, যতদিন তিনি চাকুরী করিবেন ততদিন তাঁহার অগ্রজকে মাসে ২৫ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন। কি জানি, পরে যদি মনের পরিবর্তন হয় এই ভাবিয়া দলিলটি রেজেষ্টারি করেন। ফলে Life Insurance করিতে পারেন নাই।

পিতৃদেব পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দুদর্শন পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি "ব্রহ্ম স্তব" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে গায়ত্রী মন্ত্র এবং মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে কতকগুলি শ্লোক এবং বাঙ্গলা কবিতায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গায়ত্রী মন্ত্রের তিনি এইরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন—

সেই ভগবৎ তেজ করিহে স্মরণ
যিনি আমাদের বুদ্ধি করেন চালন।

তিনি Teachings of the Bhagavad gita নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা মেদিনীপুর Town School এ পাঠ্য রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। আমি State Scholarship লইয়া বিলাত গিয়া ICS হইয়া আসিব এই প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করেন নাই। তিনি বাল্মীকি রামায়ণ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি এই শ্লোক লিখিয়া আমাদের তিন ভ্রাতাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। অত্র দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ। সকল দেশেই স্ত্রী সংগ্রহ করা যায়, সকল দেশেই বন্ধু পাওয়া যায়। এরূপ দেশ দেখি না যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়।' তিনি লিখিয়াছিলেন, "মহাপুরুষের এই উক্তি স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর যেন ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ না হয়।" লক্ষ্মণ শক্তিশেল দ্বারা আহত হইবার পর শ্রী রাম এই ভাবে বিলাপ করিয়াছিলেন।

তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু তাঁহার আজীবন সঞ্চিত অর্থদ্বারা সংস্কৃত শিক্ষা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পিতার নামে বিশ্বনাথ ট্রাষ্টফণ্ড এবং মাতার নামে দাতব্য চিকিৎসালয়। ভূদেব বাবুর অনুসরণ করিয়া পিতৃদেব তাঁহার পিতার নামে গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাঠী এবং মাতার নামে গুরুদাসী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ অগ্রজের নামে একটি কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের নামে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পৌরোহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করে তাহাকে "রায় রামসদন চট্টোপাধ্যায় সুবর্ণ পদক" দেওয়া হয়।

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

December, 1920.

সাহেব আমার লেখা Wedding Dress গল্পটার খানিক প্রশংসা করল। রবীন্দ্রনাথকে যে সে খুব বেশী চেনে তা নয় তবু জানিয়ে দিল যে তাঁকে যথেষ্টই চেনে। তিনি নাকি এত তাড়াতাড়ি লেখেন যে সব পড়ে ওঠা যায় না, এ অভিযোগও করল। মেম সাহেবটি কথা-বার্ত্তা কয় ভাল। যদিও বাংলা জানে না তবু বাংলা সাহিত্যে interest আছে বেশ। আমার সাহিত্যিক জীবনের এবং শান্তিনিকেতন বাসের সমস্ত ইতিহাস বসে বসে তাকে বলতে হল। ব্রাউন সাহেব "সোনার খাঁচা" অনুবাদ করাতে সেখানা সে পড়েছে। তার যে একজন বেবী আছে এ খবরও পেলাম।

কথাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে একখানা গানের accompaniment এতক্ষণ চলছিল পাশের ঘর থেকে। শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন ও অরুন্ধতী বোধহয় গানবাজনার through দিয়ে সমাগত অতিথিবৃন্দের মনোরঞ্জনের ভার নিয়েছিলেন। মাঝে একবার "সংগচ্ছদ্ধম্ সংবদধ্বম্" গানটা গেয়ে শোনান হল। সাহেব জিজ্ঞাসা করল "What are they singing?" আমি বললাম "ওটা বেদগান।" সাহেব একটু unexpected মন্তব্য করল, "এ রকম জায়গায় ওটা গাওয়া আমার almost profanity মনে হচ্ছে।" বলে মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করে ফেলল। গানের শেষে বেবুদির সঙ্গে Shelley রবীন্দ্রনাথ এবং Browning এর লেখার আলোচনা আরম্ভ করল।

ওরা যখন যাবার জন্যে উঠল, আমি সেই সঙ্গে চলে এলাম। তার আগে একটুক্ষণ অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁকে দেখে যেমন স্বল্পবাক্ মনে হয়, তা কিন্তু নয়, দিব্যি গল্প জমাবার ক্ষমতা আছে। মানুষটি যে কবি, তা কথাবার্ত্তায় বেশ ফুটে ওঠে।

বেবুদির বাচ্চা খুব সুসজ্জিত হয়ে একবার আবির্ভূত হলেন।

প্রস্থান করবার আগে Mrs. Thompson আমার লাল শালটা গায়ে দিয়ে খানিক ঘুরে নিল। উপস্থিত দু-একজন খানিক বিস্মিত মুখ করে তাকাল। মেম সাহেব বললেন তিনি আমার শাল গায়ে দিয়ে কিছু inspiration পাবার চেষ্টা করছেন।

গাড়ীতে সাহেব দম্পতি খুব গল্প করতে করতে এল। শালটার সম্বন্ধে বেশ খানিক আলোচনা হল। ওরা যে শিক্ষিত বাঙালী মেয়ে কখনও দেখেনি এবং দেখে যে খুব খুশী হয়েছে সেটা অনেকবার করেই বলল। আমার পুরাকালের কলেজখানা তাদের একটু দেখিয়ে দেওয়া গেল। সবতাতেই তারা বিষম interested। বেবুদিরা এককালে ছেলেদের কলেজে science পড়েছিল শুনে Thompson সাহেব ত প্রায় লাফিয়েই উঠল। সম্ভব তারা আমাদের উল্কি চিত্রিত savage ভেবেই এসেছিল। অবশেষে আমাদের নামিয়ে দিয়ে এবং অনেক ভদ্রতা করে তারা চলে গেল।

9th January, 1921. বড়দিনের ছুটিটা নিতান্তই অপব্যয় করে কাটালাম। একদিন বেবুদিদের বাড়ী বেড়িয়ে এলাম, তারপরদিন এক পরিচিত ভদ্রলোকের বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম। সেটা একান্ত খেতে যাওয়াই হয়েছিল। সাজগোজ করে গেলাম, অনেক সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে বৌয়ের মুখ দেখলাম। মন্দ নয় দেখতে, তবে যেরকম শুনেছিলাম তার চেয়ে অনেক নীচু দরের। খানিক সেখানে বসেই সঙ্গিনীদের সঙ্গে আড্ডা দিলাম। অতঃপর খেয়ে দেয়ে যখন নীচে নামছি তখন দেখলাম hostess-এর একজন আত্মীয়া একটি ঠিকা ঝিকে বেদম ঠেঙাচ্ছেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে খানিক সেই দৃশ্য দেখে চলে এলাম।

January.—এবারে মাঘোৎসবে খুব বেশী যাওয়া হয় নি। যুবকরা এবার আলাদা উৎসব করেছিলেন প্রাচীনদের সঙ্গে ঝগড়া করে। তাতে বোধহয় একদিন গিয়েছিলাম। আর একদিন গেলাম Dr. P. C. Roy-এর বক্তৃতা শুনতে। খুব ভীড় হয়েছিল। বক্তা শিক্ষার ক্ষেত্রে non-co.operation করতে বলার জন্য মহাত্মা গান্ধীর খানিকটা সমালোচনা করলেন। সভাভঙ্গ হবার পর আমার এক বন্ধু বললেন, "যখন গান্ধীজীর কথা শুনি

তখন মনে হয়, আর না এইবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। আবার যখন এঁদের কথা শুনি তখন মনে হয় একথাগুলিও ত ভেবে দেখবার। কি যে করি, মাথা একেবারে গুলিয়ে যায়।" তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমারও প্রায় ঐ দশা। শেষ কলকাতা কংগ্রেসের সময় ত দুদিকেই এত ভাল ভাল যুক্তি শুনলাম যে ভালমন্দ বিচারের শক্তিই প্রায় লোপ পাবার জোগাড় হল। কিছুদিন consistently কিছু না ভেবে ত সামলালাম, কিন্তু second attack এল বলে! আর এক মহিলা বললেন যে মেয়েদের এ রকম ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হওয়া তাঁর মতে ঠিক নয়। তাঁর মতে সব emotion ধামা চাপা দিয়ে রেখে খুঁটি হয়ে বসে থাকা উচিত। ধামাটা যে খুবই মাঝারি রকমের হওয়া উচিত এই কথাটা তাঁকে বোঝাতে বসলাম। খুব যে convinced হলেন তা নয়। বললেন, কতগুলি চেনা মেয়ে যেরকম বাপ-মায়ের দেওয়া গয়না গাটি খুলে গান্ধীজির হাতে দিয়ে দিচ্ছে, সেটা শুধু বাহাদুরি দেখাবার জন্যেই করেছে। বেশ খানিক তর্ক হল। আমি অবশ্য এ সব ব্যাপারে একটু moderation এরই পক্ষপাতী, তাই বলে একেবারেই বিশ্বাস করি না যে সব emotion ধামা চাপা দিয়ে রাখলেই মোক্ষলাভ হবে।

একটি তরুণী বন্ধুর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে জানলাম যে, তারা একটা স্বদেশী club খুলতে চায়। সেটা mixed হবে এবং হাতে কলমে জাতীয়তা প্রচার করাই হবে তার উদ্দেশ্য। তাঁত বোনা, সুতো কাটা সব শেখান হবে। গান্ধীজি রাজী আছেন open করতে। আমি এই club এর President হতে রাজী আছি কি না। বাধ্য হলাম এরকম honour প্রত্যাখ্যান করতে। বিধাতা যে কাজের যোগ্যতা দেন নি, তা কি করে নেব? সব জায়গায় ত আর ornamental figure head হয়ে থাকা যায় না?

দেশ জুড়ে হিড়িক লেগেছে non-co-operation এর। স্বদেশী আন্দোলনের চেয়েও এটা দেশকে বেশী ঝাঁকড়ানি দিচ্ছে মনে হচ্ছে।

5th February.

প্রথম যে দিন কলেজের ছাত্র একদল ক্লাশ ছেড়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেল তখন জিনিষটাকে হাস্যকরই মনে হয়েছিল। তারপর যত দিন যেতে লাগল কলেজের হল শূন্য থেকে শূন্যতর হতে লাগল আর রাস্তায় ভীড় বেড়েই চলল। সংবাদপত্রগুলিও দারুণ মুখর হয়ে উঠতে লাগল, তাদের যেন আর কোন কথা নেই। আমরা মেয়েরা গাড়ী করে স্কুলে যাই আসি, ছেলের দল রাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে "non-co-operate please", তার উপর আজ ট্রাম বন্ধ, কাল ট্যাক্সি বন্ধ এ ত নিত্য লেগে আছে। তার উপর একরকম নূতন political ধর্ণা দেওয়া সুরু হল। কলেজ blockade, Senate Hall-এ পথ আটকান, দ্বারভাঙ্গা building অবরোধ প্রভৃতি চলতে লাগল। বি, এল, পরীক্ষার্থীরা ত মানুষ মাড়িয়ে যাবার ভয়ে অধিকাংশই সরে পড়ল। দিনের পর দিন এই রকম দেখলে আর শুনলে জীবন্ত মানুষের রক্ত একটু তেতে ওঠেই। বেশ অনুভব করতাম যে উত্তেজনাটা আস্তে আস্তে আমার মস্তিষ্কটাকেও আক্রমণ করছে। গত শনিবার কাগজে দেখলাম গান্ধী মহারাজ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে মেয়েদের সভা আহ্বান করেছেন। সোজা গিয়ে সেখানে হাজির হলাম।

যাঁদের বাড়ী গেলাম তাঁরা কলকাতার পুরনো বাসিন্দা বোধ হ'ল। বাড়ীর ধরণ-ধারণ কিছুটা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর মত। বাড়ীর মেয়েগুলিকে দেখলেও এই ধারণাটাই হয়। অভ্যর্থনা করে যেখানে নিয়ে গিয়ে বসাল, সেখানে গম্ভীরভাবে বসে রইলাম। তখন পর্য্যন্ত সামান্য গুটিকয়েক মেয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে চেনা একমাত্র আমার এক ছাত্রীকে দেখলাম। ঐ বাড়ীর এক মহিলা, খুব সম্ভব বাড়ীর কন্যা, বধূ নন, পান মশলা দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করে বেড়াতে লাগলেন।

আমরা যেখানে বসেছিলাম ঠিক তার নীচে একটা ঠাকুর দালানের মত জায়গায় সভা সাজান হয়েছিল। বোধ হয় অনেক মেয়েরা আসবেন ভেবে প্রথমে আগতার দলকে উঁচু জায়গায় বসান হয়েছিল।

কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল যে লোক কিছুই হ'ল না। তখন আমরা নেমে গিয়ে নীচেই বসলাম। একটু পরে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ীর মেয়েরা এলেন। বাসন্তী দেবী এগিয়ে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। মহাত্মা গান্ধী হিন্দী বা ইংরেজীতে যা বলবেন সেটা অনুবাদ করে সমাগতা মহিলাদের শুনিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তখন লজ্জা করছিল বলে সে অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলাম না, কিন্তু পরে যা কাণ্ডখানা হল তাতে মনে হয় রাজী হলেই ছিল ভাল। উর্ম্মিলা দেবীকেও দেখলাম। ওঁকে আগেও দেখেছি তবে চেহারা অনেক বদ্‌লেছে, এবং বিধবার বেশে ঠিক প্রথম চিনতে পারি নি।

ভিতরে নারী সমাগম যতই কম হোক, বাইরে "নর সমাগম" যে প্রচুর পরিমাণে হয়েছে তা গোলমালে আন্দাজ

করতে পারছিলাম। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কলরব আর "গান্ধী মহারাজ-কি জয়।" শুনে বুঝলাম যে তিনি এসে পৌঁছেছেন। বোধহয় পদধূলি প্রার্থীর দল তাঁকে খানিকক্ষণ দরজার কাছে আটকে ফেলল। তাঁর ঢুকবার আগে একজন খাকী পোশাকপরা লম্বা চওড়া যুবক প্রকাণ্ড এক পোঁটলার ভারে stagger করতে করতে ভিতরে এসে ঢুকল। মহাত্মাজী কোথায় বসবেন জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল, এবং পোঁটলাখানা সেখানে নামিয়ে রেখে চলে গেল। একটু পরেই গান্ধীজী নিজে এসে ঢুকলেন।

যাঁকে এর আগে দশ বিশ হাজার লোকের মধ্যে "জনগণ-মন-অধিনায়ক" রূপে কেবল দূর থেকে দেখতাম এবং ভাল করে দেখতে না পাওয়ার জন্যে ক্ষুব্ধ হতাম, তিনি যখন নিতান্ত ঘরের মানুষের মত কাছ দিয়ে চলে গেলেন তখন একটু সচকিত হয়ে উঠতে হল। দূর থেকে দেখে এবং ছবির মারফতে তাঁর চেহারা যে রকম মনে হত, কাছ থেকে ঠিক সেরকমটা লাগল না। মুখের মধ্যে রূপের বাড়া সৌন্দর্য্য আছে। চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে, বাইরের অবিশ্রাম কোলাহল এখনও তাঁর অন্তরের কবিকে মেরে ফেলতে পারে নি। এই সৌন্দর্য্য তাঁর plain মুখ আর দেহকে insignificanceএর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

ওঁর সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে ঢুকল, তার মধ্যে দুচার জনকে চিনলাম। সকলেরই খোলা চুল, পরণে গরদের শাড়ী, আঁচল ধুলোয় লুটোচ্ছে। কারো কারো কপালে মস্ত বড় এক-একটা রক্ত চন্দনের টিপ। একেবারে ভৈরবী মূর্ত্তি।

মহাত্মা গান্ধী এসে বসবার পরেই মহিলামণ্ডলী তাঁর পদধূলি নেবার জন্যে মহা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলেন। ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা অনেকগুলি এসেছিল, তারাও তাদের মায়েদের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল। মহাত্মা গান্ধী ছোটগুলোর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

অনেক কষ্টে ত মহিলাদের বসান হল। তখন গান্ধীজী এক সমস্যায় পড়লেন, হিন্দীতে বলবেন না ইংরেজীতে বলবেন? উর্ম্মিলা দেবীর সঙ্গে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে হিন্দীতেই বলবেন। একজন অতি গরীয়সী হিন্দী-ভাষিণী মহিলা অযাচিত ভাবে অনুবাদিকার কাজ করে দেবার ভার নেওয়ায় আমি আশ্বস্ত হলাম। গান্ধীজী মহিলাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই হোক বা যে জন্যেই হোক, হিন্দীতে একটা বড় sentence বলে তাঁকে বললেন, "আপনি অনুবাদ করুন।" তাতে তাঁর ভাবী অনুবাদিকা বললেন, "বাঙালী মেয়েরা প্রায় সকলেই হিন্দী জানে, যদি কেউ নাই বোঝে ত তিনি বক্তৃতার শেষে বুঝিয়ে দেবেন।" অতঃপর বক্তৃতা অবাধে চলল।

বক্তৃতা সমাপনান্তে যখন সেই মহিলাকে তর্জমা করতে বলা হল, তখন তিনি বললেন "এনার বক্তব্য হচ্ছে এই, উনি যা বললেন তা ত আপনারা শুনলেন, এখন সার যা আছে তা এনার চরণে নিবেদন করুন।" আমি অনেক কাল ছাত্রীরূপে substance লিখেছি এবং শিক্ষয়িত্রীরূপে লেখাচ্ছি, কিন্তু এমন সংক্ষিপ্ত সার প্রস্তুত করতে কখনও দেখিনি। যাঁরা শুনছিলেন এবং যাঁদের হিন্দীর জ্ঞান কিছু আছে তাঁরা ত চোখ কপালে তুলে বসে রইলেন। আমার তখন দুঃখ হতে লাগল যে, কেন অস্বীকার করলাম interpreter হতে। আর যাই করি এ রকম farce করতাম না। সে মহিলা যখন দেখলেন যে তাঁর এমন সারমর্ম্মখানা সকলের মনঃপূত হল না তখন তিনি একখানা নিজস্ব বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। যাই হোক, সমাগতা মহিলাবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর কথা যত বুঝুক বা নাই বুঝুক, এটা তারা স্থির করে এসেছিল যে তাকে টাকা দিতে হবে। অনেকে গহনাগাঁটি খুলতে আরম্ভ করল। হঠাৎ গান্ধীজী সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন "You haven't understood a word of it"। আমি বললাম যে হিন্দী আমি মোটামুটি ভালই জানি এবং সবই বুঝতে পেরেছি। তখন তাঁর পরিচিত মহিলাদের মধ্যে কে একজন আমাদের পরিচয়টা তাঁকে দিয়ে দিল। কাছে যাবার উপায় তখন ছিল না, দূর থেকেই তাঁকে নমস্কার জানালাম। তিনি বললেন, "I know your father, but I have not seen you before।" তাঁর মুখের হাসিটা বেশ সুন্দর লেগেছিল তখন।

ইতিমধ্যে আমার কাছে যে দুচারজন মেয়ে বসেছিল তাদের আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে বক্তৃতার সার মর্ম্ম বোঝাতে চেষ্টা করলাম। অতঃপর মহাত্মাজীর হাতে টাকা এবং

গহনা দেবার ধূম পড়ে গেল। আমি গহনা অবশ্য বিশেষ কিছু পরে যাই নি, তবু কয়েক গাছা চুড়ি ছিল হাতে। যদি আমার স্বোপার্জ্জিত হত ত ঠিক দিয়ে দিতাম। কিন্তু পরের ধনে পোদ্দারি করার সঙ্কোচটা দূর করতে পারলাম না। আমার নিজের কাছে যা টাকাকড়ি ছিল এবং এধার ওধার থেকে দুচারজন মেয়ে যা দিল তাই নিয়ে ওঁর হাতে দিয়ে প্রণাম করে এলাম। আরও খানিকক্ষণ হুড়োহুড়ি, প্রণাম করা, এবং টাকা গহনা দেওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী সদলবলে প্রস্থান করলেন। আমরা অল্প পরেই চলে এলাম।

27th February.

বেশ গরম পড়ে গিয়েছে, এ বছরের মত গরম কাপড় শিকেয় তোলা যেতে পারে। গত রবিবার ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের Prize Distribution ছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীকে এত আগে থেকে কথা দিয়ে রেখেছিলাম যে না গিয়ে পারলাম না। রবিবারে কোনোখানে যেতে হলে আমাদের মহা গোলমাল বেধে যায় কারণ, আমাদের বিশিষ্ট বাহন রাজনারায়ণকে সেদিন কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। যাহোক, যখন সাজসজ্জা সমাপ্ত করে অন্য একটা চাকরকে দিয়ে গাড়ী আনাবার চেষ্টায় আছি তখন হঠাৎ রাজনারায়ণের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। হাঁফ ছেড়ে ত যাত্রা করা গেল।

রামমোহন লাইব্রেরীতে গিয়ে পৌছলাম যখন তখনও বেশী লোক আসে নি। তবে যারা এসেছিল তাদেরই বসে বসে দেখতে লাগলাম। চিরকাল যেখানেই যাই, ঠিক এক setএরই কতকগুলি মানুষের মুখ দেখে দেখে হাড় জ্বালাতন হয়ে যায়। এখানে দেখলাম গুটিকয়েক বাদে সবই নূতন। হেমবালাদিরা দুই বোনে এসেছিলেন, তাঁদের পিছনের সারিতে গিয়ে ঠেসে বসলাম। অনেক-গুলি সুন্দরী তরুণী ও বালিকাকে দেখলাম। দুঃখের-বিষয় অধিকাংশেরই নাম জানতে পারলাম না। গান, আবৃত্তি অভিনয় প্রভৃতি অনেক কিছুই হল। খুব যে ভাল হচ্ছিল performanceগুলো তা নয়। ভাল করে train করা হয়নি, কিন্তু উৎসাহটা মেয়েগুলির অতিশয়ই খাঁটি। গায়িকাদের মধ্যে একটি রূপসী কিশোরী খুব চোখে পড়ল। পরিচয় নিতে গিয়ে জানলাম সেটি স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জির কন্যা।

Lady Bose প্রাইজ দিলেন। মেয়েরা প্রাইজ নিতে এসে অনেক মজা করল। কেউ প্রিয়ম্বদা দেবীর হাত থেকেই বই প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কেউ Lady Boseকে একখানা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ফেলল, কেউ বা প্রদক্ষিণ করে গেল। সমাগত মহিলাবৃন্দের আচরণ দেখে অনুমান করছিলাম যে এঁরা সভা সমিতিতে বিশেষ অভ্যস্ত নন। সারাক্ষণই হলে প্রচণ্ড গোলমাল চলছিল। যাক, এক সময় শেষ হল। সভা ভঙ্গ হতে উঠে পড়ে একটু এর ওর সঙ্গে আলাপ করে বেড়ালাম। লেখিকা ইন্দিরা দেবীর* সঙ্গে আমার এক ছাত্রী আলাপ করিয়ে দিল। মহিলা আমাদের চেয়ে অনেক বড়। নিতান্ত ঘরোয়া গৃহিণীর চেহারা। কথাবার্ত্তা খুব বেশী যে কিছু বললেন, তা নয়। আমাদের দুই বোনের লেখা যে তাঁর খুব মিষ্টি লাগে সেই কথাটা অনেকবার করে বললেন। লেডী বোস ইতিমধ্যে তাঁকে পাকড়ে নারী শিক্ষা সমিতিতে একটা বক্তৃতা দেওয়াবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। প্রিয়ম্বদা দেবী এর ভিতরে আবার জলযোগের জোগাড় করে রেখেছিলেন, তাও স্বহস্তে না খাইয়ে ছাড়লেন না। সে এক কাণ্ড।

পরদিন আবার যেতে হল মেয়েদের সেই clubএ। সে কি এ রাজ্য? চলেছি ত চলেইছি। অনেক কষ্টে, অনেক ঘোরাঘুরি করে Mrs. K. N. Royএর বাড়ী আবিষ্কার করা গেল। অভ্যর্থনা করবার জন্যে দুজন মেয়ে হাজির ছিল। মস্ত বাড়ী lawn বাগান সবই রয়েছে, খালি মানুষেরই অভাব। একটা hallএ বসে আমরা খুব খানিক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করেই club-এর উদ্বোধনের কাজ সারলাম। Mrs. Roy (কামিনী রায়) উপস্থিত ছিলেন এবং আশে পাশের থেকে গুটি দুই-তিন মেয়ে এসেছিল। Plan ত অনেক রকম করা হল, কাজে কতদূর কি হবে জানি না। অবশেষে বেশ গুছিয়ে চা খেয়ে চলে এলাম। অতঃপর আর যে যেতে পারব তা মনে হল না।

* বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

এই সপ্তাহের গোড়াতেই পাড়ায় একটা বিয়ে হয়ে গেল। এঁরা এ পাড়ায় নূতন আগন্তুক, আলাপ পরিচয় বেশী ছিল না। তবু প্রতিবেশী হিসাবে নিমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম। হৈ চৈ যথেষ্টই হল। তবে আমাদের সঙ্গে কোন পক্ষেরই বিশেষ আলাপ নেই, কাজেই আমাদের part ওর মধ্যে সেজেগুজে যাওয়া, খাওয়া ও সর্ব্ব সাধারণের সমালোচনা করা। কনেকে ভাল দেখাচ্ছিল না এ বিষয়ে দেখি সবাই একমত। তবে দোষটা সবটাই কনের নয়, কনেকে যিনি সাজিয়েছিলেন, তাঁর দোষও ছিল।

17th February.

আমাদের এক সহকর্ম্মিণীর বিয়েতে গিয়েছিলাম। বিয়েটা দেখলাম খুব সনাতন type-এর হচ্ছে যদিও বর কনে কেউ সনাতনী নয়। তাঁরা বিয়ের আগে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন না, কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছামত বিয়ে হয়ে গেল। বলা বাহুল্য এহেন বিয়েতে যেতে উৎসাহিত লাগছিল না, তবু অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, কাজেই গেলাম। ছোট একটা বাড়ীতে বিয়ে হল। নিমন্ত্রিতদের বসবার জায়গাই নেই, সব গলিতে এবং ফুটপাথে ঘুরতে লাগল। অবশ্য এঁরা নিমন্ত্রিতদের male section। অনেক কষ্টে ঠেলাঠেলি করে বিয়ের জায়গা অবধি গেলাম, সেখানে আমার অন্য সহকর্ম্মিণীরা বসে গল্প করছিলেন। আমাকে তাদের মধ্যে এনে বসাবার অনেক চেষ্টা হল, কিন্তু অমন ভাবে ময়দা ঠাসা হতে আমার ইচ্ছা করল না, আমি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েই বিয়ে দেখতে লাগলাম। খাওয়া-দাওয়াটা মন্দ হল না। অতঃপর স্কুলের বন্ধুরা চলে যাওয়াতে আর থাকতে ইচ্ছা করল না। বর-কনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না। বর ব্রাহ্মত্ব সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিলেন এবং কনে কথাই বললেন না। সেখান থেকে সরে এসে একটা নিরিবিলি বারান্দায় গোটা দুইভাঙা চেয়ার আবিষ্কার করে সেখানে বসে দুচারজন মিলে একটু গল্প করলাম। নীচে তাকিয়ে একদল ভদ্রলোকের আহার দেখা যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ ছিলাম সেখানে।. তাঁরা উঠবার পর দেখলাম, এখন line clear, বিয়ে বাড়ীর থেকে বেরোন যেতে পারে। আমাদের বাড়ীর কাছেই, সুতরাং হেঁটেই চলে যাব ঠিক করে নেমে পড়লাম। সুকুমারবাবু সঙ্গে যেতে পারেন বললেন, পাড়ার প্রভাত-কুসুম রায়চৌধুরী গাড়ীও offer করলেন। কিন্তু ঐটুকুর জন্যে আর কাউকে ব্যস্ত করতে ইচ্ছা করল না। যদিও রাস্তায় হাঁটার পক্ষে সাজসজ্জা একটু বেশীই ছিল তবু হেঁটেই চলে এলাম।

3rd April.

আমাদের দেশে চৈত্র মাসটা নামেই বসন্তকাল, কার্য্যতঃ গ্রীষ্মের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকলে লেখাপড়া কিছু করা যায় না, অথচ খুলে রাখলে গায়ে ছেঁকা লাগতে থাকে। যত গরম বাড়ছে, কাজকর্ম্ম করা ততই অসম্ভব হয়ে উঠছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে এই অসহ্য সময়টাতেই লেখাপড়ার কাজ হয় ভাল।

পরশু Dr. Bose এর একটা বক্তৃতা শুনে আসা গেল। সাহিত্য পরিষদ থেকে ব্যাপারখানা organise করা হয়েছিল, যদিও hallটা Bose Instituteএরই। আমার স্কুলের বোর্ডিং-এই সে রাতের মত থেকে গেলাম, না হলে বক্তৃতার শেষে বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। সাদাসিদে কাপড়ে যাওয়ায় বোর্ডিংএর বন্ধুদের মত হল না, কাজেই borrowed plumes-এ সেজেগুজে ত গেলাম। কিন্তু বক্তৃতা শুনব কি, হলের ভিতরে এমন অসহ্য গরম যে আর কিছুতে মনই দিতে পারলাম না। বসু পরিবারের অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হল।

বক্তৃতাতে খানিকক্ষণ Ladies Park-এ ঘোরা গেল। তারপর স্কুলের lawn-এ বসে গান গাওয়া গেল। বেশ সাড়ে ন'টা বাজিয়ে উপরে গেলাম, সেখানে গল্প করা, লেমনেড খাওয়া, চুলবাঁধা সারতে সারতে বোধহয় ১১টাই বেজে গেল। শনিবার সকালেও স্কুল থেকে চা খেয়ে বাড়ী ফিরলাম। স্কুলে যদি পড়াতে না হত, তাহলে ব্যাপারটা আমার বোধহয় ভালই লাগত। কি যে বিষম উৎপাত এই পড়াশুনো ব্যাপারটা।

28th Apri, Kurseong. দিন পাঁচ-ছয় হল plain ছেড়ে পাহাড়ে এসে ওঠা গেছে। বাড়ীর জানলা খুললেই

দূরে ছবির মত আঁকা সমতল ভূমি চোখে পড়ে। এখানে কি জানি কেন এবার বিশেষ ভাল লাগছে না। জায়গাটা lonely বড়, চেনাশোনা লোকজনও বিশেষ নেই। তবে দেখতে বেশ ভাল, ফুলের মেলাও খুব চারিদিকে। বেড়াতে বেরোলে দেখা যায় অনেক কিছু, পাহাড়ের ভীমকান্ত সৌন্দর্য্য, ঝরণার লীলাময়ী গতি, সবুজের বিজয় যাত্রা, কিন্তু ভাল লাগে না সঙ্গীর অভাবে।

২৮শে চৈত্র আমার জন্মদিন গেল। সে দিন ঘরে বাইরের থেকে উপহার খুব খানিক পাওয়া গেল। একে জন্মদিন, তার উপর স্কুল থেকে কিছুকালের মত বিদায় গ্রহণ। রোজ ত ফুলের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরতাম। তেতলার ছোটঘরে ক'দিন যেন ফুলের হাট বসে গিয়েছিল। জন্মদিনের দিন বিকেলে আবার বন্ধুদের আমন্ত্রণে বোর্ডিং-এ গিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে এলাম। শরীর খুব ভাল ছিল না, তবু নিমন্ত্রণকারিণীদের মর্য্যাদারক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম।

Lady Bose নববর্ষ উপলক্ষে তাঁর শিক্ষয়িত্রীবর্গকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দিদিকেও করেছিলেন, তবে অসুস্থ ছিল বলে সে যায়নি। এর আগের দিন রীতিমত রাবীন্দ্রিক বর্ষশেষ উপভোগ করা গিয়েছিল। কাল-বৈশাখীর প্রসাদে বেশ করে ভিজে অসুখ বাধিয়েছিলাম, তবু গেলাম। যখন পৌছলাম তখন মেরী কার্পেণ্টার হলে নারী শিক্ষা সমিতির আয়োজিত বক্তৃতা হচ্ছে। একটু পরেই সভা ভাঙল, তখনই হুড়মুড় করে কত রকমের মেয়ে যে বেরিয়ে পড়ল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। পরিচিত এবং অপরিচিত কত মহিলাই যে আমাকে পাকড়ে বাড়ীর লোকের খোঁজ করতে লাগলেন তার ঠিকানা নেই। হেম-বালাদি তাড়া দিয়ে বললেন, "তুমি সর শীগগির সিঁড়ি থেকে, নইলে কেউ আজ আর বাড়ী যাবে না।" অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করলাম।

সেদিনও কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব খানিকটা উপভোগ করে তবে Lady Bose-এর বাড়ী খেতে যাওয়া গেল। খাওয়া ভালই হল, তবে গল্পগাছা খুব জমল না। খুমু* গোটা দুই গান গাইল সেটা অবশ্য বেশ ভালই লাগল।

29th April.

শুক্রবার বিকেলে কার্শিয়ং যাত্রা করেছিলাম। বাঁধা-ছাঁদার কাজ আমাকে কিছু করতে হল না, দিদি এবং ভূলু বাবু মিলে সবই করে দিল। See off করতে বন্ধুবান্ধবের দল অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। ট্রেন ছেড়ে দিল, ভূলু এবং হেমু platform-এর শেষ অবধি গাড়ীর সঙ্গে দৌড়েই চলল। Journeyটা মোটের উপর বড়ই colourless হল। D. H. R. এর খেলনা গাড়ী চড়ে যখন পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম তখন মনে হল অনেক-কাল পরে পুরণো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি থেকে snowy range-টা একবার দেখা গেল। ঝরণা, পাহাড়, মেঘের খেলা এসবের একটা সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু তার typeটা বড় gloomy, সমুদ্রের মত নয়। তাকে একবার দেখে যতখানি ভালবেসে ফেলেছি, পাঁচ ছয় বার দেখেও নগাধিরাজের সঙ্গে সে প্রেমের সম্পর্ক হল না। কেবল কুয়াসা, কেবল ঝাপসা ভাব, সব যেন ছায়া আর মরীচিকা। All enveloping mist-এর মধ্যে কোন জিনিষকেই ঠিক বাস্তব বলে বোধ হয় না।

বাড়ী খুঁজে যখন এসে ঢুকলাম এবং সুখবর পেলাম যে packing caseটা এসে পৌছয়নি তখন মনের যে ভাবটা হল, তার যোগ্য বিশেষণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। যাই হোক, উপায় যখন নেই, ওরই মধ্যে নিজেদের comfortable করে নেবার চেষ্টা করা গেল। সুখের বিষয় সেই দিন বিকেলের মধ্যেই বাক্সটা পাওয়া গেল।

তারপর দিনগুলো ত কাটছে। ভাল কাটছে বলতে পারি না, তবে মনটা settle করে আসছে। ক্রমে ক্রমে কাজকর্ম্ম করা বোধহয় আরম্ভ করতে পারব। কাল পাহাড়ে রাস্তা ধরে অনেকখানি উপরে উঠলাম। এক-একটি জায়গা এমন সুন্দর romantic, দুঃখের বিষয় যে একলা একলা romance করা যায় না।

আমাদের বাড়ীর থেকে এক টুকরো plain দেখা যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে ঐটুকুই উল্লেখযোগ্য, বাকি টিনের

* শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, স্বর্গত অধ্যাপক নির্ম্মল-কুমার সিদ্ধান্তের পত্নী।

চালের শ্রেণী চারদিক্ জুড়ে চোখে যেন খোঁচা মারে। কুয়াশা, মেঘ, বাদ্‌লা, রোদ সব একটার পর একটা এখানে ধেয়ে চলেছে। বেড়াতেও যাচ্ছি। সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখছি কিন্তু impressionগুলো মনে থাকছে না বেশীক্ষণ।'

গত রবিবারের আগের রবিবারে এখানে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ছোটখাট একটা উৎসব হয়ে গেল। তাতে দার্জ্জিলিং থেকে কয়েকজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও মহিলা এলেন। এঁদের মধ্যে হেম মাসীমাও (শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার) ছিলেন। সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব হল, দুপুরে খাওয়া দাওয়াও ওখানেই হল। দিন কয়েক আগে ভুলু (বিমল সিদ্ধান্ত) ও তার তিনচারজন বন্ধু এখানে এসে দিনটা কাটিয়ে গেল। একবেলা আমাদের এখানেই খেল এবং সারাদিন শহরে হৈ হৈ করে বেড়াল।

4th July, Calcutta.

বেশ কয়েকদিন হ'ল plainএর মানুষ আবার plain-এই ফিরে এসেছি। স্কুলও খুলেছে, রোজ যাচ্ছি আসছি। তবে শরীরটা এখানে এসে আবার খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কার্শিয়ং থেকে ১৫ই জুন যাত্রা করলাম। তার আগে একদিন Dow Hill Road বেয়ে অনেক উপরে উঠে গেলাম। এখান থেকে চারিদিক্ ভারি চমৎকার দেখায়। St Mary's school-টা কিছু নীচে পটে আঁকা ছবির মত দেখায়। কালো গাউন পরা Fatherদের মূর্ত্তিগুলো এখানে বেশ মানায়। রাস্তাটা যত উপরে উঠেছে তত সরু হয়ে গেছে। খালি মেঘ আর মেঘ, পাঁচ মিনিট পরে পরেই চারিদিক ঢেকে শাদা হয়ে যাচ্ছে। Weston Road দিয়ে হুড়মুড় করে নামলাম, ভয় হচ্ছিল পাছে উল্‌টে পড়ি, এত steep রাস্তা। এ যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা, কোথাও কিছু দেখা যায় না, কেবল চলেছি ত চলেইছি। ঝোপঝাড়ে বেষ্টিত গড়ানে পথ, জনমানবের বসতি নেই। অনেক পরে পা যখন ক্লান্ত হয়ে আসছে তখন হঠাৎ এই ঘন কুয়াসার মধ্যে মানব শিশুর কাকলি শুনে অবাক্ হয়ে গেলাম। যত এগোচ্ছি স্বর তত উচ্চ হতে উচ্চতর হচ্ছে অথচ চোখে কাউকে দেখছি না। বুঝলাম সামনের Convent বাসিনীদের আনন্দ-কলরব। প্রায় যখন Cart Road-এর কাছাকাছি নেমেছি তখন একদল ঘোমটা দেওয়া পাহাড়ী পক্ষী এবং গুটি দুই-তিন nun-এর সাক্ষাৎ লাভ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। Weston Roadএ নেমে অবধি মানুষের মুখ দেখিনি।

Jourey-টা মোটের উপর মন্দ হয় নি, শরীরটা আশ্চর্য্য রকম ভাল ছিল। তবে Himalayan পথে যখন বৃষ্টি এল এবং সব পরদা ফেলে দিয়ে যাত্রীরা এক-একখানা বিশাল চুরুট ধরিয়ে বসলেন তখন অবস্থা বড়ই কাহিল হল। বৃষ্টি যখন থামল তখন পরদা তুলে দেখলাম যে পাহাড় ছেড়ে নেমে পড়েছি, এবং সমতল পথে গড়িয়ে চলেছি। আকাশ তখনও মেঘে ঢাকা, তবে ফাঁকে ফাঁকে তারার আলো দেখা যাচ্ছে। দুধার দিয়ে বৃষ্টির জলধারা প্রবল বেগে চলেছে। আঁধারের মধ্যে ছোট ছোট নদীর গর্জ্জন, মধ্যে মধ্যে বিপুল জলোচ্ছাস, চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। শিলিগুড়িতে নেমে বড় ট্রেনে ওঠার পর আর দর্শনযোগ্য কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর দিনের পরে দিন অভ্যস্ত গতিতে চলেছে।

মাঝে একদিন Short Streetএ ডাঃ নীলরতন সরকারের নূতন বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বেশ সুন্দর বাড়ী, জায়গা অনেকখানি। অরুন্ধতী আমার ভ্রাতৃজায়া হতে চলেছেন। আসবার সময় বাগানের অনেক ফুল নিয়ে আসা গেল।

আমাদের পাড়ায় এখন এক নূতন interestএর জিনিষ হয়েছে, একটা mixed club ছেলেমেয়েদের। প্রশান্ত মহলানবিশের বহুকালের একটা সখ এখন কাজে পরিণত হল। তাদের সাবেকী বাড়ীতে এরকম সমাবেশ হবার জায়গা ছিল না। সম্প্রতি সে একটা বড় flat ভাড়া করেছে পাড়ার মধ্যেই। এখানেই club এর অধিবেশন হবে। মস্ত বড় ছাদ আছে, বড় ঘরও আছে। প্রথম অধিবেশন হল বোধহয় 8th April, আমরা কার্শিয়ং যাবার আগে। ছাদেই হল, তবে ছেলেমেয়েরা সনাতন প্রথা মত দুভাগে বিভক্ত হয়ে বসল। খাওয়া দাওয়া, গান,

গল্প সবই হল। প্রশান্ত এক মজার question paper তৈরি করে সবাইকে দিয়ে পরীক্ষাও দিইয়ে নিল। মোটের উপর মন্দ হল না।

কার্শিয়ং যাবার আগের দিনও একবার meet করল সবাই। প্রায় আগের দিনের মতই হল। গান হল কয়েকটা। কয়েকজন উদীয়মান সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হল। প্রশান্তর অনেক programme ছিল, charade প্রভৃতির, তাও হল খানিক খানিক। হঠাৎ ঝড় এসে যাওয়ায় ছাদ থেকে নেমে নীচের হল ঘরে আশ্রয় নিতে হল। সেখানেও খানিক এই সব খেলা চলল। আজকে লোক বেশ হয়েছিল। অনেকগুলি যুবককে দেখলাম যাদের আগে কখনও দেখিনি, বোধহয় ব্রাহ্ম সমাজের ছেলে নয়। মনে হল, এই নবাগত ছেলের দল একটু যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, ভাবছে ব্রাহ্ম পার্টি এই রকম নাকি?

সুকুমার বাবু আমাদের মস্ত ভরসা ছিলেন। তিনি কিন্তু খুব ভুগে চলেছেন। এরই মধ্যে একদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখে মন খারাপ হয়ে গেল, কি ছিলেন আর কি হয়ে গেছেন। নবজাত খোকাকে দেখলাম। খুব প্রবলভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করল।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারা

অশোক সেন

পৃথিবীর নানা দেশে এক এক সময়ে এমন এক-একজন বিরাট প্রতিভাশালী কবি, নাট্যকার বা কথাশিল্পী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের সৃষ্টির মাহাত্ম্য শুধু দেশ বা কালের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। দিনে দিনে এবং দিকে দিকে তাঁহাদের যশঃ এবং খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাতৃভাষায় লিখিত তাঁহাদের সাহিত্যের বহু ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে, বহু দেশের লেখক নিজেদের মাতৃভাষায় ঐ সব সাহিত্যের অনুবাদ পড়িয়াছেন এবং মুগ্ধ বিস্ময়ে সেগুলির শিল্পরস উপভোগ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। সেক্সপীয়ার, গ্যয়টে অথবা টলষ্টয়ের অথবা তাহারও পূর্ব্বে হোমার বা বাল্মীকির প্রতিভা ছিল এত বিরাট এবং সুদূরপ্রসারী যে আজ সমগ্র বিশ্বের কৃষ্টি ও সভ্যতার আসরে তাঁহাদের স্থান চিরকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

ঠিক একই কারণে রবীন্দ্রনাথকেও বিশ্ব-সাহিত্যিকের পর্যায়ে ফেলা হয়। শুধু বাংলার কবি, ভারতবর্ষের কবি, এমন কি এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি বলিলেও তাঁহার প্রতিভার যথোচিত স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তাঁহার প্রতিভার প্রতি সম্মান দেওয়া হইয়াছে সর্বদেশে, তাঁহার সাহিত্য সবকালের এবং তাঁহার প্রধান পরিচয় বলিতে এই বুঝি যে তিনি বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ।

অনেক সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, কোন সময়ে তাঁহারা সাহিত্যজগতে একটা বিরাট আলোড়ন তুলিলেন, তাঁহাদের লইয়া কিছুকাল খুব হৈ চৈ চলিল, আবার কিছুকাল বাদে সে উত্তাপ স্তিমিত হইয়া আসিল। ইহার অর্থ অবশ্য ইহা নয় যে তাঁহাদের প্রতিভা নাই কিন্তু একইভাবে চিরকাল নিজ নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত বিরাট সাহিত্য তাঁহারা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, ইহাই বুঝা যাইবে।

সেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অন্য ধরণের। এঁদের সৃষ্টির গভীরত্ব, কল্পনার ব্যাপকতা, শিল্প সৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য এমন একটা উচ্চ মার্গের যে কোন এক স্থানে পৌছাইয়া ইঁহারা বাধা পান নাই। কোনকালেই পাঠক বা সমালোচক এ কথা বলিতে পারিবেন না যে, এই অবধি বলার পরই রবীন্দ্র সাহিত্য অথবা সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে শেষ বলা হইয়া গেল।

কার্লাইল তাঁহার The hero as poet প্রবন্ধে বলিয়াছেন, --If I say that Shakespeare is the greatest of intellects, I have said all concerning him. But there is more in Shakespeare's intellect than we have yet seen. It is what I call an unconscious intellect there is more virtue in it than he himself is aware of. Novales beautifully remarks of him, that those dramas of his are products of Nature too deep as Nature herself. I find a great truth in this saying. Shakespeare's Art is not Artifice, the noblest worth of it is not there by plan or precontrivance. It grows up from the deeps of Nature through this noble sincere soul who is a voice of Nature. The latest generations of man will find new meanings in Shakespear new elucidations of there own human being; new harmonies with the infinite structure of the Universe; concurrences with later ideas, affinities with the higher powers and senses of man.

This well deserves meditating. It is Nature's highest award to a true simple great soul, that he get thus to be a part of herself. Such a man's works, whatsoever he with utmost conscious exertion and forethought

shall accomplish, grow up with all unconsciously, from the unknown deeps in him,—as the oak-tree grows from the Earth's bosom as the mountains and waters shape themselves ; with a symmetry grounded on Nature's own laws, conformable to all truth whatsoever. How much in Shakespeare lies hid. his sorrows, his silent struggles known to himself, much that was not known at all, not speakable at all ; like roots, like sap end forces working underground Speech is great, but silence is greater.

(From Heroes and Hero-worship 1840)

সেক্সপীয়ারের মত রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধেও এতটুকু দ্বিধা না করিয়া বলা যাইতে পারে—যুগে যুগে নব নব পাঠক, নব নব সমালোচক আসিবেন এবং তাঁহার রচনার উপর হইতে পর্দার পর পর্দা সরাইয়া ফেলিয়া নূতন নূতন সম্পদের আবিষ্কার করিবেন—নূতন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিবেন, ছন্দের নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন, ভাবের লালিত্যে চমৎকৃত হইবেন, চিন্তার গভীরত্বে সর্বব্যাপী বিরাটত্বের পরিচয় লাভ করিবেন।

এই প্রসঙ্গে শেলীর A difence of Poetry প্রবন্ধ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল। শেলীর এই মন্তব্য রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রযোজ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

"All high poetry is infinite veil after veil may be undrawn, and the naked beauty of the meaning never expressed. A great poem is a fountain for ever, our flowing with the waters of wisdom and delight, and after one person and age has exhausted all its divine influence which their peculior relations enable them to share, another and yet another succeeds and how relations are ever developed, the source of an unforeseen and unconcieved delight.

রবীন্দ্র মানসে আমরা বহু বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রকৃতির সহিত তাঁহার যে একটা নিবিড় আত্মিক নৈকট্য ছিল এ কথা তাঁহার বহু লেখার মধ্য দিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের লেখা হইতে কিছু তুলিয়া দিলাম—

"প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করে। এই তৃণ-গুল্মলতা, জলধারা, বায়ু-প্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে-বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়ছে সেখানে ঝংকার উঠছে সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অনু পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত তাহলে কখনোই এই বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হত না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হয়ে উঠত।"

... ...

"এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলেছে? কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড় আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাহিরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের নিজের ভিতরে ভাল করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি।

... ...

"এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলাম...ইত্যাদি।

"এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল

নতুন। ...আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন”—ইত্যাদি।

প্রকৃতি এবং বিশ্বের সমগ্র মানুষের সমাজের সঙ্গে যে গভীর একাত্মবোধ কবি অন্তর হইতে অনুভব করিয়াছেন তাহারই সংজ্ঞা দিয়াছেন সহানুভূতি। কবি বলিয়াছেন—

‘এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভ মুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চির পুরাতন একাত্ম্য আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।”

রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন:

“রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর চিত্তের ও চেতনার গহনে তিনটি কি চারটি ধারা প্রবহমান; এ কয়েকটিতে মিলে মিশে তাঁর কবি-স্বভাবের তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য গড়ে দিয়েছে। ধারা ক'টি হোল—প্রথম, উপনিষদের ধারা:

(কবি নিজেই বলেছেন—“আমাদের বাড়ীতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্ পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক; এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, সাধারণত বাংলা দেশে ধর্মসাধনার ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়ীতে তা' প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

... .

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি: তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে; যা রয়েছে তোমার চারিদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ করোনা। কাব্য সাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।”

—আত্মপরিচয়।)

দ্বিতীয়, বৈষ্ণব ভাবের ধারা:

(“শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেই জন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।”

—জীবনস্মৃতি)

তৃতীয়, ‘পেগান' (pagan) অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যভোগের ধারা; আর চতুর্থ যোগ করা যেতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা বুদ্ধিবাদের ধারা।

আমরা মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষা ধার করে বলতে পারি উপনিষদ্‌ভাব রবীন্দ্রনাথের উর্দ্ধতর বুদ্ধিকে ভাস্বর করেছে, বৈষ্ণব-ভাব তাঁর হৃদয়কে (উর্দ্ধতর প্রাণকে) সরস ও বিদগ্ধ করেছে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাঁর নিম্নতর প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে অপরূপ মোহিনী শক্তিতে ভরে দিয়েছে। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি বাহ্যমান সমস্তাকে, মস্তিষ্কের পরিধিকে পরিপূর্ণ করে সকলকে ঘিরে—অনেক সময়ে সূক্ষ্মভাবে—একটা ব্যাপক আবহাওয়া রচে দিয়েছে। তবে এই সংমিশ্রণ বা যোগাযোগের ফলে কোনো ধারাটিই তার স্বকীয় বিশুদ্ধ স্বরূপ বজায় রাখতে পারে নি—প্রত্যেকে একটা নূতনত্ব অর্জন করেছে, সকলের উপর পড়েছে একটা রাবীন্দ্রিক ছাপ।”

খুবই সত্য কথা। যে কোন ধারাই রবীন্দ্রমানসে আসিয়া মিশিয়াছে কবির লেখনীতে তাহা রূপ লইয়াছে বিশেষ রাবীন্দ্রিক ভঙ্গীতে। কোন ভাব অথবা তত্ত্বকে যখন তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, আগে তাহাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, তারপর তাহাকে রূপায়িত করিয়াছেন নিজের রচনায়। এই জন্যই তাঁহার ভাবধারাকে কখনও ‘নকল’

অথবা 'ধার করা' চিন্তা বলিয়া মনে হয় না—সবই যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁহার কল্পনার উৎস হইতে নিঃসারিত হইয়াছে—আর এই জন্যই তাঁহার প্রকাশভঙ্গীও এত সহজ এবং প্রাণবন্ত।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় সৌন্দর্যের কবি রবীন্দ্রনাথের নামকরণ করিয়াছেন সৌন্দর্যের সন্ন্যাসী।"

এ নামকরণের দ্বারা তিনি কবির সৌন্দর্য উপলব্ধির বিশেষ ভঙ্গীটাই আমাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখিয়াছেন—"মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে।"

'পূরবী'র 'আশা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন--

"মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপ্নলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।"

এই কথাগুলি শুধু কথার কথা নয়। কবি নিজের জীবনে সবক্ষণ এই সুন্দরকে ধ্যানের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া কাব্যে তাহার রূপ দান করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মূল কথা হইতেছে সৌন্দর্য—

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো
সুন্দর করো হে।" (গীতাঞ্জলি)

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল সুন্দর, এই জন্য যাহা কিছু তিনি দেখিয়াছেন তাহার ভিতর হইতেই আবিষ্কার করিয়াছেন সুন্দরকে। তারপর অনুপম শিল্পী যেমন তাঁহার মনোভাব ফুটাইয়া তুলেন তুলির রেখায় রেখায়, তেমনি আমাদের কবি তাঁহার অন্তরের ধ্যানলব্ধ সৌন্দর্যকে রূপ দিয়াছেন নানাভাবে—সঙ্গীতের সুরলহরীর ভিতর দিয়া কাব্যের ছন্দ লালিত্যে, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকের মাধ্যমে সার্থক শিল্পরসের সৃষ্টি কৌশলে। ইহাতেও কবি ক্ষান্ত হন নাই—মনে হইয়াছে দেবার আরও উপায় আছে—অন্তরে এবং বাহিরে যে সৌন্দর্যের রসাস্বাদে তিনি নিজে মুগ্ধ, চকিত, বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন, তাহাকে আরও নূতন রূপে পরিবেশন করিতে হইবে শিল্পরসিকের রসপাত্রে। তাই জীবনের সায়াহ্নে আসিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন চিত্রাঙ্কন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র যেমন তেমন হয় নাই। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ লিখিলেন :

"His art had something volcanic about it. It came out like a volcanic eruption—all that had been accumulated in the past and its very impetus gave it form, its very force shaped its course. Pause for a moment to contemplate the immensity of his genius. Literature, poetry and music were not enough for its full play, but it must perforce find an outlet through line and form and colour in his old age, in order fully to realize itself.

(Visva-Bharati Quarterly 1942)

নিজের ছবি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন : "But onething which is common to all arts in the principle of rhythm which transforms inert materials into living creations my instinct for it and my training in its use led me to know that lines and colours in art are no carriers of information, they seek their rhythmic incarnation in pictures. Their ultimate purpose is not to illustrate or to copy some outer fact or inner vision, but to evolve a harmonious wholeness which finds its passage through our eyesight into imagination. It neither questions our mind for meaning nor burdens it with unmeaningness, for it is, above all meaning."

(Chitralipi-2-Rabindranath Tagore.)

সৌন্দর্যকে কবি কখনও খণ্ড খণ্ডভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে দেখেন নাই। সমস্ত সসীম সৌন্দর্যের মূলে রহিয়াছে এক অনাদি অনন্ত অসীম সৌন্দর্য—ইহাই—ছিল তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু এই **abstract** রূপটিই আবার সৌন্দর্যের

পূর্ণ পরিচয় নহে। অসীম নিরন্তর সীমার ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে ব্যাকুল—

"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ"

অথবা,

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
... ...
আমি এলেম তাইতো তুমি এলে—" (বলাকা)

আবার যাহা সীমাবদ্ধ, যেমন নানা খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য, যেমন বস্তুরাশি—এ সবের মধ্যেও রহিয়াছে অসীমের দিকে আকর্ষণের ইঙ্গিত। সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে আকর্ষণ করিবার শক্তি যদি সসীম সৌন্দর্যের না থাকিত তবে সে সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিত না। এই যে অসীমের ক্রমাগত সীমার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ এবং সীমার অবিরত অসীমের দিকে আহ্বান, ইহারই ভিতর দিয়া সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের। এই সত্যটাই রবীন্দ্রনাথ বার বার প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন উৎসর্গের "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" নামক কবিতাটিতে। অন্যত্র বলিয়াছেন—

"রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।"

অথবা,

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।" (গীতাঞ্জলি)

অথবা,

"যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি
(জয়ধ্বনি—নবজাতক)

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে একটি সুসঙ্গতি এবং সমন্বয়ের ভাব। রূপ সৃষ্টিতেও অসামঞ্জস্যের কোন স্থান থাকিতে পারে না। যে সৃষ্টিতে সঙ্গতির অভাব আছে তাহাকেই ত বলিব কুৎসিত; বলিব যথার্থ অসুন্দর।

এই সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়াই সৌন্দর্যের মূল অর্থাৎ "ছন্দকে লাভ করা যায়। ছন্দনৃত্যের অনুরণনে যে মিলনের ভাবটি আত্মপ্রকাশ করে তাহাকেই ত বলে সৌন্দর্য। যাহার ভিতর সুর নাই, সঙ্গীতের অভাবে যাহা দুষ্ট তাহাকে ত সুন্দর বলা চলে না। জগতের বিচিত্র শক্তির মধ্যে যিনি নিয়মস্বরূপ তাঁরই নাম শান্তম। এই জন্যই কবি 'শান্তম' মন্ত্রের এত বড় উপাসক। এই মিলনের মন্ত্রের মধ্য দিয়াই তিনি দেশ-কালকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন পাইয়াছেন তাঁহার বিশ্ববোধ। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির পিছনেই রহিয়াছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম।' সেই ঐক্যের মহিমাই কবি সারা-জীবন ধরিয়া গাহিয়া গিয়াছেন।

জাতিগত, দেশগত, ক্ষুদ্রস্বার্থপ্রণোদিত সমস্ত ভেদাভেদ দূর হইয়া গিয়া সমস্ত মানবজাতি সৌন্দর্যের বন্ধনে একদিন ঐক্যলাভ করিবে, ইহাই ছিল রবীন্দ্র-নাথের আদর্শ। এইখানেই তাঁহার 'বিশ্বকবি' নামের সার্থকতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী-শক্তি চরম বর্বরতার সহিত বিশ্বশান্তির মূলে কুঠারাঘাত সুরু করিল, নিরীহ শান্তিপ্রিয় ছোট ছোট জাতিগুলি তাহাদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উঠিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতাকে পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে হইল। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্যরোগমুক্ত, দেহ অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু পৃথিবীর এই মহাসংকটের দিনে কবি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে যে কি ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রান্তিকে'র ১৭ সংখ্যক কবিতায়। জীবন হইতে ধর্মকে বাদ দিয়া, সৌন্দর্যকে বর্জন করিয়া যে আত্মঘাতী আধুনিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত পাশবিকতা প্রকট হইয়া উঠিল কবির বর্ণনায়। এই সভ্যতার বীভৎসতা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিলেন—

"যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময় ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন নরকাগ্নি গিরিগহ্বরের তটে, তপ্ত ধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে যে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের

আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।......
......মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নরঘাতী
কুৎসিত বিভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

আজিকার পৃথিবীতে আমরা বোধ হয় সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি যে যতদিন না আবার জগতে ধর্ম্মবোধ এবং সৌন্দর্য্যবোধ ফিরিয়া আসিয়া সকলকে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধিয়া দিবে ততদিন আমরা আর শান্তির মুখ দেখিতে পাইব না।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার আড়ালেও রহিয়াছে এই সৌন্দর্যপ্রিয়তা। জাতির স্বাভাবিক সহজ-সুন্দর বিকাশের পথে একটা প্রধান অন্তরায় পরাধীনতা। সৃষ্টির ভিতর দিয়াই এই বাধাকে দূর করিতে হয় যে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অভাব মোচন করা সম্ভব হয় না। জাতীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে সুন্দর করিয়া, সুসমঞ্জস করিয়া—তাহা হইলেই ভিতর হইতে একটি ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠিবে—তাহার ফলে জাতীয় জীবনে যে শান্তির উদ্ভব হইবে তাহাকে অবনমিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা কোন বিদেশী শক্তিরই নাই—ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি, এ-কথা ভুলিলে চলিবে না। তিনি সুরসৃষ্টি করিয়াছেন, সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, যাহা আমরা বহিঃপ্রকৃতিতে দেখিতে পাই সেই সব সুন্দর দৃশ্যাবলীকে আমাদের দৃষ্টির অতীত—যাহা শুধু তাঁহার কাছেই বিশেষ ভাবে প্রতিভাত—এমন রূপের দ্বারা মণ্ডিত করিয়া সুন্দরতরভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৌন্দর্যসৃষ্টি তাঁহার শিল্পীজীবনের মূল কথা। সাধারণ দর্শক সাধারণ দৃশ্যের মধ্যে যে অপার্থিব সৌন্দর্য আবিষ্কার করিতে অসমর্থ সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে শুধু নিজে দেখা নয়, সবার কাছে তুলিয়া ধরিতে পারেন বলিয়াই ত কবি সাধারণ মানুষ হইতে উচ্চস্তরের মানুষ—কবির এই বিশেষ ক্ষমতার কথাটাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন তাঁর Nature and the Poet কবিতায়,

> To add the gleam
> The light that never was on sea or land,
> The consecration and the poets dream."

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি স্কুল-মাষ্টার নন, কবি। অর্থাৎ তিনি পাঠ দিতে অথবা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে আসেননি—সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ। তবু তো অনেক কিছুই তত্ত্ব দেখিতে পাই তাঁহার কাব্যাবলীতে। ইহার কারণ তত্ত্বকথাকে শুধু তত্ত্ব হিসাবে দেখাইবার প্রচেষ্টা কবি কখনও করেন নাই—কিন্তু যাহা সুন্দর, তাহাকে যে সত্য হইতেই হইবে এবং সেই কারণেই সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভিতর হইতে অনেক গভীর তত্ত্ব বা সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

হীন যান

(উপন্যাস)

সুবোধ বসু

ছয়

বনমালী দা একটা আশার খবর দিয়াছেন। দোকানের ছোক্‌রা ভুতো দেশে যাইবার কথা বলিতেছে। যদি সত্যিই যায়, তবে দু'তিন মাসের জন্য কাজ খালি হইতে পারে। বনমালী মালিককে আগেই বলিয়া রাখিয়াছে। নিমাইয়ের একটা সুযোগ হইতে পারে।

ভুতো নিমাইয়ের প্রতি তাচ্ছিল্যেরভাব অতি স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিত। সে মিষ্টির দোকানের ছোক্‌রা। দেওয়া এবং চুরি-করা রসগোল্লা সন্দেশ খায়; দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পারে। চুরি-করা মিষ্টি বন্ধুবান্ধবেরও মাঝে মাঝে বিলায়। রাতে ভিয়ানে সাহায্য করে; দিনের বেলা ফাই-ফরমাস খাটে। এ-বাড়ীতে ও-বাড়ীতে মিষ্টি পৌঁছাইয়া দেয়। ফুটপাথের বাসিন্দা নিমাইয়ের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া যায়।

ওকে দেখিলেই কিন্তু নিমাইয়ের হাসি পায়। ওর মিশমিশে কালো রং উৎকৃষ্ট আহার্য্যের কল্যাণে চকচক করে—মনে হয় যেন কালো জুতোয় নতুন পালিশ পড়িয়াছে। কিন্তু নিমাইয়ের হাসির উপাদান ইহা নহে। ভুতোর গণেশ ঠাকুরের মত ফুলো পেটটি তেমন গম্ভীর লোকেরও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে পারে।

ভাব করিবার উদ্দেশ্যে নিমাই একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'ভাই তোমার নামটা কি ?'

'তাতে তোর দরকার কি রে ছোকরা।' বলিয়া যথোচিত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সৌভাগ্যপুষ্ট ভুতো দোদুলদেহ দোলাইয়া নিজ কর্ম্মে প্রস্থান করে।

ইহার জায়গায় কাজ করিবার সম্ভবনায় নিমাই রীতিমত গৌরবান্বিত বোধ করিল। এইবার তবে গণেশ ঠাকুর বুঝিবে, নিমাইও নিতান্ত ফেলনা নহে। দুর্ভাগ্যের জন্যই নিমাইকে ফুটপাতে নামিতে হইয়াছে। একদিন তার ঘরবাড়ী, মা-বাবা, খেত খামার সবই ছিল।

'পরশু থন্‌ই কি কাজে লাগুম, বনমালী দা ?' নিমাই। মিষ্টির দোকানের সকলের ব্যস্ততা দূর হইবার পর বনমালীকে আসিয়া প্রশ্ন করিল। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে বহুবারই প্রশ্ন করা হইয়াছে, একটা কিনারা না হইলে সে শান্তি পাইতেছে না। দু' তিন মাস যদি একটা সাময়িক আশ্রয়ও মেলে তবে রাজাবাবু কলিকাতায় না ফেরা পর্য্যন্ত একটা হিল্লে হইয়া যায়। তারপর সে নিজেই হয়ত এই কাজ ছাড়িয়া দিতে পারিবে। অফিসের কাজ জোগাড় হইবে।

'কি জানি বুঝতে পারছি নে ত' বনমালী কহিল। ভুতোর দাদার ছুটি নিয়ে মুস্কিল হয়েছে। সে না গেলে ত ভুতোরও যাওয়া বন্ধ। ভুতো গেছে দাদার কাছে খোঁজ নিতে। ফিরে এলে জানা যাবে...'

শুনিয়া নিমাই প্রমাদ গণিল :

'ক্যান, একলা যাইতে পারে না ?'

'ছোট ছেলে, তাও কখনও পারে। ওর দাদা একা ছাড়বে কেন ?'

বেলা দুটো হইতেই নিমাই বৌবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। রমজান মিঞার আসিবার কথা আড়াইটায়। কিন্তু সাবধানের মার নাই। গরজ নিমাইয়ের। রাজাবাবুর বাড়ীটা একবার চিনিয়া আসিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সময় অতিক্রান্ত হইলে তখন সে একাই আসিয়া রাজাবাবুর দরবারে হাজির হইতে পারিবে।

রমজান মিঞা যথাসময়ের মিনিট কুড়ি পচিশ পরে আসিল।

'চল ছোক্‌রা। চলবি ত চল্।'

'চল।' নিমাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল। 'আমি ভাবলাম, তোমার আর মনে নাই।'

'রমজান মিঞা বাত দিবে তো তার গড়বড় হোবে না। জুম্‌মার নেমাজে দের্ হয়ে গেল। আল্লাহ্ মহম্মদ রসুল আল্লা।' বলিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া রমজান খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে আরম্ভ করিল।

'উই শ্যালদা ইষ্টেশান! দেখে লে। বড়া ভারি ইষ্টেশান।'

পরিচয়দানের প্রয়োজন ছিল না। নিমাই ইহার সহিত বিলক্ষণ পরিচিত। তবু সভয়ে সে একবার সেদিকে তাকাইয়া দেখিল। চেনা কারুর সঙ্গে দেখা না হইয়া যায়। তবে আবার বন্দী হইতে হইবে। হয়ত পুলিশের হাতে পড়িতে হইবে। অবশ্য দুলী এবং ননীদির হয়ত একটা খবর পাওয়া যাইত। কিন্তু তারা কি আর ফিরিবে? খোঁজ করিতে গিয়া সেই আটকা পড়িয়া যাইবে!

'চল্ ছোকরা, পা চালিয়ে চল।' শ্লথগতি নিমাইকে তাড়া দিয়া রমজান কহিল। 'দের করা চলবে না। বহুত কাম বাকী আছে।'

বাস্‌টা এখনও চলা শুরু করিবে কি, না দু এক সেকেণ্ড দেরী আছে। রাস্তা পার হইতে এখনও সে রপ্ত হয় নাই। ভীত শঙ্কিতভাবে যানবাহনগুলির দিকে তাকাইয়া ছুট্ মারিয়া তাকে রাস্তা পার হইতে হয়। রমজানের বাজখাঁই গলার তাড়া খাইয়া সে সামনের অনিশ্চিতমতি বাসটার সামনে দিয়া দৌড় মারিয়া রাস্তা পার হইয়া অন্য ফুটপাথে রমজানের সাথে মিলিত হইল। হেলেদোলা মেইন রোডের চাবি চাচার হাতে। ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলিলে কোন মতেই চলিবে না। বাস্ ড্রাইভারের গালি তার প্রায় কানেই পৌঁছিল না।

রাস্তাটার নাম মোড়ের মাথায়ই লেখা ছিল। উহা পড়িবার পর হইতে প্রতিটি বাড়ীর নম্বরের প্রতি নিমাই সতর্ক নজর রাখিয়াছে। রাজবাড়ী ফস্‌কাইয়া যাইবার মত জিনিষ নয়; তবু সাবধানের মার নাই। কোনও বাড়ীকেই তাহার দৃষ্টি-প্রহরী রেহাই দিতেছে না। রাজবাড়ীর নম্বর তার মুখস্থ তো বটেই, জপ-মন্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবু বুক পকেট হইতে রাজাবাবুর দেওয়া কার্ডটা বাহির করিয়া সে স্মরণশক্তিকে ঝালাইয়া লইতেছে।

'হাঁ ক'রে' কি দিখছিসরে ছোক্‌রা? জলদী আয়। তুরন্ত।'

রমজান মিঞা আপন মনেই নেংচাইয়া নেংচাইয়া চলিয়াছিল, সহসা তাকাইয়া নিমাইকে কাছে অনুপস্থিত দেখিল। আশেপাশে তাকাইয়াও তাহাকে দেখা গেল না। রমজান মিঞা অনুচ্চস্বরে একটা গালি নিক্ষেপ করিয়া বিরক্তভাবে পিছন ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

'কি করছিস উখানে। বুরবক লোগে! আ জা। আ জ।' একজন কর্ত্তাব্যক্তির মত ভঙ্গিতে আঙ্গুল নাড়িয়া ইসারা করিয়া আহ্বান করিল রমজান মিঞা।

নিমাই অন্তত পাঁচটা বাড়ী দূরে মস্ত একটা ফটকের সামনে খাড়া। রমজানের ডাক তার কানে ঢুকিয়াছে এমন কোনও লক্ষণই তার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। গ্রাম্যলোকসুলভ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে লোহার ফটকের ভিতর দিয়া বাড়ীর দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।

'কি কুরছিস রে সালা। দ্বারবানের হাতে মার খাবি?'

মারটা কিন্তু দ্বারবানের বদলে রমজানই দিল নিমাইয়ের পিঠের উপর।

নিমাই চমকাইয়া তাকাইল।

পালিয়ে আয়। রাজা-রহিমের মকানের দিকে আঁখ তুললেই পুলিশ ধ'রে নিয়ে যায় জানিস? খাড়া হয়ে কি কুরছিস?

'এই বাড়ীটাই দেখতে আইছি, রমজান চাচা।'

'কে নো রে, দুলহা হবিস? রাজার লড়কীর সঙ্গে শাদী করবিস? রমজান রসিকতার সঙ্গে কহিল। 'তুর গাঁওয়ের আদমী কোই আছে। তবে পুছ্‌না দ্বারবানজীকে। তার পর চলে আয়, বহুত আচ্ছা খবর আছে…।

রমজানের তাড়া এবং তার 'পুছনা'র প্ররোচনায় নিমাই মরিয়ার মত আগাইয়া গেল। প্রকাণ্ড লোহার ফটকের ডান পাশে কাঠের সেন্ট্রি বকস্ এর মুখে একটা টুলের উপর উর্দিপরা দারোয়ান তাহারই দিকে আড় চোখে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, নিমাই তাহার প্রতি নিজ প্রশ্ন ছুঁড়িয়া দিল।

'কিস্‌কে মাংতে হো?' দারোয়ান 'রাজাবাবু'র তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজের গুপরীর ভিতর হইতে পাল্টা সওয়াল নিক্ষেপ করিল।

'বাড়ীর কর্ত্তা। স্যার উমাশংকর গাংগুলী, কে, টি।'

নিমাই পকেট হইতে রাজাবাবুর দেওয়া চকচকে কার্ডটা বাহির করিয়া পড়িয়া কহিল। 'স্যার' কথাটি নিমাইকে প্রথম হইতেই বড় গোলমালে ফেলিয়াছে। স্কুলের মাষ্টারকেই সে স্যার বলিয়া জানে, অথচ রাজাবাবুকে মাষ্টার মনে করিবার কোনও উপায়ই নাই। কিন্তু কার্ডে যেমন লেখা ছিল সে বেমালুম তেমনি পড়িয়া গেল, এমন কি নামের শেষে কে. ও টি. অক্ষর দুটিও বাদ দিল না।

'বড়া সাব্!' এইবার দারোয়ানকে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর করিলেও করিতে পারে, কিন্তু একটা রাস্তার ভিখারী বড় সাহেবের খোঁজ করিবে ইহা অভাবনীয়। 'বড়া সাব নহী হায়। হটো।'

'আমারে রাজাবাবু দেখা করতে কইছে। এই তাঁর কার্ড।'

শাদা (সেলুলয়েডের) চক্‌চকে কার্ডটা সে রক্ষা-কবচের মতো উদ্যত করিয়া দেখাইল।

বাগানের ফোয়ারাটার কাছ দিয়া এক ভদ্রলোক ও-প্রান্তের একতলা সেরেস্তাখানার দিকে চলিয়াছিলেন, দারোয়ানজী তাহার প্রতি হাঁকিয়া কহিল, 'সরকার মোশায়, এই ছোকরা কি বোলতে শুনে জান। বড়া সাহেবের কার্ড দেখলাচ্ছে।' এতটা দূর হইতে ব্যাপারটা সরকার মশায়ের হৃদয়ঙ্গম হইল না। দারোয়ান পুনরুক্তি করিলে তিনি বিরক্তভাবে কাছে আগাইয়া আসিলেন এবং প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা জানিয়া লইলেন।

'দেখি কার্ডটা?' বেশ রুক্ষ কণ্ঠস্বর।

উপায় নাই। অমূল্য ধন পরের হাতে সমর্পণ করিতেই হইল। রাজাবাবু এখানে নাই। তিনি স্বয়ংই তাকে মাস তিনেক পরে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন। শুধু কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সে এমন চিপিতে পড়িয়াছে। নিতান্ত অসহায় বোধ করিল নিমাই। এখন ইনি যদি কার্ডটা ফেরৎ না দেন? কি পরিচয় লইয়া তবে সে রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে?

'কোথায় পেয়েছিস এই কার্ড?'

'রাজাবাবু আমারে নিজে দিছে।' নিমাই তোৎলাইয়া কহিল। 'আমার দুঃখের কথা শুইনা তিনি কন, তিন মাস পরে আমার সঙ্গে দেখা করিস। এখন আমি কইলকাতার বাইরে যাইতেছি।'

সরকার মশায় এইবার নিমাইয়ের দিকে ভালো করিয়া তাকাইলেন। মালিকের তিন মাসের অনুপস্থিতির এই খবরটা বলিতে পারায় বুঝিলেন, আর যাই হোক ছোকরা ঠগ নয়। কর্তাবাবু দয়ালু সদানন্দ পুরুষ। গরিবের প্রতি কৃপাবর্ষণ তাঁর এই প্রথম নয়।

কর্তাবাবু হাওয়া বদলাতে গিয়েছেন দার্জিলিঙে। মাস আড়াই পরে ফিরবেন। তখন আসিস।' বলিয়া কার্ডটা তিনি নিমাইয়ের হাতে ফিরাইয়া দিলেন।

ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল নিমাইয়ের।

'আমার কাম হইয়া গেছে' যেন যুদ্ধজয় করিয়া আসিয়াছে এমনি পরিতৃপ্ত গর্বিত কণ্ঠে নিমাই কহিল। 'চল, এখন ফিরা যাই, রমজান চাচা।'

'তলব কোত মিলবে রে ছোকরা?'

'তলব!' বিস্মিতভাবে নিমাই কহিল। 'ও, না না। চাকরি এখনও হয় নাই। রাজামশায় কইলকাতা ফিরা আইলে চাকরি হইব। দুই তিন মাস বাকি আছে।'

'এ তো দিন খাদি কিয়ে সালা।' রমজান প্রথমে প্রাসাদটা ও পরে নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল নোকরী মিলবার ফুরসৎ মিলবে না। তার পহলাই খতম হোয়ে যাবিস।...'

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। রাজাবাবুর ফেরার এখনও অনেক বাকি। এদিকে খাদের অবস্থা শোচনীয়। শিয়ালদহ ষ্টেশনে বহু আশ্রয়প্রার্থীর সমাবেশ। সেখানে রিফুজীর দুর্দশা সকলের চোখের সামনে একটা 'রিফুজী' বলিয়া সে অঞ্চলে ভিক্ষা পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। বৌবাজারে একক রিফুজী দয়া আকর্ষণ করিতে অসমর্থ। লোকে তার সততায় সন্দেহ করে। এই বয়সের জোয়ান ছোকরা খাটিয়া না খাইয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায় তাহা সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। অথচ খাটিয়া খাইবার সুযোগ কোথায়। কাজ তো সে করিতেই চায়, কিন্তু কাজ দেয় কে? হাতে ছচার আনা পয়সাও নাই! পরের বেলার খাওয়া জুটিবে কি জুটিবে না তাহা অনিশ্চিত।

এক ভরসা ভুতোর চাকরিটা। দু তিন মাসের কাজ বলিয়া তার কোনও আক্ষেপ বা অসুবিধা নাই। দুটো মাস কাটাইয়া সে অনায়াসে রাজাবাবুর কাছে হাজির হইতে পারিবে। তাঁর কার্ড দেখিয়া সরকার মশায় পর্যন্ত খাতির দেখাইয়াছেন। কিন্তু সকাল বেলা বনমালীদা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভরসা করিবার খুব কিছু নাই। ভুতোর দাদা ছুটি না পাইলে ভুতোরও দেশে যাওয়া বন্ধ। অর্থাৎ নিমাইকে যথাপূর্বং রাস্তার

কুকুরের মত খাওয়ার সন্ধানে ঘুরিতে হইবে, ভিক্ষা চাহিতে হইবে। এবং তাতে কোনও সমস্যারই হয়তো সমাধান হইবে না। ক্ষিধার জ্বালা কি ভয়ানক হাড়ে হাড়েই নিমাই তাহা টের পাইয়াছে।

'এসেছিস তো চল, এ এলাকাটা তুকে দেখিয়ে নিয়ে যাই।' রমজান আত্মীয়তার সঙ্গে কহিল। 'কত কারখানা, মিল। চাউল কলের গোসাঞিজীর সাথ জান-পহচানভী আছে। কাজকাম খালি আছে তো পুছ করে লিব। দেড় রুপায়া পৌনে দো রুপায়া রোজ মিলবে। বেঁচে যাবিস, ছোকরা...'

রমজান সামনে হাঁটা দিয়াছে। অগত্যা নিমাইকেও অনুসরণ করিতে হইল। নানা রকম কলকারখানা নজরে পড়িতেছে। পথে মালবোঝাই লরীর ব্যস্ত যাতায়াত। কর্মব্যস্ততার লক্ষণ। কোথায়ও একটা কাজ জুটাইয়া লইতে পারিলে মন্দ হয় না। তিন মাস চালাইতে পারিলেই হইল। তখন কাজে ইস্তাফা দিয়া রাজাবাবুর কাছে হাজির হইবে। তখন আর তার ভয় নাই।

একটা পুল পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ডাহিনে মোড় লইল রমজান। সেই পুলের তলা দিয়া একটা রাস্তা গিয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া আগাইয়া আরও দু তিনবার মোড় লইতে হইল। ফলে, রাস্তার ভূগোল এলোমেলো হইয়া উঠিল নিমাইয়ের কাছে। কিন্তু অঞ্চলটা যে ক্রমেই নোংরা অপরিচ্ছন্ন ও বস্তিবহুল হইয়া উঠিতেছে তাহা সহজেই নজরে পড়িল।

দুই সারি খোলার ঘরের মাঝে অনতিপরিসর একটা গলির মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড একটা লরী ভরা-বস্তায় পূর্ণ হইয়া 'পো-আপ' 'পো-আপ' শব্দ করিয়া একটা আস্ত বুনো হাতির মতো বড় রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। রমজান দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। একবার পিছনে নিমাইয়ের দিকে ঈষৎ ফিরিয়া কহিল, 'চাউল কল থেকে আসছে। চ, এতো দূরে এসেছি তো লিয়ে যাই একবার গোঁসাইজীর কাছে। তুর নসীব থ কে তো লেগে যাবে। খোদা মেহেরবান!'

সাত

নোংরা অপরিচ্ছন্ন গলি। বেশির ভাগ মাটীর ও বেড়ার ঘর, তার উপর খোলার ছাদ। এখানে ওখানে ছেঁড়া কাগজ, ভাঙা মাটীর ভাঁড়, পরিত্যক্ত জীর্ণ জুতো, গৃহপালিত জন্তু ও মানবকের পুরীষ গড়াগড়ি যাইতেছে। দোকানপাট এবং বাসগৃহ প্রায় জড়াজড়ি করিয়া চলিয়াছে পরস্পরের সঙ্গে। হিন্দু ও মুসলমান, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ওড়িয়া প্রভৃতি নানা প্রদেশবাসী স্ত্রী ও পুরুষে গিসগিস করিতেছে গলিটা। ছোটখাট মুদির দোকানের পাশেই হয়তো মুচির জুতো তৈরির আস্তানা। কাঁচা চামড়ার গন্ধ আসিতেছে। পুরাণো বস্তার গুদামের পাশে তেলে-ভাজা জিলিপি ও পকোড়ার দোকান। ইহার পাশেই কোনও সৌখীন ব্যক্তির বৈঠকখানা। উহাতে চোঙা-অলা গ্রমোফোনে নাকীসুরে হিন্দী ছায়াচিত্রের গান বাজিতেছে। তার পাশেই কামারশালা। হাতুড়ির আওয়াজ গানের সঙ্গে পাল্লা দিতেছে।

যতই তারা অগ্রসর হইল, গলিটা ক্রমে আরও অপরিসর হইয়া উঠিতে লাগিল। মাটকোঠার আকার ছোট এবং পথচারীর সংখ্যা কম হইয়া উঠিল। অধিকাংশ সদর দরজায়েই চট ঝোলানো। বাড়ির নানা জায়গা হইতে দড়ি টাঙাইয়া তাহাতে পাজামা, শাড়ি বা লুঙ্গি শুকানো হইতেছে। রাস্তার অর্দ্ধেকটা জুড়িয়াই হয়তো একটা দড়ির চারপাই পড়িয়া আছে। তাহাকে সম্মান না করিয়া পথ অতিক্রম করিবার উপায় নাই। একবার তো নিমাই অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। একটা দরজার কড়ার বাঁধা গুটিকয়েক রামছাগল বন্ধনের প্রতিবাদ স্বরূপ মানুষ মাত্রের প্রতিই শিং উদ্যত করিয়াছিল, অসতর্ক নিমাইয়ের প্রতি তাহা তাগ্ করিয়া মারিল। ভাগ্যিস দড়িতে নাগাল পায় নাই, নহিলে নিমাইকে আর অগ্রসর হইতে হইত না।

শিয়ালদ ষ্টেশনের যেখানে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল সেখানে বহু মানুষকে একসঙ্গে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু হঠাৎ অনেক লোক এক জায়গায় উপস্থিত হইলে এমন না হইয়া উপায় নাই। কিন্তু এখানে যারা আছে, তারা আরও অনেক খারাপ আছে, নিমাই মনে মনে ভাবিল। চাউল কলে কাজ লইলে এইখানেই কি তাকে থাকিতে হইবে? এর চেয়ে বৌবাজারের খোলা ফুটপাথ অনেক ভাল।

'লে, এবার ডাইনে মোড়। এসে গিয়েছি।'

'চাউলের কল কই, রমজান চাচা? এই চিপা গলি দিয়া কই যাও?'

'আরে বুরবক!' রমজান ধমক দিয়া কহিল, 'কারখানাতো সিধা গেলে মিলবে। হামি যাচ্ছি, গোঁসাইজীর খুদ আপনা মোকানে। সেখানে ভেট হোবে, বাত হোবে, তব্ তো কারখানা যাবি। পহলা তো হুকুম মিলা চাই...

সেই গলি দিয়া প্রায় পাঁচ সাত মিনিট চলিবার পর

এতক্ষণে একটা ইটের পাঁচিল নজরে পড়িল। অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে পাঁচিলটা। কারখানার পাঁচিলের মতো। ইহার মাঝামাঝি আসিয়া জীর্ণকাঠের একটা দরজা আবিষ্কার করা গেল। রমজান এই দরজা ঠেলিয়া নিমাইকে আহ্বান করিল, 'আ জা।'

ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই খানিকটা খোলা জায়গা। এক পাশে অনুচ্চ বেদীর উপর তুলসী গাছ। তার পরেই একটা ইঁদারা। বাঁশের কপিকল খাটাইয়া জল তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অদূরে জমিটার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া একটা গুদামঘর। উচ্চতা এবং আয়তনে প্রকাণ্ড। খোলার চাদ। ঘরের অর্দ্ধাংশ মাটির, সামনের দিকে ছোট একটা জানালা বন্ধ আছে, তা ছাড়া দরজা বা অন্য জানালা নাই। অপরাংশ কিন্তু এই আবদ্ধতার ক্ষতি পোষাইয়া দিয়াছে। ইহার তিন দিকই চেরা-বাঁশের বরফি-আকারের বেড়া দিয়া ঘেরা। ইহার অসংখ্য গবাক্ষপথ দিয়া দৃষ্টি চালাইয়া পুরাতন শিশি ও বোতলের একটা পাহাড়ের মতো উঁচু স্তূপ লক্ষ্য করা যায়—যেন কলিকাতা শহরের অসংখ্য ফেলিয়া-দেওয়া কাচের বোতল ইত্যাদি সব আসিয়া এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এই বৃহৎ গুদামঘরের ডান পাশে পাঁচিলের প্রায় ঘেঁষিয়া চেরা বাঁশের বেড়ায় পরিবৃত গোটাকয়েক ছোট ছোট মাটির ঘর। কারও গৃহান্তঃপুর বলিয়া মনে হয়।

গুদামঘর ও এই বাসগৃহের মাঝখানের সরু গলিটি ধরিয়া রমজান নিমাই কর্তৃক অনুসৃত হইয়া আগাইয়া চলিল।

গুদামঘরটি অতিক্রম করিবার পর নিমাই অবাক হইয়া দেখিল, সমুখে ঠিক আগেরটির মতোই বড় এবং অবিকল সেই ধরণের আরও একটি গুদামঘর। তফাতের মধ্যে এই গুদামটির বরফি-বেড়ার গবাক্ষবহুল অংশে ভাঙা লোহালক্কড়ের পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপ। মোটরের মাডগার্ড, বিকল ট্রাইসিকেল, জানালার পুরানো গরাদ, রেললাইন, সাঁতির ও বর্গা হইতে শুরু করিয়া লৌহ-নির্ম্মিত প্রায় যাবতীয় দ্রব্যই এখানে আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

এবারও উভয়ে নিঃশব্দে সামনে আগাইয়া গেল।

আশ্চর্য! আরও একটা! দৈত্যের মত একটার পর আরেকটা গুদাম আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে একটা ত্রাসের আবহাওয়া সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু নিমাইয়ের বিস্ময় চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল এই গুদামটির খোলা-অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া। অন্তত শ পাঁচেক ছাগল, ভেঁড়া, দীর্ঘাকার রামছাগল ও পাঁঠা কিলবিল করিতেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের আওয়াজ করিয়া যে ঐক্যতান সৃষ্টি করিতেছে তাহা অবর্ণনীয়। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে যেন একটা গোরগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। রমজান মিঞা নিজ কানটি বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে দুইকানে হাত চাপিল।

"আর কত দূর, রমজান চাচা?"

নিমাই পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বেশ চেঁচাইয়াই বলিয়াছিল। কিন্তু কোনও সাড়াই আসিল না রমজানের কাছ হইতে। একটা বকুনিও নয়।

'রমজান চাচা' নিমাই উচ্চকণ্ঠে ডাকিল।

রমজান ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু জবাব দিবার চেষ্টা করিল না। আঙুল তুলিয়া ইঙ্গিতে কহিল, 'আয়।'

যাত্রার সম্ভবত এবারে অবসান হইয়াছে। পরবর্তী গুদাম ঘরটির সামনে আগাইয়া গিয়া রমজান একটা চট-ঝোলানো দরজার সামনে দাঁড়াইল। অন্য গুদাম ঘরগুলি তুলনায় এটি আকার এবং নির্ম্মাণ ভঙ্গির দিক হইতে স্বতন্ত্র। এটির দৈর্ঘ্য বাঁ দিক হইতে ডান দিক পর্য্যন্ত প্রসারিত নয়, সমুখ হইতে পিছনে অনেক দূর পর্য্যন্ত এটি চলিয়া গেছে। চারদিকের বেড়াই টিনের, ছাদ টালির। সমুখেই একটা দরজা, কিন্তু জানালা নাই।

রমজানের নির্দ্দেশে তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিমাই এই গুদামের বিবরে প্রবেশ করিল। সমুখে চটের বস্তার হিমালয় ছাদ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে যেন ঘরের অপরাংশের সীমান্তরক্ষী বেড়া এগুলি। প্রায়ান্ধকার ঘরে ইহাদের ভিতরে কোনও প্রবেশ পথই নজরে পড়েনা।

কিন্তু রমজান অবলীলাক্রমে এই স্তূপের দিকে আগাইয়া গেল এবং রন্ধ্রপথে ঢুকিয়া পড়িল। নিমাইকে কহিল, 'আ জা লোণ্ডে।'

এইবার অনেকটা খালি জায়গার সন্ধান পাওয়া গেল। এখানেও কোনও জানালা নাই। তবে ছাদের কিছুটা নিচে টিনের বেড়ার গায়ে কতগুলি ভেন্টিলেটার শ্রেণীর ফাঁক দিয়া কিছু কিছু আলো ভিতরে ঢুকিতেছে। ইহাতে অস্পষ্টভাবে ভিতরের জিনিষপত্র চেনা যায়। এক পাশে একটা নড়বড়ে তক্তপোষের উপর তেল-চিটচিটে ছেঁড়া মাদুর পাতা। তার পাশে একটা অপরিষ্কার বেঞ্চ, বেঞ্চির একপ্রান্তে কটা রোগা ধরণের কল্কে এবং ইহার তলায় ধূমপানের বিবিধ উপকরণ এলোমেলোভাবে ছড়ানো। আর একটু দূরে এলুমিনিয়মের গেলাসে ঢাকা মাটির কলসীতে জল।

'খাটিয়ার উপর বসে জা।' ইঙ্গিতে তক্তপোষটি দেখাইয়া রমজান বলিল। 'আমি ভিতর গিয়ে বাত করে আসছি। গোদা করে ত তুর নসীব ঘুরে যাবে। ব্যাঠ্ জা।'

ঘরের ওদিকে পুরানো কেরোসিনের টিন স্তূপ করিয়া এক দুর্ভেদ্য প্রাকার খাড়া করা হইয়াছে। ইহাকে প্রায় যেন বাউতি কাটাইয়া রমজান আরও ভিতরের অংশে ঢুকিয়া পড়িল।

অদ্ভুত জায়গা! চারদিকে শূন্য বস্তা, শূন্য টিন। একটা ভাপসা গন্ধ চারদিকে। উপরকার ঘুলঘুলি দিয়া যে আলো আসিতেছিল, তাহাও যেন ক্রমে কমিয়া আসিয়া গুদামঘরটাকে আরও অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে। জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া গাছ-পালা হোক, জীবজন্তু হোক, আকাশ হোক বা বাড়ী-ঘরই হোক, কিছু যে লক্ষ্য করিবে, তার সামান্যতম উপায় নাই। যেন একটা প্রকাণ্ড কবর। দূরের ছাগল-ভেড়াগুলির 'ব্যা' 'ব্যা' শব্দ যেন প্রেতের ডাক বলিয়া মনে হয়।

নিমাইর ভয় করিতে লাগিল। কেন এখানে সে আসিল রমজান মিঞার সঙ্গে! এক ছুটে যদি পালাইতে পারিত, তবে মন্দ হইত না। খালি কেরোসিনটিনের বেড়ার অপরপ্রান্ত হইতে উত্তেজিত কথাবার্তা শুনা যাইতেছে। যেন এখনই হাতাহাতি শুরু হইবে।

প্রায় মিনিট পনেরো ধরিয়া রমজান মিঞা গিয়াছে। এখনও তার দেখা নাই। বড় বিপন্ন ও অসহায় বোধ করিতে লাগিল নিমাই। যে পথে আসিয়াছে সেই পথে বস্তার অরণ্যের মধ্য দিয়া চুপিচুপি বাহির হইবার চেষ্টা করিবে কি? আবার নতুন বিপদের মধ্যে গিয়া পড়িবে না ত?

সহসা ঘরের অন্ধকারের উপর আরেক পর্দা কালো ছায়ার আভাস পাইয়া নিমাই চোখ মেলিয়া তাকাইল। সমুখে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিল। হাবুগুণ্ডা বস্তার রন্ধ্র দিয়া ভেতরে ঢুকিতেছে! মূর্তিমান যমকে দেখিলেও নিমাই এতটা আতঙ্কিত হইত না।

বস্তুতঃ হাবুগুণ্ডার পকেটমারার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার পর নিমাই তাহার দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ও নিজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্পর্কে বৈঠকখানা বাজারের মুটে ও ফেরিঅলা সম্প্রদায়ের কাছ হইতে যে সব লোমহর্ষক বর্ণনা শোনে, তাহার পর হইতে তাহার অবচেতন মনের মধ্যে হাবুগুণ্ডা প্রবেশ করিয়া কায়েমি হইয়া বসিয়াছে। কত রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে ফুটপাথের উপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। হাবুকে না চিনিবার তার জো নাই।

সৌভাগ্যক্রমে হাবু তাহাকে লক্ষ্যই করিল না। রমজান মিঞা যে পথে হাঁটিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল, হাবু সেই পথে অন্তর্দ্ধান করিল।

এইবার নিমাইকে আর কোনও বিবেচনাই সেখানে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মরিয়ার মত উঠিয়া পড়িয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে বস্তার দিকে আগাইয়া গেল।

'আরে মড়া। এখনে এসেছিস কি করতে। পালা। জান নিয়ে পালা।'

নিমাই চটের পর্দা সরাইয়া বাহিরে প্রায় আছাড় খাইয়া পড়িবার জো হইয়াছিল। আরেকটু হইলেই এই স্ত্রীলোকটির উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িত। কোনও মতে সামলাইয়া লইল।

কালো রঙের ঘাঘ্রা পরণে, গায়ে ওড়না, মাথায় আধ কাঁচা আধপাকা চুল মুসলমানী। বাঁ হাতে একটা মুরগীর দুই ডানা শক্ত করিয়া ধরা। অনিচ্ছুক কুকুরা নিজেকে মুক্ত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা ও প্রতিবাদের ক—ক—ক—ক শব্দ করিতেছে।

'ক্যান? কি হইব?' নিমাই তাহার আতঙ্কপূর্ণ চোখের দিকে চাহিয়া বোকার মত কহিল।

'আরে হাঁদা, বাত করিস নে, ভেগে পড়।' বলিয়া প্রৌঢ়া পলায়মান অপর মুরগীর অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া তার পরিবর্তে নিমাইয়ের একটা ডানা খাবলাইয়া

ধরিল। প্রবল জোরে আকর্ষণ করিয়া কহিল, 'বাঁচতে চাস ত আমার সঙ্গে চলে আয়। ও ধারের পাঁচিলে গর্ত্ত আছে। তা দিয়ে পালিয়ে যা। সিধে ছুটে গেলে কিছুটা বাদে গলি মিলবে। ডাইনে মোড় নিয়ে না থেমে ছুটবি। আরে বুরবক, কাঁপছিস কেন, আমার সঙ্গে ছোট।...কেন ছুটবি? কি হবে? তবে একবার চেয়ে দেখ।' নিমাইকে প্রায় টানিয়া লইয়া ভেড়াছাগল পূর্ণ গুদামঘরের মাটির দেওয়াল ঢাকা অংশের একটা ঝাঁপ ঠেলিয়া উঠাইয়া মুসলমানী কহিল, 'একবার চেয়ে দেখ ভেতরে।'

পলকের জন্যই নিমাইকে থামিতে দিয়াছিল। সেই পলকপাতে নিমাই যাহা দেখিল, তাহাতে গায়ে লোম খাড়া হইয়া যায়। ছোট বড় নানা রকম বয়সের ছেলে ও মেয়েদের গাদা ঠাসা। কারুর গালের মাংস তোলা, ভিতরে মাড়ী দেখা যাইতেছে, কাহারও চোখ উপড়ানো, কাহারও হাত বা পা ঠুঁটো করা, কাহারও আঙুলগুলি কাটা—যেন কোনও বর্ব্বর চেঙ্গিস খাঁ-র সৈন্যবাহিনী এই মাত্র এইখান দিয়া তাণ্ডব করিয়া অবর্ণনীয় অত্যাচারের স্রোত বহাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

'যদি না ভাগতে পারিস, তোরও এই হাল হবে।' নিমাইকে টানিয়া লইয়া অপরপ্রান্তের পাঁচিলের দিকে ছুটিতে ছুটিতে বেটি কহিল, 'এরা খোদার বানানো মানুষ নয়, শয়তানের পয়দা-করা হারাম। কোথা থেকে চাঁদপানা সব ছেলেপুলে ধরে এনে খোঁড়া নুলো কানা বানিয়ে তাদের দিয়ে পয়সা কামায়। কাৎরানি শুনে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু কিছু করবার জো নেই। ...এইবার ফাটল দিয়ে ঢুকে পড়। জান নিয়ে পালা। ...ফতেমার নসিবে আজ কি আছে খোদাতাল্লা জানেন। কিন্তু তুই বাঁচ...

নিমাই যখন বৌবাজারে মিষ্টির দোকানের কাছে ফিরিয়া আসিল। তখনও সে কাঁপিতেছে।

'কোথায় গিয়েছিলি?' বনমালী সবিস্ময়ে তাকাইয়া কহিল, 'মুখের এমন চেহারা হয়েছে কি করে? কাঁপছিস নাকি?...শোন, ভালখবর আছে। ভূতো সন্ধেবেলার ট্রেণে দেশে চলে গেছে। মালিককেও আমি তোর কথা বলে রেখেছি। হাত-পা ধুয়ে আয়। ভেতরে গিয়ে আগে খেয়ে নেগে।'

আট

'ব্যাধের জালে পড়ছি। আমাগো আর নিস্তার নাই, ননীদি!'

ননী গম্ভীর হইয়া রহিল। কোনও জবাব দিল না এই কথা সে নিজেই প্রথম বলে। বহুবার দুজনে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। তবু বারবার আক্ষেপ করিয়া এই কথাই বলে।

প্রতারকের হাতে পড়িয়াছে একথা দুলীর অনেক আগেই ননী টের পাইয়াছিল। প্রায় চারমাস আগে 'সমিতির বাবু' তাহাদের ট্যাক্সিতে তুলিয়া বহু রাস্তা ঘুরিয়া, বহু আজগুবি কৈফিয়ৎ দিয়া যখন এক বস্তির মধ্যে ঢুকিয়া তাহার এক 'মাসির' খোলার ঘরে আনিয়া হাজির করিল, তখনও সে সন্দেহ করে নাই। দরিদ্র পরিবেশেই তাহারা অভ্যস্ত। মাসির বাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া রাতে বিশ্রাম করিয়া হাসপাতালে যাওয়ার কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হয় নাই। কিন্তু বেশি রাতে ঘরের মধ্যে লোকজনের কথাবার্ত্তায় তার ঘুম ভাঙিয়া যায়। চোখ মিটিমিটি করিয়া চুপে চুপে তাকাইয়া ননী কজন মধ্যবয়স্ক পুরুষকে নিম্নস্বরে আলোচনারত দেখিতে পাইল। আশ্চর্য্য রকম কালো পোষাক গায়ে। হাতে সোনার হাতঘড়ি। পরিপাটি করিয়া টেরি কাগানো। বস্তির মধ্যে এই শ্রেণীর লোক একেবারেই বেমানান। কিন্তু ইহাদের রকমটা দেখিয়া ননী আশঙ্কিত বোধ করিল।

বিশেষ করিয়া দুলীর দিকেই তাহারা দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। বাজারে একটা ভাল মাছ দেখিলে পেটুক লোভী ক্রেতা যেমন ভাবে তাকায়, তিন তিনটা অচেনা পুরুষ সেইরূপ লোলুপ দৃষ্টিতে ঘুমন্ত দুলীর দিকে বারবার তাকাইয়া দেখিতেছে। ইহাদের পিছনে লেজ নাড়া কুকুরের মত ভঙ্গিতে 'সমিতির বাবু'টি দাঁড়াইয়াছিলেন, আড়চোখে আগন্তুকদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'কেমন, স্যার! দাম বেশি চেয়েছি কি?'

'দুটোকে মিলে পাঁচশো দিতে পারি।' ভদ্রলোক ত্রয়ের একজন উদাসীনের গলায় কহিলেন, 'শত হোক, গেঁয়ো ভূত। শেষ পর্য্যন্ত কি রকম দাঁড়াবে বলা যায় না।'

'পাঁচ শো! হাসালেন। ধনপৎমল মাড়োয়ারী এক্ষুণি দু' হাজার ফেলতে রাজি আছে। এই ত এসে দেখে গেল! গলির মোড়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জবাবের অপেক্ষা করছে।'

'তবে তাকেই দিয়ে দাও।' তিন জনের অপর একজন মন্তব্য করে।' ও ব্যাটার তিন তিনটে এষ্টাব্লিশমেণ্ট আছে। কোনওটা অবলা আশ্রম, কোনটা নার্সিং হোম। কোনটা শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। একটায় সুবিধে না হয়

আরেকটায় ঘুরিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বাগিয়ে নেবে। আমাদের স্ট্রেট বিজনেস। অন্যায্য রকম ঝুঁকি নেওয়া চলবে না।' বলিয়া তিন জনই পিছন ফিরিয়া অনুচ্চ দরজার দিকে পা বাড়াইল।

ঘরের বাহিরে আরও পনেরো কুড়ি মিনিট পর্য্যন্ত ইহাদের আলোচনা চলিল। নিজেদের সর্ব্বনাশ সম্বন্ধে ননীর আর কোনই সন্দেহ রহিল না।

ইহার পরদিন তুলীকে ননীর কাছ হইতে আলাদা করিবার চেষ্টা করিল। 'সমিতির বাবু' বেলা এগারোটা আন্দাজ হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া কহিলেন, 'তুলীকে এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে। খোদ বড় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তারা একজনকে নিতে পারে। আমার কথা শুনে বললেন, আগে ছোট জনকেই এনে দেখাও। হাওড়ায় তাদের আরেক হাসপাতাল আছে। বল্লেন, সেখানেও দু তিন দিন পরে লোকের দরকার হবে। কিন্তু আজ একজনের ভারি জরুরী দরকার। ...রাজী হয়ে এলাম। এরাই কর্ত্তা, এদের চটাতে পারি নে। ...ও মাসি শুনছ, তুলীকে তাড়াতাড়ি সজিয়ে পরিষ্কার করে' তৈরি করে দাও। যাও ত ভাই ননীদি, তুমি একটু তাড়া দাও ত গিয়ে...

'একা অর যাওন চলব না। আমিও যামু।' ননী 'দিদি' আহ্বানে সামান্যতম না গলিয়া নীরস গম্ভীর কণ্ঠে কহিল।

তোমাকে গিয়ে ত সেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। একজনের পারমিট দিয়েছে বই ত নয়। দারোয়ান তোমাকে ত ফটক গলাতে দেবে না। মিছিমিছি গিয়ে লাভ কি। ওকে নিয়ে যাব, আর চলে আসব। আজ থেকে ত আর কাজে লাগছে না। ইণ্টারভিউ করিতে আনামাত্র।'

'তা হউক, আমিও যামু।'

'সমিতির বাবু' চটিয়া উঠিলেন। 'আমার ঘাট হয়েছে। তোমাদের ভার হাতে নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যেমন করে হোক, একটা ব্যবস্থা ক'রে দেব। এমন জেদ করলে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিও। আমি এর মধ্যে নেই।' বলিয়া হাতে পায়ে এবং মুখভঙ্গিতে অধৈর্য্য সুস্পষ্ট করিয়া সে বোধহয় বড় ডাক্তারবাবুকে খবর দিবার জন্যই বাহির হইয়া গেল।

ননী আরও সতর্ক হইল। তুলীকে পারতপক্ষে সে নিজের কাছ ছাড়া করে না। অন্যেরা চুপি চুপি তার সাথে কথা বলিতে চেষ্টা করিলে সে কাছে যাইয়া হাজির হয়। 'মাসি', ভাইপো এবং তাহাদের ধনী ও বিভিন্ন জাতীয় অতিথিদের উদ্দেশ্য বুঝিতে ননীর বিলম্ব হয় নাই। তুলিকে সে অবশ্য সব কথা জানিতে দেয় নাই, শুধু তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে, কাহারও কথায় যেন বিশ্বাস না করে এবং কোনও কারণেই কাহারও সঙ্গে যেন একা বাহির না হয়।

কিন্তু তুলী ছেলেমানুষ। নানা কম কৌতূহল তাহার। বস্তির বাইরে রাস্তার ধারে বার বার যাইতে চায়। বাহিরের বিচিত্র জীবনধারা তাকে আকর্ষণ করে। সমিতির বাবুর মাসি তাকে চুপি চুপি কহিয়াছেন, কাল দুপুরে তাকে টকি বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া যাইবেন। বড় রাস্তার সিনেমা-হলে খুব ভাল ছবি দেখান হইতেছে। দুটো পাস পাইয়াছেন মাসি। দুজনের বেশি যাইবার উপায় নাই। ননীদি ত দুপুরে ঘুমান। সেই অবসরে মাসি তুলীকে লইয়া যাইবে সিনেমা দেখাইতে।

প্রায় সফল হইয়াছিল সেই প্রচেষ্টায়। হঠাৎ ননীর দুপুরের গাঢ় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অস্পষ্ট দৃষ্টিতে সে চারদিক তাকাইয়া দেখিল। তুলীর পরণের ডুরে শাড়ীটা মাসির তক্তপোষটার উপর জড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তার গায়ের ব্লাউজটা মেঝেতে গড়াইতেছে। দ্রুত সাজ পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

'সর্ব্বনাশ হইছে!' বলিয়া ননী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। 'বান্দ্রীকে কত কইরা সাবধান করছি! ভাওতায় ভুলিস না। এরা ভাল লোক না। অখন বোঝ! স্বগতোক্তি ও দৌড় একই সঙ্গে চলিল। ঝড়ের মত দ্রুত বস্তির গলি দিয়া ননী সদর রাস্তারদিকে ধাবমান হইল।

তুলী সুন্দরী মেয়ে। তার উপরই ইহাদের লোভ এতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে নাই। বস্তির পক্ষে নিতান্ত বেমানান চেহারার যে সব ব্যক্তি মাসির ঘরে নানা রকম ছুতোয় গত দুদিন ধরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, সকলের চোরা-দৃষ্টিই ছিল তুলীর দিকে। অবশ্য ননীও একেবারে বাদ যায় নাই। কিন্তু ইহাদের কাছে তুলীই যে প্রধান আকর্ষণ ইহাতে সংশয় থাকে নাই।

ননী জানে, এই সর্বনাশের জন্য সে-ই দায়ি। 'সমিতির বাবুর' সদয় কথায় সেই প্রথম গলে। তুলী রাজী হয় তার নিজের কথায়। ননীর বুদ্ধিতেই সে চলে। এবারও চলিয়াছে। ইহার দায়িত্ব ননীর। যেমন করয়াই হোক তুলীকে বাঁচাইতে হইবে, ননী সংকল্প করিয়াছিল। বোকা মেয়েটা সব পণ্ড করিয়া দিল।

গ্যাস-পোষ্টের তলায় দুটি স্ত্রীলোক রিক্শাতে চড়িতেছিল। একজন উঠিয়া বসিয়াছে। অপরটি এক পা উঠাইয়াছে। এমন সময় বাঘিনীর মত ননী সেখানে হাজির হইয়া সতিরস্কারে কহিল, 'কই যাস লো বান্দরী? না কইয়া? কতবার না তরে মানা করছি!

'ওর দোষ নেই ভাই ননী'; মাসি রিক্শা হইতে অবতরণ করিয়া কহিল, 'আমি বললাম. ননী দি ঘুমোচ্ছে: চল এই ফাঁকে আমরা সিনেমা দেখে আসি। শত হোক ছেলেমানুষ! আমারও দুটো পাস শুধু শুধু নষ্ট হত।

'চইলা আর। বায়স্কোপ দেখেন! আনন্দের আর সীমা নাই,' বলিয়া তুলীর হাত ধরিয়া ননী টানিয়া লইয়া চলিল।

'কই যাও ননীদি। বাড়ীর রাস্তা যে ফালাইয়া আইলাম।'

'চুপ কর্ গরু মাইয়া।' ননী চাপা গলায় ধমক দিয়া কহিল। 'কার হাতে পড়ছ্ ট্যার পাও নাই। কোনও দিক চাইস না। সিধা হাঁইটা চল। ওরা মাইয়া বিক্রি করে...'

'কও কি ননীদি।' তুলী কোনও প্রকারে এক হোঁচট সামলাইয়া ননীর সঙ্গে ছুটিতে লাগিল।

দুপুরবেলা হইলে কি হয়। সদর রাস্তায় লোকের অভাব নাই। মাঝে মাঝেই ট্রাম গাড়ি আসিতেছে, যাইতেছে; হুস হুস করিয়া বাস আগাইয়া চলিয়াছে। গরীব পল্লীর দোকানপাট জাঁকজমকপূর্ণ না হইলেও দেদার। কামারের দোকান, সাইকেল মেরামতের কারখানা, সস্তা রেষ্টুরেণ্ট। পান বিড়ির দোকানে লেমনেড ও ডাবের খদ্দেরের অভাব নাই। এত লোক সত্বেও ননী ও তুলী নিতান্ত অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করিয়া প্রায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সামনে ছুটিয়া চলিল।

'শুনচ। ও ননীদি। শুনচ। দাঁড়াও। রাস্তাঘাট কিছু চেন না হারিয়ে যাবে যে।'

বস্তির রাস্তায় পৌঁছিয়া বস্তির দিকেই মোড় লইবে মাসি এমন আশা করিয়া রিক্সাঅলাকে নির্দেশদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন তাহার অতিথিদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাতের অবসর হইল, দেখিলেন তাহারা বস্তির মোড় ছাড়াইয়া অন্তত পঞ্চাশ গজ আগাইয়া গেছে। মাসি দ্রুতপায়ে পিছনে ছুটিলেন। কিন্তু উহারা যে ছুটিতেছে। ছুটিতে সাহস হয় না মাসির। হৈ চৈ গোলমাল হইলে তাহার চলিবে না। পুরুষগুলি এমন বে-আক্কেলে হয়। কথা ছিল, কাছেই হাজির থাকিবে। অথচ হাঙ্গামার সময় তার দেখা নাই। অথচ ছুঁড়ী দুটো যদি পালাইতে পারে, তবে নিগ্রহ মাসিকেই সহ্য করিতে হইবে।

পিছন পিছন যথাসাধ্য দ্রুত ছুটিতে ছুটিতে একশো গজ দূরবর্ত্তী দুই পলাতকের প্রতি মাসি তার বিকৃত গলায় হাঁক ছাড়িতে লাগিল। এই ডাকে ভদ্র পথচারী যাহারা আকৃষ্ট হইল, তাহারা এই আচরণ এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পক্ষে কিছু বেমানান মনে করিল না!

'ও রমেশবাবু, শুনচ?'

পান বিড়ির দোকানের সামনে লাল পাগড়ী ও শাদা পোশাক পরা এক কনেষ্টবল বাঁ বগলে বেটন চাপিয়া ডান হাতে লেমনেডের বোতল হইতে লেমনেড পান করিতেছিল, পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

'কি গো ফুলটুসী, এত ব্যস্ত কেন?' সে ক' পা আগাইয়া 'মাসির' নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল।

'ঐ সামনে চেয়ে দেখ। ছুঁড়ী দুটোই যে পালাচ্ছে। কিছু কর।'

'খগেন কোথায়?'

'ও মিন্সে তো কাছেই হাজির থাকবে বলেছিল। কিন্তু তার টিকিরও দেখা নেই। যত হাঙ্গামা আমার ঘাড়ে।...বলে গিয়েছিল, রমেশ এই বিটেই ডিউটি দিচ্ছে, তাকে বলে রেখেছি। হাঙ্গামায় পড়লে তাকে বলো।...যা করবার শীগগির কর। একবার রাস্তার মোড়ে পৌছলে তোমার হদ্দারও বাইরে চলে যাবে।...

'বড় দারোগাবাবুর হিস্সায় পাঁচশো। আমাদের অংশে দু' কুড়িও নয়। তা যাওনা একবার দারোগা-বাবুর কাছে ফুলটুসী ঠাকরুণ…'

'কি করছ। এ কি ঝগড়ের সময়। দু' হাজার টাকার মাল ফসকে যাচ্ছে। আর তুমি খাড়া হয়ে একটা মেয়ে মানষের সঙ্গে ঝগড় করছ! এই কি তোমার বন্ধুত্ব? আর সে তোমার উপর ভরসা করেই বসে আছে…'

'রোখকে।' কনেষ্টবল সাহেব তীব্র হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলেন।

হুঙ্কারটি ফুলটুসির প্রতি নয়। সামনে দিয়া একটা প্রকাণ্ড ইট-বোঝাই লরী রাস্তা প্রকম্পিত করিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। কনেষ্টবলের হাঁকে সভয়ে ব্রেক কষিল। ক' আনা পয়সা না খসাইয়া ছাড়িবে না।

কনেষ্টবল সাহেব কিন্তু আইনভঙ্গের কোনও অভি-যোগ উপস্থিত করিল না। ড্রাইভারের চালাইবার জায়গার পাদানিতে পা দিয়া চড়িয়া কহিল, 'চল'।

টানিয়া থানাতে লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল কনেষ্টবল। ভয়ে ননীর মত মুখরা মেয়েও বিভিন্ন জেরার জবাব দিতে পারে নাই। এমন সময় কোথা হইতে সমিতিরবাবু হাজির হইয়া হস্তক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, 'আমি এদের জানি। এরা কোনও খারাপ স্ত্রীলোক নয়। রেফুজী এরা। আমাদের শ্রীলক্ষ্মী সঙ্ঘ থেকে এদের কাজ জোগাড়ের চেষ্টা চলছে। ডাক্তার সামন্তের হাসপাতাল থেকে এইমাত্র আসছি। তিনি এদের দুজনকেই শিক্ষার্থী হিসেবে নিতে রাজী হয়েছেন।'

কনেষ্টবল তাহার কথা না মানিয়া বলে 'না মশায়, আমি ছাড়তে পারব না। একবার থানায় বড়বাবুর কাছে যেতেই হবে। আপনার মত এ ধরণের কথা অনেকেই বলে। মেয়েদের বান্ধব সেজে বসে!'

'বিশ্বেস না হয়, আপনি নিজেও সঙ্গে আসুন, কনেষ্টবল সাহেব।' সমিতিরবাবুও জোরের সঙ্গে কহিলেন। সত্য কথা বলছি, না বাজে কথা বলছি, এক্ষুণি প্রত্যয় করে যান। এই ট্যাক্সি।…ট্যাক্সি করেই চলুন। চাকরির কথাটা মিছে হলে এই ট্যাক্সি করেই সরাসরি থানায় নিজে যাবেন, কি বলেন?'

কনেষ্টবল সাহেব রাজী হইয়া সমিতিরবাবু ও সন্দেহ-ভাজন দুই তরুণীসহ ট্যাক্সিতে আসীন হইলেন।

এই ত হাসপাতালে আসিবার ইতিহাস!

বহু রাস্তা পার হইয়া, বহু বাগান পুষ্করিণী এবং প্রাসাদ পার হইয়া, বহু ট্রামগাড়ী ও বাসের সহিত পাল্লা দিয়া ট্যাক্সি গাড়ী কোন জায়গায় হাজির হইল, তাহার কোনও ধারণাই ননী বা দুলী করিতে পারিল না। প্রায় কুড়ি মিনিট চলিবার পর ট্রামরাস্তা হইতে মোড় লইয়া একটা অপরিসর গলির ভিতর একটা প্রকাণ্ড দালানের সামনে আসিয়া যখন ট্যাক্সি দাঁড়াইল, তখন তাহাদের সকল দিক জ্ঞান গুলাইয়া গিয়াছে। দালানের একতলার ঘরগুলিতে নানা রকম দোকান। কোনওটা স্যুটকেশের, কোনটা লুঙ্গীর, কোনওটা বা মাংসের। এইগুলির একপাশ দিয়া খাড়া এবং সরু অসংখ্য সিঁড়ি উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। সামনে জবরজঙ্গ চেহারার এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান বসিয়াছিল। পুলিশ দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

দোতলায় পৌঁছিয়া কিন্তু অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করা গেল। বড় একটা হলঘরের চারদিকে ঘর। প্রতি ঘরের দরজায় পর্দা। ছোট ছোট কয়েকটা কাঁচের আলমারীতে নানা ধরণের ডাক্তারী যন্ত্রপাতি। এক দিকে ডাক্তারের ঘর। পিতলের ফলকে ডাক্তারের নাম লেখা। শীঘ্রই ছোট ঘরগুলির একটার পর্দা সরাইয়া মাথায় রুমাল বাঁধা একজন নার্স বাহির হইয়া আসিল।

সমিতিরবাবু তার কাছে আগাইয়া গিয়া কি সব বলিবার পর ফিরিয়া আসিয়া ননীকে কহিলেন, 'এর সঙ্গে যাও। উপরে বড় ডাক্তারবাবু আছেন। তার সঙ্গে দেখা করে এস।'

ননী ও দুলী সভয়ে এই মেম-ধরণের মেয়েটাকে অনুসরণ করিয়া উপরে যাইবার খাড়া ও সরু সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

তারপর হইতে আর নীচে নামিতে পারে নাই!

তেতলার পর চারতলা। তার প্রবেশ মুখে মজবুত দরজা। দরজায় প্রকাণ্ড তালা। দারোয়ানজী প্রকাণ্ড চাবির গুচ্ছ আনিয়া এই তালা খুলিয়া দিল। কিন্তু চারতলা মানুষের বাসের যোগ্য নয়। সমস্ত তলাটাই শুঁটকী মাছের গুদাম। এক পলকে তরোয়ালের খোঁচার মত দুর্গন্ধ যাইয়া নাকে প্রবেশ করে। এর উপরের তলায় নার্সদের থাকার জায়গা—দারোয়ান পরবর্তী খাড়া সিঁড়িগুলির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল। পাঁচ তলার মুখেও আবার ফটকের তালা খুলিতে হইল দারোয়ানজীকে। অতঃপর পঞ্চমস্বর্গের মেজেতে পা দিয়া দারোয়ানজী হাঁকিয়া কহিল, 'এ চণ্ডীর মা, নোতুন লড়কী এসেছে, লিয়ে যা…'

তারপর হইতে উভয়েই বহুবার বলিয়াছে: "ব্যাধের জালে পড়ছি। আমাগো আর নিস্তার নাই।"

"নিমাইদাটা এমুন বোকা যে রাগ ধরে।" তুলী চুলের বেণীর খসিয়া-পড়া কালো ফিতেটায় ফাঁস বাঁধিতে বাঁধিতে প্রায় অভিমানের কণ্ঠে কহিল। কত কইরা কইয়া আইলাম আমাগো পিছনে পিছনে আইও, বাড়ীটা চিনা যাইও, কিন্তু তার কোনই পাত্তা নাই ...

'অর আর কত বয়স। কুড়িতে পড়ছে কি পড়ে নাই। তর থন তিন বছরেরও বড় না। সহরের সয়তানের লগে ও কি কখনও পারে। আইছিল নিশ্চয়ই। দোষ আমার। ক্যান্ ট্যাকিস গাড়ীতে উইঠা বসলাম... ননী প্রকৃত দোষীর কণ্ঠে কহিল।

'আমি রোজ জান্‌লা দিয়া গলির দিকে চাইয়া থাকি। যদি নিমাইদা বা চিনা কেউ যায়, হাক দিমু ...

'দূরও। তারা থাকে শিয়ালদ ইষ্টিসানে। এই জাগাও কেউ চিনে না'। ননী বুদ্ধিমতীর মত মন্তব্য করিল। 'আর যদি কেঐ যায়ই, পাচতলার উপুর থন্ ডাক কি শুনব। কিন্তু হাঁক দেওনের ডর দেখাইয়াই রণচণ্ডীরে জব্দ রাখছি, কি কস্? 'যা, যা, নিচে যা। সেজেগুজে খেলাধূলা কর গিয়ে, নিত্যি বিকাল হইলে আইয়া ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে,, দারোয়ান ডাইকা জোর কইরা নিচে পাঠাইয়া দিব ডর দেখায়, কিন্তু জোর করতে আর সাহস পায় না। কাছাকাছি বাড়ীগুলির উচাতলায় হয় কালাকালা সাহেব মেম, নইলে চীনাম্যান বা অন্যদেশী সব লোক। ডাক পাড়লেই বা কে বুঝব, কে বা খ্যাল করব। তবু এই একমাত্র ভরসা। কালীঘাটের মা কালীর দয়া। ঐ শোন,, নাম করতে না করতে রণচণ্ডীর হাঁক উঠছে...

ভাঙা কাঁসার আওয়াজের মত কণ্ঠস্বর—মোটা এবং বিকৃত। কতক্ষণ ধরিয়াই শুনা যাইতেছিল, ননী এবং তুলীর নাম উচ্চারিত হওয়ার পর তবেই আলোচনারত উহাদের কানে তাহা স্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল।

চণ্ডীর মা-কে রণচণ্ডীতে পরিবর্তিত করিতে কল্পনা-শক্তিকে বেশী কষ্ট দিতে হয় নাই ননীর। বছর পঞ্চান্নর স্থূলকায়া স্ত্রীলোক। নাকটা চ্যাপ্টা, পবতের মতো মাংসবহুল বুক। কপালে স্থায়ী টিপের দাগ, শরীরের প্রায় অধিকাংশ অনাবৃত অংশেই বাহারি উল্কি। মোটা অধর প্রায় উল্টো দিকে বাঁকাইয়া পড়িয়াছে। চোখ আরক্ত। এই রক্তিমতার তরল কারণটি আবিষ্কার করিতে ননীর বেশী দেরি লাগে নাই।

এই চণ্ডীর মা-ই "নার্সদের মেসের কর্ত্রী। নতুন যারা আসে তাদের ইনিই শিক্ষা ও জ্ঞান দান করেন, সাজ-পোষাকের রুচি তৈরি করিয়া দেন এবং সন্ধ্যাবেলা নিচের হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

'চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে একশেষ হচ্ছি, শুনতে পাস নে ছুঁড়িরা?

মেদবহুল কলেবর টানিতে টানিতে দরজার কাছে হাজির হইলেন রণচণ্ডী।

কে তোমারে চেঁচাইতে কয়। না চেঁচাইলেই পার। ননী নিরসকণ্ঠে কহিল।

'দারোয়ান এসেছে। সাবান আলতা হেজলিন কি চাই বলে দেগে'।

'আমাগো কিচ্ছুরই দরকার নাই'।

'খুব যে জেদ দেখাচ্ছিস। মেয়েমানষের জেদ কি করে' ভাঙতে হয়, তার সব কায়দা কৌশল আমার জানা আছে। ভাল কথায় না হয়, তারই ব্যবস্থা হবে। গেঁয়োভূত রাজ-রাণীর হালে থাকছিস। যা চাই হুকুম করলেই হাজির। হেসে ফুর্তি করে জীবন কাটাবার সুযোগ করে দিচ্ছে। এমন সুযোগ সবাই লুফে নেয়। এই তোর চেহারা। বিয়ে দিতে চাইলে পাত্তর মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যেত। তোর আবার অত বাছাই কি রে। নিজে জেদ করছিস আবার এই মেয়েটাকেও মন্ত্রা দিয়ে নষ্ট করছিস। ঐ শোন্, দারো-য়ানজী হাঁক দিচ্ছে। যাবি তো যা, নইলে ঘরেই ডেকে আনব। হাজিরে চেক হওয়া চাই তো...

'যাও ননীদি। তুমি গিয়াই একবার কইয়া আস'। অনুপস্থিতির বিকল্পটির সম্ভাবনায় ভীত হইয়া তুলী কহিল। 'নাইলে আমিই যাই।'

'থাম। তুই যাইসনা' ধমক দিয়া উঠিল ননী। 'তালা দিয়া তো সারাক্ষণ আটকাইয়া রাখ। তবে নিগ্রি নিগ্রি হাজিরা চেক করণ ক্যান্? দারোয়ান দিয়া ডর দেখাও, কেমুন?'!

"বেশি ধেষ্টামি করবি, রণচণ্ডী দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল, বজ্জাত মেয়েমানুষ কোথাকার।

'বজ্জাত তুমি'। বলিয়া ননী গটগট করিয়া হাঁটিয়া সিঁড়ির ফটকের দিকে আগাইয়া গেল।

বস্তুতঃ এটা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সকাল ও রাতে একবার করিয়া দারোয়ান সিঁড়ির কাছে হাজির হইয়া লাঠি ঠকঠক করে। তখন উপরতলার বাসিন্দাদের এক এক করিয়া হাজিরা দিয়া আসিতে হয়। দুলীকে ননী কখনও একা যাইতে দেয় না। ইহা নিয়মবিরুদ্ধ, কিন্তু ননীর মেজাজের কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয়, তাহাকে এ লইয়া ঘাঁটানো হয় না। ননী একাই হাজির হইয়া উভয়ের হাজিরা দিয়া আসে।

প্রকাশ্য উপলক্ষ্য অবশ্য হাজিরা নয়। মেয়েদের কাহারও কিছু প্রয়োজন আছে কিনা, সাবান তেল নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্য কি কি চাই, এই ধরণের কোনও একটা জিজ্ঞাস্য থাকে। এই সব জিজ্ঞাসার সুযোগে দারোয়ানজী ননীর কাছে কিছু কাল আগেই একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। দারোয়ানজী বিপত্নীক। তাহার নতুন করিয়া সংসার পাতিবার ইচ্ছা।

সামুরিয়া ঘাট ও বারাউনী জংশনের মাঝামাঝি কোনও এক গ্রামে তাহার খেত-খামার আছে; বইল-ভৈসের সংখ্যা নগণ্য নয়। ঘর বাড়ী সম্পত্তি ও স্বজন ত্যাগ করিয়া সুদূর কলিকাতা শহরে নোকরী করা তার পছন্দ নয়; কিন্তু শূন্য ঘরে ফিরিয়া যাইতে মন ওঠে না। ননী বিবি ভাল লড়কী। লম্বায় চৌড়ায় মানানসই কনেও বটে। একদিনও সে তেতলার ডগদরখানায় সন্ধ্যা না কাটানোয় তার প্রতি দারোয়ানজীর বিশেষ সম্ভ্রমও জন্মাইয়াছে। সত্যই এ কি কোনও ভাল স্ত্রীলোকের কাজ। এ তো আর সত্যসত্যই নার্সগিরি নয়।

এই সকল সাক্ষ্য নার্সদের কাউকে গ্রহণ করিতেও যে দারোয়ানজীর কোনও আপত্তি নাই, তাহাও একদিন কথাপ্রসঙ্গেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আরও একটি বাঙালিনকে তিনি অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অবশেষে এই বাজে পেশা হওয়ায় দারোয়ানজীর প্রস্তাবে রাজী হয়। দারোয়ানজী তাকে মেটিয়াবুরুজের এক বস্তিতে লইয়া তোলেন। কথা হয় যে মাসখানেক বাদে দেশে যাইবার ছুটি লইয়া তিনি সস্ত্রীক কলিকাতা ত্যাগ করিবেন। কর্ত্তাদের সন্দেহ হইলে তারা কুত্তার মতো হত্যা করিতেও দ্বিধা করিবে না, তাই এই সাবধানতা। নার্স উধাও হওয়ার সঙ্গে দারোয়ানজীর বাড়ী যাওয়ার যে কোনও সম্পর্ক নাই, ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে। বিলম্ব এই জন্যই।

অথচ এত দিন বসাইয়া কে খাওয়াইবে? কিন্তু দারোয়ানজীর সঙ্গত প্রস্তাবে তার বাক্‌দত্তা বিশেষ আপত্তি তুলিলেন। এটা যে সাময়িক ব্যাপার, তা সে বুঝিলনা। একদিন সরিয়া পড়িল।

কিন্তু ননীকে সে আশ্বাস দিয়াছে। বলিয়াছে, তাহাকে দিয়া পয়সা কামাইবার কোনও ইচ্ছাই তার নাই, বরঞ্চ তার চাচেরা ভাইয়ের সঙ্গে সরাসরি সে তাকে সামুরিয়াঘাটে পাঠাইয়া দিবে। যে খারাপ মেয়ে নয়, তাকে সে কি কখনও খারাপ কাজে লাগাইতে পারে। ওটা তো ডাগদরখানায়-আসা স্ত্রীলোক ছিল।

'আজকের কি ফরমাস আছে বোলো ননী বিবি'। ননী সিঁড়ির প্রবেশ মুখে হাজির হইবার পর প্রকাণ্ডাকার দারোয়ানজী তার প্রকাণ্ড মুখে অমায়িক হাসি টানিয়া আনিয়া সরস কণ্ঠে প্রশ্ন করিল। 'হেজলিন চাই, পাউডার-পোমেটম-সাবুন চাই। শাড়ী-বেলাউজ লাগবে?

কিছু চাই না, দারোয়ানজী'। ননী সংক্ষেপে কহিল।

'সাজ করবে, আচ্ছা কাপড়া পিহ্‌নবে বাল বানাবে, ওঠে রং লাগাবে, আঁখে সুর্মা ডালবে তবে তো ডাগদরখানায় কিমমত বাড়বে'!

'আমাগো ছাইড়া দেন, দারোয়ানজী। আমরা পলাইয়া বাঁচি। ডাক্তারখানায় আমরা যামুনা'। ননী অনুরোধের কণ্ঠে আবেদন করিল।

'ওরে বাবা'। দারোয়ান তার আরক্তিম চোখে ভীতি প্রকাশ করিয়া কহিল। ছেড়ে দিবে তো হামার জান চোলে যাবে। ডাগদর আর উনার দোস্তার তিন শয়তান আছে। পাকিটে পিস্তল নিয়ে ঘোরে। বেইমানি কোরবে তো একদম খতম করে দিবে'।

প্রায় ছয় ফুট উঁচু, শালপ্রাংশু বাহু, চওড়া ছাতি যেন বুলেট আটকাইতে পারে। প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ পাক খাইয়া কানের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। বড় বড় চোখ ঢুলুঢুলু ও আরক্তিম। মুখ হইতে যখন তখন মদের গন্ধ বাহির

হইয়া আসে। মূর্ত্তিমান যমদূতের মতো চেহারা। কিন্তু ডাগদর ও তার দুই শয়তান বন্ধুর ভয়ে এই প্রকাণ্ড লোকটা যেন সত্যই শঙ্কিত।

'হামি যে বাতটা বোলেছিলম, তা সোচে করেছ ? রীতিমত কোমল কণ্ঠ দারোয়ানজীর।

কিছুক্ষণ কোনও জবাব আসিলনা। মুখ নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল ননী। দারোয়ানজীর লোলুপদৃষ্টির প্রতি একবারও নজর পড়িল না। তারপর সহসা সে স্থিরদৃষ্টিতে দারোয়ানের দিকে তাকাইল। ইতিপূর্ব্বে দারোয়ানের প্রস্তাব সে নীরবেই শুনিয়াছে, কোনও রকম জবাবই উচ্চারণ করে নাই। প্রশ্ন করিলেও জবাব পাওয়া যাইবে, এমন আশা আজও দারোয়ান মহাশয় করেন নাই। সহসা ননীর গলার আওয়াজ শুনিয়া সে পুলকিত বোধ করিল।

"আমারে লইয়া গেলে যে আপনার গুলী খাইয়া মরতে লাগব। তারা যে পকেটে পিস্তল লইয়া ঘোরে কইলেন"।

'আরে হামি তো তার আগে পগাড় পার, ননী বিবি'। বলিয়া দারোয়ান রসিকতার সঙ্গে হা হা করিয়া কয় দমক হাসি উদ্গীরণ করিয়া ফেলিল। 'হামাকে আর পাবে কুথা। হামার গাও-গেরাম কুছ্ভী জানে না। হামি তো সালাদের ঝুট পতা দিয়ে রেখেছি। চাপা গলার স্বর চাপা ফুর্ত্তির চাপা হাসি।

'আমি তো গ্যালাম। কিন্তু আমার বইনটার কি হইব।

'উসকে ভী নিয়ে চোলো। কিসিকে সাথ শাদী দিয়ে দিব।'

ননী ঘাড় নাড়িল। 'ও রাজী হইব না। ও তো ছোট মাইয়া। বাপ মায়ের কাছে যাওনের লাইগা কান্দে।'

'না যাবে তো ডাগদরখানা যাবে।" দারোয়ানজী শ্লেষ করিয়া কহিলেন। তুমার আপনা বহিন তো আছে না ." অর্থাৎ তোমার নিজের বোন যখন নয়, তখন ওর জন্য অত ভাবনা কেন।

'অরে যদি ছাইড়া দেন, তবেই আমি যাইতে পারি, নইলে না। গম্ভীর নিরাসক্ত কণ্ঠস্বর ননীর।

'সে কি কোথা, ননীবিবি। ওকে ছেড়ে দিব, তো জান্ চলে যাবে যে!' রীতিমত ভীত বিব্রত কণ্ঠস্বর দারোয়ানের। এমন সর্ত্ত সে পালন করে কি করিয়া!

'কইবেন ডাক্তারখানায় আইছিল। তারপর আপনে যখন দরজার থন একটু সরছেন, তখন সেই ফাঁকে নাইমা পালাইছে। আমি তো থাকুমই। কেউ সন্দেহ করতে পারব না। তারপর আপনে যেই দিন কইবেন, আপনের সঙ্গে একেবারে ভাইগা যামু। যেইখানে চান, লইয়া যাইয়েন।

'ওরে বাবা! এ তো বোড়ো মুস্কিলের কথা আছে। তুমি বোড়ো চালহাক লড়কী। দাম না নিয়ে খুশী কোর না। আগর টের পাবে তো সালারা জান লিয়ে লেবে। বড় খতরার মধ্যে গিড়ে যাব। আচ্ছা করে সোচ করতে হবে।' বলিয়া চিন্তিতভাবে দারোয়ানজী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন অর্থাৎ সিঁড়ি দিয়া এক ধাপ নামিয়া গিয়া দরজার পাট বন্ধ করিলেন। শীঘ্রই তালা আটকাইবার শব্দ হইল।

ক্রমশঃ

অমৃত জীবন

নীরেন্দুকুমার হাজরা

রক্তরাঙা সূর্যমুখী মানুষের মন পাব বলে—
চেয়েছি সূর্যের কাছে জীবনের মহান উত্তাপ,
পথপ্রান্তে এক প্রশ্ন: কেবা সেই সুমহান শিল্পী
বঞ্চনার জ্বালা দিয়ে গড়িয়াছে মাটির প্রাসাদ।
বর্ষালী স্বপন দিন—পৃথিবীর অপরূপ ধন
সবুজ ঘাসের 'পর মানুষের লক্ষ পদাঘাত
তবু আজও বেঁচে আছি। এও এক, আশ্চর্য-বিস্ময়
নীরস মাটির বুকে—শত পরমায়ু দূর্বাদল।
আকাশ পৃথিবী আর লক্ষ লক্ষ মানুষের মন—
পবিত্র সৃষ্টির লগ্নে আর কেন রবে মৌনব্রত,
জীবনের মহাশিল্পী যন্ত্রণার জঠরে জঠরে
সমুদ্র মন্থন ক'রে খুঁজে পায় অমৃত-জীবন।

বাইশে শ্রাবণ

মনোরমা সিংহরায়

প্রতিদিন ধূলি ধূসরিত। প্রতিদিন ভুলে থাকি
তোমার অনিন্দ্য নাম। ভুলে যাই প্রত্যহের ঝড়ে।
কোলাহল মুখরিত ক্ষুধা তৃষ্ণা বাসনা কামনা,
আঁধি আসে কোথা থেকে আর দেখি শুধু ধূলি ওড়ে।।
পল্লবিত যূথিকা বিতানে মঞ্জুরিত অঙ্গীকার
ফুল হয়ে কখনো ফোটে না। জীবনের ক্লান্তি ভেঙে পড়ে।
কবিতা হয় না লেখা। একদিন তবুও এ মন
প্রণামে বিনত হয় আসে যদি বাইশে শ্রাবণ।।

তাঁরই উদ্দেশে যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল *

ইলা চট্টোপাধ্যায়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মার্কিণ কবি ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্‌ম্যানের To him that was crucified কবিতার অনুবাদ।

প্রিয় ভ্রাতঃ, আমার আত্মাকে নিবেদন করি তোমার আত্মার কাছে,
অনেকে মুখে তোমার নাম নেয়, কিন্তু বোঝে না তোমাকে,
আমি বাইরে তোমার নাম নিইনে বটে, কিন্তু আমি তোমায় বুঝি,
হে আমার বন্ধু, আমার আনন্দিত অভিবাদন বিশেষ ক'রে
তোমাকেই এবং তাঁদেরও যাঁরা তোমার সঙ্গে আছেন
তোমার জন্মের আগে ও পরে, যাঁরা আসবেন
তাঁদেরও অভিবাদন করি,
আমরা একই সাধনায় ব্রতী, ভাবিকালের হাতে দিয়ে যাচ্ছি
একই ব্রতের ভার, একই উত্তরাধিকার,
আমরা কতিপয় সগোত্র যারা বিশেষ কোন দেশের নই,
বিশেষ কোন কালের নই,
সমস্ত মহাদেশগুলিকে, সমস্ত বর্ণসমূহকে, সমস্ত ধর্ম্মমতকে
আমরা আলিঙ্গন ক'রে আছি,
আমাদের সহানুভূতি সর্ব্বজীবে, আমরা দ্রষ্টা, আমরা
হচ্ছি মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র,
গোঁড়াদের তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়ে আমরা পথ চলি
নিঃশব্দে, কোন মতের পক্ষে বা বিপক্ষে
যাঁরা আছেন তাঁদের কাউকেই আমরা বর্জন করিনে,
আমাদের কানে আসে চীৎকার ও গণ্ডগোল, মতভেদ, ঈর্ষা,
পরছিদ্রান্বেষণ চারিদিক থেকে আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত,
বন্ধু আমার, আমাদের ঘেরাও করতে ওরা আগিয়ে আসছে
সমুদ্ধত পাদক্ষেপে,
তবু বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত
মুক্ত আমরা যাতায়াত করি সমস্ত বন্ধনের ঊর্দ্ধে,
সে চলার বিরাম নেই যে পর্য্যন্ত না আমরা মহাকালের
এবং বিচিত্র যুগের উপরে এমন একটা দাগ রেখে যাই
যা মুছবার নয়,
যে পর্য্যন্ত না ভাবীকালের এবং যুগ-যুগান্তের অণুতে পরমাণুতে
এমনভাবে আমরা অনুস্যূত হয়ে যাই যে অনাগত সর্ব্বযুগের
সর্ব্বজাতির নরনারীর জীবন সাক্ষ্য দেবে তারা প্রেমিক
এবং একে অন্যের ভাই যেমন আমরা।

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ইলা চট্টোপাধ্যায় গত ১২ই মে' ৬৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া উক্ত কবিতাটি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদুষী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বরিশালের একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। কবি-পত্নীর সহিত স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ ছিল।

কবিকে সমবেদনা জানাইবার ভাষা নাই, ভগবান তাঁহাকে শান্তিতে রাখুন।

মহালক্ষ্মী প্রসীদতু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

শান্ত রসাস্পদ তপোবনে,
ক্ষিপ্ত হস্তী আসিল কেমনে ?
ছিল যাহা তোমার ভাণ্ডার—
কি দশা করেছ তুমি তার ?
অনটন নিত্য যে নবীন –
ভিখারী ফিরাতে হয় দিন।
প্রায় বন্ধ অতিথি সৎকার,
গ্রামে যে উৎসব নাহি আর।
প্রাত গৃহী অভাব কাতর,
অগ্নি মূল্য প্রতি দ্রব্য দর।
কোথা তৃপ্তি সে প্রসন্ন মুখ ?
মহালক্ষ্মী কেন মা বিমুখ !

২

দিন ক্ষীণ দেবদেবী পূজ',
গ্রামের বেদনা যায় বুঝা,
নাহি আর হরি সংকীর্তন—
হাঁকে ডাকে রাত্রি জাগরণ।
প্রাতে শোনে গ্রামবাসী সব
ডাকাতির নিত্য উপদ্রব।
ধন নাই নাহিক নিস্তার,
সহা চাই অসহ্য প্রহার।
নারী গাত্রে অলঙ্কার নাই,
কি যে হবে, শঙ্কিত সবাই
নাহি জ্বলে আনন্দের বাতি,
দারুণ উদ্বেগে কাটে রাতি।

৩

লক্ষ্মীছাড়া আজ গ্রামবাসী।
ভগ্ন মন, মুখে নাহি হাসি।
পল্লীর সে লাবণ্য কোথায় ?
সব হবে মায়ের কৃপায়।
সুদিন আসিবে পুনরায়
সবে সেই আশা পথ চায়।
শঙ্কা যে হারায় একাগ্রতা,
সেই ভক্তি সেই নিষ্ঠা কোথা ?
পল্লীরাণী আজ কাঙালিনী,
চিনিতে পারিনে যাঁরে চিনি
মহালক্ষ্মী লয়ে স্বর্ণ ঝাঁপি
এসো—বড় কষ্টে দিন যাপি।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহা-ভারতে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় এবং অধিকার কি?

ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বভারতীয় প্রশাসন ব্যাপারে যোগ্য বাঙ্গালীর প্রতি কেন্দ্রীয় কর্ত্তামহল কি প্রকার সুব্যবহার এবং কতখানি সুবিচার করিয়া থাকেন- সে বিষয় মধ্যে মধ্যে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী লইয়া এ-ভাবে আলোচনা করাটা অনেকের বিচারে হয়ত প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট এবং কাহারো কাহারো মতে হয়ত অযথা এবং অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতেও পারে। বলা বাহুল্য আমাদের বিচারে তাহা নহে বলিয়াই আমরা বাঙ্গালীর, বিশেষ করিয়া যোগ্য বাঙ্গালীর প্রতি কেন্দ্রীয় অবাঙ্গালী কর্ত্তামহলের অবিচারের প্রতিবাদ না করিয়া পারি না। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর প্রতি দরদ দেখাইলে এবং অবিচারের প্রতিবাদে কোন বাঙ্গালী কোন কথা বলিলে তাহা হইবে 'প্রাদেশিকতা'—কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আসনে বসিয়া যে সকল অতি মহাশয় প্রশাসক নিজ নিজ রাজ্যবাসীদের জন্য দরাজহস্তে বিবিধপ্রকার (এবং বহু ক্ষেত্রে অযোগ্যদের জন্যও) সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন—মুখে কোন কথা না বলিয়া, তাহা হইবে রাষ্ট্রের এবং জাতির প্রতি পরম প্রেমের এবং কল্যাণ প্রচেষ্টার প্রকাশ মাত্র! এইবার কাজের কথার অবতারণা করা যাক—

প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার—পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম একজন অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস রাজ্যপাল নিযুক্ত হইলেন। এখন ভারতের ছয়টি রাজ্যের রাজ্যপালই আই সি-এসের লোক—(অবশ্যই অবসরপ্রাপ্ত), আবার এই ছয় জনের মধ্যে পাঁচজনই উত্তর প্রদেশে আই-সি-এস ছিলেন। তারপর ইঁহারা যান দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে এবং ঐ স্থান হইতেই রাজ্যপাল পদ লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের নামের তালিকা—(১) আসামের গভর্ণর বিষ্ণু সহায়, (২) জম্মু ও কাশ্মীরের গভর্ণর ভগবান সহায় (ইঁহারা আবার দুই সহোদর ভাই), (৩) কেরালার গভর্ণর বিশ্বনাথন (৪) পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম্মবীর এবং (৫) দিল্লীর লেফটেনান্ট গভর্ণর এ এন ঝা। পাঁচজনই অবসরপ্রাপ্ত। ষষ্ঠতম গভর্ণর—গোয়ার লেঃ গভর্ণর নকুল সেন (বাঙ্গালী নহেন)। ইনি পাঞ্জাবের অফিসার। ইহাছাড়া আর একজন ভূতপূর্ব্ব অফিসার গভর্ণরের পদ পাইয়াছেন। উড়িষ্যার গভর্ণর ডাঃ খোসলা। ডাঃ খোসলা পাঞ্জাব হইতে আসেন। তালিকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাহারো নামই নাই।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কি পদ্ধতিতে রাজ্যপাল নিয়োগ করা হয় সেই বিষয়ে একটি দৈনিকে প্রকাশিত মন্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল:—

> স্বাধীনতার পর রাজ্যপাল নিয়োগের পদ্ধতি হচ্ছে, নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী প্রথমে নাম মনোনয়ন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর কাছে পেশ করেন এবং পরে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেন। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত স্বজন-পোষণে পর্যবসিত হচ্ছে কিনা তা ওপরের তালিকাটি দেখে পাঠকই অনুমান করতে পারবেন। উত্তরপ্রদেশ ভারতের বৃহত্তম রাজ্য। পরপর তিনজন প্রধানমন্ত্রী আমরা এই রাজ্য থেকেই পেয়েছি। এককালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদেও উত্তর-প্রদেশের নেতারা (স্বর্গীয় গোবিন্দবল্লভ পন্থ লালবাহাদুর শাস্ত্রী ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু) অধিষ্ঠিত

ছিলেন। তাই উত্তরপ্রদেশের অফিসাররা নয়াদিল্লীর স্বাভাবিক নিয়মেই যে নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নিতে সক্ষম হয়েছেন—এতে আশ্চর্যের কি আছে? কেউ কেউ আবার আই-সি-এস চাকরীতে এক্সটেনশন পাবার পর পাঁচ বছরের জন্যে গভর্ণর হয়েছেন। সেজন্যে পশ্চিমবঙ্গ বা মাদ্রাজ কিম্বা কেরালার ঈর্ষা প্রকাশের স্থান কোথায়? কিছু বলতে গেলেই প্রাদেশিকতার প্রশ্ন তোলা হতে পারে।

রাজ্যপাল নিয়োগের ব্যাপারে এ-রাজ্যে নিযুক্ত অফিসারদের কথা না তুলিয়াও—একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে খাস নয়া-দিল্লীতেই কমপক্ষে দুইজন আই-সি-এস অত্যন্ত যোগ্যতা এবং প্রশংসনীয়ভাবে কার্য করিয়াছেন—একজন বৈদেশিক দপ্তরের প্রাক্তন সেক্রেটারী, দ্বিতীয়জন—ইউ-এন-ওতে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি—শ্রী বি-এন-চক্রবর্ত্তী। শ্রীসুবিমল দত্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় দিল্লীতে কাটাইয়া অবসর গ্রহণ করেন—এবং তাহার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে নূতন পদে বহাল করেন। শ্রী-বি-এন চক্রবর্ত্তী ইউ-এন ও'র কার্যভার ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে দিল্লীতেই বাস করিতেছেন। শ্রীচক্রবর্ত্তীর ইউনাইটেড নেশনসে বিরাট অবদানের কথা বর্ত্তমান ভারতসরকারের পরিচালকদের মনে রাখিবার কথা নয়। অবাঙ্গালী হইলে হয়ত থাকিত। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের মন্তব্য যথোচিত বোধে তাহা উদ্ধৃত করা হইল:—

> পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন খ্যাতিমান আই-সি-এস অফিসার এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। যোগ্যতার তুলনায় এঁরা উত্তরপ্রদেশের অফিসারদের চেয়ে খাটো একথা বোধহয় কেউই বলতে চাইবেন না। কিন্তু এদের যে খুঁটির জোর নেই। এই রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব চীফ সেক্রেটারী এস এন রায় আর লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার কে কে হাজরাকে কেন্দ্রীয় দপ্তরে যোগদানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এঁদের ছাড়তে চান নি। তাই এঁরা নয়াদিল্লীর নজরেও আসেন নি। গেলেই যে আসতেন তাও তো সুবিমল দত্ত আর বি এন চক্রবর্ত্তীকে দেখে মনে হচ্ছে না। অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস শৈবাল গুপ্ত, কৃণু গুপ্ত, নির্মল রায়চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গেই রয়ে গেলেন। নয়াদিল্লীর নজর তাঁদের 'পরে পড়ে নি। বাঙ্গালী আই-সি-এসদের নামডাক ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এখন দেখছি উত্তরপ্রদেশের জয়জয়কার।—
>
> কিন্তু এইটুকু বললেই সবকিছু বলা হোলো না। গভর্ণর নিয়োগে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল—এক রাজ্যের অধিবাসীকে সেই রাজ্যের গভর্ণর নিয়োগ করা হবে না। কিন্তু তা—বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রকে এই নিয়ম শিথিল করতে বাধ্য করেছিলেন। স্বর্গতঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জিকে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর পদেই নিযুক্ত করতে হয়েছিল। কেন্দ্রের কোনো আপত্তি ডাঃ রায়ের কাছে টেকেনি। একথা অনস্বীকার্য ডাঃ রায়ের পর থেকে আমরা নয়াদিল্লীতে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। আর সেই সুযোগেই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তিসঙ্গত পাওনা কেন্দ্র উপেক্ষা করতে সাহস করেছে। আজ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার চেয়ারমান কে হবেন সেজন্যও কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মতামতের পরোয়া করে না। ডি-ভি-সির চেয়ারম্যান নিয়োগ এখন প্রায় পুরোপুরি কেন্দ্রের অধীনে চলে গেছে। ডাঃ রায়ের আমলে এটি কোনোমতেই হতে পারতো না। তাই, রাজ্যপাল পদে অফিসারদের নিয়োগের সময় পশ্চিমবঙ্গের দাবীও উপেক্ষিত হবে, এতে আশ্চযের কি আছে?
>
> —নতুন অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভা-রাজ্যসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি এর কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না?—

আমরা আশা করি লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যগণ নিজ নিজ পার্টির কথা কিছুদিনের মত ভুলিয়া যান—পশ্চিমবঙ্গের হতভাগ্য বাঙ্গালী প্রজাদের কথা দয়া করিয়া একটু স্মরণে রাখিয়া তাহাদের প্রতি কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের দয়ার উদ্রেক যাহাতে হয় সেই বিষয়ে কিছু প্রয়াস পাইবেন।

কলিকাতার কাহিনী—

কলিকাতার দুঃখের কাহিনী কি কখনও শেষ হইবার নহে? নগরবাসী সকলের মনেই আজ এই প্রশ্ন অহরহ জাগ্রত হইতেছে। কলিকাতার বিভ্রাট আজ বাটে কাল ঘাটে, পরের দিন হয়ত মাঠে। একটার পর একটা লাগিয়াই আছে—সময় সময় একই সঙ্গে বহু বিভ্রাটের সমারোহ উৎসবও লাগিয়া যায়। নগর জীবনে অশান্তি এবং দুঃখ কষ্ট মনে হয় চিরস্থায়ী হইতে চলিয়াছে।

বিগত ৬ই মে ৭২ ইঞ্চি পাইপে ফাটল দেখা দিয়া নগরবাসীদের দুঃসহ এক কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। সেবারের ফাঁড়া কোন ক্রমে কাটিল, কিন্তু—তাহার পর এক মাসও পার হইতে না হইতে গত ২রা জুন, এবং তাহার পর আর একবার বোধহয় ৭।৭।৬৭ তারিখে ৭২ ইঞ্চি পাইপে দেখা গেল আবার ফাটল—এবং সেই হইতে প্রায়ই জলের নলে কলিকাতার নানা অঞ্চলে ফাটলের পর ফাটল দেখা যাইতেছে। সকলের মনেই আজ এই প্রশ্ন—কবে কোথায় মহা-ফাটল দেখা দিয়া কলিকাতা বাসীদের জল বঞ্চিত হইয়া শুখাইয়া মরিতে হইবে। কলিকাতার নগরবাসীদের মিউনিসিপ্যাল সুখ সুবিধার দায় দায়িত্ব যে সংস্থার উপর, সেই সংস্থার মালিকদের কিন্তু দায়দায়িত্বের প্রতি কোন দৃষ্টি এবং যাহাদের টাকায় তাঁহারা নবাবী করিতেছেন, সেই ভাগ্যহত করদাতাদের প্রতি তাঁহাদের কোন কর্তব্য যে আছে, তাহার কোন সামান্য পরিচয়ও পাওয়া যায় না।—

আজ কলিকাতায় শতচ্ছিদ্র শুধু জলের পাইপ নয়, কলিকাতার সমুদয় অঙ্গই আজ ব্যাধিজর্জর। বার্ধক্য তাহার একমাত্র কারণ নয়। জলবাহী ওই নলটির অবশ্য বয়স হইয়াছে অর্দ্ধশতকের উপর কিন্তু অন্য ব্যাধিগুলির সবই জরাজনিত নয়। ইদানিং একমাত্র মানুষই বাড়িয়াছে কলিকাতার আর কিছুই সেই হারে বাড়িতেছে না, মহানগরীতে সবই আজ বাড়ন্ত। অতএব বিভ্রাট বোধ হয় অনিবার্য।

সে ভাগ্যলিপি যে কেহ জানেন না এমন নয়। থাকিয়া থাকিয়া নানা প্রস্তাব ওঠে সি, এম,পিও নকসা আঁকেন, কখনও কখনও সাড়ম্বরে শিলান্যাস ইত্যাদিও স্থাপিত হয়। তাহার পর আবার সেই সনাতন ওজর—টাকার টানাটানি। গত বছর মহাসমারোহে কল্যাণী-ত্রিবেণী সেতুর সূত্রপাত হইয়াছিল। এবার শোনা গেল আপাতত তাহা বন্ধ—হাতে টাকা নাই। বন্ধ রহিল বালিগঞ্জ ষ্টেশন এবং কসবার মধ্যে প্রস্তাবিত নতুন সেতুটির কাজও। কারণ সি-এম-পি-ও জানাইয়াছেন কলিকাতার উন্নয়ন-প্রকল্পে ১৯৬৭-৬৮ সনের জন্য বাজেট রচিত হইয়াছিল দশ কোটি টাকার, মঞ্জুর হইবে বড়জোর চার কোটি টাকা! সুতরাং শুধু সেতু নয় পানীয় জল, অন্তঃপ্রণালী, পরিবহন ও পথ—কোন ক্ষেত্রেই লক্ষ্য পূর্ণ হইবে না কাজ হইবে কম কম। অর্থাৎ বৎসর শেষেও দেখা যাইবে—এই কলিকাতা আছে সেই কলিকাতাতেই।

ইহা শুধু উদ্বেগজনক সমাচার নয় লজ্জার কথাও। সাধ আর সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সব সংসারীকেই করিতে হয়; তাহাতে অগৌরব নাই। নাকের সামনে মুলা ঝুলাইয়া এইভাবে বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কাজই যদি না হইবে তবে কথা কেন? যাহারা প্রকৃত লোক তাঁহারা কিন্তু মাপিয়া বুঝিয়াই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। একসঙ্গে অনেক করিতে গিয়া চারিদিকে বিভ্রাট বাধাইয়া বসেন না, কাপড় বুঝিয়া কোট তৈয়ারিই সঙ্গত। সমস্যা অনেক, সন্দেহ নাই করণীয় অনেক। ইহাও ঠিক কথার চেয়ে কাজ কঠিন। সহজ শুধু সমালোচনা। সদিচ্ছা থাকিলেই অনেক সময় ইচ্ছাপূরণ হয় না। সেই কারণেই অগ্রাধিকার বিচারের প্রশ্ন আসে, ভাবিয়া দেখিতে হয় কোনটি আগে কোনটি পরে। আগে পত্রিকা সংস্কার, না ক্ষেতে জল-সরবাহ—আগে পথের নিওন আলো, না পথ।

সত্য, কোন সমস্যাই একক নয়, একটির সঙ্গে আর একটি জড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহার মধ্যেও আর্জেন্ট "অর্ডিনারি" নিশ্চয় আছে। সেই মত বুঝিয়া হাত লাগাইতে হইবে। যোজনা-ভবনের স্বপ্নদর্শীরাও নাকি অবশেষে যোজনাকে ছাটকাট করিতে চাহিতেছেন।

কলিকাতার উন্নয়নকামীদেরও তাহাই করিতে হইবে। পরিকল্পনার পুঁথিটির সংক্ষিপ্ত বা শিশুসংস্করণ প্রকাশ করিলেই চলিবে না, এক একটি পর্বে এক একটি অধ্যায় অধ্যয়ন সারা করাও চাই। সব কয়টা কাজই করিতে হইবে বইকি। তবু ধরা যাক এই বৎসর অগ্রাধিকার পাইল একটি বিষয় পরের দুই বৎসর আর একটি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট অন্তত একটা সমস্যা মিটাইতে হইবে, চাই এই পণ। কর্তৃপক্ষ স্থির করুন না যে এই সময়ের মধ্যে আর কিছু না পারি পরিবহণ সঙ্কট একেবারে মিটাইয়া দিব, ইহার পর পড়িব স্বাস্থ্য কিংবা মৎস্য লইয়া। এইভাবে বাস্তবসম্মত পন্থায় অগ্রসর হইলে একে একে অনেক মুশকিলেরই আসান হয়। সম্বলের তহবিলে টান পড়ে যদি পড়ুক। যে-হেতু জলই জীবন সেই হেতু প্রথমেই জল সমস্যা জল করিয়া দিবার সঙ্কল্প লইলে কেমন হয়? ১৯৬৭ সনের মধ্যে পানীয়-সমস্যার সমাধান এমনই কি অসম্ভব?

প্রসঙ্গত এইখানে উল্লেখ করিব যে টালার অবস্থিত ২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত একটি বড় ট্যাঙ্কেও ফাটল দেখা দিতেছে। টালার জলাধার ট্যাঙ্কগুলিতেও যদি এইবার ফাটল দেখা দিতে সুরু করে তাহা হইলে কলিকাতার জল, তথা জীবন, সমস্যা একেবারে চরমে পর্যায়ে উঠিবে।

এখনও যদি কলিকাতা কর্পোরেশনের বেহুঁস মনে সামান্য হুসও জাগ্রত হয়—কলিকাতাবাসীরা ধন্য হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনে "আর্থিক-খরা"—খরাত্রাণকে করিবে?

কলিকাতা পৌর সংস্থার অর্থসঙ্কট চরমে উঠিয়াছে। মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে'র মতে কর্পোরেশনের অর্থ সঙ্কট-রূপ খরা দূর করিতে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব সর্ব্বাধিক। সঙ্কট মোচনের সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে এখন রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কর্পোরেশনের আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। পূর্ব্বতন কংগ্রেসী সরকার থাকিলে হয়ত মেয়র মহাশয়কে অর্থনৈতিক চিন্তায় এমন ভাবে ক্লিষ্ট হইতে হইত না, কারণ সেইকালে পশ্চিমবঙ্গরাজ্য এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাগ্য বিধাতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের সামান্য ইঙ্গিতেই রাজ্য সরকারের টাকা দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানে হাওয়া বদলাইয়াছে।

কর্পোরেশনের এক ঘরোয়া বৈঠকের পর শ্রীগোবিন্দ দে—সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে—

> "টাকার কোন সন্ধান আমরা করতে পারিনি'। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে পৌর সংস্থার ব্যয় বেড়েছে। অথচ দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে পৌর সংস্থার কিছু করবার নেই এজন্য পৌরসংস্থাকে সাহায্য করার নৈতিক দায় রাজ্য সরকারের। দুর্মূল্য ভাতার অন্ততঃ ৮০ ভাগ টাকা রাজ্য সরকারের বহন করা উচিত।"

করদাতারা মেয়রের এই কথা স্বীকার করিবে কতখানি বলা যায় না। কারণ করদাতাদের এই ধারণা অকারণ নহে যে—সরকার প্রয়োজন এবং দাবীমত টাকা যোগাইবে এই করপোরেশনকে—এবং করপোরেশন তাহা খুশীমত অপব্যয় করিবে কিন্তু সরকার হইতে হিসাব চাওয়া হইলে তাহা হইবে কর্পোরেশনীয় অটোনমীতে অন্যায় হস্তক্ষেপ।

—"বৈঠকের আলোচনাসূত্রে পৌর সংস্থা থেকে জানা যায়, পৌরসংস্থার এখন ব্যাংকে মজুত আছে ৫৭ লাখ টাকা। জুলাইয়ের প্রথমার্ধে আর দশ লাখ টাকা কর আদায় হতে পারে। সব নিয়ে হবে ৬৭ লাখ টাকা।

"অপর দিকে জুন মাসের বেতনাদি বাবদে ব্যয় হবে ৫২ লাখ টাকা। সি-আই-টি-কে দিতে হবে ১৪ লাখ টাকা। জল-জঞ্জাল ইত্যাদির কয়েকটি একান্ত জরুরী কাজের জন্য কমপক্ষে চার লাখ টাকা নাকি না হলেই নয়। সুতরাং তহবিল ঘাটতি।

এ অবস্থায় ঠিকাদারদের পাওনা মিটানো সাধারণ পৌরকৃত্য ইত্যাদি বন্ধ রাখা ছাড়া নাকি উপায় নেই। জুলাই মাসে সি-আই-টি-কেও নাকি তার পাওনা ১৪

লাখ টাকার অর্ধেক দেওয়া হবে বলে বৈঠকে স্থির হয়েছে।

এই পৌর সংস্থার অপশাসন আজ নূতন নহে—ইহা ক্রণিক রোগে পরিণত হইয়াছে—যাহার কোন চিকিৎসা নাই। এমন অবস্থায় পৌর সংস্থারূপ-রোগীকে সরকারী অর্থরূপ-মরফিয়া দিয়া কতদিন বাঁচাইয়া রাখা যাইবে জানি না। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার কর্পোরেশনকে দয়া করিয়া হয় মর্গে প্রেরণ করুন আর না হয় নূতন ব্যবস্থা কিছু করুন এবং দয়া করিয়া আমাদের বাঁচান।

একটি সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি রাজ্যের কয়েকটি পৌর সংস্থায় সরকারের প্রদত্ত এবং কর বাবদ আদায় অর্থে অপব্যয়ের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবেন। গত বৎসর সরকার রাজ্যের কয়েকটি পৌর সংস্থাকে (বোধ হয় ১৭টি)—পাকা ড্রেন, পথঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা দান করেন। অভিযোগ এই যে—এই অর্থ যেজন্য মঞ্জুর করা হয় সেই বাবদ খরচ না হইয়া অন্য উদ্দেশ্যে অপব্যয়িত হইয়াছে। এ বিষয় দ্বিমত নাই যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রায় সব-কয়টি পৌর সংস্থাই অযোগ্য অকর্মণ্যদের দখলে গিয়া প্রায় ধ্বংস হইবার মত অবস্থায় আসিয়াছে।

এককালে-গৌরবমণ্ডিত কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান অবস্থা এবং চালচলন দেখিলেই—অবস্থা কি পর্যায়ে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারো পক্ষে কোন পরিশ্রম বা কষ্ট করিতে হইবে না। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ বিধান ছাড়া পৌর সংস্থার আর কি মহান কর্তব্য থাকিতে পারে? কিন্তু সরকারী অর্থ পাওয়া সত্ত্বেও যদি নাগরিক জীবনের বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনা দূর না হয় তাহা হইলে পৌর সংস্থা থাকুক বা না থাকুক, নাগরিকদের তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। নূতন রাজ্য সরকার যদি অবিলম্বে রাজ্যের পৌর সংস্থাগুলির প্রশাসনিক গলদ, অর্থের অপব্যয়, স্বজন পোষণ এবং অন্যান্য প্রকার অপশাসনের খোলাখুলি তদন্ত করেন, জনগণ খুসী এবং সুখী হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে রাজ্যের ১৮টি পৌর সংস্থায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচনে পৌরসংস্থার বাস্তু ঘুঘুগুলির বাসা ভাঙ্গিয়াছে। নূতন যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসী বোধ হয় শতকরা একজনও নাই। নব-নির্ব্বাচিতদের প্রায় সকলেই বয়সেও নবীন। যে দায়িত্বের ভার আজ তাহারা পাইলেন, আশা করি তাহার মর্য্যাদা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বলা বাহুল্য—পৌর সংস্থার কাজে কোন প্রকার রাজনীতির স্থান নাই, নির্ব্বাচিত সদস্যবৃন্দ বিবিধ পার্টির লোক হইলেও পৌর সংস্থায় তাঁহাদের পার্টি পলিটিকস্-এর অবকাশ নাই। তাঁহাদের একমাত্র এবং প্রধান কর্ত্তব্য নাগরিক জীবনের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ বিধানে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করা। আমরা, অর্থাৎ সাধারণজন আশা করিব পৌর সংস্থাগুলির পূর্ব্বতন 'ইজারাদাররা-কর্ত্তব্যে যে বিষম অবহেলা করিয়া আত্মসেবার সঙ্গে কেবল আত্মস্বার্থই দেখিয়াছেন—এবার সেই অপ-যুগের অবসান ঘটিবে।

আমরা বৃদ্ধ; আমাদের বিদায়ের দিন আগতপ্রায় কিন্তু আমরা নবীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশের যুবশক্তির উপর অসীম বিশ্বাস রাখি। ভুলচুক অবশ্যই হইবে, কিন্তু সে সব ভুলচুক - ইচ্ছাকৃত হইবে না এবং যথা সময়ে সকল ভুলের প্রতিকারও যে হইবে ইহাও আমরা বিশ্বাস করি।

কলিকাতা পৌরসংস্থা সম্পর্কে কিছু বলিতে হইলে বহুবার কথিত সেই পুরাণ কথাই বলিতে হয়। প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকারের বি-টিম ছিল এই কলিকাতা কর্পো-রেশন—কিন্তু বর্ত্তমানে আর তাহা নয় বলিয়া মনে হয়। নূতন রাজ্য সরকার যদি একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়া করপোরেশনের গত দশ পনেরো বছরের কলঙ্কময় ইতিহাসের সব কিছুই ভাল করিয়া খতাইয়া দেখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কলিকাতার পৌর অপ-পিতাদের বহু বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম্মের নিখুঁত চিত্র উদ্ঘাটিত হইবে। এমন ক্রিয়া কর্ম্মের ব্যাপারও প্রকাশ পাইতে পারে, যাহা আদালতের আওতায় পড়িতে পারে। সরকারী অর্থ সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও কলিকাতা করপো-

রেশনে এমন কতগুলি কার্য্যে চরম অবহেলা এবং গাফিলতি দেখাইয়াছে যাহা অসহনীয়। নূতন রাজ্য সরকারের স্বায়ত্ত শাসন দপ্তর যদি কলিকাতা করপোরেশনের কার্যাবলীর পূর্ণ তদন্ত আর কালবিলম্ব না করিয়া আরম্ভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের পূর্ণ বিচার এবং যথোচিত দণ্ড বিধান করেন, কলিকাতার করদাতারা শান্তি এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে। আর বিলম্ব হইলে কলিকাতা নগর অতি অল্পকাল মধ্যেই পতিত নগরে পরিণত হইবে এবং সেই সঙ্গে হয়ত নগরবাসীরাও চিরতরে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

নূতন রাজ্যসীমা নিয়োগের দাবী

কিছুদিন পূর্ব্বে লোকসভায় ওড়িষার সদস্য শ্রী পি, কে, দেও একটি নূতন বাউণ্ডারী কমিশন দাবী করিয়া সেরাইকেলা এবং খরসোয়ান সম্পর্কে নূতন করিয়া বিচার বিবেচনা চাহিয়াছেন। এই দুইটি অঞ্চলই ছিল দুইজন ওড়িয়া রাজার অধীন। ভারত স্বাধীনতালাভের পর যখন নূতন করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের সীমা নিদ্ধারণ করা হইল, সেই সময় কোন বিশেষ এবং অজ্ঞাত কারণে সেরাইকেলা এবং খরসোয়ান—শতকরা শতজন ওড়িয়া অধ্যুসিত এই দুইটি রাজ্যকে—কেন বিহারের সহিত যুক্ত করা হইল কেহই তাহা বলিতে পারেন না। উক্ত দুইটি 'রাজ্যের' প্রধান দুইজন তাঁহাদের জমিদারী সত্ব এই সর্তে ত্যাগ করেন যে—ঐ দুইটি রাজ্যই ওড়িষার মধ্যেই থাকিবে, কেন্দ্রীয় সরকারও সেই সর্ত স্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল ওড়িষার দাবী বাতাসে উবিয়া গেল হঠাৎ সেই স্থানে বিহার আসিয়া গেল। সে যাহাই হউক, এখন নূতন করিয়া আবার হয়ত রাজ্য সীমা নিদ্ধারণ কমিশন বাধ্য হইয়াই কেন্দ্রীয় সরকারকে বসাইতে হইবে এবং ন্যায়দাবী অনুসারে ওড়িষার ধন ওড়িসাকেই ফেরত দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্য সীমা নূতন করিয়া বিবেচনা করিবার দাবীও উঠিয়াছে। মহারাষ্ট্র-মহীশূরের মধ্যেও কোন কোন অঞ্চলের সীমা লইয়া বিবাদ চলিতেছে। চারিদিক হইতে আবার রাজ্য সীমা পুনর্নির্দ্ধারণের সজোর দাবী উঠিতে থাকিলে—কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবে এবং কোন দিক দিয়া সেই তাল সামলাইবেন আমরা বলিতে পারি না—কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চিম বাঙ্গলার দাবী আবার জোরদার না করিলে চলিবে না! ইংরেজ আমলে বাঙ্গলা হইতে মানভূম, সিংভূম, ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে বিহারের সহিত যুক্ত করা হয় বাঙ্গলাকে মুসলমান প্রধান রাজ্যে পরিণত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে এবং বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক প্রহার দিবার মানসে বাঙ্গলাকে এই ভাবে কতকগুলি অঞ্চল হইতে বঞ্চিত করিবার ফলে সেইকালে (বোধহয় ১৯১২ সালে) বাঙ্গলায় মুসলমানের সংখ্যা হইল শতকরা ৫১ এবং হিন্দুর হইল শতকরা ৪৯ মাত্র। বলা বাহুল্য বাঙ্গলাকে তাহার বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্যে এইভাবে জব্দ করা হইল। বাঙ্গালীর প্রতি এই বিষম অবিচার দেখিয়া তৎকালের বহু কংগ্রেসী এবং অকংগ্রেসী নেতা—যাহাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী সচ্চিদানন্দ সিংহ (বিহারী) রাজেন্দ্র প্রসাদ (বিহারী) এবং খুব সম্ভবত স্যর হাসান ইমাম (বিহারী) এবং আরো অনেকে—প্রতিশ্রুতি দেন যে ক্ষমতা হাতে পাইলে তাঁহারা বাঙ্গলার প্রতি এই ব্রিটিশ অবিচারের প্রতিকার করিবেন। কিন্তু হায়! ক্ষমতা যখন হাতে আসিল পোড়া বাঙ্গলার কর্ত্তিত অঙ্গ জোড়া লাগিল না। বাঙ্গলার কথা সকলেই ভুলিয়া গেলেন, এমন কি, বলিতে দুঃখ হয়—(ধর্ম্ম-)রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বয়ং পিছনে থাকিয়া বাঙ্গলার দাবী যাহাতে বাতিল হয় সেই সার্থক চেষ্টাই করেন। তাঁহার কাছে বিহারের সর্ব্বপ্রকার দাবী—তাহা ন্যায় বা অন্যায় যাহাই হউক—সর্ব্বদা অবশ্য-গ্রাহ্য বলিয়া গৃহীত হইল। কেবল 'গৃহীত হইল' বলিলে কম বলা হইবে—বিহারের দাবী এবং স্বার্থ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হয়, এমন কি অন্য রাজ্যের একান্ত ন্যায্য দাবীকেও অগ্রাহ্য করিয়া সে বিষয়ে ৺রাজেন্দ্রপ্রসাদ সদা অতি জাগ্রত ছিলেন—এবং শেষ রক্ষাও তিনি করিয়া যান।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এবং অবস্থায়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি যখন তাহাদের রাজ্য সীমার নূতন নির্দ্ধারণ দাবী করিতেছে, আমরাই বা কেন করিব না? বিশেষ করিয়া

মানভূমের যে অংশ বিহারে গিয়াছে সেই ধানবাদ, পুরা ধলভূম অঞ্চল (টাটানগর সমেত)। এই দুইটি অঞ্চল আদি কাল হইতে বাঙ্গলারই ছিল, ব্রিটিশ রাজের কৃপায় গেল বিহারের জমিদারীতে এবং তাহার পর কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের প্রবল বাঙ্গালী প্রীতির কল্যাণে অঞ্চলদুটি বিহারেই রহিয়া গেল।

এদিকে জন সংখ্যার প্রবল চাপে পশ্চিম বঙ্গের প্রায় শ্বাসরোধ হইবার মত অবস্থা, লক্ষ লক্ষ পূর্ব্ব বঙ্গ আগত উদ্বাস্তু এখনও পথে ঘাটে কোন ক্রমে নাসিকাস্ত প্রাপ্ত জীবন ধারণ করিয়া আছে আর ও দিকে বিহারে ধানবাদ ধলভূম এবং সিংভূমের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় জনহীন পতিত জমি হইয়া পড়িয়া আছে। উক্ত অঞ্চলগুলি আবার যদি পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয়—কয়েকলক্ষ লোকের বসবাস এবং জীবিকার ব্যবস্থা হইবে। ইহাতে বিহারেরও এমন কিছু ক্ষতি হইবে না সামান্য মাত্র পতিত জমির পরিমাণ কমিবে। পশ্চিম বঙ্গের নূতন রাজ্য সরকার এবং লোক-সভার বাঙ্গালী সদস্যরা এ-বিষয়ে একটু অবহিত হইলে হয়ত এ রাজ্যের কিছু উপকার হইবে। পশ্চিম বঙ্গে এখন আর কেন্দ্রের তাঁবেদার কংগ্রেসী সরকার নাই—কাজেই আশা করা যাব রাজ্য সরকারও বাঙ্গলার হারানো অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করিতে যথোচিত প্রয়াস করিবেন।

হিন্দীওয়ালাদের উন্মত্ততা

ইংরেজী সম্পর্কে শ্রী নেহরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়া ভাষা লইয়া প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা শান্ত করেন এবং পরে শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীও যে নেহেরু প্রতিশ্রুতিকে আইনে পরিণত করিবার অঙ্গিকার দেন, এখন সেই নেহেরু সূত্রকে কাজে পরিণত করিবার জন্য লোকসভায়— দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর পরে একটি বিল পেশ করিবার প্রাক্কালেই প্রায় দুইশত কংগ্রেসী অকংগ্রেসী সদস্য শ্রীমতী গান্ধীর নিকট একটি আবেদন পেশ করিয়াছেন—যাহাতে নেহেরুর প্রতিশ্রুতি কোন ভাবেই যেন বাস্তবে কার্য্যকর না হয়। বলা বাহুল্য এই ২০০ আবেদনকারী বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশের লোক—অর্থাৎ হিন্দীভাষী অঞ্চলের বাসিন্দা। এই অভিজ্ঞ হিন্দী পণ্ডিতদের ভয় এই যে একবার ইংরেজী যদি সহযোগী ভাষা বলিয়া আইনত স্বীকৃতি লাভ করে তাহা হইলে হিন্দী আর কখনও সমগ্র ভারতের ভাষার রাজসিংহাসনে বসিতে পারিবে না। কাজেই আর কালবিলম্ব না করিয়া আজই হিন্দীকে এক এবং অদ্বিতীয় রাজ-ভাষা বলিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হউক—এই হইল ইঁহাদের সামান্য দাবী।

এই হিন্দী ফ্যানাটিকের দল মাত্র দুই তিন বৎসর পূর্বে ভারতে ভাষা লইয়া যে প্রলয় হইয়া গেল সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে! কেন্দ্রীয় সরকারেরও এ বিষয়ে গলদ যথেষ্ট আছে এবং মনে হয় তাহার বেশ খানিকটা ইচ্ছাকৃত। একবার যখন স্থির হইল ভাষা সম্পর্কে নেহেরু প্রতিশ্রুতি কার্য্যকর করিতে হইবে, তখন তাহা লইয়া এত টালবাহানা এবং অযথা বিলম্ব করিবার কি হেতু ছিল? কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন কর্ত্তা ব্যক্তি (তৎকালীন)—বিশেষ করিয়া শ্রীনন্দা—মনে করিয়াছিলেন কোনপ্রকারে দুই চারি বৎসর এই ভাবে তা-না-না করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে, এক বিশেষ শুভক্ষণে হিন্দীকে রাজ সিংহাসনে বসানো সহজ সম্ভব হইবে। এখন দেখা যাইতেছে লোকে শ্রী নন্দাকে ভুলিয়াছে কিন্তু ভাষা সম্পর্কে নেহরু প্রতিশ্রুতি ভুলে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এখনও এই বিষয় লইয়া চিন্তামগ্ন থাকেন, তাহা হইলে হঠাৎ আবার একটা বিষম ভাষা বিস্ফোরণে চমকিত হইয়া তাঁহাদের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাইবে এবং ইহার পূর্ব্ব লক্ষণও দেখা যাইতেছে। গতবারে দক্ষিণ ভারতেই হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ প্রকটিত হয় এবার যদি আবার কিছু ঘটে তবে কেবল মাত্র ভারতের মধ্য এবং উত্তরাঞ্চল বাদ দিয়া পশ্চিম বঙ্গ উড়িষ্যা আসাম ত্রিপুরা, অর্থাৎ সমগ্র পূর্ব্ব ভারত জুড়িয়া হিন্দীর বিরুদ্ধে বিষম এবং বিকট অভিযান সুরু হইবে। কাজেই সাবধান হইবার সময় যেন পার না হইয়া যায়।

দেশে এখন বহুবিধ জটিল সমস্যা বিরাজ করিতেছে তাহার মধ্যে খাদ্য এবং ক্রম-উর্দ্ধমুখী দ্রব্যমূল্য এই দুইটি—প্রধান। ইহা ছাড়াও স্বাস্থ্য শিক্ষা, রাজনৈতিক দলাদলি এবং দর কষাকষিও কম চলিতেছে না। কংগ্রেস

তাহার প্রাধান্য হারাইয়াছে—এমন অবস্থায় দেশের অশান্তি বৃদ্ধি পায় বা জাগ্রত হয় এমন কোন কার্যে বা আন্দোলনে কংগ্রেসের পক্ষে বর্ত্তমানে যোগদান না করাই হয়ত বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত, কিন্তু কাজের লোক বেকার বসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই বহু কংগ্রেসী সদস্য অকাজের দিকেই মন দিতে চেষ্টা পাইতেছেন। প্রধানত পার্লামেণ্টে হিন্দী ভাষী সদস্যের (কংগ্রেসী)দলই আবার নূতন করিয়া হিন্দী লইয়া মাতামাতির সহিত মাথা ফাটাফাটি আন্দোলন চালাইবার চেষ্টায় আছেন।

দেশের রাজনৈতিক নেতারা ভারতের ঐক্য এবং সংহতি লইয়া বড় বড় জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন এবং দেশের কল্যাণের জন্য জনগণকে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে উপদেশও দিয়া থাকেন কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় এই সকল হঠাৎ বনগিয়া নেতারা নিজেদের প্রাদেশিক এবং গোষ্টি স্বার্থ সংরক্ষণে সদা অতি তৎপর।

ভারতের বিপদ চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে। এসব অবস্থায় হিন্দীর রাজ্যাভিষেক লইয়া যাঁহারা আবার একটা ঝড় তুলিতে প্রয়াস করিতেছেন, তাহাতে এবার হয়ত দেশের মধ্যে ঐক্যবোধ যতটুকু আছে, তাহাও লোপ পাইবে এবং অচিরকাল মধ্যে দেশ হয়ত ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। ইহা যদি বাস্তবে ঘটে, তাহা হইলে একদিকে চীন অন্য দিকে পাকিস্তানের পক্ষে উপস্থিত হইবে সুবর্ণ সুযোগ।

আমরা বুঝিতে পারি না ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে কিন্তু ইংরেজী ভাষা এমন কি অপরাধ করিল যাহার কারণে ইংরেজী না হটাইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে! বিগত অন্তত ২০০ বছর ধরিয়া আমরা ইংরেজির মাধ্যমেই দেশে এবং বাহিরের পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছি—বাহিরের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্য পূর্ণ করিয়াছি। আজ একদল অপক্ক অৰ্দ্ধ শিক্ষিতের মাতামাতির কারণে নিজেদের কি সব দিক হইতে নিঃস্ব করিব?

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার বনাম নক্সালবাড়ী—

নক্সালবাড়ী সমস্যার মূলে যাইতে হইলে নিম্নে প্রদত্ত শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকার জনসংখ্যা ও জন বিন্যাস কিছু সাহায্য করিবে :—

মহকুমা	মোট এলাকা (বঃ মাইল)				জনসংখ্যা	গ্রামেরসংখ্যা	
		(ক)	(খ)	(ক)	(ক)	(ক)	(খ)
	মোট	গ্রামীন	শহর	বর্গমাইল	মোট	বসতিপুর্ণ	বসতিহীন
শিলিগুড়ি (মহ)	৩২.৩৩	৩১৭৩	৬০	৬৮০	২১৯,৮৪৮	২৯৬	১৮
ফাঁসিদেওয়া	১২০৬	১২০৬		৪৮৬	৫৮,৫৭৩	৯০	২
খড়িবাড়ি	৫৫ ৪	৫৫,৪		৪৬৯	২৫৯৫৭	৭০	৩
নক্সালবাড়ি	৭৯৮	৭৯৮		৫২৯	৪২১৯৩	৭১	৬
শিলিগুড়ি (থানা)	৬৭,৫	৬১,৫	৬,০	১৩৮০	৯৩১২৫	৬৬	৫
শিলিগুড়ি (শহর)			৫০	৫০৯৫২	৬৫৪৭১		

নক্সালবাড়ী এবং অন্যান্য সংলগ্ন অঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি পত্রিকা মন্তব্য করিতেছেন—

এ অঞ্চলে একটু চলা ফেরা করলেই মনে হয় যে এখানে দীর্ঘকাল ধরে, ধরে নেওয়া হয়েছে যে, 'কুলি সর্বস্ব জনসাধারণ হলো less than human—মানুষের চেয়ে নিচু ধাপের প্রাণী।

এই যে বোধ ভিতরে ভিতরে দীর্ঘকাল কাজ করেছে যার উপর ভিত্তি করে যাতায়াত, যোগাযোগ বাড়ি ঘর জীবনযাত্রা প্রণালী ইত্যাদি সব কিছু ব্যবস্থা

গড়ে উঠেছে—জনসাধারণ এই আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অস্পৃশ্যতা'র বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চাইছে। মানুষ আজ মানুষের মতো ব্যবহার চাইছে—কেবল কুলির মতো ব্যবহার নয়। কুলির প্রতি দয়া দেখিয়ে বা আরো দু'পয়সা বেশী তাদের হাতে গুঁজে দিয়েও এ সমস্যার সমাধান হবে না। এখানকার সমস্যা কেবল আর্থিক নয়—এ সমস্যা মানবিক। যেটাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে দেখা যাচ্ছে সেটাও বর্তমান রূপ নিতে পেরেছে কারণ এর পিছনে একটা তীব্র অথচ অমীমাংসিত মানবিক সমস্যা রয়েছে। এটা হলো গণতান্ত্রিক অধিকারের সমস্যা—সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে মানুষ হিসাবে মানবিক অধিকার সাম্যের সমস্যা।

এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভেদ শুধু আর্থিক নয় শ্রেণীগত ভেদ এখানে জাতিগত ভেদ সৃষ্টি করেছে—এ আজ দুস্তর সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচনা করে বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণীগত জাতি গোষ্ঠিকে চিরবিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের লোকের, রাজবংশী চাষির সঙ্গে বাবুর তফাৎ অথবা আদিবাসী শ্রমিক চাষির সঙ্গে মধ্যবিত্তের যে পার্থক্য তাকে অসেতুসম্ভব ব্যবধান বলেই মনে হয়। এই ব্যবধান আছে বলেই আর্থিক সমস্যা থেকে রাজনৈতিক সমস্যা এমন উগ্র বৈরিতার আকার নিতে পেরেছে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জন গোষ্ঠির মধ্যে এই human uunderstanding বা মানবিক সমঝোতা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে এ অঞ্চলের কি ভবিষ্যত তা বলা শক্ত হবে!—

নক্সালবাড়ী সমস্যার পশ্চাতে যে সকল জটিল আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণ কার্য্য করিতেছে তাহার মধ্যে পশ্চাৎপদ ও অতি সীমিত কৃষি ব্যবস্থায় জনসংখ্যার প্রবল চাপ যে একটি অন্যতম বৃহত্তম কারণ তাহা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

বর্তমানে নক্সালবাড়ীর অবস্থা যাহা তাহাতে নানা কারণে একটা বৃহৎ সংখ্যক অধিবাসী অর্থনৈতিক দিক হইতে একেবারে স্থানচ্যুত অথবা বাস্তহারা হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান নক্সালবাড়ী সমস্যা অথবা বিদ্রোহের আবর্ত—ইহাদেরই কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট। অতএব, নক্সালবাড়ীর তথাকথিত "বিদ্রোহ" দমন বা সমাধান করিতে হইলে কেবল মাত্র পুলিসি অভিযানেই—(যদিও তাহার কিছু প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না) সকল সমস্যার সমাধান হইবে না।

পশ্চিম বঙ্গের বহু কংগ্রেসী নেতা আজ নক্সালবাড়ী সমস্যা লইয়া নানা কথা, নানা উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু দীর্ঘ দশ পনেরো বৎসর প্রাক্তন কংগ্রেসী রাজ্য সরকার এ-সমস্যার সমাধানে কোন চেষ্টাই করেন নাই কেন? বলা বাহুল্য নক্সালবাড়ী সমস্যা হঠাৎ একদিনে গজায় নাই—ইহা দীর্ঘকালের, আজ চরমে উঠিয়াছে এই মাত্র তফাৎ।

বর্ত্তমান অবস্থাতেও মানুষকে যদি দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সমস্যার তীব্রতা বা উগ্রতা বহুলাংশে হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের কাছে অতিশয় সু-যুক্তিও বিদ্রোহের কারণ হইতে পারে।

উগ্রলাল কমিউনিষ্ট পার্টির এক অংশ আজ নক্সালবাড়ি এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য কয়েকস্থানে মানুষের দুর্দ্দশার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। যে-সব মানুষের সামনে কেবল মাত্র নিরাশার অন্ধকার তাহাদের সামনে যে কেহ একটু আশার আলোকপাত করিবে—তাহা যতই অস্থির এবং আসলে আলেয়ার আলো হইলেও—আশাহীন মানুষ তাহাকেই অন্ধকার হইতে ত্রাণের চরম পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে। উগ্রলালের দল আজ এই উপায়ে নক্সালবাড়ী এবং অন্যত্র লাল পতাকার নিচে এক শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার সূচনাতেই নক্সালবাড়ীর হাঙ্গামা সবটা না হউক—খুন জখম, লুটতরাজ এবং অন্যবিধ অরাজকতা দমন করিতে সক্ষম হইতেন যদি তাঁহারা আরম্ভেই কঠোর হস্তে কার্য্য আরম্ভ করিতেন! একথা সত্য যে পুলিস-পল্টন দিয়া মানুষের বিদ্রোহ দমন করা

যায় না, যদি সে বিদ্রোহ ব্যাপক এবং দেশব্যাপী হয়। নক্সালবাড়ির অরাজকতা বিদ্রোহ নহে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক পার্টির নষ্টামি মাত্র। প্রয়োজন একদিকে কঠোর হস্তে অরাজকতা দমন —অন্য দিকে সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের জনগণের অভাব অভিযোগ এবং দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার। বিলম্বে হইলেও পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবার হয়ত রোগ নিরাকরণে যথাযথ ঔষধ এবং সেই সঙ্গে রোগীর পথ্যেরও ব্যবস্থা করিবেন।

মন্ত্রীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নক্সালবাড়ি তথা শিলিগুড়ি অঞ্চলে অস্ত্র প্রেরণ বহন এবং চালান করা সম্পর্কে নিষেধ আজ্ঞা লইয়া একটা অযথা এবং অনাবশ্যক তর্কাতর্কি চালিয়াছে। আমাদের মনে হয় দেশের কোন অঞ্চলে নিরাপত্তার জন্য কোন বিশেষ আইন প্রয়োজন এবং তাহা জারি করিবার অধিকার — কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। এবং ইহা করিলে রাজ্য সরকারের কোন অধিকার সঙ্কোচ করা হয় না। আজ নক্সালবাড়ির রাজনৈতিক আবহাওয়া যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অস্ত্রাদি বহন এবং চালান সম্পর্কে ঐ অঞ্চলে আরো প্রখর সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন—ইহা উগ্রলালের দল ছাড়া অন্য সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্রীজ্যোতি বসু সি পি আই এম হইয়াও মুখ্যমন্ত্রীকে নক্সালবাড়ির অবস্থা আয়ত্তে আনিবার প্রয়াসে সাহায্য এবং পূর্ণ সহযোগিতা দিতেছেন, কিনা জানিনা।

কলিকাতার ট্রাম—ট্রাম কোম্পানি—জ্যোতি বসু

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানির বড় কর্ত্তারা হঠাৎ ট্রাম বন্ধ করিয়া কলিকাতাবাসী এবং রাজ্য সরকারকে বিপাকে ফেলিয়া ইচ্ছামত ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া লইবার জন্য যে বিষম প্যাঁচ করিয়াছিলেন, শ্রী জ্যোতি বসুর তৎপরতা, সতর্কতা এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে—ট্রাম কোম্পানির সেই প্যাঁচ কাটিয়া গেল! মাত্র৪৮ ঘন্টার নোটিশে 'কর্ম্মীদের বেতন দিবার টাকা নাই' বলিয়া—কোম্পানির এজেন্ট সমেত তিনজন সাহেব একজন ভারতীয় ডিরেক্টার সহ হঠাৎ বিলাতে পাড়ী দিলেন। এ ভাবে পলায়ন করিবার কি কারণে ঘটিতে পারে, বলা সহজ নহে। খুব সম্ভবত কোম্পানির বড় কর্ত্তারা ভাবিয়াছিলেন—রাজ্য সরকার হঠাৎ এমন একটা সমস্যার তাল সামলাইবার জন্য কোম্পানির দাবি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের হিসাবে একটু গলদ হইয়াছিল। কংগ্রেসী সরকার যে এখন বিগত তাহা তাঁহাদের মনে ছিল না। দিন বদলাইয়াছে—এবং বর্ত্তমানে ট্রাম কর্ম্মীরাও যে সংযুক্ত দলীয় সরকারের পশ্চাতে থাকিয়া—নির্দ্দিষ্ট দিনে বেতন না পাইলেও কাজ চালাইয়া যাইবে—ট্রাম কোম্পানি এ অসম্ভব কথা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সমস্যা যখন দেখা দিল শ্রী জ্যোতি বসু ট্রাম কর্ম্মীদের সামনে দাঁড়াইয়া ধীর ভাবে সব কথা খুলিয়া বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এ অনুরোধও করেন যে জুন মাসের বেতন পাইতে দেরী হইলেও ট্রাম কর্ম্মীরা যেন ট্রামের চাকা অচল না করেন। কর্ম্মীরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইলেন।

শ্রী জ্যোতি বসু নিজ দায়িত্বে (পরিবহন মন্ত্রী হিসাবে) কলিকাতার ট্রাম সরকারী হাতে লইয়া চালাইবার সিদ্ধান্ত লইলেন। মন্ত্রীসভা ইহা মানিয়া লইয়াছেন। বিলও প্রস্তুত—পেশও হইয়াছে বিধান সভায়, [১৪-৭-৬৭] (পরে পাসও হইয়াছে)

ট্রাম কোম্পানির কলিকাতার এজেন্ট বিলাত হইতে এখন হঠাৎ আবার কলিকাতায় হাজির হইলেন (১৩।৭।৬৭)—কেন? শুনা যাইতেছে ট্রাম কোম্পানি এখন নাকি কর্ম্মীদের জুন মাসের বেতন দিতেও রাজী, ট্রাম তদন্ত কমিশনের জন্য ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গও শিকায় তুলিয়া রাখিতে প্রস্তুত, যদিও—পূর্ব্বে ছিলেন না। কয়েক দিন পূর্ব্বে বলা হয় কোম্পানির হাতে টাকা নাই—আজ হঠাৎ কোন্ টাকশাল হইতে টাকা আসিল?

এদিকে ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার মিঃ ম্যাকেন্‌জি ১৩।৭।৬৭ তারিখে জ্যোতি বসুর সহিত দেখা করিয়া একটি স্মারক লিপি তাঁহাকে দিয়াছেন। স্মারক লিপিতে অন্যান্য কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন চাপ বা হুমকির আভাস স্পষ্টই পাওয়া যায়)—এই কথাগুলি আছে:-

"মাহামান্য রাণীর সরকারের উদ্বেগ (না স্বার্থ?)

আরো বেশী কারণ বিলাতি কোম্পানির উপর এই আচরণ (ট্রামের পরিচালন ভার সরকারের হাতে গ্রহণ) ব্রিটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—যাহার ফলে পশ্চিম বঙ্গে ব্রিটিশ পূঁজি নিয়োগ ব্যাহত হইবে”।

কথায় বলে “মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে তারে বলে ডাইনী।” মহামান্যা ব্রিটিশ রাণীর সরকারের পশ্চিম বঙ্গের জন্য এই উদ্বেগ সত্যই উপভোগ্য। এ দেশের এবং দেশবাসীর উপর ব্রিটিশ রাজ এবং বণিকদের কি ভীষণ এবং অপরিসীম দরদ তাহা আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতে দেখিতেছি। বাধ্য হইয়া ভারত পরিত্যাগ করিবার সময় ব্রিটিশ সরকার যে কামড়ের দ্বারা ভারতকে দুই টুকরা করিয়া যায়, তাহা ভুলিতে এবং বিষাক্ত দাঁতের সে-কামড়ের ঘা শুকাইতে কত হাজার বছর লাগিবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা অসম্ভব !

আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। জ্যোতি বসু তথা আমাদের রাজ্য সরকার তৎপর থাকিবেন, কারণ যথাকালে দিল্লীতেও ট্রামের ব্যাপার গড়াইবে। চেষ্টা প্রকাশ্য এবং গোপন—চলিবে যাহাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ট্রাম পরিচালনা ভার গ্রহণের বিলে সম্মতি না দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কুখ্যাত বাঙ্গলা বিদ্বেষী দুষ্ট চক্রের তৎপরতা হয়ত এখনই সুরু হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান রাজ্য সরকারকে হতমান করিবার সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকার অবহেলা নাও করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি ট্রামের বিলে সম্মতি শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য দিয়াছেন—কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে চার-পাঁচ দিন ধরিয়া চিন্তা করিবার কোন কারণ ছিল কি? ট্রামের ব্যপারে দিল্লীর দুষ্টচক্র এবং চক্রীর দল বাধা সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাহা কার্য্যকর করিতে দেন নাই

জিপসী-মন

তুষারকান্তি নিয়োগী

(১)

"তোমার না আছে বাপ
না আছে মা
না আছে বোন
না আছে ভাই
আপন বলে জগৎ মাঝে
তোমার কিছুই নাই—
নিঠুর ভুমি তোমার কোলে
হ'ল না মোর ঠাঁই।"

করুণ ঝংকার তোলে জিপসীর বেহালা, করুণতর চিক্কণ কণ্ঠধ্বনিতে আকাশ বাতাস হয় মুখরিত—জিপসীরা গান গায়:

আপন বলে জগৎ মাঝে
তোমার কিছুই নাই
নিঠুর ভুমি তোমার কোলে
হ'ল না মোর ঠাঁই।

ইতিহাসের কোন এক অতীত অশুভ দিনে একান্ত ইচ্ছাটা জেগেছিল টেখেনের মনে; টেখেন,—জিপসী রাজার ছেলে—গেনকে, হিন্দুরাজার মেয়ে যে জিপসী মায়ের কোলে বেড়ে উঠেছিল, চেয়েছিল বিয়ে করতে। সমাজে যে গেনের পরিচয় ছিল টেখেনের বোন বলে, তাই বোনকে ভাই কি করে বিয়ে করবে? এ যে অসম্ভব, অবাস্তব। টেখেনের প্রেম কিন্তু এইসব তুচ্ছ নিয়মতন্ত্রকে মানতে চাইল না—হৃদয় যখন একবার উথলে উঠেছে তখন কিসের বাধা। নীল চাঁদোয়ার নীচে সবুজঘাসের বুকে পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে বসে যার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে সে হারিয়ে ফেলেছে চারপাশের সব কিছুকে, বিস্রস্ত আবর্জনার স্তূপকে, তাকে সে কি করে ত্যাগ করবে? ত্যাগ সে কিছুতে করতে পারবে না. গেনকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না—তা যে যা বলুক, গেনকে তার চাইই চাই। টেখনের বাপ গত হয়েছে—হিন্দুরাজাও চোখ বুজেছে সেকেন্দরের সেনাপতির অতর্কিত আক্রমণে। প্রজাদের মধ্যে কানাকানি, ফিসফাস—তাদেরই একজন দূত হয়ে যায় সেকেন্দরের সেনাপতির কাছে বিচার প্রার্থনা করতে; সেনাপতি আইনকানুন নিয়ম আচার কিছুই আমল দেয় না—দূতের মাথা খসে পড়ে সেনাপতির তলোয়ারের কোপে। তারপর আসে জ্যোতিষী—মস্তবড় জ্যোতিষী। অভিশাপ কণ্ঠস্থ—বলে যায় এক নিঃশ্বাসে: তোমরা চিরকাল যাযাবর বৃত্তি পালন করবে—আমৃত্যু ঘুরে বেড়াবে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত; এক তাঁবুতে দুরাত্তির ঘুম হবে না তোমাদের, এক কুয়োর জল তোমাদের গলা দিয়ে নামবে না দুবার। সেই যে যাযাবর-বৃত্তি শুরু হয়েছে তার আর শেষ হয়নি—এক পথের ধুলো মুছে আর এক পথে পাড়ি দিয়েছে জিপসী পা—ঘুরে চলেছে তারা দেশ থেকে দেশান্তরে, পশ্চিম সীমান্ত থেকে মিশর, বুলগেরিয়া থেকে রুমানিয়া, রাশিয়া থেকে ইটালী, লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক, চিকাগো থেকে মেলবোর্ণের পথের প্রান্তে গড়ে উঠেছে জিপসী বসতি—বাঁধা হয়েছে তাঁবু, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে জিপসী পুরুষ তার হাতুড় বাটাল নিয়ে ছুতোরের কাজ করতে, মেয়েরা ব্যস্ত হয়েছে ঘরের কাজে, আশপাশের জনপদ লোকালয়ে ঘুরে ফিরে ম্যাজিক দেখিয়ে নাচ দেখিয়ে গান গেয়ে ও ভবিষ্যৎ গণনার কাজ করতে; রাত্রে পুরুষ বসেছে বেহালা নিয়ে, মেয়েরা গান গেয়েছে মিঠে সুরে:

দৃষ্টি তোমার ফেলল গিলে
হৃদয় আমার;
হারিয়ে গেলাম

মন ভোলান চোখের নেশায়
মাতাল হলাম ;
মাতাল হলাম
তোমার ওই মন ভোলান চোখের নেশায়।
হারিয়ে গেল
মাতাল হল
হৃদয় আমার।

সেই যে চলা শুরু হয়েছে আজও তার বিরতি নেই—আজও চলেছে সেই চলার নেশায় "জিপসী মন"—পাখী যেন নীল নীলিমায় ডানা ভাসিয়ে সব কিছু ভুলে গেছে—ঘর, বন্ধন, বিশ্রাম, কাজ, অধিকার—সব কিছু!

পণ্ডিতদের ধারণা: কোন জাতির জীবন আচারের সম্পর্কে ধারাবাহিক ধারণা নিতে হলে সেই জাতির লোককথা উপকথা লোকশ্রুতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। লোককথা তথা লোকাচার তথা লোকসাহিত্য লোকেরই সৃষ্টি—এই সব কথা, আচার, ছড়াগান হয়ত কোন পুঁথিতে রূপ পায়না, কিন্তু তাবৎ লোকের মুখে ফিরে ফিরে তা থাকে চিরসবুজ চিরনবীন—কালের কামড়ের জ্বালা সহ্য করে এ সব কাহিনী কথা নূতনত্ব সজীব রাখে আর দেখা যায় যে জাতির জীবনের অনেক আচার-আচরণই গড়ে ওঠে এই সব লোককথাকে কেন্দ্র করে। জীবনের আচার আচরণ যেমন লোককথাগুলির ভিত্তিমূল তেমনি এই লোককথাগুলিও সময় সময় জীবনের আচার আচারণকে গড়ে তোলে, রূপায়িত করে—করে সংশোধিত পরিবর্তিত পরিবর্ধিত। বাঙ্গালা দেশের বিয়েতে প্রচলিত 'কালরাত্রি" আচারটা মনে হয় মনসামঙ্গলের বেহুলা লক্ষীন্দরের কালরাত্রির স্মৃতিকে অবলম্বন করেই চালু হয়েছে। হয়ত এর পেছনে অন্যবিধ নিয়ম থাকতে পারে কিন্তু মনসা মঙ্গলের লোককাহিনী এই আচারকে বাঙ্গালী সমাজ-জীবনে অনেক বেশী দৃঢ়মূল করেছে সে কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায়। এইভাবে দেখা যায় যে অনেক জাতির আচারই প্রাচীন উপকথা কথকতা-ভিত্তিক রূপ লাভ করেছে। জিপসীদের রূপকথায় আছে যে, আদিতে ওরা ছিল পাখী। এখন ওদের যে পাখীর মত স্বভাব তা ওদের লোককথাকে অনুসরণ করছে, না ওদের লোককথা পাখীস্বভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা গবেষকদের গভীর অধ্যয়নের খোরাক জোগাবে; তবে আমাদের মনে হয় এর মূলে আছে একটা বিশেষ মনঃস্বভাব—অর্থাৎ ব্যাপারটা অনেকটাই মনঃস্তাত্ত্বিক, কেবলমাত্র বাহ্যিক ঘটনার ওপর নির্ভরশীল নয়।

সমাজতাত্ত্বিক নৃবিদ্যাবিদ্‌রা জীবন ধারণের একটা মৌলগুণ হিসেবে অভিযোজনের (adaptation) ইঙ্গিত দিয়েছেন,—এর অর্থ পরিবেশ পবিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। যে জাতি যতবেশী পরিমাণে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে সে জাতি জীবনসংগ্রামে তত বেশী পরিমাণ সফলকাম হয়েছে। বিশেষ বিশেষ জীবের মানস স্বভাব ও দেহস্বভাব বিশেষ বিশেষ পরিবেশ পরিপার্শ্ব ও পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের মানসিক বিকাশ ওই ওই বিশেষ ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের সুযোগ পায়। অন্তত পৃথিবীর সভ্য অর্দ্ধসভ্য এবং অসভ্য সমস্ত জাতি উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা গেছে যে অভিযোজনের সার্থকতাই তাদের জীবনবৃত্তে এনেছে একটা আনুপূর্বিক সুষমভাব—খাপ-খাওয়ানর প্রবৃত্তিই সৃষ্টি করেছে তাদের জীবনরঙ্গে সুস্মিত সৌন্দর্য। কোন কোন বিশেষ শিল্পী যেমন বিশেষ বিশেষ নাট্যশালা বা বিশেষ চরিত্র ছাড়া সুন্দর ও সার্থক অভিনয় করতে পারে না, জীবের জীবনধারণের ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব সেই রকম। প্রকৃতি পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী মানস স্বভাব গড়ে ওঠে অথবা দেখা যায় যে মানসস্বভাবের বিশেষ প্রবণতার জন্যই জীবের বাসস্থান নির্দিষ্ট ও পরিবর্তিত হয়। যাই হোক পৃথিবীর অধিকাংশ নরগোষ্ঠীর মধ্যেই বাসস্থানের ব্যাপারে একটা স্থিতিশীল স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কেবল জিপসী নামে খ্যাত বা অখ্যাত এই অদ্ভুত নরশ্রেণী ছাড়া। বেদুইনরাও যাযাবর, কিন্তু তাদেরও একটা সীমাবদ্ধ বিচরণ ক্ষেত্র রয়েছে—তারা আরবের প্রচণ্ড

উত্তপ্ত মরুবালুকার ওপর বেশ সুখে ও শান্তিতেই বসবাস করে। ভারতের দক্ষিণের কিছু আদিবাসী আছে যারা যাযাবর—"মালাপণ্ডারমরা" দক্ষিণ ভারতে যাযাবর জীবনযাপন করলেও তাদেরও নির্দিষ্ট বিচরণ ক্ষেত্র রয়েছে। "বেদুইন" কথাটার মধ্যেই আছে যাযাবর স্বভাবের ইঙ্গিত—কিন্তু জিপসী কথাটার মধ্যে ওই অর্থ যেন আরও ব্যাপক আরও গভীর। আজকের দিনে দেশে দেশে রাজনৈতিক সীমারেখার বেড়া উঠে যাবার কালে, সীমান্ত প্রহরীরা বেশী সচেতন হওয়ার ফলে হয়ত একদেশের জিপসী সহজেই আর এক দেশে যেতে পারে না—তবুও দেখা গেছে যে কোন এক বিশেষ ভুখণ্ড, বিশেষ জলবায়ু, ওদের প্রলুব্ধ করতে পারেনি, ওরা চায়নি কোন বিশেষ আকাশের নীচে বিশেষ মাটির ওপর ঘর বাঁধতে—ঘরের মায়া ওদের কিছুতেই টানতে পারে না, পারে না বেঁধে রাখতে; দুচারদিন বাস করলেই ঘরের মায়া যায় টুটে, পুরাতনের জীর্ণতা ওদের দীর্ণ করে—ফুরিয়ে যাওয়া অতীতকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে ওরা একেবারে চায় না—ওরা ক্লান্তি চায় না, চায় গতি। ঘর তাই ওরা ছাড়বেই, পথ তাই ওরা চলবেই। কোন বিশেষ ভুখণ্ডের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাস করার প্রবৃত্তিতে ওদের স্বভাব-অনীহা। আমাদের মনে হয় "জিপসী" যেন একটা মানসস্বভাব—যে স্বভাব যখন যেখানে তখন সেখানের সঙ্গে ঝটপট মানিয়ে নিতে পারে কোন বাধা হয় না, হয়ত কোন জায়গায় বাধা পড়লেই জীবনের স্বাভাবিক গতি যাবে হারিয়ে। পাখীকে খাঁচা কি কি কখনও ভাল রাখে? তার স্বাধীন সঞ্চরণ, ডানা-ভাসাবার নীলনভোতলই শ্রেয়, খাঁচার তথাকথিত নিরাপত্তার চেয়ে, পৃথিবীর অন্যান্য মানুষকে যেমন বিশেষ বিশেষ স্থানের জলহাওয়া তার জীবনচর্চা ও জীবনচর্যায় সাহায্য করে, জিপসীদের কাছে যেখানে সমস্ত বিশ্বই বিচরণক্ষেত্র—উষ্ণশীতল তরুভূমি মরুভূমি ওদের কাছে সবই সমান, শহরপল্লী কোন তাতেই ওদের আপত্তি নেই —আপত্তি কেবলমাত্র বন্ধনে, আপত্তি পরাধীনতায়, আপত্তি জীর্ণতায়, আর আনন্দ,—আনন্দে নিবন্ধন পদ-যাত্রায়, নিরলস কর্মভাবনায়, নিঃসীম জীবনভোগে। এই মানসভাবকেই আমরা "জিপসী মন" বলতে চাইছি—যে মন চরম আসক্তি ও পরম নিরাসক্তির মধ্যে রচনা করেছে সেতু; আজ যা পেয়েছে, হাতের কাছে রয়েছে তা মন ভরে উপলব্ধি করতে ওদের জুড়ি মেলা ভার, আর সেই আজকের প্রতিশ্রুতিই কালকের চাকচিক্যের প্রতি একটা নির্মম নিরাসক্তি এনে দেয়।

(২)

এই যাদের মনোবৃত্তি পণ্ডিতমশাইরা কিন্তু তাদের অত সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নন। তাঁরা বলেন; মানসস্বভাবই বল আর যাযাবর-বৃত্তিই বল একটা আস্তানা নিশ্চয়ই ওদের ছিল একদিন যেখানে ওরা প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিল। বস্তুত 'আর্যসমস্যা" (আর্যজাতির আদিমতম নিবাসভূমি সম্পর্কে) নিয়ে যে কৌতূহল এবং গোলকধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে 'জিপসী সমস্যার" কৌতুহল তার চেয়ে কম নয়। জিপসীদের আদিনিবাস নিয়ে নানাদেশের পণ্ডিত-সমাজ কিছু কম গবেষণা করেন নি, এ গবেষণার বিরতি এখনও ঘটেনি—হয়ত তা হবেও না; কিন্তু আশ্চর্য এতে জিপসীরা কিছুমাত্র লাভবান হবে না—তারা যে যাযাবর সেই যাযাবরই থেকে যাবে।

ঐতিহাসিক' সমাজতাত্ত্বিক, নৃ-বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক —প্রায় সকলেই জিপসীদের "জাতি" ও নিবাসভূমি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং করছেন। সংগৃহীত জিপসী শব্দ তালিকা বিচার করে, ধ্বনিবিজ্ঞানের রীতি পদ্ধতি অনুসারে তাঁরা জিপসীদের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা পাচ্ছেন। তবে অধিকাংশ গবেষকদের ধারণায় জিপসীরা আদিতে ভারতের অধিবাসী ছিল বলে স্বীকৃত হয়েছে।

মধ্যযুগের ইতিহাসে জিপসীদের উল্লেখযোগ্য উল্লেখ আছে। পণ্ডিতদের মধ্যে একদলের ধারণা যে আদিতে ওরা ছিল ভারতের বাসিন্দা—এই জিপসীরা জাঠ বা জুঠ বা হিন্দুজাত্যাচারের নিম্নবর্ণ শূদ্রদের স্বজাতি। আবার অন্য মতে; আদিতে ওরা ছিল মিশরে, অনেকের ধারণা ইজিপ্ট শব্দের স্মৃতি ওদের নামের পেছনে লুকিয়ে আছে। সে যাই হোক ওরা যে একদিন স্থানকালের গণ্ডি ভেঙ্গে দুর্বার বেগে বেরিয়ে পড়েছিল তাতে আর কারও সন্দেহ নেই। কবে সেই মহাযাত্রা শুরু হয়েছিল এবং কি ভাবেই বা সেই যাত্রার গতিপথ নির্দ্ধারিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা আজও সম্ভব হয় নি। কেউ বলেছেন আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর, কেউ বলেছেন তৈমুরের বিজয়াভিযানের সময়। ইজিপ্টকে জিপসীদের আদি নিবাস যাঁরা মনে করে তাঁরা তাদের যুক্তিকে সমর্থন করবার জন্য ফরাসী লেখক রোচের বই Les Paris de France A d' Espagne" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, তাতে আছে: রবিবার, ১৭ই আগষ্ট, ১৪২৭ খ্রী: প্যারী নগরীতে ডজন-খানেক মধ্যযুগীয় নাইট বেশধারী অশ্বারোহী হাজির হয়।

তারা তাদের দক্ষিণ ইজিপ্টে বসবাসকারী খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দেয়। তাদের খ্রীষ্টান-ধর্মের সর্বেসর্বা পোপের অনুমতি আনতে পাঠান হয়। এই দলের পেছনে যে নরনারীর দল ছিল তারা লেখকের ভাষায়ঃ লোকগুলি অসম্ভব রকমের কালো, কোঁচকানো কালোচুল ওদের মাথায়, মেয়েরা অসভ্য পোষাকে, চোখে মুখে নোংরামি ভরা—ওরা মানুষের ভাগ্য গণনা করবার কৌশল জানত। যাই হোক পোপের কাছে ওদের সুবিধা হয় নি। কিন্তু কথা হল দক্ষিণ ইজিপ্টের একদল লোক থেকে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ জিপসী সৃষ্টি হল, তাই বা কি করে মানা যায়। তা ছাড়া এর আগেও জিপসীরা সশরীরে অখ্রীষ্টান অবস্থায় ডানিয়ুব অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস করে এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন এই অঞ্চল থেকেই জিপসীরা পূবপশ্চিমে পাড়ি দিয়েছিল। আরব বৃত্তান্তে জিপসীদের বৃত্তি, স্বভাব স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এও জানা যায় যে সিন্ধুনদের পাশে বসবাসকারী পশুপালনকারী জিপসীদের বাগে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

যে কোন জাতির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে গেলে সেই জাতির ভাষা সম্পর্কে পরিষ্কার পরিচয় থাকা আবশ্যক। ভাষা জাতির জীবনবেদেরই প্রকাশ রূপ। ভাষার রূপ বিশ্লেষণে সেই জাতির আচার ব্যবহার, পছন্দ অপছন্দ, আসক্তি নিরাসক্তি ভাব-প্রত্যয় গৌরব অবক্ষয়—প্রায় সব কিছুর সম্পর্কেই ধারণা করা চলে। জর্জ বারো, উলিক প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা জিপসী ভাষা সম্পর্কে গভীর গবেষণা করেছেন। তাঁরা জিপসী ভাষার সঙ্গে ভারতের সংস্কৃত-সংস্কৃতজাত আর্যভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে উভয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। জর্জ বারোর মতে জিপসী শব্দভাণ্ডারে যে ৩,০০০ এর ওপর শব্দ আছে তার অধিকাংশেরই মূল পাওয়া যাবে সংস্কৃতে এবং সাম্য পাওয়া যাবে আধুনিক ভারতীয় ভাষা হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাথী, সিন্ধীর সঙ্গে। নীচের তালিকায় চোখ বোলালেই সাদৃশ্যটা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

জিপসী	ভারতীয়	বাঙলা
কাষ্ঠ	কাষ্ঠ	কাঠ
পানি	পানি	জল, পানি।
সিঙ্গারা	সিঙ্গারা	পানিফল
বিহা	বিহা	বিবাহ, বিয়ে
ভুখ	ভুখ	ক্ষুধা।
দুখ	দুখ	দুঃখ।
কাক (অ)	কাকা	কাকা।
জি (আ) গ	আগ	আগুন।
জিব, ছিব	জিব	জিব।
গাব	গাও	গ্রাম।
দাঁত	দাঁত	দাঁত
দুধ	দুধ	দুধ।
দেবতা	দেবতা	দেবতা
মাঙ্গা	মাঙ্গা	চাওয়া।
মানুস	মানুষ	মানুষ।
রাজা	রাজা	রাজা।
মুত্র	মুত্র	প্রস্রাব।
ছুরি	ছুরি	ছুরি।
শুন	শুন	শোন।

ক্রিয়াবাচক শব্দঃ

যায়	আমি যাই।
আছে	আমি আছি।
মরে	আমি মরি।
দেখে	আমি দেখি।
লে	আমি নিই।

সরল বাক্যের রূপঃ

কই তেরো কের	কোথায় তোমার ঘর।
কই সে ছুরি	ছুরিটা কোথায়।
মেরো কের ইণ্ডিয়া	আমার দেশ ভারত।

সংখ্যাবাচক শব্দঃ

এক	এক
দুই	দো
ত্রিন	তিন
শ্তৌর	চার
পাঞ্চ	পাঁচ
নু	নঅউ
দশ	দশ

২০কে ওরা বলে দুবার দশ, ৫০কে পাঞ্চ বার দশ ইত্যাদি।

পণ্ডিতরা একমত না হওয়া পর্যন্ত গবেষণা চলতে থাকুক ; উপরের তালিকা সম্পর্কে আমরা কোন উক্তি করতে চাই না—শুধু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি শব্দ-ভাণ্ডারের ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে। জীবন-আচারেও জিপসীরা অনেকখানি হিন্দুদের সমধর্ম। প্রাচীন হিন্দুদের বিবাহে স্বয়ম্বর প্রথার যে প্রচলন ছিল জিপসীদের বিয়েতে তা বর্তমান। হিন্দু বিবাহে বর কনের মাথায় চাল ছড়িয়ে দেওয়ার আচার জিপসীদের মধ্যে চালু আছে। সন্তান জন্মাবার আগে জিপসীরা একটা আচার পালন করে—অনেকটা আমাদের সমাজে প্রচলিত সাধভক্ষণ আচার জাতীয় ব্যাপার। হিন্দু শ্রাদ্ধাচারের মত জিপসীরাও একটা মৃতাচার পালন করে থাকে। রামায়ণ কাহিনী জিপসীদের পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের একটা ভক্তিমূলক স্থান জিপসীদের মধ্যে রয়েছে—গোপীনৃত্য জিপসী নৃত্যাঙ্গিকগুলির অন্যতম। জিপসীরা পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের স্মৃতিরক্ষার্থে নানা আচার উৎসব পালন করে থাকে। ওরা মৃতাচার অনুষ্ঠানে আমাদের শ্রাদ্ধের মত ভোজের আয়োজন করে। সন্তানের প্রতি মায়ামমতা এবং সন্তানজন্মে উচ্ছ্বসিত জিপসীমানস হিন্দুমানসের সঙ্গে ঐক্যদৃষ্টি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের জিপসীদের ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। বুলগেরীয় জিপসীদের বলা হয় "গুপ্ত", স্পেনীয় জিপসীদের বলা হয় "গিটোনিশ", ফরাসী দেশের জিপসীদের বলা হয় "বোহেমিয়ান" কেননা ফরাসীদের ধারণা যে ওরা বোহেমিয়া অঞ্চল থেকে এসেছে। তা সে যে যাই বলুক জিপসীরা, সে যে কোন দেশেরই হোক, কখনও নিজেদের ওই সব নামে ডাকে না, পরিচিতও করে না নিজেদের ওই সব নামে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ওদের জাত হলেও ওরা ওদের "রোম" বলেই পরিচয় দেয়, আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় নিজেদের বিশেষ ভাষার ব্যবহার করে যার কিছু পরিচয় আমরা উপরে দিয়েছি। ওদের মধ্যে প্রচলিত "রোম" কথাটার উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে একজন গবেষক বিষ্ণুর অবতার "রাম" শব্দটির উল্লেখ করেছেন—তাঁর ধারণা যে ওরা কোন সময় "রাম" নামক দেবতার পূজা করত।

জিপসীদের কাছে তাদের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যাবে :

মনদে হে দদেসক্রো বাট—আমার একটি প্রিয়পিতৃভূমি আছে।

মেরো কের ইণ্ডিয়া—আমাদের দেশ ইণ্ডিয়া।

জিপসীদের স্বাজাত্যবোধ একটু বেশী রকমের।

হাজার বছরের ওপর ওরা নিরন্তর ফিরে চলেছে পৃথিবীর পথে ;—কাব্যের ভাষা যেন ওদের সম্পর্কে সুন্দর ভাবে ব্যবহার করা চলে। জিপসীরা যেন বলছে : "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে", আরব সাগরের তীরে নিশীথের অন্ধকারে আমি পথ চলেছি—পার হয়ে এসেছি হারানউলরসিদের বাগদাদ, পেরিয়ে গেছি সিরিয়া প্যালেষ্টাইন, চলেছি অনন্ত যাত্রা-পথে—শেষ নেই আমাদের গতির, আমাদের পদযাত্রার। সভ্যতার বোঝা বয়া মানুষের দল বার বার ভেবেছে এবার বুঝি জিপসীদের পথ চলা শেষ হবে, বুঝি এবার ওরা স্থায়ী হবে, ঘর বাঁধবে—স্থির হবে জীবনক্ষেত্রে ; কিন্তু না, জিপসীদের পথের শেষ নেই, বিশ্রামেরও সময় নেই, নেই সংগ্রামেরও শেষ। ১০০০ বছর আগের কোন এক জিপসীদলকে দেখে লোকে ভেবেছিল এই বুঝি শেষ জিপসী বংশধরেরা, পাঁচশ' বছর আগে ফরাসী ইংরাজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল তাদের সামনে শেষ জিপসীর দলকে দেখেছে বলে। চার্লস লেলগু ত' বলেই ফেলেছিলেন যে শেষ জিপসীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে—কিন্তু সারা পৃথিবীর জিপসী সুমারীতে ওদের সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে কোটিতে ওঠবার জোগাড়। পাঞ্জাব থেকে প্যারিস, ইংলণ্ড থেকে চিকাগো, নিউইয়র্ক থেকে মেল-

বোর্ণ—সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ওরা। জিপসীরা নিজেরাই বলে: শেষ জিপসী দেখা যাবে যখন আমরা আবার ভারতে ফিরে যাব জরাজীর্ণ ধ্বংসীভূত পৃথিবীকে পথের প্রান্তে রেখে—আমরা আবার ভারতে যাব ফিরে।

জিপসীদের জন্মস্থান হিসেবে ভারতের উল্লেখ, ভারতের প্রতি ওদের আন্তরিক টান এবং ভারতকে যে ওরা শেষ বাসস্থান হিসেবে দেখে—এই কথাগুলি নিয়ে আমরা সামান্য কিছু আলোচনা করলাম। তবে যতদিন পর্যন্ত কোন রকম স্থির সিদ্ধান্তে না আসা যায় ততদিন গবেষণা চলবে। তা চলুক—চলুক তাদের আদি ভারতীয় বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা, ভাষাতাত্ত্বিক সামাজিক সাংস্কৃতিক, নানা দিককার আলোচনা সমালোচনা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এতে আলোচক সমালোচকের লাভ ক্ষতি যাই হোক জিপসীদের এতে কিছুমাত্র আসে যায় না। তার কারণ তাদের যে মানসস্বভাবের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় উৎসের সম্পর্কে দু এক কথা বলার প্রয়াস পেলেও আমরাও আনন্দিত হব জিপসীদের তথাকথিত স্থির স্বভাবের মানুষ হিসেবে না দেখে চিরচলমান চিরগতিময় প্রাণচঞ্চল সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করে।

সব মানুষের মত জিপসীদের জীবনেও একটা স্থায়িত্ব একটা ধরের বন্ধন আনবার জন্য অনেক চেষ্টা করা (ও) হয়েছে, বিশেষতঃ আমেরিকায় এ চেষ্টা চলেছে সবচেয়ে বেশী। হয়ত কিছুক্ষণের জন্য কোন কোন জিপসী-দম্পতী তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে একটা আস্তানা গাড়বার চেষ্টা করেছে—সভ্যতার তালে তাল ফেলে চলবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। স্বামীকে অফিসে পাঠিয়েছে, ছেলেমেয়েকে স্কুলকলেজে পাঠিয়েছে, স্ত্রী নিজে স্থায়ী বাসস্থানের চারপাশ গুছিয়ে সাজিয়ে বসবার উপক্রম করেছে। কিন্তু সে আর ক'দিন—মন আর ক'দিন বন্ধন মানে? আবার সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, পড়ে আছে অফিসের নথিপত্র, ক্লাসের লেখাপড়া আর অগ্নিহীন চুল্লী, বাসনকোসন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—ছাড়িয়ে গেছে বন্ধন, বেরিয়ে পড়েছে পথে। আর কি করেই বা ওরা বাঁধা পড়বে সভ্যতার গারদখানায়। শুধু কি মন? দেহও যে সয়না। কোনার্ডের ভাষায় বলতে হয়:

"The greater number of deaths from tuberculosis among the Gypsies of Chicago was due primarily to the attempt to settle in one place. The old story Caging Swallows"

বাবুইকে কি আর খাঁচায় বাঁধা যায়?

তবে ওরা ওদের নিজেদের জগতে অশিক্ষিত নয়, অমার্জিত নয়, অসভ্য নয়। সভ্যতার চশমা পরে দেখলে হয়ত ওদের মনে হবে অসভ্য, অশিক্ষিত—কিন্তু এই অশিক্ষা ওদের জীবনে শাপে বর, ওদের জ্ঞান পুঁথির অক্ষরের বাইরে জীবনের আলোর রাজ্যে, প্রকৃতির বুকের প্রতিটি স্পন্দনের অর্থ ওদের পরিচিত আর সে-জন্যই ওদের সম্বন্ধে একটি বিশেষণই ব্যবহৃত হতে পারে! তা হল: ওরা সুখী। এ সুখ যে কী তা গদ্যের ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না—পাওয়া যাবে অক্সফোর্ড-পালান সেই যুবকটির জিপসীলোকে প্রস্থানের গাথা-কাহিনীতে যার আরও মার্জিত ও সংস্কৃত রূপ পাওয়া যাবে ম্যাথ্‌আর্নল্ডের "স্কলার জিপসী" কবিতায়। তাই যদি কোন শহুরে সভ্যতাগর্বে স্ফীত অভিমানী জিপসীদের দেখে অসভ্য নোংরা বর্বর বলে নাসিকাকুঞ্চন করে তবে তৎক্ষণাৎ সে উত্তর শুনবে "হ্যাঁ, সবই সত্য, কিন্তু আমরা সুখী। তোমাদের সভ্যতার জ্বালা বা ঝামেলা কোনটাই আমাদের বিব্রত করতে পারে না। তোমরা সভ্য, শিক্ষিত, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন কিন্তু অসুখী। আর অজ্ঞতার কথা যদি বল তবে তার উত্তর হল এই যে, আমরা যা জানি তা তোমাদের ক্ষুদে অক্ষরের বইয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে না. তোমরা তোমাদের যতটা চেন আমরা তারচেয়েও ঢের বেশী তোমাদের জানি।' কিন্তু জ্ঞানের যত বড়াই করি না কেন সুন্দরী জিপসী তন্বীর যাদুবিদ্যার সামনে আমরা মূঢ় বিস্মিত—সময় সময় যাদু ভুলে সভ্যচোখ তন্বীর দেহেরই চারপাশে বেড়ায় ফিরে। চেষ্টারও ব্যত্যয় ঘটে না জিপসী মেয়ের পানি পাবার—কিন্তু কি হাস্যকর বোকামি মার্জিত পৌরুষের! নীলপাখীর উজ্জ্বল আকাশ আর জিপসী মেয়ের বন্ধনহীন স্বভাব আজন্ম স্বাতন্ত্র্য নিয়েই লালিত ও বাঞ্ছিত। জিপসীরা জানে যে, কালের গতি কুটিল, কালের কামড়ে ক্ষয় অনিবার্য—শূন্যতার ধ্বনি বেরিয়ে আসছে নগ্নাসুন্দরী ধরিত্রীর বুক থেকে—মাঝে সামান্য কটা দিন কেবল ভালবেসে নেবার। তাই সঞ্চয় করে কি লাভ যখন সবই "সিন্ধুমূলে জলবিন্দু বিশ্বমূলে অণু," কিন্তু সিন্ধু অগাধ বিশ্ব অপার পথ অনন্ত। জিপসীরা জীবনের এই দার্শনিক তত্ত্ব আয়ত্ত করেছে দর্শনের পাণ্ডুলিপি না পড়েই—ভালবেসেছে আজকের সাফল্যকে, ভুলে গেছে অতীতের অপচয়কে, ভবিষ্যতকে গ্রহণ করেছে নির্মোহ-ভাবে। দিনের আলোয় মিছিল চলেছে একদল

মানুষের—মুখগুলিতে ভালবাসার বিকশিতকান্তি, দেহে কর্মের তৃপ্তি, চোখে রহস্যের নেশা—পথ চলেছে জিপসী নারীপুরুষ, কত গ্রাম কত নগর পেছনে পড়ে থাকছে ঠিক নেই, টুকরো টুকরো হাসি ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আশপাশে সভ্য মানুষদের ওপর। রাত নামল চাঁদের টিপ জ্যোৎস্নার চাদর জড়িয়ে—গাড়িগুলো থেমে গেল, কুকুরগুলো আস্তানা নিল মুলো শুঁকে শুঁকে, নারী-পুরুষ একটু গুছিয়ে নিয়ে বসল আরামে, তৃপ্তিতে ঘুম নেমে আসছে চোখের পাতায়, গানের সুর উঠছে ভেসে—

হে প্রিয়, সব কিছু মোর দিলেম তোমায়
তোমার তরে দিলেম আমার গোপন ভালবাসা
আমার সাধের ভালবাসা।

ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষুদ্র চন্দননগর শহর যা বহুকাল ধরে বাংলাদেশে ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়ে এসেছে সেখানে আজ একবছর হল একটি ফরাসী সংস্কৃতি-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই ব্যবস্থা শুধু শোভন নয় সঙ্গতও, তাই একে স্বাগত জানিয়েছেন চন্দননগরবাসীরা। চারিদিকে বিশাল ব্রিটিশ-ভারত বেষ্টিত ক্ষুদ্র এই ফরাসী-শাসিত সহরের পৃথক রাষ্ট্র-নৈতিক পরিবেশের দরুন এখানে গড়ে উঠেছে একটা পৃথক সত্ত্বা, তাই এখানকার সাংস্কৃতিক ধারাও একটু বিশিষ্টপূর্ণ। একদিকে যেমন মানুষ অতীতের মধুর স্মৃতি সহজে ভুলতে চায়না তেমনি আবার ইতিহাস ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক হওয়ায়, সংস্কৃতিকে কেউ সহজে ভুলে যেতে পারেনা। সহরবাসীরা ফরাসী শাসনমুক্ত হওয়ার সময় থেকেই একথা ভেবেছিলেন, তাই ফরাসী-ভারত হস্তান্তর চুক্তিতে এবিষয়ে একটা ধারা গ্রহণ করা হয়। চুক্তির সর্ত্ত-অনুযায়ী এখানে ফরাসী-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল। কিন্তু সে কথা মেনে চলার ব্যবস্থা করতে বেশ সময় অতিবাহিত হয়, ফলে সহরের অনেকেই বেশ উদ্বেগের সঙ্গে সরকারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। সরকারও চুক্তিবদ্ধ অনেক সর্ত কার্যে প্রয়োগ করতে অবহেলা করে চলছিলেন। অবহেলিত সর্ত্তের মধ্যে সংস্কৃতি-কেন্দ্র স্থাপন একটি অন্যতম বিষয় হওয়ায় সাধারণের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ১৯৫২ থেকে ১৯৬৩ পর্য্যন্ত বরাবর চলে এসেছে। ভারতে বা পশ্চিম বাংলায় এসে কি পেয়েছি বা কি পাইনি এ নিয়ে একটা অসন্তোষ অনেকের মনে দেখা দেয়। তাই সহরবাসীদের পক্ষ থেকে চুক্তির এই সর্ত্তকে কার্য্যকরী করার জন্য চেষ্টা চলতে থাকে।

এইভাবে চেষ্টা করতে থাকায় অবশ্য পশ্চিমবাংলা সরকার থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়না কারণ চুক্তি পালনের দায়িত্ব তাঁদের নয়। পরে ফরাসী-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তখন ভারত-সরকার এই প্রস্তাব নীতিগতভাবে নিজেদের দায় বলে স্বীকার করেন এবং সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নতুনভাবে অনুমোদন করেন ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে। কিন্তু ঠিক এতেই সাংস্কৃতিক-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলনা।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বিষয় আলোচনা চলতে থাকে আরো কয়েকমাস ধরে। ঠিক এই অবস্থায় ভারত ও ফরাসীদের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে। এই বিবৃতিতে আগেকার চুক্তির ধারাকে নতুন করে স্বীকার করে নেওয়া হল। কিন্তু সংস্কৃতি-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হল সেটি হচ্ছে ভারত-ফরাসী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতার কার্য্যসূচি। এখানে বলা দরকার যে পণ্ডিচেরীতে এই ধরণের একটি কেন্দ্র বরাবর থেকেই চলেছে।

এই ধরণের সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক বা কারিগরী সহযোগিতায় অগ্রসর হওয়া ফরাসী জাতির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা একটু আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। ভারত স্বাধীন হয়েছে কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এগিয়ে যেতে পারেনি, তাই তার নানারকমের সাহায্য দরকার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখনও এদেশ অনেক দেশের খুব সহজ শীকার। এছাড়া আছে, অল্প-অগ্রসর দেশ হিসাবে উন্নতির শীর্ষস্থানে আসীন জাতি সমূহের কাছে অভিভাবকের এত ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী অবস্থা। সমগ্র বিশ্বের সদ্য রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র লাভ করা সব দেশেরই অবস্থা ভারতের মত প্রায় একই ধরণের। আজ দেখতে পাওয়া যায় যে, যে কোনও অগ্রসর দেশই

অপর কয়েকটি কম অগ্রসর দেশের অভিভাবক হতে বা আন্তর্জাতিক স্তরে নেতৃত্ব করবার একটি দুর্নিবার আকাঙ্খা এদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ভারতের স্বাধীনতার পর ইংরাজ, আমেরিকা, রাশিয়া, ও পশ্চিম জার্মানি এরা সবাই অনেক দিনই কারিগরী সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। এমন কি খুব দেরীতে হলেও জাপান, যুগোশ্লোভিয়া পূর্ব্ব-জার্ম্মানী ও চেকোশ্লোভিকিয়া এঁরাও সহায়তার হাত এগিয়ে দিয়েছেন।

আর একটা বিষয়ও বলা দরকার, বিশেষ এইসব পাশ্চাত্ত্য দেশের বিচিত্র ধরনের মনোভাব। এরা অনেকেই কোনও দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রযুক্তি-বিদ্যা বা প্রয়োগ-শিল্পে যেমন সহায়তা করেন তেমনি আবার সে দেশকে অগ্রসর হতে সহায়তা করছেন তারই শত্রু-রাষ্ট্রকে আনবিক অস্ত্র, যুদ্ধ-বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে এঁদের বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ দেখা যায় না। তাই একথা কারও কাছে নতুন নয় যে ফরাসী জাতি ঠিক এই ধরণের একটি জাতি। ভারতের কল্যাণ হোক বা ভারতের শিল্পে, বাণিজ্যে অগ্রসর হোক এটাও যেমন এঁরা আশা করেন তেমনি ভারতের শত্রু-রাষ্ট্রকে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে বিপদগ্রস্ত করতে এঁরা কুণ্ঠিত নন। তবে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কেন তাঁদের ভারতের প্রতি এই ধরণের সহায়তার উদার হস্ত প্রসারিত করা। এর উত্তরও সহজ, কারণ আরও কয়েকটি দেশ যখন ভারতের অভিভাবকের ভূমিকা নিয়েছে তখন ফরাসী দেশ যদি পিছিয়ে থাকে তবে আন্ত-র্জাতিক স্তরে নেতৃত্ব পাবার কোন সুযোগই থাকে না। তাই ভারতীয় ছাত্র আকর্ষণ করা কারিগরী সহায়তার উৎসাহ দেওয়া বা শিল্প-বিজ্ঞানে এগিয়ে দেওয়ার কাজে ফরাসীরা এগিয়ে এলেন। আর সেইভাবে চিন্তা করতে গিয়েই তাঁদের মনে পড়ল চন্দননগরের প্রায় ভুলে-যাওয়া চুক্তির বিষয়।

সেইজন্যেই চন্দননগরবাসীরা লক্ষ্য করলেন যে, চুক্তির ধারার উপর ভিত্তি করে একটা নতুন বিষয় জুড়ে দেওয়া হল। আর সেটি হচ্ছে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক সহায়তার বিষয়।

সংস্কৃতি-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার কাজ দিনে দিনে এগিয়ে চলতে লাগল, আর এর জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হল পূর্বতন ফরাসী-প্রশাসক ভবন। পূর্ব্বতন ফরাসী-শাসিত এলাকা হওয়ায় ফরাসী-সংস্কৃতির পূর্ব্বাঞ্চলীয় কেন্দ্র হিসাবে একে গড়ে তোলা হতে থাকল। ফরাসী সরকারের উদ্যোগে ভারত-সরকার বা পশ্চিমবাংলা-সরকারও সহায়তার হাত এগিয়ে দিলেন। অনেক দেরিতে হলেও এর প্রয়োজন ছিল।

এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রের নাম দেওয়া হল ফরাসী ভাষায়—Institut de Chaerdernagore'—"আসতুত্যুৎ দে শন্দরনগর।" কেন্দ্রের কার্য্যক্রম অনুযায়ী সংগ্রহশালা, পাঠাগার, চারুকলা প্রভৃতি বিভাগকে সযত্নে গড়ে তোলা হতে থাকল, আর এইসব শাখাকে আরও পূর্ণাঙ্গ করে তোলারও চেষ্টা চলতে থাকল। এর প্রথম কার্য্যপদ্ধতি হিসাবে ফরাসী ভাষা শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হল। কিন্তু এতেও স্থানীয় অনেকের ক্ষোভ মিটলনা। খুব সঙ্গত কারণেই তাঁদের মন থেকে অতীতকে হারিয়ে যাওয়ার বেদনাকে মুছে ফেলা গেল না।

গত বৎসর জুন মাসে (১৯৬৬) নূতন পদ্ধতি যাকে 'Direct method' বলা হয় সেই পদ্ধতিতে ফরাসী ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন রেভারেণ্ড ফাদার দাঁতে (Dante) স্থানীয় ফরাসী ভাষাবিদ ভদ্রমণ্ডলী ছাড়াও এই সভায় স্বাগত জানাতে এলেন কলকাতার ফরাসী কন্সাল অফিসের সাংস্কৃতিক সদস্য।

বিদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে যে বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও অপরাপর বিষয়ে পাঠ ও গবেষণার কাজে কি রকম সাহায্য করে সে বিষয়ে অনেকেই বক্তব্য রাখলেন। আর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে পুরাতন পদ্ধতিতে ফরাসী ভাষা পড়ানর ব্যবস্থা কতখানি অসুবিধা সৃষ্টি করে সেই বিষয়েও আলোচনা হল। কেন্দ্রে প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থীও আসন নিলেন। এইভাবে ক্রমে মনে হতে লাগল যেন ক্ষুদ্র একটি ফরাসী সংস্কৃতি নতুন করে জন্ম নিল এই চন্দননগর শহরে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় ফরাসী

ভাষামোদি ছাড়া শহরের অনেকেই মন থেকে হতাশার ভাব মুছে ফেলতে পারলেন না।

কেন্দ্রের কার্য্যকলাপ দেখে যিনি আজীবন পরিশ্রম করে এখানকার সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলেছেন সেই অতি বৃদ্ধ শ্রীহরিহর শেঠও ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর মতে সংগ্রহ-শালার জিনিষপত্র ভালভাবে সাজিয়ে না রেখে কেবল ফরাসীভাষা শিক্ষাকে প্রধান্য দেওয়াটা সমীচীন নয় এ ছাড়া চন্দননগরের বাহিরের কোন জিনিষ এখানে রাখাও উচিত নয়। চন্দননগরবাসী অনেকেই এই ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একই হতাশার সুর ধ্বনিত হল জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কণ্ঠে। তিনি তাঁর বাণীতে বললেন—"চন্দননগর ও তার নিকটবর্ত্তীস্থানে ২৫০ বছরের ফরাসী-শাসনের এবং এই শাসনের দরুণ প্রভাবের নানা রকমের সাক্ষ্য আজও বিদ্যমান, যদি ভারতীয় ইতিহাসের এই অধ্যায়কে অবহেলা করা হয় তাহলে ভারতীয় সভ্যতার উপর ফরাসী প্রভাবকে অবজ্ঞা করা হবে।"

ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা থাকায় জাতীয় অধ্যাপকের এই যুক্তি অকাট্য বলে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। কারণ অতীত সংস্কৃতিকে ভুলে যেয়ে ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারেনা। তাই প্রয়োজন আছে এই-কেন্দ্রের অপরাপর শাখার সঙ্গে ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণার কাজে সহায়ক একটি পূর্ণাঙ্গ ভারততত্ত্ব গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। যার প্রয়োজনীয়তা সহরবাসীরা অনেকেই স্বীকার করেন।

এই কেন্দ্রে যে ফরাসী ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে এবিষয়ে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। প্রায় ২০০ বছর আগে ফরাসী ভাষার মাধ্যমে ছাড়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা চলবেনা এই সরকারী আদেশকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬১ সালে সদ্য হস্তান্তরিত ব্রিটিশ এলাকায় গড়বাটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর উদ্যোক্তা ছিলেন ফরাসী এলাকার অধিবাসীরা। এর কারণ হচ্ছে এই যে ফরাসী ভাষা শিখলে ব্রিটিশ ভারতের রুজি-রোজগারের সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হত না। আবার ফরাসী এলাকাতে সুযোগ খুবই কম ছিল। শুধু শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে চন্দননগরে পড়াশুনা করা অসুবিধা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ-ভারতের কলেজের উপর নির্ভর করতে হত অথবা পণ্ডিচেরি যেতে হত। এ অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। কারণ ফরাসী স্কুলে পড়ে হুগলী কলেজে পড়তে অনেক অসুবিধা দেখা দিত। তাই সমগ্রভাবে শাসকদের ভাষা এখানে খুব আদর লাভ করতে পারেনি। শুধুমাত্র শাসক-মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহল ব্যবহারজীবি এই ধরণের মুষ্টিমেয় অধিবাসীরা এই ভাষা শিক্ষায় আগ্রহ দেখাতেন।

ফরাসী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ভারত-সরকার ক্ষমতা দখল করার পর দুবছর চলেছিল কিন্তু পরে আর চালান সম্ভব হল না। কারণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থী উভয় মহল থেকেই হতাশার ভাব দেখা গেল। ফলে শিক্ষাকেন্দ্র তুলে দেওয়া হল।

এই ভাষা শুধু অতীতেই বন্ধ হওয়া নয় বর্ত্তমানেও এই ভাষা যে খুব আদর লাভ করেছে এমন কথা স্বীকার করা চলে না। ফরাসী ভারত চুক্তি (১৯৫২) অনুযায়ী যে বিশেষ সুবিধা চন্দননগরের ছাত্রদের দেওয়া হয়েছে সে-সুযোগও অনেকেই গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী এই শহরের যে কোনও ছাত্র সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে ফরাসী ভাষা নিয়ে যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চমান পর্য্যন্ত পড়বার সুযোগ পায়, এমনকি প্যারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠও এর অন্তর্ভুক্ত। এমন আকর্ষণীয় সুযোগ কিন্তু খুব মুষ্টিমেয় ছাত্রই গ্রহণ করছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে ফরাসী ভাষার আদর এখানে খুব বড় রকমের নয়।

ভাষাশিক্ষা কেন্দ্র যেটি খোলা হয়েছে তাতেও দেখা যাচ্ছে যে প্রথম শুরুতে যত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তী হয়েছিলেন তার দুই-তৃতীয়াংশ প্রথম ছয়মাসের মধ্যেই এই ভাষাশিক্ষা ছেড়ে দিয়েছেন।

ভারত-সরকারের আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে পশ্চিম-বাংলা সরকার এই কেন্দ্রের পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন

এবং শিক্ষাবিভাগের মাধ্যমে ৪৫০০০ হাজার টাকা প্রথম বছরে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করেছেন। এদিকে ফরাসী-সরকারের দূতাবাস থেকেও বিভিন্ন রকমের পুস্তক, আসবাব, ছায়াচিত্র প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। এমনি করে এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রে বিভিন্ন শাখা যাতে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ আকার পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ এগিয়ে চলেছে। বর্ত্তমানে বিশেষভাবে সংগ্রহশালা, পাঠাগার, চিত্রকলা ও ভাষাশিক্ষা বিভাগ এগুলির কাজ নিয়মিতভাবে চলেছে। এ ছাড়া এর কার্য্যসূচীর ভিতরে রয়েছে বৈজ্ঞানিক-বিভাগ নতুন করে সৃষ্টি করা। তাই আশা করা যায় যে, এই সংস্কৃতি-কেন্দ্র কোন কোনও দিক দিয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলকে আনন্দ দান করবে। ফরাসী ভাষাবিদ্‌রা এতে নিশ্চয়ই উৎসাহবোধ করবেন এই দেখে যে, আজ তাঁরা এই চন্দননগর শহরে থেকেই ফরাসী ভাষা-সাহিত্যও সংস্কৃতির পড়াশুনার সুযোগ পাবেন। এখানে ফরাসী ভাষামোদীদের একটি বহুদিনের পুরাণো ক্ষোভের কথা উল্লেখ করতে হয়। সেটা হচ্ছে এই যে, ফরাসী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষিত বেশ কিছুসংখ্যক ভদ্রলোকেরা ভারতেই উপযুক্ত মর্য্যাদার স্থান বা আসন পান নাই। সোজা কথায় বলতে গেলে অবস্থাটা এইরকম দাঁড়ায় যে মার্কিন দেশের বা বৃটেনের যে কোনও অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রমাণপত্রকে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করা হয়। তাই খুব সংগত কারণেই শিক্ষামোদীরা এই দুর্বিষহ অবস্থার অবসান কামনা করেন। মুষ্টিমেয় এই সব শিক্ষামোদীদের হতাশার ভাব মুছে ফেলে যাতে তাঁরা স্বদেশে যোগ্য আসন পান তার আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এদিক থেকে ফরাসী সরকার সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ও আদান প্রদানের যে কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন তাতে আশা করা যায় যে, ভারতসরকারের ফরাসী দেশের শিক্ষাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা না দেওয়ার মনোভাব খুব শীঘ্রই বদলে যাবে।

সংস্কৃতি-কেন্দ্র ঠিকমত গড়ে উঠুক বা প্রসার লাভ করুক এটা সবাই আশা করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও তাঁরা করেন যে, ক্ষুদ্র এ শহরের অতীত ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে যেন এই কেন্দ্রে ধরে রাখা হয় বা এখানকার আঞ্চলিক পর্য্যায়ে ভারত তত্ত্ব গবেষণার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা যেন করা হয়। দুই রাষ্ট্রের চুক্তির সর্ত্তগুলি যেন নিকটবর্ত্তী গঙ্গার স্রোত-ধারার সঙ্গে বিলীন হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সকল মহলেরই কর্ত্তব্য, কারণ এই ভাবেই চন্দননগরবাসীরা অতীতকে ভুলে যাওয়ার বেদনাকে মুছে ফেলে তার মধুর স্মৃতিকে বুকে নিয়ে চলতে পারবে।

ভারতবর্ষের প্রথম লৌহ সেতু

অরুণকুমার মজুমদার

শুনতে খুব আশ্চর্য্য লাগলেও একথা সত্যি, খুবই সত্যি যে মোগল বা তৎপূর্ব্ব যুগে ভারতবর্ষে কোন লৌহসেতু ছিল না। বড় বড় নদী পার হবার তৎকালীন প্রধান ব্যবস্থা ছিল নৌকা, আর ছোট খাল পার হবার জন্য ব্যবহার করা হোত বাঁশের চার বা পুল। এছাড়া খুব ছোট নালায় ইটের বা কাঠের পুলও দেখা যেতো। আজকাল যেমন গঙ্গার ওপর হাওড়ার পুল, বা পদ্মার ওপর সারা পুল বা উইলিংডন ব্রীজের ওপর দিয়ে মানুষ গাড়ী অনায়াসে চলে যেতে পারে, সেযুগে তেমন কোন সুবিধের কথা কোথাও শোনা যায় না।

ভারতবর্ষের প্রথম লৌহ-সেতুর চলন করেন ইংরেজরা এ সত্যটা কিন্তু অনেকেরই জানা ছিল না। ইংরেজরা এদেশে রেল এনেছেন, টেলিগ্রাফ এনেছেন এমনকি সভ্যতার অনেক উপকরণ আমদানী করেছেন জানি, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম লৌহপুল তাঁরা নির্ম্মাণ করে গেছেন আমাদের এই কলকাতার কালীঘাটে আদিগঙ্গা বা টালি নালার ওপর, একথা যেন শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এ খবরটা প্রথম ইংরেজরাও জানতোনা। খবরটা প্রথম পাওয়া গেল কালীঘাটের প্রাচীন লোহার পুলটা ভাঙ্গবার সময়। সেটা হোল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। পুলটা অনেকদিন ধরেই জরাজীর্ণ হয়ে আসছিল দেখে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ পুলটাকে ভাঙ্গবার আদেশ জারি করেন। কালীঘাট ও আলিপুর খিদিরপুরের মধ্যে যোগাযোগকারী হাজরা রোডের ওপর ঐ পুলটা ভাঙ্গবার সময় কুলিরা এর নীচে একখানি তাম্রফলক আবিষ্কার করে। সেখানে যিনি ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন তিনি কৌতুহলী হয়ে তার পাঠোদ্ধার করেন। ঐ তাম্রফলকটীতে লেখা ছিল যে ইংরেজ রাজত্বের সময় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আলিপুর যাবার জন্য কালীঘাট এবং আলিপুরের মধ্যে টালিনালার ওপর ঐ লৌহ সেতুটি নির্মিত হয় এবং এটিই ভারতের প্রথম লৌহ নির্মিত সেতু।

সেদিন আজ প্রায় দেড়শ বছর হয়ে গেছে। ইংরেজ রাজত্বের সুরুতে আদি গঙ্গার মজে-যাওয়া বক্ষের ওপর উইলিয়াম টালি সাহেব হুগলী নদী হতে বিদ্যাধরী নদী পর্য্যন্ত খাল কেটে নৌকা চলাচলের সুবিধে করে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ক্যানিং, ভাঙ্গর, হাড়োয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেদের কলকাতার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধে করে দেওয়া। এই খাল কেটে তিনি একটি টোলও বসান যাতে করে তাঁর কিছু আয় হয়। তারপর একদিন টালি সাহেব সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের দিকে যাত্রার পথে মারা (১৭৮৪ খৃঃ) গেলেন। এই সতেরো মাইল দীর্ঘ নালাও ধীরে ধীরে স্রোতহীন হয়ে মজে এল। কিন্তু সেদিন যে এ নদীবক্ষ গুনগুন্ গুঞ্জন, নৌকার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে মুখর ছিল, আজ আর তা অনুমান করা যায় না। অবশ্য ঐতিহাসিকরা বলেন তারও বহু বৎসর আগে আদিগঙ্গার লাস্যময় যৌবনে এর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করত পালতোলা জাহাজ, এর দুপায়ে ছিল কত জনপদ কত মঠ মন্দির বাঁধান-সরোবর তার কোন হিসেব রক্ষিত নেই! যাক তারপরে আদিগঙ্গার মরা বক্ষে সৃষ্টি হোল টালির নালা, আর টালির নালার যৌবনে যেদিন ভাটা পড়ল সেদিন আলিপুর আর কালীঘাটের পথে টালি নালা বা আদিগঙ্গার বক্ষে সৃষ্ট করা প্রয়োজন হোল এই পুল। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে টালিনালা ও আদিগঙ্গা বর্ত্তমান বৈষ্ণবঘাটা পর্য্যন্ত এক হয়ে তারপর ভিন্নপথে গেছে।

টালিনালা গেল সোজা বিদ্যাধরীর দিকে আর আদিগঙ্গা বারুইপুর, কল্যাণপুর, দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর, ছত্রভোগ, খাড়ি হয়ে চলে গেল সাগরে।

এরপর ডাক পড়ল, তখনকার দিনের ব্রীজ্ ও ক্যানাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মেজর জে এ স্কালাকের (J. A. Schalch)। এই মেজর স্কালাকই কলকাতার উন্নতির জন্য সৃষ্ট লটারী কমিটির জন্য কলকাতার মানচিত্র রচনা করেন (১৮২৫,১৮৩০—১৮৩২ খৃঃ) অবশ্য নীতিবাগীশদের জন্যে কলকাতার তেমন কোন উন্নতি হয়নি, কিন্তু স্কালাকের তৎকালীন ম্যাপ ও জরীপ সেইদিনকার কলকাতার এক অসমান্য ঐতিহাসিক পরিচিতি।

যাকগে, বর্ত্তমান হাজরা রোডের প্রান্তে আদিগঙ্গার ওপর স্কালাক সাহেব অনেকদিন পরিশ্রম করে এই লৌহ সেতুটি নির্ম্মাণ করলেন। এর দৈর্ঘ্য হোল ১৪১ ফিট এবং প্রস্থ হোল আট ফিট। এই পুলে সেদিন উঠবার একটি মাত্র পথ ছিল এবং এর ওপর দিয়ে কেবল মাত্র মানুষ এবং গরু মহিষ মাত্র যেতে পারত। ব্রীজটি সৃষ্টি হবার পর ভারতের গভর্ণর জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি মার্কুইস অব হেষ্টিংস এর শুভ উদ্বোধন করেন। সেই হতে এই সেতুর 'পর দিয়ে কত রাজপুরুষ কত যাত্রী কত প্রাণী গেছে তার কোন সংখ্যাতত্ত্ব নেই এরপর আবার সত্তর বছর পরে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যুগে দাবীতে এই ব্রীজ ভেঙে ফেলে আবার নতুন ব্রীজ তৈরী করা হোল। এক যুগ হতে আর একযুগের ওপর সেতু পড়ল, তার ওপর দিয়ে চলল ঘোড়া-চালিত ট্রামগাড়ী।

টালি নালার আধুনিক ব্রীজটা তৈরী হোল ১৯০ খৃষ্টাব্দে এবং এটি সৃষ্টি করেছেন হাওড়ার বা কোম্পানী। আজকে কিন্তু এই সেতুটির ওপর দিয়ে শুধুমাত্র গাড়ীই যেতে পারে, মানুষের যাতায়াতের পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, ব্রীজের পাশের সঙ্কীর্ণ দুটি পথ। আবার এই সেতুও হয়তো একদিন মানুষের বিশেষ প্রয়োজনে ভেঙে ফেলতে হবে। সে কথা আমাদের আলোচ্য নয়।

আজ কালীঘাটের ঐ সেতুর ওপর দিয়ে যেতে যেতে কালীঘাটের ঐ টালি নালার বা আদিগঙ্গার বক্ষে জোয়ারভাটা দেখতে দেখতে একথা স্মরণে এলে মন পুলকিত না হয়ে পারে না যে ভারতের প্রথম লৌহপুল এইখানেই ছিল, যখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী, আর বাঙ্গালী ছিল ভারতবর্ষের চিন্তা-জগতের অবিসংবাদী নেতা।

পাড়াগাঁয়ে খেলাধূলা

শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অবহেলিত পল্লীর সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগের কথা পল্লীবন্ধু প্রবাসীতে লিখিতে সাহসী হইতেছি। গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে "পাড়াগাঁয়ের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা" প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর হইতেছে—খেলার মাঠ। মানবশিশু প্রথম শিক্ষালাভ করে তার মাতৃসকাশে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে সে শিক্ষালাভ করে পুস্তকের সাহায্যে। পুস্তকে অধীত-বিদ্যার বিকাশ লাভ হয় খেলার মাঠে। খেলাধূলা শিক্ষার অপরিহার্য্য অংগ শৈশব অবস্থা হইতেই মানবশিশু বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ হইতেই তার চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আত্ম-দর্শন। আত্মদর্শন বা ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে যে সমস্ত গুণের অধিকারী হইতে হয়, সেই সমস্ত গুণ বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ হইতে ক্রমশঃ লাভ করা যায়। আমরা ভারত-বাসী—অধ্যাত্ম বিদ্যালাভই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আমরা সে আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছি বলিয়াই বিদ্যালয়ে ও খেলার মাঠে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতেছে। খেলাধূলাকে শিক্ষার অধ্যক্ষরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে আমরা প্রকৃত বিদ্যালাভ করিয়া লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইতে পারিব না। "প্রবাসীর নববর্ষ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য আমাদিগকে সেই-পথেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই এখন শারীরিক বলবৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার খেলা, দৌড়, সন্তরণ ইত্যাদিতে বহু লোক প্রশংসা পাইবার জন্য নানারূপ কৌশল শিক্ষা করিতেছে। ব্যায়ামবীর, সন্তরণ-বীরগণকে নানাবিধ পারিতোষিক দিয়া, সভাসমিতিতে সংবর্দ্ধনা করিয়া বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইতেছে। এই জন্য সহর-গুলিতে এই সমস্ত ব্যায়ামগুলির বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে। এবং সুদূর পল্লীগ্রামগুলিও ক্রমশঃ নানাবিধ খেলার শব্দে মুখরিত হইতেছে। নানাবিধ খেলার প্রতিযোগিতার সংবাদ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাগুলি পূর্ণ থাকে।

সহরগুলিতে লোকসংখ্যার আধিক্য, যথেষ্ট অর্থ ও উপযুক্ত শিক্ষক ও দাতা থাকে বলিয়া ভাল ভাল খেলোয়াড় অনেক প্রস্তুত হয় কিন্তু পল্লীগুলিতে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ অভাব বশতঃ তেমন উপযুক্ত খেলোয়াড় পাওয়া যায় না। কিন্তু সহরের অনুকরণে সুদূর পল্লীগ্রামগুলিতেও স্থানে স্থানে শীল্ড, কাপ, মেডেল প্রভৃতির প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সুতরাং গ্রাম্য-যুবক ও বালকগণ ঐগুলি পাইবার জন্য নানা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছে কিন্তু অধিকাংশ পল্লীবাসী যুবক ও বালক ভাল খেলা না জানায় সহর ও সহরের উপকণ্ঠ হইতে অনুনয়, বিনয় এবং অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বহু খেলোয়াড় আনাইয়া তাহা-দিগকে নিজ দলের পরিচয় দিয়া প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেছে না। ইহাতে দেহের বলাধানই কেবল হইতেছে না তাহা নহে, পরন্তু নানা দুর্নীতি সমাজে প্রবেশ করিতেছে। ইহাদ্বারা মিথ্যা জুয়াচুরি দাম্ভিকতা, পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপ স্থায়ী মনো-মালিন্য অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে নানারূপ অভদ্রোচিত বাক্যাবলী রেফারী ও কাউন্সিলের উপর বর্ষিত হইতেছে। যাহাতে অপরিণতবুদ্ধি বালক ও যুবকগণ ঐরূপ অশিষ্ট ব্যবহার হইতে বিরত হয় তাহার চেষ্টা না করিয়া বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় গ্রামবাসীগণ এবং বিদ্যা-লয়ের শিক্ষকগণ বরং ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

খেলার উপকারিতা অনেক, প্রত্যেক নরনারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথেষ্ট ব্যায়াম আবশ্যক। যাহাদের দৈহিক পরি-

শ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় কিম্বা পরিশ্রম-মূলক নানা সাংসারিক কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাদের অবশ্য পৃথক খেলা বা ব্যায়ামের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাহাদের সর্ব্বদা মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় ও অঙ্গ সঞ্চালনের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, এরূপ ব্যক্তির যথা ছাত্রের, শিক্ষকের এবং কেরানীর কোনও না কোনরূপ ব্যায়াম করা উচিত। ইহার লক্ষ্য হইতেছে দেহে বলাধান। দেহের সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। দেহ দুর্ব্বল হইলে মানসিক উন্নতি সুদূর পরাহত। দুর্বল ব্যক্তি মানসিক পরিশ্রম করিলে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহার মনের ও বুদ্ধির তেজ থাকেনা এবং রুগ্ন শরীর লইয়া সংসারের ভারস্বরূপ হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। জড়বাদীই হউক আর অধ্যাত্মবাদীই হউক, দেহের বল সকলের আবশ্যক। জড়বাদী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ভোগের জন্য বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং যতদিন বাঁচিবে ইন্দ্রিয়গণকে সবল রাখিয়া তদ্দারা যথেচ্ছ ভোগ করিতে চায় কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের পথিকগণ ইন্দ্রিয়-সুখ অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের ভোগ হইতে আপনাদিগকে পৃথক রাখিয়া যাহাতে, ক্রমে পরম পুরুষার্থের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন তাহার সন্ধান করেন। এই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে দেহের বলের বিশেষ প্রয়োজন। দেবী চৌধুরাণী যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন, ভবানী ঠাকুর দেবীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রথমে কিরূপ দৈহিক-ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বেদে আছে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মলাভ দুর্ব্বল ব্যক্তির সাধ্যাতীত। দুর্ব্বল ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে না, ধ্যান-ধারণা করিতে পারে না। এই জন্য আমাদের দেশে যোগীদিগকে নানা প্রকার আসন শিক্ষা করিতে হয়। প্রায় ৮৩ রকম আসন আছে। তাহা অতিশয় কষ্টসাধ্য শারীরিক ব্যায়াম। ইহা হঠযোগের অন্তর্গত। প্রাণায়ামও বিশিষ্ট রূপ শারীরিক ব্যায়াম। এই দুইটির দ্বারা পরিপক্ক হইয়া যোগীগণ ধারণা ধ্যান ও সমাধির দিকে অগ্রসর হইতে পারেন

আমরা ভারতবাসী আর্য্য সন্তান। বললাভ আমাদের goal বা গন্তব্য স্থান নহে। বলের প্রতি কামনা বা আসক্তি আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "বলং বলবতাঞ্চহম কামরাগবিবর্জ্জিতম্" অর্থাৎ কামনা ও আসক্তিবিহীন বল ভগবানেরই বিভূতি বা শক্তি। এই বলদ্বারা আমরা আমাদের পরম পুরুষার্থ লাভের অর্থাৎ ভগবানে লীন হইবার চেষ্টা করিতে পারি।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

রথযাত্রার মেলা

শিল্পী : বাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৭৪

৩য় সংখ্যা

উচ্চমূল্য আদায় নীতি

দেওয়ার সহিত তুলনায় যদি নেওয়া অত্যধিক হইয়া যায় তাহা হইলে সেইরূপ উচ্চমূল্য আদায় সামাজিকভাবে অন্যায়। কারণ, লাভের কথা বাদ না দিলেও লাভ কতটা করা সুনীতি অনুগত সে কথা বিচার করা যাইতে পারে. কোন বস্তু বা অবাস্তব ক্রয়যোগ্য সেবা বা অপর কিছুর মূল্য কত হইলে তাহা লোক ঠকান মূল্য হয় অথবা হয় না এই বিষয়ের কোন স্থির নিশ্চয় মীমাংসা করা যায় না। তবে লোকমত বলিয়া একটা সাধারণ বুদ্ধির জিনিস সমাজে আছে যাহা মোটামুটি ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সকলকে সাহায্য করে। অর্থাৎ যদি একমণ চাউল পূর্ব্বে চার টাকায় পাওয়া যাইত এবং এখন সকল বস্তুর মূল্য ও জনসাধারণের রোজগার টাকার হিসাবে পাঁচগুণ হইয়াছে দেখা যায় তাহা হইলে চাউল কুড়ি টাকা মণ হইলে কেহ বলিবে না যে সেই মূল্যে চাউল বিক্রয় লোক ঠকান। কিন্তু যদি চাউল ৮০ টাকা অথবা ১৮০ মণ দরে কিনিতে হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে সাধারণ ক্রেতাকে প্রবঞ্চনা করা হইতেছে। চাউল যদি উৎপাদন করিতে খরচ হয় ১৬ অথবা ১৮ টাকা মণ তাহা হইলে প্রবঞ্চনার কথাটা আরও উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়া যায়। ব্যবসাদার যদি চাউল ১৬ টাকা মণ দরে কিনিয়া তাহা ১০০ টাকা মণ দরে বিক্রয় করে তাহা হইলেও ঐ প্রবঞ্চনা প্রকট হইয়া উঠে। অর্থাৎ মূল্য ন্যায্য কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে (১) পূর্ব্বের তুলনায় মূল্য কতটা অধিক (টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধি ধরিয়া লইয়া) হইতেছে (২) ক্রীত বস্তুর উৎপাদনের খরচ হিসাবে মূল্য কিরূপ হইতেছে ও (৩) বিক্রেতা বস্তু কত মূল্যে নগদে সংগ্রহ করিয়াছে ও কত লাভ করিতেছে।

অত্যধিক মূল্য আদায় অথবা লোক ঠকান ধরণে লাভ করিবার চেষ্টা পৃথিবীতে নানাভাবে হইয়া থাকে। শুধু যে দোকানদার অথবা বিক্রেতাগণই উচ্চমূল্য আদায় বা জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করে তাহা নহে। এই লাভ করিয়া লোক ঠকান আরও বহুভাবে হইয়া থাকে। সাধারণভাবে বলা যায় যে দেওয়ার তুলনায় নেওয়াটা কত অধিক তাহার দ্বারাই সহজে বোঝা যায় যে প্রবঞ্চনা অথবা উচ্চমূল্যে অল্প বস্তু বা সেবা দান করা হইতেছে কি না যথা, বড় কথায় চলিয়া যাইলে, জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে উচ্চহারে রাজস্ব দিয়াও যদি দেশ শাসন কার্য্য ঠিকমত না হয় তাহা হইলে রাজকার্য্যের যাহারা ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সমষ্টিগত ভাবে "মুনাফাখোর" বলা উচিত হইবে

কিনা। শাসন কার্য্যে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি মিলিতভাবে যাহা দিতেছেন তাহার তুলনায় যাহা নিতেছেন তাহা অতিরিক্ত কিনা ইহা বিচার করা যাইতে পারে।

অপরাপর ক্ষেত্রে মূল্যাধিক্য বিচার করিলে দেখা যায় যে অনেক ডাক্তার, আইনজ্ঞ, শিক্ষক, গায়ক, ধর্ম্মগুরু, বাদ্যকর, নর্ত্তক, নট প্রভৃতির দক্ষিণা এতই অধিক যে সাধারণ লোক তাহা দিতেই পারে না। ফলে বহুলোকেই তাঁহাদিগের সাহায্যে নিজেদের জীবনযাত্রা সুগম করিতে সক্ষম হয় না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যদি হাজারে হাজারে কথা বলেন গরীবের তাহা হইলে সুচিকিৎসার উপায় থাকে না। হাসপাতালে স্থান লাভও বহুক্ষেত্রে অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হয় না। আইনজ্ঞদিগের সম্বন্ধেও বলা যায় যে যাঁহারা উচ্চহারে দক্ষিণা দাবি করেন তাঁহাদিগের নিকট গরীবে যাইতে পারে না। ফলে হয়ত নির্দ্দোষ লোকের শাস্তি হইয়া যাইতে পারে।

যে সকল কারখানা ও কারবার সমাজে চলিয়া থাকে ও যাহার পরিচালনার উপর সমাজের লোকের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রভৃতির সরবরাহ নির্ভর করে, সেই সকল কারখানা ও কারবার ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত যে ভাবেই চালিত হউক না কেন, তাহার পরিচালকগণ কত টাকা নিজেরা গ্রহণ করেন তাহার উপর উৎপাদিত বস্তুর মূল্য নির্ভর করে। পরিচালক বলিতে বুঝিতে হইবে উচ্চবেতনের কর্ম্মচারী, উপদেষ্টা ও হুকুমতের বিশেষজ্ঞগণ। দেখা যায় যে আজকাল বহু কর্ম্মচারীর বেতন কারবার কারখানায় মাসিক ১০,০০০৲ টাকার অধিকও হয়। বিদেশী তথাকথিত-বিশেষজ্ঞদিগকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে বিদেশী যন্ত্রাপাতি ক্রয় করিয়া বিদেশী ও স্বদেশী মধ্যবর্ত্তীদিগের হস্তে কত শত কোটি টাকা আজ অবধি ভারত তুলিয়া দিয়াছে তাহার হিসাব সম্ভবত কোনদিনই কেহ করিবে না। ঝুটো-সবজান্তা উচ্চ কর্ম্মচারী আমদানি করা ব্যক্তিস্বত্বাধিকারী ও সমষ্টিবাদী উভয় জাতীয় কারবারেই হইয়া থাকে। ব্যক্তিস্বত্বাধিকারী কারবারের মধ্যে ইহা অধিক দেখা যায়। ইহা ব্যতীত মালিক বা পরিচালকদিগের গৃহপালিত মূর্খদিগকেও উচ্চ আসনে বসান ব্যক্তিস্বত্বাধিকারী কারবারে প্রায়ই দেখা যায়। এই সকল ব্যক্তি যে কর্ম্ম অথবা কর্ম্মশক্তির তুলনায় অতি উচ্চহারে বেতন ও দক্ষিণা পাইয়া থাকেন তাহা সামাজিকভাবে অন্যায় এ[illegible] সহজেই বুঝা যায়। এবং অন্যায়ভাবে বাছাই করা ব্যা[illegible] দিগকে সে টাকা, পাওয়াইয়া দেওয়ার রীতি প্রচ[illegible] থাকিলে মূল্য, কর্ম্ম, বেতন ও দক্ষিণার হিসাব সর্ব্বদাই অন্[illegible] গাঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে[illegible] তাহা হইলে সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা খা[illegible] হইতে আরও খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয়। অ[illegible] অর্থনৈতিক সুনীতির প্রতিষ্ঠার সহিত জনসাধারণের জী[illegible] যাত্রার যে গভীর সংযোগ তাহা স্থির নিশ্চয়ভাবে বুঝি[illegible] সকল নেওয়া দেওয়ার কথাই ন্যায়সঙ্গত করিবার ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং সামাজিক [illegible] সুবিধার ভাগ-বাটোয়ারা ক্রমশঃ যথাযথ ভাবে সুসংগত সুনীতিগত করিতে হইবে। এই সুনীতির আলো[illegible] শেষ অবধি শুধু ধনীদিগের অন্যায়ভাবে অর্থ অর্জ্জন চেষ্টা[illegible] আবদ্ধ রাখা সম্ভব নহে; কারণ অন্যায় সকল স্তরের ব্য[illegible] দিগের মধ্যেই প্রচলিত দেখা যায় এবং দেওয়া নে[illegible] বিষয়ে অন্যায় উপায়ে অর্থ আহরণ চেষ্টা যাহারাই করু[illegible] কেন, তাহার প্রতিকার না করিলে সমাজে অর্থনৈ[illegible] সুনীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে না।

এই আলোচনা ব্যাপকভাবে করিলে দেখা যাই[illegible] অল্প বেতনের কর্ম্মী, শ্রমিক, দ্বারবান, গোয়ালা, [illegible] দোকানদার প্রভৃতি সকল কর্ম্মী ও বিক্রেতাদিগের ম[illegible] লোক ঠকান বিশেষভাবে প্রচলিত। বেতন লইয়া [illegible] না করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবঞ্চনা ও দ্রব্য অপহরণ প্রভৃতি অ[illegible] স্থলে লক্ষিত হয়। দুগ্ধে জল মিশান, ওজনে কম দে[illegible] প্রভৃতি অন্যায় কার্য্যও সর্ব্বত্র প্রচলিত। এই সকল অ[illegible] অপরাপর সভ্যদেশে ভারতের তুলনায় কমই দেখা [illegible] কারখানা ও কারবারে কর্ম্মের তুলনায় কর্ম্মীর সংখ্যা কিছু অধিক দেখা যায়। অপর দেশে যে কার্য্য এ[illegible] শ্রমিক বা কর্ম্মী করে ভারতবর্ষে সেই জন্য তিন চা[illegible] লোক রাখা হইয়া থাকে। এই সকল লোক অতি[illegible] কাজ করে এবং বেতনও পায় অল্পই। কিন্তু পূর্ণ কার্য[illegible] গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত বেতন অর্জ্জন করিলে মানুষ যে[illegible] জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এ দেশে তাহা ঘটে ন[illegible]

কারণে। একটি কারণ, ধনীদের অন্যায়ভাবে ধনোপার্জ্জন ও অপর কারণ, কর্ম্মীদিগের উপযুক্ত পরিশ্রমে অনিচ্ছা ও অল্পকাজ অথবা বহুলোক মিলিয়া করিবার চেষ্টা। এই দুই ধরণের নেওয়া দেওয়ার বৈষম্য দূর না করিতে পারিলে ভারতীয় অর্থনীতি স্বাস্থ্যবান হইতে পারিবে না।

জীবনযাত্রা নিরাপদ, সহজ ও সুগম করা

ভারতের ছয় হাজার সহর ও ছয় লক্ষ গ্রামে মানুষ কি ভাবে বসবাস করে তাহার আলোচনা করা কাহারও পক্ষে অল্পের মধ্যে করা সম্ভব নহে। সেই জন্য আমরা প্রথমত শুধু কলিকাতার কথাই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। কলিকাতা বহু পুরাতন সহর নহে। তাহা হইলেও কলিকাতার রাস্তাঘাট অলিগলি দেখিলে মনে হয় তাহা বহু পুরাতন সহরের তুলনায় বিশেষ উন্নতভাবে নির্ম্মিত নহে। ইহার কারণ বৃটিশদিগের ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যেরভাব ও শ্বেতকায়দিগের বাস করিবার এলাকাগুলি কিছু ভাল করিয়া গঠিত করিয়া লইয়া অপর এলাকাগুলি যথেচ্ছা গঠন করিতে দেওয়ার ব্যবস্থা। পরে যখন ইয়োরোপীয় ধরণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভারতীয় দিগের মধ্যেও প্রচলিত হয়, তখন সহর কিছুটা উন্নতভাবে-গঠিত হইতে আরম্ভ করে; কিন্তু তাহাও দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য ঠিকভাবে সম্ভব হয় নাই। বিগত একশত বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় যে সব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বহু গৃহ পঞ্চাশ ষাট বৎসরেই এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে সেইগুলিতে কাহারও পক্ষে বাস করা আর নিরাপদ নহে। যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা অপর আবাসস্থল পান না বলিয়াই বাস করেন অথবা যুদ্ধপূর্ব্বের তল্প ভাড়াতে থাকিতে পারার লোভে জীবন বিপন্ন করিয়াও ভগ্নজীর্ণ গৃহে থাকিয়া যান। কলিকাতা কর্পোরেশন ট্যাক্স পাইলেই যে কোন জরাজীর্ণ গৃহকে মানুষের নিবাসের উপযুক্ত ধার্য্য করিয়া লয়েন; অথবা না লইলেও কোন উপায়েই সেই সকল গৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করাইতে পারেন না। সুতরাং কলিকাতাবাসী যেন তেন প্রকারে নিজ নিজ ভগ্ন বা অর্দ্ধভগ্ন গৃহে বাস করেন ও কখন কখন আহত বা নিহত হ'ন।

যানবাহনের ব্যবস্থা কলিকাতার মত জনবহুল সহরের পক্ষে অত্যন্তই অপ্রচুর ও অযত্ন রক্ষিত। ট্রামগুলি মোটামুটি পরিষ্কার ও অভগ্ন। বাস ট্যাক্সি, ঘোড়া গাড়ি ও রিকশা অপরিষ্কার ও ঠিকভাবে রক্ষিত নহে। আইন থাকিলেও আইন প্রয়োগ করা হয় না। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার রাখা হয় বলিয়া মনে হয় না। নাগরিকগণের বাসস্থান ও যাতায়াতের পথ ঘাট যানবাহনের কথার পরে উঠে জল সরবরাহ, আলো, গ্যাস, কয়লা কাঠ, খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতির কথা। কলিকাতার জল-সরবরাহ অত্যন্তই অসুবিধাজনক। জল প্রায় কোথাওই পাম্প না চালাইলে একতলার উপরে উঠে না। তাহা ব্যতীত ঐ জল না ফুটাইয়া খাইলে অসুখের সম্ভাবনা ঘটে। সারাদিন জল চলে না ও কখন কখন বন্ধ হইয়া যায়। বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতির সরবরাহ কলিকাতায় যথাযথভাবে হয় না। বিদ্যুৎ ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারী কারবার হইতে সরবরাহ করা হয় এবং গ্যাস বর্ত্তমানে সরকার নিজ হস্তে লইয়াছেন। এই কারণে গ্যাসের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে ও বিদ্যুৎ যতটা সরকারী উৎপাদন কেন্দ্র হইতে লওয়া হয় ততটা ঠিকমত আসে না। ভারতবর্ষে সমষ্টিগত ভাবে যে কার্য্যই করা হয় তাহাই অকর্ম্ম ও দুর্নীতির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ সরকারী পরিচালকদিগের অক্ষমতা ও তাঁহাদিগের নেতাদিগের দ্বিগুণ অক্ষমতা। ধনবাদ যেরূপ একটা সমাজ-শোষণের উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সমষ্টিবাদ সেইরূপই একটা শোষণের ব্যবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কলিকাতা সহরে যেখানে যেখানে স্বায়ত্ত শাসন বা সমষ্টিবাদ চালিত আছে সেই সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি ও অক্ষমতা প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

দুগ্ধ সরবরাহ, ধোবাদিগের কারবার, খাইবার রেস্তোরাঁ, হাটবাজার প্রভৃতি দেখিলে কলিকাতা যে সভ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত তাহা বোধগম্য হয় না। দুগ্ধে জল গোয়ালা-মাত্রই মিশাইয়া থাকে। সরকারী দুগ্ধকেন্দ্রগুলি অল্প লোককেই দুগ্ধ দিতে সক্ষম এবং সেই দুগ্ধও পাঁচ মিশাল ও টিনের পাউডার দিয়া অংশত পুষ্ট। অনেক সময়েই সরকারী দুগ্ধ ফুটাইলে কাটিয়া যায়। অন্যান্য খাদ্যবস্তু, যথা মাছ, মাংস, ডিম, মাখন, ঘৃত, তৈল, তরকারি ফল প্রভৃতির মূল্য অতি উচ্চ ও সরবরাহ অল্প। অনেক খাদ্যবস্তুই তাজা

পাওয়া যায় না এবং কোন কিছুরই মূল্য বা স্বাস্থ্য-হানীকরতা পরীক্ষা করা হয় বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ কলিকাতার নাগরিক থাকা, চলাফেরা করা ও খাওয়ার ব্যবস্থায় অসহায় ও চির বিপন্ন। তাঁহারা এই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে অক্ষম; অন্তত কোন চেষ্টা করেন না। এই প্রকার বিলিব্যবস্থা হইলে অন্য দেশে বহু পার্টি ও নেতা বহিষ্কৃত হইয়া যাইতেন বহুবার; কিন্তু কলিকাতার নাগরিক বৃটিশ আমল হইতেই অত্যাচার অনাচার সহ্য করিয়া চলিতে এতই অভ্যস্ত যে তাঁহারা সকল উৎপীড়ন মূকভাবে মানিয়া লইয়া থাকেন। ধোবার কাপড় কাচার কথা না বলাই ভাল। ছেঁড়া, হারান ও বদলান, কিংবা রং জ্বালাইয়া বা লাগাইয়া আনা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে। চুল কাটিবার "সেলুন"গুলি অধিকাংশই অপরিষ্কার ও সেইখানের চিরুণী, কাঁচি, ক্ষুর, তোয়ালে প্রভৃতি বহু ব্যবহৃত হইলেও পরিষ্কার করা বা বদলান হয় না। রেস্তোরাঁতে বাসন পরিষ্কার করিয়া ধোয়ার ব্যবস্থা নাই ও কোন খাদ্যই উপযুক্ত মূল্যে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকরভাবে ক্রেতাকে দেওয়া হয় না। শুধু দুই চারিটি বিদেশী ব্যবহৃত রেস্তোরাঁ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। মূল্য অত্যন্ত অধিক কিন্তু সরবরাহ উত্তম। সাধারণ নাগরিক ঐ রেস্তোরাঁগুলিতে যাইতে অক্ষম।

কলিকাতায় কাহারও অসুখ হইলে প্রথমত ডাক্তার পাওয়া কঠিন। পাইলে বহু ব্যয় সাধ্য। হাসপাতালে স্থান পাওয়া কঠিন। যদি কাহারও যক্ষারোগ হয় তাহা হইলে ছয় মাস অপেক্ষা করিলে ও বহু সুপারিশ করাইলে কোথাও স্থান লাভ ঘটিতে পারে। শীঘ্র হাসপাতালে লইয়া যাইবার অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া অসম্ভব কেননা যেগুলি আছে সেগুলির অধিকাংশই অচল। ডাক্তার হাসপাতাল জুটিলেও, ঔষধ না জুটিবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। ঔষধও আবার নকল ও ভেজাল হয় কখন কখন। মূল্যের কথা না বলাই ভাল। ঠিক জিনিস ঠিক দামে পাওয়া সম্ভব নহে। নার্সিং-হোমে রুগী লইয়া যাইলে তাহার ব্যয় অনেক। সেখানে ডাক্তারের খরচও বহুগুণ এবং আনুসঙ্গিক খরচ ক্রমবর্দ্ধনশীল। নার্সিং-হোমের হিসাব সর্ব্বদা হাজারেই হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ ঘটে তাহা হইলে শব দাহ করিতেও "কিউ" লাগা দাঁড়াইতে হইতে পারে। তাহা হইলেও একবার মা যাইলে শ্মশান গমন ও দাহ কার্য্য এক প্রকারে হইয়া যায়

কলিকাতায় বাসের আরও যে সকল বিঘ্ন আছে তা মধ্যে চোরের, গুণ্ডার ও বদলোকের উৎপাত উল্লেখযো চোরের কারবার কলিকাতায় বিস্তৃত এবং চোরেরা মোট নির্বিঘ্নেই এই সহরে নিজ কার্য্য পরিচালিত রাখে। পু পাহারার বিশেষ কড়াকড়ি নাই; ধরা পড়িবারও সম্ভ অল্পই। যে সকল নাগরিক এই কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা প্রকার আরামেই থাকেন। পথে গুণ্ডার দ্বারা আ: হওয়া এই মহানগরীতে অসম্ভব নহে। পথের লোকে অনেক সময় গুণ্ডাদিগের সহায়তা করে এবং গাড়ী চ কেহ যাইলে তাহার উপর উৎপাত করিবার লোকের অ কখনও হয় না। অনেক সময় গুণ্ডার পিছনে ধাবমান পু দিগের হস্তেও দুই চার ঘা খাওয়া ঘটিয়া যাইতে প ইহা ব্যতীত কোন কার্য্যে কোন আফিস-দপ্তরে ঢু সেখানেও হঠাৎ "ঘেরাও" হইয়া যাওয়া অসম্ভব • অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনার্থে সিনেমা বা ফুটবল দে যাইলেও টিকেট বিক্রেতা গুণ্ডা বা ফুটবল দর্শক জু দিগের হস্তে লাঞ্ছিত হওয়া সহজেই ঘটিতে পারে। কলি বাসের আনন্দ অশেষ। এমন কি এই সহর ত্যাগ ক যাইবার পথও সুগম নহে। রেলের টিকিট পাওয়া নহে। "ওয়েটিং লিষ্ট" বা "কিউ" সর্ব্বদাই থাকে সুপারিশ ও ঘুষের কথাও উঠে!

কলিকাতায় যাহারা ভৃত্য রাখিতে পারেন তাঁহা বিপদ আরও অধিক। ভৃত্য সাজিয়া অনেক সময় ডাকাতেরা গৃহে প্রবেশ করে এবং সুবিধা হইলে সে সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পালায়। অনেকক্ষেত্রে ধরা পা ভয়ে খুন জখমও করিয়া থাকে। ভৃত্যদিগের সম্বন্ধে করিয়া দিবার ব্যবস্থা কলিকাতা পুলিস করেন বলিয়া যায়। তবে তাহাতে কোন সুবিধা হয় বলিয়া জান নাই। অপরাপর দেশে ভৃত্য সরবরাহের অফিস তাহারা খোঁজ করিয়া দেখিয়া তবে ভৃত্য প কলিকাতায় কেন তাহা হয় নাই তাহা বলা কঠিন। যে সহরে কোন কিছুই যথাযথভাবে হয় না সেই সহরে

কার্য্যও যে হইবে না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এখন কথা হইতেছে এই যে সহরের নাগরিকগণ কেন এই সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকার চেষ্টা করেন না? মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে সকল কার্য্যই করা যায়, সুতরাং কলিকাতা বাসও নিরাপদ, সহজ ও সুগম করা কেন যাইবে না সকলে একত্র হইয়া চেষ্টা করিলে? আমাদিগের মতে এই কার্য্য সহজেই করা যাইতে পারে। যে সকল কার্য্যভার লইয়া সরকার বা কর্পোরেশন করেন না, সেই সকল কার্য্য চাপ দিয়া করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। যে সকল কার্য্য অপরের দ্বারা হয় তাহার সুব্যবস্থাও অসম্ভব নহে। নাগরিকদিগের কর্ত্তব্য মিলিত হইয়া এই সকল অভাব অভিযোগ ও সমস্যার যথাযথ মীমাংসা ও সমাধান চেষ্টা করা। এইদিকে তৎপর হওয়া সকলের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। নেতা বা দলের উপর ছাড়িয়া দিলে এ কার্য্য অন্যায়ের হইবে না। কারণ নেতা ও দলগুলি এই সকল বিষয়ের সহিত জড়িত।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

ভারতের জনসংখ্যা অপরাপর দেশের জনসংখ্যার মতই ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিয়া এখন প্রায় পঞ্চাশ কোটির উপরে পৌঁছাইয়াছে। এই কারণে ভারতের বহু জননেতার মহা চিন্তা ও আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয়টা "জন বিস্ফোরণের" পূর্ব্বাবস্থা এবং শীঘ্রই ভারতের সকল মানব শুধুমাত্র দাঁড়াইবার স্থান পাইবে ও খাদ্যের অভাবে মারা যাইবে প্রভৃতি নানা ভবিষ্যৎবাণী অনেকে করিতেছেন। ভারতের চাষের উপযুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ষাট কোটি একর। ইহা ব্যতীত চাষের উপযুক্ত নহে ও জলাকীর্ণ স্থান আছে আরও প্রায় ষাট কোটি একর। অর্থাৎ চাষের জমি বাদ দিয়া মানুষ বাস করিবার উপযুক্ত স্থান যাহা আছে তাহাতে প্রায় এক দেড় শত কোটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও ঐ জমির একচতুর্থাংশও ব্যবহৃত হইবে না। একটা গৃহে যদি একটা পরিবার বাস করে তাহা হইলে ভারতের জনসংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি হইলেও "বিস্ফোরণ" হইবার আশঙ্কা থাকে না। খাদ্যাভাব ঘটে খাদ্যবস্তু উৎপাদন না করিতে পারার জন্য। ষাট কোটি একর জমির মধ্যে যদি অর্দ্ধেক জমিও উপযুক্তভাবে চাষ করা হয় তাহা হইলে ৩০ কোটি একর জমিতে বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টন সর্ব্ব প্রকার খাদ্য উৎপাদিত হইতে পারে। মাথা পিছু খাদ্য যদি দিনে দেড় সেরও লাগে তাহা হইলে বৎসরে অর্দ্ধটন খাদ্য একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। এই কারণে মনে হয় যে মানুষের দাঁড়াইবার স্থান অথবা খাদ্যের অভাব এই দুই আতঙ্কের মূল কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নহে। আসল কারণ নেতা ও শাসকদিগের অক্ষমতা। যাহারা এক বিঘা জমিতে চার পাঁচ মণের অধিক খাদ্যবস্তু উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট আমরা বিশ্বমানবের হিতের (অথবা জয় পরাজয়ের) কথা শুনিলে তাহা হাস্যকর মনে করিতে বাধ্য হই। ভারতের মানুষও অকাতরে এই সকল লোকের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া ক্রমে চূড়ান্ত অভাব ও দুর্দ্দশায় পড়িতেছেন। নিজেরা চেষ্টা করিয়া অভাব দূর করিতে শিখিলে ভারতীয় মানবের কোন দুঃখ থাকবে না। জনসংখ্যাও ধীরে ধীরে সভ্যতার সীমা মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে।

শিক্ষা ও আধুনিক জীবনযাত্রার আস্বাদ পাইলেই মানুষ বুঝিতে পারে যে একটি পরিবারে বহু সংখ্যক লোক থাকিলে সকলে উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসব্যবস্থা, চিকিৎসা ও অবসরের আমোদের আয়োজন করা সম্ভব হয় না। দুই তিনটি সন্তানকে ঠিকভাবে মানুষ করিয়া তোলা বহু ব্যয়সাপেক্ষ এবং ইহা ব্যতীত মাতার স্বাস্থ্য ও সন্তানদিগের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনের সুবিধার কথাও উঠে। সকল কথা বিচার করিলে বৃহৎ পরিবার কেহ চাহিতে পারে না এবং উন্নত জীবনযাত্রা যাহাদিগের সেই সকল জাতির লোকসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা জোরাল কারণ জীবনযাত্রা পদ্ধতির অবনত ভাব। এই কারণে দারিদ্র্যের সহিত সংখ্যা বৃদ্ধির সম্বন্ধ অতি নিকট। অজ্ঞতা আর একটি কারণ। সুতরাং শিক্ষা ও উপার্জ্জন ক্ষমতা উপযুক্ত না হইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা আলোচনা করিয়া কোন লাভ হয় না। শিক্ষা ও উপার্জ্জন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইলে নিজ হইতেই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্য্য সুসাধিত হইয়া যায়। শিক্ষা ও উপার্জ্জন বৃদ্ধির সহিত

উন্নত জীবনযাত্রা পদ্ধতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। উন্নত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে সেই পরিস্থিতিতে অল্প বয়সে বিবাহ করা চলিতে পারে না। স্ত্রীলোকের আঠার ও পুরুষের একুশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ না দিলে জনসংখ্যা হ্রাস স্বভাবতই হইতে থাকে। অতএব দেখা যায় যে শিক্ষা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা চেষ্টাই সংখ্য-নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ পন্থা ও যতদিন তাহা ঠিক মত করা না যাইবে ততদিন খাদ্য উৎপাদন চেষ্টা আরও প্রবল ভাবে করা প্রয়োজন। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি যত ভয়ের কথা, খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি তাহা অপেক্ষা অধিক ভয়ানক।

সংবিধান সংস্কার

ভারতীয় সংবিধান যদি কোনভাবে কোথাও পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহার পন্থা সংবিধানেই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু কোন সংস্কার কার্য্যের ফলে যদি সংবিধানের মূল স্বরূপ বদলাইয়া যায় এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্র মূলতঃ উল্টা পথে চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সেইরূপ পরিবর্ত্তন সংবিধান গ্রাহ্য কি না ইহার বিচার আবশ্যক। অর্থাৎ মূলতঃ ভারত স্বাধীন দেশ ও ভারতের শাসনকার্য্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার ও প্রাদেশিক সরকারের কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে। দেশরক্ষার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে। যদি বলা যায় সংবিধানের নির্দ্দেশ বদলাইয়া প্রদেশগুলি নিজ নিজ প্রদেশের পৃথক সৈন্যদল ও বিমান বহর রাখিবে, তাহা হইলে ভারত রাষ্ট্রের স্বরূপ বদলাইয়া যাইবে। ইহা কি সংবিধান সঙ্গত হইবে? যদি বলা যায় প্রদেশগুলি নিজ নিজ ইচ্ছামত বিদেশীয় রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পারিবে; যথা বাংলা দেশ চীনের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্টি করিবে; তাহাও কি সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য নাশ করিবে না এবং সেই কারণে করা চলিবে না? আয়কর প্রদেশগুলির ইচ্ছামত কম বেশী হইতে পারিবে কি না; ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রদেশ বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারী করিয়া লইতে পারিবে কি না; কোন মহারাজাকে কোন প্রদেশ রাজাসনে বসাইতে পারিবে কি না; অন্য দেশের নিকট কোন প্রদেশ নিজ স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে পারিবে কি না; ইত্যাদি বহু পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিয়া বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে দেখা যাইবে যে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য ও নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত কোন ব্যবস্থা সংবিধান সংস্কার করিয়া করা চলিতে পারে না। মূল যে সকল ব্যক্তিগত অধিকার ও সমষ্টিগত দাবি ও দায়িত্ব সংবিধানে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সংবিধা সংস্কৃতি করিয়া করা যাইতে পারে না। এক প্রদেশকে দ্বিধা করা কিম্বা দুইটি প্রদেশকে সংযুক্ত করিয়া একটি করা অথবা প্রতিনিধির সংখ্যা ও মনোনয়ন রীতি প্রভৃতি বদলা চলিতে পারে। রাজস্বের ভাগ বাট লইয়া পরিবর্ত্তন প্রদেশের সীমানা নির্দ্ধারণ ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহাতে রাষ্ট্রের স্বরূপ বদলাইয়া যায় না। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে সংবিধান রাষ্ট্রের অন্তরের চরিত্রগত অভিব্যক্তি তাহাতে এমন কোন পরিবর্ত্তন যদি করা হয় যাহা তাহা চরিত্রে মূল পার্থক্যের সৃষ্টি করিবে তাহা হইলে সে পরিবর্ত্তন সংবিধানকে বাতিল বা নাকচ করা হইবে। সুতরাং তাহ করা যাইতে পারে না।

ফরাসী বিপ্লবের পরে যে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহ নেপোলিয়ন বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ করিলেন। নেপোলিয় পরাজিত হইলে পরে পুনর্ব্বার আর একটি নিয়মতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্র রিপাবলিক হিসাবে চলিতে লাগিল। লুই ফিলিপ পরে সেই তন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন ও আরও পরে, ফরাসী প্রুশিয়ান যুদ্ধের এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে নূতন নূতন রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল পরিবর্ত্ত নিয়মতন্ত্র সংস্কার করিয়া করা হয় নাই; বল প্রয়োগে কর হইয়াছিল। আমাদের রাষ্ট্র যদি নিজ চরিত্র আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চাহে তাহা হইলে তাহার জন্য শক্তির অভিব্যক্তি আবশ্যক হইবে। ভোটের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় নিয়মতন্ত্রে আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন জনমত বিরুদ্ধ হইবে এবং সেইরূপ সংস্কারের পশ্চাতে জনশক্তি ব্যক্তভাবে প্রকাশ না পাইলে সেই সংস্কার কেহ মানিতে বাধ্য থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যক্তিগত সম্পদ সমষ্টিগত করা

যদি কোন ব্যক্তিগত সম্পদ রাষ্ট্র করায়ত্ত করা প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহা করা যাইতে পারে ব্যক্তিদিগকে সম্পদের মূল্য দান করিয়া। অবশ্য এই ক্রয় করিবার উদ্দেশ্য সাধারণের মঙ্গলজনক হওয়া আবশ্যক। যেখানে ব্যক্তিগত অধিকার থাকায় সাধারণের আর্থিক ক্ষতি হয়; অথবা সাধারণের সুবিধা মত কার্য্য না হওয়ায় সুখ সুবিধার হ্রাস হয় সেই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সম্পদ নিজ হস্তে লইতে পারেন কিন্তু যদি দেখা যায় যে রাষ্ট্রের হস্তে অধিকার আসিলে সাধারণের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা এবং রাষ্ট্র কর্ত্তৃক চালিত হইলে ব্যক্তিগত কারবার যথাযথ ভাবে চলিবার আশা কম

তাহা হইলে রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত হইবে না ঐরূপ কোন কারবারের পরিচালনা নিজ হস্তে লওয়া। রাষ্ট্রের কর্ম্ম ক্ষমতা বিশেষ নাই একথা সর্ব্বজন বিদিত। সেই কারণে রাষ্ট্রের পক্ষে নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। অথচ রাষ্ট্র নেতাদিগের নূতন ভার গ্রহণের আগ্রহ অনন্ত। ইংরেজীতে বলে কামড় দিয়া লইয়া চর্ব্বণ শক্তির অভাব ঘটিলে মহা বিপদ হয়।

সমষ্টিগত সম্পদের ভাগবাট

প্রায়ই শুনা যায় যে কোথাও না কোথাও চাষের জমি জোর করিয়া দখল করিয়া কোন কোন রাষ্ট্রীয় দলের অনুগত ব্যক্তিদিগকে দান করা হইয়াছে। জমি যদি সরকারী হয়, অর্থাৎ তাহার কোন মালিক না থাকে, তাহা হইলে জমি চাষের জন্য দান করিলে দেশের কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু জমি যদি অপরের হয় তাহা হইলে তাহা ছিনাইয়া লওয়া আইনসঙ্গত নহে এবং কেহ লইলে আইনত তাহাকে জমির মালিককে তাহা ফিরত দিতে হইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সরকারী জমিও কোন রাষ্ট্রীয় দলের সম্পত্তি নহে, সুতরাং রাষ্ট্রীয় দলের কথায় তাহার ভাগবাট হইতে পারে না। সরকারী জমি কি ভাবে কাহাকে দেওয়া হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার রীতি আছে ও সেই রীতি অনুসারেই তাহার ভাগবাট হইতে পারে। থিয়েটারি ঢংএ ঝাণ্ডা উড়াইয়া, লাল বা নীল সেলাম জানাইয়া যাহাকে তাহাকে জমি দেওয়াটা ঠিক উপযুক্ত পন্থা বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত রুশ বা চীন দেশেও এভাবে জমি কাহাকেও দেওয়া হয় না বা দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত অধিকারে জমি দখল করিয়া সম্ভোগ করাও উচ্চাঙ্গের লাল আদর্শ অনুগত নহে। সুতরাং জমি দখল করিয়া ভাগ বাট করার আবশ্যকতা কি তাহাও বোধগম্য হয় না। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা যাহাই হউক বেআইনি ভাবে জমির লেনদেন না চালানই উত্তম পন্থা। কারণ এইভাবে যদি কোন রাষ্ট্রীয় দল সকল শাসন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সেইরূপ অরাজকতার ফল কখনও দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে না। ভারতের কোন রাষ্ট্রীয় দলেরই সভ্য সংখ্যা এত অধিক নহে যে সেই দলকে দেশের মালিক বলিয়া স্বীকার করা যায়। গায়ের জোরে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার চেষ্টাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে গায়ের জোর সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই বিধেয়।

খাদ্যের অভাব

খাদ্য সরবরাহ ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরও খারাপ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্যত্র কি হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না কিন্তু কলিকাতায় লোকে মাথাপিছু সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম চাউল পাইতেছেন (১২ বৎসরের কম বয়স্করা পায় ২৫০ গ্রাম) এবং গম পাইতেছেন এক দেড় কিলোগ্রাম। অর্থাৎ চাউল ও গম মিলাইয়া মানুষে দিনে কম বেশী তিন শত গ্রাম খাদ্যবস্তু পাইবে ধরা হইতেছে। ইহাও ঠিকভাবে সকলে সব সময় পাইতেছে না। খাদ্যের কালো বাজার প্রবলভাবে চলিত ও সেই বাজারের মূল্য যেমন খুসী তেমন। তিন টাকা চার টাকা কিলো চাউল, দুই টাকা বা ততোধিক টাকায় এক কিলো আটা; তিন চার টাকা কিলো চিনি প্রভৃতি নানা প্রকার দামের কথা শুনা যায় এবং কথাগুলি সত্যও বটে। মৎস্য, মাংস্য, ডিম্ব, তরকারি দুগ্ধ প্রভৃতির অবস্থা কি, তাহা সকলেই জানেন। ভাল করিয়া খাইতে হইলে মাথা পিছু দুই টাকার কমে তাহা হয় না। বাড়ী ভাড়া বস্ত্র ঔষধ প্রভৃতিও অনেক টাকা দিলে পাওয়া সম্ভব হয়। এই অবস্থায় অল্প রোজগার যাহাদের তাহারা কি করিয়া বাঁচিয়া আছে তাহা বলা কঠিন। দেশের বহু গোলযোগের মূলে রহিয়াছে এই অর্থ ও খাদ্যাভাব। কিন্তু দেশ নেতাগণ শুধু কথাই বলিয়া চলিয়াছেন। কার্য্য কি হইতেছে তাহা তাহার ফল দিয়া বিচার করিলে অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না।

বিপ্লবের পরিচালনা

বাংলার পার্ব্বত্য সীমানা বরাবর বহু চা বাগান আছে। আসাম ও বাংলার এই পার্ব্বত্য অঞ্চলকে ডুয়ারস্ বলা হয়। পর্ব্বত হইতে সমতল অঞ্চলে প্রবেশ করিবার দুয়ার বলিয়াই সম্ভবত এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভুটানের সীমানাও এই স্থলে সমতল প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছে। চীনারা যখন ভারতে চৈনিক নক্সার মুক্তি আনয়নের জন্য নানাপ্রকার চক্রান্ত করিতেছিল এবং ব্যাঙ্ক অফ চায়না ও অন্যান্য চীনা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বাংলার কোন কোন দলের মুক্তি-ফৌজের সেনাপতিগণ যখন বিপ্লবের খোরাক সংগ্রহ করিতেছিলেন সেই সময় শুনা যায় একটা বেশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেশ দখল করিয়া নূতন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ভারত সরকারের হস্তগত হয়। এই যে নূতন রাষ্ট্র হইত কিন্তু হইল না, তাহার অবয়ব চীনা ধাঁজের ও দৃষ্টিভঙ্গীও চৈনিক ঢংএ কথঞ্চিৎ বক্র; অর্থাৎ ঐ রাজ্যে মুক্তির ব্যবস্থা ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাষ্ট্রের

দাসত্ব করিবার অধিকার মাত্র এবং গণশক্তি ছিল চীনার পদসেবার জন্যই বিশেষ করিয়া। ঐ রাজ্য যে কারণেই হউক হইল না, কিন্তু তাহার ব্যবস্থা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা ঠিক মুক্তিফৌজকে সংযত রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই। এই কারণে ঐ সকল পার্ব্বত্য অঞ্চলের মূর্খ জনগণ পরস্পরের অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে শিক্ষিতভাবে অজ্ঞানতাবাদী (জ্ঞানপাপী); অর্থাৎ কোন্‌টা কাহার ক্ষেত বা কোন্‌টা কাহার ধানের মরাই ইহা ঐ সকল মুক্তি-ফৌজের সেনাদিগের কিছুতেই মনে থাকে না। এই অবস্থায় সাধারণ ভাষায় লুঠতরাজ আরম্ভ হওয়ায়; মারপিট ও খুনখারাবি সেই অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী এই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত। কারণ কোন কোন মন্ত্রী মুক্তিফৌজের সহিত পূর্ব্বে জড়িত ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাওয়াইতে গিয়া জলটা নিজেই খাইতে বাধ্য হইবেন না আশা করি।

তিব্বতী লামাদিগের অবস্থা

তিব্বত হইতে চীনা সৈন্যবাহিনী যখন তিব্বতীয় মানবকে নিজেদের ঐতিহ্যময় ধর্মরাষ্ট্রের 'দাসত্ব' হইতে মুক্তি দিবার নামে লামা সরাইগুলি দখল ও লুঠ করিয়া সকল লামা ও তৎসঙ্গে সহস্র সহস্র তিব্বতীয়দিগকে দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য করিল, তখন সেই সকল বৌদ্ধ ধর্ম্মে ও দর্শনে সুপণ্ডিত লামাগণের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দালাইলামা ইঁহাদিগের মধ্যে তিব্বতীয় ধর্ম্ম-রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন ও তাঁহাকেও চীনাগণ লাসার পোটালা প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য করে। সকল লামাগণের অবস্থা সমান ছিল না। পাণ্ডিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিলেও অনেকেরই আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। ভারত সরকার ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া যে ভাবে থাকিতে বাধ্য করিলেন তাহাতে ইঁহাদিগের মধ্যে বহু লামাকেই নিজ নিজ ধর্ম্ম ও দর্শন চর্চ্চা ছাড়িয়া দিতে হইল এবং অনেকেই গ্রীষ্মপ্রবল স্থানে বাস করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কোন কোন স্থান এমন হইল যেগুলিতে পূর্ব্বে বৃটিশগণ রাষ্ট্রীয় বন্দিদিগকে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিত। তিব্বতী পণ্ডিতগণ যে কেন এই সকল কারাগারে বাস করিতে বাধ্য হইলেন এ কথার উত্তর কে দিতে পারে? ভারত-সরকারের আতিথেয়তার আদর্শ কি আমরা তাহার কিছু কিছু পরিচয় বাস্তুহারাদিগের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি। বহু গরীব বাস্তুহারা সুজলা সুফলা পূর্ববঙ্গ-দেশ হইতে নেহেরুর রাষ্ট্র বিভাগ ব্যবস্থার ফলে দূরে দূরান্তরে শুষ্ক ও অনুর্ব্বর স্থলে গিয়া মহাকষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনও অনেকে সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিজয় লাভের ফলভোগ করিতেছেন। নিজের দেশের লোকের প্রতি অন্যায় করিলে তাহার জন্য যে দুর্নাম হয় তাহা দেশেই ঢাকা থাকে, কিন্তু অপর দেশের লোককে আশ্রয়ের নামে কষ্টভোগ করাইলে সে দুর্নাম পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। ভারত সরকারের এই বিষয় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ভারতবর্ষের শীর্ষে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ের মত—যেন এক 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়।' তাঁর প্রতিভা হিমাদ্রির মতই বহু উত্তুঙ্গ শিখর সমন্বিত। সে প্রতিভার বিকাশ বিশ্বতোমুখী এবং উচ্চতা আকাশস্পর্দ্ধী।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কমলহীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে,—আর তার থেকে যে আলো ঠিক্‌রে পড়ে তাকেই বলে কাল্‌চার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।" আজ তাঁর সহস্রাংশু প্রতিভার শুধু একটিমাত্র রশ্মি অনুসরণ করে,—সেই হীরকের একটিমাত্র 'পল' বা facet আমরা দর্শন করব,—তাও অসম্পূর্ণভাবে। এই পরাধীন পতিত জাতিকে জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীন মনুষ্যত্বের কোঠায় উন্নীত করবার জন্য তিনি কি করেছিলেন,—তার একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া মাত্র এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সোভিয়েট কবি বলেছিলেন :—

Arise,—
Our beloved Country groans,—
It calls for deliverance
As it never called before.

মহাকবি প্রার্থনা করেছিলেন,—

"প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান হে,—জাগ্রত ভগবান!"

তিনি অজস্র রূপ ও রীতি, নিত্য নব নব আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গী নিয়ে বঙ্গের সাহিত্য-গগনে যুগ-সৃষ্টির নূতন সূর্যের রূপে উদিত হলেন এবং অশীতি বর্ষ ধরে সমানভাবে তাঁর প্রতিভার সহস্রাংশু ভূগোলের উভয় গোলার্ধে বিকীর্ণ করলেন অমলিনভাবে।

Apollor র মুখে Shelley যে বলেছেন,—

I am the eye with which the Universe
Beholds itself and knows itself Divine,

প্রকৃত পক্ষে ত্যাগ বা বৈরাগ্য এবং অভয় যেন এক পাখীর দুটী ডানা। 'মানুষ বিত্ত অর্জ্জনের দ্বারা বা যক্ষের মত ধন সঞ্চয়ের দ্বারা কখনও মহৎ পদ লাভ করে না,—ত্যাগের দ্বারাই মহিমান্বিত হয়।

অথবা Dryden যে কথা বলেছেন Shakespeare সম্বন্ধে—

"A man so various, that he seemed to be
Not one man but all mankind's epitome"

এই উভয় উক্তিই রবীন্দ্রনাথে তা পরম সার্থকতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যুগন্ধর পুরুষ, জনগণের পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়ন্তা এবং নায়ক,—তাই তিনি জাতির কণ্ঠে তাঁর জনগণমনের ছন্দে ছন্দিত এবং হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত জাতীয় সঙ্গীত দান করতে পেরেছেন। দিকে দিকে জাতীয় পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে। আজ স্বাধীনতার শৈশবে,—নব জীবনের আলোকে—বহুবিধ slogan-এ এবং গানে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। 'বন্দেমাতরম' থেকে 'জয়হিন্দ' পর্য্যন্ত কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা-শ্রমিক এবং কমরেড, কেউ কম 'রেড' নন্ সকলেই দেশপ্রেমিকতার লালে লাল হয়ে উঠেছেন, বিশেষতঃ নির্বাচনের প্রাক্‌কালে। সকলেই বলছেন "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা!"

মহাকবির ভাষাতেই বলি,—

"পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।"

কবির প্রথম দান দেশপ্রেম বা দেশপ্রাণতা যা তিনি বিশেষ করে দিয়েছেন, তাঁর জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে—

১। অয়ি ভুবন মনোমোহিনী
২। 'সার্থক জনম আমার',
৩। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'
৪। 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'
৫। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'
৬। 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা
৭। 'ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে।'

ইত্যাদি গান মোহগ্রস্ত মৃতকল্প জাতির অন্তরে

স্বাধীনতার প্রবল পিপাসা জাগিয়ে তুলে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করে অতি অল্পকালের মধ্যে যে অসাধ্য সাধন করেছিল তার ফলে জাতি স্বাধীনতালাভের পথে বুক বেঁধে দাঁড়াতে পেরেছিল।

তাঁর দ্বিতীয় দান অভয়বাণী: সেদিন সেই সকল-ভয়-ভঞ্জন, অলখ-নিরঞ্জনের নামে কবিগুরু আমাদের কানে প্রতিরোধের অভয় মন্ত্র দিয়েছিলেন। যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে, কারও মনে কুণ্ঠা, কার্পণ্য বা ভয় এসে ভয় দেখায়, তাই শিখগুরুর মুখে কবিগুরু আমাদের অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন,—

'রে পুত্র! ভয় নাহি।'

অনেকেই হয়ত জানেন যে সেদিন বিপ্লবীদের সঙ্গে যেমন থাকত ভগবদ্‌গীতা, তেমনি অনেকেরই কাছে থাকত রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা',—'সঞ্চয়িতা' তখনও প্রকাশ হয়নি।

বন্দার পুত্র শহীদ বালকের মত, এই 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত এবং জাতীয় যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত বালক ক্ষুদিরামের মত পবিত্র প্রাণগুলি মহাকবির স্মৃতিপূজায় চিরদিন শ্রেষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি বলে গণ্য হবে।

কবির তৃতীয় দান ত্যাগের মন্ত্র: গুরু রামদাসের মুখে তিনি শিবাজীকে গৈরিক পতাকা দান করবার প্রসঙ্গে বলেছেন—

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন

আবির্ভাব কাল:—রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়, জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে। তখনও সিপাহী-যুদ্ধের অগ্নি শিখার ধূম এবং বিস্ফোরকের গন্ধকের গন্ধ,—জাতীয় হতাশার মধ্যেও,—পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ-সন্তানদের প্রেরণা এবং উত্তেজনা সঞ্চার করছিল। তখনও গ্যারিবলডি ও ম্যাটসিনির দ্বারা, অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে ইটালির স্বাধীনতালাভ ভারতবর্ষকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

জাতীয় জাগরণের চারণ-কবি:—কূপ-মণ্ডুকের মত অহংসর্বস্ব, আত্মম্ভরি এবং আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদ (Aggressive Nationalism বা Jingoism) তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তথাপি দেখতে পাই তিনি বিশ্বমানবতার সার্বভৌম কবি হয়েও, জাতীয় জাগরণের সেই মহাসন্ধিক্ষণে, আপন চারণকবির কর্তব্য বিস্মৃত হ'ন নি। তাই সেদিন পরাধীনতার যন্ত্রণায় তিনি বলেছিলেন "এ যে বুক ফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে দারুণ মরম বেদনা।" বড়ই দুঃখের বিষয় যে স্বাধীনতা লাভের যুগাধিক কালের পরও, সে দুঃখের অবসান আমাদের আজও হয় নি।

জাতীয়তার সত্য ইতিহাস:—অভিসন্ধিমূলক, মিথ্যা ইতিহাস রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে, দেশপ্রাণ, ত্যাগের প্রতীক, শিবাজীকে, তিনি পার্বত্যদস্যুর কলঙ্কিত নাম থেকে মুক্তি দান করে স্বাধীন রাজার সিংহাসনে গৌরবের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে গুরুদত্ত গৈরিক পতাকা হাতে দিয়ে—অভিষেক করেন এবং শিবজী উৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন।

"অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ, ওগো
মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন হবে
আজি জয়ী"।

ইংরাজ সরকারের স্বরূপ নির্ণয়: তিনি এই পরাধীন, বিদেশীমায়ামুগ্ধ মোহান্ধ জাতিকে চক্ষুষ্মান ও জাগ্রত করলেন। তিনি জানালেন—'সুরঙ্গ পথের অন্ধকারে' ছদ্মবেশী বণিকের রাজ-সিংহাসন পাতা হয়ে গেছে এবং 'বণিকের মানদণ্ড' শর্বরী পোহাতেই 'রাজদণ্ড রূপে' ধরা পড়ে গেছে। তখন জলৌকার শোষণ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে দেশ তখন শাসনে মূর্চ্ছিত এবং শোষণে শোণিতহীন পাংশুবর্ণ হয়ে পড়েছে। তখন 'ধনীর দুয়ারে', 'কাঙালিনী মেয়ে' ম্লানমুখে, বিরস-বদনে, দিনের পর দিন গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসছে। শারদোৎসবের 'সহকার শাখা' এবং 'মঙ্গল কলসে'র উৎসবের দ্যোতনা মিথ্যা এবং ফাঁকির অভিনয়ে পর্যবসিত হয়েছে। পূজা মণ্ডপে খেমটা নাচ চলেছে এবং পূজায় উৎসবে শ্বেতাঙ্গ হুজুরদের মদ্য পান মহোৎসব চলেছে।

ভারতবর্ষের রূপ: তিনি চিত্রতুলিকা গ্রহণের বহু পূর্বেই চিত্রিত করেছেন—দেশমাতৃকার 'নির্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বলা', 'অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চলা',—'শুভ্র তুষার কিরীটিনী' 'ভুবন মোহিনী' মহিমময়ী প্রতিমা,—রেখায় নয়, লেখায়। তিনি নিজেই আবার বজ্রাহত বিদীর্ণবক্ষ হয়ে আর্তনাদ করেছেন—সেই মহিমময়ীর কাঙালিনী রূপ দেখে।

পরিবেশ ও পরিস্থিতি, হিন্দুমেলা ও স্বাদেশিক সভা: —ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, গণেন্দ্রনাথ, যখন বিদেশী বর্জন করে স্বদেশী শিল্পের প্রসার কল্পে 'হিন্দু মেলা' প্রভৃতি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছিলেন, তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ—কৈশোরে পা দিতে

না দিতেই স্বাদেশিকতায় এবং জাতীয়তায় দীক্ষা লাভ করেন। হিন্দুমেলার উদ্বোধন হয় ১৭৬৭ সালে,—জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের প্রায় ১৮ বৎসর আগে।

তখন গোবিন্দ রায়ের,—"কতকাল পরে বল ভারত রে"

রঙ্গলালের,—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে"

দ্বারকানাথের "না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না—"

মনোমোহন বসুর "দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হায় পরাধীন।"

হেমচন্দ্রের "ভারত তবুও ঘুমায়ে রয়" এবং "বাজরে শিঙা বাজ এই রবে"

দ্বিজেন্দ্রনাথের—"চলরে চল সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি আজি করে আহ্বান।"
এবং "মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমার।"

সত্যেন্দ্রনাথের—"মিলে সব ভারত-সন্তান…গাও ভারতের জয়"

গণেন্দ্রনাথের—লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে।'

ইত্যাদি জাতীয় সঙ্গীত, জাতির মনে জাতীয় প্রেমের প্রেরণা যোগাচ্ছিল। হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে দেশের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র দিয়া একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মনে হয় রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে "স্বাদেশিক সভা" বলে যে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তা থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক ভাবধারার উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি সাধিত হয়। নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। তবে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁর পৈতৃকসূত্রে পাওয়া, কারণ ঠাকুর পরিবার সে সময় স্বাদেশিকতার দৃষ্টান্তস্থল ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছিল।"

কংগ্রেস :—১৮৮৬ খৃঃ এ কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গান করেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।

তখনো কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল আরামচেয়ারের উপর। নীতি ছিল আবেদন-নিবেদনমূলক। গভর্ণমেণ্টের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল এই ভিক্ষানীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই আস্থাবান ছিলেন না। তিনি ছিলেন গীতোক্ত ক্ষাত্রবীর্যের বলিষ্ঠ ভাবধারার উত্তরাধিকারী, আত্মশক্তির সাধনায় বিশ্বাসী।

'সাধনা' পত্রিকা ও স্বাদেশিক সাধনার প্রস্তুতি—১৮৯২ সালে জাতীয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার জন্য আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য তিনি 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সমান্তরালে অর্থনৈতিক সংগ্রামও চালাতে হবে। অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের বর্জন এবং স্বদেশী শিল্পের উৎকর্ষ সাধন একই সঙ্গে করতে হবে।

'বন্দেমাতরম' ও রবীন্দ্রনাথ :—রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই বাংলার কংগ্রেসে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম' গানটি সেদিন জাতীয়সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেটির স্বরলিপি করে জাতীয় মহাসভায় গান করেন। ক্রমশঃ সেই বন্দেমাতরম ধ্বনি স্বাধীনতা যুদ্ধের মন্ত্ররূপে যোদ্ধৃগণের প্রাণে উন্মাদনা সঞ্চার করেছিল এবং ইংরাজ সরকারের কর্মচারীগণের আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল। অসংখ্য শহীদ বন্দুকের গুলিতে—অথবা ফাঁসির দড়িতে, প্রাণত্যাগ করবার মুহূর্তে এই মহামন্ত্রে জাতীয় জয়গান উচ্চারণ করে নিজে অমর হয়েছেন এবং জাতিকে এই গৌরবময় মৃত্যুর প্রেরণা দান করেছেন। কাঁথিতে বর্ষীয়সী মহিলা মাতঙ্গিনী হাজরা ১৯৪২ আগষ্ট-আন্দোলনে নেত্রীত্ব করেন। তিনি পতাকা হস্তে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ডান হাতে গুলি বিঁধেছে যখন
বাম হাতে ধ্বজা উচ্চ করি
বুক পাতি করে মৃত্যু বরণ
মরিয়া তবুও পতাকা ধরি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা বহুমুখী :—উল্লাসকর দত্ত বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পেয়েই গেয়ে উঠেন—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জীবন মাগো তোমায় ভালবেসে"।

জাতীয়তার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথের অবদান—অতি বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ এবং পারদর্শী রাজনীতিবিদের মত।

প্রথমতঃ…তিনি দেশের দুর্বলতার প্রথম এবং প্রধান

কারণ দেখলেন ভেদবাদ এবং প্রকোষ্ঠ-পরায়ণতা। জাতিভেদ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-হরিজনাদির স্পৃশ্যাস্পৃশ্য—ভেদ-ভাগ, যাকে কথায় বলে 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি', এই ভেদবাদের প্রতিকারকল্পে এবং নীতি-নিষ্ঠ চরিত্রবান ধর্মনিষ্ঠ যুবক যুবতী গড়ে তোলবার জন্য, শান্তিনিকেতন এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গড়ে তুললেন। পরে আচার্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এসে তাঁকে সাহায্য করেন এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও শক্তি সঞ্চার করেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি দেখলেন যে বিদেশী-বর্জন ও স্বদেশী-সংগঠন না করলে ঐ বণিক সরকারকে আবেদন-নিবেদনের দ্বারা অনুকূল করা যাবে না তাই তিনি শ্রীনিকেতনে ও সুরুলে, কৃষি ও কুটিরশিল্প-সংগঠনে মনোনিবেশ করলেন।

তৃতীয়তঃ—ভারতে হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মবিভাগ আছে। হিন্দুধর্মের মধ্যে আবার অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ এবং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ আছে যার ফলে শতকরা যদি ৫ বা ১০ জনের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে তো বাকী ৯৫ বা ৯০ জন এখনো "যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।" তাই তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বললেন—"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।" তিনি আত্মবিস্মৃত জাতিকে, আত্মসচেতন করতে চেয়েছেন। অলস, বিলাসপ্রিয় ভাবপ্রবণ, কর্মবিমুখ, মুখসর্বস্ব, অনুকরণপরায়ণ বাঙালীকে জাগাবার জন্য বঙ্গমাতাকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন :—

"সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননি !
রেখেছো বাঙালী ক'রে মানুষ করনি "

ধর্মভেদ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে তিনি হিন্দু শব্দকে সঙ্কীর্ণ ধর্ম অর্থে বা religion অর্থে ব্যবহার করেন নি। তিনি বলেছেন হিন্দু শব্দ ও মুসলমান শব্দ একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি ধর্ম। কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাত পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।" "আমার মনে হয় হিন্দু শব্দটি, ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতি, ও জীবন-দর্শন ও জীবন যাপন পদ্ধতির যেন গাণিতিক পরিভাষায়, —এক লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। এই ধর্ম উদার এবং ব্যাপক—মৌলিক অর্থেই প্রযোজ্য। ধারণাদ্ধর্ম ইত্যাহু-ধর্মো ধারয়েতে প্রজা:—ধর্ম ভারতীয় জনগণকে এক আন্তরিক যোগসূত্রে আবদ্ধ করে মালার মত ধারণ করে আছে—সূত্রে মণিগণা ইব।

চতুর্থত: দেশের অর্ধেক—অর্থাৎ সমগ্র নারী-সমাজ, নানাবিধ সামাজিক বন্ধনে, লজ্জায় এবং ভয়ে, অজ্ঞানে এবং কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, জড়ীভূত, মূর্ছিত বা মৃতকল্প অবস্থায় পতিত বা পরিণত। কবি তাদের সুস্থ, মুক্ত এবং প্রাণবন্ত করেছেন,—সমান অধিকার দিয়ে, পুরুষের সহধর্মিণী করে। নারীকে সহমরণের চিতাগ্নি থেকে রক্ষা করেছেন রামমোহন,—তাকে বালবৈধব্যের তুষাগ্নির তিলে তিলে দহন থেকে রক্ষা করেছেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু তার পরেও নারী প্রাণে বেঁচে থাকলেও সমাজ-শরীরে যেন অহল্যার মত পাষাণ প্রতিমা হয়ে বেঁচেই ছিল মাত্র। তার দেহে জাগৃতির আনন্দ, স্বাধীনতা সাধনার প্রেরণা, প্রকৃত বাঁচার মত বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা যোগালেন যাঁরা তাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'হে বিধাতা আমারে রেখোনা বাক্যহীনা রক্তে মোর
জাগে রুদ্রবীণা'।

তাই আজ নারী সমাজ-জীবনের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে গৌরবময় অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

পঞ্চমত:—ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি, তার নিজস্ব সম্পদ ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। সাহেবিয়ানা ও বিবিয়ানার অনুকরণ তিনি একান্ত ঘৃণা করতেন। সেই তরুণ বয়সে তিনি লিখেছেন :—

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে?
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি একি অহঙ্কার?
তার চেয়ে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার।

তিনি সতেরো বছর বয়সে বিলাত গিয়েছিলেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি যে তিনি বাঙালী। তিনি সেখান থেকে স্বদেশী পোষাকেই ফিরেছিলেন।

যদিও সে সময় দেশের শিক্ষিত সমাজ, পোষাক পরিচ্ছদ আসবাবপত্র সবকিছুতেই সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছিল।

তাই প্রার্থনা জানিয়েছেন তিনি মহাজীবনের সাধনার জন্য মহামন্ত্রের :—

"দাও আমাদের অভয়মন্ত্র অশোকমন্ত্র তব
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র দাওগো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্তদীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব
মৃত্যুবরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব"।

ষষ্ঠতঃ—তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জন করে,—'জাত-পাঁত' ভেঙ্গে দিয়ে সর্ববিধ ভেদবাদ পরিহার করে,—তিনি মা'র অভিষেকের মঙ্গল ঘট সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে, ভরবার জন্য সকলকে আহ্বান করেছেন এবং বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশ্বভারতী রচনা করেছেন "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

যেখানে ভেদ বাধা এবং বেড়া সেখানেই তিনি দুঃখ-বোধ করে বলেছেন—

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন যাত্রার

যেখানে ভেদবাদী Rudyard Kipling বলেছেন —the West is West "The East is East and ne'er the twain shall meet" অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় Apartheid প্রচার করেছেন সেখানে অভেদবাদী রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যাঘ্র ও বলীবর্দকে, তাঁর আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বলিষ্ঠ সাধনায়,—একঘাটে জল খাইয়েছিলেন,—"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"। তাঁর কবি-প্রতিভা বিদ্বেষের নয়, প্রেমে এবং আনন্দে অবাধ আদান প্রদানের। তাঁর মতবাদ উদার অসঙ্কীর্ণ বিশ্ব-মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত—যেখানে সকলে "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।"

তিনি বিশ্বমানবকে আলিঙ্গনবদ্ধ করতে চেয়েছেন—নর-দেবতার বন্দনায়, বলেছেন—

"হেথায় দাঁড়ায়ে দুব হু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে
উদার ছন্দে পরামনন্দে বন্দনা করি তাঁরে।"

দেশমাতার নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন বা আত্মসমর্পণ।

—"স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে কহিলাম জোড় করে,
এই লহ মাতঃ এ চির জীবন সঁপিনু তোমার তরে।"

বলিলেন—"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ, তোমারি তরে সঁপিনু প্রাণ
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে এ বীণা তোমার গাহিবে গান।"

পণ করলেন—

"এ বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার বরণে হে ভারত লব শিক্ষা"।

সম্ভবতঃ তাই তিনি প্রথমতঃ স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী কবি, পরে স্বকীয় প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে সার্বভৌম আন্তর্জাতিক কবি বা বিশ্বকবি বলে পরিচিত হন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও রবীন্দ্রনাথ :—বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিরোধকল্পে বাংলায় যে প্রতিরোধকল্পে বাংলায় যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সে আন্দোলনে পুরোভাগেও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ! ইং ১৯০৫ সাল ১৫ই অক্টোবর, বাং সন ১৩১২ সাল ৩০শে আশ্বিন, রবীন্দ্রনাথ সারা বাংলাদেশে গঙ্গাস্নান, অরন্ধন, হরতাল এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে রাখীবন্ধনের বিধান ঘোষণা করেন। তাঁর রাখীবন্ধনের গানটি আজও মিলনের মন্ত্র স্বরূপ হয়ে অন্তরে অন্তরে বিরাজ করছে—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।"

* * *

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হোক, এক হোক এক হোক হে ভগবান।"

এই সময় থেকে বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত করার দিন ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশে বিপ্লবের এক বিপুল বন্যা ব'য়ে গিয়েছিল,—আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল—যার ফলে বাংলার অসংখ্য ছেলে হাসিমুখে ফাঁসি, দ্বীপান্তর এবং কারাগার বরণ করেছে। এদের সকলেরি অন্তর রবীন্দ্রনাথের সহস্রাংশুর উজ্জ্বল কিরণে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমের মহামন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' মুখে নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের উন্মাদনাপূর্ণ গান কানে শুনে, তারা নিঃশঙ্কচিত্তে জীবনকে তুচ্ছ করে বীরদর্পে অসাধ্য সাধন করেছে।

নরমদল ও গরমদল :—রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে গরমদলের প্রতিই সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল দেশকে আত্মনির্ভরশীল করা গঠনমূলক ক্রিয়ার অনুবর্তী। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের মনে এই আন্দোলন negative বা নেতিধর্মমূলক বলে কিয়ৎ পরিমাণে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে মহাত্মাজীর গঠনমূলক তালিকার অধিকাংশ কার্যসূচীই রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী লেখায় বা পরবর্তী কার্যে রূপ গ্রহণ করেছে। উভয়ের এই আন্তরিক মিলের জন্যই মহাত্মাজী পরম শ্রদ্ধাভরে এবং সাগ্রহে কবিকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করেছেন। উভয়ের এই মহামিলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যে কতখানি অগ্রসর করে দিয়েছে তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানেন। পরবর্তী আন্দোলনে কবির অন্তর মহাত্মাজীর আইন-অমান্য-করা অসহযোগের আন্দোলনে ঐকান্তিক ভাবে সাড়া দিয়েছিল। এই সত্যাগ্রহ ও সমাজ-সংগঠনের ভাবধারা তাঁর ১৯২২ খ্রী:এ রচিত 'মুক্তধারা'র রূপক নাটিকায় রূপ গ্রহণ করেছে।

কার্লাইল সার্কুলার ও ছাত্রদমন :—জাতীয় আন্দোলনে যাতে দেশের ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিতে না পারে সেজন্য বাংলা সরকার কুখ্যাত 'কার্লাইল সারকুলার' জারি করেন। যে কোন ছাত্র 'স্বদেশী' সভা সমিতিতে যোগ দেবে বা 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করবে তাকে চিরকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হবে, এই মর্মে। ছাত্রছাত্রীরা এই জুলুমের নিকট মাথানত করে নি। তারা অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটি গঠন করে এর প্রতিবাদ জানায় এবং বিরোধিতা করে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ :—রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি শিক্ষাব্রতী দেশনায়কগণ সংকল্প করলেন, যে বিদেশী সরকারের করায়ত্ত শিক্ষা-প্রণালীর জুলুম থেকে মুক্ত করে, জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে, আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষা পরিষৎএর জন্য অর্থ সাহায্য করলেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, স্যার তারকনাথ পালিত, এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তার প্রধান অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, এর অধ্যাপনার ভার নিলেন। রবীন্দ্রনাথও এতে নানা বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং উৎসাহদান করেছিলেন। কিন্তু পরিচালকদের মধ্যে নানা মতভেদ লক্ষ্য করে, ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে বাধ্য হন। এই সময় তিনি 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামক প্রবন্ধ লিখে উভয় দলকে মিলিয়ে একযোগে দেশের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ : উভয়দলের এই মতভেদ ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিবাদে পরিণত হয় এবং ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে অত্যন্ত বিশ্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীঅরবিন্দকে ইংরাজ সরকার রাজদ্রোহ অপরাধে বন্দী করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যে অপরূপ কবিতাটী রচনা করেন সেটী প্রকাশিত হয় তাঁর নব প্রকাশিত বঙ্গদর্শনে। "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার, হে বন্ধু হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার, বাণীমূর্তি তুমি"।

১৯০৮ খৃঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় পাবনায়। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন উভয় দলকে যদি মিলিয়ে গৃহবিবাদ দূর করে, গঠন শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। এই অধিবেশনে তিনি সভাপতির অভিভাষণ বাংলায় দিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য যে তার ফলে বাংলা ভাষার স্বকীয় মর্যাদা, স্বদেশে এবং বিদেশে, প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল!

পথ ও পাথেয় : এর পরে ঘটে ক্ষুদিরামের বোমা নিক্ষেপের ঘটনা মজঃফরপুরে॥ রবীন্দ্রনাথ এই জিঘাংসু পন্থা যে কল্যাণ প্রসূ হবে না তাঁর "পথ ও পাথেয়" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। কিন্তু ছেলেদের আত্মোৎসর্গ এবং প্রাণবলি দেওয়ার বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন।

অসহযোগ-সত্যাগ্রহের প্রয়োগ-পরিকল্পনা :—মহাত্মা গান্ধীর আফ্রিকার passive resistance এর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ খৃঃএ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন। তা'তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার, তাহার প্রয়োগ সাধনা এবং শক্তির বিপুলতার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজি আফ্রিকায় Passive Resistance সুরু করেন...রাজনৈতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হিসাবে।

সমাজ সংস্কার: রবীন্দ্রনাথের 'তপোবনে' প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি যেমন গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায়, তেমনি কদাচার, কুসংস্কার ও ধর্মের ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির প্রতিও দেখা যায় মর্মান্তিক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর 'অচলায়তন' নাটকে।

জাতীয় সঙ্গীত: ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি উপহার দেন আমাদের বর্তমান জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' ইত্যাদি।

এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ান এবং শান্তিনিকেতন প্রভৃতি দেশ ও জাতিগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে আমরা আজ পেয়েছি বিশ্ব ভারতী নামক বিশ্ববিদ্যালয়কে।

নোবেল পুরস্কার: গীতাঞ্জলিও এই সময়ে প্রকাশিত হয় এবং কবি আধ্যাত্মিক সাধনা ও আরাধনার মধ্যে গভীরভাবে নিমগ্ন হন। ১৯১৩ খৃঃ তিনি 'গীতাঞ্জলি'র জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য: ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য হল এই, যে, ভারত চিরদিন বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং নানাবিধ মতানৈক্যের মধ্যে ঐক্যের এবং সাম্যের সন্ধান পেয়েছে। কবির অভিমত—তিনি সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন—

"এক ঐক্য ও সাম্যের দ্বারা নিখিল মানবের মুক্তিকল্পে তার কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে হবে।"

ছাত্র আন্দোলন: 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে কবি এই কথাই বিশদ করে বলেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্র ও ওটেন ঘটিত ব্যাপারে ইংরেজ সরকার যে নিষ্ঠুরভাবে ছাত্র-দমন করেন তার প্রতিবাদে 'ছাত্র-শাসন' নামে একটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করেন।

শিক্ষার বাহন: 'শিক্ষার বাহন' নামক একটী প্রবন্ধে বাংলা-ভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা দাবী করেন।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম: প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সরকারের খেয়াল-খুশীমত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে এবং নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলফ্রেড থিয়েটারে প্রবন্ধটি পঠিত হয় এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধক্রমে তাঁর আর একটী অবিস্মরণীয় ভারত-বন্দনার প্রাণ মাতানো গান —'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' নামক গানটীও সেইদিন সর্বসমক্ষে গীত হয়।

বেশান্ত ও রবীন্দ্রনাথ: ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয় কলিকাতায়। হোমরুল (Home Rule) পরিকল্পনার জন্য শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তকে সভানেত্রী করা নিয়ে নরম ও গরম দলের মধ্যে আবার বিরোধ বাধে। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, কিন্তু গরম দলের প্রতিই ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। এই বিদেশিনী মহিলার ভারতের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে, তাঁহাকেই প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তিনি সমর্থন করেন এবং তাঁহার সমর্থনেই বেশান্ত সেদিন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নাইটহুড্ ত্যাগ: ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে জালিয়ানাওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কবি ক্ষোভে দুঃখে চার পাঁচ দিন প্রায় অনিদ্রায় অতিবাহিত করেন, অতঃপর তার প্রতিবাদস্বরূপ সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে চেমস ফোর্ডকে যে পত্র লেখেন তা জাতীয়তার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তার অংশ মাত্র উদ্ধৃত করছি:

"The disproportionate severity of the punishment inflicted upon the unfortunate people and methods of carrying them out, are without parallel in the history of civilized Govts....And these are the reasons. which have painfully compelled me to ask your Excellency, with due deference and regret, to release me of my title of Knighthood.

'একতার উপায়': হিন্দু মুসলমানের একতা ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব এই কথাই বুঝাবার জন্য এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য তিনি 'একতার উপায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

ফ্যাসিজম্-এর প্রতিবাদ: ১৯১২ খৃঃ-এ তিনি মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইটালি যান এবং সেখানে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে কঠোর মন্তব্য করেন। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে মানুষকে রাজশক্তির যন্ত্রচালিত পুতুলের মত ব্যবহার করা যে কত বড় বর্বরতা তা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন।

গান্ধীজিকে সমর্থন:—গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র ও অহিংস আন্দোলনকে অমানুষিক অত্যাচারের দ্বারা দমন

করার জন্য তিনি লণ্ডনে "কোয়েকার" সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে দৃঢ়কণ্ঠে কঠোর মন্তব্য করেন এবং ইংরাজের এই কুশাসনের বিরুদ্ধে এই শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহকে সমর্থন করে লণ্ডনের বিখ্যাত 'স্পেক্টেটার' পত্রিকায় একখানি পত্র লেখেন।

রাশিয়ার চিঠি: ১৯৩১ খৃঃঅ রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে 'রাশিয়ার চিঠি' নামক গ্রন্থখানি লেখেন, তাতে তত্রত্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা করেন এবং আমাদের পক্ষেও যে সামাজিক উন্নতির ও শিক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় এইরূপ মত প্রকাশ করেন।

জাতিভেদ ও রবীন্দ্রনাথ: জাতিভেদের প্রতিবাদকল্পে তিনি দুখানি নাটক পর পর রচনা করেন একটি 'শাপমোচন' অপরটি 'চণ্ডালিকা'। বুদ্ধের প্রচারিত জাতিভেদহীনতা, সামাজিক সর্বজনসমতা, প্রেম এবং করুণাই যে একমাত্র কল্যাণের পথ তাই তিনি দেখিয়েছেন। 'অপমান' কবিতায় বলেছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে।
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

নিয়তির মত অমোঘ এবং কঠোর মহাকবির এই ভবিষ্যদ্বাণী। এ যেন আগামী ১৩৫০ সনের ভীষণ এবং ব্যাপক দুর্ভিক্ষের ছবি কবির ধ্যাননেত্রে দেখে লেখা; তার ছবি এঁকেছেন "Bengal Famine" নামক গ্রন্থে পরিসংখ্যানবিদ্ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ।

বিচারের দাবী: স্বাধীনতা লাভের পরও যারা দেশের দুর্গতদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলছেন, কদর্য দালালীর মাধ্যমে অবশ্য-প্রয়োজন অন্নবস্ত্র ঔষধাদির অসম্ভব রকম মূল্য বৃদ্ধি করছেন, এবং হীনতার ও নীচতার চরম সীমায় গিয়ে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল মেশাচ্ছেন, তাঁদের লক্ষ্য করেও কবি ঐরূপ শোকে দুঃখে অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর মতই বলে উঠেছেন—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে,
হেনেছে নিঃসহায়ে—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

এই নিরীহ নিঃসহায়দের প্রতি অত্যাচারের যারা হেতু, সেই বিশ্বাসঘাতক কালোবাজারীদের লক্ষ্য করেই যেন বলেছেন—

'অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।"

ভিসুভিয়াসের তরল অনলোদ্গারের মত কবি বলেছেন,

"যে নপুংসক কোনদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়—আপনার,
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত ন্যায্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়
অন্ন তার অকল্যাণ মাতৃরক্তপ্রায়।
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তি তার
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগার।

মনে হয় কবির এই অভিশাপ—কোন এক অনুশোচনার মুহূর্তে ঐ বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্য ব্যবসায়ীদের জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলবে।

জীবনের দাবী: এদের পার্শ্বে তুলনা করুন বহু বৎসর পূর্বেকার (১৮৯৪ সন) তাঁরি আঁকা আমাদের অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত দরিদ্র বাস্তুহারা ভাইবোনদের ছবি, যা ভাগ্যক্রমে তিনি তত নিকট থেকে দেখে যেতে পারেন 'ন—যেমন আমরা তার বহু বৎসর পরে: স্ব গৃহদ্বারে প্রত্যক্ষ দেখার দুঃখ এবং যন্ত্রণা পেয়েছি এবং ভোগ করেছি। তাদের হয়ে তিনি দাবী করেছেন—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

জাতীয়তার প্রথম সূত্র তিনি নির্ধারণ করে গেছেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

যারা ভাই-ভাই হয়েও ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে পড়েছে তাদের কাছে তিনি দাবী করেছেন—

"ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান—
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সব অসম্মান
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি
যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।

আমাদের অন্তরের প্রদীপ তিনিই জ্বালিয়েছেন। আজ যে কেহ আপনার অন্তরের মধ্যে দেশপ্রেমের হোমানলের অরুন্তুদ অন্তর্দাহ অনুভব করেন তিনিই কবির মর্মপীড়া উপলব্ধি করেন—

"যেন সচেতন বহ্নিসমান নাড়ীতে-নাড়ীতে জ্বলে।"

সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করে, চিরসুখিদের মধ্যে একজন সুখিতম জন হয়েও ব্যথিত বেদনের আশীবিষ-জ্বালা তিনি ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের দ্বারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড :—যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে নরকাগ্নি জ্ব'লে ওঠে, এবং ভারতের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়, তারই মৌরুসী পাট্টা ম্যাক-ডোনাল্ডের কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড। উহার প্রবর্তনের সময় টাউন হলের সভায়—রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন,—

My advice to my countrymen is,—they should ignore this award and focus all treir forces —against irrational communal and class differences, —come to an agreement between ourselvs and thus remove one of the greatest obstacles in the path of our national self-expression."

সংগঠনাত্মক সেবা :—১৯১৮ খৃঃ এরপর রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকে পশ্চাতে রেখে সাহিত্যে ও গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন :—শান্তিনিকেতনে প্রথমে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, পরে বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠা, দ্বাদশবার সমুদ্র ও আকাশ-যাত্রা এবং বিশ্বভ্রমণ, জমিদারীতে সমবায় সমিতি, পাঠশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষাদান, বৃক্ষরোপণ, ইষ্টাপূর্ত (public works) বা জনহিতার্থে কূপ জলাশয়াদি খনন, রাস্তা মেরামত প্রস্তুত করা, জঙ্গল পরিষ্কার দ্বারা পল্লী সংস্কার করা, সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা চাষীদের ঋণমুক্ত করা, শ্রীনিকেতন ও সুরুলে কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্পের প্রসার,—National Council of ducation-এ যোগদান, প্রভৃতির দ্বারা তিনি তরুণ বয়স থেকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অক্লান্তভাবে চেষ্টা ও পরিশ্রম করে গেছেন—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্য দেশের শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য।

হিজলী হত্যার প্রতিবাদ : ৯৩১ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে এই মেদিনীপুর জেলায় হিজলী জেলে নিরস্ত্র বন্দীর উপর বেপরোয়া গুলিচালনার পর কবির অগ্নিগর্ভ বাণী আমরা শুনতে পাই সেই অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে। তিনি মনুমেন্টের নীচে বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন "রক্ষক-নামধারী নরঘাতকদের" বিরুদ্ধে জন-সাধারণের নালিশ জানাবার জন্য।

নেতাজীর প্রতি :—মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কবি বাণী দিয়েছিলেন,—"ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। তা'রা দীপ জ্বালবার জন্য ভুল করে আগুন লাগালো, পথকে করল বিপথ। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আজ নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারাতো নির্ভীক মনে চিরদিনের মত প্রমাণ করে গেছে বাংলায় দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে।

বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ,—তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি—তার নূতনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি,—রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য—পরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি,—এই সকল ক্ষমতাকে ভবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে,—তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে,—নব বসন্তে নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ কর তুমি ......

আজ আমার শেষকর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক,—কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেবো এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছো, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।

সভ্যতার সঙ্কট :—১৯৪১ সনে কবি তাঁর জীবৎ-কালের শেষ জন্মদিনে 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে তাঁর শেষ বাণী দিয়ে যান। আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন,—

"পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতার অভিযানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা অসম্ভব হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে,—মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি,—(অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান,—এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে)—তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।... জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমগ্র মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা

করে আছি,—পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব,—সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে,—মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।"

মিস র‍্যাথবোনের প্রতি:—ভারতবাসীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য মিস র‍্যাথবোন,—বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যা—এক খোলাচিঠি লেখেন দৈনিক সংবাদপত্রে। তিনি বলেন, ভারতবাসীর পক্ষে সেটা কৃতঘ্নতা। রোগশয্যায় শায়িত হয়েও মহাকবি জাতির পক্ষ থেকে কঠোর ভাষায় তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, জাতীয়তার প্রতি, এই তাঁর শেষকর্তব্য পালন।

পূর্বদিগন্তের সে মহামানব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং:—আমার মনে হয়েছে কবি যে মহামানবের আগমন বার্তা সূচনা করে বলেছেন—"ওই মহামানব আসে—দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে" সে মহামানব তিনি স্বয়ং। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার বাণীও তিনি স্বয়ং রচনা করে দিয়ে গেছেন যেন তাঁর মহাপ্রস্থানের পর,—আমরা তাঁকে চিনতে পেরে, তাঁর অবিনশ্বর আত্মাকে ওই অভ্যর্থনা দিয়ে প্রতি জন্মদিনে অভিনন্দন করতে পারি।

চৈতী

অমিতাকুমারী বসু

কোর্টে বিচার চলেছে কদিন থেকেই। আজ বিচারের শেষদিন। খুনের অপরাধে অভিযুক্ত যে যুবকটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে তার মুখ শুকনো, ক্লিষ্ট, চোখের নীচে কালি কিন্তু সে খুনীর মত ভয়ঙ্কর নয়। এত কাঁচ বয়সে সে খুনি, ভাবলে করুণা হয়। ভিড় করে জনতা কোর্টের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে, জজ কি হুকুম দেন শুনতে। আসামী পক্ষের উকীল যথেষ্ট চেষ্টা করলেন আসামীকে বাঁচাতে। কিন্তু বিচার শেষ হলে জুরীদের মত নিয়ে জজ খুনীর ফাঁসীর হুকুম দিলেন। জনতার অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। খুনী রঞ্জন তার ফাঁসীর হুকুম শুনল, চেঁচিয়ে উঠলনা, হাউ হাউ করে কাঁদল না। একবার ভাল করে জজের দিকে চাইল, তারপর দুহাত তুলে নমস্কার করে বল্লে, হুজুর খুব ভাল করেছেন, এবার আমি চৈতীর কাছে যেতে পাব।

পুলিশরা রঞ্জনকে হাতকড়া পরিয়ে কাটগড়া থেকে নামিয়ে জেল-ভ্যানে নিয়ে তুল্ল। জনতাও কলরব করে ওদিকে চল্ল। একবার রঞ্জন ফিরে চাইল, দেখতে পেল, সখারাম আর তার স্ত্রী বুক চাপড়ে আর্ত্তনাদ করছে। দেখতে না দেখতে ভ্যান অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিশ প্রহরী বেষ্টিত ভ্যানে খুনী রঞ্জন চোখ বুজে বসে আছে। ধীরে ধীরে তার চোখে অনেকদিন আগেকার এক মধুর দৃশ্য ভেসে উঠল—

তোর রাগ পড়েছে রে চৈতী? এবার আমায় বিয়ে করবি কি না বল্। উত্তরের অপেক্ষা না করে রঞ্জন কাঁধে এক আঁটি কাঠ আর একহাতে কুড়াল নিয়ে দাঁড়াল। চৈতী আঁচলভরা ফুল আর দুচারটে শুকনো ডাল নিয়ে সঙ্গে চল্ল। বাড়ী তাদের খুব বেশী দূর নয়, সহরতলীর একপ্রান্তে তাদের ছোট ঘরখানা।

রঞ্জনের শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা, পরণে আটহাতি একটা ধুতি। কাঁধে চৌখুপি লাল পাড়ওলা গামছা, বছর উনিশ হবে তার বয়স। চৈতী পরেছে একখানা লালশাড়ি সামনে আঁচল, পায়ে দুগাছা মল, হাতে কাঁচের চুড়ি, গলায় রূপার হাঁসুলী, কানে পেতলের ইয়ারিং। মাথাভরা কোঁকড়া চুল আঁট করে টেনে পেছনে খোঁপা বেঁধেছে। গৌরবর্ণ মুখখানা সুন্দর কোমল, পনের বছরের কিশোরী। চৈতীর মায়ের এককালে সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল, রং তার ফরসা, ধীবরের ঘরে এমন রং দুর্লভ। পাড়াপড়শী অনেক সময় ঠাট্টা করে হেসে বলে, চৈতীর দাদু বোধহয় সাহেব ছিল। চৈতীও তার মায়ের রংই পেয়েছে।

বাপমায়ের একমাত্র সন্তান চৈতী, খুব আদুরে। সখারাম জাতে চীমর (ধীবর) হলেও মাছধরার কাজ ছেড়ে শহরে চাকুরী নিয়ে আছে। স্ত্রী ও মেয়ে চৈতীকে নিয়েই তার সংসার আর সেই সংসারে একটু স্থান করে আছে রঞ্জন।

রঞ্জন হল বাপ মা মরা একছেলে। তার শৈশবেই যখন কলেরায় বাপ ও মা দুজনেই মারা গেল তখন সখারাম নিয়ে এল রঞ্জনকে। চৈতীর তখনও জন্ম হয়নি। নিঃসন্তান দম্পতি নিজেদের ভালবাসা উজার করে দিল রঞ্জনের উপরে। তারপর কয়েক বছর পর যখন চৈতী এসে ঘর আলো করল, তখন তাদের মনে কল্পনা উঁকি দিতে লাগল রঞ্জনকে জামাই করে চৈতীকে ঘরে রাখবার। রঞ্জন চৈতী উভয়েই পাশাপাশি বাড়তে লাগল গরীবের কুটিরে পরমানন্দে।

তারপর চৈতী আর রঞ্জন যখন কিশোর কিশোরী তখন দেখা যেত চৈতী রান্না করে, রঞ্জন কলসী ভরে জল আনে। রঞ্জন কাঠ কাটে, চৈতী কাঠ কুড়ায়। ভোরে উঠে দুজনে টুকরী করে মাঠে মাঠে যে গোবর পড়ে থাকে, তাই তুলে এনে বসে ঘুঁটে দেয়। চৈতীর বয়স বাড়ছে,

কিন্তু মা বাপ পরম নিশ্চিন্ত, চৈতীর ঘরবর বাঁধা আছে কোন ভয় নেই।

একদিন সখারাম এসে হাসিমুখে ডাকলে, ও চৈতীর মা, এদিকে এসে শুনে যা। চৈতীর মা বল্লে, কি হয়েছে, আজ যে এত খুসী ?

সখারাম বল্লে আমাদের চৈতীর বরাত ভাল। রঞ্জনকে কাপাসের মিলে ঢুকিয়ে দিয়েছি, মাইনে ত্রিশ টাকা। আসছে বছর এমনি দিনে চৈতীর বিয়ে দিয়ে দেবো। চৈতীটা আর একটু বড় হোক। রঞ্জনও টাকাপয়সা জমাক, ওদের নতুন সংসার পাততে হবে।

রঞ্জন কার্পাস মিলে ভর্ত্তি হয়েছে। এখন থেকে ভোরে উঠে চা খেয়ে তৈরী হয়ে নেয়। চৈতীর মাও সেই সময় উঠে পড়ে দুখানা বড় জোয়ারের রুটি ভেজে, বেশমে একটু নুন লঙ্কা দিয়ে ঘন ডালের মত তৈরী করে। তারপর একটুকরা কাপড়ে সেই রুটি, বেশমের ঝুনকা, ঝাল, আমের আচার আর দুটি পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা সযত্নে বেঁধে দেয় দুপুরে খাবার জন্য। রঞ্জন তাই নিয়ে নতুন উৎসাহে মিলে চলে যায়, আর সন্ধ্যেয় ফিরে আসে ক্লান্ত হয়ে। হাতমুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেয়ে যে ঘুম দেয় সে ঘুম ভাঙ্গে একবারে ভোরে।

যখন থেকে রঞ্জনের সঙ্গে চৈতীর বিয়ের কথা সখারাম তুলেছে তখন থেকে দুজনের মধ্যে বিশেষ বাক্যালাপ হয়না, কিশোরী চৈতীর কেমন একটা সঙ্কোচ এসে গেল, চৈতী আগের মত রঞ্জনের সঙ্গে যখন তখন আলাপ আর খুনসুটি করে না। রঞ্জনও মিলের কাজ নিয়েই ব্যস্ত গল্প আড্ডা দেবার ফুরসৎ নেই, কার্পাস মিলটা যেন দুজনের মনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল।

প্রায় পাঁচ ছয় মাস কেটে গেছে। রঞ্জন মিলে কাজ করছে, মাস কাবারে টাকা এনে চৈতীর মায়ের হাতে তুলে দেয়। চৈতীর মা একগাল হেসে টাকাগুলো তুলে নিয়ে সযত্নে জমিয়ে রাখে।

এক রবিবারে রঞ্জন খেতে বসেছে—এই রবিবারটাই শুধু তার আরামের দিন। চৈতীর মা খাওয়াতে খাওয়াতে বলছে, আসছে ফাগুনে তোদের দুজনের হাত এককরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। চৈতী রুটি ভাজছিল। রঞ্জন আড়-চোখে একবার তার দিকে চেয়ে দেখল আগুনের তাতে চৈতীর ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, আর সুগোল সুন্দর হাতে রুটির পর রুটি সেঁকছে। সাধারণ একখানা রঙীনশাড়ী চৈতীর পরনে, তবু সমস্ত শরীরে যেন লাবণ্য উথলে পড়ছে। রঞ্জন নীরবে খেয়ে উঠে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল, মধুর কল্পনার আবেশে তার দেহমন তৃপ্ত হয়ে উঠল।

* * * *

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দলে দলে যাত্রীরা এসে শহরের বাইরে ভীড় করতে লাগল। তারা ওঙ্কার মান্ধাতায় নর্ম্মদানদীতে স্নান করে মহাদেবের পুজো দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবে। শিবরাত্রির উৎসব শেষ হলে সখারামের বাড়ীতে অতিথি এল তার বহুদিনকার পুরানো সাথী সুন্দরলাল, তার স্ত্রী আর একছেলে। সখারাম খুব খুসী হয়ে চৈতী আর তার মাকে ডেকে বল্লে, ভাল করে রান্না করো, আমার বন্ধু এসেছে। চৈতীকে বল্লে তোর কাকাকাকীকে প্রণাম কর।

সুন্দরলাল আর তার স্ত্রী চৈতীকে দেখে তার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে গেল।

সুন্দরলাল অবস্থাপন্ন লোক, গাঁয়ের মোড়ল-লোকেরা তাকে মান্য করে চলে। তার অনেক জায়গাজমি। তাতে সম্বৎসরের ধান গম ডাল উৎপন্ন হয়, গোয়ালে গরু মোষ দুইই আছে। তার একমাত্র ছেলে শোভনলাল বলিষ্ঠ যুবক। শহরে সরকারী ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার, বেশ মাইনে পায়। সখারাম ধরে বসল শোভনলালের সঙ্গে চৈতীর বিয়ে দিতে হবে।

এ বিয়ের প্রস্তাবটা আশাতীত লোভনীয়। তবু সখারাম ইতঃস্তত করতে লাগল চৈতীর মায়ের কাছে প্রস্তাবটা তুলতে। মনে পড়ল কচি শিশু রঞ্জনকে নিয়ে তারা স্বামী স্ত্রীতে কত সোহাগ-আহ্লাদ করত। চৈতীর জন্মের পরেই চৈতী বড় হলে তার সঙ্গেই রঞ্জনের বিয়ে দেবে এই ঠিক করে রেখেছে। ছোট থেকে চৈতী আর রঞ্জন জানে বড় হলে তাদের দুজনের বিয়ে হবে।

সখারাম বন্ধুকে সবকথা খুলে বল্ল, কিন্তু সুন্দরলাল

নাছোড়বান্দা, সে বলল এটা তো আরো ভালকথা। রঞ্জন তোমার ছেলের মত, তাকে বিয়ে দিয়ে সুন্দর বউ আনবে। আর চৈতীকে বিয়ে দিয়ে জামাই পাবে! তোমারই তো লাভ। চৈতীর বিয়েতে তোমার কিছু করতে হবে না। আমি সমস্ত খরচ বহন করব, তাছাড়া চৈতীকে দুচারখানা সোনার গয়নাও তৈরী করে দেব।

সখারাম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বল্ল, ভেবে দেখি। আর ভাবাটাবা নয় পাকা কথা, বলে সুন্দরলাল দুতিন দিন সখারামের বাড়ীতে বিশ্রাম করে স্ত্রী পুত্র সহ একদিন রওয়ানা হল নিজ গ্রামে।

সখারাম সুযোগ বুঝে একদিন ধীরে ধীরে চৈতীর মাকে কথাটা খুলে বল্ল, কিন্তু চৈতীর মা চমকে বলে উঠল, সে কি, চৈতীর জন্মের পর থেকে ঠিক করে রেখেছি রঞ্জনের সঙ্গে তার বিয়ে দেব। আর রঞ্জন চৈতীও জানে সেকথা, আমি চাইনে সোনাদানা। সেদিনের মত কথাটা এখানেই চাপা পড়ল।

অতিথিরা চলে গেলে রঞ্জন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, একে তো অতিথি-সমাদরের চোটে তার খাওয়ার দিকে কারো দৃষ্টি ছিলনা, তাছাড়া শোভনলালকে দেখলেই তার মনে একটা বিরক্তি আর ঈর্ষা জাগতো, কেন তা সে নিজেও জানেনা। খুসী মনে বল্লে, চৈতী, ওরা চলে যাওয়াতে বাঁচলাম, এই কয়দিন কি হৈ চৈ চলছিল, না রে? চৈতী কোন উত্তর দিল না, রঞ্জন একটু ক্ষুব্ধ হল।

ওদিকে সুন্দরলাল দমবার পাত্র নয়, সে চৈতীকে তার ছেলের বৌ করবেই। তাই সখারামকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে রাজী করাল। সখারামও দিনের পর দিন চৈতীর মাকে তার চৈতীর ভবিষ্যত সুখের রঙীন চিত্র এঁকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। চৈতীর মার মনে দুটা চিত্র ভাসতে লাগল। ধনীর গৃহিনী হয়ে চৈতী এক গা সোনার গয়না পরে সুখে থাকার চিত্র। আর রঞ্জন চৈতীর বিয়ে হলে মাতৃপিতৃহীন রঞ্জনের ভবিষ্যত সুখের চিত্র, এই দুই কল্পনার মধ্যে তার মন দোটানায় পড়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত ধনেরই জয় হল, চৈতীর মা এই বিয়েতে মত দিল।

এ পর্য্যন্ত সে রঞ্জনকে কোন কথাই খুলে বলতে পারে নি। তবু যেন হঠাৎ ঝিম খেয়ে যাওয়া পরিবারের লোকদের ভাবে স্বভাবে রঞ্জন যেন কিছুটা আঁচ করতে পারল। একটা অশুভ কিছু ঘটবে এম্নি তার মনে হতে লাগল। মনের এই অস্বস্তিকর ভাব নিয়ে রঞ্জন মিলে কাজ করছে। একদিন তার কিছুতেই কাজে মন বসল না, সে অসুস্থ এইকথা বলে ছুটি নিয়ে দুপুরে বাড়ী চলে এল। এসে দেখতে পেল সুন্দরলাল তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে হাসিমুখে গল্প-সল্প করছে সখারামের সঙ্গে।

রঞ্জনকে দেখেই সখারাম চমকে বলে উঠল, একি রঞ্জন অসময়ে যে চলে এলি?

সুন্দরলাল বল্লে, ভালই হল। ও সঙ্গে থাকলে বিকেলে বাজারটা সেরে আসব। কাল ভালদিন চৈতীকে আশীর্ব্বাদ করে বিয়ের দিন লগ্ন ঠিক করে যাব।

সুন্দরলালের কথাগুলো যেন রঞ্জনের কানে সীসা ঢেলে দিল, সে টলতে টলতে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল। চৈতীর মা কলতলায় জল আনতে গিয়েছিল। ঘরে রঞ্জন অসময়ে শুয়ে আছে দেখে তাড়াতাড়ি জলের ঘড়া নামিয়ে কাছে গিয়ে বল্লে, কি হয়েছে বেটা, এমন শুয়ে আছিস কেন? জ্বরটর আসেনি তো? বলে কপালে হাত দিয়ে দেখল গা গরম কিনা। রঞ্জন নিঃশব্দে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

চৈতীর মা বিষয়টা বুঝতে পারল, ধীরে ধীরে বল্ল কি করব বেটা, ওর ছেলেবেলার বন্ধু নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে বসে আছে চৈতীকে তার ছেলের বৌ করবেই। তার ছেলে শহরে বেশ ভাল চাকরী করে, চৈতী সোনাদানা পরে সুখে থাকবে। আমি তোর জন্যে রাঙাবৌ ঘরে আনব।

চৈতীর মার এক একটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনের বুকে যেন হাপড় পড়তে লাগল। রঞ্জন সেদিন উঠল না, খেল না। পরদিন ভোরে উঠে চলে গেল।

বেলা বারোটার সময় শুভক্ষণে সুন্দরলাল পাড়ার লোক ডেকে চৈতীকে আশীর্ব্বাদ করে হাতে দিল একটা ফুল-তোলা শাড়ী আর এক জোড়া সোনার ইয়ারিং, পাড়া-পড়শীর হাতে দিবার জন্য একহাড়ি বাতাসা আর পান সুপারী। বিয়ের দিন স্থির হল আটাশে ফাল্গুন। সুন্দর-

লাল তার বলদটানা গাড়ীতে বসে নিজ গ্রামে চলে গেল প্রফুল্ল মনে। সুপুষ্ট একজোড়া শাদা বলদ প্রায় ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে চল্ল আর তাদের গলার ঘুঙুর বাজতে লাগল টুং টুং টুং।

চৈতী সোনার ইয়ারিং আর ঘড়ি পেয়ে খুশী হল কিনা কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু রঞ্জন বেশ রাত করে ঘরে ফিরল, চেহারা উগ্র চুলগুলো উস্কখুস্ক, চোখ দুটা লাল, পাগলের মত অর্থহীন দৃষ্টি। রঞ্জনকে সে রাতেও খাওয়ানো গেলনা, সে কারো সঙ্গে কোন কথা বল্ল না। পরদিন রবিবার অনেকবেলা অবধি সে খাটিয়ায় শুয়ে রইল। মিলের ছুটি, মনে হল তার জীবনেরও ছুটি, উঠতে গেল পারল না, তার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন কে কেড়ে নিয়েছে, সে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে রইল।

* * * *

বেলা হলে চৈতী এসে ডাকল রঞ্জন খেতে এসো। রঞ্জন খপ করে চৈতীর হাত ধরে বলল, চৈতী সত্যি করে বল্ তুই আমাকে বিয়ে করবি কিনা। চৈতী হাত ছাড়িয়ে বল্লে, আমি কি জানি? রঞ্জন বললে, চৈতী তুই বড় লোকের গিন্নী হবি তাই বুঝি বলছিস আমি কি জানি? না আমি ছাড়ব না। বল্, সকাল বেলায় সত্যি করে বল্ তোর কি ইচ্ছে।

চৈতী হঠাৎ কঠিনভাবে বলে উঠল, হাত ছাড়, বিয়ের আমি কি জানি, মা বাবা যা ভাল বোঝে তাই করবে।

রঞ্জন হাত ছেড়ে দিল, দাঁত কড়মড় করে উঠল, কিছুক্ষণ দুহাতে মাথার শিরা চেপে ধরল, মাথার ভিতরে যেন রক্তের তাণ্ডব-নৃত্য চলছে। রঞ্জন টলতে টলতে উঠল, ঘরের পেছনে তার কুড়ালখানা পড়েছিল সেটা গিয়ে নিয়ে এল, তারপর কাঁধে লাল গামছাখানা ফেলে হন হন করে জঙ্গলের দিকে ছুটল। সে পাগলের মত এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। এক একটা গাছে কোপ দেয় আর বলে ধনীর ঘরণী হবি, আচ্ছা দেখা যাবে। সারাটা দুপুর তার জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কাটল, একবার বসে একবার শুয়ে পড়ে, আবার এক সময় উঠে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক ঘোরে। চোখ দুটো যেন জবাফুল, চেহারাটা কেমন রুক্ষ হয়ে উঠল। রঞ্জন খানিকক্ষণ বসে কি যেন মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করল, তারপর কুড়লটা তুলে পাথরে প্রাণপণে ঘসতে লাগল। কুড়ালটা ঘসা খেতে খেতে গরম হয়ে রোদের কিরণে ঝলমল করতে লাগল। রঞ্জন কুড়াল নিয়ে ঘরে ফিরে চল্ল, দৃষ্টি তার উদ্‌ভ্রান্ত।

* * * *

বেলা অপরাহ্ণ, চৈতীর মা চলে গেছে বাজারে, সখারাম গেছে শহরে কাজে, চৈতী একা বসে বসে রাতের রান্নার আয়োজন করছে। কুড়াল হাতে নিয়ে রঞ্জন দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল। কার্য্যরতা চৈতীর দিকে চেয়ে রইল। গরীবের ঘরের মেয়ে, কিন্তু কি তার রূপ, সাধারণ বেশভূষায়ও তার সৌন্দর্য্য যেন উপচে পড়ছে সমস্ত শরীরে যৌবনের মাধুরী ফুটে বেরুচ্ছে।

রঞ্জন দেখছে আর ভাবছে এত সুন্দরী চৈতী সে তো আমারি, আর আজ শোভনলাল এসেছে তাকে কেড়ে নিতে। সে কে, কে নেবার, দেবনা দেব না আমি, জোরে চেঁচিয়ে উঠল রঞ্জন। হাত তার বজ্রমুষ্টি হয়ে গেল, চোখ দুটো থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। চৈতী আচমকা চীৎকার শুনে রঞ্জনের দিকে চেয়ে তার উগ্র চেহারা দেখে ভড়কে গেল। জিজ্ঞাস করলে রঞ্জন কি হয়েছে, কি দিবিনে?

রঞ্জন ছুটে গিয়ে চৈতীর হাত চেপে ধরে বল্লে, চৈতী তুই আমার, তোকে আমি শোভনকে দেব না দেব না। আমার এতদিনের সাধ আশা শোভন ভেঙ্গে দেবে, না, না, সে হবে না।

চৈতী তার হাত ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল, বল্লে রঞ্জন, হাত ছেড়েদে কি বাজে বকছিস?

বাজে বকছি? তুই কি জানিসনে চৈতী, তুই আমার কি? আর আজ তুই বলছিস আমি বাজে বকছি?—না চৈতী, তুই একবার বল্ তুই আমার, আমি এ বিয়ে যে ভাবেই হোক ভেঙ্গে দেব।

চৈতীর মনে কি হচ্ছিল কে জানে, সে নিশ্চুপে প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। রঞ্জন তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, শিগ্‌গির বল্ তুই কার, আমার না শোভনের?

চৈতী এবার শান্তভাবে জবাব দিলে—জানিনে।

তাহলে সোনাদানার লোভে তোরও এই মত ? ধনীর ঘরণী হবি, তবে হ। রঞ্জনের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, বাহুর মাংসপেশী ফুলে উঠল, চোখমুখ লাল-টক্‌টকে হয়ে গেল। চোখের নিমেষে রঞ্জন দুপুর বেলার ধার দেওয়া চক্‌চকে কুড়াল তুলে চৈতীর ঘাড়ে দিলে এক কোপ, এবার বলল কি করে শোভন তোকে নেয় দেখ্‌ব।

চৈতীর শেষ ডাক মাগো বলতে না বলতেই তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রঞ্জনের পায়ের কাছে পড়ল। চৈতীর গরমরক্ত ফিন্‌কি দিয়ে রঞ্জনের চোখ মুখ ভিজিয়ে দিল। তার হাত থেকে রক্তমাখা কুড়াল মাটিতে খসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনও বেহুঁস হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল তখন শুনতে পেল মথারাম আর চৈতীর মায়ের বুকফাটা আর্ত্তনাদ, দেখতে পেল, উত্তেজিত জনতা আর লাল পাগড়ী পুলিশ।

রঞ্জনের হাতে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে দিল, রঞ্জন লাল টক্‌টকে রক্তে-ভেজা চৈতীর দেহহীন মুখ দেখে শিউরে উঠে চোখ বুজল।

* * * *

উঃ মাগো, বলে রঞ্জন দুচোখ রগড়াতে চাইল, বুঝি দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি পেতে। আর সাতদিন পর তার ফাঁসী।

মধ্যপ্রদেশের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

রামানুজন্

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

শ্রীনিবাস রামানুজন্ আইয়েঙ্গার একজন প্রতিভাসম্পন্ন গণিতশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। মাদ্রাজের ট্যাঞ্জোরা প্রদেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা ও পিতামহ কাপড়ের দোকানে সামান্য গোমস্তার কাজ করিতেন। তাঁহার মাতা ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মহিলা। রামানুজনের পিতামাতার বিবাহের পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁহারা নমাকাল সহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নমগিরির কাছে গিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইতে থাকেন একটি পুত্ররত্নের জন্য। অবশেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর মাতুলালয় ইরোড্ নামক গ্রামে রামানুজন জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহাকে একটি অতি সামান্য পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। দুই বছর পরে কুম্বাকোনাম্ নামক সহরের টাউন স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং এইখানেই স্কুলের পড়াশুনা শেষ পর্যন্ত করেন। ১৮৯৭ সালে প্রাইমারি পরীক্ষায় ট্যাঞ্জোর জেলায় তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন যাহার দরুণ তিনি স্কুলে পরবর্তিকালে অর্দ্ধবেতনে পড়ার সুবিধা পান।

এই অল্প বয়সেই বালক রামানুজন ধীর স্থির ও শান্ত-প্রকৃতি এবং চিন্তাশীল ছিলেন। এই সময় তিনি আকাশের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে জিজ্ঞাসা করিতেন—আকাশের ঐ অসংখ্য তারা পৃথিবী থেকে কত দূরে? ক্লাসের পড়াশুনায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেন বলিয়া সহপাঠিরা অনেকেই তাঁর বাড়ীতে যাইত। কিন্তু বালক রামানুজনকে তাঁহার পিতামাতা ছেলেদের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন না বলিয়া জানলায় দাঁড়াইয়া পথে দণ্ডায়মান সহপাঠিদের সঙ্গে কিছুকাল কথাবার্তা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন।

যখন রামানুজন দ্বিতীয় ফর্মে পড়িতেন তখন তাঁহার মনে জিজ্ঞাসা জাগিল অংকশাস্ত্রের মূল তথ্য কোথায় পাওয়া যায় এবং পিথাগোরাসের কেতাবে ডুবিয়া গেলেন। আবার কখনো Stocks and Shares এর অংক কষিতে থাকেন। যখন তিনি তৃতীয় ফর্মে পড়েন তখন শিক্ষক একদিন ক্লাসে বুঝাইতেছেন যে, কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল ১ হয়, তখন বালক রামানুজন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—যদি শূন্যকে শূন্য দিয়া ভাগ করা যায়?

স্কুলে চতুর্থ ফর্মে পড়িতে পড়িতেই তিনি ত্রিকোনমিতি অধ্যয়ন করিতে মাতিয়া গেলেন এবং একজন বি, এ, ক্লাসের ছাত্রের কাছ হইতে Loney's Trigonometry দ্বিতীয় ভাগ মাঝে মাঝে চাহিয়া আনিয়া পাঠ করিতেন এবং তাহা এতই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন যে ঐ বি, এ ক্লাসের ছাত্র তাঁহার কাছে আসিয়া কঠিন কঠিন জায়গা তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়া লইত।

১৯০৩ সালে তিনি যখন পঞ্চম ফর্মে পড়িতেছেন তখন তাঁহার এক বন্ধুর মারফৎ গবর্ণমেণ্ট কলেজের একখানি বই যোগাড় করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার জ্ঞানার্জনের নূতন পথ খুলিয়া দিল। বইখানি ছিল—Carr's Synopsis of Pure Mathematics. রামানুজন তাহা পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। তিনি জ্ঞানের নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন। এই বইখানি তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। ইহাতে অংকশাস্ত্রের যে সকল সমস্যার উল্লেখ ছিল, রামানুজন একটি একটি কষিয়া তাহার সমাধান করিতে মাতিয়া বা ডুবিয়া গেলেন। তিনি কাহারো সাহায্য লইলেন না। নিজেই গবেষণা করিতে লাগিলেন এবং অপার আনন্দে মগ্ন হইলেন। তিনি জ্যামিতির জটিল উপপাদ্য, বীজগণিতের পুংখ্যানুপুংখ্য অংক কষিয়া

যাইতে লাগিলেন। রামানুজন বলিতেন যে নামাক্কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি তাঁহার পিতামাতার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তাঁর জন্ম দিয়াছেন, সেই নমগিরি দেবীই অংকশাস্ত্রের জটিল সমস্যার সমাধান তাঁহার কাছে করিতেছেন, বিশেষ করিয়া যখন তিনি সমস্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে রাতে ঘুমাইয়া পড়েন তখন স্বপ্নে দেবী নমগিরি আসিয়া তাঁহার সমস্যার সমাধান করিয়া দেন। তাই প্রাতঃকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই সর্বপ্রথমে সেই সদ্যপ্রাপ্ত সমাধানগুলি লিখিতে বসিয়া যাইতেন। এই সকল সমাধানগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া পরে অংকশাস্ত্রজ্ঞগণকে দেখাইয়া মুগ্ধ করিতেন। এ সকলই ঐ স্কুলে পাঠকালের ব্যাপার।

তারপর ১৯০৩ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন এবং কুম্বাকোনাম গবর্ণমেণ্ট কলেজের এফ, এ ক্লাসে ভর্তি হন। অল্পকাল পরেই সুব্রমানয়ম-বৃত্তি লাভ করেন তাঁহার অংকশাস্ত্রে ও ইংরেজী সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য। কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে, এই সময় তিনি অংকশাস্ত্রে এতই মগ্ন হইয়া থাকিতেন যে, অন্যান্য বিষয়ে একেবারেই মন দিতেন না, এমনকি সেই সব বিষয়ের ক্লাসের সময় অধ্যাপকের বক্তৃতা না শুনিয়া মাথা গুঁজিয়া নানা অংক কষিয়া যাইতেন। ইহার ফলে বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি ফেল হইলেন, প্রমোশন পাইলেন না এবং বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল। এই সব কারণে এতই তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন যে, একজন বন্ধুর সাহায্যে দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া অন্ধ্রপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন। উদ্‌ভ্রান্তভাবে কিছুকাল উদ্দেশবিহীন ভ্রমণ করিবার পরে কুম্বাকোনামে ফিরিয়া আসেন এবং আবার কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার দরুণ শেষ পর্যন্ত কলেজ হইতে পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলেন না এবং প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ১৯০৭ সালে এফ, এ, পরীক্ষা দিলেন কিন্তু পাশ করিতে পারিলেন না। ইহার পর কিছুকাল তিনি বিশেষ কোন কাজে পড়াশুনায় লাগেন নাই। কিন্তু নিজের সখের অংক অনবরত কষিয়া বিস্তর খাতা ভরিয়া ফেলিলেন, যাহা পরবর্তিকালে পণ্ডিতমহলে বিস্তর সমাদৃত হইয়াছে।

১৯০৯ সালে তিনি বিবাহ করিলেন এবং সংসারজীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু একে দরিদ্র পরিবারের ছেলে তায় উপর ফেল করা ছাত্র, উপার্জনের কোন পন্থাই খুঁজিয়া না পাইয়া দারুণ বিপদে পতিত হইলেন। দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া গেলেন তিরুকৈলুর নামক ছোট এক শহরে যেখানে মিষ্টার ভি, রামস্বামী আইয়ার ছিলেন ডেপুটি কালেক্টার যিনি ইণ্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া যুবক রামানুজন তাঁর অংকের খাতা সকল দেখাইলেন ও একটি কেরাণীর চাকরীর জন্য প্রার্থী হইলেন। এই ভদ্রলোক নিজেই ছিলেন একজন উচ্চস্তরের গণিতশাস্ত্রজ্ঞ এবং যখন রামানুজনের খাতায় তাঁর কথা আশ্চর্য অংকরাশি দেখিলেন তখন বুঝিলেন যে সামান্য কেরাণীর কাজে ইঁহাকে নিযুক্ত করিলে প্রতিভা বিকশিত হইবে না। তাই তিনি তাঁহাকে মাদ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন এবং মিঃ পি, ভি, শেশু আইয়ারের কাছে একখানি সুপারিশপত্র রামানুজনের হাতে দিলেন। মিঃ শেশু আইয়ার রামানুজনকে অস্থায়ীভাবে একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিসে একটা ভাল চাকরী কিছুকালের জন্য দিলেন। কিন্তু ইহার মেয়াদ ফুরাইলে কয়েক মাস প্রাইভেট-টুইশনি করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিলেন। তথাপি মিঃ শেশু আইয়ার কয়েক মাস পরেই মফঃস্বল সহর নেলোরের কালেক্টার দেওয়ান বাহাদুর আর, রামচন্দ্র রাওয়ের নিকট রামানুজনকে পাঠাইয়া দিলেন একখানি সুপারিশপত্র সহ। কিন্তু তিনিও দেখিলেন ছেলেটি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এবং সেই জন্য একটা মফঃস্বল সহরে পড়িয়া থাকিলে তাহার প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইবে না তাই তিনি আবার মাদ্রাজেই ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর উপযুক্ত কর্ম না পান, রায়বাহাদুর তাঁর ব্যয়ভার বহন করিতে চাহিলেন। কিন্তু রামানুজন অপরের ভারগ্রস্ত হইয়া থাকিতে রাজী না হইয়া মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে মাদ্রাজ পোর্টট্রাষ্টের অফিসে একটা চাকরী যোগাড় করিয়া নেন। কিন্তু নেশা ঐ গণিতশাস্ত্রের চর্চায় অবসর সময় ক্ষেপণ করিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্নেল অব ইণ্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল

সোসাইটিতে গণিতের প্রবন্ধ পাঠাইতে থাকেন। এই সকল লেখাদ্বারা তাঁহার খ্যাতি ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

এই সময় বিলাতে বিখ্যাত গণিতবিদ্ মিষ্টার জি, এইচ, হার্ডি ছিলেন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো', যাঁর লেখা নানা গণিতসংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত হইত। মিঃ শেশু আইয়ার এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকের উপদেশ অনুসারে ১৯১৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে মিষ্টার হার্ডিকে রামানুজন এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি শেষের দিকে লিখিলেন যে মিষ্টার হার্ডির বিশেষ একটা লেখা যাহা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, রামানুজন তাহা পড়িয়াছেন এবং ঐ সংক্রান্ত নানা সমাধান রামানুজন নিজে যাহা করিয়াছেন তাহা ঐ চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। সেই সঙ্গে আরও শতাধিক গণিতের গবেষণায় যাহা রামানুজন করিয়াছেন তাহাও পাঠাইয়া দেন। মিঃ হার্ডি সেই সব দেখিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া যান এবং উৎসাহপূর্ণ প্রত্যুত্তর দেন। তার পর দ্বিতীয় পত্র রামানুজন লেখেন ২৭শে ফেব্রুয়ারী। তাহার একস্থানে লেখা ছিল—"I have found a friend in you who views my labours sympathitically. This is already some encouragement to me to proceed.***

To preserve my brains, I want food and this is now my first Consideration. Any sympathitic letter from you will be helpful to me here to get a scholarship either from the university or from the Government." কিন্তু এই চিঠি পাইবার পূর্বেই হার্ডি সাহেব লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের সম্পাদকের কাছে রামানুজনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এই প্রতিভাসম্পন্ন যুবকটিকে কোন প্রকারে কেম্ব্রিজে আনিয়া উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। হার্ডি সাহেবের এই মন্তব্য পাইয়া লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের সম্পাদক মাদ্রাজের ছাত্র-উপদেশ-মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের গোচর করেন এবং তাহারা রামানুজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কেম্ব্রিজে যাইতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু সাগর-পাড়ি দিলে জাতিচ্যুত হইবেন এই ভয়ে তিনি রাজী হইলেন না।

অপর দিকে রামানুজনের ব্যাপারটা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে উঠিল। সিমলার মানমন্দিরের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর জি, টি, ওয়াকার কার্য্যোপলক্ষে মাদ্রাজে আসিয়াছিলেন এবং রামানুজনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন যে এই প্রতিভাবান যুবককে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কাজে লাগানো উচিত। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় রামানুজনকে ৭৫ টাকা মাহিনায় একজন গবেষকরূপে নিযুক্ত করিলেন যাহাতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে গণিতের সমস্যা সকল সমাধান করিতে পারেন।

কিন্তু রামানুজন কেম্ব্রিজে যাইতে রাজী না হওয়ায়, ওদিকে বিলাতে হার্ডি সাহেব বিশেষ দুঃখিত হইলেন। তথাপি আশা না ছাড়িয়া সুযোগ খুঁজিতেছিলেন এবং সুযোগ একটা জুটিয়াও গেল: কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো Mr. E. H. Nerville-কে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ করিল মাদ্রাজে গিয়া ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটা বক্তৃতা দিবার জন্য। Mr. Hardy এই সুযোগে Mr. Nerville-কে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তিনি যেন রামানুজনকে পাকড়াও করিয়া বিলাত পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। Mr Nervile-র কথাবার্তায় এবং বন্ধুদেরও পরামর্শে রামানুজনের মন টলিল বটে কিন্তু মুস্কিল হইল তাঁহার মাতাকে লইয়া। তাঁহার মা মত না দিলে তিনি সাগরপাড়ি দিতে পারেন না। এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া যখন রামানুজন কালাতিপাত করিতেছিলেন তখন আশ্চর্যভাবে একদিন প্রত্যুষে তাঁহার মাতা নিজেই আসিয়া পুত্রকে বিলাত যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার—তাঁহার মা বলিলেন যে, তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে রামানুজন বিলাতে গিয়াছেন এবং সেখানে মহা গুণী জ্ঞানীদের কাছে খুব সমাদর লাভ করিতেছেন ও তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলেন যে, দেবী নমগিরি আসিয়া তাঁহাকে আদেশ দিলেন—তিনি যেন পুত্রের উন্নতির পথে বাধা না দেন, যেন বিলাত যাইবার অনুমতি দেন। এই ব্যাপারে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। রামানুজন

বিলাত যাইতে রাজী হইয়াছেন জানিতে পারামাত্র Mr Nerville মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন—"The discovery of the genius of S. Ramanujan of Madras promises to be the most interesting event of our time in the mathematical world.***The importance of securing to Ramanujan a training in the refinements of modern methods and a contact with men who know what ranges of ideas have been explored and what have not, can not be over estimated.* I see no reason to doubt that Ramanujan himself will respond fully to the stimulus which contact with Western mathematicians of the highest class will afford him. In that case his name will become one of the greatest in the history of mathematics and the university and the city of Madras will be proud to have assisted on his passage from obscurity to fame."

পরদিনই ঠিক এই মর্মে আর একখানি দীর্ঘ পত্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত অধ্যাপক Mr R Littlehailesও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিসট্রারকে লিখিলেন। এর ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় দুই বছরের জন্য বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি রামানুজনকে দেওয়া সাব্যস্ত করিয়া ফেলিলেন এবং বিলাত যাওয়ার যাবতীয় পাথেয় ব্যবস্থাও করিলেন। রামানুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করিলেন যে তাঁহার ঐ বৃত্তির অংশ বিশেষ অর্থাৎ মাসে ৬ টাকা তাঁহার মাতার নিকট পাঠান হইবে এবং বাকি অংশ বিলাতে যেন তাঁহার কাছে পাঠান হয়। এই ব্যবস্থা করিয়া মাতৃভক্ত পুত্র ১৯১৩ সালের ১৭ই মার্চ বিলাত যাত্রা করিলেন।

কেম্বিজে গিয়া একাগ্রমনে গণিত অধ্যয়ন ও গবেষণায় ডুবিয়া গেলেন। দেশে থাকিতে অর্থ উপার্জনের ধান্দায় যে পড়াশুনার ব্যাঘাত হইত তাহা আর রহিল না। গণিত-বিষয়ক তাঁহার বিস্তর প্রবন্ধ হার্ডি সাহেব ও লিট্‌লউড সাহেবের সাহায্যে অনেক সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে অত পড়াশুনার মধ্যেও সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান যুবক স্বপাক ও নিরামিষ আহার করিতেন।

এইভাবে কিছুকাল চলিতেছিল বেশ। কিন্তু ১৯১৭ সালের মে মাসে জানা গেল যে রামানুজন কঠিন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। চিকিৎসা অবশ্য রীতিমত চলিতে লাগিল। হাসপাতালেও মাঝে মাঝে যাইতে হইল। ওদিকে আবার ১৯১৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী রামানুজনকে রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' করিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইল। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্যক্তি যিনি এই F.R.S. পদবীতে ভূষিত হইলেন এবং মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে।

যদিও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না তথাপি এই মহাসম্মানিত পদবীতে ভূষিত হইয়া নূতন উৎসাহে তিনি কাজ করিতে লাগিয়া গেলেন এবং গণিতের কতকগুলি বিখ্যাত উপপাদ্য এই সময়ই রচনা করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালের ১৩ই অক্টোবর তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের একজন 'ফেলো' বলিয়া ধার্য হইলেন এবং ছয় বৎসরের জন্য বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড হিসাবে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন যাহার জন্য কোন বিশেষ কাজ করিবার বাধ্যকতা রহিল না, কারণ ইহা বৃত্তি নয়, ইহা ছিল পুরস্কার।

কিন্তু রামানুজনের শরীর বিলাতে ভাল থাকিতে ছিল না। তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বোঝা গেল। তাই তিনি ১৯১৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিলাত হইতে রওনা হইয়া ২৭শে মার্চ তারিখে বোম্বাই পৌঁছিলেন এবং মাদ্রাজে আসিলেন ২রা এপ্রিল। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আতংকিত হইলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা অবিলম্বে যথাসাধ্য করা হইতে থাকিল। তিনমাসকাল মাদ্রাজেই চিকিৎসা চলিল। তারপর কিছুকাল কাবেরী নদীর তীরে কোডুমুণ্ডী নামক গ্রামে গিয়া বাস করিলেন। কিন্তু শরীরের উন্নতি না হওয়াতে ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে আবার মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন চিকিৎসার সুবিধার জন্য। এই সময় বহু লোক তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার সুচিকিৎসা হয়।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯২০ সালের ২৬শে এপ্রিল এই প্রতিভাপ্রদীপ্ত যুবক মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে চিরনিদ্রামগ্ন হইলেন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। পিতামাতা ও পত্নীকে রাখিয়া অনন্তপ্রয়াণ করিলেন।

অসুস্থতার পূর্বে রামানুজন একটু স্থূলকায় যুবক ছিলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। তাঁহার ছিল বৃহৎ মস্তিষ্ক, প্রশস্ত ললাট, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ কোঁকড়ানো কেশরাশি। তাঁহার চেহারা চমৎকার ছিল, বিশেষ করে তীক্ষ্ণ দীপ্তিমান কাজল আঁখি দুটি। মাদ্রাজের ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর দেওয়ালে তাঁহার চিত্র শোভা পাইতেছে।

রামানুজন একেশ্বরবাদী এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চালচলন অতি সহজ সরল ছিল। তিনি ছিলেন নিরহংকারী অমায়িক যুবক এবং যখন তাঁহার কৃতিত্বের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তখনও অহমিকা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয় নাই এবং নিজের কৃতিত্বের কথা অপরের কাছে তুলিতেন না।

কেম্ব্রিজের বিখ্যাত গণিতবিদ্ মিস্টার জি, এইচ, হার্ডি The Indian mathematician Ramanujan নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে রামানুজনের অংকশাস্ত্রে যাবতীয় কার্যকলাপ মুদ্রিত করিয়াছেন এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এই বলিয়া যে রামানুজনের জীবনের ট্র্যাজেডী তাঁহার অকাল মৃত্যু নয়,—ট্র্যাজেডী এই যে শিক্ষাকালে এই প্রতিভাসম্পন্ন যুবক বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সংস্পর্শে বা আবহাওয়ার মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পান নাই।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ছয়

খুব ভোর ভোর ট্রেন দমদমে এসে থামল। সময় কম, যারা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল তাদের ঠেলে জাগিয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সবাই।

সুরবালাকে গাড়ি থেকে নামানো ত চারটিখানি কথা নয়? একটা দল তাই করতেই ব্যস্ত রইল; আর একটা দল পোঁটলাপুঁটলি বাক্স-পেঁটরা মোটমাটরি ঠিক ঠিক সব নামল কি না ছুটোছুটি করে মিলিয়ে দেখে নিতে লাগল।

ষ্টেশনে লাঠি হাতে দুজন পুলিশ ঘুরছে দেখে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল নির্ম্মলার বুক।

সে আর এখন সেই নিরুপমা নেই। সে এখন সত্যি অন্য মানুষ। তার চেহারাটাও ঠিক আগের মত নেই। এক রাত্রিতেই বয়স যেন তার অনেক বেড়ে গেছে। দৃষ্টি তীব্র, ঠোঁটের ভাঁজ শক্ত, দুই ভুরুর মাঝখানটা কোঁচকানো। কপালের ঠিক উপরে মাথার মাঝখানে একগোছা এলোমেলো রুক্ষ চুল। ভিড় থেকে একটু দূরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। জগন্নাথ তার পাশ দিয়ে দুবার ছুটতে ছুটতে এল আর গেল। আর একবার যখন সে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, নির্ম্মলা হাতের ইসারায় তাকে ডাকল।

এক মুখ হাসি নিয়ে জগন্নাথ কাছে এসে দাঁড়ালে নির্ম্মলা বলল, "কাল ভোরে হোসেনপুর ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমের একপাশে আমার ছোট বাক্সটি আর শতরঞ্চি জড়ানো বিছানাটা রেখে চান করব বলে শাড়ী গামছা নিয়ে কাছে কোথাও পুকুর আছে কি না খুঁজতে গিয়েছিলাম। পুকুরও খুঁজে পেলাম না; আর ফিরে এসে দেখলাম, বাক্স বিছানাও উধাও হয়েছে। আমার সঙ্গে এখন জিনিষ বলতে একটি বাড়তি শাড়ী আর একটি গামছা ছাড়া আর কিছু নেই।"

জগন্নাথ বলল, "তোমার ত তবু বাড়তি শাড়ী একটা আছে। এই যাদের দেখছ, এরা অনেকে এক কাপড়ে এসে জমিদার বিজিতেন্দ্রের বাড়ীতে কাজে ঢুকেছিল। তুমি কিছু ভেবো না। তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে কোন কিছু নিয়ে খুব বেশী অসুবিধেয় তোমাকে পড়তে হবে না। আমি ত রয়েছি, আমিও তোমাকে দেখব। আর হোসেনপুর ষ্টেশনে তোমার জিনিষ কি ক'রে খোয়া গেছে তা নিয়ে এত কথা আর কাউকে বলতে যেয়ো না তুমি। কি দরকার? আমি বলব, ট্রেনে তোমার জিনিষ আমারই জিম্মায় ছিল আর আমারই নামিয়ে নেবার কথা ছিল। তাড়াহুড়োর মধ্যে আমারই দোষে নামান হয়নি।"

কাছেই কাশীপুর অঞ্চলে বিজিতেন্দ্রের বাড়ী। তাঁর গ্র্যাহাম পেজ গাড়ি এসেছে স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে যাবার জন্যে। দলের অন্যরা মালপত্র নিয়ে ভাড়াটে গাড়ি করে যাবে।

তাঁর সেবাশুশ্রূষার জন্যেই মেয়েটিকে নেওয়া হয়েছে এবং এত পথশ্রমের পর বাড়ী গিয়েই তাকে তাঁর দরকার হতে পারে বলে সুরবালাকে বুঝিয়ে গাড়িতে তাঁর সঙ্গে নির্ম্মলাকে তুলে দিল জগন্নাথ, তারপর নিজে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসল, কারণ সুরবালার দুটি ছেলে সুধীর আর প্রবীর কিছুতেই তাকে ছেড়ে যেতে রাজী হল না। সদুও উঠতে যাচ্ছিল গাড়িতে, সুরবালা তাড়া দিয়ে বললেন, "গাড়িতে আর লোক ধরবে কোথায়? কেন? ভাড়াটে গাড়িতে আর সবাই যেতে পারে, কেবল তুমি পার না?"

সদুর দাম ছিল না বেশী, কারণ কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় বাড়ীর গাড়িতে করে সেই এসেছিল ষ্টেশনে সুরবালার সঙ্গে।

ঝি-চাকররা যে তাঁর বাড়ীতে তাঁর বিমুদার কাছে

কি রকম আস্কারা পায়, আর তাঁর কর্তা কোন কিছুর মধ্যে থাকেন না ব'লে, রেসের ঘোড়া ছাড়া আর কিছু বোঝেন না ব'লে এরা যে সুরবালাকে কি রকম জ্বালায়, সারা পথ তারই বিশদ বিবরণ দিতে দিতে চললেন তিনি।

আশপাশটাকে ভাল করে দেখে নেবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না নির্ম্মলার, তবু সে লক্ষ্য করল, জমিদার বাড়ীর চারদিকটা যে দেয়াল দিয়ে ঘেরা সেটা দেড়টা মানুষের সমান উঁচু। মনে হয় যেন জেলখানা। দু দিকে দুজোড়া ক'রে চার জোড়া থামের গায়ে লোহার গেট, সেখানে খাকী পোশাক আর পাগড়ি পরা বন্দুকধারী দারোয়ান, হঠাৎ দেখলে মনে হয় পুলিশ, আর বুক কেঁপে ওঠে।

সুরবালার মহলের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালে নির্ম্মলার কাঁধে ভর করে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন তারপর এক হাত তার কাঁধে রেখে আর এক হাতে সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে দুতলায় তাঁর শোবার ঘরে উঠে গেলেন। ছেলেদের ইচ্ছে ছিল, উপরে গিয়ে নবাগতাটির সম্বন্ধে খোঁজ খবর একটু করে, কিন্তু সুরবালা বললেন, "তোরা উপরে এসে এখন মোটেই জ্বালাবি না আমাকে, বুঝেছিস্?" জগন্নাথ তাদের আগলে রইল।

খবর পেয়ে বাড়ীর ডাক্তার সুজন সান্ন্যাল আগে থেকেই এসে দুতলার বারান্দায় একটা চেয়ারে বসেছিলেন তাঁকে দেখে যাবার জন্যে। শোবার ঘরে জোড়াখাটের বিছানার উপর থেকে বেডকভারটা সরিয়ে, ক্ষিপ্র হাতে বিছানাটা ঠিক করে সুরবালাকে শুইয়ে পাখা খুলে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল নির্ম্মলা। সুরবালা বললেন, "বাইরে ডাক্তারবাবু বসে আছেন, তাঁকে পাঠিয়ে দাও, আর তুমি নিজে কাছাকাছিই থাকো।"

নির্ম্মলা দরজার বাইরে একপাশে দেয়াল ঘেঁষে মেজের উপর বসে রইল। কাছাকাছি থাকতে পেলেই ত বাঁচে সে। সে জানে, এই যে আশ্রয় তার জুটেছে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। এ আশ্রয় তাকে যাতে না হারাতে হয়, সে জন্যে সে প্রাণপণ করবে। আপ্রাণ চেষ্টা করবে যাতে তার কোন কর্ত্তব্যকাজে ত্রুটি না ঘটে। বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, ঐ যে দেড়মানুষ সমান উঁচু দেয়াল বাড়ীটাকে বাইরের পৃথিবীর থেকে আড়াল করে রেখেছে, এরই মধ্যে রয়েছে যেন একটা নিরাপত্তার আশ্বাস। কাল সন্ধ্যার পর এই প্রথম বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিল সে।

সুরবালা একটু পরেই ডাকলেন তাকে। সুজন ডাক্তার একটা চেয়ারে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছিলেন, তাঁর সঙ্গে নির্ম্মলার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুরবালা বললেন, "সব বুঝে শুনে নাও। এরপর তোমাকেই ত সব করতে হবে?"

সুজন বললেন, "রোগীর সেবা এর আগে করেছ কখনও?"

নির্ম্মলা বলল 'ছ'সাত মাস রোগে ভুগে বছর দুই আগে আমার একজন আত্মীয়া মারা যান। তাঁর জন্যে সব কিছু একলা আমাকেই করতে হ'ত।"

সুজন বললেন, "খুব কষ্ট হ'ত, না?"

নির্ম্মলা বলল, "না, বরং ভালই লাগত।"

সুজন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, স্মিতহাস্য মুখে নিয়ে নির্ম্মলার হাতে প্রেসক্রিপশনটা দিয়ে বললেন, "তুমি পারবে।" তারপর তাকে সুরবালার পরিচর্য্যার বিষয়ে কতকগুলি দরকারী নির্দ্দেশ দিয়ে সুরবালাকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

নির্ম্মলা এমনিতেই নির্ব্বিরোধী মানুষ, তার উপর তার এখনকার অবস্থায় সে ত মাটির সঙ্গে মিশে থাকতে পারলেই ভাল থাকে। তবু তাকে নিয়েই দুপুরে কুরুক্ষেত্র একটা হয়ে গেল।

সদুর হঠাৎ খেয়াল হল, তাদের সকলের এঁটো বাসন নির্ম্মলাকে দিয়ে মাজাবে। এত বাসন একসঙ্গে যদিও কোনদিন সে মাজেনি, কিন্তু বাসন মাজা নির্ম্মলার অভ্যাসই ছিল, এবং ঘষে মেজে বাসনগুলোকে ঝকঝকে ক'রে তুলতে তার বেশ ভালই লাগত। সেই এক কাঁড়ি বাসন নিয়ে খিড়কির পুকুরের পাশে ব'সে সে সবে একটা কাঁসার গেলাস নিয়ে মাজতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় জগন্নাথ ছুটে এসে বলল, "গিন্নীমা ডাকছেন তোমাকে।"

ঐ যে ডাকবামাত্র তাকে পাওয়া গেল না, সে জন্যে সব ক'জন ঝি-চাকরের তলব হ'ল। তাদের সারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে সুরবালা ব'লে দিলেন, নির্ম্মলা ঝি-গিরি করতে এ বাড়ীতে আসেনি। সুরবালার কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ যদি তাকে করতে হয়, সেজন্যে সুরবালার অনুমতি আগে নিতে হবে।

সুরবালার শোবার ঘরের পাশে করিডরে এসে দাঁড়িয়েছিল সবাই। সুরবালা "আচ্ছা, যাও" বলবার পর, একটাও কথা না বলে চলে গেল সকলে, কেবল নির্ম্মলার ওখানেই থাকতে হবে ব'লে সে রইল, আর রইল জগন্নাথ।

যখন কেউ আর নেই কাছাকাছি কোথাও, এক ঝলক হাসি মুখে এনে জগন্নাথ বলল, "মাসী!"

নির্ম্মলা একটু অবাক্ হয়েই তাকাল তার দিকে।

জগন্নাথ বলল, "ঐ বলেই তোমাকে আমি ডাকব মাসী। কেন জান? নির্ম্মলা ব'লে আমার একজন মাসী ছিল, আমার মায়ের আপন মায়ের পেটের বোন। এই তোমারি মতন বয়সের। তোমার মত অত সুন্দর দেখতে অবিশ্যি ছিল না। আর দুজন দুজনকে কি ভাল যে আমরা বাসতুম। মায়ের কাছেই মানুষ হয়েছিল ত? বিয়ে হয়ে সেই যে চলে গেল ত গেলই। ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল।"

ছেলেটিকে নির্ম্মলার ভাল লাগছিল। বলল, "আচ্ছা, বেশ ত, তুমি আমাকে মাসী বলেই ডেকো।"

জগন্নাথ বলল, "আচ্ছা, সে ত হ'ল। কিন্তু তোমাকে এ বাড়ীতে খুব সাবধানে থাকতে হবে মাসী। তাই বলতেই আমি রয়ে গেলুম। সদু ঠাকরুণ খুব সহজ পেরাণী নন। তার উপর আবার মামাবাবুর পেয়ারের লোক। একদিন দেখলুম, একজনের মুখের খিলি পানের আদ্ধেকটা আর একজন কামড়ে নিয়ে খেলেন! মামাবাবু কলকাতায় নেই এখন, দুমাস পরে হোক, তিনমাস পরে হোক, যখন ফিরে আসবেন, তখন কি যে হবে ভেবে ভয় হচ্ছে আমার।"

নির্ম্মলা ভয় পেয়ে বলল, "চল না, আমরা কর্ত্তাবাবুর কাছে যাই দুজনে? ব'লে আসি আমি কাজে ঢুকেছি।"

জগন্নাথ বলল, 'কর্ত্তাবাবু লোক খুব ভাল। মদ খান ত? কিন্তু এ বাড়ীর কর্ত্তা আসলে মামাবাবু। কর্ত্তাবাবু কারুর ভালতেও নেই, মন্দতেও নেই। গিন্নীমার মহলেও বড় একটা আসেন না তিনি। তবে তেমন তেমন কিছু হলে তাঁর কাছে আমরা যাব বই কি?"

একফাঁকে নির্ম্মলাকে তিনমহলা সমস্ত বাড়ীটা দেখিয়ে নিয়ে এল জগন্নাথ। কলকাতার মধ্যে চারটে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এ যেন কলকাতার বাইরের কোন একটা জায়গা। চেহারায় বা চরিত্রে গ্রামাঞ্চলের জমিদার বাড়ীগুলির সঙ্গে বিশেষ তফাৎ এর নেই, কেবল খিড়কির পুকুরের পাশে জলের কল ধরণের ব্যাপার কিছু আছে। দাসদাসী, আত্মীয়-পরিজন, আমলা মুহুরিতে গমগম করছে সমস্ত বাড়ীটা, কিন্তু মানুষগুলো কলকাতায় থেকেও যেন কলকাতার নয়। যেন নিজেদের সৃষ্টি করা আলাদা একটা দেশে নিজেদের নিয়ে এরা বাস করছে।

এক নজরেই বোঝা যায় এদের জীবনযাত্রায় কাজের তুলনায় কোলাহল অনেক বেশী। তার কারণ, কাজ করবার লোকের অনুপাতে সত্যিকারের করবার মত কাজ অনেক কম, তাই নিজেদের মান বাঁচাতে লোকগুলিকে সব কাজই খুব গলাবাজি করে সকলকে জানান দিতে দিতে করতে হয়। তাছাড়া কথায় বলে, নেই কাজ ত খৈ ভাজ, এরাও খৈ মুড়ি ভাজে, চিঁড়ে কোটে, নানারকম ডালের নানারকম মসলা দিয়ে বা না দিয়ে বড়ি দেয়, পাথরের থাদায় করে আমসত্ত্ব রোদে দেয়, শাস্ত্রমতে স্নানাদি করে শুচি হয়ে কাসুন্দি তৈরি করে; আমসি, কুলসি, কুলের আচার, তেঁতুলের আচার, নানারকমের মোরব্বা এসবও তৈরি হচ্ছে সারাক্ষণ। কোটনা কোটা, বাটনা বাটা, রান্নাবান্না ত আছেই, আর আছে খাদ্যাখাদ্য নিয়ে, ব্রত-উপবাসের নিয়মকানুন নিয়ে, সকড়ি নিয়ে, শৌচাশৌচ নিয়ে চুলচেরা বিচার আর বিতর্ক। এ সবের উপরে, সবকিছুকে আবৃত করে আছে কোলাহল। সেই কোলাহলের সমুদ্রে স্বল্পভাষিণী নির্ম্মলা পাথরের ছোট একটি মূর্ত্তির মত টুপ করে ডুবে গেল। তাকে নিয়ে উচ্চবাচ্য কিছুই হ'ল না।

গোটা কয়েক ঘোড়া বেছে আলাদা আলাদা আর জোড়ায় জোড়ায় খেললে ঘোড়াগুলোর মধ্যে যেগুলো দৌড়বে আর জিতবে তাদের উপর লাগানো টাকা টোটের চৌগুণো হয়ে ফিরবে।

ঘোড়া বাছাইয়ের ব্যাপারে বিজিতেন্দ্র কারও ওপর নির্ভর করেন না, যেজন্যে তাঁর রেস খেলার সঙ্গী কেউ নেই। তিনি টিপ্‌স্‌ নেন না, উড়ো খবর সংগ্রহ করেন না। একলষেঁড়ে মানুষ তিনি, বাড়ীতে এবং বাড়ীর বাইরে তাঁর একই ধরণের ব্যবহার।

একটা টেবিলে চা খাওয়া শেষ করে অন্ত যে টেবিলটায় রেসের বই খাতা-পত্র রাখা থাকে, উঠে গিয়ে সেইটেতে বসতে যাবেন, এমন সময়ে সুজন এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "খবর না দিয়েই উপরে উঠে এলাম, কিছু মনে করো না।"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "এ ত সৌভাগ্য। খবর দিলেও যে তোমরা সব সময় আস না, সেই ত দুঃখ আমাদের। বোস।"

সুজন বসলে বললেন, "কেমন আছ? নাকি ও প্রশ্নটাতে তোমাদের একচেটে অধিকার?"

সুজন হেসে বললেন, "ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বল।"

বিজিতেন্দ্র, "ভাল না থাকলে খবর পেতে। তারপর এদিকে সেই একই প্রেসক্রিপ্‌শন চলছে এখনো, না সিরাপের রংটা বদলেছ?"

সুজন, "তা মাঝে মাঝে রং বদল করতে হয় বই কি? রোগের লক্ষণগুলিও বদলায় ত?"

বিজিতেন্দ্র, "কোনো রোগ না থাকলে যা হয়।"

সুজন, "খানিকটা তাই। কাল আমি প্রেসক্রিপ্‌শন লিখছি, হঠাৎ প্রায় চীৎকার করে আমাকে ডেকে বললেন, শীগগির আসুন, দেখুন আমার হার্টবিট যেন বন্ধ হয়ে গেছে। হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেলে কেউ যে চেঁচিয়ে কথা বলতে পারে না এটা তাঁকে বোঝাতে আমার খানিকটা সময় গেল।"

বিজিতেন্দ্র, "এমন একটি রুগী নিয়ে খুব ত হাবুডুবু খেতে হচ্ছে তোমাকে।"

সুজন, "তা একটু হচ্ছে। আর সেইজন্মেই এসেছি তোমার কাছে। রোগ নেই, অথচ ভাবছেন যে আছে, এও ত একটা রোগ? এ রোগেরও চিকিৎসা চাই।"

বিজিতেন্দ্র, 'তা ত চাইই।"

সুজন, "কিন্তু এখানটায় তোমাকে আমার দরকার। তুমি একটু সাহায্য না করলে হবে না।"

বিজিতেন্দ্র, "কি করতে হবে বল। রেস খেলা ছাড়তে হবে?"

সুজন, "না।"

বিজিতেন্দ্র, "তবে?"

সুজন, "বিছানা-বালিশ গুটিয়ে নিয়ে নিজের স্ত্রীর মহলে ফিরে যেতে হবে।"

বিজিতেন্দ্র বললেন, "বাজে বকো না। তোমাদের আজকালকার ডাক্তারদের ঐ এক হয়েছে। যাও। ওঁকে দেখতে যাচ্ছ ত? আমার আজ অনেক কাজ।"

খুব বিমর্ষ মুখ করে সুজন ডাক্তার সুরবালার মহলের দিকে চলে গেলেন।

একগাদা বালিশে পিঠ রেখে জোড়া খাটের বিছানায় একটি বই কোলে করে বসে আছেন সুরবালা। খুব রূপবতী বলে এতবড় জমিদারদের বাড়ীতে তিনি বধূরূপে আসতে পেরেছিলেন। সেই রূপে এখনো ভাঁটা পড়েনি তাঁর। কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত ক্লিষ্ট মুখের ভাব। ডাক্তার ঘরে ঢুকতে সেই ভাবটা একটু যেন বদলাল।

একটা রূপোর বাটি হাতে তাঁকে আপেলের রস খাওয়াচ্ছিল নির্মলা, বাটি সুদ্ধ তার হাতটাকে ঠেলে দিয়ে সুরবালা বললেন, "আর খেতে ভাল লাগছে না, তুমি যাও।"

নির্মলা যাচ্ছিল, সুজন বললেন, "একটু দাঁড়াও। এই ওষুধটা কবার খাইয়েছ?"

"তিনবার।"

"চারবার খাওয়াবার কথা ছিল না?"

"ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাত্তিরেরটা খাওয়াইনি।"

"ভাল করেছ। চা খাওয়া কিছু কমেছে?"

"না। তবে কাপড়ের পুঁটলি করে চায়ের পাতা

নিয়ে ফুটন্ত জলে ডুবিয়েই তুলে নিচ্ছি। একটু রং ধরছে জলে, চায়ের গন্ধও একটু হচ্ছে। তাইতে দুধ চিনি মিশিয়ে দিচ্ছি, খাচ্ছেন ত খুশী হয়ে।"

সুরবালা, "চুপ কর ত তুমি। খুশী হয়ে খাচ্ছে, তোমাকে বলেছে।"

সুজন, "weak চা খেতে ভাল লাগছে না বুঝি?"

সুরবালা, "ঐ weak চা-ই এত ভাল করে ও করে, যে এখন ঐটে না খেতে পেলেই মনে হয়, কি যেন একটা হল না।"

সুজন ও সুরবালা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন, নির্ম্মলাও তাতে যোগ দিল একটু।

সুরবালা বললেন, "দাঁড়িয়ে কেন রয়েছ? যাও না।"

নির্ম্মলা চলে গেলে সুজন ডাক্তার বিধিমতে সুরবালার বুক, পিঠ, গলা, নাড়ী, চোখের কোল, গলার পাশ, আঙুলের ডগা বেশ খানিকটা করে সময় নিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর ব্লাড প্রেশার মাপলেন। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখতে লিখতে বললেন, "বেশ মেয়েটি, খুব কাজের মেয়ে, কোথায় পেলেন ওকে?'

সুরবালা বললেন, 'নির্ম্মলার কথা বলছেন ত? কে জানে, বিনুদা কোথা থেকে ওকে জুটিয়েছে।"

সুজন বললেন, "ও বেশ ভাল নার্স হতে পারে, একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে।"

সুরবালা বললেন, "কাজ করতে করতে শেখাটাই ত ভাল। আমার কাছ থেকে ও শিখুক না যত খুশি।" একটু কাতর ভাবেই বললেন কথাটা, কারণ সুজন চাইলে অন্য অনেক কিছুই যেমন তিনি ছাড়তে পারেন এই মেয়েটিকেও ছেড়ে তিনি দেবেনই; কিন্তু খুব বেশী নির্ভর করতে আরম্ভ করেছিলেন নির্ম্মলার উপর।

ডাক্তার সুজন সান্ন্যাল সম্প্রতি একটি নার্সিং হোম খুলেছেন, হয়ত খুলতেন না যদি জানতেন, ভাল বা মন্দ সব রকম নার্সেরই যে কি মারাত্মক অভাব এ দেশে। একটু হেসে বললেন, "কোনো অভিসন্ধি মনে নিয়ে কথাটা আমি বলিনি।

তবু একদিন সুজন ও নির্ম্মলা একসঙ্গে নীচে নেমে যাবার পর নির্ম্মলাকে ডেকে সুরবালা জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তারের সঙ্গে কি কথা হল তোমার?"

"কোন্ বিষয়ে মা?"

"এই, নার্সিং শেখা বিষয়ে?

"কই না, কোনো কথাই ত হয়নি মা!"

"আচ্ছা, যাও। যদি কখনো কিছু বলেন, আমাকে আগে এসে বলবে। বুঝলে?"

"তা ত বলবই মা" বলে নির্ম্মলা একটু অবাক্ হয়েই সেখান থেকে চলে এল।

নূতন পরিবেশের মধ্যে যে দুতিনটি মানুষের কাছে মানুষ বলে তার কিছু মূল্য আছে, সুজন ডাক্তার তাদের একজন। তাঁর কোনো কথায় তাঁর সে পরিচয় নির্ম্মলা পায়নি কোনদিন। কতগুলি বাঁধাধরা প্রশ্ন এবং তাদের কতগুলি প্রায় বাঁধাধরা জবাব, এরই মধ্যে তাদের বাক্যালাপ সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু সিঁড়ি উঠতে নামতে, বা নির্ম্মলার ঘরটার পাশ দিয়ে যেতে যখনই নির্ম্মলার সঙ্গে চোখোচোখি হয় তাঁর, চোখ ফিরিয়ে নেন না ডাক্তার। ঘাড়টাকে একটু কাত করে মৃদু হাসেন, তার অর্থ হ'ল, ভাল আছ ত? নির্ম্মলাও ঘাড় কাত ক'রে সে হাসি ফিরিয়ে দেয়, যার অর্থ হ'ল ভাল আছি।

রোগীর পরিচর্য্যা নির্ম্মলা খুব ভাল করতে পারে তার একটা বড় কারণ, যেটা সুজন ডাক্তার সেদিন ঠিকই ধরেছিলেন, কাজটা তার ভাল লাগে। সে কাজটা আরো ভাল ক'রে শিখবার সুযোগ যদি তার হয় এই মানুষটির কাছে ত সে খুশীই হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মামাবাবু ফিরে আসবার আগেই ডাক্তার যদি তাকে নিয়ে যান এখান থেকে, তাহলে তার একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে যায়। ফাঁকি দিয়ে কাজে ঢোকা নিয়ে তাকে তাহলে আর নাজেহাল হতে হয় না।

কিন্তু সুরবালা কিছুতেই হয়ত ছাড়বেন না তাকে। তাঁর কথার ভাবে মনে হল, ছাড়তে তিনি চাইছেন না।

অবশ্য ছাড়তে যে চাইছেন না, এর মধ্যে নির্ম্মলার পক্ষে আশ্বাসের কথাও একটু আছে। হয়ত তার

কাজে এতটাই খুশী হয়েছেন সুরবালা, এবং এতটাই খুশী থাকবেন যে তার কাজে ঢোকার সময়কার ফাঁকিটাকে বড় করে দেখবেন না।

সুরবালার মহলের দুতলায় তাঁর শোবার ঘরের ঠিক পাশেই সিঁড়ি। একতলার সেই সিঁড়ির পাশেই একটা ঘরে সুবীর-প্রবীর পড়াশুনো করে, ছবি আঁকে, খেলে। দুতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালে খোলা দরজায় একতলার এই ঘরটার মাঝখান অবধি দেখা যায়। সুরবালা বিছানায় শুয়েও ডেকে কিছু বললে এই ঘর থেকে সেটা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়।

সুরবালার দেখাশোনার কাজ করে ব'লে এই ঘরটাকেই নির্ম্মলার বাস নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য ঝি-দের মহলেও একটা ছোট ঘর তাকে দেওয়া হয়েছে, তাতে তার জিনিষপত্র সে তালা বন্ধ করে রাখে। দিনেমানে বসবার সময় ত সে বেশী পায় না, বসতে পেলে সুবীর প্রবীরের এই ঘরটাতেই সে বসে, রাত্তিরে এই ঘরেই সে শোয়।

এই ঘরটি উপলক্ষ্য করে সুবীর-প্রবীরের সঙ্গে নির্ম্মলার কিঞ্চিত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। রোজ রাত্তিরে শুতে যাবার আগে নির্ম্মলাদির কাছে, রূপকথার রাজপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়া, দৈত্য, রাক্ষস, ব্যাঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ও অজগরের গল্প না শুনতে পেলে তাদের এখন আর চলে না। তাছাড়া, সুরবালার রান্নার সঙ্গে সুবিধে পেলেই নির্ম্মলা তাদেরও কিছু একটা রেঁধে দেয়। তার কাছে ব'সে দুভাই তার সেই রান্না দেখে, মাঝে মাঝে জগন্নাথও এসে সেখানে দাঁড়ায়।

আজ নির্ম্মলা যখন ছোট ঘরটায় ব'সে সুরবালার রাত্রির রান্নার জন্যে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল, তরকারি কুটছিল, সে সময়টা খিড়কির বাগানের একটা আমগাছের ডালে সুবীর-প্রবীরের জন্যে সুন্দর একটি দোলনা খাটিয়েছে জগন্নাথ। তাতে দুভাই পালা করে কয়েক-বার দোল খেয়েই দুপদাপ ক'রে দুতলায় এসে উঠেছে, "নির্ম্মলাদি দেখবে এস, নির্ম্মলাদি দেখবে এস" ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে। মায় ঘরে নির্ম্মলাকে না দেখতে পেয়ে সুবীর বলল, "মা, তুমি এসে দাঁড়াও এই জানলাটায়, আমরা নীচে যাচ্ছি। জগন্নাথ কি সুন্দর একটা দোলনা খাটিয়েছে ঐ আমগাছটায়, দেখবে, আর আমরা কেমন মজা ক'রে দোল খাই তাও দেখবে।"

সুরবালার বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল একটু। চমকে জেগে উঠে নির্ম্মলাকে ডাকতে লাগলেন। সুবীরের বক্তব্য তাঁর কানে গিয়েছে কি না বোঝা গেল না, বলতে লাগলেন, "আমার ঘরে এদের কে ঢুকতে দিলে? আমি বলে মরছি নিজের জ্বালায়, তার উপর এ দুটোর উৎপাতও আমাকে সইতে হবে? এমন চমকে দিয়েছে দুটোতে মিলে, এখনো বুকটা ধড়ফড় করছে আমার। নির্ম্মলা!"

দুভাইয়ের পিছন পিছন জগন্নাথও দুতলার সিঁড়ির অনেকটাই উঠে এসেছিল, পিছন ফিরে ছুটে গেল নীচে, গিয়ে নির্ম্মলাকে পাঠিয়ে দিল উপরে। দুভাই তখন নিজেরাই নীচে নামছে, দুহাতে তাদের দুজনকে ধরে সিঁড়ি নামতে নামতে নির্ম্মলা বলল, "তোমরা এমন যখন তখন মায়ের ঘরে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করবে না, বুঝেছ? আমি তাঁর কাছে থাকলে তবেই যাবে।"

সুবীর বলল, "আমলা ত তাই করি নির্ম্মলাদি।"

প্রবীর বলল, "আমরা তাই ত কলি নির্ম্মলাদি।"

সুবীরের বয়স সাত, কিন্তু প্রবীরের সঙ্গে ব্যবহারে সত্তর। প্রবীরের বয়স তিন, তা সে বেচারা নিতান্তই তিন, তার কাছে সাতও যা সত্তরও তাই, আপাততঃ সাতকেই সে নিজের একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ ব'লে ধরেছে।

নির্ম্মলাকে তারা টেনে নিয়ে গেল খিড়কির বাগানে। জগন্নাথও এসে এই সময় জুটে গেল তাদের সঙ্গে। বেলা শেষ হয়ে এসেছে। খিড়কির বাগানে আম জাম পেয়ারা, বাতাবি লেবু ও শিউলি হাস্নুহানার গাছগুলির ছায়ায় ছায়ায় জড়াজড়ি। জগন্নাথ আর নির্ম্মলাকে দাঁড় করিয়ে দুভাই একই সঙ্গে বসে দোল খেল অনেকক্ষণ। একই সঙ্গে, কারণ, শেষ অবধি দেখা গেল, সুবীরকে জড়িয়ে ধরে বসে দোলাটাই প্রবীরের বেশী পছন্দ। এরপর সুবীর প্রবীর ও জগন্নাথ, বিশেষ ক'রে জগন্নাথ, নির্ম্মলাকে দোলনাটায় বসতে বলছে, তারা

তাকে দোলা দেবে। কিন্তু নির্মলা কিছুতেই রাজী হ'ল না।

রাত্তিরে নির্মলার সামান্যই রান্না, সেটা শেষ হয়ে গেলে সুরবালাকে খাইয়ে সে যখন বড় ঘরটার কার্পেটের উপর এসে বসল, সুবীর প্রবীরও এসে বসল তার দুপাশে আসন-পিঁড়ি হয়ে।

সুবীর প্রবীর খেয়ে দেয়ে এসেছে। নির্মলা আঁটিবাঁধা খড়কে দিয়ে ছাঁচি কুমড়ো ছেঁচে পিটুলি দিয়ে ভেজেছিল, খেয়ে খুব ভাল লেগেছে তাদের।

সুবীর বলল, "আচ্ছা নির্মলাদি, কাল আমাদের জন্যে তুমি কি রাঁধবে?'

প্রবীর বলল, "কাল কি রাঁধবে?

নির্মলা বলল "কাল? দাঁড়াও, দেখছি ভেবে। আচ্ছা কাল কাঁচা ছোলা আর গুড় দিয়ে কচুশাক রাঁধব।"

সুবীর বলল, "তার চেয়ে আমি বলি কি, কালকেও ছাঁচি কুমড়ো ভাজাই হোক। এই, তোকে বলতে হবে না, ছাঁচি কুমড়ো ভাজাই হোক। তুই চুপ ক'রে শুনে যা শুধু, কথা বলতে ভাল করে যখন শিখবি তখন বলিস।"

নির্মলা বলল, "কালকেও ছাঁচি কুমড়ো ভাজা? আচ্ছা, তাই হবে।"

সুবীর বলল, "দুখানা ভাজা বেশী কোরো নির্মলাদি, জগন্নাথকে দেব।"

নির্মলা বলল, "আচ্ছা।"

ছেলেটা দাঁড়িয়ে তার রান্না দেখে, মাঝে মাঝে একটু কিছু তাকে দেওয়ার কথা নির্মলার নিজেরই মনে হয়েছে অনেকবার, কিন্তু বাড়ীর ঝি-চাকর মহলে এই নিয়ে পাছে কথা ওঠে ভেবে দেয়নি। সুবীর প্রবীর যদি দেয় ত তা নিয়ে কেউ কিছু বলবে না।

একটা ছোট্ট প্রশ্ন সুবীরের মনে অনেকবার জেগেছে আবার মনেই তলিয়ে গেছে, সম্ভবতঃ নির্মলার সুন্দর নিরামিষ রান্নার গুণে। আজ হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসল, "আচ্ছা নির্মলাদি, তুমি কেন একদিনও মাছ রাঁধ না?"

নির্মলার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন পাশ ফিরল। নিজেকে সামলে নেবার একটু সময় পেল সে, কারণ দাদার কথার প্রতিধ্বনি করে প্রবীরও বলল, "কেন একদিনও মাছ রাঁধ না?" বলল, "মাছের গন্ধ সইতে পারি না বলে নিজে খাই না, রাঁধিও না।" তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

দেড় সেরী মৃগেল মাছটা উঠোনে পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে, কি সুন্দর দেখতে ছিল, আঁশ ছাড়িয়ে বিশ্রী হয়ে গেল, বারুণী দীঘি, চুইলা গঙ্গার...বাবা গো, কি কাণ্ড, কি বিশ্রী কাণ্ড। কোনো দিন কোনো উপায়ে ব্যাপারটাকে কি ভুলতে পারবে সে?

নির্মলা একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে জল ছিল না, দৃষ্টিও যেন ছিল না। ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে নির্মলাকে ঐ অবস্থায় দেখে জগন্নাথ থমকে দাঁড়াল। নির্মলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়াতে সুবীর প্রবীরও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, জগন্নাথকে দেখে ছুটে গিয়ে দুজন দুদিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরল।

সুবীর বলল, "তুমি বলেছিলে আজ তিনতলার ছাত থেকে গারাজের ছাতে লাফিয়ে পড়বে। এস, লাফাবে।"

প্রবীরও তাকে টানতে টানতে বলল, "এস, লাফাবে।"

নির্মলা উঠে গিয়ে দুজনকে ধরে এনে আবার নিজের কাছে বসাল। বলল, "না, এই রাতবিরেতে ওকে লাফাতে হবে না। হাত-পা ভেঙে তারপর মরুক আর কি!"

জগন্নাথের মুখ দেখে মনে হল, সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বলল, "ওখানটায় অনেক আলো, সহজেই লাফাতে পারতুম।"

নির্মলা বলল, "তা হোক।"

সুবীর খুব উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, "জান নির্মলাদি, ও অনেক কিছু পারে। ও হাতল না ধরে সাইকেল চালাতে পারে, আর চালাতে চালাতে পা দুটোকে হাতলের উপর উঠিয়ে দিয়েও বেশ বসে থাকে, পড়ে যায় না। একদিন উবু হয়ে হাতে প্যাডল করে সাইকেল চালিয়েছিল, কি মজার যে দেখতে হয়েছিল তখন। আর জান? ও ত আমাদের গাড়ি ধোয়? কিন্তু ওকে বলতে হয় ক্লিনার ড্রাইভার। বাবা ব'লে দিয়েছেন। ও গাড়ি চালাতেও জানে কিনা!"

জগন্নাথ বলল, "পুলিশকে ভাঁড়িয়ে ষোল বৎসর বয়সে লাইসেন্স নিয়েছিলুম, কিন্তু কর্তাবাবু কিছুতেই আমাকে গাড়ি চালাতে দিতে রাজী হলেন না, কথাটা তুলেছিলুম বলে ডেকে নিয়ে কান মলে দিলেন।"

নির্ম্মলা বলল, "সেটা না করলেই অন্যায় হ'ত।"

সুবীর জগন্নাথের একজন সত্যিকারের ভক্ত। বলল, "ও আলো সারাতে জানে, পাখা সারাতে জানে। সিষ্টার্ণ খারাপ হয়ে গেলে তাও সারাতে পারে। গাড়িও মেরামত করে। আর জান, ড্রেনের পাইপ বেয়ে ছাতে উঠে যেতে পারে, ঠিক বাঁদরের মত।"

প্রবীর এতক্ষণ দাদার কথার সঙ্গে নিজের কথা, যেটা অবশ্য তার দাদারই কথা, জুড়ে দেবার মত ফাঁক পাচ্ছিল না; এবারে হেসে হাত তালি দিয়ে বলে উঠল, "ঠিক বাঁদলের মত।"

জগন্নাথের মুখে বিনয়ের হাসি। বলল, 'ভারি ত সব ব্যাপার।"

প্রবীর বলল, "আর দোলের সময় কি করে?"

সুবীর বলল, "হাঁ৷ নির্ম্মলাদি, আগে থেকে শিউলি ফুলের বোঁটা শুকিয়ে জমিয়ে রেখে দেয়, আর দোলের সময় তাই জলে ফুটিয়ে রং তৈরি করে। কি সুন্দর সে রং না? আর মুলি বাঁশ দিয়ে পিচকিরি তৈরি ক'রে দেয়, পেতলের পিচকিরি কিনতে দেয় না আমাদের।"

প্রবীর আরো কি একটা বলতে যাচ্ছিল, সুবীর তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "জানি, তুই বলবি, আর দেয়ালির সময়? দেয়ালির সময় হাউই ছাড়া আর কোনো বাজী বাইরের থেকে আমাদের কিনতে দেয় না, ও সব নিজে তৈরি করে। এবারে খুব সুন্দর একটা ফানুস বানিয়েছিল, তার একদিকে পঞ্চম জর্জ্জ আর একদিকে গান্ধীজীর ছবি এঁটে দিয়েছিল আঠা দিয়ে। সেটা ঐ, ঐ দিক্ দিয়ে কোথায় যে ভেসে চলে গেল।"

জগন্নাথ বলল, "ফানুস তৈরি করতে তোমাদের আমি শিখিয়ে দেব। ও ত খুব সোজা কাজ।"

একটু পরেই আবার বলল, "তোমার জন্যে একটা ছোট আলমারি বানাচ্ছি মাসী।"

সুবীর বলল, "জানি, কেরাসিন কাঠ দিয়ে।"

জগন্নাথ বলল, "বানাই আগে, তারপর আলমারিটাতে যখন শাদা এনামেলের রং ধরিয়ে দেব, তখন কার সাধ্যি বলবে যে ওটা কেরাসিন কাঠের তৈরি।"

উঠোন থেকে পদ্মর গলা শোনা গেল। "জগন্নাথ, জগন্নাথ, জগন্নাথ রয়েছ ওখানে?"

জগন্নাথ সাড়া দিল না, সিঁড়ির দিক্‌কার দরজার কপাটের একটু অন্ধকার একটা আড়ালে দেয়ালের সঙ্গে লেপটে রইল।

পদ্ম আবার ডাকল, "জগন্নাথ, ও জগন্নাথ।"

নির্ম্মলা বলল, "ও কি? সাড়া দিচ্ছ না কেন?"

সুবীর প্রবীর খুব মজা পেয়ে, মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। জগন্নাথ বলল, "ও সাড়া না পেলেই চুপ ক'রে যাবে, দেখো তুমি। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না মাসী।"

নির্ম্মলা বলল, "কেন ডাকছে শোনা ত উচিত?"

জগন্নাথ বলল, "জানি কেন ডাকছে। সর-বাটা মাখনের ঘি যখনই করে, চাঁচিটা আমাকে খেতে দেয়। আজ ঘি করেছে কিনা, তাই চাঁচি খেতে ডাকছে।"

সর-বাটা মাখন জ্বাল দেওয়া ঘির মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল সেখান অবধি।

নির্ম্মলা বলল, "যাও না, চাঁচিটা খেয়ে এস না?"

গেল না জগন্নাথ।

সুবীর প্রবীরের ঘুম না আসা পর্য্যন্ত তাদের রূপকথার গল্প শোনায় নির্ম্মলা, জগন্নাথও হাতে কাজকর্ম্ম কিছু না থাকলে এসে বসে শোনে। একটা গল্পের মাঝখানটা অবধি শুনে কাল সুবীর প্রবীর ঘুমোতে গিয়েছিল, সেইটের বাকীটুকু এখন শোনাবে নির্ম্মলা।

সে-রাত্রিতে নিদ্রাহীন চোখে বিছানায় শুয়ে নির্ম্মলা ভাবছিল, এখানে এই যে মানুষগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক তাদের ত তার ভালই লাগছে, আর এখন পর্য্যন্ত বেশ ত ভালই সে আছে এখানে। তবু তার এত দুঃখ কেন? কেন রোজ থেকে থেকে ছাতের চিলে-কোঠায় পাশের সরু ফাঁকটাতে লুকিয়ে বসে তাকে কাঁদতে হয়?

এটা খুবই আশ্চর্য্য যে, বাড়ীর ভিতের প্ল্যানের মত, এখানে নির্ম্মলার জীবনের যেটা প্ল্যান বা প্যাটার্ণ, সেটা অনেকটাই নিরুপমার জীবনের মত। সুবীর প্রবীর যেন অন্টু-শন্টু, জগন্নাথ যেন বিকাশ; ঐ যে বারান্দায় আলো জেলে একলা ব'সে রাত জাগছেন বিজিতেন্দ্র, তাঁরও মহেন্দ্রেরই মত নিঃসঙ্গ জীবন; আর আপ্রাণ সেবা করেও তার যে মাকে বাঁচাতে সে পারেনি, তিনিই যেন সুরবালার মধ্যে দিয়ে আবার তার সেবা নিচ্ছেন। সুবীর প্রবীর হতে ত পারত তার ভাই, সুরবালা হতে ত পারতেন তারও মা? এই যে, যেন সবই আছে অথচ কিছু নেই, এরকমটা হয় কেন? কেন কতগুলি বিশেষ মানুষকে না হলে মানুষের চলে না?

হঠাৎ কান্নার বান ডেকে এল। বাবা, বাবা গো! দাদা, ও দাদা! অন্টু রে অন্টু! শন্টু, শন্টু রে!

ক্রমশঃ

শতবর্ষ স্মৃতি ঃ অবিনাশচন্দ্র দাস

হারাধন দত্ত

বাংলা সাহিত্য-জগতে অবিনাশচন্দ্র দাস এক সময়ে ছিল বহু বিঘোষিত নাম। অবিনাশচন্দ্র তাঁর সমকালের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু আজকের বাঙালী-পাঠকদের কাছে অবিনাশচন্দ্র একটি প্রায়-বিস্মৃত নাম। সৃজনধর্মী মৌলিক রচনা বলতে যা বুঝি সেখানে অবিনাশচন্দ্র ছিলেন এক সময়ে অগ্রগণ্য নাম, আবার চিন্তাশীল ও মনীষাদীপ্ত সাহিত্যের জগতে অবিনাশচন্দ্রের অবদান আজও পণ্ডিতসমাজ সবিস্ময়ে স্মরণ করেন। এক-কথায় সাহিত্য-সাধক বলতে যা বোঝায় অবিনাশচন্দ্র ছিলেন তাই। তিনি একদিকে সৃষ্টি করেছেন, অপরদিকে পুরাতনের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন নূতন চিন্তার দিগন্ত। অবিনাশচন্দ্রের মধ্যে প্রাজ্ঞ গবেষকসত্তা ও রসিক সাহিত্যিকের হৃদয়মাধুরী যুগ্মবেণী হয়ে মিশে গেছে। তথাপি অবিনাশচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি, আর সে জন্যই শততম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যেও অবিনাশচন্দ্র স্মরণযোগ্যরূপে বিবেচিত হতে পারেননি।

গতশতকে যেসব সাহিত্যিক ব্যক্তিসত্তা প্রায় শোভা-যাত্রা করে এসেছিলেন—তাঁদের সকলের কথা আমরা মনে রাখিনি—মনে রাখিনি অবিনাশচন্দ্র দাসকেও। তাঁদের যথাযথ মূল্যায়ন আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে এই আশায় বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠসেবক অপ্রমেয় বিদেহী অবিনাশচন্দ্রের শততম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে অবিনাশচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের কিছু আলোচনার প্রয়োজন বিবেচনা করেছি। তাঁর সাহিত্য-সাধনার বৃত্তান্ত উপস্থিত করার আগে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের দু একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অবিনাশচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। ১৮৬৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী (বাং ১২৭৩, ৮ই ফাল্গুন) বাঁকুড়া শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা হরিচরণ দাস। মাতা দীনময়ী। পিতা হরিচরণ ছিলেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস। রাঁচি তাঁর কর্মস্থল। হরিচরণ সংস্কৃত, ইংরেজী ও প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে বিশেষ ভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দেশজ সাহিত্য সংস্কৃতির উপর হরিচরণের প্রীতি ও মমত্ব পুত্রের জীবনকেও প্রভাবিত করে। অবিনাশচন্দ্র পরবর্তীকালে তাঁর রচিত 'Rig Vedic culture' ও 'The Vaisya caste' গ্রন্থ দু'খানি তাঁর পিতার নামে উৎসর্গ করে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। এই সময়ের কিছু আগে অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের মে মাসে অবিনাশচন্দ্রের আজন্ম সুহৃদ ভারতপথিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও বাঁকুড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। অবিনাশচন্দ্র ও রামানন্দ আজীবন বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র ও রামানন্দের জীবনব্যাপী সম্পর্কের কথা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি। রামানন্দ দুহিতা শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী তাঁর "ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা" নামক সুবৃহৎ ও তথ্যবহুলগ্রন্থে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যুতে রামানন্দ শোকাভিভূত হন। প্রবাসীতে শোক নিবেদনকালে বাল্য-কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি লেখেন—"অবিনাশ আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন। সে জন্য মনে করিয়াছিলাম, আমার সন্তানদিগকে বলিয়া যাইব আমার মৃত্যুর পর আমার যৌবনকাল সম্বন্ধে তাহাদের কোন কৌতূহল হইলে, অবিনাশচন্দ্রকে যেন জিজ্ঞাসা করে। তাহা আর হইল না"। বাঁকুড়ার পাঠশালাতে অবিনাশচন্দ্র ও রামানন্দ একসঙ্গেই পড়াশুনা সুরু করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই অবিনাশচন্দ্র পিতার কর্মস্থল রাঁচিতে চলে যান। রাঁচি জিলা স্কুল থেকে ১৮৮৪ সালে অবি-নাশচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। অবিনাশচন্দ্র পাটনা কলেজে ভর্তি হন। পাটনা কলেজ

থেকে তিনি এফ, এ ও বি, এ ইংরেজী অনার্সে পাশ করেন। বি, এ পাশের বৎসর ১৮৮৮। এই একই বছরে রামানন্দ সিটি কলেজ থেকে ইংরেজী অনার্সে প্রথম হয়ে বি, এ, পাশ করেন। এর পরেই অবিনাশচন্দ্র এলেন কোলকাতায়, প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এ. ও ল ক্লাসে ভর্তি হলেন। এম. এ. তে তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজী সাহিত্য। ১৮৮৯ সালে অবিনাশচন্দ্র এম, এ, এবং ১৮৯১ সালে 'ল' পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই অবিনাশচন্দ্রের বিবাহ হয়। (কলিকাতা বরাহনগর নিবাসী কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা শরৎকুমারীকে তিনি বিবাহ করেন)। অল্পদিনের মধ্যে স্ত্রী-বিয়োগ হয়। স্ত্রীবিয়োগজনিত কারণে তাঁকে একাধিকবার দারপরিগ্রহ করতে হয়। ইতিমধ্যেই পরবর্তী সাহিত্যসেবক জীবনের মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। অবিনাশচন্দ্র ওকালতি দিয়ে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। বাঁকুড়া ও আলিপুর কোর্টে তিনি কিছুকাল ওকালতি করেন মালদহতেও থাকতে হয় বেশ কিছুদিন। কিন্তু এ কাজ তাঁর মনোরঞ্জন করেনি। কাজেই ওকালতিতে তিনি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকতে পারেননি। অবিনাশচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশ-প্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং সেকালের জাগৃতি ও জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। সুতরাং সরকারী চাকুরী মিললেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। ওকালতি-জীবনের প্রথমপর্বের পর তিনি মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের জৈনধর্ম্মাবলম্বী জমিদার দুধোরিয়া-পরিবারে গৃহশিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে তিনি এই জমিদার ষ্টেটের ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। তিনি এখানে ম্যানেজার রূপেদক্ষতার সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করেন। পরে মতান্তরের ফলে এ কাজেও ইস্তফা দেন। এই আজিমগঞ্জের কর্ম্মজীবন থেকেই অবিনাশচন্দ্র সলজ্জ পদক্ষেপে সাহিত্যের দ্বারদেশে পদার্পণ করেন। আজিমগঞ্জ অবস্থান কালেই অবিনাশচন্দ্র ঋগ্বেদ চর্চায় মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ পনের বছর ঋগ্বেদের গবেষণায় সমাহিত হয়েও রসসৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অনেকেরই ধারণা আছে পণ্ডিত মাত্রেই অ-রসিক, আবার রসিক মাত্রই অ পণ্ডিত। অনেকের মত অবিনাশচন্দ্রও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ঋগ্বেদ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণা ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কথা গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কর্ণগোচর হয়। তিনি আহ্বান করেন, অবিনাশচন্দ্রকে। তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠ করে স্যার আশুতোষ কেবল ভূয়সী প্রশংসাই করেননি—বিশ্ববিদ্যালয়ে নব প্রবর্তিত Ancient Indian History and culture বিভাগে অবিনাশচন্দ্রকে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তাঁর ঋগ্বেদ সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি, এইচ, ডি উপাধিতে ভূষিত করে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁর ঐ ঋগ্বেদ সম্পর্কীয় থীসিস্ Rig-vedic India নামে প্রকাশিত হয়। ১৯২০ থেকে ১৩ বৎসর অধ্যাপনা করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর (বাং ১৩৪৩, ২০শে ভাদ্র) অবিনাশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

অবিনাশচন্দ্র পুরাপুরি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই সংবাদপত্রের সংশ্রবে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্নিদীপ্ত রচনারাজি অবিনাশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি Indian Mirror সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সংশ্রবে আসেন এবং ঐ পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখকরূপে পরিগণিত হন। Indian Messenjer প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লেখা সুরু করেন। Mirror সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ অবিনাশচন্দ্রের জীবনকে সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সেবার অভিমুখী করে তোলেন। তাঁরই গভীরতর প্রভাবের ফলে অবিনাশচন্দ্র কোলকাতায় 'স্বদেশ' নামে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'স্বদেশ' নামক একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। স্বদেশ পত্রিকাখানি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্বদেশ পত্রিকাখানি অবলুপ্ত হওয়ার পর তিনি সনাতনী নামে একখানি ধর্ম্মমূলক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এ পত্রিকাও বেশিদিন চলেনি। এরপর নানা-কারণে 'স্বদেশ' প্রেস উঠে যায়। অবিনাশচন্দ্র কিছুকাল 'জমিদারী পঞ্চায়েত' পত্রিকাখানির সম্পাদনা করেন। পত্রিকাখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখি "ষষ্ঠসংখ্যা হইতে শ্রীযুক্তবাবু অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা আশা করি দাস মহাশয়ের

সম্পাদকতায় 'জমিদারী পঞ্চায়েৎ' পত্রিকা উত্তোরোত্তর অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে।১ স্বদেশ, সনাতনী ও জমিদারী পঞ্চায়েৎ পত্রিকা সম্পাদনার পর ১৩২ সালে অবিনাশচন্দ্র 'গন্ধবণিক' নামক একখানি সামাজিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এক বৎসরের মধ্যেই পত্রিকা-খানির প্রকাশ বন্ধ হয়। ১৩২৮ সালে পুনরায় তিনি উক্ত পত্রিকাখানির প্রকাশ করেন এবং ১৩৪৩ অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গন্ধবণিকে তাঁর বহু সুচিন্তিত নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সম্পাদনাগুণে এই পত্রিকা সেকালের বিদ্বজ্জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। রামানন্দ অবিনাশ-চন্দ্রের এই পত্রিকা থেকে বহু রচনা নির্বাচিত করে প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রণ করতেন। সংবাদ ও সাহিত্য পত্র-সেবায় তাঁর শিক্ষানবিশি হয় নরেন্দ্রনাথ সেনের কাছে। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথের কাছে ঋণ ও কৃতজ্ঞতার কথা স্বীকার করে তিনি 'একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।২ অবিনাশচন্দ্র ইংরেজী ও বাংলা এই উভয় ভাষাতেই সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তিনি সেকালের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। ধর্ম্মবন্ধু, দাসী, প্রদীপ, মুকুল, ভারতী, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, সাহিত্য, ভারতবর্ষ, সঞ্জীবনী, হিতবাদী, বাঁকুড়াদর্শন, ভারতের সাধনা, মানসী, Modern Review, Calcutta Review, Indian Mirror, Indian Messenger, প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় তাঁর নানাবিষয়ক রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Journal of Department of Letters নামক সংকলনগুলিতে অবিনাশচন্দ্রের অনেকগুলি সুচিন্তিত রচনা প্রকাশিত হয়। অবিনাশচন্দ্র সেকালের সাহিত্য-জগতের একটি সুপরিচিত নাম—তৎকালীন পত্রপত্রিকাগুলির পাতা উল্টালেই তার নিদর্শন মেলে।

অবিনাশচন্দ্র আত্মমর্যাদাবোধে ও বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধে সঞ্জীবিত ছিলেন। উনিশ শতকের মানবতা ও জনসেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সমাজসেবাকেও জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। 'নিজেকে জান' এই সত্যবোধ তাঁকে স্বীয় সমাজসেবায় প্রবুদ্ধ করে। অবিনাশচন্দ্র নিজ সমাজ-সেবার আদর্শকে জনসেবা বলেই মনে করতেন। অবিনাশ-চন্দ্রের সময়ে দেশাচার লোকাচার সামাজিক ও পারি-বারিক জীবনের নীতি-নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে শিথিলতা ও স্বৈরাচার দেখা দিয়েছিল। অবিনাশচন্দ্র সেখানে ছিলেন বাঙালী, হিন্দু—অবিনাশচন্দ্র সংস্কারক ও শিক্ষক, এই কল্যাণবোধ ও সমাজ-সেবার আদর্শেই অবিনাশচন্দ্র গন্ধবণিক পত্রিকার প্রকাশ করেন, তদানীন্তন সেন্সাস কমিশনার E, A, Gait গন্ধবণিক সম্প্রদায় সম্পর্কে সামান্য বিরূপ মন্তব্য করায় অবিনাশচন্দ্র Indian Mirror পত্রিকায় ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে The census commissioner and the Vaisyas of Bengal নামে এক দীর্ঘ প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময়েই ১৩০৯ সালের 'প্রবাসীতে' তিনি 'বৈশ্যবর্ণ' নামে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ করেন। এইরূপ সমাজচিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি ইংরেজীতে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁর "The Vaisya Caste" গ্রন্থখানি এইরূপ চিন্তা ও গবেষণার ফল। এই ইংরেজী গ্রন্থখানিতে তিনি গন্ধবণিক জাতির ইতিহাস নিরূপণ করেছেন। এরপরও তিনি বাংলা ভাষায় 'গন্ধবণিক জাতির প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস" 'চতুরাশ্রম সমন্বয়ের 'ইতিবৃত্ত', প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অবিনাশচন্দ্র প্রণীত এই সমস্ত গ্রন্থ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। বাংলার বিজ্ঞানভিত্তিক সামাজিক ইতিহাস যেদিন রচিত হবে—সেদিন অবিনাশচন্দ্রের সমাজ-চিন্তামূলক এই গ্রন্থ, নিবন্ধ, ভাবনাগুলির যথার্থ মূল্য নির্ণিত হবে।

গ্রন্থ পঞ্জী

—বাংলা—

(১) সীতা (গদ্য) প্রথম সং.১২৯৭, ২য়, ১৩০৪, ৩য় ১৩১৯
(২) সীতা (ঐ ছোট সং) ১৮৯৪
(৩) পলাশবন (উপন্যাস) ১৮৯৬
(৪) কুমারী (উপন্যাস) ১৩১৬
(৫) অরণ্যবাস (উপন্যাস) ১৩২১
(৬) দুর্গারাণী (উপন্যাস) ১৩৩০

—গ্রন্থপঞ্জী—

(৭) গাথা (কাব্য) ১৯০৯

(৮) প্রভাবতী (নাটক) ১৩২৯

(৯) সুকথা (প্রবন্ধ) ১৩০০

(১০) গন্ধবণিক জাতির প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস (প্রবন্ধ) ১৩৩০

(১১) চতুরাশ্রম সমন্বয়ের ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ) ১৩৩১

(১২) রঘুবংশম (গ্রন্থকার ও রামগোপাল কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত)

(১৩) সাহিত্যবোধ (প্রবন্ধ)

(১৪) ঐতিহাসিক গল্প (শিশু সাহিত্য)

(১৫) পৌরাণিক গল্প (ঐ)

(১৬) মধ্যম কনিষ্ঠ (নাটক)

—ইংরেজী—

(১) Rig-vedic India (c. v. 1921, 2nd Ed 1927

(২) Rig-vedic culture (1925)

(৩) The Vaisya caste (1903)

(৪) Nahar family (?)

(৫) Address : (1927)

Delivered by Dr. Abinash chandra Das, M. A. ph. D. of Calcutta University, as President of the Sarasvati Sammelana and the Veda Sammelana of the Gurukul University in connection with its Silver Jubilee celebration on the 16th March 1927.

অবিনাশচন্দ্রের সাহিত্য-সেবার কৃতিত্বের মূল্যায়ন বর্ত্তমান নিবন্ধে সম্ভব নয়। তবু প্রাসঙ্গিকভাবে দু একটি কথা এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে। ইংরেজী এবং বাংলা এই উভয় ভাষাতেই তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন—নিবন্ধাদি লিখেছেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য কর্ম্ম মূলত দুভাগে বিভক্ত। সৃজনীমূলক সাহিত্য ও চিন্তা-গবেষণামূলক সাহিত্য। আবার সুকুমারমতি কিশোরদের জন্য তিনি ভাবোদ্দীপক সুরুচি ও নীতিমূলক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। চিন্তানায়ক অবিনাশচন্দ্রের সকল রচনা সংকলিত হয়নি। সেকালের প্রায় ইংরেজী বাংলা সাময়িক পত্রে তিনি নানা চিন্তা-ভাবনাপূর্ণ প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। অবিনাশচন্দ্র জীবৎকালে সেই রচনারাজির সংকলন করে যেতে পারেননি। আজও সে কাজে কেউ অগ্রসর হননি। অথচ বর্তমানে অবিনাশচন্দ্রের সেই বিপুল রচনারাজির সংকলন শ্রমসাধ্য ও অনুসন্ধানসাপেক্ষ। আমার মনে হয়, অবিনাশচন্দ্রের সাহিত্যে বহুচারিতার নিদর্শন তাঁর পাণ্ডিত্য মনীষার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি বহুধা বিক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যেই অনুসন্ধাননির্ভর।

অবিনাশচন্দ্রের প্রথম সারস্বত অবদান 'সীতা'। 'সীতা' সুললিত গদ্যে রচিত। সীতাকে গদ্য কাব্য বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় সীতার মনোরম চরিত্রাঙ্কনের জন্য তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সীতা, গ্রন্থের জন্য অবিনাশ-চন্দ্র বাংলা ভাষায় সুলেখক রূপে পরিচিত হন। অবিনাশ চন্দ্র সীতা গ্রন্থে যে ভাষালালিত্য, সৌন্দর্য এবং প্রাচীন পরিবেশ সৃজনে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা চিরকালীন সাহিত্যের সম্পদ। সেকালে সীতার বহু সংস্করণ তাঁর জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবিনাশচন্দ্র শিক্ষক-সমাজ-সংস্কারক। তিনি সেই উদ্বেলিত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের সব কিছুকেই বরণ করে নিতে পারেননি—প্রাচীন হিন্দুভারতের গৌরবকে তিনি বিস্মৃত হননি। সেজন্যই স্ত্রী-শিক্ষা ও লোকশিক্ষার দিকে নজর রেখে তিনি "সীতা" গ্রন্থখানি রচনা করেন স্ত্রী-শিক্ষা বা প্রকৃত শিক্ষা অবিনাশ চন্দ্রের কালেরই সমস্যা। সীতার ভূমিকায় লেখক এতৎ বিষয়ে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সীতা গ্রন্থে উনিশ শতকীয় বাঙালী মননের একটি দিক অবিনাশচন্দ্রের মধ্যে উঁকি দিয়েছে। বঙ্গসাহিত্যে 'সীতা' দীর্ঘকাল ধরে তাঁর জনপ্রিয়তার আসন অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। পরবর্তীকালে অবিনাশচন্দ্রের সীতাকে কেন্দ্র করে কিছু গোলযোগ হয়। জলধর সেন 'সীতাদেবী' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেকালের কোন কোন সমালোচক জলধর সেনের এই 'সীতাদেবী' গ্রন্থখানিকে অবিনাশচন্দ্রের সীতার ভাব ও ভাষার অপহরণ বলে মনে করেন। স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে জলধর সেনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে লেখেন।৩ অবিনাশচন্দ্রও সীতা, গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের

ভূমিকায় লেখেন—"সীতাদেবীর দেবোপম চরিত্রাবলম্বনে বাংলা ভাষায় আরও দুই তিনখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সীতা গৃহে গৃহে যতই আলোচিত হয়, ততই সুখের বিষয়। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে হইল, গ্রন্থকার মৎপ্রণীত এই পুস্তকের বিলক্ষণ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, পরন্তু তিনি ভূমিকায় তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে অপরিচিতও নহেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু না বলিয়া তদ্বিষয়ের বিচার ভার পাঠাকবর্গেরই উপর অর্পণ করিলাম।"

অবিনাশচন্দ্রের উপন্যাস চতুষ্টয়ের উপর বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ বাঙালীদের সম্মুখে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে তিনি চিরায়ত হিন্দু-বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনচিত্র দাম্পত্যপ্রেম শান্ত প্রীতি স্নিগ্ধ পল্লীচিত্র—ধর্ম্মমাহাত্ম সত্যনিষ্ঠ সংগ্রামী চরিত্রের উপহার দেন। স্বাজাত্য সংস্কৃতির উদার ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাঁর উপন্যাসের ভাববস্তুরূপে দেখা দেয়। অবিনাশচন্দ্র বহু ভাষাবিদ বহু সাহিত্যচারী। রামানন্দের সংস্পর্শে তিনি উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁর কর্মস্থল কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। রামানন্দের দাসী, প্রদীপ প্রবাসী, মডার্ণরিভিয়ু এবং উদারনৈতিক বঙ্গদর্শন ও ভারতীয় কার্য্যালয়ে তাঁর আনাগোনা, আবার প্যুরিটান সাহিত্য ও নব্যভারতেরও তিনি লেখক। প্রগতি ও দেশের অতীত গৌরব এ উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় খুঁজেছিলেন অবিনাশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ঔপন্যাসিক হয়েও তাঁকে বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উপন্যাসের নূতন উপাদান অনুসন্ধানে তিনি পারঙ্গম হতে পারেননি—উপন্যাসে হাওয়াবদলের লক্ষণ তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই ঐতিহাসিক কারণেই অবিনাশচন্দ্রের ঔপন্যাসিক সত্তা পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি। তথাপি সেকালেই কোন কোন গল্পলেখকের মধ্যে পল্লীসমাজ ও গ্রামকেন্দ্রিক মানসিকতা দেখা দিয়েছিল। এই পরিবেশের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তবু বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের সেই শ্লথ প্রবাহে অবিনাশচন্দ্রের মত লেখকেরা বুভুক্ষু পাঠকদের খাদ্য জুগিয়েছেন—অব্যাহত রেখেছেন বাংলা-সাহিত্যের প্রবাহ। সেজন্যই অবিনাশচন্দ্রের মত ঔপন্যাসিকদের কাছে ঋণ স্বীকার উত্তরপুরুষের একটি কর্তব্য বলে মনে করি। তাঁর উপন্যাস ক'খানির সবকটিই মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ সালের দিকে রামানন্দের 'দাসীতে' তাঁর পলাশবন প্রকাশিত হয়, 'কুমারীর' রচনাকাল ১৩০৭ সাল। এ উপন্যাসের কিছু অংশ ১৩১১ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। অরণ্যবাসের রচনাকাল ১৩১২ সাল। পরে এই উপন্যাসও প্রবাসীতে ছাপা হয়। আর তাঁর দুর্গাবতী' উপন্যাসখানি ১৩২১ সালের 'পন্থা' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। অবিনাশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই সমাপ্ত হয়ে যায়।

অবিনাশচন্দ্রের 'পলাশবন' একখানি সুখপাঠ্য গল্পচিত্র। পলাশবনের ভাব ভাষা ও লিখনভঙ্গী পবিত্রতা মাখান। এখানে উদ্দাম শিক্ষার ঔদ্ধত্য নেই—নেই কোন আবিলতা। এ গ্রন্থের 'সুরমা' চরিত্র আকর্ষণীয়। সুরমা ধীর প্রশান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—এরূপ স্ত্রী চরিত্র তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী অঙ্কিত হয়নি। সাত্ত্বিক প্রশান্ত আনন্দে গ্রন্থখানি সিঞ্চিত। গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারতী (১৩০. জ্যৈষ্ঠ) আট পৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রবন্ধে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। ১৯০৭ সালের ৯ই মার্চ তারিখে এনট্রান্স পরীক্ষার্থীদের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহু অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ তালিকায় অবিনাশচন্দ্রের 'পলাশবন' সম্পর্কে সপ্রশংস উক্তি করে বলেন—

"you may also read the Bengali novel 'Palasban' by Babu Abinash Chandra Das or Suta Duhita. They are excellent novels and written in the Present style."

অবিনাশচন্দ্রের 'কুমারী' উপন্যাসের ভাষা মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ। রচনায় কবিত্ব ও ভাবুকতা আছে। ভাব পবিত্র, আদর্শ উচ্চ। সমকালীন দেশের কতিপয় জটিল সমস্যা গ্রন্থের বিষয়ীভূত। বালিকাবিবাহ, সামাজিক অবস্থা, ভারতে ইংরেজ শাসন বিধাতার অভিপ্রেত কিনা, ভারত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপযুক্ত কিনা, স্বরাজ লাভের পূর্ব্বে দেশের অধঃপতিত জাতি ও নারীসমাজকে শিক্ষিত ও উন্নত করা

আবশ্যক কিনা—এই সমস্ত সমস্যা লেখক সুনিপুণভাবে উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে শিল্পীর মত অঙ্কন করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ১৩.৬ সালে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন—"আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা" ও অবিনাশচন্দ্রের 'কুমারী' ব্যতীত উপন্যাস বিভাগ ও কোন স্থায়ী রসাত্মক রচনাধারা আলোকিত হয় নাই।"

"অরণ্যবাস" অবিনাশচন্দ্রের বৃহৎ উপন্যাস। অরণ্যবাস জীবনসংগ্রামে জয়লাভের এক মনোরম কাহিনী। সেকালের স্বাধীনতাকামী স্বাবলম্বী বাঙালী তরুণদের সম্মুখে এই উপন্যাস-খানি নূতন বার্তা বহন করে এনেছিল। চরিত্র-চিত্রণেও লোকজীবন প্রীতিতে অবিনাশচন্দ্র এ গ্রন্থে তাঁর শিল্পীসত্তার নিদর্শন রেখেছেন। তাঁর 'দুর্গারাণী' সামাজিক সমস্যামূলক আর একখানি উপন্যাস। বরপণের দাবী সেকালেই সামাজিক কুসংস্কাররূপে বিবেচিত হয়। বরপণে কন্যার পিতা যেমন সর্বস্বান্ত হতেন, কোন কোন স্থলে কন্যাপণের দাবীতে অনেকে অবিবাহিত থাকতেন। বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি জেলার হিন্দু-বাঙালীর পল্লীজীবনে মুসলমানগণ স্থায়ী আধিপত্য করতে পারেনি। সেজন্য সেখানকার হিন্দু মুসলমানগণের চরণ সেকালেও নিগড়বদ্ধ হয়নি। হিন্দুর প্রাধান্যকালের অনেক প্রথা ও রীতি তখনও অবিকৃত ছিল। অবিনাশচন্দ্র 'দুর্গারাণী' উপন্যাসে এই সমাজচিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছেন।

অবিনাশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কোন নূতন বাণী বহন করে আনেনি। সাহিত্যের হাওয়াবদলের কোন নূতন চিন্তা এখানে যুক্ত হয়নি। তথাপি তাঁর উপন্যাসগুলি ছিল সুখপাঠ্য শিক্ষণীয় ও সুরুচিপূর্ণ। উপন্যাসগুলিতে লেখকের বাঙালী মেজাজ স্ফুরিত। ভাষার মনোহারিত্ব তাঁর এরূপ লেখাতে প্রোজ্জ্বল। অবিনাশচন্দ্রের স্বাভাবিক ও আত্মিক যোগ ছিল পল্লীপরিবেশ ও লোকজীবনের সঙ্গে। তিনি তাঁর রচনাকে যতক্ষণ পল্লীর প্রকৃতি ও সরলজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন ততক্ষণ তাঁর সরল সৌন্দর্য সহজেই মনকে আকর্ষণ করেছে। সমকালীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তুলনা করলে সমগ্রভাবে অবিনাশচন্দ্রের কৃতিত্ব খুব বেশী মনে হয় না। কিন্তু তাঁর গদ্য রচনায় সহজশ্রী এবং পল্লী ও লোকজীবনের সরল সুন্দর রূপায়ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; এই গুণ সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করেছে।

অবিনাশচন্দ্র 'গাথা' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ এবং 'প্রভাবতী' ও 'মধ্যমকনিষ্ঠ' নামে দুখানি নাটক রচনা করেন। তাঁর কবিতাগুলি সরল ও প্রাঞ্জল। 'গাথা'র কবিতাগুলিতে একটা স্নিগ্ধ শুচিতা সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর কবিতাগুলিতে কোন বিহ্বল উচ্ছাস আবেগ নেই। সমতলদেশের ক্ষুদ্র তটিনীর মত ধীর লঘুগতিতে তা প্রবাহমান। এখানে কোন আড়ম্বর নেই—অথচ কোন আড়ষ্টতাও নেই। Indian Mirror 'গাথা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল—

"The Poems are mostly spiritual, and have blossomed forth in all their innocent Purity and loveliness which are not blurred nor bedimmed by any mist hanging about them, as unfortunately characterises the writings of some of our best Poets, the rapturous effusions of the soul bear in them the impress of classical simplicity and grandour, and make one forget for the nonce the sad and moddening turmoils of the world."

'প্রভাবতী' পঞ্চাঙ্ক নাটক। রুদ্ররাম চক্রবর্তীর 'ষষ্ঠীমঙ্গল' নামক প্রাচীন কাব্যের মানবখণ্ডের দেবীবর ও প্রভাবতীর উপাখ্যান অবলম্বন করে লেখক এই নাটক-খানি রচনা করেন। এই নাটকে লেখকের কবিত্ব ও নাট্য প্রতিভার নিদর্শন আছে।

অবিনাশচন্দ্র উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, সব কিছুই লিখেছেন তথাপি তিনি মূলত গদ্য-লেখক। সম্পাদক হিসাবে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ও গবেষক হিসেবেও অবিনাশচন্দ্র দাস স্মরণীয়। তাছাড়া আধুনিক বাংলাগদ্যের বিবর্তনে তাঁর অবদান অগ্রাহ্য নয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের চর্চায়—কর্ণধার না হলেও তিনি ছিলেন একজন নাবিক। ইংরেজী বাংলায় রচিত তাঁর অসংখ্য নিবন্ধরাজির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমার ত মনে হয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ—মণীষাদীপ্ত চিন্তা ও গবেষণার সাহিত্যেই সাহিত্য-সেবকরূপে

অবিনাশচন্দ্রের বড় কৃতিত্ব। তাঁর এরূপ রচনার সংখ্যা অগণিত। ভারততত্ত্ব, ইতিহাস, হিন্দুদর্শন, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য, সমালোচনা, স্মৃতিকথা, জীবনী, কত বিষয়ে তিনি নিবন্ধ লিখেছেন তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন। অবিনাশচন্দ্রের পূর্ণ ইংরেজী বাংলা রচনাসূচী সংগ্রহের ভার কোন অনুসন্ধিৎসু উৎসাহী ব্যক্তির গ্রহণ করা কর্তব্য বলে মনে করি। কাজটি পরিশ্রমসাপেক্ষ হলেও দুরূহ নয়। এদিক থেকে সেকালের সাহিত্যে অবিনাশচন্দ্র ছিলেন চিন্তানায়ক।

এই প্রসঙ্গে তাঁর ঋগ্বেদ চর্চার কথা মনে পড়ে। তাঁর জীবনের দীর্ঘকালীন সাধনা এই ঋগ্বেদচর্চার পিছনে অতিবাহিত হয়। বেদ ও প্রাচীন ভারতের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালবাসা, প্রীতি ও মোহ ছিল। অবিনাশচন্দ্রের এই চরিত্রলক্ষণের মূলে তাঁর পিতা হরিচরণ দাসের প্রভাব মুখ্য। রামানন্দ একস্থানে লিখেছেন "তাঁর পিতা হরিচরণ দাস, স্কুল সমূহের ডেপুটি-ইনস্পেক্টর, বিদ্বান ও শিক্ষাদানে দক্ষ ছিলেন। অবিনাশচন্দ্রের স্বভাব চরিত্র তাঁহার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। শানবাঁধাগ্রামের মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নূতনচাটির হরিচরণদাস প্রভৃতি বোধ হয় সেকালে বাঁকুড়ায় প্রথম ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।" হরিচরণ ১৮৫০-৫১ এবং ১৮৫১-৫২ সালে কৃষ্ণনগর কলেজের জুনিয়র স্কলার ছিলেন। কিছুকাল বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন—পরে মেদিনীপুর, রাঁচী প্রভৃতি জেলার ডেপুটি ইনস্পেক্টররূপে শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন।৪ বাঁকুড়ায় যাঁরা প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন তাঁদের মধ্যে হরিচরণ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। অবিনাশচন্দ্র প্রথমযুগের প্রবাসীতে বাঁকুড়ায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের বিবরণ প্রকাশ করেন।৫ Rig-Vedic Cultureএর উৎসর্গপত্রে অবিনাশচন্দ্রের "Father who inspired in me a love of ancient India" শব্দনিচয়ের অর্থ বুঝি।

গবেষণা-সাহিত্যে অবিনাশচন্দ্রের অবিস্মরণীয় অবদান তাঁর Rig-Vedic India ও Rig-Vedic Culture নামক বিপুলকায় গ্রন্থ দু'খানি। অবিনাশচন্দ্র আর কিছু না লিখলেও কেবলমাত্র এই অসীম পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ দু'খানির জন্য বাংলার গবেষণা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য। ঋগ্বেদচর্চায় পরবর্তী উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলে অনেক নূতনতথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। তথাপি ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যাঁরাই আলোচনা করুন না কেন—অবিনাশচন্দ্রের গবেষণালব্ধ উপকরণগুলি আজও অপরিহার্য। এদেশে ঋগ্বেদচর্চায় অন্যতম অগ্রপথিকের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। বেদচর্চার জন্যই তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। সেকালেই ভারতের বৈদিক সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, Prof. A. Hille brandt, Prof. Dr. A. B. Keith, Prof. Dr. Sten Konow, Prof. Dr. M- winternitz, Prof. G. Sergi, Prof. E. W. Hopkins, A. V. william Jackson, Prof V. Giuffrida Ruggeri, Dr. James Lindsay, Dr. Ganganath Jha প্রভৃতি দেশ বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী অবিনাশচন্দ্রের ঋগ্‌বৈদিক চিন্তার মৌলিকত্ব স্বীকার করেন। ১৯২৭ সালে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলভার জুবিলী উপলক্ষ্যে সারস্বত সম্মেলন ও বেদ সম্মেলনে অবিনাশচন্দ্র প্রদত্ত সভাপতির মনোজ্ঞ অভিভাষণ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সেদিন ভারতের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ অবিনাশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও মণীষাকে স্বীকার করে নেন। অবিনাশচন্দ্র সেদিন ঋগ্‌বৈদিক যুগের ভারতবর্ষের গৌরবগাথা পরিবেশন করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"It was the R. sis or the sage Priests, the mighty wise thinkers of the old, the 'brainiest' among the People, who led the Van of Progress in the early and subsequent stages of Aryan development. It was they who domesticated the cattle, discovered the use of fire, invented and manufactured various implements, made chariots and wagons, discovered the intimate relations of the cosmic Powers with human welfare, instituted fire-worship and the various sacrifices, calculated the promote human happiness, evolved the insti-

tution of marriage, and established it on a firm and secure basis, discovered the existence of the various beneficent deities and differentiated their individual characteristics, brought them down, as it were, from their distant spheres to exercise their benevolent influence on human affairs, discovered their unity in the one Supreme Deity, Permeating the universe the Primodial source of creation—the one and the indivisible, yet manifesting Itself in manifold ways and lifted up human hopes and aspirations from the fleeting, evanescent and Perishable things of the world to the attainment of Calm, serene and ever lasting "anandam" (beautitude) that knows no flewareble and is centred in and Co-extensive with Brahman, the great and undefinable."

অবিনাশচন্দ্রের ঋগ্বেদচর্চা তাঁর জীবনের এক সফল কীর্তি—বাঙালী মণীষার একটা দিগন্ত। যোগ্যব্যক্তি অবিনাশচন্দ্রের এই বৃহত্তর সাধনার দিকটির মূল্যায়ন করতে পারেন। এই অল্পকালের মধ্যে আমরা অবিনাশচন্দ্রকে বিস্মৃত হয়েছি। আজীবন সাহিত্যব্রতী অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যুতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসীতে' (১৩৪৩, আশ্বিন) লিখেছিলেন—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে এবং বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন গণনীয় ব্যক্তির তিরোভাব হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ হইতে কিছু কম হইয়াছিল। সাহিত্যিক কৃতিত্বে ও পাণ্ডিত্যে তিনি বাঁকুড়া জেলার গৌরবস্থল ছিলেন। তিনি পলাশবন, অরণ্যবাস, কুমারী, সীতা প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থের লেখক বলিয়া সুবিদিত। পদ্যও তিনি বেশ লিখিতে পারিতেন। তিনি গন্ধবণিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঋগ্‌বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যে বিস্তৃত ইংরেজী নিবন্ধ পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তাহা লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক নিয়োগের কারণও ঐ গ্রন্থখানি। তিনি তাহা না লিখিলেও অন্য অনেক এম-এ-বি-এল উপাধিধারীর মত অধ্যাপক হইবার যোগ্য ছিলেন। তিনি বেশ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ইংরেজী লিখিতে পারিতেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার বাংলা গ্রন্থগুলি অনাবিল এবং ভাষা প্রসাদগুণবিশিষ্ট।"

অবিনাশচন্দ্রের শততম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর সাহিত্য-সাধক জীবনের নব মূল্যায়ন ও সমীক্ষার প্রত্যাশা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করছি।

১। সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

২। স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন। বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১৮

৩) প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৯

৪) History and Register of Krishngara College (1950) P-67

৫) বাঁকুড়ায় ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তনের বিবরণ। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

ব্যাঙ্কিং ও বাংলা দেশ

সন্তোষকুমার অধিকারী

সর্বপ্রথম মুদ্রার প্রচলন কবে এবং কিভাবে সুরু হয়েছিল তা আজ গবেষণাসাপেক্ষ। তবে যেদিন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হতে শিখেছিল, সেদিন থেকেই তার প্রয়োজন হয়েছিল বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের। উৎপাদকের কাজ দ্রব্য সৃষ্টি করা, কারণ মানুষের অভাব বোধ হয়েছে। এবং সাধারণ মানুস চায় তার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতে। চাষী শস্য উৎপাদন করে এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য তার হাতে থাকে। কিন্তু তার অভাব বস্ত্রের, তেল, নুন, লকড়ির। তাঁতি কাপড় বোনে, সে চায় বস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্য সুতো ইত্যাদি। কাজেই পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের একটা ব্যবস্থা আপনা থেকেই একদিন গড়ে উঠলো। এই পারস্পরিক উৎপন্নদ্রব্যের বিনিময়কে অর্থনীতির দৃষ্টিতে বাণিজ্য বলে বর্ণনা করা হয়।

বিনিময় ব্যবস্থাটা শুধু দুটি বা তিনটি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে দুটি দেশ, এমনকি দুটি বৈদেশিক দেশের মধ্যেও এই ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছে। বস্তুতঃ বাণিজ্যই যে কোন একটি দেশের সমৃদ্ধির কারণ সে আলোচনা পরে করবো। আপাততঃ দেখছি, বিনিময় ব্যবস্থাটা প্রথম যুগে খুব সহজ হয়নি। কারণ একটি শাড়ির দাম কত মণ ধান, অথবা একটি বলদের জন্য কি পরিমাণ গম দেওয়া যাবে, কি ভাবে তা নিদ্ধারণ করা যায়। মানুষ তাই বিনিময়ের একটি মাধ্যম খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলো। এই মাধ্যম হিসেবে একসময় তারা ঝিনুক, কড়ি, ও একজাতীয় বীজ (wampum seads) ব্যবহার করেছে। কোন একসময়ে পুর্ব আফ্রিকায় ছাগল ছিল এই বস্তু। তখন অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নিদ্ধারিত হতো এইভাবে—:

১টি শিকারের ছুরি—১০টি ছাগল
১ মণ শস্য—২ " "
১টি তরুণী নারী—৬ " "

মুদ্রার প্রথম প্রচলন গ্রীস দেশে বলেই জানা যায়। তারা ধাতু নির্মিত একটি দণ্ডকে মুদ্রা হিসাবে চালু করেছিল প্রায় সাড়েতিন হাজার বছর আগে। কিন্তু রাজকীয় ছাপ সম্বলিত স্বর্ণ বা স্বর্ণযুক্ত মুদ্রার প্রথম প্রচলন সম্ভবতঃ এশিয়ামাইনরের লিডিয়াতে প্রায় সাতাশ শো বছর আগে রাজ ক্রীশাশের আমলে (Croesus) সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দেখা গেছে।

ভারতবর্ষে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতকে স্বর্ণ ও রৌপমুদ্রার প্রচলন ছিল বলে জানা গেছে। খৃঃ পূঃ ৩২৫-১৮৫ শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাটরা ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। সেই যুগের পূর্বেই এদেশে ধাতুমুদ্রার চল সুরু হয়েছিল। পাণিনির ব্যাকরণ, বৌদ্ধজাতক, ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্নপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার উল্লেখ আছে। স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'নিষক' ও সুবর্ণ" এবং রৌপ্যমুদ্রার নাম "কার্ষাপণ' ও 'প্রবণ'। রৌপ্যমুদ্রার সাধারণ ওজন ছিল ৩২ রতি, তাম্র-মুদ্রার ৮০ রতি। অর্থশাস্ত্রে 'মাষক' নামে তাম্রমুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মৌর্য যুগে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত রজতখণ্ডের নাম ছিল 'পুরাণ'। শ্রেষ্ঠী ও সার্থবহগণ এই মুদ্রা প্রস্তুত করতো। বাংলার নানাস্থানে এই 'পুরাণ' আবিষ্কৃত হয়েছে। চব্বিশ-পরগণায় জাক্রা, মেদিনীপুরের তমলুকে—হাওড়ায় বাসুদেব-পুরে ও মুর্শিদাবাদে এই পুরাণ ও অন্যান্য ধরনের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।

গুপ্তসাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের (৩৪০-৩৮০

খৃ:) আমলে আট প্রকার স্বর্ণমুদ্রার চলন ছিল। বাংলাদেশের নানাস্থানে সমুদ্রগুপ্তর এই স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তর পরবর্তী সম্রাট কুমার গুপ্ত (৪১৪—৫৫ খৃ:)। তাঁর আমলে হুন আক্রমণ সুরু হয়। ফলে রাজভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেলে কুমার গুপ্ত দ্বিধাতুযুক্ত মুদ্রার প্রবর্তন করেন। তিনি স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে তাম্র যোগ করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারত দখল করে, তখন রবার্ট ক্লাইভও এই দ্বিধাতুবাদের প্রবর্তন করেছিলেন। আর তখন সারা ভারতবর্ষে চারটি টাকশালের মধ্যে দুটিই ছিল বাংলাদেশে—একটি মুর্শিদাবাদে অপরটি কলকাতায়।

(২)

মানুষ যেদিন থেকে বাণিজ্য করতে শিখেছে সেদিন থেকেই তার মধ্যে সঞ্চয়প্রবৃত্তি সহজাত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রা তখন শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে থাকেনি—সম্পদ-বৃদ্ধির উপায় হিসেবেও গণ্য হয়েছে। কিন্তু প্রচুর সম্পদ যার হাতে, সে চেয়েছে সেই সম্পদকে বিনিয়োগ ক'রে আরও বর্দ্ধিত করতে। যারা বাণিজ্য করে দেশ বিদেশে দ্রব্য বহন করে নিয়ে গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করে তাদেরও প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থের। বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ঋণ গ্রহণ ও ঋণদানের এই নীতি প্রাচীনকালেও বর্তমান ছিল। স্বার্থবাহ ও কুলিকরা শ্রেষ্ঠীদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করতো। খৃষ্টজন্মের দুহাজার বছর আগে অর্থাৎ বৈদিক-যুগের ভারতবর্ষে এই ঋণ দেওয়া ও নেওয়ার প্রথা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে যুগে মহাজন বা ব্যাঙ্কারদের শেঠ শ্রেষ্ঠী বা শ্রক্ বলে অভিহিত করা হত। মনুসংহিতার রচনাকাল দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করা হয়। মনুসংহিতার একটি পুরো অধ্যায় সঞ্চয় ঋণদান ও বন্ধকি ব্যবস্থার নীতি-বর্ণনায় পূর্ণ। বাংলাদেশের দামোদরপুরে (৪৪৪ ৪৫ খৃ:) যে তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে তাতে নগর-শ্রেষ্ঠীর উল্লেখ আছে। এই শ্রেষ্ঠীরা আমানত গ্রহণ করতো এবং সুদের বিনিময়ে কুলিক (merchant)-দের কাছে অর্থ-বিনিয়োগ করতো। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তবংশের স্কন্দগুপ্ত ইন্দোরে যে তাম্রলিপি রেখে যান তাতে নিগম প্রতিষ্ঠানের (Banking Institution) কাছে মন্দিরের সম্পত্তি আমানত হিসেবে রাখার কথা উল্লিখিত রয়েছে। নিগমগুলিই ব্যাঙ্কের কাজ করতো। নগদ অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তি জমা রাখতো। এই কাজকে 'অক্ষয়নিধি' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ বর্তমান সেফকাষ্টোডি (Safe custody) ব্যবস্থার প্রাচীন রূপ। বৈশালী কোটিবর্ষ প্রভৃতি স্থানে এই নিগমপ্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্ব অর্জন করেছিল। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের ভারতবর্ষে জৈন ব্যাঙ্কাররা খ্যাতিলাভ করেছিল। তখন ব্যাঙ্কিং বলতে বোঝাতো—(১) আমানত জমা রাখা

(২) হুণ্ডির সাহায্যে টাকা পাঠানো

(৩) ঋণদান ইত্যাদি।

আবু পাহাড়ের বিখ্যাত দিলওয়ারা এই জৈন ব্যাঙ্কারদের টাকাতেই তৈরী হয়েছিল বলে শোনা যায়। বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক T. B. Tavernier এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি বাণিজ্যকেন্দ্রেই শ্রক বা শ্রেষ্ঠীরা টাকা লেনদেন করতো। তারা আধুনিক ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির মতই ব্যাঙ্কিং-এর* কাজ করতো। অর্থাৎ তারা আমানত গচ্ছিত রেখে বিনিময়ে সুদ দিতো; সেই আমানতের অর্থ বণিকদের কাছে ঋণ হিসাবে বিনিয়োগ করতো; সম্পত্তি ও অন্যান্য নানাদ্রব্য বন্ধক রেখে এই ঋণ দিতো এবং বাণিজ্যের টাকা লেনদেন করার জন্য হুণ্ডি কাটতো। তাদের কাছে সাধারণ লোক মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখতো।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইংল্যাণ্ডে ব্যাঙ্কিং-য়ের সূচনা দেখা দেয় ষোড়শ শতাব্দীতে। অবশ্য তারও পূর্বে ইহুদিরা টাকা লেনদেন করতো এবং ধার দিতো। ব্যাঙ্ক নামটি আমরা ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি, এবং ব্যাঙ্কিং এর আধুনিক বিবর্তনের জন্য আমরা বিশেষ ভাবে ইংরেজদের কাছে ঋণী, তবুও একথা বলা যায় যে ব্যাঙ্কিংয়ের নীতি ভারতবর্ষে বহু পূর্বেই প্রচলিত ছিল। ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতে মানুষ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সে সময়ে ইউরোপের লোক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাটি বুঝে উঠতে পারেনি।

(৩)

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে একজন মাড়োয়ারী মহাজন যোধপুর থেকে পাটনায় এসে বসতিস্থাপন করেন। এর পুত্র মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলি খাঁর ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদে আসেন। সে সময় ব্যাঙ্কার শব্দের সমার্থবোধক শব্দ ন্যাসরক্ষক। কিন্তু কোন রাজদরবারে ন্যাসরক্ষক হওয়ার অর্থ State banker হিসাবে গণিত হওয়া। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব এই মাণিকচাঁদকে "শেঠ' বলে অভিহিত করে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। মাণিকচাঁদের ভাইপো ফতেচাঁদ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তিনিই 'জগৎ শেঠ' উপাধি পান এবং সম্রাট ফরুখসায়ার তাঁকে এই উপাধি দান করেন। এই ফতেচাঁদ-এর পৌত্র মহাতাপচাঁদ জগৎ শেঠ মুর্শিদাবাদের নশীপুর নামক স্থানে গৃহ নির্মাণ করেন। তাঁর সেই গৃহের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

মুর্শিদাবাদের নবাব এই "জগৎশেঠ"প্রদত্ত হুণ্ডির মাধ্যমে দিল্লীর দরবারে কর পাঠাতেন। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোং ও তদানীন্তন ইংরাজ-বণিকদের কাছে 'জগৎশেঠ' প্রচুর সম্মানলাভ করেছিলেন। কিন্তু মীরকাশিম নবাব হয়ে "জগৎশেঠ" মহাতাপচাঁদকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ ক'রে হত্যা করেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নেন।

জগৎ শেঠের মৃত্যুর পর কলকাতায় ইউরোপীয় বণিকেরা—ব্যাঙ্কের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করে। রাজস্ব আদায় ও বিভিন্ন স্থানের মধ্যে টাকা লেনদেনের সুবিধার জন্য ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথা চিন্তা করে। ইতিমধ্যে আলেকজাণ্ডার এ্যাণ্ড কোং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ব্যাঙ্ক অফ্ হিন্দুস্থান-এর প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যাঙ্কই আধুনিক ভারতের প্রথম ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান যা আধুনিক ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের ধারায় কাজ সুরু করে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ওয়ারেন হেষ্টিংশ বাংলাদেশের জন্য একটি ব্যাঙ্ক্ প্রতিষ্ঠা'র পরিকল্পনা করেন। এই ব্যাঙ্কটির নামকরণ করা হয়—জেনারেল ব্যাঙ্ক্ অফ্ বেঙ্গল এ্যাণ্ড বিহার। কিন্তু এই পরিকল্পনা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বাতিল করা হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক্ নামে একটি ব্যাঙ্ক্ গড়ে ওঠে, এবং ১৭৮৬তে প্রতিষ্ঠিত হয় দি জেনারেল ব্যাঙ্ক্ অফ্ ইণ্ডিয়া। এই দুটি ব্যাঙ্ক্ই নোট্ ছাপাবার অধিকার পায়, ফলে দুটি ব্যাঙ্কের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। "দি জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া" প্রথম ব্যাঙ্ক যাতে অংশীদারদের দায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই ব্যাঙ্কের ছাপা নোট্ গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করা হলে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতি ঘটে। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশের কাছে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রতিবাদ জানায়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরাজদের সুনাম নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক টাকা-তোলার হিড়িক পড়ে। এই বছরেই ২৮শে নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়।

জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার কার্য মূলতঃ কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে কলকাতার বাইরে টাকা আদানপ্রদানের ব্যাপারে এই ব্যাঙ্ক কোন সাহায্য করতে পারতো না। গভর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায়ের টাকা কলকাতায় আনা ও কলকাতা থেকে টাকা বাইরে পাঠানোর ব্যাপারে অসুবিধে ঘটতে লাগলো। ১৭৮৮ সালে একটি বিজ্ঞপ্তির দ্বারা গভর্ণমেণ্ট জেনারেল ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করে। ১৭৯৩ সালে ব্যাঙ্কটি ব্যবসা গুটিয়ে নিল। বাকি রইল শুধু ব্যাঙ্ক অফ্ হিন্দুস্থান।

ইতিমধ্যে দেশে অর্থনৈতিক বিপত্তি দেখা দেয়। মুদ্রামূল্য হ্রাস পেতে থাকে। একটি ব্যাঙ্কের অভাবে সরকারী কাজকর্মেও প্রবল অসুবিধা হতে থাকে। গভর্ণমেন্ট অগ্রণী হয়ে ১৮০৬ সালে ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। এই ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সপারিষদ বড়লাট। ১৮০৯ সালে বিশেষ সনদ লাভ করে এই ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল' নামে পরিচিতি হয়। এই ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল পাঁচলক্ষ পাউণ্ড। তার মধ্যে একলক্ষ পাউণ্ড ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অফ্ বোম্বের প্রতিষ্ঠা। এই দুটি ব্যাঙ্ক এবং আরও পরে ব্যাঙ্ক অফ্ মাদ্রাজ

সরকারী ট্রেজারীর কার্য সম্পাদন করতো। ১৯২০ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট পাশ হলে এই তিনটি ব্যাঙ্ক একত্র হয়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া নাম গ্রহণ করে। প্রধান অফিসটি কলকাতাতেই থাকে।

(৪)

এখানে বলা প্রয়োজন যে এতক্ষণ যে সব ব্যাঙ্কের নাম করা হয়েছে সেগুলিতে মূলতঃ বিদেশী মূলধন ও বিদেশী পরিচালনাই কার্যকরী ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদেই বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষে নব-জাতীয়তাবাদের মন্ত্রগুঞ্জরণ সুরু হয়ে গেছে, রাজা রামমোহন যার উদ্বোধন এবং বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও তিলক যার উদ্‌গাতা। সমস্ত দেশ জুড়ে তখন এক নতুন স্পন্দনের দোলা জেগেছে। ব্যবসায় ও আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রেও অগ্রণী হয়ে এল দেশ। বলা বাহুল্য বাংলাদেশই নেতৃত্ব দিয়েছে সর্বক্ষেত্রেই।

বাংলাদেশে প্রথম Loan Office প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৫ সালে ফরিদপুর জেলায়—নাম ফরিদপুর লোন-অফিস। ১৮০১ সালে পাই ত্রিপুরা লোন-অফিস এবং ১৮৮৭তে জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং এ্যাণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন। এই লোন-অফিসগুলির কার্য অত্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং ১৯২৯ সালে গৃহীত একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ওই সময় সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৭৮১টি লোন-অফিস ছিল। ওই পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা যায় যে ১৯২৯ সালে সমগ্র বাংলা দেশে মোট ১৭৪৫৩টি সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল।

যৌথ মূলধনে গঠিত ও সীমিত দায়সম্পন্ন প্রথম ব্যাঙ্ক এল ১৮৬০ সালে, কিন্তু এটিও বিদেশী পরিচালনার অধীন ছিল। সম্পূর্ণ ভারতীয় মূলধনে গঠিত ও ভারতীয় পরিচালনায় চালিত প্রথম ব্যাঙ্কের (Joint stock Bank with limited liability) নাম অযোধ্যা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—(Oudh Commercial Bank Ld. Estd 1881.) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ১৮৯৪ সালে আর বাংলা দেশে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন গড়ে ওঠে ১৮৯৬ সালে। এই ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পেছনে বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা সংহত হয়েছিল; এবং এই ব্যাঙ্ক দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে চলেছে। এই ব্যাঙ্কের পরে বাংলাদেশে যে তিনটি উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় তাদের নাম যথাক্রমে

১।	কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	১৯১৪
২।	বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৯১৮
৩।	কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১৯২২

প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বাভাবিক নিয়মে দেশে অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দেয়। অন্যদিকে এই সময়েই স্বদেশী আন্দোলনের ধারা দুর্বার হয়ে ওঠে। বাংলা-দেশে সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও সমান গতিতে এগোতে থাকে। কিন্তু বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও আর সতেরোটি ব্যাঙ্কের পতন এক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যার ফলে সাধারণ মানুষের মনে হতাশা ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রথম অভিমত দেন যে, এই বিপর্যয়কে রোধ করতে হলে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির একত্রিকরণ দরকার। ১৯২৯ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে ভারতীয় ও বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক-গুলির অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার একটি চিত্র নীচে দেওয়া হল।

মোট ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও আমানত—(৩৩)	৬২,৭২,০৩,০০০
বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ও আমানতের পরিমাণ—	
ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন :	২৯,৬১,০০০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	৮,৬৫,৭৪৭
বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৬,২৩,০০০
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১৩,৩৭,০০০
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও মোট আমানত—	৭৭,২৪,২৮,০০০
বিনিময় ব্যাঙ্ক ও মোট আমানত—(১৮)	৬৬,৬৫,৯১,০০০
বাংলা দেশের সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ— সংখ্যা (১৭৪৫৩)	
বাংলা দেশের লোন অফিস সমূহ ও মোট আমানত—(৭৮১)	৭,৬৭,৬৯,০০০

১৯৪৭।৪৮ সালে ব্যাঙ্কবিপর্যয় মারাত্মকরূপে দেখা দিলে ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের প্রশ্নটি প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে বাংলা দেশের চারটি বড় ব্যাঙ্ক মিলিত হয়ে একটি সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলে।

গত একশ' বছরের ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে যে বিপুল বিবর্তন ঘটেছে, এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে তার আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি শুধু ইতিহাসের পটভূমিকা এবং এই পটভূমিকায় বাংলা দেশের ভূমিকা-টুকু দেখাবার চেষ্টা করেছি।

* ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কিংয়ের কোন সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার ও লেখক ডঃ হার্টের মতে (Dr Hart law of Banking) Banker may be defined as one who in the ordinary course of business honours cheques drawn upon him by persons from and for whom he receives money on current accounts. Banking Co's Act 1949 ব্যাঙ্কিংয়ের একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যা আজ পর্যন্ত অন্যকোন দেশের আইনে হয়নি। ওই সংজ্ঞা অনুযায়ী—চাহিবামাত্র (অথবা পূর্বনির্দিষ্ট সর্তে) ফেরত দেওয়ার সর্তে এবং চেক এর মাধ্যমে (অথবা অন্যভাবে) টাকা তুলতে দেওয়ার অঙ্গীকারে আমানত যদি গ্রহণ করা হয় এবং সেই আমানত যদি (ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অথবা দেশের উন্নতিমূলক কার্য্যে) ঋণ হিসাবে বিনিয়োগ করা যায় তবে এই ব্যবসাকে ব্যাঙ্কিং বলে।

মার্কিনী বুলি বা ইয়াংকি ইংরাজী

জুলফিকার

মার্কিনী বা এ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের ভাষা ইংরেজী, কিন্তু খাঁটি বিলেতী ইংরেজী নয়। ওদের অনেক কথা ইংরাজেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, যেমন পূর্ববঙ্গের অনেক কথা বা বাক্যরীতি পশ্চিম বাংলার লোকদের কাছে দুর্বোধ্য। চলতি কথায় মার্কিনীরা তাদের দেশওয়ালীদের বলে Yankee, কাজেই ওদের ভাষাকে বলা যেতে পারে, ইয়াংকি ইংলিশ। মার্কিনীদের ভাষা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করার আগে, ওদের ethric pattern বা জাতীয় গঠন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

যুক্তরাষ্ট্র বিশাল দেশ।

এর আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় তিনগুণ (জনসংখ্যা অবিশ্যি পাকিস্থানকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের অর্ধেকেরও কম); নতুন এ্যামেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পর, ইংল্যাণ্ড থেকে পিলগ্রীম ফাদাসে'রা এসে পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি উপনিবেশ গড়ে তুলে'ছিলেন, বন-জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিরাট ভূখণ্ডের সামান্য একটু অংশ জুড়ে ছিল তাঁদের উপনিবেশ।····

উন্মুক্ত আকাশ-তলে পড়ে ছিল দিগন্ত-প্রসারী তৃণভূমি-প্রেইরী, যেখানে স্বল্পায়াসে শস্যোৎপাদন ও পশুপালন চলতে পারে; উত্তুঙ্গ বিশাল রকি গিরিশ্রেণীর সানুদেশে বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চল, যেখানে কাষ্ঠ ও পশুচর্ম ব্যবসায়ের পর্য্যাপ্ত প্রতিশ্রুতি; ক্যাকটাস, সেজব্রাশ ও পশুর বিকীর্ণ উষর মরু প্রান্তর, স্বর্ণ সন্ধানীদের El dorado,—যার প্রলুব্ধ আকর্ষণ দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীদের দলে দলে টেনে এনেছে, সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে এই দেশে···

এসেছে ইংরেজ, আইরীশ, ফরাসী, জার্মান। এসেছে এসেছে হিস্পানী, পর্তুগীজ, ইতালীয়ান, রুশ। এসেছে সুইস, ডাচ, পোল, ফিন ও স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান। প্রেইরীর বুকে এদের কেউ হল পশুপালক বা র‍্যাঞ্চার, কেউ লেগে গেল ক্ষেত-খামারের কাজে,—গমের বা তামাকের ক্ষেতে, তুলোর চাষে, আপেল-নাসপাতি-চেরী-পিচ-আনারসের বাগানে।

সুরু হল রকমারী ব্যবসা।

ইংরেজেরা এসে খুলল আমদানী রপ্তানী কাজের জন্য কমার্শিয়াল হাউস, এ্যাটর্নীর দপ্তর, বইয়ের দোকান, ছাপাখানা; ইতালীয়ানেরা খুলল হোটেল, কাফিখানা, মনিহারী দোকান; গ্রীকেরা লেগে গেল দর্জীর কাজে, কেউ বা কাপড়ের ব্যবসায়ে; স্কচেরা চালাতে লাগল সুতোর কল; ডাচেরা মদের ভাঁটি; জার্মানেরা খুলে বসল এঞ্জিনীয়ারীং ফার্ম, নাট্যশালা, মাইনিং এক্সপার্টের আপিস।

১৮৫০ সালের সরকারী হিসাবে দেখা যায় ঐ বছর যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে লোক এসেছিল মোট তিন লক্ষ সত্তর হাজার। একশো বছর পর ১৯৫০ সালে, বহিরাগত ইমিগ্রান্টদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দশ লক্ষে। বর্ত্তমানে এমিগ্রেশন আইনের কড়াকড়িতে এই সংখ্যা এসে ঠেকেছে বাৎসরিক মাত্র দুই লক্ষে। ১৮২০ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল তক মোট চারকোটি বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে, পাকাপাকিভাবে ওদেশে বসবাস করবার অভিপ্রায়ে। এদের মধ্যে ইংরেজ হচ্ছে ৪৫ লক্ষ, আইরীশ ৪৫ লক্ষের কিছু বেশী, জার্মান ৬৫ লক্ষ, ইতালীয়ান ৫০ লক্ষ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ২৫ লক্ষ, মধ্য ইউরোপীয়ান, অর্থাৎ হাঙ্গেরিয়ান, পোল, শ্লাভ, চেক, গ্রীক-সব মিলে ৮০ লক্ষ। এ ছাড়াও ক্যানাডা, মেক্সিকো, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজেরও অনেক লোক এসেছে।

কার্পাসের ক্ষেতে ও কারখানায় খাটবার জন্য এসেছে নিগ্রো ক্রীতদাসের দল, আটলান্টিক পার হয়ে। এসেছে চীনা ছুতোর, ধোপা, জাপানী মিস্ত্রী, ফিলিপিনো মজুর।··· ন্যু ইয়র্ক সহরের আশী লক্ষ লোকের অর্ধেকই ভিন্‌দেশী। এদের মধ্যে ইতালীয়ান ও রুশদের সংখ্যাই সমধিক। সিকি ভাগ হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইহুদী।

এ্যামেরিকান পদবী—Agostini, Deferrari, Guggenhiems, Heinz, Rosenwald, Levin Stassen, Eisenhower, Wurlitzer, Chrysler, Swientoslawski, Weyherhauser প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় ওদের জাতি বৈচিত্র্য। কালে কালে আবার খটখটে জার্মান বা শ্লাভ পদবী অনেক সময় সংক্ষিপ্ত মোলায়েম রূপ নিয়েছে।

প্রথম প্রথম ভিন্নভাষী লোকেরা এদেশে এসে নিজেদের পৃথক পৃথক আস্তানা গড়ে তুলেছিল।

উইসকন সিনে এখন সুইস গয়লাদের ঘাঁটি, তারা পুরুষানুক্রমে মাখন ও চীজের ব্যবসা চালাচ্ছে। Detroit এর মধ্যে Hamtramck হচ্ছে পোলদের মহল্লা, লস এঞ্জেলেসে মেক্সিয়ানদের ভিড়, সান-ফ্রান্সিস্কোতে চীনাদের বিরাট উপনিবেশ—ওখানে তাদের নিজেদের হাসপাতাল, ডাকঘর, খবরের কাগজ, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে (এই এক্সচেঞ্জে ছয় রকম চীনা dialcat এ কাজ চালাবার জন্য অপরেটর রাখা হয়েছে)। …এখন পোলিশ ছেলেরা falcons এ, আইরীশ খোকা-খুকুরা eisteddfods এ এবং বোহেমিয়ান বাচ্চারা sokols এ নিজ নিজ মাতৃভাষা শেখবার জন্য পড়াশোনা চালায়। কোন কোন অঞ্চলে জার্মানদের নিজেদের থিয়েটার আছে। এই সব ছুটকো বিচ্ছিন্ন সমাজগুলোকে বাদ দিলে দেখা যাবে এই বিশাল রাজ্যে বিভিন্ন জাতি ও তাদের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক বর্ণাঢ্য প্রাণবন্ত সভ্যতা। একই ভাষাভাষী এক মহান সঙ্কর জাতির অভ্যুদয় হয়েছে নতুন মহাদেশের এই শক্তিমান রাষ্ট্রে। 'বিভেদ ভুলিয়া জাগায়ে তুলেছে একটি বিরাট হিয়া'—কবির এই উক্তি ভারতের পক্ষে যতটা প্রযোজ্য, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রযোজ্য হবে মার্কিন দেশের জন্যে। আমাদের ভাষার লড়াই কবে শেষ হবে কে জানে?…

এ্যামেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী লোক ইংরাজ বংশোদ্ভব। দীর্ঘ ১৭০ বছর দেশটা ইংল্যাণ্ডের রাজার অধীনে ছিল। এই পৌনে দুশ বছর ধরে মার্কিন মুলুকে ভাষা ও কৃষ্টির রূপ ইংরেজীর বুনিয়াদের উপরেই গড়ে উঠেছে। আপন কুক্ষিগত ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকদের যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজীর জারক রসে জীর্ণ করে ফেলেছে। স্প্যানীশ, ডাচ, জার্মান, পোল, ইতালীয়ান সব এক বিরাট দেহে লীন হয়ে গেছে, যেমনটি হয়েছিল, গ্রীক শক, হুন, পারশুদের বেলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারতে। ডোমিট্রিয়াসের ছেলে হয়েছিলেন বাসুদেব, হুনেরা শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সূর্যবংশীয় রাজপুত। এ্যামেরিকা প্রবাসী Signor Palazzeschi এর প্রপৌত্র এখন হয়েছেন Mr. Palas, Minkowski এর নাতি সাদামাটা Mr. Mink.

এ্যামেরিকান জাতীয় জীবনে রেড ইণ্ডিয়ানদের অবদানও কম নয় নেহাৎ। ইণ্ডিয়ান নাম আজও বেঁচে আছে নদী পাহাড়, অঞ্চল, জনপদের সঙ্গে,—মিসিসিপি, মোনানগাহেম, সাসকোয়েহেন্না, ওহিও, আরকানসাস, ওকলাহোমা, সিন্‌সিনাটি, কনেকটিকাট প্রভৃতিতে, নতুন মহাদেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের কাছে জীবজন্তু, গাছ-পালা অনেক কিছুই ছিল অজানা, নতুন, কাজেই ইণ্ডিয়ানদের উদ্ভিদ ও প্রাণীবাচক অনেক শব্দ ইয়াংকিদের শব্দ-ভাণ্ডারে এসে ঢুকেছে—

আলপাকা, হিকোরী (এক রকম বাদাম), মেহোগেনী, মুস্ (হরিণ) শাঙ্ক প্রভৃতি।……ইয়াংকিরা প্রতিবেশী আদিম রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ভাষা থেকে অনেক শব্দ গ্রহণ করেছে (যেমন আদিম অনার্যদের অাষ্ট্রিক ভাষার অনেক শব্দকে,—চোঙা, ঠোঙা, বোঁচা, ঝিঙা খোকা প্রভৃতি আমরা বাংলা ভাষায় স্থান দিয়েছি।) এই সব শব্দের অনেকগুলো আবার ইংরেজী অভিধানেও স্থান পেয়েছে যেমন—

Canoe (ডোঙ্গা), Moccasin (নরম চামড়ার জুতো), Hominy (ভুট্টো চূর্ণের মণ্ড), Sachem (মাতব্বর লোক) Squaw (স্ত্রীলোক) ইত্যাদি, Mugwamp শব্দটিও খুব ব্যবহার হয়ে থাকে, এর অর্থ—কর্ত্তা বা হোমরা-চোমরা লোক। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সহরের নাম ঠিক ইংরেজী নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে— Albuquerque, Bernardino, Las, Cruces, Las Vegas, Santa Fe, Sacramento।

ভিন্ন জাতের লোকের কাছ থেকে মার্কিনিরা নানা ধরণের খাবার খেতে শিখেছে। ইণ্ডিয়ানদের Succotash (কাঁচা ভুট্টোর দানা, বীন ও নোনা শূকর মাংসের ঝোল) ইতালীয়ানদের সেঁওয়াই Spaghetti বা macaroni ওদের মধ্য Scallopini ও Cianti, ডাচদের কেক Cruller হাঙ্গেরিয়ান ঝাল ও মশলাদার মাংসের ব্যঞ্জন, জার্মান সসেজ hamburger, সে দেশের বাঁধা কপির আচার sauerkrant ও জার্মানী সুরা wienerschnitzel ও Schnupps, ফরাসীদের উপাদেয় পাঁচমেশালী মাছের ঝোল কুইয়াবেস (bouilla), চীনাদের ও আচার (soy sauce) এ সব খাবারগুলোর নাম ওদের অভিধানে স্থান নিয়েছে। বহু বৈদেশিক শব্দ মার্কিনী শব্দ কোষকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। জাপানী ও ঈড্ডিশ (Yiddish—প্রাচীন জার্মানীর ইহুদী ভাষা) শব্দও বাদ যায় নি। দুটো খুব প্রচলিত শব্দ হচ্ছে,—টাইকুন (tycoon—Japanese, অর্থ—শিল্পপতি) ও কোশার kosher—Yiddish, অর্থ

খাবার বা খাবারের দোকান, আর একটি ইড্ডীশ শব্দ যার খুব ব্যাপক চল আছে, সেটা হচ্ছে kibitzer (যারা তাস খেলার খেলোয়াড়দের পেছনে বসে অযাচিত উপদেশ দেয়; সব ব্যাপারে নাক গলান স্বভাব তাদের বলা হয় কিবিৎসার)।

ইয়াংকিদের ইংরেজী শুনলে খাস ইংল্যাণ্ডের লোক সময় সময় ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবে। শব্দটা ইংরেজী হলেও তার অর্থ বুঝতে গলদঘর্ম, 'স্ন্যাপ' শব্দের অর্থ ইংরেজদের কাছে—শব্দ করে ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে যাওয়া (ফট্ করে যেমন দড়ি ছেঁড়ে) অথবা ফোটোর স্ন্যাপসট্ কিন্তু এর মাকিনী অর্থ হচ্ছে,—'ঝট্ করে করে ফেলা' (verb হলে) অথবা (noun হ'লে) সহজসাধ্য কাজ। (He did it with a snap, or It is such a snap)। ইংরাজেরা জানে 'ডাম' শব্দের অর্থ বোবা, কিন্তু ইয়াংকিদের কাছে এই শব্দের চলতি অর্থ হচ্ছে বোকা বা হাবা। অনেক সময় মুখচোরা লোককে ওরা বলে থাকে ডাম্বেল (dumb bell)।

র‍্যাংলার বলতে ইংরেজ বুঝবে 'ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের উচ্চ উপাধিধারী, মাকিনীদের কাছে কিন্তু ওর মানে,—রাখাল cowboy)।

ড্রামার কথাটা শুনলে ইংরেজরা ভাববে ঢাকী কিন্তু মাকিনমুলুকে এই শব্দটি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিকে বোঝায়। ডে লেটার কথাটার মানে বুঝতে যে কোন ইংরেজই হিমশিম খেয়ে যাবে, অথচ এ্যামেরিকায় এটা খুবই চালু শব্দ, বিশেষ ব্যবসায়ী মহলে। এটা হচ্ছে স্পেশাল টেলিগ্রাম।

ইয়াংকিরা 'চিট' (ঠকান) অর্থে 'বিট' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করে থাকে। রেলট্রেনকে ওরা বলে পুলম্যান, ষ্টেশনকে বলে ডিপো' (depot)। ট্র্যাম হচ্ছে ষ্ট্রীট কার। ওরা পেট্রোল বলে না, বলে গ্যাস, হাতব্যাগ বা হ্যাণ্ড-ব্যাগকে ওদের দেশে বলা হয় গ্রীপ স্যাক (grip sack)। ইংরেজদের 'যা বনে' মাকিনীদের তা 'বিস্কিট'। আর বিলেতে যাকে বিস্কিট বলা হয়, এ্যামেরিকায় তারই নাম ক্র্যাকার বা কুকি।

ইংরাজদের 'ড্রেসিং গাউন' ওদের 'বাথরোব'। লিফট্ বললে ওরা বোঝে না, বলতে হয় এলিভেটর। যাকে ইংরেজরা বলে 'পকেট মানি', ইয়াংকিরা তাকেই বলে 'স্পেণ্ডিং মানি'। 'ব্যাঙ্ক নোট' ওদের ভাষায় 'বিল'। ইংরেজেরা যাকে বলবে 'পোষ্ট' ওরা তাকে বলবে এ্যাসাইনমেণ্ট। তুমিও তোমরা বোঝাতে ইংরাজেরা একই শব্দ 'ইউ' ব্যবহার করে থাকে, ইয়াংকিরা কিন্তু বহুবচন তোমরা বোঝাতে বলে থাকে 'ইউ অল'। ইংল্যাণ্ডে 'ব্লু বুক' হচ্ছে পার্লামেণ্টের কার্য বিবরণী পুস্তিকা, এ্যামেরিকায় ওটা হল দেশের বিখ্যাত লোকদের নামের ক্যাটালগ। সাধারণতঃ ইংরাজী 'মুনশাইন' শব্দের অর্থ অলস বা অবাস্তব চিন্তা' কিন্তু মাকিন মুলুকে কথাটার তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে 'বেআইনী চোলাই মদ!' লম্বা ছেলেকে ইংল্যাণ্ডে বলবে 'টল বয়', মাকিনীদের দেশে কিন্তু তাকে বলবে 'হাই বয়'। পুস্তক প্রকাশনী ইংরেজদের কাছে পাবলিসিং হাউস, ইয়াংকিদের কাছে ওটা 'বুক কনসার্ন'। The Britishers 'speak English' but the Americans 'talk English'.

ট্যাক্সি ভাড়া করাকে ইংরেজ বলবে 'টু টেক এ ট্যাক্সি' মাকিনী বলবে 'টু হপ্ এ ক্যাব'। বন্ধুকে এক গ্লাস সুরাপানের নিমন্ত্রণ জানাতে ইংরাজেরা বলবে, 'ওয়েল, হ্যাভ এ ড্রিংক, ইয়াংকিরা কিন্তু বলবে—'হ্যাভ এ স্নর্ট (snort) অথবা 'গ্র্যাব এ ড্রিংক। প্রচুর অর্থাৎ very much ইত্যর্থে এ্যামেরিকানেরা বলে 'এ হিপ' (heap),—আই লাইক হিম এ হিপ্ অর্থাৎ তাকে আমি খুব পছন্দ করি। রাজনৈতিক দলত্যাগীকে ইংল্যাণ্ডে বলা হয় রেনিগেড (renegade), মাকিন মুলুকে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে বোল্টার (bolter)। সদ্বংশজকে ওরা বলে ব্লাডেড, 'আচ্ছা করে পিট্টি দেওয়া বোঝাতে ইয়াংকিরা যে শব্দ ব্যবহার করে, সেটা হল 'হোয়েল' (এটা অনেকটা ইংরেজদের হোয়াক (whack) এর মত। জমক লো বা ছিমছাম ভাবে সাজ করাকে ওরা বলবে 'ডল'। সইয়ার (sawyer) বলতে ইংরাজেরা করাতীকে বোঝায়, মাকিনী পরিভাষায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে নদীতে ভাসমান কাঠের গুঁড়ি (এ্যামেরিকায় কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরা বন থেকে গাছ কেটে নদী দিয়ে ভাসিয়ে আনে)। সিংগল্ শব্দের আসল মানে হচ্ছে ছাদের জন্য ব্যবহার যোগ্য কাঠের চৌকো টুকরো, কিন্তু এ্যামেরিকায় এ শব্দে ছোট সাইনবোর্ড বোঝায়।

একই শব্দ ক্রিয়া ও বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করতে ওদের হামেশাই দেখা যায়। খাওয়ার ইংরাজী 'ইট', কিন্তু খাদ্যের প্রতিশব্দ হিসাবে কোন ইংরেজ কি কখনও 'ইটস্ শব্দটী ব্যবহার করবে? রুম (ঘর) শব্দটির ইংরাজীতে কুত্রাপি ক্রিয়া হিসাবে প্রয়োগ নাই, কিন্তু 'ঘরে বাস করা' এই অর্থে ইয়াংকিরা এটা ব্যবহার করে থাকে—আই রুম উইথ জন (আমি জনের সাথে একই

ঘরে বাস করি); আবার আই য়্যাম জনস্ রুমার—এরকম বাক্যেরও চল আছে। ডিড্ (দলিল) শব্দটি ক্রিয়াবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয় ও দেশে, তখন কথাটির মানে দাঁড়ায় 'দলিল করে কিছু লিখে দেওয়া'। ইংরাজীতে 'গ্যেস' মানে অনুমান করা মার্কিনী ভাষায় কিন্তু ওটা জানা অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে অর্থাৎ,

আই গ্যেস = আই নো।

সে রকম ক্যালকুলেট শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে মনে করা বা বিশ্বাস করা। সেন্স শব্দটি ক্রিয়ারূপে বোঝা (understand) বোঝায়।

ফিক্সার শব্দটি ইংরাজদের কাছে বিশেষ কিছু অর্থ বহন করে না কিন্তু এর একটা বিশেষ অর্থ আছে ইয়াংকিদের কাছে। কেউ আইন-বিরুদ্ধ কাজে ধরা পড়লে তার তরফে তদ্বিরকারী ব্যক্তিকে বলা হয়ে থাকে ফিক্সার। 'বাউণ্ডার' মানে ভবঘুরে, গৌণ অর্থে নেশাখোর। লাংগার মানে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি (Lung থেকে Lunger), 'কোরেকার' শব্দের অর্থ ইংরাজীতে শান্তিবাদী, মার্কিন মুলুকে কথাটার অর্থ দাঁড়িয়েছে দুর্গ বা জাহাজের উপর স্থাপিত ডামি কামান।

কথাবার্তা, গালগল্পকে ওরা বলে ইয়াপ (Yap), বোলোনি বলতে বোঝে আবোল-তাবোল বকুনী, কোন কিছুর অসাধারণ রূপ বা অবস্থাকে প্রকাশ করে wow শব্দের প্রয়োগে। রাজনৈতিক ব্যাপারের ঘুষকে বলে বুড্‌ল (boodle), চোরাই মদ্যের কারবারীকে বলে বুটলেগার (কথাটা আজকাল ইংরেজরাও ব্যবহার করছে)। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা কথার খুব ব্যাপক প্রচলন আছে ও দেশে,—ব্লার্ব, এর অর্থ পুস্তকের বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রকাশক কর্তৃক লেখকের প্রশস্তি অথবা গল্প বা প্রবন্ধের পূর্বাভাস বা মুখবন্ধ। সাধারণ লোকেরা রাস্তায় কাউকে ইয়ার বা দোস্ত হিসাবে সম্বোধন করতে হলে বলে 'বাডি' (ভাইটি?)। কোন কিছু নতুন দেখা বা আবিষ্কার করার আনন্দ প্রকাশ করে 'gee' শব্দের দ্বারা। এন্ত্রমন্ত্রকে ওরা বলে 'ভুডু'—এটা একটা দেশওয়ালী আদিম শব্দ। হৈ-হল্লোড় উল্লাস বোঝাতে ওরা 'হুপি' (whoopee) কথাটা ব্যবহার করে থাকে। জোর করে কোন কিছু করাতে বাধ্য করাকে বলে বুলডোজ (যার থেকে বুলডোজার শব্দটি এসেছে) ভুট্টোকে ওরা বলে কর্ণ (corn), খোঁয়াড়কে বলে কোরাল, ভ্রাম্যমান মুচ্ছুদ্দিকে বলে 'হোবো', ভাড়াটে গুণ্ডাকে বলে 'গুন'। লম্বা চওড়া বুলি যাকে ইংরেজরা বলে 'টল্ টক্' সেটা ইয়াংকিরা ছোট্ট করে বলে বাংক (bank)। সরস টিপ্পনীকে ওদের ভাষায় বলা হয় 'ওয়াইজ ক্র্যাক'। হঠাৎ ক্রোধে বিহ্বল হয়ে পড়া বা হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়াকে বলে কনিপশান (coniption)। সৈন্যদের কার্য্যের সরকারী প্রশংসাকে বলে 'সাইটেশান'! সহজে প্রভাবিত হবার নয়, এমন লোককে ওরা বলে 'কেজী' (cayey)! প্রাণোচ্ছলতা বোঝাতে ওরা সচরাচর পেপ শব্দটা ব্যবহার করে; ফুর্ত্তিবাজ লোককে তাই ওরা বলে পেপী (peppy)। জমিতে জোর করে বসবাসকারীকে বলা স্কোয়াটার (আজকাল উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধেও এদেশে হয় সরকারী কাগজেও এই শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে)। মিথ্যা, বাজে বা ধাপ্পার সমর্থক শব্দ হচ্ছে 'ফোনি' (phoney)। হঠাৎ কোন বৈষয়িক ব্যাপারে সাফল্য লাভ করা কিংবা হঠাৎ পেট্রোলের সন্ধান পাওয়া বোঝাতে মার্কিনীদের ভাষায় 'ষ্ট্রাইক' শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে! জল ঘোলা করা কিংবা উত্যক্ত করার মার্কিনী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'রয়েল' (roil)! রুট' মানে প্রশংসা বা সমর্থন দ্বারা কাউকে প্রতিষ্ঠিত করা। ইয়াংকিদের ভাষায় হঙ্ক' শব্দের অর্থ আতঙ্ক বা সন্দেহ। 'বাম্প অফ্ (bump off) মানে বলপূর্বক সরিয়ে দেওয়া বা হত্যা করা। 'নক' শব্দটি নিন্দা করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। রেসের আগে ঘোড়ার খবর বা কুস্তি বা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পূর্বে (পালোয়ানদের খবর সংগ্রহকে ওরা বলে 'ডোপ'। মেলার ফিরিওয়ালা হচ্ছে 'ফেকার'। মুলাটো বা নিগ্রো ও শ্বেতকায়ের মিশ্রণে সঙ্কর ব্যক্তি বা সদ্য আগত ইউরোপীয়কে ইয়াংকি ভাষায় বলা হয় 'গ্রিঙ্কন'। অসার বাক্য হচ্ছে গ ফ, (guff), চেরী প্লাম বা পীচের আঁটিকে বলা হয় 'পিট'। 'হ্বুক' মানে হাতের লোক (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা বহুল প্রচলিত শব্দ)। 'নাট' মানে বোকা বা পাগলাটে লোক, 'মাট' mutt) শব্দেও নির্বোধ লোককে বোঝায়। কোন জিনিষ বা ব্যক্তির (সাহিত্যিক, অভিনেতা, গায়ক প্রভৃতির) অনুরাগী ভক্তকে বলা হয় 'ফ্যান'। শব্দটির আজকাল ইংরজীতে ব্যাপক ব্যবহার। 'প্রমোট' শব্দের ইংরেজীতে মানে হচ্ছে পদোন্নতি করা বিপরীত অর্থে ইয়াংকিরা 'ডিমোট' শব্দটি চালাচ্ছে—নিচু পদে নামিয়ে দেওয়া ইত্যর্থে! দুর্বলচিত্ত লোক বোঝাতে ওরা অনেক সময় কুইটার শব্দটির প্রয়োগ করে থাকে। ভারী হৃষ্টপুষ্ট লোকের বিশেষণ হিসাবে 'হেফটি' শব্দটি ব্যবহার

আছে ইংরাজীতে। কথাটা কিন্তু আসলে অ্যামেরিকান, সব ব্যাপারে অসন্তুষ্ট বা খুঁৎখুঁত করাকে ওরা বলে 'গ্রাউচ' (grouch)। অগোছাল করাকে বোঝাতে ওরা 'মাস' (muss) শব্দের প্রয়োগ করে (বোধহয় এটা ইংরেজী mess শব্দেরই রূপান্তর)। উত্তেজিত করাকে বলে 'জাজ আপ' (jazz up)।

ইয়াংকিদের অনেক ফ্রেজ ও ইডিয়ম আসল ইংরেজদের কাছে রীতিমত দুর্বোধ্য। 'গো গেটার' হচ্ছে সেই লোক যার ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তি হয়েছে। 'পুট ওভার' মানে সাফল্য লাভ করা। 'কাম এ্যাক্রশ' মানে দেনা শোধ করা 'পাশ আপ' মানে 'যেতে দাও' বলে কোন কিছু মনে না করা। কল ডাউন—তিরস্কার করা।

'দূর হও' বলতে ইয়াংকি বলবে 'বিট ইট'। কোন কিছুতে নাক গলানোকে বলে হর্ণ ইট। কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে ইংরেজরা যেমন বলে 'লুক হিয়ার', ওরা বলবে 'লুক ইট'। 'ফর কিপস' বলতে ওরা বোঝে চিরদিনের জন্য (ফর গুড)।"

'ডবল ক্রস' মানে দুই পক্ষের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখা অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ করা। খেলায় প্রতিপক্ষকে একটিও পয়েন্ট না করতে দিয়ে হারানোকে ওরা বলে 'হোয়াইট ওয়াস'। ওদেশে বড় বড় পাইকারী জিনিষের দোকানে যারা ঘুরে ঘুরে তত্ত্বাবধান করে তাদের বলা হয়, 'ফ্লোরওয়াকার'। 'ফ্ল্যাটফুটেড' শব্দে বোঝায় দৃঢ়চেতা লোক! মহারথী বা ধুরন্ধর ব্যক্তিকে বলে ক্র্যাক-এ্যা-জ্যাক (Crack-a-jack)। O. K, Campus, movie, fan cafetaria, Gallup-pole, coco cola, প্রভৃতি অনেক ইয়াংকি শব্দ বর্তমানে ইংরেজরাও হামেশা ব্যবহার করছে।

ইয়াংকিরা দুইটি ইংরেজী শব্দের সমন্বয়ে, অদ্ভুত নতুন শব্দ সচল করেছে। এই সৃজন কার্যে ওদের রসিকমনের পরিচয় মেলে।

হোটেল শব্দটি আমরা সবাই জানি, কিন্তু মোটেল কি? মোটরের যাত্রা পথে পথিপার্শ্বস্থ রাতের আশ্রয়স্থলকে ওরা নাম দিয়েছে মোটেল (মোটর হোটেল), —ধোঁয়া ও কুয়াশায় যেমন ধোঁয়াশার সৃষ্টি। 'নীট আর ফিট এই দুই শব্দের সংযোগে নূতন শব্দ নিফটী অর্থঃ পরিচ্ছন্ন, সুদৃশ্য। 'রিয়্যলটর' হচ্ছে রিয়াল এষ্টেটের কেনাবেচার দালাল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার আছে এ্যামেরিকায়। বিশেষ্যে 'বাই' (buy) শব্দের অর্থ বারগেন। 'চেক' শব্দের অর্থ রসিদ বা রেজিষ্ট্রেশন টিকিট। দোকানে কোন খদ্দেরের চলতি হিসাবকে বলে 'চার্জ এ্যাকাউন্ট'। একই কোম্পানী বিভিন্ন দোকানগুলোকে বলা হয়ে থাকে 'চ্যেন ষ্টোর'। শুল্ক ধার্যের জন্য জিনিষপত্রের শ্রেণী বিভাগ করাকে বলা হয় 'ইম্পোষ্ট'। বিনিময় মূলক ব্যবসা (বাটার) হচ্ছে 'ডাকার' (ducker)। অন্যের জিনিষে যে নিজের দাবী আরোপ করে তাকে বলে 'চ্যেন জাম্পার'। ইংরেজরা যাকে বলে 'লিগ্যাল টেণ্ডার নোট' মার্কিনী কথায় সেটা 'গ্রীন ব্যাক'। কোন কিছুর টিকিট ধরে, পরে সেগুলো বিক্রী করে মুনাফা করার প্রতিশব্দ হচ্ছে 'স্ক্যাল্প', বিপক্ষের সুবিধাকে ক্রয় করাকে 'র‍্যাকেট'। বিদ্যাদানের ক্ষেত্রেও 'সেল' (sell) শব্দটীর ব্যবহার আছে। কোন অধ্যাপক যদি ছাত্রদের মনভরানো লেকচার দিতে অপারগ হন তবে ওরা বলবে অমুক প্রফেসরের সেলস এ্যাক্টিভিটি ছাত্রদের সেলস রেজিষ্ট্যান্সের চেয়ে কম।

ইয়াংকিদের এমন অনেক ইডিয়ম আছে যেগুলো এখনও ইংরাজী ব্যাকরণে স্থান পায় নি। যেমন,

ফেস দ্য মিউজিক, টেক টু দ্য ওয়ার্ডস

ফ্লাই অফ দ্য হ্যাণ্ডেল, গো অন দ্য ওয়ার পাথ (যদিও এগুলো অর্থ খুব প্রাঞ্জল)।

শব্দকে সংক্ষিপ্ত করার দিকে এ্যামেরিকানদের খুব ঝোঁক। দৃষ্টান্ত হিসাবে কতগুলি শব্দ নিয়ে সন্নিবিষ্ট করা হল।

ফোন (টেলিফোন), কো-এড(কো এডুকেশন), প্লেন (এ্যারোপ্লেন), জিম (জিমন্যাশিয়াম), অটো (অটোমোবিল), গ্রাড (গ্রাজুয়েট), ডাইনার (ডাইনিং কার), সিম্প (সিম্পলটন), রকার (রকিং চেয়ার), রাবার (রাবারের ওভার সু), গ্যাস (গ্যাসোলীন), ইলাষ্টিক (গার্টারের

জন্ম ব্যবহৃত হিতে) ইত্যাদি।

নতুন দেশে আসার পর ইংরেজ উপনিবেশকারীরা অনেক ভৌগোলিক শব্দের প্রচলন করেছিলেন। এগুলি এখন সদা সর্বদাই ব্যবহার হচ্ছে।

Arroyo, Butte, Canyon, wash, gulch··· এ্যামেরিকানরা যখন প্রথম ওপোজ, প্রোগ্রেস, অবলিগেট, কনট্যাক্ট, ইমিগ্রেট, লোকেট—এই সব ক্রিয়াপদগুলির প্রচলন করল, তখন শিক্ষিত রক্ষণশীল ইংরাজরা ক্ষেপে উঠেছিলেন। তাদের এই সময়কার মনোভাব বোঝাতে এ্যামেরিকার শিক্ষাব্রতী ও লেখক ব্র্যাডফোর্ড স্মিথ লিখছেন:

They evoked such protest in England that one would have thought the monarch himself had been called dirty names।

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই ইংরাজী লেখা ও কথাবার্তায় এই ক্রিয়াপদগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার চলছে। ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ও রিলায়েবল শব্দ দুটী আমরা এখন অদূরহই ব্যবহার করছি, কিন্তু এগুলো খাঁটি ইংরাজী ব্যাকরণ সম্মত নয়।

ইংরাজদের কাছে 'নক আপ' কথাটা সম্পূর্ণ নির্দোষ কিন্তু কোন এ্যামেরিকান মেয়ে যদি কোন ইংরেজ সাহেবের মুখে কথাটা শোনে, তবে লজ্জায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হবে। এ্যামেরিকানের ওটা খুব অশ্লীল কথা।

এ্যমেরিকায় বাস কণ্ডাক্টার, ষ্টোরের কেরাণীদের আচরণ অনেক সময় বহিরাগত ইংরেজদের কাছে অসৌজন্যসূচক বা রীতিমত অভদ্র বলেই মনে হবে। যেমন লোকদের মধ্যে সামাজিক স্তর ভেদ নেই, ভাষারও সাধারণতঃ আটপৌরে ও পোষাকী এই দ্বিবিধ রূপ নেই তবে শিক্ষিত লোকদের কথাবার্তা অনেকটা লেফাফা দুরস্ত বা ডিউক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লোকদের কাছে পত্র লিখতে গেলে, ইংরাজেরা মর্যাদাসূচক বিশেষ বাচনভঙ্গীর অনুসরণ করে, যথা মে ইট প্লীজ ইওর ম্যাজেষ্টি মে ইট প্লীজ ইওর গ্রেসাস হাইনেস,···এছাড়া উপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত করতে হলে—উইথ ডিউ রেসপেক্ট এ্যাণ্ড হাম্বল সাবমিশান ইত্যাদি ভনিতা ত আছেই। এ সব বিষয়ে ইংরাজেরা অনেকটা প্রাচ্যপন্থী।

সরকারী বা বৈষয়িক কাজ-কর্মে, আইন আদালতে, দলিলপত্রে ইংরাজেরা বাঁধাধরা বয়েৎ আউড়ে চলে, যেমন —whereas it is expedient to···(কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে গোছের,)-যে গুলো অনেক সময় দীর্ঘ, শ্রুতিকটু এবং কিছু পরিমাণে অর্থহীন সাড়ম্বর বাক্যমাত্র।

ইয়াংকিরা বাহুল্য বর্জনের পক্ষপাতী। তারা সাদা-মাটা ভাষা চালায় কি ব্যবসার ক্ষেত্রে কি আইন-আদালতে। ফরম্যালিটির ধার ধারে না। ইয়াংকিরা ওদের প্রেসিডেন্টকে ডাকে নাম ধরে মিঃ অমুক, অথবা মিঃ প্রেসিডেন্ট বলে।···রাস্তায় পরিচিত কাউকে ডাকতে হলে ওরা বলে 'হিয়া' অথবা সংক্ষেপে 'হি'। কোন জনসমাবেশকে সম্বোধন করতে হলে ইংরেজরা বলবে 'লেডিজ এ্যাণ্ড জেন্টেলমেন' (নারী বর্জিত জনতার বেলায় শুধু জেন্টেলমেন) কিন্তু ইয়াংকিরা বলবে 'ফোকস'। কত সহজ সম্বোধন। এলিজাবেথের আমল থেকে আজ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার (সাহিত্যের নয়) উল্লেখযোগ্য এমন কিছু অগ্রগতি হয় নি। কতকগুলো এ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান শব্দ বা অন্যান্য উপনিবেশ থেকে আমদানী গোটাকত নতুন কথা হয়ত ইংরাজী অভিধানে স্থান পেয়েছে, কিন্তু ভাষার ছক বা ব্যাকরণের নিয়মের এমন কিছু বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। এ্যামেরিকানেরা কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে চলেছে।

Americans are going on vitalising (another horrid americanism) the language by borrowing from other tongues, shifting parts of speech, dowpping inflexious and by the excercise of a humorous imagination --B. Smith.

এ্যামেরিকানেরা ব্যবসাদার জাত।

দেশজুড়ে কেবলই প্রতিযোগিতা।

ইস্কুলে ছেলেদের বক্তৃতা বা ভাষণ দেওয়ানো শেখানো হয়, যাতে কর্মজীবনে প্রবেশ করে বাকচাতুর্যে লোক পটাতে পারে।···Can use language as a weapon or tool to sell, to persuade, to organise. In

american life the prefer go to the plan who can persuade.

নতুন শব্দ তৈরির জন্য এ্যামেরিকায় পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। যাঁরা শব্দ-রচয়িতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাদের বেশ মোটা মাইনে দেওয়া হয়ে থাকে। টেলিভিশনে প্রচার হচ্ছে এই নব উদ্ভাবিত শব্দ সম্বলিত বাক্যাবলী।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইংলিশ বিষয়ে জনসাধারণকে পাঠ দেওয়া হচ্ছে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে।

লোকরা বেশ শিখছে, কিন্তু বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তারা উদাসীনই থেকে যাচ্ছে।

মজার কথা হচ্ছে বিশাল যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্তরে লোকদের অন্য প্রান্তের লোকদের কথা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। পশ্চিমদিনাজপুরের বা কুচবেহারের সাধারণ লোকজনের কথা, ২৪ পরগণা বা হুগলীর লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না। ইয়র্কশায়ারের চাষী ও কর্ণওয়ালের একজন মজুর যদি কথাবার্তা চালায়, তবে একের কাছে অন্যের কথা যথেষ্ট দুর্বোধ্য ঠেকবে।

কিন্তু এ্যামেরিকার Portland Maine এর একজন বাসিন্দা Portland Oregon এর কোন লোকের কথা দিব্যি বুঝে নেবে। ডাকোটার লোকেরা একটু নাকিসুরে কথা বলে, কিন্তু তাহলেও ভর্জিনিয়ার লোকদের ওদের কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না (অবিশ্যি ব্রুকলীনের এ্যাকসেন্ট নিয়ে নুইয়র্কের লোকদের মধ্যে অনেক ঠাট্টা প্রচলিত আছে)।

যদিও এ্যামেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের কথার ও কথার টানের অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে, তবুও এক অঞ্চলের লোকের পক্ষে ভিন্ন অঞ্চলের লোকদের কথার মর্ম অনুধাবন করা আদৌ কঠিন নয় (কোন কোন মহল্লার স্প্যানিশ, জার্মান বা চানরা ইংরেজী না জেনেও বেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে)।

কে কোন্ প্রদেশের লোক তা উচ্চারণে যতটা ধরা না যাবে, তার চেয়ে শব্দের ব্যবহারে ও খাদ্যের পছন্দে বেশী ধরা যাবে। কে উত্তরের লোক, কে দক্ষিণী আর কেই বা পুবদিয়া, তা বোঝা যাবে, কাগজের থলেকে সে ব্যাগ বলে, না স্যাক বলে, না পোক বলে—তাই শুনে, ছোট্ট নদীকে সে ব্র্যাঞ্চ বলে, না ব্রুক বলে, না ক্রীক বলে, না কীল বলে—সেটা জেনে, কফির সঙ্গে সে ডাফ নাট, না ক্রুলার না ফ্যাট কেক কি খেতে চায়,—তা থেকে।

অবিশ্যি পশ্চিমা, পুবদিয়া ও দখ্নে উচ্চারণে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে। দক্ষিণের লোকেরা 'ই' স্থানে 'আ' উচ্চারণ করে।

High on the bright sky কে ওরা বলবে হা অন্ দা ব্রাট স্কা (skah,) ওদের কথার টানে একটা গোলালো মোলায়েম আমেজ আছে (roundness softness and slow rythm) পুবদীয়ারা 'র' ছেড়ে কথা বলে, আর উচ্চারণ করে টেনে টেনে,—

হা-আ-ভা-আ-ড Harvard

ফা-আ-দা-আ Father

ওদের কথা শুনে মেহেরপুরী ঝিদের কথা মনে পড়ে যায়—

আম বাবুর বাড়ীর অকটা অক্তে আঙা হয়ে উঠেছে (রামবাবুর বাড়ীর রকটা রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে)।

ব্রিটেনের লোকদেরও ইংরেজী উচ্চারণ জায়গায় জায়গায় ভিন্ন ও হাস্যকর। লণ্ডন ককনীরা পেপারকে বলে পাইপার, হ্যাটকে বলে এ্যাট, এয়ারকে বলে হেয়ার। লণ্ডনের বাসে চলতে চলতে এক বিদেশী ভদ্রলোক শুনলেন, কনডাকটার চেঁচাচ্ছে-'এ্যাটফীল্ড, 'এ্যাটফীল্ড'।

ভদ্রলোকটি বল্লেন, ওয়েল কনডাকটার! ইটস হ্যাটফীল্ড এ্যাণ্ড নট এ্যাটফিল্ড। ইউ হ্যাভ ড্রপড H।

কনডাকটার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, 'নেভার মাইণ্ড স্যার, আই শ্যাল পিক ইট আপ হ্যাট হিসলিংটন (islington)।

ইংরাজেরা স্কচদের গড়ানো (rolling) উচ্চারণ নিয়ে ঠাট্টা করে অথচ কোন ইংরেজ যখন বলে 'সড অব দ্যা লড' (sword of the lord) তখন ওদের কানে বেখাপ্পা লাগে না।

ইংরেজদের চেয়ে এ্যামেরিকানদের উচ্চারণ ঢের পরিষ্কার। ইংরাজেরা Dictionary Extraordinary, gentry প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণ কালে দুটো একটা সিলেবেল ছেড়ে দেয় কিন্তু ইয়াংকিরা কোনটাই বাদ দেয় না। বাইরের ইংরেজী জানা লোকের পক্ষে ওদের কথা ইংরেজদের কথার চেয়ে অনেক সহজে বোধগম্য হয়ে থাকে।

এ্যামেরিকার কথ্য ভাষা তাদের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী গড়ে উঠেছে।

ওদের ভাষার অন্তর্নিহিত সুর হচ্ছে পারস্যুয়েশান যাতে লোকের মন জয় করা যায়, কাজেই মনস্তত্ব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় ওদের বাচন ভঙ্গীতে। ওদের দেশের ছেলেরাও রীতিমত পরিশ্রম করে শেখে কথা বলতে, যাতে বাজারে নেমে ঠকতে না হয়। জীবন-সংগ্রামে যাতে জয়ী হতে পারে। সেল রেজিষ্ট্যান্সকে জয় করাই ওদের জীবনের চরম লক্ষ্য।

মার্কিনীদের লিখিত ভাষা বেশ ঝরঝরে (crisp,) সাবলীল ও বর্ণোজ্জ্বল, সূক্ষ্ম শেডসের অভাব হয়ত আছে কিন্তু বেগ ও আবেগের কমতি নেই একটুও। অনেকটা জার্ণালিজমের ঢং দীর্ঘ ভূমিকা নেই, নেই অবান্তর বাক্যাড়ম্বর। ওরা সোজাসুজি বিষয়টির অবতারণা করে, কথাকে এমনি ভাবে বলতে চায় যাতে চট করে লোকের মনে দাগ কাটে। ভাষার নির্মাণ কার্যে ওরা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে।

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সংস্কৃত সাহিত্যের উপর পুরাণের প্রভাব ছড়ানো রয়েছে অসামান্য ভাবে এবং সে প্রভাববাহুল্যের সঙ্গত কারণও রয়েছে। সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব আর্যরা কোনদিনই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে পারে নি। আর্যদের কাছে হেরে যাবার পরও অনার্যদের মধ্যে অনেককালের সংস্কার বেঁচেছিল— বেঁচেছিল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। আর তাদের স্বাভাবিক সংস্কার আর্যদের জীবনেও মাঝে মাঝে সুবিধে-মতন প্রবেশ লাভ করেছিল। তারপর কালস্রোতে এই দুই সংস্কার মিশে গিয়ে সূচনা করলে নতুন ধর্মসৃষ্টির আবশ্যকতা। বৈদিক দেহবাদীদের নতুন সংস্কারের জন্য অষ্টাদশ পুরাণের আবির্ভাব ঘটল। বাংলা সাহিত্যে এল নবরূপে পুরাণাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রেরণা। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তিনটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্মসংস্কার তাদের স্পর্দ্ধিত মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। এগুলো হল যথাক্রমে, হিন্দু, অনার্য ও বৌদ্ধ ধর্মসংস্কার।

এদের মধ্যে আর্য সংস্কৃতির দান হিন্দুধর্মই অবশ্য শ্রেষ্ঠ। হিন্দুরাই ভাষা ও সংস্কারের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়ে আসছেন। তাদের পূজিত লৌকিক দেব-দেবীরা সমাজে পূজা পেতে লাগলেন কিন্তু সম্মানের কোলাহলমুখর বিস্তৃতি পেলেন না। ফলে দেখা গেল এই সব লৌকিক দেবদেবীরা পৌরাণিক দেবদেবীদের সাথে নিজের নাম যুক্ত করে সংস্কৃতির ইতিহাসে আপনাদের স্থান পেতে খুবই ব্যস্ত হলেন। এই সব দেবদেবীর পূজকেরা সার্বজনীন সর্তে তাঁদের পূজা প্রচলিত করবার জন্য বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব দেখা গেল যত্রতত্র লৌকিক ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের মধ্যে।

সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে এল মঙ্গল-কাব্যের তরণী বেয়ে। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীকে সংস্কার করে "পুরাণ-চরিত্র" করে তোলা হয়েছে। পুরাণে আমরা যেসব দেবদেবীর পরিচয় পাই তাঁরা সকলেই বৈদিক দেবদেবী নন। কিন্তু বৈদিক দেবদেবীর সম্মান ও চরিত্র সম্পদ তারা পেয়েছেন প্রায় সকলেই। মার্কেণ্ডয় পুরাণে চণ্ডীর মাহাত্ম্য, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদিতে দেবতার অখণ্ড মাহাত্ম্য দেখা যায়। ভক্তজনের ব্যাকুল প্রার্থনা শুনবার জন্যই সংস্কৃত পুরাণে দেবদেবীর আবির্ভাব। বৈদিক দেবদেবীদের কল্যাণরূপ দেখা যায় পুরাণে। অবশ্য দেবতার মতন দেবীর প্রাধান্য খুব একটা নেই। পুরাণে ভীত আর্ত মানুষকে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতে দেখি—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, ইত্যাদি।" সংস্কৃত পুরাণের এই আদর্শই আমাদের বাংলা ভাষায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে আঙ্গিক, উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতিতে সচেতন হয়ে অনুসৃত হয়েছে। একই পরিবেশ ও উদ্দেশ্য হওয়ায় উভয়ের রীতিও প্রায় সমধর্মীতা লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্যকারগণ পুরাণকে সচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন দেব বন্দনার ক্ষেত্রে—একের ক্ষেত্রে বহু দেবতাকে বন্দনা করা হয় মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতে। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে পুরাণের ভাষা পর্যন্ত অনূদিত হয়েছে।

সংস্কৃত পুরাণে দেবতার অলৌকিক লীলা বর্ণনাই মুখ্য। এখানে দেব দেবীরা সব আপন আপন মহিমা প্রচার করে দেবসমাজ ও নরভক্তসমাজে আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের পাঠকমাত্রই বলবেন যে মঙ্গলকাব্যেও দেবতার পূজা প্রচারই লক্ষ্য, এমন কি এই আদর্শে মঙ্গলকাব্যের নামকরণের মধ্যেও পুরাণের অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ মেলে। যেমন "পদ্ম-পুরাণ।" পদ্মপুরাণের সংস্কৃতরূপে আমরা মনসার যে সাক্ষাৎ পাই মনসামঙ্গল কাব্যেও অনেকস্থলে সেই কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে দেখতে পাই।

মঙ্গলকাব্যের যে শাখাকে পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের শাখা বলা হয় তাদের নামকরণ থেকেই প্রমাণিত হয় তারা কতদূর পুরাণ-প্রভাবিত। পৌরাণিক মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে আছে গৌরীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডী-কা মঙ্গল ইত্যাদি।

নারায়ণদেবের লেখা মনসামঙ্গলের পুঁথিতে আছে—

"পদ্মপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণদেব পাঁচালী রচিছে।"

সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব কেবল মঙ্গলকাব্যকেই আশ্রয় করেনি। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও পড়েছে এর প্রভাব। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রভাব। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মধ্যে কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে গীতগোবিন্দের রাসলীলার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় এবং গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের সাথে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ১৫শ অধ্যায়ের প্রথম আটটি শ্লোকের প্রায় হুবহু মিল আছে। বাংলার মধুর রসের সাধক ও রসবেত্তারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপকে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা গ্রহণ করেছেন মধুরস্বভাবসম্পন্ন প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় রূপকে। পুরাণের কৃষ্ণই পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের নায়ক এবং দেবতা। দেবতা করার সাধনায় বৈষ্ণবকাব্য পুরাণের কাছে ঋণী। ভাগবতের ব্রজলীলা বৈষ্ণবসাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য। তাছাড়া মধ্যযুগের প্রারম্ভে লেখা মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" ভাগবতের প্রায় সার্থক অনুবাদ বলেই গণ্য হয়ে থাকে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তিনটি শাখা—অনুবাদ, বৈষ্ণবসাহিত্যের শাখা ও মঙ্গলকাব্যের শাখা। এদের মধ্যে শেষের দুটি শাখার উপরে পুরাণের প্রভাব অনস্বীকার্য। পৃথিবীর প্রায় সর্বজাতির সাহিত্যের আদিযুগেই ধর্মের একাধিপত্য দেখা যায়। বাংলাসাহিত্যের প্রথম যুগের সাহিত্যে পুরাণপ্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। স্বকীয় চিন্তাধারা যতদিন না মৌলিকত্ব অর্জন করেছে ততদিন প্রাচীন প্রভাবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সরলমানুষকে বিশ্বাস ও অলৌকিকতা দিয়েই মুগ্ধ করতে হয়। সুতরাং দেবমূলক সাহিত্যের অনুবর্তন চলে নানা ভাবে এবং বহুদিন। পরবর্তী সাহিত্যের সমস্ত দেবদেবী তাদের পৌরাণিক শক্তি ও মাহাত্ম্য দিয়ে তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তারও পরবর্তীযুগের জনসাধারণকে।

মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ শাখাটি প্রত্যক্ষ ভাবেই পৌরাণিকশাখার অনুবাদ। রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের মধ্যে পুরাণের ছায়া সঞ্চারিত হয়েছে অসামান্যভাবে। দেবীমহাত্ম্যমূলক মঙ্গলকাব্যে দেবী ভাগবতের প্রভাব আছে।

ষোড়শ শতকের জীবনী-সাহিত্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে বৃন্দাবনদাস স্পষ্টই বলেছেন—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহেন বেদব্যাস
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।"

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জীবনীগ্রন্থ হিসেবে চৈতন্য-ভাগবতের বিশেষ মূল্য আছে। চৈতন্যদেবকে অবতার রূপে কল্পনা করে একটি পুরাণসৃষ্টির অভিনব পরিকল্পনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। তাঁর একান্ত ভক্তিনত চিত্তই এটি প্রমাণ করে দেয়।

বাংলা সাহিত্যে দেবতার রাজত্ব ছিল যতদিন প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শ ততদিন কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে আরও সুদূরপ্রসারী হয়ে, আরও বহু বিস্তৃত হয়ে। পুরাণ ও মহাকাব্য জাতির ভাব-জীবনে একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের জাতীয় প্রবণতা, চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের মূলেও ঐ পৌরাণিককাব্য ও পুরাণ। সুতরাং বাংলা সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করলেও বাঙালীর ভাবজীবনে, তার জীবনাদর্শের মধ্যে, ন্যায়-নীতিধর্মে পুরাণের পরোক্ষ প্রভাব আছে। বহুযুগের পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে আজও আমরা স্ত্রীদেবতার দেবত্বে বিশ্বাসী। আজও বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য বিভিন্ন দেবীর স্থানে পুজো দিয়ে আমরা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করি। আমাদের জাতীয় জীবনের মূল থেকে আজও দেব দেবীদের আমরা একেবারে নির্বাসিত করতে পারিনি। যদিও একথা সত্য যে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেববাদের উপর মানববাদের জয়ধ্বজা স্বভাবতই উড়েছে এবং তার ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে পুরাণ দূরবর্তী হয়েছে, তথাপি। মানব-মানবীর চরিত্রকে উন্নত এবং আদর্শায়িত করবার জন্য আমরা পুরাণের দিকেই নম্র মনোহর দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছি। সন্ধান করেছি সীতা সাবিত্রীর আদর্শকে।

বরেণ্য পুরুষের মূর্তি কল্পনা করেছি ভোলানাথ শিবের চরিত্রে। প্রেমিকের রূপকে ভেবেছি নবদূর্বাদল শ্যাম শ্রীকৃষ্ণের অবয়বে।

আজকের বাংলা সাহিত্যে পুরাণ-প্রভাব একাবারে দূরবর্তী হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। আধুনিক প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিকদের মজ্জায় মজ্জায় পুরাণের আদর্শনিষ্ঠা বর্তমান। তাঁদের সৃষ্ট-সাহিত্যে তার চরমতম প্রতিফলন। কাহিনীর বিষয়, আঙ্গিক, চরিত্রসৃষ্টি সর্বত্রই এই আদর্শনিষ্ঠা মহিমাবোধ অপ্রত্যক্ষভাবে গভীর প্রভাব রেখে গেছে।

"অসতো মা সদ্গময়"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অগ্নি-সূর্য্য নিভে গেছে মৃত্যুর নিশির
নিবিড় তিমির জালে। জরা-রাক্ষসীর
নিষ্ঠুর জঠরে লুপ্ত জীবন যৌবন!
অস্তিত্বের ছিন্ন-মেঘ দুরন্ত পবন
কোন্ দিগন্তের পারে দেয় নিঃশেষিয়া!
চূড়ান্ত সে বিলুপ্তির ছায়াতে বসিয়া
কাঁদে অমৃতের পুত্র! করে অন্বেষণ,
কোথা সে শাশ্বত শান্তি? সেই সত্যধন
যাহা ছিল, যাহা আছে, রবে চিরকাল?
যারে পেলে অদৃষ্টের বিকট কঙ্কাল
দেখাতে পারে না ভয়? ভূমারে চাহিয়া
অনন্তের পানে ব্যগ্র বাহু প্রসারিয়া
কাঁদিল মানুষ: "লও অনিত্যের পারে
সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ শাশ্বতের দ্বারে!"

আস্তিক

অশোক ভট্টাচার্য

নীল আকাশে আলোর আরতি।
মধুমান্ সূর্যঘট: নীলের পল্লবে
স্বাগতম্ জটাধারী শাদা মেঘ যতি।
আলোর প্রসাদ নিলে পূজার বিরতি

নীল আকাশে আলোর আল্পনা।
পদচিহ্ন এঁকে মেঘে স্মরণ বল্লভে।
মধুবাতা ঋতায়তে: তোমার কল্পনা
নয় নয় নীল আকাশ অলীক জল্পনা।

সঙ্গীহীনা শস্যকাটুনী

(William Wordsworth-এর The Solitary Reaper. 1770-1850)

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ক্ষেতের মাঝে একলা ওকে তাকিয়ে দ্যাখো,
ওই পাহাড়ী সঙ্গীহীনা মেয়েটিরে !
কাটছে ফসল গাইছে আবার একাই নিজে,
হেথায় থামো, নয় চলে যাও আস্তে ধীরে ।
কাটছে একা বাঁধছে আঁটি নিজেই আবার,
গাইছে কেমন দুঃখের গান একটা তাহার ;
ওইরে শোনো ! উপত্যকার বুকটা ভরে'
আওয়াজ যেন যাচ্ছে বয়ে উপ্‌চে পড়ে' ।

কোন বুলবুল কোনকালেই গায় নি আগে
শ্রান্ত পান্থদেরে এমন স্বাগত গীতি
আরবদেশের মরুভূমির মধ্যভাগে
ছায়াচ্ছন্ন স্থানে দিতে একটু প্রীতি :
রোমাঞ্চকর কণ্ঠ এমন শুনেছে কে
ফাগুন মাসের কোন কোকিল-কণ্ঠ থেকে !
সমুদ্দুরের নি-শব্দতা ভাঙল ওরে
সুদূরতম দ্বীপ সমূহের ঠিক ভিতরে ।

কেউ কি মোরে বলবে না সে কি গান গায় ?
সম্ভবতঃ দুঃখসূচক কাব্য কথা
এক অসুখী বিষয় লাগি ভেসে যায়
সুদূরবর্ত্তী যুদ্ধগুলির দুঃখ ব্যথা ।
নচেৎ কোন সামান্য গান হয়ত হবে
পরিচিত বিষয় নিত্য ঘটছে ভবে ?
খুব স্বাভাবিক দুঃখ ক্ষতি কিংবা ব্যথা
যা ঘটেছে ঘটতে পারে সেসব কথা ?

প্রসঙ্গটা যা হয় হউক্, বিশুদ্ধ গান
কক্ষণো তা শেষ হবে না হচ্ছে মনে ;
দেখছিলাম সে কাজের মাঝেই চলছে গেয়ে,
কাস্তের ওপর নুইয়ে পড়ে' সর্বক্ষণে ;
আমি নীরব, শুনছিলাম গান ঠায় দাঁড়িয়ে ;
পাহাড়-চূড়ায় গেলাম শেষে খুব হাঁপিয়ে,
মধুর গীতি আনলাম আমার হৃদয় ভরি'
ঢের কাল পর আর না তাহা শ্রবণ করি' ।

জরিতা শবরী

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

তুমি যদি বলো এখনও আমায় চেয়েই থাকতে হবে
তোমার আসার ইশারার সাড়া পেতে,
তুমি যদি বলো, দিন গুণে গুণে এখনও কাটাতে হবে
বহুবসন্ত। বহুপথ হবে যেতে ;—

তাই বলো তুমি, আমার সময় ফুরিয়ে গিয়েছে, বুঝি ;
এখন আমার শুধু অপেক্ষা-চাওয়া।
—পুরোনো বনের জটার গভীরে চৈত-ফাগুনের রাতে
ঝরা পাতাদের মর্মর ভুলে যাওয়া।

গত বছরের পলাশের শাখা সেজেছে নতুন কোরে,
নতুন চালতে ভরে ওঠে সোনা-মধু ;
বসন্তহীন আশার পাতারা সবুজেই গেছে ঝোরে ;
ফোটেনি মুকুল ; বরণ হোলানা বধূ।

যে-রাত জেগেছে পম্পা-পাড়ায় নতুন চাঁদকে নিয়ে,
ছিলো যে রাতের গভীরে স্নিগ্ধ আলো,—
সে চাঁদ আমার মনের কিনারে আর মারেনা তো উঁকি !
হায়রে, আমার লাল বসন্ত, কালো।

যদি এলে এই ফুরোবার দিনে, ফুরিয়ে যেতেই দিও ;
রূপ ? দেখবো কি,—চোখেতে যে নেই দিশা !
নবনী-ললিত দেহ-লাবণ্য জরায় কি যায় ছোঁয়া ?
এবারের মতো থাক্ ছেয়ে অমানিশা।

রেখে যা ছিলাম ফুল, আলো, আর যৌবনভরা আশ্লেষ
চেয়ে দেখো এই দেহময় আছে মরে ;
তবুও এসেছো ? সাধুবাদ দিই ; প্রণিপাত করি পায়ে।
তা বোলে, বুকেতে জড়াবো কেমন কোরে ?

ফুরিয়েছে যারা ফুরোবার দিনে ফিরে ডাকা ফের তাকে
দুরন্ত যেন সে এক মরণ কালো।
তুমি যদি বলো, এখনও কাটাবো বহু বসন্ত শরৎ ;
এ পাওয়ার চেয়ে প্রতীক্ষা ঢের ভালো।

হীন যান

(উপন্যাস)

সুবোধ বসু

চার

'বাবু, এক আনা পয়সা দিবেন, মুড়ি কিনা খামু।'

বৈঠকখানা বাজারের প্রবেশমুখে সকাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে নিমাই। গত তিন দিন ধরিয়াই দাঁড়াইতেছে। মিঠাইয়ের দোকানের বনমালীদাই পরামর্শ দিয়াছিল। বাবুদের সওদা ভারি হইলে সস্তা দামের মুটের কাজে লাগাইতে পারেন। এই পরামর্শের দরুণ গত দু'দিনে সে মোট দশ আনা পয়সা কামাইয়াছে। কিন্তু ছোকরা মুটের সুযোগ কম। যারা বেশী সওদা করে তারা হয় বাড়ী হইতে লোক লইয়া আসে, নয়ত ঝাঁকা মুটে ডাকিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ জিনিষ টানায়। নিতান্ত যারা সখের বাজার করিতে আসে বা নিজেই জিনিষ বহন করিবে ঠিক করিয়া আসিয়া পরে হাতের কাছে পাইয়া মুটে লাগায়, একমাত্র তাদের কাছেই নিমাইয়ের মত বাচ্চা মুটের সুযোগ।

আজ ঠায় দুই ঘণ্টা বাজারের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। একজন মক্কেলও জোগাড় হয় নাই। কারা কাজে লাগাইতে পারে দুই দিনে সে সম্বন্ধে নিমাইয়ের একটা ধারণা জন্মাইয়াছিল। সে রকম দু' চার জন লোকও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের কেহই তাহার সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

বেলা প্রায় দশটা নাগাদ ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা খুব বাবুগোছের এক ভদ্রলোক বাজারে আসিলেন। সঙ্গে চাকর-বাকর নাই। ইনি নিজ হাতে বাজার বহন করিবেন না, ইহা নিশ্চিত। নিমাই পলকে তাহার কাছে হাজির হইয়া কহিল, 'মুইটা চাই, বাবু?'

বাবু চোখের কোণ দিয়া তাচ্ছিল্যভরে একবার তার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তারপর কোনও রকম জবাব না দিয়া বাজারের ভিতর ঢুকিবার উপক্রম করিলেন।

তখন নিমাই মরিয়া হইয়া ভিক্ষা চাহিয়া বসিল: 'বাবু, এক আনা পয়সা দিবেন, মুড়ি কিনা খামু।'

'কাজ করতে পারিস না, ছোঁড়া? এইবার বাবু বাক্য ব্যয় করিলেন।

'কি কাম করুম, কয়েন? কাম ত করতেই চাই'

'কাজ করতে চাইলে কাজের অভাব কি। কত কাজ আছে।'

'কেউ কোনও কাম দেয় না। আপনে দিবেন?' বাড়ীর কাম করতে পারি। বাজারপত্র করতে পারি। হিসাব রাখতে পারি। স্কুল ফাইনাল ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ছি।'

'তা হলে আর কি। ডালহৌসী স্কোয়ারে ঘোরা-গিয়ে। আফিসের চাকরি মিলে যাবে!' বলিয়া বাবু বাজারে ঢুকিয়া পড়িলেন।

শুধু ইনি নহেন, সবাই। বলে খাটিয়া খাও গিয়া। কিন্তু কোথায় খাটিবে, কে খাটাইবে? সে সম্বন্ধে কেহ কিছু বলেনা: কেহ কোনও সাহায্য করে না। নিমাই খাটিতেই চায়। ভিক্ষা করিতে তার লজ্জা করে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে অন্যদের দেখিয়া সে এই অভ্যাসটি অর্জন করিয়াছিল। নিরুপায় হইয়াই এটি এখনও পরিত্যাগ করা যাইতেছে না।

অবশেষে একবার ধৈর্য্যের পুরস্কার মিলিয়া গেল। তার প্রায় গায়ের কাছ দিয়াই ভদ্রলোক আগাইয়া বাজারের ভিতর ঢুকিতেছিলেন; অন্যমনস্ক থাকায় ইতিপূর্ব্বে নজরে পড়ে নাই নিমাইয়ের। যখন নজরে পড়িল তখন প্রায় হাতছাড়া হইবার উপক্রম।

পিছন হইতে প্রায় মরিয়া হইয়াই নিমাই কহিল, 'বাজার নেওনের জন্য মুটিয়া চাই, বাবু?' মুইটার বদলে মুটিয়া প্রয়োগ ইচ্ছা এবং চেষ্টাকৃত।

'কে মুটে?'

'আমিই।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সকৌতুক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রচ্ছন্ন রগড়ের সুরে কহিলেন, 'ক' মণ মোট বইতে পার?'

'এক মোণ দুই মোণ…'নিমাই থতমত খাইয়া কহিল। বস্তুতঃ কতটা সে প্রকৃতপক্ষে বহন করিতে

পারে, তা নিজেই জানে না। এমন প্রশ্নও ইতিপূর্ব্বে কেহ করে নাই।

'এক মণ আর দু মণে তফাৎ কতটা জানো খোকা? আচ্ছা সঙ্গে এস। ঝাঁকা কোথায়?'

'আইজ্ঞা ঝাঁকা নাই।' বেশ বোকা বনিয়া নিমাই জবাব দিল।

'তবে এক মণ দু মণ নেবে কি করে? তাঁর সাদা বড় গোঁফজোড়ার আড়ালে ঠাকুরদা-সুলভ দুষ্টুমির হাস্য। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। এসো।

বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে অনুসরণ করিয়া নিমাই বাজারের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রথমে তরকারির দোকান। দোকানের পর দোকান ঘুরিলেন ভদ্রলোক। আলুর সের কত? আর যদি আড়াই সের নিই? মাদ্রাজী আলুর মত মনে হচ্ছে! নৈনীতাল? বৈদ্যবাটী-নৈনীতাল? শাদা বেগুন কত করে? বারুইপুরের বেগুন? গ্রীষ্মকালের রোগা কপির দাম কি রকম? পাটনা না দার্জ্জিলিং? একেবারে এক টাকা সের টোমাটোর? শীতকাল নয়। তা ত জানি? কিন্তু শীতের সব আনাজই ত দেখতে পাচ্ছি।

তন্নতন্ন করিয়া সব্‌জির খোঁজ করিলেন, দামাদামি করিলেন, কিন্তু কোথাও এক পয়সার কিনিলেন না। নিমাই অবাক হইল। ভারি কৃপণ বোধ হয়! এত কৃপণ হইলে কখনও জিনিষ কেনা যায়।

'চল ত চন্দর, একবার মাছ কেনা যায় কিনা দেখে আসি।'

'মাছের ত আরও দাম!' নিমাই মনে মনে কহিল।

'পুকুরের মাছ! পুকুরের মাছ। খোঁচা মারলে এখনও লাফাবে। আসুন, জামাইবাবু, একটা দিয়ে দিই। শ্বশুরবাড়ীতে নাম হবে।'

'ওর কথায় ভুলবেন না, স্যার। পাঁচ দিনের বাসি মাছ। বরফে ডোবানো। আমার পাকা রুই। বুকটা লাল টকটক করছে।'

'ডাহা মিথ্যুক ওটা, জামাইবাবু। বুকটা ঘষে দেখলেই আঙুলে সিঁদুরের রং উঠে আসবে।...তিন টাকা সের, তিন টাকা সের। পুকুরের জ্যান্ত পোনা।'

অনাবৃত প্রতিযোগিতা! কিন্তু ইহাই নিয়ম; ইহাতে পরস্পরের মধ্যে দ্বেষের সৃষ্টি হয় না। সকলেই ইহাকে রসিকতা বলিয়া গ্রহণ করে।

'বাগদা চিংড়ি দুটাকা! দু'টাকা! ইলিশ পৌনে তিন!'

'গঙ্গার ইলিশ তিন টাকা সের। বাজে ইলিশ পৌনে তিন।'

জামাইবাবু সত্যই জামাইবাবু। একটা গোটা রুই মাছ ওজন করাইয়াছেন। টকটকে তার বুক। উপহারের উপযুক্ত মাছ সন্দেহ নাই।

'আট সের, তিন ছটাক।' তিন ছটাকের দাম আর দেবেন না। আট সেরে তে-আটা চব্বিশ টাকা।'

'পুরো মাছ নিলে তিন টাকা সের কখনও হয়। আড়াই টাকা করে কুড়ি...

জামাইবাবু মনিব্যাগের জন্য ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবীর নীচের পকেটের দিকে হাত বাড়াইলেন। জেলের প্রতিবাদে দুই সেকেণ্ডের জন্য থামিতে হইয়াছিল, এমন সময় বালক-কণ্ঠের একটা তীব্র আওয়াজে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া তাকাইল।

কয়েক মিনিট আগে নিয়োগকর্ত্তাকে অনুসরণ করিয়া নিমাই মাছের বাজারে প্রবেশ করিয়াছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রথামত দরদস্তুর চালাইতেছেন। এখন পর্য্যন্তও নিমাইকে কিছু বহন করিতে হইতেছে না। অলসভাবে সে চারদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে। মাছের দোকানগুলির একটির সামনে সে ইতিপূর্ব্বেই আদ্দির পাঞ্জাবীপরা সেই বাবুগোছের বাবুটিকে লক্ষ্য করিয়াছে, যিনি কিছু পূর্ব্বে তার সাহায্য-প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া তাকে ভিক্ষার আবেদন করিয়া ছাড়াইয়াছিলেন এবং ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছে শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যখন বড় রকম একটা মাছ কিনিতেছেনই, তখন নিমাইকে হতাশ করিবার কি দরকার ছিল? অনায়াসেই সে দশ বারো সেরের একটা রুই মাছ কানকো ধরিয়া বহন করিতে পারিত।

কিন্তু ঐ লোকটা কি করিতেছে বাবুটির পিছনে? কাছাকাছি আরও দুচারজন লোক জেলেদের সঙ্গে দামাদামি করিতেছিল। কিন্তু বাবুটির ঠিক পিছনের লোকটি মাছের দোকানের দিকে তাকাইয়া থাকিলেও বাঁ হাতটা ঐ রকম করিতেছে কেন? আড় চোখে সে নিজের এই হাতটির দিকে তাকাইয়াছে এবং অদূরবর্ত্তী আর একটা লোকের সঙ্গে কি যেন ইসারা করিয়াছে, তাহাও নিমাইয়ের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় নিমাই সেদিকে দৃষ্টি

নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। দেখিল, এইবার লোকটার বাঁ হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলি বাবুটির আদ্দির পাঞ্জাবীর নীচের পকেটে প্রবেশ করিয়াছে।

'গাঁইট কাটা! গাঁইট কাটা। মারল, মণিব্যাগ মারল।' তারস্বরে উত্তেজিত চিৎকার করিয়া উঠিল নিমাই। চমকিয়া উঠিল সারাটা মাছের বাজার। প্রথমে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পকেটে হাত দিল। তারপর হৈ হৈ শব্দ উঠিল। কোথায়? কোথায়? ইতিমধ্যে একটা লোক এক লাফে পাশের হাঁটার পথে গিয়া দুইটা মুদি দোকানের মাঝখানের একটা সরু নর্দ্দমার গলির মধ্যে ছুটিয়া গিয়াছে। ধর ধর ধর। কিন্তু ধরে কে? কাকেই বা ধরে।

'সর্বনাশ!' বাবুটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। 'আমার ব্যাগটা নেই! দেড় শো টাকা! সর্ব্বনাশ!'

'নিতে পারে নাই, বাবু। তাড়াতাড়িতে ফালাইয়া পালাইয়াছে।' নিমাই ছুটিয়া গিয়া হাত পাঁচেক দূরে ব্যাগটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

বাবুটি প্রায় ঝম্প দিয়া সেখানে হাজির হইলেন এবং পলকে ব্যাগটি উঠাইয়া প্রথমেই নোট গণিয়া দেখিলেন। বার দুই গণিবার পর বেশ হৃষ্ট কণ্ঠেই কহিলেন, 'না, নিতে পারে নাই। সবই ঠিক আছে।...দিচ্ছ ত মাছটা? কুড়ি টাকার বেশি দিতে পারব না।

'দিন। যা ইচ্ছে আপনার দিন। আর একটু হলেই দেড়শো টাকা খোয়াতেন ভেবে আমাদেরই কষ্ট হচ্ছে।' জেলে কৃত্রিম সহানুভূতির স্বরে কহিল।

'মশায়, আদ্দির পাঞ্জাবীর নিচের পকেটে দেড়শো টাকা ঝুলিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কি রকম লোক আপনি?' ভিড়ের মধ্য হইতে বেশ কড়া সুরেই তিরস্কার আসিল।

'আরে জানেন না, ইনি যে জামাইবাবু।...জেলেকে চারটাকা ঠকিয়েছেন, ঠিকই করেছেন। সাত দিনের বাসি মাছ। কিন্তু ঐ ছোকরাটাকে একটা টাকা বকসিস দিয়ে যান। ওর জন্য দেড়শো বেঁচেছে।'

'পুকুরের মাছের' বিক্রেতা সুযোগের অভাবে চুপ করিয়া গিয়াছিল, মৌকা বুঝিয়া টিপ্পনী ও উপদেশ ছাড়িল।

'এই ছোঁড়া, আয়।' বাবু এইবার নিমাইয়ের দিকে তর্জ্জনী নাড়িয়া আহ্বান জানাইলেন। 'মাছটা নিয়ে যাবি ত চল।' অর্থাৎ একই সঙ্গে বকশিষ ও পারিশ্রমিক ধরিয়া দিবেন।

এই আঙ্গুল নাড়িয়া ডাকটা নিমাইয়ের কাছে ভারি অপমানজনক মনে হইল। একে ত সে ইতিমধ্যেই অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাঁহারই পিছে পিছে এখানে আসিয়াছে; ইহার ডাকে সে যাইবে কেন? তার উপর বাবুটির ব্যবহার ভারি আপত্তিজনক। ইহার বকশিষে নিমাইয়ের লোভ নাই।

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না আমি যামুনা'। 'এই ঝাঁকা।' বাবু আর বাক্যব্যয় না করিয়া ওদিকের এক ঝাঁকা মুটেকে আহ্বান করিলেন। তর্জ্জনীর আন্দোলন পূর্ব্ববৎ।

'টাকাটা বের করে দিন মশায়।' জনতার তিরস্কার আসিল। 'মাল বইবার, পয়সা নয়, কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি।'

'না, আমি চাই না টাকা'। বলিয়া নিমাই পিছন ফিরিয়া দশ হাত দূরে সরিয়া গেল।

অদ্ভুত সওদা সমাপ্ত করিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার বাজারের ফটকের কাছে হাজির হইয়াছেন। পিছনে পিছনে নিমাই হাজির আছে, কিন্তু হাতে সওদাপাতির চিহ্নমাত্র নাই। বাজার হইতে ভদ্রলোক কিছুই কিনিলেন না, তবু তাহাকে মুটে নিযুক্ত করিবার অর্থ কি? নিমাই আর বিস্ময় রোধ করিতে পারিল না। কহিল, 'বাজার থন্ কিছু ত কিনলেন না, বাবু।'

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। অস্থির হয়ো না। ঐ ত ওখানে যা কিনতে এসেছি।' চারদিকে একবার দ্রুত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ। 'যাও ত বাবা। ঐ দেখ গন্ধরাজ, সুগন্ধ নেবু, ওখানের ঐ বুড়ী বিক্রি করছে। নিয়ে নে দু জোড়া! গন্ধরাজ নেবু না হলে আমার খাওয়াই হয় না।'

কাজ পাইয়া নিমাই ছুটিয়া গেল।

'স্যর উমাশঙ্কর! আপনি এখানে।'

অহূত হইয়া নিমাইয়ের নিয়োগকর্ত্তা বৃদ্ধ পাশে তাকাইলেন।

'আর বলবেন না মশায়। বাজার দরের খোঁজ নিতে নিতে একেবারে জান শেষ। অথচ গৃহিণী জেদ ধরেছেন। ছেলেমানুষ বৌ একা থাকবে। চাকর-বাকর ঠকিয়ে শেষ করবে। যাবার আগে একবার নিজে গিয়ে জিনিষপত্রের দাম জেনে এসো। ...মেয়েমানুষদের ত জানেন। আজকের বাজার দর কালকের বাজার দর নয়, সেটা কে বোঝাবে।'

প্রশ্নকর্তা মৃদু হাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'বাইরে যাচ্ছেন নাকি? কবে যাচ্ছেন? কোথায়?'

'বছরের পর বছর সেই একই স্থান।' স্যার উমাশঙ্কর পূর্ব্ববৎ হাল্কা সুরেই কহিলেন। 'দার্জিলিং। অপরাধ সেখানে এই হতভাগ্যের একটি নিজস্ব বাড়ী আছে। গৃহিণী অপব্যয় সহ্য করতে পারেন না। নিজেদেরই যখন বাড়ী আছে, তখন সেখানে গেলে আর বাড়ী-ভাড়া লাগবে না।···ও, এসে পড়েছে। দু' জোড়া গন্ধরাজ দু আনা। বেশ দামাদামি করতে পার ত তা হলে ছোকরা।' বলিয়া পরিচিত ভদ্রলোকটির সহিত সহাস্য নমস্কার বিনিময় করিয়া স্যার উমাশঙ্কর অগ্রসর হইলেন।

বৈঠকখানার গলি দিয়া বৌবাজার রোডের দিকে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে নিমাই কেবলই ভাবিতে লাগিল, মাত্র দু জোড়া নেবু বহন করিবার জন্ম তাহাকে নিযুক্ত করিবার কি দরকার ছিল। কিন্তু সদর রাস্তায় পৌঁছিবার পর রাস্তার মোড়ে প্রকাণ্ড একটা মোটর গাড়ির জমকালো পোষাকপরা ড্রাইভার যখন তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া সসম্ভ্রমে বৃদ্ধকে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, তখন তাঁহার অদ্ভুত আচরণে নিমাই একটা ব্যাখ্যা পাইল। বোধহয় কোথাকার রাজা হইবেন। এক জোড়া নেবু কিনিলেও মুটিয়া ডাকিতে হয়, নইলে রাজার রাজসম্মান থাকিবে কেন?

'এই নাও।' স্যার উমাশঙ্কর ব্যাগ খুলিয়া একটা টাকা বাহির করিয়া কহিলেন, 'পকেট-কাটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পাওনা পুরস্কার এক টাকা।' তারপর আরও একটা টাকা বাহির করিয়া কহিলেন, 'আর এটা মোট বওয়ার মজুরী।'

এক সেকেণ্ড টাকা দুটো হাতের তেলোতে ধরিয়া রাখিবার পর নিমাই সহসা ভ্যাঁক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

'না, না, এত ক্যান্। আমি ত কিচ্ছু করি নাই।···

'ঠিক আছে। নাও।'

'আপনে কোন্খানে থাকেন রাজাবাহাদুর? আমি রিফিউজী। বাপ মা সব হারাইছি। আমারে একটা কামকম্ম দেন। আমি স্কুল ফাইন্সাল ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছি।'

স্যার উমাশঙ্কর করুণ মুখে কয়েক সেকেণ্ড নীরব রহিলেন। তারপর নিজের মণিব্যাগ হইতে একটা কার্ড বাহির করিয়া আনিয়া কহিলেন। 'এই কার্ডটা রাখো। এতে ঠিকানা লেখা আছে। কিন্তু কা[illegible] সকালের প্লেনে আমি বাইরে চলে যাচ্ছি। মা[illegible] তিনেক থাকব বাইরে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার সঙ্গে দেখা কর। কেমন, ঠিক আছে?'

ঠিক আছে, না, না-আছে তাহা বিচার করিবার মত অবস্থা নিমাইয়ের নহে। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

পাঁচ

জায়গাটা ভাল ছিল। সমব্যবসায়ী ছোকরাদের সঙ্গে কিছু চেনাপরিচয়ও হইয়াছিল। ট্রাম-লাইন হইতে বাজারটা কিছুটা দূরে থাকায় অল্পসল্প রকমের মোট বহিবার জন্ম লোকে ডাকিত। কিন্তু এমন সুবিধাজনক কর্মস্থলটি হারাইতে হইয়াছে।

'রাজাবাবুর কাছ হইতে নগদ দুইটাকা, অর্থাৎ কল্পনাতীত বকশিস পাইয়া সে যখন আবার বৈঠকখানার বাজারের প্রধান ফটকের কাছে ফিরিয়া আসে, তখন একবাক্যে প্রায় সবাই বলিল, 'এ করিয়াছিস কি। হাবু গুণ্ডাকে চটাইয়াছিস। তোর রক্ষা নাই।'

হাবু গুণ্ডার নাম জীবনে সে এই প্রথম শুনিল। আরও শুনিল, হাবুই মাছের বাজারে পকেট হইতে মণিব্যাগ টানিয়াছিল, নেহাৎ নিমাইয়ের চিৎকারে ব্যাগ ফেলিয়া তাহাকে সরিয়া পড়িতে হইয়াছে। লোকটার ভয়ঙ্করতার বহু বর্ণনাই সে শুনিল। ইহা শুনিবার পর বাধাপ্রাপ্ত ও পলায়নপর পকেটমার নিমাইয়ের দিকে যে দৃষ্টিটি নিক্ষেপ করিয়াছিল, তার পূর্ণ তাৎপর্য্য নিমাইয়ের হৃদয়ঙ্গম হইল।

মিষ্টির দোকানের বনমালীদাকে সকল ঘটনা জানাইবার পর সেও বেশ উদ্বিগ্নভাবেই বলিল, থাক। ওখানে আর কিছুদিন যাস নে। যারা অসহায় তাদের সৎ হওয়া বিপজ্জনক।'

ইহার পর নিমাই বৌবাজারের বাজারে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে। এই কাজটির কৌশলই সে এই কয়দিনে যা হোক কিছু আয়ত্ত করিয়াছে, কাজেই এই কাজেরই চেষ্টা করিল। খুব সুবিধা করিতে পারিল না। প্রতিযোগীরা তার চাইতে আরও অভিজ্ঞ ও চটপটে। তা ছাড়া, ট্রাম বাজারের গায়ে। বাজারের ব্যাগ ক্রেতাদের বিশেষ একটা বহন করিতে হয় না। ট্রামে চড়িয়া বসিলেই হইল।

বনমালী বলিল, 'এক কাজ কর। ঐ যে দুটো টাকা পেয়েছিলি, তা দিয়ে একটা কড়া, একটা তোলা উনুন, কিছু কাঠ কয়লা, মুশুরির আর মাস কলাইয়ের ডাল কিনে ঐ যে পানের দোকানটার কাছে বুড়ী বসে ডালের বড়া, পলতা-ভাজা ভাজে সেই রকম তুইও ভাজ। পকোড়ার খুব চাহিদা। এ মোড়টায় একটা চলবে মনে হয়। তোর উপরে যে মেয়েগুলি থাকে, তাদের কাছ থেকেই কত অর্ডার আসবে দেখবি। মদের চাট চাইত।'

উপরের মেয়েগুলি ভাল মেয়ে নয়, নিমাই এ বয়সেও তাহা সহজেই বুঝিয়াছে। ইহাদের কাছ হইতে পয়সা উপার্জ্জনটা তাহার কাছে খুব লোভনীয় ব্যাপার মনে হইল না। কিন্তু ব্যবসাটা যে লাভজনক এবং খুব কষ্ট-সাধ্য নয়, তাহা অনস্বীকার্য্য। বনমালীর ব্যবসাবুদ্ধির উপরও তাহার যথেষ্ট আস্থা জন্মাইয়াছে। কিন্তু তার যে গোড়ায়ই গলদ!

'সে টাকা কি আর আছে বনমালী দাদা।' প্রায় অপরাধীর কণ্ঠে নিমাই কহিল। 'গত আটদশ দিন হয় কি অবস্থা চলতেছে জান ত। পুরা একটা টাকাও হাতে নাই। পাইস হোটেলে সব গেছে। ঐসব কিনুম কি দিয়া?'

তবু কিন্তু সে সন্ধ্যাবেলা পকোড়া বুড়ীর ফুটপাথস্থিত ক্ষুদ্রাকার কারখানাটার খুব কাছে দাঁড়াইয়া তাহার কার্য্য-প্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিল। চট করিয়া যদি কিছু পয়সা উপার্জ্জন হয়, তবে এরকম একটা দোকান দিলে মন্দ কি। বনমালীদা সুস্বাদু পকোড়া প্রস্তুতের কায়দা শিখাইয়া দিবেন বলিয়াছেন, এবং কড়া, উনুন এবং কাঁচা মাল দোকানের মালিকের অনুমতি পাইলে দোকানের ভিতরে রাখিতে দিবেন, এমন আশ্বাসও দিয়াছেন।

কিন্তু মূলধন আসে কোথা হইতে? বাজারে মাল বহিবার কাজ যদি বা পাওয়া যায়, সামান্য বোঝার মালিকেরাই মাত্র তাহাকে নিয়োজিত করে এবং তার পারিশ্রমিকও দু-এক আনার বেশি হয় না। ইহা দ্বারা পাইস হোটেলে একবার খাওয়ার মত পয়সা ওঠাই মুস্কিল! অবশ্য নিরুপায় হইয়া আয় বৃদ্ধির জন্য সে আবার কিছু কিছু ভিক্ষা করা শুরু করিয়াছে। 'অসহায় রিফুজী, বাপ নাই মা নাই। দুইচাইর পয়সা দিয়া যান।' বলিতে তার নিজেরই সংকোচ হয়, কিন্তু অভাব বড় বালাই। কিন্তু ভিক্ষার আয়ই বা কত?

রমজান মিঞা প্রতি রাতেই একবার তাহাকে 'বুরবক' বলিয়া গালি দেয়। যদি ভিখ্ই মাংগবি, তবে এ রকম আনাড়ীর মত কেউ ভিখ মাগে! এতে কত মিলবে? ভিখ মাগিবারও কায়দা আছে। বিশেষ বিশেষ জায়গা আছে, সেগুলি দখল করিতে পারিলে বৃষ্টির মত টাকাটা-সিকিটা পড়ে। তার জন্য আবার উপযুক্ত সাজ-পোষাক করিতে হয়। এসবের ব্যবস্থা করিবার লোক আছে। রমজান মিঞার সঙ্গে তাদের খুবই জান-পয়চান। এদেরই দৌলতে রমজানের কয়েক হাজার টাকা সঞ্চয় হইয়াছে। নিমাইকেও সে সেখানে লইয়া যাইতে পারে। তারা লোক ভাল। সব রকম সুবিধা তারা করিয়া দিবে, অথচ আগে হইতে কোনও পয়সা চায় না। আয় হওয়া শুরু হইলে তবে তাদের সামান্য কমিশন দিতে হইবে—আর কিছু নয়।

রমজানের এই প্রস্তাবের কথা নিমাই বনমালীকে বলিয়াছিল। শুনিয়া সে বলিল, 'খবরদার, ওর কথা শুনিস নি। বিপদে পড়বি।'

তারপর হইতে নিমাই ইহাতে আর কান দেয় নাই। বনমালীকে সে প্রকৃত হিতৈষী মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সব কথাই সে তাকে বলে। সব বিষয়ে তার পরামর্শ নেয়।

শুধু রাজাবাবুর কার্ডটা এবং ক'মাস পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার আমন্ত্রণের খবরটা চাপিয়া গিয়াছে! এত বড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাটা বীজমন্ত্রের মত পাঁচ-জনের কানে তুলিয়া দিতে কেমন যেন দ্বিধা হইয়াছে। তবে নানাভাবে এই কথাটা জানাইতে ত্রুটি করে নাই যে, মাস কয়েক পরে তার খুব একটা ভাল কিছু ঘটিবার কথা।

এবিষয়ে কেহই কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নাই।

কিন্তু ইহা নিমাইয়ের কল্পনার প্রধান উপজীব্য। এক দিন তার দুর্দ্দশা ঘুচিবে। আস্ত একটা ছাদের তলায় তক্তপোষের উপর বিছানা পাতিয়া শুইবে। অফিসের বাবুদের মত ট্রাম-গাড়ীতে বাদুড় ঝুলিতে ঝুলিতে মহা আনন্দে অফিসে যাইবে। ফর্সা জামাকাপড়, পালিশ-করা জুতো পরিবে। ইচ্ছামত খাবার কিনিবে। পেট ভরিয়া ভাত খাইবে। শহরের হাজার সুখী লোকের মত সেও সুখী হইবে।

দুলী ও ননীদি তার কাছে সম্পূর্ণ নিখোঁজ। ইহাদের সন্ধান করাও এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। শহরের প্রায় কিছুই সে এখন পর্য্যন্তও চেনে না। চিনিলেও এই বিরাট শহরের কোথায় তাদের খোঁজ করিবে? নিমাই তার দায়িত্ব পালন করে নাই। সে বোকা বনিয়া গেছে। এই বোকামির দরুণ যারা তাহার নিতান্ত আপনার জন তাহাদেরই হারাইতে হইয়াছে। চাকরি পাইলে ইহাদের লইয়া সুন্দর একটা বাসা পাতা যাইত, কিন্তু কে তাহাদের খোঁজ দিবে?

দুলী নিমাইয়ের আশৈশব খেলার সাথী। ঠানদিদি রগড় করিয়া বলিতেন, 'অর লগে তর বিয়া দিমু।' দুলীর ফর্সা সুন্দর মুখটা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিত। বড় বড় চোখের একপ্রান্ত হইতে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়া শাড়ীটা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে এক ছুট দিয়া সে দৃষ্টির বাহির হইয়া যাইত। কিন্তু আবার পরদিন সকালেই হাজির!

এ সব কথা ভাবিতে ভাবিতে নিমাই অধৈর্য্য হইয়া ওঠে। আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তবে ত অন্য সব। অথচ রাজাবাবুর কাছে হাজির হইবার দিন এখনও অনেক দূর। কার্ডটা নিমাই রোজই একবার করিয়া পড়ে। বাড়ীর নম্বর এবং রাস্তার নাম তার মুখস্থ। কিন্তু বেলেঘাটা মেইন রোড তার কাছে চন্দ্রলোকের মতই দুর্গম। কোনও সঙ্গী পাওয়া গেলে অন্ততঃ একবার বাড়ীটা চিনিয়া আসা যাইত!

এই বাড়ীটাই এখন তার একমাত্র ভরসার স্থল।

'রমজান চাচা, ঘুমাইয়া পড়ছ?'।

'আরে দূর। বাইজীর গানা শুনছি। ক্যায়া রে, লোণ্ডে, ক্যায়া খবর?'

'বেলেঘাটা মেইন রোড কোন্ রাস্তাটা জান?'

'বেলিয়াঘাটা মেন রোড। হাসিয়েছিস। খুব হাসিয়েছিস।' বলিয়া হাসি প্রমাণের জন্য রমজান কাংস্যকণ্ঠে খুব খানিকটা হোঃ হোঃ করিয়া লইল। 'মোছ ওঠবার আগে থেকে কলকাতা আছি, বেলিয়াঘাটা মেন রোড পয়চানবো না।...

'একদিন সেই রাস্তাটায় আমারে লইয়া যাইবা?'

'কেন রে, ব্যাপার কি? চালকলে নোকরী করবি?'

'চাউল-কলে কাম পাওয়া যায় নাকি?'

'আরে বহত কাম। কত নিবি।' রমজান বিজ্ঞের মত কহিল।

'কামের লাইগা না।' নিমাই একটু থতমত খাইয়া কহিল। 'এমনেই রাস্তাটা একবার দেখতে চাই। নিয়া যাইবা?'

'যাবিস্?' রমজান মিঞা ফুটপাথ-খাট হইতে জবাব দিলেন। 'হাঁ, নিয়ে যাব এক রোজ। ক'দিন ফুসরৎ নেই। জুম্মাবারে নেমাজ পড়তে আসব দপহরে। তৈয়ার থাকিস। নিয়ে যাব...

'আইচ্ছা নিমাই সাগ্রহে কহিল।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত (হীন ?) বাঙ্গালীর ভবিষ্যত কি ?

আমাদের অর্থাৎ (বিত্তহীন) মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কি এবং কোন দিকে তাহা লইয়া কেহ কেহ মাথা ঘামাইতেছেন। সম্প্রতি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে এই গুরুতর বিষয়টি লইয়া আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গলার সংস্কৃতির সহিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের যোগ এবং সম্পর্ক বহুতর এবং এ-বিষয়ে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের অবদান বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ভবিষ্যত কি এই বিষম প্রশ্নের পূর্ব্বে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং উঠা উচিত—বাঙ্গালীর বর্তমান অবস্থা কি ?—

—আমরা নৈরাশ্যবাদী নই, কিন্তু অন্ধকারকে আলো বলিয়া মনে করিবারও কোন কারণ দেখি না, কিংবা গোধূলিকে দ্বিপ্রহর। স্বীকার করিতেই হইবে মধ্যবিত্ত আজ সম্প্রদায় হিসাবে অন্ধকারে দিশাহারা। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত। দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণায় এই শ্রেণীটি আজ কী শহরে, কী গ্রামাঞ্চলে—অতিষ্ঠ, বিড়ম্বিত। ঘরে ঘরে পুঞ্জীভূত দিনযাপনের গ্লানি। বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, সর্ব্বোপরি জীবিকার সমস্যা—মধ্যবিত্তের জীবন ঘিরিয়া আজ সমস্যার অক্টোপাস। স্পষ্টতই সে ক্ষয়িষ্ণু, জরার লক্ষণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে। বিত্তের দিক হইতে অবশ্য মধ্যবিত্তশ্রেণী বরাবরই একধরনের মধ্যপদলোপী সম্প্রদায়, 'বিত্ত' শব্দটি রাজ্যহীন রাজার মাথায় মুকুটের মত তাহার পক্ষে একান্তই বেমানান। বলা চলে—অহেতুক। ধনগৌরব মধ্যবিত্তের কোন কালেই ছিল না। এই শ্রেণীর বিকাশের চরম মুহূর্ত্তে একজন বাঙ্গালী দর্শক তাহার সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছিলেন, "মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদেরও ওই (ধনাঢ্যের) রীতি কেবল দান বৈঠকী আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।" মধ্যবিত্ত সেদিনও রূপার চামচ মুখে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইতেন না। তাঁহাকে সেদিনও পরিশ্রম করিয়াই অন্নসংস্থান করিতে হইত। তাহা সত্ত্বেও চিত্তের ঐশ্বর্যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সেদিন এক আশ্চর্য জীবন্ত শ্রেণী। দিকে দিকে তাহার অভিযাত্রা, নব নব ক্ষেত্রে সার্থকতা। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সেদিন সকল প্রগতি-আন্দোলনের আগে জাতির হাতে পতাকা-স্বরূপ।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী অর্থবলে হীন হইয়াও ছিল চিত্ত বলে এবং আদর্শ সম্পদে অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বলবান। ঐতিহাসিকদের মতে—

মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের সংক্রান্তিতে ইউরোপীয় নবজাগরণ সম্ভব হইত না যদি শ্রেণী হিসাবে তখন মধ্যবিত্তের অভ্যুত্থান না ঘটিত।—বাঙ্গলা তথা ভারতের নবজাগরণ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, দর্শনে, আইনে, সমাজনীতি এবং রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত এক অবিশ্বাস্য দাতা। দুই হাত ভরিয়া সে কেবলই দিয়া গিয়াছে, প্রতিদানে নিজের জন্য কিছুই চায় নাই। যদি কোন বাসনা তাহার প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা আর কিছু নয়, নিজের বিশিষ্ট জীবন-ভঙ্গীটি বাঁচাইয়া রাখার আগ্রহ মাত্র। আজ তাহাও টিকাইয়া রাখা দায়। মধ্যবিত্তের প্রাণ রাখিতেই প্রাণান্ত!

এই বিষম সমস্যার হয়ত সমাধান হইবে—আজ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যদি তাহার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইতে পারে। কলম ছাড়িয়া এখন যন্ত্রে নূতন দীক্ষা লইতে হইবে। যন্ত্রে দীক্ষা লইয়া—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে পথে বাহির

হইতে হইবে, ভারতের সর্ব্বত্র— যেখানেই সম্ভব নব নব ইষ্ট সন্ধান করিয়া লইতে হইবে।

সহজ কথায় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তকে বর্তমানে দুর্গম পথে অভিযাত্রী হইতে হইবে। "দরিদ্র হইলেও ভদ্রলোক" এই .গুকারজনক মোহ কাটাইতে হইবে। যদি বাঁচিতে হয় অদ্যকার জীবন যুদ্ধে।

দারিদ্র্য কঠিন ব্যাধি, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় বাহির করিতে না পারিলে মধ্যবিত্ত শেষ পর্যন্ত "ভদ্রলোক"ও থাকিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'—বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত এই মন্ত্রেও এতকাল বিশেষ আস্থা দেখান নাই, বা দেখাইয়াও বিশেষ সফল হন নাই। এই দিকেও নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য - সবত্র প্রবল প্রতিযোগিতা সন্দেহ নাই, কিন্তু মধ্যবিত্তের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ব্যর্থ হইবে এমন কথাও মনে করি না। চাই বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবার মত লোক, যথার্থ নায়ক। মধ্যবিত্ত এখনও নানা ব্যাপারে অধিনায়কের ভূমিকায়—নিজেদের সমস্যার মোকাবিলা করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে পারেন, এমন মানুষও নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।

নিয়তির কাছে পুরাপুরি আত্মসমর্পণ অবশ্য মধ্যবিত্ত করেন নাই। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার প্রয়াস অবশ্যই আছে। লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে মধ্যবিত্তের পরিধি বাড়িতেছে। উচ্চ, মধ্য, নিম্ন— মধ্যবিত্ত সমাজে নানা মাপের ঘর। এই সম্প্রদায়ে নূতন নূতন "কনভার্ট" যোগ দিতেছেন, পুরানোরাও ভঙ্গী পালটাইতেছেন। ইহা প্রাণের লক্ষণ, জীব-ধর্ম। বিবর্তন নিজের কৃত্য অবশ্যই করিবে, কিন্তু তাহারই হাতে মধ্য-বিত্তকে সঁপিয়া দিলে অবশিষ্ট সমাজ অপরাধী হইবে। আজিকার এই স্বাধীনতা এবং এই নবীন সমাজের পিছনে অন্যতম কারিগর যাঁহারা তাঁহাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় কর্তব্যও আছে। মধ্যবিত্ত নিজে উদ্যোগী হইবেন কিন্তু সেই উদ্যোগে সর্ব্বতোভাবে সহায়ক হইতে হইবে রাষ্ট্রকে।

পশ্চিমবঙ্গে—বাহিরের লোক আসিয়া সামান্য বিত্ত লইয়া মাত্র বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই—লাখ নহে, ক্রোড়পতি হইতেছে—কোন মন্ত্রবলে? জানি, আজ বহিরাগত যে-সকল ব্যবসায়ী পশ্চিমবঙ্গের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ শিল্প বাণিজ্যের মালিক হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন ব্যবসায়ের নীতিগত রাজপথে দিবালোকে বিচরণ করে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে—এই সব বহিরাগত অসৎ ব্যবসায়ীদের অপকর্মে আমাদেরই এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বসহায়তা দান করিতেছে—সামান্য অর্থের কারণে। আজ এই হীন কর্ম্মের দ্বারাই বহু বাঙ্গালীকে নিজেকে এবং নিজের সংসারকে বাঁচাইবার অপপ্রয়াস করিতে হইতেছে বাধ্য হইয়াই। একথাও সত্য যে—অপকর্ম্ম করিতে করিতে তাহা ক্রমে মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়, এবং প্রয়োজন না থাকিলেও অভ্যাসগত অপকর্ম্ম হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে পারে না কিছুতেই। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ নিশ্চয়ই ক্রিমিন্যাল টাইপে পরিণত হয় নাই—এবং বর্তমানের বিষম সঙ্কটে যাহারা দুর্নীতির পথে চলিতেছে, বা চলিতে বাধ্য হইতেছে তা নিতান্তই বাঁচিবার তাগিদেই। বাঙ্গালীকে আত্ম জাতি হিসাবে টিকিয়া থাকিতে হইলে—নিজের পথ নিজেকেই বাহির করিতে হইত।

এ-কথা বহুলাংশে সত্য—যে বাঙ্গালী আজ নিজ-রাজ্যেই 'ঘেরাও' হইয়া আছে। অন্যরাজ্যবাসীরা এ-রাজ্যে খালি হাতে আসিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইতেছে আর সেই সঙ্গে উলটা তালে মধ্য-বিত্ত বাঙ্গালী একেবারে বিত্তহীন হইতেছে। এমনটা হইতেছে কাহার দোষে, সে বিচার না করিয়াও বলা যায়—বিত্ত-বান যাহারা হইতেছে, তাহারা পরিশ্রম এবং প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াই তাহা অর্জন করিতেছে। বিত্তহীন কখনো অনায়াসে বিত্ত লাভ করিতে পারে না।

সরকারী এবং বেসরকারী চাকুরীর প্রতি অত্যধিক লোলুপতাই আমাদের অগ্রগতির পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন চাকরীর বাজার ক্রমশ সংকীর্ণ হইতেছে—ক্রমে আরো হইবে। বিশেষত সরকারী ক্ষেত্রে। সরকারী নীতির ফলে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইবার পথে, কাজেই ঘরে বসিয়া হাহুতাশ না

করিয়া, অনাহারে যদি মরিতেই হয়, তবে শেষ চেষ্টা করিতে দোষ কি ?

বাঙ্গালীর নব অভিযানের পথে দুঃখ বিপদ বাধা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু একবার যদি—অন্তত কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী যুবক নব উদ্যমে কিছু সার্থকতাও অর্জন করিতে পারেন, করিবেন নিশ্চয়, তবে সেই সামান্য সার্থকতা বহু বহু জনকে উৎসাহিত করিয়া নব প্রেরণা দান করিবে। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

নেই কাজ ? খই ভাজ—

প্রায় ক্ষমতাচ্যুত হইয়া, কংগ্রেস এখনও তাহার দেশ এবং জনহিত ব্রত ভুলিতে পারে নাই। দীর্ঘকালের অভ্যাস সহজে ভুলাও যায় না। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের একছত্র দেশশাসনের ফলে, বলা বাহুল্য, ভারত আজ প্রায় উন্নতির গৌরী-শৃঙ্গের কাছাকাছি উঠিতে সক্ষম হইয়াছে! ভারতের ৮।৯ টি রাজ্যে এখন কংগ্রেস শয্যাশায়ী, শাসন বিষয়ে কংগ্রেসের কোন ক্ষমতাই আর নাই, ভবিষ্যতে যে আর কোন দিন হইবে, তাহার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তাহা সত্বেও কংগ্রেসী পার্লামেণ্টারী কমিটি কিছুদিন পূর্ব্বে ঘটা করিয়া হস্তিনাপুরে মিটিং করিলেন এবং দেশের বেসরকারী আওতায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠান "জাতীয়করণ" করিবার প্রস্তাবও পাশ করিলেন। ইহার মধ্যে—প্রথম লক্ষ্য হইয়াছে জেনারেল ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়। দ্বিতীয় লক্ষ্যও স্থির হইয়া গেছে—ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ। তৃতীয় লক্ষ্য হইবে নিশ্চয়ই বড় বড় বেসরকারী কলকারখানাগুলি!

দেশে যখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব, বহু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ এবং ব্যবসাবাণিজ্য, বিশেষ করিয়া, রপ্তানী—প্রায় অচল হইয়া আছে, দেশের সর্ব্বত্র শ্রমিক আন্দোলন, মূল্যবৃদ্ধির কড়াপাকে জনপ্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, এবং আরো বহু প্রকার কঠিন সমস্যার পেষণে দেশ সর্ব্বনাশের দিকে অতি দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, ঠিক সেই শুভ সময়েই কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি জেনারেল ইন্সিওরেন্স তথা অন্যান্য নানা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বিপর্য্যয় ঘটাইবার প্রচেষ্টায় মসগুল।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে কংগ্রেসী অবাস্তব আদর্শ বাস্তবে কার্য্যকর করিতে গিয়া, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক বিষয়ে, দেশের কল্যাণ না করিয়া অশুভই কংগ্রেসী কর্ত্তারা করিয়াছেন। অবাস্তব আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়া—কংগ্রেসী প্রশাসকদের গুষ্টি যে বিষম প্রহার লাভ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের কোন চেতনা হয় নাই দেখা যাইতেছে।

এবার জেনারেল ইন্সিওরেন্সের কথাই বলা যাক।—

১৯৬০ সালে ডেপুটি অর্থমন্ত্রী মিঃ বি আর ভগৎ জেনারেল ইন্সিওরেন্স জাতীয়করণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। মিঃ ভগৎ বলেন—

If you look to the merits of the case, ...various factors involved in it, if you have a realistic approach and not proceed in some undue enthesiasm, I feel that the case for nationalisation of general insurance is not a very strong one—

শ্রী সি ডি দেশমুখ যখন অর্থমন্ত্রী (কেন্দ্রীয়) ছিলেন সেইসময় তিনিও জেনারেল ইন্সিওরেন্স জাতীয়করণের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করেন।

কিন্তু আজ এমন কি ঘটিল যাহার কারণে ৭৷৮ পূর্ব্বে যাহা হইবে না স্থির হইয়া যায়—তাহাই আবার করিবার এমন বিষম প্রয়োজন অনুভূত হইল, অর্থনৈতিক বিষয়ে গজপণ্ডিত কয়েকজন কংগ্রেসী এম পি'র বিচার বুদ্ধিতে?

বাঙলা দেশের স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত আছে বলিয়া আজ এই বিষয়ে কিছু বলিতে হইতেছে বাধ্য হইয়াই।

জেনারেল ইন্সিওরেন্স জাতীয়করণের দ্বারা সরকারের কোন্ দিক দিয়া কি লাভ হইবে এবং সেই সঙ্গে ইহার উন্নতি বিধান সরকার বাহাদুর কি কতখানি করিতে পারিবেন, সে বিষয় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিশেষ করিয়া দেশের পাবলিক্ সেকটারের ব্যবসা বাণিজ্য কলকারখানা প্রভৃতির বর্ত্তমান নিরাশাজনক অবস্থা দেখিয়া। জেনারেল ইন্সিওরেন্স প্রাইভেট সেকটারের একচেটিয়া কারবার নহে, সরকার ইহার শতকরা অন্তত ২০ ভাগ কাজ চালাইতেছেন, তাহা ছাড়া জেনারেল ইনসিওরেন্সের প্রায় সকল কার্য্যই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

১৯৬৬ সালে জেনারেল ইন্সিওরেন্সের মোট প্রিমিয়াম আদায় হয় ৭১ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ১৫ কোটি টাকা সরকারের খাস জেনারেল ইন্সিওরেন্স হইতে আদায় হয়। বাকি ৬০ কোটি টাকার মধ্যে ১৮ কোটি টাকা বিদেশী জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলির আদায়। বিদেশী কোম্পানীগুলির জেনারেল ইন্সিওরেন্স অংশ শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র—এই অজুহাতে নিশ্চয়ই এই ব্যবসায়কে হঠাৎ জাতীয়করণ করিবার প্রকৃষ্ট কারণরূপে খাড়া করা যায় না। বিদেশী কোম্পানীগুলির এই ব্যবসায়ে মোট আদায় যাহা হয়, তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ সরকারকে ট্যাক্স হিসাবে দিতে হয়। ইহার পর তাহাদের নিট লভ্যাংশ থাকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মত।

দেশীয় জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির পলিসিহোল্ডারদের দাবী এবং পরিচালনা খরচাদি মিটাইয়া প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত নিট লাভ থাকে। দেশীয় কোম্পানীগুলির এই কারবারে লগ্নী ২৩ কোটি টাকা এবং এই হিসাবে লাভের পরিমাণ এমন কিছু লোভনীয় বা সাংঘাতিক নহে, যাহার জন্য সরকার হঠাৎ এত লালায়িত হইতে পারেন। জেনারেল ইন্সিওরেন্সে লিপ্ত সব কয়টি কোম্পানী সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে তাহার দায় দায়িত্ব কি প্রকার হইবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। আর একটি বিষয় বলা দরকার। জেনারেল ইন্সিওরেন্সের পলিসিগুলির মেয়াদ মাত্র এক বৎসর। পলিসি হোল্ডার এক কোম্পানীর সার্ভিসে সন্তুষ্ট না হইলে পরের বৎসর অন্য কোম্পানীর পলিসি লইতে পারেন, কিন্তু জাতীয়করণ হইলে—সার্ভিস যত খারাপই হউক, পলিসি হোল্ডারদের পক্ষে গত্যন্তর থাকিবে না। পলিসি ক্রেতাদের পক্ষে ইহা হইবে এক দুঃসহ সমস্যা, যাহা সহ্য করা ছাড়া পথ থাকিবে না।

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিই কি দেশের সর্ব্ব প্রকার শাসন ব্যবস্থা এখনও নিয়ন্ত্রণ করিবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। পার্লামেণ্টে মাত্র ৩০।৩২টি ভোট এখনও বেশী আছে বলিয়া কংগ্রেসী কর্ত্তারা মনে করিতেছেন তাঁহারা ভারতের প্রশাসনিক ম্যানেজিং এজেন্সীর চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করিয়াছেন? আনাড়ী অনভিজ্ঞের দল যখন মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং যে সব ব্যাপারে ব্যাপারী তাহারা হইতে পারে না যোগ্যতার অভাবে, সে ব্যাপারে তাহারা মাথা গলাইবার অবকাশ পাইলে—দেশে সর্ব্বনাশ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। দীর্ঘ বি বৎসর ধরিয়া যাহারা দেশের চরম অর্থনৈতিক বিপর্য ঘটাইয়াছে তাহাদের ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে চিরতরে বিতাড়িত করা কর্ত্তব্য। জোড়া বলদের কাজ এখ মাঠে লাঙ্গল টানা। ২০ বৎসর ধরিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ লোকে অভুক্ত রাখিয়া যাহারা কেবল নিজেরাই স্ফীতোদর হ নাই, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদেরও সযত্নে পালন করিয়াছে এবার তাহাদের ঋণ পরিশোধের পালা।

ডি-ভ্যালুয়েশনের 'বাৎসরিকী'—

বিগত ৬ই জুন ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাসের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। খ্যাতনামা আইনজীবি শ্রীশচীন চৌধু অর্থমন্ত্রীর (কেন্দ্রীয়) পদ গ্রহণ করিবার পর গত বৎসর ৫ জুন ভারতীয় টাকার মূল্য কমানোর কথা মহা রা বেতারে ঘোষণা করেন। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর ইহা ভারতের অর্থনৈতিক এবং ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী উন্নতি হইবে সে বিষয়ে, কেবল অর্থম নহেন, অন্যান্য দু-চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আমাদের ও অদ্বিতীয়—বর্ত্তমানে কিঞ্চিত স্তিমিত—শ্রীঅতুল্য ঘো মহাশয়ও —ডি-ভ্যালুয়েশনের গুনবর্ণনায় দশ নহে, শত মু হইয়া উঠেন। এমন কি শ্রীঅতুল্য তাঁহার অধীন কংগ্রে পদাতিক বাহিনীকে গ্রামে গ্রামে, লোকের ঘরে ঘ গিয়া ডি ভ্যালুয়েশনের স্বর্গীয় মহিমা প্রচার এবং মূ জনগণকে বুঝাইবার অভিযানে বাহির হইবার আদে দান করেন।

এখন একবার দেখিতে দোষ কি—গত এক বৎসর দেশের অর্থ-নৈতিক এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কত কতখানি উন্নত হইয়াছে—কিংবা ক্ল্যাট-অল কিছু হইয়া কি না। এক কথায় এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়—মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে সর্ব্বভাবে এবং সর্ব্বদিকেই দেশের অ নৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে এবং অচিরে হয়ত চ বিপর্যয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

মুদ্রামূল্যহ্রাসের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী যে

আশার কথা বলেন কার্যত সেগুলি সবই ব্যর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে সত্য হইয়াছে এবিষয়ে সমালোচকদের আশঙ্কা—ভয়।

বলা হয় মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ হইবে, শিল্পের উন্নতি হইবে, প্রসার ঘটিবে রফ্তানি বাণিজ্যের। অথচ আজ এই মূহূর্ত্তে দেশের অর্থনীতি গুরুতর সঙ্কটের মুখোমুখি।

রাজনীতির দিক হইতেও ইহার প্রতিক্রিয়া সামান্য নয়। বোধ হয় এই একটি কারণের জন্যই কংগ্রেস আজ মারাত্মকভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িল।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ হয় নাই। আভ্যন্তরীণ বাজারেও টাকার সঠিক মূল্যের অতিমন্দাভাব। আন্ত-র্জাতিক বাজারেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই ঘটিয়াছে।

সরকারি হিসাবমত মুদ্রামূল্যহ্রাসের সময় মূল্যের সূচক সংখ্যা ছিল ১৮৪'৩ আর গত ১৩ মে তারিখ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে দেখা যায় মূল্যের সূচক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২০৮'১। খাদ্য শস্যের দাম বাড়িয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি।

মুদ্রামূল্যহ্রাসের পর রফ্তানি বাণিজ্যের খুবই হ্রাস পায়। পরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিলেও লক্ষ্য হইতে এখনও অনেক নিচে আছে। মূল্যহ্রাসের সময় আমরা যে পরিমাণ রফ্তানি করি পরে তাহার সামান্যই বাজারে বিক্রি করিতে পারিয়াছি। আয় প্রভূত কমিয়াছে।

গত বছরের জুন মাসে বলা হয় আমদানি বাণিজ্যের উপর কড়াকড়ি হ্রাস করায় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানী করা সুগম হইবে এবং ইহার ফল ১৯৬৬ সালের শেষ নাগাদ বিদেশে রফ্তানিযোগ্য মাল উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা হয় নাই। এখন অবস্থাটা এমন যে আমাদের প্রধান বাণিজ্য পাট-জাত দ্রব্য এবং চা-এর রফ্তানির পরিমাণও হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী বলেন, মুদ্রামূল্যহ্রাস করার প্রয়োজন ছিল। তাহা না হইলে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে যে সব বিদেশী সাহায্য আসিবার কথা, তাহা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এইধরণের সাহায্য একেবারে বন্ধ হয় নাই। কিন্তু সাহায্য যে ভাবে আসিতেছে এবং সাহায্যের পরিমাণ যে প্রকার তাহাতে অবস্থাটা এই হইয়াছে যে আমাদের চতুর্থ যোজনার চূড়ান্তরূপ আমরা এখনও দিতে পারি নাই। ইহা অপেক্ষা ট্র্যাজিক আর কি হইতে পারে যে, ১৯৬৭-৬৮ সালের অর্থ-নৈতিক বছর তিন মাস পার হইয়া গেল অথচ বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দের পরিকল্পনা আজও সম্পূর্ণ করা হয় নাই।

সাধারণ মানুষের অবস্থা বিশেষ করিয়া বিত্তহীন মধ্য-বিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সমাজের বাঙ্গালী হয়ত এবার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহা নির্ব্বাণের পথে যাত্রা করিতে বাধ্য হইবে।

মাত্র বিশ বৎসরেই অন্য কোন দেশে কোন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক পার্টি—এমন করিয়া, এমন অনায়াসে কেবল ফাঁকা নীতবাণী, হিতোপদেশ এবং অসার প্রতিশ্রুতির ফাঁকা আওয়াজে একটা বড় দেশকে, এবং দেশের প্রায় ৫০ কোটি নরনারীকে এমন ভাবে—দুর্নীতি, দুঃখদুর্দ্দশা এবং অসহনীয় দৈনন্দিন জ্বালা যন্ত্রণার স্রোতে নিক্ষেপ করিতে ইতি পূর্ব্বে আর কোথাও এমন সার্থক হয় নাই।

সামান্য পিপীলিকাও আহত আক্রান্ত হইলে মরিবার পূর্ব্বে একটা কামড় অন্তত দিতে প্রয়াস পায়। আমরা আজ জাতি হিসাবে আজ জীবিত না মৃত?

মোরারজীর প্রতিশ্রুতি—

এবারের বাজেট পেশ করিবার পূর্ব্বে অর্থমন্ত্রী 'প্রোহিবিশন হিরো' শ্রীমোরারজী বলেন যে এমন ভাবে এমন বাজেট তিনি প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ত পাইবেই না, অধিকন্তু কমতির দিকেই যাইবে। অর্থ-মন্ত্রীর পবিত্র প্রতিশ্রুতি যে কি ভীষণ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে তাহা এবারের বাজেট এবং নূতন করের বহর দেখিয়া আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিলাস দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি করিলে আমাদের কিছু বলিবার থাকত না, কিন্তু এমন কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপর জনদরদী মোরারজী করের বোঝা বাড়াইলেন, যাহার ফলে একান্ত দরিদ্র ব্যক্তিও সবিশেষ আক্রান্ত হইতে বাধ্য। বস্ত্রের উপর মাত্র দু-চার মাসে কর বাড়ানো হইল, সেই বস্ত্রের (দরিদ্রজনের ব্যবহার্য) উপর আরো এবং আবার কর বৃদ্ধি করা হইল।

জুতাও বাদ যায় নাই। চা-কফি, সিগারেট সবই অর্থ-মন্ত্রীর করাঘাতে আহত হইয়াছে। চা-কফির উপর কর বৃদ্ধির যুক্তি অপূর্ব্ব। বিদেশে চায়ের রফতানী বৃদ্ধির কারণে চায়ের উপর রফতানী শুল্ক হ্রাস করা প্রয়োজন এবং এই বাবদে যে টাকাটা লোকসান হইবে সেই টাকাটা দেশের লোকের মাথায় গাঁট্টা মারিয়া আদায় না করিলে চলিবে কেন? দেশে চা এর দাম বাড়িলে অনেক চা-পায়ী বদঅভ্যাস ত্যাগ করিবে, এবং ইহাতে যে চা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা বিদেশে চালান করিয়া কেন্দ্রীয় প্রভুদের বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনের কিছু সুবিধা বাড়িবে। খুবই যুক্তিযুক্ত কথা! কিন্তু শতকরা ৯০টি চা-বাগানের মালিক আজ যাঁহারা, তাঁহারা সর্ব্বব্যাপারে স্বধর্ম পালনে সদা তৎপর এবং নিষ্ঠাবান। ভেজাল যাঁহাদের ব্যবসায় নীতির প্রধান সহায়, সেই তাঁহারা চা-পাট এবং অন্যান্য প্রায় সর্ব্বপ্রকার রফতানী-যোগ্য সামগ্রী, ভেজাল সমৃদ্ধ করিয়া অবস্থা এমনি করিয়া তুলিয়াছেন যে—বিদেশে ভারতীয় চা, পাট প্রভৃতির কাটতি ক্রমেই নিম্নমুখী হইতেছে। পণ্যের মানও যথাযথ না থাকাতে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত বহু কোটি টাকার ইস্পাতের রেল-লাইনের অর্ডারও বাতিল হইয়াছে। আর কত দৃষ্টান্ত দিব?

সর্ব্ববিধ প্রশাসনিক বেকুফীর ফল ভোগ করিতে হয় করদাতাকেই। ভারতে মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ সরকারী করনীতি। দিনের পর দিন উৎপাদন শুল্ক যে ভাবে এবং যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে প্রায় প্রতিটি সামগ্রীর মূল্য ক্রমাগত ঊর্দ্ধমুখী হইতে হইতে আজ এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যাহা মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। বস্ত্র মূল্য ক্রমাগত চড়িতে থাকায় এবং উৎপাদন কমিবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনের ক্রয়-ক্ষমতাও ক্ষীয়মাণ হইয়াছে। এবারের বাজেটে লোকে আশা করিয়াছিল যে অর্থমন্ত্রী হয়ত বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের কিছু সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আমাদের আশা যে কী ভাবে আহত হইয়াছে—তাহা বলার প্রয়োজন নাই।

রফতানীযোগ্য ভারতের পণ্যদ্রব্যের দাম বেশী বলিয়া গত বৎসর টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়। কিন্তু ভারতীয় পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য ঐসব পণ্যদ্রব্যের উপর হইতে আবগারী শুল্ক কমানো হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরেও মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস করার জন্য সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ এবং উন্নয়ন ভিন্ন অন্য ব্যাপারে ব্যয় সীমিত রাখার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটেই নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ ও শিল্পজাত দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর বসাইয়া যে মূল্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা কোন ঘাটতি বাজেটেও হইত কিনা সন্দেহ। তাহা ছাড়া খরাত্রাণ ও দুর্গত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে টাকা ব্যয় করিতেছেন, তাহা কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ধারাকেই শক্তিশালী করিতেছে।

বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে ভারতীয় অর্থনীতিকে উদ্ধার করিতে হইলে এক দিকে দ্রুত কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বাড়ানো দরকার এবং অপর দিকে রফতানির পরিমাণও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কারণ রফতানি মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে না পারিলে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং ভারতীয় শিল্পসমূহ চালু রাখা যাইবে না। কৃষির উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্প ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাসের কথা বলা হইয়াছে। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় কাঁচা-মাল ও যন্ত্রাংশ আনিলে শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের ফলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিন্তু তাহাতেও ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় হইবে না। আভ্যন্তরীণ মূল্য বেশী রাখিয়া রফতানির ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করিয়া রফতানি বাড়ানোর চেষ্টা হইয়াছে ঠিকই কিন্তু তাহাতে কোন লাভ হয় নাই বরং দুর্নীতি ও চোরাচালানদের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অন্যদিকে করভার বৃদ্ধির সঙ্গে রেলের ভাড়া এবং মালের মাশুল দুইটিই আবার বৃদ্ধি করা হইল।

১৯৫২ হইতে ১৯৬৫ সালের মধ্যে দেশে রেল এবং মাশুল (মালের) ৭ বার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যাত্রীদের উপকার এবং সুখ সুবিধার জন্যই নাকি রেল ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। ঘন ঘন রেল দুর্ঘটনায় শত শত যাত্রীর অকালে স্বর্গলাভ করা ছাড়া (ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয় নাই অবশ্যই স্বীকার করিব) আর কি উপকার বা সুখ সুবিধা লোকে পাইয়াছে জানি না।

এবার আবার রেল ভাড়া এবং মাশুল বৃদ্ধির ফলে

দ্রব্যমূল্য আরো বৃদ্ধি পাইয়া জন-জীবনকে আরো বহুগুণ অসহনীয় করিবে সন্দেহ নাই।

বাজেটে করবৃদ্ধি যদি কেবল কেন্দ্রীয় কোষাগারে ধনবৃদ্ধি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য এবং কাম্য হয় বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহারা কর দিবে, তাহাদের দিবার ক্ষমতা কতটুকু তাহার বিচার কে করিবে? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে মাসিক ৬।৭ শত টাকা যাহারা চাকুরী দ্বারা আয় করে, তাহাদের দৈনন্দিন সংসার খরচা চালাইতেই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়—কিন্তু এই সীমিত আয় মধ্যবিত্তদেরও আয়কর হইতে রেহাই পাই—৩৫০ টাকার বেশী (মাসিক) আয় হইলেই আয়করের বেড়াজালে পড়িতে হইবে।

যাহা আয় করি, সবটাই যদি সরকার গ্রহণ করিয়া—জীবন ধারণের ব্যবস্থা যদি করিয়া দেন, বাধিত হইব।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন কোন্ পথে। (১৩-৬-৬৭)

গত ১২ই জুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে "নকশালবাড়িতে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে"—ব্যাপকভাবে লুট, ডাকাতি খুনের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে—এইসব ব্যাপার দেখিয়াও তিনি পুলিসকে তফাতে থাকিতে নির্দ্দেশ দিলেন কেন, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা বুঝা অসম্ভব। এই নির্দ্দেশের অন্তরালে কোন মহৎ প্রশাসনিক ট্যাকটিক্যাল চাল বা উদ্দেশ্য নিহিত আছে আমাদের পক্ষে বলা বা বুঝা সম্ভব নয়। এই অঞ্চলে হাঙ্গামাকারীরা, শুনা যাইতেছে, সি, পি, আই (এম-লেফ্‌ট) নেতাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্ররোচিত এবং পরিচালিত হইতেছে। সরকারী মহলেও এ অভিযোগ স্বীকৃত এবং সমর্থিত। দেশের বর্ত্তমান আইনে অরাজকতা এবং সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের গ্রেপ্তার এবং যথাবিহিত বিচার ও শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু হাঙ্গামা দমন করিবার সকল ক্ষমতা এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী হাঙ্গামা দমনের ব্যবস্থা না করিয়া পুলিসকে হাঙ্গামাস্থল হইতে দূরে থাকিবার ব্যবস্থা কোন বিচারে করিলেন? যে বিশেষ দুইজন কম্যু (অতিবাম) নেতা নকশাল বাড়ীতে সর্ব্বপ্রকার অরাজকতার মূলে, তাহাদের কেন যথা সময়ে গ্রেপ্তার করা হইল না, ইহা অবশ্যই দেশের লোক জানিবার দাবী করিতে পারে। বিশৃঙ্খলকারীরা স্থানীয় লোকেদের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার চালাইবে, নিজেদের মতানুসারে অন্যদের চালাইবে, নিজেদের হুকুম অন্যকে মানিতে বাধ্য করিবে, যখন যেখানে ইচ্ছা যে কোন লোকের গৃহে জোর করিয়া প্রবেশ করিবে, টাকা পয়সা, বন্দুকাদি (লাইসেন্স করা) কাড়িয়া লইবে, এবং যেমন ইচ্ছা সেইমত যে-কোন অত্যাচার চালাইবে সাধারণ লোকের উপরে—অথচ একান্ত প্রয়োজন এবং কাতর আবেদন সত্ত্বেও পুলিস অত্যাচারিতদের রক্ষা এবং সাহায্যার্থে যাইতে পারিবে না, ইহাকেও সরকারী জুলুম ছাড়া আর কি বলা যায়?

আঞ্চলিক কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস-কর্ত্তাদের রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও রাইটার্স ভবনের কর্তা-মহল মনে হয় নির্ব্বিকার! ছয় জন মন্ত্রী নকশাল বাড়ীতে গিয়াছেন হাঙ্গামা সুরু হইবার কয়েকদিন পরে, তাঁহারা স্বচক্ষে অবস্থা দেখিয়া মতামত দিলে, তাহার পর ঐ স্থান সম্পর্কে বিচার বিবেচনা হয়ত করা হইবে। ইহা যতদিন না হয়, হাঙ্গামা চলিতে থাকুক, নিরীহ মানুষের প্রাণহানি হউক, শত শত লোকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হউক, কর্ত্তামহলের কিছু আসে যায় না।

সকল স্থানে সর্ব্বপ্রকার হাঙ্গামা দমনের ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা স্থির করিতে মন্ত্রী মহাশয়দের সবকাজ ফেলিয়া যদি ছুটিতে হয়, তাহাহইলে কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপার-প্রভৃতি পদগুলি বাতিল করিয়া দিলে ক্ষতি কি? ইহা বাতিল করিলে অসহায় করদাতাদের বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইবে। ঐ সব পদ বিলুপ্ত করিয়া এক একটি অঞ্চলে সংযুক্ত দলগুলির এক একটি দলের মোড়লদের উপর প্রশাসনের সকল ভার অর্পণ করা যাইতে পারে। বিশেষ করিয়া যখন দেখা যাইতেছে যে বিশেষ কয়েকটি দলের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রী দেশ এবং দেশের মানুষের কল্যাণস্বার্থ না দেখিয়া দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াসই সবিশেষ করিতেছেন। ইঁহাদের মূল মন্ত্র

—"সবার উপরে পার্টি সত্য
তাহার উপর নাই।"

কয়েকদিন পূর্ব্বের খবরে প্রকাশ মন্ত্রীমহাশয়গণ উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়া বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নাই - এমন কি হাঙ্গামা লুটতরাজ আরো ব্যাপক হইয়াছে। সংযুক্ত

দলীয় সরকারের উপর লোকে খুবই আশা রাখে কিন্তু কিছু লোকের মন এই সরকারের উপর এখন ক্রমশ বিরূপ হইতেছে—এই অবস্থায় হইতে বাধ্য।

আজ কেবল নকশালবাড়ীতেই নহে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র বিবিধপ্রকার হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। উগ্র-লাল মার্কা একটি রাজনৈতিক দলের উস্‌কানী এবং প্ররোচনার ফলে দু-চারিটা খুনও হইতেছে, লুটপাটের সংখ্যা যে কত তাহার হিসাব নাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়া সত্ত্বেও উপ-মুখ্য মন্ত্রী শ্রীজ্যোতিবসুর বলিতে কোন দ্বিধা হইল না যে পশ্চিমবঙ্গে "ল অ্যাণ্ড অর্ডার" একেবারে 'নর্মাল'। এ-রাজ্যের বর্তমান এই অবস্থা যদি "নর্ম্যাল" হয়, তবে কি হইলে অবস্থা 'অ্যাব্‌নর্ম্যাল' অর্থাৎ অস্বাভাবিক বলিয়া গৃহীত হইবে, আমাদের মত অপ্রখর ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। অবশ্য জ্যোতিবাবু যে-দলের একজন প্রধান ব্যক্তি, সেই দলের মতে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ী, ক্যানিং, আসানসোল এবং অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিতে থাকিবে, সে-সব এমন কিছু আঁতকাইবার মত নহে! এখন ত কেবলমাত্র 'প্রস্তুতি পর্ব' চলিতেছে। সুবিধা ও সুযোগমত যখন সমস্ত দেশ রক্তে এবং আগুনে লাল হইয়া উঠিবে, তখনই আমরা (যদি কপালদোষে বাঁচিয়া থাকি) প্রকৃত গণ-অভ্যুত্থান তথা গণ-জাগরণের মধুর আস্বাদ তথা জীবন্তচিত্র দেখিতে পাইব! সংযুক্ত দলের—একটি ছাড়া অন্যান্য সরিকরাও আগামী মহোৎসব হইতে বাদ যাইবেন না।

সব কিছুর মধ্যে আশার কথা (১৪-৬-৬)

নকশালবাড়ী এবং অন্যান্য অঞ্চলে সি পি আই (এম-ঘোরতর লাল)—দলীয় নেতাদের প্ররোচনায় যে সকল অন্যায় অত্যাচার চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সাধারণজন মাথা তুলিয়া দাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই কয়েক স্থানে পাল্টা প্রহারের ব্যবস্থা করিয়াছে। নিরাশার মধ্যে ইহা একটা আশার কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সামান্য সংখ্যক মানুষ যখন সংখ্যা গরিষ্ঠদের জোর করিয়া তাহাদের মতে এবং রাজ-নৈতিক পথে চলিতে বাধ্য করিবার প্রয়াস করে, সেই ক্ষেত্রে মানুষকে বাঁচিতে হইলে এবং নিজ নিজ ধ্যান-ধারণামত জীবন যাপন করিতে হইলে প্রয়োজন মত পাল্টা বলপ্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর নাই। বাঙ্গলা দেশে এখন ইহা বিশেষ প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের "অরাজকতার" হেতু কি?

আমাদের মুখ্য মন্ত্রীর মতে এ-রাজ্যে বর্তমানে যে সমস্ত হৈ হল্লা এবং হাঙ্গামাদি চলিতেছে—তাহার প্রধান কারণ খাদ্যাভাব। কথাটা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণও নহে। দেশে খাদ্যাভাব ভয়াবহ এবং ইহার সুযোগ লইয়া যে বিশেষ দল এবং ঐ দলের বিশেষ কয়েকজন উগ্র-লাল নেতা সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদের অনাবশ্যক সংঘর্ষের মুখে ঠেলিয়া দিয়া নিজেরা পিছনে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, তাহার দ্বারা খাদ্য সমস্যার সামান্যতম সুরাহা না হইয়া সমস্যা আরো তীব্র এবং জটিলতর করা হইতেছে। এই বে-আইনী কার্য্যকলাপ এবং রাজনৈতিক দুষ্টনীতির দ্বারা বিশেষ একটি পার্টি তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অপ-প্রয়াস করিতেছে—চীনা রেড্‌গার্ডদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে—ভারতে কেবল কেরল এবং সামান্য পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া, অন্যান্য প্রায় সকল রাজ্যেই এই বিশেষ অতি-উগ্র লাল রাজনৈতিক পার্টি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে আধিপত্য স্থাপন করিয়া কি এই পার্টি সমগ্র ভারতে তাহাদের "রাজত্ব" চালাইবে মনে করিয়াছে? দুষ্ট এবং বিকৃতবুদ্ধি না হইলে এমন কথা এই পার্টির বিশেষ কয়েকজন নেতার মাথায় উদিত হইত না। আশার কথা এই পার্টির মধ্যে এখনও কয়েকজন সুস্থ এবং অবিকৃত বুদ্ধি নেতাও আছেন যাঁহারা ভিতরে বসিয়া পার্টিকে সংযত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে "খাদ্যাভাবের পটভূমিকায় জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি (এবং বৃদ্ধির) জন্য কোন কোন দল চেষ্টা করছে" এবং এই প্রচেষ্টায় এই পার্টির সঙ্গে বহু সমাজবিরোধী স্বভাবদুষ্ট লোকও যোগদান করিয়া নানা প্রকার হাঙ্গামা, লুটপাট

প্রভৃতি কার্য্য মনের আনন্দে চালাইয়া যাইতেছে। মন্ত্রীর আদেশ না লইয়া পুলিস হাঙ্গামা দমনে যাইবে না— এই হুকুম থাকায় সমাজ-বিরোধীদের স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত অন্ততঃ এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে।

রাজ্যের মন্ত্রীবিশেষের বিচার বিবেচনায় খাদ্য আন্দোলনও হয়ত একটা শ্রমিক আন্দোলন, কারণ আন্দোলন, হৈ-হল্লা করিতে হইলে আন্দোলনকারীদেরও নিশ্চয় 'শ্রম' করিতে হয় এবং এই বিচারে যে কেহ আন্দোলনে যোগ দিবে সেই হইতে 'শ্রমিক'—এমন কি একান্ত অ-শ্রমিক ব্যক্তিও!

মুখ্যমন্ত্রী যদি নিশ্চিত হইয়া থাকেন যে পার্টি-বিশেষ এবং সেই পার্টি-ভক্তরা খাদ্য আন্দোলনের অবকাশে সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করিতেছে কিংবা করিবার দুষ্ট প্রমাণ পাইতেছে, তাহা হইলে তিনি এ-বিষয়ে কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন না? ইহার একমাত্র কারণ হইতে পারে এই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চৌদ্দ ঘোড়ার মন্ত্রী-যান কঠিন হস্তে চালাইবার ক্ষমতা কিংবা সাহস রাখেন না। চৌদ্দ-ঘোড়ার গাড়ী ঠিকমত চালাইতে হইলে সারথীকে প্রয়োজনমত দুষ্ট ঘোড়াগুলির পৃষ্ঠদেশে প্রয়োজনমত মৃদু অথবা কঠিন ভাবে অবশ্যই চাবুক চালাইতে হইবে। বিশেষ কোন ঘোড়াকে যদি একেবারেই 'ব্রেক্' করা না যায়, সেই ঘোড়াটিকে অবশ্যই বাতিল করিতে হইবে। মুখ্যমন্ত্রী শক্ত হউন।

'ঘেরাও'-এর বিষময় ফল

পশ্চিমবঙ্গে ছোট, মাঝারি এবং বৃহৎ প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানই আজ 'ঘেরাও'-এর ফলে, বিশেষ করিয়া ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলি, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। আতঙ্কিত ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির পক্ষ হইতে কয়েকদিন পূর্ব্বে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক আবেদন করা হইয়াছে। আবেদনে বলা হইয়াছে—

ঘেরাও ও অন্যান্য প্রকার শ্রমিক অশান্তিতে ছোট ও মাঝারি শিল্প বিপর্যস্ত। অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে, এই রাজ্যের ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থায় উৎপাদন নিদারুণভাবে ব্যাহত হইবে।

ছোট ও মাঝারি শিল্প ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে স্মারকলিপিতে আরো বলিয়াছেন—ঘেরাও ও অনুরূপ শ্রমিক অশান্তির ফলে উৎপাদন কিভাবে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যাহত হইতেছে। পরিচালক কর্তৃপক্ষ কিভাবে নাস্তানাবুদ এবং নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত হইতেছেন, তাহা বিস্তৃতভাবে স্মারক-লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফেডারেশন দুঃখ করিয়া বলেন, 'তবুও রাজ্য সরকার ঘেরাওকে বে-আইনী ঘোষণা করেন নি। উপরন্তু মন্ত্রীরা বলেন, ঘেরাও কিছুদূর পর্যন্ত "আইন সম্মত"!'

ফেডারেশনের মতে, ছোট ও মাঝারি শিল্পে ছাঁটাই ও লে-অফ শ্রমিক অশান্তির কারণ নয়। কেন্দ্রীয় বেতন বোর্ড অথবা সপ্তম শিল্প ট্রাইব্যুনালের রায় কার্যকর না করার জন্যই এবং অন্যান্য "তুচ্ছ কারণে" প্রধানত ঘেরাও চলিতেছে। তাহা ছাড়া, ঐসব রায় কার্যকর করার আর্থিক সঙ্গতি এই রাজ্যের ছোট ও মাঝারি শিল্পের নাই। এ-সত্ত্বেও যদি ঐসব রায় কার্যকর করিতে ইঁহাদের উপর চাপ দেওয়া হয়, অন্যান্য রাজ্যের ছোট শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বাঙ্গলার ছোট শিল্পের পক্ষে দুষ্কর হইবে। এমন কি এ-রাজ্যের ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলি হয়ত অতি শীঘ্র দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে।

এমনই যদি ঘটে, তবে সেই অবস্থায় কি এবং কাহাকে 'ঘেরাও' করিয়া প্ররোচিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কার্য্যোদ্ধার করিবেন? আমরা সাক্ষাতভাবে জানি—এ-রাজ্যে এমন বহু শিল্প আছে, যাহা বর্ত্তমান অবস্থায় কোন রকমে "র‍্যাশন ডায়েটে" অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। আর সামান্য মাত্র চাপ পড়িলেই এই সব শিল্প ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং বেশ দু-চার লক্ষ শ্রমিকও বেকার হইবে। শ্রমিক দরদীরা এই দিকটা একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন, যদি অবকাশ হয়।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের বর্ত্তমান 'ঘেরাও' নীতি যে ভাবে কার্য্যকর করা হইতেছে—অবিলম্বে তাহার গতি রোধ না হইলে এমন সময় অচিরে এ-রাজ্যে আসিবে যখন—শ্রমিক থাকিবে কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র বলিতে হয়ত কিছুই থাকিবে না। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা যদি সত্যই আসে, তবে সেই সময় যে

সকল শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের উপর 'নির্ভর' করিয়া দিন গুজরান করেন, সেই-সব নেতাদেরও বেকারত্ব কেহই আটকাইতে পারিবে না। সেই অবস্থায় হয়ত কোন পণ্ডিত শ্রমমন্ত্রী বেকার ইউনিয়ন লিডারদের জন্য নবতর কিছু একটা ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে এই সকল পরশ্রমনির্ভর নেতারা উপায়হীন না হইয়া পড়েন।

আমরা বার বার বলিয়াছি—শ্রমিকদের প্রতি অবশ্যই সুবিচার করিতে হইবে, তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে কোন প্রকারেই বঞ্চিত করা চলিবে না। কিন্তু শ্রমিকদের এই প্রাপ্য নির্ভর করিবে শিল্প সংস্থার আয়ের উপর। জোর করিয়া আদায় দু-একবার চলিতে পারে কিন্তু বার বার কখনই না। জোর করিয়া আদায় করিবার প্রচেষ্টার ফলে কলিকাতা হইতে কিছুকাল পূর্ব্বে দুই তিনটি বড় শিল্প সংস্থা অন্য রাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে, ফলে কয়েক হাজার বাঙালী শ্রমিক এবং কর্ম্মচারী বেকার হইয়াছে। এখন আবার শুনা যাইতেছে, অন্য কয়েকটি—সংস্থা—(দেশী এবং বিদেশী)—কলিকাতায় কাজকারবার চালাইতে খুব উৎসাহ বোধ করিতেছে না, ইহার প্রধানতম কারণ "ঘেরাও" এবং সরকারের অপূর্ব্ব একতরফা শ্রমনীতি।

ভারতের অন্যান্য রাজ্য এই সুযোগে শিল্প প্রসার করিতেছে এবং যাহার ফলে ঐ সব রাজ্যে বেকারত্ব বিশেষভাবে বিদূরীত হইতেছে—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ঠিক উল্টা। একটা কথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না—অবাঙ্গালী শ্রমিক অনায়াসে অন্য রাজ্যে কর্ম্ম সংস্থান করিয়া লইতে পারে কিন্তু বাঙালী শ্রমিকের এ-রাজ্য ছাড়া অন্য আশ্রয় নাই—নগণ্য দুচার-জন ব্যতিক্রম থাকিতে পারে।

কিন্তু এ-রাজ্যের শ্রমিক নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার—বাঙালী শ্রমিকের অসুবিধা হইলেও, অন্যরাজ্য আগত শ্রমিকদের যদি সুবিধা হয় তাহাই কাম্য—এই মনে হয়। শ্রমিকদের কল্যাণ বিচারে প্রাদেশিকতা অবশ্যই চলিবে না!

আমাদের শ্রম-মন্ত্রী ওড়িষ্যায় এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—চাকরী সম্পর্কে রাজ্যবাসীদের দাবী সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য! খুবই ভাল কথা; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে "sons of the soil"দের জন্য এ-দাবী করা চলিবে না কারণ ইহা হইবে পরম প্রাদেশিকতা! এখানে অতিথিদের প্রতি কৃপার আতিশয্য সর্ব্বক্ষেত্রে একমাত্র বেকারী ছাড়া অর্থাৎ নিজ বাসভূমে বাঙ্গালী বেকারীত্বের সংখ্যা গুরু!!

তরুণ ছাত্রের কৃতিত্ব

স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা পুষ্প দেবীর দৌহিত্র সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীমানের মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। এ সংবাদ গতমাসে কালিদাস রায়ের কবিতা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মাতৃ-বিয়োগের পরম শোকের মধ্যেও শ্রীমানের এই সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

October, 1920.

হুমায়ুন বাদশাহের সমাধি দেখে ফিরবার পথে একটা অন্ধ ছেলে অনেকক্ষণ ধরে গাড়ীর পিছনে ছুটল। দুতিন-বার পয়সা দেওয়া সত্ত্বেও সে দেখতে পেল না, চীৎকার করতে করতে কেবলি দৌড়তে লাগল। আমার মনটা ভারি depressed হয়ে গেল।

এরপর চললাম আমরা "পুরানি কিলা" দেখতে। সে এক বিষম ভাঙাচোরা ধ্বংসাবশেষের রাজ্য। চারি-দিকে ঘাটাঝোপের ভীড় অসাধারণ রকম। সামনের গেটখানা এখনও অভগ্ন আছে। তা ছাড়া দেয়াল, ঘর, খিলান, মন্দির, মসজিদ্ সবই ভেঙে ধূলোয় গড়াচ্ছে। গেটের উপরে চিত্রিত দেবমূর্ত্তি দেখলাম মনে হল, অথচ শুনলাম এইখানের ধ্বংসাবশেষটি হুমায়ুনের কেল্লারই ভগ্ন-স্তূপ। অত recent কালের ব্যাপার বলে কিন্তু তাকে মনে হচ্ছিল না। ভিতরে ঢুকলাম। দুটি মসজিদ আর একটা "বাউলি" (সিঁড়িওয়ালা কুয়ো) ছাড়া অন্য জিনিষ আর কিছু দেখলাম না। ভাঙাচোরা দেয়াল দিয়ে ঘেরা, প্রকাণ্ড একটা খালি মাঠ, এই পর্য্যন্ত। এই নাকি আমাদের ক্ষত্রিয় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ। এইখানেই নাকি মহাবীর পৃথ্বীরাজের দুর্গও ছিল। সেকালের মাটিটা রয়েছে বটে, এবং নীলাকাশটাও বদলায়নি, এ ছাড়া আর কিছু সেই পুরাকালের সাক্ষী নেই।

গাইড মহোদয় বললেন যে এখন যেখানে মসজিদ রয়েছে, পুরাকালে নাকি সেখানেই পাণ্ডবদের প্রাসাদ ছিল, মন্দির ছিল, মুসলমানরা এসে সেগুলি ভেঙে ফেলেছে। এ বিষয়ে ওদের কথা ছাড়া আর কিছু প্রমাণ নেই। দুচার জায়গায় ভাঙা সিঁড়ি দেখা গেল, তাই বেয়ে উপরে উঠলাম। এক-আধটা খিলান এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এই ইঁট-কাঠের অরণ্যের মধ্যে কত যুগ-যুগান্ত ধরে কত মানুষ জীবননাট্যের অভিনয় করে গিয়েছে। এই পাথরগুলোর মুখে যদি ভাষা দেওয়া যায় একবার, কত ক্ষত্রিয় বীরের, কত রাজপুতসুন্দরীর কাহিনীই না বলে দেয় তাহলে।

এক জায়গায় একটা ভাঙা দেয়াল ঠিক রাজসিংহাসনের আকৃতি নিয়ে আকাশের গায়ে ঠিক ছবির মত ফুটে রয়েছে। ঐখানে কি যুধিষ্ঠিরের রাজসিংহাসন সত্যই ছিল? প্রচুর পরিমাণে বুনোলতা গজিয়ে উঠে এই বিরাট কঙ্কালকে সৌন্দর্য্যের আবরণে ঢেকে রেখেছে।

একেবারে সন্ধ্যা করে হোটেলে ফিরলাম। ক্লান্তিতে পা চলছিল না। অথচ ঘরে ঢুকেই ইচ্ছা করছিল, দৌড়ে আবার বেরিয়ে যাই। খাওয়া দাওয়া সারা গেল কোনোমতে। আমাদের guide and friend আর একবার দেখা দিলেন। আর কি কি দেখবার মত আছে, তা তাঁর কাছে আর একবার শোনা গেল। দিল্লীর বাঙালী লাইব্রেরীওয়ালারা বাবাকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের লাইব্রেরী দেখতে যেতে। স্থির হল, পরদিন বেড়ান শেষ করে তারপর তাঁদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হবে। রাতটা কোনোমতে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে উঠে দেখি শহরে মহা ধুম লেগেছে। কালীপূজা সংক্রান্ত কোনো উৎসব বোধ হয়। নাচ গানের চোটে রাস্তা গুলজার একেবারে। ভীষণদর্শনা অনেকগুলি নর্ত্তকী বাজনদার সঙ্গে নিয়ে দোকানে দোকানে ঢুকে নেচে বেড়াচ্ছে এবং দক্ষিণা আদায় করছে। যেমন তাদের চেহারা তেমন তাদের গলা। এ রীতিটা ইতি-পূর্বে আগে কোথাও দেখিনি। এটি বিশেষ করে দিল্লীর জিনিষ বোধ হয়।

পরদিন সকালে কাশীলাল গাড়ী নিয়ে আসতে বেজায় দেরি করেছিল। সাজসজ্জা সমাপন করে কতবার যে

ঘর আর বার করলাম তার আর ঠিক ঠিকানা নেই। তাকে খুঁজতেও অনেকবার লোক পাঠান হল, কিন্তু তার আর দর্শনই নেই। কি আর করি, অচেনা জায়গায় রাগ দেখিয়েও লাভ নেই, হতাশভবে রাস্তার নৃত্যগীতের বন্যা উপভোগ করতে লাগলাম। যাক, অবশেষে গাড়ীত এল। তিনটের আগে ফোর্টে ঢুকবার Pass পাওয়া যায় না, কাজেই ততক্ষণ অন্যসব দেখে বেড়াবার প্রস্তাব হল। গাড়ী চলল। প্রথমে যেদিক্ দিয়ে চললাম, সেটা নিতান্তই আধুনিক দিল্লী, আমাদের শাসকবর্গের কীর্ত্তিতে ভরা। এই দিক্‌টা দিল্লীর Ridge। সেই সীমাহীন প্রান্তরের ভাব আর নেই, এটা পাহাড়ে জায়গার মত, ঝোপঝাপ জঙ্গলে ভর্তি। পঞ্চম জর্জের আগমনে ধন্য অনেক পথ ঘাট দেখা গেল। তখন Duke of Connaught-এর আগমনের আশায় মহা আয়োজন চলছে, তারও কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল।

দিল্লী-বিজয়ী General Nicholson-এর বিজয় স্তম্ভ দেখতে প্রথম নামলাম। দিল্লী এসে এইসব কীর্ত্তি দেখে সময় নষ্ট করাটা আমার ভাল লাগল না, কিন্তু সময়টা কাটাতে হবে ত? Memorialটা দেখতে মন্দ নয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কত ইংরেজ যোদ্ধা মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম লেখা tablet আষ্টেপৃষ্ঠে লটকান। এই স্মৃতিস্তম্ভও লাল sandstone-এর। অতঃপর একটা জায়গায় গেলাম, সেটার নাম শুনলাম বাগুট। এইখানে দিল্লীবাসী ইংরেজরা শেষ retreat করেছিলেন। এর historical মূল্য ছাড়া আর কোনো মূল্য আছে বলে মনে হল না। এরপর দিল্লীর সাহেব পাড়া একটু ঘুরে আসা গেল। কলকাতার চৌরঙ্গী থেকে তফাৎ বিশেষ কিছু নেই। একটা পুরনো গির্জ্জা দেখলাম, সেটা Mutinyর সময়ের গোলাগুলির চিহ্ন গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সব একই প্রকার। চকচকে রাস্তা, বড় বড় এক ছাঁচের বাড়ী। অতঃপর Nicholson Garden-এ গিয়ে নামা গেল। বাগানটা মন্দ নয় দেখতে। মাঝে Nicholson-এর মস্ত বড় ধাতব মূর্ত্তি আছে। চেহারাটা বোধ হয় মন্দ ছিল না।

এরই সামনে কাশ্মীর গেট। এই গেট দিয়েই ঢুকে ইংরেজেরা দিল্লী জয় করেছিল। কাজেই এটাকে খুব সযত্নে রক্ষা করেছে। যেখানে যেখানে গোলা লেগে গর্ত্ত হয়েছে, সে সব ঠিক তেমনি রেখে দেওয়া হয়েছে। সেখানটাও একটু ঘুরে ফিরে দেখলাম।

তারপর এই গেট দিয়ে বেরিয়ে আবার দিল্লীর পুরাকীর্ত্তি দেখতে চললাম। একটি অশোকস্তম্ভ আছে কাছেই, দেখে এলাম। দিল্লীতে দুটি অশোকস্তম্ভ আছে, কোনটিই originally এখানে ছিল না। অন্য জায়গা থেকে বহন করে এনে ফিরোজ শাহ্ এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রথম যেটি দেখলাম, সেটি একলা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, আশে পাশে বিশেষ কিছু নেই। স্তম্ভটি মাঝে ভেঙে চার পাঁচ টুকরো হয়ে গিয়েছিল, তাকে জুড়ে আবার খাড়া করে রাখা হয়েছে। কেবল যে অংশে inscription টা ছিল, সেটা নিয়ে গিয়ে museum-এ রাখা হয়েছে।

পথে বেরিয়ে কালকের দেখা খানিকটা জায়গা আবার traverse করা গেল। আমাদের এ দিকের প্রথম দেখবার জিনিষ হল ফিরোজ শাহের রাজত্বের ruins, আর একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজধানী। এরই পাশ দিয়ে বোধহয় দিল্লীর municipalityর ড্রেন গিয়েছে, নেমেই গন্ধে মাথা ধরে গেল। জায়গাটা মোটেই well kept নয়, পায়ে কাঁটাও ফুটল বিস্তর। চারিদিকে ভগ্ন দুর্গের খণ্ড, এখানে দেয়াল ধ্বসে পড়েছে, ওখানে মসজিদের ছাদ ভেঙে পড়েছে, বড় বড় পাথর জঙ্গলে আর আগাছায় ভরে উঠেছে। কাঠফাটা রোদে মাঠ ঘাট হাঁ করে পড়ে আছে। জায়গায় জায়গায় জল দিয়ে ঘাস করবার বৃথা চেষ্টা হচ্ছে। এই ভাঙাচোরার রাজ্যে একমাত্র আস্ত জিনিষ হচ্ছে একটি অশোকস্তম্ভ। অনেক পরিবারের ছেলেমেয়ে সব মরে গিয়ে যেমন দু একটা বুড়ো বুড়ী থেকে যায়, এরও তেমনি দশা। এর চারধারে কত শতাব্দী পরে তৈরি সৌধের ভগ্নস্তূপ মাটিতে লুটোচ্ছে, আর এ নিজের দুহাজার বছরের পুরনো মাথা আজও খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজ্যের ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ও কোনমতে স্তম্ভের

কাছে গিয়ে পৌঁছন গেল। হাল্কা সোনালী রঙের পাথরে স্তম্ভটি তৈরি, এই জন্যে এর নাম "মিনার জরিম." অশোকের শিলালিপি ছাড়াও ফিরোজ সাহের একটা inscription এর গায়ে খোদা আছে। এই দুটি প্রধান, তা ছাড়া যে যখন সুবিধে পেয়েছে বেচারার গায়ে একবার করে কলম ফুটিয়ে নিয়েছে। উপর থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। স্তম্ভ দেখেই আমরা নেমে পড়লাম। নীচে এক জায়গায় এক মুসলমান সাধুর সমাধি দেখলাম। অন্ধকার ঘরের মধ্যে কবরের পাশে একটি প্রদীপ জ্বেলে একজন মানুষ বসে আছে। চুপচাপ, কোন সাড়াশব্দ নেই, মৃতের সঙ্গী হয়ে সেও যেন নিজেকে পৃথিবীর থেকে নির্ব্বাসিত করে নিয়েছে। আমাদের গাইড্টি ভক্তিভরে সেখানে একটা নমস্কার করে এল। আরো দু চারটে কি যেন ওখানে দেখবার ছিল, কিন্তু রোদ তখন এমন ভীষণ যে কোনোরকমে পালাতে পারলে বাঁচি সেখান থেকে। আর কিছু দেখবার ইচ্ছা ছিল না। তবুও সেখানকার চৌকিদার বখ্‌শিস চাইতে ছাড়ল না। তার জমিদারিতে এসে কাঁটার খোঁচা খেয়ে যে পুলকের সঞ্চার হয়েছে, তারই জন্যে তাকে দু আনা পয়সা দিয়ে এলাম।

এরপরে জুম্মা মস্‌জিদ দেখতে নামলাম। মস্‌জিদের যেটি আসল দরজা সেটি না দেখেই চেনা হয়ে ছিল, কারণ অন্তত এক হাজার বার তার ছবি দেখেছি। সিঁড়ি এমন চওড়া আর বিরাট্ যে একসঙ্গে পাঁচশ লোক তা দিয়ে উপরে উঠতে পারে। কিন্তু শুনলাম এই বিরাট্ সোপান শ্রেণীর সামনের তদনুরূপ বিরাট্ দরজাটি শুক্রবার নমাজের সময় ছাড়া খোলাই হয় না। অগত্যা পাশের দিকের একটি একই ছাদের তবে অনেকটা ক্ষুদ্রতর সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আগে নাকি বিনা passএ এই মসজিদে হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন হবার পর জাতীয় একতার খাতিরে এখন হিন্দুদের অবাধ প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

রাস্তা থেকে মসজিদের ভিত বেশ এক তলার সমান উঁচু হবে। উঠে একটি মাঝারি গোছের ফটক পার হয়ে ভিতরের বিশাল quadrangleএ এসে দাঁড়ালাম। এটিকে উঠোন বা ছাদ বললে অপমান করা হবে এমনি তার বিশাল আকৃতি। এর তিন দিক্ দিয়ে দালান চলে গিয়েছে। একদিকে মসজিদ। মস্‌জিদের মুখোমুখি ঠিক সেই বিরাট সিংহদ্বার। প্রাঙ্গণটির মধ্যে ছোটখাট পুকুরের মত একটি চৌবাচ্চা আছে, নমাজের আগে এখানে সকলে 'ওজু' করে। এখানেও লাল পাথরের প্রাধান্য, তবে মস্‌জিদ properটিতে শাদা মার্ব্বেল পাথর এবং কাল পাথরের নক্সা কাটা মেঝে, প্রত্যেক উপাসকের জন্য একটি করে ঘর কাটা। সামনে প্রধান আচার্য্যের জন্য রক্ষিত একটি one piece মার্ব্বেল পাথরের বেদী। মসজিদের উপরের গম্বুজে সোনার চূড়া। দুইধারে দুটি মিনারেট, এমন ঝক্‌ঝক্ করছে যেন একেবারে নূতন। গোলাপী, সাদা, কালো ও সোনালী রংএর ছড়াছড়ি, কোথাও একটুও ম্লান হয়নি। আউরঙ্গজেবের সময়ের জিনিষ অবশ্য দিল্লীর standardএ ত একেবারেই আধুনিক। চারিদিক্ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। মুসলমানদের মধ্যেও ধরনা দেওয়ার প্রথা আছে তা জুম্মা মসজিদে প্রথম দেখলাম। আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে কয়েকজন লোক পড়ে আছে। ঠিক মনে হচ্ছে mummy। মসজিদটিতে খুব কম হলেও দশ হাজার লোক ধরে। মুসলমানদের ঐই একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখলাম যে তাদের তৈরি সৌধ বা মসজিদ যতই বিশাল হোক না কেন, কখনও clumsy হত না। ছোট্ট পাথরের বাক্স যেমন সুনিপুণ হাতে তারা গড়ত, দেয়ালের গায়ে আঙুর-পাতা যেমন সূক্ষ্ম করে কাটত, এই বিরাট প্রাসাদ ও মসজিদগুলি তার চেয়ে একতিলও কম নৈপুণ্য প্রকাশ করছে না।

মসজিদ দেখা শেষ হল ত চললাম লাল কেল্লা দেখতে। সেখানে ভিতরে ঢুকতে হলে পাস চাই। গেটের বাইরে গাড়ী দাঁড় করিয়ে প্রথম পাস কেনা হ'ল, তারপর গাড়ী ভিতরে ঢুকল। সে কি গেট! ঢুকলাম ত ঢুকলামই, দরজা এবং passage আর শেষই হয় না। passageএ একখানা market বসে গেছে, প্রায় কলকাতার municipal marketএর সমান। ফল, ফুল, কাপড় জামা, জুতো, গহনা কিছুরই অভাব নেই। গোরা সৈন্যের আড্ডা এটি, কোন জিনিষ কিনতে তাদের বেশী দূর যেতে হয় না। অধিকাংশ দর্শককে সিংহদ্বারে নেমে সমস্ত

বাজারখানা হেঁটে পার হতে হয়। ছোকরা গোরা sentryর একগাড়ী মেয়ে দেখে কি ভাবের উদয় হল বলা যায় না, একটু রসিকতা করে আমাদের গাড়ীটা ভিতরে পাঠিয়ে দিল।

কেল্লার অনেক বাড়ী ঘর দোর ভেঙে ফেলে এখন গোরা সৈন্যদের বাসা বানান হয়েছে। অনেক জায়গা তারা নষ্ট করে ফেলেছে, কিছু কিছু কালের প্রভাবে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। যা বাকি ছিল, তাই দেখলাম। সবুজ lawn আর বাগান অনেক জায়গা জুড়ে রয়েছে, ও সব জায়গায় নাকি আগে নানারকম মহল ছিল।

প্রথমেই একটি লাল বালি পাথরে গড়া সৌধে গিয়ে উঠলাম। চোখে না দেখি, এর এত ছবি দেখেছি আর এত বর্ণনা পড়েছি যে এক মুহূর্তও দেরি হল না বুঝতে যে এইটিই দেওয়ান-ই-আম। বাদশাহের বসবার জায়গাটি অপূর্ব mosaic-এ চিত্রিত। নীচে উজীরের বসবার স্থান। বাদশাহের বসবার জায়গা অনেক উঁচুতে, দেওয়ালের গায়ে একটি বিরাট কুলুঙ্গির মত। আশে পাশে দেওয়ালের লাল বুকে ঝরোকা কাটা, এইখান থেকে অন্দর মহলবাসিনীদের কালো চোখ উঁকি মেরে বাইরের জগৎটাকে দেখত। যাই হোক, সেখানে তখন এমন ভীষণ "দেহাতীদের" ভীড় যে সেখানে না দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলাম। কত বাগান যে পার হলাম তার ঠিকানা নেই। এক জায়গায় দেখলাম যে গাছের ডালে ডালে bulb লাগিয়ে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হয়েছে। কনট্ দরবারের আয়োজনের ব্যস্ততা সর্ব্বত্রে পরিস্ফুট। অনেকটা পথ মাড়িয়ে তবে মতি মসজিদে গিয়ে হাজির হলাম। মতির মতই বটে ছোট্ট অথচ নিটোল নিখুঁৎ। সাদা আর কালো পাথরে গড়া। শুনলাম, আলোর বদলে নাকি আগে ছাদ থেকে একটি বিরাট মণি ঝোলান থাকত, তারি জ্যোতিতে চারদিক আলো হয়ে থাকত। এটি অবশ্য গাইড্ মহোদয়ের কাল্পনিক গল্প।

সেখান থেকে "হামাম" দেখতে গেলাম। স্নান জিনিষটাকে এখন আমরা সম্পূর্ণ কবিত্ব বর্জ্জিত ও কেজো ব্যাপার করে ফেলেছি। এর মহিমা বুঝত এই মুসলমান বাদশাহেরা। সে যে কি সুন্দর তা ত বর্ণনা করিবার ভাষা খুঁজে পাই না। কত কল্পনা আর কত অর্থই না এর জন্যে ব্যয় হয়েছিল। যমুনা তখন খুব নিকট প্রতিবেশিনী ছিলেন, তাঁর নীল জলধারা যখন এই স্ফটিক-শুভ্র পয়ঃ-প্রণালীর উপর দিয়ে গড়িয়ে আসত আর সাদার বুকে আঁকা সোনালী ডোরা যখন জলের লীলায় ঝিলিক হানত তখন না জানি এখানের শোভা কি অপরূপ হত। এখন ত সব শুষ্ক হয়ে পড়ে আছে। চৌবাচ্চাই যে কত তার ঠিকানা নেই। ফোয়ারাও অসংখ্য। এটাও বেশির ভাগ সাদা আর কালোয় আঁকা, মাঝে মাঝে সোনালীর ছোপ। আজকালকার দিনে সৌন্দর্য্য আর comfort-কে প্রায়ই একত্র বাস করতে দেখা যায় না, কিন্তু এদের কালে এ দুটির মিলন ছিল। বেগমের স্নানের জায়গা, বেরোবার পথ, বাদশাহের ঢুকবার বেরোবার পথ, অন্দরের শিশুদের স্নানের জন্য গড়া এক পাথরের টব সব দেখলাম। বাদশাহের শয়ন-মন্দির, সেইকালের আসবাব, শয্যা, প্রভৃতি দিয়ে সাজান আছে তাই তার ভিতরে ঢোকা বারণ। বাইরে দাঁড়িয়ে একটু উঁকি মেরে দেখলাম।

যমুনার ধার দিয়ে যে বারান্দা চলে গিয়েছে, তার উপর সারি সারি মহল, রংমহল, শিশমহল, মচ্ছিভবন আরো কত কি। অধিকাংশই বর্ব্বরতার অত্যাচারে হতশ্রী। একটি জায়গায় স্বচ্ছ পাথরের পরদার উপরে ন্যায়ের তুলাদণ্ড আঁকা, এখনও ঠিক নূতনের মত উজ্জ্বল রয়েছে। যেখানে দাঁড়িয়ে সকালবেলা বাদশাহ প্রজাদের মুখ দেখাতেন সে জায়গাও দেখলাম। কনট্ দরবারের জন্য কাঠের গ্যালারি তৈরি হচ্ছে, ভীষণ ঠকাঠক শব্দ করে।

আর দেখলাম দেওয়ান-ই-খাস। সম্রাট শাহজাহান একজন কবি ছিলেন বটে। এত সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ-সৌধের মধ্যে এই দেওয়ান-ই-খাসটি যেন আলোর শতদলের মত মাথা তুলে রয়েছে। শ্বেতপাথরে তার সুন্দর দেহ গড়া, তার উপর সোনা রূপা, মুক্তা চুনি ও পান্নার অলঙ্কার। সাঁচ্চা পাথরগুলির অধিকাংশই চোরে চুরি করে নিয়েছে, ঝুঁটা পাথরে পরে সে সব জায়গা ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু এর রূপ যায়নি। রূপসী বিধবার মত তাকে যেন অপরূপ দেখাচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে সাহজাহানের উক্তি উদ্ধৃত, 'ভূতলে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে ত এইখানেই, এইখানেই,

এইখানেই।" ময়ূর সিংহাসন ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গেছে, তার পাথরের চৌকিটা শূন্য প'ড়ে।

এধারটা দেখে শুনে আবার দেওয়ান ই আম-এ ফেরা গেল। মহলের পর মহল পার হচ্ছি, আর মনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের তাজমহল কবিতাটি একটানা ঝঙ্কার দিয়ে ফিরছে। যাদের রূপ এই প্রাসাদগুলির সৌন্দর্য্য আরো সাতগুণ বাড়িয়ে দিত, কোথায় গেল সেই রূপসীর দল? রাত্রে এখানে একলা বসে থাকলে "ক্ষুধিত পাষাণের" নায়কের মত হয়ত তাদের আবার দেখা পাওয়া যায়। তারা সবাই কি আর এই অতিপ্রিয় আশ্রয়গুলি ছেড়ে গেছে?

দেওয়ান-ই-আম-এ এখন আর ভীড় ছিল না। ওখানকার এক অতি পুরান গাইড আমাদের পাশের একটি দরজা দিয়ে উপরে নিয়ে গেল। ছবি, নক্সা সব ভাল করে বুঝিয়ে দিল। বাদশাহের সিংহাসনে উঠলাম বলে আমাদের রাজরাণী হবার সম্ভাবনা খুব বেশী সেটাও জানিয়ে দিল। সে নিজে যে বহুকাল ধরে ওটার উপর দাঁড়িয়েও কেন রাজা হয়নি, তা অবশ্য জানি না। এখানটার mosaic একেবারে অতুলনীয়। বাদশাহের সিংহাসন থেকে নেমে এলাম।

বাকি ছিল ওখানকার museum, সেখানে গেলাম। Collection এর ভিতর বেশীর ভাগ পুরাতন ছবি, সম্রাট্দের এবং তাদের বংশধরদের। শেষ বাদশাহের সময়কার জিনিসপত্র ঢের রয়েছে। বেগম জিন্নৎমহলের পেশোয়াজ, ওড়না, গহনা-গাঁটি। জেনারেল নিকলসন যে খাকি কোট পরে গুলি খেয়ে মরলেন, তাও রয়েছে। প্রথম পাঁচ বাদশাহের চেয়ে শেষের নগণ্য দলের ছবির বেশী ঘটা। কয়েকখানা বাদশাহী ফারমান্ রয়েছে। Guide প্রথমে সব কিছু খুব ঘটা করে বোঝাচ্ছিল, কিন্তু আমরা নিজেরাই সব পড়ে নিচ্ছি দেখে হাল ছেড়ে দিল। পুরনো অস্ত্রশস্ত্র বাসনকোসন রয়েছে কিছু কিছু। খুব সম্ভব সম্রাট্ আকবরের armour-এর অংশ এবং তলোয়ার রয়েছে। বাহাদুর শাহের এক বিরাট্ trunk দেখলাম। পুরাতন দিল্লীর অনেক দৃশ্য দেখলাম। Museum-এর বারান্দায় বড় বড় ভাঙ্গা লাল পাথরের মূর্তি দেখলাম কতকগুলি। কোথা থেকে আনা বুঝলাম না।

অতঃপর গাইডকে বখশিস দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সামনের দিকে আধুনিক একখানা বাড়ীতে বিগত বিশ্বযুদ্ধের অনেক trophy রয়েছে দেখলাম। দেখবার একটুও ইচ্ছে ছিল না, কার যেন সখ হল, তাই গেলাম। ঢুকেই পড়লাম সারি সারি shell, কামান আর German helmet-এর মধ্যে। কি শোচনীয় anticlimax। মনে হল, আরব্য উপন্যাসের রাজ্য থেকে কে যেন চুলের মুঠি ধরে নবা amminution factoryতে নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি পলায়ন করলাম। তারপর সেই বাজার পার হয়ে আবার গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। এবং হোটেলে ফিরে এলাম। দিল্লী দেখা ত সমাপ্ত হল। যা বিরাট্ ব্যাপার তাতে একাধিক সহস্র রজনী লাগলেও অবাক্ হতাম না। তার বদলে দুইদিনেই courseটা শেষ করে উপভোগ করে নেওয়া গেল।

বিকেলে দিল্লী প্রবাসী বাঙালীরা বাবাকে তাদের লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে গেলেন। লাইব্রেরীটি এক ভদ্রলোকের থাকবার বাড়ীতে। আমরাও সঙ্গে গেলাম। বাবা যতক্ষণ বই দেখলেন আমরা ততক্ষণ উপর তলায় বসে গৃহিণী ও তাঁর কাচ্চাবাচ্চাদের সঙ্গে আলাপ করলাম এবং ঘরে তৈরি পেস্তার বরফি সহযোগে চা খেলাম। তবু ছেলের কান্না, ভাইবোনের মারামারি, রান্নাবান্নার শব্দে গন্ধে হোটেলপীড়িত প্রাণ খানিকটা সুস্থ হল। খানিকপরে চলে এলাম।

তখনই যদি ফিরে চলার পথ ধরা যেত ত বাঁচতাম, হোটেলটা দেখলেই আমার কান্না পেত। কিন্তু সে রাতটা কাটাতেই হল। খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এমন সময় দিল্লীর St. Stephen College এর Principal Rudra মহাশয় বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে হাজির হলেন। সে এক বিচিত্র experience। আমরা বেশ শুয়েই রইলাম মুড়ি দিয়ে এবং তিনি আর বাবা অনেকক্ষণ বসে গল্প করলেন। সারারাত ঘুম হল না, উপর তলায় গান বাজনার চোটে।

ভোরের ট্রেনে দিল্লী ত্যাগ করলাম। ট্রেন ছাড়তে কিছু দেরি করল, কাজেই প্ল্যাটফর্মে খানিক ঘোরা গেল।

গাড়ীতে ভীড় ছিল না, ভালই এলাম। সহযাত্রিণীরূপে দুটি মুসলমান মহিলা ছিলেন, মা ও মেয়ে। সুন্দর দেখতে, কথাবার্ত্তাও ভাল। আজমীর শরিফে পাগলস্বামীর কল্যাণার্থে গৃহিণী মানত করতে গিয়েছিলেন, এখন ফিরছেন। হিন্দুদের সঙ্গে কোনো তফাৎ ত দেখলাম না।

সেদিন বোধহয় দীপান্বিতা অমাবস্যা। এলাহাবাদের দিকে যতই এগোতে লাগলাম, আঁধার ততই বাড়তে লাগল। একটা জিনিষ দেখে খুব ভাল লাগল, এ দেশে মাঠে ও ক্ষেতেও দেওয়ালির আলো দেয়।

এলাহাবাদ পৌঁছে মাত্র একদিন ছিলাম। তার মধ্যে এক মিনিটের জন্যেও ঘর ছেড়ে বেরোইনি। পরদিন বিদায় হলাম। ট্রেনে গোড়ার থেকেই ভীড় খানিকটা ছিল, তবে একজন সহযাত্রিণী খুব রসিকতাপূর্ণ গল্প চালিয়ে পথকষ্ট অনেকটাই নিবারণ করলেন। ইনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছোট বোন।

মোগল সরাইয়ে গাড়ীতে ঠিক যেন ডাকাত পড়ল। একসঙ্গে রাশীকৃত পেয়ারার ঝুড়ি ও একগাদা মানুষ ঘরের উপর এসে পড়ল। সুখের বিষয়, রাগ না হয়ে হাসিই পেল বেশী। তবে আমাদের পূর্ব্বোক্তা সহযাত্রিণী খুব কর্ম্মিকর্ম্মা মহিলা। ওরই মধ্যে কুলি ডাকাডাকি করে তিনি সব পেয়ারার ঝুড়ি bunk-এ তুলিয়ে দিলেন, এবং যাত্রিণীদের বসবার ব্যবস্থা করলেন। এবং নিজেই নিজের তারিফ করে বললেন "প্রতিভা কখনও বিফল হয় ?"

আর কোনো এক ষ্টেশনে অনেকগুলি মুসলমান মেয়ে উঠল। তার ভিতর একটি সুন্দরী তরুণী ও একটি ফুট্‌ফুটে খুকী ছিল। তরুণীর দিদিমা দলের পাণ্ডা। তিনি নাকি জজ আর ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া আর কোন চাকরির নাম মনে রাখতে পারেন না। নিজের অক্ষমতায় দুঃখিত হয়ে বললেন, "আমি কি আর মানুষ ভাই, আমি একটা বাঁদর।" আমরা ভদ্রতা করে সে কথা মানতে অস্বীকার করলাম। যাক, আবার কলকাতায় ফিরে আসা গেল।

সব জড়িয়ে দিন পঁচিশ বোধহয় বাইরে ছিলাম, কিন্তু কলকাতাটাকে কেমন যেন অচেনা আর বিশ্রী লাগতে লাগল। চারিদিক্ থেকে যেন কাঁটা ফুটছে। আসলে খাঁচার পাখী একবার খাঁচা থেকে বেরোলে, তারপরে আর খাঁচায় ঢুকে সুখ পায় না। হৈ হৈ করে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে এসে কলকাতার static জীবন আর কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না।

27th November.—সারাদিনটা কিছুই করি না অথচ ক্লান্ত হয়ে থাকি। স্কুলেও সেই অবস্থা। মেয়েরা পরীক্ষার পড়া করে, আর আমরা Common Room-এ শুয়ে বসে গড়িয়ে দিনটা কাটিয়ে দিই। কালকে আমাদেরই একজনের জন্মদিন উপলক্ষ্য করে খানিকটা হুল্লোড় হল। ওকে তার Matric class-এর ছাত্রীরা অনেক চন্দ্রমল্লিকা আর লাল গোলাপ উপহার দিয়ে গেল। বোর্ডিংএ যতগুলো ফুলদানি আর চুমকি ঘটি ছিল সব জোগাড় করে এনে, আমরা ফুলগুলি সাজিয়ে টেবিলে রাখলাম। অমন পুষ্পসজ্জাভূষিত টেবিলে বই, খাতা, hand bagএর রাশ মানায় না বলে সেগুলোকে নামিয়ে অন্যত্র রাখলাম। তারপর একটু tea partyও হয়ে গেল। রোজ এই রকম করে কাটতে ত মন্দ হত না, কিন্তু তা আর হয় কই ?

6th December.—পাড়ায় এক ভদ্রমহিলা মারা গিয়ে বেশ একটু upset করে দিয়েছেন সবাইকে। তাঁর মেয়েদের কান্না শুনে মনে হচ্ছিল জীবন যেন তাদের পক্ষে শেষই হয়ে গেল। অথচ আজই দেখছি, ছোটজন পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছে। জীবনের তুলনায় মৃত্যু যে কত তুচ্ছ, তা এইসব ব্যাপারে বোঝা যায়। যারা জীবনের রসে ভরপুর তারা মরণটাকে বেশী মনে রাখতে পারে না। যারা নিজেরা মরণের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তারা সেটাকে বেশী importance দেয়।

আমার না দেখা বন্ধু এণ্ডারসন্ সাহেব মারা গিয়েছেন কয়েকদিন হল। বাস্তবিক হিতাকাঙ্ক্ষী যাকে বলে, তা তিনি আমার ছিলেন। চোখে যাদের দিনে দশবার দেখি, তাদের চেয়ে তিনি বেশী কাছের মানুষ ছিলেন। আমাদের ও বাবাকে প্রায়ই তিনি চিঠি লিখতেন, কখনও ইংরেজীতে কখনও বা বাংলায়। হাতের লেখা ছিল যেন মুক্তোর মত। বাংলায় চিঠি লিখলে নিজের নাম সই করতেন "ইন্দ্রসেন" বলে। কত উৎসাহই

তাঁর কাছে পেতাম। আচ্ছা এই যে সব ক্ষণিকের আসা-যাওয়া, এর কি এখানেই সব শেষ? না এর আর কোনো উত্তর পর্ব্ব আছে eternityর মধ্যে কোথাও?

এই সূত্রে মনে পড়ছে আমার বাল্যবন্ধু কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনও এই মাসে সংসারের মায়া কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর স্মৃতি এখন ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে। কেবল মনে পড়ে, প্রায় প্রত্যহই তিনি আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসতেন, অনেক সময় আদালতের পোশাকও না ছেড়ে। বাবাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাঁর কত কবিতা যে প্রবাসীতে বেরোত তার ঠিক নেই। আমার সঙ্গে আর ক্ষুদুর সঙ্গে তাঁর বড় ভাব ছিল, আমাকে মা বলে ডাকতেন।

9th December.—কালকে সারাদিনটা স্কুলের বোর্ডিং-এই কেটে গেল। দিদিকেও জোগাড় করে নিয়ে গেলাম। বিভাই করেছিলেন নিমন্ত্রণ বেঁধে খাওয়াবেন বলে, গিয়ে দেখি তিনি জ্বর করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন, এবং আমার অন্য দুইবন্ধু সেজেগুজে marketএ চলেছেন। অবস্থা দেখে খুব যে উৎসাহিত বোধ করলাম তা নয়। তবে সুখের বিষয়, সে ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই খিচুড়ি আর নানারকম ভাজাভুজি এসে পড়াতে আবার চাঙা হয়ে উঠলাম। Market থেকে বন্ধু দুজনও ফিরে এল, এবং গল্পও খুব জমে উঠল।

8th January, 1921.—বড়দিনের ছুটির অবসানে আবার নিজেকে ঘানিতে জুত্‌তে হয়েছে। ছুটিটা বেশ্রী-ভাবেই কাটল। মিস্ত্রীর উপদ্রবে বাইরে ত চূণবালি মেখে ভূত হলাম। ভিতরটাও যদি whitewash করতে পারতাম তা হলেও না-হয় একটা কাজ হত, কিন্তু সেটা ঠিক আগের মতই কালি ঝুলি মাখা হয়ে রইল।

এই ষোলো দিনের ছুটিতে মাত্র দুবার ঘর থেকে বেরিয়েছি। তাও প্রথম বেরোনোটা ঘটে উঠত না যদি না প্রশান্ত এত গোলমাল করত। Mr. Edward Thomson ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ করতেই হবে, সে খোট্ট ধরে বসল। এটা যে এমনই কি অবশ্য কর্ত্তব্য তা বুঝলাম না। সাহেব দম্পতি কলকাতায় আসবামাত্র সে জেদ করতে লাগল তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবার জন্য। বাড়ীতে ডাকা যায় না, সেখানে স্থানাভাব, মিস্ত্রী লেগেছে, নিজের শরীর খারাপ, ইত্যাদি অনেক কিছু বলে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু "ভবি ভুলবার নয়।" অবশেষে একদিন হঠাৎ শুনলাম যে, সাহেব মেম বিকেল বেলা বেবুদিদের বাড়ী আসছেন এবং আমাদের যেতে হবে। দিদির শরীর খারাপ বলে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, আমিই পড়লাম চোরের দায়ে ধরা। সে এক কাণ্ড! প্রথমে বেবুদির চিঠির উত্তরে লিখলাম, যেতে পারব না। অতঃপর phone, পাশের বাড়ীর জানলা দিয়ে অনুরোধ উপরোধ, মিনি মহলানবিশের সশরীরে আবির্ভাব ও অনুরোধ, বাড়ী গিয়ে আবার চিঠি লেখা ইত্যাদি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল। অত্যন্ত চটে গিয়েও শেষে রাজী হতে হল। তখনকার মত ঝাঁটা বালতি ফেলে ও ঘর গোছান বন্ধ রেখে, সাজসজ্জা করে মিনিদের বাড়ী গিয়ে উঠলাম। গিয়ে দেখি সবাই আমার সন্ধানে মহা ব্যস্ত, কাজেই দেরি না করে বেরিয়ে পড়তে হল। আমাদের গিয়ে পৌঁছতে একটু দেরিই হয়ে থাকবে, কারণ দেখলাম, নিমন্ত্রিতের দল চা পান সাঙ্গ করে বেশ জমিয়ে বসে গল্প করছে। Mr. Thompsonএর বয়স বেশী নয়, দেখতে ভালই। স্ত্রীটিকে তাঁর চেয়ে বয়সে বড় দেখায়, সুন্দরীও কিছু নয়, তবে সরণধারণ কথাবার্ত্তা বেশ charming। পরিচয় করে দিতেই সাহেব আমাকে খুব মন দিয়ে একবার পর্য্যবেক্ষণ করে নিল তারপর বলল "I know your father quite well." অনেক কথাই বলল অতঃপর। তার ব্রাহ্ম communityটাকে নাকি ভারি extraordinary লেগেছে। একসঙ্গে এত-গুলি cultured and intelligent লোক সে নাকি আর কোথাও দেখেনি। ক্রমশঃ

কলকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি

কলকাতা হাইকোর্টের সুপরিচিত ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র তালুকদার উক্ত মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী ৺সুরেশচন্দ্র তালুকদারের পুত্র শ্রীযুক্ত তালুকদার ছাত্র-জীবনে একজন কৃতী সন্তান ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবীরূপে যোগদান করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আইন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ বাগ্মিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিচারপতিরূপে যোগদানের অব্যবহিত পূর্বে তিনি হাইকোর্টের আপীল-বিভাগে নেতৃস্থানীয় ব্যবহারজীবী-রূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর কর্মজীবনে হাইকোর্টের আপীল-বিভাগে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, কোম্পানী ল বোর্ড, পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্ত; নৌ ও সেনাবিভাগ, অফিসিয়াল রিসিভার, হাইকোর্ট; কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী, কলকাতা কর্পোরেশন প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ব্যবহারজীবীরূপে সংযুক্ত ছিলেন।

খ্যাতনামা খেলোয়াড় হিসাবে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত তালুকদার ক্রীড়া-জগতের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এ্যাসোশিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (ভূতপূর্ব অনারারী সেক্রেটারী); ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এ্যাসোশিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট; ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট; মহাবোধি সোসাইটির আজীবন সদস্য, ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির পরিচালক সমিতির সদস্য এবং মৈত্রেয়ী আসর, ইলিসিয়াম ক্লাব, আঞ্চলিক রবীন্দ্র সমিতি, ভূতনাথ পাঠাগার প্রভৃতি সংস্থার তিনি প্রেসিডেণ্ট। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের পরিচালক সমিতির তিনি অন্যতম সদস্য।

প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী ৺ভূতনাথ করের কন্যা অমিতার সহিত শ্রীযুক্ত তালুকদারের বিবাহ হয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ৺নৃপেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রতিমার সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'ন।

অযোধ্যার নবাব

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৩)

নবাবী ধারা

জীবনের শেষ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে প্রথম নবাব সাদৎ খাঁ বুর্হান্-উল্-মুল্ক আত্মহত্যা করলে সেখানেই কবরস্থ হলেন। ফৈজাবাদ থেকে তিনি বাদশা মহম্মদ শা'র পক্ষ নিয়ে নাদির শা'র বিরুদ্ধে যে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন তারই আকস্মিক ঘটনাচক্রে এবং আপন দুর্মতিতে অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি করে ইহলোকের পাট চুকিয়ে দিলেন স্বহস্তে।

অযোধ্যায় আর তাঁর ফিরে আসা হল না। এতকাল নানাভাবে ও অন্যের বিপর্যয়ের সুযোগে যেমন প্রচুর ধনরত্ন সঞ্চয় করেছিলেন তেমনি দক্ষ যোদ্ধা ও শাসকরূপে অযোধ্যা রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যান বংশধরদের নবাবীর জন্যে।

সেই সবই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করলেন অপুত্রক সাদৎ খাঁর ভাগিনেয়-জামাতা মনসুর আলি খাঁ। তিনি সফদরজঙ্গ উপাধি নিয়ে অযোধ্যার দ্বিতীয় নবাব হলেন। আগের আমলের মতন রাজধানী রইল ফৈজাবাদে। সরকারী আবাস, সামরিক প্রধান কার্যালয় এবং আরো অনেক বাড়ি ফৈজাবাদে তাঁর সামনে নির্মাণ করা হয়। নবাব সাদৎ খাঁর প্রাসাদটিতে সফদর জঙ্গ কিছু আশা যোগ করেছিলেন। তাঁকেই এ নগরের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়, যদিও তিনি বেশী সময় থাকতেন দিল্লী প্রভৃতি জায়গায়।

সফদর জঙ্গের আমলের ফৈজাবাদের প্রায় সব বস্তুই কালের কবলিত। অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

শাসনকার্যে তাঁর সহকারী ছিলেন যে নেওয়াল রায় তিনি অযোধ্যায় একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। নেওয়াল রায়ের এই প্রাসাদ ছিল নদীর ধারে। কিন্তু সফদরজঙ্গ অযোধ্যা নগরে আর কিছু পত্তন করেন নি। কয়েকজন পদস্থ মোগল রাজকর্মচারী বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন, সে সবও এখন লুপ্ত। মোগলপুরা মহল্লায় শুধু সেই স্থানটির নামের স্মৃতি রয়ে গেছে।

সফদর জঙ্গের চৌদ্দ বছরের নবাবীর মধ্যে প্রায় দশ বছর ছিল বাদশা মহম্মদ শাহ্‌র আমল (১৭৪৮ সাল মহম্মদ শাহের মৃত্যু পর্যন্ত)। নাদির শাহের আক্রমণ ও কোতল-ই আম-এর (সার্বজনীন হত্যাকাণ্ড) শেষে মোগল সাম্রাজ্যের নিতান্ত মুমূর্ষু দশা। যে নাম মাহাত্ম্য এ যাবৎ তার সঙ্গে জড়িত ছিল, নাদির শাহ তাও দিল্লীর পথে পথে তাও লুটিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন শুধু অতীতের কঙ্কাল-কেত্তা এবং স্বার্থান্বেষী মহলে তা ভাঙিয়ে নিজেদের সিদ্ধিলাভের চেষ্টা।

এই অবস্থায় অযোধ্যার দ্বিতীয় নবাব সফদর জঙ্গ বাদশাহী নেক নজর ভালভাবেই পেলেন। এমন কি সাদৎ খাঁর চেয়েও অনেক বেশি। কারণ সফদর জঙ্গ বাদশার উজীর (প্রধানমন্ত্রী) মনোনীত হলেন। এই পদটির ওপর প্রথম নবাবের লোভ থাকলেও ভাগ্যে জোটেনি শেষ পর্যন্ত। সফদর জঙ্গকে ১৭৪৭ সাল মহম্মদ শাহ এই উজীরী দেন। ক্ষমতার চেয়ে অবশ্য উজীরের খেতাবী মূল্যই তখন বেশি।

তার পরের বছর অর্থাৎ ১৭৪৮ সাল মহম্মদ শাহের হৃত গৌরব বাদশাগিরির ওপর মৃত্যু এসে ছেদ টেনে দেয়।

তাঁর রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের আকার আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। শুধু অযোধ্যা নয়, সুবা বাংলা-

বিহার-উড়িষ্যাও কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। তাঁর বাদশাহী জীবনের শেষদিকে সুবা বাংলার মসনদ হস্তগত করেন প্রভু-হন্তা আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০ সাল)। মালব, বুন্দেলখণ্ড ও গুজরাট মারাঠাদের অধিকারে আসে। স্বাধীনতা লাভ করে রাজপুতনা।

সাংস্কৃতিক বিষয়ে মহম্মদ শাহের আমলের এক উল্লেখ্য সংবাদ হল তাঁর দরবারে সঙ্গীত চর্চা। তিনি একজন যথার্থ সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্দিনেও সঙ্গীতজ্ঞদের যথাসম্ভব পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে গেছেন। তানসেনের পুত্রবংশীয় রবাবী-ধ্রুপদী গুলাব খাঁ এবং তানসেনের কন্যাবংশীয় মহা প্রতিভাধর বীণকার ধ্রুপদী ও খেয়ালগুণী নিয়ামত খাঁ একইকালে অবস্থান করেন তাঁর দরবারে। নিয়ামৎ খাঁ সঙ্গীত জগতে যে (শাহ) সদারঙ্গ নামে স্মরণীয় হয়ে আছেন তা' মহম্মদ শাহেরই প্রদত্ত উপাধি। সঙ্গীতরচয়িতা শাহ সদারঙ্গ স্বরচিত কোন কোন গানে মহম্মদ শাহকে 'রঙ্গিলা'-রূপে ভূষিত করেছেন।

বোধহয় সঙ্গীতপ্রেমের আতিশয্যেই মহম্মদ শাহ এমন বিবাহ করেছিলেন যার দৃষ্টান্ত তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে দেখান একমাত্র জাহান্দার শাহ। দিল্লীর উধম্ বাঈ নাম্নী বাঈজীকে মহম্মদ শাহ বিবাহ করেন। বিবাহের পর বাঈজী খেতাব পান 'কুদসিয়া বেগম।' মহম্মদ শাহের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল জাহান্দার শাহের প্রতি লালকুঁওয়ারেরই অনুরূপ।

কুদসিয়া বেগম ও মহম্মদ শাহের পুত্র আহ্মেদ শাহ পিতার মৃত্যুতে দিল্লীর বাদশা হন (১৭৪৮ সাল)।

আহ্মদ শাহ, কুদসিয়া বেগম, তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট জাবেদ খাঁ এবং তাঁদের সমকালীন অযোধ্যার নবাবী সফদর জঙ্গের প্রসঙ্গে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর 'ইতিহাসের ইন্দ্রপ্রস্থ' 'রাজস্থান কাহিনী' (গ্রন্থ) ফার্সী পুস্তক 'তারিখ্-ই-আহমদি' অনুসরণে লিখেছেন—

"...বারবিলাসিনী, 'কুদসিয়া বেগম' খেতাব পাইলেও, পদমর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার গর্ভে তাঁহার (মহম্মদ শাহের) উত্তরাধিকারী আহমদ শাহের জন্ম হয়। শাহী-তক্তে বসিবার পূর্বে একুশ বৎসর পর্যন্ত তিনি অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই, কোন পুরুষ মানুষের মুখও দেখেন নাই, সর্বপ্রথম যাহার মুখ দেখিয়াছিলেন,—সেই ব্যক্তি—তাঁহার মাতার অনুগৃহীত ক্রীতদাস খোদা জাবেদ। আহমদ শাহের নামে বাদশাহী চালাইতেন কুদসিয়া বেগম, এবং খাঁ উপাধিধারী জাবেদ। তাঁহার দরবারে 'ইরাণী' ও 'তুরাণী' আমীরগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ প্রধান উজীর, কিন্তু খোজার উজীরী করিতে তিনি নারাজ। আহমদ শাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে চারিবর্গ মাইল ব্যাপী প্রাচীর বেষ্টিত, লতাকুঞ্জশোভিত পরীর শহর আবাদ করিয়াছিলেন। দিল্লীর কোলাহল এবং পুরুষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তিনি মাসের পর মাস এই পরীস্থানে কুঞ্জবিহার করিতেন।"

সফদর জঙ্গের দিল্লী সম্পর্কিত গুরুতর প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তা বর্ণনা করবার আগে লক্ষ্ণৌর কথা একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার।

সফদর জঙ্গও সাদৎ খাঁর মতন ফৈজাবাদে অধিকাংশ সময় থাকতেন এবং লক্ষ্ণৌর সঙ্গে সম্পর্ক সামান্যই রেখেছিলেন। শেখদের যে দুটি প্রাসাদ লিখ্না কিলার অভ্যন্তরে সাদৎ খাঁ ভাড়া নেন তা দ্বিতীয় নবাবের সময়েও বজায় ছিল। লিখনা কিলার নাম পরিবর্তন করে সাদৎ খাঁ তাঁর বাসস্থানের নতুন নামকরণ করেছিলেন – মচ্ছি ভবন। তাঁদের বংশের প্রতীক-চিহ্ন মৎস্য, তাই থেকেই এই নাম। (কোন কোন ভূম্যধিকারী বংশে একটি জীবকে emblem হিসাবে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত আছে, যেমন কুচবিহার রাজবংশের—সর্প।)

লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবনের ধ্বংসাবশেষ এখন আর সামান্যই বর্তমান আছে। কিন্তু তার তোরণ-প্রাচীরে উৎকীর্ণ বৃহৎ আকারের মৎস্য এখনও দেখা যায়। সাদৎ খাঁ ও সফদর জঙ্গের পরবর্তীকালেও এই বংশীয় নবাবগণ যেসব

ইমারত গঠন করেন তাদের অনেকগুলিতেই লক্ষণীয় মৎস্যের এই প্রতীক চিহ্ন।

শেখদের নিকট থেকে নেওয়া সেই মচ্ছিভবন নামে প্রাসাদ দুটি সফদর জঙ্গ পরে অধিকার করে নেন। লিখিত চুক্তিপত্র সত্ত্বেও শেখদের তিনি ভাড়া বাবদ কোনদিন কিছু দেননি এবং গৃহগুলির মালিকানা পুরোপুরি নেবার সময় পরিবর্তে দুর্গাওতে সাতশ একার জমি দিয়েছিলেন লিখনা কিলার পূর্বতন মালিক শেখদের।

মচ্ছিভবনের স্বত্বাধিকার এইভাবে লাভ করে সফদর জঙ্গ তাকে সুদৃঢ় ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলেন। লক্ষ্ণৌ সহরের দক্ষিণে জালালাবাদ গড়টিও নির্মাণ করেন তিনি। তাঁর বংশধরদের জন্যে লক্ষ্ণৌ রাজধানীর ভিত্তি এমনিভাবে রচিত হতে থাকে। তাঁর সময়ের মন্ত্রী নওয়ল রায় গোমতী নদীর ওপর লৌহ-সেতুটি তৈরি করতে আরম্ভ করেন; যদিও তা সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই মৃত্যু হয় নওয়ল রায়ের। লক্ষ্ণৌর সঙ্গে সফদর জঙ্গের আমলের সম্পর্ক এই পর্যন্ত।

উজীর হবার তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৭৫০ খৃঃ বাদশা আহম্মদ শাহের আমলে সফদর জঙ্গ অতি জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। একাধিক শত্রুর আক্রমণে আযোধ্যা রাজ্য তখন বিপন্ন। তাঁর সৈন্যদলের অবস্থা শোচনীয়, রাজকোষ প্রায় শূন্য। গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী দোয়ার অঞ্চল তখন তাঁর অধিকার বিচ্যুত হয়ে গেছে। ফরাক্কাবাদের আহম্মদ খাঁ বংশে এবং আফ্রিদি-রোহিলা আফগানদের মিলিত আক্রমণে লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ দুর্গ অবরুদ্ধ। দিল্লীও শীঘ্রই আক্রান্ত হওয়ার অবস্থা।

আহম্মদ শাহ নাম মাত্র বাদশা, একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর পশ্চাতে সঞ্চালক ছিলেন জাবেদ খাঁ, যাকে সফদর জঙ্গ ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। সুতরাং শত্রু বিতাড়নের একান্ত দায়িত্ব তাঁর (সফদর জঙ্গের)। অনন্যোপায় হয়ে তিনি মারাঠা ও জাঠ সৈন্যশক্তি নগদ মূল্যে ক্রয় করলেন, বেগম সদরুন্নিসার (সাদৎ খাঁর কন্যা) ব্যক্তিগত তহবিলের সাহায্যে। নবাব-উজীরের পক্ষ নিয়ে মারাঠা ও জাঠ সেনাবাহিনী আহম্মদ খাঁ বংশ এবং রোহিলা আফগানদের সম্পূর্ণ পরাস্ত ও বিতাড়িত করলেন।

কিন্তু এরমধ্যে জাবেদ খাঁ সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে মারাঠাদের সঙ্গে চক্রান্ত করার ফলে রোহিলাদের ধ্বংস করতে সক্ষম হলেন না উজীর। জাবেদ খাঁ আগে থেকেই তাঁর চক্ষুশূল ছিল, এবার নবাব দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে তার হত্যাসাধন করলেন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় দিল্লী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর দারুণ বিবাদ বাধল। তাঁর উজীরী পদ গেল এবং তিনি অপসারিত হলেন দিল্লী থেকে। পরে সফদর জঙ্গের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টার ফলে তাঁর আহ্বানে জাঠরাজা সুরজমলের নেতৃত্বে বিপুল জাঠ সৈন্যদল দিল্লী অবরোধ করে। তারপর আহম্মদ শাহের নতুন উজীর রাজধানী রক্ষার জন্যে বাইরের সাহায্য গ্রহণে তৎপর হলে সফদর জঙ্গ দিল্লী লুণ্ঠনের নির্দেশ দেন সুরজমলকে। পূর্বতন মোগল আমলে জাঠদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার ও হত্যার তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিহিংসা তারা দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের এই সুযোগে আওরঙ্গজেবের বংশধরদের ও তাঁর স্বধর্মীয়দের ওপর দস্যুর মত চরিতার্থ করে নেয়। ঘটনাচক্রে তার উপলক্ষ্য হয়ে পড়েন অযোধ্যার নবাব। এ বিষয়ে অধিক বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক।

দিল্লীর সঙ্গে এই সাংঘাতিক বিরোধই সফদর জঙ্গের নবাবীর পরিণতকালে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার তিন বছর পরে (১৭৫৩ সন) তাঁর মৃত্যু হয় ফৈজাবাদে। পরে দিল্লীতে তাঁরই নামাঙ্কিত সফদর জঙ্গ সমাধিসৌধে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে অযোধ্যার তৃতীয় নবাব রূপে অভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র সুজাউদ-দৌলা। সুজা-উদ-দৌলার নবাব-প্রাপ্তির পরের বছর অর্থাৎ ১৭৫৪ সন আহম্মদ শাহের মৃত্যু হলে, দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীর বাদশাহী তখ্তে

বসেন। তারপর পাঁচ বছরের মেরুদণ্ডহীন জীবনের শেষে ষড়যন্ত্রে নিহত হন দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৯ সন)।

তাঁর পরবর্তী দিল্লীর বাদশা শাহ আলমও প্রথম জীবনে ছিলেন অযোধ্যার তৃতীয় নবাব সুজা-উদ-দৌলার সমসাময়িক। শাহ আলমের আমলে মোগল বাদশাহীর অবস্থা আহম্মদ শাহ কিংবা দ্বিতীয় আলমগীরের চেয়েও শোচনীয় হল। শাহ আলমের জন্যে মোগল সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট বলতে আর বিশেষ কিছু ছিল না। তাঁর ১৮০৬ সন মৃত্যু পর্যন্ত বাদশা কথাটা তাঁর সম্পর্কে ব্যবহার করতে হয় নিয়মমাফিক। কিন্তু প্রথম ১২ বছর অর্থাৎ ১৭৭১ সন পর্যন্ত দিল্লী থেকে নির্বাসিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাযাবরের মতন ঘুরেছেন রাজ্যহারা অবস্থায়। তারপর মারাঠারা তাঁকে কুক্ষিগত করে নিজেদের স্বার্থেই তাঁকে দিল্লীর তখ্‌তে উপবেশন করায়। সতের বছর মারাঠাদের তাঁবেদাররূপে থাকবার পর শাহ আলম ব্যর্থ চেষ্টা করেন মারাঠা-শক্তিকে অস্বীকার করতে। সেই প্রচেষ্টার ফলে মারাঠাদের হাতে প্রায় বন্দী রূপেই তাঁকে দিল্লীর প্রাসাদে জীবন কাটাতে হয়। মারাঠা সৈন্যদল লালকেল্লা অধিকার করে থাকে এবং সিন্ধিয়ার ক্রীড়নক হয়ে পনের বছর শাহ আলম অবস্থান করতে থাকেন ১৭৮৮ সন থেকে। তারপর ১৮০৩ খৃঃ ব্রিটিশদের হাতে মারাঠাশক্তি পরাস্ত হলে শাহ আলম ব্রিটিশের বৃত্তিভোগীরূপে জীবনের অবশিষ্ট তিন বছর যাপন করেন। সে সময় মোগল সাম্রাজ্য দিল্লীর প্রাসাদেই প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

শাহ আলমের আমলে ১৭৭৫ সন পর্যন্ত অযোধ্যার তৃতীয় নবাব সুজা-উদ-দৌলার জীবনকাল এবং তা তৎকালীন ভারতের গুরুতর রাষ্ট্রনীতিক ঘটনাবর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শাহ আলম ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন না করলেও তিনি এবং নবাব-উজীর সুজা-উদ-দৌলা ভারতবর্ষে নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ-শক্তির ভাগ্যাবর্তনের সূত্রে জড়িত হয়ে পড়েন। বাংলার নবাব মীর কাসিমের ব্রিটিশের আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে শাহ আলম ও সুজা-উদ-দৌলার সক্রিয় অংশ গ্রহণ তদানীন্তন ভারত-ইতিহাসের সুপরিচিত অধ্যায়। সুজা-উদ-দৌলার পরবর্তী অযোধ্যার নবাবদের মধ্যে অপর কোন ব্যক্তির ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখা যায়নি। সুজা-উদ-দৌলার পুত্র আসফ উদ-দৌলার আমলে লক্ষ্ণৌ সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, বাদশাহী দিল্লী লক্ষ্ণৌর ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবু ভারতের রাজনৈতিক জীবনে সুজা-উদ-দৌলার তুল্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি অযোধ্যা রাজ্য।

পূর্বভারতে যে শেষ শত্রু মীর কাসেমকে পর্যুদস্ত করে ইংরেজরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করে, নবাব সুজা-উদ দৌলা তাঁর মিত্ররূপে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচ পাহাড়ির যুদ্ধের (৩রা মে, ১৭৬৪ সন) পর আশ্রিত মীর কাসিমের দুর্দিনে তাঁর ধনরত্ন আত্মসাৎ করে তাঁকে বিতাড়িত করা ইত্যাদি ঘটনা সকলের সুবিদিত। ইংরেজদের হাতে, বীরত্ব সত্ত্বেও, সুজা উদ দৌলা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশের ইচ্ছা হলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিণতি প্রায় মীর কাসিমের অনুরূপ হতে পারত। কিন্তু পরাজিত, হৃতরাজ্য এবং ক্ষমাপ্রার্থী সুজা উদ-দৌলাকে ইংরেজরা তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করে কূট স্বার্থের প্রয়োজনে, বাংলা দেশের দিকে মারাঠা-শক্তির সম্প্রসারণের সামনে buffer state হিসাবে অযোধ্যা রাজ্যকে ব্যবহার করবার জন্যে। সুজা উদ দৌলার রাজ্য থেকে ইংরাজরা তখন শুধু এলাহাবাদ ও কোরা জেলা দুটি বাদশা শাহ আলমের খাসে রেখে দেয়। সেসব প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। শুধু উল্লেখ করে রাখা যায় যে, নবাব-উজীর সুজা-উদ-দৌলা শাহ আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে মীর কাসিমের পক্ষ সমর্থনের অভিপ্রায় প্রকাশ করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সুবিধাবাদী লক্ষ্য নিয়ে। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল, ধ্বংসায়মান মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে যত দূর সম্ভব আপন স্বার্থসিদ্ধি করা। কিন্তু ইংরেজদের হাতে নবাব ও বাদশা দুজনেই

পাটনা ও বক্সারে সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। তারপর সুজা-উদ দৌলা পলায়ন করেন বেরিলিতে আর শাহ আলম সোজা শিবির পরিবর্তন করে যোগ দেন ব্রিটিশের স্বপক্ষে। কূটনীতিবিশারদ রবার্ট ক্লাইভ সুজা-উদ-দৌলাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অযোধ্যা সুবার কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেন। সুজা-উদ-দৌলা অযোধ্যার নবাবী পুনরায় লাভ করলেন বটে, কিন্তু এই সময় থেকেই ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ প্রভাবের চক্রে যুক্ত হয়ে পড়ল অযোধ্যা।

সুজা-উদ-দৌলা তাঁর রাজ্যকালের বেশির ভাগ কাল পূর্ববর্তী দুই নবাবের মতন ফৈজাবাদেই অবস্থান করতেন। জীবনের শেষ দিকে নানা সুবিধা বিবেচনা করে তিনি লক্ষ্ণৌতে বাস আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু হয় ফৈজাবাদে। এখানে, সহরের পূব অঞ্চলে, তাঁর সমাধি-সৌধ একটি দ্রষ্টব্য স্থাপত্য হয়ে আছে। বংশে তিনিই প্রথম কবরস্থ হন ফৈজাবাদে, পূর্ববর্তী দুজন নবাবই দিল্লীতে।

গুলাব বাড়ি নাম এই বিরাট সমাধি-গৃহটি তৃতীয় নবাব নিজেই তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁর পিতা সফদর জঙ্গের দেহ দিল্লীতে সমাধিস্থ করবার আগে এখানেই কবর দেওয়া ছিল সাময়িক ভাবে। অযোধ্যার পথে এই বিশাল সমাধি-ভবন পথিকের দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট করে। সামনে দুটি অতিকায় বহির্ফটক, তৃতীয়টি নিয়ে যায় অন্তর প্রকোষ্ঠে। সেখানেই আছে ইঁটকে গঠিত বিরাট গৃহতলে সুজা-উদ-দৌলার সমাধি। তাঁর তরবারি ও রাজকীয় শিরস্ত্রাণও সেখানে রক্ষিত দেখা যায়। আড়ম্বর-পূর্ণ দৃশ্য। মনে হয়, আপন সমাধি ভবনটি নবাব বহুব্যয়ে ভাবীকালের দর্শকদের সম্ভ্রম জাগাবার জন্যে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে পরে লক্ষ্ণৌতে সাড়ম্বরে ইমারৎ গঠনের যে প্রবণতা প্রকাশ পায়, তার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় এই সময় থেকেই। সুজা-উদ-দৌলার আমলে ফৈজাবাদ খুবই সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, নগর হিসাবে এবং সওদাগরিতেও। ফৈজাবাদের যা কিছু উন্নতি তা তাঁরই জন্যে এবং তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ফৈজাবাদের ক্ষয়িষ্ণুতা আরম্ভ হয়।

সুজা-উদ-দৌলার রাজ্যকালে ভারতবর্ষের বাইরে পারস্য এমন কি ইউরোপ থেকেও সওদাগরদের বাণিজ্য-সূত্রে আগমন ঘটত ফৈজাবাদে। অনেক টাকার সওদা লেন-দেন হত। লোক সংখ্যাও তখন বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সহরও বিস্তৃত হয়েছিল পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত। বাগ-বাগিচা ও বৃক্ষশ্রেণীতে মনোরম দেখাত ফৈজাবাদকে। লক্ষ্ণৌ রোড বরাবর সুজা-উদ-দৌলা তেঁতুল গাছের চমৎকার সব বীথি দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন। ছোটা কলকাতা নামে একটি দুর্গ নির্মাণও করেন, যা এখন নিশ্চিহ্ন। তার সংলগ্ন ফাসিল বলে আরো গড়খাই তৈরি হয়েছিল তাঁর নির্দেশে। উনিশখানি গ্রামের পরিধি বেষ্টন করে সে এক বিরাট চত্বর। দুর্গের পূব, দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক ঘিরে প্রায় এক ক্রোশ ব্যাপী তার পরিখা। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে অনেক বাড়ী তৈরী হয়েছিল তাঁর রাজ্যকালের কয়েক বছরেই। দিলখুসা প্রাসাদ তিনি নতুন করে নির্মাণ করেন। আর তার দক্ষিণে মোতি মহল। চক ও তার তিনটি তোরণযুক্ত ফটক। কেল্লার মধ্যেই আঙ্গুরি বাগ নামে সাজানো বাগিচা। চকের দক্ষিণে সংলগ্ন মোতিবাগ। নগরের পশ্চিমে বুলন্দ বাগ ও লাল বাগ। তখনকার অন্যান্য প্রাসাদের মধ্যে খুর্দ মহলেরও নাম ছিল। নবাবের শ্বশুর সালার জঙ্গের প্রাসাদ সে সবই নিশ্চিহ্ন। শেষোক্ত প্রাসাদের স্মৃতির রেশ রয়ে গেছে রাস্তার সালার জঙ্গ নামের অন্তরালে।

সুজা-উদ-দৌলার বেগম ছিলেন প্রসিদ্ধা আম্মাৎ উজ-জহরা। বহু বেগম নামে তিনি ইতিহাস-খ্যাতা হন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়। হেষ্টিংসের লুণ্ঠনপরায়ণতা ও নানা দুষ্কৃতির জন্যে পরে বিলাতে যে ঐতিহাসিক বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে অযোধ্যার বেগমদের ধনরত্ন আত্মসাৎ করবার অভিযোগ ছিল। সে প্রসঙ্গেও সম্পর্কিতা ছিলেন বহু বেগম। বাংলার রঙ্গ-

মঞ্চের একদা জনপ্রিয় নাটক (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের) 'অযোধ্যার বেগম'-এর নায়িকাও উক্ত বহু বেগম।

নবাবের মৃত্যুর (১৭৭৫ খৃঃ) অনেক বছর পরেও তিনি ফৈজাবাদে বাস করেছিলেন। চকের উত্তর-পূবে প্রাচীরে-ঘেরা বাগানের মধ্যে মোতি মহল প্রাসাদ ছিল তাঁর আবাস। তার কাছেই মসজিদ। মসজিদ পার হয়ে ঈষৎ দক্ষিণে খোজা জওয়াহির আলী খাঁর তৈরী ইমামবাড়া। সেনাবারিকের উত্তরে বেগমের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা দরাব্ আলী খাঁর বিরাট বাগান-বাড়ী—হেষ্টিংসের বিচারকালে এই প্রাসাদও বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিল।

১৮১৬ খৃঃ মৃত্যুর পরে বহু বেগম সমাধিস্থা হন জওয়াহির বাগের সুরম্য সমাধি-ভবনে—নগরের দক্ষিণে, এলাহাবাদ রোডের পূবদিকে। সমাধিস্থল হিসাবে এটি অযোধ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বস্তু। দরাব আলী খাঁ কর্তৃক এটি নির্মিত হবার জন্যে বেগম তিন লাখ টাকা গচ্ছিত রেখে যান। দরাব্ খাঁ আরম্ভ করলেও সমাধি-গৃহ সম্পূর্ণ হয় তাঁরও মৃত্যুর (১৮১৮ খৃঃ) অনেক বছর পরে।

সুজা-উদ্-দৌলা ও বহু বেগমের পুত্র আসফ্ উদ-দৌলা পিতার মৃত্যুতে অযোধ্যার মসনদ লাভ করেন। তিনি বেশিদিন ফৈজাবাদে বাস করেননি এবং তাঁর আমলেই অযোধ্যার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় লক্ষ্ণৌতে।

লক্ষ্ণৌ শুধু তখন প্রথম রাজধানী বলজ্ঞা, তার সব চেয়ে সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির সূচনাও আসফ্ উদ-দৌলার জন্যে। তিনি ফৈজাবাদ ত্যাগ করে যাবার পর থেকে এবং তারপর বহু বেগমের মৃত্যুতে শহরটি একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। আসফ উদ দৌলা জননীর সঙ্গে কলহ করে ফৈজাবাদ থেকে চলে আসেন লক্ষ্ণৌতে।

যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস অযোধ্যা থেকে অর্থের দাবী করছিলেন মাতাপুত্রের কলহ সেই সংক্রান্ত ঘটনা।

নবাব হবার অনতিকালের মধ্যেই আসফ-উদ-দৌলা তাঁর সদর দপ্তর লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ নগরের নতুন করে নির্মাণ এবং তার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন চতুর্থ নবাব উজীর আসফ্ উদ-দৌলা। তাঁর নব রাজধানীকে বর্ধিষ্ণু ও সৌন্দর্যময়ী করাই যেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বিলাস ছিল এবং তা চরিতার্থ করবার জন্যে তিনি সুবার রাজস্ব ও নিজ জীবনেরও অধিকাংশ নিয়োজিত করেছিলেন।

বিশাল রুমি দরওয়াজা বা তুর্কী তোরণ লক্ষ্ণৌতে বিশালাকার, অলঙ্কৃত বাস্তু নির্মাণ এবং তাদের সাড়ম্বর নামকরণের রেওয়াজও তাঁর আমল থেকে আরম্ভ। বড় ইমামবাড়া ও তার সংলগ্ন মসজিদ, নিকটস্থ হুসেনাবাদের বৃহৎ ইমারৎগুলিকে একটা স্থাপত্য গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করা যায় আকারে ও চিত্রোপম কারুকৃতিতে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি আসফ্ উদ-দৌলার অবদান। ১৭৮৪খৃঃ যে সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখনকার বুভুক্ষু প্রজাদের উপার্জনের সুযোগ দেবার জন্যে নবাব এই সব নির্মাণ কার্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। বড় ইমামবাড়াটি গঠন করতেই তিনি ব্যয় করেন এক কোটি টাকা। এই ইমামবাড়ার স্থপতি কিফায়ৎ উল্লা এবং নবাব আসফ্ উদ-দৌলা দুজনেরই দেহ বড় ইমামবাড়ায় সমাধিস্থ আছে।

বিখ্যাত দৌলৎখানা প্রাসাদও আসফ-উদ-দৌলার নির্দেশে গঠিত। হুসেনাবাদ ক্লক-টাওয়ারের উত্তরে অনেকগুলি বড় বড় ইমারৎ নিয়ে এই দৌলৎখানার চৌহদ্দি। আসফ-উদ-দৌলা ও তাঁর আমীর প্রভৃতির আদি বাসস্থল এখানেই ছিল। ফৈজাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌর এই চত্বরে নবাব স্থানান্তরিত করেছিলেন তাঁর দরবার। এখানকার আসফি কোঠি নামক নবাবী আবাসটি তাঁর নামের স্মৃতি রক্ষা করেছে।

বিবিয়াপুর কোঠিও আসফ-উদ-দৌলার আমলে তৈরী। নবাবের শিকারের একটি আস্তানা হিসাবেই বিবিয়াপুর কোঠির প্রথম পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু পরে এই দ্বিতল গৃহটি লক্ষ্ণৌতে আগত বৃটিশ রেসিডেন্টদের প্রথম আগমন উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে ব্যবহার করা হত। পরবর্তীকালে, নবাব উজীর বংশের ষষ্ঠ ব্যক্তি গাজি উদ্দীন হায়দর বৃটিশ প্রদত্ত অযোধ্যার রাজা খেতাব পাবার পর থেকে, অযোধ্যার রাজারা হস্তীপৃষ্ঠে বিবিয়াপুর কোঠিতে এসে নবনিযুক্ত বৃটিশ রাজদূতকে হাওদায় আপন পার্শ্বে উপবেশন করিয়ে রাজকীয় মর্যাদায় রাজধানীতে প্রবেশ করতেন এবং তাঁকে পৌঁছে দিতেন

রেসিডেন্সীতে। লক্ষ্ণৌর সেই সব আড়ম্বরের এবং বৃটিশ প্রভাবের যুগে বিবিয়াপুর কোঠির এই এক উল্লেখ্য স্থান ছিল।

লক্ষ্ণৌর একদা বিখ্যাত মুসাবাগও আসফ্-উদ্-দৌলার আমলে প্রথম পত্তন করা হয়। নবাব একটি সুদৃশ্য বাগান হিসাবে পরিকল্পনা করেছিলেন মুসাবাগের। তারপর তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা, নবাব সাদৎ আলী খাঁ, জেনারেল ক্লড মার্টিনের নক্সা অনুসারে এখানকার গৃহটি নির্মাণ করেছিলেন। নবাব সাদৎ আলী তখনকার এই পল্লীভবন থেকে বন্য পশুদের লড়াই উপভোগ করতেন। আরও পরে, লক্ষ্ণৌর মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে মুসাবাগের এই উদ্যান-বাটিকা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হুসেনাবাদের এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মুসাবাগের মাটিতে বিদ্রোহের প্রথম এবং শেষ পর্যায়ও সংঘটিত হয়েছিল।

সেকালের লক্ষ্ণৌর স্মারকগুলির মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ হল—চক। চক না দেখলে বিগত যুগের লক্ষ্ণৌর পরিচয় সম্পূর্ণ পাওয়া যায়না। উঁচু উঁচু ধাপের সরু সিঁড়ির সারি বেয়ে উঠতে হয় ছোট ছোট দোকানঘরে। সিঁড়ি থেকে আরম্ভ করে দোকানেও দিনদুপুরে আবছা অন্ধকার। দোকানে ঘুলঘুলির মতন জানলা থেকে যা সামান্য আলো আসে তাইতেই নবাগত খরিদ্দার সওদার জিনিষপত্র দেখে। লক্ষ্ণৌর নানা মূল্যবান কারুকর্মের নিদর্শন সব। আগেকার আমলের দুষ্প্রাপ্য রূপার সুদৃশ্য নানা দ্রব্য। চমৎকার নক্সা করা এনামেলের রকমারি কায। মণিমুক্তা খচিত কত সৌখীন ও বহুমূল্য সামগ্রী। নবাবদের ও তাঁদের বেগমদের হাত-ফেরতা হয়েই হয়ত তাদের মধ্যে অনেক কিছু এই বাজারের দোকানগুলিতে এসে হাজির হয়েছে। এমনি দোকানের সারি দু ধারে নিয়ে গড়ে উঠেছে লক্ষ্ণৌর পুরনো চক। তার প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ পথের দুদিকে দুটি সুন্দর তোরণ, তাতে অযোধ্যার নবাবদের বংশীয় প্রতীক চিহ্ন মৎস্য যথারীতি অলঙ্কৃত করা আছে। এই চকেরও আসফ্-উদ্-দৌলার আমলে প্রথম পত্তন।

এমনিভাবে আসফ্-উদ্-দৌলা লক্ষ্ণৌর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তির সঙ্গে বাগ বাগিচা, সেতু বাজার কুয়া ইত্যাদি নানা প্রকার গঠনকার্য সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর বাইশ বছরের রাজ্যকালে। এই সমস্ত নির্মাণ অনুষ্ঠানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর বেতনভোগী কর্মচারী জেনারেল ক্লড্ মার্টিন তাঁকে সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন। ক্লড্ মার্টিন শুধু স্থাপত্য বিষয়ে নয়, নবাবের অন্যান্য কার্যেও ছিলেন অতি বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা।

আসফ্-উদ্-দৌলার সময়ে লক্ষ্ণৌ যেমন বহিরঙ্গে চূড়ান্ত ঐশ্বর্যশালী ও জাঁকজমকে পূর্ণ হয়, রাজনীতিক্ষেত্রে তেমনি বৃটিশ-শক্তির আওতার মধ্যে এসে যায়। বিলাস-বিভূষিত আড়ম্বরে এবং দরবারি সম্ভোগ-সম্পদে লক্ষ্ণৌ বাদশাহী দিল্লীর ওপর টেক্কা দিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অযোধ্যা রাজ্যের স্বাধীন ভূমিকা লোপ পেতে থাকে। সঙ্কুচিত হয়ে আসে রাজ্যের আয়তনও। নবাব আসফ্-উদ্-দৌলা বৃটিশ রক্ষা-কবচের বিনিময়ে জৌনপুর ও বারানসী জেলা এবং বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অর্থ-মূল্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অগ্রাসী হস্তে তুলে দেন।

লক্ষ্ণৌর প্রতিষ্ঠাতা আসফ্-উদ্-দৌলা অযোধ্যা রাজ্যের ইতিহাসে এই অংশ গ্রহণ করে নবাবী-জীবন সাঙ্গ করেন ১৭৯৭ খৃঃ।

মৃত্যুকালে নবাবের কোন বৈধ উত্তরাধিকারী নাকি পাওয়া যায়নি। ওয়াজির আলী নামক এক ব্যক্তি আসফ্-উদ্-দৌলার পুত্র পরিচয়ে দাবিদার হয়ে অধিকার করেন লক্ষ্ণৌর মসনদ। চার মাস তিনি অযোধ্যার তথা-কথিত নবাব হয়ে রইলেন। কিন্তু এ রাজ্যে তখন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অপ্রতিহত ক্ষমতা। বৈধতার প্রশ্নে তাঁরা ওয়াজির আলীকে বহিষ্কৃত করে আসফ্-উদ্-দৌলার বৈমাত্র ভ্রাতা সাদৎ আলী খাঁকে ১৭৯৮ খৃঃ অযোধ্যার নবাবরূপে অধিষ্ঠিত করলেন।

ওদিকে দিল্লীর বাদশাহী তখ্‌তে সিন্ধিয়ার হাতের পুতুল হয়ে তখনো শাহ্ আলম সমাসীন।

বৃটিশের অনুগ্রহে রাজ্যের গদি লাভ করে সাদৎ আলী খাঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে অযোধ্যার আরো

অঞ্চল খয়রাৎ করলেন। পঞ্চম নবাবের আমলে আরো সংক্ষিপ্ত হল অযোধ্যা সুবার সীমানা। পূর্ববর্তী আসফ্ উদ-দৌলার সময় থেকেই অযোধ্যার নবাব উজীর ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় অংশীদার আর বিশেষ ছিলেন না। সাদৎ আলীর আমলে আরো প্রকট হল নবাবীর এই বৈশিষ্ট। রাজ্যের গণ্ডীবদ্ধ পরিধির নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে তিনি আসফ্ উদ-দৌলার দৃষ্টান্ত অনুসরণে লক্ষ্ণৌর বাহ্য সৌন্দর্য আরো কিছু বৃদ্ধি করলেন। আর্থিক বিষয়ে কৃপণ-স্বভাব হলেও তিনি দিলদরিয়া ছিলেন বাস্তু গঠনে। রাজধানীর আকারও তাঁর আমলে বর্ধিত হয়েছিল। অনেক অর্থব্যয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ নগরীকে সম্প্রসারিত করেছিলেন পূব দিকে। লক্ষ্ণৌ শহরের পরবর্তী কালের আকার তাঁর উদ্যোগেই প্রায় নির্ধারিত হয়ে যায়।

গোমতী নদীর লৌহ-সেতুটি তিনিই বহু মূল্যে আনয়ন করেন ইংলণ্ড থেকে, যদিও সেটি ব্যবহারযোগ্য করা হয় তার চল্লিশ বছর পরে দশম নবাব আমজাদ্ আলী খাঁর আমলে।

লাল বারাদারি নামে সুপরিচিত দরবার-গৃহটিও রাজ-সংবর্ধনাদির জন্যে সাদৎ আলী খাঁ নির্মাণ করেছিলেন। অযোধ্যার নতুন নবাবদের অভিষেকও সম্পন্ন হত এই দ্বাদশ দ্বার বিশিষ্ট লোহিত বর্ণের ভবনে।

ক্লড মার্টিন নির্মিত ফরহৎ বখ্স অর্থাৎ আনন্দদায়ক প্রাসাদ তাঁর নিকট থেকে সাদৎ আলী খাঁ ক্রয় করেন এবং পুনর্গঠনের পর এই প্রাসাদ অযোধ্যার রাজাদের রাজকীয় বাসস্থানে পরিণত হয়। এর চারদিকে গড়ে ওঠে বেগমদের, তাঁদের সন্তানদের এবং নানা রাজপুরুষদের আবাস। পরবর্তী যুগের ইংরেজ শাসনকালে ফরহৎ বখ্স্ ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের লাইব্রেরী হয়েছিল!

মহাবিদ্রোহের সময়ে লক্ষ্ণৌর ঐতিহাসিক ঘাঁটি হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ রেসিডেন্সীও (অযোধ্যা রাজ্যে ইংরেজ রেসিডেন্টের সরকারী ভবন) সাদৎ আলী খাঁ (১৮০০ খৃঃ) তৈরী করেছিলেন। এই প্রাসাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হল—তয়খানা প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ব্যবহারের জন্যে গঠিত ভূগর্ভস্থ গৃহ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মে সেই যুদ্ধবিগ্রহে অবরুদ্ধ রেসিডেন্সীতে এই তয়খানা অনেক ইংরেজ নারী ও শিশুদের শীতল আশ্রয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল।

সুদৃশ্য মোতি মহল প্রাসাদও নবাব সাদৎ আলী খাঁর নির্দেশে নির্মিত। মোতি মহলের আমলে গম্বুজটি বৃহদাকার মুক্তার আকৃতিতে গঠিত হওয়ার জন্যে প্রাসাদের এই নামকরণ হয়েছিল। দক্ষিণ দিক থেকে মোতি মহলের প্রবেশ পথে ত্রিতল তোরণে অযোধ্যার নবাব বংশের রাজকীয় প্রতীক চিহ্ন তিনটি মৎস্য—মচ্ছি ভবনের মতন—অলঙ্কৃত। পরবর্তীকালে মহাবিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্যায়ে ইংরেজের ভাগ্যচক্র তাদের স্বপক্ষে আবর্তিত হতে আরম্ভ করে মোতি মহলের সংলগ্ন এলাকায়। এখানেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংগ্রামে বিপন্ন বৃটিশ বাহিনী। নতুন ইংরেজ সেনাদলের সাহায্য লাভের ফলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। মোতি মহলের নীচু প্রাকারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে একটি মর্মর ফলকে সেই ঘটনার স্মারকলিপি খোদিত আছে: এই স্থানের প্রায় বিশ পদ দূরে, মোতি মহলের পার্শ্ব-দেওয়াল বরাবর স্যর জেম্স আউট্রাম ও স্যর হেন্রি হ্যাভেলক অগ্রসর হয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ তারিখে স্যর কলিন ক্যাম্বেলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।...

সেকালের লক্ষ্ণৌর আরো একটি দ্রষ্টব্য প্রাসাদ দিল্‌-খুশা ও সাদৎ আলী খাঁর আমলে নির্মিত। চৌকোণ চূড়াবিশিষ্ট মধ্যযুগীয় দুর্গ ধরণের এই প্রাসাদ তিনি শিকারের আস্তানা হিসেবে তৈরী করান। পরে এটি বেগমদের অন্যতম প্রিয় গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয়। তারপর মহাবিদ্রোহের সময়ে দিলখুশা হয়ে পড়ে বিদ্রোহীদের একটি দুর্গ, যা প্রচণ্ড যুদ্ধে অধিকার করে নেন ইংরেজ সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্বেল। ইংরেজপক্ষীয় আর এক বিখ্যাত সেনানায়ক স্যর হেন্রি হ্যাভেলকের ২৪ নভেম্বর, ১৮৫৭ তারিখে দিলখুসার উদ্যানমধ্যস্থ শিবিরে মৃত্যু হয়েছিল, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

হায়াৎ বখ্স্ নামে প্রাসাদটিও নবাব সাদৎ আলী খাঁর আমলে গঠিত। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে হায়াৎ বখ্সের অধিকার নিয়ে একাধিক খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায় ইংরেজ ও বিদ্রোহীদের মধ্যে। বিখ্যাত মেজর হড্সন্ এই প্রাসাদের

একতলার একটি কক্ষে মৃত্যু বরণ করেন, আহত অবস্থায় আনীত হবার পর। পরবর্তী ইংরেজ আমলে হায়াৎ বখ্স্ গভর্ণমেন্ট হাউস নামে পরিচিত ছিল।

খুর্শাদ মঞ্জিল (সূর্যের আলয়)-ও নবাব সাদৎ আলীর আমলে তৈরি আরম্ভ হয়, যদিও সম্পূর্ণ হয়েছিল পরবর্তী নবাব গাজী উদ্দীন হায়দরের সময়ে। মহা বিদ্রোহের রক্ত-রাঙা অধ্যায়ে খুর্শাদ মঞ্জিল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ফটকের বাম পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভে তার নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি উৎকীর্ণ আছেঃ '১৭ই নভেম্বর, ১৮৫৭ খৃঃ, এই স্থানেই হ্যাভেলক, আউটরাম এবং স্যর কলিন ক্যাম্বেল মিলিত হয়েছিলেন।...

ইংরেজ গভর্ণমেন্ট পরে লা মার্টিনীয়ার ট্রাস্টকে দান করে খুর্শাদ মঞ্জিল এবং এখানে স্থাপিত হয় লা মার্টিনীয়ার গার্লস হাই স্কুল।

এতসব নির্মাণ কার্যে অর্থব্যয় করেও নবাব সাদৎ আলী খাঁ রাজকোষে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত রেখে যান। তাঁর পুত্র ও পরবর্তী নবাব গাজী উদ্দীন হায়দর নির্মিত (কাইসর বাগের উত্তর-পূর্ব দিকে) মক্বারায় (সমাধি গৃহে) কবরস্থ আছে সাদৎ আলী খাঁর মর-দেহ।

১৮১৪ খৃঃ নবাব সাদৎ আলীর মৃত্যুতে গাজী উদ্দীন হায়দর অযোধ্যার মসনদ লাভ করেন। ষষ্ঠ নবাব গাজী উদ্দীনের আমলে ঐশ্বর্য আড়ম্বরের জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে লক্ষ্ণৌ দরবার। বিলাস-বৈভবের সঙ্গে সাহিত্য শিল্পাদিও নবাবী পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে অর্জন করতে থাকে। সেই সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসকশক্তিকে আরো সুবিধা দান করেন গাজী উদ্দীন হায়দর। তার স্বীকৃতি স্বরূপ লর্ড হেস্টিংস (ওয়ারেন হেষ্টিংস নয়) নবাবের রাজ্য লাভের পাঁচ বছর পরে তাঁকে 'অযোধ্যার রাজা' রূপে ঘোষণা করেন। অযোধ্যার নবাব-উজীর বংশে গাজী উদ্দীন হায়দর হলেন প্রথম রাজা। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বৃটিশ ক্ষমতার সামনে রাজার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্য বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। সে সময় দিল্লীর তখ্তে মোগল বাদশার জীবন্ত কঙ্কাল দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-১৮৩৭ খৃঃ) সমাসীন।

গাজী উদ্দীন হায়দর সৌধ নির্মাণ বা প্রশাসনিক বিষয়ে পিতার তুল্য যোগ্যতা প্রদর্শন করেন নি। তিনি বহু ব্যয়ে নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত কদম রসুলের পশ্চিম দিকে বৃহদাকার শুভ্র গম্বুজশীর্ষ শাহ্নজফ্ নামক সুদৃশ্য সমাধি ভবনটি। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জামাতা এবং প্রসিদ্ধ ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় হাসান ও হোসেনের পিতা আলীর স্মৃতিতে গাজী উদ্দীন এই মকবারা স্থাপন করেছিলেন। আরব দেশে যে নজফ পর্বতে আলীর সমাধি আছে সেই অনুসারে নামকরণ হয় লক্ষ্ণৌর শাহ্নজফ্। এই মকবারার ব্যয় নির্বাহের জন্য গাজী-উদ্দীন হায়দর বৃটিশ সরকারের কাছে এক কোটি টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন।

চমৎকার বাগিচায় সাজানো শাহ্নজফ-ও সিপাহী-বিদ্রোহের আগুনের স্পর্শ পেয়েছিল। প্রথম দিকে শাহ্-নজফ ছিল বিদ্রোহীদের দখলে। শেষে ক্যাপ্টেন (পরে ফিল্ড মার্শাল লর্ড উল্সলীর অধিনায়কতায় ইংরেজপক্ষ প্রচণ্ড যুদ্ধে এই সমাধি সৌধ অধিকার করে নেয়।...

ছত্তর মঞ্জিল নামে সুপরিচিত ও সুদৃশ্য প্রাসাদ দুট তাঁর নির্দেশে গঠিত হতে আরম্ভ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি জীবিত কালে। ছত্তর মঞ্জিল বিশেষ করে হারেমের মহিলাদের জন্যে নির্মাণ করা হয় এবং তাঁর পুত্র নাসির উদ্দীন হায়দরের আমলে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কক্করওয়ালি কোঠি নামে পরিচিত চৌকোণাকার মজবুত ভবনটিও গাজী উদ্দীন হায়দরের তৈরি।

গাজী উদ্দীন হায়দর ফরহৎ বখসে বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৮২৭ খৃঃ। নবাবের দেহ সমাধিস্থ আছে গোমতী নদীর তীরে শাহ্ নজফের সুপ্রশস্ত প্রধান প্রকোষ্ঠে। তাঁর দুই পার্শ্বে প্রিয় বেগম মুবারক মহল ও অপর এক বেগম সমাধিস্থা।

গাজী উদ্দীন হায়দরের ১৮২৭ খৃঃ মৃত্যুতে তাঁর পুত্র সুলেমান জাহ্ নাসির উদ্দীন হায়দর খেতাব নিয়ে অযোধ্যার গদী আসীন হন। লক্ষ্ণৌর রাজকোষে রাজ্যের নিয়মিত আদায়ের অতিরিক্ত যে দশ কোটি টাকা গাজী উদ্দীন হায়দর উদ্বৃত্ত রেখে গিয়েছিলেন, সে সবই

লাভ করেন দ্বিতীয় রাজা বা সপ্তম নবাব। নাসির উদ-দীনের দশ বছরের নবাবী-জীবন বিলাস ব্যসন স্বেচ্ছাচার এবং দুর্নীতিতে পূর্ণ হয়ে ত্বরান্বিত করে অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া। ইউরোপীয়দের সঙ্গে তিনি বেশি পছন্দ করতেন এবং তাদের নানা সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেন।

ইউরোপীয় রূপজীবিনীদেরও স্থান ছিল তাঁর হারেমে। তাদের জন্যে তিনি 'বিলাইতি বাগ' তৈরি করেছিলেন। তাঁর নির্মিত বাদশা বাগেও ছিল তাদের জন্যে পৃথক পৃথক মহল। চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর ঘেরা বাদশা বাগ। তার মাঝখানে সুন্দর কারুকার্যখচিত স্তম্ভের ওপর স্থাপিত উন্মুক্ত হল-ঘরের ছাদ। সুপরিকল্পিত বাগানের মধ্যে সুগন্ধী গোলাপ জলে ভরা নকল হ্রদ। তার ধারে ধারে নানা রঙের ফুলের কেয়ারি। প্রিয় বেগমদের সঙ্গে নাসির-উদ্ দীন হায়দরের প্রমোদ-জীবনের লীলাস্থল এই বাদশা বাগ ও সিপাহী বিদ্রোহের যুদ্ধবিগ্রহে বিজড়িত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা বাদশা বাগের পিছন দিক থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। নদী পারাপারকারী বৃটিশ সৈন্যদের ওপর। পরে ইংরেজ সেনাদল বাদশা বাগের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এক গোলন্দাজ ঘাঁটি তৈরী করেছিল।

গাজী-উদ-দীন হায়দরের আমলে আরম্ভ হয়েছিল যে ছত্তর মঞ্জিল তার নির্মাণ সমাপ্ত হয় নাসির-উদ দীনের রাজ্যকালে। ছত্তর মঞ্জিলের পরিকল্পনা নাকি আরও আগে, গাজী-উদ দীনের পিতা সাদৎ আলী খাঁ প্রথম করেছিলেন। তিন নবাবের আমল যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ হয় বেগমদের জন্যে এই রমনীয় প্রাসাদ। বড় ও ছোট ছত্তর মঞ্জিলের শীর্ষদেশে সোনালি ছত্রের অলঙ্করণ থেকে প্রাসাদ দুটির নামকরণ হয়েছে। বড় ছত্তর মঞ্জিল ত্রিতল। তার চূড়ায় স্বর্ণ বর্ণের ছত্র শোভিত। এ মঞ্জিলের গর্ভগৃহে বিশাল তয়খান। তার বাইরের প্রাকারে গোমতীর জলধারার ঝাপটে শীতল থাকত ভূতলের কক্ষগুলি, বেগমদের আরামের জন্যে।

ছোট ছত্তর মঞ্জিলের দুদিকে আরো দুটি সুদৃশ্য ভবন। গুলিস্তাঁ-ই-আরাম (স্বর্গীয় উদ্যান) ও দর্শন-বিলাস তাদের নাম। প্রথমোক্ত গৃহের ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে নাসির-উদ-দীন হায়দর নিহত হন বিষ প্রয়োগে। এক রমণীর হাত থেকে নবাব বিষমিশ্রিত পানীয় গলাধঃকরণ করেছিলেন (৭, জুলাই, ১৮৩৭ খৃঃ)। আরো বিশ বছর নারীকণ্ঠের মৃদু হাসি ও কলধ্বনিতে মুখরিত ছিল ছত্তর মঞ্জিল। তারপর বিদ্রোহের গুরুগর্জনে স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন বিদ্রোহীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হয়েছিল ছত্তর মঞ্জিল। পরবর্তীকালের বৃটিশ আমলে ছত্তর মঞ্জিল হয় ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের গৃহ।

কথিত আছে, নাসির উদ-দীন হায়দরের চরিত্র অনেকাংশে উদ্ঘাটিত হয়েছে ডব্লিউ নাইটন লিখিত Private life of an Eastrn king পুস্তকে। কৌতূহলী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

গাজী-উদ-দীন হায়দর রাজকোষে যে দশ কোটি মুদ্রা উদ্বৃত্ত রেখেছিলেন, তার মধ্যে থেকে ন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা বিলাস-জীবনে ব্যয় বা অপব্যয় করে' ফেলেন নাসির-উদ্-দীন হায়দর।

অবক্ষয়ের যে ধারা পূর্ববর্তী নবাবদের আমলে আরম্ভ হয়েছিল, তা একেবারে নিম্নমুখী হয়ে পড়ে নাসির উদ-দীনের অব্যবস্থিত জীবন। দিল্লীর বাদশার রূপ-গুণবতী কন্যা তাঁর বেগম হওয়া সত্বেও তিনি এক ধাত্রীকে প্রধানা বেগম পদাভিষিক্তা করেন, মালিকা জমানি (যুগের রাণী) উপাধি দান করে। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে সেই ধাত্রীর পুত্র কাইওয়ান জাহ্-কে অযোধ্যার মসনদের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন, যদিও তার জননীর প্রাসাদে প্রবেশের তিন বছর আগে কাইওয়ানের জন্ম। তা ছাড়া, নাসির-উদ-দীন তাঁর মন্ত্রী ও পরামর্শদাতাদের অগ্রাহ্য ও বিরক্ত করে ইউরোপীয়দের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দান করার ফলেও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। নানা কার্যকারণে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলতে থাকে দরবারে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে। সেসবের শেষ পরিণতি—নবাবের গুপ্ত-হত্যা (১৮৩৭ খৃঃ)

নাসির-উদ-দীনের মৃতদেহ যখন গুলিস্তাঁ-ই-আরামের নিভৃত কক্ষে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল, তখন লাল বারাদারির দরবারে এক নবাবী নাটকের দৃশ্য আরম্ভ হয়। নাসির

উদ-দীনের বিমাতা বাদশা-বেগম কোন কোন মন্ত্রীর প্ররো-চনায় অযোধ্যার মসনদ দখল করতে এলেন তাঁর পুত্র মুন্নাজানের নামে। মুন্নাজান কিন্তু বৈধ দাবিদার হতে পারেনা, কারণ গাজী-উদ্-দীনের পুত্র সে নয়। তার জননী গাজী উদ্-দীনকে বিবাহ করবার পূর্বে মুন্নাজানের জন্ম অথচ লাল বারাদারির দরবারে প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী প্রভৃতির সহায়তায়, বাদশা-বেগম নাসির্-উদ-দীনের আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর সেই সুযোগে মুন্নাজানের অভিষেক-উৎসবের আয়োজন করলেন এবং বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্ণেল লো-কে বাধ্য করলেন সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

মুন্নাজানকে তখ্‌তে বসাবার ষড়যন্ত্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। বৃটিশ রেসিডেন্টের চেষ্টায় মৃত নবাবের খুল্লতাত (গাজী উদ-দীনের ভ্রাতা) মহম্মদ আলী যথাবিধি লাভ করেন অযোধ্যার মসনদ।

পূর্ববর্তী দুই নৃপতির তুলনায় মহম্মদ আলী শাহ্ অনেক যোগ্য ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তখন বৃদ্ধ। রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন ও পতন রোধ করবার জন্যে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা থাকলেও সাধ্য আর বিশেষ ছিলনা। রাজ্য লাভ করবার পর পাঁচ বছর মাত্র জীবিত ছিলেন তিনি।

অশক্ত, অসমর্থ মহম্মদ আলী অন্তিমকালের কথা বিবেচনা করে' আপন সমাধিভবন স্বরূপ বহুমূল্য হুসে-নাবাদ ইমামবাড়াটি তৈরি করলেন। প্রকাণ্ড তোরণ পার হয়ে প্রাচীর-ঘেরা সেই কবরস্থান অনেক অর্থব্যয়ে গঠিত। শবদেহ কি মূল্যবান আচ্ছাদনাদিতে ভূষিত থাকবে তারও বন্দোবস্ত তাঁর করা। প্রবেশ-পথের বিপরীত দিকে নহবৎখানা, সেখানে সাতজন শানাইবাদক প্রতিদিন মৃতের সম্মানে বাজনা শোনাবে। সুরম্য ইমামবাড়ার অভ্যন্তরে জেলোখানা (অলঙ্কৃত স্থান)-ও প্রচুর অর্থব্যয়ে তৈরি। মহম্মদ আলী ও তাঁর জননীর সমাধি ভারি রূপোর রেলিংঘেরা। কাছেই নবাবের রূপোর সিংহাসন, কয়েকটি দামী তাজিয়া, দু খণ্ড কোরাণ।

লক্ষ্ণৌর নবাবী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন এই হুসেনাবাদ ইমামবাড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মহম্মদ আলী শাহ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কাছে কয়েক লক্ষ টাকা গচ্ছিত রেখে যান।

জুমা মসজিদও তাঁর আমলে তৈরী যদিও তখন সম্পূর্ণ হয়নি। পরে তাঁর বেগম মালকা জাঁহা এর গঠন কায শেষ করেছিলেন। মহম্মদ আলী শাহের দশ লক্ষ টাকা এ সম্পর্কে তাঁকে দিয়ে যাওয়ার জন্যে।

জুমা মসজিদের সামনে, দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হলে দেখা যায় একটি হলুদ রঙের গৃহ, তার নাম পিলি কোঠি। সেটি ছিল মহম্মদ আলীর আবাস। তাঁর মৃত্যুর পনের বছর পরে মহা বিদ্রোহের সময় এই পিলি কোঠি বিদ্রো-হীদের একটি ছোট ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল? এখানকার দুটি কামান থেকে বৃটিশ ফৌজের ওপর অনেক গোলা-বর্ষণের পর জেনারেল হ্যাভেলকের নেতৃত্বে পিলি কোঠি দখল করে নেয় ইংরেজ সৈন্যদল।

১৮৪২ খৃঃ মহম্মদ আলী শাহের মৃত্যুতে অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেন তাঁর পুত্র আমজাদ আলী শাহ্। প্রশাসনিক কার্যাদিতে তাঁর যোগ্যতা বা আগ্রহ আদৌ ছিলনা। হারেমে বেগমদের সঙ্গেই তিনি যাপন করতেন অধিকাংশ সময়।

তবে বংশের ধারায় নির্মাণ কর্ম তিনি কিছু করেছিলেন। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর নিজের সমাধির জন্যে তৈরি মক্‌বারা। দুটি দর্শনীয় তোরণ দ্বার দিয়ে অগ্রসর হয়ে এগারটি ধাপের শেষে উচ্চ পাথরের সমতলের ওপর সেই সমাধিগৃহ অবস্থিত। বহিরঙ্গে স্থাপত্য-কারুর অভাব সমাধির অভ্যন্তরে প্রচুর অর্থব্যয়ে খচিত অলঙ্করণে যেন পূরণ করা হয়েছে। কবরস্থানে এত ধনরত্নের আড়ম্বর ছিল যে, বিদ্রোহের সময়ে তা সবই লুণ্ঠন করে নেয় বিদ্রোহীরা। ইংরেজ সৈন্য লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার করবার পর আমজাদ আলী শাহের এই মকবারা খৃষ্টানদের গীর্জা হিসেবে প্রথমে ব্যবহার করা হত।

আমজাদ আলীর আমলের আর একটি নিদর্শন বেগম কোঠি। তাঁর বেগম মালিকা আহাদ বেগমের জন্যে ১৮৪৪ খৃঃ এই প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করেন। এই জায়গাতেই পঞ্চম নবাব সাদাৎ আলী খাঁ একটি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন চল্লিশ বছর আগে। আমজাদ আলী শাহের অন্যতম বিলাসভবন এই বেগম কোঠিও তাঁর

মৃত্যুর বার বছর পরে বিদ্রোহের আগুনে ঝলসিত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয় তখন বেগম কোঠি। প্রায় পাঁচ হাজার সেপাই এর চত্বরের মধ্যে আস্তানা নিয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যদলের আক্রমণের সামনে এর দরজা জানলার লুকানো ছিদ্র থেকে তখন অনর্গল অগ্নি উদ্‌গীরণ করেছিল বিদ্রোহীদের বন্দুক। বৃটিশ বাহিনী এ প্রাসাদ অধিকার করবার আগে এর বারান্দায় বারান্দায় ঘরে ঘরে লড়াই হয়ে যায়। বেগম তখন এখানেই। ছিলেন এত দ্রুত ইংরেজরা বেগম কোঠিতে ঢুকে পড়ে যে, অল্পের জন্যে বন্দীত্ব এড়িয়ে যান তিনি। তাঁর পরিচারিকারা পলায়ন করতে না পেরে ধরা পড়ে যায়।

পরবর্তীকালের ইংরেজ আমলে বেগম কোঠি হয় জেনারেল পোষ্ট-অফিস।

আমজাদ আলীর আমলে আর তৈরি হয়েছিল কাণপুর পর্যন্ত পাকা সড়ক। তিনিও তাঁর পিতার মতন পাঁচ বছর মাত্র রাজত্ব করেছিলেন, যদিও বৃদ্ধ তিনি হননি। তাঁর শাসনকালে রাজ্যে এত বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা দেখা দেয় যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক উন্নতি করতে না পারলে হারাতে হবে অযোধ্যার মসনদ। কিন্তু তার আগে জীবন হারিয়ে আমজাদ আলী শাহ্ সব দায়-দায়িত্ব চুকিয়ে গেলেন (১৮৪৭ খৃঃ)।

পিতার মৃত্যুতে ওই সালে অযোধ্যার রাজত্ব লাভ করলেন ওয়াজিদ আলী শাহ্—এই বংশে পঞ্চম ও শেষ রাজা। দশম ও শেষ নবাব।

ওয়াজিদ আলী শাহের মসনদ লাভ করবার কথা নয়, কারণ তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুস্তাফা আলী অপরিণত বুদ্ধি ও অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন ওয়াজিদ আলী। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ২৪ বছর (১৮২৩ খৃঃ ওয়াজিদ আলীর জন্ম)। আমজাদ আলী শাহ মৃত্যুর অনেক আগেই জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরক্ত হয়ে ওয়াজিদ আলীকে উত্তরাধিকার দানের ঘোষণা করেছিলেন।···

নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের বৃত্তান্ত আরম্ভ করবার আগে লক্ষ্ণৌ দরবারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত নবাব বংশের ধারা বিবরণে নবাবদের রাষ্ট্রীয় জীবন এবং স্থাপত্য প্রসঙ্গ মাত্র আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্ণৌর একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে যা বিশেষভাবে নবাব বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত। লক্ষ্ণৌ দরবারের দান, সঙ্গীত ও নৃত্য, কাব্য ও সাহিত্য, অন্যান্য চারু ও কারু শিল্প, পোষাক-আষাক ও সাজসজ্জা সুগন্ধী ও বিলাসদ্রব্যাদি, নাগরিক শিষ্টাচার ও আদবকায়দা। সব মিলিয়ে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি ধারা, যা লক্ষ্ণৌর নবাব-দরবারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংপৃক্ত। বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যাকে বলা যায়—হিন্দুস্থানের জমিতে একটি বিশেষ পর্যায়ের পারস্য সংস্কৃতির ফসল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এক পারসিক পরিবারের সাত আট প্রজন্ম ভারতবর্ষে অবস্থানের ফলে একটি ধারার সমন্বয় সাধন। নবাবী চরিত্রের ছায়ার অংশ সত্ত্বেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা অবদানে তার প্রকাশ। দিল্লী দরবারের পতনের যুগে এই লক্ষ্ণৌ দরবারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্ণৌর বিশিষ্ট রীতি বা চাল বা ঘরাণার প্রবর্তন নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত ও গীত-চর্চার নানা বিভাগে।

অযোধ্যা সুবার রাজধানী হিসাবে লক্ষ্ণৌ দরবার এই নাগরিক সংস্কৃতি ধারার কেন্দ্রস্থল হয়। নবাবী আমলের অযোধ্যা রাজ্যের সমস্ত রোশনি প্রতিফলিত হয়েছিল লক্ষ্ণৌ দরবারে। অযোধ্যা বা আউধের চেয়ে এ পর্যায়ে লক্ষ্ণৌ দরবারের নাম বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ বলা যায়, অযোধ্যার অবশিষ্ট অঞ্চল শোষণ করে স্ফীত হয়ে ওঠে লক্ষ্ণৌ। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে প্রজাসাধারণকে দুর্দশায় জর্জরিত করে লক্ষ্ণৌ দরবারের জৌলুষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে নবাব ওয়াজিদ আলীর নির্বাসন প্রসঙ্গে।··

নবাব বংশের ইতিহাসে দেখা গেছে, লক্ষ্ণৌ দরবারের পত্তন করেন চতুর্থ নবাব উজীর আসফ্-উদ-দৌলা (রাজ্যকাল ১৭৭৫-১৭৯৭ খৃঃ) লক্ষ্ণৌ দরবারের সাংস্কৃতিক

পর্যালোচনা সেজন্যে আফস্ উদ দৌলার আমল থেকে কর্তব্য।

অবশ্য লক্ষ্ণৌর গীত বাদ্য নৃত্য প্রধান দরবারী সংস্কৃতির পরিচয় তাঁর পিতা সুজা উদ্-দৌলার সময় থেকেই পাওয়া যায়, যদিও তাঁর দরবার ছিল ফৈজাবাদে, লক্ষ্ণৌতে নয়। ফৈজাবাদ দরবারে তৃতীয় নবাব সুজা উদ্-দৌলার (রাজ্য-কাল ১৭৫৩-১৭৭৫ খৃঃ) আমলে সঙ্গীত ও নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতার সূচনা। তাঁর পূর্ববর্তী দুই নবাব সাদৎ খাঁ বুরহান-উল্-মুলক (১৭৩২-১৭৩৯ খৃঃ) ও সফ্দর জঙ্গের (১৭৩৯-৭৫৩ খৃঃ) আমলে যদিও লক্ষ্ণৌর মচ্ছি ভবনে অস্থায়ী আবাস ছিল, কিন্তু সেখানে সঙ্গীতাদি চর্চা হওয়ার কথা জানা যায়:না। সম্ভবত প্রথম দুই নবাবের সময়ে পরবর্তীকালের মতন কোন সাঙ্গিতিক দরবারের অস্তিত্ব ছিল না লক্ষ্ণৌ বা ফৈজাবাদে।

তার একটি কারণ এই হতে পারে যে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গ থেকে তাঁরা ছলে বলে কৌশলে অযোধ্যা রাজ্যকে কুক্ষিগত করতে ব্যস্ত ছিলেন, বংশধরদের মতন দরবারী উপভোগের অবসর তাঁদের অল্পই ছিল। এই নবাব বংশে সঙ্গীত নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপে প্রথম সুজা-উদ-দৌলার নাম পাওয়া যায়। তাঁর দরবারে অন্যতম মুখ্য স্থান ছিল সঙ্গীতের। এ বিষয়ে তিনি দরাজ পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন এবং দূর দূরান্তর থেকে নানা প্রকার সঙ্গীতজ্ঞদের আনয়ন করে দরবারে স্থান দেন। দিল্লীর শিল্পীরাও নিযুক্ত থাকতেন সুজা উদ-দৌলার চিত্ত বিনোদনের জন্যে। গায়ক গায়িকা নর্তক নর্তকীদের প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি দরবারে পোষণ করতেন। নৃত্যে যে পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার প্রবর্তন হয় তার সূত্রপাত সুজা উদ-দৌলার সময়ে হয়েছিল, বলা যায়।

সুজার মাতুল নবাব সালার জঙ্গ স্বয়ং ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতবিদ।

স্বনামধন্য টপ্পাগুণী শোরি মিঞা বা গোলাম নবী সুজা-উদ-দৌলার আমলে লক্ষ্ণৌ নিবাসী ছিলেন, তবে নবাবের সঙ্গে তাঁর কতখানি যোগাযোগ ছিল সেবিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

লক্ষ্ণৌ দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আসফ উদ-দৌলার আমলের প্রথম ভাগেও বর্তমান ছিলেন শোরি মিঞা। চতুর্থ নবাবের সময়ে দরবারী উৎসাহ প্রদানে সঙ্গীত চর্চার আরো বৃদ্ধি হয়েছিল। 'উসুল্ উন্ নাথ্মৎ' নামে সঙ্গীতের তত্ত্ব বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তক ফারসী ভাষায় রচিত হয় আসফ্ উদ্-দৌলার আমলে। গ্রন্থটি নবাবকে উৎসর্গীকৃত।

তারপর ষষ্ঠ নবাব গাজী উদ্-দীন হায়দরের (১৮১৪-১৮২৭ খৃঃ) আমলেও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ ছিল লক্ষ্ণৌ দরবার। তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক হায়দারি খাঁ তাঁর দরবারী কলাবৎ ছিলেন।

নাসির উদ্-দীনের (১৮২৭-১৮৩৭ খৃঃ) দরবারেও অব্যাহত ছিল সঙ্গীতের ধারা। কিন্তু মহম্মদ আলী শাহের (১৮৩৭-১৮৪২ খৃঃ) আমলে নয়।

আমজাদ আলী শাহের (১৮৪২-১৮৪৭ খৃঃ) স্বল্প রাজ্যকালেও লক্ষ্ণৌ দরবারে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতচর্চা হত। তানসেনের কন্যাবংশীয় বীণ্কার ও মরাও খাঁ ছিলেন আমজাদ আলীর দরবারের নিযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ। মহাগুণী ওমরাও খাঁ পুত্র আমীর খাঁ (রামপুর ঘরানার অন্যতম প্রবর্তক) ভিন্ন লক্ষ্ণৌতে অপর দুই কৃতী শিষ্যকে তালিম দিয়েছিলেন—কুতুব্-উদ্-দৌলা ও গোলাম মহম্মদ।

আমজাদ আলীর পুত্র ওয়াজিদ আলী শাহের (১৮৪৭-১৮৫৬ খৃঃ) আমলে লক্ষ্ণৌ দরবারের সঙ্গীত চর্চা এক বিস্তৃত প্রসঙ্গ। ওয়াজিদ আলীর জীবনকথা আলোচনার সময় তার পরিচয় দেওয়া হবে।

লক্ষ্ণৌ দরবারে নৃত্যের স্থানও অন্যতম প্রধান—সুজা উদ্-দৌলা থেকে ওয়াজিদ আলীর আমল পর্যন্ত। এখানকার দরবারী পরিবেশে যে বিশিষ্ট নৃত্যধারা গড়ে ওঠে, পরে কথক নৃত্যে তা লক্ষ্ণৌ ঘরাণা নামে ভারত প্রসিদ্ধ হয় কথক নৃত্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর ভারতের দুই প্রধান ঘরাণা। এই নৃত্য ধারায় লক্ষ্ণৌ ঘরাণার প্রসিদ্ধি শুধু নয় প্রবর্তনও বলা যায় নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবার থেকে, যদিও তার সূচনা পূর্ববর্তী নবাবদের আমলে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের কথক নৃত্যের সঙ্গে দিল্লী ও আগ্রা কেন্দ্রও সম্পর্কিত। অনেকাংশে সম পরিবেশে, মুসলমান বাদশা নবাবদের চাহিদার প্রত্যক্ষ প্রভাবে ও আনুকূল্যে এই নৃত্যকলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আসলে কিন্তু কথক নৃত্যানুষ্ঠান প্রাচীনতর পদ্ধতি, মুসলমান-পূর্ব যুগ থেকে ভারতে তার প্রচলন। মন্দির-আশ্রয়ী এবং ধর্মকর্মের অঙ্গাঙ্গী এই নৃত্যরীতি নবাবী আমলে বিলাস-জীবনের একটি চিত্তাকর্ষক উপকরণ হিসাবে দরবারে প্রদর্শনের বস্তু হয়। যা ছিল মহৎ ভাবলোকের লীলার রূপায়ণ সেই কথিকা-প্রধান কথক পর্যবসিত হল শরীর সর্বস্ব প্রমোদবিলাসের উপকরণে। শাস্ত্রীয় কথক-নৃত্যের আঙ্গিক, করণ অঙ্গহারের সুচারু রূপকল্পের স্থানে নতুন পৃষ্ঠাপোষকের রুচি অনুসারে শুধু চিত্তরঞ্জক, নয়নলোভন নৃত্য ভঙ্গিমা এবং উত্তেজক তাল-প্রক্রিয়া দেখা গেল। মন্দির থেকে দরবারে পরিক্রমণের ফলে চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে গেল কথক নৃত্য শিল্পের। জয়পুর ঘরাণার কথক নৃত্য হিন্দু রাজাদের আনুকূল্যে লালিত হলেও মধ্যযুগীয় নবাবী-বাদশাহী পরিবেশের আওতায় ও অনুকরণে বহিরঙ্গপ্রধান নৃত্য-পদ্ধতি রূপে গড়ে ওঠে।...

লক্ষ্ণৌ দরবারে বরাবরই নৃত্যের কদর। সুজা-উদ্-দৌলার আমলে শুধু নর্তকীরা নয়, বারাণসীর কথক সম্প্রদায়ের নর্তকবৃন্দও দরবারে নিযুক্ত থাকার কথা জানা যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতবিখ্যাতও। সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যাচার্য খুশী মহারাজ সুজা-উদ্-দৌলার আমল থেকে আরম্ভ করে আসফ উদ্-দৌলার দরবারেও বিদ্যমান ছিলেন।

তারপর সাদৎ আলী খাঁ, গাজী উদ্-দীন হায়দর ও নাসির উদ্-দীন হায়দরের আমলে হল্লাল জী, প্রকাশ জী এবং দয়ালজীর তুল্য নৃত্য-বিশারদদের লাভ করেছিল লক্ষ্ণৌ দরবার। তাঁদের মধ্যে স্বনামধন্য প্রকাশজীর পুত্রদ্বয় দুর্গাপ্রসাদ ও ঠাকুরপ্রসাদও এই দরবারে থেকেই পিতার তুল্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ তাঁর পূর্ববর্তীদের মতন শুধু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং নৃত্যবিদ এবং এ বিষয়ে দুর্গাপ্রসাদ ও ঠাকুরপ্রসাদের রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য। ওয়াজিদ আলীর নৃত্য প্রসঙ্গও তাঁর জীবন কথার সঙ্গে পরে উল্লেখ করা হবে।

সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ দরবারে কাব্যসাহিত্যের আনুকূল্য ভালভাবেই করা হয়েছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে স্বাধীন রাজ্যরূপে যেমন প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পায় অযোধ্যা তেমনি মোগল দরবারের জৌলুষ ম্লান হওয়ার ফলে লক্ষ্ণৌ দরবারের রোশনাই। নৃত্য ও সঙ্গীতের মতন কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি সত্য। দেউলিয়া দিল্লী দরবার থেকে শুধু গায়ক নর্তক, বাদক, নটীরা নয়, কবি ও অন্যান্য রচনাকাররাও লক্ষ্ণৌ দরবারে আশ্রয় লাভ করেছিল। লক্ষ্ণৌ দরবার তখন সব চেয়ে সমৃদ্ধিশালী, দিল্লী থেকে বহুদূরও নয়। তাই এখানে আনুকূল্য স্বীকৃতি ও জীবিকার আশায় কাব্য-লেখকদের আগমন ঘটে এবং লক্ষ্ণৌ দরবারও দাক্ষিণ্য ও উৎসাহের সঙ্গে তাদের গ্রহণ করে।

লক্ষ্ণৌতে নবাবী কেতায় বিলাস আড়ম্বরের জীবন। দরবার-আশ্রিত কবিদের ওপর সেই বাহ্য ঐশ্বর্যের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই দেখা গেল। দরবারী বহির্মুখী রূপের প্রতিফলন হল লক্ষ্ণৌনিবাসী কবিদের কাব্যে। ভাবের গভীরতা অপেক্ষা বহিরঙ্গ অলঙ্কারাদির দিকে কবিদের দৃষ্টি বেশি পড়ল। উপমা উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির ওপর তারা অধিকতর আগ্রহ দেখালেন অনুভবের গাঢ়তা বা শৈলীর বলিষ্ঠতার চেয়ে। দিল্লী দরবারের পরিবেশে রচিত কাব্য ও কবিতা কিন্তু শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যে চিহ্নিত। কবিতা ও কাব্যে দিল্লীতে ভাবের প্রাধান্য, লক্ষ্ণৌতে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর। মীর্জা গালিবের কবিতায় এই দুই ধারার সমন্বয়।

লক্ষ্ণৌ দরবার শিয়া সম্প্রদায়ের নবাব দরবার। তাই এখানকার উদ্‌যোগে বা আনুকূল্যে রচিত কাব্যে মার্সিয়ার প্রাচুর্য। কারবালা যুদ্ধক্ষেত্রে হুসেন প্রভৃতির শহীদী অবলম্বনে মার্সিয়া রচনা লক্ষ্ণৌ দরবারের কবিদের নিকট প্রধান বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে।

লক্ষ্ণৌর নবাবরা প্রায় সকলেই কাব্য ও সাহিত্য-প্রিয়।

তাঁদের কেউ কেউ কবিতা রচনা শক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। উর্দু কিংবা ফার্সী ভাষায়, কেউ বা দুই ভাষাতেই। লক্ষ্ণৌ দরবারের প্রতিষ্ঠাতা নবাব আসফ-উদ্-দৌলা স্বয়ং কবি হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর বিপুল কলেবর দিওয়ান বা কবিতাবলীর সংগ্রহ এখনো রক্ষিত আছে হায়দরাবাদের আসাফিয়া লাইব্রেরীতে। তাঁর আমলে উর্দু ও ফার্সীতে রচিত কয়েকটি পুস্তক তাঁকে উৎসর্গ করার কথা জানা যায়।

আসফ-উদ্-দৌলার বৈমাত্র ভ্রাতা ও তাঁর পরবর্তী নবাব সাদৎ আলী খাঁও ছিলেন কাব্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক।

সাদৎ আলী খাঁর পুত্র গাজী উদ্-দীন হায়দর ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচ্যদর্শনের পুস্তক পাঠে অনুরাগী ছিলেন। বিজ্ঞান ও নক্ষত্রবিদ্যায়ও আগ্রহ ছিল তাঁর। এ আমলে পুস্তক-মুদ্রণে পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে একটি রাজকীয় মুদ্রণ-যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল গোমতী নদীতীরের এক গৃহে। আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত কর্ণেল লকৃহার্ট এই মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং এর নাম ছিল মত্‌বা-ই-শাহী (রাজার ছাপাখানা)। আরবী ফার্সী ভাষায় কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ 'তাজ-উল্-লুখাত্' নামে অভিধান এখান থেকে প্রকাশিত হয়। গাজী উদ্-দীন হায়দরের আমলে এই অভিধানের সঙ্কলন কার্য আরম্ভ হয়ে নাসির উদ্-দীন হায়দরের সময়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ হয় এবং সম্পূর্ণ হয়েছিল মহম্মদ আলী শাহের রাজত্বে। এই রাজকীয় মুদ্রণযন্ত্র থেকে হাফ্‌ৎ কুল্‌জুন্ নামে সাত খণ্ডে প্রকাশিত আর একটি ফার্সী অভিধানও উল্লেখ্য। নবাব গাজী উদ্-দীন এই অভিধান সঙ্কলনেও সাহায্য করেছিলেন। কবিতাও রচনা করতেন গাজী-উদ্-দীন। নাসির উদ্-দীন হায়দরও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং কবিতা-লেখক রূপেও কথিত। তাঁর আমলে মত্‌বা-ই শাহীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মিঃ আর্চার, যিনি লক্ষ্ণৌতে লিথোগ্রাফীর প্রচলন করেন। মিঃ আর্চার কাণপুরে একটি লিথো প্রেস স্থাপন করেছিলেন ১৮৩০ খৃঃ। সে সংবাদ পেয়ে নবাব নাসির-উদ্-দীন তাঁকে অনুরোধ করে প্রেস সমেত লক্ষ্ণৌতে অবস্থানের বন্দোবস্ত করেন।...

শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের কাব্য-সাহিত্য রচনার প্রসঙ্গ এক সুবিস্তৃত অধ্যায় রূপে পরিচয় দানের যোগ্য। পূর্ববর্তী ন'জন নবাবের কেউই তাঁর তুল্য কীর্তি এ বিষয়ে স্থাপন করতে পারেননি। তিনি একাধারে কবি, নানা বিষয়ক গদ্য-সাহিত্যের লেখক অপেরা জাতীয় নাটিকা প্রণেতা বহু ঠুংরি গান ও গজল রচয়িতা ইত্যাদি। তাঁর গ্রন্থাদি রচনা সম্পর্কিত গবেষক, অধ্যাপক মাসুদ হাসান রিজবির মতে, ওয়াজিদ আলী শাহ্ প্রায় ষাটখানি পুস্তকের লেখক।

শুধু কাব্য সাহিত্য গীতাদি রচনার ক্ষেত্রে নয়, আগে যে নবাবী আমলে সঙ্গীত ও নৃত্যধারার বিবরণ দেওয়া হয়েছে সে সব বিষয়েও ওয়াজিদ আলী শাহ বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কারণ উক্ত দুই বিষয়েও তিনি ছিলেন সক্রিয় শিল্পী, যে কথা তাঁর পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলা যায় না। তিনি একাধারে নৃত্য শিল্পী, গায়ক ও সেতার বাদক। বলা অসঙ্গত হবেনা, তাঁর আগের আমলের সমস্ত নবাবরা যত বিষয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ওয়াজিদ আলী ছিলেন তার প্রত্যেক বিষয়ে সৃজনশীল শিল্পী।

এত বিভিন্ন শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করতে গিয়েই হয়ত তাঁর রাজকীয় কর্তব্যে শৈথিল্য ও সময়াভাব ঘটে যায়। এবং তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্য প্রসারে তৎপর, নতুন কালের উদীয়মান বৃটিশ রাজশক্তি। তাঁর শিল্পী-সত্তা ও নবাবী জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি বিধ্বস্ত হয়ে যান।

অযোধ্যা রাজ্যে সে সময়ের প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় জটিলতা, বৃটিশ কূটনীতি, নবাবের খণ্ডিত ও দ্বৈত চরিত্র, একদিকে তাঁর শিল্প-প্রতিভা অন্যদিকে অবক্ষয়ের ধারা-বাহী সত্ত্ব, তাঁর বেগম বিলাস ও অপর্যাপ্ত অপচয়, ইংরেজের দৃষ্টিতে নবাবের চরিত্র ও ভূমিকা, বৃটিশের চরম আঘাত এবং নবাব-জীবনে বিপর্যয় তথা নির্বাসন ইত্যাদি প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচ্য। ক্রমশঃ

কমলাকান্ত কি বঙ্কিমের মানস-রূপ

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

বাংলা সাহিত্যে "কমলাকান্তের" আবির্ভাবের মোটামোটি বিবরণটি এইরূপ: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করার পর দ্বিতীয় বৎসরের ভাদ্র সংখ্যায় কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির দপ্তর প্রকাশিত হয়। পর পর দপ্তরের ১৪টি সন্দর্ভ "বঙ্গদর্শনে" পত্রস্থ হয়। শেষ সন্দর্ভ "মশক" প্রকাশ হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। আর যে এগার মাস বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদনা করেন তার মধ্যে কমলাকান্ত ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এক বৎসর বিরামের পর বঙ্গদর্শন যখন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় পুনর্জীবিত হল তখন ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সনের সংখ্যাগুলির মধ্যে "কমলাকান্তের" রচনা আবার স্থান পেল কিন্তু এবার "ভবদেব খোসনবীশ" মহাশয়ের সংগৃীত দপ্তর আকারে নয়, সম্পাদককে লিখিত পত্ররূপে। দু'বৎসরের মধ্যেও সর্ব্বসমেত "কমলাকান্তের" পত্র প্রকাশিত হল সাতখানা। আঠাত্তর সালের শেষভাগে "কমলাকান্তের বিদায়" নামক সন্দর্ভে লেখক তাঁর নিজস্ব কারণ দেখিয়ে পাঠকবর্গ হতে অবসর নিলেন। এর চারবৎসর পরে "বঙ্গদর্শনেই" প্রকাশিত হয় "কমলাকান্তের জবানবন্দী"। অহিফেন-সেবী কল্পিত লেখকের লেখনী-চালনার এইখানেই হয় পরিসমাপ্তি। কল্পনার মানুষ কিন্তু খ্যাতির তরঙ্গে আজও বাংলার সাহিত্য-স্রোতে তিনি ভাসমান।

বলা বাহুল্য যে এই ত্রিধা-বিভক্ত কমলাকান্ত রচনার—দপ্তর, পত্র ও জবানবন্দী—প্রায় সবগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী-প্রসূত। শুধু দপ্তর-পর্য্যায়ের তিনটি সন্দর্ভ তাঁর অন্য দুই সাহিত্যিক বন্ধুর রচনা। কাজেই কমলাকান্ত বলতে বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে—এই যে অহিফেন-সেবী, ভবঘুরে অমার্জ্জিতশীল তীক্ষ্ণ-বাণের তূণ-ধারী কল্প-লোকটির অবতারণা, তা কি বঙ্কিমচন্দ্রের একটা নিছক সাহিত্যিক ভঙ্গিমা, না নাটকীয় ভূমিকা, না এতে ছিল বঙ্কিম-মানসের এক নৈষ্ঠিক প্রতিচ্ছবি? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে "কমলাকান্ত" গ্রন্থের যে শত-বার্ষিক-জয়ন্তী সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে কৃতী যুগ্ম-সম্পাদকগণ তাঁদের চিন্তাপূর্ণ ভূমিকায় শেষোক্ত মতেরই পরিপোষণ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, পাঠক-পাঠিকার প্রমোদ-বৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত লঘু-রসের পরিবেশন করে করে "বঙ্গদর্শন"-সম্পাদক হাঁপিয়ে উঠেছিলেন এবং সমসাময়িক জীবনের পঙ্কিলতায় ইপ্সিত মনের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবেই কমলাকান্ত মনুষ্যটিকে উদ্ভাবন করা হয়। অর্থাৎ কমলাকান্ত ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের একটি আঙ্গিক-সর্ব্বস্ব সৃষ্টি, একটি আত্ম-নিষ্ঠ-নিরপেক্ষ চরিত্র-বিশেষ, যার জবানীতে মনীষি বঙ্কিম নিজের মুখে কড়া কড়া কথা না শুনিয়ে অহিফেন-সেবীর অ-প্রকৃতিস্থ বাক্যের শরণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কমলাকান্তের মানস-নিষ্ঠা সম্বন্ধে কি এই মত গ্রহণীয়? একথা কি বলা চলে যে, কমলাকান্ত ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মত-প্রকাশের আর একটি বিভিন্ন দিক? এ কথা কি আজ বলা চলে যে, ইংরাজ লেখকের অহিফেন-সেবীর ভাব-বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র হয়েছিলেন এত মুগ্ধ যে কমলাকান্তের ভূমিকা গ্রহণ না করে তাঁর সাহিত্যিক-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের আর অন্য কোন পথের সন্ধানই তিনি পেলেন না?

বিচার-বিশ্লেষণে যতটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাতে মনে হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকদের এই নাটকীয়-মত অভ্রান্ত নয়। প্রথমতঃ সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের লঘুরস-পরিবেশনে ক্লান্তির কথা। প্রথম পর্বের মাসের "বঙ্গদর্শনে" এই লঘু-রসের অত প্রাচুর্য ছিল না, কেবল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে মনীষি বঙ্কিম কমলাকান্ত সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত বাঙ্গালী-সমাজকে ঐরূপ ধারালো কথা শোনাবার জন্য কমলাকান্তের ভূমিকা ছিল নিতান্তই অনাবশ্যক—কেন না তাঁর নিজের জবানীতে উক্ত মন্তব্যের মধ্যেও খোঁচার ছড়াছড়িই ছিল। তৃতীয়তঃ দপ্তর-পর্যায়ের অনেক সন্দর্ভেই খোঁচা ততটা ছিল না, [illegible] ছিল ভাষার রসালতা। "আমার মন" সন্দর্ভটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রগুলির মধ্যে ভাষণ-তিক্ততা আরও কম। কেবল জবানবন্দীর বেলায় বলা চলে যে, সেটা ছিল নিছক ব্যঙ্গ। এ রচনা হয়ত অনেকটা ফরমায়েসে লেখা। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই রচনার চার বৎসর পূর্ব্বেই বঙ্কিম-মানসে কমলাকান্তের মৃত্যু ঘটেছিল—"কমলাকান্তের বিদায়" তার প্রমাণ।

আমরা মনে করি যে কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-স্বরূপের একটা নৈষ্ঠিক অভিব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষিতব্য এই যে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বঙ্কিমচন্দ্রের আর চারখানা প্রধান উপন্যাস লিখতে বাকী ছিল—"কৃষ্ণকান্তের উইল" "আনন্দমঠ" "দেবী-চৌধুরাণী" ও "সীতারাম"। শেষোক্ত তিনখানি সম্বন্ধে বলা চলে যে, তাদের ঔপন্যাসিক মূল্য যতই থাক, আসলে সেগুলি তত্ত্বাশ্রয়ী। "সীতারাম" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তার গীতা-ভাষ্যে স্পষ্ট ভাষায়ই এরূপ স্বীকারোক্তি করে গেছেন। এক বাকী রইল আটাত্তর সালে প্রকাশিত "কৃষ্ণকান্তের উইল"। গোবিন্দলালের নৈতিক স্খলন ও রোহিণীর হেয় কামুকতা দেখানই এখানে ছিল মনীষি বঙ্কিমের উদ্দেশ্য এবং শেষ পর্য্যন্ত সেখানেও গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসী সেজে ভ্রমরের স্মৃতি তর্পণ করতে দেখান হয়েছে। এ সব তথ্য বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনে হয় যে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার ও পরেকার বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-স্বরূপের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য দানা বেঁধে উঠেছিল। প্রথম জীবনে তাঁর ছিল এক পরম জীবন-আস্বাদী মন এবং দ্বিতীয় জীবনে ছিল তাঁর এক জীবন-ত্যাগী মন। বড় জোর বলা যায় যে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গ দর্শন" বন্ধ হবার পরও আরও তিন বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবন রসিক-মন প্রতিকূল চিন্তাধারার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি মারছিল। কমলাকান্তের পত্রাবলী বঙ্কিমচন্দ্রের এই জীবন-আস্বাদী মনেরই একান্ত পরিচায়ক। কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ভোল নয়, তাঁর নৈষ্ঠিক মানস-ধর্মের প্রকাশ। বয়সের কাঠামোয় ফেলে সোজাভাবে বলা চলে যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ছাপান্ন বৎসরের জীবনে "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশ করেন। তার পরে চার বৎসর তার অভূতপূর্ব মননশীলতার সঙ্গে জীবন-ধর্মের সাধনা এবং বাকী ষোল বৎসর চলে জীবন-বিমুখী মনের সাধনা। তাহলেও প্রশ্ন উঠবে যে, জীবন-ধর্ম চরিতার্থতার জন্য কি কমলাকান্ত অবতারণার বিশেষ প্রয়োজন ছিল? সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে বিবিধ প্রকারের প্রবন্ধ ও সাহিত্য আলোচনার অবতারণা করে কি তিনি তাঁর জীবন-রস মেটাতে অসমর্থ হয়েছিলেন? সত্য বটে তৃপ্তির দ্বারদেশে তিনি পৌছাতে পারেন নি, যতদিন না তিনি কমলাকান্ত সেজে মন খুলে কথা বলতে পাচ্ছিলেন। উপন্যাসের আখ্যায়িকায়ই হউক, কিংবা চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের বিচার-বিতর্কের মধ্যেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি বিদগ্ধ-মনের রুচি-চিক্কণতা রক্ষা করে চলতে হয়েছিল, যে চলার মধ্যে জীবনের স্পর্শ ছিল না, যার মধ্যে স্থূল অথচ অলঙ্ঘ্য জীবন টানে সাড়া দেওয়া চলত না। ফুলের বিবাহ, ভোমরার ঘ্যানঘ্যানানি, 'এস এস বঁধু এসো' বলে মনদোলান গীতরস পান করার অবকাশ ছিল না—প্রসন্ন গয়লানীর সঙ্গে সার্থক সঙ্গের কথা দূরেই থাক। এই সব মনে করেই ১৮৭৩ সালের ভাদ্রমাসে যখন "বঙ্গদর্শনে" সর্ব্বপ্রথম দপ্তরের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা

হল তখন ভবদেব খোসনবীশ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর একটি চরিতালেখ্য দেবার প্রয়োজন মনে করেছিলেন। সে আলেখ্য আর কিছু নয়—এক শিক্ষাভিমানী ভব-ঘুরে, অহিফেন-সেবী, যাযাবর। যে বৃত্তিকে হেলা করত, অশোভনতার ভয়ে মনের রসকে প্রকাশ কর্ত্তে বিন্দুমাত্র পেছপাও হত না—যেন এক নায়িকা-পরিগ্রহ-বিমুক্ত শ্রীকান্ত আফিং খায় বটে কিন্তু তার চাইতে বেশী পান করে গেলাস উল্টিয়ে জীবনের সবটুকু রস। বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-রসের পিয়াসী হয়ে কমলাকান্তের স্বেদ-মলিন ফতুয়ার মধ্যে নিজের আশ্রয় বেছে নিলেন যাতে ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিমের সঙ্গে এই একান্ত জীবনধর্মী লেখকের কোন বিভেদ-সংঘাতের প্রশ্নই উঠতে না পারে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের অতি সাধের রসিক-জীবনে ভাটা পড়ল। ললাটে নূতন চিন্তার রেখা দেখা দিল এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে পাঠক হতে কমলাকান্তের বিদায় জানাতে গিয়ে লিখলেন—

"তখন (বার বৎসর আগে) বয়স ছিল, কতকাল হইল (১৮৭৩।৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই।**কমলাকান্ত আর সে কমলাকান্ত নাই। আমার সে নসীবাবু নাই, সে প্রসন্ন এখন কোথায় জানি না—তাহার মঙ্গলা গাভী এখন কোথায় জানি না ** কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী—তার এত বন্ধন কেন? এদেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের বাঁধন-গুলো পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিভে না কেন? পুকুর শুকাইয়া গেল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় গিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন?**বাঁশী ফাটিয়াছে আবার সা ঋ গ ম কেন?" এ সহস্র কেন'র জবাব অতি সোজা। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে—চল্লিশ বৎসর বয়সেই—ভৈরবী গানের আহ্বান এসেছিল, প্রত্যক্ষবাদ ও নিষ্কাম কর্ম-বাদের যুগ্ম মূর্চ্ছনায়। কমলাকান্তের মৃত্যু ত তখন স্বভাব-সিদ্ধ।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

নূতন বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেট

বহুকাল পর,—বস্তুতঃ ১৯৫১ সনের পর এই প্রথমবার—কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয়ের বাজেটে ঘাটতি সম্পূর্ণ মিটিয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত আয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে কতকগুলি পণ্যের বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের উপরে কতকগুলি আবগারী শুল্ক ধার্য্য করে। এতে সরকারী পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমতঃ এবার ঘাটতি বাজেট না হবার দরুন আর ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের প্রক্রিয়া দ্বারা অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হবে না এবং সেই কারণে ইনফ্লেশ্যান বৃদ্ধি বন্ধ করা সম্ভব হবে এবং তার ফলে মূল্য স্থিরতা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি ভোগ্যপণ্য যথা চা, কফি—ইত্যাদির উপরে নূতন আবগারী শুল্ক ধার্য করবার ফলে অনিবার্য ভোগ-সঙ্কোচ ঘটিয়ে রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করবে এবং তার দ্বারা রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

এই দুইটি দাবীর কোনটিই যে বিচারসহ নয় সেকথা একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। আমরা আমাদের এই আলোচনায় বহুকাল ধরে বারংবার বলে আসছি যে অন্যান্য আনুসঙ্গিক কারণ ব্যতীতও মূল্যবৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ সরকারী ট্যাক্স বাজেটের কাঠামোটি। ১৯৫১-৫২ সন থেকে সুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স কাঠামোটি যে ধারাটি অনুসরণ করে চলেছে, তার ফলে এই ট্যাক্স কাঠামোটির মধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ বর্তমান রয়েছে। ১৯৫০-৫১ সন পর্য্যন্ত ভারতে মাথাপিছু মোট করভারের পরিমাণ ছিল মোটামুটি বার্ষিক ৮টাকা মাত্র। কিন্তু এর মধ্যে পরোক্ষ ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল শতকরা ৭ ভাগ মাত্র অর্থাৎ বর্তমান মুদ্রায় ৫৬ পয়সা। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ট্যাক্সেই মাথাপিছু ট্যাক্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় বার্ষিক ৬৫ টাকার মতন। এর সঙ্গে রাজ্য বাজেট জনিত অতিরিক্ত করভারের অঙ্কটি যোগ করলে মোট মাথাপিছু বার্ষিক করভারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ টাকার ওপর। মাথাপিছু গড়পড়তা বার্ষিক ৩১২ টাকা (বর্তমান মূল্যমানে) আয়ের তুলনায় এই পরিমাণ মোট করভার যে দুনিয়ার সর্বোচ্চ করভারের পর্য্যায়ে পড়ে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তা ছাড়া যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি তাৎপর্য্যপূর্ণ সেটি এই যে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের পরিমাণ মোট ট্যাক্স রাজস্বের ৭৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে (অর্থাৎ মাথাপিছু মোটামুটি ৫৮ টাকা ৮০ পয়সা, তুলনায় প্রত্যক্ষ করভারের পরিমাণ হয় ১১ টাকা ২০ পয়সা মাত্র)। এই প্রকারের ট্যাক্স কাঠামোর প্রধান গলদ এই যে প্রত্যক্ষ ট্যাক্স যেমন ট্যাক্স দাতার আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ধার্য্য করা হয়, পরোক্ষ ট্যাক্সের বেলায় এই অনুপাত রক্ষা করা সম্ভব হয় না, ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়কারী ট্যাক্স-

দাতার উপরে করভারের চাপটি অত্যধিক বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এই সাধারণ প্রতিপাদ্যটি ছাড়াও বর্তমান ক্ষেত্রে আরো একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মোট পরোক্ষ রাজস্বের মধ্যে অর্দ্ধভাগেরও কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ রাজস্ব ভোগ্য এমন কি অবশ্য ভোগ্যপণ্যাদির উপরে ট্যাক্সের দ্বারা আদায় হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই ট্যাক্সের পরিমাণটি পণ্যমূল্যের মধ্য দিয়ে ভোক্তার কাছ থেকেই আদায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভোগ্য পণ্যাদির উপরে এই ধরণের পরোক্ষ ট্যাক্স ধার্য্য করবার ফলে—বিশেষতঃ এইরূপ ট্যাক্সবাহী পণ্যাদির মধ্যে যদি খানিকটা সাধারণের অবশ্যভোগ্য পণ্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়—সরকারী দাবীর চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ—মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রয়-কারীর নিকট থেকে আদায় করা হয়ে থাকে। এই ধরণের পরোক্ষ ট্যাক্স ধার্য্য করবার এটি একটি অনিবার্য্য ফল বলে সব দেশেই স্বীকৃত হয়ে থাকে। ফলে সব দেশেই যথাসম্ভব ভোগ্যপণ্যের উপরে আবগারী বা অনুরূপ ট্যাক্স ধার্য করা সাধারণতঃ সযত্নে পরিহার করা হয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রম করা হয় কেবলমাত্র সেই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে যে স্থলে সে সকল পণ্যাদির ভোগ সঙ্কোচ ঘটান সমাজনীতির বিচারে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যথা মাদক দ্রব্যাদি—পানীয় মদ্য ইত্যাদি। যে সকল দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে কোন সামাজিক বাধা আছে বলে মনে করা হয় না সে সকল দেশের সরকারও মাদক পানীয়াদির উপরে চড়া হারে আবগারী শুল্ক ধার্য্য করে থাকেন। তার কারণ এ নয় যে এই শুল্ক থেকে যে রাজস্ব আদায় হবে এ ক্ষেত্রে সেটাই একমাত্র বিবেচ্য। আসল কারণ এই যে এই ধরণের ভোগ্য বস্তুর ভোগ যথাসম্ভব সংযত করে রাখা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার লক্ষণ বলে মনে করা হয় এবং চড়া হারে এ সকলের উপরে আবগারী কর ধার্য করা হয় যাতে অবাধ ভোগ এই ভাবে সংযত করে রাখতে পারা যায়। এই ধরণের পণ্যাদি ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের ভোগ্য পণ্যের উপরে আবগারী বা অনুরূপ শুল্ক প্রয়োগ সাধারণতঃ সুস্থ ট্যাক্সনীতির পরি-চায়ক বলে মনে করা হয় না, তার প্রধান কারণ এ ভাবে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে সমর্থ হন, তুলনায় ব্যবসায়ীরা ভোক্তার নিকট থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ এই অজুহাতে আদায় করে থাকেন। অর্থাৎ সাধারণতঃ এই ধরণের শুল্কের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধিকারক (inflationary contents) কারণ স্বাভাবিক কারণেই অন্তর্নিহিত থাকে। অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহে সমতার (balance) অবস্থাতেও ভোগ্য পণ্যাদির উপরে এই ধরণের আবগারী বা অনুরূপ শুল্ক সাধারণতঃ মূল্যমানের উপরে অনুপাতের অধিক চাপ সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু যখন চাহিদার তুলনায় সরবরাহে অপ্রতুলতার কারণে প্রায় কায়েমী ভাবে একটা বিক্রেতা অধ্যুষিত বাজারের সৃষ্টি হয় তখন এই ধরণের ভোগ্য পণ্যের উপরে শুল্ক মূল্য-মানের উপরে আরো অতিরিক্ত চাপ অনিবার্য্য ভাবেই সৃষ্টি করে থাকে।

সেই জন্য আমরা আগাগোড়া দাবী করে আসছি যে বর্তমান মূল্যবৃদ্ধিকারক অর্থ-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে একমাত্র ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং বন্ধ করে কিম্বা মুদ্রার সরবরাহ সংযত করেই তা করা সম্ভব হবে না, আমাদের বর্তমান ট্যাক্স কাঠামোটিকে সম্পূর্ণ ভাবে নূতন করে রচনা করতে হবে। যাতে সরকারী রাজস্বের প্রত্যক্ষ কর থেকে আদায়ী অংশটুকু অনুপাতে পরোক্ষ করের থেকে পরিমাণে বা অনুপাতে বেশী হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্য পণ্যের উপরে আবগারী অথবা অনুরূপ অন্যান্য শুল্কের ভার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা সম্ভব না হলেও অন্ততঃ সমধিক পরিমাণে হাল্কা করে ফেলা সম্ভব হয়। গত বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁর বার্ষিক বাজেট বক্তৃতায় উপলক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করেন কিন্তু বাজেট রচনায় এর প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন। বর্তমান বাজেটে শ্রীমোরারজী দেশাই প্রভূত পরিমাণে নূতন আবগারী শুল্ক ধার্য্য করে বাজেট ব্যালান্স করেছেন, কিন্তু তার ফলে অচিরে স্থির মূল্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে যে দাবী করা হয়েছে তার কোন সমীচিন কিম্বা বিচারসহ কারণ নেই।

বস্তুতঃ সকল ভোগ্য পণ্যের সরবরাহে এবং বিশেষ করে খাদ্য-শস্যাদি প্রাথমিক অবশ্য ভোগ্য পণ্যের সরবরাহে যে আশঙ্কাজনক ঘাট্‌তির অবস্থা চলে আসছে তার সঙ্গে শ্রী দেশাইয়ের নূতন আবগারী শুল্ক সমূহের সংযোগে বর্তমান বৎসরে মূল্যমানের উপরে চাপ যে আরো সমধিক বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনই সন্দেহের বিচারসহ কারণ নেই।

নূতন ট্যাক্স বাজেটের দ্বারা দ্বিতীয় এবং যে অন্যতম উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে দাবী করা হয়েছে—অর্থাৎ চা, কফি ইত্যাদি ভোগ্য পণ্যের উপরে নূতন আবগারী শুল্ক ধার্য্য হবার ফলে এই সকল পণ্যের যে মূল্যবৃদ্ধি ঘট্‌বে, তার ফলে অনিবার্যভাবে আনুপাতিক পরিমাণে ভোগ সঙ্কোচ ঘটবে এবং তার ফলে সরবরাহের কিছুটা অংশ রপ্তানীর জন্য পাওয়া যাবে—একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে এ সকল অলীক কল্পনা মাত্র।

বিপদ এই যে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠটুকুও জানা নেই। তা যদি হতো তাহলে তিনি জানতেন যে চাহিদা ও সরবরাহের সমতা বা স্থেক balanced অবস্থাতেই মাত্র মূল্যমানে উঠতি পড়্‌তির ফলে আনুপাতিক পরিমাণে ভোগ সঙ্কোচ বা ভোগবৃদ্ধি ঘটে সম্ভব। অর্থাৎ বাজারটি যদি মোটামুটি ক্রেতা অধ্যুষিত (buyers market) হয় তবেই মূল্য কমা বাড়ার অনুপাতে চাহিদার (effective demend) বৃদ্ধি বা ঘাট্‌তি ঘটা থাকে। কিন্তু বিক্রেতা অধ্যুষিত বাজারে (Sellers' market) যখন সরবরাহের পরিমাণ আনুমানিক চাহিদার (Potential demand) তুলনায় অনেক কম এবং বাস্তব ভোগচাহিদা (effecive) সম্ভাব্য চাহিদার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র তখন মূল্যমানের ঘাট্‌তি বৃদ্ধির ফলে চাহিদায় কোন আনুপাতিক কমতি বৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয় না। ফলে নূতন আবগারী শুল্কের দরুণ চা, বা কফি ইত্যাদি ভোগ্য পণ্যের যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে তার ফলে এই সকল পণ্যের কিঞ্চিৎমাত্র ভোগ সঙ্কোচও ঘটা সম্ভব, এ শুধু বাতুলের অসম্ভব কল্পনা।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রে নূতন অতিরিক্ত আবগারী শুল্ক যথা পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদির উপরে নূতন শুল্ক—দেশের সামগ্রিক পরিবহণ ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বহু এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য্য ভাবে ঘটাবে।

বাজেটের সামগ্রিক আলোচনা, পার্লামেণ্টে বাজেট পাশ হয়ে যাবার পর আগামী সংখ্যায় করা হবে।

খাদ্য সঙ্কট না মূল্য সঙ্কট

বর্তমান বৎসরে চাউলের ফসল পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত কম হবার দরুণ গত বৎসরের তুলনায় আরো কম হয়েছে বলে সরকারী হিসাবে নির্দ্ধারিত হয়েছে। অতএব অন্তর্বর্তী আউসের ফসলের দ্বারা কিছুটা লাঘব হলেও বর্তমান খাদ্য সঙ্কট থেকে মুক্তি আগামী আমনের ফসল না ওঠা পর্যান্ত কোনো ক্রমেই সম্ভব হবে না সরকারী মুখপাত্ররা জন সাধারণকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এধরণের সতর্কবাণীর সঙ্গতি কতটুকু তার একটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। পশ্চিম বঙ্গের লোক সংখ্যা যদি বর্তমানে পুরো ৫কোটি হয়, তবে তার মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ (৩৬) ৮ বৎসরের কম বয়স্ক এবং ৩কোটি ২০ লক্ষ ৮ ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক। এঁদের জন্য খাদ্য শস্যের দৈনিক বরাদ্দ যথাক্রমে ৮ও ১৬ আউন্স হিসাবে ধার্য্য করলে (সরকারী পূর্ণ রাশনিংয়ে যথাক্রমে ৫ও ১০ আউন্স বরাদ্দ করা হয়েছে)। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য শস্যের বাস্তব দৈনিক ভোগচাহিদা ১১৫০০ টনের অধিক হবার কথা নয়। অর্থাৎ বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ হবার কথা ৬৩, ৮৭,০০০ টন।

১৯৬৩-৬৪ সন থেকে যদি এ রাজ্যে খাদ্য শস্যের উৎপাদন, আমদানী ও বাস্তব ভোগচাহিদার তুলনা করা যায়—অর্থাৎ এই বৎসরের পূর্বেকার কোন উদ্বৃত্ত মজুদের হিসাব না ধরেও—তাহলে বিভিন্ন সময়ে সরকারী বিবৃতি বা হিসাব নিকাশাদিতে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, তার থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া যায় :—

১৯৬৩-৬৪

আমনের ফসল (চাউলের পরিমানে)	৪৪,০০,০০০ টন
আউসের ফসল (চাউলের পরিমানে)	৪,০০,০০০ "
গম আমদানী	১২,৫০,০০০ "
চাউল আমদানী	৬,০০,০০০ „
মোট সরবরাহ	৬৬,৫০,০০০ „

১৯৬৪ ৬৫

আমনের ফসল (চাউলের পরিমানে)	৪৮,০০,০০০ টন
আউসের ফসল (চাউলের পরিমানে)	৩,০০,০০০ „
গম আমদানী	১৩,৫০,০০০ „
চাউল আমদানী	৭,০০,০০০ „
মোট সরবরাহ	৭১,৫০,০০০ „

১৯৬৫ ৬৬

আমনের ফসল (চাউলের পরিমানে)	৪৪,০০,০০০ টন
আউসের ফসল (চাউলের পরিমানে)	৪,০০,০০০ „
গম আমদানী	১৭,০০,০০০ "
চাউল আমদানী	৭,০০,০০০ "
মোট সরবরাহ	৭৩,০০,০০০ „

১৯৬৬ ৬৭

আমনের ফসল (চাউলের পরিমানে)	৪৪,০০,০০০ টন
আউসের ফসল (চাউলের পরিমানে)	৭,০০,০০০ „ (পূর্ব্বাভাষ
গম আমদানী	২০,০০,০০০ „ (কেন্দ্রের সরবরাহ প্রতিশ্রুতি)
চাউল আমদানী	৭,৫০,০০০ „
মোট সরবরাহ	৭৮,৫০,০০০ „

বিভিন্ন সময়ে পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার দ্বারা প্রচারিত তথ্যাদির ভিত্তিতে সঙ্কলিত এই হিসাব যদি বাস্তবানুগ হয়, তবে বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে খুব কম হলেও চাউলের ও গমের মিলিত মজুতের পরিমাণ ৪০,০০,০০০ টনের কম হবার কথা নয়। এর মধ্যে চাউলের মজুদ অন্ততঃ তিনচতুর্থাংশ কিম্বা তারও বেশী হবার কথা। তার প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গে গমের সরবরাহের সম্পূর্ণ পরিমাণটাই বাহির থেকে এবং প্রায় সমস্তটাই সরকারী প্রয়োগে এবং মালিকানায় আমদানী হয়ে থাকে। তার থেকে কিছু পরিমাণ যে স্বাভাবিকভাবে এবং নানা কুটিল পথে কালোবাজারী মজুতের দিকে চালিত হয় না এমন নয়। কিন্তু তার মোট পরিমাণ চাউলের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, তার সুযোগও অপেক্ষাকৃত কম। এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সরকারী হিসাবে এবং আমাদের বিভিন্ন আলোচনায় আমরা খাদ্য শস্য বলতে কেবলমাত্র চাউল ও গমের কথাই বলি। কিন্তু এই দুইটি মিহি শস্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্যশস্যও (cereals) প্রচুর পরিমাণে আমদানী ও ভোগচাহিদা মিটিয়ে থাকে। একটি বেসরকারী সূত্র থেকে জানা গেল যে গত বৎসর (১৯৬৫-৬৬ সনে) কলিকাতায় বাজরা ও জোয়ার মিলিয়ে মোট প্রায় ৫,০০,০০০ টন শস্য আমদানী হয়েছে; ভুট্টার আমদানীও প্রায় অনুরূপ পরিমাণ। এই শস্যের আনুমানিক ৬০ ভাগ অর্থাৎ গড়-পড়তা ৬,০০,০০০ টন শস্য নানাবিধ মূল্যবান খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত (food products) হয়ে থাকে; কিন্তু ৪০ ভাগ অর্থাৎ মোটামুটি বার্ষিক ৪,০০,০০০ টনের মত পরিমাণ সরাসরি প্রাথমিক ভোগে লেগে থাকে। আনুপাতিক পরিমাণ চাউল কালোবাজারীর গুদামজাত হয়। তা হলে উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী ৩০,০০,০০০ টনের উপরে গত চার বৎসরে আরো প্রায় ১৬,০০,০০০ টন অর্থাৎ অন্ততঃ মোট ৪৬,০০,০০০ টন চাউল মুনাফা-লোভীর গুদামজাত হয়ে আছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনুরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে খাদ্যশস্যের বর্ত্তমানে মোট মজুতের পরিমাণ (চাউল+গম মাত্র) অন্ততঃপক্ষে ২০,০০,০০০ টনের কম নহে।

অতএব একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দেশের ন্যূনতম ভোগচাহিদা মেটাবার মত খাদ্যশস্য আমাদের দেশেই মজুত আছে। কেবল ভোক্তার পক্ষে সেটুকু উপযুক্ত পরিমাণে এবং তার আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে তাল রেখে আয়ত্তাধীন মূল্যে সংগ্রহ করতে পারাই আসল সমস্যা। সরকারের তরফ থেকে এই পরিণতির জন্য দ্বিতীয় এবং বিশেষ করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদনে আনুপাতিক অসাফল্য-কেই বিশেষভাবে দায়ী করা হয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে পরিকল্পনা রচনায় কৃষি উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি ও উন্নতি সাধনের পূর্বেই অতিদ্রুত শিল্পায়নের উপরে যে সমধিক জোর দেওয়া হয়েছে, অংশত: তার ফলে বর্তমান পরিস্থিতিটির সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের শিল্পাগ্রসর ও সম্পদশীল রাষ্ট্রগুলির শিল্পায়নের ইতিহাস যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এ সকল রাষ্ট্রেই কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ও উৎপাদনসাফল্য সাধিত হবার পরেই, পূর্বে নয়, দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে দুনিয়ার সকলের চেয়ে উন্নত ও সম্পদশীল রাষ্ট্র, আমেরিকার ইতিহাসও অনুরূপ। আধুনিক জগতে একমাত্র ব্যতিক্রম হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপের সম্মিলিত আর্থিক জোটবদ্ধ (European Economic Community) রাষ্ট্রগুলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত একদা এই সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলি তাদের সকল সম্পদ (resources) ও শক্তি নিজ নিজ আর্থিক বুনিয়াদ পুনর্গঠনের তাগিদে শিল্প-পুনর্গঠনে সংহত করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শিল্পায়ন ও কৃষি উন্নয়ন একই সঙ্গে সমান তালে চলেছে এবং সম্ভবতঃ তারই ফলে এ সকল রাষ্ট্রগুলির সফল আর্থিক পুনর্বিন্যাস এত দ্রুত সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে। আমাদের দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় যদিও প্রথম পঞ্চবর্ষে কৃষি সহায়ক শিল্পাদির উপরেই প্রাথমিক স্থান আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে সুরু করে কৃষি উন্নয়নকে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থান দিয়ে বৃহৎ উৎপাদক শিল্পগুলির ওপরেই প্রাথমিক জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নের সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত পনেরো বৎসর ধরে আমরা কেবল বৃহৎ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা শুধু নয়, অনেক ক্ষেত্রে শিল্পের জন্য নানাবিধ কাঁচা মাল এবং বিশেষ করে খাদ্য শস্যের জন্যও বিদেশের উপরে নির্ভরশীল হয়ে রয়েছি। অন্যপক্ষে কৃষি ব্যতীত ভোগ্য শিল্পাদির বিস্তারও আনুপাতিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে। বৃহৎ উৎপাদক শিল্পাদির উপরে শিল্পায়নের ধারায় অবশ্যই প্রাথমিক জোর দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু বৃহৎ পরিধির উন্নয়ন ব্যবস্থায় ভোগ্যশিল্পের অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে যদি সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক উন্নয়ন দ্বারা সামঞ্জস্য সাধন করবার ব্যবস্থা না করা হয় তবে মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতি যে অনিবার্য্য হয়ে ওঠে সেটা ধনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ মাত্র।

মূল্যস্ফীতির অন্যান্য কারণ : উন্নয়নে সার্থকতার শ্লথ্য

অন্যান্য বিভিন্ন কারণ এবং প্রয়োগও যে এই অসামঞ্জস্যে অনিবার্য্য প্রভাব বিস্তার করছে তাতে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান পরিকল্পনার রূপায়ণে শ্লথ্য ও অসার্থকতা। বর্তমান রচনা অনুযায়ীও উন্নয়নের গতি দ্রুততর হলে খানিকটা সামঞ্জস্য সাধিত হবার আশা ছিল। কিন্তু এই দ্রুতীকরণের তাৎপর্য্য স্পষ্ট ভাবে বোঝা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মতে এই দ্রুতীকরণের অর্থ অধিকতর পুঁজি লগ্নীর দ্বারা পরি-কল্পনার পরিধি আরো অধিকতর বিস্তৃত করা। কিন্তু লগ্নীকৃত পুঁজি যদি উৎপাদন সাফল্যে আনুপাতিক পরিমাণে প্রতিফলিত না হয় তবে কেবলমাত্র পুঁজি লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে কি করে উন্নয়ন সার্থকতা লাভ করতে পারে বোঝা মুস্কিল। যে পরিমাণ পুঁজি এর মধ্যেই লগ্নী করা হয়েছে তারই আনুপাতিক সার্থকতা লাভ এ পর্য্যন্ত হয় নি। প্ল্যানিং কমিশনের অন্তর্বর্তী মূল্যায়ণের (mid term appraisal) রিপোর্টে দেখা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর ৯৩'৮% পুঁজি পরিকল্পনাকালেই নিয়োগ করা হয়ে যাবে। কিন্তু জাতীয় আয়ে এর আশানুরূপ প্রতিফলন হবার কোনই আশা নেই। প্ল্যানিং কমিশনের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় আয় বার্ষিক ১৭০০০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়ায় জাতীয় আয় বার্ষিক গড় ৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ বৎসরে মোট ৩৬ ভাগ বৃদ্ধির দ্বারা বার্ষিক ২১০০০ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে। দ্বিতীয় পরি-

তুলনায় শেষ হিসাবে দেখা যায় যে জাতীয় আয় পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক ১৫৫০০ কোটি টাকায় পৌঁছে নাই, ১৫০৫০ কোটি টাকা হয়েছে। এই ভিত্তির উপরে বার্ষিক ৬ ভাগ হারে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বার্ষিক ২০,৪০০ কোটি হবার কথা, কিন্তু পরে এই লক্ষ্য আরো নীচু করে ১৯০০০ কোটি টাকায় ধার্য্য করা হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে আরো প্রায় ৯·৮ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে বাস্তব ক্ষেত্রে সার্থকতার পরিমাণ আরো ১০ ভাগ বেশী কম হবে। অর্থাৎ ২১০০০ কোটি টাকা আয় দেবার মতন লগ্নীর ফলে বাস্তব বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে মাত্র ১৭০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ ১৯ ভাগ কম। পরে অবশ্য পূর্ব হিসাব বাতিল করে দিয়ে প্ল্যানিং কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত বার্ষিক জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১৮০০০ কোটি টাকায় ধার্য্য করেছেন। এই লক্ষ্য যদি নির্দ্দিষ্ট থাকেও তাহলে লগ্নীর পরিমাণ ও উৎপাদনে তার সার্থক প্রতিফলনের মধ্যে অন্তর্বর্তী ১৪·৩ ভাগ ব্যবধান থেকে যাবে। এই অবস্থা থেকে বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের বাস্তব প্রকৃতি ও কারণের আংশিক নির্দ্দেশ পাওয়া যাবে। এক কথায় বর্তমান খাদ্য সঙ্কট দেশের বৃহত্তর মূল্য সঙ্কটেরই একটা আংশিক প্রকাশ মাত্র। এবং লগ্নীর তুলনায় উৎপাদন সাফল্যে সার্থকতার অভাব যে মুদ্রা-স্ফীতি ও তজ্জনিত মূল্য সঙ্কট ঘটাবার একটা বিশেষ কারণ সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাজস্ব ও শুল্ক নীতি

বর্তমান মূল্য পরিস্থিতির জন্য অন্যান্য যে সকল বিষয়ও অন্ততঃ অংশতঃ দায়ী বলে দেখা যায়, তার মধ্যে দেশের রাজস্ব ও শুল্কনীতি অন্যতম। ১৯৫০-৫১ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার সুরু থেকে ভারত সরকার যে অভূতপূর্ব্ব রাজস্ব ও শুল্কনীতি অনুসরণ করে আসছেন তার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হয়েছে। বিষয়টির বিস্তৃত পুনরাবৃত্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন; শুধু এটুকু বললেই হবে যে বর্তমানে ভারতের সমগ্র রাজস্বের মোটামুটি তিন-চতুর্থাংশ (৭৪·৬ ভাগ) গৌণ শুল্কের দ্বারা (indirect taxation) আদায় করা হয় এবং তার মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশের বেশী কতকগুলি অবশ্য ভোগ্য এবং আরো প্রায় এক-ষষ্ঠমাংশের বেশী অন্যান্য ইচ্ছাভোগ্য পণ্যাদির উপরে আবগারী বা অনুরূপ শুল্ক ধার্য্য করে আদায় করা হয়ে থাকে। এ প্রকার রাজস্ব ও শুল্কনীতির প্রয়োগ যে স্বতঃই মূল্যস্ফীতি জনক তা যাঁরা শুল্কপ্রয়োগ বিধির সঙ্গে সামান্য মাত্রও পরিচিত তাঁরাও জানেন। বস্তুতঃ কথাটা প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচারী তাঁর গত বৎসরের বাজেট বক্তৃতায় স্বয়ং নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নীতি পরিবর্জন বা সংশোধনের কোন আভাস তাঁর বাজেট রচনায় বা পরবর্তী আর্থিক প্রয়োগে (fiscal measures) এ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা যায় নি। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বর্তমান জটিল মূল্য সঙ্কটের কথা স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করেছেন এবং উপযুক্ত আর্থিক প্রয়োগের দ্বারা এর সমাধানের সুব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও জ্ঞাপন করেন। একমাত্র আর deficit financing মুলতুবী রাখা ব্যতীত অন্য কোন আর্থিক প্রয়োগ তিনি রচনা করেছেন বলে দেখা যায় না। অন্যপক্ষে উন্নয়ন সহায়তার অজুহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা পূর্ব থেকে অনুসৃত ব্যাঙ্ক-গুলির ঋণদান নীতির (credit control policy) উপরে যে কড়া নিয়ন্ত্রণবিধি বহাল ছিল তা বেশ খানিকটা ঢিলা করে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য মূল্য সঙ্কট কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরো শোচনীয় হয়ে ওঠায় এবং বিশেষ করে খাদ্য ও অন্যান্য অবশ্য ভোগ্য পণ্যাদির ওপর তার প্রতিফলন আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবার ফলে পূর্ব কড়াকড়ি পুনর্বহাল করতে হয়েছে।

মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক প্রয়োগ

গত বাজেট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মূল্য স্থিরতা (Price stabilization) প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের চেয়ে আর্থিক প্রয়োগ (fiscal measures) অধিকতর কার্য্যকরী হবার সম্ভাবনা বলে বর্ণনা করেন। এই বিষয়ে মত ভেদের বিশেষ আশঙ্কা ছিল না কেন না অতীত

এবং বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে বরাবরই দেখা গেছে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণবিধি সাধারণের কল্যাণে কার্য্যকরী ভাবে প্রয়োগ করবার মতন যথেষ্ট প্রশাসনিক সততা এবং কর্মকুশলতার efficiency নিতান্তই অভাব। সে ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োগের দ্বারা যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আশা থাকে তবে সে পথ অনুসরণ করাই সদ্বিবেচনার কাজ হবে বলে মনে হয়। এই মূল্যবৃদ্ধি নিরোধক আর্থিক প্রয়োগ কি কি ক্ষেত্রে আরোপ করা প্রয়োজন তার প্রয়োগের একটা আমূল পরিবর্তন বা সংশোধন আশু এবং একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োজনে লগ্নী নীতিতে একটা সামঞ্জস্য ও সংযমের একান্ত প্রয়োজন; একান্ত প্রয়োজন; প্রথমতঃ লগ্নীকৃত পুঁজির যাতে আনুপাতিক সার্থকতা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনে প্রতিফলিত হতে পারে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার দ্বিতীয়তঃ বৃহৎ মূল উন্নয়নের সার্থক আয়োজন একান্ত জরুরী তৃতীয়তঃ একই সঙ্গে ভোগ্যশিল্পেরও খানিকটা প্রসার প্রয়োজন যাতে ভোগ্য পণ্যের সরবরাহের খানিকটা প্রসারের দ্বারা উন্নয়ন লগ্নী জনিত প্রভৃতি অর্থ সরবরাহের খানিকটা পরিমাণ সার্থক ভোগপ্রসারের দ্বারা ব্যয়িত হবার সুযোগ পায়, কেবল মাত্র স্বল্পভোগের মূল্যমান মাত্র বাড়িয়ে তুলতে না পারে।

কালোবাজারী পুঁজি

এই প্রসঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে এবং বিশেষ করে খাদ্য ও অন্যান্য অবশ্য ভোগ্য পণ্যাদির উপরে মূল্যবৃদ্ধির প্রবলতম প্রতিফলন যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী করে হচ্ছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানুষের জীবন এবং জীবিকা সংশয়াপন্ন করে অতিরিক্ত মুনাফাবাজীর দ্বারা যে কালোবাজারী পুঁজি ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরের সময় থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার অঙ্ক যে আজ বিরাট হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এই পুঁজি বৈধ ও নৈতিক উপায়ে সংগৃহীত হয় নাই। খোলা বাজারে এই পুঁজি বৈধ ও কল্যাণকর পথে লগ্নী করিবার উপায়ও নাই। এই পুঁজি অন্তরাল থাকে, আইন ও বৈধতার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে ক্রিয়া করে থাকে; সাধারণতঃ অসহায় ও দরিদ্রতম জনসাধারণের জন্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় অবশ্য ভোগ্য খাদ্য পণ্যাদি নিয়া এরা জুয়া খেলিতে সুরু করে। সাধারণত মূল্যস্ফীতির সুযোগেই এ ভাবে এ জুয়া খেলা হয়ে থাকে। এই প্রবল শক্তিশালী পুঁজির বাজারের অস্তিত্বের কথা অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই বারে বারে স্বীকার করেছেন, কিন্তু এর কার্য্যকলাপ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করবার কোন উপায় আজো উদ্ভাবন করবার কেহ চেষ্টা করেন নাই। কাজটি সহজ নয়, কিন্তু উপযুক্ত সাহস ও সততার সঙ্গে এ বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলে অসম্ভব হবার কথা নয়। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের চাউলের বাজারের কথা ধরা যাউক। ইহা স্পষ্ট যে বর্তমান বৎসরের মোট ফসলের বৃহত্তম অংশ পরিমাণ চাউল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এর পরিমাণ অন্ততঃ ৩০ লক্ষ টন এবং এ পরিমাণ চাউল বাজার থেকে সরিয়ে ফেলতে হলে একটা বিরাট পুঁজির ন্যূনপক্ষে ৬০০ কোটি টাকার ওপর প্রয়োজন। তার ওপরে মাছ, ডাল তেল ইত্যাদির বিষয় অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হলে আরো বিরাটতর পুঁজির দরকার। একথা অবিশ্বাস্য যে গুটিকয়েক আড়তদার, মিল মালিক বা পাইকার মিলে এই রকম বিরাট পুঁজি লগ্নী করতে সক্ষম। এই লুকিয়ে রাখা মজুত চাল এবং অন্যান্য পণ্য খুঁজে বের করে জব্দ করে ফেলা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই কালোবাজারী পুঁজির একটা বড় অংশকেও নিষ্ক্রিয় করে ফেলা সম্ভব হয়। কিন্তু এদিকে কোন প্রয়াস বা প্রয়োগের কোনই লক্ষণ দেখা যায় না।

মূল্যবৃদ্ধিসূচক ও সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা

সরকারী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে দেশের সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৫২ সনের তুলনায় ১৯৬৩-৬৪ সনে হয়েছিল ১৩৫·৩ ভাগ। কিন্তু ১৯৬৪ সনের মার্চ মাসের তুলনায় যে মাস পর্য্যন্ত মূল্যমান আরো ৯·২ ভাগ বেড়েছে। ঐ সময়ে খাদ্য পণ্যাদির পাইকারী দাম বেড়েছে যথাক্রমে ১৩৬·৮ ভাগ এবং ১৩·২ ভাগ। বস্তুতঃ এই পরিসংখ্যান সূচকটি ভ্রান্তি উৎপাদক। কেন না খোলা

বাজারের বাস্তব দরের পরিমাণ থেকে দেখা যায় যে মূল খাদ্যশস্যাদির দর আরো অনেক বেশী। তা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে পাইকারী দর কাগজে কলমে যা ধার্য্য করা হয় পাইকারদের কাছ থেকে খরিদ করবার সময় তাদের আরো অতিরিক্ত ৮ ভাগ থেকে ১০ভাগ কালোবাজারী মুনাফা না দিতে রাজী হলে খুচরা দোকানদার মাল পায় না। ফলে চাউল ডাল এবং চিনির খুচরা দর—সরকারী দর নয় যে দরে বাস্তবিক ক্রেতা মাল পেয়ে থাকে—১৯৬২ সনের মার্চ মাসের তুলনায় এখন মোটামুটি প্রায় ৪৯ভাগ বেশী। অন্যদিকে সাধারণের বাস্তব ক্রয় ক্ষমতা ১৯৫০ ৫১ সনের তুলনায় কিছু বিশেষ বাড়ে নাই। জাতীয় আয় বেড়েছে কিন্তু দেশের লোকসংখ্যার ০৮ভাগ লোক মোট জাতীয় আয়ের ৩৮ ভাগ অধিকার করেন (ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্ট থেকে এই তথ্য প্রমাণিত হবে)। গড় জাতীয় আয়ের যা উদ্বৃত্ত থাকে তাতে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক ২৯০, টাকা আন্দাজ। তার থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের দাবী, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির কর ইত্যাদির মাথাপিছু বোঝা দাঁড়ায় প্রায় বার্ষিক ৭০, টাকা। অতএব মাথাপিছু ভোগ্য আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক ২২০, টাকা। অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সনের মাথা পিছু আয়েরও কম। অথচ অবশ্য ভোগ্য খাদ্য পন্যের মূল্য বেড়েছে খুচরা দরে গত দুই বৎসরেরই মধ্যে ৪৯!

বস্তুতঃ বর্তমান খাদ্য সঙ্কট বাস্তব পক্ষে সাধারণ মূল্য সঙ্কটেরই প্রতিফলন মাত্র। এই বৃহত্তর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপায় বের করতে না পারলে খাদ্য সঙ্কটের এই বর্তমান রূপ অনিবার্য্য ভাবে আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, আংশিক বন্টন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষীণশক্তি প্রয়োগের দ্বারা যে এই শোচনীয় সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, সেকথাটা স্পষ্ট করে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।
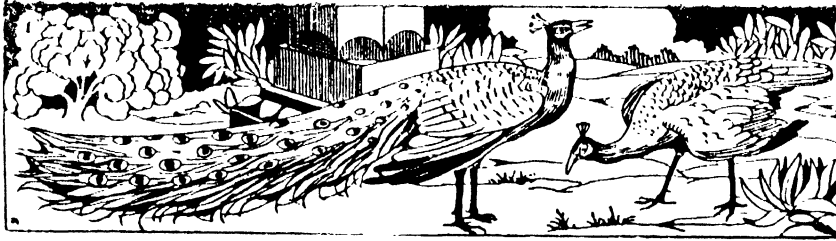
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে

অশোক সেন

আমাদের দেশের এক রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকেই ইন্টারন্যাশনাল প্লেজের পর্যায়ে ফেলা যায়। অথচ নিয়মিতভাবে এদেশে রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। ওদেশে বহু ইউরোপীয়ের মুখে শুনেছি যে ভারত পরিক্রমায় এসে কলকাতাতেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কোন নাটক দেখবার সুযোগ পাননি। ব্যাপারটা সত্যিই লজ্জাজনক নয় কি! কল্পনা করতে পারেন রাশিয়াতে গিয়ে চেখভ বা গর্কির নাটক দেখতে পাওয়া গেল না, বা ইংলণ্ডে গিয়ে শেক্সপীয়ারের কোন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে না বলে বিদেশীদের হতাশ হয়ে ফিরতে হল, বা প্যারিসে গিয়ে মলিয়েরের নাটক না দেখেই চলে আসতে হল? আসলে নাটক বিষয়ে এখনও আমরা অনেক পিছিয়ে আছে—ভাল নাটকের কদর দিতে শিখিনি। তাই বছরের পর বছর কলকাতার সব পেশাদারী মঞ্চে তৃতীয় শ্রেণীর আজে-বাজে নাটক মঞ্চস্থ হয়, অথচ রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়ের কোন ব্যবস্থা হয় না।

ওদেশে একটা কথা আছে—A Nation is known by its stage. ইউরোপের যে কোন বড় দেশকে বুঝতে হলে, তার শিক্ষা-সংস্কৃতির সত্যিকার পরিচয় পেতে গেলে, তার কৃষ্টির ব্যারোমিটার-এর কাঁটা ঠিক কোন্ জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছে জানতে হলে, সেই দেশের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার। ওদেশের বিদগ্ধজনেরা অন্ততঃ এই কথাই বলে থাকেন।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা নাটক পড়াতেন, ছাত্ররা থিয়েটার দেখতে যায় শুনলে তাঁরা মনে করতেন যে, ওরা উচ্ছন্নের পথে গিয়েছে। অর্থাৎ এই সব অধ্যাপকেরা বিশ্বাস করতেন যে, মেণ্টাল পারফরমেন্সের দ্বারাই নাটকের সমস্ত রস উপলব্ধি করা যায়। আজকাল অবশ্য এ ধারণা অনেক পাল্টে গেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অভিনয়ে উৎসাহী করবার জন্য স্থায়ী মঞ্চ করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্ররা আজকাল অধ্যাপকদের থেকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পান অভিনয়ের ব্যাপারে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে নাটকের থিওরী ও প্র্যাকটিস সম্বন্ধে অধ্যাপনা করা হয়—তবে আসলে এখানে কতটুকু কাজ হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্ততঃ এদের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত 'ক্ষুধিত পাষাণে'র নাট্যরূপ দেখে এদের অভিনয়ের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে মোটেই উচ্চ ধারণা পোষণ করা যায় না। আসলে এক্ষেত্রে দরকার ভাল অভিনয় শিক্ষক এবং পরিচালকের। শান্তিনিকেতন থেকে দক্ষ পরিচালক এবং কোচ্ এনে সহজেই এঁরা সে কাজ সমাধা করতে পারেন। রবীন্দ্রনাট্যের প্রেডাক্শনের যে একটা বিশেষ ঢং আছে সেটা শান্তিনিকেতনের নাট্য-বিদগ্ধ লোকেরাই জানেন—এ কথার সত্যতা নূতন ভাবে উপলব্ধি করলাম আশ্রমিক সঙ্ঘের সাম্প্রতিক রবীন্দ্র সংগীত-নাট্যগুলোয় যথা, মায়ার খেলা, ভানু সিংহের পদাবলী, তাসের দেশ, বাল্মীকি প্রতিভা ও চিত্রাঙ্গদার—মঞ্চরূপ দেখে। এই সব অভিনয় দেখবার সময় রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে বসে দেহমনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করছিলাম—যেন রূপসাগরে বসে বসে অবগাহন করছি এবং ছন্দ নৃত্যের লহরী স্পর্শে সম্পূর্ণ চিন্ময় সত্ত্বায় পরিণত হয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছি। এ সব নাটকে নাচ, গান, পোষাক পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ সবই হয়েছিল নিখুঁত। অথচ আমাদের পেশাদারী মঞ্চগুলোতে যান—কোন নাটক দেখে এতটুকু তৃপ্তি পাবেন না, আপনাকে চিন্তা করবার মত প্রেরণা দেবার কোন বস্তু এ সব নাটকে নেই। আর নাটকের মাধ্যমে সৌন্দর্য সৃষ্টি?—সে ধরণের আশা মনে পোষণ করা ত দুরাশারই নামান্তর।

সাম্প্রতিককালে লণ্ডনে যে সব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তার দু' একটি নিয়ে আলোচনা করছি—দেখবেন বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে এরা নাট্য-সাহিত্যকে কতটা উঁচুতে তুলে ধরেছে।

অলড়ইচ থিয়েটারে পিটার ব্রুকের পরিচালনায় ফ্রেডারিক ডুরেন মাটের লেখা। দি ফিজিসিষ্ট নাটকটির কথাই ধরা যাক। অবজার্ভার পত্রিকার

থিয়েটার গাইডে নাটকটি এই ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল "Nightmare comedy of nuclear age, set in a Swiss mental home; a near masterpiece, marvellously acted."

যবনিকা উঠলে দেখা যাবে একটি বড় ঘরে আসবাবপত্র সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। একটি টেবিল ও পড়বার বাতিদানটা উল্টে ছিটকে পড়েছে মেঝের একধারে। আর লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে একটি মেয়ের দেহ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এ এক উচ্ছৃঙ্খল নৈশ-উৎসবের অবসানের দৃশ্য। আসলে তা নয়—মেয়েটি সত্যিই মারা গেছে।

এই ভাবেই পিটার ব্রুক, ডুরেনমাটের নাটক 'দি ফিজিসিষ্টের' সুরু করেছেন। নাটকটি ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতই রহস্যোদ্দীপক। হিচ্‌কক যেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নাটকের সুরুতে আবির্ভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এই নাটকে। নাটকটিতে স্যাটায়ারের প্রাধান্য। সমগ্র প্রেক্ষাগারটি যেন আদালত-গৃহ বলে মনে হতে থাকে—নাট্যকার হচ্ছেন বিচারক—আর দর্শকের দল জুরি।

নাটকীয় ঘটনা ঘটছে সুইট্জারল্যাণ্ডের একটি পাগলদের থাকবার বিলাস-প্রাসাদে। এর মালিক এক মহিলা সাইকিয়াট্রিষ্ট—এখানে অন্যান্য রোগীর মধ্যে তাঁর চিকিৎসাধীনে আছেন তিনজন বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিষ্ট। এঁদের মধ্যে একজনের ধারণা যে তিনি আইনষ্টাইন—প্লে আরম্ভের আগে ইনি তাঁর নার্সকে গলা টিপে মেরে ফেলেছেন এবং তারই দেহ মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে। আর একজন, যিনি নিজেকে মনে করেন নিউটন, তিনিও কয়েক মাস আগে ঠিক এই ভাবেই নিজের নার্সকে মেরে ফেলেছিলেন। তৃতীয়, যাঁর কাছে সদাসর্বদা রাজা সলোমন আবির্ভূত হচ্ছেন, প্রথম অঙ্কের পর একইভাবে তাঁর নার্সকেও হত্যা করবেন।

পুলিশ এ সব কেস নিয়ে সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে না পড়লেও বিব্রত বোধ করছেন।

নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানতে পারি যে নিউটন বা আইনষ্টাইন আসলে পাগল নয়—এঁরা দুজনেই পরস্পরবিরোধী পৃথিবীর দুই বিরাট শক্তিশালী জাতির নিয়োজিত চর—পাগলামীর মুখোস এঁটে এঁরা এখানে এসেছেন তৃতীয় সঙ্গীকে অর্থাৎ যিনি রাজা সলোমনকে সব সময় দেখতে পান, হরণ করে নিয়ে যেতে। কারণ তৃতীয় ব্যক্তিটি এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা সব কিছু ধ্বংস করে দেওয়া যায়। তৃতীয় বৈজ্ঞানিকটি কিন্তু উন্মাদ নন। নার্সেরা এঁদের আসল পরিচয়ের খানিকটা আভাস পাবামাত্রই তাদের জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে। তৃতীয় বৈজ্ঞানিকটি সত্যিকার জিনিয়াস। তাঁর আবিষ্কারের ফলে যাতে মানব জাতি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় শুধু এই কারণেই তিনি পাগল সেজে আছেন। ওঁর এই ছদ্মরূপ ধারণের পেছনে রয়েছে একটা বিরাট নৈতিক সমর্থন। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত অন্য দুই সঙ্গীকে বোঝাতে পেরেছেন একমাত্র উন্মাদাগারেই তাঁরা সত্যিকার স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে পারবেন। শেষে এদের দুজনকে নিজের প্যাসিফিষ্ট মতবাদে দীক্ষিত করেছেন।

নাটকটির বাইরের দিকটা রহস্য রোমাঞ্চে ভরা কিন্তু ভেতরে ফল্গুধারার মত বইছে আবেগে ভরা একটি মাত্র আইডিয়া—আজকের জগতে কি করে সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এই মূল বক্তব্যটিই নাটকটিকে ডুরেনমাটের একটি শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এবার আসছি বের্টল্ট ব্রেখ্‌টের 'বাল্' নাটকটির লণ্ডন প্রডাকসনের আলোচনায়।

অব্‌জার্ভার পত্রিকায় কুইক থিয়েটার গাইডে 'বাল্' নাটকটি সম্বন্ধে এইভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল—Baal, by Bertolt Brecht—Poet's progress through the lower depths: Peter O'Toole in a fine production of Brecht's first play—Phoenix.

ব্রেখ্‌ট্ মাত্র কুড়ি বছর বয়স এ নাটকটি লিখেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যনাট্য এবং বিংশ শতাব্দীর থিয়েটার অভ্ দি এ্যাবসার্ডের মধ্যেকার একটি প্রধান যোগসূত্র এই 'বাল্' নাটকটি। এর মূল শিকড় খুঁজতে গেলে চলে যেতে হবে পেছিয়ে ইব্‌সেনের 'পিয়ার জিন্‌টে', আর সামনের দিকে এগিয়ে এলে এর পূর্ণ প্রভাব দেখা যাবে জেনেট ও বেকেটের রচিত নাটকগুলিতে।

ফিল্ম স্ক্রিপ্টের ধরণে টুক্‌রো টুক্‌রোভাবে নাটকটি রচিত—সব মিলে তুলে ধরেছে এমন একটি লোকের ছবি যার কোন পরিচয় আমরা সাধারণ জীবনে পাইনা। "Baal is a drunken poet, a Rimbaud-cum-Villan, a lecherous freebooter who seeks the truth of

human existence in the gutter and is alternately overjoyed and disguised by what he finds"— Kenneth Tynan.

বাল কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ। মানুষের যত বদ্‌গুণ সবই তার মধ্যে দেখতে পাই! সে মদ্যপ, আলস্য-পরায়ণ, স্বার্থপর, অসভ্য এবং দুশ্চরিত্র। এক শিষ্যের সতের বছরের প্রণয়িনীর সে সতীত্ব নষ্ট করে—মেয়েটি জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। তার সঙ্গীরা হচ্ছে ভবঘুরের দল, গাড়ীর গাড়োয়ান প্রভৃতি। সস্তা নাইট ক্লাবে গিয়ে সে গান করে আনন্দ পায়। তার বন্ধু কম্পোজার একার্টের সঙ্গে সারা দেশময় ঘুরে বেড়ানো—মদ খেয়ে মাতলামি করা, আর মারামারি করা এই যেন হয়ে দাঁড়ায় তার জীবনের ব্রত। সোফী নামে একটি মেয়ের তার দ্বারা সন্তানসম্ভাবনা হয়। সোফী কিছুদিন বাল এবং তার সঙ্গীর অনুসরণ করে ঘুরে বেড়ায় এবং শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করে আগের মেয়েটির মত জলে ডোবে, এরপর বাল্ একার্টের প্রণয়িনীকে প্রলুব্ধ করে এবং একার্টকে হত্যা করে নির্মম-ভাবে। পুলিশ তার পেছনে ধাওয়া করে এবং শেষ-পর্যন্ত সঙ্গীহীন ভাবে এক বনের ভেতর একটি কুঁড়ে ঘরে বালের মৃত্যু হয়।

নাটকটিতে সমস্ত ছাপিয়ে একটি হতাশারই ভাব ফুটে উঠেছে। এইখানেই এ নাটকের সঙ্গে বেকেটের নাটকের মিল দেখতে পাওয়া যায়। একটি দৃশ্যে আছে একজন পাবলিশার বালের সম্মানার্থ একটি পার্টি দিচ্ছেন —বাল শুধু খাওয়া, মদ্যপান এবং মেয়েদের প্রতি ইঙ্গিত, ইশারা করেই কাটায়। পরে সে তার নিত্যসঙ্গী গিটারটি বাজিয়ে গান সুরু করে—"Man only eats in order to excrete." এই দৃশ্যটিতেই যেন বালের জীবন দর্শন ব্যক্ত হয়েছে!

বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, (প্রাচীনযুগ): ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ, পিএইচ ডি প্রণীত, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৫২, মুল্য ১০ টাকা।

বাংলা দেশের ইতিহাসের প্রথমখণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৫২ সাল। বর্তমান-প্রকাশ পরিবর্তন চতুর্থ সংস্করণ। পরে কুড়ি বৎসরে নানা উৎখননের ফলে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে পশ্চিম বঙ্গে সিন্ধুনদের উপত্যকা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মতই প্রাক্‌কার্য্য সভ্যতার নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে এবং এগুলির সাহায্যে আর্য্য জাতির সহিত সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে বাঙালীর কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে বাঙালীর সভ্যতার প্রচীনত্ব প্রায় দেড় হাজার বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় "চন্দ্র" উপাধিধারী রাজগণের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজবংশের সম্বন্ধে পূর্ব্বেকার ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সম্রাট শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের গুরুতর মতভেদ ছিল! বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রামডাঙ্গায় নীচে মাটির কতকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে এবং উহার কয়েকটীতে রক্তমৃত্তিকা বিহারের নাম উৎকীর্ণ থাকায় উক্ত স্থান অর্থাৎ রাঙামাটি শশাঙ্কর রাজধানী ছিল ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

মোট একুশটি পরিচ্ছেদে দেশ, জাতির, উৎপত্তি, আর্য্য প্রভাব, গুপ্তযুগ, অরাজকতা মাৎস্যন্যায়, পাল সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, বৈদেশিক আক্রমণ ও অন্তর্বিদ্রোহ, বর্ম রাজবংশ, সেনরাজবংশ, দেববংশ রাজ্যশাসন প্রভৃতি (প্রাচীনযুগ, গুপ্ত, পাল ও সেন ও অন্যান্য খণ্ড রাজ্যে) ভাষা ও সাহিত্য ধর্ম্মমত (বৈদিক, পৌরাণিক, বৈষ্ণব, শৈব, জৈন, বৌদ্ধ সহজিয়া) দেবদেবীর মূর্ত্তি পরিচয়, সমাজের কথা অর্থ নৈতিক অবস্থা (কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রাচীন মুদ্রা), শিল্প কলা বাংলার বাহিরে বাঙালীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থে আনুমানিক ৪র্থ ৫ম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজা ও রাজবংশের কালবিজ্ঞাপক সূচী দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা লিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের চিত্র এবং ৩১ খানি মন্দির, মূর্ত্তি প্রভৃতির চিত্র এই মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থনে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

প্রাচীনকাল হইতে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার এই ইতিহাস প্রত্যেক বাঙালীর নিকট সমাদর লাভ করিবে ইহাই আমরা আশা করি।

বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্য যুগ): ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদিত—জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৩৪ মূল্য ২০ টাকা।

বাংলা দেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (হিন্দুযুগ) প্রায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়, এতদিন পরে দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যযুগের ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ায় প্রাক্ ইংরেজ যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইল। এ যুগের ইতিহাসকে বিদেশী জাতি সমূহের বিজয়, প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তারের ইতিহাস বলা চলে। অবশ্য হিন্দুরাজগণকে পরাজিত করিতে এবং সমগ্র বাংলাদেশ দখল করিতে মুসলমান বিজেতাগণের বেশ কিছু সময় লাগিয়াছিল এবং বহু বৎসর বাংলার বিভিন্ন অংশে মুসলমান বিজেতাগণ এবং হিন্দু রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন—বিশেষত: পূর্ব্ববঙ্গে। ইখতিয়ারুদ্দীন, মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী ১২০৪ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ (নদীয়া) জয় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন ১২০৬ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন। ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দেও মধুসেন পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের কোন অঞ্চল মুসলমানেরা দখল করিতে পারে নাই। এই যুগে বাংলা দেশে বিভিন্ন সময়ে তুর্কী জাতীয় স্বাধীন সুলতান, বাদশা দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি, আফগান, মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছে। এই মুসলমান যুগেও কিছুকালের জন্য একজন হিন্দু রাজা গণেশ

রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় হিন্দু রাজত্বের শেষ হয়।

পনেরটা পরিচ্ছেদে এই বৃহৎ গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। প্রথম সাতটা পরিচ্ছেদ বাংলায় মুসলমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ—ইলিয়াস-শাহী বংশ রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশ, মাহমুদশাহী বংশ ও হাব্‌শী রাজত্ব, হোসেনশাহী বংশ—প্রথম যুগের শাসন ব্যবস্থা (১২০৪-১৫৩৮), হুমায়ূন ও আফগান রাজত্ব এবং চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে লিখিয়াছেন শ্রীসুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অষ্টম হইতে একাদশ পরিচ্ছেদ মুসলমান যুগ। নবাবী আমল, মুসলিম যুগের উত্তরার্দ্ধের রাজ্য-শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পাদক নিজে লিখিয়াছেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের আলোচ্য সংস্কৃত-সাহিত্যের লেখক ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 'ধর্ম্ম ও সমাজ' সম্পাদক ও ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট প্রাচীন বাংলা গদ্য, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে 'শিল্প' পরিশিষ্টের কোচবিহার ও ত্রিপুরা' সম্পাদক নিজে, কোচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের মুদ্রা বিষয়ে ডক্টর অমরনাথ লাহিড়ী লিখিয়াছেন। বাংলায় সুলতান শাসন ও নবাবের কালানুক্রমিক তালিকা করিয়াছেন শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। পুস্তকের প্রথমার্দ্ধে (১-২২৬ পৃষ্ঠা) রাজকীয় ইতিহাস এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে (২২৭ হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠা) আর্থিক, ধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্যের ইতিহাস স্থান পাইয়াছে।

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কে রাজনীতির প্রভাবে হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতির মধ্যে একটি কাল্পনিক মিলনক্ষেত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ডক্টর মজুমদার ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা এই মতের সমর্থন করে না। অবশ্য ডক্টর মজুমদার তাঁহার মতকে অভ্রান্ত বলিতে চান না এবং এই বিষয়ে আরও নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

পুস্তকের পরিশিষ্টে হিজরি সন ও খ্রীষ্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা গবেষকগণের কাজে লাগিবে। গ্রন্থপঞ্জী, নির্দ্দেশিকা, ৫৯ খানি মূল্যবান চিত্র (মন্দির, মসজিদ, ৩খানি মানচিত্র, মুদ্রা চিত্র ইত্যাদি) গ্রন্থের মূল্য বাড়াইয়াছে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল।

এই সুলিখিত ইতিহাস গ্রন্থের বিপুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

এই গান তোমার আমার—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়, পরিবেশক: কথা শিল্প, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, দাম আট টাকা। কলিকাতা-১২।

কথা ও সুর নিয়ে গান। আগে দেখা যেত যিনি সুর-শিল্পী তিনিই কথা-শিল্পী। আজকাল সংগীত-রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে সুরশিল্পী ও কথাশিল্পী পৃথক হয়ে গেছেন। গানে কথাশিল্পীর, অর্থাৎ গান-লেখকের অবদান যে সুর-শিল্পীর অর্থাৎ গায়কের চেয়ে কম নয় তা স্বীকৃত হয়েছে। গান-লেখক হিসেবে শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়ের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। তাঁর টাটকা ছাপা গানের বই হচ্ছে—এই গান তোমার আমার। অমিয়বাবু গানগুলোকে আটভাগে ভাগ করেছেন, যেমন আধুনিক, রাগপ্রধান, পল্লীগীতি, শ্যামাসঙ্গীত, হোলি, ভক্তিমূলক, দেশাত্মবোধক, বিবিধ। প্রথমে স্থান দিয়ে অমিয়বাবু আধুনিক গানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। গানগুলি ভাবে ও ভাষায় আধুনিক, অথচ অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নতুন যুগের নতুন পরিবেশে নতুন চিত্তে সুখ দুঃখ, বিরহ মিলন যে রেখাপাত করেছে অমিয়বাবুর গানে তার পরিচয় পাই। এখানে দু একটি গান থেকে দুএক লাইন তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

আশা-ময়ূরীর দেখেছো কি পাখা ছড়ানো—
দেখেছো কি তার আঁখি দুটি মন-হরানো?
স্বপ্ন সাগর বেলাতে
সীমাহারা রাতে চির আলেয়ার খেলাতে—
দেখেছো কি তার নীল ফুলঝুরি ঝরানো?

*   *   *

রাত-ভরা স্বপ্ন
মন-ভরা গান
চাঁদ-ভরা জোছনা
নদী-ভরা বান॥
মধু-ভরা মধুবন
ভ্রমরের গুঞ্জন
চোখ-ভরা জল, আর
বুকে অভিমান।

বইটির ছাপা পরিচ্ছন্ন, বাঁধাই সুন্দর। মলাটের ছবি এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেন। আশা গায়ক-মহলে বইখানির আদর হবে।

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

স্ত্রী-শিক্ষার কথা: শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

উল্লেখযোগ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত বিবিধ প্রগতিমূলক প্রচেষ্টা চলিয়াছিল তাহার মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন অন্যতম। গোঁড়া হিন্দুয়ানীর প্রভাবে মেয়েরা

তখন ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী। পড়াশুনা করিবার জন্য মেয়েরা ঘরের বাহির হইবে এ যেন কল্পনারও অতীত ছিল তখন। এই অন্ধ কু-সংস্কার ভাঙ্গিতে সে সময় অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় সেই অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বাগল মহাশয় তাহার পূর্বাপর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, সে সময় ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা এই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন: "১৮৫৭ সনের প্রারম্ভ হইতেই কলিকাতাস্থ আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়—যাহা পরে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হইতে থাকে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী আওতার মধ্যে আসিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্পাদকত্বে একটি নূতন জীবন লাভ করে। আবার এই বৎসরই দক্ষিণবঙ্গের বিশেষ ইনস্পেক্টররূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুরে কয়েকটি মডেল বালিকা বিদ্যালয়ও…স্থাপন করিয়াছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় সরাসরি সরকারী নির্দেশে স্থাপিত হয় নাই বলিয়া শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ প্রথমে অর্থমঞ্জুরীতে আপত্তি তুলেন। …বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার আদর্শে সাধারণ-গম্য অ-ধর্মীয় বালিকা বিদ্যালয় কলিকাতায় ও মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।"

যোগেশবাবুর এই "স্ত্রী-শিক্ষার কথা" হইতে আমরা অনেক তথ্য অবগত হই। ইতিহাসের ইহা একটি বিশেষ অধ্যায়। আজকের মানুষের যাহা জানিবার কথা নয়, তিনি সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। আজ স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার দেখিয়া আমরা তাঁহাদের কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব, যাঁহারা এই শিক্ষা প্রসারকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আর সেই সঙ্গে যোগেশবাবুকে সহস্র ধন্যবাদ, এরূপ একটি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য। বইখানি ছোট, কিন্তু বিবিধ তথ্যে ঠাসা। সার্থক তাঁহার লেখনী।

মধ্যদিনের গান: বিমলেন্দু চক্রবর্তী, গ্রন্থলোক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২। মূল্য তিনটাকা।

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু বলিবার ভঙ্গী ও নূতনত্বে চমক লাগে। লেখক শিল্পী। তিনি ভাল ছবি আঁকেন কিন্তু তিনি যে এমন করিয়া লিখিতেও জানেন, জানা ছিল না।

আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস, কিন্তু নানা লোকের ভিড়ে গল্প কোথাও দানা বাধে নাই। লেখক আগাগোড়া দারিদ্র্যকেই ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। কথাঘাতের বাহুল্যে বার বার একই কথা আসিয়া পড়িয়াছে। সংযম লেখকের একটি বড় গুণ। লেখকের ইহা মনে রাখা উচিত ছিল। তবে লেখকের লিখিবার শক্তি আছে, হয়ত এ দোষ পরে আর থাকিবে না। আমরা পরবর্তী বই-এর অপেক্ষায় থাকিলাম।

গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

২য় সংখ্যা

সমষ্টিবাদের পাটিগণিত

"আমি কোনও ব্যক্তিকেই কিছু দিই নাই কিন্তু সকল ব্যক্তিকে সবকিছু দিয়াছি" এই জাতীয় কথার অঙ্কশাস্ত্র-গত অর্থ বিশেষ কিছু না হইলেও আধ্যাত্মিক অর্থ হইতে পারে। যেরূপ মন্দিরের সেবায়েতগণ ব্যক্তিগত অধিকারে কিছু খাইতে না পাইলেও দেবতার প্রসাদ ভোজন করিয়া নিজেদের উদর পূর্ণ রাখিতে সক্ষম হন। এই ক্ষেত্রে অধিকার বিচার করা হয় বাস্তব পরিস্থিতির হিসাব না করিয়া। কিন্তু সমষ্টিবাদের কোনও অবাস্তব বা আধ্যাত্মিক রূপ থাকা উচিত নহে, কারণ ঐ জাতীয় অর্থনীতিবাদ শুধু বস্তুতন্ত্র অবলম্বনেই গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ বাস্তবভাবে দেখিলে কোনও ভোগ্যবস্তু যদি কোন ব্যক্তিই না প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাহা কেহই পান নাই বলিয়া ধরিতে হইবে। সমষ্টিগতভাবে ভোগ করার উপায় হইল ব্যক্তির ভিতর দিয়া; কারণ সমষ্টিগতভাবে সকল ব্যক্তির কোন পৃথক মহা-উদর থাকিতে পারে না। বস্ত্র পরিধান করা, তক্তাপোষে শয়ন, ছাতা মাথায় দিয়া রৌদ্রবৃষ্টি হইতে বাঁচাও কোন সমষ্টিগত মহা-পৃষ্ঠদেশ অথবা মহা-মস্তক ব্যবহারে সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্যক্তিগত পৃথক পৃথক বহু সংখ্যক উদর, পৃষ্ঠদেশ, মস্তক প্রভৃতি দিয়াই সমাজ বা সমষ্টির ভোগ সাধিত হয়। অর্থাৎ অর্থনীতিতে যে ভোগ্য উৎপাদন, বণ্টন ও উপভোগের কথা আলোচনা করা হ সেই বণ্টন ও উপভোগ ব্যক্তিকে বাদ দিয়া কোন বিরা ও সুবিশাল মহা-ভোক্তার জন্য নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না কারণ ঐরূপ কোন সমাজ বা সমষ্টি নামধেয় মহা-ভোক্তা অস্তিত্ব নাই। ভাবের ক্ষেত্রে থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে নাই এবং ভাবের ক্ষেত্র বা অবাস্তবের স্বরূপ বিচার বস্তুবাদে পূজারীদিগের পক্ষে অনধিকার চর্চা। যাঁহারা বিশ্বা করেন যে বস্তুই একমাত্র সত্তা, তাঁহাদিগের পক্ষে ক কল্পিত অবাস্তব মানসিক ভাবের সাহায্যে বাস্তব সমস মিটাইবার চেষ্টা নিজেদের উপরই বিশ্বাসঘাতকতা অর্থনীতির পাটিগণিতে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ বিষয়ে যে সকল দেনা-পাওনার কথা উঠে তাহাতে দেনাদার পাওনাদারগণ ব্যক্তিই হইয়া থাকেন—ব্যক্তিগত অথব মিলিতভাবে jointly and severally। অর্থাৎ ব্যক্তি গণের যে মিলিত কিম্বা পৃথক পৃথক দাবী অথবা দায়িত্ব বাস্তবের অর্থনীতিতে শুধু তাহারই হিসাব হইতে পারে তাহা কিন্তু ব্যক্তিরই মিলিত দেনা-পাওনার কথা এব তাহা দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থাও ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া মাত্র হইতে পারে। যাহার জন্য অতিবড় সমষ্টিবাদে কেন্দ্রেও কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিই শুধু দিতে নিতে পারে ব্যক্তি না দিলে সমষ্টিগত পাওনা পাওয়া যায় না এব

ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া না দিলে সমষ্টিগত দেনাও শোধ হয় না। উপরন্তু সমাজের সকল লোকের অভাব মিলিত আকারে একটা উৎকট রূপ ধারণ করে।

সুতরাং ব্যক্তির যে দায়িত্ব ও যে দাবী তাহার সুসংগত হিসাব-নিকাশ করিতে পারিলেই রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র যথাযথভাবে চলিতে পারে। রাজার রাজ-শক্তি ঐশ্বরিক সুতরাং রাজা যথেচ্ছাচার করিতে পারেন এ কথাও যেরূপ মিথ্যা, সমাজবাদের নামে যথেচ্ছাচারের অধিকারও সেই রূপই অন্যায় ও মিথ্যা। ব্যক্তির অর্থ উপার্জ্জন, বস্তু উৎপাদন ও সেই সকল বস্তুর ন্যায়সাপেক্ষ বণ্টন ও ব্যক্তিগত ভোগের ব্যবস্থার উপরেই সমাজ চলিতেছে ও চলিবে। ইহার বিপরীত কোন উন্নততর সমাজগঠন ও পরিচালনার উপায় এখনও কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

ঘেরাও নীতি বিচার

ঘেরাও কাহাকে বলে তাহার অর্থ আলোচনা না করিয়া দেখা যাইতে পারে ঘেরাও কাহাকে কি ভাবে কাহারা করিয়াছে ও করিয়া থাকে। কি হইয়াছে তাহা জানিলে কথার অর্থ অনুসারে কি হওয়া উচিত তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইবে। একজন কারখানার প্রধান কর্ম্মচারী কারখানার বাহিরে খেলার মাঠে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে ঘেরিয়া অনেকগুলি শ্রমিক দাবী পেশ করিলেন যাহাতে সেই কারখানায় শ্রমিকদিগকে ছাঁটাই করা না হয়। তিনি বলিলেন ছাঁটাই করা না করা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। মাল তৈয়ার করার প্রয়োজন হয় ক্রেতা-দিগের চাহিদার উপর। ক্রেতাগণ মাল না চাহিলে কারখানা পুরাদম চলিতে পারে না। তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে লাঠি মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হইল। কোন কোন রাষ্ট্রকর্ত্তা বলেন যে শ্রমিকদিগের উচ্চ কর্ম্ম-চারীদিগকে ঘেরাও করিয়া রাখিবার অধিকার আছে। কারণ তাহারা সেই উপায়ে নিজেদের দাবী পেশ করিতে পারে। দাবী পেশ করিতে পারিলেই যদি যে কোন কার্য্য বা ব্যবহার ন্যায্য হইয়া যাইত তাহা হইলে গভীর রাত্রে কোন কর্ম্মচারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ছোরা দেখাইয়া দাবী শুনাইলে তাহাও ন্যায্য প্রমাণ হইবে। কিম্বা কোন কর্ম্মচারীকে রাস্তার অলোকের স্তম্ভে বাঁধিয়া দাবী শুনাইলে তাহাও ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ হইবে। আমেরিকার পুলিশ অপরাধী সন্দেহে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিলে তাহাকে ঘুমাইতে না দিয়া দুইচারিদিন ধরিয়া একই প্রশ্ন ক্রমাগত করিতে থাকে। ইহাকে 'থার্ড ডিগ্রি' নাম দেওয়া হইয়াছে। রুশ দেশে এই উপায়ে বহু নির্দ্দোষ লোককে অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। এই উপায়ে যদি কারখানার মালিক বা কর্ম্মচারীদিগকে সপ্তাহ কাল না ঘুমাইতে বা না খাইতে দিয়া ক্রমাগত দাবী পেষ করা যায় তাহাতে শ্রমিকদিগের কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। অতএব রাষ্ট্রকর্ত্তাগণ মালিক শ্রমিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে "থার্ড ডিগ্রির" ব্যবস্থা করিলে একটা নূতন কিছু করিবার সুনাম ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবেন। কেননা শ্রমিকদিগের দাবী পেশ করিয়া সেই দাবী মানাইয়া লওয়াই যদি পৃথিবীর সকল ন্যায়-বিচারের শেষ উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে যে কোন উপায়ে দাবী মানাইয়া লওয়াই চরম সমাজ-শাসন রীতি ও নীতি হইয়া দাঁড়াইবে।

অপর এক কারখানায় শ্রমিকগণ আইন অনুসারে যত অধিক ঘণ্টা কাজ চলে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় কাজ করিবার দাবী করিয়া উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে ঘেরাও করিয়া রাখেন ও কর্ম্মচারীগণ তাহাতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাদিগের পাখা, জল বন্ধ করিয়া দেন। আর একটি বিপরীত উদা-হরণে দেখা যায় যে একটা কারখানায় শ্রমিকগণ খাটুনি লাঘব করিবার জন্য ঘেরাও-পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ কাজ কম বা বেশী যাহা কিছু করিবার জন্যই ঘেরাও হইতে পারে। অবশ্য সকল দাবীর মূলে রহিয়াছে আর্থিক লাভ-লোকসানের কথা। চাউল না পাওয়ার জন্য (সরকারী দরে) ঘেরাও হওয়ার কথাও সম্প্রতি শুনা গিয়াছে। হুকুম না মানিয়া যথেচ্ছ কাষ করার দাবীও পেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ দাবী নানান প্রকার হয় ও তাহার বৈচিত্র্য অসীম। শ্রমিকদিগের যে সকল দাবী আইনত গ্রাহ্য হয় তাহার আলোচনা ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের শ্রমিক-মালিক মতদ্বৈধ সংক্রান্ত আইনে আছে। এই আইন অনুসারে কোন মতদ্বৈধ ঘটিলে তাহার প্রথমত আপোষে মীটমাটের ব্যবস্থা আছে। আপোষের ব্যবস্থা যেভাবে

করিবার কথা তাহার মধ্যে ঘেরাও করার কোন বিধান নাই। আপোষ মীমাংসা যদি সফল বা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আইনে বলে যে সালিসি মীমাংসার ব্যবস্থা হইতে পারে, এবং কি ভাবে তাহা হইবে তাহারও নির্দ্দেশ আছে। ইহার মধ্যেও উভয় পক্ষের কেহ কাহাকেও অথবা সালিসকে ঘেরাও করিতে পারিবে বলিয়া কোন ব্যবস্থা নাই। আপোষ ও সালিস সফল না হইলে থাকে আদালত। এই আদালত বা ট্রাইবিউনাল কি ভাবে কেমন করিয়া বিচার কায করিবেন তাহার পদ্ধতিও আইনে প্রকৃষ্টভাবে বিবৃত আছে। বিচারক, সাক্ষী, বাদী, বিবাদী, কেহ কাহাকেও ঘেরাও করিবেন বলিয়া কাহারও কোন অধিকার নাই।

আইনতঃ তাহা হইলে ঘেরাও গ্রাহ্য হয় নাই। এখন বাংলা সরকার আইন করিয়া ঘেরাও-এর বে-আইনী রূপ পরিবর্ত্তন করিবেন কি না তাহা নির্ভর করিবে লোকসভায় ঘেরাও সমর্থক একমত ব্যক্তির সংখ্যার উপরে। কারণ ভারতীয় আইন প্রণয়ন, হইয়া থাকে কেন্দ্রের লোকসভায়; বাংলার বিধান সভায় নহে। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ত্তমানে আইন যেরূপ আছে তাহাতে মালিক-শ্রমিক মতদ্বৈধের মীমাংসা যথাযথভাবে হইতেছে না। আইন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলেই যে যথেচ্ছাচার আইন গ্রাহ্য হইয়া যাইবে এরূপ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না। ঘেরাও যথেচ্ছাচারের অভিব্যক্তি। তাহার পরিবর্ত্তে কি ব্যবস্থা করিলে তাহা আইনের অঙ্গ হইতে পারে তাহার আলোচনা প্রয়োজন। ঘেরাও কখনও আইনসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে শীঘ্রই অপর পক্ষের লোকেরাও অন্য কোন বে-আইনী পন্থায় নিজেদের ইচ্ছা ও মত বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা অধিকতর ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন মনে হয়। শ্রেণী-সংগ্রাম বিপ্লব-বাদের দিক দিয়া প্রগতি পরিচায়ক হইলেও সমাজের লোকের সুখ সুবিধা ও নিরাপদ জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযুক্ত পদ্ধতি নহে। আমরা জাতীয় ভাবে শান্তিপ্রিয় ও কোন প্রকার যুদ্ধ বা দাঙ্গা হাঙ্গামায় আমাদিগের আস্থা নাই। আমরা এতই শান্তিবাদী যে আমরা তাহার জন্য বহু অপমান সহ্য করিয়াও শান্তিরক্ষা করিয়া চলি। সুতরাং কোন রাষ্ট্রীয় দলের মতবাদের খাতিরে আমরা পথে ঘাটে ক্রমাগত অসুবিধা ভোগ করিয়া শ্রমিক-আন্দোলনের ধাক্কা সামলাইতে প্রস্তুত নহি। বহু শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দেশের শাসন কার্য চলিতেছে। সুতরাং যাঁহারা সেই টাকা দিতেছেন তাঁহারা চাহেন আইন অনুসারে সকল সমস্যার সমাধান হয়। ইহার উহার মতবাদ বা আজগুবী বিশ্বাসের উপর দেশের শাসন বা ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতে পারে না।

আরব ও ইহুদী

আরব ও ইহুদী, উভয় জাতিরই ইতিহাস বহু পুরাতন। আরব বা ইহুদী জাতীয় মানুষের ইতিহাস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকা ও উত্তর পশ্চিম এশিয়াতে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস ছিল। তাহারা বিরাট বিরাট রাজ্যও সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পুরাতন মিশর, ক্যালডিয়া, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতির নাম মানব ইতিহাসে প্রখ্যাত। আরব এবং ইহুদীদিগের সভ্যতা ও ভাষা প্রাচীন-ইতিহাসে মানব উন্নতি ও প্রগতির পরিচায়ক। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকাল হইতেই ইহুদীদিগের অবস্থা ক্রমশ পতনের দিকে যাইতে আরম্ভ করে। কারণ ইহুদী ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ। পরে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইলে ইহুদীদিগের শত্রু সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায় ও তাহাদিগের উপর প্রবল অত্যাচার চলিতে থাকায় তাহারা ক্রমশঃ নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া বহু সংখ্যায় অপর দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মধ্য যুগে এমন কি বর্ত্তমান কালেও ইহুদীদিগের উপর অত্যাচার করা প্রায় পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। ইহুদীদিগের "ঘেট্টো" আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করা; এমন কি তাহাদিগকে হত্যা করার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই জাতীয় অমানুষিক অত্যাচার বা "পগ্রম" ইউরোপের বহু দেশেই প্রচলিত ছিল। রুশ, পোলাণ্ড, জার্ম্মানী, প্রভৃতি দেশ এই দুষ্কর্ম্মে প্রধান ছিল। উত্তর পশ্চিম এশিয়ায় অর্থাৎ বর্ত্তমান প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন প্রভৃতি দেশে কিছু কিছু ইহুদী বরাবরই থাকিয়া গিয়াছিল। তাহারা ছোটখাট ব্যবসাতে নিযুক্ত থাকিত। যাহারা ইয়োরোপে পলাইয়া গিয়াছিল তাহারা বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াও ব্যবসা বুদ্ধির জোরে প্রায় সকল দেশেরই আর্থিক ক্ষেত্রে নিজেদের একটা প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে সক্ষম

হইয়াছিল। কোন কোন ইহুদী-পরিবারের আর্থিক প্রতিপত্তি জাতি ও রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যথা জার্ম্মান দেশের রোটশীল্ড পরিবার ইংলণ্ড ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, প্রভৃতি দেশেও অর্থ সম্রাট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই কারণে কোন দেশেই ইহুদীগণ জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। সকলেই তাহাদিগকে মূলধনের মালিক বলিয়া হিংসা ও ঘৃণা করিত। ইহুদীদিগের ইতিহাসে তাহারাও বরাবরই নিজ দেশে পুনর্ব্বার নিজ রাজ্য স্থাপন করিবে বলিয়া একটা আগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছে এবং পৃথিবীর সকল ইহুদীগণই এই আশা নিজেদের মনে সর্ব্বদা বলবৎ রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরে যখন তুর্ক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া আরব দেশগুলির পুনঃগঠনের পরিকল্পনা হয় ও যখন ইংরেজ ও ফরাসীগণ আরব দেশের সর্ব্বত্র নিজ নিজ অধিকারের সীমানা টানিতে আরম্ভ করেন, তখন সিরিয়া ও লেবানন ফরাসী এলাকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। (ট্রান্স) জর্ডন, প্যালেষ্টাইন ও মিশর প্রধানতঃ ইংলণ্ডের খপ্পরে পতিত হয়। ইরাক ও সাউদি আরব দেশও ইংলণ্ডের কূটনীতির ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ছিল। আরব জাতি যদিও অত্যন্তই গরীব তাহা হইলেও আরব দেশগুলিতে ধনিকের অভাব নাই। অভিজাত পরিবারেরও অভাব নাই। এই সকল দেশে যে সৈন্য-সামন্ত গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যেও অভিজাত ও ধনবানের স্থান উচ্চে ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা হইলেও আরব জাতিগণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধাচরণ হেতু ধন-নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা স্বভাবতই রুশ বা চীনের সহিত সৌহার্দ্য করিতে ইচ্ছুক ও সেই ইচ্ছা কিছু কিছু পূর্ণতা লাভও করিয়াছে। সাউদি আরব দেশে শুনা যায় দাসত্ব-প্রথা এখনও প্রচলিত আছে; কিন্তু সাউদি রাজশক্তি প্রগতিশীলতার পথে পদক্ষেপ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা বর্ত্তমান ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনে বহু সাহায্য করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে যাহা তাহারা রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহারে করিয়াছেন এখনও সেই কার্য অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সম্পন্ন করা হইতেছে। ইসরাইল ক্ষুদ্র দেশ হইলেও সেই দেশে উত্তম অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত চার পাঁচ লক্ষ সৈন্য আছে। আরও আছে সহস্রাধিক যুদ্ধ বিমান ও কিছু কিছু নৌবহর। অর্থাৎ যুদ্ধ লাগিলে ইসরাইল আরব জাতিদিগের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে অক্ষম নহে। এই কারণেই রুশ আমেরিকাকে হুমকি দিতে ব্যস্ত যাহাতে আমেরিকা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিজ নিজ দেশ হইতে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত ইহুদী সৈন্য ইসরাইলে পাঠাইতে না চেষ্টা করেন। এই হুমকির ফল কি হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ ইসরাইল-এর "প্রত্যাবর্ত্তন আইন (১৯৫০)" অনুসারে পৃথিবীর সকল ইহুদী সেই দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন এবং যদি যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ইহুদীগণ দলে দলে ইসরাইল দেশে গমন করে তাহা হইলে বিশ্বরাষ্ট্র সভায় গ্রাহ্য আইন অনুসারেই তাহা করা হইতেছে বলা যাইতে পারিবে। এই দিক দিয়া দেখিলে রাষ্ট্রপতি নাসের আরব জাতিদিগের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে যে সাহায্য পাইবেন, ইহুদীগণ তাহা অপেক্ষা অধিক সাহায্য লাভে সক্ষম হইতে পারে। কারণ আরব জগতে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত-প্রিয়তা অতি প্রবল। ইরাক, সাউদি আরব ও জর্ডন এই সকল বিশ্বাসঘাতকতা মূলক চক্রান্তের কেন্দ্র। যে কোনও সময়ে এই সকল দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, অর্থাৎ ঘটান যাইতে পারে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স এই সকল কার্য্যে রুশ অপেক্ষা অধিক তৎপর। ইহা ব্যতীত, যদিও আরবগণ "প্যালেষ্টাইন কাড়িয়া লইব" বলিতেছেন তাহা হইলেও পূর্ব্বকার সন্ধি সর্ত্ত সম্পূর্ণ নাকচ করিয়া দিয়া সে কার্য্য করা কঠিন হইবে। কারণ ইসরাইল ১৯৪৮ খৃঃ অব্দে আইনত বৃটিশ ম্যানডেট অবসানের পরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে ইসরাইল বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। এই সময় আরবগণ সমবেতভাবে ইসরাইল আক্রমণ করে ও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম না হইয়া জর্ডন, লেবানন, সিরিয়া ও মিশর সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। মিশর অতঃপর ক্রমাগত ইসরাইল আক্রমণ চালাইতে থাকে ও ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে ইসরাইল মিশর দেশ আক্রমণ করিয়া তদ্দেশে অনুপ্রবেশ করে। ইহার পরে যে শান্তি স্থাপিত হয় তাহা বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ অনুমোদিত। মিশর ও অপরাপর আরব দেশের যে মিলিত রাষ্ট্র তাহাও বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত

নহে। সিরিয়া ১৯৬ খৃঃ অব্দে একবার সম্মিলিত আরব রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়াছিল।

সকল কথা বিচার করিয়া মনে হয় আরব জাতিগুলির ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-চালনা যতটা সহজ মনে হয়, তাহা নহে। কারণ ইসরাইল বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘ দ্বারা অনুমোদিত রাষ্ট্র এবং তাহাকে দখল করিয়া লওয়া আইনত গ্রাহ্য হইবে না। ইচ্ছা হইলেই মত বদলাইতে পারে কিন্তু আইন বদলায় না। ইসরাইল যত অন্যায়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকুক না কেন, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার তুলনায় তাহা অনেকাংশে ঐতিহ্য সমন্বিত। তাহাকে হঠাৎ তুলিয়া দেওয়া পাকিস্থান তুলিয়া দেওয়ার তুলনায় অধিক অন্যায় হইবে। উভয় রাষ্ট্র উঠাইয়া দিয়া যদি মানবতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করিয়া বিতাড়িত জনগণকে উভয় ক্ষেত্রেই নিজ নিজ ভিটায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান ইহুদীগণ ইসরাইল দেশে আসিয়া আরব বাসিন্দাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহারা নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইলে এই কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু যদি ন্যায়ের কথাই উঠে তাহা হইলে পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত ভারতবাসীগণও সেই দেশে ফিরিয়া গিয়া নিজ অধিকারে সেই দেশে থাকিবার দাবী করিতে পারেন এবং ভিব্বত হইতে বিতাড়িত জনগণও সেই দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকারী। সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতীয় বিতাড়নের কথাও এই সূত্রে উঠিতে পারে। মনে হইতেছে ভারত সরকার এই সকল কথাই অতঃপর বিচার করিয়া নিজ রাষ্ট্রীয় পন্থা স্থির করিবেন। ভারতের ভিতরেও একবার আসামে "বঙ্গাল খেদা" হইয়াছিল ও পণ্ডিত নেহেরু তাহা দেখিয়া আসামের যুব-শক্তির তারিফ করিয়াছিলেন। মানভূম সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণা হইতেও কিছু কিছু বাঙ্গালী পূর্ব্বে ভিটা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তি নিজ নিজ ভিটা ফিরাইয়া পাইবার দাবী করিতে পারেন। বিশেষ করিয়া যখন ভারত সরকার ইহুদীদিগকে হটাইয়া আরবদিগের পুনর্বাসনের সমর্থক হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু গোলমাল এই যে ভারত-সরকার মত প্রকাশ সহজেই করেন কিন্তু মতানুসারে কার্য্য প্রায় কখনই করেন না কার্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সক্ষম কার্য্য শক্তি নাই অতএব আরব ও ইসরাইল ঝগড়া করিতে থাকিবে ভারত ও মত প্রকাশ করিয়াই কার্য শেষ করিবে।

নিযুক্ত ও নিযোক্তা

আজকাল যেভাবে সমাজে কার্য্য বিচার চলিতেছে তাহাতে অনেক কথারই কোন স্থির নির্দিষ্ট অর্থ থাকিতেছে না। যথা মালিক ও শ্রমিক। পাবলিক সেক্টর হইল জনসাধারণের সম্পত্তি। জনসাধারণ তাহা হইলে দুর্গাপু কারখানার মালিক। সেইখানের শ্রমিকগণ তাহা হইতে জনসাধারণের সহিত "শ্রেণীসংঘাত" না করিয়া উচ্চ বেতনের কর্মী, অর্থাৎ কর্ম্মচারীদিগের সহিত কল করিতেছেন কেন? উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ শ্রমিকদিগকে নিযুক্ত করিলেও বস্তুত শ্রমিকদিগের নিযোক্তা হইলেন সে জনসাধারণ যাঁহারা সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিক কর্ম্মক্ষেত্রে বেতনের ও দায়িত্বের পার্থক্য থাকিলে বেতনভোগী সকল ব্যক্তিই কর্মী। শ্রমিকগণও কর্মী যদি বলা যায় ঘর্মাক্ত কলেবরের ঘর্মের পরিমাণ অনুসা কর্মীর কর্ম্মকারিতা বিচার করা হইবে, তাহা হইলে শী প্রধান দেশে সকল কর্মীর বেতন অল্প হওয়া উচিত এ গ্রীষ্মকালে সর্বত্র বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বহু কর্ম্মচারী আছেন যাঁহারা মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া কা করেন এবং অনেক শ্রমিক আছেন যাঁহারা শুধু বসি থাকেন—যথা দ্বারবানগণ। এই অবস্থায় পরিশ্রম অনুপা কোন ব্যক্তি কর্মী কিনা তাহা বিচার করা যায় না অধিকার দিয়াই তাহা বিচার্য্য। আমাদিগের যতটা জ্ঞা আছে তাহাতে আমরা বুঝি যে কর্ম্মচারীগণের হস্তে শ্রমি দিগের বেতন, বোনাস, ছুটি বা খাদ্য-সরবরাহের ভ সচরাচর থাকে না। যাঁহারা মালিক অথবা কর্ম্মপরিচাল বা ডিরেক্টর তাঁহারাই শুধু ঐসকল বিষয়ের মীমাং করিবার অধিকারী। সুতরাং কোন কারখানার ডাক্তার ধরিয়া অসুস্থতার বেতন, ছুটি, খাদ্য ও ঔষধের ঝগ করিবার বিশেষ অর্থ হয় না। কারণ পয়সা দিবার খরচ করিবার অধিকার ডিরেক্টর বা সরকার বাহাদুরে ডাক্তারের নহে। ডাক্তারকে যদি বরাদ্দ করা হয় রুগী

১'২৫ পয়সা দৈনিক হারে খাবার দিবার ব্যবস্থা করিতে তিনি তাহা হইলে ঐ পয়সায় উত্তম খাদ্য দিতে সক্ষম নাও হইতে পারেন। রুগীদিগের চিকিৎসা ও ঔষধ সম্বন্ধেও বলা যায় যে বহুক্ষেত্রেই অসুস্থতা শুধু ছুটি লইবার অজুহাত। সত্যকার অসুস্থতা না থাকিলেও কর্মীগণ ছুটি লইবার জন্য "শির ঘুমতা হায়" কিম্বা "পেটমে বহুত দরদ" বলিতে লজ্জা অনুভব করেন না। ঔষধ লইয়া তাহা নৰ্দামায় ঢালিয়া দেওয়াও বহু স্থলে হয়। ইহা ব্যতীত ঔষধ, চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আইন আছে সেই আইন অনুসারেই সকল ব্যবস্থা হওয়ার কথা, ডাক্তারের ইচ্ছামত নহে। আমাদিগের মতে ডাক্তারগণও কর্মী এবং শ্রমিকও কর্মী। 'শ্রেণী সংঘাত" তাহা হইলে ইঁহাদিগের মধ্যে হইতে পারে না। প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ও ফিটারের ঝগড়াও ঐরূপ দুইজন কর্মীর মধ্যেই হয় বলিতে হইবে; কারণ প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ও ফিটার উভয়েই কর্মী। কোন কারখানা বা দফতরের ম্যানেজার ঐভাবে কর্মী বলিয়াই গণ্য হইবেন। কিন্তু যাঁহারা "শ্রেণী সংঘাত" চালনার ব্যবস্থাপক তাঁহারা সম্মুখে যাঁহাকে দেখেন তাঁহাকেই "শোষক" বলিয়া ধরিয়া লয়েন—যদিও রুশ ও চীন দেশেও ম্যানেজার ও প্রধান ইঞ্জিনীয়ার দেখা যায়। কর্মের ক্ষেত্রে কর্মী বিভিন্ন শ্রেণীর হইয়া থাকে। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে কোন ঝগড়া না থাকার কথা। যথা অশিক্ষিত ও কৌশলহীন কর্মী (unskilled labour) অৰ্দ্ধকৌশলী কর্মী (Semi skilled labour সুশিক্ষিত কৌশলী কর্মী (skilled worker) উচ্চ শিক্ষিত ও সুকৌশলী কর্মী (highly skilled worker, তত্ত্বাবধায়ক কর্মী (supervisory workers, কর্মচারী (officer) উচ্চ কর্মচারী senior officer ইত্যাদি। এই সকল ব্যক্তির উপরে থাকেন মহাধ্যক্ষগণ (Directors) যাঁহারা মালিকের অনুমোদিত কার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শাসন কর্ত্তা। "শ্রেণী সংঘাত" চলার কথা ইঁহাদিগের সহিত, কিন্তু সমষ্টিগত সম্পদ যে সকল কারখানা, সেগুলিতে অধিকারী হইলেন জনসাধারণ। তাঁহাদিগের সহিত "সংঘাত" কি ভাবে চলিবে?

আসলে সমষ্টিবাদের ধাক্কায় শ্রেণীবিভাগ সংরক্ষণ বা সংহার কথঞ্চিৎ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। ইহা ব্যতীত যে সকল যৌথ কারবার সত্য সত্যই বহু অংশীদারের সম্পদ সেগুলির মালিকগণের মধ্যে কিছু কিছু "শ্রমিক" ধনিকও থাকা সম্ভব। অনেক শ্রমিক-ধনিক আছেনও। ইহারা নিজেদের সহিত সংঘাত করিয়া কি ফল পাইবেন তাহা বলা কঠিন। এক কথায় বৰ্ত্তমান পরিস্থিতিতে যদিও কিছু কিছু সংখ্যালঘিষ্ঠ নিয়োক্তা যত্রতত্র দেখা যায়, তথাপি নিয়োক্তা হিসাবে উচ্চতম স্থান হইলে সমষ্টিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত ভারতের রাষ্ট্রের। নিযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রমিকই হউন বা তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী হউন সকলেই কর্মী। ইহাদিগের মধ্যে কলহ '"শ্রেণীসংঘাত" নহে। কারণ ইহারা সকলেই একশ্রেণীর লোক অর্থাৎ কর্মী। কত অধিক বেতন হইলে কর্মী মালিকের শ্রেণীতে পড়েন এ কথারও কোন উত্তর চীন বা রুশ হইতে পাওয়া যায় নাই।

একটা কথা অবশ্য বলা যাইতে পারে। ইহা হইল কোন কোন কর্মচারীর মালিকের সহিত মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার ধারা। এই সকল বিকল্প কমীগণ স্বভাবতই অপর কর্মীদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে পড়েন না। কিন্তু যদি কোন পেটোয়া ইউনিয়নের কর্মচারী মালিকদিগের বিশ্বাস-ভাজন হন তাহা হইলে সেই কর্মচারীর স্থান কোন্ শ্রেণীতে হইবে? মালিক-শ্রমিক বিবাদের মূল প্রেরণা হইল শ্রমিকের দাবীর প্রাচুর্য্য ও মালিকের সেই দাবী মিটাইবার অনিচ্ছা। কোন কোন মালিক দাবী মিটাইতে অক্ষম আবার কেহ কেহ মিটাইতে পারিলেও মিটাইতে চাহেন না। সরকার বাহাদুর নিজেই মালিক সুতরাং সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি বহুক্ষেত্রেই মালিকগণ পাইয়া থাকেন। অবস্থাটি বিশেষ জটিল এবং এই জট ছাড়াইয়া সকল কিছু যথাযথভাবে স্থাপন করা কঠিন। কিন্তু করা প্রয়োজন। ইহার জন্য আবশ্যক জনসাধারণের এই সকল বিষয়ে আরও খবর লইবার চেষ্টা করা। কারণ এই সংঘাতের খরচ ও অসুবিধা শেষ অবধি জনসাধারণকেই বহন করিতে হয়।

রাজস্ব নির্দ্ধারণ নীতি

রাজস্ব ব্যতীত রাজত্ব চালান সম্ভব হয় না। ইহার কারণ দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা, আইন আদালত

ও কারাগার সংক্রান্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা স্বাস্থ্য পথঘাট ও যাতায়াতের যান-বাহনের বন্দোবস্ত এবং চাষবাস জলসরবরাহ পশুপালন ও সাধারণভাবে দেশবাসীর উপার্জ্জনের উপায় ঠিক করা প্রভৃতি যে সকল কার্য্যের ও বিষয়ের সহিত রাজ্য শাসনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে সে সকল কিছুই ব্যয় সাপেক্ষ। রাজকার্য্যে সৈন্য সামন্ত শান্তিরক্ষক পুলিশ চৌকিদার পেয়াদা, পাইক কেরানী, কর্ম্মচারী, বিচারক, মন্ত্রী, আইন, চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাহাদিগের বেতনাদি খরচও রাজস্ব হইতেই আইসে। রাজকার্য্য চালাইবার জন্ত শতশত প্রাসাদ অট্টালিকা, গৃহ, কেল্লা, শিক্ষা ও চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত অবস্থায় রাখিতে হয় ও তাহাও ব্যয়সাধ্য।

ভারতবর্ষ গরীবদেশ কিন্তু এই দেশেও বৎসরে ৪০০০ কোটি টাকার অধিক অর্থ রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হয়। এই কারণে ভারত-সরকার রাজস্ব কি ভাবে সংগৃহীত করা হইবে তাহা লইয়া বিলক্ষণ চিন্তা করিয়া থাকেন। কারণ রাজস্ব সংগ্রহ করিবার উপায়ের উপর জাতীয় অর্থনীতির পরিণতি নির্ভর করে। ভুল ভাবে রাজস্ব আদায় করিলে দেশের আর্থিক অবনতি ঘটিতে পারে, আদায় অপেক্ষা আদায়ের খরচ অধিক হইতে পারে এবং পরোক্ষভাবে রাজস্বের ভবিষ্যৎ পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত গরীবের উপর রাজস্বের ভার অধিক পড়িলে তাহা রাষ্ট্রনীতি বিরুদ্ধ হয়, ধনিকের নিকট ভুল ভাবে টাকা আদায় করিলেও তাহার ফলে ধনিকের উপার্জ্জন কমিয়া যাইতে পারে। শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ার ফলে দ্রব্যবিক্রয় বন্ধ হইয়া বেকার সমস্যার আবির্ভাব ঘটিতে পারে; রাজস্ব আদায়ের চাপে অর্থনীতি বিপরীত পথে চালিত হইতে পারে—এবং আরও অনেক কথা রাজস্ব সংগ্রহনীতির ফলাফলের মধ্যে বিচার করা প্রয়োজন হইতে পারে। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রী মোরারজি দেশাই যে রাজস্বের আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনি নিজের এই বিষয়ের জ্ঞানের কোন বিশেষ পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার ব্যবস্থায় জাতীয় অর্থনীতি যে অবনতির পথে চলিতেছে সেই পথেই আরোও দ্রুত চলিতে থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। নূতন ব্যবস্থায় জাতীয় শ্রমিকশক্তি, মূলধন ও কর্ম্মকৌশল কোন নূতন ঐশ্বর্য্য উৎপাদনে সক্ষম হইবে না। যে সকল পথে চলিলে অধিক জাতীয় লাভ হইতে পারে সে সকল পথে চলা সহজ করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। গরীবের উপর রাজস্বের চাপ কমাইয়া ধনবানের উপর সেই ভার ন্যস্ত করিবার কোন চেষ্টাও নূতন রাজস্ব আহরণ পন্থার মধ্যে লক্ষিত হয় নাই।

ধূমপান অধিক ব্যয় সাধ্য করিয়া দিলেই ভারতীয় অর্থনীতি উন্নতির পথে চলিবে একথা স্বয়ং শ্রী মোরারজিও ভাবিতে পারেন না। কিন্তু সিগারেট ও আরও দুই চারিটি বস্তুর উপর শুল্ক বৃদ্ধি ব্যতীত বিশেষ কোন নূতন রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা শ্রী মোরাররজি করেন নাই। আসল কথা রাজস্বের কথা চিন্তা করার পূর্ব্বে চিন্তা করা প্রয়োজন জাতীয় আয়ের কথা। জাতীয় আয় যদি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে থাকে বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুরূপ হারে বৃদ্ধিলাভ না করে তাহা হইলে যেন-তেন প্রকারে রাজস্ব আদায় করিলেই রাজ্য শাসনের আর্থিক ব্যবস্থার শেষ হয় না। আমাদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্ব আদায় পন্থা জাতীয় আয়ের কথা না বিবেচনা করিয়াই সম্ভবত করা হয়, কারণ জাতীয় আয় ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিতেছে কি না একথা আমাদিগকে ক্রমাগতই ভাবিতে হইতেছে। তিনটি পঞ্চবর্ষের পরিকল্পনার ফলে আমরা যদি ৫০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদিগের জাতীয় আয় বার্ষিক ২০০০০ কোটি হইতে বাড়িয়া এখন অন্তত ৩০০০০ কোটি টাকা হওয়া উচিত ছিল। তাহা হয় নাই অথচ এখনও পরিকল্পনা চলিতেছে। এই অবস্থায় সভা বসাইয়া দেখা প্রয়োজন কি ভাবে জাতির আর্থিক অবস্থা অন্তত সকলের জীবন ধারণের পক্ষে উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষিত ও গঠিত হইতে পারে। শুধু মোরারজি অথবা বাসুর খেয়ালের উপর নির্ভর করিলে ভারত ও বাংলাদেশ বাঁচিবে না।

রাজস্ব আহরণ জাতীয় মোট উপার্জ্জনের বণ্টনেরই একটা বিশেষ দিক। সমগ্র জাতির সকল উপার্জ্জকগণের মিলিত উপার্জ্জনের কোন অংশ কি ভাবে জাতির সমষ্টিগত প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার জন্য আদায় বা উৎপাদন করিয়া

লওয়া হইবে; সেই ব্যবস্থা সেই রাজস্ব আহরণ নীতি বলা হয়। একটা কথা ইহার মধ্যে অতি সরল ভাবেই সকলের বোধগম্য হইতে পারে। ইহা হইল এই যে মোট জাতীয় আয় অধিক হইলে রাজস্বও অধিক হওয়া সহজ হইবে এবং জাতীয় আয় অল্প হইলে রাজস্বও অল্প হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জাতীয় আয় বৃদ্ধি রাজস্ব বৃদ্ধির একটা সহজ উপায়, জাতির যে সকল ব্যক্তির বাৎসরিক আয় অতি অল্প তাহাদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিতে হইলে চাউল, গম, লবণ, ডাল, জোয়ার ভুট্টা প্রভৃতির উপর শুল্ক বসাইতে হয়। আমদানী রপ্তানী শুল্ক অথবা আবগারী শুল্ক যাহারা দেয় তাহাদিগের বাৎসরিক আয় সাধারণত ১০০০ টাকার অধিক। আয়কর দিতে হইলে প্রায় বাৎসরিক ৪০০০ টাকা আয় হওয়া প্রয়োজন হয়। ভারতের মোট জাতীয় আয় যদি ২০০০০ কোটি টাকা হয় এবং জনসংখ্যা যদি ৫০ কোটি হয় তাহা হইলে গড়পড়তা মাথা পিছু আয় হয় বৎসরে কিঞ্চিৎ অধিক ৩০০ টাকা হয়। অর্থাৎ উপার্জ্জক সংখ্যা যদি জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের মত হয় তাহা হইলে উপার্জ্জক পিছু বাৎসরিক আয় হয় ৬০০।৭০০ টাকা মাত্র। তাহাতে প্রমাণ হয় ভারতের অধিকাংশ লোক রাজস্ব দিতে অক্ষম। এই ক্ষেত্রে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অন্তত আরও ৫ কোটি লোকের বাৎসরিক আয় বাড়াইয়া ৬০০।৭০০ হইতে ১২০০।১৪০০ টাকায় পরিণত করা। ইহা করিলে রাজস্ব আদায়ও বাড়িয়া বৎসরে ৪০০০ কোটি হইতে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি হইতে কোন অসুবিধা হইবে না। উপার্জ্জন হ্রাস কিম্বা বেকার সমস্যা প্রকট হইলে রাজস্ব হ্রাস হওয়াই স্বাভাবিক হয়। রাজস্ব বৃদ্ধি তাহা হইলে অধিকতর সংখ্যক লোকের আয় বৃদ্ধির উপরেই নির্ভর করে।

অর্থনৈতিক উন্নতির দুইটি দিক আছে; উৎপাদন ও ভোগ এবং উৎপাদন ও সঞ্চয় এই দুইটি দিকেই জাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগের দেশে যাহারা মূল্যবান বস্তু অথবা কার্য্য উৎপাদন ও সরবরাহ করেন তাঁহাদিগের মোট সংখ্যা ২০ কোটির অধিক হইবে। এই সকল উপার্জ্জক ব্যক্তি ও তাঁহাদিগের পোষ্যদিগকে যথাযথভাবে খাওয়া-পরা-থাকা শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া না দিলে জাতীয় উৎপাদনের প্রবাহে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং উৎপাদন ও ভোগের দিকটা সেই ভাবেই গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে লোকের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-ক্ষমতা হ্রাস না পায়। অপর দিকে এই সকল লোকের মধ্যে বেশ কিছু উপার্জ্জকের সঞ্চয় ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দেশের মূলধন বৃদ্ধি অথবা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। অতএব ২০ কোটি উপার্জ্জকের মধ্যে ১২ কোটি ব্যক্তির বাৎসরিক উপার্জ্জন অন্তত ১০০০ টাকার অধিক হওয়া প্রয়োজন। ৬ কোটির হওয়া প্রয়োজন ১৫০০ টাকার অধিক। এক কোটির ৪০০০ টাকা বা ততোধিক এবং এক কোটির ১০০০০ বা আরও অধিক। এইরূপ হইলে মূল ধন সঞ্চয়, রাজস্ব আহরণ ও উপযুক্ত জীবনযাত্রা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে। উপরোক্ত হারে উপার্জ্জন হইলে ভারতের মোট জাতীয় আয় বাৎসরিক ৩৫০০০ কোটি টাকার অধিক হইবে। রাজস্ব পাওয়া যাইবে ৮০০০-৯০০০ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়ও দ্বিগুণ হইবে। উপার্জ্জন-বৃদ্ধির যে সকল উপায় আছে তাহার মধ্যে শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহার ব্যবস্থা প্রধান উপায়। ইহা হইলে খাদ্য সমস্যা দূর হইতে পারে এবং শুধু সেই দিক দিয়াই জাতীয় আয় বৎসরে ৫০০০-৬০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে। অপরাপর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করিলে ৫।১০ হাজার কোটি টাকা উপার্জ্জন বৃদ্ধি ও সম্ভব হইতে পারে।

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে আমাদিগের শ্রমশক্তির অভাব নাই। অভাব আছে প্রধানতঃ মূলধনের, যন্ত্র সরবরাহের, যন্ত্রপ্রস্তুত দ্রব্যের ক্রেতার এবং রপ্তানী কারবারের। এই অবস্থায় আমাদিগের আর্থিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ ও দ্রুত সাফল্য প্রাপ্তির উপায় হইল কৃষিজাত ঐশ্বর্য্য উৎপাদন চেষ্টা ও তৎসঙ্গে পশুপালন, দুগ্ধ-মাখন-ঘৃত উৎপাদন, ফলের চাষ, মৎস্যের চাষ, হাঁস মুরগী পালন ইত্যাদি। এই জাতীয় কার্য্যে আমরা লোকবল লাগাইলে আমাদিগের নিজেদের যাহা আছে তাহা দিয়াই আমরা শীঘ্রই বাৎসরিক কয়েক সহস্র কোটি টাকার আয় বৃদ্ধি করিতে পারি। অতঃপর আমাদিগের দেখিতে হইবে ঐ সঙ্গেই জলাশয় খনন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, গ্রাম সংস্কার শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র হইতে পারে। বার্ষিক খাদ্য বা ঐ জাতীয় বস্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা করিলে ৫০০০-৬০০০ কোটি টাকা প্রমাণ করা কঠিন হইবে না। শুধু চেষ্টা ও ব্যবস্থা প্রয়োজন। বসিয়া বাক্যব্যয় করিলে রাজ্য-শাসন কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না, এই জ্ঞান মন্ত্রীদিগের মস্তিষ্কে প্রবেশ করান আবশ্যক। পথঘাট, গৃহ, জলাশয়, কূপ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে জাতীয় মূলধন বৃদ্ধি হয়। পশুপালন ঠিক মত করিলে তাহার সাহায্যে রপ্তানী-কারবার বাড়ান সহজ হয়। বৃক্ষরোপণ, খনিজাত বস্তু আহরণ ইত্যাদিও রপ্তানী কারবার বাড়াইবার উপায়। এই সকল কার্য্যে বহু লোক নিযুক্ত হইতে পারে ও তাহাতে দেশের বেকার-সমস্যা দূর হয় এবং রাজস্ব বৃদ্ধিও হইতে পারে। গঠনমূলক প্রচেষ্টা না থাকিলে শুধু মতবাদ আওড়াইয়া গাছে ফল ধরান যায় না। যাহা নাই তাহা কোন উপায়েই আহরণ করা যায় না। ইহা সহজ বুদ্ধির কথা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব

ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য ও রসমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোর বয়স থেকেই। এর নিদর্শন পাওয়া যায় কবিগুরুর নানা রচনায়। এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য প্রবাসী—কার্ত্তিক ১৩৬৯, আষাঢ় ১৩৭০, শ্রাবণ ১৩৭০, কার্ত্তিক ১৩৭১, মাঘ ১৩৭১)। প্রস্তুত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুইটি কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে এ বিষয়ে আরও খানিকটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১২৯৩ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব দেখা যায় কোনো কোনো কবিতায়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশী বেজে উঠেছে, তার ধ্বনি এসে পৌঁছেছে রাধিকার কানে, কিন্তু রাধিকা পরায়ত্ত-পরাধীনা। তাঁর দুনয়ন বেয়ে অঝোরে অশ্রু বইছে। সখী এসে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাধিকা কৃষ্ণের বাঁশীর কথা উল্লেখ করে বললেন,—

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশি-নিশাস-গরলে তনু ভোর॥ —বিদ্যাপতি

সখি আমার দুঃখের কথা আর কি বলব! বাঁশির নিঃশ্বাসে অর্থাৎ ধ্বনিতে যেন গরল; তাতে আমার দেহ বিষময় হয়ে উঠেছে। সখী এর উত্তরে রাধিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি বৃথা আক্ষেপ কয়োনা, স্থির হও। সখীর এই উক্তির ঠিক প্রতিধ্বনি যেন পাই 'কড়ি ও কোমল'-এর 'পুরাতন' শীর্ষক কবিতার নিম্নোক্ত ছত্রে—

সুদূরে বাজিছে বাঁশি তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।

'কড়ি ও কোমল'-এর 'মথুরায়' শীর্ষক কবিতাটি সম্পূর্ণ রূপে বৈষ্ণবভাবেই বিভাবিত। মথুরার রাজা কংস ধনুর্যজ্ঞ করবেন; তাই তাঁর সামন্তরাজ নন্দকে নিমন্ত্রণ করেছেন কৃষ্ণ ও বলরাম সহ উৎসবে যোগদান করতে। রাজ-নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা নিতান্ত অশোভন; তা ছাড়া রাজদর্শনও ভাগ্যের কথা। সুতরাং কৃষ্ণ মথুরায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, কিন্তু যজ্ঞের ছলে কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার যে চক্রান্ত করেছেন কংস তা কেউ ভাবতে পারেনি। যাত্রার আয়োজন হচ্ছে। রাধা ও অন্যান্য গোপী কৃষ্ণের মথুরাগমনের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত আকুল হয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন। কৃষ্ণ সকলকে শান্ত করে এবং শীঘ্রই ফিরে আসার আশ্বাস দিয়ে মথুরায় চলে গেলেন। মথুরায় অনুষ্ঠানসভার দ্বারদেশে কুবলয়পীড় নামে হস্তীকে দিয়ে কৃষ্ণকে মেরে ফেলার প্রথম চেষ্টা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ কুবলয়পীড়কে মেরে বীরদর্পে সভাস্থলে প্রবেশ করেন। তখন কংসের আদেশে চানুর ও মুষ্টিক নামে মল্লদ্বয়কে কংস আদেশ দেন যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে। এই যুদ্ধে উভয় মল্লই নিহত হলে কংস মহাক্রোধে রাম ও কৃষ্ণকে রাজধানী থেকে দূর করে দিতে বলেন। তখন কৃষ্ণ আর কংসের সম্মান রক্ষা করতে না পেরে সমুচিত দণ্ডবিধানার্থ মঞ্চোপরি আসীন কংসকে আক্রমণ করেন এবং কিছুক্ষণ উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর কংস নিহত হন। পরে কৃষ্ণ মথুরায় শান্তি ও সুশাসন ফিরিয়ে এনে সেখানে বাস করতে থাকেন। বৃন্দাবন থেকে মথুরায় কৃষ্ণের আগমনের বিবরণ হল এই।

কৃষ্ণের তৎপরতায় মথুরায় শৃঙ্খলা ফিরে এলে মথুরাবাসী পরম আনন্দে কাল কাটাতে লাগলেন। কৃষ্ণ তখন অসি ছেড়ে বাঁশী নিলেন হাতে; কিন্তু বাঁশী আর তেমন বেজে ওঠেনা। যে-বংশীরবে বৃন্দাবন আকুল হয়ে উঠত, যমুনা বইত উজান, স্থাবর-জঙ্গম উল্লসিত হয়ে উঠত, তেমন ধ্বনি তো আর বাঁশী থেকে নিঃসৃত হচ্ছে না। মায়ের কোলে সন্তানের যে

শোভা, লতার সঙ্গে ফুলের যে সৌন্দর্য, সেই সম্বন্ধই বাঁশীর সঙ্গে বৃন্দাবনের! আবার বৃন্দাবনের সঙ্গে রাধার নিত্যসম্বন্ধ। স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় সে বাঁশীর শক্তি আর নেই। রবীন্দ্রনাথের 'মথুরায়' শীর্ষক কবিতায় কৃষ্ণ আক্ষেপ করে বলেছেন—

> বাঁশরি বাজাতে চাই বাঁশরি বাজিল কই?
> বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
> মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
> বাঁশরি বাজাতে চাই বাঁশরি বাজিল কই?

বৃন্দাবনের মতো মথুরায় সকলেই আছে। সেখানে উপবনরাজি পিকধ্বনিতে মুখরিত, প্রাণমাতানো বসন্ত-সুরভিত অলিকুলের গুঞ্জনে কুঞ্জকুসুম সচকিত। এই পরিবেশেই তো বাঁশী বেজে ওঠে। কৃষ্ণ ভাবেন, এই বুঝি বৃন্দাবন। তাই বাঁশী বাজাতে যাচ্ছেন, কিন্তু বাঁশী তো বাজল না! তখনই তাঁর মনে হল, এতো বৃন্দাবন নয়, এখানে সেই চন্দ্রাননা শ্রীমতী রাধিকা তো অভিসারে আসবে না! বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি হলেই যে রাধিকা গৃহকর্ম সব ফেলে, পরিজন-গঞ্জনা অগ্রাহ্য করে শ্যামের সঙ্গে মিলিত হতে আসতেন, সেই অভিসারিকা রাধিকার নূপুরধ্বনি তো শোনা যায় না! রাধিকার কথা মনে পড়ায় কৃষ্ণের আর বাঁশী বাজানো হল না। যেখানে রাধিকা নেই, সেখানে বাঁশী নীরব; তার দেহ আছে কিন্তু প্রাণ নাই। 'মথুরায়' কবিতায় উক্ত ভাব সুস্পষ্ট-রূপে ফুটে উঠেছে—

> বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
> কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
> এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন,
> ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায়?
> একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
> সোঙরি সে মুখশশী পরাণ মজিল সই।
> বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?

বৃন্দাবনের সব কথা কৃষ্ণের এখন সব কথা মনে পড়ছে। মধুযামিনীতে মথুরায় কুঞ্জে বসে তিনি রাধিকার কথা মনে করে বাঁশী বাজাতে যাচ্ছেন, কিন্তু রাধা নামের সাধা বাঁশী তখন আর বেজে উঠল না। কৃষ্ণ বড়ই বিরহাকুল হয়ে উঠেছেন। মধু যামিনী শেষ হয়ে এল; তাই বৈষ্ণব কবির কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বেজে উঠল—

> একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশি মনোসাধে;
> আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
> কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতীমালা,
> হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায়, হায়।
> কবি যে হল আকুল, এ কিরে বিধির ভুল।
> মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই।
> বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই?—
>
> মথুরায় : কড়ি ও কোমল

রবীন্দ্রনাথ এখানে মথুরা ও বৃন্দাবনের প্রকৃতিগত ব্যবধানের চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। যে-স্থান হিংসা-দ্বেষে ভরা, যে-কংসের অত্যাচারে মথুরাবাসী সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, যে-মথুরারাজ কংসের প্রতিনিয়ত চেষ্টা ছিল কৃষ্ণকে হত্যা করতে এবং যে-মথুরায় রাজশক্তি সর্বদাই কৃষ্ণের অহিত সাধনে নিরত, বক-বাণসুরাদি যে-সব মথুরাবাসী কংসানুচর কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র করে নিজেরাই বিনষ্ট হয়েছে, সেই কৃষ্ণের হত্যাষড়যন্ত্রের নিলয় বিষাক্ত মথুরাই বা কোথায় আর কৃষ্ণের বংশী-রবে মুখরিত আনন্দ বৃন্দাবনই বা কোথায়! মরুভূমিতে কখনও পিকধ্বনি আশা করা যায় না, ঊষর প্রান্তরে ভ্রমর কখনও গুঞ্জন করে না, শুষ্ক সরোবরে কখনও পদ্ম শোভা পায় না, জলশূন্য তড়াগে মীনকুলের উল্লাস দেখা যায় না, সেইরূপ রাধাহীন মথুরায় বাঁশী বাজেনা। পার্থসারথিহীন অর্জুনের নিষ্ফল গাণ্ডীবের মতো রাধাবিহীন কৃষ্ণের হাতেও আজ বাঁশী প্রাণশূন্য একান্ত নীরব।

মথুরা যেন কর্মচঞ্চল সংসার। সেখানে কর্মই মুখ্য মন নিতান্ত গৌণ। একান্ত প্রাকৃত কর্মসংকুল মথুরায় বসে পার্থিব জগতের ওপারে অবস্থিত মনোবৃন্দাবনের বাঁশী বাজানো যায় না। রাধিকা সারাদিন গৃহকর্মে নিরত, কিন্তু যখনই শ্যামের বাঁশী বেজে উঠত বৃন্দাবনে যখনই পরম আনন্দময়ের আহ্বান ধ্বনি এসে পৌঁছাত

অন্তরে, তখন রাধিকার কর্মময় জগৎ হয়ে যেত শান্ত-শুদ্ধ, তিনি তখনই সমস্ত ফেলে মনোবৃন্দাবনের অখিল রসামৃত মূর্তি সচ্চিদানন্দময়ের সঙ্গে মিলিত হতেন। তাই কর্মনিষ্ঠ বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে আনন্দ-নিকেতন মনোবৃন্দাবনে বসে বাঁশী বাজানো যায় না। রাধা কৃষ্ণেরই আনন্দনিকেতন এবং বাঁশী তার সম্পূরক; কিন্তু যেখানে রাধা বা আনন্দ নেই, শুধু আছে বাস্তব রূঢ়তা সেখানে বাঁশী বাজবে কেন?

'মথুরায়' কবিতাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বৈষ্ণব-কবিদের মতো মাথুর বিরহের ভঙ্গীতে লেখা এই কবিতাটিতে রাধিকার বিরহোক্তি নেই, আছে কৃষ্ণের। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে রাধা-আদি গোপীদের অশ্রুধারায় বৃন্দাবন ভেসে গিয়েছিল। শত শত পদকর্তা রাধিকার আর্তকণ্ঠের এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন সহস্র সহস্র পদে; কিন্তু তারা রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের বিরহার্তিসূচক পদ কখনও লেখেননি। বৈষ্ণব পদকর্তা শুধু রাধিকার মনকেই জেনেছিলেন, কৃষ্ণের কথা একবারও ভাববার অবসর পান নি। বুঝি রবীন্দ্রনাথ কবিমনের এই অসমতা লক্ষ্য না করে পারেন নি; তাই কৃষ্ণের বিরহার্তি কবিগুরুর মনকে দোলা দিয়েছে। মথুরার রাজা হয়েও কৃষ্ণের মন হাহাকার করে উঠেছে রাধিকার জন্য। সুদূর মথুরায় বসে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণ রাধিকার নূপুর-ধ্বনি শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন—

এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শোনা যায়?
একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরাণ মজিল সই।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের বিরহোক্তি সূচক গান আছে। সুতরাং 'মথুরায়' কবিতাটির অনুভাবনা জয়দেবের গীতগোবিন্দ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, অনুমান করি। গীতগোবিন্দের রাধা-গতপ্রাণ কৃষ্ণ বলছেন,—

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥
—গীতগোবিন্দম্ ৩.৪

(আমার দীর্ঘ বিরহে রাধিকা এখন কি করছেন, কিই বা বলছেন? তাঁর বিরহে আমার ধন, জন, জীবন ও গৃহের কি প্রয়োজন?)

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি ॥
—গীতগোবিন্দম্, ৩।৮

(আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমার সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করছ, তবে কেন পূর্বের ন্যায় সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন দান করছ না?)

কৃষ্ণের এই আক্ষেপোক্তি রবীন্দ্রনাথের উক্ত 'মথুরায়' কবিতায় বর্তমান।

কৃষ্ণসহ ব্রজবালকগণ ধেনুবৎস বন ছেড়ে দিয়ে সারাদিন খেলাধূলা করত যমুনাতটে; খেলায় কেউ পরিশ্রান্ত হলে শ্যামল ছায়ায় নিদ্রা যেত। মাধবদাসের একটি পদে পরিচয় আছে,—

নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর বেশ।
আসিয়া যমুনাতীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কভু হয় নিদ্রার আবেশ ॥

গোষ্ঠের এই চিত্র আংশিক ভাবে ফুটে উঠেছে 'কড়ি ও কোমল'-এর 'বনের ছায়া' শীর্ষক কবিতায়,—

হাঁসি, বাঁশি, পরিহাস বিমল সুখের শ্বাস
মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে;
কেহো খেলে, কেহো দোলে ঘুমায় ছায়ার কোলে
বেলা শুধু যায় চলে কুলু কুলু নদীনীরে।

বসন্ত পূর্ণিমায় রাসরসে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি করেছেন। সেই ধ্বনিতে বৃন্দাবনে এক নবীন জীবনের সঞ্চার হল। কবি শেখরের 'গোলাপ বিজয়' নামে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে এ-বিষয়ে অতি মনোরম বর্ণনা আছে—

বেণুধ্বনি হেলাএ শুনিঞা একবার।
তৃণ আদি সভাকার হইল নিস্তার ॥
ধ্বনির মধুর লীলা দেখ বিদ্যমানে।
পরতেক কাজ ইথে নাহি অনুমানে ॥

বেণুরবে কীটপতঙ্গাদি উল্লসিত।
মুকুলের ছলে লতা তরু পুলকিত ॥
বেণুরবে বৎস সব দুগ্ধ নাহি পিএ।
বাটেমুখে আরোপি দোপাশে ফেনা বহে ॥
বনে বেণুধ্বনি শুনি মৃগ পালে পালে।
ঘূর্ণিত লোচনে আইসে কৃষ্ণ অনুসারে।

কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে বৃক্ষ লতা, পশুপক্ষিদের তো এই অবস্থা। রাধা-আদি গোপীদের যে কি দশা হল, তাতো সহজেই অনুমেয়। রাধিকা গৃহমাঝে বন্দিনী হয়ে কেবল অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন; তাঁর মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এর বাঁশি কবিতায় রাধিকার এই ব্যাকুলতার আভাস পাওয়া যায়—

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায়
অধর ছুঁয়ে বাঁশীখানি চুরি করে হাসিখানি
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়
ওগো শোনো কে বাজায় ॥
কুঞ্জ বনের ভ্রমর বুঝি বাঁশীর মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশীর গানে মুঞ্জরে,
যমুনারি কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোনো কে বাজায় ॥

এখানে লক্ষণীয়, কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গোপাল বিজয়-এর তরুলতাই যে শুধু মঞ্জুরিত হয়েছে তা নয়, রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশী' কবিতাতেও বাঁশীর গানে বকুল আকুল হয়ে মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছে প্রেমাতিশয্যে। এ বিষয়ে উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য বড়ই আশ্চর্যজনক।

কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় কুঞ্জে রাধা শয্যা রচনা করে বসে আছেন। প্রহরের পর প্রহর অতীত হয়ে গেল; কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নেই। এইভাবে কত নিশি অতীত হয়ে গেল। পদকর্তা জ্ঞানদাসের একটি পদে রাধিকার এই আক্ষেপোক্তি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

শেজ বিছাইয়া রহিনু বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-অন্তর্গত 'বিরহ' কবিতায় এই ভাবটি প্রায় বিদ্যমান,—

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে ॥

রাধিকার জীবন যৌবন সবই ব্যর্থ; বৃথাই তাঁর মালা-গাঁথা, বৃথাই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা। রাধিকা একবার ভাবছেন, যদি কৃষ্ণ নিশিশেষে আসেন, তবে তাঁকে শুধু একবার চোখে দেখে যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন করে চিরতরে বিরহজ্বালা প্রশমিত করবেন। 'বিরহ' কবিতায় রাধিকার এই ব্যাকুলতাই যেন প্রকাশ পেয়েছে,

এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী?
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব ॥

'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্গত 'বিলাপ' কবিতাটিতে মাথুর বিরহের সুরই যেন বেজে উঠেছে। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গেছেন; আর ফেরবার নাম নেই। রাধিকা ভাবতেই পারেন না যে রাধাগতপ্রাণ কৃষ্ণ কিভাবে এত দিন ভুলে আছেন,—

ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।

কৃষ্ণ যদি আমাকে ভুলেই যাবেন, তবে আমাকে কেন তিনি এখানে ভুলিয়ে গেলেন? গৃহ-পরিজন মান সম্ভ্রম লাজ-লজ্জা সব ভুলে তাঁকে আমি আত্মসমর্পণ করেছি তার মদনমোহন রূপে। তিনি আমাকে কেনই বা বাঁশরিতে রাধা রাধা বলে পাগল করে তুলেছিলেন?

যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী
আমারে ভুলাল কেন সে?
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে।

পরে রাধিকা বড়ই আক্ষেপে বলেছেন, কৃষ্ণের সুখের কণ্টক হতে তিনি চান না। কৃষ্ণ যদি মথুরায় সুখে থাকেন, তবে সেইখানেই তিনি থাকুন, শুধু একবার চোখের জলের উপহার তাঁর কাছে তিনি পাঠাতে চান,—

যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়;
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।

'বিলাপ' কবিতাটি লিখতে লিখতে রবীন্দ্রনাথ যে রাধাভাবময় হয়ে গিয়েছিলেন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কবিতায় রাধা কথার উল্লেখেই। বিরহজ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে রাধা তাঁর শেষ দশা কৃষ্ণকে জানাবার জন্যে সখীকে মথুরায় পাঠাচ্ছেন এই বলে;—

আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখিজল।—

বিলাপ: কড়ি ও কোমল

আবার পরক্ষণেই রাধিকা দারুণ দুঃখ ও অভিমানে বলে উঠলেন;—

না না এত প্রেম সখী ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহো সেধো না।
আমি কথা নাহি কব, দুঃখ লয়ে রব,
মনে মনে সব বেদনা।—

'বিলাপ' কড়ি ও কোমল

সুখ একবার চলে গেলে আর তাকে ফিরে পাও যায় না। কৃষ্ণের অদর্শনে রাধিকা ইহা স্পষ্ট অনুভব করেছেন, আর বুঝতে পেরেছেন ভালবাসা-প্রেম সকল মিথ্যা। তাই রাধিকা সখীকে বলছেন,—

ওগো মিছে, মিছে সখী, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো সুখ-দিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসেনা।—

—'বিলাপ': কড়ি ও কোমল

কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধা রাধা বলে বাঁশী বাজাচ্ছেন পরাধীনা রাধিকা তাঁর মনের বেদনা জানাতে না পেরে তাঁর প্রাণ কেঁদে কেঁদে ফিরছে। কৃষ্ণের গলায় মালা পরাবার জন্য রাধিকা যে ফুল তুলেছিলেন তা ধূলিতেই শুকিয়ে গেল। সারারাত্রি এই ভাবে বৃথাই গেল কেটে। যৌবন-ডালা সাজিয়ে রাধিকা যাকে পূজো করতে চেয়েছিলেন তা আর হলনা, কিন্তু বাঁশীর স্বরে কৃষ্ণ তো আগেই তাঁর প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন, শুধু এ দেহটুকুর আর কি প্রয়োজন? বিরহাতুরা রাধিকার এই ব্যাকুলতা 'কড়ি ও কোমল' এর 'গান' কবিতায় অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পেয়েছে,

তার আকুল পরাণ বিরহের গান
বাঁশী বুঝি গেল জানায়ে।
আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে,
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে।।
কুসুমের মালা গাঁথা হল না,
ধূলিতে পড়ে শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে,
ওই বাঁশী-স্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে।।

জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের একটি বিখ্যাত পদ আছে,—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥

উক্ত পদটির অনুসরণ দেখতে পাই 'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্গত 'দেহের মিলন' কবিতায়;—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে।
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'একাল ও সেকাল' কবিতায় রাধিকার দিবাভিসারের কথা মনে পড়ে। ঘন কালো মেঘ গগন আচ্ছন্ন করে যখন বারি বর্ষণ করে, মধ্যাহ্নের সূর্যকে যখন গ্রাস করে অনন্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা, তখন দিন কি রাত্রি বোঝা যায় না। সেই সময় কৃষ্ণের কথা মনে পড়ায় রাধিকা অভিসারের জন্য প্রস্তুত হন। বহু পদকর্তা এ বিষয়ে নানা পদ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এমনি একটি দিনের চিত্র অঙ্কিত করেছেন 'একাল ও সেকাল' কবিতায়। একদিন বর্ষায় মেঘ নেমেছে দুপুরবেলা। চার দিক থেকে ঘন কালোমেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, সুগভীর কালো ছায়া পড়েছে ধরণীর উপর; শ্যাম বনানী শ্যামলতর হয়ে উঠেছে। তখন রাধিকার কথা চিন্তা করে কবিগুরুর মনে পড়ল,—

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।
সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

কবিতাটি লিখতে লিখতে গোবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদটির কথা রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে থাকতে পারে,—

গগনাহি নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥
ঐছন জলদ কায়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥
চলু গজ-গামিনি হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, রাধিকার সেই বিরহাভিসার নিত্য কাল ধরে চলছে। আজিও শারদ পূর্ণিমায় ধারা-বর্ষণের সঙ্গে সেই চিরন্তন বিরহ গানই ভেসে ওঠে। 'মানসী'কাব্যগ্রন্থের 'একাল ও সেকাল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাধিকার কথা স্মরণ করে বলেছেন,—

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত—
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণ তিমির।
আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারা দিন সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।

কয়েক শত বৎসর পূর্বে বৃন্দাবনদাস রাধিকার চিরন্তন অভিসারের অনুরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলা দর্শন করে চৈতন্যভাগবত-এ বলেছিলেন,—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥

মনে হয়, বৃন্দাবনদাসের উক্ত ছত্রদ্বয়ের প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'একাল ও সেকাল' কবিতায়।

বর্ষাভিসারের অপর এক চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র 'পত্র' কবিতায়। রাধিকা চলেছেন সঙ্কেত-কুঞ্জে ছল ছল নেত্রে। দারুণ বর্ষায় দয়িত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন মনে করে রাধিকার মন আকুল হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার; পথ চেনা যায় না। যমুনাতটে নির্জন নীপমূলে কৃষ্ণ রাধার পথপানে চেয়ে আছেন। দীনহীন অকিঞ্চন রাধিকার জন্য কৃষ্ণের এই

দারুণ ক্লেশ স্মরণ করে রাধিকার মন বড়ই উতলা। তিনি ব্যাকুল হয়ে ছুটেছেন সংকেতকুঞ্জে। রাধিকার এই বিরহাবস্থার চিত্র সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে উক্ত 'পত্র' কবিতায়—

পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ—
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছল ছল নলিননয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ খুলে বিরহব্যথায়।

রবীন্দ্রনাথের এই অনুভাবনা স্মরণ করিয়ে দেয় কবি বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত ছত্র কয়টি,—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

উক্ত আলোচনায় দেখা যায়, 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'-র যুগে বৈষ্ণব পদাবলী তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু তরুণ বয়সেই নয়, কৈশোর ও তারুণ্যের সন্ধিক্ষণেও যে তিনি পদাবলীর রসমাধুর্যে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে কবিকৃত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা এবং পদরত্নাবলী নামে পদসংকলন গ্রন্থ সম্পাদনে।

সেই ওষুধটা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

গির্জা ঘরের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। একটুখানি সাজান বাগান পড়ে সামনে আর এদিক ওদিকে। খানিকটা উঁচু নিচু টিলা টিপি আবড়ো খাবড়ো জঙ্গলময় ছোটবড় গাছে ভরা।

কাঁটা ঝোপ বুনো গাছ ফুলের জঙ্গল।

তাতে বুনো কুকুর পোষা কুকুর মুরগী সব আছে।

আর ছেলেদেয় খেলার প্রাঙ্গণ।

চোর চোর লুকোচুরী এদেশী ওদেশী নানারকম খেলা।

সহসা 'আরে কাট খায়োরে, কাট খায়ো' বলে একটি বালক চেঁচিয়ে উঠল।

ছেলেরা সকলে খেলছিল, সকলে দৌড়ে সেদিকে গেল। কি হয়েছে? কি হল রে? কি কামড়াল?

বালকটির বছর ১২।১৩ বয়স হবে। নাম রমজান। রহমৎউল্লা ভিস্তির ছেলে। চমৎকার দৌড়তে পারে তীরবেগে। বাঁদরের মত গাছে উঠতে পারে। দোলনা টাঙাতে পারে গাছে। খুব ভাল মালীর কাজ পারে।

বন্ধুদের ভারি প্রিয়। সকলের ভয় বিছে সাপ না কি কামড়ালো?

'কিরে বিচ্ছু?' জঙ্গল-জায়গা সবই থাকে তো।

না। কাছেই একটা খেঁকি কুকুর কেঁউ কেঁউ করতে করতে পালাচ্ছে দেখা গেল।

সবাই সেদিকে তাকালো তারপর বন্ধুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কুকুর? ঐ খেঁকি কুকুরটা? কি করে কামড়াল?'

রমজান বসে পড়েছে। হাঁটুর নিচে দাঁত বসিয়েছে। বেশ রক্ত পড়ছে।

রক্ত দেখে ভয়ও পেয়েছে। আর কামড়ানতে লেগেছেও ত। সে গির্জ্জার ভিস্তির ছেলে। গির্জ্জার অধিবাসীরা এগিয়ে এল।

'কাট খায়া' শুনে তাদের ছোট কুঁড়ে ঘর থেকে মা বাবা কাকা সব বেরিয়ে এল! ওদিক থেকে এল বুড়ো জমাদার আরও কেউ কেউ।

'কুকুর? কে ন্ কুকুর? সাহেবের কুকুর? না বুনো কুকুর? সকলে ভীত। কি করা যায়। সাহেব ত পাহাড়ে গেছেন। ওষুধ কোথা পাবে। কে ওষুধ দেবে?

২

বিমূঢ় খেলার সঙ্গীরা কখনো এক জায়গায় জড় হয়, কখনো এদিক ওদিক যায় কারুকে জিজ্ঞাসা করতে।

ব্রাহ্মণ বেনের ঘরের ছেলেরা একটু সম্পন্ন ঘরের সন্তান, তাদের কেউ কেউ ছুটে বাড়ী যায়, কোনো ওষুধ বা পরামর্শ পায় যদি। বাঙ্গালী ঘরের ছেলেরাও বাড়ী যায় বড়দের জিজ্ঞাসা করতে।

'কুকুরে কামড়ালো? সব বাড়ীর বড়রাই চমকে ওঠেন আতঙ্কে।

ওষুধ? কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ? কেউ মেয়েরা জানেন না।

বিবর্ণভয়ে হিন্দুস্থানীরা বলেন, 'আরে কাঁই ঠিক কাঁই হোসি। (কে জানে কি হবে) বাঙ্গালী গৃহিণীরা কেউ বলেন 'সে ওষুধ ত গোঁদলপাড়া কলকাতার দিকে চন্দননগরে পাওয়া যায় শুনেছি। এখানে? কি জানি।

আর একজন আরম্ভ করেন বিরাট একটি গল্প। কাকে কবে কুকুরে কামড়েছিল তার। শেষ অবধি কি হ'ল তার ভয়াবহ বিবরণ।

অন্য এক গৃহিণী থামিয়ে দেন গল্প। বলেন আর আছে ওষুধ শুনেছি দেয়, কসৌলী পাহাড়ের এক হাসপাতালে। তা' সে ত অনেক খরচ! আহা!...সে কি ওরা পারবে। এখন একটু টিঙ্কার আইডিন দিয়ে বেঁধে দে। নিয়ে যা বাড়ী থেকে।

ছেলের দল বিবর্ণ ব্যাকুল মুখে বন্ধুর কাছে ফিরে আসে। কেউ একটু খাবার, একটু টিঙ্কার আইডিন হাতে।

কুকুরে কামড়ানোর আতঙ্কটা কি তাদের জানা নেই কিন্তু বড়দের ভয় দেখে তারাও ভয় পেয়েছে খুব।

বুড়ো লছমন জমাদার এসে পড়েছিল। ভিস্তী আর জমাদার একই সঙ্গের কাজ। খুব বন্ধুত্ব সে বললে 'কুত্তা কাট খেয়েছে বড় খারাপ বাত। তা অনেক সময়ে

ভালও হয়ে যায়। ভয় পাসনি। ওষুধ একটা আছে জানি। কিন্তু নাম ত বলতে নেই!

কিন্তু জনতা বিমূঢ়! কি ওষুধ? যার নাম বলতে নেই? ডাংদারখানায় মিলবে না? (ডাক্তার) নাম বলতে না পারলে দেবেই বা কি করে? বুড়ো বাবা কি নাম জানো? বল না। চুপি চুপি বল না। কেউ শুনতে না পায় যেন।

জমাদার বললে, আরে নাম বল্লেই যে ওষুধ না কামকে (অকেজো) হয়ে যাবে। কিন্তু ওষুধ ত শীঘ্র দেওয়া দরকার। অতখানি দাঁত বসেছে যখন। 'খতরা' (ক্ষতি) হয়ে যাবে' তবে? তবে কি করে ওষুধ আনব আমরা?

সন্ধ্যেও শেষ হয়ে গেছে—প্রায় রাত্রি। পশ্চিমের গরমের সন্ধ্যা মানে তখন আলো আছে। রাত্রি আটটা যদিও।

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ জমাদার বললে, 'ওষুধ আছে একজায়গায় আমি জানি।

আমি গেলে আনতেও পারি। কিন্তু সে ত আমেরে (অম্বরে) যেতে হবে। সেখানে নাজীরজীর কাছে (রিসিভার) ওষুধ-বিষুধ অনেক থাকে।

পাহাড়ে পর্বতে থাকেন অনেক গরীব পাহাড়ী বাসিন্দা ওষুধ-বিষুধ নেয়। কিন্তু এখন ত রাত প্রায় ৮টা, তারপর এক ঘণ্টার মধ্যেই ৯টার তোপ পড়বে, সহরের সব গেট বন্ধ হয়ে যাবে। তা না হয় ছোট দরজা দিয়ে গেলাম। কিন্তু পাহাড়ের দিকে অন্ধকার পথ, সন্ধ্যেবেলা শেষ বাঘরাচিতা (বাঘ) জল খেতে বেরোয়। শিকার ধরতে বেরোয়। অন্য জন্তুরা জল খেতে আসে। তার হাতে মরে।

পাহাড়ের লোকেরা সন্ধ্যার আগেই গাঁয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। আলো নিয়ে ডাণ্ডা লাঠি নিয়েও বেরুতে সাহস করে না।

ছেলেরা মুখ শুকিয়ে চেয়ে থাকে। ছেলেরা কেউ কোন বড় বিজ্ঞজনের কাছে আবার কুকুরে কামড়ানোর ভয়াবহ গল্পও শুনেছে। তাদের কাছে বলেছে তেমনি ভয়াবহভাবে।

জমাদার বললে ভয়াবহ ভাবে।

জমাদার বললে, 'আচ্ছা আমি কাল ভোরে তোদের কারুকে কারুকে নিয়ে অম্বর পাহাড়ে যাব। কিন্তু অনেক হাঁটতে হবে। পারবে তোমরা? পাহাড়ে ত একা সগ্‌গড় (গরুর গাড়ী) রথ ওঠে না।

৩

৩

গরমের সকাল মানে ৪টায় ভোর।

এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে ভদ্রলোক মামারি বেনে ব্যবসায়ী ঘরের সন্তান বাঙালী রাজপুত জৈন শেঠ ঠাকুর (জমীদার) সকলের ছেলেই বেরিয়ে এল। সবাই বাড়ীতে বললে, 'তারা অম্বরে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে।

সহসা তাদের এত কালী ভক্তি দেখে কোন বাড়ীতে লোকেরা একটু অবাক হ'ল। কেউ বা জানতেও পারল না বলেই ছেলের দল ৫।৭ জন এক হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্গী হ'ল ভিত্তি আর জমাদারের ভাই আর এক বিজ্ঞ জমাদার।

সবে ভোর হচ্ছে। সহরের বড় গেট তখনো খোলেনি। খিড়কী দরজাগুলো খুলেছে।

পথ জনশূন্য। পথের ধারে খাটিয়া পেতে শুয়ে শহর সুষুপ্ত তখনো।

এর মানে গুটিকতক শুকনো মুখ, চিন্তিত বন্ধুবৎসল বালক আর বয়স্ক ভিত্তি জমাদারের ভাইবন্ধুরা পথের ফুটপাথ ধরে চলেছে।

৬০ বছর আগের সেকালে বাস ছিল না। ঘোড়ার গাড়ী ভাড়াকরার মত অর্থ-সামর্থ্য তাদের বালক-ট্যাকে নেই। ভিত্তি জমাদারের তো নেইই। মাথায় পাগড়ী পায়ে নাগরা পরণে জীর্ণ ধুতি গায়ে মেরজাই। তাদের সঙ্গে চলেছে বাঙালী কেষ্ট কানাই রমেশ দীনেশের দল, চলেছে শিউপ্রসাদ রামপ্রতাপ কাশীরাম ঘাসীরামের দল। কেউ বেনে কেউ ব্রাহ্মণ কেউবা অন্য সাধারণ জাতির। খেলার সময় তারা একজাত। তাদের অন্যেরাও যতই পৈতে বা কপালে রোলীর (সিন্দুরের) টীপ থাক বা না থাক তাই দিয়ে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারেনি।

তাদের শিশু-বালক মনে শুধু ভয়—যদি রমজানের কিছু হয়। সে কিছু কি? মৃত্যু? না তারো চেয়ে ভয়াবহ? সে যদি ঐ কুকুরের মত হয়ে যায়। কার নানী বলেছে, সে কিরকম হয়ে যায়। কুকুরের মতই ওদের কামড়াতে আসতে পারে।

ঐ ধরণের গল্প যারা শুনেছে তারা চুপি চুপি বলাবলি করে।

রমজানের কাকা ধমক দেয়, এই 'টব্‌বর' চুপ রনা। (এই ছেলেরা চুপ কর)।

এলো ত্রিপোলিয়া। (তেমাথার ত্রিপথ)। তার

পূর্ব্ব মুখে যেতে হবে। তার পর উত্তর মুখে। বাঁয়ে গঙ্গোরী দরজা, হাওয়া মহল। ওদিকে পুরোনো বস্তি গোবিন্দজীর গোঁসাইদের হাবেলী (গৃহ)। সেকেলে ধরণের একরকমের বাড়ী। পাথরের পাতলা শক্ত চাদরের দেওয়াল। যেন তাসের বাড়ী।

সহসা সামনে দেখা দিল নীল রঙের পাহাড় শ্রেণী। অম্বর পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছে। পাহাড়ের গেটে দুর্গ পরিখা। ঘিরে ঘিরে ঘুরে ঘুরে পথ চলে গেছে পাহাড়ের ওপর।

সেখানে কেল্লার মধ্যে একটি ভবনে নাজীরজী (রিসিভার) থাকেন।

৪

নাজীরজী বৃদ্ধ ধার্মিক মুসলমান। কালীমন্দিরের আয় ব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। সরল মানুষ।

আরে কি হয়েছে এত ভোরে এত লোক তোমরা? কি ব্যাপার?

সকলেরই মন বিচলিত, সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চায়। নাজীরজী থামালেন বালকদলকে। তাকালেন প্রবীণ জমাদারের দিকে। সেই সবচেয়ে বড়।

লছমন দাস গুছিয়ে ব্যাপারটা বললে।

এবং ওষুধের জন্যই আসা তাও জানাল। সেই নাম না-বলা অব্যর্থ ওষুধ দবাইটা চাই। নাজীরজী বসবার ঘরের একটা আলমারী খুললেন।

একটা হাণ্টলী পামারের বিস্কুটের টিন বার করলেন।

তারপর টেবিলের কাছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ওষুধ বার করলেন। নেকড়া ও তুলোর মোড়া ওষুধ। একটি কাঁচি দিয়ে খানিকটা কেটে আর একটি তুলো আর কাগজে মুড়ে ছেলের কাকার হাতে দিলেন। এ ওষুধের দাম নেন না ওঁরা।

তারপর বলে দিলেন পরিমাণ এবং কদিন কবার করে খাবে এবং কিসের সঙ্গে খাবে কলার মধ্যে পুরে খাবে। চিবোবে না। গিলে ফেলবে। এবং বললেন, কাল এলেই ভাল হত। দেরী করেছ একটু। তা হোক ভয় নেই।

জিনিষটা দেখতে পাওয়া গেল না।

৫

ছেলেরা কৌতূহলে কল্পনায় মনে মনে মুখর হয়ে উঠেছে। সব নামল পাহাড় থেকে। এবারে কথা কইতে কইতে।

রমজানের কাকার হাতে ওষুধ। নেকড়া তুলো আর কাগজের মোড়কে। তখন ত দেখতেই পাওয়া যাবে না।

বড়দের দল এগিয়ে চলেছে। ছোটরা একটু পেছিয়ে আছে। 'কি ওষুধরে ভাই? বাঙালীরা জিজ্ঞাসা করে।

আরে নামই করতে নেই যে। নাম জানেই না লোকে। ওদেশী ব্রাহ্মণ কেশবলাল বলে।

বাঙালী দুই ছেলেরা চুপি চুপি বলে 'ভাই যখন কলার ভিতরে দিয়ে খাওয়াবে তখনও কি দেখা যাবে না?'

'কি করে দেখবি? ভিস্তির ঘরে গিয়ে বসে থাকতে হবে।'

'তাহোক।' তারা ছোঁয়াছুঁয়ি মানে না তাদের সব বন্ধুই 'বন্ধুর জাত'। একজাত।

'আর নাম বললে তার যদি উপকার না হয়? কি সব ভীষণ খারাপ হয়।'

কেউ বললে 'দাদী বলেছে বিলকুল কুত্তার মত হয়ে যাবে, রমজান যদি সেরে না ওঠে।'

'তাহলে ভাল হয়ে গেলে বলা যাবে।

জানিস বাবা বলেছেন আমাকে ডাক্তারী পড়াবেন। ওটাও শিখে নেওয়া উচিত। নয় কি?

একজন। কতদিনে ভাল হওয়া বোঝা যাবে ভাই?'

সেই তো জানি না। দেখা যাক বাড়ীতে জিজ্ঞেসা করব কারুকে।'

'আচ্ছা। তাঁরাও কি নাম জানেন না?'

'জানে। জানেরে তারাও বলবে না। বলতে নেই যে! 'বললেই কামড়ানো মানুষটা সারবে না। কুকুর হয়ে যাবে। সকলেই সভায় নীরব হল।

* * * *

প্রথমে তিন সপ্তাহ। তারপর ৬ সপ্তাহ গেল।

রমজান খেলার মাঠে এসেছে। তার পায়ে দাঁতের দাগও মিলিয়ে আসছে।

ওষুধ খাওয়ানোর সময়েও কেউ দেখতে পায় নি।

বন্ধুরা বলে 'ভাই ওষুধটা কি রকম খেতেরে?'

রমজান বললে 'সে ত গিলে ফেললাম।'

'দেখতে পেলি না? দেখতে কি রকম?'

'একদিন মা কলার মধ্যে পুরছিল দেখেছিলাম ঠিক যেন জুতোর চামড়ার মত শুকনো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ যে তোদের আমসত্ত্ব দিয়েছিদি একদিন ঠিক সেই রকম।'

এবারে ভবিষ্যতে ডাক্তারী পড়বে বলা সেই ছেলেটি বললে, 'আমি জানি ওষুধের নাম। কিন্তু একেবারে সেরে গিছিস ত ?'

সকলে উৎসুক চোখে চায় 'কি আমসত্ত্ব ?'

সে হাসল। 'নারে। ছোট ঠাকুর্দা বলেছেন বাঘের জিব।

বললে ঘেন্না করবে। বমি হয়ে যাবে। তাই নাম বলে না। বললেন কুকুর কামড়ানোর অব্যর্থ ওষুধ।'

বাঙালী কেউ বললে 'যাঃ' বাজে কথা।'

অন্যরা অবাক হয়ে গিয়েছিল।

একজন। দেখেছিস তুই ?'

ভাবী ডাক্তার। নারে দেখি নি। কিন্তু সত্যি সত্যি বাঘের জিভ। ছোড়দাদা বললেন যে।

তিনিও ত ডাক্তার।

কিন্তু ভাই কোথায় পাবে বাঘের জিভ লোকে ?'

'কেন ? রাজার ঠাকুর লোগরা (জমীদার) শিকার করে না ? জিভটা কেটে নিয়ে রেখে দেয়।'

'কি করে থাকে ভাই পচে যায় না ?'

কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কিন্তু সকলেরই ভীষণ বমি আসে।

রমজানেরও। সেরে গেছে বটে। কিন্তু তার মনে হয় এখনি বমি হয়ে যাবে। তারা নানাবিধ বুনো ফুলের পাতা ধনে পাতা পুদিনার পাতা মুখে পোরে আর চিবোয়।

মাসী

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

(উপন্যাস)

তিন

নিরুপমাকে একটা গাছতলায় এসে থামতে হল, কারণ, সামনে নদী। এই প্রথম তার হুঁশ হল যে মাছের চুপড়িটা হাতে করেই এতটা পথ সে চলে এসেছে। শেষ অবধি বাড়ীই সে ফিরে যাবে, আর যে কোথাও তার যাবার নেই, অবচেতন মনে এই চিন্তাটা তার ছিল বলেই চুপড়িটাকে সে ছাড়তে পারছিল না। এখন বুঝল, ফিরে যাওয়া চলবে না, বৃথাই সে চুপড়িটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। এই নিদারুণ ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেও তার মনে পড়তে লাগল, তার দাদা সমস্তদিন অনাহারে থেকে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে পুড়ে ছিপ হাতে করে বসে মাছটা ধরেছিল। তিন ভাই গোল হয়ে বসে কত আগ্রহ করে তার মাছ কোটা দেখেছে, তিনজনেই সমস্বরে বলেছে চিংড়ে দিয়ে মুড়িঘণ্ট করো, বড়ি দিয়ে ঝোল, আর জলছিটে দিয়ে মাছ ভাজা, মা যেরকম করে ভাজতেন। হল না, পারল না সে তার ভাইদের সামান্য সখগুলি মেটাতে। মায়ের মত করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে সেও যে মাছ ভাজতে পারে, দেখান হল না সেটা তাদের। তার দু চোখে জল কেবলই উপচে পড়তে লাগল।

ভেবেছিল, কোথাও বসে এখন একটু জিরিয়ে নেবে আর সেই ফাঁকে আরও একবার ভেবে দেখবে, বাড়ী ফিরে যাওয়া কোনোমতেই তার চলে কি না। কিন্তু দেখল, পিছনে অন্ধকার মাঠটা জুড়ে যে লণ্ঠনের আলোগুলো চিক্ চিক্ করছে, যে দুতিনটে টর্চ থেকে থেকে জ্বলছে আর নিবছে, সেগুলো ক্রমশঃ নদীর দিকেই এগিয়ে আসছে যেন। কাজেই জিরোন আর হল না। গা ধুয়ে পরবে বলে যে শাড়ীটা এনেছিল সেটাকে গামছায় পুঁটলি করে বেঁধে নদীর স্রোত যেদিকে বইছে, নদীর ধার ধরে সেইদিকে সে চলতে লাগল।

ইতিহাসের জন্মের বহু আগে থেকে মানুষ যখনই নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়েছে তখন কোথাও একটা নদীর দেখা পেলে তার স্রোতের গতি আশান্বিত মনে সে অনুসরণ করেছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক সহজ মনের প্রবৃত্তি কি নিরুপমার মধ্যে কাজ করছিল?

মাছের চুপড়িটা পড়ে রইল পিছনে গাছতলায়। কোন্ পথে সে গেছে তার চিহ্ন একটা রইল, কিন্তু প্রাণ ধরে ওটাকে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারল না।

নদীটা গ্রামের লোকদের দেওয়া নামেই বড়, আসলে এদিকে পরিসর তার খুব বেশী নয়। আর সেই জন্যে স্রোত সাধারণতঃই বেশ প্রখর। তার উপর বর্ষণ সুরু হলে তার প্রখরতা অনেক বেড়ে যায়। তখন শুধু দাঁড় বা শুধু পাল, বা পাল বা দাঁড় এই দুয়েরই সাহায্যে সেই স্রোত ঠেলে উজিয়ে যাওয়া শক্ত হয়, তাই মাঝিরা এদিকটাতে নেমে গুণ টানে। গুণটানা মাঝিদের পায়ে-চলার পথ তাইতে তৈরি হয় নদীর ধারে ধারে। বেশীর ভাগটা নিজে থেকে তৈরি হয়, কোথাও কোথাও কোদাল কুড়াল দিয়ে তৈরি তারা করে নেয়। অন্ধকারে সেই পথের রেখা অস্ফুট হয়ে চোখে পড়ছিল, নিরুপমা সেই পথ ধরে চলতে লাগল।

কিন্তু অন্ধকার ক্রমেই দুর্ভেদ্য হয়ে আসছে। পথ সব সময় ঠাহর হচ্ছে না, থেমে থেমে চলতে হচ্ছে। মরা নদীটা পার হয়ে ওপারে উঠবার সময় দুবার সে আছাড় খেল, একটা হাঁটুর ছড়ে গেল খানিকটা। এতক্ষণ একটা

মহাভয়ের-তাড়নায় অন্য ভয়গুলি তার মনের আনাচে-কানাচে নিঃসাড় হয়ে পড়ে ছিল, এখন যখন পিছনের লণ্ঠন ও টর্চের আলোগুলি আর দেখা যাচ্ছে না, তখন সেই ভয়গুলি এক এক করে নিজেদের জানান দিচ্ছে।

অনির্দেশ্যতার ভয়, নিরাশ্রয়তার ভয়, নিঃসঙ্গতার ভয়, সরীসৃপের ভয়, আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ভয় মিলে তাকে একেবারে বিহ্বল করে দিল। ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে সে, বুকের মধ্যেটা ব্যাথায় টনটন করছে, কিন্তু থামতে পারছে না। ভয়গুলি যেন তার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে, কোথাও একটুক্ষণের জন্যে দাঁড়ালেই তারাও তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যাবে।

কড় কড় শব্দে যেন খুব কাছেই বাজ পড়ল একটা। একটু পরে আরও একটা। বাজ পড়াকে শিশুকাল থেকেই বড় ভয় নিরুপমার। কেন দৌড়চ্ছে, কি তাতে লাভ হবে, না ভেবেই সে দৌড়তে লাগল। আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথে কয়েকবার সে হোঁচট খেল, খুব লাগল দুই হাঁটুতে, দুই কনুয়ে। তবু সে দৌড়তে লাগল।

হাওয়ার জোর কমে গিয়ে বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছে। এরপর ত পিছল হয়ে যাবে পথ, আর সে দৌড়তে পারবে না। হেঁটে যেতেও অন্ধকারে পায়ে পায়ে আছাড় খাবে।

অনেকক্ষণ পর আবার একবার অন্তহীন নৈরাশ্যে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার। ইচ্ছে করতে লাগল, সেই নির্জ্জন নদীতীরে বসে ডাক ছেড়ে খুব খানিকটা কাঁদে। কিন্তু কি হবে কেঁদে, কাঁদবার সময় ত ঢের পাওয়া যাবে, এখন আছাড় খেতে খেতেই যতটা পথ এগিয়ে যাওয়া যায় ততটাই লাভ।

কোথাও পা টিপে, টিপে কোথাও বা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যেতে যেতে আর্ত্তস্বরে সে বলতে লাগল, অঙ্কু রে! শঙ্কু রে! দাদা গো দাদা! বাবা, বাবা গো!

একটি নিরপরাধা বালিকার শোচনীয় এই দুর্দ্দশা বোধহয় নির্ম্মম-অদৃষ্ট দেবতাও আর দেখতে পারছিলেন না। তাই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তখনকার মত একটি আশ্রয় তার জুটে গেল।

বিদ্যুতের আলোতেই সে দেখতে পেল, নদীর খাড়া পারটি এক জায়গায় ঢালু হয়ে নীচে নেমে গিয়েছে, মনে হয় কাছাকাছি কোনো গ্রামের লোকদের স্নানের ঘাট এটা। নদীর সেই ঘাটের একপাশে লগিতে বাঁধা ছই-ওয়াল ছোট একটি একমাল্লাই নৌকো। নৌকোতে আলো নেই কাজেই আরোহীও কেউ নেই মনে হয়।

পা টিপে টিপে নেমে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে, কেউ যে নেই, নৌকোটাতে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নৌকোতে উঠে পড়ল নিরুপমা।

ছইয়ের ভিতরে ঢুকে পুঁটলিটা রেখে বসতেই বাইরে তুমুল বৃষ্টি। একটু পরে শরীর ও মন একটু বিশ্রাম পেতেই দুচোখেও বর্ষা নামল তার। ভিতরকার এবং বাইরেকার অবিচ্ছিন্ন বর্ষণের মধ্যে মুহ্যমান হয়ে সে পড়ে রইল অনেকক্ষণ।

পশ্চিমের ঘরের জোড়া তক্তপোশের বিছানাটাকে মনে পড়তে লাগল তার। যে বিছানাটাতে ছোট ভাই দুটিকে নিয়ে সে শুত। এই সময়টাতেই দিদিভাইকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হত অঙ্কু আর শঙ্কুর, ছোটবড় কত রকমের কত প্রয়োজন। তরে মধ্যে দিদিভাইয়ের দুদিকে দুজন শুয়ে শুধু তার গায়ে হাত রাখা, আর কখনো বা কোনো রকমে ভয় পেয়ে দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধারার প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বেশী। মায়ের অভাব দিদিভাই এত দিন ভুলিয়ে রেখেছিল তাদের; আজ দিদি-ভাইয়ের অভাব কে তাদের ভোলাবে? রাত্রে কোন্ ঘরে কার কাছে তারা শোবে? শঙ্কু এখনো বিছানা ভিজোয়, পাছে বাবা বা দাদা জানতে পারেন সেটা, সেই ভয়ে সে আধমরা হয়ে থাকে। আজ রাত্রে কি হবে তার দশা?

কতকিছু নিয়েই ত কাঁদা যায়, নিরুপমার কান্নার শেষ কি আছে? এরই মধ্যে ভীষণ ভড়কে সটান হয়ে উঠে বসল সে। মনে হল কে যেন লাফিয়ে উঠল নৌকোয়। তখন দূর আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার মৃদু আলোয় বাইরে তাকিয়ে বুঝল ভয়টা অমূলক। নৌকোটা প্রখর স্রোতের টানে এগোচ্ছে পিছচ্ছে; একবার পিছিয়ে আসবার সময় লগির গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে একটা, সেই সঙ্গে দুলে উঠেছে ভীষণ ভাবে আর কিছু নয়।

কিন্তু সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। মনে পড়ল নৌকোর মাঝিরা অনেকেই বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করে নৌকোতে ঘুমোতে আসে রাত্তিরে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। এই নৌকোর মাঝিও নিশ্চয় আসবে। তখন চোখে পড়ল, একপাশে পাট করে রাখা কাঁথার উপরে তেল-চিটে বালিশটি, ছইয়ের গায়ে ঝোলান লাউয়ের খোলার একতারা ও একটি খঞ্জনী।

বৃষ্টি থেমেছে। কিছুক্ষণ থমথমে হয়ে থেকে হাওয়াটা এবার উল্টো দিকে অর্থাৎ স্রোতের অভিমুখে বইছে। ত্রস্তপদে উঠে গিয়ে নিরুপমা লগির বাঁধনটা খুলে দিল। ভাল করে খুলবার আগেই এক ঝটকায় বাকীটুকুকে আলগা করে নিয়ে স্রোত ও ঝোড়ো হাওয়ার টানে আড়াআড়ি ভাবে তীব্রগতিতে ছুটে চলল নৌকোটা।

ছইয়ের নীচে চাটাইয়ের বিছানায় বাহু উপাধানে মাথা রেখে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতেই কোনো এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল নিরুপমা। একটা ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখল নৌকোটা চলছে না। হাওয়ার জোর এখন আর প্রায় নেই বললেই হয়, আকাশ জুড়ে তারার আলোর ঝলমলানি। সন্তর্পণে ছই থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, একটা খেয়া জালের বাঁশের কয়েকটা খুঁটির গায়ে নৌকোটা আড়াআড়ি ভাবেই আটকে গিয়েছে। তারার আলোতে যতটা হওয়া সম্ভব তার চেয়েও একটু যেন বেশী ফিকে হয়ে এসেছে অন্ধকার। প্রায় সারা রাত ধরে তীব্র বেগে নৌকো চলেছে, নিশ্চয় আট-পাড়া থেকে এতক্ষণে অনেকটাই দূরে চলে এসেছে সে। হয়ত ত্রিশ মাইল বা চল্লিশ মাইল বা তার থেকেও বেশী। সেই সঙ্গে সে চলে এসেছে আরও অনেক কিছু থেকে অনেক অনেক দূরে।

কিন্তু এরপর কোন্‌দিকে কোথায় সে যাবে? খেয়া জালে মাছ ধরতে জেলেরা রাত থাকতেই উঠে আসে, যে কোনো মুহূর্তে তারা এসে পড়বে। নৌকোটাকে সহজেই মুক্ত করে আবার ভাসিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু কি লাভ হবে এতে? একটু পরেই ভোর হবে। মাঝিবিহীন নৌকোয় করে নিশ্চিন্তে ভেসে যেতে কেউ তাকে তখন আর দেবে না।

খুব জলতেষ্টা পাচ্ছিল। আঁজলা করে জল তুলে খেতে গিয়ে জলজলে সোনার চুড়িগুলি তার চোখে পড়ল। সে-গুলিকে আর গলচার বিছে হার ও কানের দুলদুটিকে গাম-ছার পুঁটলিতে ঢুকিয়ে নিয়ে দুগাছা করে সবুজ কাঁচের চুড়ি পরা হাতে বাঁশের খুঁটি একটার পর একটা ধরে ধরে নৌকোর গলুইটাকে পারের কাছ অবধি সে নিয়ে গেল, তার পর পুঁটলি হাতে লাফিয়ে নেমে গেল নৌকো থেকে।

যেখানটাতে সে নামল, সেখানে নদীর প্রসার বেশী, স্রোত কম। পারও আর আগে মত খাড়া উঁচু নয়, দুদিকেই ক্রমে ঢালু হয়ে জলে নেমেছে। ঘাসে ঢাকা ঢালু পার বেয়ে সে চলতে লাগল।

ভয়ের প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গিয়ে অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছিল সে, সেই সঙ্গে অনাহারের ক্লিষ্টতা। চলতে যেন পারছিল না, কিন্তু চলতে ত তাকে হবেই? কোথায় চলেছে, কি আছে তার সামনে, কিছুই সে জানে না, কিন্তু তাই বলে বসে থাকতে ত সে পারে না? সামনে যাই থাক, এগিয়ে গিয়ে সেটার সঙ্গে তাকে পরিচয় করতে হবে।

একটা ঘন বন জলের প্রায় ধার অবধি নেমে এসেছে, সেই বনের মধ্য দিয়ে অনেকখানি পথ। জলের ধার ধ'রে চলতে পারত, কিন্তু ইচ্ছে করেই নিরুপমা বনের পথ ধরল। বনের পথে এসময়টা লোক চলবে না, কিন্তু নদীতে নৌকো চলবে, এবং একটি অল্পবয়সী মেয়ে লোকালয় থেকে দূরে শেষ রাত্রে কেন একলা পথ চলেছে, এ প্রশ্ন কারুর না কারুর মনে জাগবেই।

পূবের আকাশে ফিকে দুধ রঙের আলোর ছোঁওয়ায় তারাগুলি তখন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, কেবল বনের মধ্যে তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বনের ঠিক ওপাশেই নদীটা যেখানে বাঁক ঘুরে গিয়েছে, সেখানে ছোট একটি নালা এসে পড়েছে নদীতে। সেই নালার পার ধরে চলতে চলতে যেখানে এসে সে পৌঁছল, সেটা রেল রাস্তার একটা কাল্‌ভার্ট্‌। পিছনে কাল্‌ভার্টের খাড়া দেয়াল, সামনে নালা, এ-দুয়ের মাঝখানে

আগাছায় ভরা সংকীর্ণ একটু জায়গা, তারই মধ্যে কোনরকমে ঠাঁই করে ব'সে বাকী রাতটুকু সে কাটিয়ে দিল।

এইভাবে ওখানে বসে থাকতে থাকতে কিছু-ক্ষণের জন্যে একবার তার মনে হল, সে যেন সে নয়, অন্য কেউ! কেন ভয়? ভাবনাই বা কিসের? যে-মানুষটা ভয় পাচ্ছিল, ভেবে আকুল হচ্ছিল, প্রিয়-বিরহে বুক-ফাটা কান্না কাঁদছিল, সে নেই! সে নেই, নিরুপমা নেই। তার দেহটা আশ্রয় করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানুষ বেঁচেরয়েছেএখন। এই যে মানুষটা, যাকে নিরুপমা চেনে না, তার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, বর্ত্তমান বলতেও বিশেষ কিছু নেই। কেবল প্রতিটি মুহূর্ত্তের বিচিত্র, বিক্ষুব্ধ, অপ্রত্যাশিত তরঙ্গভঙ্গের উপর শুকনো একটি আগাছার মত নিরবলম্ব হয়ে সে ভাসছে।

তার বিগত জীবন অনেকগুলি সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির মত হয়ে তার মনের দিগন্তে ঐ তারাগুলির মতই মিলিয়ে যেতে লাগল। স্বপ্নে কি ঘটেছে তা নিয়ে কেউ ত জেগে উঠে দুঃখ করে না, কাঁদে না? নিরুপমাও কাঁদছে না আর এখন। এতদিন সে স্বপ্ন দেখছিল, তার বিগত জীবনটা একটা স্বপ্ন।

ভেবেছিল, আর কাঁদবে না। ভোরের আলো চোখে এসে পড়তেই অনিদ্রাক্লান্ত চোখদুটি জ্বালা করে উঠল। দুহাতে রগড়াতে গিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল চোখ থেকে। তারপর তার পরিচিত প্রিয় পৃথিবীর রূপ, মাঠ ঘাট প্রান্তর ধানক্ষেত, গ্রামের কুটীর আর কুটীর-প্রাঙ্গণে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ক্রমিক উন্মেষ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যত তার চোখে পড়তে লাগল, অশ্রুধারা আর বাধা মানতে চাইল না।

একটু স্থির হয়ে নিয়ে, নালার ঝিরঝিরে, পরিষ্কার জলে হাতমুখ ধুয়ে কাল্‌ভার্টের নীচে থেকে সে বেরিয়ে এল। দেখল, অনতিদূরে ছোট একটি স্টেশন। রেল-রাস্তার ধার দিয়ে পায়ে-চলা পথ চ'লে গিয়েছে স্টেশনের দিকে। পুঁটলিটি হাতে নিয়ে ক্লান্তিজড়িত পায়ে সেই পথ ধরে সে চলতে লাগল।

চার

কিরকম যেন গোলে হরিবোলের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা।

স্টেশনের থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমটায় একরাশ মোটঘাট আগলে জনকয়েক ভৃত্যস্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ বসেছিল। ভৃত্যস্থানীয় এই জন্যে যে মোটঘাটগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছিল সেগুলির মালিক তারা নয়। কিছুক্ষণ বাইরে সুরকিঢালা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে বেড়িয়ে নিরুপমা একসময় ভিতরে এসে তাদেরই পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। বেশী দূরত্ব রক্ষা করে বসবার মত স্থান যথেষ্ট ছিলও না, তাছাড়া অন্যদের সঙ্গে একটু মিলেমিশে থাকতে পারলে বিশেষ করে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ সে করবে না, তার অপরিণত বালিকা-বুদ্ধি দিয়েও এইটুকু সে বুঝেছিল। হয়ত সেইজন্যে এদের একটু বেশী কাছেই সে বসেছিল।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল নিরুপমার। আধ ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ লোকগুলির টুকিটাকি কথা একটু আধটু যা তার কানে আসছিল, তাতে সে বুঝল, এরা কলকাতার যাত্রী। এদের কর্ত্রী ঠাকরণ তাঁর ছোট দুটি ছেলেকে সঙ্গে করে সদলবলে এ অঞ্চলে তাঁদের জমিদারিতে এসে-ছিলেন। ঠাকরুণটি অসুস্থ। কথা ছিল. কলকাতা থেকে তাঁদের পরিচিত একজন ডাক্তার হয় কিছুদিন এসে তাঁর সঙ্গে থেকে যাবেন, নয়ত মাঝেমাঝে এসে দেখে যাবেন। কিন্তু কোনো কারণ ডাক্তারের আসা সম্ভব হয়নি বলে কলকাতাতেই তিনি ফিরে যাচ্ছেন।

হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরটা একটা বিষম ঘা খেয়ে চৌচীর হয়ে ভেঙে গেল নিরুপমার। ব্যাপার কিছুই নয়, একটা বড় হাতঘণ্টা নেড়ে নেড়ে স্টেশনের একজন লোক চীৎকার করে বলছে যাত্রীগাড়ী আগের স্টেশন থেকে ছেড়েছে। মাঝবয়সী কিঞ্চিৎ স্থূলকায় একজন ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মোটঘাট আগলে যারা বসেছিল তাদের বললেন, "এই টিকিট-ঘর খুলেছে। তোদের ক'খানা টিকিট, বল্। এই, এই, ক'জন তোরা?"

যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে থেকে একটু মুরুব্বি ধরণের একজন লোক নিরুপমাকে সুদ্ধ হিসাবে ধরে বলল,

"আমরা আটজন আছি সরকার মশাই।"

বছর কুড়ি বয়সের চটপটে দেখতে একটি ছোকরা, রঙ কালো, কিন্তু একটু লম্বাটে আঁট সাঁট ধরণের চেহারা, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি তুলে বলল, "আট কেন হতে যাবে? সাতজন ত আমরা।"

মনে হল, ছেলেটাকে কেউ বিশেষ আমল দিতে চায় না। ভদ্রলোক তাই এবার নিজেই গুনছেন। তিনিও নিরুপমাকে হিসাবে ধরে নিয়েই গুনলেন। তারপর চলে যাবার মুখে ছেলেটির মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললেন, "নিজেকে বাদ দিয়ে গুনছিস। সারারাত ঘুমোসনি ও, মাথটার ঠিক নেই।"

সত্যিই সারারাত না ঘুমিয়ে মাথাটার কারুরই বেশী ঠিক ছিল না, তাই এ নিয়ে উচ্চবাচ্য আর হল না। কয়েকজন মুর্খের হাসি হাসল একটু। মুরুব্বিটি বলল, "তোর যেমন বুদ্ধি জগন্নাথ। ধর্‌ গে না-হয় আমরা আটজন নয়, সাতজনই রইছি। তাতে হলটা কি রে? একটা বেশী টিকিটের দাম তোর গাঁট থেকে ত যাচ্ছে না? নাকি যাচ্ছে, বল্‌। কিন্তু ধর্‌, যদি আটজনই আমরা হই, তখন একটা টিকিট কম কেনা হলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াত বল্‌ দিকি।"

আর এক ব্যক্তি মন্তব্য করল, "মুনিবের যে পয়সাটা বাঁচবে সে ত তোর ট্যাঁকে আসবে না।"

ট্রেনটা এসে পড়তেই হৈ হৈ রৈ রৈ, ও বাপজান, ও হালার পো হালা মংলা, ও ডুলা মিয়া, কই গেলা তুমি, এই, এই, এ গাড়ীতে না, এটা দেড়া মাশুলের গাড়ী, এই ধরণের কত যে চীৎকার চেঁচামেচি, এমনকি কান্নাও। এসবের মধ্যে আর তিনটি ঝি-এর সঙ্গে নিরুপমাও উঠে গেল ট্রেনের থার্ডক্লাস মেয়ে-কামরায়। দুমিনিট মাত্র ট্রেনটা থামে এ স্টেশনে। ট্রেনে চড়া আর ট্রেন থেকে নামা পাড়াগাঁর নিরক্ষর চাষীদের কাছে একটা ভয়াবহ মহা পরীক্ষার পর্ব্ব। মোট চড়ে ত মানুষ পড়ে থাকে পিছনে; নয়ত মানুষ চড়ে, মোটমাটরির হিসাব মেলে না, মানুষে মানুষে ছাড়াছাড়িও হয় বিস্তর। যে গাড়ী তিন ঘণ্টা লেট করে আসে, তাও ঐ বাঁধা দুমিনিটের বেশী এই হতভাগাদের জন্যে দাঁড়ায় না।

ভাগ্যিস দাঁড়ায় না, নয়ত কে জানে নিরুপমার জীবন-ধারা কোন্‌ খাতে বইত।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল সে, জগন্নাথ বলে সেই ছেলেটি তাকে প্রায় ঠেলে তুলে দিয়ে গেল ট্রেনে। সঙ্গে সঙ্গেই চলতে সুরু করল ট্রেনটি।

তা জগন্নাথকে দোষ দেওয়া যায় না। সে ত নিরু-পমাকে বাদ দিয়েই গুনেছিল নিজেদের। কিন্তু সবাই গুনে হাসল যে। নিশ্চয় মেয়েটি জমিদার-বাড়ীতে কোন একটা কাজে ঢুকেছে, জগন্নাথ জানে না। তখন থেকে বারবার আড়-চোখে তাকিয়ে দেখেছে সে মেয়েটিকে আর, যত দেখেছে তত বেশী তার ভাল লেগেছে। বেশ হবে এই মেয়েটি কলকাতার বাড়ীতে থাকলে। বাড়ীটার শোভা বাড়বে। গাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে, মেয়েটি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উঠতে পারছে না, এটা সে দেখে কেমন ক'রে?

এই ধরণের সব যোগাযোগে নিরুপমার কলকাতা যাত্রা সুরু হ'ল।

মেয়েদের কামরার এক কোণে তার পুঁটলিটি কোলে করে জড়সড় হয়ে বসেছে সে। উদ্বেগের ঘামে তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। সহযাত্রিণী তিন জন প্রথমটা বুঝতে পারেনি, নিরুপমাও যে তাদেরই একজন। পরের স্টেশনে জগন্নাথ এসে যখন চারখানা টিকিট চারজনকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, তখন সেটা তারা জানল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরুপমাকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখল তারা, তারপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুশ্রী আর মোটাসোটা দেখতে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, "আজকেই বু ঝি কাজে ঢুকলে?"

নিরুপমা কি যে বলল নীচুগলায় ট্রেনের প্রচণ্ড শব্দে তা শোনা গেল না, তবে সকলে ধ'রেই নিল, সৌদামিনী ওরফে সদুর অনুমানটাই ঠিক।

সদু বলল, "মামাবাবু বলছিলেন বটে, কর্ত্রীমার জন্যে একটু লেখাপড়া জানা একটি মেয়ে খুঁজছেন। ভুল করে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দেবে না, কখন কি দেওয়া হ'ল, না হ'ল, লিখে রাখতে পারবে, এই রকম আর কি! আমরা সব জানো ত বাছা, ক বলতে হ! তা লেখাপড়া তুমি ত জানো বলেই বোধ হচ্ছে।"

নিরুপমার মনে হ'ল, সে যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। তার মত একটি মেয়ের তাহলে দরকার এদের আছে। বলল, "লেখাপড়া সামান্য শিখেছি।"

সদু বলল, "ঐ সামান্যতেই ঢের হবে। ওরা ত আর টোল খুলছে না যে টুলো পণ্ডিত চাইবে? তা, মাইনে কত ঠিক হ'ল?"

ছিপছিপে গড়নের শ্যামাঙ্গী মেয়েটি ওপাশ থেকে তাড়া দিয়ে উঠল, "তোমার এত কথায় দরকার কি সদুদি। তোমার চেয়ে বেশী মাইনে মামাবাবু আর কাউকে যে দেবে না তাও ত তুমি জানো।"

এদের মধ্যে যে বর্ষীয়সী, যার একমাথা পাকা চুল আর মুখের সামনের দিকে উপর পাটির গুটিতিনেক দাঁত নেই, সে হেসে বলল, "মাইনে যাই দিক, উপরি পাওনাগুলো ত আর দেবে না?" কথা বলার সময় দাঁতের ফাঁকে তার অপরিচ্ছন্ন জিভটার নড়াচড়া দেখা গেল।

সদু তার টানাটানা চোখদুটি পাকিয়ে বলল, "দেখ পদ্মপিসী, দেখ্ নেত্য, একটা নতুন লোকের সামনে আমাকে এরকম যা তা তোরা বলবি না।" কথাটা সত্যিই যে খুব রাগ করে বলল, তা কিন্তু মনে হ'ল না।

পদ্মপিসী বলল, "বেশ, আমরা চুপ করলুম। নতুন লোক বেশী পুরনো হবার আগেই নিজে থেকে সব জানতে পারবে, ভাবনা নেই।"

এরপর অনেকক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বলল না। আর একটা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতেই জগন্নাথ ছুটতে ছুটতে এল, বলল, "পদ্মপিসী, তোমরা কিছু খাবে ত বল। গাড়ী এখানে দাঁড়াবে কিছুক্ষণ।"

পদ্মপিসী বলল, ট্রেনে উঠলেই তার গা গুলোয়, খেতে সে পারবে না। সদু বিধবা মানুষ, আজ তার একাদশীর উপবাস। নেত্য বলল, তার এখনো ক্ষিদে পায়নি, সে পরে খাবে। নিরুপমা কিছু হয়ত বলবে আশা করে জগন্নাথ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু তাকে নিরুত্তর দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ মুখ করে ফিরে গেল।

এরপর প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে জগন্নাথ আসছে আর খোঁজ নিচ্ছে। এক-একবার এসেই ছুটে পালাতে হচ্ছে তাকে গার্ডের হুইসলের শব্দ শুনে। হয়ত কখন গাড়ীটা ওকে ফেলে রেখেই চলে যাবে ভেবে নিরুপমা সত্যিই একটু আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সদুকে বলল, "ওর এরকম বারবার আসবার কি দরকার? কেবল বড় স্টেশনগুলিতে এলেই চলবে, সেটা তুমি ওকে বলে দাও না ভাই?"

সদু বলল কথাটা জগন্নাথকে, কিন্তু এমন রূঢ় ভাষায় আর এমন কুৎসিত ভঙ্গিতে বলল, যে, ওরকম একটা অনুরোধ সদুকে করেছিল বলে নিরুপমা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।

হঠাৎ একসময় সদু বলল, "ভাল কথা,—তোমার নামটি কি তা ত জানা হ'ল না?"

উত্তরটা নিরুপমা আগে থেকেই ভেবে ঠিক করে রেখেছিল। খুব সহজ ভাবেই বলল, "নির্মলা।"

আরও অনেক কথাই অনেকে জানতে চাইবে। কি তখন তাদের বলবে, তাও ভেবে ঠিক করেছে।

পাঁচ

যে লোকটা বলেছিল, নিবারণ শেষ হয়ে গেছে, খুব মিথ্যে সে বলেনি। বাস্তবিক নিবারণের রক্তশূন্য দেহে প্রাণটুকুই অবশিষ্ট ছিল মাত্র, কিন্তু অবশিষ্ট ছিল।

স্থানীয় চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেন্সারীর ডাক্তার রক্তপাত বন্ধ করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তারী শাস্ত্রে যে জিনিষটাকে বলে 'শক্', প্রচুর রক্তক্ষয়ের সঙ্গে সেই জিনিষটা মিলে নিবারণের অবস্থাটাকে খুবই সঙ্কটজনক ক'রে তুলেছিল।

ছ'দাঁড়ের নৌকোয় করে তাকে জেলা শহরে নিয়ে এল তার বাবা রঘুনাথ মণ্ডল। পথে আসতে বারবার বলল, "ওরে হারামজাদা, নির্ব্বংশার পুত, মরতে আছছ, মর্, খালি একবার চৌখ খুইল্যা কইয়া যা, কে এই দশা কইরা রাইখ্যা গেছে তর।"

হাসপাতালে ভর্ত্তি করবার পর দিন-পনেরো লাগল তার একটু মানুষের মত হতে। তখন হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিকাশকে সঙ্গে করে মহেন্দ্র, ও স্থানীয় একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আটপাড়ার দারোগা তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

তাকে নানারকম ক'রে প্রশ্ন করে মোটামুটি যা জানা গেল তা হ'ল এই, যে, একদল গুণ্ডা, নিবারণের দৃঢ় বিশ্বাস তারা মমীনপুরের লোক, নিরুপমার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। নিবারণ ছুটে এসে তাদের বাধা দিতে গেলে তারা দা দিয়ে তার ঘাড়ে মাথায় কুপিয়েছে।

বিকাশ বলল, "আর নিরুপমা? নিরুপমার কি হ'ল তার পর?"

নিবারণ বলল, "হেইয়ারে ত আমি জানি না। আমার কি তখন কিছু দেখনের মত অবস্থা? দুই চৌখে ধুমা দেখতে আছি না?"

দারোগাটি বিশেষজ্ঞের মত বললেন, "তুমি বাধা দিতে গিয়ে পারলে না, তারপর তারা কি আর ওকে ছেড়ে দিয়ে গেছে? নিয়েই গেছে নিশ্চয়।"

স্থানীয় পুলিশ-কর্ম্মচারীটি বললেন, "ওরা ক'জন এসেছিল?"

নিবারণ, "তা আইজ্ঞা সাত আষ্টজন হইব।"

দারোগা, "তাদের কাউকে তুমি চেন?"

নিবারণ, "আগে চিনা আছিল না, এখন দেখলে কইতে পারি।"

দারোগা, "আচ্ছা ভাল করে সেরে ওঠ, তোমাকে সঙ্গে করে আমরা যাব মমীনপুরে। কাউকে সনাক্ত করতে পার কি না দেখব।"

বিকাশ বলল, "তুমি কি করতে গিয়েছিলে সেখানে তখন?"

নিবারণ বলল, "এই দ্যাহেন। আমি কি আর আমার কাজে গেছি? দূর থাইকা দেখলাম মানুষ গুলান-রে যাইতে আছে দীঘির দিকে। দীঘির দিকে যায় ক্যান্? কিসের লাইগা? একটু ত দেখন লাগে। ভাবলাম যাই, গিয়া একটু দেখি কি তারা করে।"

বিকাশ, "তোমার পরনের কাপড়টা ভিজেছিল কি করে?"

নিবারণ, "আর কইয়েন না। দাও দিয়া ত কুপাইলই আবার টাইনা আমারে জলেও ফালাইয়া দিয়া গেল।"

বিকাশ পরে দারোগাকে বলেছিল, "নিরুপমার মাছের চুপড়িটা দীঘি থেকে দু মাইল দূরে বড় নদীর ধারে কি করে গেল বুঝতে পারছি না।"

দারোগা এবারও বিশেষজ্ঞের মতই বলেছিলেন, "ও আর আশ্চর্য্য কি? ওরাই কেউ নিয়ে গিয়েছিল, পরে হয়ত অসুবিধা বোধ করে ফেলে গেছে।"

নিবারণের কথাগুলি বিকাশের খুব যে বিশ্বাসযোগ্য মনে হল তা নয়, কিন্তু আর কি যে হয়ে থাকতে পারে তাও ত সে বুঝতে পারছে না।

মমীনপুরে জোর তদন্ত চলল কিছুদিন। সন্দেহ হওয়াতে তিনজন লোককে ধরে চালানও দিয়ে দিল পুলিশ। কিন্তু নিরুপমার কি যে হল, কোথায় যে সে গেল, তার কিনারা কিছুই হল না।

দিদিভাই মারা গেলে তারা যতটা কাঁদত, সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে অক্ষ শঙ্কু তার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদল। দিনরাত বুকফাটা তাদের সেই কান্না প্রায় অবিশ্রান্ত চলল কিছুদিন। মহেন্দ্র এমনিতেই কথা কম বলতেন, এখন যেন পাথর হয়ে গেলেন। কেবল বিকাশ ফাঁদে পড়া বাঘের মত গর্জ্জাতে লাগল, "এ হতে পারে না, হয়নি, কোথাও ভুল কিছু একটা হচ্ছে। নিরুপমাকে আমি খুঁজে বের করবই।"

কাগজে কাগজে অনেকদিন ধরে সে বিজ্ঞাপন দিল, বোন, ফিরে এস, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। নিরুপমার খবর কেউ দিতে পারলে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করল। তবে এ বিষয়ে বেশ একটু ত্রুটি রয়ে গেল এই কারণে, যে তার দশ বছর বয়সে তোলা একটি গ্রুপ ফোটোগ্রাফের মধ্যে ছাড়া নিরুপমার আর কোনো ছবি নেই, আর সেই দশ বছরের মেয়েটির সঙ্গে সতেরো বছরের নিরুপমার কোনো সাদৃশ্যই চোখে পড়ে না। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তার কোনো ছবি ছাপা এজন্যে সম্ভব হ'ল না। অবশ্য যে ভাবছে সে খুন করে পালিয়েছে, এসব বিজ্ঞাপন চোখে পড়লেই তার নিজে থেকে সাড়া দেবার কথা নয়, কারণ সে ত স্বচ্ছন্দেই ভাবতে পারে যে তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে পুলিশেরই এটা একটা কারসাজি। কিন্তু বিকাশ কি করে তা জানবে?

বিকাশের ওকালতি রইল পড়ে, সে আটপাড়া ছেড়ে নড়তে চাইছে না। তার ভয়, হয়ত দূরে চলে গেলে নিরুপমাকে ফিরে পাবার কোনো সূত্র যদি কোথাও থাকে

—আছে নিশ্চয়,—তা সে হারাবে।

মহেন্দ্র তাকে ডেকে একদিন বললেন, "আর সময় নষ্ট করে কি হবে? যা হবার তা ত হয়ে গিয়েছে, এবার কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ভাবতে হয়।"

"কিন্তু মেয়েটার কি হল তা জানতে হবে না?"

"চেষ্টা ত অনেক করলে।"

"হয়ত সেটা যথেষ্ট হয়নি।"

"শোন বিকাশ, নিরুপমা হয় বেঁচে নেই, নয়ত তার এমন দুর্গতি হয়েছে, যার চেয়ে মৃত্যু ভাল। ওকে নিয়ে ভাববার আর দরকার নেই।"

বিকাশ গর্জে উঠে বলল, "তোমার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। আমার এই কথাটা শুনে রাখ তুমি; যে ধরণের দুর্গতির কথা তুমি বলছ তার চেয়ে মৃত্যু ভাল, এ আমি মনে করি না। ও কোনো অপরাধ করেনি, কিন্তু তাও যদি করত, আমি কখনোই বলতাম না, তার মৃত্যু ভাল।"

মহেন্দ্র শান্ত কণ্ঠেই বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, শুনে রাখলাম। এবার আমার কথাটা তুমি শোন। তুমি অনেকবার আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে বলেছ, আমি ঠিক করেছি তাই যাব। যা ঘটে গেছে তারপর আত্মসম্মান বজায় রেখে আটপাড়ায় থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তা ছাড়া অক্ষু-শম্ভুর দেখাশোনার ব্যবস্থা এখানকার চাইতে কলকাতায় অনেক বেশী ভাল করে হতে পারবে।"

হায়রে, বাবা সঙ্গে যেতে রাজী হতেন না বলে এত আদরের বোনটির এত আগ্রহ সত্ত্বেও কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে তাকে সে রাখতে পারেনি। তাই নিয়ে দুই ভাই বোন কত দুঃখই না পেয়েছে। আজ বাবা যাচ্ছেন কলকাতায় আর এতে সবচেয়ে বেশী খুশী যে হত সেই কেবল কোথাও নেই। বড় দুঃখেও হাসি পেল বিকাশের।

ক্রমশঃ
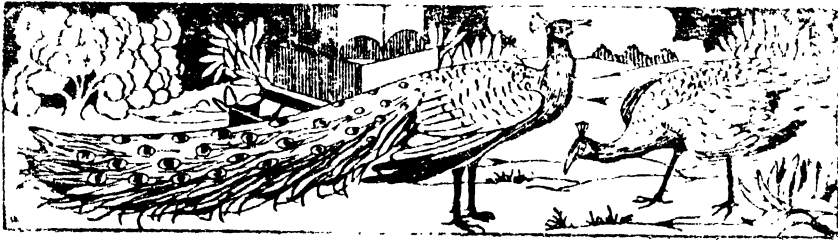
শূন্যবাদের মর্মকথা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"ওঃ। মাথার উপর এই আকাশের ভার সহ্য হচ্ছে না—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! রক্ষা করো! রক্ষা করো!"

বিভীষিকাগ্রস্ত একটি লোক—এই ভাবে আকুল ক্রন্দন করছিল।

এ কথা শুনে আপনাদের তাজ্জব লাগছে। আমারও তাজ্জব লাগে—শূন্যবাদের কথা শুনে আপনারাও যখন এমনি বিভীষিকাগ্রস্ত হন।

আসবাবপত্রে-ভরা-ঘরবাড়ি হ'তে বের হয়ে, প্রান্তরে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়ান। যার দু-চার ক্রোশের মধ্যে ঘরবাড়ী নাই—গাছপালা নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু অবারিত প্রান্তর। সামনে ধু ধু করছে মাঠ। পিছনেও তাই। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে তাকান—তরুলতা, তৃণগুল্ম শূন্য—দিকচক্রবাল। মাথার উপর সীমাহীন আকাশ।

ঐ অভিনব পরিবেশে মন আপনার শান্ত হবে—ক্লান্তি দূর হবে। নতুন শক্তি, নতুন উৎসাহে আপনি উজ্জীবিত হবেন।

দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, প্রভাতে এবং সন্ধ্যায়, প্রতিদিন অন্তত দুবার আমরা ঘরবাড়ী ছেড়ে বাইরে বিচরণ করি।

মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, জীবন উজ্জীবিত করবার জন্য—এইরূপ "শূন্যতত্ত্বে" বিচরণ করার প্রয়োজন আছে।

নানাপ্রকার চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ, সমস্ত হতে চিত্তকে মুক্ত করুন। যত প্রকার মতবাদ, স্নেহ আসক্তি, ঘৃণা বিদ্বেষ, মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। মনকে ধৌত করুন, পরিষ্কার করুন।১

দেহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিরেচকের প্রয়োজন আছে। পাকস্থলীকে ধৌত করার, পরিষ্কার করার আবশ্যক আছে। যে বিরেচক সবচেয়ে বেশি অন্তর নির্মল করতে পারে—সেই বিরেচকই শ্রেষ্ঠ বিরেচক।

মনেরও এইরূপ বিরেচকের প্রয়োজন আছে। দেহ নির্মল করার প্রয়োজন আছে, আর মন নির্মল করার প্রয়োজন নাই—এমন কথা কোন বিজ্ঞব্যক্তি বলতে পারেন?২

আমি শূন্যবাদী, মনকে নির্মল করার সাধনায় মগ্ন। শূন্যের সাহায্যেই আমি মনকে নির্মল করি। পরিষ্কার করি, পরিশুদ্ধ করি।

স্পৃহা, অস্পৃহা, প্রীতি, বিদ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শুচি, অশুচি প্রভৃতি মনোভাব হতে আত্মা, অনাত্মা, নিত্য, অনিত্য, একত্ব, বহুত্ব, শাশ্বত, উচ্ছেদ, ঈশ্বর, নিরীশ্বর ইত্যাদি মতবাদ হতে, চিত্তকে নির্মুক্ত করুন। চিত্ত শান্ত হবে, স্বীয় প্রভাস্বর, শুদ্ধ, শিবময় স্বভাবে স্থিতিলাভ করবে।

শূন্যতা নাস্তিতা আনে না, অভাব আনে না, পূর্ণতা আনে। বিভীষিকা আনে না, অভয় আনে।

যদি প্রশ্ন করেন—"শূন্যতা কোন্ পরমার্থ দান করে?" আমি তার উত্তর দিতে পারব না। যে-ভাষায় উত্তর দেবার চেষ্টা করব—মানুষের সে-ভাষা, সে-উত্তর প্রকাশ করতে পারবে না। "যে-তাপযন্ত্র মানুষের দেহের তাপ গ্রহণ করে, সে-তাপযন্ত্র সূর্যের তাপ গ্রহণে অপারগ (সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন)।"

কল্পনা বা ভাবের প্রকাশক হল শব্দ বা ভাষা। যা কল্পনা বা ভাবের অতীত, তা কেমন করে শব্দ প্রকাশ করবে? সর্বপ্রকার কল্প, বিকল্প, ভাব, ভাষা ও ভাষণ-বিহীন যে তত্ত্ব, তাকে কেমন করে ভাষায় প্রকাশ করব।৩

সুতরাং নিরুত্তরতার দ্বারাই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আমাদের পূর্বসূরিগণ নীরবতা নিরুত্তরতার দ্বারাই এর উত্তর দিয়েছেন ৪।

মনের সিংহাসনকে আবর্জনা মুক্ত কর। ধৌত কর, শুদ্ধ কর। নির্মল কর। এবং শূন্য রাখ। তুমি সেখানে কাউকে বসতে দিও না। যিনি বসবার, তিনি নিজে এসে বসবেন ৫ শূন্যতা অভাব নয়—নাস্তিতা নয় ৬।

ভগবান তথাগতের কাছে একবার বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য আগমন করেন। তথাগত তাঁদের প্রশ্ন করেন।

"ব্রহ্মা সপরিগ্রহ না অপরিগ্রহ?"

বশিষ্ঠ উত্তর দেন—"অপরিগ্রহ।"

"ব্রহ্মা বৈরচিত্ত কি অবৈরচিত্ত?"

"অবৈরচিত্ত!"

"ক্লিষ্টচিত্ত অথবা অক্লিষ্টচিত্ত?"

"অক্লিষ্টচিত্ত।"

"স্বাধীন কি পরাধীন?"

"স্বাধীন।"

"ব্রাহ্মণগণ কি অপরিগ্রহ?"

"না।"

"ব্রাহ্মণগণ কি অবৈরচিত্ত?"

"না।"

"অক্লিষ্টচিত্ত।"

"না।"

"স্বাধীন?"

"না।"

"অপরিগ্রহ, অবৈরচিত্ত, অক্লিষ্টচিত্ত, স্বাধীন ব্রহ্মার সঙ্গে, সপরিগ্রহ, বৈরচিত্ত, ক্লিষ্টচিত্ত, পরাধীন ব্রাহ্মণগণের মিলন সম্ভব কি?"

বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিলেন—"না গৌতম, তা সম্ভব নয়।"

অতঃপর তথাগত প্রশ্ন করলেন—

"ভিক্ষুগণ কি অপরিগ্রহ? ভিক্ষুগণ কি অবৈরচিত্ত, অক্লিষ্টচিত্ত এবং স্বাধীন?"

ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ।"

এঁদের সঙ্গে কি ব্রহ্মার মিলন হতে পারে?"

উত্তর হল—'হাঁ।"

—(তেবিজ্জসুত্ত, দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড)

১। "সর্বপ্রকার 'দর্শন' (মতবাদ) হতে মুক্ত করার জন্য, জিন (বুদ্ধ) গণ শূন্যতার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা আবার শূন্যতা 'দর্শনে' (মতবাদে) আসক্ত—তাঁদের কোন আশা নাই (তাঁদের রোগ অসাধ্য)।" মূলমধ্যমক, ১৩।৮; বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা, ৯ম পরিচ্ছেদ; চতুঃশতক, ১৬শ পরিচ্ছেদ,

২। "শূন্যতা হল কঠিন বিরেচকের মত। সেই বিরেচক পাকস্থলী নির্মল করে, নিজে যদি না বাইরে এসে, পাকস্থলীতেই অবস্থান করে, তবে তা উপকার না করে অপকারই করে থাকে।" মূলমধ্যমক, ১৩.৮; চতুঃশতক; ১৬শ পরিচ্ছেদ, পৃ ২৭২।

৩। বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা, নবম পরিচ্ছেদ। পৃ, ৩৬৩।

৪। "বাস্কলি বাহ্বকে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। তিনি নীরবতা ও নিরুত্তরতার দ্বারাই সেই প্রশ্নের উত্তর দেন।" বেদান্ত দর্শন, শাংকর ভাষ্য, ৩।২.১৭

"মঞ্জুশ্রী অদ্বয়তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, নানা জনে নানা বর্ণনা দিতে থাকেন। বিমলকীর্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি একেবারে নীরব থাকেন। তখন মঞ্জুশ্রী বলে উঠেন "সাধু! সাধু! আপনিই অদ্বয়তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন। অদ্বয়তত্ত্বে প্রবেশ করলে মানুষ বাক্যহারা হয়।" The Eastern Buddhist, No. 2, Vol. IV 1927.

৫। তুলনীয়; "শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশি। বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।"

রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৬৪।

৬। অভাব শব্দের যা অর্থ, শূন্যতা শব্দের সে অর্থ নয়। অভাব শব্দের অর্থ শূন্যতা শব্দের উপর আরোপ করে' আপনি অনর্থক আমাদের দোষ দিতেছেন।

"...প্রপঞ্চ নিবৃত্তিশীল শূন্যতায় নাস্তিত্ব কোথায়?"

মূলমধ্যমক, ২৪।৭।

রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস'

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্ব কম নয়। এই শতকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় নতুন রীতি ব্যবহৃত হয়। নতুন রীতি না বলে বলতে পারি ইউরোপীয়দের দাক্ষিণ্যে আমরা ইতিহাস লিখতে শিখলাম এবং ভারতবর্ষের বিরাট বিরাট প্রামাণিক ইতিহাস রচিত হল। আমরা যা পেলাম তাতে খুশী হবার কথা। কারণ, ভারতবর্ষে আগে যা ছিল, অনেকের মতে, তার শতকরা নিরানব্বই ভাগই সাহিত্য। কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী ও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থ ছাড়া তেমন কোন ইতিহাস বিশেষ করে প্রাচীন যুগের, চোখে পড়ে না। অবশ্য বিদেশীদের বিবরণ এবং সাহিত্য থেকেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু অনেক সময়েই তা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। ইংরেজদের প্রচেষ্টায় ভারতের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক ধন্য। কিন্তু ইংরেজগণ আমাদের দেশের যে ইতিহাস আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তা ত্রুটিমুক্ত নয়। এমন কি ইংরেজ-প্রবর্তিত রীতিতে আমাদের ইতিহাসের বিচার বা গবেষণা যাঁরা করেছেন তাঁরাও, আমার মনে হয়, ঠিক করেন নি। আমাদের ইতিহাসের যে যুগবিভাগ—যথা, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—ইউরোপীয় ইতিহাসের কায়দায় হলেও তা অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়। কারণ, দুইদেশের ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা পথে প্রবাহিত। যদিও দৈবাৎ দুই একটি জায়গায় দুই দেশের ইতিহাসে মিল (ঠিক মিলও নয়) দেখা যায় তথাপি ভারতবর্ষের ইতিহাসের যুগ বিভাগ—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন পর্য্যায়ে করা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নয়। তাঁর মতে ভারতের ইতিহাস হচ্ছে:

"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয় রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা। এই একেকে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্র-গৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্র গৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্র গৌরব লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সমাজ বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।"

অপরকে আপন করে নেওয়া ভারতের শাশ্বত সত্য ঘটনা। এইটাই ভারত ইতিহাসের মূল কথা। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনই ভারত ইতিহাসের মূল সূত্র।

আমাদের দেশের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে একটি প্রশ্ন ওঠে এই যে, আমাদের দেশের ইতিহাস কোন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে? এবং আমরা—যাঁরা ইতিহাস সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলতে অভ্যস্ত—তাঁরা দেশ বলতে কি বুঝেন? ইতিহাসের ধারাপথ নির্ণয় কিছুটা— সহজ সাধ্য।

এ কথা স্বীকার করা যদিও অনেকের মতে লজ্জাজনক ব্যাপার যে, 'দেশ'—এ কথাটির অর্থ আমরা অনেকেই জানি না। তথাপি দেশের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়ি। দেশ শব্দটির অর্থ সহজ নয়। "প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ যে, ইহা কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে! ইংরাজ বল, ফরাসী বল, কোন দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মর্ম স্থানটি কোথায় তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না ; তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞাও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে ; আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটতে দেয় না ; তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উদ্যম লুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ীকে জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কি করিয়া ?"

আমাদের দেশের ইতিহাস যে-ভাবে পড়ান হয় তা'তে আমরা দেশকে, ভালবাসা ত দূরের কথা, চিনতেই পারি না। আমাদের দেশের যা আছে তা দেখতে পাই না—নিজের চোখ থাকা সত্ত্বেও পরের চোখ দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হওয়ার দরুণ আমাদের দুর্দশার অন্ত নেই। ইতিহাস শিক্ষায় সাধারণের, অধিকাংশের অনীহার কারণ কি ?—এই প্রশ্নের মীমাংসায় আসা সহজসাধ্য নয়। অথবা আমরা যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র, সাধারণ মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার খবর সাধারণতঃ রাখি না, তাদের ইতিহাস শিক্ষার মূল গলদ কি এবং কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, দেশীয় ইতিহাসে অনভিজ্ঞতা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কি জিনিষ তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতে পারে না।"

একদা রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন যে, ইংরেজদের ভারতবিজয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, চিন্তাধারা ধর্ম এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। ইংরেজদের আগমনের ফলে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল বা ধর্মীয় বিবর্তন হয়েছিল সেইটিই একমাত্র ইতিহাস নয় এবং তা ইতিহাসের ছাত্রের একমাত্র ধ্রুব হলে সে, আমার মনে হয়, ঐতিহাসিকমগ্নতা থেকে বিচ্যুত হবে। ইংরেজদের এ দেশে আসার ফলে সমাজ-জীবনে এবং প্রতিটি মানুষের সাধারণ মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন এল, তাদের সুখ-দুঃখই ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের আদর্শে গড়ে ওঠে সুন্দর সমাজ। যে দেশের ইতিহাস কুৎসিত বা যে দেশের সুন্দর ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও সেই দেশের লোক ঠিক পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাদের সমাজ সাধারণতঃ আদর্শহীনভাবে গড়ে ওঠে। ইতিহাসের সাথে সমাজের সম্বন্ধ অাঙ্গিভাবে জড়িত। যদি দেশবাসী নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ হয় তবে তারা সহজেই অন্য দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি (খারাপ হলেও) দ্বারা অনায়াসে প্রভাবিত হয়।

আঁদ্রেজিদ্ সাংবাদিকতার সূত্র হিসেবে যে উক্তি করেছিলেন সে উক্তিকে আমরা ইতিহাস রচনায় একটা সূত্র হিসেবে ধরে নিতে পারি। কারণ, সাংবাদিকতার সঙ্গে ইতিহাসের যোগসম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ,—আমার তাই ধারণা। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য রামায়ণ মহাভারতকে ব্যাস-বাল্মীকির সাংবাদিকতা বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি করা হবে বলে মনে হয় না। কারণ, প্রত্যেক যুগের সাহিত্য যুগের প্রবাহিত আবহাওয়াকে অবলম্বন করে গঠিত হয়, যদি সেটি সৎ-সাহিত্য হয় তবে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রতিনিধিই উপস্থিত থাকবে।

আমরা এদেশের ইতিহাস হিসেবে রামায়ণ মহাভারতকে গ্রহণ করতে পারি। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'১ নামক প্রবন্ধে এদেশের ঐতিহাসিকগণের তথা প্রতিটি ইতিহাসের ছাত্রের গীতা পড়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের মূল অংশটুকু গীতাতে পাব। ভারতের ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে যদি বের হই তবে বিদেশীদের দ্বারস্থ হওয়ায় কোন অর্থই হয় না। আমরা গীতাতে সমস্ত কিছু পাব। তা ছাড়া ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-বিজ্ঞান ধর্মবিষয়ক বই থেকেও ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। আজও অনেকে ভারত-ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচনা কালে বিদেশী ঐতিহাসিকগণের রচনাকে প্রাধান্য দেন। তাঁদের কাছে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বেদ-বেদান্ত উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি সাধারণতঃ অলীক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। পুষ্পকরথ প্রভৃতির রহস্য অনেকের প্রচ্ছন্ন-দৃষ্টিতে অনুদ্ভাসিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন। আধুনিক বিজ্ঞানের মতই যে সে-যুগ বিজ্ঞানে উন্নত ছিল তা বুঝতে আমাদের এতটুকু অসুবিধা হয় না। বিজ্ঞানে যদি উন্নত না হয় তবে কী করে রামচন্দ্র সেতুবন্ধন করেছিলেন? এবং মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করেছিলেন? নিশ্চয় তখন কারিগরি বিদ্যার উন্নতি হয়েছিল যার ফলে রামচন্দ্র বিশাল সমুদ্রের বুকে সেতু বাঁধতে পেরেছিলেন। আর নিশ্চয় বর্তমান এরোপ্লেন জাতীয় এমন কিছু ছিল যার ফলে মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছিল। এ রকম বহু কাহিনী আছে যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-ভিত্তিক। উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা সমীচীন হবে না। যদি কোন ব্যক্তি এই মন্তব্য করেন যে, ভারতীয়গণ প্রাচীন কালে ইতিহাস চর্চায় অমনোযোগী ছিলেন—একমাত্র কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ লেখা হয়নি —তবে আমি তাঁদের সাথে একমত নই। ডক্টর স্মিথ বলেছিলেন যে, ভারতীয়গণ ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈদেশিক আক্রমণ এবং কীটপতঙ্গাদির আক্রমণের ফলে সেই সমস্ত ইতিহাস নষ্ট হয়ে গেছে। এ উক্তিও স্বীকার করতে পারলাম না। কারণ, এই উক্তির কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি সম্ভবতঃ তিনি দেন নি। আলাদা করে ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা না করলেও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয়গণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রেখে গেছেন। সুতরাং তাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চা করেছেন।

ভারত ইতিহাস জানতে হলে ভারত সংস্কৃতির সাথে পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। জীবান্ বিসর্জ্জ ভূম্যায—মহানারায়ণ উপনিষৎ-এ যে কথা বলা হয়েছে—মানুষের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছে। মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়েছে সংস্কৃতির মাধ্যমে। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি আর্য্য অনার্য্যের মিলনের ফলে গড়ে উঠেছে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলন সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেনের আলোচনাটি পাঠ করলে তৎকালীন যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। তিনি বলেছেনঃ "রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের ধারায় এই সত্যটি চমৎকার করে দেখিয়েছেন। অন্তহীন ভেদের মধ্যেও একটি অখণ্ড মহান সমন্বয়ের মহাতপস্যা ভারতের জন্য বিধাতা চিরদিন ভিতরে ভিতরে নির্দ্দেশ করে আসছেন।" আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির মিলন ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস-চর্চা বিষয়ক সংক্ষিপ্ততর আলোচনার উপসংহারে এই কথা বলব যে, আমাদের দেশের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা ত্রুটিমুক্ত নয়। ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক স্বচ্ছ এবং যুক্তিযুক্ত। এখনও আমাদের দেশের আসল ইতিহাস হয়ত আমরা জানি না।

১। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'র বৈশাখ ১৩১৯-এ প্রকাশিত এবং 'ইতিহাস' নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত।

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

October, 1920.—দিল্লী ষ্টেশনে নিজেরা নেমে এবং জিনিষপত্র নামিয়ে আমাদের প্রথম ভাবনা হল যে আমরা কি ক'রে, আমাদের যিনি নিতে আসবেন, তাঁকে চিনব। তাঁর নাম ছাড়া আর কিছু জানা নেই, তাঁকে কেউ কোনদিন চোখে দেখিনি। তবে আশা হ'ল যে ব্রাহ্মসমাজের লোক যখন, তখন বাবাকে নিশ্চয়ই চিনবেন। যাক্, ভাবনাটা বেশীক্ষণ রইল না, কারণ দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে সাহেবী পোশাক পরা একজন সুদর্শন যুবক হন্‌হনিয়ে এগিয়ে এলেন এবং বাবার পরিচয় নিয়ে বললেন, "আমি আপনাদের নিতে এসেছি।"

পথ-প্রদর্শক পেয়ে খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে আরম্ভ করলাম। দিল্লী ষ্টেশনটি এক বিরাট্ ব্যাপার। এতবড় ষ্টেশন জীবনে কখনও আর দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না। বিছানা ট্রাঙ্ক প্রভৃতি মুটের মাথায় চাপিয়ে ত ষ্টেশন থেকে বার হয়ে আসা গেল। তখন বুঝলাম, বাদশাহী দেশের বাদশাহী চাল এখনও একেবারে বিগত হয়নি। মুটে ভাড়া গাড়ীভাড়া প্রভৃতি যা শুনতে লাগলাম, তাতে ত চোখ কপালে উঠবার জোগাড়। পুরনো রাজধানীবাসীরা এই নূতন অথচ সনাতন রাজধানীবাসীদের ধারে কাছেও লাগে না। এদের কত শতাব্দীর সঞ্চিত আভিজাত্য, তুলনায় আমরা ত সেদিনকার শিশু। গাড়ী পাবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না, অর্থাৎ reasonable ভাড়ায়। আমাদের পথ-প্রদর্শক আশ্বাস দিলেন যে হোটেলটা খুব কাছেই, হেঁটে কয়েক মিনিটেই পৌঁছান যাবে। জিনিষপত্র মুটের মাথায় তুলে পদব্রজেই বেরিয়ে পড়া গেল।

"দিল্লীর পথের ধূলি পরে" পা ফেলবামাত্র সমস্ত মনটা সাড়া দিয়ে জেগে উঠল। Actually দিল্লীতে এসেছি, romance যার প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে জড়িত, যার নাম শুনলে চোখের সামনে বাদ্‌শাহ্ বেগম, আমীর ওম্‌রাহ্, রূপসী ক্রীতদাসীর ভীড় ছায়াবাজীর ছবির মত নাচতে থাকে, মনটা পুরানো আতর গুলাবের গন্ধে বিভোর হয়ে ওঠে, সেই দিল্লীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। অথচ এখানকার বাসিন্দাগুলো কি অবহেলা ভরেই চলেছে, দিল্লী তাদের কাছে কিছু নয় যেন। বাস্তবিক যেটুকু সামান্য সময়ের জন্য এখানে ছিলাম, কিরকম একটা নেশার ঘোরে দিন কাটত, আমাকে ঠিক আমি ব'লে মনে হত না। বুঝতে পারতাম না কি ক'রে এখানকার লোকগুলো দৈনিক তুচ্ছতার মধ্যে ডুবে আছে। বাস্তবিক familiarityর মত অসাধারণ অন্ধতার উৎপাদক জগতে আর কিছু নেই।

পথে পদার্পণ ক'রে প্রথমেই চোখে পড়ল রাজধানীর হরেক রকমের যানবাহনের ঘটা। শহরটি অতিকায় এবং বহুদূর বিস্তৃত। লোকসংখ্যা কিছুমাত্র কম নয় এবং লোকালয়ের ঘন সন্নিবেশ খুব বেশী জায়গায় নেই।* কাজেই যান বাহনের সংখ্যা বেশী। তবুও বোধহয় জনসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নেই। অনেক জায়গায় ট্রামের লাইন পাতা হয়েছে অথচ ট্রাম এখনও সেখানে চলে না। মোটরকার থেকে আরম্ভ করে বলদ টানা দুচাকার গাড়ী পাশাপাশি চলেছে। মেয়ে স্কুলের বলদ গাড়ীও চলেছে।

টাঙ্গায় চ'ড়ে অনেকগুলি বাঙালিনী বাচ্চা কাচ্চা পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে চলেছেন। শুনলাম সেদিন Secretariat সিমলা থেকে নেমেছে।

---

* পাঠক ভুলে যাবেন না যে এটা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগের দিল্লীর চেহারা।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখি এক cosmopolitan crowd ফুটপাথ জুড়ে শুয়ে বা ব'সে রয়েছে। তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া এক বিষম ব্যাপার। ইহুদির থেকে আরম্ভ ক'রে উড়িষ্যাবাসী পর্য্যন্ত সবই আছে। পাশ ঘেঁষে কোনমতে পার হয়ে গেলাম। হোটেলের একটি গাইড্ ইতিমধ্যে এসে জুটেছিল, সে সারাপথ বক্তৃতা করতে করতে চলল। একটা বাগানের পাশ দিয়ে গেলাম। শুনলাম তার নাম Queen's Garden. শহরটি দেখতে অনেকটাই আগ্রা বা এলাহাবাদের মত। তেমনি পুরনো সরু সরু চারতলা বাড়ী, তেমনি অপরিষ্কার, তেমনি গলিখুঁজিতে ভর্ত্তি। এদের যত বাহার মরবার পরে, বেঁচে থাকবার সময় খোঁয়াড়ের পশুর মত দিন কাটানতে কোনো আপত্তি নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই Delhi and Punjab Hotel এর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। রীতিমত রোদ উঠেছে তখন, কিন্তু হোটেলের সদর দরজা বন্ধ। আমাদের গাইড্‌টি ত ঠেলাঠেলিই সুরু ক'রে দিল। "পঞ্চম, এ-পঞ্চম, খোল্ শুণ্ডা খোল্" বলে চেঁচাতে লাগল, এবং দুম্‌দাম্ করাঘাত করতে লাগল দরজায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন পাহাড়ী ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল। জীবনে এই প্রথম হোটেলে প্রবেশ করলাম।

হোটেলটার প্রতি বেশী uncomplimentary হতে চাই না, কিন্তু যে দুদিন ওখানে ছিলাম এমন একটা acute uneasiness অনুভব করতাম যা জীবনে আর কোনো জায়গায় করিনি, এমন কি সোবাতিয়া বাগের বেড়ার ঘরেও না। অথচ খাওয়া, শোওয়া, নাওয়া, কোনটারই আয়োজন মন্দ ছিল না। Hot and cold bath দুইয়েরই ব্যবস্থা ছিল। আমরা বাঙালী, মাছ ভাত খাই শুনে এক-একজনের পাতে আধসের ক'রে মাছ রান্না ক'রে দিয়ে দিত। কিন্তু হলে হবে কি, এমন horrible lack of privacy আমি কল্পনাও করিনি। আগে জানলে দিল্লীতে হোটেল বাসের প্রস্তাবে রাজী হতাম কি না সন্দেহ। একদল পুরুষ মানুষ যদি আসত, তাহলে তাদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হত না, তবে বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণই অযোগ্য। যতক্ষণ হোটেলে থাকতাম আমার কান্না পেত। সুখের বিষয় সে যতক্ষণটা বেশীক্ষণ ছিল না। হোটেলে মাত্র একখানা ঘর পাওয়া গিয়েছিল, আর বেশী খালি ঘর ছিল না।

যাক্, সেই ঘরেই ঢুকে হাত পা ছড়িয়ে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবার চেষ্টা করা গেল। সঙ্গের ভদ্রলোক হোটেল-ওয়ালাকে যথাসম্ভব নির্দ্দেশ দিয়ে এবং বাকি দেখাশোনার ভার গাইড কাশীলালের উপর সমর্পণ করে প্রস্থান করলেন। ট্রেনের লম্বা journey এবং অনিদ্রার ফলে বড়ই upset লাগছিল। আর একবার ট্রেনে উঠবার আগে সে ভাবটা যায়নি।

হোটেলটা যে জায়গায় তাও কিছু প্রশংসা পাবার মত নয়। যেদিকে তাকাও সারি সারি তিনতলা বাড়ী, এক তলাটা invariably দোকান। ঠিক যেন কলকাতার বড় বাজারের বড়দাদা। সৌভাগ্যক্রমে বেশীক্ষণ এই অতি মধুর পরিবেশের রূপ উপভোগ ক'রে কাটাতে হল না। দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়া যে দরকার সেটা অনেক পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গিয়েছিল। স্নানাদি যতটা সম্ভব সভ্যতাসঙ্গত ভাবে করবার চেষ্টা করলাম, তাতে কতটা সফল হলাম তা বলতে পারি না। গাইড্ গাড়ী নিয়ে আসবে বলে বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ক'রে নাওয়া খাওয়া সেরে বাইরে বেরোনোর সাজ সজ্জা সারলাম। একটিমাত্র ঘর, সেটিকে ড্রেসিংরুমে পরিণত করাতে, বাবাকে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল বেশ কিছুক্ষণ।

গাড়ী এসে হাজির হ'ল, বেশ বাহারের ল্যাণ্ডো গাড়ী, তবে ভাড়া শুনলাম ১৬ টাকা। কি আর করা যায়, এসেছি যখন বেড়াব ব'লে, তখন না বেড়িয়ে ফিরে যাব না নিশ্চয়, গাড়ী ভাড়া যতই হোক। গাড়ীতে উঠলাম, আমাদের নতুন বন্ধুও এই সময় এসে উপস্থিত হলেন। কোন্ পথে যেতে হবে, কি কি জায়গা visit করতে হবে সব গাড়ীর চালক ও গাইড্ কাশীলালকে ব'লে দিলেন। বাবাকেও একটা list করে দিলেন। হঠাৎ আমরে শরীরটা কেমন যেন ক'রে উঠল। অত্যন্ত ভয় পেয়ে গাড়ী থামাতে বললাম। সকলের ত চক্ষু স্থির! গাইড্ বেচারা সেজে গুজে এসেছে, তার ত

মুখ চুন। যা হোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে, কয়েক-মিনিটের মধ্যেই সামলে নিলাম এবং আবার নেমে গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। শরীর নিয়ে হৈ হল্লা করার সুবিধা ঢের পাব, কিন্তু দিল্লী দেখার সুবিধা জীবনে আর হবে কি না সন্দেহ। শরীর যেমনই থাক, যেতে হবে। এবার গাড়ী ছাড়ল। বুকের ভিতর ভয়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল, কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়েই ব'সে রইলাম।

প্রথমে শহর অতিক্রম করতেই লাগল কিছুক্ষণ। পুরনো শহরটি দেখতে কিছু ভাল নয়। খুব সম্ভব আজমীর গেট দিয়ে পুরাতন দিল্লী পরিত্যাগ ক'রে চলতে লাগলাম। একটুক্ষণ পরে সামনে বিচিত্র আকারের কতকগুলি construction দেখলাম। সেগুলি যে কি হতে পারে সবে ভাবতে আরম্ভ করেছি এমন সময় গাড়ীখানা থেমে গেল। শুনলাম, জয়সিংহের মানমন্দিরে এসেছি, এদেশী ভাষায় যাকে বলে "যন্তর্ মন্তর্"। গাড়ী থেকে নামতে পা কাঁপছিল, তবু জোর ক'রেই নামলাম। রোদে তখন কাঠ ফাটছে। ছাতা মাথায় দিয়ে যত রাজ্যের sundial, moondial প্রভৃতি যত বিচিত্র নক্সাকাটা ইঁটে গাঁথা পাঁজি পুঁথি দেখে বেড়াতে লাগলাম। সেখানকার গাইড্-গুলি একেই নিজেদের বিদ্যে দেখাতে মহাব্যস্ত, তার উপর মা তাদের প্রশ্ন ক'রে ক'রে আরো উৎসাহী ক'রে তুললেন। জিনিষগুলি interesting বটে, কিন্তু আমার দেখতে ভাল লাগল না, শরীর ভাল ছিল না ব'লেই বোধ হয়। তা ছাড়া astronomy র ত ধারও ধারি না, ও সবের বুঝবই বা কি? অল্পক্ষণের মধ্যেই মানমন্দির দেখা শেষ ক'রে আবার গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। যেখান দিয়ে চললাম খুব সম্ভব সেটা "রায়সিনা", যেখানে আজ-কাল সেক্রেটারিয়েটের বাবুদের বাসা। শাদা শাদা নীচু নীচু ব্যারাক্ বাড়ীর মত বাড়ীতে রাস্তার দুধার ভ'রে উঠেছে। দেখলে ভেবেই পাওয়া যায় না ওখানে মানুষে থাকে কি ক'রে। অথচ অধিবাসিনীদের কাছে শুনেছিলাম যে বাড়ীগুলি comfortable বটে। কত নূতন রাস্তা নূতন পাড়া গ'ড়ে উঠছে, সরকার বাহাদুর পুরাতন দিল্লীর বিশেষ ভক্ত নয়, সবই নূতন ক'রে গড়ছেন। একটা রাস্তার নাম দেখলাম Dupleix Road, মৈত্রীর নমুনা। এ ধারটা বেশ ঝকঝকে well kept; স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ বেশ বোঝা যায়।

এরপর সফ্দর জঙ্গের সমাধিতে নামালাম। গেটের সামনে এক turn pike কলকাতার চিড়িয়াখানার মত। এই জিনিষগুলিকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। নিজের দেহখানি নিয়ে ঢুকতে অসুবিধা হবে এই ভয়েই বোধহয়। কার্য্যত অসুবিধা হয় না অবশ্য। ঢুকেই গেলাম। মুসলমানরা কোনো জিনিষ ছোট খাট করায় বিশ্বাস করে না। গেট হবে ত একখানা ইমারত বানিয়ে ফেলল তার জন্যে। আবার শুধু একটা করে রক্ষে নেই, symmetry রাখবার জন্য চার কোণে চারটা ঠিক সেই রকম বানাতে হল। যা করবে তা চুটিয়ে করবে, যা তা করতে রাজী নয়।

সফ্দর জঙ্গ কে ছিলেন তা ত মোটেই ঠিক জানি না। কেউ বলে এক, কেউ বলে আর এক। যাই হোক, তাতে তাঁর সমাধি দেখতে আটকাল না। গেটের মধ্যে বোলতার আধিপত্য বড় বেশী। সফ্দর জঙ্গের স্মৃতিকে অমন বেদনাময় করে রাখার ইচ্ছা ছিল না, ছুটে তাড়াতাড়ি গেট পার হয়ে গেলাম। গেট থেকে আরম্ভ করে প্রায় সমাধি সৌধ অবধি টানা এক জলপ্রণালী দেখা গেল। বেচারা এখন শুষ্ক শ্রীহীন। জলে যখন ভরে থাকত আর আশে পাশের বাগানগুলো যখন সত্যিকারেরই বাগান ছিল, তখন চেহারা বোধহয় খুব সুন্দরই ছিল। ঘুরে ফিরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চারিদিক্ ত দেখা গেল। সৌধটি যে সুন্দর খুব তা নয় অবশ্য, দিল্লীর standardএ; অন্য জায়গায় হলে সারাদিন তার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতেও আপত্তি ছিল না। Detailsএ সব মনে করতে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছু মনে পড়ছে না। এমন করে গোগ্রাসে দিল্লীর সব দৃশ্য চোখ দিয়ে গিলেছি যে মনের মধ্যে সব পিণ্ডি পাকিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। আলাদা ক'রে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলে এখন কোনটার মুণ্ডু কোনটার ঘাড়ে উঠে বসে তার ঠিকানা নেই। তখনি তখনি লিখে রাখলে এ দশা হয় না। আমাদের গাইড্ কাশীলালও আমাদের সঙ্গে উপরে উঠেছিল। সেখান থেকে সে কুতব মিনার, পুরানি কিলা প্রভৃতি অনেক কিছু point out করল। আমরা যে ঐতিহাসিক জ্ঞানে

অনেকখানিই অগ্রসর, এ ব্যাপারটা সে বড়ই resent করছিল। আমরা যেন বড়ই অনধিকার চর্চ্চা করছি। যে সব কথা অঙ্গভঙ্গি সহকারে বলে আমাদের তাক লাগিয়ে দেবার কথা তার, তা কেন আমরা আগে ভাগে জেনে বসে থাকব? শেষ অবধি কিন্তু সে হাল ছাড়েনি, জানি বা নাই জানি, সে গায়ের জোরে তার যা বলবার তা বলে গিয়েছে।

সেখান থেকে ত বেরোলাম। মাঝখানে কোথায় যেন আর একটা গেট অতিক্রম করলাম। নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এটি হচ্ছে সেই বিখ্যাত "খুনি দরওয়াজা" যার উপর বসে বিজয়ী নাদির শাহ্ দিল্লীবাসীদের হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এর দুপাশের নালা দিয়ে রক্তস্রোত জলস্রোতের মত বয়ে গিয়েছিল। আজ কোথায় সে দর্পিত মদোন্মত্ত নাদির শাহ্ কোথায় বা তার বিজয়ী পারসিক সৈন্য, আর কোথায় বা ভয়কাতর দিল্লী নাগরিকের দল? ইঁট পাথরগুলো কেবল অচল হয়ে পড়ে আছে।

এবার কুতব মিনারের পথ ধরে চলতে লাগলাম। কোথায় ঠিক মনে পড়ছে না, দেখলাম, নূতন লাটভবন তৈরি হচ্ছে। লাল sand stone দিয়ে ঠিক পুরনো দুর্গের ধাঁচে। ভিতরে যে ভাবই থাক, বাইরে দেশবাসীর মতের সঙ্গে তাঁদের যে মিল আছে, সেটাই দেখাতে চান কর্ত্তারা।

এইবার দিল্লীর যে রূপ দেখলাম, সেটা কখনও ভুলব না। মাঠের পর মাঠ, আর তার মধ্যে ছড়ান ভাঙা সমাধি, ভাঙা মস্‌জিদ আর ভাঙা প্রাসাদ। লোক নেই, জন নেই, চারিদিক হাঁ হাঁ, খাঁ খাঁ করছে। মানবসভ্যতার এই শ্মশান-ভূমির দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা যেন শুকিয়ে আসতে লাগল। কি তুচ্ছ জীব আমরা, কতক্ষণের জন্যেই বা এই পৃথিবীর মাটিতে খেলা করতে আসি? তারপর আমাদের বাকি থাকে কি? ধূলো ছাড়া আর কিছু না।

হু হু করে বাতাস বইছিল, রাশ রাশ ধূলো তার তাড়ায় একবার এদিকে ছুটে চলেছে, একবার ওদিকে। এরই মধ্যে সকলে মিশে আছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, বাদশাহ্ আর ফকির। এই শেষ আশ্রয় আমাদের সকলের, এই ধূলি-জননীর কোল।

মহাশ্মশান বলতে যে কি বোঝায়, তা এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীগুলির মূর্ত্তি দেখে বুঝলাম। কত বিচিত্র সভ্যতার ধারা এই মহামরুর মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কত পার্থিব প্রতাপ এইখানে সমাধি লাভ করেছে। মহাভারতের যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি কত রাজ্য এখানে উঠেছে আর পড়েছে।

সকলে কেনই বা এই ill omened জায়গাটা বেছে নিত? এই তৃণশূন্য তৃষাদীর্ণ মহাপ্রান্তরের দিকে একবার চাইলেই যে পার্থিব যশের আশা-আকাঙ্খা আকাশ-কুসুমের মত শূন্যে মিলিয়ে যায়। এতখানি উন্মুক্ত জায়গা পাবার লোভটাই কি এতবড় লোভ ছিল?

কত মাঠ ঘাট যে পার হলাম। দিল্লীর থেকে কুতব্ মিনার ১১।১২ মাইল ত হবেই নিশ্চয়। সারাপথ সেই একই রূপ। শ্মশানের পর শ্মশান। কারো নাম জানি না, ধাম জানি না, তাদের শেষ পাড়ির চিহ্ন কেবল চারদিকে। শেলীর কবিতা Ozymandiasএর একটা লাইন ক্রমাগত মনে পড়ছিল,

"Ozymandias am I, king of kings
Look here ye mighty and despair."

Despairএর ভাব যথেষ্টই মনে আসে বটে, তবে Ozymandias যে কারণে despair করতে বলেছিলেন, সে কারণে নয়।

শুনি এইখানে পৃথ্বীরাজের কাটা হ্রদ, সৈয়দ বাদশাহদের সমাধি প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। দেখছিলাম হয়ত, কিন্তু চিনিয়ে কেউ দেয়নি। ওখান থেকে ফিরে এসে দিল্লী সম্বন্ধে অনেক বই hunt up করে, লম্বা list দেখলাম। তখন দুঃখ হল, এসবগুলো কেন ভাল করে খুঁটিয়ে দেখিনি। এখন মনে হয়, দুটো ভাঙা বাড়ী কম বা বেশী দেখলাম তাতে এসে যায় কি? দিল্লীর আসল spirit-কে দেখে-ছিলাম, এই ঢের।

অবশেষে দীর্ঘপথের অবসান হল। চারিদিকে সব অভ্রভেদী ভগ্ন প্রাচীর আর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। মাঝখানে দৃপ্তগর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে কুতব্ মিনার দাঁড়িয়ে। মিনারের কাছাকাছি এসে গাড়ী থেকে নেমে পড়া গেল।

ঘোড়াগুলো একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এই দারুণ রোদে এতপথ ছুটে এসেছে। চারিদিকে গাছের অভাব নেই, তারই ছায়ায় গাড়োয়ান গাড়ী নিয়ে রাখল। কাছে কোথায় এক দেবী মন্দির আছে, তার কল্যাণে সামনেই দেখলাম এক জলছত্র। অনেকক্ষণ ধরে মানুষ এবং পশু সকলেরই জল পান চলল। রাস্তার এক ধারে, ছোট খোলার চালের ঘরে এই জলছত্র, আর এক দিকে কুতব্।

রাস্তা দিয়ে সারি সারি মেয়ে চলেছে কাঁচুলি আর ঘাঘ্রা পরা, দিব্য রাণীর মত দৃপ্ত চলার ভঙ্গি, গড়ন বেশ আঁট সাঁট নিটোল। সবগুলিই যে তরুণী তাও নয়, কিন্তু বাঙালী মেয়ের মত কুড়ি পেরোলেই বুড়ি হয়ে যায় না এরা। Outdoor life এর গুণ আর কি। মেয়েগুলি সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের নয়, পোশাক দেখে যতদূর বুঝলাম, রাজপুত হতে পারে। এদিক্‌কার আঁটা চুড়িদার পায়জামা আর কামিজ আমার চোখে একেবারে বিশ্রী লাগে। মেয়ে বলে যেন মনেই হয় না।

কুতবের কথা মনে হলে কেবল রাশি রাশি লাল পাথরের ভগ্নস্তূপ আর তার উপর সবুজলতার নিবিড় আবরণ, এই সবার আগে মনে পড়ে। প্রকাণ্ড উঁচু দেওয়াল, চারধার দিয়ে বেশীর ভাগ ভেঙে পড়েছে, মাঝে মাঝে খাড়া হয়ে আছে। একটি সাহেব মিনারের ছবি তুলছিল, তাকে কাজ সেরে নেবার অবকাশ দিয়ে তবে ভিতরে ঢুকলাম। এমন আশ্চর্য্য সুন্দর ruins আর কখনও দেখিনি আমি।

পূর্ব্বকালে যেখানে পাঠান বাদশাহ্‌দের জুম্মা মসজিদ ছিল, তারি ভাঙাচোরা অবশেষের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রকাণ্ড এক সিংহদ্বার সামনেই, তার উপরে সিংহ বসিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হয় না যে সেটা সিংহদ্বার। বাইরের দিকে একটা courtyardএর মত জায়গায় অসংখ্য স্তম্ভ শীষ আর স্তম্ভের খণ্ড ছড়ান। ভিতরের দালানগুলি ঠিক আছে, যদিও আসল মসজিদটি ভেঙে গেছে। দালানের আগাগোড়াই যে হিন্দুমন্দির থেকে চুরি তা এক নজরেই ধরা পড়ে। কি সুন্দর সব কারুকার্য্য, তবে মুশকিল এই যে অনেক জায়গা থেকে অপহৃত স্থাপত্য সম্পদ, তাঁরা এনে একজায়গায় কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন, কাজেই সব জড়িয়ে effect টা একটু অদ্ভুত হয়েছে। দালানটির মাঝখানে সেই বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ, খুব সম্ভব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের। তার inscriptionটা আধুনিক অক্ষরে এবং ভাষায় অনুবাদিত হয়ে এক জায়গায় টাঙান রয়েছে। আমাদের গাইড এতক্ষণে খানিকটা reconciled হয়েছিল, আমাদের সব কিছু নিজেরা পড়ে নেওয়াটা সহ্য করে যাচ্ছিল। যদিও নিজে আর একবার সব কিছু বলে নেওয়ার লোভটা ত্যাগ করতে পারছিল না। লোহার স্তম্ভটি এখনও ঝক্‌ঝক্ করছে, এত শতাব্দীর রোদ জল তাকে কাবু করতে পারেনি। সেখান থেকে একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে খানিকটা নেমে এবং আবার খানিকটা উঠে আসল কুতব্ মিনারের সামনে হাজির হলাম। অভ্রভেদী বলতে যা বোঝায় এটি ঠিক তাই। নীচে দাঁড়িয়ে মাথা উল্টিয়ে প্রায় পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে ফেললেও মিনারের চূড়াটা দেখা যায় না।

মিনারের খানিকটা ডান দিকে বিরাট্ "বুলন্দ দরওয়াজা।" তার সাঙ্গোপাঙ্গ কোথায় খ'সে পড়েছে, সে-ই কেবল একলা দাঁড়িয়ে আছে। এক প.। দিয়ে খানিক দূর অবধি একটা polystyle চ'লে গিয়েছে। বিরাট্ এক মাঠের মধ্যে একটা বিশাল দরজা শুধু দাঁড়িয়ে। প্রবেশ পথ ত রয়েছে কিন্তু প্রবেশ করব কিসের মধ্যে? বিধাতার sense of humour-এর এই সব জায়গায় বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কুতবের সামনে খানিক দূরে আর একটা স্তম্ভ, একতলা অবধি গাঁথা হয়ে অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। এখানের গাইড্ জাতীয় জীবদের version যে ওটাই আসলে কুতবুদ্দিন গাঁথতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ ক'রে যেতে পারেননি। যেটি কুতব্ মিনার বলে চলে সেটি নাকি রায় পিথোরা তাঁর কন্যার যমুনা দর্শনের জন্যে তৈরী করিয়েছিলেন। কিন্তু মিনারটির শক্ত অবস্থা এবং স্থাপত্যের ছাঁদ দেখে সেটিকে মুসলমানী আমলের তৈরী ব'লেই মনে হয়। এটাও লাল পাথরে গাঁথা, প্রতি তলায় বিচিত্র কারুকার্য্যমণ্ডিত ঝোলান, ঘোরান বারান্দা। সব জড়িয়ে খুব সম্ভব সাতটি তলা এখন দাঁড়িয়ে আছে। অষ্টম

তলাটি কাঠের তৈরী ছিল। একবার মিনারের উপর বাজ পড়ায়, সেটি ভেঙে নীচে পড়ে যায়, এখনও নীচেই রক্ষিত আছে। কত কালের পুরনো, অথচ লাল পাথরের রং এমন টাট্‌কা দেখায়, যেন কে সবে তুলি দিয়ে রং করেছে।

নীচে দাঁড়িয়ে একটু ভেবে দেখলাম উপরে উঠব কি না। গাইড্ কাশীলাল ত খুব উৎসাহ দিতে লাগল, আমরাও উঠতে রাজী। ভাবলাম ওঠাই যাক না, না পারি খানিক-দূর গিয়ে ব'সে নেওয়া যাবে একবার। উঠতে আরম্ভ করলাম। ভেবেছিলাম ভিতরটা অন্ধকার হবে বোধ হয়, তাজমহলের minaretগুলোর মত, কিন্তু কাজে দেখলাম তা মোটেই নয়, আলো আসার পথ বেশ ভালই আছে। খানিক ক'রে উঠি আর জানলার seat এ ব'সে পড়ি। জানলা, বারান্দা ও ফোকরেরও সংখ্যা নেই। ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সকলেই ছাড়াছাড়ি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। কাশীলাল যে কোথায় উবে গেল তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক তলার বারান্দায় বেরিয়ে চারিদিক্‌টা দেখে নিচ্ছিলাম। যতই উপরে উঠতে লাগলাম, মাঠের পর মাঠ, তাদের ধূসর অঞ্চল চোখের সামনে বিছিয়ে দিতে লাগল। শেষের দিকে সিঁড়ি আর বারান্দা এত সরু হয়ে এল, যে পাশাপাশি দুজন লোকের দাঁড়াবারও জায়গা রইল না। হাওয়ার বেগ এমন প্রবল হয়ে উঠল যে ছাতা নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়িতেও ভরসা হল না। উঠতেই লাগলাম, ক্লান্ত লাগছিল কি না তা ভাবতেও ভুলে গিয়েছিলাম। সবাই পিছিয়ে পড়েছে, আমিই শুধু উঠে চলেছি।

অবশেষে একেবারে শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালাম। দেখি গাইড্ কাশীলাল নিশ্চিন্ত মনে উপরে উঠে ব'সে আছে। আমাকে দেখে পরম আপ্যায়নের হাসি হেসে বলল, "আইয়ে মায়ি।" যাহোক ঐ দারুণ রোদে তার কাছে যাবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিলনা। যেখানে ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলাম চারিদিক্। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেও তীব্র রোদ, কিন্তু এমন প্রলয় ঝড়ের মত হাওয়া গর্জাচ্ছে যে রোদের কথা ভুলেই যেতে হয়। কাপড় চোপড় সামলে দাঁড়িয়ে থাকাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মিনারের উপর থেকে তাকালে মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী যেন চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নীল আকাশ কেমন করে নেমে এসে ধরিত্রীকে আলিঙ্গনে করে তা এতদিন বইয়ে পড়তাম, চোখে দেখিনি, বড়জোর একটুকরো দেখছি। হঠাৎ যেন একটা পরদা উঠে গেল রঙ্গমঞ্চে। আকাশের domeটা পুরো দেখা যাচ্ছে, কোথাও আড়াল নেই। উপমাটা সুন্দর নয় কিন্তু ঠিক মনে হচ্ছিল একটা পানের ডিবের খোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, নীল ঢাকনাটা উপর থেকে ক্রমে নেমে আসছে। মাঠের কি উদার বিস্তৃতি, তার শেষ ত কোথাও দেখতে পেলাম না। একেবারে শ্যামলতা-হীন ধূসর, কোন একটা জায়গায় গিয়ে আকাশের নীলিমায় মিশে গিয়েছে। অতবড় বিরাট্ শহর দিল্লীকে এখান থেকে কি অদ্ভুতই না দেখায়। শহর, ridge, মাঠ ঘাট, সাহেব-পাড়া সব নিয়ে যেন একমুঠো মাত্র। পাখীর বাসার মত এক ঝাড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ধূসর দিগন্তব্যাপী মাঠগুলোর কাছে তারা নিতান্তই নগণ্য। একদিকে সরু একগাছি রূপোর সুতোর মত যমুনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

গাইড্ দেখিয়ে দিল, ঐ পৃথ্বীরাজের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। চেয়ে দেখলাম, খানিকটা জায়গা জুড়ে কতকগুলো মাটির ঢিপি পড়ে আছে, আর কিছু না। অনেক দূরে দেখিয়ে দিল ইন্দ্রপ্রস্থের site।

নেমে এলাম। এধার ওধার ঘুরে কতগুলো কবর আর মস্‌জিদ দেখলাম, তাদের নামধামও শুনলাম, বানানো কি সত্যি জানি না। আরও অনেক আছে শুনলাম, কত দাস রাজা, খিল্‌জি রাজার সমাধি। কিন্তু দেখতে যেতে আর ইচ্ছে করল না। যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই এই প্রাচীন নগরীর স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ ছেড়ে চললাম। গাড়ীটা জুততে একটু দেরী হ'ল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ততক্ষণ আর এক পালা জল খাওয়া গেল। গাড়ীতে উঠে একবার কুতব মিনারের দিকে চেয়ে দেখলাম, জীবনে আর হয়ত দেখা হবে না।

ফেরার পথেও সেই একই desolation মাইলের পর মাইল। এখানে লোকালয় অল্প আছে অনেক দূরে দূরে। কিন্তু এখানে মানুষ থাকে কি করে? মানুষের সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য, আশা ভরসা সব কিছুর এমন পরিণতি চোখে দেখার পর, আবার কি ক'রে তারা ভাত ডাল রেঁধে খায়, নিজেদের

ছোট খাট ভালবাসা, ঝগড়া, বিবাদ নিয়ে দিন কাটায় ?

কুতব মিনার ছাড়িয়ে বেশ কয়েক মাইল চ'লে এসে গাড়ীটা এক জায়গায় দাঁড়াল। বাইরে থেকে শ্যাওলায় মলিন দু-একটা গুম্বজ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। কালী লাল বলল সেটা বিখ্যাত মুসলমান পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি-ক্ষেত্র, এটা মুসলমানদের একটা বড় তীর্থস্থল। নিজামুদ্দিন বাদশাহদের পারিবারিক গুরু ছিলেন বোধ হয়, কারণ রাজবংশের অনেকেই এখানে শেষ শয্যা বিছিয়েছেন। এক হাঁটু ধুলো অতিক্রম করে ত তীর্থের দরজায় পৌছলাম। কালীলাল দুঃখিতভাবে বল্ল যে এখানকার লোকেরা বাইরের গাইডকে কিছু বলতে দেয় না, নিজেরাই বলে। তা ভিতরে ঢুকবার আগে সে যথাসম্ভব বক্তৃতা করে নিজের বিদ্যা জাহির করে নিল। জুতো খুলে রেখে ত ঢোকা গেল। দিব্য ফিটফাট একটি যুবক সঙ্গে চলল। এমনি তার style যে তাকে professional guide মনেই হচ্ছিল না। যেন কোন নবাবের বংশধর।

প্রথমে একটি সিঁড়িওয়ালা কুঁয়ো বা বাউলি দেখলাম। জল একেবারে সবুজ হয়ে গেছে, শুনলাম এই জলের রোগ আরোগ্য করবার গুণ আছে। অনেকগুলি পঞ্চনদবাসিনীকে দেখলাম, ছেলে পিলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঐ জলে স্নান করছেন। ভয় করতে লাগল রোগ সারার বদলে রোগ কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন।

তারপর লম্বা সুড়ঙ্গের মত চারদিক্ চাপা বারান্দা দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করা গেল। চলেছি ত চলেইছি, অনেকক্ষণ পরে আবার দিনের আলোয় বেরিয়ে এলাম। জায়গাটা একটা রাজবংশীয় কবরস্থানের রূপ ধরেছে। পথ-প্রদর্শকটি হুড়মুড় ক'রে নাম বলে যেতে লাগল, এই last emperor, এই তাঁর ভাই প্রিন্স্ জাহাঙ্গীর, এই দ্বিতীয় আকবর ইত্যাদি। একটি করে ছোট উঠোনের মত, তার মধ্যে মার্বেল পাথরের গায়ে আলপনা কাটার মত কাজ করা দেওয়াল, তাতে কপাট বসিয়ে এক-একজন নিজের চির-বিশ্রামের ঘর আলাদা ক'রে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে এক-একটি ঘেরার মধ্যে দু-তিন জন ক'রে রয়েছে, স্বামী, স্ত্রী, বা দুই ভাই, ভাই বোন এইরকম। পাথরের গায়ের রং এখনও ফেনার মত শাদা, কারুকার্য্য দিব্য নূতনের মত রয়েছে। বিখ্যাত কবি আমীর খসরুর সমাধিটিকে খুব বাহারের সাজে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ধব্ধবে বিছানা পাতা, তার উপর রাশ রাশ ফুল ঢালা রয়েছে, চারদিক্ আতরের গন্ধে ভুরভুর করছে! ঝোলান সোনার বাতি, উট পাখীর ডিমের খোলার কারুকার্য্য, mother of pearl দিয়ে mosaic করা মেঝে। স্বয়ং নিজামুদ্দিনের সমাধিটিও এইরকম ক'রে সাজান। ঢুকেই চমকে উঠতে হয়, মনে হয় এ কি সমাধি না আর কিছু? ঐ দুটিতে রাজ্যের মুসলমান পাণ্ডা বেশ ব্যবসা খুলে বসেছে, প্রচুর পয়সা লুটছে। ঢুকবামাত্র চিলের মত ছোঁ মেরে এসে ধরে এবং বেশ কিছু না খসিয়ে কিছুতেই ছাড়ে না। এদের উৎপাতে আর রাজসিক আড়ম্বরের ঘটায় সমাধি মন্দিরের গাম্ভীর্য্য আর সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। এই সমাধি ক্ষেত্রে একটি জায়গা ভারি ভাল লাগল। সম্রাট শাহ জাহানের মেয়ে জাহানআরা বেগমের সমাধি। চারিদিকে শাদা পাথরের জালিকাটা পর্দ্দা টানা, মাঝে তাঁর কবর, শ্বেত পাথরের তৈরি, উপরে শুকনো ঘাসের আবরণ। তিনি সবুজ ঘাসকেই নিজের সমাধির যোগ্য আবরণ বলে গিয়েছিলেন। কবরের উপর ফারসীতে লেখা দু লাইন কবিতা। দিল্লী দেখবার বহু আগে থেকেই ঐ কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—

"বহুমূল্য পুষ্পদামে করিও না সুসজ্জিত সমাধি আমার,
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন আত্মা জাহানারা সম্রাট কন্যার।"

অনুবাদটি কার তা আর এখন মনে নেই। কিন্তু এখানের হতভাগা লোকগুলো সারাদিন ব্যস্ত থাকে যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা লুটবার জন্যে, এইখানে দুঘটি জল দিয়ে ঘাসগুলিকে একটু তাজা করে রাখবার কথা তাদের মনেও হয় না।

এই বিরাট্ compound এর্ মধ্যে কত যে সমাধি, তা গুনে রাখতে পারলাম না, সকলেই প্রায় রাজবংশীয়। একটি মস্জিদ দেখলাম, তারও ছাদ থেকে একটি ঝোলান আলো, সোনার তৈরি। কতগুলি উপাসক তখন সেখানে নমাজ পড়ছিল। অতঃপর ফিরে চললাম। অনেক বক্তৃতা শুনতে শুনতে এবং অনেক উঠোন, অনেক অন্ধকার গলি পার হয়ে এসে আবার সেই বাউলির ধার দিয়ে গিয়ে সদর দরজায়

পৌঁছলাম। Aristocratic guideটি এবার পয়সার দাবি করলেন, পেলেন কিছু বোধহয়। জুতো পরে আবার গাড়ীতে উঠলাম গিয়ে।

এরপর হুমায়ুন বাদশাহের কবর দেখতে গেলাম। বেশ সযত্নে রক্ষিত জায়গাটি। চারিদিকে বাগান, চারকোণে মস্ত বড় বড় লাল পাথরের সিংহদ্বার। ভিতরটি ঠিক তাজমহলের ছাঁদে তৈরি। তেমনি প্রবেশদ্বার থেকে সুরু করে সমাধি সৌধের সিঁড়ি অবধি প্রায় ফোয়ারা আর জল প্রণালী চলে গিয়েছে, তার দুধার দিয়ে ফুলগাছের border. তাজমহলের সঙ্গে তফাৎ এই যে তাজ অমলধবল মূর্ত্তি, আর এটি ভোরের পূর্ব্বাকাশের মত অরুণবরণ। কারুকার্য্যের ঘটা কমই, কিন্তু এমন এর অতুলনীয় গঠনপারিপাট্য যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সৌধটি আকারে বিরাট্। দোতলার ছাদটি এত বড় যে ছোটখাট একটা মাঠের সমান। হুমায়ুন ছাড়াও তাঁর পরিবারের আরও অনেকের কবর এখানে। স্ত্রী পুত্র ভাই বোন মা প্রভৃতি একান্ত আত্মীয় ছাড়াও প্রিয় ভৃত্য, নাপিত, বেগমের চুড়িওয়ালী প্রভৃতি অনেকেই মরণের পরেও বাদশাহের আশ্রয়েই বিশ্রাম করছে। অনেক সিঁড়ি ওঠানামা করে অনেক ঘরে ঘরে ঘুরলাম, একতলায় আসল কবর যেখানে, সেখানেও গেলাম। Simplicity আর grandeur মিলে জায়গাটিকে অপূর্ব্ব করে তুলেছে। চারিদিকের সবুজ আবেষ্টনের মধ্যে এই বিরাট্ রক্তবর্ণ প্রাসাদ মনে ভারি একটা সুষমার ছবি এঁকে দেয়।

লঘুগুরু ছন্দ ও প্রসঙ্গতঃ*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ওঁ

১১ আশ্বিন ১৩৭৩ হরিকৃষ্ণমন্দির

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন পুনা-১৬

পরম প্রীতিশ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার ২৮এ ভাদ্র-র চিঠিটি পড়ে উৎফুল্ল হলেও মনের খট্‌কা সম্পূর্ণ ঘোচে নি: আমি কি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম, না এখন নতুন করে ভুল বুঝছি? আপনার সঙ্গে আজ ত্রিশ বৎসরব্যাপী পত্রালাপ, কই কোন পত্রেই ত আপনি লঘুগুরু ছন্দের স্বপক্ষে একটি কথাও বলেছিলেন বলে মনে পড়ছে না! আপনার সে-পত্রগুলি হারিয়ে না গেলে হয়ত দপ্তর খুঁজে প্রমাণ দাখিল করতে পারতাম আমার এই ধারণাটির স্বপক্ষে যে, আপনি—যে-কারণেই হোক—লঘুগুরু ছন্দকে নেকনজরে দেখতে পারেন নি। যারা আমার সংশয়কে সাব্যস্ত করতে পারত সে-নজিরগুলি হাতের কাছে নেই, সেহেতু আপনাকেই benefit of the doubt দিতে হবে। (আইন না মানলে চলে)? বলতেই হবে যে, আপনাকে আমি এযাত্রা যদি ঠিক বুঝতে পেরে থাকি তাহলে আপনাকে লঘুগুরু ছন্দের বেদরদী ক্রিটিক তথ্‌মা দিয়ে (আপনার ভাষায়) আসামী দাঁড় করানোটা অনুচিত হবে। তবু মন খুঁৎ খুঁৎ করে আরো একটি কারণে: আপনার সুযোগ্য ছন্দশিষ্য ডাক্তার শ্রীনীলরতন সেন আমাকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি পত্রে সেদিন-ও লিখেছিলেন যে, আমার লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা কয়েকটি সদ্যোজাত গান প'ড়েই আপনি শুষ্ক সুরেই বলেছিলেন যে, লঘুগুরু ছন্দ সম্বন্ধে আপনার মত পরিবর্তন করার প্রশ্নই ওঠে না। নীলরতনের মুখে আপনার এ শুষ্ক মন্তব্য শুনে এ সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু গানটিকেও ছন্দের দিক দিয়ে অচল মনে করে-ছিলেন:

"এসো গগনগঙ্গা খরতরঙ্গা ছন্দ সুন্দর গানে
মাগো, মূর্ছনে তব উচ্ছলিয়া নব রাগমালা তানে।"
...ইত্যাদি

মরুকগে। দূরে থেকে পত্রালাপে যে অনেক সময়ে ভুল ধারণা জমে ওঠে এসত্য আমার অগোচর নেই। তাই আমি আপনার এপত্রটি মূল্যবান বলে গণ্য করব আপনার সুচিন্তিত মতামতের অন্তিম—কিনা ফাইনাল—রায় রূপে। যথা, যখন আপনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের

"নীল সিন্ধু জল-ধৌত চরণতল
অনিলবিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল

ইত্যাদি রচনায় যে-উদাত্ত গাম্ভীর্য ধ্বনিত হয়েছে অন্য কোন ছন্দে কি সে-গাম্ভীর্যের একাংশও আনা যেত?" বা দ্বিজেন্দ্রলালের পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে স্তবগানটির দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করে সোচ্ছ্বাসেই লিখেছেন —এ থেকে "বোঝা যাচ্ছে জয়দেব আজও বেঁচেই আছেন। তিনি চিরজীবী হোন। আমি তাঁর জয়ধ্বনি করি।"

ব্যাসদেব মহাভারতে এত্তালা দিয়েছেন যে, অর্জুনের গাণ্ডীবের প্রসাদে কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গনেও গঙ্গা উচ্ছলিত হয়েছিলেন ভীষ্মের তৃষ্ণা মেটাতে। মাদৃশ অকিঞ্চন রুদ্যমান গাণ্ডীব সে-মহাবর না পাওয়া সত্ত্বেও আমার হাহাকারী তীরন্দাজিতে যে আপনার ছান্দসিক মর্মকোষ থেকে এমন প্রচ্ছন্ন "লঘুগুরু" প্রশস্তির গাঙ্গবারি উৎসারিত হল এ অভিজ্ঞান আমার ধূসর বার্ধক্যে একটি রঙিন সম্পদ হয়েই বিরাজ করবে স্মৃতির মণিকোঠায়। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাংলা লঘুগুরু ছন্দ সম্বন্ধে আপনার এ-আনন্দোচ্ছ্বাস অপ্রকাশই থেকে যেত—অন্তঃসলিলা গাঙ্গধারার মতন—যদি না হঠাৎ আমার প্রতি সদয় হয়ে আপনি বাংলা ছন্দরসিকদের এ প্রশান্ত প্রসাদ বিতরণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে আমি ছন্দসম্বন্ধে আপনার প্রশস্তির সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে থাকি একথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তাই আসুন, হাত মেলানো যাক। কারণ এপত্রে আপনি যা লিখেছেন তাতে আশ্বস্ত হওয়া চলে বৈকি। কেবল আপনার একটি নামকরণে আমার আপত্তি আছে। আপত্তি জানানোর সূত্রে অনেক কিছু বলার সুযোগ

পার — বিশেষ করে পত্রালাপে সেসব কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে, তাই বলি।

প্রথম কথা, আমার মনে হয় যে, বাংলা লঘুগুরু ছন্দের আদি-প্রেরণা এসেছে মুখ্যত: সংস্কৃত কাব্যের সনাতন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ থেকে ও গৌণত: জাতি (ওরফে মাত্রাবৃত্ত) ছন্দ থেকে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে নানা নব ছন্দোবদ্ধ থাকলেও নব ছন্দরীতির প্রবর্ত্তন করেছেন, তিনি কেবলমাত্র পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে। ছন্দের আর কোন নন্দনে তিনি নব ছন্দের পথিকৃৎ হন নি—তিনের ছন্দে একটিও গান বাঁধেন নি, সপ্তমাত্রিক ছন্দে মাত্র একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিমাত্রিক তথা সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু ছন্দে বৈষ্ণব কবিরা ও রবীন্দ্রনাথ ত গান বেঁধে ছিলেন, আমরা ও (দিলীপ-নিশিকান্ত এণ্ড কোং) নানা গান বেঁধেছি এবং বাঁধবার সময় এছন্দে প্রেরণা পেয়েছি কুলীন অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ থেকেই, জয়দেবীয় ছন্দ থেকে নয়। তাই একথা বললে হয়ত ভুল বলা হবে না যে, বাঙালী কবিরা এযাবৎ লঘুগুরু ছন্দের প্রেরণা আহরণ করে এসেছেন সংস্কৃত মুক্তদল গুরুস্বরের কল্লোলের কাছে হাত পেতেই—জয়দেবের ছন্দে বিমুগ্ধ হওয়ার দরুণ নয়। এ কথা আমার আরো মনে হয় এই জন্যে (একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি বাহুল্য ভয়ে) যে, আমি খাস সংস্কৃতেও গান বেঁধেছি জয়দেবের সপ্তমাত্রিক ছন্দের টানে নয়, মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয় তৃতীয় পর্বের মনোহারিত্বে আকৃষ্ট হয়ে। আমার গানটি গুরুবন্দনা—"মধুমুরলী"-র প্রথম গান :

> "প্রেমরচিতা তনুর্যস্ত প্রেমরচিতং মানসম্
> প্রেমরচিতং চিত্তমমলং করতি নিত্য সুধারসম্..."
> ইত্যাদি

কিম্বা বাংলায় ধরুন গঙ্গাস্তব যার প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করেছি, অত পর :

> বর) ধূলিধূসর মলিনতা হর' অমল তব বরদানে
> এসো) পতিতপাবনি! ললিতলাবণি! মধুরিমা-অভিযানে

কিম্বা জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণ-আবাহন :

> এস সুন্দর বন্ধু, বাঁশরিতানে
> ক্লান্ত অন্তর শিহরি নন্দনগানে।
> জানি না কিছু আমি
> ভজনসাধন স্বামী :
> প্রার্থি শুধু—তুমি এস হে তব
> প্রীতিপরশে কুসুমি' নিতিনব গীতি ঝঙ্কৃত-প্রাণে,
> নির্ঝরি' করুণা অমরতা বরদানে।
> বিধুর তিমিরে মধুর জনমবিহানে
> এস অচিরে কান্ত হে, বরদানে।
> এস প্রেমল, আলো
> নৃত্যকোমল আলো,
> বরষি, ভুবনে রাগমালা
> পুণ্য কিরণে বরি' উতলা শূন্য হৃদি তব টানে
> এস উন্মুখ কর' সখা তব পানে।

শুধু আমি (বা নিশিকান্ত) নই, দ্বিজেন্দ্রলালও নানা লঘুগুরু ছন্দে গান বাঁধার সময়েও জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি—সংস্কৃত গুরুস্বর তিনি প্রবর্তন করে-ছিলেন কৈশোরেই ত্রিমাত্রিক ছন্দে : 'নীলগগন চন্দ্রকিরণ তারকাগণ রে।'

> 'হের নয়ন হর্ষ গগন চারু ভুবন রে!...ইত্যাদি
> (আর্যগাথা ১ম ভাগ)

কিম্বা, তাঁর অনবদ্য ষাণ্মাত্রিক লঘুগুরু :

> নিখিল জগত সুন্দর নব পুলকিত তব দরশে
> অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর পরশে
> বা
> এক মধুর ছন্দ মধুর ছন্দ পবন মন্দ মন্থর
> কভু কোকিল মৃদু গীতে
> উঠে জাগি শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে...
> ইত্যাদি

নিশিকান্তের লঘুগুরু ছন্দে রচিত (ত্রিমাত্রিক)

> আলো শুভ আলো
> হে প্রোজ্জ্বল আশা
> তব মন্ত্র না ঢালো
> তব দীপন ভাষা।
> মম জীবনবীণা
> কর তব করলীনা
> বহি মধুর-সার
> সিক্ত কর পিপাসা
> আলো তব ধারা
> মম দুর্দম প্রাণে
> জালো তব তারা
> মম ঝঙ্কৃত তানে
> গহন অন্ধকারে
> উজ্জ্বল অভিসারে
> মম চেতন রাখো
> সব তামস নাশা।

(এ-গানটির ছন্দ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য হয়ত না শোনাতেও পারি—তাছাড়া ছন্দবিতর্ক ত কিছুটা টেকনিকাল কচকচি হবেই। কথাটা এই যে, এ ছন্দটিতে ষান্মাত্রিক ছন্দ বলা চললেও আমি এই সুর ঝাঁপতালের ছন্দ প্রেরণায়ই বেঁধেছিলাম—জয়দেবের নয়।

সুরফাঁকতালের ভঙ্গি জানেন নিশ্চয়ই – চার + দুই + চার এর কদম; অর্থাৎ, দশমাত্রিক অথচ দুইয়ের চাল আমার গানটি ছিল :

ঢালো মধু ঢালো বলিব বঁধু ভালো
সুর-নূপুর আলো অমৃত অভয় ঢালো
যাচিব চিরচুম্বন ...ইত্যাদি
(গীতশ্রী ৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

প্রতিভাময়ী কবি জ্যোতির্মালা আমার কাছে ছন্দ শিখবেন। তিনি লঘুগুরু ছন্দ সত্যি ভালো লেখেন, এছন্দে বেঁধেছিলেন :

এলো | বঁধু | রাতে তারি মর্মর তালে
নীল উজানি এল ছন্দি অযুত তারা
গন্ধ গীত সাথে ঝলি হীরক ঢালে
তিমির বিদারি এসো নত, আপন হারা
চন্দ্র মুকুট সাথে নবচেতন ভাতে
এল বঁধু রাতে এল বঁধু রাতে
শিহরি স্বপন মাঝে
গোপন মন চাহে
ধরণী-সুর সাজে
বরণ-তরণি বাহে
প্রেম-কমল হাতে
এল বঁধু রাতে।

অনিলবরণ, সাহানাদেবী ও নীরোদবরণও আমার লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা গানের প্রেরণায় এ-ছন্দে কয়েকটি সুন্দর গান বাঁধেন। আমার "গীতশ্রী" গ্রন্থে পাবেন গানগুলি। প্রতিভাধর এই নিশিকান্ত গীতশ্রীতে আমারই অনুরোধে আরও একটি চমৎকার সুদীর্ঘকবিতা লিখেছিলেন জয়দেবের লঘুগুরু ছন্দের অনুভাবে, নাম "রাজহংস"। তার মাত্র প্রথম স্তবক (জয়দেবের মূল গান : "দিনমতিমণ্ডলমণ্ডন ভব খণ্ডন মুনিমানসচরহংস")

হে সিত চন্দন গঞ্জিত তনু রঞ্জিত, সঞ্চিত-তুষার-স্বর্ণ!
তব পরশন বিধু লাবণি দিল প্লাবনি অমরাবতীর বর্ণ।
তব মুখ চুম্বন লাগে
মম উৎপলবন জাগে
লভি নন্দন মধু ভাষা
এ-ভূতল সরসীজল করি শীতল সুন্দর! কী তব আশা?
ইত্যাদি

এ কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন (জুলাই ১৯৩৬—তীর্থংকর ২০১ পৃঃ) "এ পরিণত লেখনীর রচনা – ছন্দের তরঙ্গ ভঙ্গের উপর দিয়ে ভাবে ভরা ভাষা পাল তুলে চলেছে নিরাপদে। প্রথম থেকেই নিশিকান্তের প্রতিভার যে পরিচয় পেয়েছি নিশ্চয় জানতুম তার সম্বন্ধে প্রত্যাশা পূর্ণ হবে—আজ আনন্দলাভ করলুম।"

দ্রষ্টব্য—নিশিকান্ত জয়দেবের মূল গানটির ছন্দোবন্ধের অবিকল নকল করেন নি। তবু এটি জয়দেবীয় প্রভাবেই রচিত মানতে বাধা নেই। কিন্তু তবু দেখবেন যে সংস্কৃত চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে কোন পর্বে "মধ্যগুরুগণ" অর্থাৎ লঘু-গুরু-লঘু পর্ব শুদ্ধ বলে গণ্য হয় না, কিন্তু আমার বাংলায় (বা সংস্কৃতেও) তা মানতে বাধ্য নই। তাই আমি নিশিকান্তের মধ্যগুরুগণ গ্রহণের সমর্থন করি। রবীন্দ্রনাথও এতে দোষ দেখতেন না* যদিও নীলরতন এতে আপত্তি করেছেন—কেন জানি না—আমরা সংস্কৃত ছন্দ থেকে প্রেরণা পেতে পারি বলে যে সে-ছন্দের মাছিমারা নকল করতে বাধ্য এ কি একটা কথা হ'ল? আমার সংস্কৃত গানেও আমি এই গ্রহণ বরণ করেছি অকুতোভয়েই, যথা (সুরবিহার ১ম ভাগ ৮৭ পৃঃ)

অমর ধ্যানাসীনা ভবাম মুগ্ধং স্বার্থং মুক্তা
জপাম যুগর্ষি মন্ত্রবরাভয়মিহ চিরতরণং বুদ্ধা

এখানে ভবাম, জপাম তথা যুগর্ষি-তে গ্রহণে আমি মধ্যগুরুগণকে অকুণ্ঠেই বরণ করেছি—গাইতেও বাধে না—যদি গানটি আপনাকে শোনাতে পারতাম তাহলে ছন্দের দিক দিয়ে অন্ততঃ আপনাকে তুষ্ট করতে পারতাম একথা জোর করেই বলতে পারি।

এত কথা বলছি শুধু এই নিবেদনটি পেশ করতে যে, অতীত সৃষ্টি থেকে প্রেরণা পেলেও স্রষ্টা কবিরা কদাচ মাছিমারা অনুকরণ করেন না। তাই আমরা নানা লঘুগুরু ছন্দে মোটেই জয়দেবের "অনুকরণ" করি নি। আপনি হয়ত ভ্রুকুটি করে বলবেন "কিন্তু প্রভাব?" উত্তরে আমি বলব করজোড়ে যে, আমরা সর্বত্র জয়দেবের প্রভাবও মেনে নিই নি যথা, সুরফাঁকতাল ছন্দের গান-গুলিতে বা পর্ব গ্রহণে, বা নানা নব ছন্দোবন্ধে। উদাহরণতঃ, নিশিকান্তের (আমার নিজের রচনার বেশি উদ্ধৃতি দেওয়া অশোভন হবে বলেই নিশিকান্তকে সামনে ধরছি—গীতশ্রী ১০৩ পৃষ্ঠা)

জলধর আসিল ঐ··· তড়িত বিকাশিল ঐ···
দিগন্ত ভাসিল ঐ··· ঘনবরষণ প্লাবনে।
অম্বর বাজিল ঐ··· ময়ূর নাচিল ঐ···
হৃদয় বিরাজিল ঐ··· ভয় দুরু দুরু কাঁপনে।
শ্যামল রঞ্জিল ঐ··· ঝিল্লী ঝংকৃল ঐ···

রাত্রি অতন্দ্রিল ঐ ··· বিরহী-চিত ভাবনে···
লগ্ন বিভাতিল ঐ··· মন্মথ মাতিল ঐ···
চাতক সাধিল ঐ··· আগত নব শ্রাবণে

নিশিকান্ত এ গানটিতে চার-এর সঙ্গে তিনের কদমের জুড়ি চালিয়েছেন চমৎকার ঢঙে—আমার-দেওয়া মডেল-এর অনুসরণে। এখানেও লক্ষণীয়: এ জোড়-মেলানোর কোন প্রেরণাই তিনি পান নি জয়দেবীয় কোন ছন্দ বা ছন্দোবন্ধ থেকে। দ্বিজেন্দ্রলালের লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা বিখ্যাত রণগাথা:

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা॥
(গীতশ্রী ২০৪ পৃ:)

বা, এ ছন্দে: ছক নিশিকান্তের বাঁধা গান:

আনো আনো অনল প্রাণে আনো চিত্তে
জ্যোতির্বাণী।
মর্ত্ত্যে কর' উদ্দীপিত আজি হে প্রলয়ঙ্কর, হে রুদ্রাণী!

এদুটি গানেও জয়দেবীয় কোন ছন্দের লেশমাত্র প্রভাব পাবেন না।

বলতে কি (ভয়ে ভয়েই বলছি এবার) দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মতন জয়দেবের ভক্ত ছিলেন না। আমার "মহানুভ দ্বিজেন্দ্রলাল" ভাষণে আমি বলেছি দ্বিজেন্দ্রলাল ভালবাসতেন বেশি—যাকে আমাদের অনেক পরিবার বলেন 'ভাবধ্বনি"—কিনা ওজস—সমুদ্র কল্লোল। "রসধ্বনি" অর্থাৎ অতিলালিত্য কুলুধ্বনি তাঁর মন তেমন টানত না। এখানে আমি তাঁর ওকালতি করতে চাইছি না, চাইছি শুধু এই কথাটি পেশ করতে যে, তাঁর লঘুগুরু ছন্দের গতিভঙ্গি বা ভাবধ্বনি কিছুই তিনি জয়দেবের কাছ থেকে ধার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের ত্রিমাত্রিক লঘুগুরু "দেশ দেশ নন্দিত করি" বা সপ্তমাত্রিক "মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন" বা ষাণ্মাত্রিক

মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে
জগতে তব কি মহোৎসব বন্দনা করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ, ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে
পূর্ব গগনভাগে
দীপ্ত হইল সুপ্রভাত তরুণারুণ রাগে
অমৃত পুণ্যভাগী কে জাগে কে জাগে

জাতীয় নানা গানের রসধ্বনি বা ভাবধ্বনির প্রেরণাও তিনি জয়দেবের কাছ থেকে পান নি, নিজের প্রতিভার উদ্ভাবনী জাদুশক্তির কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। জয়দেবের প্রভাবকে স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই। বিশেষ করে পঞ্চমাত্রিক ছন্দে জয়দেবের প্রবর্ত্তনাই আমাদের আরো নানা বিচিত্র পঞ্চমাত্রিক ছন্দোবন্ধের প্রেরণা দিয়েছে। যথা নিশিকান্তের অনবদ্য (গীতশ্রী ১২৩ পৃ:)

তব প্রণয় পুলক ধরি শিরে লভি প্রাণ ভরি
লভিনু পথ সকল অভিযানে।
রূপ তব মন হরিল দূর শশি অবতরিল
বুঝি ঝলমলিল তব দানে।

জয়দেবের ভাব প্রেরণা বহি:সৌন্দর্যমুগ্ধ দেহ
তৃষ্ণামূল ("দন্ত" পর্যন্ত জাহির করে)

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী।
অলতি মম দারুণো মদনকন্দর্পানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্

নিশিকান্তের প্রেমকীর্ত্তন উচ্চতর ভাবের ভাবুক:

বহুজনম আবরিত চেতন অজাগরিত
জাগিল বিভাসিত বিতানে
মুকুল সম মঞ্জরিল মলয় সম সঞ্চারিল
ভ্রমর সম গুঞ্জরিল গানে

এ অনিন্দনীয় গানটি গীতশ্রীতে পাবেন। কিন্তু এ গানটিও ত আপনাকে গেয়ে শোনাতে পারলাম না। যদি পুনরায় আসতেন তা হ'লে হয়ত এ জীবনকে "জীবন্মৃত" গণ্য করে লিখতেন না ললাটে করাঘাত করে, "কিন্তু হায়! আমাদের দেশে এখন সুরসাধক কবিরা গেলেন কোথায়? রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র প্রমুখ কবিদের কণ্ঠ নীরব হওয়ার পরে আর ত কোন কবির কণ্ঠই সুরে বিলসিত হয় না।"

আমার বিপদ হয়েছে কী জানেন? কুলিন সমাজে কেউ নিজের দৃষ্টান্ত যথেচ্ছ পেশ করতে পারে না, আত্মকথন অশোভন বলে। কিন্তু আইনে মানে যে, প্রাণ

রক্ষার্থে আততায়ীকে প্রত্যাঘাত করলেও দোষ হয় না। তাই আপনি আমাকে জীবদ্দশায়ই হত্যা করতে উদ্যত দেখে ভীত হ'য়ে সঘনে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি: "এখনো আমি গান গেয়ে থাকি এবং অন্ততঃ গায়ক হিসাবে আমাকে—" কিন্তু না আর রটান চলবে না। এ পাপ মুখে যে আমি গায়ক তথা কবি তথা সুরকার। কেবল বলি—যদি একবার আপনাকে হাতের কাছে পেতাম তাহ'লে হয়ত লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা নানা গান তীব্র স্বরে গেয়ে আপনার মন ভেজাতে পারতাম যার ফলে আপনার হয়ত মনে হতেও পারত যে আমাকে জীবন্মৃত মনে করে একটু ভুল হয়েছে আপনা'র। বিশ্বাস না হয় ত নীলরতনকে শুধা'বেন সেদিনও দিল্লীতে প্রায় কয়েকঘন্টা তাদের সঙ্গে গানের জুড়ি-গাড়ি চালিয়ে ছিলাম কি না, দেখে শুনে তার মনে হয়নি যে এ গরুর গাড়ির "বেসুরে বিলসিত" আর্তনাদ। আর অতি সলজ্জে বলছি—দু বৎসরের আগে কলকাতায় "মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল" ভাষণে শেষ দিন দু ঘন্টা কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করার সঙ্গে অন্ততঃ ডজনখানেক গান গেয়েছিলাম যার মধ্যে একটি লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা শিব-স্তোত্র (জর্মন সুরে গীত) শুনে হাজার-বারোশ' ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা এমন মুখের ভাব দেখিয়েছিলেন যাতে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, আমার কণ্ঠ ঠিক "বেসুর বিলসিত হয় নি।"

কিন্তু আত্মশ্লাঘা (Self-prescroation এর জন্যে সমর্থনীয় হলেও) আর সইবে না—শুধু ধর্মভ্রষ্ট না যোগ-ভ্রষ্ট হয়ে ফের জন্মাতে হবে কে জানে হয়ত আপনারই প্রদৌহিত্রদের বা প্রপৌত্রদের গেহে? তখন হয়ত আপনিও ফের ঐ একই কুলে জন্মিয়ে আমার সব সুলক্ষণকেই অলক্ষণ বলে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগবেন—এ-জন্মের বিতণ্ডার জের টানতে বা শোধ তুলতে।

ঠাট্টা রেখে ফের গম্ভীর হই, শুনুন। বলেছি—জয়দেবের প্রভাব মানতে আমার কোন আপত্তিই নেই। বলতে কি, প্রতি কথাই আমি সানন্দে স্বীকার করি। আপনার কাছে তাও কি স্বীকার করি নি মুক্তকণ্ঠে?—(যার জন্যে একদা রবীন্দ্রনাথেরও বিরাগভাজন হয়েছিলাম তিনি আপনাকে ও আমাকে উদ্দেশ করে নালিশ করে-ছিলেন: (তীর্থংকর ১৯৪ পৃঃ)

"ছান্দসিকের সাক্ষ্যসাবুদ নিয়ে রায় দেবার কাজ অন্ততঃ আমার নয়। আজ প্রায় ষাট বছর ময়রার কাজ করে এসেছি, শেষ বয়সে সন্দেশের তার পরীক্ষা করবার জন্যে ল্যাবরেটারির দোহাই পাড়তে যাব না, যে-রসায়নে সন্দেশের বিচার হয় সে আমার মনের মধ্যেই থাক, কলেজের ক্লাসের কাঠগড়ায় তার সন্ধানে যাব না।"

এতক্ষণে হয়ত আন্দাজ করতে পেরেছেন কি আমার নালিশ? সংক্ষেপে এ নালিশটি পেশ করি এই প্রশ্নে: সংস্কৃত ছন্দের প্রেরণায় যেসব কবিতার ছন্দ আমাদের আধুনিক মনে গুঞ্জন তুলেছে তার মধ্যে যদি জয়দেবীয় সুর খুঁজে না পাই তাহলেও কেমন করে মেনে নেব যে, এসবই তাঁর কাছে ধার করা ছন্দ বা যেখানেই এ ছন্দ রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেখানেই বলব আপনার সুরে: "জয়দেব আজও বেঁচে আছেন, জয় জয় জয়।"

জয়দেবের ছন্দের দুটি দিক আছে। একটি তাঁর পদলালিত্য, অন্যটি ছন্দ মাধুর্য। কিন্তু তাঁর ছন্দে ভাব-ধ্বনি আদৌ নেই, তেমনই রসধ্বনি (melody)। পিতৃদেব তাই জয়দেবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ভালবাসতেন ব্যাস, ভবভূতি, শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, মধুসূদন, কীটস্ প্রভৃতি ভাবধ্বনি-সমৃদ্ধ কবির ওজস্বী কবিতা। তাঁর নিজের কাব্যে রস-ধ্বনিও আছে বটে কিন্তু ওঁর কবিশক্তির সর্বোত্তম বিকাশ ভাবধ্বনিতেই বলব—রসধ্বনিতে নয়। একথা আমি বলেছি আমার "মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল" ভাষণে। আমি কবিতায় রুচির দিক দিয়ে পিতৃবৎসল পুত্র, তাই রবীন্দ্রনাথের জয়দেবীয় উচ্ছ্বাসে সাড়া দিতে পারি নি কোনদিনই। জয়দেব আমার কানকে খুশী করলেও মন টানেন নি কোনদিনই। ওঁর "প্রলয় পয়োধি জলে" সুরটি ছাড়া আর কোন গান গাইতেই আমি তেমন প্রেরণা পাই না যেমন পাই শঙ্করাচার্য শ্রীচৈতন্য বা গীতার স্তোত্র গাইতে। তাই জন্যেই বলি: দোহাই আপনার, আমাদের সবাইকেও জোর করে জয়দেবীয় ছন্দের গোয়ালে ঢুকিয়ে, মাথা মুড়িয়ে দেবেন না।

আমরা চাই নিজের পথেই চলতে—যতটা পারি ছন্দে সুরে কাব্যে স্রষ্টা হয়ে—জয়দেবের ছন্দের কাছে ধর্ণা দিয়ে তাঁর "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এ নীতি মানতে অন্ততঃ আমার মন নারাজ।

আপনি হয়ত বলবেন এ নাম নিয়ে তর্ক। কিন্তু আমি তা মানব না। যে ছন্দের উদ্ভব তথা বিকাশের ইতিহাস সংস্কৃত কাব্যে পাই তার প্রেরণার জন্যে জয়দেবের অতিলালিত্য ছন্দের কাছে হাত পাতব কেন? জয়দেবের অষ্টপদ:

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল মলয় সমীরে
মধুকর-নিকর করম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে

আর দ্বিজেন্দ্রলালের চতুর্মাত্রিক লঘুগুরু

নারদকীর্ত্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্মকমণ্ডলু ধারিনি' ধূর্জটি জটিল জটা পর ঝরিয়া
অম্বর হইতে সম শতধারে জ্যোতিপ্রপাত তিমিরে
নামি ধরায় হিমাচলমূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে

এ-দুই ছন্দের আন্তর সুর, ভাবধ্বনি কি এক? না, বাইরের কাঠামো সদৃশ হলেই কি মধ্যেকার ছবিরও একাত্মতা প্রমাণ হয়? আমার নিজের লঘুগুরু ছন্দে রচিত কবিতা উদ্ধৃত করতে বাধে, কিন্তু বলবেন কি আমার পূর্ব স্তবটির গাম্ভীর্যও জয়দেবের কাছ থেকে ধার করা—(মহাপুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

তা ছাড়া আপনি একলাই বা হায় হায় করবেন কী দুঃখে? আমিও যে হায় হায়-এর জোয়ার দিতে পারি এই বলে যে আপনি একবারও আমার গান শোনেন নি—(এ দুঃখ আমি রাখি কোথায়)—কিন্তু যদি শুনতেন তা হ'লে হয়ত বুঝতেন গানের কথায় বা সুরে ওজস্ বলতে দ্বিজেন্দ্রলাল কী মনে করতেন—সঙ্গীতে যাঁর উত্তরসাধক বলেই আমি নিজেকে মনে করে এসেছি আশৈশব। এই ওজস্ রবীন্দ্রনাথেরও নানা অনুপম কবিতায় আছে—আর আছে তাঁর নানা লঘুগুরু ছন্দের গানে। কিন্তু জয়দেবে শুধুই অতিলালিত্য রসধ্বনি—symphony, melody-র প্রাচুর্য। ভাবধ্বনি বা মেঘমন্দ্র কোথায়? মানি, এ ভাবধ্বনি জয়দেবের স্বধর্ম নয় বলে তাঁর কাছে ভবভূতি কালিদাস বা ব্যাসের ধ্বনিকল্লোল চাওয়াটা অনুচিত হবে, কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা যে জয়দেবকে নিয়ে নয়—বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধি বিকাশ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ষাণ্মাত্রিক লঘুগুরু

প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান্ হে জাগ্রত ভগবান্…

বা

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ
নূতন তব জন্ম লাগি' কাতর যত প্রাণী
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী…

কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের চাতুর্মাত্রিক লঘুগুরু

আনন্দময়ী বসুন্ধরা

চির অভিরামা তরুণী শ্যামা সুহাসিনী পিককলস্বরা…
তরুণ উষার অরুণ মৃদু রক্তিম তরুণী প্রণয়স্মিতাধরা

বা

সাজ সাজ সকলে রণসাজে—শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে
চল সমরে দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত! জয় মা কালী!

এ ভাবধ্বনির সঙ্গে জয়দেবের অতিলালিত্য অনুপ্রাস-বহুল ছন্দের তুলনা হয় কি—

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনমণ্ডিতলোকং
বন্ধুজীব মধুরাধর পল্লবমুল্লসিত স্মিতশোভম্।
জলদপটলচলদিন্দু-বিনিন্দক-চন্দনতিলকললাটং
পীন পয়োধর পরিসর মর্দন নির্দয় হৃদয়কবাটম্।

এর সস্তা শ্রুতিমাধুর্য বা আদিরস প্রথমেই জনগণ-মনকে আবিষ্ট করে না এমন কথা বলব না—সব সস্তা জিনিসেরই নগদ বিদায় বেশি সহজে মেলে, কে না জানে? কিন্তু ছন্দের বহির্লালিত্যকে পাশ কাটিয়ে যাঁরাই তার অন্তরে পৌঁছেছেন তাঁরাই জানেন ছন্দের গভীর রসসম্পদ কী বস্তু। জয়দেবে এই গভীর কল্লোল বাজে নি যেমন বেজেছে ধরুন কালিদাসে বা (আরো) ভবভূতিতে শঙ্করাচার্যে বেদব্যাসে।

জয়দেব অবশ্য বাংলা কবিদের কানকে মুগ্ধ করে-ছিলেন প্রথম দিকে। আমি ভবাদৃশ ঐতিহাসিক নই, তাই বলতে পারব না কাকে তিনি কতখানি প্রেরণা দিয়েছিলেন:—বিশেষ করেই রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে বলা কঠিন কে কার কাছ থেকে কী ও কতখানি পেয়েছে, আর কতটা তার পরে খাটিয়ে লাভ করেছে। কিন্তু একথা বলতে পারি খানিকটা ভরসা করেই যে, বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের নানা পদাবলীর নানা চরণে গুরু স্বরের বিন্যাসের মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন মুখ্যতঃ সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ও গৌণতঃ জাতি বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ থেকে। তাঁরা ত্রিমাত্রিক ছন্দের প্রেরণা পেয়েছিলেন সম্ভবতঃ সমানিকা, পঞ্চচামর রুচিরা পুষ্পিতাগ্রা বর্গীয় ছন্দ থেকে। চতুর্মাত্রিক ছন্দের—সম্ভবতঃ তোটক মদিরা পজ্ঝটিকা বর্গীয় ছন্দ থেকে। পঞ্চমাত্রিক—এইখানেই মনে হয় জয়দেবের বিশিষ্টতম দান০—যদিও এ ছন্দের প্রেরণারও কিছুটা এসে থাকতে পারে ভুজঙ্গ প্রয়াতের পঞ্চমাত্রিক থেকে। তবে মনে হয় ভুজঙ্গ প্রয়াতের চলন একটু বেশি কড়া—বার বার লঘু-গুরু-এ গ্রহণে বাংলা লঘুগুরু ছন্দ নিজের পায় দাঁড়াতে পারত না।

কিন্তু সপ্তমাত্রিক ছন্দে আমরা প্রেরণা পেয়ে থাকব সম্ভবতঃ গৌণতঃ অক্ষরবৃত্ত গীতিকা ছন্দ থেকে (যার কথা

পরে বলছি) এবং মুখ্যতঃ মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব থেকে। কারণ মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্বে চারিটি গুরু স্বর (বা রুদ্ধ দল) থাকলেও এর পরের তিনটি পর্বই সপ্তমাত্রিক—শেষেরটি পাঁচ এর সঙ্গে দুমাত্রা ও বিরতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বলে, যথা

কশ্চিৎকান্তা | বিরহ গুরুণা | স্বাধিকার | প্রমত্তঃ ০•

মন্দাক্রান্তার আদর সংস্কৃত কাব্যে খুবই বেশি। তাই মনে হয় বৈষ্ণব কবিরা এই ছন্দটি থেকেই তাঁদের লঘুগুরু সপ্তমাত্রিকের প্রেরণা পেয়েছিলেন জয়দেবের একটিমাত্র সপ্তমাত্রিক কবিতা থেকে নয়।

বাংলা লঘুগুরুতে বৈষ্ণব কবিরা তিন চার, পাঁচ ও সাত এই চারিটি প্রধান কদমেই বহু মঞ্জু পদাবলী রচনা করেছেন। সর্বত্র গুরুস্বর দু মাত্রার মর্যাদা পায় নি বটে (সুরেই সে খুঁৎ নিরাকৃত হ'ত) কিন্তু মুক্তদল গুরু স্বরের প্রসাদেই এ সব চরণে এসেছে খানিকটা সংস্কৃত কল্লোল! আপনার কাছে এ সব চরণের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হবে যাকে সাহেব-পুরাণে বলে carring coals to Hewcostle, তবু লঘুগুরু ছন্দের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত অন্ততঃ দেওয়াই চাই নৈলে মান থাকবে কেন বলুন? কেবল মনে রাখবেন দয়া করে যে, আমার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই যে, এ সব ছন্দেরই আদিম প্রেরণা বৈষ্ণব কবিরা পেয়েছিলেন—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এসব ছন্দেরই আভাস (indication) তথা অনুমোদন (sanction) ছিল বলে. কেবল, বলেছিল হয়ত পঞ্চমাত্রিক ছন্দের প্রেরণা জয়দেব দিয়ে থাকতে পারেন। সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তে সপ্তমাত্রিক ছন্দের নজির মেলে গীতিকা ছন্দে:

কর | তাল-চঞ্চল | কঙ্কণস্বন | মিশ্রণে ন ম- | নোরমা
জয়দেব

শুধু "কর" এই অতিসার্বিক শব্দটি বাদ দিয়ে তাঁর একমাত্র সপ্তমাত্রিক ছন্দের প্রবর্তন করেছেন তাই তাঁর

কিং করিষ্যতি | কিং বদিষ্যতি | সা চিরংবিব | কেণ

মূলতঃ এই ছন্দই ব্যর্থ এমন কি লঘুগুরু ধ্বনি বিন্যাসেও)

এবার উদাহরণের পালা:

ত্রিমাত্রিক ওরফে বর্ণমাত্রসর্বিক লঘুগুরু ছন্দ ঃ৪

দেখ রি সখি | শ্যামচন্দ | ইন্দুবদনি | রাধিকা…
মদনরাজ | নবসমাজ | ভ্রমত ভ্রমর | চাতুরী | (জ্ঞানদাস)
অতিশীতল | মলয়ানিল | মন্দ মন্দ | বহনা | …শশিশেখর
হেরি যুগল | রসবিলাস | কমল কুমুদ | সব বিকাশ।
নন্দ দাস | নিজরি আশ | পুরত কত | রসো (নন্দদাস)

চতুর্মাত্রিক লঘুগুরু—এ ছন্দের দৃষ্টান্ত অজস্র মিলবেঃ

কুসুমিত। কুঞ্জে | অলিকুল। গুঞ্জে। …রসবতি | সঙ্গে |
রসময় | রঙ্গে |

দুহুঁ মুখ | চাঁদে | ধোই সু | ছাঁদে।
হাসি টীট হরি | ধনি করি | কোর
পীবই | অধর সু | ধারস | তোর… (কবিশেখর)
অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরণা
তরুণারুণ থলকমলদলারুণ মঞ্জরি রঞ্জিত চরণা…
(গোবিন্দদাস)

পঞ্চমাত্রিক লঘুগুরু:

চিরদিবস | ভেল হরি | রহল মথু | রা পুরী | অবহুঁ
সখি | বুঝহ জনু | মানে
সোই সখি | তেজল কি | কাজ ইহ | জীবনে | আন
সখি | গরল করি | গ্রাস
(শশিশেখর)

গন্ধ সহ গন্ধবহ মন্দগতি ভেল
ইহ সুখদ বিপিন-দ্রুম-দাম দুখ দেল
(কমলাকান্ত)

সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তে পঞ্চমাত্রিক ছন্দ মেলে ভুজঙ্গপ্রয়াতে কিন্তু তার "য-গণ"-এর—অর্থাৎ লঘু-গুরু-গুরু (য— —) পর্ব—পর পর বিন্যাস বজায় রেখে রসোত্তীর্ণ বাংলা কবিতা রচনা করা খুব সহজ নয়। সেকালের কবিতাবলীর মধ্যে এছন্দে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতাটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবিতা মনে হয়:

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে কিন্তু সমগ্র কবিতাটিতে ছন্দ বজায় রাখতে গিয়ে শব্দচয়ন সর্বত্র সুষ্ঠু হয় নি। এযুগে একমাত্র কবি নিশিকান্ত এ ছন্দে অনবদ্য শিবস্তোত্র রচনা করেছেন সর্বত্র আমাদের বাংলা হসন্ত উচ্চারণ বজায় রেখে:

প্রশান্তির দিশাতে নিজেরে দিশাবো
নিমেষে নিমেষে গভীরে মিশাবো
অপারে অনন্তে স্বরাজে স্বছন্দে
তরঙ্গেরি রঙ্গে গভীরে দুলাবো।
সনাতন সখা হে, অতল হে অপারী!
সুগোপন হিয়াতে চিরন্তন দিশারি!
সুগোপন নিবাসী শুনালে কি বাঁশি!

বিভোলা বিম্ব নিজেরে ভুলাবো।
অচল হে অবারণ অলোকী অকালী!
অসংখ্যেরি শঙ্খে নিরব হে নিরালী!
সুদূরে সমীপে শশাঙ্কে প্রদীপে
সহস্রেরি রূপে অরূপে জ্বলাবো।

কিন্তু এ-বিন্যাস বজায় রেখে বেশিক্ষণ টাল সামলানো কঠিন বৈকি। তাই বৈষ্ণব কবিরা ভুজঙ্গ প্রয়াতের দিকে না ঘেঁসে মুক্তগতি নিরঙ্কুশ পঞ্চমাত্রিকের প্রেরণা জয়দেবের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন মনে হয়। কিন্তু এবার সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু ছন্দের কয়েকটি নমুনা দিই:

এছন্দে ভারতচন্দ্র নিখুঁৎ "হরিনামাবলী" স্তোত্র রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত অন্নদামঙ্গলে:

সপ্তমাত্রিক লঘুগুরু:

জয় কৃষ্ণকেশব রামরাঘব কংসদানব-ঘাতন
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন-রঞ্জন···ইত্যাদি।

বৈষ্ণব কবিদেরও অনেক সুন্দর গান আছে এ ছন্দে।

নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ···
কঞ্জলোচন কলুষমোচন শ্রবণ রোচন ভাস
···(গোবিন্দদাস)

জয় নন্দনন্দন চন্দ
অঙ্গ দীপতি নিন্দি নীরদ নীল-নীরজকন্দ···
নন্দনন্দন নীকে নাগর নবিন-ঘন-রসমেহ
নীল উতপল নবিন নীরদ নিন্দি নিরুপম দেহ
(কমলাকান্ত)

বৈষ্ণব কবিরা এই চারটি মূল ছন্দে—তিন চার পাঁচ ও সাতমাত্রার—বহু মুক্তগতি লঘুগুরু পদ রচনা করেছেন। কেবল একটা কথা মনে রাখতে হবে: তাঁরা এ-গানগুলি গাইতেন, তাই সুরের দোলায় নানা গুরু স্বরকে জোট করে একমাত্রা ধরে তালসাম্য করতেন—যেমন কীর্তন গাইবার সময় আমরা আজও করি। কিন্তু আবৃত্তি করতে গেলে তাঁদের কাছে এ-সব গানের অনেক পদেই ব্যাহত হবে যাঁরা গুরুস্বরকে সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ করতে যান। কিন্তু একটু অনুশীলন করলেই আর কানের কোনো খটকা থাকে না, কারণ মন দুলে ওঠে যথাযথ আবৃত্তি করে (গুরুস্বরকে ঠিকমতন বিকল্পে একমাত্রিক করে) নানা চিরস্মরণীয় চরণ:

জনম অবধি হাঁম রূপ নিহারলুঁ নয়ন না
তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া
জুড়ন না গেল।

এখানে বলা বাহুল্য, লাখ রাখ হিয়ে ভেল বর্গীয় গুরুস্বরের উদাত্ত কল্লোলই প্রেমাস্পদকে মর্মস্পর্শী করেছে।

অথবা বিদ্যাপতির অপরূপ ভক্তি বৈরাগ্য উচ্ছ্বাস:

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত রমণি
সমাজে
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ অব মঝু হব
কোন কাজে।
কত চতুরানন মরি মরি জাওত ন তু আ আদি
অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর
সমানা

এ পদগুলি আবৃত্তি করলেও কান ও মন মুগ্ধ হয় যদি তাদের যথাবিধি গুরু উচ্চারণ করা যায়। বস্তুত: এগুরু উচ্চারণ বাদ দিলে পদগুলি ছন্দপতনের দরুণ পঙ্গু হয়ে পড়েই পড়ে, আরোএই জন্যে যে, এদের প্রাণপুরুষ নিহিত ঐ গুরুস্বরের কল্লোলে। সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলা চলত কি যদি তার গুরুস্বরকেও লঘুর সাংক্রেম করে একই মর্যাদা দিতাম একমাত্রা করে? তাই আমরা চাইছি আর কিছুই নয়, সংস্কৃত গুরুস্বরের কিছুটা রস-বিলাস বাংলা গানে আমদানী করতে—যে রস স্থান পেয়ে এসেছে বহুদিন ধরে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, চণ্ডিদাস, কবিশেখর গোবিন্দদাস, শশিশেখর, বলরামদাস প্রমুখ অগুন্তি বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে। যেমন মাত্রাবৃত্তেরও অনুমোদন ও ইঙ্গিত ছিল প্রায়-রবীন্দ্রকাব্যে। রবীন্দ্রনাথ শুধু তাকে নিয়মিত করেছেন প্রতি রুদ্ধদলকে "সর্বত্র" দুমাত্রা ধরে, তেমনি বাংলা লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা স্তব বা গানে আমরা চাইছি গুরুস্বরকে "সর্বত্র" দুমাত্রা ধরতেও—যেমন ভারতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ধরেছিলেন। কিন্তু এজন্য জয়দেবের কাছে ঋণ স্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না! আমরা চাইছি ছন্দে নিজের প্রেরণাদেবীর (muse) প্রসাদার্থী হয়েই রসসৃষ্টি করতে। এজন্যে নজিরকেও দাম দিতে আমরা অসম্মত নই—বস্তুত: নজিরই ত ট্র্যাডিশন—ঐতিহ্য। ঐতিহ্যকে বাদ দিলে সংস্কৃতি দাঁড়াবে কোন্ ভিতে? কিন্তু ঐতিহ্য (tradition) আমাদের নব সৃষ্টির প্রেরণা দিক—পুনর্ণবের মধ্যেই যে যুগে যুগে সনাতনের নবজন্ম হয় এই প্রত্যক্ষ ও আশাপ্রদ সত্যের এজাহার দিতে আমাদের সচল ও শক্তিমান করবে। লঘুগুরু ছন্দে এ নীতির প্রয়োগ আমরা কি ভাবে করতে চাই তার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছি। কিন্তু শুধু ব্যাখ্যায় আমার বক্তব্যকে

পুরোপুরি পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। গেয়ে শোনাতে পারলে বোঝাতে পারতাম লঘুগুরু ছন্দে কি অপূর্ব ওজ-শক্তির আমদানি করা যায় গানে তথা আবৃত্তিতে। কিন্তু এ দুঃসাধ্যসাধন করতে হলে সব আগে চাই লঘুগুরু ছন্দে শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে লঘুগুরু ছন্দের পরে ঘোর অবিচার করেছিলেন ইঙ্গিত করে যে, এছন্দে হাস্যোদ্রেক করা চলে কিন্তু রসসৃষ্টি করা চলে না (তীর্থংকর ১৯৮ পৃষ্ঠায় তাঁর পত্র দ্রষ্টব্য) কিন্তু এই কথাই কি সত্যি? লঘুগুরু ছন্দে রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি (তাঁর নানা গানে তথা ভানুসিংহের পদাবলীতে) অনবদ্য রস সৃষ্টি করেন নি? দ্বিজেন্দ্রলালের নানা নিখুঁৎ লঘুগুরু গান গেয়ে কি আমরা আনন্দ পাই না বা রস পরিবেশন করতে পারি না? রবীন্দ্রনাথের শ্রীমুখে একটি কথা বারবার শুনতে শুনতে আমার মনে গেঁথে গেছে। কথাটি এই যে, "কলাকারুতে সবচেয়ে বড় কথা হল "হয়ে ওঠো"—অর্থাৎ সৃষ্টির রসোত্তীর্ণ হওয়া। যে মাটিতেই হোক না কেন বীজ ফুলটি হয়ে ফুটে উঠলে আর কথা নেই, তাকে ফুলের প্রণামী দিতেই হবে।" ঘরোয়া ভাষায়ঃ সৃষ্টি আমাদের মনে রসের আনন্দ দিলেই ব্যস—কেল্লা ফতে, আর কথাটি নয়। ব্যাকরণ প্রেজুডিস সংস্কার থিওরি সবাইকেই বলতে হবে—রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়—মেনেছি হার মেনেছি।"

মনে পড়ে আর একটি উপমা যদিও গদ্যময় ভূমিকায়। ওয়াট (Tames Watts) যখন বাষ্প-যোগে এঞ্জিন চালানো যায় বলে ঘোষণা করেন তখন গাণিতিকেরা বলেন ব্যঙ্গ হেসেঃ পাগল না ক্ষেপা! গণিত দিয়ে যে প্রমাণ করা যায়—এ অসম্ভব।" ওয়াট্ সাহেব আর বাক্যব্যয় না করে ষ্টীম এঞ্জিন উদ্ভাবন করে গাড়ী চালিয়ে পাল্টা হেসে বলেনঃ "দেখুন, গণিতকে নামঞ্জুর করেও গাড়ী কেমন চলল অকুতোভয়ে!"

লঘুগুরু ছন্দের রস আমাদের মনের ময়ূরকে আনন্দ নৃত্যের দীক্ষা দিয়ে সচল করেছে নানা বাংলা গাণিতিক থিওরিকে নামঞ্জুর করে। একথার একটি মহৎ প্রমাণ—আমাদের উদাত্তঝংকার জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন" লঘুগুরু ছন্দেই রচিত। তাই আসুন এ-ছন্দের বিরুদ্ধে অনর্থক গাণিতিক বৈয়াকরণিক আপত্তিকে প্রশ্রয় না করে রসিক উচ্ছলতায় এ ছন্দরমাকে অভিনন্দন করি:

> মা | এস চিরন্তনি | ছন্দরমা | অবসন্ন ক্ষণে অরবিন্দ দলে।
>
> কর' ম্লান নিশা কলঝংকৃত প্রেমসঞ্চারবে প্রতি মর্মতলে।
>
> ঝর' অন্তর-তামস উজ্জ্বলিয়া
> সুর নৃত্যরসে মরু মঞ্জরিয়া,
>
> জিনি কণ্টক এস প্রফুল্ল ফুলে মধুহাস্য সমুচ্ছলি অশ্রু জলে।

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের পারিভাষিকে মুক্তদল—(অর্থাৎ open syllable অ অ ক খ···) সর্বত্রই এক-মাত্রা (অবশ্য লঘুগুরু ছন্দ ছাড়া, সেখানে আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ প্রত্যেকেই দুমাত্রা, গুরুস্বর)। আর রুদ্ধদল (closed syllable) মাত্রাবৃত্তে দুমাত্রা, স্বরবৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্তে কখনো একমাত্রা কখনো দুমাত্রা। স্বরবৃত্তে অধিকাংশক্ষেত্রেই রুদ্ধদল একমাত্রা।

২। প্রমাণ পরে পেশ করছি তাঁরই গান উদ্ধৃত করে।

৩। এমন কি রবীন্দ্রনাথের অনুপম কবিতা পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে "জয়দেবের পঞ্চমাত্রিকের "ভবতু ভবতীহ ময়ি সতমমুরোধিনী"-র সগোত্র মনে হয় ছন্দঃ স্পন্দে (rhythm)।

৪। দৃষ্টান্তগুলি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত "বৈষ্ণব পদাবলী" থেকে উদ্ধৃত।

৫। কিন্তু মিশ্র লঘুগুরু ছন্দে গুরুস্বরের বিকল্প আচরণ মঞ্জুর। কেন—সে আলোচনা করেছি আমার "ছান্দসিকী" ব্যাকরণে।

হীন যান

(উপন্যাস)

সুবোধ বসু

দুই

দুলী সত্যই চুপে চুপে খবর দিয়া গিয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে সে যে খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছে, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ননীদির ভয় না থাকিলে হয়ত ভাগিয়া পড়িত। এই দুঃসাহসিক অভিযানের সমস্ত উত্তেজনা ছাপাইয়া তার আর্ত্ত অনুরোধের কণ্ঠ বার বার নিমাইকে বলে, 'খপরদার ·নিমাই দা, পিছু ছাড়িছ না কিন্তু। চুপে চুপে বাড়ীটা দেইখ্যা লবি। আর রোজ একবার কইরা যাওন চাই। ডরে হাত-পাও কাঁপতে লইছে।'

নিমাই এই অনুরোধ উপেক্ষা করে নাই। ষ্টেশনের এই হাটের মধ্য হইতে মুক্তি পাইবার উত্তেজনা তাহারও হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। সমিতির বাবু অনেকটা আগে আগে যাইতেছেন। তাহাকে অনুসরণ করিতেছে ননীদি। এবং স্খলিত পদ দুলী। আর ইহাদের সব কয়জনার উপর নিতান্ত দক্ষ গোয়েন্দার মত কড়া নজর রাখিয়া নিমাই চলিয়াছে পিছু পিছু। কলিকাতার সে কিছুই চেনে না। ইহারা গন্তব্যস্থলে পৌছিলে সেই বাড়ীটা চিনিবার পর কি করিয়া এই রাত্রিবেলা সে ডেরায় ফিরিয়া আসিবে, উত্তেজনার বশে সে এ কথা একবারও ভাবে নাই। এমন সময় সমিতির বাবুটি তাহার সমস্যার সমাধান করিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল পার হইয়া আপার সার্কুলার রোড ধরিয়া বেশ কিছুটা আগাইবার পর সহসা সে সঙ্গিনীদের সহিত দূরত্ব কমাইয়া আনিল। দূর হইতে নিমাই স্পষ্ট দেখিল, লোকটা ননীদির সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করিতেছে। নিমাই নিজের দূরত্ব অব্যাহত রাখিয়া একটা গ্যাস-পোষ্টের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল।

কয়েক সেকেণ্ডেরই মাত্র ব্যাপার। ইতিমধ্যে রাস্তার বিবিধ আকর্ষণীয় ব্যাপারের দ্বারা নিমাই এক-আধটু অন্য-মনস্ক হয় নাই, এমন বলা যায় না। সহসা সে নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া সমুখে চাহিয়া দেখে তাহার নজরের ব্যক্তিদের পাশেই একটা মোটর গাড়ি আর একি, সমিতির সেই বাবুটি সেই গাড়ির দরজা দিয়া ননীদি ও দুলীকে গাড়িতে চড়িতে সাহায্য করিতেছেন! চকিতে নিমাই ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিল। বুঝিল ইহার পর আর উহাদের অনুসরণ করা বা উহাদের গন্তব্য ঠিকানা চিনিয়া আসা সম্ভব নয়, তবু সে মরীয়ার মত সমুখ দিকে এক ছুট লাগাইল।

কিন্তু তার আগেই ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়াছে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে মেয়ে উধাও হওয়ার এই ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হইল রাত দশটারও পরে। ছাড়া গরুর মত ছেলেমেয়েরা সব সময়ই ষ্টেশনের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়; কেহই তাহাদের সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগ বোধ করে না। কিন্তু রাত দশটা বেজে গেল, তবু মেয়ের দেখা নাই। দুলীর জেঠিমা এবার নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইলেন। বাঁদর মেয়েটা গেল কোথায়? সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিনই সে 'খাইতে দেও' 'খাইতে দেও' বলিয়া অস্থির করিয়া তোলে। সন্ধ্যার ভাত এখনও হাঁড়িতেই পড়িয়া আছে। বাসন মাজার ভারটাও দুলীর। এঁটো বাসন সবই পড়িয়া আছে।

পরের মেয়ে পালা বড় ঝামেলা! এখন নিজেদেরই দেখে কে অথচ সঙ্গে আবার দেওর কন্যা জুটিয়াছে। দুলীর বাপ-মা উভয়েই নিখোঁজ। দুলীর জ্যেঠী একে-ওকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ননীর সঙ্গে গত কিছুকাল ধরিয়াই দুলীর খুব ভাব চলিতেছিল। ননী মেয়ে ভাল নয়, কিন্তু এই গড্ডালিকার মধ্যে ভাল মন্দ কেউ বিচার করে না। দুলীর জ্যেঠী ননীর খোঁজ করিলেন। কিন্তু কেহই উহার সন্ধান দিতে পারিল না। অগত্যা 'দুলী' 'ও দুলী', 'দুলী হারামজাদী' বলিয়া হাঁক দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? ক্রমে এই হাঁক উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া আর্ত্তনাদের আকার ধারণ করিল।

এইবার জাগিয়া উঠিল আশ্রয়প্রার্থী মহাপরিবার। চেঁচামেচি, প্রশ্ন, তিরস্কার ও অভিযোগের এক অট্ট-রোলের সঙ্গে সঙ্গে দুলীর জ্যেঠী, মাসী, মামী ও

ঠানদিদিদের ক্রন্দনরোল সারা ষ্টেশন মুখর করিয়া তুলিল। পুলিশের লোকেরা ছুটিয়া আসিল ; ষ্টেশনের জনতা চারদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল 'মেয়ে চুরি গেছে' 'মেয়ে চুরি গেছে।' সর্ব্বত্রই এই রব।

এটাই প্রথম ঘটনা নয়। ইতিপূর্ব্বেও মেয়ে-ধরার কর্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে। দুর্গতদের সাহায্যদানের ভড়ং করিয়া বহু ভদ্র এবং ইতর আড়কাঠি এ অঞ্চলে আনাগোণা করিতেছে, ইহা প্রকাশ পাইতে দেরি হয় নাই। পুলিশ এ সম্বন্ধে ষ্টেশনের আশ্রয়প্রার্থী অজ্ঞ গেঁয়ো লোকগুলিকে সচেতন করিতে একেবারে চেষ্টা করে নাই, তাও নয়। কিন্তু ফাঁক অনেক। এই হট্টগোলের মধ্যে মন্দ লোকের সুযোগের অভাব হয় না।

'এই ছোক্‌রাটা ঐ মাইয়্যা দুইটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। অরে দিগাযন।—ওরে ঐ নিমাই। শোন দেখি।'

ষ্টেশনের এক থামের আড়ালে যথাসাধ্য গা-ঢাকা দিয়া নিমাই সভয়ে এই আলোড়ন লক্ষ্য করিয়াছে। ভয়ে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হইবার উপক্রম। ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেছে এবং এই ব্যাপারের সঙ্গে সেও জড়িত ছিল, এইটুকু বুঝিতে তার অসুবিধা হয় নাই। সহসা অদূর হইতে নিজের নাম শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল এবং যেন অজগর সাপের দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া অসহায়ভাবে সমুখে আগাইয়া গেল।

'এই ছেমরা, ক' দেখি ননী আর দুলী কই গেছে?'

প্রশ্নকর্ত্তা হরেকৃষ্ণ সরকার নিমাইর সুপরিচিত। আশ্রয়প্রার্থী ষ্টেশনবাসী সমাজের সে মাতব্বর ব্যক্তি। একে ত ইহাকেই তাহারা সমীহ করিয়া চলে। তার উপর তার সহিত পুরা য়ুনিফর্ম-পরা পুলিশের দারোগা। কয়েক সেকেণ্ড নিমাইয়ের গলা দিয়া আওয়াজই বাহির হইল না। অতঃপর কণ্ঠের জড়তা কাটাইতে সমর্থ হইয়া সে বিকল ঘড়ির মত আওয়াজে কহিল, 'ননীদি আর দুলী! জানি না ত।'

'জানস্ না! সারাক্ষণ ত অগো লগে লগে ঘোরস্।'

'কি হইছে অগো জ্যাঠামশায়!' নিমাই প্রাণের দায়ে আশ্চর্য বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া কহিল। 'গাড়ি চাপা পড়ছো?'

'ছেড়ে দিন ওকে।' দারোগাবাবু অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন।

নিমাই পালাইয়া বাঁচিল। কিন্তু দারোগাবাবুর দৃষ্টিটা তার ভেতরটায় পর্য্যন্ত যেন গাঁথিয়া বসিয়া গেছে। মুখে তিনি বলিয়াছেন বটে "ছেড়ে দিন", চোখ দুটাতে কুটিল সন্দেহ গাঢ় হইয়া ছিল, ইহাতে নিমাইয়ের সন্দেহমাত্র নাই। বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানের পর নিশ্চয়ই নিমাইয়ের সঙ্গে এই ব্যাপারের সম্পর্ক তাহার কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে। তখন আবার ডাক আসিবে "এই ছোকরা, শোন্ দেখি।" তখন আর রক্ষা নাই।

এই বিপদের মুখে নিমাই চটপট নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। অনেকদিন হইতেই ষ্টেশনের নোংরা আবহাওয়ায় সে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। অজানা শহরটা একটা প্রকাণ্ড ভয় না থাকিলে সে অনায়াসেই ইহার ভিতরে ভাগ্যান্বেষণে ঢুকিয়া পড়িত। এখন পরিচিত আবেষ্টনের ভয় আরও প্রত্যক্ষ ও ভয়ঙ্কর হইয়া ওঠায় সে অজানার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার সিদ্ধান্ত করিল।

এক আধটা কাপড় জামা, একটা থলে ও কিছু মুড়ি আশ্রয়স্থলে পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহা উদ্ধার করিবার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হইবে কি? ওগুলি আনিতে গিয়া অন্যদের সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া সব ভণ্ডুল হইবে। নিমাই আর সে চেষ্টা করিল না। বার বার চারদিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গাগুলি দিয়া ষ্টেশনের চৌহদ্দি অতিক্রম করিয়া সে ট্রাম রাস্তায় হাজির হইল। সেখানে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিল এবং পশ্চিমদিকের ফুটপাত ধরিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে হাঁটিয়া চলিল।

বৌবাজারের মোড়ে উপস্থিত হইয়া নিমাই প্রকৃতই দ্বিধার মধ্যে পড়িল। সিধা যাইবে, অথবা ডানদিকে মোড় লইবে? দুইই তার কাছে সমান। তবে ডান দিকেই আলোর জলুস বেশি। লোকের ভিড়ও বেশি। তার দ্বিধার কিন্তু সমাধান করিল ট্রাফিক পুলিশের হুইসিল। এই শব্দে আকৃষ্ট হইয়াই মোড়ের মধ্যপথে যান-নিয়ন্ত্রণরত পুলিশ নিমাইয়ের দৃষ্টিপথে পড়িল। রাস্তা অতিক্রম করার চেষ্টায় বিরত হইয়া ডান দিকে মোড় লইয়া সে তাড়াতাড়ি পুলিশের সান্নিধ্য হইতে সরিয়া পড়িল।

তিন

এত দোকান, এত আলো, এত মানুষের ভীড় নিমাই জীবনে দেখে নাই। যেন কোন এক আজব দেশে আসিয়া হাজির হইয়াছে। বার বার সে পথ-চারীদের গায়ে ধাক্কা মারিয়া বকুনি খাইল। এতখানি বিস্ফারিত চোখ, অথচ সামনের মানুষও নজরে না

পড়িলে বকুনি খাইতে হইবে। কিন্তু এ সব সে ভ্রূক্ষেপই করিল না। এত দ্রষ্টব্যের কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা দেখিবে? দোকানের সাইনবোর্ডে রাস্তার নামটা পড়িয়াছে। বহুবাজার ষ্ট্রীট। অনেকগুলি বাজার এক সঙ্গে জড়ো না করিলে এমনটা হওয়া অসম্ভব!

কিন্তু ব্যাপারটা কি! সবাই হঠাৎ এমন দোকানপাট বন্ধ করিতে শুরু করিয়াছে কেন? পট পট করিয়া আলো বন্ধ হইতেছে, লোহার ফটক টানা হইতেছে, দরজার পাট একটির পর একটি সাজাইয়া তাহাতে আড়াআড়ি ভাবে লোহার লম্বা পাত বসাইয়া কুলুপ মারা হইতেছে। দাঙ্গা শুরু হয় নাই ত?

সহসা নিমাইয়ের ভয় করিতে লাগিল। শিয়ালদ ষ্টেশনের পরিচিত আবেষ্টনী নেহাত প্রাণের দায়েই সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। একেই প্রাণে ভয় ছিল, তার উপর এসব লক্ষণ তার ভালো লাগিল না। পাইকিরিভাবে ঠিক একই সময়ে সবাই দোকান আটকাইতেছে কেন?

নিমাই যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। একটা পুরাণো দোতলা-বাড়ির নিচে পাশাপাশি একটি সোনারূপার গহনার অপরটি খাবারের দোকান। গহনার দোকানের কলাপসিব্‌ল গেট টানার আওয়াজ ও ভঙ্গি তাহার পূর্বোক্ত আশঙ্কা দৃঢ়তর করিল মাত্র। মিষ্টির দোকানটা তখনও খোলা ছিল। সে রীতিমত ভীত হইয়া কাচের শো-কেসটার মাঝখানের ক্ষুদ্রাকার জানালাটার কাছে বসিয়া যে ব্যক্তি মিষ্টি বিক্রি করিতেছিল তার কাছে হাজির হইল এবং উদ্বিগ্নস্বরেই প্রশ্ন করিল, 'কি হৈছে? সকলে এমুন দরজা বন্ধ করতাছে ক্যান্‌?'

'কি দেব বল্লে?'

'না, জিগ'ই, একসঙ্গে সকলে দোকানপাট আটকায় ক্যান?'

'আরে দেখছ না ভাই। ডাকাত পড়েছে।' বিক্রেতা রগড় করিয়া কহিল। 'দেশ কোথায়? আরে দূর বোকা, সত্যি কি ডাকাত নাকি। সাড়ে আটটার পরে দোকান খোলা থাকলে আইনে ধরে যে। রিফিউজী মনে হচ্ছে। কোথায় থাক?'

'থাকার জায়গা নাই। পয়সা কড়ি নাই। বাপ মা হারাইছি।' একটা সুযোগের সন্ধান পাইয়া নিমাই কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট পরিমাণ বাষ্পসংযোগ করিয়া কহিল: 'দয়া কইরা যদি একটা আশ্রয় দেন, বিনা মায়নায় খাটুম...'

'আর তার পরদিনই সুযোগ বুঝে ক্যাস বাক্সটি বগলে নিয়ে লম্বা দেও! বেশ চালাক ছেলে দেখছি! খসে পড়।...কি বললেন, এক টাকার সিঙাড়া? একেবারে টাটকা, গরম ভাজা!...ওরে ঐ ছোকরা, নে, এই সিঙাড়াটা নে, খেগে।'

দোকানের কর্মচারির বকুনি খাইয়া এবং নবাগত ক্রেতাকে জায়গা ছাড়িয়া দিয়া নিমাই স্থান ত্যাগের উদ্যোগ করিয়াছিল, এমন সময় শেষোক্ত আহ্বান শুনিতে পাইল।

নিমাই কাছে ফিরিয়া আসিল। কহিল, কি কয়ন?'

'নে, এইটা নে।'

'না। নিমুনা। আমি চোর! চোররে আবার খাতির কি?'

'বাঙালের রাগ দেখেচ!' মিষ্টান্ন বিক্রেতা ইহার ছেলেমানুষিতে রীতিমত কৌতুক বোধ করিয়া কহিল। 'নে, দুটোই দিলুম। খেয়ে নে। তারপর যেখানে ইচ্ছে যাও। পেটে না পড়লে যে তারও জো নেই।' বলিয়া বিক্রয়-গবাক্ষ দিয়া হাত বাড়াইয়া সে প্রা[illegible] নিমাইয়ের মুঠোর মধ্যেই দুটো সিঙাড়া গুঁজিয়া দিল ইহার চোখে-মুখে স্পষ্ট ক্ষুধার ছাপ। বেচারী হয়[illegible] কিছুই খায় নাই। ঝাঁজালো কথা বলিয়া এখ[illegible] নিজেরই মায়া হইতেছে।

নিমাই আর আপত্তি করিল না। পেটে তার আগু[illegible] জ্বলিতেছে। নিতান্ত আত্মসম্মানের খাতিরেই তাে[illegible] অভিমান দেখাইতে হইয়াছিল। ইহার ফলও মন্দ হ[illegible] নাই। একটির বদলে একজোড়া প্রাপ্তি ঘটিয়াছে গোগ্রাসে সে সিঙাড়া দুটো পলকের মধ্যে নিঃশে[illegible] করিল।

মিষ্টির দোকানের পশ্চিম দিকে একটা সঙ্কীর্ণ গলি। এই গলির মোড়ের টিউব-ওয়েল পাম্প করিয়া তখনও অনেকে জল নিতে ছিল। নিমাই সেখানে আগাইয়া গেল এবং এক ফাঁকে তাহার তলায় আঁজলা পাতিয়া দিল। অগত্যা পরবর্তী কলসীর মালিকের পাম্প করিয়া তাহার তৃষ্ণা মিটানো ছাড়া উপায় রহিল না।

মোড়ের ওদিককার তেতলা প্রকাণ্ড বাড়ীটার ব্যাল্‌কনি বড় রাস্তার প্রকাণ্ড চওড়া ফুটপাথটা সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। নীচতলার দোকানঘরগুলির দরজাও প্রায় সবগুলিই বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। নিমাই স্থানটা আবিষ্কার করিয়া পরম পুলকিত বোধ করিল। রাতের আশ্রয়স্থল হিসাবে এমন জনবিরল আরামদায়ক স্থান সে বহু দিন চোখে দেখে নাই। পাশেই ট্রাম-লাইন মেরামত হইতেছিল। সেখান হইতে খুঁড়িয়া-তোলা পিচের বড় সাইজের টুকরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নিমাই তাহা ব্যাল্‌কনির এক থামের কাছাকাছি রাখিল। এত সহজে যে বালিশের সমস্যাটার সমাধান হইবে, কে আশা করিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য আজ প্রসন্ন মনে হইতেছে।

সারাদিন আজ কম ধকল যায় নাই। রাতের খাওয়াটাও জুটিয়া গিয়াছে। শোবার জায়গাও পায়ের তলায় প্রসারিত। নিমাই গায়ের সার্টটা খুলিয়া জড়াইয়া লইল এবং পিচের বালিশের উপর উহা স্থাপন করিল। ফতুয় গায়ে দিয়াই শুইবে কি? বিছানার বিকল্প হিসাবে উহা যথেষ্ট নয়, তবে পথের ধুলা হইতে গাটা বাঁচিবে। আর বিলম্ব না করিয়া সে থামটার কাছ ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িল।

শিয়ালদ ষ্টেশনের ভিড় ও আবর্জনার তুলনায় অনেক ভাল জায়গা এটা। তবে একেবারেই অপরিচিত স্থান। একটা লোকও ধারে কাছে চেনা নাই। নাই বা থাকিল। আপনার জন ত অনেকদিনই হারাইয়াছে। এবার না হয় সাথীসঙ্গীদেরও ত্যাগ করিয়াছে। ভাগ্য যেমন চালাইবে তেমনি ত হইবে।

ছলী ও ননীদি সম্পর্কে একটা সঙ্কোচ ও কর্তব্যে ত্রুটিজনিত অপরাধবোধ এখনও মনের মধ্যে অদৃশ্য কাঁটার মত খচখচ করিতেছিল, কিন্তু ক্লান্তি তার চেয়েও প্রবল। শীঘ্রই নিদ্রা আসিয়া হাজির হইল।

বেশ গাঢ় ঘুমই আসিয়াছিল। সহসা একটা তীব্র দুঃস্বপ্নে সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কে যেন সজোরে পাঁজরার উপর দমাদম লাথি মারিতেছে। ঘুমবিজড়িত চোখে নিমাই ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল এবং সেই অবস্থায়ই উপলব্ধি করিল, লাথিগুলি স্বপ্নের নহে, একেবারে বাস্তব লাথি!

'উঠ, সালে, উঠ।'

'এই, মারতা হ্যায় ক্যান?'

'দস শাল থেকে আমি এখানে নিদ্‌ করছি, আর তু সালা কুথা থেকে এসেচিস্‌রে। মারকে হাড় তুড়ে দেব…'

পরণে জীর্ণ লুঙ্গি, বহুতালিসংযুক্ত আধছেঁড়া ফতুয়া গায়ে, বাঁ হাতে গোটা তিনেক ছোট আকারের কাপড়ের পুঁটলি, ডান হাতে লাঠি। চিবুকের মুসলমানী দাড়ির পশ্চাৎপটে দাঁত খিঁচুনি প্রায়ান্ধকারেও বেশ স্পষ্ট।

নিমাই ইহার ব্যক্তিত্ব উপেক্ষা করিতে পারিল না। কহিল, 'আমি জানতাম না তো, তাই শুইচি। আমি সইরা যাই, তুমি শোও। আমার ঘরবাড়ী কিছু নাই, আপনার জন কেউ নাই…।

জায়গার মালিক পলকে কাপড়ের পুঁটলিগুলি মুক্ত-স্থানে নিক্ষেপ করিয়া নিজের দখল জারি করিল। পুঁটলি-গুলির একটির গিঁঠ ছাড়াইয়া বিছানা হিসাবে ছড়াইয়া দিল। অবশিষ্ট দুটির একটি বালিশ ও অপরটি পাশ-বালিশ। হাতের লাঠিগাছা পোর্টিকোর থামের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া 'বিসমোল্লা' বলিয়া বিছানায় নিজেকে নিক্ষেপ করিল ও রকিং চেয়ারের মত বারকয়েক নড়িয়া-চড়িয়া স্থির হইল।

'লে লে কুত্তাটাকে হটিয়ে দুকানঘরের বগলে শুয়ে যা'। অবশেষে সে উদারতার সঙ্গে কহিল। 'আমার লাঠিটা লে। নেই তো সালা কামড়ে দেবে।'

নিমাই উহার কথা মত কুণ্ডলী-পাকানো খেঁকো কুকুরটাকে তাড়না করিল। গভীর প্রতিবাদ করিয়া নির্লোম দেহটাকে ধনুকের জ্যার মত বাঁকা করিয়া সারমেয় রুখিয়া দাঁড়াইল—কেরে তুই আমার অধিকারে বাগড়া দিবার? নিমাইও ঘাবড়াইবার নয়। সেও লাঠি দিয়া পিঠে দুখানা সজোর ঘা বসাইয়া দিল। তখন তীব্র আর্তনাদে মধ্যরাতের আকাশ বিদীর্ণ করিতে করিতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে বেচারী রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

ফুটপাথের অপরাপর স্থানে আর যে কয়জন শুইয়া ছিল, তাদের দুএকজনের সুখনিদ্রা ইহাতে ব্যাহত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। নিদ্রাবিজড়িত কয়েকটি কণ্ঠ হইতেই অশ্রাব্য গালি ধ্বনিত হইল, কিন্তু কণ্ঠের মালিকদের

ঝগড়া সহিংস করিবার মত অবস্থা নয়, তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। নিমাই উহাতে অনাবশ্যক কান না দিয়া পলকে নিজের শয্যা রচনা করিয়া ফেলিল।

'কি নাম তুর?'

'নিমাই।'

'কি কাম কোরিস রে ছোঁড়া? জুতা-পালিশ?'

'না। কাজের খোঁজ করি।' নিমাই তাহার মুরুব্বির প্রশ্নের জবাবে কহিল।

'আচ্ছা ঠিক আচে ডরিস না। আমি কাম ঠিক করে দিব। রমজান মিঞা কত আদমীর রোটী করে দিয়েছে। তোরও কাম জুটবে। হামাকে রমজান চাচা বলে ডাকবি, সমঝেচিস্?'

নিমাই নীরব রহিল। যে মুসলমানের ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই মুসলমানই পাশে হাজির! কিন্তু ভয় আর নাই। জাতবিচারও নাই। যে সাহায্য করিতে চায় সেই বন্ধু।

'কাল লিয়ে যাব তুকে। গানা জানিস্? জানিস তো একটা আঁখ কানা করে দিলে খুব কামাতে পারবি। ...শুন, শুন। কেমন গানা হচ্চে! মিঠাই দুকানের দুতলা থেকে। কেমুন রোশনি আসচে দেখ্! নৈন তারা বাইজি বড়ী খান্দানী বাই। উহ্ কিসমৎমাইয়ার ভী আছে।' বলিয়া অদূর হইতে ভাসিয়া আসা স্ত্রী-কণ্ঠের ঠুংরীর সাথে বিছানার পাশে রাখা শূন্য টিনটা বাজাইয়া তাল দিতে শুরু করিল।

'শুন ছোঁড়া। ঈদের পরব হবে জানিস। রূপায়া জমাচ্ছি। শো রূপয়া হাতে লিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাব নৈন তারার মজলিশে। চুড়িদার পাজামা, রেশমী আচকান, আঁখে সুরমা, দাড়িতে খোসবু। রমজান মিঞা নবাবজাদা! গিয়ে কি বোলব শুন। বলব, "শুন মেরা জান, নৈন তারা বিবি···"কিরে ছোঁড়া, নাক ডাকাচ্চিস! আরে সালে সোগে···'

ক্রমশঃ

নান্নুর

·কুমারলাল দাশগুপ্ত

বাস লোকে ভরতি। ড্রাইভারের পাশে দুটি সিটে দুজন বসেছি। বৈশাখের সকাল বেলা, বাসের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে গায়, বাস চলেছে পুবমুখো। পথের দুধারে দিগন্ত প্রসারিত শস্যহীন মাঠ, মাঝে মাঝে তাল-পুকুর, গ্রামের সীমানায় ঘন তালবন, ধূসর দৃশ্যপটে তাল-গাছেরই প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথের বোলপুর থেকে আমরা চণ্ডীদাসের নান্নুর চলেছি।

অনেক দিন আগেই নান্নুর যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। নতুন বছর এসে গেছে, ভাবলাম আর দেরী করা নয়, তাড়া-তাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক। প্রস্তুত হচ্ছি; ভাগ্যে অচিন্ত্য-কুমার বল্লেন "আমিও যাব"। সঙ্গী পেয়ে উৎসাহ বেড়ে গেল। ২রা বৈশাখ বোলপুরে এসে রাত কাটালাম। ৩রা বৈশাখ সকাল বেলা স্নান করে ষ্টেশনের রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ সেরে বাসে উঠে বসলাম। বিয়ের তারিখ ছিল আগের দিন, দেখতে দেখতে বরকনে ও বরযাত্রীতে বাস ভরে গেল। একটা ট্রানজিষ্টার রেডিও বেজে উঠলো, বর সেটি যৌতুক পেয়েছেন। এই সমারোহের মধ্যে আমাদের নান্নুর যাত্রা শুরু হোলো।

বোলপুর থেকে নান্নুর বারমাইল পথ, যেতে লাগলো প্রায় আড়াই ঘণ্টা। এই সময়টা কাটলো বেশ উত্তে-জনার মধ্যে। বাস যেখানেই থামছিল, মনে হচ্ছিল এসে গেছি নান্নুর। পাশের একটি ভদ্রলোক বার বার আমার ভুল ভেঙে দিচ্ছিলেন, তিনিও নান্নুর-যাত্রী। মন্থর গতিতে বাস এগিয়ে যাচ্ছিল। পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে একই দৃশ্য দেখছিলাম, বড় বড় মাঠ, মাঝে মাঝে তালগাছ। মনে হচ্ছিল যেন বিরাট মুক্তির মাঝে এক একটি রুক্ষকেশ নগ্ন-সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছে।

এক জায়গায় এসে পুবমুখো পথ ঘুরে গেল উত্তরে। বাস মোড়ে এসে দাঁড়াতেই পাশের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন "নামুন, নান্নুর পৌছে গেছি।" তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম, বাস চলে গেল কীর্ণাহারের দিকে। পথের উপর দাঁড়িয়ে ভিতরে একটা উত্তেজনা বোধ করলাম। অনেকদিনের ইচ্ছা আজ পূর্ণ হোলো, আজ সত্যিই নান্নুরে এলাম।

মোড় থেকে একটা পথ পুবদিকে এগিয়ে গেছে, আমরা সেইপথ ধরে চল্লাম। মিনিট দুই চলবার পরে বাঁয়ে দেখলাম চণ্ডীদাস তোরণ, বুঝলাম তীর্থের দরজায় এসে পৌছেছি। ইঁটের তৈরি তোরণটি বেশ উঁচু, তার উপরের খিলানে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিদুটি লেখা—শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই। শুনলাম এ তোরণ অল্পদিন আগে তৈরী হয়েছে। তোরণের ভিতর দিয়ে আমরা বাশুলী মন্দিরের দিকে চল্লাম। গ্রামের সরু পথ, কয়েকখানা বাড়ী পরেই পথের ধারে দেখলাম ভাঙ্গাইঁট ও মাটির একটা ঢিপি, সেই ঢিপির উপরে মস্ত এক বটগাছ। এটি যে বাশুলীর মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ তা অনুমান করে নিলাম। অচিন্ত্যকুমার স্তূপের ফটো তুলে নিলেন। স্তূপের পুবদিকে একটা পুকুর। নাম দেয়াকুঁড়ো। শুদ্ধ ভাষায় দেয়াকুঁড়ো হচ্ছে দেবকুণ্ড, নামেই বুঝা গেল এটি আদিমন্দিরের পুকুর।

চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি. বাশুলীমন্দির তার অনেক আগেকার। চণ্ডীদাস যখন মন্দিরের পূজারী তখন মন্দিরের জমজমাটি অবস্থা, লোকে বলে, কালক্রমে জীর্ণ হয়ে এমন্দির ভেঙে পড়েনি। চণ্ডী-দাসের সময়ে ভূমিকম্পেই হোক বা স্থানীয় মুসলমান ফৌজদারের আক্রমণেই হোক মন্দির ধ্বংস হয়। সবদিক থেকে বিচার করলে ফৌজদারের আক্রমণই ধ্বংসের কারণ বলে মনে হয়। তন্ত্রের যুগে মন্দিরে নরবলি হোতো। শুনলাম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে স্তূপের নীচে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। এ কঙ্কাল কাদের সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না।

প্রাচীন বাশুলী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ

স্তূপের উত্তরে বাশুলীর নতুন মন্দির, আমরা সেই মন্দিরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালাম। শুনলাম, এ মন্দির ১৮৯২ সালে তখনকার পূজারী কার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য তৈরি করান। নতুন মন্দির মোটেই মন্দিরের মত দেখতে নয়। সামনে একফালি খোলা চাতাল, তারপরে প্রায় সমচতুষ্কোণ একটি ঘর, তিনটি খিলান পথ, ভিতরে সরু বারান্দার পরেই একটি প্রকোষ্ঠ, মাঝখানে একমাত্র দরজা, দুপাশে দুটি ছোট ছোট জানালা। এই প্রকোষ্ঠে ঠিক দরজার সামনে দেবীর আসন। প্রকোষ্ঠের ছাতের মাঝখানে মন্দিরের চূড়ার মত ছোট একটি চূড়া গাঁথা, মন্দিরের সঙ্গে এই ঘরটির এইটুকুই যা সাদৃশ্য। মন্দির-চত্বর তেমন বড় নয়। 'পূব-পশ্চিমে প্রায় পনর হাত, উত্তর দক্ষিণে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাত, মাঝখানে হাড়ি-কাঠ গাড়া। চত্বরের উত্তরে দক্ষিণমুখো বাশুলী মন্দির, পশ্চিমে দুটি ও দক্ষিণে দুটি শিব মন্দির। দক্ষিণ দিকের শিবমন্দির দুটির গায় সুন্দর টেরা-কোটা কাজ। শিবমন্দির কটি বেশ প্রাচীন, দেড়শ, দুশ বছরের তো হবেই।
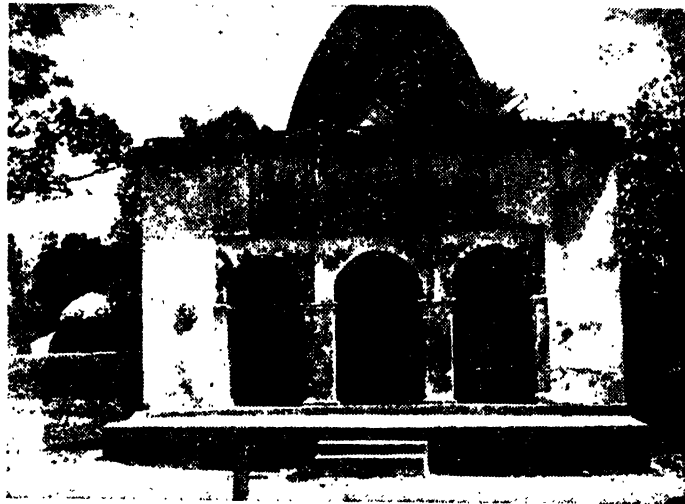
বর্তমান বাশুলী মন্দির

আমরা যখন মন্দির চত্বরে পৌঁছালাম, পূজারী তখন পূজা করছিলেন। তাড়াতাড়ি মন্দিরে উঠে প্রকোষ্ঠের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেবীমূর্তি জবাফুল দিয়ে সাজানো, স্পষ্ট কিছু দেখতে পেলাম না, মনে হোলো ছোট একখানা শিলাপটের উপর দেবীমূর্তি ক্ষোদিত। বাশুলী মূর্তির সামনে পূজারত এই পুরোহিতটির মতই প্রায় পাঁচশ বছর আগে চণ্ডীদাসও দেবীর পূজো করতেন। বাশুলী দেবী তখন জাগ্রত, পূজারীও মহাসাধক। এইখানে এই তালকুঞ্জের মাঝে দেবকুণ্ডের ধারে বাশুলীর আদেশ পেলেন চণ্ডীদাস—

সহজ ভজন করহ যাজন,
ইহাছাড়া কিছু নয়।

রূপান্তরিত হয়ে গেলেন চণ্ডীদাস, তান্ত্রিক হলেন প্রেমের সাধক।

একটু পরে পূজো শেষ হোলো, পুরোহিত উঠে এসে আমাদের হাতে প্রসাদ দিলেন।

মন্দির চত্বর থেকে আবার গাঁয়ের পথে নেমে আমরা উত্তরমুখো এগিয়ে চল্লাম। সরু পথের দুদিকে মাটকোঠা। একটা মোড় ঘুরতেই দেখি আর একটা তোরণ, সেইখানে শেষ হয়ে গেল গ্রামও। নান্নুর গ্রাম খুবই ছোট। গ্রামের উত্তর প্রান্তে বেশ বড় একটা পুকুর, বৈশাখ মাসেও তাতে যথেষ্ট জল রয়েছে, গ্রামের বউ-ঝিরা জল নিচ্ছে। পুকুরের নাম শুনলাম বর্গীপুকুর। পুকুরটি প্রাচীন, নাম শুনে মনে হোলো বর্গীদের সঙ্গে পুকুরের কিছু একটা সম্বন্ধ আছে। হয়তো বর্গীর হাঙ্গামার সময় এই পুকুরটা কাটা হয়েছিল, অথবা এক সময়ে এই পুকুরের ধারে বর্গীরা ছাউনি ফেলেছিল।

বর্গীপুকুরের পাশ দিয়ে গ্রামের পথ মস্ত মাঠের ভিতর দিয়ে উত্তরমুখো কীর্ণাহারের দিকে চলে গেছে। মন্দিরের আশেপাশে আমরা যে নান্নুর গ্রাম দেখলাম চণ্ডীদাসের সময় গ্রাম সেখান ছিল না। ছিল উত্তরের ঐ মাঠে। শুনলাম চাষের সময় এখনও লাঙলের ফালে সেখানে ইঁট উঠে আসে। চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে—

নান্নুর মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ সে পাইবে কোথা॥

এ থেকে বুঝতে পারছি চণ্ডীদাসের সময় মন্দির ছিল গ্রাম থেকে দূরে মাঠের মাঝখানে। যে মন্দিরে নরবলি হোতো সে মন্দির একান্তে মাঠের মাঝখানে হওয়াই স্বাভাবিক। অচিন্ত্যকুমার বর্গীপুকুরের ফটো তুলে নিলেন। আমরা গাঁয়ের ভিতর দিয়ে মন্দিরের দিকে ফি[রলা]ম।

বাশুলীর নতুন মন্দির ও ভাঙ্গা মন্দিরের স্তূপ বাঁয়ে রেখে আমরা আবার বড়রাস্তার তোরণের নীচে এসে দাঁড়ালাম।

বর্গী পুকুর

যে পথ ধরে এলাম সে পথ বড়রাস্তা পার হয়ে চলে গেছে দক্ষিণে, শুনলাম সেই পথের ধারেই রামীর পুকুর। রজকিনী

রামীর পুকুর

রামী নাকি সেই পুকুরে কাপড় কাচতেন। রামীর পুকুর খুব কাছেই, মিনিট দুএকের পথ, আমরা এগিয়ে গিয়ে তার পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। রামীর পুকুরের কোন শ্রীছন্দ নাই, অনেকখানি লম্বা, দেখেই মনে হলো যেন মরানদীর এক অংশ। রামীর পুকুরের পশ্চিমে কাছাকাছি আরো দুটো ঐ রকম পুকুর, তিনটে জুড়ে দিলে নদীর একটা বাঁকের মত দেখতে হয়। আসলে ও তাই, আজ পুকুর তিনটি প্রাচীন অজয়ের একটি বাঁক। রামীর সময় অজয়নদ এইখান দিয়েই বয়ে যেতো। কালক্রমে নদ সরে গেছে, নদের কোন কোন অংশ পুকুরে পরিণত হয়েছে।

আমরা রামীর পুকুর দেখছি এমন সময় স্নানার্থী একটি ভদ্রলোক কাছে এসে বল্লেন "রামীর কাপড় কাচার পাট দেখেছেন? আমরা জানালাম, আমরা এইমাত্র এসেছি, রামীর কাপড় কাচার পাট দেখি নাই। ভদ্রলোক বল্লেন, ঐ যে সামনে ছোটো চালাখানা, ওরই পাশে কাঠের পাটা রাখা আছে। রামীর কাপড় কাচার পাট একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ, আমরা তাড়াতাড়ি চালার দিকে এগিয়ে গেলাম। সত্যিই সেখানে একটুকরো কাঠ যত্ন করে রাখা আছে। আমি ঝুঁকেপড়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আমার মনে হোলো এ যেন কাঠ নয়। হাত দিয়ে ছুঁতেই বুঝলাম এ পাথর। রামীর কাপড় কাচার পাট বলে যা সেখানে রাখা আছে তা হচ্ছে একটুকরো প্রস্তরীভূত Fossilized কাঠ। কাঠের আঁশগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি তো অবাক! রামী প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার মানুষ, তাঁর কাপড় কাচার পাট মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকলেও কি এত অল্পসময়ে প্রস্তরীভূত হতে পারে? মনে হয় তা হোতে পারে না। এই প্রস্তরীভূত কাঠের

রামীর কাপড় কাচার পাট
(প্রস্তরীভূত কাঠের টুকরো)

টুকরো তাহলে কোথাথেকে এলো? এ সম্বন্ধে ভাল করে অনুসন্ধান করা উচিত।

রামীর পুকুর নাম হলেও রামী ধোবানী যে এই পুকুরে কাপড় কাচতেন তা বলা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রামী কৈশোর থেকেই বাশুলী মন্দিরে কাজ করতেন, অন্য ধোবানীদের মত কাপড় কাচতেন না। নান্নুর, চণ্ডীদাস, রামী এই তিনকে নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেন চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুরবাসী ছিলেন না, ছিলেন বাঁকুড়ার ছাতনাবাসী। স্থান ও কাল যদি স্থির হোলো, পাত্রকে নিয়ে চল্ল টানাটানি। কেউ বল্লেন চণ্ডীদাস এক, কেউ বল্লেন চণ্ডীদাস অনেক। কেউ বল্লেন পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাসই আসল, কেউ বললেন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসই আসল। দুইপক্ষেই বড় বড় পণ্ডিত আছেন। বাংলার মানুষ চণ্ডীদাস বলতে পদাবলীর চণ্ডীদাসকেই বোঝে, পদাবলীর অপূর্ব ভাব ও ভাষায় তারা মুগ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হালে আবিষ্কৃত হয়েছে। পুঁথির শেষের কয়েক পাতা পাওয়া যায়নি। পুঁথির কোন নাম ছিলনা, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নাম পরে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বাংলাভাষা বলে মনেই হয় না,

ভাবেরও অত্যন্ত অভাব। আমাদের বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস অনেক পরের লোক।

অনেকে রামীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন কিংবদন্তী নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়। একথা মানা যায় না। বৃন্তহীন পুষ্প যেমন সম্ভব নয় (উর্বশী বাদে) সত্যহীন কিংবদন্তীও তেমন সম্ভব নয়। কিংবদন্তীর পিছনে কিছু না কিছু সত্য থাকবেই। স্বর্গগত ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর Obscure Religious Cults নামক বইতে লিখেছেন "Though the story of the love-episodes of chandidasa the greatest love poet of Bengal, with washer woman Rami is still shrouded in mystery and as such cannot be credited historically as supplying proof of Chandidasa himself being an exponant of the Sahajiya practice, yet we should remember that tradition always indicates possibility অর্থাৎ বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি চণ্ডীদাসের সঙ্গে রামী ধোবানীর প্রণয়-ঘটিত আখ্যায়িকাগুলি আজপর্যন্ত রহস্যে আবৃত রয়েছে। সে কারণ চণ্ডীদাসের সহজিয়া সাধনের স্বপক্ষে সেগুলো ঐতিহাসিক প্রমাণ রূপে উপস্থাপিত করা যায় না। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে যে কিংবদন্তী সবসময় 'ঘটতে পারে' এই নির্দেশই দেয়।

রামীর পুকুর দেখে আমরা আবার গ্রামে ফিরে এলাম। চণ্ডীদাসের বাড়ী কোথায় ছিল এখন তা খুঁজে বার করা অসম্ভব। চণ্ডীদাসের অবস্থা ভাল না থাকলেও তাঁর আত্মীয়স্বজনের অবস্থা ভালই ছিল, বিশেষকরে ভাই নকুলের। তাদের বাড়ীঘর নিশ্চয়ই ভাল ছিল। প্রাচীন গ্রাম লুপ্ত হয়ে গেছে, চণ্ডীদাসের ভিটের সন্ধান করবো কোথায়? রামীর বাড়ী সম্বন্ধেও ঐ কথা। কেউ কেউ বলেন রামীর বাড়ী ছিল নান্নুরের পাশের গ্রাম তেহাই-তে। তা থাকলেও রামী স্বগ্রাম ছেড়ে নান্নুরেই ঘর বেঁধেছিলেন। চণ্ডীদাস নিজের বাড়ীতে বেশীদিন থাকতে পারেননি, সমাজের শাসনে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে নিজের ঘর ছেড়ে চণ্ডীদাস রামীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং রামীর সহযোগিতায় সহজ-সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রামীর ঘর গ্রামের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। তালকুঞ্জ শোভিত নির্জন নান্নুরের মাঠ তখন সাধনার অনুকূল স্থান ছিল। তাই মনে হয় রামীর ঘর মন্দিরের কাছেই ছিল।

চণ্ডীদাসের সময় দেশের যাঁরা রাজাউজির নবাব বাদশা ছিলেন তাঁদের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কথা বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সেই যুগে সাধারণ মানুষের জীবন গ্রামের সীমানার মধ্যেই কেটে যেতো। চণ্ডীদাস সাধারণ মানুষ ছিলেন তাই তাঁর সময়ে গ্রাম্যসমাজের রূপ কেমন ছিল তা জানতে ইচ্ছে করে। ধোবিনীর সঙ্গে প্রেম করে দ্বিজ চণ্ডীদাস পতিত হয়েছিলেন, আবার কুটুম্ব ভোজন করিয়ে জাতে উঠেছিলেন সে খবর আমরা তাঁর কাব্যে পাই। এই রকম টুকরোটাকরা খবর জানা গেলেও তদানীন্তন সমাজের সামগ্রিক রূপ ধারণা করা যায় না। খুব সম্ভব রাজাগণেশের রাজত্বকালে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময়ে দেশে কিছু শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা না থাকলে সাহিত্য ও শিল্প-চর্চা সম্ভব হয় না। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। যদুর সময়েও দেশে মোটামুটি শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। যদুর রাজত্বকালেই চণ্ডীদাস তাঁর সুললিত পদাবলী রচনা করেন।

ভাঙামন্দিরের আশেপাশে ঘুরছি এমন সময় চোখে পড়লো দেবকুণ্ডের পারে এক অশথগাছের নীচে ছোট একখানা মেটে ঘর। ঘরের মালিক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাঁর আমন্ত্রণে সেই ছোট ঘরের বারান্দায় উঠে বসলাম। চণ্ডীদাস ও রামী সম্বন্ধে দুচারটে কথা হোলো। বাশুলীর প্রাচীন মন্দির কেমন করে ধ্বংশ হোলো সে সম্বন্ধে কোন প্রবাদ চলতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বল্লেন "শুনেছি কীর্ণাহারের তদনীন্তন নবাব মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। দেশের লোকের উপর, এমনকি মুসলমানদের উপরেও চণ্ডীদাসের পদাবলীর মাধ্যমে প্রেমধর্ম্মের প্রভাব পড়ছে দেখে নবাব রুষ্ট হয়েছিলেন।" রামীর ঘর কোথায় ছিল সে বিষয়ে কিছু শুনেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে বল্লেন "শুনেছি মন্দিরের কাছেই ছিল।" কথাটা আমার উপর মন্ত্রের মতই কাজ করলো, মনে হোলো যেন এইখানেই এমনি একখানা ছোট ঘরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে চণ্ডীদাস রামীকে বলেছিলেন—

শুন রজকিনী রামী।
যুগল চরণ শীতল বলিয়া
শরণ লইনু আমি।।

এই বাশুলী মন্দিরের প্রাঙ্গণে, এই দেবকুণ্ডের ঘাটে, এই নান্নুরের পথে পথে রামী আর চণ্ডীদাস প্রেমে পাগল হয়ে বেড়াতেন। "এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি, পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।" একজন আর একজনকে তিলেক না দেখলে যেন মরে যান। এই দুটি মানুষের প্রেম কেমন করে দেহ থেকে দেহের অতীতে, অনিত্য থেকে নিত্যে পেঁছিল তার কাহিনী আজও সাধককে অনুপ্রাণিত করে।

বেলা পড়ে আসছিল, পথের পাশে তালের দীর্ঘছায়া দীর্ঘতর হচ্ছিল। আমি উঠে পড়লাম, বাশুলী মন্দিরের প্রাঙ্গণে মাথা ঠেকিয়ে নান্নুর থেকে বিদায় নিলাম।

সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ ও প্রকৃত সার্থকতা

সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

সাধারণভাবায় সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার-মূলক সম্যক আলোচনাকে সমালোচনা বলা যেতে পারে। সাহিত্যের ভাব ভাষা, রীতিনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের অপক্ষপাত নিখুঁত আলোচনাই সাহিত্যের সম্যক আলোচনার নামলাভ করবে।

সমালোচনা শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। টীকাকার আর সমালোচক এক নন। তাঁদের মধ্যে সুচিন্তিত পার্থক্য-রেখা বর্তমান রয়েছে। টীকাকার প্রত্যেক শ্লোকের দুরূহ শব্দমাত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা করে থাকেন। আর সমালোচক কোন গ্রন্থের সামগ্রিক আলোচনা করে থাকেন। সমালোচক—এই শব্দটির মধ্যেই সমালোচনার আদর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ কোন গ্রন্থের কেউ যখন সমান আলোচনা করেন তখনই তিনি সমালোচক বলে চিহ্নিত হন। কিন্তু সমান আলোচনা বলতে কি বুঝব? সমান আলোচনা বলতে বুঝবো গ্রন্থের মধ্যস্থিত ভাল ও মন্দের নিরপেক্ষ আলোচনা।

সাহিত্যের এই সমালোচনা নানাভাবে হতে পারে। কেন না বিভিন্ন লোকের রয়েছে বিভিন্ন রকমের রুচি, বিভিন্নধারার শিল্পবোধ। কাজেই বিচারের দৃষ্টিকোণও পৃথক হতে বাধ্য।

দৃষ্টিকোণের এই বিভিন্নতা বশতই নানাধরণের সাহিত্য সমালোচনার উদ্ভব হয়েছে।

যাঁরা কেবলমাত্র গ্রন্থের শব্দ ও অর্থালঙ্কারেরই আস্বাদন গ্রহণ করতে ভালবাসেন এবং তাঁদের এই ভালবাসাকে অন্যের মধ্যে বিস্তার করে দেবার প্রয়াস পান, তাঁদেরকে আলঙ্কারিক পদ্ধতির সমালোচক বলা যেতে পারে। এই মতে যাঁরা বিশ্বাসী এবং এই পদ্ধতিতে যাঁরা সাহিত্য সমালোচনা করে থাকেন তাঁদের মতে কাব্যের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র অলংকরণের উপরেই নির্ভরশীল। তাঁরা কেবল সাহিত্যের আঙ্গিকগত শুভ্রতার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কিন্তু, "কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ"—এই মত গ্রহণ করলে সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনা সম্ভবপর হয় না। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতযুগ আলংকারিকেরা এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করে গেছেন।

তারপর আছেন ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমালোচকেরা। এ পদ্ধতিতে যাঁরা সমালোচনা করতে প্রয়াসী তাঁরা যুগচিন্তা, পারিপার্শ্বিক ও গ্রন্থকারের ব্যক্তিমানস ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করে দেখান যে এই সকল এক ঐতিহাসিক ধারারই অনুবর্তন করে চলেছে। কিন্তু এই পদ্ধতিকেও সম্পূর্ণ গ্রহণীয় বলে মনে করা যায় না। কেন না এক ধরণের গ্রন্থকার যাঁরা, যুগেরদাবীর চেয়ে মহাকালের দাবীকে অধিক গ্রাহ্য করে থাকেন এবং তাকেই তাদের রচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। তাদের সম্বন্ধে এধরণের সমালোচনাতে ঠিক যথার্থ বিচার করা হয় না। তাছাড়া যাঁরা একান্তভাবেই মনোলোক-বিহারী সাহিত্যশিল্পী তাঁদের বিচারও এ ধারাতে সম্ভব নয়। তবে যুগসচেতন লেখকদের সমালোচনা এই পদ্ধতিতে অসম্ভব বলে মনে হয় না। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীবিনয় ঘোষ প্রমুখ সমালোচকেরা এই ধারাকে অনুসরণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁদের বঙ্কিম-মানস ও নূতন সাহিত্য সমালোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আর এক দল সমালোচক আছেন যাঁরা সনাতনবিধি-সম্মত পদ্ধতিতে সমালোচনার কাজ চালাতে ভাল-বাসেন। সমালোচনার এই ধরণের পদ্ধতি অত্যন্ত রক্ষণশীল পদ্ধতি। এতে সমালোচনার যথার্থ আদর্শ ও সার্থকতা অবলুপ্ত হয়ে যায়। এতে সাহিত্য অত্যন্ত

ক্লীব ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতির সমালোচনাতে সাহিত্যিকের মনের অনুভূতির দিকটিকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মেঘদূত' এ জাতীয় সমালোচনার উদাহরণ।

আমাদের সৌভাগ্য এ জাতীয় সমালোচনার কাল ক্রমশ দূরবর্ত্তী হচ্ছে।

মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতির সমালোচকেরা সাহিত্য-বিচার সময় লেখকের ব্যক্তিগতজীবন বা তাঁর নির্জ্ঞানমনের ছাপ সাহিত্যে কতখানি মুদ্রিত হয়েছে, তার বিচার করে থাকেন। এই সমালোচনা সাহিত্যের নয় বরং সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন বা চরিত্রের সমালোচনা মাত্র। ইংরেজী সাহিত্যে হার্বাডরীড ও চার্লস উইলিয়াম এজাতীয় সমালোচনা করে থাকেন।

ব্যক্তিগত সমালোচনাতে ভাল লাগা, না লাগার কথাই প্রধান। তবে এ ধরণের সমালোচনার ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সত্যকার রুচি ও সংস্কৃতবান সমালোচক না হলে ব্যক্তিগত মনোভাব অত্যন্ত মারাত্মক রূপ ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেন এই ধারার সমালোচনাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু অল্প প্রতিভাবান সমালোচক পূর্ণচন্দ্র বসু এই ধারার সমালোচনাতে অত্যন্ত দুর্বলতারই পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্য সমালোচক সুইনবার্ণ ব্যক্তিগত সমালোচনার ক্ষেত্রে এমনই অপরিণত উচ্ছ্বাসের নিদর্শন রেখেছেন যে তা' বলিবার নয়। অথচ টি. এস. এলিয়ট দেখিয়েছেন সুনিপুণ মুন্সীয়ানা। তাঁর সেকরেড উড গ্রন্থখানি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

তত্ত্বসন্ধানী পদ্ধতির সমালোচকেরা সাহিত্যের সমাজ-কল্যাণের দিক, তার সত্য রূপ ও সৌন্দর্যের দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের সমালোচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্র-সমালোচনায় অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। অতুল গুপ্ত মহাশয়ও এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন।

তুলনামূলক পদ্ধতির সমালোচনা ইদানীং বেশ প্রভাববিস্তার করেছে। তুলনীয় পংক্তি নির্বাচনে বা সাহিত্যগ্রন্থ নির্বাচনে এই সমালোচনা অত্যন্ত অভিনব। সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় পরস্পরের উৎকর্ষা-পকর্ষ বিচার অনেকখানি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজী সাহিত্যের ম্যাথুআর্নল্ড এই ধারার সমালোচক ছিলেন। আমাদের বাংলা ভাষার সমালোচকদের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, সুধাকর চট্টোপাধ্যায় এই ধরণের সমালোচনার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে এক আশ্চর্য্য রকম ভাবে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। এইরূপ সমালোচনায় লেখকের ব্যক্তিজীবন, পারিপার্শ্বিক, সমাজজীবন ও ব্যক্তি প্রতিভার যে প্রকাশে সাহিত্য সৃষ্ট হয় তার কোন আলোচনা না করে রেখাচিত্র এবং পরিসংখ্যানের সাহায্যে সমালোচনা করা হয়। এই জন্য তাঁরা কোন লেখকের বিচিত্র শব্দসম্পদ ও ভাবকল্পের বিক্ষিপ্ত ব্যবহারের সংখ্যা নির্দেশ করে তার সাহায্যে কবি-মানসের উপর আলোকপাত করতে চান। এ জাতীয় সমালোচনায় ভারননলী ও ক্যারোলীন স্পারজীয়ন প্রসিদ্ধ। আমাদের বাংলা সাহিত্যে এধরণের কোন সমালোচকের অস্তিত্ব আছে বলে আমাদের জানা নেই।

বর্ত্তমানকালে অবশ্য বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতির সমালোচনারই অধিক চল। এই পদ্ধতি সাহিত্য হিসাবে, বিশিষ্ট এবং একক সাহিত্যকর্ম হিসাবে গণ্য করে। এই পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য, কোন ব্যক্তি-বিশেষ জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক এবং বাহকরূপে জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, তা' তার সাহিত্যকর্মে কতখানি স্বাভাবিক ও সত্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, তারই বিচার। এধরণের সমালোচনাতেই সাহিত্যের সত্যকারের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়।

নানাধারার সাহিত্য-সমালোচনার কথা বলা হল। কিন্তু আসল কথা হল এই যে সমালোচক যেন সমালোচনার দায়িত্ব নিয়ে কোন সময়ই কোন লেখকের লেখার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না করেন। সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বনই তাঁর আদর্শ হওয়া উচিত। একথা তাঁকেও

মনে রাখতে হবে যে তিনিও লেখকের মতন সত্যদ্রষ্টা। প্রকৃত সাহিত্যিকের মতন তিনিও শিল্পী। বিশ্লেষকের ভূমিকা তাঁর নয়। তিনিও আস্বাদনপন্থী। খুব বেশী হলে তিনি ব্যাখ্যাতা। আদালতে বিচারক যেভাবে বিচার করেন সাহিত্য-সমালোচক সেইভাবে, সেই দৃষ্টিতে সাহিত্যের বিচার করেন না। তাঁর কাজ স্বতন্ত্র। তাঁর আদর্শ সত্য ও সুন্দরের ধ্যানে নিরত।

সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যটিকেই উদ্ঘাটিত করে দেবেন সমালোচক। লেখক এবং পাঠকের মাঝখানে যে ব্যবধান তাকেই অপসারিত করে একটি সংযোগের সেতু যেখানে সমালোচক রচনা করে দেন সেখানেই তার সমালোচনার সার্থকতা। "সাহিত্য সমালোচকগণ," ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের মতে "সাহিত্য সংসারে এক-দিকে প্রহরী, অপরদিকে পুরোহিত স্বরূপ।" কাজেই প্রহরীর মতন তাঁরও দেখা উচিত যে, অশুদ্ধ মিলন ও অপবিত্র পদার্থ পতিত হয়ে সাহিত্যের নির্মলক্ষেত্র যাতে কলুষিত না হয়।

সত্যকার সমালোচনা পথভ্রষ্ট সাহিত্যিককে নিয়ন্ত্রিত করে তাঁকে দৃষ্টিদান করে এবং সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি শাণিত ও অনুভূতি জাগ্রত করে। সহৃদয়তা, রসবোধ ও উদারতা সমালোচকের প্রধান গুণ।

সাহিত্য সমালোচনার প্রকৃত আদর্শ হল ঔদার্যবাদের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য সমালোচকে কখনই উগ্রপন্থী বা অসহিষ্ণু হলে চলে না। সাহিত্যে যেমন গ্রন্থকারের আত্মপ্রকাশ, সমালোচনারও তেমন সমালোচকের আত্মমুক্তি। সমালোচক তাঁর আত্মমুক্তির মধ্য দিয়ে 'লেখকের মনের সাথে পরিচয়' করিয়ে দেন পাঠককে। কিন্তু এই আত্মমুক্তি নিছক ব্যক্তিগত নয়; ব্যক্তিগত কাব্যানুভূতি যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বমানবের প্রত্যয়আলোকে বিভাসিত নবসৃষ্টিতে মূর্ত্ত না হল, ততক্ষণ পর্যন্ত তা' সত্যকার সমালোচনার পর্যায়ে উন্নীত হয় না।

আরও একটা কথা। সমালোচক যেন কোন পর্যায়েই কারও রচনা সম্পর্কে পাঠককে অতিমাত্রায় বিরক্ত বা আসক্ত করে না দেন। তাঁর কাজ হচ্ছে পাঠককে সাহিত্যের সিংহদরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। তার মধ্যকার ভাল মন্দের সংবাদ তাঁর না দিলেও চলবে তাকে। ভেতরে প্রবেশ করবার ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয়ই পাঠকের। সমালোচক কেবল মধ্যপথের কাণ্ডারী।

"শেষ লেখা"য় ঋষিবাণী

প্রবীরকুমার গুপ্ত

"সন্ধ্যা সংগীত" এর গান গেয়ে একদিন এক মহা-প্রভাতে কবি-পরিব্রাজক যাত্রা শুরু করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের পথে, দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়ালেন তিনি এ পথ থেকে ও পথের বৈচিত্র্যে, অন্ধকারের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। প্রতিভার দীপ্তি বিকশিত হল। আঁধারের বুকে ফুটে উঠল আলোর মুক্তা। চলার পথে আবার পড়ল ছেদ। দেখলেন চেয়ে, সম্মুখে রয়েছে দিগন্তপ্রসারী মরুমৃত্তিকা। আবার শুরু হল সৃষ্টির পর্ব। রবি-রশ্মি আকাশে তুলে আনল তমোঘন মেঘ, সাহিত্যের বন্ধ্যা-মরুতে ঝরল শ্রাবণের ধারা। খড়কুটো-কাঁটার মরু-প্রান্তর হল সবুজের বনভূমি, ফুল ফুটল, পাখী গাইল গান। 'ফুলের গন্ধে চমক লেগে' কবির মন মেতে উঠল। এগিয়ে চললেন তিনি, কেউ বা হয়ত একদিন শুধালো—কোথায় যাবে তুমি চিরচঞ্চল পথিক? উত্তর দিলেন রহস্যময় সুরে—

"ওই শুনি আমি চলেছি আকাশে
বাঁধন ছেঁড়ার রবে নিখিল আত্মহারা
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা—
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে,
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি
যাব অলক্ষ্যে সূর্য্য তারার সাথী।"

হ্যাঁ। মর্ত্তের পথ ত ফুরালো। 'বেলা যে পড়ে এল।' এবার সময় হয়েছে সেই অলক্ষ্য পথে পদক্ষেপের, সেই অপরিচিত পরিণামের মধ্যে প্রবেশের। ধ্যান-লোকে প্রবেশ করে যেন দেখতে পেলেন—

সুদূরে সম্মুখে সিন্ধু নিঃশব্দ রজনী
তারি তীর হতে আমি আপনার শুনি পদধ্বনি।

এবার তিনি হলেন দূর দিগন্তের অভিযান পথের যাত্রী, কিন্তু বাঁধন ছেঁড়ার আগে একটা কাজ ত বাকী রয়ে গেছে!

"সে রহস্য সূত্রে গাঁথা এসেছিনু
আশী বর্ষ আগে
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।"

সেই বিস্তৃত আশী বৎসরের জীবনের ক্ষেত্রকূটে যে মাটির 'জলে স্থলে ফুলে ফলে' ভরেছেন মর্ত্তের ঝুলি, যে পৃথিবীর মৃত্তিকা চুম্বন করে প্রাণভরে গান গেয়েছেন,

"কান পেতেছি চোখ মেলেছি
ধরার বুকে গান ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে
কোরেছি সন্ধান।"

যে মানুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে বলেছেন

"থাকি মানবের হৃদয় চূড়ায় লাগিয়া"—

যে মানবিক প্রেমাকূতির গহনে ডুব দিয়ে বলেছেন—

'প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আর একটু মধু দিয়ে যাব ভরে,'

—সেই মানুষ আর মাটি, সেই জগৎ আর জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা চাই এ মর্ত্ত্যধূলি থেকে বিদায় নেওয়ার আগে। তাই বুঝি দেহ-জীবনের পথ-প্রান্তে এসে সেই চিরাকাঙ্খিত অসীমের সন্ধান পেয়েও কবি দুঃখসুখের অমৃতে ভরা মর্ত্ত্যভূমির বিরহ ব্যথায় কাতর। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে বলছেন, 'ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম।

তাঁর এই আকুল প্রণাম নিবেদনের অভিব্যক্তি রূপ নিয়েছে 'শেষ লেখার' পাতায়।

এই "শেষলেখা"র কবিতাগুচ্ছ কবির এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি, তাঁর সমগ্র সৃজন-সম্ভারের মর্ম্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে এর অনু-পরমাণুতে।

শেষ লেখার কবির আসনও বড় বিচিত্র, ও পরের আহ্বান কানে এসে বাজছে। জীবনের পলে পলে যে আনন্দময়কে পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছেন সেই আদিত্যবর্ণ সত্তার পরশ-রেণু দিয়ে জীবনের পাত্রখানা পূর্ণ করেছেন। হৃদ-স্পন্দন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে ধ্বনিত হচ্ছে মন্থর গতিতে। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য জীবন-মরণের ছায়ারেখায় এসে কবির দেহসত্তা সহসা যেন এক গভীর চিন্তায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুদীর্ঘ আশী বছরের দুঃখসুখের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বলিষ্ঠ জীবন শেষ নিঃশ্বাসের আগে শেষবারের মত মর্ত্তের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশ করতে আকুলপ্রয়াসী। একদিকে জীবন-ব্যাপী সাধনার আরাধ্য কোল বাড়িয়ে আছেন আর অপরদিকে আশী বছরের মর্ত্ত্যলোকের "দুঃখসুখের দোলা"য় দোলা নানারংএর দিনগুলির অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের সোচ্চার প্রতিবন্ধক—'যেতে নাহি দিব'। দিব্য-দৃষ্টি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে 'সম্মুখে শান্তি পারাবার আর আশী বছরের পরিচিত 'আকাশভরা সূর্য্য তারা'র চোখে চোখ রেখে দেহজীবন যেন সকাতর আবেদন পেশ করছে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'।

মনে পড়ছে 'প্রথম দিনের সূর্য্যকে, মনে পড়ছে আশী বছরের স্মৃতিবিজড়িত অগণিত প্রভাত-সন্ধ্যার আনন্দ-বেদনা। আবার পরমপুরুষের সাথে মিলনের আভাস পেয়ে হৃদয়-গহনে বাজছে আনন্দ-কল্লোল।

বিরহের ব্যথা আর মিলনের আনন্দ—এ দুয়ের সীমা-রেখায় অবস্থিত কবি এক বিচিত্র সত্তার গভীরে বিলীন হয়ে রয়েছেন। এ এক পরম মুহূর্ত্ত। দেহ জীবনের সীমানা অতিক্রম করেছেন, জীবনাতীতের দ্বারে পদ-ক্ষেপ করেছেন, অমৃতের স্পর্শে রোমাঞ্চিত সমগ্র দেহাতীত তনুমনের সত্তা। মৃত্যু-স্নাত হয়ে অমৃতের আস্বাদে পুলকিত হওয়ার আশায় প্রতীক্ষারত। দেহ-জীবনের অস্তিত্ব শেষ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। দেখতে পাচ্ছেন জ্যোতির্ময় জগতের মুক্তির আলোক। প্রাণ-প্রিয় পৃথিবীর আবরণ ঝাপসা হয়ে আসছে। জীবন-মৃত্যুর গোধুলি-ক্ষণে কবি'অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অব্যয়'সত্তার মর্মে সমাহিত। তিনি আর কবি নন, ও মুহূর্ত্তে তিনি দিব্য জ্ঞানী, মহান তাপস, ধ্যানগম্ভীর ঋষি, যিনি দেখতে পেয়েছেন সেই দিব্যধামবাসী জ্যোতিষ্মান পরমপুরুষকে। এই জীবনমৃত্যুর অব্যক্ত সুরে এসেও ঋষি থামলেন,—উচ্চারণ করতে হবে শেষবাণী, নিবেদন করতে হবে শেষ কৃতজ্ঞতা সেই মাটীর পৃথিবীকে আর পৃথিবীর মানুষকে যার কাছ থেকে আশী বছরের জীবন-পাত্র পূর্ণ করেছেন শাশ্বতের মণি-মাণিক্যে। তাই যেতে যেতেও থামলেন। চেয়ে দেখলেন হৃদয়ের নিভৃতে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে জীবনপ্লাবী রূপ-রসের অভিজ্ঞ-নিপুণ অনুভূতির কণা কণা সম্পদ, দিতে হবে জগতকে এই উপহার। কিন্তু কেমন করে দেবেন? এ উপলব্ধি ত অনির্বচনীয়! দেহাতীত মনের অনুভূতি ত অব্যক্ত! কেমন করে সসীম ভাষায় প্রতিবিম্বিত করবেন অসীম আকুতিকে?

সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করলেন ঋষি। আশী বৎসরের নিপুণ শিল্পী উদ্গীরণ করলেন প্রবীণ প্রতিভার শেষ স্ফুলিঙ্গ। বিস্ময়কর বিপুল প্রতিভার চরম বিকাশ হল জীবন-উপলব্ধির অনির্বাণ জ্যোতি-উদ্ভাসে, রূপ নিল "শেষ লেখা"

অতি বিস্ময়কর এই শেষলেখার পনেরটি কবিতা। এগুলোকে কবিতা বলব না, এহল ঋষি রবীন্দ্রনাথের জীবন-বাণী, এ হল ঋষি কবির মানস-তপোবনের বৃক্ষ-তলে উদাত্তস্বরে উচ্চারিত জীবনবেদের মন্ত্র। ছোট ছোট কথা, ক্ষুদ্র তার অবয়ব, কিন্তু অন্তর্নিহিত রয়েছে এক অনুচ্চারিত অনন্ত বার্ত্তা। সংহত বাক্যের সীমার মধ্যে জীবন্ত হয়েছে অসীমের ছোঁয়া, মর্ত্ত আর অমর্ত্ত এক হয়ে যায় অনুভূতির গহন লোকে—

> "হয় যেন মর্ত্তের বন্ধন ক্ষয়
> বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
> পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
> মহা অজানার"—

রূপে রসে বিচিত্র মানুষ তার চিরন্তন আত্ম-সত্তার পরিচয় পায়—

> "বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে বলে
> সেই তার আমি
> পরম আমির সত্যে সত্য তার
> একথা নিশ্চিত মনে জানি।"

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৃটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী এবং ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য-শিক্ষার সূতিকাক্ষেত্র কলিকাতা। উহার উত্তরে কাশীপুর। তাহার উত্তরে বরাহনগর। কাশীপুর ও বরাহনগর ভিন্ন গ্রামে হইলেও উহাদের অধিবাসীরা একই গ্রামের লোক বলিয়া নিজেদের চিরকালই মনে করিয়া আসিতেছেন।

শহরতলী হইলেও বরাহনগরের নাম ইতিহাসে স্থান পাইয়া আসিয়াছে। অনেক বিপ্লবী এই গ্রামে বা তার-নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করায় এবং এই গ্রামের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সংস্রব থাকায় এক একটি বৈপ্লবিক আবহাওয়া এ স্থানে মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছে।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান রাজত্বকালে ভারতের নানা স্থানে যখন ধর্ম্ম-বিপ্লব আরম্ভ হয়, নীলাচল (বর্ত্তমান পুরী) যাইবার পথে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বরাহনগরে উপস্থিত হইয়া ভক্তিমান ভাগবতাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন বরাহনগরেও বৈপ্লবিক ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হয়। পূজ্যপাদ রামদাস বাবাজীর প্রচেষ্টায় ভাগবতাচার্য্যের ভগ্নকুটীর সুরম্য হর্ম্ম্যে পরিণত হইয়াছে। "বরাহনগর পাঠবাড়ী" নামে সে স্থান এখন সুপরিচিত।

মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে ডাচেরা যখন বরাহনগরে তামাক, গুড়, ও কাপড়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরে অনেকগুলি কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন তখন ব্যবসায়ে বিপ্লব উপস্থিত হয়। ডাচ্ গভর্ণর যে-গৃহে বাস করিতেন, সেই স্থানে এখন দাঁয়েদের ডাচ্ কুঠি। যে-ঘাটে ডাচেদের বাণিজ্যতরীগুলি বাঁধা থাকিত, তাহা এখনও "কুঠি ঘাট" নামে খ্যাত। সেই ঘাটের উপরেই অনেকগুলি কুঠি ছিল। এখন সেই স্থানে কয়েকটি বিচালির গোলা, ও গরু মহিষের খাটাল হইয়াছে। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের সুবৃহৎ অট্টালিকাও ডাচেদের আবাস স্থলেই স্থাপিত।

নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ইংরাজ বিতাড়নে বদ্ধপরিকর হইয়া বরাহনগরের পূর্ব্ব সীমান্তে বর্ত্তমান পালপাড়ার নিকট যখন সৈন্য সমাবেশ করিলেন, আবার যখন উহার কিছুকাল পরে মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার বরাহনগর বাড়ীতে বসিয়া লর্ড হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ বিলাতের পার্লামেন্টে পেশ করিতে লাগিলেন, তখনও সেখানে এক রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইল। বরাহনগরে মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ীর নিদর্শন পাঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। এখন সেখানে কয়েকটি দোকানঘর উঠিয়াছে। তাঁহার বাড়ীর পশ্চাদ্দেশের রাস্তাটির নামকরণ হইয়াছে—মহারাজ নন্দকুমার রোড। বৃটিশ রাজত্বকালে ঐ রাস্তারই নাম ছিল "ভিক্টোরিয়া রোড।

বরাহনগরের উত্তরসীমায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া নবরূপে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিলেন, তাহাতে শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতে, এমন কি বিপুল বিশ্বে নবতর আধ্যাত্মিক বিপ্লব উপস্থাপিত করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-পীঠ ও লীলা-নিকেতন, এবং রাণী রাসমণির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি শ্রীশ্রী ভবতারিণীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য দেবমন্দির ও পঞ্চবটী আজও বিরাজমান।

এইরূপে বৈপ্লবিক ভূমিতে অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী নামে জনৈক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে পবিত্র গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। বরাহনগরের অধিবাসিবৃন্দ উক্ত মহাত্মাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই জানিতেন, এবং তদনুরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাম রাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোন এক সময়ে বরাহনগরে আনাইয়া বাস করান। শশিপদ বাবুর পিতা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহারই সুযোগ্য বংশধর।

রাজকুমার বাবু সেকালের ব্রাহ্মণ হইলেও সবলচেতা ও

নাই। সেই বিদ্যালয়ই আজ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামে সুপরিচিত হইয়াছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে শশিপদবাবুর বালিকা-বিদ্যালয়ের একটি শাখা দক্ষিণ বরাহনগরে কুঠিঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে শশিপদ বাবু "বরাহনগর এসোসিয়েশান" Baranagore Assocition নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে স্থানীয় যুবকদিগকে একত্র করিয়া সমাজ-সেবায় নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পান। এই সমিতির কার্য্য ত্রিধা বিভক্ত ছিল।

(১) শিক্ষা বিভাগ—এই বিভাগের কার্য্য ছিল—নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও সাময়িক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা। মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন ও অন্তঃপুরে শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টাও এই বিভাগের অন্তর্গত।

(২) দাতব্য বিভাগ—এই বিভাগের কার্য্য ছিল সমর্থ ব্যক্তিদিগকে কাজ জুটাইয়া দেওয়া, খাদ্য, বস্ত্র, ও প্রয়োজনমত ঋণ দিয়া সাহায্য করা, অসহায় রোগীদিগকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, মৃতদেহ সৎকার বা সমাধি দেওয়া, অনাথা বিধবা ও নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করা।

(৩) সাধারণ বিভাগ—এই বিভাগ স্থানীয় অভাব অভিযোগাদি অনুসন্ধান করিয়া উহা দূরীকরণের উপায় স্থির করা।

এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত নড়াইল, টাকী, ও সাতক্ষীরার বদান্য জমিদারেরা বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সভার কার্য্য চারি বৎসর সুচারুরূপে চলিয়াছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শশিপদ বাবু ডাক বিভাগের কর্ম্ম লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলে, এই সমিতির কার্য্যে ভাঁটা পড়ে, পরে স্থগিত হইয়া যায়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ Indian Daily News পত্রিকায় এই সমিতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

ইহারও পূর্ব্বে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী social Improvement Society সামাজিক উন্নয়ন সমিতি একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। তাহাও বেশ কিছুকাল সক্রিয় ছিল। ইহারই কাছাকাছি সময়ে শশিপদ বাবুর নেতৃত্বে দক্ষিণ বরাহনগরের যুবকেরাও বিভিন্ন হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্যাল এই যুবকবৃন্দের অগ্রণী ছিলেন। ইঁহারা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ষ্টুডেণ্টস্ ছাত্র সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহারই মাধ্যমে নৈশবিদ্যালয়, রবিবাসরীয় বিদ্যালয়, এবং নৈতিক সুশিক্ষা প্রচারের জন্য আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইঁহাদেরই উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ তখনকার নরেন্দ্রনাথ দত্ত ভবনাথের বিশেষ বন্ধু ও দাশরথি সান্যালের সহপাঠি ছিলেন। তিনিও এই সভার অধিবেশনে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন।

বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই শশিপদ বাবু ক্ষান্ত হন নাই। বয়স্থা রমণীদিগকেও শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কেবল মহিলাদিগের জন্য একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। একই উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা উষাবালাকে সম্পাদিকা করিয়া "অন্তঃপুর" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাতে কেবল মহিলাদিগের রচনাই প্রকাশিত হইত। সাত আট মাস পরে উষাবালা বিবাহিতা হইয়া সুদূর বোম্বাই প্রদেশে স্বামীগৃহে গমন করিলে তাঁহার মধ্যমা কন্যা বনলতা দেবী স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়াই "অন্তঃপুরে"র সম্পাদনার ভার লইলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা সুখতারা, এবং কনিষ্ঠা কন্যা শান্তিদেবীও পিতার সৎকর্ম্মের সহায় ছিলেন, এবং তজ্জন্য গৌরব অনুভব করিতেন।

বালকদিগের শিক্ষা বিস্তারেও তিনি অবহেলা করেন নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেবল বালকদিগের জন্য একটি বিদ্যালয়, এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পাঠচক্র (A Reading Society) প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের জন্য একটি পাঠাগারও A Public Library স্থাপিত হয়। এই সময় একটি চলমান গ্রন্থাগার A circulating Library প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় "রাইস্ এণ্ড রায়ত" ও মুখার্জ্জি ম্যাগাজিনের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশিপদ বাবুকে প্রভূত সাহায্য করেন।

নিজের গ্রামের বালিকাদিগের শিক্ষাব্যবস্থা করিয়াই তিনি বিশ্রাম লাভ করেন নাই। তদানীন্তন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থাগুলির সহিত তিনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বালিগঞ্জে স্থাপিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু, ও দুর্গামোহন দাস মহাশয়দ্বয় যে ব্রাহ্ম মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, সেই বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতির চেষ্টায় শশিপদ বাবু ব্রতী হইলেন। বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়" স্থাপনে তিনি একজন সক্রিয় উদ্যোক্তা ও উৎসাহশীল অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তখন শিক্ষিকা ছিলেন শশিপদ বাবুর দ্বিতীয়া পত্নী গিরিজাকুমারী দেবী এবং ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, অবশ্য তখনও তিনি ডাক্তার হন নাই।

বালক-বালিকাদিগকে বশে আনিবার তিনি অপূর্ব্ব কৌশল জানিতেন। শিক্ষক হিসাবেও তিনি অতুলনীয় ছিলেন। কিণ্ডারগার্টেন নীতিতে বালক বালিকাদিগকে পড়ান শশিপদ বাবুই প্রথম আরম্ভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর দেশে ও বাঙ্গালীর স্কুলে এ অভিনব শিক্ষানীতি কেহই প্রচলন করেন নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে একটি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শশিপদ বাবুর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। শিশুটি আঁতুড়েই মারা যায়। সূতিকাগৃহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই শিশুটির অকাল মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া শশিপদ বাবু উহার সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে নিজ গৃহের সূতিকাগারের সংস্কার সাধন করিয়া প্রতিবেশীদিগের সূতিকাগারের সংস্কারে মনোযোগ দিলেন। ইহাতেও তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল। সূতিকাগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং উহাতে অবাধ আলোবাতাস প্রবেশের উপকারিতা যখন ক্রমে ক্রমে সকলে বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন তখন শশিপদ বাবুর সৎচেষ্টা সার্থক হইল।

পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রসারের সহিত প্রথম ও প্রধান পাপ আসিয়া জুটিল—সুরাপানে অভ্যস্ত হওয়া। শশিপদ বাবু তাঁহার গ্রামবাসী ও আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে এই পাপ প্রবেশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। উহা নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়া ৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ্চ বরাহনগরে সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করিলেন। সুরাপান নিবারণী সভায় পরিপূরক হিসাবে "আশাবাহিনী" Band of Hope স্থাপিত হইল। এই বাহিনীর সদস্যগণ শশিপদ বাবুকে সকল সংস্কার কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

ইহাতেও অনেক ঝড় উঠিল। অনেক বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হইল। "বেঙ্গল হরকরা" Bengal Harkara ও "ভারত বন্ধু" (The Friend of India দুইখানি পত্রিকাই সুরাপান নিবারণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিল। পত্রিকা দুইখানির সম্পাদক স্তম্ভে আন্দোলনকারীদিগকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় সোপর্দ্দ করার ও উপদেশ দেওয়া হইল। স্বনামধন্য প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের "Well wisher" পত্রিকার ১৮৬৯ সালের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসের সংখ্যা দুটিতে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

বেঙ্গল হরকরা পত্রিকাখানি বহুকাল লোপ পাইয়াছে। পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে, "ভারত বন্ধু" The friend of India পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, উহা কালক্রমে রবার্ট নাইট Robert Knight এর প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় The Statesman ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। উক্ত ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপরেই এখনও লেখা হইয়া থাকে Incomporating and directly descended from The Friend of India, founded 1818.

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর আলমবাজার ও বরাহনগরের অনেক শ্রমজীবিকে আহ্বান করিয়া তাহাদেরই নিজ নিজ অবস্থার উন্নতিকল্পে সমবেত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজন বুঝাইয়া দেন। এই উদ্দেশ্যে আলমবাজারে বোর্নিও কোম্পানীর কলবাড়ীতে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিছুদিন পরে স্কুল-গৃহটি আগুনে পুড়িয়া গেল এবং কলের সাহেবেরা স্বার্থান্বেষী

কয়েকজনের প্ররোচনায় কলবাড়ীর মধ্যে আর স্কুল চালাইতে দিলেন না। তখন শশিপদ বাবু উহা নিজের বাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যান।

একই আদর্শে বরাহনগরের বিভিন্ন পল্লীতে, কামার পাড়া ও কুঠিঘাটে এক একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নিকটবর্ত্তী আঁড়িয়াদহ গ্রামেও অনুরূপ আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক এই সময় শ্রমজীবীদিগের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য হুগলী জেলায় শ্রীরামপুরের নিকটে বড়াই গ্রামে একটি মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে দেখা যায়।

এই ভাবে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমজীবী সমিতি working mens Club গড়িয়া উঠে। এই সমিতির সদস্য হইতে হইলে সুরাপান একেবারে ত্যাগ করিতে হইত। শশিপদ বাবুর গৃহে এবং অন্যান্য সদস্যদিগের বাড়ীতে এই সমিতির সাময়িক অধিবেশন হইতে লাগিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কুমারকৃষ্ণ মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল. প্রভৃতি সেকালের খ্যাতনামা বক্তাগণ এই সকল অধিবেশনে বক্তৃতা দিতেন। শশিপদ বাবুর উদ্যোগে এবং অন্যান্য সমাজ-সেবকদিগের আন্তরিক চেষ্টায় শ্রমজীবী সমিতির সদস্যগণ ক্রমে সচ্চরিত্র কষ্টসহিষ্ণু, অনলস, মিতব্যয়ী ও মিতাচারী হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

শুধু শ্রমজীবী পুরুষদিগের ক্রমোন্নতি দেখিয়া শশিপদ বাবু সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নারীদিগকে লইয়াও তাঁহার বাড়ীতে সভা করিতে লাগিলেন। সেই সকল সভায় ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া হইত। এবং নানা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় ছবিতে দেখান হইত। সময় সময় ছুটির দিনে শ্রমজীবী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র দলে নিকটবর্ত্তী সুন্দর দর্শনীয় স্থানগুলিতে বেড়াইয়া আনা হইত।

সমাজসেবা কার্য্যে তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী রাজকুমারী দেবী শশিপদ বাবুকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগরে যখন কলেরা রোগের মহামারী উপস্থিত হয়, শশিপদ বাবু আর্ত্ত ও পীড়িতদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বামীকে যখন কর্ম্মোপলক্ষে কলকাতায় যাইতে হইত, রাজকুমারী দেবী নিজ হস্তে রোগীদের পথ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে সযত্নে খাওয়াইয়া আসিতেন। নিয়মিত ঔষধ খাওয়ান হইতেছে কি না রোগীর আত্মীয় স্বজনের নিকট জানিয়া লইতেন। খাওয়ান না হইলে নিজেই ঔষধ খাওয়াইয়া দিতেন।

শ্রমজীবীরা শশিপদ বাবুকে যাহাতে আপনজন মনে করিতে পারে, সেই জন্য তিনি তাহাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সুখ দুঃখের খবর লইতেন। তাহাদের সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতেন। কাহারও অসুখ হইলে তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল কারণে শ্রমজীবীরাও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত এবং তাঁহার সহিত আপনজনের মত অকুণ্ঠ ব্যবহার করিত। তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিতেও আন্তরিক চেষ্টা করিত।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ই মার্চ্চ তারিখের ডেলি একজামিনার The Daily Examiner পত্রে শশিপদ বাবুর কর্ম্মধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিবরণটি এইরূপ "There isan evening School, a working men's Club and a Savings Bank ...He has also established a Girl's School, a social Improvement Society, and a public Library.

১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিশ্রুতা সমাজ-সেবিকা কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভারত ভ্রমণে আসেন। শশিপদ বাবুর সহিত এই সময়ই তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী কুমারী কার্পেণ্টার শশিপদ বাবুর নিয়োগী-পাড়ার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার স্ত্রী রাজকুমারী দেবীর সহিত আলাপ করিয়া যান এবং তাঁহাদের পরিচ্ছন্ন সংসার দেখিয়া মুগ্ধ হন। Six months in India গ্রন্থে লেখেন—"I had the happiness of being in a simple Indian dwelling which had the domestic charms of an English home." ইহা নিশ্চয়ই রাজকুমারী দেবীর সুনিপুণ গৃহিণীপনার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

ইহার কিছুকাল পরেই কুমারী মেরী কার্পেণ্টার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া শশিপদ বাবুকে সস্ত্রীক ইংলণ্ডে যাইবার সাদর

আমন্ত্রণ জানান। প্রচুর বাধা-বিঘ্ন থাকিলেও শশিপদ বাবু সে আন্তরিক আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। স্ত্রী রাজকুমারী ইংরাজী জানেন না। তিনি আবার সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। সংসারে আবার তাঁহাদের তিনটি শিশু পুত্র—দুই, চারি, ও ছয় বৎসরের। তৎসত্ত্বেও স্বামীর সংগামিনী হইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

তিনটি শিশু পুত্রকে আত্মীয় স্বজনের নিকট রাখিয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রেল "ওগ্‌লা Tha ogla নামক জাহাজে তাঁহারা বিলাত যাত্রা করেন। মে মাসের শেষাশেষি ইংল্যাণ্ডে পৌছান। বৃষ্টল সহরে মেরী কার্পেণ্টারের গৃহ "রেড্‌লজ হাউসে "Red lodge House তাঁহারা অতিথি হন। ইংরাজী না জানা বাঙ্গালী কুলবধূর পক্ষে ইহা এক অসমসাহসিক কার্য্য।

বৃষ্টলকেন্দ্র করিয়া শশিপদ বাবু বার্মিংহাম, ওয়ালসাল, ম্যাঞ্চেষ্টার, কেপটাউন, লিভারপুল, প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভারতের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অধিকাংশ সময়ই রাজকুমারী দেবী তাঁহার সঙ্গেই থাকিতেন। সকল স্থানেই তাঁহারা সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। ভারতে যাহাতে কারখানা আইন Factory Act প্রবর্তিত হয়, তাহার জন্যও এই সময় তিনি প্রবল আন্দোলন চালান। শ্রমজীবীদিগের প্রকৃত কল্যাণের জন্য এইরূপ আন্তরিক প্রচেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে কেহই করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রমিকদিগের প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা ভারতে এখনও ঠিক হইতেছে না বলিয়াই মনে হয়, কারণ ইউনিয়নগুলি Labour unions শ্রমিকদিগের আর্থিক উন্নতির দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি দেন বটে, কিন্তু তাহাদের মনুষ্যত্ব স্ফুরণের কোনরূপ চেষ্টা করিতে দেখা যায় না।

রাজকুমারী দেবীর বিলাত গমন যে ভারতীয় মহিলার ইংলণ্ডে প্রথম পদার্পণ শুধু তাহাই নহে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর রেডলজ হাউসে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মগ্রহণ ও বিলাতের মাটিতে ভারত সন্তানের সর্ব্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ হওয়া। এই শিশুটির নামকরণ করেন লীড্‌স সহরের সমাজ বিজ্ঞান সমিতির Social Science Association সদস্যেরা। তাঁহারা শিশুটির নাম দেন "এল্‌বিয়ন" Albion। শশিপদ বাবু তখন সেই স্থানে বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পুত্রলাভের সংবাদ আসে।* এই পুত্রটি বড় হইয়া সার এল্‌বিয়ন ব্যানার্জ্জি Sir Albion Banergee নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তিনি পাণ্ডিত্য ও কর্ম্মদক্ষতায় দেশে ও বিদেশে বিশেষ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দীর্ঘ আট মাস বিলাতে বাস করিয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি শশিপদ বাবু সস্ত্রীক ও সপুত্র স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

দেশে ফিরিবার প্রায় এক বৎসর পরে সর্ব্বজনগ্রাহ্য উদার ধর্ম্মনীতি প্রচারের প্রয়োজন শশিপদ বাবুর মনে জাগে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নিজ জন্মভূমিতে বরাহনগরে সাধারণ ধর্ম্মসভা নামে একটি সভা তিনি স্থাপন করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নরনারীর মধ্যে হৃদয়গত ঐক্য ও পারস্পরিক প্রেম ও নীতির ভাব উদ্রেক করাই এই সভাস্থাপনের উদ্দেশ্য। এই সভার অধিবেশন কালে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি নিজ নিজ ধর্ম্মমত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। কাহাকেও কোন ধর্ম্মের অযথা নিন্দা করিতে দেওয়া হইত না। আভাসে বা ইঙ্গিতে কোন বিদ্রূপ করাও চলিত না। কোন প্রকার অভদ্র আচরণেরও প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। সকলেই যুক্তি সহকারে নিজ নিজ ধর্ম্মের সারবস্তু কেবল সেখানে আলোচনা করিতে পারিতেন।

ইহার কুড়ি বৎসর পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো সহরে যে বিশ্বধর্ম্মসম্মেলন The worlds parliament Religious অনুষ্ঠিত হয় সেই প্রসঙ্গে "ইণ্ডিয়া মিরর" India mirror পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শশিপদ বাবুর "সাধারণ ধর্ম্মসভা" সম্বন্ধে বলেন—"এই স্থানে খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, ও ব্রাহ্মদিগের সাধারণ মিলনভূমি ছিল। এই স্থানে মিলিত হইয়া তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতেন। কোন ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেন না। সর্ব্বজনীন সত্যসমূহ এই স্থানে প্রচারিত হইতে।"

তৎকালীন The purity servant নামক পত্রিকাতেও দেখা যায়—"এই সভায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বুধবার একটি প্রার্থনাসভা হইয়া থাকে। এই সভায় একমাত্র সত্য ও প্রত্যক্ষ পিতা স্বরূপ

পরমাত্মার উপাসনা হয়। মাসিক সভাসমূহে প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকই বক্তৃতাদানে অধিকারী।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণের এক মহতী সভায় রেভারেণ্ড ডাক্তার জার্ডিন এই সাধারণ ধর্ম-সভার কর্মপ্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করেন।

ঈদৃশ ধর্মান্দোলন ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখা যায় নাই। মহামতি সম্রাট আকবর শাহের সভায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচার্যগণের সমাবেশ ও সর্বজনীন ধর্মালোচনার ব্যবস্থা ছিল, তাহা ইতিহাস পড়ে জানা যায়। আমেরিকার Free Religious Association অনেকটা এই ধরনের হইলেও অতটা উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা "এইরূপ উদার মতাবলম্বী ছিল বলিয়া শুনা যায়।

প্রথমে এই সভার অধিবেশন শশিপদ বাবুর বাড়ীতেই হইত। পরে ইহার জন্য বরাহনগর ইনষ্টিটিউট ভবন নির্মিত হইল। কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি সার জন ফিয়ার ১৮৭৪ সালের জুন মাসে এই ভবন প্রতিষ্ঠাকালে উপস্থিত থাকিয়া বলিয়াছিলেন, এই গৃহ শশিপদ বাবুর স্বদেশ-বাসী সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল।

এই ইনষ্টিটিউট ভবন শুধু ধর্মসভার জন্যই ব্যবহৃত হইত না। দিনেরবেলায় মহিলা বোর্ডিংভুক্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যালয়, এবং হিন্দু বিধবাশ্রমের বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইত। সন্ধ্যায় এই স্থানে শ্রমজীবী বালক ও বৃদ্ধদিগের উপদেশ ও অধ্যাপনার কাজ চলিত। ইহার সংশ্লিষ্ট একটি পাঠাগারে সর্বসাধারণের জন্য অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকা সুরক্ষিত থাকিত।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে শশিপদ বাবু "শ্রমজীবী সমিতি" স্থাপন করেন, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৮৭২। খ্রীষ্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে "ভারত শ্রমজীবী" নামে এক পয়সা মূল্যের—আট পাতার একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রতিমাসে এই পত্রিকা পনের হাজার সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। সুদূর পল্লীগ্রামেও এই কাগজখানি গিয়া পৌছিত। বাঙ্গলা দেশে অনেক সদাশয় ব্যক্তি ইহার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। সকল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই এই পত্রিকাখানি ক্রয় করিতেন। সে যুগে ছাপাখানা খুব অল্পই ছিল। শশিপদ বাবু নর্থ সুবারবান প্রেস North Subarban Press প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার হবকে পত্রিকাখানি ছাপাইতেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে "বরাহনগর সমাচার" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র তিনি প্রকাশ করেন। ইহাতেও শ্রমজীবী দিগের অভাব অভিযোগ সাধারণ লোকের গোচরে আনিয়া উহাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের সর্বদা চেষ্টা চলিত। অধিকন্তু সমাজ-বিরুদ্ধ কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনাও মাঝে মাঝে ইহাতে বাহির হইত। তাহার ফলে একবার শশিপদ বাবুকে আদালতে অভিযুক্ত হইতে হয়। সেই মানহানির মোকদ্দমায় শশিপদ বাবুর যে অর্থদণ্ড হইয়াছিল তাহা সার জন ফিয়ার স্বেচ্ছায় নিম্ন আদালতে জমা দেন।

শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ধর্মভাব ও সুনীতি প্রচারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কর্মসচিবের হস্তে এই সময় শশিপদ বাবু দুই হাজার টাকা অর্পণ করেন। শ্রমজীবীদিগকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য নানাবিধ উপদেশ দিতে থাকেন, হস্তচালিত তাঁতে অবসর সময়ে বস্ত্র বয়ন করিতে উহা-দিগকে উৎসাহ দিতেন। বস্ত্রশিল্পে বরাহনগর এক সময় বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। খাস বাগানের (বর্ত্তমান বরদাবসাক ষ্ট্রীট) কাপড় প্রসিদ্ধ ছিল। বিদেশী প্রতি-যোগিতায় এবং দেশের শাসক শ্রেণীর সহানুভূতির অভাবে সে বস্ত্রশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শশিপদ বাবু উহা পুন-র্জ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বরাহনগরে এখনও অনেক তন্তুবায়ের বাস। তাঁহারা তখন পিতৃপিতামহের স্বাধীন বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাকুরীজীবী হইয়াছেন।

মিতব্যয়ের অভ্যাস এবং দুর্দিনের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে শিখাইবার জন্য শশিপদ বাবু সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তখনও পোষ্ট অফিসে সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুধু বাহিরের লোককে মিত-ব্যয়িতা শিক্ষা দিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। নিজ গৃহমধ্যে ও সঞ্চয়শীলতা শিখাইতেন, এবং নিজ পরিবারবর্গের জন্যও অনুরূপ ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মুসলমান শ্রমজীবী সন্তানদিগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শশিপদ বাবু বরাহনগরে একটি স্বতন্ত্র

বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কারণ সে যুগে হিন্দু বালক-বালিকাদিগের সহিত মুসলমান বালক-বালিকাদিগের একত্র বসিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব ছিল না।

শ্রমিক আন্দোলন সে যুগে ভারতবর্ষে কল্পনার অতীত ছিল। শশিপদ বাবুই ভারতে উহার পথিকৃৎ। তিনি শ্রমজীবীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চাহিয়াছিলেন, তাই শুধু মজুরী বাড়াইবার আন্দোলন না করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, সুনীতি, ধর্মচেতনা, স্বাবলম্বন ও সঞ্চয়শীলতার বীজ বপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকেও শশিপদ বাবুর শ্রমজীবী পত্রিকায় লিখতে দেখা যায়।

"সমাজের মূল তোরা ভাই।
কে দেখেছে ধরাতলে
মূল বিনা তরু চলে
মাথা চলে, তাতে লাভ নাই"
যেথা ছিল রহিবে সেথাই।

তাঁহার আশা ছিল কালে উহা মহীরুহে পরিণত হইবে। বহুচেষ্টাসত্ত্বেও শশিপদ বাবুর সে আশা ফলবতী হয় নাই। সরকার ও জনসাধারণের আন্তরিক উৎসাহ ও সহানুভূতির অভাবে উহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তবে ১৮৮৩ সালে ও Baranagor workingmen's Institute সক্রিয় ছিল তাহা শ্রীম লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায় কালীকৃষ্ণ সন্ধ্যাসমাগমে শ্রীশ্রী ঠাকুরের পূত সঙ্গ ত্যাগ করিয়াও শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়ে চলিয়া আসিতেছেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া শশিপদ বাবুর প্রথমা স্ত্রী রাজকুমারী দেবী চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। কৃচ্ছ্র সাধনই তাঁহার অল্পায়ুর প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দেশে থাকিতে এবং বিদেশ হইতে ফিরিয়াও সংসারের সকল কাজ নিজ হাতেই তাঁহাকে করিতে হইত। সমাজচ্যুত সংসারে ঝি চাকর সকল সময় মিলিত না। বিলাতে থাকাকালীনও তিনি হিন্দুকুলনারীর ন্যায় দিন যাপন করিতেন। আমিষ আহার করিতেন না। সে স্থানের আবহাওয়ায় এভাবে বাস করাতেও তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ মাত্র আটাশ বা উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এই অল্প বয়সে তিনি পাঁচটি পুত্র সন্তানের জননী। তাঁহার প্রথম সন্তান সূতিকাগৃহেই মারা যায়। অপর চারিটি সন্তান সত্যপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ, সুপ্রকাশ ও এলবিয়ন রাজকুমার তাঁহার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন।

হিন্দুমতেই রাজকুমারী দেবীর শবদাহ সম্পন্ন হয়। একাদশ দিনে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু অন্যভাবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর তাঁহার একখণ্ড অস্থি আনিয়া শশিপদ বাবুর বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগানে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যপ্রকাশ সমাহিত করেন। সমাধির উপর যে স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়, আজও তাহা বর্ত্তমান। শ্রাদ্ধের দিন সমবেত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সেই সমাধি প্রদক্ষিণ করেন। সমবেত প্রার্থনা ও স্তোত্র পাঠ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেদিন উপাসনা করেন। তাহার পর অনাথ, আতুর ও ভিক্ষুকদিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। আজও প্রতিবৎসর ৮ই মার্চ্চ তারিখে শশিপদ বাবুর পরিবারবর্গ এই সমাধি-মন্দিরে একত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধোৎসব পালন করেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে শশিপদ বাবু তাঁহার বাসভবনের সম্মুখ ভাগে সাধারণের ব্যবহার্য্য একটি সুন্দর বৃহদায়তন সভাগৃহ নির্ম্মাণ করেন। সেই গৃহে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ম (museum) স্থান পাইল। নিজের সংগৃহীত বহুসংখ্যক পুস্তক ও দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করিলেন। এই গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় শশিপদ বাবুই প্রধানতঃ বহন করেন। বিলাতে তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতেও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি আছি সমিতি Board of Trustees নিযুক্ত করিয়া গৃহ, তৎসংলগ্ন জমি এবং চৌদ্দ হাজার সাতশত টাকার কোম্পানির কাগজ (G P notes Rs 14700 রেজেষ্ট্রিবলিল সহায়ে সর্ব্বসাধারণকে দান করেন। ট্রাষ্টির সভাপতি নিযুক্ত হন বরাহনগরেরই কৃতি সন্তান টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার সুশিক্ষিত, সুবক্তা,

দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়। সেই গৃহ এখন "শশিপদ ইন্‌স্টিটিউট" নামে সুপরিচিত হইয়া শশিপদ বাবুর বিদ্যানুরাগ ও জনসেবার সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান কর্ম্মীদিগের উৎসাহে ও সরকারী সাহায্যে উহা এখন মহকুমা গ্রন্থাগারে Govt spon sored Sub Divisional Library) পরিণত হইয়াছে।

প্রায় এক হাজার বৎসর রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে হিন্দু সমাজের কাঠামো প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। যৌথপরিবারের সুদৃঢ় ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হইতে থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভে মানুষের প্রবৃত্তি জাগিতে থাকে। উহার ফলে হিন্দু বিধবা রমণীদিগের প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইত, তাঁহাদিগের উপর সংসারের গুরুভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত শোক দুঃখ যে ভাবে ভুলাইবার চেষ্টা চলিত, সেরূপ আর চলিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি সকলেরই অত্যধিক লক্ষ্য পড়িতে থাকায় তাঁহারা সংসারের ভারস্বরূপ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সমাজেও তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর পাইলেন না। সকলেই তাঁহাদিগকে গলগ্রহ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জীবন অধিকাংশ স্থলেই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বদ্ধপরিকর হন। শশিপদ বাবু আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। শুধু বিধবাদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া এবং নিজে দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় বিধবা-বিবাহ করিয়াই তিনি সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, অনাথা বিধবাদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানের জন্য ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগরে তিনি হিন্দু বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী গিরিজাকুমারী দেবীর সাহায্যে অতীব দক্ষতার সহিত ষোল বৎসরকাল এই বিধবাশ্রম পরিচালনা করিয়াছেন। গিরিজাকুমারী দেবী সার কে, জি, গুপ্তের সম্পর্কে ভগিনী, তাঁহাদের বাড়ী ছিল বরিশালে, এখন পূর্ব্ব পাকিস্তানে।

সমাজের সকল সম্প্রদায়ের লোকই শশিপদ বাবুর প্রতিষ্ঠিত বিধবা আশ্রমের জন্য সাহায্য ও সহানুভূতি করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেন্টও এই আশ্রমে অর্থ সাহায্য করিতে কৃপণতা করেন নাই। সুদূর আমেরিকা হইতেও স্বামী বিবেকানন্দ এই আশ্রমের জন্য কয়েকবার অর্থ সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া উহা পরিদর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশও করেন।

শুধু ভরণপোষণের ভার লইয়া এই আশ্রম বিধবাদিগের জন্য একটি অলস-আলয় সৃষ্ট হয় নাই। বিধবারা যাহাতে স্বধর্ম্মে থাকিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন, তাহার জন্য নানাবিধ হাতের কাজ ও অন্যান্য অর্থকরীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণ লেখাপড়াও শিখান হইত। নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় ছিলেন এই বিধবাশ্রম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। শশিপদ বাবুর কার্য্যের অনুসরণে মহীশূর, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে অনুরূপ বিধবাশ্রম গড়িয়া উঠে। পশ্চিম ভারতে রমা বাই-এর বিখ্যাত "সারদাসদন" ইহাদের অন্যতম। কিন্তু দরদী লোকের অভাবে এবং নিঃস্বার্থ কর্ম্মী সকল সময় না পাওয়া যাওয়ায় আশ্রমগুলি একে একে উঠিয়া যাইতে থাকে।

বিধবাদিগের দুঃখদুর্দ্দশা দেখিয়া শশিপদ বাবু যেরূপ মর্ম্মাহত হন এবং উহার প্রতিকারকল্পে হিন্দু "বিধবাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন, সেইরূপ ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুর দংশন-ক্ষত জলাতঙ্ক রোগীদিগের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া সেইরূপ ব্যথিত হন, এবং কুমারী ম্যাম মার্স-টনের সাহায্যে ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রায় প্রতিনগরে ইউরোপে প্রচলিত তদানীন্তন বাষ্পীয় চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করেন। তখন অনেকে এই তীব্র যন্ত্রণাদায়ক রোগের হস্ত হইতে মুক্তি পায়।

১৯০৫ বা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কোন এক সময় শশিপদ বাবু বরাহনগরের বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে 'দেবালয় সমিতি' প্রতিষ্ঠিত করেন। উহা বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ধর্ম্ম সভারই অনুবৃত্তি মাত্র। উক্ত দেবালয় সমিতির কার্যগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য ২১৩।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান

বিধান সরণীতে একটি সুপ্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করেন। সেখানে আজও প্রতি সপ্তাহে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মালোচনা হয়। এই সমিতিতেও শশিপদ বাবু মূল্যবান সম্পত্তি দান করিয়া যান। উহার অর্পণ-পত্রে লেখা আছে "দেবালয় সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মিলন মন্দির। ইহার উদ্দেশ্য ধর্ম্মানুশীলন; এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশহিতৈষণা ও দানধর্ম চর্চ্চা করা। জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত মাত্রেরই বক্তৃতা করার ও উপদেশাদি দান করিবার অধিকার আছে। চিরকালই শশিপদ বাবু এইরূপ উদার প্রকৃতি ছিলেন।

জনসেবার ব্রতী থাকিয়াও শশিপদ বাবু নিজের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কাশীপুর ও শালিখা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বরাহনগর রেজিষ্ট্রার অফিসেও কিছুকাল কাজ করেন। কলিকাতা পোষ্ট অফিসে বেশ কিছু দিন কাজ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন! তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার জন্য ২৪ পরগণা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসেও কিছুকাল কাজ করিবার সুযোগ পান। শেষে একাউণ্ট্যান্ট জেনারেল অফিসেও কাজ করেন। সমাজ-সেবায় তিনি এমনই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বাঙ্গলার ছোটলাট সার-জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু জনসেবায় ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কায় তিনি সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার অর্থের অভাব তখন যথেষ্টই ছিল। এরূপ মানব-প্রেমিক জগতে বিরল।

তিনি কোনও দিন নামযশের কাঙাল ছিলেন না। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহারই নামে বরাহনগরের একটি রাস্তার নামকরণ করা হইয়াছিল। শশিপদ বাবু বরাহনগর পৌরসভায় পত্র লিখিয়া সেই নামের পরিবর্তন করাইয়া নিজের নামের বোর্ডখানি উঠাইয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হন।

নিঃস্বার্থ পরোপকারই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। যে ব্যক্তি বহু প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছে, তাহাকেও বিপন্ন দেখিলে শশিপদ বাবুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তিনিই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার ঈদৃশ পরার্থপরতা ও নিষ্কাম কর্ম্মে অদম্য স্পৃহা দেখিয়াই ভট্টপল্লীর পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে সেবাব্রত উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

শশিপদ বাবু নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন, "আমার জীবনে ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে পৃথক করিয়া দেখান বা বুঝান যায় না! তবুও তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের কিছু পরিচয় লাভের আমরা চেষ্টা করিব। কারণ শরীর ও মনের সমষ্টিভূত মানুষের জীবনকাহিনী কেবলমাত্র তাহার জড়দেহ ও তৎকর্তৃক কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনেই জানা যায় না। উভয়ের সমান অনুশীলনে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির যে সম্যক স্ফুরণ হয় তাহারই সুসম্মেলন প্রকৃত জীবন।

উপনয়ন সংস্কারের পরই শশিপদ বাবুর অধ্যাত্ম-চেতনার উন্মেষ হয়। তাঁহার মাতৃদেবীর ধর্মৈষণা এবং পিতাঠাকুরের পূত চরিত্রের প্রভাব ও তাঁহার কুখ্যাত আস্তিক্য বুদ্ধিই শশিপদ বাবুকে অধ্যাত্ম বিষয়ে প্রেরণা দেয়। শ্রীভগবানের আনন্দময় সত্তা জীবনের প্রথম হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সত্যের আলোক প্রজ্বলিত করে। ছোট বেলায় ঠাকুর পূজা করা তাঁহার একটি প্রিয় খেলা ছিল। খেলাঘরের পূজায় তিনি পুরোহিতের কার্য করিতেই ভাল বাসিতেন। নিষ্ঠার সহিত পৈতৃক শালগ্রাম শিলার পূজা করিয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। এইরূপ আনুষ্ঠানিক পূজাদির মধ্য দিয়াই ক্রমে তিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি লাভ করেন।

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি ও অপূর্ব্ব ঈশ্বর নির্ভরতা তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তি। তিনি সগুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের মূল তত্ত্বের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আজীবন নিজেকে হিন্দু বলিয়াই তিনি পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়াও তিনি সমাজ হইতে আনুষ্ঠানিক কোন দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। নিজ গুরু দত্ত মন্ত্রেরই চিরকাল সাধন করিয়া আসিয়াছেন। তজ্জন্য ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট তাঁহাকে অনেক সময় হাস্যাস্পদ হইতে হইত। তথাপি তিনি হিন্দু বলিয়াই গৌরব অনুভব

করিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র সমূহের প্রতি কখনই আমি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি নাই। চিরদিনই কথকতা শুনিতে যাই, এবং শুনিতে শুনিতে আজীবনই চক্ষু জলভরাক্রান্ত হইয়া আসে।"

গুরুভক্তিও তাঁহার চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। গুরু-সেবারও তিনি কোনও দিন ত্রুটি করেন নাই। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের পর তাঁহার গুরুদেব সংস্কারবশতঃ শশিপদ বাবুর গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। গুরু বাড়ীতে আসিলে তিনি আত্মীয়দের বাড়ীতে গুরুদেবের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং সস্ত্রীক সেখানে প্রসাদ পাইতেন। তাঁহার গুরু কৃষ্ণহরি শিরোমণিরও শশিপদ বাবুর প্রতি স্নেহের লাঘব কখনও দেখা যায় নাই। সকল সৎকার্যে তিনি শিষ্যকে সকল সময়েই উৎসাহ দিতেন।

ব্রাহ্ম সমাজের সমবেত উপাসনা ও প্রার্থনায় তাঁহার বিপুল বিশ্বাস ছিল। সেই কারণে বরাহনগরে তিনি একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা দোষে কোনও দিনই তিনি দুষ্ট হন নাই। বরাহনগরে তখন অনেকগুলি কর্তাভজার দল ছিল। বনহুগলির নিম চাঁদ মৈত্রের বাগানে এইরূপ একটি দলের কার্যকলাপ চলিত। শশিপদ বাবু সে স্থানে যাইতেও দ্বিধা করিতেন না। দক্ষিণেশ্বরে শম্ভু মল্লিকের গৃহে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তদবধি পরমহংস দেবের প্রতিও তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। আলমবাজার মঠে (১৮৯১-৯৭) তাঁহার শিষ্যগণের সহিতও শশিপদ বাবুর ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে।

কর্ম্ম-জীবনে, এবং সকল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর শেষ বয়সেও আনুষ্ঠানিক পূজার্চ্চনা অপেক্ষা আকুল প্রার্থনায় তিনি বেশী বিশ্বাসী ছিলেন। কোন কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে শশিপদ বাবু অন্তরের সহিত একান্তে প্রার্থনা করিতেন। পরিবারস্থ কাহারও কঠিন পীড়া হইলে, এবং সে পীড়া চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গেলেও, তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা কখনও বিফল হয় নাই। বংশগত বৈষ্ণবরক্তই বোধ হয় তাঁহাকে এরূপ প্রার্থনাশীল করিয়া ছিল।

মনে মুখে এক হইবার চেষ্টা চিরকালই তিনি করিয়া আসিয়াছেন। কি সমাজে, কি গৃহস্থালীতে, কি নিজ জীবনে মিথ্যা ও কপটতা কখনই তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। যেখানেই কপটতা ও মিথ্যাচার দেখিতেন সেখানেই সারল্য ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতেন।

সাধুতা তাঁহার জীবনের সহিত ওতঃপ্রোতঃভাবে মিশিয়াছিল। কোন বন্ধু শশিপদ বাবুর নিকট কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখেন। তাঁহার গৃহ হইতে সেই টাকা কোন প্রকারে চুরি যায়। নিজ বসতবাটী বিক্রয় করিয়া শশিপদ বাবু সেই গচ্ছিত টাকা পরিশোধ করেন। শ্রীভগবানের কৃপায় সেই বসতবাটী অর্থের বিনিময়ে আবার তিনি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

শশিপদ বাবু পরলোকে বিশ্বাস করিতেন। সেই বিশ্বাসের ফলেই তিনি কখনও শোকে অভিভূত হন নাই। তাঁহার দুই স্ত্রী, কয়েকটি সন্তান, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর মৃত্যুতে তাঁহাকে কেহ শোক প্রকাশ করিতে দেখে নাই। অনেক সময় এরূপ ব্যবহার করিতেন।যাহাতে মনে হইত তাঁহার মৃত আত্মীয়দিগকে তিনি চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছেন।

তিনি এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, প্রিয়জনের মৃত্যুতেও কর্ত্তব্যচ্যুত হইতেন না। ১৩১২ সালের ১৫ই মাঘ, ইংরাজী ১৯০৬ সালের ২৮শে জানুয়ারি রবিবার তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু হয়। তখন তাঁহারা কলিকাতায়। সেই দিনই বক্তৃতা দিবার জন্য কয়েকজন বক্তাকে বরাহনগরে লইয়া যাইবার কথা ছিল। স্ত্রীর মৃতদেহ ঘরে পড়িয়া রহিল। শশিপদ বাবু বক্তাদিগের বাড়ী বাড়ী গিয়া, তাঁহাদের নিষেধ সত্ত্বেও কয়েকজনকে বরাহনগরে বক্তৃতা দিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তবে গৃহে ফিরিলেন।

সংসারের অনিত্যতা তিনি নিত্যই স্মরণ করিতেন। স্নেহের শিশু পুত্র মাতৃক্রোড়ে শুইয়া হাসিতেছে তখনও তিনি ভাবিতেন—"ইহার স্থায়ীত্ব কতটুকু।" তাঁহার স্ত্রী এরূপ অমঙ্গলের কথা শুনিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। শশিপদ বাবু কিন্তু সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। এইভাবে সর্বদা তাঁহার নিত্যানিত্য বিচার চলিত।

তিনি বলিতেন—"ধর্ম জীবনে জীবনের প্রতি কথায়

প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে প্রকটিত হইবে। প্রতিদিন, প্রতি-মুহূর্ত্তের জন্য যে ভগবানের পক্ষে আমাদের যোগ তাহা ভাল করিয়া বুঝা তাহা ভাল করিয়া জীবনে পরিণত করা ও তাঁহার লীলা জীবনে দেখাই ধর্ম্ম। শশিপদ বাবু জীবনে সে ধর্ম্মলাভ করেন। জীবনের প্রতিস্তরে ভগবানের লীলা দেখিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সমাজ যে একটি অখণ্ড জীবনের বিকাশ তাহা তিনি উপলব্ধি করিতেন। বিশ্ব-মানবের ইতিহাস বিশ্বনাথের লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয় তাহা তিনি মনে প্রাণে বুঝিতেন। সেই কারণে নিজেকে সকলের মধ্যে এমন করিয়া বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

শেষ বয়সে শশিপদ বাবু কলিকাতায় একান্ত একাকীই বাস করিতেন। কাহারও সেবা কখনও গ্রহণ করিতেন না। বানপ্রস্থি-যতির ন্যায়ই জীবনের শেষে কয়টা দিন অতিবাহিত করেন। পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় পঞ্চানন শিরোরত্ন মহাশয় প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল শশিপদ বাবুর পূত সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার "কর্ম্ম-যোগী শশিপদ" নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন "সংসারী হইয়াও তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, কর্ম্মফলত্যাগী হইয়াও তিনি ছিলেন কর্ম্মী। ক্ষমা ছিল তাঁহার ভূষণ। বিনয় সমন্বিত তেজ ছিল তাঁহার কবচ। রোগে তিনি কখনও কাতর হন নাই। আততায়ী শত্রুর প্রতিও তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল। শোকে বিমর্ষ হন নাই। বিপদে ও সম্পদে কোনও দিন বিমূঢ় বা উচ্ছসিত হন নাই।" শিরোরত্ন মহাশয়কে আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার মুখেও শশিপদ বাবুর গুণানুকীর্ত্তন শুনিয়াছি।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর এই মহামানবের তিরোধান ঘটে। বিগত শতাব্দীর একটি জ্বলন্ত প্রদীপ নিবিয়া যায়। সেই প্রদীপ হইতে আর একটি অনুরূপ আলো কাহাকেও জ্বালাইতে দেখা গেল না। বাঙ্গালী জাতির এমনই দুর্ভাগ্য *

* প্রবন্ধটির প্রায় সমগ্র উপাদান পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক প্রণীত 'নব যুগের সাধনা" হইতে গৃহীত। প্রবাসী, রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ের শত বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য পুস্তক ও পত্রিকা হইতেও কোন কোন বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে।

সে যে এসেছিল রাতে

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

(১)

মরুভূমির মাঝে মাঝে থাকে মরূদ্যান। তাইত উষর-সাগর পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়। আর, দশটা-পাঁচটা কলম চালনার বিরাট শুষ্ক সময়টার মাঝে থাকে টিফিনের সরস অবকাশ। তখন কলমের বদলে চলে রসনা, যার দ্বিবিধ কাজ: গ্রহণ করে খাদ্য, প্রেরণ করে বক্তব্য। তখন মনে হয় সবজান্তা ও সববোদ্ধা এই কেরাণীকুল, কিন্তু কপালদোষে 'ড্যামফুল'।

বড়বাবু সেদিন কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন—তোমাদের টেবিল এত ঘন ঘন ভাঙে কেন? ওরা জবাব দিয়েছিল—আজ্ঞে স্যার, যা ভারি ভারি ফাইলের স্তূপ ঘন ঘন দড়াম্ দড়াম্ করে রোজ পড়ে ওর পিঠে, বেচারি টেবিলের কি দোষ?

কিন্তু টেবিলের ভাঙন ধরে আসতে টিফিনের ছুটির সময়। ওদের তর্কের অল্প-বিস্তর অত্যাচার চলে ঐ টেবিলের উপর। তর্কের যুক্তিটা যার যত দুর্বল ততই তার সবল হাতের চাপড় টেবিলের উপর ফেলে সেটা পুষিয়ে নেয়। প্রতিপক্ষও তখন সেই পথই অবলম্বন করে। বেচারি টেবিল!

একজন যদি বলে—"এ হতে পারে না" সেই সঙ্গে এক ঘা পড়ে টেবিলের উপর। জবাব আসে "আলবৎ" সঙ্গে সঙ্গে দুটো ঘুসী টেবিলেই! তৃতীয় তার্কিক তড়াক্ করে টেবিলের উপর চড়ে বসে বলে, কভি নেহি"।

রাষ্ট্রভাষায় জোর বোধহয় রাজসিক ধরনে পাওয়া যায়। নানা রকম আলোচনার ক্ষেত্র ঐ ক্ষুদ্র টেবিল। এক ধরণের আলোচনা মাঝে মাঝে উত্থাপন করে নীতীশ। সেটা হল পরলোক তত্ত্ব। তর্ক যখন জমে, তখন প্রবীণ তার্কিক সে-ই। এবং তর্কে প্রতিদিন জিত হয় নীতীশেরই। তার প্রমাণ স্বরূপ নিদর্শন রয়েছে ওর হাতের মুঠোয়। একেবারে কড়া পড়ে গেছে প্রতিদিনের কর-কসরতে। সে মত প্রকাশ করে যে পরকাল বলে কিসসু নেই, মৃত্যুতেই দাঁড়ি। মিছে কতকগুলো জীবনের জের-টানা-মত প্রচার করে।

আর হাবাতে লোকেরা যেমন যা দেখে তাই খেতে চায়, কতকগুলো লোক আছে, যে যা বলে তাই তারা বিশ্বাস করে বসে। ঐ শ্রেণীর লোকদের নাচাতে ভালবাসে ঐ তথাকথিত পরলোক-তত্ত্ববিদ্‌গণ নাচিয়ে আমোদ পায় তারা, আবার আড়ালে হয়ত মুচকে হেসেও আরাম ভোগ করে। বইও এবিষয়ে লেখে বিস্তর, বিক্রী করে পয়সাও রোজগার করে কিছু। লোককে ঠকানো ব্যবসা। ঠেঙ্গিয়ে দিতে হয় ঠকগুলোকে। এই সব নীতীশের হল সাধারণ ভাষ্য ও ভাষা। এই কারণে সে অনেকের কাছে অপ্রিয় ছিল। তারা বলত—পরলোকতত্ত্ব একটা মতবাদ—ধর্ম্মমতই। তার বিরুদ্ধে এ হেন কটূক্তি নীতীশের উচিত নয়। তোমার বিশ্বাস না হয় ত করো না বাপু বিশ্বাস। হামেশা এত তর্কের অবতারণা কেন হে বাপু? ও যেন একটা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক! সে আরও কয়েকটা কারণে অদ্ভুত! হয় সে চিরকুমার অথবা বিপত্নীক, নয়ত পত্নীছোড়! মোটকথা সে নিতান্তই একলা। সংসারে তার কেউ আছে বলে মনে হয় না। বয়স হয়েছে বেশ, রিটায়ারের সময় হয়ে এসেছে প্রায়। মাইনে পায় ভাল, কিন্তু কৃপণের বেহদ্দ। অথচ টাকা যে কোথায় যায় তা কে জানে? এতদিন চাকরী করছে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স কিছুই নেই বলতে গেলে। এ খবরটা সহকর্মীরা খুব কষ্টে যোগাড় করেছে। কষ্ট এই জন্যে বলছি যে, যদিও আফিসে তার মুখ দিয়ে বাক্যের খই ফোটে, তার বাড়ী গেলে দেখা যায় ঠিক বিপরীত মূর্তি তার। গম্ভীর যেন ভূতগ্রস্ত মূক। চেনাই প্রায় যায় না তাকে, সেও চিনতে চায় না তখন কাউকে। তার বয়সের স্রোত এমন মোহানায় গিয়ে উপনীত হয়েছে যেখানে পরলোকতত্ত্বের জলাবর্ত পেয়ে বসতে পারে তাকে—বিশেষ করে যখন তার এই নিরাশা গৃহখানিতে গুম্ হয়ে বসে থাকে। তখন তাকে দেখে আফিসের টিফিন সময়কার তার্কিক বলে মনে হয় না, বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি।

একজন ভৃত্য সম্বল। সে-ই সব করে। বাজার, রান্না, বাসনমাজা, জুতো বুরুষ সবই। কিন্তু সেও ভূতের মত কাজ করে যায় সব। ভয়ে ভয়ে মনিবকে পড়ার-টেবিলেই অনেক সময় খাবার দিয়ে যায়। বাঁ

হাতে বইএর পাতা ওলটায়, ডান হাতে খেতে থাকে, কি খাচ্ছে তা হয়ত জানেই না। বাড়ীতে কারো বিশেষ প্রবেশ ছিল না। তৎসত্ত্বেও সকলে জানে এই কৃপণের ভাণ্ডার ও ব্যাংকের তহবিল রিক্ত। আর একটা খবর যোগাড় হয়েছে যে, লোকটার নাকি গোপন দান বেশ আছে। আর আশ্চর্যের বিষয়—থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে গোপনে দান করে, যার বিরুদ্ধ মতবাদ সে প্রকাশ্যে হামেসা প্রচার করে থাকে।

(২)

কিন্তু বন্ধু একজন আছে তার। অন্তরঙ্গ বন্ধু সে, যার কাছে অন্তর উন্মুক্ত করে ধরা চলে। মাঝে মাঝে নিশার আগমনে তমসার আবরণে যখন সবকিছু আচ্ছন্ন, যখন নিদ্রার যবনিকা নেবে আসে, ক্বচিৎ কোন কোন রাতে নিদ্রার পর্দা ফুঁড়ে সুখস্বপ্নের সুহাস ফুটে ওঠে। এমনি একটি স্বপ্নেরই মত হঠাৎ মাঝে মাঝে গভীর রাতে এই বন্ধুটির আবির্ভাব হয়ে থাকে। নাম তার নবেন্দু। সে রাতে ঘুম তাদের চোখে থাকে না। গল্প চলে চলমান জলের কলকলানির মত।

নবেন্দু বলেছিল—এতই যদি ভালবাসতিস বেলাকে তবে মুখ ফুটে একদিনও বললি না কেন তাকে একটি-বারও তোমার ভালবাসার কথা?

নীতীশের জবাব ছিল—সেও ভালবাসত কিনা সেইটে যে জানতে পারি নি। তা না জেনে কোন্ সাহসে বলি আমার ভালবাসার কথা?

—কিন্তু জীবন যখন তার শেষ হয়ে আসছিল, তখন কি আর সাহস বা ভয়ের বিচার চলে?

—তখনই ত বিশেষ ভয়ের কথা! অন্তিমকালে তাকে বিচলিত করা উচিত হত কি?

—কিন্তু হয়ত বিচলিত না হয়ে একটা শেষ সম্বল নিয়ে পরপারে যাবার সৌভাগ্য হত তার অবিশ্যি যদি সেও ভালবেসে থাকত।

—আর যদি সে ভালবেসে না থাকত? তবে আমার ভালবাসা ব্যক্ত করায় সে হয়ত এতই বিরক্ত হতে পারত যে তার অন্তিমকালে তার কাছে বসবার অধিকারটুকু হতেও বঞ্চিত থেকে যেতুম। আমার ত প্রায় সেই ক'টা দিনের সান্নিধ্যলাভের স্মৃতিটুকুই সম্বল হয়ে রয়েছে জীবনে। আমার সেবা করবার পালা ছিল রাতে, বাড়ীর লোকেরা সারাদিন সেবা ক'রে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত। নিশ্বাসের কষ্ট হত বলে প্রায় সর্বক্ষণ হাতপাখার বাতাস নাকের কাছে করতে হত। কত নিশুতি রাত, শিয়রে বসে একা পাখা নাড়ছি, চোখ বুজে শুয়ে আছে, ঘুম আসছে না, মাঝে মাঝে বলত 'আর একটু জোরে বাতাস'। আমি সজোরে কিছুক্ষণ পাখা চালাই। হঠাৎ এক সময় চোখমেলে দেখে—কে হাওয়া করছে। আমায় দেখে যেন মুখে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। বলেছে "আচ্ছা এইবার আস্তে আস্তে বাতাস কর"। আমি ধীরে ধীরে বাতাস করে চলেছি তখন। বাতাসের ধাক্কায় যদি দুচার গাছি চুল মুখের উপর এসে পড়েছে, আমি আলগোছে তা সরিয়ে দিয়েছি। এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার একাকী মন বলেছে—ঘুম পাড়িয়ে দিলুম প্রিয়তমাকে। কিন্তু পরক্ষণেই আঁৎকে উঠেছি এই ভেবে—হায়! চির-নিদ্রা ত আসন্নপ্রায়! সে এক অভিনব মনের অবস্থা—তৃপ্তি ও আতংক—যুগপৎ আবির্ভাব! পরপর তরঙ্গের তোলপাড়। একদিন বললে "আমি ত চললুম, তুমি রইলে দুঃখ ভোগ করতে"। ঠিক কি ভেবে বলেছিল কথাটা আজও বুঝতে পারি না।

এই পর্যন্ত বলে চুপ করল নীতীশ। নবেন্দুও চুপ করে রইল। একটু পরে নবেন্দু বলল—

—কিন্তু ধর সে যদি তোমায় ভালবেসে থাকে, তবে তোমার মনটা জানবার সুযোগ ত পেয়ে গেল না।

—পরপারে গিয়ে হয়ত আমার মন জানার সুযোগ পেয়েছে। বিদেহী আত্মা ত শুনি আমাদের অন্তর পড়তে পারে। তাই ভাবছি আজ। যে প্রশ্নটা জীবন থাকতে জিগ্যেস করতে পারি নি, মরণ-পারে পৌঁছে দিতে চাই সেই জিজ্ঞাসা ওগো তুমি কি ভালবাস? যদি তাই হয় একটিবার দেখা দেও।

এই কথা শুনে নির্বাক নবেন্দু নীতীশের দিকে

নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। এরপর কী যে কথা বলবে ভেবে পেল না। হঠাৎ নীতীশ এগিয়ে এসে নবেন্দুর বুকে হাতটা রেখে বলে—আমি লোকের সঙ্গে জোর গলায় তর্ক-জুড়ে দিই এই বলে যে পরলোক বলে কিছু নেই, তা কেন করি জানিস ?

—কেন ?

—সেটা করি এই জন্যে যদি কোন বিদেহী-আত্মা আমার ভুল ভাঙ্গাতে একদিন এসে আমায় দেখা দেয় সেই আশায়। সেই প্রতীক্ষা করে থাকি প্রতিদিন।

(৩)

সেদিন ছিল রবিবার। সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন। দীর্ঘ দিবানিদ্রা দিয়ে নীতীশ উঠেছে বেলা পেরিয়ে। জানলাগুলো বৃষ্টির ভয়ে বন্ধ। কিন্তু বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। দরজা আধখোলা, ঘরখানা আঁধারপানা। স্বপ্নলোক থেকে মনটাকে তখনো ঝেড়ে ফেলতে পারে নি বুঝি। কি রকম নিঝুম মেরে বসেছিল। হঠাৎ নারী-কণ্ঠের মিনতিভরা আবেদন শুনে চমকে উঠল—"যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্যে চাঁদা দেবেন ?"

কখন ঘরে একটি তরুণী ঢুকে দূরে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি নীতিশ। হঠাৎ এই মিনতিপূর্ণ নারীকণ্ঠ শুনে চমকে তার দিকে তাকাল, তাকিয়েই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে বললে, "এ কি বেলা, যে এসো এসো বেলা" বলতে বলতে তৃষিত ঝড়ের মত ছুটে গেল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও সেই মুহূর্তে ঝড়ের অগ্রে চালিত মেঘেরই মত নিমিষে কোথায় মিশিয়ে গেল।

নীতীশ পাষাণের মত সারা সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিলে সেই ঘরেই। সারা রাতও বুঝি সেই ভাবে কাটিয়ে দেবে বলে দরজা রাখল খোলা। দিবা-নিদ্রা হয়েছে প্রচুর, রাতে সজাগ অপেক্ষা। যদি আবার আসে এই আশা। যেন অশরীরের আসতে খোলা দরজার দরকার হয়।

গভীর রাতে সত্যি হল পদধ্বনি। ব্যাকুল হয়ে দরজায় পৌঁছতে দেখল—বেলা না, নবেন্দু। তার গলা জড়িয়ে টানতে টানতে এনে বসাল নিজের পাশে। বললে,—"জানিস নবু, আজ বেলা এসেছিল !"

—বলিস কি রে ?

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, সেই কণ্ঠস্বর, তারপর একেবারে সেই মূর্তি। কিন্তু মূর্তি সে মুহূর্তেই অন্তর্ধান। দেখা দিয়ে বুঝি বুঝিয়ে গেল যে সেও ভালবাসে। যা জানতে চেয়েছি এতকাল।

নবেন্দু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বন্ধুর দিকে।

(৪)

সতীশ সে বছর ডাক্তারী পাশ ক'রে হাউস-সার্জেন হয়েছে ছাত্রাবস্থায় প্রথম তিনটা বছর হাসপাতালের জন্যে চাঁদা আদায় করত। গত দু'বছর হতে তা আর করে না। তবে নতুন ছাত্রছাত্রীদের হদিস বলে দেয় কোথায় কার কাছে গেলে ভাল টাকা পাওয়া যেতে পারে।

রেবা সেদিন তার কাছে ছুটে এসে মহা উত্তেজনার সঙ্গে বললে, "কার কাছে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ? আপনি ত বেশ লোক !"

—কেন কি হয়েছে দেয় না চাঁদা ?

—চাঁদা চুলোয় যাক ? এমন বদ লোকটা—দুই হাত বাড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরতে ছুটে আসছিল ?

—বটে ? তবে কি জান, ওটা ওর একটা অভ্যাসের মত। আমি যতবার গিয়েছি ওর কাছে যক্ষ্মা হাসপাতালের চাঁদার জন্যে, এমন আগ্রহ ক'রে জড়িয়ে ধরেছে আমায় যে অবাক হয়ে গিয়েছি। লোকটা এমনিতে কৃপণ, কিন্তু যক্ষ্মা-হাসপাতালের দানের বেলায় মুক্তহস্ত। মোটা টাকা পেয়েছি প্রত্যেক বছরেই। শুনেছি ও যাকে ভালবাসতো সে মেয়েটি যক্ষ্মারোগে মারা যায়। তাই যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্যে যারা চাঁদা চাইতে যায় তাদের ঐ রকম অভ্যর্থনা করে প্রথমটায়। পরে মুক্ত হস্তে দান। কিন্তু তোমার সঙ্গেও যে ঐ রকম ব্যবহার করবে তা ত মনে করি নি।

সতীশের কথা শুনতে শুনতে রেবা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাকে যে নাম ধরে সম্বোধন করেছিল নীতীশ, তার সঙ্গে সতীশের কথাগুলো মনে মনে মিলিয়ে নিতেই স্তম্ভিত হল। সতীশের কথার কোন জবাব না দিয়ে নীতীশের সেই "বেলা, বেলা" বলে আহ্বানটার আলোড়ন মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। কারণ সে জানত তার মাসীর নাম ছিল 'বেলা' এবং তিনি যক্ষ্মা রোগে যৌবনেই মারা যান। আর বাড়ীর লোকেরা বলতেন সে নাকি বেলার মত দেখতে হয়েছে। তবে কি··· ?

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মূল্যবৃদ্ধির চাপে জনজীবন অসহনীয়

পশ্চিমবঙ্গের নূতন অকংগ্রেসী সরকার গদিতে আসীন হইবার পর চাউল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য এবং অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য কিছু কমিয়াছিল—কেন তাহা বলা যায় না। ব্যাপারীরা হয়ত মনে করিয়াছিল নূতন সরকার কঠোর হস্তে সর্ব্ব প্রকার অনাচার বন্ধ করিবেন এবং এই আশঙ্কাতেই অনেক ব্যাপারী তাহাদের গোপন ষ্টক কিছু কিছু ছাড়িয়া দিতেছিল। তাহার পর যখন দেখা গেল—ভয় করিবার কিছু নাই, তখন ব্যাপারী এবং কালো-বাজারীর দল আবার স্বধর্ম পালনে তৎপর হইল, এমন কি, মাস দুই কিছু কম মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া লাভের অঙ্কে যাহা কম পড়িয়াছিল সেটাও তাহারা পূরণ করিয়া লইতে সুরু করিল।

গত কিছুদিন হইতে দ্রব্যমূল্য আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। কয়েকটি অতি আবশ্যকীয় খাদ্য-সামগ্রীর মূল্য নিম্নে দেওয়া হইল। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন সীমিত আয়ের মধ্য এবং নিম্ন-মধ্য-বিত্ত লোকদের অবস্থা কি হইয়াছে। জনগণ বহু আশা করিয়াছিল—নূতন রাজ্য সরকার যেমন করিয়াই হউক দ্রব্যমূল্য সীমিত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা কম করিবার সকল প্রয়াস অবশ্যই করিবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা এ বিষয়ে ক্ষীণতম আশার আলোকও দেখিতে পাইতেছি না কেন? অবশ্য আশা আমরা ছাড়ি নাই এবং এখনও মনে করি নূতন রাজ্য সরকার তাঁহাদের প্রতিশ্রুত জনসেবা এবং জন কষ্ট দূর করিবার ব্রতপালন হয়ত সার্থক করিতে পারিবেন।

গত কিছুদিনের কয়েকটি দ্রব্য মূল্যের স্যাম্পল্ দেওয়া হইল :—

মুসুর ডাল—১ টাকা ৭০ পয়সা (১'৫০ টাকা)। মুগ ডাল—২ টাকা (১'৮০ পয়সা)। মটর ডাল—১ টাকা ৭০ পয়সা (১'৬০ পয়সা)। অড়হর ডাল—১ টাকা ৫০ পয়সা (১'৪০ পয়সা)। বিউলি ডাল—২ টাকা (১'৮০ পয়সা)। সরিষার তৈল ৫ টাকা ২০ পয়সা (৪·৯০ পয়সা)। গুড়—২ টাকা (১'৪০ পয়সা)। আলু—১'১০ টাকা (৯০ পয়সা)। পটল ও বেগুন এক মাস আগে যথাক্রমে ২ টাকা ও ১'২৫ পয়সায় বিক্রী হইতেছিল। এখন যথাক্রমে ১ টাকা ও ৭৫ পয়সায় বিক্রি হইতেছে। উচ্ছে ও ঝিঙ্গার দামও কিছু কমিয়াছে। মাছের দর আগের মতই বেশি। কাটা রুই ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা। আলুর দাম আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। পেঁয়াজেরও তাই। (বন্ধনীতে কিছুদিন পূর্ব্বের মূল্য দেওয়া হইয়াছে)।

নূতন সরকার চেষ্টা সত্যই করিতেছেন, কিন্তু, এখনও তেমন কিছু সার্থকতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

এ বিষয়ে নূতন সরকারের মুখপাত্রদের একটা কথা বলিবার আছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের সকল দুর্দ্দশা এবং অসহনীয় কষ্টের জন্য কথায় কথায় প্রাক্তন রাজ্য সরকারের নিন্দা, সমালোচনা করার সার্থকতা কোথায়? যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজে দেখাইয়া দিন তাঁহারা এ-রাজ্যের অনাচার, খাদ্যাভাব, প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রভৃতি অন্তত খানিকটা নীরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা করিতে পারিলেই, প্রাক্তন সরকারের নিন্দার ফল বাক্যে যাহা হইবে, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হইবে, এবং লোকেও বুঝিবে ভাল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা যেমন করিয়াই হউক খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি রোধের সঙ্গে মূল্য হ্রাসও করিবেন। শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা কোথায় ?

মূল্যবৃদ্ধি রূপ অনাচারের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী অতিলোভী এবং কৃষ্ণবাজারী ব্যবসায়ী এবং ব্যাপারীরা। খাদ্যদ্রব্যাদির এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যেরও বিষম অভাব পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রায় সমগ্র ভারতেই। বিহারের কথা না বলাই ভাল। আবার পাশের রাজ্য পাকিস্থানেও চরম খাদ্যসঙ্কট। অসাধু ব্যাপারী এবং কালোবাজারীদের পক্ষে এ-সঙ্কট অতি মহার্ঘ্য সুবর্ণ-সুযোগরূপে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহারা কেবল রাজ্যের বাহিরেই নহে, দেশের বাহিরেও খাদ্যশস্য পাচার করিতেছে। ইহারা যে-কোনো মূল্য (নগদ) দিয়া ধান চাউল কিনিতেছে এবং ক্রীত মূল্যের তিনচারি গুণ বেশী দামে ঐ সব ধান চাউল বিক্রয় করিয়াছে—এখন করিতেছে। এই সকল অসাধু অনাচারী ব্যবসায়ীদের কারবার নগদে, হাতে হাতে। ধারের বালাই নাই। হিসাবেরও মারপ্যাঁচ নাই। কাঁচা মাল, কাঁচা টাকা—খরিদ্দার দরজায় হাজির। কাজেই ব্যবসার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ তাহারা ছাড়িবে কেন। অর্থ-উপার্জ্জনই যাহাদের একমাত্র কাম্য, জীবনের চরম সাধনা এবং এই অর্থরূপ মোক্ষলাভের জন্য এই অনাচারী ব্যবসায়ীরা দেশকে, দেশবাসীকে যে-কোন অনর্থের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে কোন প্রকার দ্বিধা, লজ্জা-সঙ্কোচবোধ করিবে কেন ? হাজার লোকের প্রাণের বিনিময়ে যদি ইহাদের হাজার টাকা মুনাফা হয়, সেই ক্ষেত্রে ইহারা মুনাফাটাকেই দেখে বড় করিয়া। মানুষের প্রাণ ইহাদের কাছে মূল্যহীন !

এই সব কালোবাজারীদের নিকট হইতে গরীব চাষীরা, সরকারী মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে ধান-চাউল বিক্রয় করার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, কাজেই চাষীরা হাতে হাতে নগদ টাকা পাইয়া, মজুদ মাল এই কালোবাজারীদের হাতেই তুলিয়া দিয়াছে—এবং দিতেছে সানন্দে। ব্যাপারীরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঐসব মাল রাজ্যের বাহিরে এবং সময় সুযোগ মত দেশের বাহিরেও—পাচার করিতেছে এবং এই পুণ্যকর্মে তাহাদের সহায়তা দান করিতেছে এক শ্রেণীর অসৎ সরকারী আমলা—নগদ মূল্য—অর্থাৎ ঘুষের বদলে।

পাকিস্থানের সহিত আমাদের কোন প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্ক না থাকিলেও চোরা সড়কে ধান-চাউলের কারবার ভালই চলিতেছে এবং এ-বিষয় সবকিছু জানিয়া শুনিয়াও পাকিস্থান সরকার নীরব, নিশ্চেষ্ট, কারণ ইহাতে পাক সরকারের ক্ষোভ কিংবা ক্ষতির কোন কারণ নাই বরং এক দিক দিয়া বিষম একটা লাভের কারণই ঘটিতেছে। রাজ্য সরকার যদি এই সকল পাপ ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা করিতে পারেন, দু-চারজনকে ধরিয়া ভরসা করিয়া ফাঁসী দিতে পারেন তাহা হইলে কাজের কাজ কিছু হইবে। রেলগাড়ীতে দু চার কেজি চাল লইয়া (বিক্রয় উদ্দেশ্যে) যে-সব গরীব স্ত্রীলোক ভ্রমণ করে তাহাদের দমন করিয়া সমস্যার সুরাহা হইবে না।

দ্বি-বনাম ত্রি-ভাষাসূত্র

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যশিক্ষামন্ত্রীদের লইয়া কিছু-দিন পূর্ব্বে নব হস্তিনাপুরে দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভাষা, কয়টি ভাষা এবং অন্যান্য শিক্ষা-সমস্যা লইয়া যে আলোচনাচক্র বসে তাহাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ত্রিগুণা সেনের দ্বি-ভাষাসূত্রের পক্ষে (আঞ্চলিক এবং ইংরেজী) প্রায় সকলেই মত প্রকাশ করেন। ইহাতে হিন্দী ভাষী রাজ্যগুলির ছাত্রছাত্রীদেরও কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি হইবে না, কারণ শিক্ষার প্রথম স্তর হইতে শেষ পর্যায় পর্য্যন্ত হিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা তাহাদের মাতৃভাষা হিন্দীর মাধ্যমেই করিতে পাইবে এবং বিশেষ একটা শ্রেণী হইতে ইংরেজী শিক্ষা করিবার সুযোগও পাইবে। অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলির বেলাতেও ঠিক এই কথা। একথা শিক্ষক এবং শিক্ষা বিষয়ে যাঁহারা সামান্য চিন্তা করেন এবং চাহেন যে দেশের ছেলে মেয়েরা প্রকৃত ভাবে শিক্ষিত হইয়া উঠুক, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে অযথা অনাবশ্যক কয়েকটা ভাষা শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে, বিশেষ করিয়া ১ম হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত 'আবশ্যিক" করিলে তাহাদের উপর অযথা একটা চাপ দেওয়া হইবে। ইহাকে নিপীড়নও বলা যাইতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী আলোচনা-চক্রে এইসব ভাবিয়াই "দ্বি-ভাষা" সূত্রকেই গ্রহণ করা হয়। এই সূত্র গ্রহণ করিয়া কাহারো উপর কোন প্রকার জবরদস্তি করা হয় নাই। এই ব্যবস্থা অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিতে একটা স্বস্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় মহলে ফল হইয়াছে বিপরীত।

প্রধানমন্ত্রী 'বিশ্ব-ধন্যা' ইন্দিরা এবং তস্য ডেপুটি

'বিদ্যা-পতি' মোরারজী ফতোয়া জারী করিলেন যে দেশের এবং দেশবাসীর কল্যাণের (?) কারণে "ত্রিভাষা" সূত্র রক্ষা করিতেই হইবে, অর্থাৎ সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে হিন্দীর প্রভুত্ব বজায় রাখা চাই-ই। তবে তাঁহারা একেবারে নির্দ্দয় নহেন, দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যন্ত (৫।১০ বৎসর) হিন্দীতে পণ্ডিত না হইয়া উঠে ততদিন হিন্দীর পাশে ভিখারিণীর মত ইংরেজীও চলিতে থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারী কাজকর্ম্ম চলিবে হিন্দীর মাধ্যমে তবে সকল প্রকার আদেশ-নির্দ্দেশের সঙ্গে একটি করিয়া ইংরেজী তর্জ্জমা যুক্ত থাকিবে। লোক এবং রাজ্যসভা দুটিতেও ঐ একই ব্যবস্থা।

শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে, এবং কমবয়সী ছাত্র-ছাত্রীরা কয়টি ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য থাকিবে, সে বিষয়ে শিক্ষা বিদ্‌দের মতই গ্রহণীয়—কিন্তু আমাদের এই বিচিত্র গণতন্ত্রের ব্যবস্থা অতি বিচিত্র। শিক্ষার ভাষা বিষয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা এবং কট্টরী হিন্দী প্রেমী শ্রীমান মোরারজীর ('বিদ্যা-পতি'র) মত প্রকাশ করিবার কেবল প্রয়োজনই নহে, কি অধিকার আছে জানিতে পারিলে সুখী হইব। শ্রীমতী ইন্দিরা প্রধান মন্ত্রী হইতে পারেন, প্রশাসনিক কাজেও ক্রমে ক্রমে হয়ত দক্ষ হইয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু জনশিক্ষার পদ্ধতি বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার আছে কি? ভাগ্যক্রমে তিনি আজ বিশ্বভারতীর 'আচার্য্য' (পদের কল্যাণে)। রবীন্দ্রনাথ যে আসনে একদা ছিলেন সেই আসনে বসিতে —অন্য কেহ হইলে (লজ্জিত হইয়া) অন্য কোন সত্যকার গুনী ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিতেন। দেশ এখনও ভ্যারেণ্ডা এবং গাব বৃক্ষেই ভরিয়া যায় নাই।

শ্রীমান মোরারজীর বিষয় কিছু না বলাই ভাল। এই দাম্ভিক ব্যক্তিটি নিজের অধিকারের মাত্রা এবং সীমা বিষয়ে অ-জ্ঞান। সকল বিষয়েই ইহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত প্রকাশ করা চাই-ই। করুন তাহাতে কেহ বাধা দিবে না, কিন্তু দেশের শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার কোন মতামত না প্রকাশ করা, তাঁহার নিজের এবং দেশের পক্ষেও সত্যই মঙ্গলকর হইবে।

ওদিকে বোম্বাই শহরে এক প্রেস কনফারেন্সে শেঠ গোবিন্দ দাস এম. পি., বলিয়াছেন যে দ্বি-ভাষা সূত্র দ্বারা যে সকল রাজ্য হিন্দী গ্রহণ করিবে না, সেই সব রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর উপর জোর করিয়া ইংরেজী চাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে! তাঁহার মতে দুই কোটি লোকের ভাষা ৪৪ কোটি লোকের উপর জোর করিয়া চাপান হইতেছে। এই লোকটি গত ১৮ বৎসর ধরিয়া ভারতের সকল রাজ্যে এবং সকল রাজ্যবাসীর উপর গায়ের জোরে হিন্দী চাপাইবার পুণ্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। আজ কংগ্রেসের এই প্রহার জর্জ্জরিত কাহিল অবস্থাতেও এই সব উৎকট হিন্দীওয়ালাদের মনের কোন পরিবর্ত্তন এখনও হয় নাই, তবে হইতে আর খুব দেরী হইবে না—এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জোর করিয়া অহিন্দীভাষীদের উপর পরম-অপক ভাষা হিন্দী চাপাইতে কোন দোষ নাই, কিন্তু যে ভাষা শিক্ষা না করিলে বর্ত্তমান জগতে চলা, যোগাযোগ রাখা এক প্রকার অসম্ভব —সেই ইংরেজী ভাষাকেই হটাইবার জন্য এক শ্রেণীর অ-এবং অর্দ্ধশিক্ষিত হিন্দী পণ্ডিত নিজেদের মত দেশ শুদ্ধ সকলকেই অর্দ্ধ শিক্ষিত রাখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য এমন বিষম প্রয়াস, (যে প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য,) পাইতেছেন কেন? হিন্দী ভাষী লোকেরা যদি ইংরেজী না শিখিতে চাহেন, শিখিবেন না এবং ইহাতে কেহ তাঁহাদের কোন ভাবে বাধ্যও করিবে না। কিন্তু অহিন্দী ভাষী রাজ্যের লোকেরা যদি হিন্দী না শিখিয়া তাহার বদলে ইংরেজী গ্রহণ করেন, তাহাতে কট্টর হিন্দী উদো-পণ্ডিতদের এত হৃৎপিণ্ড দাহন হইতেছে কেন জানি না!

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দ্বি-ভাষা সূত্র যদি কেন্দ্রীয় সরকার, (শ্রীমতী ইন্দিরা এবং মোরারজীর প্ররোচনায়) বাতিল করেন, তাহা হইলে শ্রী ত্রিগুণা সেনের একমাত্র কর্ত্তব্য সসম্মানে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করা। বিশেষ করিয়া এই মন্ত্রিত্ব যখন তাঁহাকে বিশেষ কোন নূতন সম্মান দিতে পারে না। এই সঙ্গে অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিকে ইংরেজীকে অবশ্য শিক্ষণীয় করিয়া (মাতৃভাষার সঙ্গে)

অবিলম্বে সমান আসন দিতে বলিব ! পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এ-কথা বিশেষ প্রযোজ্য।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান বলিতে "হিন্দী শিক্ষা" বুঝায় না। কি ভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের সুস্থ সবল নাগরিক করা যায়, তাহা স্থির করিবেন দেশের শিক্ষাবিদরা—এ বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের ভোটের জোরে মন্ত্রী হইয়া হঠাৎ পণ্ডিতদের মাথা না গলানই ভাল, জোর করিলে মস্তিষ্কহীন মাথাগুলি ফাটিয়া যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে ঘেরাও ঘূর্ণী

এ-রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী যে ভাবে ঘেরাও সম্পর্কে তাঁহার অতি প্রাজ্ঞ মতামত প্রকাশ করিতেছেন এবং সর্ব্ব বিষয় শ্রমিকদের সকল প্রকার ন্যায় অন্যায় আচরণ সমর্থন করিয়া যাইতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে এই ভদ্রলোক ট্রেড্-ইউনিয়ন লিডারের মনোভাব এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। ঘেরাও এবং কতকগুলি বিষয় অনাচার সম্পর্কেও তিনি নীরব। এবং মনে হয় এই সব মাত্রাহীনতায় তাহার মৌন সমর্থন রহিয়াছে। মন্ত্রীমহাশয় দয়ালু এবং সুবিবেচক ব্যক্তি তাই তিনি ঘেরাওকারীদের নিষ্ঠুর হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এ-নিষেধ কতখানি কার্যকর হইয়াছে—তাহা সংবাদপত্র পাঠকমাত্রেই জানেন আশা করি। এই দুঃসহ গরমে রৌদ্রের নিচে ৫৭ ঘণ্টা খালি মাথায় দাঁড় করাইয়া রাখা এবং একটু জল চাহিলেও তাহা ঘেরিত দুইজন অফিসারকে না দেওয়া নিশ্চয়ই পরম দয়ার লক্ষণ! কলিকাতা কর্পোরেশন দপ্তরে মেওর এবং তাঁহার সহকর্মীদের প্রায় ৫৬ ঘণ্টা, ঘরের ফ্যানের এবং বাতির তার কাটিয়া দিয়া, নির্জ্জলা আটক রাখাটাও অতিশয় দয়ার কার্য্য। বাড়ী হইতে প্রেরিত 'ঘেরিত আসামীদের' জন্য —খাবার আসিলে তাহা বাহকদের হাত হইতে অতি শান্তভাবে কাড়িয়া লইয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়াও কম দয়ার কার্য নহে, ইহা দয়ালু ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ঘেরাও করিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে 'ঘেরিতদের' প্রহার করা হয়ত আমাদের যুবক শ্রম মন্ত্রীর বিচারে অন্যায় হইলেও এমন কিছু গুরুতর অন্যায় নয়। প্রহারকারীদের সাহসী বলিতেও হয়ত তাঁহার দ্বিধা হইবে না।

রাজ্য শ্রম মন্ত্রীর মতে ঘেরাও দণ্ডনীয় অপরাধ নহে। আইন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকিলে জোর গলায় এমন ঘোষণা কেহ করিতে পারে না। কিন্তু—

ভারত সরকারের আইনজ্ঞ তথা অন্যান্য প্রায় সকল আইন বিশেষজ্ঞদের মতে ঘেরাও, ষ্টে-ইন-ষ্ট্রাইক বেআইনী এবং আইনের চোখে এই দুইটি কার্য্যই দণ্ডনীয় অপরাধ। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীনিশীথ কুণ্ডু মহাশয়ও বলিয়াছেন ইহা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। ইহার বিরুদ্ধে মালিকপক্ষ দেওয়ানী বা ফৌজদারী উভয়বিধ মামলা দায়ের করিতে পারেন। এই সব মামলা শ্রমমন্ত্রী কি বাতিল করিয়া দিবেন ?

ঘেরাও অর্থ কি ? বেআইনীভাবে (গায়ের এবং দলের জোরে) মানুষকে আটক রাখা। এবং এই ঘেরাও কখনও এবং কোন ভাবেই প্রতিবাদ জানাইবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নহে। প্রতিবাদ জানাইবার পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে—(সর্ব্বদেশে) শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং দরকার হইলে সত্যাগ্রহ। কিন্তু 'ঘেরাও' অর্থই হইল একজনের স্বাধীন ভাবে চলাফেরা, স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম করায় বেআইনী বাধার সৃষ্টি করা। ইহা আর যাহাই হউক ভদ্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নহে।

আমাদের শ্রমমন্ত্রী বেআইনী কোন কাজকে আইনী করিবার ক্ষমতা রাখেন কি না জানি না। যেমন শুনা যাইতেছে কয়েকটি ঘেরাওএর ঘটনা শেষ পর্য্যন্ত আদালতে যাইতে পারে। মন্ত্রী মহাশয় 'পুলিশকে 'ঘেরিত'দের সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন—ভাল কথা। কিন্তু তিনি শ্রম মন্ত্রী হইয়া দেশের পুলিশকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে যাইতে নিষেধ করেন কোন বিশেষ ক্ষমতাবলে জানিতে ইচ্ছা হয়। পুলিস পালন করা

হয় কাহাদের টাকায়? নিশ্চয়ই দেশের লোকের। কিন্তু বিপদকালে, নিরাপত্তার কারণে সেই পুলিসকে শ্রমমন্ত্রী এক পার্টির স্বার্থে, আর এক পার্টির রক্ষার জন্য কোন্ আইনের কত ধারামত নিষেধ করিতে পারেন? এ বিষয়ে কেহ, কোন আক্রান্ত পার্টি—টেষ্ট কেস করিলে ভাল হয়।

রাজ্যমন্ত্রী মণ্ডলীতে ঘেরাও লইয়া মতভেদ?

মন্ত্রী শ্রীনিশীথ কুণ্ডু (পি-এস-পি) মুখ্যমন্ত্রী অজয় বাবুকে 'ঘেরাও'-এর প্রশ্ন উত্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। নিশীথবাবু সোজা কথায় বলিয়াছেন যে ঐ বিষয়টি এ পর্য্যন্ত রাজ্য মন্ত্রী সভায় উত্থাপিত কিংবা আলোচিত হয় নাই (১-৮-৫-৬৭)। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা কি মনে করিব—যে-'ঘেরাও' আজ এ রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে পরম একটা বিপর্য্যয় তথা সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে, সেই "ঘেরাও" কি একমাত্র রাজ্য শ্রম মন্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে? শ্রমমন্ত্রীর এই বিষম খামখেয়ালীকে, অন্য কথায়, স্বেচ্ছচারিতা বলিয়া অভিহিত করিলে অপরাধ হইবে কি? শ্রম মন্ত্রী অবশ্য রাইটার্স বিল্ডিংসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে তিনি 'ঘেরাও' ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখান নাই। কিন্তু 'ঘেরাও' সম্পর্কে তাঁহার উদাসীনতার কি অর্থ হইবে? বহুক্ষেত্রে মৌনতার দ্বারাও বহু কাজকে চরম উৎসাহ দান করা যায়। শ্রমিকের দল 'ঘেরাও' করিয়া কয়েকজন অফিসারকে বন্দী করিয়া রাখিবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ক্ষেত্র বিশেষে দিনের পর দিন, কিন্তু 'বন্দীদের' রক্ষা এবং মুক্ত করিতে শ্রমমন্ত্রী রাজ্য পুলিসকে তফাতে রাখিবেন, 'ঘেরাও' স্থানের ত্রিসীমানায় যাইতে দিবেন না—সাধারণ ব্যক্তি ইহাকে কি অর্থে গ্রহণ করিবে। স্বভাবতই আমাদের মনে হইবে শ্রম মন্ত্রী শ্রমিকদের 'ঘেরাও' সম্পর্কে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়া তাহাদের নাক ঘুরাইয়া উৎসাহের উপর আরো বেশী কিছু দান করিতেছেন।

যতদূর জানা যায় রাজ্যমন্ত্রী সভায় ঘেরাও লইয়া গভীর মতভেদ দেখা গিয়াছে এবং একমাত্র শ্রমমন্ত্রী ছাড়া আর কোন মন্ত্রীই 'ঘেরাও' জিনিষটাকে ভাল চোখে দেখিতেছেন না। অন্যান্য অকংগ্রেসী রাজ্যের এবং এমন কি কেরলেরও মন্ত্রীসভা দ্বিধাহীনভাবে এবং ভাষায় ঘেরাওএর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী—এই দুই জনের নিকট হইতে 'ঘেরাও' সম্পর্কে স্পষ্ট কথা লোকে শুনিতে চায়। সকলেই এমন আশঙ্কা করিতেছেন যে 'ঘেরাও" আন্দোলন সময় থাকিতে দমিত না হইলে শেষ পর্য্যন্ত চরমভাবে এক সর্ব্বনাশা মহামারিরূপে সারা রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িবে এবং যাহার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য, মানুষের স্বাভাবিক কাজ কর্ম্ম এমন কি প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

মতলবী 'ঘেরাও'?

একজন মন্ত্রী এমন কথাও বলিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ দু-একটি রাজনৈতিক দল 'ঘেরাও'-এর অবকাশে দলীয় সংগঠনকে পাকা ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার প্রয়াসও করিতেছে। ইহা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দলগুলি 'ঘেরাও' কে উসকানী উৎসাহ দিয়া ফাঁকতালে হাততালি পাইবার চেষ্টাতেও রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দেখা যাইতেছে 'ঘেরাও'-এর ফলে নানাবিধ হাঙ্গামা, অকারণ নিষ্ঠুরতা এবং সেই সঙ্গে সমাজ-জীবনে স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম ব্যাহত হইতেছে। কলকারখানায় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ভার যাঁহাদের দায়িত্ব এবং কাজ, তাঁহারা সর্ব্বদা একটা অস্বস্তির মধ্যে রহিয়াছেন এবং কোন কাজেই পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে—'ঘেরাও' যদি অনতিবিলম্বে বন্ধ করা না হয় তাহা হইলে এই অন্যায় অনাচার কেবলমাত্র শিল্পবাণিজ্য স্বার্থকেই হত্যা করিবে না, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক এবং কর্ম্মী কর্ম্মচারীদেরও গ্রাস করিতে, এমন কি যাঁহারা 'ঘেরাও' মুগ্ধ সেই তাঁহারাও ইহার কবল হইতে রক্ষা পাইবেন না। বর্ত্তমানে ইহার বেশী বলার প্রয়োজন নাই। আমরা আশা করিব, শ্রমিক-নেতা, সরকারী শ্রমবিভাগ এবং শিল্পপতিরা যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা এ রাজ্যকে

ঘেরাও রাহুর করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার সকল প্রকার সম্ভাব্য পন্থাই অবলম্বন করিবেন। সদ্ ইচ্ছা এবং সমস্যা সমাধানে ঐকান্তিক প্রয়াস থাকিলে শিল্পজগতে তথা অন্যান্য সকল সংস্থায় আবার শান্তি ফিরাইয়া আনা যাইবে—এ-বিশ্বাস আমরা রাখিব।

দুর্গাপুরের বুকে নূতন আঘাত

সংবাদে প্রকাশ—দুর্গাপুরে ফেরো-ক্রোম কারখানা স্থাপনের যে পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল—হঠাৎ তাহা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে—এবং পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্তে বিহারের পাত্রাতুত নামক স্থানে এই কারখানা বসাইবার কথা নাকি পাকা হইয়া গিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন পরিকল্পিত ফেরো-ক্রোম কারখানায় যাহা কিছু উৎপাদিত হইবে সেই সকল দ্রব্যই দুর্গাপুরের মিশ্র-ইস্পাত কারখানার একান্ত প্রয়োজনেই। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রণালয়ের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি—এই ফেরো-ক্রোম কারখানার স্থান নির্ব্বাচন বিষয়ে—কারখানার আর্থিক এবং সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে সব কিছুই বহু বিচার বিবেচনা করিয়া—দুর্গাপুরকেই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া সুপারিশ করেন। কিন্তু আজ হঠাৎ এমন কি ঘটিল যাহার জন্য দুর্গাপুর তথা পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করিয়া কারখানা বিহারে চালান করিতে হইতেছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। বিহারে এই পরিকল্পিত ফেরো-ক্রোম কারখানা স্থাপিত হইলে, ঐ কারখানায় উৎপাদিত সকল সামগ্রী দুর্গাপুরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। দেশের প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য বিশেষ জরুরী কাজের জন্য যে বিশেষ শ্রেণীর মিশ্র-ইস্পাত প্রয়োজন—তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা একমাত্র দুর্গাপুরেই আছে। ফেরো-ক্রোম কারখানা দুর্গাপুরে স্থাপিত না হইয়া সুদূর বিহারে হইলে—কাজ কর্মের বিশেষ ক্ষতি এবং ব্যয়বহুলও হইবে, অভিজ্ঞ মহলের অভিমত ইহাই।

ফেরো-ক্রোম কারখানাটি লইয়া—পরপর চারিটি সরকারী কারখানা—যেগুলি দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—সেগুলি কোন কারণ না দেখাইয়াই অন্যান্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হইল পশ্চিম বঙ্গকে বঞ্চিত করিয়া। কারখানাগুলির নাম: ১। সালফিউরিক এসিড কারখানা—যাহার জন্য কনট্রাক্টর পর্যন্ত নিয়োগ করা হইয়াছিল—ধানবাদে (বিহারে) দেড় বছর পূর্ব্বে। ২। দুর্গাপুরের জন্য ৬টি কোক ওভেন ব্যাটারি বিহারের রামগড়ে বসানোর ব্যবস্থা হইতেছে। ৩। দুর্গাপুরে জাপানী সহযোগিতায় ক্যামেরা তৈরীর যে কারখানা হইবার কথা, সে কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা আপাতত অন্তত নাই। ইহার জন্যও কনট্রাক্টর নিয়োগ করা হয় এবং যন্ত্রপাতিও তৈয়ারী করা হইয়াছিল। ৪। এই ফেরো-ক্রোম কারখানা স্থানান্তর হইল!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন তরুণ শিল্পমন্ত্রী দুর্গাপুরের বিষয় ছিলেন যেমন অজ্ঞ তেমনি নির্ব্বিকার, সংযুক্ত দলীয় সরকারও কি এবিষয়ে নীরব থাকিবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের—সুপরিচিত অতি সক্রিয় দুষ্টচক্রের, বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী বিদ্বেষী সর্ব্ব ক্রিয়া কর্ম্মে মৌন-সমর্থন দেখাইবেন?

স্বর্গত ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পিত এবং বহু আশা লইয়া সূচিত দুর্গাপুরের আজ এই অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর ভবিষ্যত ভাবিলে মন গভীর এক নিরাশার দুঃখ বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠে। ব্যাপার যেমন চলিতেছে, তাহাতে হঠাৎ এক প্রাতঃকালে দেখিতে পাইব যে সমগ্র দুর্গাপুরই পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—অবাঙ্গালীর পূর্ণ অধিকারে!

আমরা আজ মহা 'ঘেরাও' তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া আছি—দেখিবার অবসর নাই যে এই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্যের তালে তালে বাঙ্গালীর সকল আশা, ভরসা এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যত কোন অতলে চলিয়া যাইতেছে! 'ঘেরাও' আজ আমাদের সব কিছুকেই ঘিরিয়া ফেলিতেছে—কেহই একবার চোখ মেলিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছেন না 'ঘেরিত' সীমানার বাহিরে কিভাবে সব কিছুই বাঙ্গালীর আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়া অবাঙ্গালীর করায়ত্ত হইতেছে!

কলিকাতা কোন পথে ?

কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় পর্য্যটন ও বিমান পরিবহন মন্ত্রী ডঃ করণ সিং কলিকাতায় আসেন। সেইসময় দমদম বিমান বন্দরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে বিদেশী ভ্রমণকারীদের নিকট কলিকাতার আকর্ষণ ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে—এবং এমন দিন আর বেশী দূরে নহে যখন পর্য্যটকদের জন্ম কলিকাতার নামও হয়ত আর পেশ করা হইবে না—কলিকাতা কেবলমাত্র একটা হলটিং ষ্টেশন রূপেই পরিচিত হইবে। বহু পর্য্যটক স্পষ্টভাবে মন্তব্য করিয়াছেন, কলিকাতায় তাঁহাদের পক্ষে দেখিবার আর কিছুই নাই—যাহা কিছু আছে তাহাও আর পর্য্যটক টানিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং সেগুলির দর্শক আকর্ষণ ক্ষমতাও প্রচণ্ডভাবে ক্ষীয়মান। ডঃ করণ সিংএর মন্তব্য অকারণ বা অযথা নহে, তবে এ-প্রসঙ্গে কলিকাতা মহানগরীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং এ বিষয়ে তাঁহার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ব্বিকার ভাবের কথাও বলা কর্ত্তব্য ছিল। আজ কলিকাতার সর্ব্বাঙ্গীন শোচনীয় অবস্থার নিরাকরণের জন্ম কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। শহরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক উন্নতিবিধান করিতে হইলে যে অর্থ প্রয়োজন, তাহা রাজ্য সরকারের সাধ্যাতীত। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বারবার বহুভাবে বহু আবেদন করিয়াও রাজ্যসরকার কোন সাড়া পায়েন নাই। অথচ এই কলিকাতার মাধ্যমে যে কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় হয়, তাহার প্রায় সবটাই যায় কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডারে, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে ব্যয়, দান, খয়রাতীর জন্ম।

কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলির উন্নতি বিধানে 'সি এম পি ও'র প্রায় সকল পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অথচ এই পরিকল্পনামত কাজ হইলে কলিকাতা তথা পাশাপাশি সকল অঞ্চলগুলিরও একটা মোটামুটি সামগ্রিক উন্নতি তথা কল্যাণ হইত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদান সম্বন্ধে একটা আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আজ দিল্লীর যোজনাভবনের 'মালিকপ্রধান' অশোক মেঠার স্নেহ-দৃষ্টি শুধু কলিকাতা নহে, পশ্চিম বঙ্গ এবং বাঙ্গালীর উপর নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে অশোক মেঠার মুরুব্বী জোর রহিয়াছে! এমন কি প্রধান মন্ত্রী নেহরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরাও এই নেহরু-স্নেহধন্ত ব্যক্তিটির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কোন কথা বলিতে পারেন না, হয়ত ভরসা নাই বলিয়াই। বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রীর কথা এ বিষয় না বলাই ভাল।

কলিকাতার হীন অবস্থা সম্পর্কে কলিকাতা পৌর সভার কথাও অবশ্যই বলিতে হয়। কংগ্রেস-শাসিত কলিকাতা পৌর সভার পৌর পিতার দল, কর্পোরেশন কাউন্সিল হলে জমায়েত হইয়া শহরের উন্নতি কিসে, কেমন করিয়া সম্ভব করা যায়— এই সব বাজে বিষয় বাদ দিয়া সহরবাসী এবং শহরের ভাল মন্দের সহিত কোন সম্পর্ক নাই—এমন সকল বিষয়ের আলোচনা এবং দলীয় কোন্দলে অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকেন এবং সেই সঙ্গে কলিকাতার করদাতাদের অর্থের শ্রাদ্ধ কি ভাবে আরো প্রশস্ততর করা যায় তাহারও ব্যবস্থা করেন। বর্ত্তমান কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজকর্ম দেখিয়া মনে হয়—করদাতার কষ্টবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করবৃদ্ধিই—এই কংগ্রেসী-বি-টিমের একমাত্র কাজ। বর্ত্তমানে এ-রাজ্যে কংগ্রেসী শাসন অবলুপ্ত, আমরা আশা করি—এই নূতন সরকারের কলিকাতার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে, এবং সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কর্পোরেশনের অপদেবতা—তথা পাপচক্র বর্ত্তমান পৌর-পিতাগুলিকে বিতাড়িত করা এবং সেই সঙ্গে বছর কয়েকের জন্ম কর্পোরেশন সুপারসিড করিয়া ইহার সকল দায়িত্ব সরকারের শাসনাধীনে আনা। ইহা করিলে একজন করদাতাও দুঃখিত হইবেন না।

আইন-শৃঙ্খলা কি বিদায়ের পথে ?

গত কিছুকাল ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে (এবং অন্যান্ত বহু রাজ্যেও) আইন এবং শৃঙ্খলা বলিতে গেলে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্র খুলিলেই প্রত্যহ সকালে নানা প্রকার হৈ-হল্লা এবং আইন ভঙ্গের সংবাদ প্রায় প্রতি

পৃষ্ঠাতেই চার-পাঁচটি করিয়া চোখে পড়িবে। বিশেষ করিয়া যুব-সমাজের মধ্যে নানা প্রকার অন্যায়, অবৈধ ব্যবহারের প্রাবল্য যেন হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কলেজ স্কুলে, সামান্য ঘটনাকে সূত্র করিয়া বিষম কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে। অন্য রাজ্যের কথা বলিতে পারিব না কিন্তু আমাদের এ-রাজ্যে বর্ত্তমান শাসকগুষ্ঠি জনগণের অনাচার বোধহয় খানিকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন এবং সেই কারণেই বোধহয়—যে সব ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্রেও সরকার, কেন জানি না, একটা অতিরিক্ত কোমলতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা, অনাবশ্যক এবং সামান্য কারণেই আইনভঙ্গকারীদের উপর পুলিসী শাসন সমর্থন করি না, বিশেষ ভাবে ছাত্র-সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একথা বলিতেছি। ছাত্ররা যেমন সহজেই সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, আবার ঠিক তেমনি—স্নেহ ভালবাসার কাছে স্বভাবতই নতি স্বীকারও করে, এই কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু এমন এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাহাদের পেশাই হইল—হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া "লুটপাট এবং অন্যভাবে কিছু ফায়দা উঠান। এই সব পেশাদার হাঙ্গামাকারীদের দেখা যায় হাটে-বাজারে চায়ের দোকানে, স্কুল কলেজের এবং সিনেমার চারিপাশে এবং অন্যান্য বহুস্থানে। ইহাদের দমন কঠোর হস্তে করা অত্যাবশ্যক।

চারিদিকের গোলমেলে অবস্থা দেখিয়া সাধারণ লোকের ক্রমশ এই ধারণাই হইতেছে যে সংযুক্ত দলীয় সরকার ঠিকমত শাসনকার্য্য চালাইতে এখনও অপারগ। আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার না করিলেও বর্ত্তমান সরকারকে আইন শৃঙ্খলার দিকে একটু বেশী সতর্ক দৃষ্টি দিতে বলিব শ্রীঅজয় মুখার্জ্জি (মুখ্যমন্ত্রী) এবং শ্রীজ্যোতি বসু (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) যেভাবে সংযুক্ত দলীয় সরকারকে পরিচালন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের অবশ্যই প্রশংসা করিব কিন্তু সংযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীতে এমন সদস্যও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সরকারে থাকিয়াও নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ এবং আদর্শ অনুযায়ী-কাজ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন) এমন কি কোন কোন মন্ত্রী কেবিনেটের সহিত অত্যন্ত জরুরী বিষয়ে কোন পরামর্শ না করিয়াই হুকুম জারি করিতে দ্বিধা করিতেছেন না। এইভাবে যদি চলে, ভয় হয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে ভাঙ্গন ধরিতে পারে, যাহা বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ্যের কোন লোকই চায় না। বাঙ্গলায় জনগণ এই মন্ত্রীসভার উপর, বিশেষ করিয়া অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবুর উপর প্রচণ্ড একটা ভরসা রাখে। এ-আশাও সকলে করিতেছে যে—সাময়িক দুর্যোগ, নিরাশার কালো মেঘ, অচিরে কাটিয়া যাইবে এবং দেশে শান্তি, আইন ও শৃঙ্খলা আবার যথাযথ স্থাপিত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রীদের সদাচারে সকলে বিশ্বাস রাখে—এ-বিশ্বাস যেন কোনক্রমেই অবিশ্বাসে পরিণত না হয়। প্রসঙ্গত এ কথাও বলিব যে বিশ বৎসর শাসকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কংগ্রেসী মহাপ্রভুরা প্রশাসনে যে দুর্নীতি এবং অকর্ম্মণ্যতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাতে নূতন সরকারকে—মাত্র তিন মাসের কার্য্যাবলী দেখিয়া সমালোচনা করিবার প্রয়োজন এখনও তেমন ঘটে নাই। পুরান জঞ্জাল সাফ করিতে আরো কিছু সময় লাগিবে।

———

অযোধ্যার নবাব

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

নবাবীর পত্তন

(২)

অযোধ্যায় নবাববংশ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে, প্রায় পাঁচশ বছর আগে এ অঞ্চল মুসলমানদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। তারও প্রায় দু'শ বছর আগে, ১০৩- খৃঃ গজনীর সুলতান মাহ্মদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ সালা-মাসাউদ্‌কে সসৈন্যে অযোধ্যায় প্রেরণ করেছিলেন এখান-কার অধিবাসীদের শায়েস্তা করবার জন্যে।

কিন্তু সে জেহাদের স্থায়ী ফল পাওয়া যায়নি। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই রাজপুত জাতিদের আগমন ঘটতে থাকে অযোধ্যায় এবং স্থানীয় আদিম শাসকদের হাত থেকে সেই যোদ্ধা-রাজপুতরা হস্তগত করে নেন রাজশক্তি। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন দলে রাজপুতরা অযোধ্যায় আসতে থাকেন এবং এখানকার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের মিশ্রণও আরম্ভ হয়ে যায়। এ অঞ্চলের প্রভুত্ব লাভ করতে দীর্ঘ-কালের প্রয়োজন হয়নি রাজপুতদের। তাঁদের সে রাজত্বের কথা তার উপসংহারের সব বিবরণ অবশ্য পাওয়া যায়।।

তারপর যা জানা যায় তা হল এই যে, মহম্মদ বখ্‌ৎ-ইয়ার খলজি ১২০২ খৃঃ মহম্মদ বিন্ সামের আমলে এক অভিযান করেছিলেন অযোধ্যায়। বাংলার সুবাদারি গ্রহণের জন্যে যাত্রা করে তিনি অযোধ্যার মধ্যে দিয়েই গিয়েছিলেন আর সেসময় মালিহাবাদের নিকটে বখ্‌তিয়ারনগরটির পত্তন করে যান। কিছু পাঠানদের বোধ হয় রেখে গিয়েছিলেন সেই নূতন নগরে। কাকোরির রাজা সাথ্‌নার নেতৃত্বে বৈস রাজপুতদের আক্রমণ কিংবা অন্য কোন দলের সঙ্গে সেই পাঠানরা যুদ্ধ করলেও আশপাশের অঞ্চলে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করতে পারেনি।

তের শতকের প্রথমার্ধ থেকেই অযোধ্যা অঞ্চলে মুসলমান উপনিবেশ ধর্তব্য। দফায় দফায় কয়েক শতক ধরে আগত বিভিন্ন গোষ্ঠীর শেখরা এখানকার আদি বিদেশী বাসিন্দা। সেই প্রথম যুগের ঔপনিবেশিকদের মধ্যে কাসমান্দি কালানের শেখদের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু অনেকের মতে, তাঁরা ধর্মান্তরিত হিন্দু। জুগ্‌গাউরের কিদ্‌ওয়াই শেখ্‌দের যে উপনিবেশ লক্ষ্ণৌ পরগণায় গড়ে ওঠে তাও তের শতকের গোড়ার দিকের কথা। প্রধান ডেরা সাত্‌রিখ থেকেই এই শেখদের এখানে আসার কথা জানা যায়। ৫২টি গ্রাম কিদ্‌ওয়াই শেখদের উপনিবেশে পরিণত হয় গোমতী নদীর উত্তর তীরে।

তারপর অর্থাৎ তের শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাজী আদমের পরিচালনায় বিজ্‌নৌর মুসলমানদের আগমন। কাজী আদম থেকেই লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ শেখ পরিবারের উৎপত্তি। বিজনৌরের মুসলমানদের যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে জায়গাটা দখল করতে হয়েছিল, সহরের আশপাশের অসংখ্য সব পুরনো কবর নাকি তারই সাক্ষ্য।

তাদের প্রায় আড়াইশ বছর পরে অর্থাৎ পনের শতকের একেবারে শেষ দিকে সালেমপুরার শেখদের এখানে আসবার পালা। শেখ আবুল হাসানের নেতৃত্বে এসে তারা আমেথিয়াদের উচ্ছেদ করে সমস্ত পরগণাটা অধিকার করে নেয়। লক্ষ্ণৌ পরগণা অবশ্য তারা খুব তাড়াতাড়ি দখল করতে পারেনি, বেশ সময় লেগেছিল। কারণ প্রায় ১৬০০ খৃঃ পর্যন্ত নাগরাম ছিল রাজপুতদের হাতে। ওদিকে তার অনেক আগেই দিল্লীর তখ্‌ত মোগলদের অধিকারে এসে গেছে।

লক্ষ্ণৌতে প্রাচীন কাল থেকেই—শেখ পাঠানদের আগে থেকে—একটি নাতিবৃহৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সম্প্রদায়ের বাস ছিল। লক্ষ্ণৌ নগরের কেন্দ্রস্থলে, মচ্ছি-ভবনের মধ্যে লক্ষ্মণ টিলা নামে যে উচ্চ স্থানটি আছে সেখানে এবং তার চতুর্দিক ঘিরে ছিল সেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বসতি।

পৃষ্ঠাতেই চার-পাঁচটি করিয়া চোখে পড়িবে। বিশেষ করিয়া যুব-সমাজের মধ্যে নানা প্রকার অন্যায়, অবৈধ ব্যবহারের প্রাবল্য যেন হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কলেজ স্কুলে, সামান্য ঘটনাকে সূত্র করিয়া বিষম কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে। অন্য রাজ্যের কথা বলিতে পারিব না কিন্তু আমাদের এ-রাজ্যে বর্ত্তমান শাসকগুষ্টি জনগণের অনাচার বোধহয় খানিকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন এবং সেই কারণেই বোধহয়—যে সব ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্রেও সরকার, কেন জানি না, একটা অতিরিক্ত কোমলতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা, অনাবশ্যক এবং সামান্য কারণেই আইনভঙ্গকারীদের উপর পুলিসী শাসন সমর্থন করি না, বিশেষ ভাবে ছাত্র-সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একথা বলিতেছি। ছাত্ররা যেমন সহজেই সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, আবার ঠিক তেমনি—স্নেহ ভালবাসার কাছে স্বভাবতই নতি স্বীকারও করে, এই কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু এমন এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাহাদের পেশাই হইল—হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া "লুটপাট এবং অন্যভাবে কিছু ফায়দা উঠান। এই সব পেশাদার হল্লাকারীদের দেখা যায় হাটে-বাজারে চায়ের দোকানে, স্কুল কলেজের এবং সিনেমার চারিপাশে এবং অন্যান্য বহুস্থানে। ইহাদের দমন কঠোর হস্তে করা অত্যাবশ্যক।

চারিদিকের গোলমেলে অবস্থা দেখিয়া সাধারণ লোকের ক্রমশ এই ধারণাই হইতেছে যে সংযুক্ত দলীয় সরকার ঠিকমত শাসনকার্য্য চালাইতে এখনও অপারগ। আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার না করিলেও বর্ত্তমান সরকারকে আইন শৃঙ্খলার দিকে একটু বেশী সতর্ক দৃষ্টি দিতে বলিব। শ্রীঅজয় মুখার্জ্জি (মুখ্যমন্ত্রী) এবং শ্রীজ্যোতি বসু (উপ মুখ্যমন্ত্রী) যেভাবে সংযুক্ত দলীয় সরকারকে পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের অবশ্যই প্রশংসা করিব। কিন্তু সংযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীতে এমন সদস্যও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সরকারে থাকিয়াও নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ এবং আদর্শ অনুযায়ী-কাজ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন) এমন কি কোন কোন মন্ত্রী কেবিনেটের সহিত অত্যন্ত জরুরী বিষয়ে কোন পরামর্শ না করিয়াই হুকুম জারি করিতে দ্বিধা করিতেছেন না। এইভাবে যদি চলে, ভয় হয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে ভাঙ্গন ধরিতে পারে, যাহা বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ্যের কোন লোকই চায় না। বাঙ্গলার জনগণ এই মন্ত্রীসভার উপর, বিশেষ করিয়া অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবুর উপর প্রচণ্ড একটা ভরসা রাখে। এ-আশাও সকলে করিতেছে যে—সাময়িক দুর্য্যোগ, নিরাশার কালো মেঘ, অচিরে কাটিয়া যাইবে এবং দেশে শান্তি, আইন ও শৃঙ্খলা আবার যথাযথ স্থাপিত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রীদের সদাচারে সকলে বিশ্বাস রাখে—এ-বিশ্বাস যেন কোনক্রমেই অবিশ্বাসে পরিণত না হয়। প্রসঙ্গত এ কথাও বলিব যে বিশ বৎসর শাসকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কংগ্রেসী মহাপ্রভুরা প্রশাসনে যে দুর্নীতি এবং অকর্ম্মণ্যতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাতে নূতন সরকারকে—মাত্র তিন মাসের কার্য্যাবলী দেখিয়া সমালোচনা করিবার প্রয়োজন এখনও তেমন ঘটে নাই। পুরান জঞ্জাল সাফ করিতে আরো কিছু সময় লাগিবে।

———

অযোধ্যার নবাব

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

নবাবীর পত্তন

(২)

অযোধ্যায় নবাববংশ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে, প্রায় পাঁচশ বছর আগে এ অঞ্চল মুসলমানদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। তারও প্রায় দু'শ বছর আগে, ১০৩০ খৃঃ গজনীর সুলতান মাহ্‌মদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ সালামাসাউদ্‌কে সসৈন্যে অযোধ্যায় প্রেরণ করেছিলেন এখানকার অধিবাসীদের শায়েস্তা করবার জন্যে।

কিন্তু সে জেহাদের স্থায়ী ফল পাওয়া যায়নি। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই রাজপুত জাতিদের আগমন ঘটতে থাকে অযোধ্যায় এবং স্থানীয় আদিম শাসকদের হাত থেকে সেই যোদ্ধা-রাজপুতরা হস্তগত করে নেন রাজশক্তি। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন দলে রাজপুতরা অযোধ্যায় আসতে থাকেন এবং এখানকার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের মিশ্রণও আরম্ভ হয়ে যায়। এ অঞ্চলের প্রভুত্ব লাভ করতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন হয়নি রাজপুতদের। তাঁদের সে রাজত্বের কিংবা তার উপসাগ-হারের সব বিবরণ অবশ্য পাওয়া যায় না।

তারপর যা জানা যায় তা হল এই যে, মহম্মদ বখ্‌ৎ-ইয়ার খলজি ১২০২ খৃঃ মহম্মদ বিন্ সামের আমলে এক অভিযান করেছিলেন অযোধ্যায়। বাংলার সুবাদারি গ্রহণের জন্যে যাত্রা করে তিনি অযোধ্যার মধ্যে দিয়েই গিয়েছিলেন আর সেসময় মালিহাবাদের নিকটে বখ্‌তিয়ারনগরটির পত্তন করে যান। কিছু পাঠানদের বোধ হয় রেখে গিয়েছিলেন সেই নতুন নগরে। কাকোরির রাজা সাথ্‌নার নেতৃত্বে বৈস রাজপুতদের আক্রমণ কিংবা অন্য কোন দলের সঙ্গে সেই পাঠানরা যুদ্ধ করলেও আশপাশের অঞ্চলে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করতে পারেনি।

তের শতকের প্রথমার্ধ থেকেই অযোধ্যা অঞ্চলে মুসলিমান উপনিবেশ ধর্তব্য। দফায় দফায় কয়েক শতক ধরে আগত বিভিন্ন গোষ্ঠীর শেখরা এখানকার আদি বিদেশী বাসিন্দা। সেই প্রথম যুগের ঔপনিবেশিকদের মধ্যে কাসমান্দি কালানের শেখদের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু অনেকের মতে, তাঁরা ধর্মান্তরিত হিন্দু। জুগ্‌গাউরের কিদ্‌ওয়াই শেখ্‌দের যে উপনিবেশ লক্ষ্ণৌ পরগণায় গড়ে ওঠে তাও তের শতকের গোড়ার দিকের কথা। প্রধান ডেরা সাত্‌রিখ থেকেই এই শেখদের এখানে আসার কথা জানা যায়। ৫২টি গ্রাম কিদ্‌ওয়াই শেখদের উপনিবেশে পরিণত হয় গোমতী নদীর উত্তর তীরে।

তারপর অর্থাৎ তের শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাজী আদমের পরিচালনায় বিজ্‌নৌর মুসলমানদের আগমন। কাজী আদম থেকেই লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ শেখ পরিবারের উৎপত্তি। বিজনৌরের মুসলমানদের যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে জায়গাটা দখল করতে হয়েছিল, সহরের আশপাশের অসংখ্য সব পুরনো কবর নাকি তারই সাক্ষ্য।

তাদের প্রায় আড়াইশ বছর পরে অর্থাৎ পনের শতকের একেবারে শেষ দিকে সালেমপুরার শেখদের এখানে আসবার পালা। শেখ আবুল হাসানের নেতৃত্বে এসে তারা আমেথিয়াদের উচ্ছেদ করে সমস্ত পরগণাটা অধিকার করে নেয়। লক্ষ্ণৌ পরগণা অবশ্য তারা খুব তাড়াতাড়ি দখল করতে পারেনি, বেশ সময় লেগেছিল। কারণ প্রায় ১৬০০ খৃঃ পর্যন্ত নাগরাম ছিল রাজপুতদের হাতে। ওদিকে তার অনেক আগেই দিল্লীর তখ্‌ত মোগলদের অধিকারে এসে গেছে।

লক্ষ্ণৌতে প্রাচীন কাল থেকেই—শেখ পাঠানদের আগে থেকে—একটি নাতিবৃহৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সম্প্রদায়ের বাস ছিল। লক্ষ্ণৌ নগরের কেন্দ্রস্থলে, মচ্ছি-ভবনের মধ্যে লক্ষ্মণ টিলা নামে যে উচ্চ স্থানটি আছে সেখানে এবং তার চতুর্দিক ঘিরে ছিল সেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বসতি।

তাদের হটিয়ে দিয়ে বিজনৌরের শেখ্রা প্রথমে সেসব জায়গা দখল করে নেয়। তারপর সেখানে আসে রামনগরের পাঠানরা। অনেক পরে যেখানে তৈরি হয়েছিল গোল দরওয়াজা নামে ফটক, সেই পর্যন্ত জমিদারি রামনগরের পাঠানবা দাবি করত। আর তারই পূর্বদিকে ছিল শেখ্দের অধিকারের সীমানা। তাদের বসতির চারিধারে নিম গাছের সারি ঘেরা থাকায় সে শেখদের নাম হয়ে যায় নিমবাহ্রা শেখ। মচ্ছি ভবন থেকে রেসিডেন্সী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাদের অধ্যুসিত এলাকা, ১৮৫৭র বিদ্রোহের পরে সে সবই একেবারে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

নিম্বর্হা শেখদের উপনিবেশ এখানে পত্তন হবার পর থেকে ক্রমেই বাড়তে থাকে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি। পরে এই পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তিকে অযোধ্যার সুবাদার রূপে দেখা গেছে। লক্ষ্ণৌর মুসলমানী আমলের প্রথম দুর্গ শেখদেরই আমলে তৈরী। সে গড় এখন আর নেই। পরে অযোধ্যার নবাববংশের যেখানে মচ্ছি ভবন নির্মিত হয়, সেখানেই ছিল শেখদের সেই মজবুত কেল্লা। শোনা যায়, লিখ্না নামে একজন হিন্দুর হাতে সেই পুরনো দুর্গ তৈরী। জায়গাটার তাই নাম হয়ে যায় লিখ্না কিলা।

শেখদের ক্রমিক বৃদ্ধির সঙ্গে জনবসতি বাড়তে থাকে আর এই ভাবে লিখ্না কিলার আশপাশের অঞ্চল জুড়ে নতুন করে নগর গড়ে ওঠে। প্রাচীনকালের অযোধ্যায় ঐতিহ্যে পূর্ণ বিগত যুগের লক্ষ্মণপুর নগরী ক্রমে এই বিদেশী বাসিন্দাদের বিকৃত উচ্চারণে পরিণত হল লক্ষ্ণৌতে। লক্ষ্মণপুর নাম লুপ্ত হয়ে বিজাতীয় নতুন পরিবেশে লক্ষ্ণৌ শব্দটি প্রচলিত হয়ে গেল। লিখ্না থেকে নয়, লক্ষ্মণ থেকেই লক্ষ্ণৌ।

ত্রেতা যুগের ঐতিহ্যমণ্ডিত লক্ষ্মণপুর কোন্ সময় থেকে লক্ষ্ণৌতে পরিণত হল তা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও মোগল বাদশা আকবরের আগে থেকেই নতুন নামকরণটির চলন দেখা যায়।

মুসলমান আমলের একেবারে প্রথম দিক থেকেই লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা সুবার অন্তর্গত। অযোধ্যা সুবা বা প্রদেশের রাজধানী সাধারণত অযোধ্যা নগরীই থাকত বটে, কিন্তু কখনো কখনো কোন লক্ষ্ণৌ নিবাসী ব্যক্তি সুবাদার নিযুক্ত হলে রাজধানী নির্দিষ্ট হত লক্ষ্ণৌতে। তবে আকবরের আমলের আগে লক্ষ্ণৌর ঐতিহাসিক উল্লেখ বার কয়েক মাত্র পাওয়া যায়। যেমন জানা যায় ১৪৭৮ খৃঃ লক্ষ্ণৌর সরকার কালপির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বাহ্লোল লোদি তা দান করে দেন তাঁর পৌত্র আজম্ হুমায়ুনকে। তার আগে লক্ষ্ণৌ কিছু দিন ছিল যৌনপুরের রাজাদের অধিকারে।

বাহ্লোল লোদির সময়ে লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ মিনার বর্তমান থাকবার কথা জানা যায়। তিনিও একজন শেখ—শাহ্মিনা তাঁর গুরুদত্ত উপাধি—আসল নাম ছিল শেখ্ মহম্মদ, শেখ কুতুবের পুত্র। শাহ্ মিনার কবর এখনো লক্ষ্ণৌতে আছে আর মিনানগর, মিনাবাজার ইত্যাদি নামের মহল্লা সেই পীরেরই নামের স্মারক।

১৫০৬ খৃঃ মুবারক লোদির পুত্র আহ্মদ খাঁ লক্ষ্ণৌর দখলদার ছিলেন। তারপর সিকান্দার লোদি তাঁকে বিতাড়িত করে লক্ষ্ণৌর কর্তৃত্ব দেন ভ্রাতা সুর খাঁকে।

তারপর ১৫২৬ খৃঃ বাবুর পুত্র হুমায়ুন মোগলদের পক্ষে প্রথম লক্ষ্ণৌ অধিকার করেন। কিন্তু বেশিদিন হাতে রাখতে পারেননি, ছেড়ে দিতে হয় কিছুদিনের মধ্যেই। ১৫২৮ খৃঃ বাবুর পুনরায় লক্ষ্ণৌ দখল করে নেন। আর হুমায়ুনের আমলে আবার লক্ষ্ণৌ অধিকার করেন শুরি রাজাশের শাহ্ এখানে শেরশাহ্ তাম্রমুদ্রা তৈরী করবার জন্যে একটি মুদ্রালয়ও স্থাপন করেছিলেন।

আকবরের সময় থেকে অনেক বৃদ্ধি পায় লক্ষ্ণৌর গুরুত্ব আর নামডাক। জায়গাটি মোগল কুলচূড়ামনির নেক-নজরে পড়েছিল। শের শার আমলের তামার মুদ্রা তৈরীর টাকশালটির কাজ আকবরের সময়েও চলতে লাগল—উপরন্তু তিনি আরো গোটাকয়েক মহল্লা তৈরী করালেন চকের দক্ষিণে।

আকবরের আমলেও এ নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর একটি প্রধান অংশ হিসেবে অস্তিত্ব ছিল। রাষ্ট্রনীতিতে ধুরন্ধর বাদশা লক্ষ্ণৌর ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে সম্মান দেখিয়ে বাজপেয়ী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণদের দান করেন এক লক্ষ সিকা টাকা। সেই থেকে তাঁদের পরিচয় হয়ে যায় লক্ষ্ণৌর বাজপেয়ী ব্রাহ্মণ। যে মহল্লার নাম বাজপেয়ী

শব্দটিতে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল, পরে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আকবরের আমলে লক্ষ্ণৌ জেলা ছিল সুবা অযোধ্যার লক্ষ্ণৌ সরকারের অন্তর্গত। তখনকার এই অঞ্চলের শাসন-যন্ত্রের কাঠামো অনেকাংশে পরবর্তীকালেও থেকে যায়। সেই সব নাম আর মহলের চৌহদ্দি প্রায় অনেকখানিই মিলে যায় বিশ শতকের প্রথম দিকের পরগণার সঙ্গে।

আকবরের মৃত্যুর পর থেকে অযোধ্যায় নবাবী আমল পত্তন হওয়ার সময় পর্যন্ত লক্ষ্ণৌর কথা বেশি জানা যায় না। আকবরের বংশধরদের কাছে লক্ষ্ণৌর কোন গুরুত্ব না থাকাই এর কারণ। জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের সময়ে এখানে উল্লেখ-যোগ্য কিছু ঘটেনি।

নিষ্ঠাবান ধার্মিক আওরঙ্গজেবের আমলে একটি সামান্য ঘটনার কথা জানা যায় লক্ষ্ণৌ সম্পর্কে। ভ্রাতৃহত্যা ভিন্ন আর যে ধরণের কর্ম সুসম্পন্ন করবার জন্যে তাঁর জন্ম, তেমনি একটি প্রিয় কাম তিনি এখানে সেবার সম্পাদন ক'রে যান। অযোধ্যা থেকে ফেরবার পথে লক্ষ্ণৌ নগরীর কেন্দ্রস্থল সেই লক্ষ্মণ টিলার উচ্চ স্থানটিতে যে প্রাচীন হিন্দু দেবালয় ছিল তা ধ্বংস করে তারই ওপর নির্মাণ করেন এক মসজিদ। সেই মসজিদটি আওরঙ্গজেবের কীর্তিস্বরূপ লক্ষ্মণপুরের শেষ শ্রুতি-স্মৃতির নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে লক্ষ্ণৌর বুকের ওপর আজো বিদ্যমান আছে।

এখানে লক্ষ্ণৌর ইতিহাস বর্ণনা ক্ষণকাল স্থগিত রাখতে ইচ্ছা হয় বাদশা আওরঙ্গজেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে। হিন্দুদের স্বাধীন অস্তিত্বে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা ঈষৎ তির্যকভাবে চিন্তা করে দেখলে আলমগীরের সরল হিন্দু-বিদ্বেষের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদই জানাবেন। তিনি সোজাসুজি হিন্দুদের মর্মে আঘাত এবং স্থূল নির্যাতন দুই প্রকারেরই চাবুক চালিয়ে এমন মোহ মুদ্গরের ব্যবস্থা করেন যে তারা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জেগে ওঠে। তারই ফল—নবজাগ্রত মারাঠাশক্তি আর রাজপুতকুল। দাক্ষিণাত্যে মরণপণ সংগ্রামে আওরঙ্গজেব মোগল বাদশাহীর নাভিশ্বাস উঠিয়ে যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তার কয়েক বছরের মধ্যে থেকেই মারাঠাদের হাতে দিল্লীর বাদশাদের নাজেহাল আরম্ভ ও সর্বনাশ হয়ে যায়। আর এক বিকট দস্যু নাদির শার আক্রমণে মোগলশক্তির যে বিপর্যয়, তা শুধু ঘুণগ্রস্ত একটি কাঠামোকে একটিমাত্র আঘাত দেওয়ার সামিল। আসলে আওরঙ্গজেবের দিল্লীর তখ্‌তে আসীন হওয়ার ফলেই ভারতবর্ষের কণ্ঠ রোধ করা মোগল অক্টো-পাসের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে। প্রত্যন্ত বাংলাদেশকে পর্যন্ত পরিকল্পিত শোষণের আওতায় এনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তক আকারের প্রশংসায় ঐতিহাসিকরা পঞ্চমুখ, তাঁর উদারশাসনের দাক্ষিণ্যে ভারতবাসীও ধন্য। কিন্তু তাঁর কূটনীতি আকীর্ণ শাসন প্রণালীর এক উজ্জ্বল ফলশ্রুতি এই দেখা গেছে যে, প্রতিভাশালী হিন্দুর দুই শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এক শ্রেণীর প্রতিভূ রাজা মানসিংহ—বাদশাকে কুলকন্যা দান করো, বাদশার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্যে আমৃত্যু স্বজাতি, স্বধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং বাদশার তাঁবেদাররূপে আপন রাজ্যের অধিপতি হও। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মিঞা তানসেন। ইসলামকে আশ্রয় করো, তাহলে বাদশাহের অন্তরঙ্গরূপে গণ্য হবে, অর্থ ঐশ্বর্য সম্মান প্রতিপত্তি পর্যাপ্ত লাভ করবে, এমন কি অনুগ্রহ-পুষ্ট বাদশাহী ইতিহাস-লেখক সর্বজ্ঞ হয়ে ভবিষ্যৎ কালের জন্য এই ফতোয়া দিয়ে যাবে যে হাজার বছরের মধ্যে এই বিভাগে এমন প্রতিভার জন্ম হয়নি···

আওরঙ্গজেব নিজের প্রযুক্ত 'নীতি'র পরিবর্তে যদি তাঁর মহান পূর্বপুরুষের তুল্য কূটনৈতিক হয়ে উদার হৃদয়ের পরিচয় দেবার জন্যে অমনি কৃপা বিতরণ করতেন তাহলে হিন্দুরা আরো কতকাল তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকত এবং শেষ পর্যন্ত স্বজাতি-প্রেমিক হিন্দু প্রতিভাবানদের মধ্যে কজন অবশিষ্ট দেখা যেত, সে একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে ···।

আর এসব কথায় প্রয়োজন নেই। বক্ষ্যমান অধ্যায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ যে অযোধ্যায় নবাবীর সূত্রপাত তা বাদশা আলমগীরের মৃত্যুর (৩ মার্চ, ১৭০৭ খৃঃ কয়েক বছর পরের ঘটনা।

আওরঙ্গজেবের আওরঙ্গাবাদের কবরে বাতি জ্বলবার সঙ্গেই তাঁর পরবর্তী দুর্বল বংশধররা একে একে মোগল-সাম্রাজ্যের বাতি জ্বালাতে লাগলেন। আওরঙ্গজেবের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী বাদশাহীর শেষে তাঁর পুত্র বাহাদুরশার ভাগ্যে জুটল পাঁচটি বছরের অপদার্থ বাদশাগিরি। ১৭১২ খৃঃ তাঁর মৃত্যুতে মসনদ নিয়ে মোগলবংশের চিরাচরিত

হানাহানিতে তখনকার মতন যিনি তখ্‌তে দখল করলেন সেই জাহান্দার শাহ্‌ দশটি মাস চূড়ান্ত আহাম্মকির পর ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্‌ রুখশিয়রের আক্রমণে নিহত হলেন (১৭১৩খৃঃ) ফর রুখশিয়র হত-গৌরব বাদশাহী নামমাত্র লাভ করলেন। মোগল সাম্রাজ্যের সেই ভগ্নদশায় অতিশয় শক্তিশালী এবং নৃশংস দুই ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ ও সৈয়দ হুসেন আলি খাঁর একান্ত সাহায্যে। এই দুই সহোদর ইতিহাসের সেই যুগে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত।

তাঁদের সৈন্যদলের সহায়তায় মসনদে উপবেশন করে ফর্‌ রুখশিয়র কিছুকালের মধ্যেই নিজের ক্রীড়নক অবস্থা অনুধাবন করলেন। তারপর চেষ্টা করতে লাগলেন নিজের দল বৃদ্ধি করে সৈয়দ ভ্রাতাদের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হবার আশায়। তার ফল হল এই—প্রথমে সৈয়দ ভ্রাতারা তাঁর চক্ষু উৎপাটন করে বন্দীদশায় রাখলেন। তারপর তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন ফর্‌রুখ্‌শিয়রকে (১৭১৮ খৃঃ)।

সৈয়দ ভ্রাতাদের তখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বাদশা ধ্বংস আর বাদশা সৃষ্টিতে তখন তাঁদের যা খুসি করতে পারেন। মুখের ওপর কোন কথা বলবার আর কেউ নেই। তারপর তাঁরা মোগল পরিবার থেকে পর পর দুটি রুগ্ন-শিশুকে তখ্‌তে বসিয়ে বাদশাহীর অভিনয় চালালেন স্বল্পকালের জন্যে। কয়েকমাসের মধ্যেই শিশুদ্বয়ের মৃত্যুর পরে রোশন আখ্‌তার নামে জাহান্দারশার এক সতের বছর বয়স্ক পৌত্রকে মসনদ দিলেন। রোশন আখতার মহম্মদ শাহ নাম নিয়ে হলেন পরিবর্তী বাদশাহ [১৭১৯ খৃঃ]।

মহম্মদ শার আমলেই অযোধ্যার এই নবাববংশের পত্তন হয়েছিল।

মসনদ লাভ করে মহম্মদ শাহ্‌ কিছুদিনের মধ্যেই অনুভব করলেন ফর্‌রুখশিয়রের মতন নিজের অসহায় অবস্থা আর আবদুল্লা খাঁ ও হুসেন আলী খার সৈয়দ ভ্রাতাদের কর্তৃত্ব খর্ব করবার জন্যে নবীন বাদশা তখন সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলেন।

ফর্‌রুখশিয়রের তুলনায় তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, বলা যায়। কারণ তিনি তিনজন সুদক্ষ সহায়ক পেয়েছিলেন এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কাযে। তাঁদের অন্যতম হলেন মীর মহম্মদ আমিন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিই অযোধ্যার নবাব-বংশের স্থাপয়িতা উচ্চাশা-পোষক এক ভাগ্যান্বেষী পারসিক।

মীর মহম্মদ আমিন প্রথমে সৈয়দ ভ্রাতাদেরই দল-ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁদেরই অনুগ্রহে তৎকালীন দিল্লীর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সোপানে আরোহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আশ্রয়-দাতার আনুগত্য রক্ষা কিংবা দলের ভেদাভেদ জ্ঞান তাঁর কাছে তুচ্ছ। সমসাময়িক ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার পঙ্কিল পরিবেশে উন্নতির জন্যে যা যা বৃত্তির প্রয়োজন তাঁর স্বভাবে তা ভালভাবেই ছিল। তিনি যেমন বেপরোয়া যোদ্ধা ও দুঃসাহসী, তেমনি কুচক্রী ও ন্যায়-অন্যায়ের-বিবেক-বোধ বর্জিত। কিন্তু তাঁর বংশকৌলিন্য ছিল পরিচয় দেবার মতন। তার পূর্ববৃত্তান্ত উল্লেখনীয়।

ওই সময়ের অনেক বছর আগে মেসোপোটেমিয়ার পবিত্র নজফ্‌ নগরীতে মীর সাম্‌স্‌উদ্দীন নামে সৈয়দ বংশীয় এক বৃদ্ধ বাস করতেন। জ্ঞানবত্তা ও সৎস্বভাবের জন্যে স্থানীয় লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন সৈয়দ শাম্‌স্‌-উদ্দীন। তাঁর সমকালীন পারস্য নৃপতির নাম হল শাহ্‌ ইস্‌মাইল সাকাউয়ি (১৪৯৯-১৫২৩ খৃঃ)। মীর শাম্‌স্‌উদ্দী-নকে ইসমাইল শাহ্‌ খুরাসান প্রদেশের নৈসাপুরের কাজি (বিচারক) নিযুক্ত করেন। তারপর থেকে কাজিরূপে তিনি নৈসাপুরে বাস করতে থাকেন ভাল আয়ের জাগীর পেয়ে।

মীর শাম্‌স্‌উদ্দীনের বংশপরিচয় এই যে, তিনি ছিলেন মূসা কাজীমের অধস্তন একবিংশ পুরুষ এবং মূসা কাজিম হলেন শিয়া সম্প্রদায়ের জগতে বহুমান্য আলি পরিবারের সপ্তম ইমাম্‌। আধ্যাত্মিক গুরু।

মীর শাম্‌স্‌উদ্দীনের সাত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম মহম্মদ জাফর। মহম্মদ জাফরের দুই পুত্র—মীর মহম্মদ নাসের ও মীর মহম্মদ ইউসুফ। শেষোক্ত দুজনের সময়ে পারস্যের মসনদে আসীন ছিলেন দ্বিতীয় শাহ্‌ আব্বাস (১৬৪২-১৬৬৬ খৃঃ)। ঘটনাচক্রে মীর পরিবার তখনই শাহী কৃপা লাভ করলেন। শাহ্‌ আব্বাস মহম্মদ নাসেরের কোন কাজে সন্তুষ্ট হয়ে উজীর রেজা কুলি বেগকে নির্দেশ দেন তাঁর (উজিরের) কন্যার সঙ্গে নাসেরের বিবাহ দিতে। কিজিল্‌বাশ্‌ তুর্ক জাতীয় রেজা কুলি বেগ রাজাদেশে মীর

মহম্মদ নাসেরকে জামাতারূপে গ্রহণ করেন এবং নাসেরের বৈষয়িক উন্নতির সুচনা তখন থেকেই।

মীর মহম্মদ নাসেরের এই বিবাহের ফলে দুই কন্যা ও দুই পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রদ্বয়ের নাম মীর মহম্মদ বাকর ও মীর মহম্মদ আমিন। পরবর্তী জীবনে অযোধ্যার নবাববংশের প্রতিষ্ঠা করেন উক্ত মীর মহম্মদ আমিন।

আনুমানিক ১৬৮০ খৃঃ নৈসাপুরে মীর মহম্মদ আমিনের জন্ম। সেখানে তাঁর বাল্যজীবনের কথা সবিশেষ জানা যায় না, তবে লেখাপড়ার চর্চা বিলক্ষণ হয়েছিল। কিভাবে শেখেন তার বিবরণ পাওয়া যায় না বটে কিন্তু তিনি যুদ্ধের রীতিনীতি আয়ত্ত করেন আরো ভালোভাবে।

যৌবনকালেই মীর মহম্মদ আমিনের সামরিক জ্ঞান-বুদ্ধি, বলশালী শরীর ও বেপরোয়া সাহস ইত্যাদি দৃষ্টি-আকৃষ্ট করবার মতন ছিল। তার ওপর হিন্দুস্থানে এসে প্রথম জীবনে যে জীবন-সংগ্রাম ও কষ্টভোগ করতে হয়েছিল তার ফলে আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ইত্যাদি তাঁর চরিত্রে যুক্ত হয়ে আরো বিকশিত হয় তাঁর সামরিক-শক্তি।

১৭০৭।৮ খৃঃ তাঁরা পারস্য দেশ ত্যাগ করে হিন্দুস্থানের উদ্দেশে পাড়ি দেন। সতের শতকের শেষ ভাগ থেকেই ইরাণের সাফাউয়ি রাজবংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় সওয়া সাত বছরের (১৪৯৯-১৬২৭ খৃঃ) প্রসিদ্ধ শাসনকালের শেষ এই বংশের শেষ নৃপতি শাহ হুসেনের (১৬৯৪-১৭২২ খৃঃ)। অপদার্থ রাজ্যকালে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় ও সম্ভ্রান্তমণ্ডলীর অনেকেই হত-গৌরব হয়ে পড়েন। শাম্‌স উদ্‌ দীনের বংশধরেরা এতকাল যে রাজানুগ্রহের ছত্রছায়ায় সচ্ছলভাবে দিন গুজরান্ করছিলেন, এখন তাঁদের আরম্ভ হয় দুর্দশা ও দারিদ্র্যের দুর্দিন।

মীর মহম্মদ নাসের (মহম্মদ আমিনের পিতা) বিবেচনা করে দেখলেন, এ অবস্থায় পারস্য দেশ পরিত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁর মনে হল—হিন্দুস্থানে একবার ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? যুগ যুগ ধরে কত নিঃস্ব বিদেশী হিন্দুস্থানের সোনার মাটি থেকে সর্বস্ব লাভ করেছে। আর সময়টাও এখন শিয়াদের পক্ষে খুবই অনুকূল—শিয়া সম্প্রদায় যে গোঁড়া সুন্নি আলম্‌গীরের দু চোখের বিষ তাঁর মৃত্যু ঘটে গেছে সম্প্রতি। বাদশা হয়েছেন বাহাদুর শাহ, যিনি শিয়াদের প্রতি এত প্রসন্ন যে নিজের ধারণ করা উপাধির মধ্যে সৈয়দও যুক্ত করেছেন। এইসব ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে আরো অনেক ভাগ্যান্বেষী শিয়ার মতন মীর মহম্মদ নাসের স্থির করলেন, ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে হিন্দুস্থানে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর মহম্মদ বাকরকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ মীর মহম্মদ নাসের নৈসাপুরের বহুদিনের বাস তুলে দিয়ে হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা করলেন। পারস্যের দক্ষিণ সীমানার দীর্ঘ কষ্টকর পাড়ি শেষ করে সেখানকার এক বন্দর থেকে জাহাজে উঠে সুদীর্ঘ জলপথে উপস্থিত হলেন বাংলা দেশে।

কনিষ্ঠ পুত্র মীর মহম্মদ আমিন তখন নৈসাপুরেই রয়ে গেলেন। খুল্লতাত ও শ্বশুর মীর মহম্মদ ইউসুফের সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগলেন পিতার কাছ থেকে সুসংবাদ প্রাপ্তির আশায়।

এদিকে মহম্মদ বাকরের সঙ্গে মীর মহম্মদ নাসের বাংলা থেকে এসে হাজির হলেন বিহারে। সুবা বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার তখন মুর্শিদ কুলি খাঁ। মুর্শিদ কুলি তাঁর জামাতা সুজাউদ্‌দৌলার সুপারিশে স-পুত্র মীর মহম্মদ নাসেরকে সাহায্য-ভাতার (মদদ্‌-ই-দমাশ) ব্যবস্থা করে দিলেন। সুজা উদ্‌দৌলার পূর্ব পুরুষ ইরান থেকে এদেশে আসার জন্যে পারস্যাগত এই ধরনের ব্যক্তিদের মদত্‌ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি

মদদ্‌-ই দমাশের সহায়তায় মীর মহম্মদ নাসের কিছুকাল পাটনায় বাস করবার পর তাঁদের কোন সংবাদ না পেয়ে মীর মহম্মদ আমিন হিন্দুস্থানে পাড়ি দেন। তারপর পাটনায় পৌঁছে (১৭০৯ খৃ) জানতে পারেন কয়েকমাস আগেই পিতার মৃত্যু হয়েছে, বাড়ীর অনতিদূরেই তিনি কবরস্থ। তখন কয়েকদিন বাসের পর পাটনার পাট তুলে নিয়ে দুই ভ্রাতা (মীর মহম্মদ বাকর ও মীর মহম্মদ আমিন) রাজধানী দিল্লীতে জীবিকার সন্ধানে উপস্থিত হলেন।

সেখানে বছরখানেক এক অখ্যাত আমীনের কাছে কায করে অতিকষ্টে দিন কাটে। তারপর দুজনে কায পান সুবা এলাহাবাদের কারা মানিকপুরের ফৌজদার সার-

বুলান্দ খাঁর অধীনে। সারবুলান্দ খাঁও একজন ইরানী শিয়া। মীর মহম্মদ আমিনের এই নতুন মনিব তাঁকে নিজের মীর মঞ্জিল (শিবির তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করলেন (জুলাই, ১৭১০ খৃঃ)

সারবুলান্দ খাঁ ছিলেন মোগল শাহজাদা আজিম উশ্বানের (বাদশা বাহাদুর শার দ্বিতীয় পুত্র) একজন প্রিয়-পাত্র এবং কাবার ফৌজদারিও সারবুলান্দকে আজিম উশ্বানের দান। তারপর বাহাদুর শার মৃত্যুতে তাঁর পুত্রদের মধ্যে যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব বাধল দিল্লীর মসনদের অধিকার নিয়ে, তাতে আজিম পরাস্ত ও নিহত হলেন (১৭ই মার্চ ১৭১২ খৃঃ)। তখন আদর্শ সুবিধাবাদী সারবুলান্দ খাঁ পূর্ব্ব প্রভুর শত্রু, বিজয়ী জাহান্দার শার সঙ্গে যোগ দিলেন ও ফলে লাভ করলেন গুজরাটের সুবাদারের সহকারীর পদ। জাহান্দারের সঙ্গে দিল্লীতে বাস করে সারবুলান্দ খাঁ গুজরাটের ডেপুটি গবর্ণরগিরি করবার জন্যে যাত্রা করে আমেদাবাদ পৌছলেন (নবেম্বর, ১৭১২ খৃঃ)। তাঁর সঙ্গে তখন বরাবর ছিলেন তাঁর মীর মঞ্জিল মহম্মদ আমিন।

নতুন মনিবের সঙ্গে কারা মানিকপুর থেকে দোরাহা এবং দোরাহা থেকে আমেদাবাদ উপস্থিত হওয়া সেই রাষ্ট্র-নীতির ঘনঘটাপূর্ণ দিনগুলিতে মীর মহম্মদ আমিনের বাদ-শাহীর উত্থান পতনের লীলা যেমন মালুম হল, তেমনি দরবার সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চরিত্র মাহাত্ম্য অনুধাবন করে আদর্শ ভাগ্যান্বেষীর ইতিকর্ত্তব্য সম্পর্কেও তালিম পেলেন।

তারপর থেকেই বোধহয় মীর মহম্মদ আমিন ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। কিছুকাল পরেই তাঁর সারবুলান্দের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটল। এ প্রভুর কায ত্যাগ করে দিল্লী গেলেন মীর মহম্মদ আমিন, ১৭১৩ খৃঃ প্রথম দিকে।

দিল্লীতে তখন আবার মোগলবাদশাগিরির ভোল্ পালটেছে। লালকুঁয়ারের সঙ-সাজা বাদশা জাহান্দারের গর্দান নিয়ে ফর্‌রুখ্‌শিয়র বসেছেন দিল্লীর তখ্‌তে। সৈয়দ ভ্রাতাদের ওপর নির্ভর করে মসনদ পেয়ে তাঁদের প্রতিপত্তি খর্ব করবার জন্যে ফররুখ্ শিয়র চক্রান্ত আরম্ভ করেছেন। ধূর্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ও অনুরূপ তৎপর। লাল কেল্লার দরবার সে সময় পারস্পরিক ষড়যন্ত্র ও বিবেকবিহীন বিশ্বাসঘাতকতার আবহে ক্লেদাক্ত।

দিল্লীতে বৈষয়িক উন্নতির সেই উর্বরকালে করিৎকর্ম্মা মীর মহম্মদ আমিন এক হাজারি মনসবদার হয়ে বসলেন। ফর্‌রুখ্‌শিয়রের এক দোস্ত মহম্মদ জাফরের সাহায্যে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেলেন অবক্ষয়ের রাজধানীর দরবারে।

তারপর ফররুখশিয়রকে খতম করে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় পরপর যখন দুটি অল্পায়ু মোগল-শিশু (যথাক্রমে রফি উদ্ দৌরাত তিন মাস ন দিনের ও রফি উদ্ দৌলার ৪ মাস ষোল দিনের নামমাত্র রাজত্ব শেষে মৃত্যু) এবং রোশন আখতারকে দিল্লীর মসনদে (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৭১৯ খৃঃ) স্থাপন করেন সেই সময়টিতে মীর মহম্মদ আমিন নিশ্চেষ্ট দর্শকরূপে দিন কাটান নি। ফররুখ্‌শিয়রের পক্ষ থেকে তিনি সৈয়দ ভ্রাতাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন ঠিক উপযুক্ত সময়ে।

তাঁদেরই মতন সৈয়দ ও শিয়া হওয়া এবং সামরিক বুদ্ধি, কূটনৈতিক চাতুর্য, আদবকায়দা ইত্যাদির যোগফলে মীর মহম্মদ আমিন সৈয়দ হুসেন আলি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেন। মহম্মদ শাহ্ নাম নিয়ে রোশন আখতার বাদশা হবার দিন দশেক মাত্র পরে (৬ অক্টোবর, ১৭১৯ খৃঃ) মীর মহম্মদ আমিন আগ্রা প্রদেশের হিন্দুয়ান-বিয়ানা জেলার ফৌজদারি পেলেন সৈয়দ হুসেন আলীর অনুগ্রহে।

জয়পুর ও ভরতপুর রাজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ জেলার কর্তৃত্ব লাভের ছ মাসের মধ্যেই মীর মহম্মদ আমিন তাঁর সামরিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন বিদ্রোহী জমিদারদের পর্যুদস্ত করে। এই সাফল্যের ফলে এবং মুরুব্বির তদ্বিরে পুরস্কার স্বরূপ দেড় হাজারি মনসবদার হলেন। সৈয়দ ভ্রাতারা তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁদের কোন সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধীপক্ষ নেই। সৈয়দ হুসেন আলীর বিশ্বাসের পাত্ররূপে মীর মহম্মদ আমিনের ভাগ্যরবিও সেজন্যে তখন উদয়ের পথে।

কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতাদের উল্কা-গতিতে উত্থান এক বছরের মধ্যে রহিত হয়ে এল। নতুন বাদশার গুপ্ত সহানুভূতি লাভে গড়ে উঠতে লাগল তাঁদের শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ। তাঁদের শত্রুতার কবল থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজাম উল্ মুল্‌ক্ (আওরঙ্গজেবের আমলে প্রথম নিযুক্ত) ঘাঁটি

গাড়লেন নর্মদার দক্ষিণে। তার পরেই সৈয়দ হুসেন আলির বক্সী দিলওয়ার খাঁর হত্যা, সৈয়দদের দলভুক্ত দুর্ধর্ষ আসিরগড় দুর্গের কর্তৃপক্ষ উৎকোচে বশীভূত হয়ে বিরুদ্ধ-দলে যোগদান, সৈয়দদের আত্মীয় আলাম আলি খাঁর ধ্বংস ইত্যাদি বিপর্যয় কয়েক মাসের মধ্যে ঘটে যাওয়ায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাগ্যচক্রের আবর্তন নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। পতন রোধ করবার জন্যে তাঁরা কিভাবে প্রস্তুত হলেন এবং সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে উৎসন্ন গেলেন সে সবের বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

সৈয়দ ভ্রাতাদের উৎখাত হবার প্রসঙ্গে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য এই যে, মীর মহম্মদ আমিন তাঁর পৃষ্ঠপোষকের দুঃসময়ে তাঁদের শত্রুপক্ষে এমন সক্রিয়ভাবে যোগ দেন যে, যাঁর অনুগ্রহে তাঁর এ যাবৎ উন্নতি ঘটেছে সেই সৈয়দ হুসেনের হত্যাকাণ্ডেও তিনি অংশ নেন এবং মৃত্যুর পরে সৈয়দের শিবির লুণ্ঠনের ঐশ্বর্য-সম্ভারেরও ভাগ্দার হন।

সৈয়দ আবদুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলীকে ধ্বংসের পর মহম্মদ শাহ্ উৎসব পালন করতে সাড়ম্বরে দরবার বসালেন দেওয়ান-ই-খাসে (৯, অক্টোবর, ১৭২০ খৃঃ)। সেই দরবারে ষড়যন্ত্রকারীদের পুরস্কার অর্থাৎ নতুন পদলাভ ঘোষণা করা হল। মীর মহম্মদ আমিন উপাধি লাভ করলেন সাদৎ খাঁ বাহাদুর (সৌভাগ্যের অধিপতি) এবং পাচ হাজারি মনসবদারের পদ। দুঃসাহসিক বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে এক বছরের মধ্যেই মীর মহম্মদ আমিনের হিন্দুস্থান-বিয়ানা জেলার ফৌজদার থেকে এই অভাবিত পদোন্নতি।

তারপর থেকে মহম্মদ শা'র ঘনিষ্ঠ সভাসদরূপে সাদৎ খাঁ বুর্হানউল্ মুল্কের ক্রমোন্নতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলল। ওই বছরেরই ১৫ অক্টোবর তিনি আগ্রা প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত হলেন ঘোড়া, হাতি, সম্মানের পোষাক ইত্যাদি উপহার সমেত। তার দু বছর পরেই (১৭২২ খৃঃ) সমৃদ্ধ অযোধ্যা সুবার সুবাদার মনোনীত হয়ে সাদৎ খাঁ জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জন করলেন। ওই বছর থেকেই অযোধ্যায় নবাবী পত্তনের কাল গণনীয়।···

নবাব সাদৎ খাঁর আমলে লক্ষ্ণৌর সঙ্গে সম্পর্ক অল্পই ছিল। তিনি বেশির ভাগ বাস করতেন দিল্লীতে। অযোধ্যা নগরে সাদৎ খাঁ সরকারি আবাস স্থাপন করেছিলেন। অযোধ্যার লক্ষ্মণঘাট এলাকায় তিনি কিলা মুবারক নামে যে দুর্গ নির্মাণ করান সেখানেই ছিল তাঁর প্রধান দফ্তর। আর অযোধ্যার দু ক্রোশ পশ্চিমে, ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণ তীরে, লক্ষ্ণৌর প্রায় চল্লিশ ক্রোশ পূর্বদিকে ফৈজাবাদ শহরে শিকারের জন্যে একটি বাংলো তিনি তৈরী করিয়েছিলেন।

ফৈজাবাদ প্রাচীন নগর নয়, যদিও পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌর পরে পরিণত হয়েছিল অযোধ্যা প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর-রূপে' অযোধ্যাকে মুসলামানরা আউধ বা অবধ বলত। সেখানেই আগে ছিল রাষ্ট্রকেন্দ্র। ফৈজাবাদ তখন অসংখ্য কেওড়া গাছের জঙ্গলে ভরা থাকত। ফৈজাবাদে শিকারের বাংলা তৈরি ছাড়া সাদৎখাঁ দিলখুসা প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ করেন মোতি মহলের চত্বরে। কিন্তু সে প্রাসাদ তাঁর মৃত্যুকালে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দ্বিতীয় নবাব সফ্দর জঙ্ আসলে ফৈজাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সরকারী ও সামরিক সদর দফতর ফৈজাবাদেই ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতেন ফৈজাবাদে, যদিও তাঁর অধিক বাস ছিল দিল্লী ও অন্যত্র। কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা। প্রথম নবাব সাদৎ খাঁর প্রসঙ্গ আরো কিছু আছে।

১৭২২ খৃঃ তিনি নিযুক্ত হলেন অযোধ্যা প্রদেশের সুবাদার। বাবুরের সময় থেকেই অযোধ্যা প্রদেশ মোগল-সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশ হয়েছিল। এখানকার উর্বর ভূমি ভৌগোলিক অবস্থান এবং সুষম জলবায়ুর জন্যে মোগল-সাম্রাজ্যে বিশেষ মূল্যবান রূপে গণ্য হত অযোধ্যা। ১৭২২ খৃঃ পর্যন্ত সেই ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসাবেই এর ছিল বটে, কিন্তু ওই বছর থেকে অযোধ্যায় নতুন সুবাদার সাদৎ খাঁ কার্যত একটি স্বাধীন রাজ-বংশেরই প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তীকালে তার রাজধানী লক্ষ্ণৌ ঐশ্বর্য আড়ম্বর ও সংস্কৃতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল খোদ দিল্লীর।

সাদৎ খাঁ অযোধ্যার সুবাদার হবার পর কখনো কখনো বাস করতে যেতেন লক্ষ্ণৌতে। তখনো সেখানে পূর্বতন শেখদের খুব বোলবোলাও ছিল। নবাব সাদৎ খাঁ নতুন কোন গৃহ নির্মাণ করেননি লক্ষ্ণৌ নগরে। অস্থায়ী

বাদের জন্যে সেখানকার কেল্লার মধ্যে শেখদেরই দুটি প্রাসাদ ভাড়া নিয়েছিলেন—পাঁচ মহল ও মুবারক মহল।

আগেই বলা হয়েছে, সাদৎ খাঁর অযোধ্যা সুবার সরকারী রাজধানী ফৈজাবাদে স্থাপিত হয়েছিল। তিনি তখন অযোধ্যার সুবাদারি পেয়েছিলেন, প্রদেশের সর্বত্র মোগল শাসন ছিল না, স্থানীয় জমিদাররা অনেক জায়গাতেই কর্তৃত্ব অধিকার করে ছিলেন। সাদৎ খাঁ একে একে তাঁদের অনেককেই পরাভূত করে শাসন আরম্ভ করেন বাদশার নামে। এমনি সব কাযের জন্যে ১৭২৩ খৃঃ বাদশা মহম্মদ শাহ্ তাঁকে বুরহান্ উল মুল্‌ক্ এই নতুন উপাধিতে ভূষিত করেন।

তার পরের বছর অর্থাৎ ১৭২৪ খৃঃ সাদৎ খাঁ নৈসাপুর থেকে তাঁর ভাগিনেয় মীর্জা মকিমকে ফৈজাবাদে আনিয়ে জ্যেষ্ঠা কন্যা সদরুন্নিসা বেগমের সঙ্গে বিবাহ দেন (মীর্জা মকিমের)। বিবাহের কিছু দিনের মধ্যেই ভাগিনেয় জামাতাকে অযোধ্যার নিজের সহকারী (সুবাদার) নিযুক্ত করেন এবং 'আবুল মনসুর খাঁ' এই বাদশাহী উপাধিতে ভূষিত হন মীর্জা মকিম। সাদৎ খাঁর মৃত্যুর পরে ইনিই সফদর জঙ্ উপাধি ও অযোধ্যার সুবাদারী লাভ করেছিলেন। কারণ সাদৎ খাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না।

অযোধ্যার সুবাদারি থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহেই কেটে যায় সাদৎ খাঁর জীবন। সে সব বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। শুধু অন্তিম অধ্যায়টি উল্লেখ করতে হবে—পারস্য সম্রাট নাদির শার বীভৎস দিল্লী আক্রমণের সঙ্গে তাঁর জীবনের যে পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়ে আছে।

প্রথম জীবনে তুর্কমান দস্যু এবং তদানীন্তন ইরাণের পাদিশা নাদির শাহ্ তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে কান্দাহার, কাবুল, জালালাবাদ পদানত করে সিন্ধু নদী পার হয়ে জয় করলেন লাহোর (জানুয়ারী ১৭৩৯ খৃঃ)। তার পরের লুণ্ঠনলক্ষ্য ও রণ-ধ্বনি দিল্লী চলো।

দুর্বল মহম্মদ শাহ্ এবং তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর দরবারের সাধ্য কি নাদির শাহী বর্বর অভিযানের রোধ করেন। সে কাহিনী ইতিহাসের সুপরিচিত অধ্যায়। কিন্তু তার একটি নেপথ্য পরিচ্ছেদও আছে।

নাদির শার কাহিনীর সঙ্গে কর্ণালের যুদ্ধে সাদৎ খাঁ বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেও বন্দী হন। সেই অবস্থায় নাদির শাহ্ প্রথমে অর্থমূল্যে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন মহম্মদ শার সঙ্গে এবং সাদৎ খাঁর পরামর্শে নাদির নিজাম উল মুল্‌কের মধ্যস্থতায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ফিরে যেতে সম্মত হন বিনা যুদ্ধে।

কিন্তু তার পরের দিন অকস্মাৎ বাদশার বক্‌সী সামসুদ্‌দৌলা খাঁ দৌরাণের মৃত্যুতে নিজাম উল্ মুল্‌ক্ তৎপর হয়ে মহম্মদ শাকে আবেদন করে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজি উদ্দীন খাঁ ফিরোজ জঙ্গকে বকসীর পদে ভূষিত করান। কিন্তু আজি মুল্লা খাঁ বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে ওই পদ স্বয়ং দাবি করায় নিজাম স্বয়ং গ্রহণ করেন মীর বকসীর পদটি। এই সংবাদে নাদির শার শিবিরে সাদৎ খাঁ ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত হয়ে নাদির শাহকে মন্ত্রনা দিতে থাকেন যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অতি অল্প মুদ্রা। এই মুদ্রার বিনিময়ে যুদ্ধ না করে তিনি যদি দিল্লী আক্রমণ করেন, এর চেয়ে বহুগুণ অর্থ তিনি হাতে পেয়ে যাবেন।

বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নেই। প্রধানত এই কুপরামর্শের ফলেই নাদির শা সন্ধি-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন ও দিল্লীর ভয়াবহ নাদির শাহী হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ঘটে। পরামর্শদাতার কায করে' নাদির শার অনুগ্রহও লাভ করেছিলেন সাদৎ খাঁ। বলা যায়, এ পর্বেও দস্তুরমত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় অযোধ্যার সুবাদার দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মৃত্যু হয় সাদৎ খাঁর (১৯ মার্চ, ১৭৩৯ খৃঃ) কোন কোন মতে বাদশার প্রতিশোধের আশঙ্কায় সাদৎ খাঁ বিষপানে আত্মহত্যা করেছিলেন।

ক্রমশঃ

আমাদের অর্থসংস্কৃতির ও সামাজিক দৃষ্টিকোণের প্রাগাধুনিক গতিপ্রকৃতি

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী

সমাজে আয় সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) প্রত্যক্ষ আয় এবং (২) মাধ্যমিক আয়। মাধ্যমিক আয় আবার পাঁচ প্রকার—(ক) চুক্তিমূলক (খ) প্রতিগ্রহমূলক (গ) প্রতারণামূলক (ঘ) বলাৎকারমূলক এবং (ঙ) চৌর্য-মূলক। মাধ্যমিক আয়-নীতিতে প্রথম দুটি নীতিই সমাজে স্বীকৃত। তবে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় বা সামাজিক অবস্থার চাপে অন্যান্য আয়নীতি পরিমিত মাত্রায় সমাজে স্বীকৃতিলাভ করেছে। অবশ্য যে ক্ষেত্রে মাত্রা অতিবর্তন করেছে, সেখানে দৃষ্টিকোণের সূচনা ঘটেছে। তবে সাধারণভাবে শেষের তিনপ্রকার আয় ধর্মোচিত নয়। এ ধরণের আয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্রকার উচ্চারিত করেছেন,—

"পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌস্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।"

(মনুসংহিতা ৪।১০৬)

দ্বৈতীয়িকী আয়নীতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আমাদের সমাজে একদা অধিকার-অনধিকারগত আয়ের প্রশ্ন ছিলো বৃত্তির দিক থেকে। মনু যাজ্ঞবল্ক্যের সময় থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দন পর্যন্ত স্মৃতিকাররা অনেকেই চাতুর্বর্ণ্য বৃত্তিবিভাগের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। মনু বিভিন্ন বর্ণের বৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। (মনুসংহিতা ১৷৮৮-৯১)। তবুও বৃত্তি বিপর্যয়ের ভয় এঁদের যথেষ্ট ছিলো। তাই অত্রিসংহিতায় দণ্ডের ভয় দেখাতে স্মৃতিকাররা ছাড়েন নি। সেখানে বলা হয়েছে,—

স্বৈরেব ধর্মোঽভিহিতঃ সংস্থিতা যত্র বর্ণিনঃ।
বহুমানমিহপ্রাপ্য প্রযান্তি পরমাং গতিম্॥
যে ত্যক্তারঃ স্বধর্মস্য পরধর্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তি করো রাজা স্বর্গ-লোকে মহীয়তে॥
আত্মীয়ে সংস্থিতো ধর্মে শূদ্রোঽপি স্বর্গমশ্নুতে।
পরধর্মো ভবেত্ত্যাজ্যঃ সুরূপ পরদারবৎ॥

(অত্রিসংহিতা ১৬-১৮)

বৃত্তিবিরোধী আয় আমাদের সমাজে নিন্দনীয় ছিলো। শ্রমবিভাগ যাতে তারসাম্য না হারায় সেই চেষ্টায় সম্ভবতঃ এটা করা হয়েছিলো। এঁদের ধারণা ছিলো, প্রত্যেক গোষ্ঠীর ব্যক্তি সমপরিমাণ সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম। এবং সাংস্কারিক, প্রাতিষ্ঠিক, প্রাতিভবিক এবং উৎপাদনিক শ্রমও সমপরিমাণে উৎপাদনে সক্ষম। এঁরা অর্থবন্টন সাম্যের দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করেন নি। কারণ বিশেষ বৃত্তির অর্থ সঞ্চয়ের পরিমিতির নির্দেশও দিয়েছেন। (মনুসংহিতা ১০।১২৯)

আয়ের অধিকার অনধিকারগত নির্দেশ অন্ততঃ বর্ণ বা বৃত্তির দিক থেকে সম্পূর্ণ অবাস্তব। "জীবন ধারণের হেতু" আয়ের প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন স্মৃতিকার—

বিদ্যা শিল্প ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষাং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতি ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন হেতব।

(মনুসংহিতা ১০।১১৬)

কুসীদ জীবিকা ইত্যাদি হেয় বৃত্তি উচ্চবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেও একই স্মৃতিকার আবার বলেছেন,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ।
কামন্তু খলু ধর্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেঽল্পিকাং॥

(মনুসংহিতা ১০।১১৭)

অতএব দেখা যাচ্ছে, দ্বৈতীয়িক আয়নীতিতে এ ধরণের নির্দেশ ব্যবহারিক দিক থেকে বিশুদ্ধভাবে মেনে চলা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তবুও বংশগত বর্ণাধিকার-প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি-আকর্ষক বৃত্তি বিপর্যয় সমাজে সাধারণভাবেও অননুমোদিত ছিলো। বিদেশী শাসন-তন্ত্রের বৈকল্পিক আশ্রয়স্থানের উদ্ভবে আমাদের পূর্বতন সমাজ-কাঠামো ধ্বসে পড়ায় বিশেষ করে হিন্দু সমাজের

পূর্বোক্ত দৈতৃ স্থিক আয়নীতি মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায় এবং যদিও এক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে, তা সাংস্কৃতিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু বৃত্তিভেদে নয়, লিঙ্গ ভেদে বা বয়সভেদেও দৈতৃস্থিক আয়নীতির প্রতিষ্ঠা কিন্তু বিশেষ করে লিঙ্গভেদে আয়নীতি সম্পর্কিত যে দৃষ্টিকোণ তাও প্রতিষ্ঠাগত দিকটির আনুকূল্যে পুষ্ট।

সাধারণভাবে সমাজের আয়নীতি মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বৃত্তিগত এবং (খ) ব্যক্তিগত। আমাদের সমাজের বৃত্তিগত আয়নীতির বিবর্তন সম্পর্কেও কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক যদিও চাতুর্বর্ণিক বিভাগের দিক থেকে আলোচনা করা অবৈজ্ঞানিকোচিত। কারণ—প্রথমতঃ আমাদের সমাজ এবং হিন্দুসমাজ একার্থবাচক নয়। দ্বিতীয়তঃ তথাকথিত হিন্দুরা সকলেই চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে পড়ে না। এবং তৃতীয়তঃ বা প্রধানতঃ বর্ণোচিত জীবিকা সর্বত্র অনুসরণ করা হয় নি। অতএব আয়নীতি বৃত্তিগত দিক থেকে আলোচনা করতে গেলে আধুনিক বৃত্তি-বিভাগ অনুসরণে পদক্ষেপ করাই বিধেয়। আমাদের দেশের বর্ণ ও বৃত্তি আধুনিক বিভাগ অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে স্থান গ্রহণ করে।—

(ক) সাংস্কারিক শ্রমজীবী।—সাধারণভাবে 'ব্রাহ্মণ' নামে আখ্যাত গোষ্ঠী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন। তাছাড়া অহিন্দু সমাজে সাংস্কারিক গোষ্ঠীও এর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) প্রাতিষ্ঠিক শ্রমজীবী।—এরা সাধারণতঃ দুই গোষ্ঠীতে পড়ে—কায়িক এবং বৌদ্ধিক। প্রত্যেক গোষ্ঠীতে আবার ব্যবহারিক অতিব্যবহারিক ভেদ আছে। যারা বেতনভোগী, তারা ব্যবহারিক, এবং যারা তাদের পারিশ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজে লাভ করে, তারা অতিব্যবহারিক গোত্রে পড়ে। কায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র। তবে অতিব্যবহারিক গোষ্ঠীতেই ক্ষত্রিয়ের সাধারণ অবস্থান সূচিত হতো। দাস শ্রেণীর কায়িক সেবক অন্য গোত্রীয় হলেও প্রাতিষ্ঠিক গোত্রের মধ্যেই ব্যবহারিক শ্রেণীতে পড়ে। তেমনি আবার বৌদ্ধিক শ্রেণীর ব্যবহারিক দিকে পড়ে করণিক ইত্যাদি এবং অতিব্যবহারিক দিকে পড়ে ব্যবহারজীবী, বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) ইত্যাদি সম্প্রদায়।

(গ) প্রাতিভবিক শ্রমজীবী।—চাতুর্বর্ণ্য কাঠামোর বৈশ্য শাখার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই বৃত্তিভুক্ত। তাছাড়া চতুর্বর্ণ বহির্ভূত সমাজের ব্যবসায়ীরাও এই শাখাতে পড়ে।

(ঘ) উৎপাদনিক শ্রমজীবী।—পূর্বোক্ত বৈশ্য শাখার দ্রব্যোৎপাদনিক গোষ্ঠী এই বৃত্তিভুক্ত। তাছাড়া চতুর্বর্ণ বহির্ভূত সমাজের দ্রব্যোৎপাদনিক শাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। ভূমিজ, প্রাণীজ, বৃক্ষজ ইত্যাদি দ্রব্য অঙ্গ বা যন্ত্রের মাধ্যমে যে গোষ্ঠী ব্যবহারোপযোগীভাবে উৎপাদন করে, তাদের এই গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায়।

চুক্তিমূলক আয়নীতিতেই বিভিন্ন বৃত্তি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা। আমাদের সমাজে উৎপাদনিক তথা বৈশ্য শাখার গ্রহণীয় বৃত্তি অন্যান্য বর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষণার মধ্যে দিয়েই একদিক থেকে সামাজিক চুক্তির মূল্য দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অবশ্য সন্ন্যাসী এবং অক্ষমদের প্রতিগ্রহমূলক আয়ের ব্যবস্থা সমাজ করেছে। প্রাচীন সমাজে সাংস্কারিক গোষ্ঠীর অর্থাগম আপাতদৃষ্টিতে প্রতিগ্রহমূলক বলে অনুভূত হয়, কিন্তু তা দক্ষিণা তথা বেতনেরই নামান্তর। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর বৃত্তি সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানাম কল্পয়েৎ॥ (১।৮৮)।

অর্থাৎ সাংস্কারিকদের অর্থাগমের উপায় ছিলো দক্ষিণা ও দান প্রতিগ্রহ।

ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ
বেদবিৎসু বিবিক্তেষু প্রেত স্বর্গ সমশ্নুতে॥

(মনুসংহিতা-১১।৬)

অবশ্য প্রতিগ্রহের সীমা নির্দেশও ছিলো। (ঐ—৪।১৮৬)। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মের প্রচারে বিশেষ বিশেষ সাংস্কারিক গোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্বশীল জনসাধারণের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। এই সঙ্কট অবস্থায় সাংস্কারিকদের পক্ষ থেকে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করে আচার পালনের দিকে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি করবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে তেমনি দুরাচার সর্বস্ব ক্ষমতাহীন সমাজে প্রতিষ্ঠাগত দিক থেকে বলাৎকারের

সাহায্যে অর্থাগমের প্রচেষ্টা চলেছে। এই অবস্থায় সাংস্কারিক গোষ্ঠি অর্থের বিনিময়ে স্মার্ত বিধান দিতেও দ্বিধাবোধ করে নি। আবার তেমনি পাতিত্যের ভীতি প্রদর্শনে অর্থাগম প্রচেষ্টাতেও পশ্চাৎপদ হয় নি। প্রাগাধুনিক সমাজে স্বতসর্বস্ব সমাজপতিরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পৃক্ত ভাবপ্রবণতা জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তার অন্যতম ফল কৌলিন্য-প্রথা ও বিবাহ ব্যবসায়। সাংস্কারিক গোষ্ঠির এই আয়গুলো অসামাজিক এবং অননুমোদিত হলেও প্রথাসিদ্ধ হওয়ায় এবং স্বতসর্বস্ব গতিহীন সমাজ সত্ত্যের আনুকূল্যে ক্রমেই ভয়াবহরূপ ধারণ করেছিলো। বিশেষ করে সমাজের প্রতি যাদের দুর্বলতা ছিলো, তারাই ছিলো সাংস্কারিক গোষ্ঠীর বড়ো শিকার। একদা যা ছিলো দক্ষিণা বা দান তথা চুক্তিমূলক বা প্রতিগ্রহমূলক আয় ছিলো তা ক্রমে প্রতারণামূলক ও বলাৎকারমূলক আয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদ প্রচলনের ফলে দৈবনির্ভর সংস্কার সমাজে নিষ্প্রভ হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আচার পালনের নিষ্ঠা একদিকে যেমন কমে এসেছে, তেমনি বলাৎকারমূলক আয়ও ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর যে অধ্যাপনরীতির প্রচলন ছিলো তার বৈষয়িক মূল্য না থাকায় মূল্যহীন ভাবে পরিত্যক্ত হলো। অধ্যাপনা-রীতিও অবশ্য শেষের দিকে অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। নতুন সাংস্কারিক গোষ্ঠীর অর্থকরী বিদ্যার অধ্যাপনে পুরোনো সাংস্কারিক দলের সর্বাত্মক পরাজয় সূচিত হলো। পুরোনো সাংস্কারিক গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকই পুরোনো বৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। উপায়ান্তরবিহীন সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা জীবিকার জন্যে প্রাচীন সমাজবন্ধনে বিশ্বাসী রক্ষণশীল সমাজ-সত্ত্যের সন্ধান করতে লাগলো। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর পুরোনো বৃত্তি-জড়িত আয়নীতি এভাবে পরিত্যক্ত হলো। নতুন সাংস্কারিক গোষ্ঠীর আয়নীতি সম্পর্কে অবশ্য দৃষ্টিকোণ সূচিত হয় নি তা নয়, তবে তার মূলে ছিলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত বিরোধ।

আমাদের সমাজে প্রাতিষ্ঠিকদের মধ্যে অতিব্যবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর সম্মান যথেষ্ট ছিলো এবং সাংস্কারিক গোষ্ঠীর পরেই উক্ত গোষ্ঠী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের স্থান থাকায় আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে প্রাচীন সমাজে প্রাতিষ্ঠিক শাখার অতিব্যবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর আয়নীতির মধ্যে চুক্তি মূলকতা থাকলেও প্রাতিষ্ঠিকদের স্বার্থ সেখানে বেশি রক্ষিত হতো। প্রাচীন রাজতন্ত্র অনুযায়ী রাজা ছিলেন প্রাতিষ্ঠিক শাখার অতিব্যবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর অধিপতি। সমাজে এই গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি থাকায় এই অধিপতিই সমাজের অধিপতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বয়ং রাজাকেও চুক্তি মেনে চলতে হতো। স্মৃতিকার বলেছেন যে, প্রজারঞ্জনই রাজার ধর্ম, উৎপীড়ন নয়। যে রাজা সামরিক শক্তিদ্বারা প্রজার অর্থের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেন অথচ কর আদায় করেন, তাঁরা নরকগামী হন।—

যোঽরক্ষণ বলিমাদত্তে করং শুল্কং পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ ॥
(মনুসংহিতা—৮।৩০৭)।

আবার আপৎকালীন কর গ্রহণ প্রাচীন সমাজে স্বীকৃত ছিলো। রাজার আয় ছিলো সমাহর্তার মাধ্যমে সাত দিক থেকে—(ক) দুর্গ (খ) রাষ্ট্র (গ) খনি (ঘ) সেতু (ঙ) বন (চ) ব্রজ (ছ) বণিক্‌পথ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষ প্রচারে এই সমস্ত আয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি দেখানো হয়েছে। (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—অধ্যক্ষ প্রচার—২৪শ প্রকরণ)। রাজার অনুচর যুদ্ধোপজীবি প্রাতিষ্ঠিকদের আয় রাজপ্রদত্ত বেতন থেকেই আসতো। তাছাড়া তাদের কিছু বলাৎকার রাজনীতিতে অনুমোদিত ছিলো। তবে তার মাত্রা ছিলো। কারণ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রেই 'যুক্ত' দ্বারা অপহৃত সমুদয়ের প্রাণয়ন প্রসঙ্গে "যুক্ত প্রতিষেধ" নামে একটি উপায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'যুক্ত'-দের ধনাপহরণ অনেক সময় মাত্রা অতিক্রম করতো—এর থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। (ঐ—অধ্যক্ষ প্রচার—২৫শ প্রকরণ)। অতিব্যবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠিক রাজ নিযুক্ত অথবা অনিয়োজিত—দুইই হতে পারে। শেষোক্ত দলের অর্থাৎ দস্যুদলের স্বীকৃতি সমাজে কোনো কালেই নেই। বলা বাহুল্য বলাৎকারমূলক আয়ই

এদের লক্ষ্য ছিলো। দেশীয় রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অতিব্যবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক দলের সামাজিক মান নীচে নেমে যায়। এদের অনেকেরই পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় ব্যবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিকদল—তথা শূদ্র জাতীয় অর্থাৎ অনুচর ইত্যাদি জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভবনে। আমাদের সমাজে বিদেশী শাসনতন্ত্রের পত্তনে এই বেতনভোগী কায়িক প্রাতিষ্ঠিক দলের অনেকে যথারীতি পূর্ব বৃত্তি গ্রহণ করেছে এবং অনেকে বৃত্তি ত্যাগ করেছে। আমাদের প্রাগাধুনিক সমাজে এই ধরণের কায়িক প্রাতিষ্ঠিক দলের বেতনাতিরিক্ত বলাৎকারমূলক আয় এবং প্রতারণামূলক আয় বলবৎ থেকে প্রকারান্তরে প্রাচীন ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তবে প্রত্যক্ষ বলাৎকার অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণার মধ্যেও আত্মগোপন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর পুলিশের দুর্নীতির প্রতি যে দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে, তার ভিত্তি অনাধুনিক কালে গ্রথিত।

ব্যবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিকদের আয় মূলতঃ চুক্তিমূলক, কিন্তু এই চুক্তিতে তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত। এই গোত্রীয় ব্যক্তিদের প্রাচীনকালে সমাজে শূদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদের বৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

(মনু সংহিতা-১।৯১)।

ব্যবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিকরা আয়ের দিক থেকে অনেকটাই ছিলো কৃপার পাত্র। ভট্ট মেধাতিথি এ বিষয়ে লিখেছেন,—'প্রভুঃ প্রজাপতিরেকং কর্ম শূদ্রস্যাদিষ্টবান এতেষাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যানাং শুশ্রূষা স্বয়া কর্তব্যাহন সূয়য়াহনিন্দয়া চিত্তেনাপি তদুপরি বিষাদো ন কর্তব্যঃ। শুশ্রূষা পরিচর্যা তদুপযোগি কর্মকরণঃ শরীর সংবাহনাদি চিত্তানুপালনম্। এতদ্দৃষ্টার্থং শূদ্রস্য অবিধায়কত্বাচ্চৈকমেবেতি ন দানাদয়ো নিষিধ্যন্তে। বিধিরেষাং কর্মনামুত্তরত্র ভবিষ্যতি অতঃ স্বরূপ বিভাগেন যাগাদীনাং তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ।' (মনুভাষ্য—১।৯১) সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিকদের আয়ে বলাৎকারের অবকাশ ছিলো না। এর কারণ শ্রমিক সঙ্ঘের সামাজিক স্বীকৃতি তো ছিলো না, এমন কি তাদের অর্থ সঞ্চয় ও বিলাসিতাও নিষিদ্ধ ছিলো।—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধন সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥

(মনু সংহিতা—১০।১ ২৯)।

অতএব শূদ্রের আয় ছিলো সঙ্কীর্ণ স্বার্থচুক্তিমূলক। প্রতিগ্রহমূলক আয়ের ক্ষেত্র অবশ্য এই বৃত্তিতে ছিলো, কিন্তু চৌর্য এবং প্রতারণামূলক আয়নীতির প্রয়োগ এই গোষ্ঠীর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে। তবে এই গোষ্ঠীর সমাজ-নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নেই বলে, এর বিরুদ্ধে ব্যাপক দৃষ্টিকোণের জন্ম হয় নি। কিন্তু সেব্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক দিকে দৃষ্টিকোণের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর সেবার মূলে যে চুক্তি তাতে "অর্থদূষণ" সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ প্রাচীন, পরবর্তীকালে সেবক সঙ্ঘের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

অতিব্যবহারিক বৌদ্ধিক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে বৈদ্য, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি বৃত্তিধারী ব্যক্তি সমূহ। অনেকের মতে বৈদ্য, অতিব্যবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক দলেরই সম্প্রদায় ভেদ। কিন্তু অম্বষ্ঠের জন্মগত রূপক পূর্বোক্ত মতেরই পোষক। চুক্তির ওপরেই এদের জীবিকা নির্বাহ হতো। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের রচনা অর্বাক্তন কালের হলেও, অম্বষ্ঠের মান সাংস্কারিক সম্প্রদায়ের পরে থাকায়, দেখা যায়, সমাজ এদের আয়নীতি সম্পর্কে অননুকূল ছিলো না। অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য ছাড়াও অতিব্যবহারিক বৌদ্ধিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার অস্তিত্ব ছিলো। আমাদের সমাজে আগে জীবিকা সম্পর্কিত জটিলতা ছিলো না—তা নয়; তবে কোথাও উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, কোথাও বা বিশেষ ক্ষেত্রেরই একমাত্র উপস্থিতি ইত্যাদি নানা কারণে অতিব্যবহারিক বৌদ্ধিক শাখার বিভিন্ন জীবিকা সম্পর্কে স্পষ্ট বিন্যাস সম্ভবপর নয়। পরবর্তীকালে ডাক্তার উকিল ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা ক্রমেই বিস্তৃত

হয়েছে জীবন-সংগ্রামে জটিলতা বৃদ্ধিতে। এদের জীবিকা ছিলো স্বাধীন, এবং আয় ছিলো চুক্তিমূলক। কিন্তু সাধারণের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার সুযোগে প্রতারণামূলক ও বলাৎকারমূলক আয়নীতি এদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাংস্কারিক এবং বৌদ্ধিক শাখার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণের তীব্রতাই সাধারণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উৎপাদনিক, প্রাতিভবিক এবং কায়িক (প্রাতিষ্ঠিক) দিক থেকে সাধারণের ব্যাপক অপসরণে বৃত্তিগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় সাংস্কৃতিক দিক থেকে দৃষ্টিকোণের সূচনাও অবশ্য হয়েছিলো। তবে আয়নীতির দিক থেকে চুক্তিমূলক আয়নীতির বিচ্যুতিই এই সমস্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠন করেছিলো।

ব্যবহারিক বৌদ্ধিক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক শাখার মধ্যে আছে করণিক শ্রেণী বা করণ, এবং অতিব্যবহারিক বৌদ্ধিক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা বেতনভোগী— তাঁরাও এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন। এঁরা রাষ্ট্র, সংস্থা, কিংবা ব্যক্তিপ্রদত্ত বেতন ভোগ করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর লিপিগুলোর মধ্যে "প্রথম কায়স্থ শাম্বপাল" "করণ-কায়স্থ নরদত্ত" "কায়স্থ প্রভুচন্দ্র" ইত্যাদি ব্যক্তির সবিশেষ নাম পাই। এঁরা সকলেই ছিলেন রাজকর্মচারী। বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পৃঃ ২৭৬)। রাজতন্ত্রের যুগে রাজনিযুক্ত পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকলেও এই শ্রেণীর নিয়োগ ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারাও সংঘটিত হতো, সেটা অনুমান করা যায়। প্রাগাধুনিক সমাজে বিদেশী শাসনতন্ত্রের যুগেও একই ধরণের করণিক বা বেতনভোগী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে, তার মূলে ঐতিহ্য অস্বীকার করা যায় না। ব্যবহারিক সম্প্রদায়ের (কায়িক ও বৌদ্ধিক) আয়নীতির প্রতারণামূলক, বলাৎকারমূলক, চৌর্যমূলক, সম্মানহানিকর প্রতিগ্রহমূলক আয়নীতির বিরুদ্ধে প্রাহসনিক লক্ষ্য সূচিত হয়েছে।

ইংরেজ আমলের সুরুতেই সামান্য কিছু ইংরেজী বিদ্যা সম্বল করে ইংরেজ শাসকের সেরেস্তায় ও ব্যবসা বাণিজ্যে একদল লোক চাকরী নিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছিলো। এরা ছিলো করণিক! ইংরেজরা এদের নতুন নাম দিলেন বাবু। এখনও তাদের অভিধানে বাবু অর্থ অল্পশিক্ষিত কেরাণী! এদের আয়নীতি চুক্তিমূলক হলেও এদের স্বার্থ ছিলো অনেকটাই উপেক্ষিত। রামমোহন রায়ের প্রতিবাদে অবশ্য এদেশে দায়িত্বপূর্ণ করণিক শাখারও পত্তন হলো। এতেও আয়নীতি অনুরূপই রইলো। অর্থাৎ ইংরেজরা যে সব চাকরীতে বিলেত থেকে বেশি বেতন দিয়ে লোক আনতে বাধ্য হতো, সে সব ক্ষেত্রে অল্প মাইনেতে উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলো। ইংরেজরা এভাবে স্বাধীন অর্থনীতি থেকে বাঙালীদের সরিয়ে এনেছিলো! এই বাবু বা কেরাণীদের মধ্যে সম্মানহানিকর চুক্তিমূলক আয়নীতি এবং দৌর্নীতিক আয়নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে। এই সময়ে সরকারী করণিক ছাড়া বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিনিয়োজিত হয়েও এই বৃত্তি গৃহীত হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টিকোণ লক্ষিত হয়।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের সমাজে প্রাতিভবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ছিলো। একটি সংস্কৃত প্রবচন আছে,—"নাস্ত্যচৌরঃ বণিগ্‌জনঃ।" এর থেকে বোঝা যায় চৌর্যমূলক আয় প্রাতিভবিক সমাজে ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলো। 'অচৌর' প্রসঙ্গে 'চৌর' অর্থে অবশ্য প্রতারণামূলক এবং চৌর্যমূলক উভয় আয়নীতির অনুসরণকারী বোঝানো হয়েছে। বৈশ্যদের বৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
(মনুসংহিতা—১।৯০)।

উক্ত বৃত্তি সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে,—
ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্‌ ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন॥
মণিমুক্তা প্রবালানাং লৌহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্থবলাবলম॥
বীজানামুপ্তিবিচ্চস্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্বশঃ॥
সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্‌।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্ধনং॥

ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্‌ভাবাংশ্চ বিবিধা নৃনাম্‌।
দ্রব্যাণাং স্থান যোগাংশ্চ ক্রয় বিক্রয়মেব চ ॥
ধর্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধা বা তিষ্ঠেদযত্নমুত্তমম্‌।
দদ্যাচ্চ সর্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ ॥

(ঐ—৯,৩২৮—৩৩)

আমাদের সমাজে প্রাতিভবিক এবং উৎপাদনিক সম্প্রদায়কে একত্রে বৈশ্য সম্প্রদায় নামে চিহ্নিত করা হলেও আমাদের সমাজে ব্যবসায়ী বৈশ্য সম্প্রদায়ের প্রাচীনকালে অর্থোপার্জন উপায় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। বৈশ্য সম্প্রদায়ের বৃত্তিও সমাজে প্রকৃতপক্ষে চুক্তিমূলকতার মধ্যেই আবির্ভূত হয়। দ্রব্যবিস্তার বা দ্রব্যবন্টন কিংবা অর্থবিস্তার বা অর্থবণ্টনে চুক্তি-অনুযায়ী যে প্রাপ্য তা দ্রব্য বা অর্থের ওপরে 'লাভ' হিসেবে স্বীকৃত। এই আয়নীতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে প্রাতিভবিক সত্তার ওপরে ন্যস্ত ছিলো বলে বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি সহজেই চুক্তিমূলক আয়নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটে। সাধারণ চুক্তিমূলকতায় স্বার্থসাম্য থাকে। লাভ থেকে আয়নীতির বিবর্তনের মূলে লাভের স্বাভাবিক গতি। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে অন্যক্ষেত্রে লাভের বিভিন্ন বিঘ্ন-উৎপাদকের উল্লেখ করেছেন। (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—অভিযাস্যৎ কর্ম—চতুর্থ অধ্যায়, ১৪২তম প্রকরণ)। এগুলোর মধ্যে এমন কতকগুলো বিঘ্ন উৎপাদক বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করি, যা প্রকৃতপক্ষে মানবিকগুণ বলা যেতে পারে। অতএব লাভেচ্ছা থেকে আমাদের সমাজে চৌর্যমূলক, প্রত্যারণামূলক এবং বলাৎকারমূলক আয়নীতির সূত্রপাত এবং পোষণ হয়েছে। সমাজ, ব্যবসায়ী বৈশ্য সমাজের মুনাফার স্বীকৃতি দিলেও এর মাত্রাতিরেক সমাজে দৃষ্টিকোণের জন্ম দেয়।

প্রাচীন বৈশ্যসমাজের আয়নীতি সম্পর্কে বিধি-নিষেধ আমাদের স্মৃতিগ্রন্থে খুব স্পষ্ট নয়। তবে সাধারণভাবে অতিরিক্ত মুনাফাগ্রহণ নিষিদ্ধই ঘোষণা করা হয়েছে। বিষ্ণুসংহিতায় বলা হয়েছে,—

আর্জবং লোভ শূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজনং।
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম সামান্ত উচ্যতে ॥

সব বর্ণেরই পালনীয় হিসেবে এই উক্তি বৈশ্য সম্প্রদায় সম্পর্কেও প্রযোজ্য—বলা বাহুল্য।

অর্থনীতি জগতের পরিবেশ বিশিষ্টতায় প্রাতিভবিক সম্প্রদায়ের আয়নীতির মাত্রা নির্ধারিত হয়। প্রাক্‌ শিল্পবিপ্লব যুগে অর্থাৎ কৃষি ও কুটির-শিল্পের যুগে আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থা ছিলো গ্রামকেন্দ্রিক। প্রত্যেকটি পরিবার ছিলো এক একটি আর্থনীতিক unit. সে সময়ে আমাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিলো কৃষি,—তাই কৃষির অর্থনীতিই ছিলো সেযুগের অর্থনীতি। কৃষিকাজের অবসরে তারা কুটির-শিল্পে শ্রম নিয়োগ করতো। (History of the Military transaction of the British Nation in Indosthan—Robert Orme—Vol. II, P-4)। ইসলামী যুগে আমাদের দেশে বিদেশী বণিক্‌রা এসেছে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমাদের দেশের কুটিরশিল্প ক্রয় করে বিদেশে চড়া দামে বিক্রী করা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ছিলো আমাদেরই সমাজের বণিকদের মধ্যে। তাছাড়া সরকারী শাসনব্যবস্থার প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ কড়াহারে শুল্কের প্রতিবন্ধকতায় বিদেশী বণিকরা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে আঘাত হান্‌তে পারে নি। কিন্তু তারা বাণিজ্য চালিয়েছিলো কারণ আমাদের দেশে অর্থ সাধারণতঃ তহবিলে সঞ্চিত হতো এবং সাধারণ লোক আয়ত্তের বাইরে (out of Circulation) থাকায় আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কম থাকতো। এই সময় তাদের দৃষ্টি পড়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের দিকে। এদিকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শক্তিকে তুচ্ছ করে দাঁড়িয়েছিলো আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে স্ফীতবিত্ত প্রাতিভবিক সম্প্রদায়। এই অবস্থায় সামন্তরা বুঝেছিলেন যে জমিদারীতে অর্থাগম বাণিজ্যে অর্থাগমের তুলনায় কিছুই নয়, তাই দেশীয় শেঠদের এতো প্রতিপত্তি।

পরবর্তীকালে বণিক ইংরেজদের রাজ্যাধিকারে দেশীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। যে কয়জন প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁদের খেতাব দিয়ে সম্মান দিয়ে জমিদার হিসেবে বিলাসীভাবাপন্ন করে তুল্‌লেন। বলা বাহুল্য প্রাতিভবিক সত্তায় সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কের পার্থক্য বিশেষ হয় নি। দেশীয় প্রাতিভবিক সত্তার লাভনীতির মাত্রা শুধু বিদেশীয় তথা রাষ্ট্রীয় বণিকদের লাভনীতি

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অতএব মাত্রাতিরেক থেকেই প্রধানতঃ দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠীর স্বার্থসংঘর্ষ সম্পর্কে যে দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব পাই, তা রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠাগত পথেই প্রযোজ্য হয়েছে।

প্রাতিভবিক সম্প্রদায়ের আয়নীতির বিবর্তন প্রসঙ্গে, বিশেষতঃ প্রাতিভবিক ক্ষেত্রেই পরিবেশ আলোচনার সার্থকতা এই যে, বিদেশী শাসন নিয়ন্ত্রিত দেশীয় সমাজের আর্থনীতিক পরিবেশের চিত্রের সাহায্যে প্রাতিভবিক সম্প্রদায়ের লাভনীতির মাত্রাবোধের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে।

আমাদের সমাজে ঔৎপাদনিক সম্প্রদায়কেও বৈশ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত করা হয়েছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। সমাজে দ্রব্যোৎপাদনের সঙ্গে দ্রব্যবিস্তার ও বন্টনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিলো বলেই সম্ভবতঃ এ দেশীয় স্মৃতিকারর। ঔৎপাদনিক এবং প্রাতিভবিক উভয় সম্প্রদায়কেই বৈশ্য নামে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের দেশে ভূমিজ, প্রাণিজ, বৃক্ষজ ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদন বহু প্রাচীন কাল থেকেই ব্যাপকভাবে সংঘটিত হতো। প্রত্যক্ষ প্রাতিভবিকের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় আয়নীতির ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে যে আয়নীতির অস্তিত্ব ছিলো, তা চুক্তিমূলক অবশ্যই ছিলো, তবে ঔৎপাদনিক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রশ্ন প্রাতিভবিক চাপে ঢাকা পড়ে গেছে। বস্তুতঃ ঔৎপাদনিক সম্প্রদায় যে ক্ষেত্রে অতিব্যবহারিক হয়েছে, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রাতিভবিক বৃত্তি গ্রহণ করেছে। আবার যখন ব্যবহারিক হয়ে পড়েছে, তখন প্রাতিষ্ঠিক সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। তাই আধুনিক সমাজে উপাদানগতভাবে ঔৎপাদনিক সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিলেও তার ব্যবহারিক কোনো মূল্য নেই। তাই এই সত্তাকে প্রাচীন সমাজ প্রাতিভবিকদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। অবশ্য তাঁদের দৃষ্টি একদেশদর্শী। কারণ প্রাতিষ্ঠিক গোষ্ঠীর সঙ্গেও এদের সংযুক্তির অবকাশ যথেষ্ট আছে। এককথায় আমাদের সমাজে এদের আয়নীতি প্রকারান্তরে প্রাতিভবিক এবং প্রাতিষ্ঠিকদের আয়নীতি। অতএব ঔৎপাদনিক সম্প্রদায়ের আয়নীতি সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ বৃত্তিগত আয়নীতির ওপর ধর্মীয় সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান থাকে। আমাদের সমাজে ধর্ম ও সমাজ অনেকটা একার্থক হয়ে পড়েছিলো। তাই ধর্মীয় প্রথার প্রভাব এবং সামাজিক প্রথার প্রভাবকে বিশিষ্ট করে দেখা যায় না। আয়নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথার সম্পর্কে কিছু পরিচয় প্রদান আবশ্যক। এগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে—যৌথ পরিবার প্রথা, স্ত্রীলোকের আয় সম্পর্কিত প্রথা এবং প্রতিগ্রহমূলক আয়ের স্বীকৃতি।

আমাদের সমাজ ছিলো মূলতঃ কৃষিপ্রধান। ভূম্যধিকার প্রথা ও কৃষিজাত আয়ের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার প্রথা ছিলো উপযোগী। কিন্তু পরিবর্তীকালে অন্যান্য আয়ের মধ্যে চাকুরী ইত্যাদি আয়ের পথ প্রধান হয়ে ওঠায় বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা সম্পূর্ণ অচল হয়ে ওঠে। যৌথ পরিবারে আয়কের দায়িত্ব আর্থনীতিক এবং সামাজিক—দুদিক থেকেই। প্রথার চাপে বিশেষতঃ এই ধরণের আর্থনীতিক দায়িত্ব স্বীকৃত হওয়ায় এই সমস্ত পরিবারের মধ্যে প্রাপ্ত যোগ্যতা বেকার পরিবার সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই চাপ ব্যক্তিগত তথা বৃত্তিগত আয়নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

আমাদের সমাজে ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকের ব্যবহারিক (বৌদ্ধিক বা কায়িক) বৃত্তিগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিলো। যে কারণে যৌথ পরিবার প্রথা সমাজে অনুকূল ছিলো, সেই একই কারণে স্ত্রীলোকের জীবিকাগ্রহণের ওপরে চাপ পড়ে নি। তাছাড়া এতে যৌন নিরাপত্তার অভাবই ছিলো একটা প্রধান কারণ। যে আর্থনীতিক চাপে সমাজে ভদ্রেতর স্ত্রীসমাজে জীবিকা গ্রহণের রীতি ছিলো, তা উচ্চ সমাজে ততোটা ছিলো না। তাছাড়া যৌন সংস্কার ভদ্রেতর স্ত্রীসমাজে ততো প্রখরও ছিলো না। যাহোক আমাদের সমাজে পারিবারিক শ্রমের চুক্তির মধ্যেই স্ত্রীলোকের আয় চলে এসেছে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে

উচ্চবিত্ত জমিদার সম্প্রদায় তাদের মুনাফালব্ধ অর্থ নিয়োগের পরিবর্তে ভোগবিলাসে ব্যয় করেছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানকে ক্রমেই উন্নত তথা ব্যয়বহুল করে তুলেছে। এর মূলে অবশ্য বণিক শাসকের কূট প্রচেষ্টা নিহিত ছিলো। ব্যবসার কেন্দ্ররূপে নগরগুলো প্রতিষ্ঠালাভ করায় নগরের মধ্যে উচ্চ জমিদারের পাশে দেখা দিয়েছে জমিহীন চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত ব্যবহারিক বৌদ্ধিক গোষ্ঠী তথা কর্মচারী সম্প্রদায়। জমিদারদের জীবনযাত্রার মান এই কর্মচারী সম্প্রদায়কে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে এবং কর্মচারী সম্প্রদায়কে জীবনমান সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেও কূট শাসকগোষ্ঠির প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিলো। শুধু অকারণ মান সঞ্চয়ে কিংবা বেশভূষায় অপব্যয় দৃষ্টিকোণ সূচিত করেছে, তা নয়; মদ্যপান বেশ্যাসক্তি ইত্যাদি নাগরিক অভিশাপ—যা উচ্চবিত্তের জীবনযাত্রায় সহনীয় হলেও মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রায় ভয়াবহ ছিলো—এই সমস্ত অপব্যয়ের বিরুদ্ধেও দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে।

ব্যয়ের পরিধি বিস্তার সম্পর্কে আমাদের সমাজ অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী। সাধারণবুদ্ধিতে ব্যবসায়িক মূল্য খুবই কম। তাই বলা হয়েছে,—

যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ সতু জীবতু।
কাকোঽপি কিং ন কুরুতে চঞ্চা স্বোদর পূরণং॥
(হিতোপদেশ)।

সাধারণভাবে ব্যয়ের দিক থেকে পারিবারিক দায়িত্বের সম্পর্কে বলা হয়েছে—পুত্রমুৎপাদ্য, সংস্কৃত্য, বেদধ্যাপ্য, বৃত্তিং বিধায় দাবৈ সংযোজ্য গুণবতি পুত্রে কুটুম্বমাবিশ্যকৃত প্রস্থান লেখো বৃত্তিবিশেষাননুক্রমেৎ। (শঙ্খ লিখিতৌ)। দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ব্যয়ের প্রসঙ্গে 'সমর্থ মুক্তাবলীতে' (৯।২৭)। কুলুক ভট্ট বলেছেন—প্রতিদিনপ্রাতিথিদিব্র ভোজনাদের্লোক ব্যবহারস্য। তাছাড়া উৎসবানুষ্ঠান ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে সামাজিক ব্যয় যথেষ্ট ছিলো। দানের পাত্র অবশ্য সাংস্কারিক গোষ্ঠির মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো। দানের উপযুক্ত নয় প্রকার ব্রাহ্মণের কথা মনু উল্লেখ করেছেন (১১।১)। ব্যবহারিক প্রান্তিক গোষ্ঠী তথা অনুচরবর্গকে দয়া দাক্ষিণ্যের বশে সামান্য অর্থদান শাস্ত্রকার স্বীকৃত। তাছাড়া ভিক্ষুক ইত্যাদিকে দা[illegible] করবার পুণ্য সম্পর্কে শাস্ত্রকারর। সামাজিক ব্যক্তি[illegible] সচেতন করেছেন। দক্ষসংহিতায় বলা হয়েছে,—

দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিন:॥ (দক্ষ সংহিতা—২.৪১)।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিক কারণে ব্যয়ের স[illegible] পারিবারিক কারণে ব্যয় এবং সামাজিক কারণে ব্যয়ে[illegible] আবশ্যকতা সমাজ শাস্ত্রকাররা বার বার প্রচার করে গেছেন অর্থ দিয়ে পোষণ করবার ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে,—

মাতা পিতা গুরু ভার্যা প্রজা দীন সমাশ্রিতঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃত॥
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকঃ পীড়নে তস্য তস্মাদ্ যত্নেন তং ভবেৎ॥ (দক্ষ সংহিতা—৩৪, ৩৭)। কিন্তু সামাজিক বা ধর্মীয় ব্যয় নি[illegible] বা পারিবারিক স্বার্থ লঙ্ঘন করলে, তার নিন্দাও করেছেন.

"ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করোত্যৌর্দ্ধ দেহিকং
তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ।। (মনুসংহিতা —১১।১০)।

অপর একটি শ্লোকে স্বার্থ লঙ্ঘিত ব্যয়নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে,—

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্মপ্রতিরূপক॥ (মনু-সংহিতা—১১।৯)।

এই ধরণের ব্যয় আপাতদৃষ্টিতে মধুর বলে প্রতীয়মান হলেও সামাজিক দিক থেকে এর ফল বিষময়। ব্যয়ের মান ও পরিধি সম্পর্কে এতো বিধি নিষেধ দেখে মনে হয় যে আমাদের সমাজে ব্যয়নীতি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত সমস্যাগুলোর অস্তিত্ব অত্যন্ত স্পষ্টগোচর ছিলো। তাই স্মৃতিকাররা এ ধরনের বিধিনিষেধ প্রচারের মাধ্যমে সমসাময়িক দৃষ্টিকোণগুলোকে মূল্য দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে আর্থনীতিক চাপে বিস্তৃত পরিধির ব্যয়নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর ছিলো না। তাছাড়া আধুনিক দৃষ্টিতে এর অনেকগুলোই ছিলো অপব্যয়ের নামান্তর। দান দক্ষিণা সম্পর্কে ধর্মীয় বা সামাজিক বিধান

নতুন দৃষ্টিতে দেখা দিলো ব্যক্তিগত আয়ের ওপর বলাৎকারে সামাজিক বা ধর্মীয় প্রশ্রয় রূপে—যা প্রকারান্তরে সমাজের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। এই পরিধি সঙ্কীর্ণতার মূলে যুক্তি যাই থাকুক, স্থিতিপন্থীর মতে এই নীতি অসঙ্গত ছিলো। যৌথ পরিবার প্রথা ছিলো সমাজ শক্তি পরিচালকের একটা ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেত্র। ব্যক্তিত্ব মুক্তির ফলে যৌন আর্থিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত অসন্তোষ থেকে যৌথ পরিবারের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিপন্থীরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

গুণবিচারে ব্যয়ের যে প্রকারভেদ আছে, সেগুলোর মধ্যে দৌর্নীতিক ব্যয় অন্যতম। দৌর্নীতিক অনুষ্ঠানে সহায়ক বা মাধ্যমের স্থান আছে বলে সে ক্ষেত্রে ব্যয়ের অবকাশ থাকে। সেই সমস্ত ব্যয়ই দৌর্নীতিক ব্যয় নামে চিহ্নিত হয়েছে। দৌর্নীতিক অনুষ্ঠানের মূলে আমাদের শাস্ত্রকাররা ছয়টি রিপুর অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে সেগুলো তিনটি গোত্রে পড়ে, যথা (ক) কাম, লোভ (খ) ক্রোধ মাৎসর্য ; এবং (গ) মদ, মোহ। কিন্তু এভাবে প্রকার ভেদেও অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত গোত্র তিনটির অস্তিত্বের ওপরেই যথাক্রমে (১) আকর্ষণমূলক বিপ্রকর্ষণমূলক এবং ৩। স্থিতিমূলক—এই তিন গোত্রে ভাগ করা যায়। আবার প্রত্যেকটির তিনটি সূক্ষ্ম উপবিভাগ আছে,—(ক) যৌন, (খ) আর্থিক এবং (গ) সাংস্কৃতিক।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে দৌর্নীতিক ব্যয়ের মূলে ব্যসন দোষের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, আন্বীক্ষিকী ইত্যাদি বিদ্যালাভজনিত বিনয়ের অভাবই পুরুষের (অর্থাৎ সাধারণের) ব্যসনের হেতু হয়। কারণ বিদ্যালাভ না করে অবিনীত লোক ব্যসনোৎপন্ন দোষ সমূহের জ্ঞানলাভ করতে পারে না। (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ১২৯ প্রকরণ)। আকর্ষণমূলক দৌর্নীতিক ব্যয়ের বিশেষতঃ কাম সম্পর্কিত ব্যয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কামজ চতুর্বর্গের মধ্যে। মৃগয়া, দ্যূত, স্ত্রী এবং পান—এই চারটি ব্যসনদোষে পরিচালিত ব্যয়ের সম্পর্কে আলোচনা না করলেও এবং তাঁর প্রদত্ত ব্যসনদোষ বিবৃতিতে অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে দৌর্নীতিক ব্যয়ের আলোচনায় এর মূল্য আছে। সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে লোভজ ব্যসনদোষও অন্তর্ভূত। কামে যৌন এবং লোভে আর্থিক দিক প্রধান হলেও প্রতিষ্ঠাগত দিকটিও কাম লোভ রিপুদুটির মধ্যেই মিলিয়ে আছে।

আকর্ষণমূলক যৌন দিকে আছে লাম্পট্য, বেশ্যাসক্তি, মদ্যপান ইত্যাদি। আর্থিক সমস্যার ক্ষেত্রে পুরুষপক্ষীয় লাম্পট্যই উল্লেখযোগ্য। বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে পরদারাধিকরণে পরস্ত্রীবশের অন্যতম অস্ত্রস্বরূপ অর্থের কথা বলেছেন। তাছাড়া কুট্টনী বা আড়কাঠি ছাড়া এসব ক্ষেত্রে কার্যানুষ্ঠান সম্ভবপর নয়। তারাও অর্থের বশীভূত। অতএব লাম্পট্যের প্রবণতায় বা পদক্ষেপে অর্থনাশ স্বাভাবিক। যে সব ক্ষেত্রে আর্থিক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কুট্টনী বা ব্যভিচারিণী স্ত্রী লাভ করে, সে ক্ষেত্রে অর্থনাশ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। লাম্পট্যের মতোই, বিষয়েও অনুরূপ অর্থনাশের বেশ্যাসক্তির অবকাশ আছে। দাম্পত্যদিকের ক্ষতির ভয় দেখিয়ে যৌন দিক নিয়ে অনেক কিছু বলা হলে দুর্নীতির ব্যয়ের দিক নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য মন্তব্য নেই। তবে আকর্ষণমূলক যৌন দুর্নীতিগত ব্যয়ের বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে কোনোরকম দৃষ্টিকোণ যে ছিলো না, এটা চিন্তা করাও অসঙ্গত। বস্তুতঃ আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত অর্থনাশের সঙ্গে পারিবারিক স্বার্থ জড়িত ছিলো বলেই এই আকর্ষণমূলক যৌন দুর্নীতি সমাজে দৃষ্টিকোণ সূচনা করেছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত অর্থনাশে সামাজিক গলগ্রহতার বীজ, কুদৃষ্টান্তের সূচনা ইত্যাদি সমস্যা জড়িয়ে থাকে বলে সেদিক থেকেও দৃষ্টিকোণ সূচনার অবকাশ আছে।

আকর্ষণমূলক অর্থিক দুর্নীতির সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে পারিবারিক স্বার্থ। বলাবাহুল্য পূর্বে বিবৃত অন্য কারণগুলোও এক সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ঘোড়দৌড়, ফাটকাবাজী জুয়া ইত্যাদি দৌর্নীতিক ব্যয়ের পরিণাম সমাজে ভয়াবহ। আমাদের সমাজে জুয়া ইত্যাদি অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে এবং সমস্যা সৃষ্টি করে এসেছে। অর্থ আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত

হওয়ায় আকর্ষণমূলক দৌর্নীতিক ব্যয় আর্থিক উপরিভাগের সার্থকতা স্পষ্ট করে তুলেছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে দৌর্নীতিক ব্যয়ের দৃষ্টান্তও আমাদের সমাজ অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে বহন করে এসেছে। প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে দৌর্নীতিক ব্যয় তিনটি ক্ষেত্রে সম্পাদিত হতে পারে—ধর্মীয় সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে দৌর্নীতিক ব্যয় আমাদের সমাজের স্মৃতিকারেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন স্পষ্টভাবে। (মনুসংহিতা—১১।৯-১০) সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার জন্যে উৎকোচ প্রদান অত্যন্ত অসঙ্গত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংঘটিত হলে প্রতিগ্রাহক গোষ্ঠী বহির্ভূত সম্প্রদায় থেকে দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে গত শতাব্দীতে ইংরেজপ্রদত্ত সম্মানে কৌলিন্যের মান নির্ধারিত হলে তথাকথিত খেতাব লাভের স্পৃহায় দৌর্নীতিক ব্যয়ের অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় দিকে প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে দৌর্নীতিক ব্যয়ের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন ভোটপদ্ধতিগত নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ সূচিত করেছে।

বিপ্রকর্ষণের দিক থেকেও যৌন আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক এই তিনটি অনুরূপ ক্ষেত্র আছে। বলাবাহুল্য বিপ্রকর্ষণের দিক থেকেও আমাদের সমাজে দৌর্নীতিক ব্যয় এবং দৃষ্টিকোণের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অবশ্য আকর্ষণমূলক ব্যয়ের সঙ্গে এর সংযোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিলতার মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

স্থিতমানের কালগত দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্যে স্থিতিমূলক দৌর্নীতিক ব্যয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। যৌন আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অর্জিত মানের পরবর্তী ক্ষয়িষ্ণুতায় দৌর্নীতিক ব্যয়ের সাহায্যে স্থিতিরক্ষার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে। যৌন মানের স্থিতি রক্ষার বিরুদ্ধে বিশেষতঃ বৃদ্ধের যৌবন ধারণের ব্যর্থ চেষ্টার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। আর্থিক মানের স্থিতিরক্ষায় দৌর্নীতিক ব্যয় আকর্ষণমূলক ব্যয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জটিলতা সম্পাদন করেছে। সাংস্কৃতিক মানের স্থিতিরক্ষার জন্যে দৌর্নীতিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রবলভাবে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে।

আমাদের সমাজে আর্থিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করা চলে। অবশ্য আয়নীতি ও ব্যয়নীতি সম্পৃক্ত সমস্যার সবগুলিই দৃষ্টিকোণ সংগঠন করে নি। প্রায় সবক্ষেত্রেই আর্থিক সমস্যা যৌন ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সঙ্গে একত্র সংযুক্ত হয়ে দৃষ্টিকোণ সংগঠন করায় এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই অন্য দুটির প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় দৃষ্টিকোণে আর্থিক সমস্যার দিক অনেকটা গৌণ হয়ে পড়েছে। তবু সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণে আর্থিক সমস্যার প্রায় সবক্ষেত্রেই কিছু কিছু আভাস ধরা পড়ে।

প্রার্থনা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বজীবে প্রীতি দাও! যেন আমা হ'তে
দুঃখ নাহি পায় কেহ তোমার জগতে!
সুচিন্তিত বাক্য হোক প্রশান্ত, সবল,
মাধুর্য্যে রসালো। কণ্ঠ করো সুকোমল!
চেতনা হইতে লুপ্ত করো অহঙ্কার!
ছিন্ন করে দাও মৃত্যু-জাল কামনার!
'আমি'র মৃত্যুতে দুঃখনিশি-অবসান।
নির্ব্বাণের প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ প্রাণ!
স্বার্থের প্রসুপ্তি হতে মহাজাগরণ!
আত্মার আনন্দময় পক্ষপ্রসারণ
সুবিস্তীর্ণ চৈতন্যের উন্মুক্ত গগনে!
—এ মৈত্রী-ভাবনা রাখো অনির্ব্বাণ
অহং-এর অন্ধকারে গুটিপোকা-সনে আমি
কবে হব প্রজাপতি মুক্ত সর্ব্বগামী?

ফুল্লশ্রী

দিলীপ দাশগুপ্ত

চারিদিকে কালোমেঘ, ফুলদল ঝরে পড়ে বাতাসের অশান্ত ক্রন্দন।
এরই মাঝে শূন্যবুকে একাকিনী বসে আছি তোমাদের দেখি যে স্বপন।
আর তো আসে না কেউ আঁচলে প্রদীপ ঢেকে তুলসীর মঞ্চে দিতে বাতি,
নীলের উৎসব নিয়ে আরতো করে না কেউ রাত জেগে জেগে মাতামাতি!
কোথায় বা 'বাল্যাশ্রম' কোথায় বা 'বিদ্যালয়' বিজয়গুপ্তের সে সমিতি,
নাট্যমঞ্চ শূন্য আজ, ম্লানশিখাটুকু শুধু জানায় যে সবি হায় ইতি।
এ কোন্ কঠোর হাতে, কোন্ সে পাষাণীপ্রাণ ভেঙে দিল এই উপবন?
বসন্তের জয়টীকা না পরাতে এ ললাটে, দাবদাহে পোড়ালো এ মন।
'ফুল্লশ্রী'-র শ্রীতো নেই, আছে শুধু ভাঙাস্মৃতি, আর আছে অতীত গৌরব—
তাকে নিয়ে কোন্ প্রাণে আমার সন্তান সবে দেশান্তরে করে মহোৎসব।
জুড়াতে পেরেছে কেউ আমার এ শূন্য কোল? তোমাদের কলকণ্ঠ হাসি?
তার বিনিময়ে আজ দিকে দিকে শুনি যেন বীণা বাজে মহা সর্বনাশী!
কে পারো দীপকরাগে রাজাতে এ অগ্নিবীণা? জ্বালাবে কে ধ্বংসের অনল?
সেই চিতাভস্ম মাঝে, নতুন মাধবী রাতে নব সৃষ্টি হবেই সফল।

'ফুল্লশ্রী' গ্রাম স্মরণে—

সময়ের নদী ধীরে বয়ে যায়

মনোরমা সিংহ রায়

তুমি যে কোথায় কতদিন আমি
তোমাকে খুঁজব সেকথা বল না।
জীবনের দিন কেটে কেটে যায়
শুধু বসে বসে যেন ঢেউ গোণা।
সময়ের নদী ধীরে বয়ে যায়
ফিরেও দেখে না পারে বসে বসে
কে যে গান গায়।

* * *

শুধু একদিন দেখেছি তোমাকে।
সে দেখাও ভুল কোথা কিছু নেই
এই কথা যদি বল কাছে এসে
প্রতিবাদ আমি কিছু করব না।
তেনো চিরদিন তবু তোমাকেই
খুঁজে খুঁজে সারা এ হৃদয় হবে
ভুলবার কোন অবকাশ নেই।
বসন্ত গত এইবার বুঝি
হেমন্ত যায়॥

জবানবন্দী

কল্যাণী দত্ত

সব তারা আকাশে জ্বলে না
কেউ থেমে কেউ নিভে
পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
কোন ছবি থাকে কিছুকাল।

সব নদী সাগরে মেশে না
দিনে দিনে কাছে এসে
বুঝি রাতে সরে সরে যায়।
বালি চাপা আথাল পাথাল।

সব ফুল বাগানে ফোটে না
দূরে দূরে হেসে হেসে
ঝুঁকে পড়ে খসে খসে যায়
ফুলদানী পায় না নাগাল।

সব চিঠি জবাব খোঁজে না।
কথাগুলো ফুঁসে ফুঁসে
পাড়ে এসে ভেঙে ভেঙে যায়।
অভিধান দেয় না সামাল।

রবির প্রসন্ন আলো

শান্তশীল দাশ

(২৫শে বৈশাখ স্মরণে)

রবির প্রসন্ন আলো বারে বারে নামে ধরণীতে,
সব গ্লানি, সব কালো চায় মুছে দিতে :
সে-আলোর সুস্নিগ্ধ ধারায়
ধরণীর গ্লানিভার সব মুছে যায়।

এদিকে ওদিকে আলো, প্রতি কণ্ঠে আলোকের গান,
আনন্দের সৌরভেতে চারিধার শুভ্র দীপ্যমান।
মনে হয়, এ ধরণী, এ মানুষ কত না সুন্দর,
এ প্রভাত, এই সন্ধ্যা কত মনোহর।

হায়, সে রবির দীপ্তি কোথা সরে যায়।
সব আলো ক্ষণিকে মিলায়।
আবার আবার অন্ধকার ;
অজস্র গ্লানির ভারে ভারাক্রান্ত দিনগুলি কাটে যন্ত্রণার

তোমার প্রসন্ন দীপ্তি হে ভাস্কর, অমিত দীপ্তিমান,
প্রতিদিবসের সাথী হবে না কি আমার জীবনে ?
জাগবে না ও অমৃত গান
আমার জীবন ভরে প্রভাতে-সন্ধ্যায়, নিদ্রা জাগরণে ?

আমি যে অমৃতমন্ত্র নিশিদিন কণ্ঠে পেতে চাই :
শুধু একদিন নয়, আমার অন্তর মাঝে ঠাঁই
পাবে ওই মন্ত্রখানি—এ প্রার্থনা করি বারংবার,
এ প্রার্থনা একান্ত আমার।

পার্ব্বতী দেবী

গত বৈশাখে পার্ব্বতী দেবী মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পুষ্প দেবীর প্রথমা কন্যা। উপনিষদ-অনুবাদিকা রূপে তাঁহার নাম পাঠক মহলে সুপরিচিত। শ্রীমতী পার্ব্বতীর অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে শিল্পাঙ্কনেও তাঁহার সুন্দর হাত ছিল। তাঁহার গানের গলাও ভাল ছিল—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মধুর কণ্ঠের অনুরাগী ছিলেন। ইনি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। শ্রীমতী পার্ব্বতীর মৃত্যুতে কবিশেখর কালিদাস রায় যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

শেষ সম্বল

ত্রিদিব হইতে এলো এক দেবী !
সেব্যা হইয়া গেল সবে সেবি,
হস্তে তাহার ছিল অমৃতের পাত্র

ধন্য করিতে মায়ের জীবন
দিয়ে গেল পরমার্থিক ধন
তাই তব হোক সম্বল একমাত্র।

কালিদাস রায়

বের্‌টষ্ট ব্রেখ্‌ট

অশোক সেন

গত শতাব্দীর শেষভাগে রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে দুই বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব হয়—রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয়ের খোল-নলচে বদলে এঁরা ইউরোপের থিয়েটারে নবযুগের প্রবর্তন করেন—এই দুই পথিকৃৎ হচ্ছেন ইংলণ্ডের গর্ডন ক্রেগ এবং রাশিয়ার কনষ্ট্যানটিন ষ্ট্যানিসলাভস্কি। ক্রেগ বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন সামগ্রিক ষ্টেজ-প্রডাকসনের উপর। ক্রেগ বলেছেন—"আর্ট অভ দি" থিয়েটার বলতে অভিনয়, নাটক, দৃশ্যাদি বা নৃত্যকে বোঝায় না—but it Consists of all the elements of which these things are composed.

এ্যাকসন (অভিনয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে এই এ্যাকসন), সংলাপ (নাটকের আত্মিক), রেখা এবং রং (যা দৃশ্যকে হৃদয়গ্রাহী করে) এবং নৃত্য—এর যে কোন একটি অন্য কোনটির থেকে বেশী কৌলীন্যের দাবী করতে পারে না। অবশ্য একদিক থেকে দেখতে গেলে এ্যাকসনকেই বেশী প্রাধান্য দিতে হয়। পেন্টিং-এর ক্ষেত্রে যেমন ড্রয়িংএর প্রাধান্য। মিউজিকের বেলায় মেলোডির, তেমনি আর্ট অভ্ দি থিয়েটারের ক্ষেত্রে এ্যাকসনের। আর্ট অভ্ দি থিয়েটার সৃষ্টি হয়েছে এ্যাকসন মুভমেণ্ট এবং নৃত্যের সংমিশ্রণে।

ষ্ট্যানিসলাভস্কি ছিলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রয়োগ-রীতি এবং অভিনয়-পদ্ধতি সারা ইউরোপ আমেরিকায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। ষ্ট্যানিসলাভস্কি এবং মস্কো আর্ট থিয়েটারের অগ্রগতিকে যে নাট্যকার সেরা সেরা নাটক লিখে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত রুশ লেখক আন্তন পাভ্‌লোভিচ. চেখভ। পৃথিবীর সব দেশেই আজ চেখভের লেখা বিখ্যাত নাটকগুলি, যথা—দি চেরী অর্চার্ড, দি সি গার্ল, আঙ্কল ভ্যানায়া, থ্রি সিস্টারস ইত্যাদি সমান জনপ্রিয়। কিন্তু আজও অবধি কোন দেশেই ঐ সব নাটকের মস্কো আর্ট থিয়েটারের মত সাফল্যমণ্ডিত মঞ্চরূপায়ণ হয়নি।

ক্রেগ এবং ষ্ট্যানিসলাভস্কি তাঁদের প্রডাকসনের দ্বারা রঙ্গজগতে নবযুগের প্রবর্তনা করেছেন বটে—তবে এঁরা কেউই নিজে নাটক লিখে তা মঞ্চস্থ করেন নি। এবিষয়ে ব্রেখট্ একমেবাদ্বিতীয়ম। তিনি একদিকে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার, অপরদিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রডিউসার।

রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রেও টেনিসনের সেই বিখ্যাত বাণীটি সমভাবেই প্রযোজ্য—অর্থাৎ The old order change the yielding place to new—ইউরোপে যখন ষ্ট্যানিসলাভস্কির পদ্ধতি exhausted হয়ে এসেছে এবং নাট্যানুরাগীরা অনুভব করছেন একজন নতুন পথিকৃতের আবির্ভাবের সময় উপস্থিত, তার কিছু পরেই দেখা দিলেন জার্মানীর বেরটস্ট ব্রেখট। চেখভ এবং ষ্ট্যানিস-লাভস্কির যৌথ প্রচেষ্টায় একসময়ে রাশিয়াতে যে নাট্য আন্দোলনের শুরু হয়েছিল, একা ব্রেখট এই দুইদিক সামলাবার দায়িত্ব নিলেন নিজের উপর। ব্রেখটের নাটকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রবাসে।

১৯৫৬ সালের ৪ঠা জুন সোমবার লণ্ডন টাইমসএর পৃষ্ঠায় দেখলাম ঘোষণা করা হয়েছে যে ব্রেখটপার্টি লণ্ডনে এসে অভিনয় করবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে, থিয়েটারের ব্যাপারে কোনরকম সঙ্কীর্ণতা দেখানো কোনক্রমেই উচিত নয়। মঞ্চের ক্ষেত্রে ভাব এবং চিন্তার প্রাচুর্যের অভাবটা এত বেশী যে, একদেশ যদি আর একদেশের নাট্যাভিনয় থেকে চিন্তার খোরাক পায় তবে তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য। এই বিশেষ

কারণেই বেরটল্ট ব্রেখট এবং তাঁর বার্লিনার এ্যাসেম্বল পার্টিকে লণ্ডনে সুস্বাগত জানান উচিত।

এই সময়টায় প্রত্যহ দুপুরে আমি ব্রিটিশ ড্রামালীগ লাইব্রেরীতে পড়তে যেতাম। লীগেরই গ্রন্থাগার থেকে 'থ্রীপেন ওপেরা, 'মাদার কারেজ' 'ককেশিয়ান চক সার্কল' প্রভৃতি নাটক পড়ি। এসব নাটকে একটা নতুনত্বের আস্বাদ পাই।

এই বছর আগষ্টমাসে দেখলাম লণ্ডনের রঙ্গ-জগতে বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে কারণ কাগজে খবর বেরিয়েছে যে ২৭শে আগষ্ট থেকে ব্রেখট্ পার্টি লণ্ডনের প্যালেস থিয়েটারে তিন সপ্তাহের জন্য কয়েকটি বিখ্যাত নাটক অভিনয় করবেন: এর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল ব্রেখটের নিজের লেখা Mother Courage এবং The Coucasiah Chalk Circle অভিনয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন—ব্রেখ্টের স্ত্রী বিখ্যাত অভিনেত্রী Helen Weigel.

১৯৫৬ সালের ১৪ই আগষ্ট ব্রেখট হঠাৎ মারা গেলেন তাঁর ইষ্ট বার্লিনের বাড়ীতে। তা সত্ত্বেও The Bereiner Ensemble তাঁদের পূর্ব সূচীমতই লণ্ডনে এসে অভিনয় করে গেলেন।

প্যালেস থিয়েটারে মাদার কারেজ দেখে এলাম। এধরণের প্রডাকসন এর আগে কখনও দেখিনি—চমৎকার নাটক—চমৎকার অভিনয় এবং প্রযোজনা। অভিনেত্রী হিসেবে আজকের ইউরোপে Helen Weigel এর জুড়ি মেলা ভার।

সপ্তদশ শতাব্দিতে জার্মাণী বলতে বোঝাত কতগুলি রাষ্ট্র এবং জমিদারীর সংঘকে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল আধুনিক ফ্রান্স ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়ার কিছু অংশ এবং সমগ্র বেলজিয়াম। এরা সবাই হাপস বার্গের সম্রাটের সার্বভৌমত্ব মেনে চলত। ইতিহাস-বিখ্যাত তিরিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮-১৬৪৮) বেধেছিল উত্তর ও মধ্য জার্মানীর প্রটেষ্টান্টদের সঙ্গে জার্মাণীর ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের। প্রটেষ্টান্টদের নেতৃত্ব ছিল সামন্ত রাজদের উপরে, আর ক্যাথলিকেরা পরিচালিত হয়েছিল স্বয়ং সম্রাটের দ্বারা। পরে সুইডেন যোগ দেয় প্রটেষ্টান্টদের পক্ষে এবং ফ্রান্স ক্যাথলিকদের দলে। এই ধর্মযুদ্ধে কোনপক্ষেরই কোন লাভ হয় নি। কিন্তু সমগ্র জাতি হিসাবে জার্মাণীর হয়েছিল পরম ক্ষতি। দেশের অর্ধেক লোক প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এই সর্বনাশা যুদ্ধে।

বারোটি দৃশ্যে নাটকটিকে ভাগ করা হয়েছে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে ব্রেখট তাঁর মাতৃভাষায় অর্থাৎ জার্মান ভাষায় নাটকটি লেখেন। এর ইংরাজী অনুবাদ করেন এরিক বেণ্ট্লে ১৯৫০ সালে। অর্থাৎ ঠিক যে সময় বেস্টলে ব্রেখটদের দলে কাজ করেছিলেন 'মাদার কারেজের মিউনিখ প্রডাকসনের জন্যে।

নাটকটির রচনায় ব্রেখট সামান্য সাহায্য নিয়েছেন সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একটি জার্মাণ বই থেকে। বইটির নাম হচ্ছে The lifc of the Arch Imposter and Adventures Courage এর লেখক Grimmuel-shasea। তবে তার থেকে বেশী সাহায্য পেয়েছেন অন্য একটি বই থেকে, এই বইটির নাম Simplicissimus the Vagabond.

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে মাদার কারেজের নায়িকার চরিত্র এবং তার জীবনের যে সব ঘটনাবলী নাটকে দেখানো হয়েছে, তা সমস্তই ব্রেখটের কল্পনা-প্রসূত। ছোট ছোট স্পষ্ট দৃশ্যে 'মাদার কারেজ' এবং তার সন্তানদের জীবন যাত্রার ধারা যেভাবে দেখানো হয়েছে, তার সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য দেখা যায় ফিল্ডিং এবং স্মলেটের স্কেচেসের সঙ্গে। বার্লিনার অ্যাসেম্বেনর অভিনীত 'মাদার কারেজে'র মঞ্চরূপে এই সব ছোট দৃশ্যগুলি যে কত বাস্তবানুগ এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সে নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

শুধু লাইট ও সাউণ্ডের সাহায্যে 'মাদার কারেজে'র একটি দৃশ্য যেভাবে দুরন্ত এবং কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ভাবটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল, তা না দেখলে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব।

চক সার্কলের কাহিনী নেওয়া হয়েছে একটি হারাণো চাইনীজ গল্প থেকে। গল্পটি এই: একজন বিচারকের কাছে একটি শিশুর মাতৃত্ব দাবী করে দুজন মহিলা এসে

উপস্থিত। একটি লাইন কেটে শিশুটিকে তার ওপর রাখা হল—দুজন মহিলা শিশুর দুহাত ধরে টানতে লাগলেন—আসলে যিনি মা—তিনি তার মাতৃত্বের শক্তিতে শিশুটিকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে জয়ী হলেন। In course of time the line of the original story became a Circle, and the line with which it was drawn, Chalk.

অবতরণিকা হিসাবে দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৪৫ সালে একটি উপত্যকার মালিকানা স্বত্ব নিয়ে দুটি সোভিয়েট কালেকটিভ ফার্মের মধ্যে গোলমাল সুরু হয়। ব্যাপারটা মিটমাট করবার জন্য তারা একজায়গায় এসে মেলে। তখন তাদের ওই পুরোণো চক সার্কলের কাহিনীটি বলা হয় নাটকের মাধ্যমে। অবশ্য এই কাহিনীর বিচার-পদ্ধতিটি এক্ষেত্রে বদলিয়ে দেওয়া হয়। শিশু মাইকেলকে তার ধাত্রীমাতা গ্রুসার কাছেই দিয়ে দেওয়া হল, কারণ তার আসল মা গভর্ণরের স্ত্রী নাটেলা বিপদের সময় শিশুটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই নাটকে ব্রেখ্‌ট যে নীতির প্রচার করেছেন তা হচ্ছে এই Everything should go to those who can serve it best তা জমির বেলাতেই হোক আর শিশুর বেলাতেই হোক।

Children to the motherly, so
that they grow up healthy
Waggons to good drivers ! so
that they he properly driven
and the valley to the irrigators
so that it bring forth fruit.

এবার অভিনয়ের কথা বলছি :

চক সারকল-এর চাষীদের বিয়ের দৃশ্যটার কথাই ধরা যাক। এমন সুন্দরভাবে একটি দৃশ্যের পরিকল্পনা এবং পরিচালনা ওয়েষ্ট এণ্ডের কোন থিয়েটারে আমি দেখিনি। ছোট একটি সেলের মত ঘরে ১০'×১০' ঠাসাঠাসি ভাবে ভর্তি হয়ে থাকে চব্বিশজন প্রতিবেশী. এবং একজন স্কটিশ পুরোহিত, এই পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ ঐ হাল্কা হাস্যরস পরিবেশন করবার চেষ্টা করেন অন্যান্য পরিচালকেরা—সেদিক দিয়েই যান নি ব্রেশট। দৃশ্যটিকে সবদিক দিয়ে বাস্তবানুগ করবার চেষ্টা হয়েছে—reality of a memorable and sculptural ruggedness.

ব্রেখট যে সব দৃশ্য পরিকল্পনা করেন তা ঠিক চোখে দেখে অল্পক্ষণের জন্য মোহিত হয়ে ভুলে যাবার মত দৃশ্য নয়। এসব খুঁটিয়ে দেখবার জিনিষ—রীতিমত ভরিয়ে তোলে চিন্তাশীল মনকে।

Steps বা Rostra'র দ্বারা মঞ্চকে তিনি একটা ভজঘট ব্যাপার করে তোলেন না ক[illegible]ও। মঞ্চসজ্জায় ধূসর এবং বাদামী রংয়েরই প্রাধান্য দেখা যায়। ষ্টেজের পেছনটা থাকে semi circuler এবং সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে মোড়া। ষ্টেজের ওপর খুব বেশী জিনিষ দেখা যায় না—চক সারকেলে দুটি তোরণ আর মাদার কারেজে ঢাকা ওয়াগনটি। ব্রেখট প্রযোজিত নাটকে চোখ-ঝলসানো কিছুই থাকে না—যা সত্যিকার কাজের দিক থেকে আবর্জনীয় তাই রাখা হয় সেটিংএ।

অভিনেতাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা। ককেশিয়ান চক সার্কল দেখে অবসার্ভার পত্রিকার বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক কেনেথ টাইনান লিখেছিলেন :

নাটকটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন প্রেক্ষাগৃহে আলো জলে উঠল, দর্শকের দলকে দেখে মনে হল একদল নির্জীব প্রাণহীন দর্জির দোকানের dummies। যারা এতক্ষণ ষ্টেজে অভিনয় করছিল তারাই যেন ছিল আসল রক্তমাংসের মানুষ এবং তাদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের অর্থাৎ ষ্টেজের বাইরের লোকেদেরই মনে হতে লাগল অবাস্তব এবং নকল। কথাটা খুবই সত্যি। ব্রেখট পার্টির অভিনেতাদের সঙ্গে ওয়েষ্টার্ন এক্টরদের তফাৎটা একেবারে মূলগত। বার্লিনের এই দল অভিনয়ের সময় একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দর্শকদের তাদের ব্যক্তিত্ব দেখাতে চায় না, বা মনোমুগ্ধকর অভিনয়ের দ্বারা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে না।

জার্মাণীতে ব্রেখটএর আগে যে প্রচলিত-রীতি অনুসারে নাট্য-প্রযোজনা হত, তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে ব্যারোক বা অত্যধিক সজ্জা এবং অলঙ্কারপূর্ণ ও আড়ম্বরে ভরা মঞ্চাভিনয়। এই রীতির চরম উৎকর্ষ এবং পরম পরিণতি দেখা দেয় রাইনহার্ডের প্রডাকসনে। রাইনহার্ডের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যারোক স্টাইল অব প্রডাকসনের অবসান হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তা হয়নি। দেখা দিল নাৎসী প্রবর্তিত নতুন ব্যারোক থিয়েটার। এধারার অভিনয় কিন্তু এখনও শেষ হয়ে যায় নি মঞ্চ থেকে।

এ ধরণের ক্ষয়িষ্ণু-অভিনয়-রীতিকে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা শুধু ব্রেখট প্রবর্তিত অভিনয়-রীতি বা প্রযোজনার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ব্রেখট নিজের প্রবর্তিত নাট্যাভিনয়ের নাম দিয়েছেন এপিক। এর কারণ তাঁর নাটক লেখবার ধারাটা হচ্ছে বর্ণনাত্মক ও দৃশ্য প্রধান কাহিনীর সমষ্টি। কাহিনী বলতে episodes কে বোঝাচ্ছে, প্লটকে নয়। এপিক শব্দটি এ্যারিস্টটলের থেকে নেওয়া—

—a form of narrative that is not tied to time, whereas 'tragedy' is bound by the unities of time and place.

এপিক শব্দটি ব্যবহার সম্পর্কে মনে রাখতে হবে

where English criticism uses the term to convey heroic scale, in Germany its primary meaning is a particular narrative form.

জার্মাণদের দ্বারা ব্যবহৃত এই বিশেষ অর্থেই ব্রেখটও এপিক শব্দের ব্যবহার করেছেন—

—a sequence of incidents or events, narrated without artificial restrictions as to time, place or relevance to a formal plot.

এপিক থিয়েটারে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার এবং আচরণের দিকগুলোও দেখানো হয়। কারণ সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণের দ্বারাই মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এপিক নাটকে এমনভাবে দৃশ্যগুলিকে রচনা করা হয়, যার ফলে নাটকের পাত্র-পাত্রী যে সব সামাজিক আইন-কানুন এবং রীতিনীতির পরিবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মঞ্চস্থ নাটকে। মানুষের আচার-ব্যবহার এবং আচরণ পরিবর্তনশীল—এ সবই একটা বিশেষ আকৃতি নেয় বিশেষ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে। কিন্তু আবার মানুষেরই ক্ষমতা আছে—ঐ সব অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশকে বদলিয়ে দেবার। অর্থভঙ্গ থিয়েটারের দর্শককে প্রশ্ন করুন, কি ভাবে তিনি থিয়েটার দেখেন। ঐ দর্শক বলবেন: অভিনেতার ভাব, আবেগ এবং অনুভূতি আমি থিয়েটার দেখবার সময় ঠিক তাদের মত করেই উপলব্ধি করি। আমার ধরণটাও এই রকম আর এইটেই ত স্বাভাবিক—চিরকাল এই ভাবেই থিয়েটার উপভোগ করব। নাটকের অমুক চরিত্রটির দুঃখ-দৈন্যের জীবন আমাকে উত্তেজিত করে, কারণ তাদের জীবনের সমস্যার কোন সমাধান নেই। এই হচ্ছে মহৎ শিল্প—এর ভেতর সব কিছুই স্পষ্ট। নাটকের পাত্রপাত্রীর কান্নার সঙ্গে আমি কাঁদি এবং তারা যখন হাসে তখন হাসি।

সেক্ষেত্রে একই প্রশ্নের উত্তরে এপিক থিয়েটারের দর্শক বলবেন: এমনটা যে হতে পারে তা কখনও ভাবিনি - চরিত্রটি যা কিছু করল, ওভাবে করাটা ঠিক হয়নি। ব্যাপারটা বড়ই শকিং—একেবারেই বিশ্বাস-যোগ্য নয়—এ ধরণের আচার ও আচরণ যে করেই হোক বন্ধ করা দরকার।

চরিত্রটির জীবনের দুঃখ-দৈন্য আমাকে উত্তেজিত করছে এই কারণে যে, তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, 'এই ভেবে'। আর এই কারণেই নাটকটিকে মহৎ শিল্প বলছি। আপনা থেকেই সব স্পষ্ট, এ ধরণের নাটক এটি নয়। পাত্রপাত্রী যখন কাঁদে, আমার হাসি পায়, তারা হাসতে থাকলে আমার চোখে জল আসে।

রচনার কারিগরীর দিকটা ছাড়াও সামাজিক জীবনের ওপর একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এই এপিক থিয়েটার। জীবনের সবকিছু সমস্যাকেই স্বাধীনভাবে এবং মুক্তকণ্ঠে আলোচনা করাই এপিক থিয়েটারের উদ্দেশ্য। দর্শকের মনে এই আলোচনার অবতারণা করেই সমাজ-জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট এবং গ্লানিকে অপসারিত করবার চেষ্টা করা হয় এপিক থিয়েটারে। চেষ্টা করা হয় সেইসব সমস্যার সমাধান করতে যা প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টি করছে জীবনের অগ্রগতিতে এবং যার সমাধানের জন্য দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং কলাবিদরাও সব সময়ই তৎপর।

এলিয়েনেশন এফেক্ট

এই পৃথকীকরণ (vertremdurg) রীতির আসল উদ্দেশ্য হল দর্শককে সব সময়েই তৎপর করে রাখা অনুসন্ধিৎসু করা যার ফলে ষ্টেজে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীকে সমালোচকের দৃষ্টিতে তারা বিচার করতে পারে। শিল্পানুমোদিত উপায়েই এসবের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন।

পৃথকীকরণকে কার্যকরী করতে হলে মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ থেকে যাদুকরী প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে দিতে হবে· থিয়েটারে যেমন সন্ধ্যেবেলায় কোনো একটি ঘর বা শরৎকালে একটি রাস্তা—এ ধরণের কোন প্রচেষ্টা করা হয় না—অথবা থিয়েটারের মত মুড তৈরী করবার দরকার হয় না সুরেলা সংলাপের সাহায্যে। অভিনেতা দর্শকদের ভাবাবেগের বন্যায় উত্তেজিত করে তোলেন না বা তাদের মধ্যে মায়ার জালবিস্তার করে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলতে চান না।

In this sort of acting where the transformation of the actor is incomplete three devices can contribute to the alienation of the words and action of the person presenting them.

1. The adoption of a third person.
2. The adoption of the past tense.
3. The speaking of stage directions and comments.

উদাহরণ স্বরূপ ককেশিয়ান চক সারকল এর একটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে গ্রুসা temptation of goodness এর ভাবটা অনুভব করছে অর্থাৎ সে প্রলোভিত হচ্ছে, পরিত্যক্ত শিশুটিকে তুলে নিতে, তাকে বাঁচাতে। এই সমস্ত দৃশ্যটিতে গ্রুসা মূকাভিনয় করে চলে এবং একজন গায়ক থার্ডপার্সন এবং পাষ্টটেন্সে বর্ণনা করে যায় গ্রুসা কি করছে। এই ভাবেই ব্রেখটিয়েন পদ্ধতি অনুসারে অভিনেতাকে মুক্ত করা হয় ষ্টানিসলাভাস্কি নির্ধারিত style of identification পদ্ধতির অভিনয় থেকে।

ব্রেখটের বর্ণনাত্মক নাট্য-রচনার ধারাকে ইউরোপে বলা হয় Narative realism, ন্যাচারালিজম্ বা স্বাভাবিকতাবাদ এবং সিম্বলিজম্ বা সাঙ্কেতিকতার মাঝামাঝি একটা স্থান নিয়ে রয়েছে এই বর্ণনাত্মক কাহিনী প্রধান (episode) বাস্তববাদ।

স্বাভাবিক পদ্ধতিতে একটি ঘরের ষ্টেজ-সেটিং করতে গেলে প্রডিউসার চান বাস্তবজীবনে যেভাবে ঘরটিকে আমরা দেখি ঠিক সেইভাবে মঞ্চে ঘরের দৃশ্যটি সৃষ্টি করতে—একমাত্র ঘরের চতুর্থ দেয়ালটিকে বাদ দিতে হয়। এই ঘরের দৃশ্যই আবার সিম্বলিষ্টিক প্রথায় অন্যরূপ ধারণ করে। কারণ এখানে প্রডিউসার চান ঘরের বিশেষত্ব কয়েকটি ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে—যেমন খাড়া ভাবে দুটি কাষ্ঠদণ্ড দাঁড় করিয়ে দিয়ে দরজার suggestion দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই Thoraton Wilder-এর নাটকগুলির কথা মনে হয়। এ ধরণের নাটকে প্রধানতই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাঙ্কেতিক দৃশ্য-সজ্জার দিকটা।

সাঙ্কেতিকবাদীরা মনে করেন যে, রিয়ালিজম্ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভেতর দিয়েই থিয়েটারের ভবিষ্যতের ইতিহাস তৈরী হবে। ব্রেখট অবশ্য এঁদের সঙ্গে একমত নন। তাঁর ধারণা যে, সাঙ্কেতিক পদ্ধতির ভেতর প্রকট হয়ে উঠে প্রডিউসারের শিল্পকৌশল ও শিল্প-চাতুর্য জাহির করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা। একটা চেয়ারকে মোটর গাড়ি হিসাবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে আর্থিক ও আর্টিষ্টিক ইকনমি হয় যথেষ্ট কিন্তু দর্শক বেচারীদের কল্পনাশক্তির উপর অত্যন্ত বেশী জুলুম করা হয়। এর থেকে সত্যিকারের গাড়ি দেখানোটাই সবদিক দিয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক।

ন্যারেটিভ—রিয়ালিষ্ট ঘরের দৃশ্য দেখাতে গিয়ে Plotographic representationও করেন না, ব অদ্ভুত সব সঙ্কেতের সাহায্যও নেন না। বাস্তব দৃশ্যে কয়েকটি খুব বাছাই করা জিনিষের সাহায্যেই তিনি মঞ্চসজ্জা করেন। ঘরের সমস্তটা না দেখিয়ে হয়তো একটা দিকের দেয়াল, দরজা এবং কিছু আসবাবপত্র সাজিয়ে দিলেন—অতি বাস্তবতাকেও পরিহার করা হল—আবার সাঙ্কেতিক কৌশলকেও প্রকট করে তোলা হয় না।

ব্রেখট বলেছেন যে সতেজ ও সুন্দর শব্দবিন্যাসের সাহায্যেও alieuation সৃষ্টি করা যায়। এই কারণেই প্রধানত তত্ত্বজ্ঞ হয়েও ব্রেখট নিজের কাব্যিক প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেননি। তাঁর সংলাপের কাব্যিক সৌন্দর্য পৃথকীকরণে সাহায্য করেছে।

ভাবাবেগকে alienate করতে যেমন কাব্যিক-সংলাপের ব্যবহার করেছেন ব্রেখট। সাধারণত থিয়েটারে যেভাবে সঙ্গীতের ব্যবহার হয়, which is simply to backup the dialogue to heighten the mood, ব্রেখটের সঙ্গীত তার বিপরীতধর্মী।

Orthodox theatrical music duplicates the text. It is stormy in stormy scenes quite in quite seenes. It adds A to A in a Brecht play, the music is supposed to add B to A.

Thus A is alienated and the texture of the work is enriched. Music can of course provide the sheerest alienation--through beauty and on occasion the beauty can have a special alienating point.

একটি ভারি অর্থপদ জার্মান শব্দ দ্বারা ব্রেখটএর নাটকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। শব্দটি হচ্ছে 'versuche' এর অর্থ হচ্ছে 'প্রচেষ্টা' এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। ব্রেখটও চাইতেন যেন ঠিক এইভাবেই তাঁর কর্মধারার বিচার করা হয়।

সাধারণতঃ পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকার মনে করেন যে, তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রযোজনা এবং মঞ্চ প্রয়োগের সময় নাটকটি কেমন দাঁড়ায়, দর্শক কিভাবে তাকে গ্রহণ করে, এইসব দিকগুলোই ব্রেখটকে বেশী আকর্ষণ করতো। যে কারণে নাটকটি লেখা, সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল হল সেইদিকেই তিনি বেশী নজর দিতেন।

ব্রেথট বিশ্বাস করতেন, যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজ-বিজ্ঞানের দ্বারাও জগতের যথেষ্ট উন্নতি এবং সংস্কার হওয়া সম্ভব।

ব্রেথটের মতে সাধারণতঃ প্রত্যেক সমাজেই একদল স্বার্থান্বেষী লোক থাকে—সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারে যাদের স্বার্থে ঘা লাগতে পারে এবং তারাই সাধারণত সমাজ-ব্যবস্থার পরিমার্জন এবং পরিবর্তনের বিরোধী হয়। বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির দৃষ্টিতে তারা কখনও সমাজ-ব্যবস্থার বিচার বা বিশ্লেষণ করে না। এদেরই বিরুদ্ধে ব্রেথটের অভিযান। কিভাবে এইসব দিকে মানুষের চোখ খুলে দেওয়া যায়, যার ফলে বর্তমান জগতের সবরকম অব্যবস্থা সম্বন্ধে তারা সজাগ এবং সচেতন হয়ে উঠতে পারে, এই ছিল নাট্যকার ব্রেথটের সাধনার বিষয়।

প্রভাত

নীরেন্দুকুমার হাজরা

কবে কোন্ অতীতের সুন্দরী রমনী
গড়েছিল এ-পৃথিবী বুকে মধু ভার
জানিত কি কভু হায়—অশ্রুর সাগরে
জীবন ও যৌবনের যত কিছু ধ্বনি।
তীব্রতর জ্বালা বুকে অভাগী রমণী
তাই বুঝি পথ হাঁটে মৃত্যুর গহ্বরে
যুগ হতে যুগান্তর! ক্ষুধার জঠরে
যন্ত্রণার নবস্বাদ—চঞ্চল ধমনী।

পবিত্র জাহ্নবী-ধারা দু'চোখে মাতার
উন্মত্ত পৃথিবী তবু রক্তে টলমল
হিংসায় ক্ষুধার রাজ্যে বেদনা অপার
নব জন্ম তবু তার নিত্য ঝলমল।

দাও না হে দেবী তব মৃত্যুর আস্বাদ—
আকাশে নক্ষত্র কত—কখন প্রভাত!

সমবায়ঃ ইউনাইটেড ষ্টেট্স ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা লেখকঃ জেরি ভুরিস এবং এ্যালি সি, কেলডার (জুনিয়র)। ৬৪ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রসুশোভিত।

এই সুমুদ্রিত সচিত্র পুস্তিকাটিতে নিজেদের কল্যাণসাধনে আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মানুষ কি ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে তার নিপুণ বিবৃতি আছে। ডি, আর গাডগিল-লিখিত ভূমিকাটি বাদে মোট এগারোটি পরিচ্ছেদে এই পুস্তিকায় আমেরিকার গণতন্ত্রে সমবায়ের সূচনা ও সম্প্রসারণসম্বন্ধে সহজবোধ্য চলতি ভাষায় ঝরঝরে বাংলায় অত্যন্ত উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ দেওয়ার পর ভারতে সমবায়ের অবস্থাও আলোচনা করা হয়েছে।

আমেরিকায় সমবায়ের ধীর ক্রমিক উন্নতি যে অত্যন্ত প্রশংসনীয় গতিতে সততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতে এ-ব্যাপারে আমরা খুব পেছনে পড়ে আছি। এ-সম্বন্ধে পরলোকগত অধ্যাপক আচার্য বিনয়কুমার সরকারের মত ছিল: আমরা ইউরামেরিকার ৫০-৭৫ বছর পশ্চাতে থাকি জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে। "সমবায়" লেখক আমেরিকান ভদ্রলোক দুজনের মতও প্রায় তাই। তাঁরা লিখেছেন: "১৯০০ সালের কাছাকাছি সময় যুক্তরাষ্ট্র সববায় আন্দোলন যে ভাবে গড়ে উঠেছিল বর্তমানে ভারতবর্ষেও সমবায় আন্দোলন ঠিক সেইভাবে গড়ে উঠছে।" অর্থাৎ আমরা ৬৭ বছর পেছনে রয়েছি!

জাপান বা পশ্চিম ইউরোপের মতো সততা ও দ্রুততার সঙ্গে সম্ভবপর না হলেও, আমরা আশা করব যে, লেখকদ্বয়ের মতো শুভার্থীদের সহযোগিতায় ভারতেও সমবায়ের দ্রুত উন্নতি হবে। এই তথ্যসমৃদ্ধ রচনাটির প্রতি সমবায়ের ব্যাপারে উৎসুক বাঙালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এমন তথ্য-পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচারের জন্যে ইউসিস কর্তৃপক্ষও সকলের ধন্যবাদভাজন হবেন।

শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সন্ধানী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ প্রথম খণ্ড	বৈশাখ, ১৩৭৪	১ম সংখ্যা

নব বর্ষ

নূতন বৎসরে দেশবাসীর মনে স্বভাবতই নূতন আশা ও প্রেরণার কথা জাগ্রত হয়। বাংলা দেশের মানুষ বিগত বহু বৎসর ধরিয়াই প্রগতির ক্ষেত্রে উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্য স্থলে পৌছান ভুলিয়া একভাবে একই অবস্থায় কোন প্রকারে দিন গুজরান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিখিয়া আসিতেছেন। এই বাঁচিয়া থাকাটা ক্রমশঃ এতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে যে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংঘাতের প্রতিক্রিয়ার ফলে জাতীয় চরিত্রের মাধুর্য্য ও উৎকর্ষ নষ্ট হইয়া গুণবৈষম্যের একটা প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া বাংলার নরনারী অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা হারাইয়া আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহারা ভাবে কর্ম্মচেষ্টা করিয়া ক্রমাগত শুধু আহত হইয়া আরম্ভস্থলে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন। বিফলতা একটি সর্ব্বগ্রাসীরূপ ধারণ করিয়া জাতীয় জীবন এতই বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে যে বাংলার প্রতিভা আজ গতিহীন, প্রেরণা আড়ষ্ট। কার্য্য বিশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্য অনিশ্চিত। শরীর ও মনের যে ঐশ্বর্য্য শতাধিক বর্ষকাল বাংলাকে ভারতে তথা বিশ্বে একটা বিশেষ স্থান দিয়াছিল, তাহার পরিচয় এখন আর বাংলার কোথাও পাওয়া যায় না বলিলে ভুল হইবে। শরীরের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পূর্ব্বের/ তুলনায় হৃতশক্তি হইয়া গিয়াছে বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বাংলার যুবশক্তি এখন পূর্ব্বের মতন ক্ষমতা দেখাইতেছে। যথা পর্ব্বত আরোহণ কিংবা সন্তরণে বাঙ্গালী সম্প্রতি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে অনেকে পদব্রজে লাসা গমন বা মানস সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বর্ত্তমানের তুলনায় বিশেষ কোন আয়োজন না করিয়া বা কাহারও সাহায্য না লইয়া অজানার পথে অগ্রসর হইতেন। তাহা হইলেও এখনকার দুঃসাহসের কার্য্যগুলি বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। ক্রীড়া ও যুদ্ধক্ষেত্রেও বাঙ্গালী কর্ম্মক্ষমতা দেখাইতেছে, কিন্তু আধুনিক পরিস্থিতিতে তাহা আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। সহস্র সহস্র নরনারী এখনও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধকার্য্যের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারেন ও তাহা করিলে তাঁহাদিগের ও জাতির উন্নতিও লাভ হইতে পারে। যন্ত্রশিল্পী ও কর্ম্ম-কৌশলী মানুষ বাংলায় কম নাই। তাঁহাদিগের কর্ম্মশক্তিও আছে কিন্তু সুযোগ ও ব্যবস্থার অভাবে তাঁহারা আজ বিভ্রান্ত। তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব আছে। যাঁহারা সামনে আসিয়া দেখা দিতেছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই পেশাদার ব্যবসায়ী শ্রমিক নেতা অথবা রাজকর্ম্মচারী। ইঁহাদিগের আদেশ বা উপদেশ

মানিয়া চলিয়া বাংলার কর্মী লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইতে সক্ষম হইতেছেনা। কর্মের ক্ষেত্রেও মূলধন, মালমশলা, শ্রমশক্তি ব্যবহার ও বস্তুক্রয় বিক্রয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতেছেনা। বাঙ্গালীর নিজের মূলধন নাই বা থাকিলেও কারবারে সহজে নিযুক্ত হয় না। অবাঙ্গালী স্বভাবতই নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে তৎপর ও আগ্রহশীল। সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদ বাক্যে উচ্চস্থান পাইলেও কার্য্যত বিশেষ অগ্রগামী নহে। সমবায় রীতি ব্যবসাক্ষেত্রে সক্ষম পদ্ধতি বলিয়া প্রমাণ হয় নাই। অর্থাৎ, বাস্তব জীবনে কর্মক্ষমতা শক্তি কৌশল ও জ্ঞান থাকিলেও বাঙ্গালী এখন আর পূর্ব্বকালের মত স্বার্থ ত্যাগী ও মহৎ চরিত্র নেতাদিগের প্রদর্শিত পথে চলিয়া জাতিগতভাবে উন্নতি করিতে পারিতেছেনা। তাহার একটি প্রধান কারণ বাংলার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আজ যে সকল আদর্শ নেতাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বাংলার বা বাঙ্গালীর উন্নতির সহিত সম্বন্ধ বর্জিত। কংগ্রেসী আদর্শ বাংলাদেশেও বাংলাকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয় নাই। ভাষার প্রসার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত স্থান না দিয়া নিচে নামাইবার চেষ্টাই সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে করা হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদিগের গুণাগুণ অনুপাতে তাহাদিগের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। ব্যবসা ও চাকুরীর বাজারেও বাঙ্গালীকে সাহায্যের পরিবর্ত্তে দমন করিবার চেষ্টাই লক্ষিত হইয়াছে। সঙ্গীত, নাট্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির আসরে বাঙ্গালীকে নানান প্রকার বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজ প্রাপ্য পাইতে হইয়াছে ও বহুক্ষেত্রে যাহা পাওয়া উচিত তাহা বাঙ্গালী না পাইয়া দিন কাটাইয়াছে। একটা বাঙ্গালী বিরুদ্ধতা বৃটিশ আমল হইতেই ভারতের রাজদরবারগুলিতে চালিত হইয়াছিল। স্বদেশী যুগের আরম্ভ হইতে তৎপরবর্তী ৩০।৩৫ বৎসরকাল বৃটিশ বিদ্বেষ জাত বাধা বর্ত্তমান থাকিলেও বাংলার মহামানবগণ সেই সকল অন্তরায় অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় চিন্তায়, অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায়, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, নাট্যে, শিক্ষায়, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে এবং কৃষ্টি ও কর্ম্মের নানান ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান তাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালীকে জীবনপথে দিক্‌ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন তাঁহারা উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পোষণ করিতেন; ঘোলাটে ও ছায়াচ্ছন্ন চিন্তার অনুসরণ করিয়া হাবুডুবু খাইবার লোক তাঁহারা ছিলেন না। সেই কারণে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া বাংলার জনসাধারণ নিজেদের জাতীয় গৌরব অকলঙ্কিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরের যুগের মানুষ আগের মত আর স্থির লক্ষ্য ভাবে চলিতে পারেন নাই। কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কি ব্যবসায়ে অথবা কৃষ্টির আসরে, আমরা পূর্ব্বের সেই প্রতিভা বা কর্ম্মক্ষমতা আর দেখিতে পাই নাই। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ একে একে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। যাঁহারা তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিলেন, তাঁহারা কিছুটা দেশ জাতি ভুলিয়া অপর লোকের তুষ্টির জন্য কার্য্য করিলেন এবং কিছুটা বিদেশীর অকারণ অনুকরণ করিয়া একটা উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি করিলেন। যে বাঙ্গালী পূর্ব্বকালে অপরের পথ প্রদর্শক ছিল সে এখন তোষামদকারী সভাসদের স্থান গ্রহণ করিল কৃষ্টির আসরে যে সকল মহামানব ভারতের প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়া আনিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল এবং সাহিত্যে চিত্রকলায়, সঙ্গীতে ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে এক অনুকরণবহুল বিজাতীয়তা প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। বৃটিশ যুগে যাঁহারা সাহেবিয়ানা করিয়া নকল ইংরেজ হইবার আগ্রহে মাতিয়া উঠিতেন ও বিশ্বের নিকট নিজেদের হাস্যাস্পদ করিতেন, আজ তাঁহাদেরই আদর্শে কতশত নকল আমেরিকান, নকল রুশীয়ান, এমন কি নকল চীনাও বাংলার তথা ভারতের বক্ষে বিচরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকেই যাইতেছে। শিক্ষিত ও কার্য্যে সুদক্ষ বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে, কিন্তু নানাভাবে তাহাদিগকে নিজ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। কংগ্রেসী শাসকগণ বাঙ্গালীর কোন দাবী কখনও মিটান নাই, এখনকার অকংগ্রেসী শাসকগণ নূতন পথে চলিতেছেন কি না বলা যায় না। মনে হইতেছে যেন ১৩৭৪ পূর্ব্বকার কয়েক বৎসরের মতই দীনতাক্লিষ্ট থাকিয়া যাইবে।

নববর্ষে আজ তাই আমরা সেই সকল মহাপুরুষকে স্মরণ করিতেছি যাঁহারা পূর্ব্বকালে বাংলা দেশ ও জাতিকে গৌরবদীপ্ত করিয়াছিলেন। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ,

অবনীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, প্রভৃতি মানব শ্রেষ্ঠ-জনের জীবন ও কর্ম্ম আলোচনা করিলেও নূতন প্রেরণালাভ সম্ভব হয়। বিদেশীর প্রেরণা প্রাণবান হইয়া আমাদিগের প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে এই আশা করা ভুল। কাহারও কাহারও প্রাণে বিজাতীয় ভাব পূর্ণ হইয়া উঠিলেও, জাতিগত-ভাবে অনেকের মধ্যে তাহা হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে অপরের সভ্যতা ও চিন্তার ধারাকে অনুকরণের খাল কাটিয়া নিজদেশে আনা অসম্ভবের অনুসরণ। মানব সভ্যতা ও প্রগতি শতসহস্র বাস্তব ও মানসিক অবয়বের উপর নির্ভরশীল। এই সকল বাস্তব অবয়ব বা ভাবধারা ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া মানব জীবনের উপর অধিক হইতে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে এবং সভ্যতাব গতি ও শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া মানব জীবনকে উন্নত হইতে উন্নততর করিতে সক্ষম হয়। ঐতিহ্যকে অবহেলা করিয়া সভ্যতার স্রোতের বিপরীত পথে জীবনধারা চালাইবার ইচ্ছা মানব জীবনের প্রাণবস্তুকে অগ্রাহ্য করা ও তাহা সর্ব্বদাই জীবনগতি আড়ষ্টকর ও প্রগতিনাশক। অর্থাৎ যে সভ্যতা আত্মদর্শনের উপরে গঠিত ও যে সভ্যতায় মানব প্রাণের অন্তরতম যাহা তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বাস্তব পথে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা ও রীতি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সভ্যতাকে যদি হঠাৎ উল্টা পথে চালাইয়া বস্তুপ্রধান ও শুধু বাস্তবের আঘাত প্রতিঘাত চালিত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতীয় মানব মনের গভীরতম আবেগ চালিত। বাস্তবের আকর্ষণ ও তৎসংক্রান্ত প্ররোচনাসৃষ্ট যে অগভীর আবেগ তাহা বস্তুরই মত ক্ষণস্থায়ী। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার জন্ম ও বিলোপ ঘটে। মনের অনুভূতি ও উপলব্ধির বিচার অপেক্ষা দাঁড়িপাল্লা ও গজ-কাঠির বিচার শ্রেষ্ঠ একথা জড়বস্তুর ওজন ও দৈর্ঘ সম্বন্ধেই খাটে। সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, ন্যায় কিম্বা দর্শনের বিচারে সে কথা খাটিবে না। মানবতার উচ্চতম আদর্শ ও সভ্যতার উন্নততম অভিব্যক্তি লইয়া আলোচনা করিলে সে ক্ষেত্রেও বস্তু বিচারের পদ্ধতি ব্যবহার সম্ভব হইবে না। এই কারণে যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতাকে পাশ্চাত্য ছাচে ঢালিয়া নূতন আকার দিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ হইলে সেই নূতন সভ্যতার মধ্যে ভারতের প্রতিভা বা প্রেরণার কোনও চিহ্ন আর দেখা যাইবে না। সেই কারণে এই নূতন বৎসরের আরম্ভে আমরা অন্তরে এই আশা পোষণ করি যে আমাদের ভবিষ্যত যেন অতীতের সহিত সকল বন্ধন ও যোগ অটুট রাখিয়া পূর্ণ গৌরবে প্রাণবান হইয়া উঠিতে পারে।

বাঙ্গালীর বিশেষত্ব

বাংলাদেশে অনেকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা বিদেশী-দিগের চিন্তার ধারা, কৃষ্টি ও আদর্শকেই বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছিলেন। মনে মনে তাঁহারা বাঙ্গালী নহেন অর্থাৎ বাংলার মাটি বাংলার জল ও বাংলার শস্য শ্যামল পরিবেশ তাঁহাদিগের প্রাণে মাতৃ ক্রোড়ে বসিবার আনন্দ দেয় নাই। উদ্ভট কল্পনার রথে তাঁহারা চিরদিন শুধু ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুশ ও চীনে ভ্রমণ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টায় জীবন কাটাইয়া দেন। এইরূপ স্বজাতির বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া অপরের অনুভূতিকে নিজের প্রাণে একান্ত নিজের করিয়া জাগাইবার চেষ্টা একপ্রকার মানসিক ব্যাধি সন্দেহ নাই, এবং ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে ইহা আত্মহীনতা বোধ হইতেই উদ্ভূত; কোন উচ্চ আদর্শজাত নহে। বাংলা দেশে আমরা সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, কারুশিল্প, অলঙ্কার, বস্ত্র খাদ্য, বিলাস বস্তু প্রভৃতি কোন কিছুর অভাব দেখিনা। আমরা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি মহামানবদিগের আবির্ভাব এই বাংলা দেশেই দেখিতে পাই। সাহিত্যে কাশীরামদাস, কৃত্তিবাস ওঝা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যিকদিগের পরিচয় পাই। চিত্র কলায় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, গগনেন্দ্র নাথ, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ প্রমুখ শিল্পীদিগের কথা আমরা অহঙ্কার করিয়াই বলিয়া থাকি। অতীতে পাল ও সেন যুগের শিল্পীগণের ভাস্কর্য্য ও তৎপরে বিষ্ণুপুর ও অপরাপর স্থলের পোড়ান মাটির মূর্ত্তি ও চিত্রশোভিত ইষ্টকাদি বিশ্বের শিল্প গুণগ্রাহীদিগের দ্বারা বিশেষ ভাবে আদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। বাংলার পট-শিল্প বস্ত্র বয়ন কৌশল কাঁথা শেলাই রন্ধন ও ভোজন-

পাত্রের নক্সা প্রভৃতি সমঝদার মহলে উচ্চাঙ্গের শিল্পাদর্শ পরিচায়ক বলিয়াই পরিচিত। সকল কিছুর উপরে রহিয়াছে বাঙ্গালীর রসবোধ, অন্তর্দর্শন ক্ষমতা কল্পনা ও উদ্ভাবনশক্তি। বাংলার অভিনেতা ও অভিনেতৃদিগের ক্ষমতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যুগে বাংলায় সুরুচি ও সুন্দরের সম অভিব্যক্তি পৃথিবীর শিল্পে, সাহিত্যে, নাট্যে, নৃত্যে ও সঙ্গীতে একটা নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের তিরোধান হইবার পরে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মহাকবির নিকটস্থ শিষ্য ও সহচরদিগের চেষ্টায় বাংলার সভ্যতার এই ধারা অনেকাংশে সুরক্ষিত হইতেছিল। বর্ত্তমানে এই সুকৃষ্টির আদর্শ নষ্ট করিয়া সেইখানে স্বদেশী ও বিদেশী উৎকট কল্পনা ও তাহার নিকৃষ্ট অভিব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রকটহইয়া উঠিতেছে। ইহার মূলে আছে রসবোধকে ও সাক্ষাৎ অনুভূত প্রেরণাকে বিসর্জ্জন দিয়া কষ্টকল্পিতভাবে অনুসরণ ও সৃজন চেষ্টা। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে অক্ষমের সক্ষমতার অভিনয় আজ ভারতের সর্ব্বত্র নিদারুণ অভাব ও কষ্টের সৃষ্টি করিয়াছে; জাতীয় সভ্যতার অপরাপর অঙ্গেও সেই একই অক্ষমতা প্রকটভাবে ব্যক্ত হইয়া কৃষ্টি বিপর্য্যয় আনয়ন করিতেছে। কিন্তু যে অভিব্যক্তি মানবাত্মার সত্য অনুভূতিকে বিদ্রূপ করিয়া অসত্যকে অবলম্বন করিয়া নবনব ভঙ্গীতে রূপ ধারণ করে তাহাকে কৃষ্টির ক্ষেত্রে সাজান মিথ্যা ব্যতীত অপর নাম দেওয়া চলে না। এমন কি অপরিণত বুদ্ধি বালক বালিকা কিম্বা মূর্খ মহলে সেই সকল ভঙ্গীর আদর হইলেও তাহার প্রকৃত মূল্য কিছু থাকেনা। বাঙ্গালী চিরকালই আসল ও নকলের পার্থক্য পরিষ্কার বুঝিয়া আসিয়াছে। মিথ্যা আগ্রহ, মিথ্যা বিক্ষোভ বা অন্য কোনও মিথ্যা ও সাজান মনোভাব বাঙ্গালীর নিকট অধিককাল ধরা না পড়িয়া চলিতে পারে না। যে কৃষ্টি স্বাভাবিক ও সহজভাবে গৃহীত ও আদৃত হয় না, তাহা বাংলায় ইস্তাহার জারি করিয়া বা জোরালভাবে ঘোষণা করিয়া জনপ্রিয় করিয়া তোলা যায় না। ইংরেজ একসময় খুবই ব্যয়বহুল ও জোরালভাবে বাংলায় বিজাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রচলন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া ধর্ম্ম ও দর্শনে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলার নবজাগরণের যুগ ঐ সময়েই আরম্ভ হয়। রামমোহনের পরবর্ত্তি যুগের বাঙ্গালীরা সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সমাজসেবায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও কৃষ্টির বিভিন্ন অঙ্গে নিজেদের বিশেষত্ব উত্তম রূপেই প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আজ যদি ইংরেজের ভারত বিজয়ের অনুকরণ অপর জাতিরা পরোক্ষভাবে করিবার চেষ্টা করে আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে সে চেষ্টা বাংলায় সফল হইবে না। কোন কোন জাতি কি ভাবে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে তাহা আমরা অনেকটা জানি, এবং তাহার আলোচনা অতঃপর করিবার ইচ্ছা আমাদিগের আছে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বাঙ্গালীর নিজের সত্য অনুভূতির সহিত নিজের গভীরতর পরিচয় হওয়া। বাঙ্গালী যদি নিজের নিজত্ব ভুলিয়া অন্তরে পরদাসত্ব স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে প্রথমে তাহার সেই দাসত্ব হইতে মুক্তি কি উপায়ে হইবে সেই কথাই উঠিবে। যে গুপ্ত ও প্রকাশ্য প্রচার কিছুকাল হইতে বাংলায় চলিতেছে তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া তাহার উচ্ছেদ প্রথমে করিতে হইবে। পরে অন্য কথা।

শিক্ষার নূতন আদর্শ ও পদ্ধতি

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ক্রমবর্দ্ধনশীল। বহু দেশে শিক্ষা অল্প বয়সে বাধ্যতামূলক এবং কোন কোন দেশে তাহা না হইলেও শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব নাই। জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি টান নানান দেশে নানান প্রকার দেখা যায় এবং শিক্ষার বিস্তার ও ব্যবস্থাও দেশবাসীর আগ্রহের উপর অনেকটা নির্ভর করে। যথা ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিক্ষা লাভ ইচ্ছা সমান নহে। কোথাও কোথাও লোকেরা শিক্ষার অভাব বোধ করেন না এবং কোথাও আবার শিক্ষালাভের আগ্রহ প্রবল দেখা যায়। শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি উন্নততর করিতে পারিলে মানুষের মানসিক বিকাশ যে পূর্ণতর হয় একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ ক্ষমতার সহিত শিক্ষা দিবার আদর্শ ও পদ্ধতির যদি কোন সমতা না থাকে, অর্থাৎ ছাত্রের বুদ্ধির তুলনায় যদি শিক্ষা-

পদ্ধতি কঠিন ও বিষয় অবোধ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে উন্নত আদর্শ ও পদ্ধতি স্থল বিশেষে শিক্ষার অবনতির কারণ হইতে পারে। সুতরাং সাধারণ ভাবে বলিতে হয় যে কোনও দেশেই সকল লোককে কোন একটা বিশেষ উপায়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাচেষ্টা সফল না হইতে পারে। অনুর্বর ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য যদি শুধু অতি উত্তম উপায়েই সক্ষম হয়, উর্বর ক্ষেত্রে তাহা অন্যভাবে করিয়াও অধিক ফল পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। এই কারণে সকল ক্ষেত্র ও সকল ফসল সম্বন্ধে এক নিয়ম চলিতে পারে না। স্থান, কাল ও পাত্রের পার্থক্য শিক্ষার ক্ষেত্রে যেরূপ লক্ষিত হয় ও যে ভাবে তাহা শিক্ষা কার্য্যকে প্রভাবিত করে অন্য বিষয়ে তাহা ততটা দেখা যায় না। এই কারণে সুশিক্ষক ছাত্র অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কেহ এক বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারে অথচ অপর বিষয়ে পারেনা এবং কাহাকেও এক উপায়ে শিখান সহজ হয় এবং কাহাকেও হয় অপর উপায়ে। এই সকল কারণে শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রবিচার করিয়া ব্যবস্থা করাই শ্রেয়। এক ঔষধে যেমন সকল রোগ সারান যায় না; এক রীতি অনুসরণ করিয়া তেমনি সকল বিষয়ও সকল ব্যক্তিকে শিখান যায় না। এই কথাটা সকল শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধেই খাটে, সে পদ্ধতি যতই উন্নত আদর্শে রচিত হোক না কেন! একটা মূল উপাদান যাহা না থাকিলে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হইতে পারে না, হইল অর্থ। অর্থ না থাকিলে শিক্ষালয় নির্ম্মাণ, শিক্ষার আয়োজন, শিক্ষক নিয়োগ, পুস্তক ও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রভৃতি কোন কিছুই হইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে অর্থই হইল শিক্ষার প্রধান অস্ত্র। ইহার দ্বারা বুঝিলে চলিবে না যে অর্থ যত অধিক ঢালা যাইবে শিক্ষাও ততই উন্নত হইবে। কারণ কোন কোন দেশে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে-রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, অপর দেশে সেই তুলনায় অল্প অর্থ ব্যয় করিয়াই ব্যবস্থা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। তবে একথা মানিতে হইবে যে অতি অল্প ব্যয়ে কেহই শিক্ষা-দান ব্যবস্থা উত্তমরূপে করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। নানান দেশের শিক্ষাদানের খরচ দেখিলে বোঝা যায় যে দেশগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অধিক খরচের দেশ, মাঝামাঝি খরচের দেশ এবং অল্প খরচের দেশ। যে সকল দেশে ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য মাথা পিছু গড়পড়তা বৎসরে ১০০০ হইতে ২৫০০ টাকা ব্যয় করা হয় সেগুলিকে অধিক খরচের দেশ বলা চলে। যথা ক্যানাডা কিম্বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। মাঝারি খরচের দেশে ঐভাবে খরচ হয় ছাত্র পিছু ৫০০ হইতে ১৫০ টাকা। ব্রহ্মদেশ, চিলি ও কিউবা এই সকল দেশের মধ্যে পড়ে। অল্প খরচের দেশ হইল সেইগুলি যেখানে ছাত্র পিছু বৎসরে ৩০ টাকা হইতে ৯০ টাকা অবধি খরচ করা হয়। যথা ব্রেজিলে ৩০ টাকা, আরজেন্টিনায় ৪৩ টাকা, ভারতে ৬৩ টাকা ও চীনে ৯০ টাকা। একটি স্কুলে যদি ৪০০ জন ছাত্র পাঠ করে তাহা হইলে ভারতে তাহার জন্য সরকারী খরচ হইতে পারে বৎসরে ২৫২০০ টাকা অর্থাৎ মাসে ২১০০ টাকা। অন্ততঃ ১৫ জন শিক্ষক, দুই একজন কেরাণী, দুই একজন ভৃত্য ও তাহা ব্যতীত গৃহের ভাড়া, আলোক ইত্যাদির খরচ, পুস্তকাগার, খেলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার চিত্র ও যন্ত্রাগার প্রভৃতির জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়। খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকিলে আরোও উত্তম। শুধু ১৫ জন শিক্ষককে উপযুক্ত বেতনে রাখিলেই খরচ মাসে ২১০০ টাকার অধিক হওয়া সম্ভব। অতঃপর কেরানী ও ভৃত্যাদিগের জন্য মাসে ৪০০ টাকা, গৃহের ভাড়া ইত্যাদি ২০০ টাকা হইতে ৪০০ টাকা, অপর খরচ অন্ততঃ মাসিক ১০০ টাকা হইবেই। সুতরাং দেখা যায় যে সরকারী ব্যয় যাহা হয় তাহার সহিত উপরের তত্ত্বাবধানের খরচ (overheads)" যোগ দিলে মোট খরচ মাসে ৪০০ জন ছাত্রের জন্য ২১০০ টাকা না হইয়া ৪২০০ টাকা হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ মাথাপিছু সরকারী খরচের অতিরিক্ত ৪।৫ টাকা মাসে ব্যয় হইলে তবে শিক্ষা ব্যবস্থা কোনপ্রকারে চলিতে পারে। এই ৪।৫ টাকা বেতন হিসাবে যদি আদায় করা হয় তাহা হইলে গরীব দেশের পক্ষে তাহা অত্যধিক বলিতে হইবে। কারণ এক ব্যক্তির যদি তিনটি পুত্রকন্যা পাঠশালায় গমন করে তাহা হইলে তাহাকে বাৎসরিক যদি ১৫০ টাকা পাঠশালার বেতন দিতে হয় ও পুস্তক, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদিতে

হয় আরও ৫০ টাকা, তাহা হইলে সে ব্যক্তির রোজগার বাৎসরিক ১০০০।১৫০০ টাকা হইলে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে। পিতামাতা ও তিন সন্তানের খাওয়ার খরচ দৈনিক আটআনা হারে বাৎসরিক মোট খরচ হইবে ৯১২॥০ (যদি কেহ দৈনিক আটআনায় খাইতে পারে) বস্ত্র ইত্যাদি ৫০। ঔষধ ও চিকিৎসা ৫০। বাড়ীভাড়া ১২০। যাতায়াতের খরচ ৫০। সামাজিক খরচ ৫০। পাঠের ব্যবস্থা ১৫০। মোট ১৩৮২॥০। প্রথমতঃ ঐরূপ অল্প খরচে কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ লক্ষ লোকের বাৎসরিক আয় ১০০০ টাকার কম হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষা বিনাখরচে না হইলে, হইবে না বলিয়া ধরা যায়। এবং ভারতের বহু বালক বালিকা যে নিরক্ষর থাকিয়া যাইতেছে তাহার কারণও পিতামাতার অর্থাভাব ও সরকারী খরচের স্বল্পাভাব।

অতএব যদি কেহ ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নততর করিতে চাহেন তাহা হইলে সে উন্নতি কাহারও মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না; পারে জাতীয় টাকার থলি হইতে। অধিক চিনি ঢালিলে অধিক মিষ্টতালাভ হয়। পুরাণ কথা। বিনা খরচে শিক্ষা, চিকিৎসা, দেশরক্ষা, কোন কিছুই হইতে পারেনা। খরচ বৃদ্ধি অর্থে বুঝিতে হইবে আয় বৃদ্ধি। জাতির আয় বাড়াইতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা না করিয়া আয় বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। সেই সকল চেষ্টাই তাহা হইলে সকল সমস্যা সমাধানের মূল কথা।

সাধারণতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠতন্ত্র

সাধারণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির অর্থাৎ অন্তত সকল সাবালক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থায় একটা মত প্রকাশ ও অনুমোদনের অধিকার সৃষ্টি করা। ইহাদ্বারা প্রমাণ হয় যে শাসনকার্য্য ব্যক্তির নিজ অনুমোদিত ও সম্ভব হইলে নিজের দ্বারা চালিত হওয়াই স্বাধীন দেশের জনসাধারণের রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনার আদর্শ। কোন এক দল বিশেষের কয়েকজন মাত্র লোক বুক্নি আওড়াইয়া অথবা বন্দুক দেখাইয়া রাষ্ট্র নিজ করায়ত্ত করিয়া লইবে ও পরে একটা লোক দেখান নির্ব্বাচনের অভিনয় করাইয়া দেখাইবে যে সকলের সম্মতি ক্রমেই রাষ্ট্র চলিতেছে এইরূপ ব্যবস্থাকে সাধারণতন্ত্র বলা চলে না। কিন্তু দাঁড়াইয়াছে তাহাই। রাষ্ট্রীয় দলগুলিতে যাঁহারা পালের গোদা তাঁহাদিগের কোন গুণ না থাকিলেও সাধারণকে মানিয়া লইতে হয় যে তাঁহারাই দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদিগের নির্ব্বাচিত প্রার্থীদিগকে নির্ব্বাচিত করিলেই দেশের শাসন কার্য্য শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের হস্তে ন্যস্ত হইতে পারিবে। আসল নির্ব্বাচনটা করিয়া থাকেন রাষ্ট্রীয় দলের পাণ্ডাগণ। পরে জনসাধারণ তাহার আইন অনুযায়ী সমর্থন মাত্র করিতে পারেন। অর্থাৎ যদি ধরা যায় যে দেশের জনসাধারণের শত করা একজন মাত্র লোক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলের অংশীদার হ'ন ও যদি কোন না কোন রাষ্ট্রীয় দল বা দলসংঘের হস্তেই রাষ্ট্রভার শেষ অবধি রক্ষিত হয়; তাহা হইলে ঐ শতকরা একজন লোকই বস্তুত রাজ্যশাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন দেখা যাইবে। সুতরাং দলগত রাষ্ট্রীয় অধিকার সীমাবদ্ধ না করিলে দলগুলির রাষ্ট্রীয় শক্তি লুণ্ঠন আগ্রহের ফলে অতি শীঘ্রই একাধিপত্য বা স্বৈরাচার ব্যতীত অপর শাসনতন্ত্র আর থাকিতে পারিবেনা। সাধারণতন্ত্র বলিয়া সত্যই কোন প্রতিষ্ঠান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দলের রাজত্বও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির রাজত্ব নহে; কারণ সকলেই জানেন রাষ্ট্রীয় দলের দলপতিগণ কোন কোন গুণের অধিকারী। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহারাই যাহারা মানব সভ্যতা ও প্রগতির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কৃষ্টি অর্থনীতি যন্ত্রবিদ্যা চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রাম ও নগর পরিচালনা, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি বহু বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে মানুষ দেশ শাসনকার্য্য উপযুক্তভাবে করিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেইরূপ মানুষ রাষ্ট্রীয়দলে প্রায় নাই বলিলেই চলে। যদি মাহিনা করা লোক দিয়া কাজ করান হয় তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তিও সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত লোক নহেন। কারণ অল্প বেতনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে না। সরকারী চাকুরেগণ এই কারণেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত নহেন। ইহার উপরেও আছে সরকারী চাকুরীর কর্ম্মপদ্ধতি। ইহা বৃটিশ আমলে প্রবর্ত্তিত ও এই পদ্ধতি কোন কাজ না করিবার বা না করিতে দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে সাধারণতন্ত্র বা অপর কোন তন্ত্র, যাহাই হউক না কেন, জনসাধারণের স্বায়ত্ত-

শাসন অধিকার বেদখল করিয়া অল্পসংখ্যক লোকের রাজত্ব স্থাপন করাই বর্ত্তমান কালের রাষ্ট্রনীতি, এবং ইহার মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় দলগুলির আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন, প্রচার ও অপরাপর ব্যবস্থা যদ্দ্বারা জনস্বাধীনতা নষ্ট করিয়া রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের রাজত্ব স্থাপিত হয়। যথা কম্যুনিষ্ট চীন দেশে দেখা যাইতেছে মাওৎ সে তুং ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত অন্য দলপতি ও তাঁহাদিগের অনুচরগণের মারপিট ও ঝগড়া। এই দ্বন্দ্বের যোদ্ধাদিগের সংখ্যা চীনের ৭৫ কোটি লোকের তুলনায় শতকরা এক জনও হইবে কি না সন্দেহ। অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশেও অল্পসংখ্যক লোকেই অপর সকল লোকের উপর প্রভুত্ব করেন। আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশেও অবস্থা ততটা খারাপ না হইলেও জনসাধারণের ইচ্ছাই শাসন কার্য্যে প্রধান একথা বলা যায় না। ধনপতিদিগের দ্বারা সমর্থিত রাষ্ট্রীয় দলের কখন একটি কখনও আর একটি শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাজকার্য্য চালাইয়া থাকে ও জনসাধারণ মাত্র শাসনের খরচ চালাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হন। পুরাকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষার বিস্তার এবং দারিদ্র্যের কিছুটা লাঘব হইলে সাধারণতন্ত্র নিজ অধিকার রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে. কিন্তু পরে দেখা যাইল যে সভ্যতার উন্নতি ও প্রসার হইয়া ব্যক্তির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার কিছুমাত্র বৃদ্ধিলাভ করিতেছে না। কারণ ঐ মধ্যস্থত্ব উপভোগী রাষ্ট্রীয়দলগুলি ও তাহার দলপতিদিগের একান্ত চেষ্টা যাহাতে জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে চিরকাল তাহাদেরই কবলে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

রাষ্ট্রগঠনের সময় সকল নিয়মকানুন উদ্দেশ্য ও আদর্শ রাষ্ট্রের মূল নীতি বলিয়া সংস্থিত হয় সেই কন্‌ষ্টিটিউশন রাষ্ট্রকে ভুলপথে চলিতে দেয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কন্‌ষ্টিটিউশনে রাষ্ট্রীয় দল গঠন ও গঠন করিয়া কন্‌ষ্টিটিউশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিফল করা সম্বন্ধে কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নাই। রাষ্ট্রীয় দলগুলি কি ভাবে গঠিত হইবে, কাহারা তাহার সভ্য, সভাপতি বা পরিচালক হইতে পারিবে, কি কি কার্য্যে তাহারা হাত লাগাইতে পারিবে বা পারিবে না এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহারা যে মিথ্যা প্রচার করিয়া বা উড়ো আদর্শ বিচার করিয়া সাধারণকে রাষ্ট্র শাসনের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না; এই সকল রাষ্ট্রীয় আদর্শ সংরক্ষণ ব্যবস্থা কন্‌ষ্টিটিউশনে নিবদ্ধ হওয়া অত্যন্তই আবশ্যক। নতুবা রাষ্ট্র বলিতে অদূর ভবিষ্যতে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির যথেচ্ছাচারের অস্ত্র ব্যতীত আর কিছু বুঝা যাইবে না। সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল মানবের সমান অধিকার, একথা কখনও কার্য্যত প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না যদি রাষ্ট্রীয় দলগুলি আজ গো পালক প্রধান, কাল কারখানার মজদুর প্রধান ও অপর সময়ে কৃষক, সৈন্য বা উদ্দাম চরিত্র যুবক প্রধান হইয়া দেখা দেয়। সাধারণতন্ত্র যদি সত্য আদর্শে চালিত হয় তাহা হইলে তাহাতে ধনিক, শ্রমিক, আইনজীবি চিকিৎসক যুবক ও বৃদ্ধের সমান দাবী সুরক্ষিত ভাবে বজায় রাখা হইবে।

শাসন অধিকার

যাঁহারা অভিজাত, অর্থাৎ যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশ পরম্পরায় অর্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, লোকবলে ও শক্তিতে অপর লোকেদের তুলনায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে দেশের শাসন কার্য্যে তাঁহাদিগের অংশ অপর লোকেদের অপেক্ষা অধিক থাকাই ন্যায্য ও বাঞ্ছনীয়। রাজ্য শাসন ক্ষমতা সাধারণ লোকের মধ্যে সুগঠিত ভাবে বর্দ্ধিত হয় না। আভিজাত্য ও শাসন ক্ষমতা একই গুণের দ্বিবিধ অভিব্যক্তি। প্রাচীনকালে এই জাতীয় কথায় লোকের বিশ্বাস ছিল। যাঁহারা সৈন্য এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা বলেন রাজশক্তি যুদ্ধবিদ্যা বর্জ্জিত ভাবে কখনও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না; সুতরাং সেনাপতি ও রাষ্ট্রপতি সৈন্য ও শাসক এই দুইয়ের মধ্যে এতই ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে সৈন্যগণই রাজ্যশাসনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। এই কারণে সামরিক শক্তি ও রাজশক্তি একাধারে থাকিলেই তাহা স্থায়ী হইতে পারে। দুর্ব্বল ও যুদ্ধ ক্ষমতা বর্জ্জিত মানব কদাপি রাজকার্য্যে অধিক দিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। হিটলার মুসোলিনী অথবা আয়ুব এই মতে বিশ্বাস করিতেন ও করেন। শিক্ষকগণ বলিতে পারেন যে বিদ্বান ব্যক্তিই রাজশক্তি লাভ করিলে রাজকার্য্য যথাযথভাবে চালাইতে পারিবেন এবং এই কারণে রাজকার্য্যে শিক্ষকদিগের স্থান অপরের তুলনায় উচ্চে হওয়া উচিত। আইনজীবিগণ বলিবেন যে ন্যায়বিচার ও রাজ্য শাসন কার্য্য প্রায় একই কার্য্য, সুতরাং আইনজীবিগণের স্থান রাজকার্য্যে উচ্চে থাকা প্রয়োজন। কৃষক বলিবেন চাষ না করিলে খাদ্য উৎপাদন হয় না এবং খাদ্য না থাকিলে সমাজ থাকিতে পারে না। অতএব সমাজে তথা রাষ্ট্রে কৃষকের স্থান বিশিষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেরানীগণ বলিবেন খাতা না লিখিলে রাজকার্য্য চলে না সুতরাং কেরানীরাজই শ্রেষ্ঠ রাজ।

আধুনিক যুগে সকল দেশেই কারখানার শ্রমিকগণ নিজ অধিকার ও বিশেষত্ব কীর্ত্তনে মুখর ও পারগ। যে দেশের জনসংখ্যার শতকরা দশজনও কারখানার শ্রমিক নহেন সে দেশেও শ্রমিকরাজ স্থাপনের কথা সর্ব্বত্র উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়। যাঁহারা এই প্রচার করেন তাঁহারা প্রায় কেহই কোন দিন কোন প্রকার শ্রমবহুল কার্য্য করেন নাই। তাঁহারা

হইলেন শ্রমিকদিগের নেতা ও সেই অধিকারেই মহা পরিশ্রমী। কারখানার শ্রমিকদিগের মানব সভ্যতা ও প্রগতির ক্ষেত্রে কি বিশেষত্ব সে কথার আলোচনা ইহারা করেন না। কোন বিচার না করিয়াই তাঁহারা জগতবাসীকে মানিয়া লইতে বলেন যে শ্রমজীবিগণই রাজশক্তির একমাত্র অধিকারী। যে শ্রমিক সিগরেটের কারখানায় কাজ করে ও লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার উপকরণ উৎপাদন করে অথবা যে মদ্য বা অপর কোন বস্তু তৈয়ার করে তাহার রাজ্যাধিকার কেন অপরকে মানিতে হইবে তাহা অবশ্য সাধারণ লোকের বোধগম্য হইবে না। তেল সাবান জুতা দাঁত মাজার বুরুষ বা ঐ জাতীয় অপর বস্তু উৎপাদন করিলে উৎপাদক কি ভাবে রাজশক্তি পাইতে বিশেষভাবে উপযুক্ত প্রমাণ হন তাহাও বুঝা কষ্টকর। কৃষকদিগের মধ্যে অনেকের কাজ পান তামাক, গাঁজা আফিং প্রভৃতি উৎপাদন করা। এই কৃষকগণই বা কি ভাবে মানব সভ্যতা ও প্রগতি চালিত রাখিতেছেন ও তাঁহারাই বা কেন রাজা হইবেন তাহাও সহজে বোঝা যায় না। এক কথায় কোন প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহাতে রাজশক্তি কেন উৎপাদকের প্রাপ্য হইবে ইহার কোন অর্থ হয় না। সকল মানবের রাজশক্তির অধিকার আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু সকল মানব শ্রমজীবি বা কৃষক নহেন। তাহা হইলে রাজশক্তি শুধু কৃষক ও শ্রমিকদিগের হস্তে কেন যাইবে? মানুষ শুধু মানুষ বলিয়াই রাজ অধিকার দাবী করিতে পারে। সে উচ্চবংশীয় কিম্বা উচ্চশিক্ষিত বলিয়া রাজশক্তি লাভ করিতে পাবে না। অথবা সে যুদ্ধ করে মাছ ধরে, চাষ করে এবং জুতা সেলাই করে বলিয়াও তাহাকে রাজাসনে বসান যাইতে পারে না। মানুষের মনুষ্যত্বই তাহার শ্রেষ্ঠ গুণ। সে কি উৎপাদন করে বা কি করিতে পারে তাহা দিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিচার করা যাইতে পারে না। অনেকে বলেন মানব সমাজে শ্রেণী বিভাগ থাকা উচিত নহে। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কৃষক শ্রমিক, জননেতা বা কারাগারের কয়েদী বলিয়া কোন শ্রেণী বিভাগ থাকা উচিত নহে। ধনিক ব্যবসাদার, মালিক বা বেতনভোগীর বিভেদও থাকা উচিত নহে। আইনতঃ এই সকল বিভেদ গ্রাহ্য হয় না অর্থাৎ আইনের চক্ষে সকল মানুষই সমান। সুতরাং আইন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলে ও রাখিলেই শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হইতে পারে। ধনপতি জননেতা থাকিবে না ইহাই সামাজিক নিয়ম হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক মাত্রই যদি অ্যারিসটটল প্লেটো সোক্রাটিস অথবা শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি ও চাণক্য হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিশেষ স্থান দিলে মানবসমাজ উপকৃত হইত। যোদ্ধামাত্রই যদি দুর্ব্বলের রক্ষা ও দুষ্টলোকের দমন করিতেন ও মানুষের উপর জোর জুলুম করিয়া নিজের সুবিধা না করিয়া লইতেন তাহা হইলে যোদ্ধারাজ উন্নতিকর হইতে পারিত। অভিজাতগণ যদি সকলেই বুদ্ধ অশোক বা স্যর গ্যালাহাড হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের রাজও উত্তম হইতে পারিত। কৃষক ও শ্রমিকগণও যদি বিশেষ করিয়া ধর্মপ্রাণ ও পরহিতকারী হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের রাজ অধিকার মানা যাইতে পারিত। ধনপতি ও ব্যবসাদারগণও যদি জনহিত ও মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের অধিকার নিজ হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। কিন্তু অভিজাত ও ধনিকগণ শুধু নিজের শক্তি ও সুবিধা দেখিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহাদিগের রাজত্বের অবসান হইতেছে। শ্রমিকগণও দেখা যাইতেছে নিজেদের সুবিধা ও শক্তিই চাহিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহারা যে বিশ্বমানবের হিতাকাঙ্খী তাহা চীনের পন্থায় পরদেশ লুণ্ঠন করিয়া প্রমাণ করিলে বিশ্বমানব তাঁহাদিগেব মঙ্গল অভিযানের সত্যতা স্বীকার করিবেন না। শ্রমিক শিক্ষক ও কেরাণীদিগের বেতন যদি অধিক করিয়া বাড়ান হয় এবং কৃষকের আয় যদি অল্প থাকিয়া যায় তাহা হইলেও কৃষকের সহিত শ্রমিকের মিলন ক্ষণস্থায়ী হইবে। সংখ্যা দিয়া যদি রাজশক্তি কাহার কতটা থাকিবে স্থির করা হয় তাহা হইলে ভারতে কৃষকই সংখ্যাগুরুত্বের জন্য রাজত্ব করিবে। তাহা হইলে আলুর ক্ষেত্রে কার্য্য করিলে কারখানার কার্য্যের তুলনায় অধিক বেতন পাইবার ব্যবস্থা হইবে। গায়ক চিত্রকর ধর্ম্মযাজক সুপকার মহাপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞজনের সে তুলনায় অবস্থা খারাপ হইতে পারে। কিন্তু জননেতাগণ পরিশ্রমজীবি হইলেও তাঁহারা আরামে থাকিবেন বলিয়া মনে হয়।

আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে যে মানবসমাজে রাজশক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীর হস্তে রাখা মঙ্গলজনক নহে। অভিজাত ও যোদ্ধাগণ রাজশক্তি লাভ করিয়া শুধু নিজেদের সুবিধাই করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমানে যে কৃষক শ্রমিক রাজ স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহাও মানবহিতসাধক হইবে না যদি কৃষক ও শ্রমিকগণ শুধু নিজেদের সুবিধাই করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। সেই রাজত্বই স্থায়ী ও জনমঙ্গলকর হইবে যাহাতে ন্যায় ও সত্যই উচ্চতম স্থান পাইবে। সংখ্যাগুরুত্বের বা নেতৃত্বের দাবী কিছু থাকিবে না, থাকিবে শুধু সভ্যতা ও প্রগতির দাবী। এই কথা মানিয়াই রাজ্যশাসন কার্য্য চলিবে যে আর্থিক লাভই সভ্যতা বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায় নহে এবং কাহারও বেতন বৃদ্ধি হইলেই তাহার উন্নতি হইতেছে এ কথা সত্য না হইতে পারে। জনমঙ্গল কি এবং সভ্যতার প্রসার কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে এই সকল কথাই রাজকার্য্যের সার কথা। কে বা কাহারা লাভবান হইবে ইহা ভাবিয়া রাজকার্য্য চালাইলে সে রাজত্ব প্রাচীন রাজত্বগুলির মতই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ফ্রাঁসোয়া মোরে "থেরেসা"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নোবেল-প্রাইজ-বিজয়ী ফরাসী ঔপন্যাসিক ফ্রাঁসোয়া মোরে (Francois Mauriac) থেরেসা উপন্যাসে নায়িকার চরিত্র এঁকেছেন সুনিপুণ শিল্পীর তুলির টানে টানে। থেরেসা যাকে বিয়ে করলো সেই বার্ণার্ড একজন পাকা 'ফিলিষ্টাইন' যার imagination-এর কোন বালাই নেই। চারদিক বাঁচিয়ে, হিসাবী বুদ্ধি নিয়ে, বাঁধা-ধরা রাস্তায় চলতে অতি সাবধানী বার্ণার্ড অভ্যস্ত। সব সময়ে সে ব্যস্ত, সব সময়ে সে serious. বার্ণার্ড বই পড়ে না; নিজের মন দিয়ে সে ভাবে না; অন্যের ব্যক্তিত্বে তার কোন শ্রদ্ধা নেই। সে সমস্ত কিছুর বিচার করে পারিবারিক মর্য্যাদার মাপকাঠি দিয়ে। সে কি করবে, না করবে তা আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে। He always knows what's got to be done. কোন সমস্যা উপস্থিত হলে পরিবার থেকে যা করা সমীচীন ব'লে বিবেচিত হবে বার্ণার্ড তার একচুল এদিক ওদিক যেতে প্রস্তুত নয়। যার চেতনার ক্ষেত্র নানা ভাবের সংঘাতে জটিল, একটা কাজের অনুকূলে যুক্তি থাকা সত্ত্বেও সেই কাজের বিপক্ষে যুক্তিগুলি যার দৃষ্টি এড়ায় না, উভয় এবং ওপোর দুটো দিকই ভেবে যে কাজ করে তার মনকেই ideal sort of mind বলা যায়।

এ রকমের একজন থাক্কার হাতে পড়ে' থেরেসার মনে হোলো—তার জীবন বন্দিনীর জীবন। চারদিকে তার পাথরের দুর্ভেদ্য দেয়াল। ঘরে তালা লাগানো। দাম্পত্য জীবনের এই কারাগার থেকে তার মুক্তির পথ সকল দিক থেকেই বন্ধ। মানুষটার মধ্যে ভালোবাসার নামগন্ধ নেই। বার্ণার্ড থেরেসার মন চায় না, তার দেহটা নিয়ে সে উন্মত্ত। আত্মকেন্দ্রিক স্বামীর কামনার উদ্দাম ঝড়ের মধ্যে থেরেসা যেন আলিঙ্গনবদ্ধ শব। বিছানায় চুপ-চাপ পড়ে আছে; নিথর, নিস্পন্দ, শরীর ঠাণ্ডা যেন বরফ। হঠাৎ কখনো কখনো থেরেসাকে দেখে বার্ণার্ড চমকে ওঠে! যে নারীর দেহটা নিয়ে সে এমন মত্ত হয়ে আছে সেই থেরেসা কি তার আনন্দের বিন্দুমাত্র অংশীদার? স্ত্রীর অণুমাত্র ভালোবাসার সে কি অধিকারী হতে পেরেছে? বার্ণার্ডের মনে হয়, সে একা! থেরেসা দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছে—মৃতের সামিল! সমুদ্রের বেলাভূমিতে শুয়ে আছে এক নারীর মৃতদেহ—তরঙ্গ যাকে বহন করে এনেছে! নিঃসঙ্গ বার্ণার্ড ভোগ-বতার তীরে থমকে দাঁড়ায়।

আর থেরেসার কি মনে হয়? হায়রে কামাতুর বার্ণার্ড! দেহের লালসায় মানুষের চরিত্রে কী নিদারুণ বিপর্য্যয়ই না ঘটায়! পুরুষকে একদম পশু বানিয়ে দেয়! তার মনুষ্যত্বের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না! নারী হয়ে যায় পুরুষের শীকার! রাতের পর রাত থেরেসার জীবন কাটে মুখোস-পরা প্রেমের অভিনয় করে! কোন্ সুদীর্ঘ সুরঙ্গপথের সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রেলগাড়ীর কামরায় সে চলেছে! এ অন্ধকারের কখনো কি অবসান নেই? থেরেসার পাশে ঘুমিয়ে আছে সাতাশ বছরের যে আত্মসর্বস্ব ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষটা তার কাছ থেকে যদি সে চিরদিনের জন্যে মুক্তি পেতো! তাকে যদি বিছানা থেকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতো বাহিরের ঐ নিঃসীম অন্ধকারে! অসুস্থ বার্ণার্ডের জন্য ওষুধ ঢালতে ঢালতে থেরেসা ভাবেঃ বেশ হোতো যদি ওষুধ কাজ না করতো!

হতভাগিনী থেরেসার মনে অনবরত আনাগোনা করে মুক্তির স্বপ্ন। বিবাহিত জীবনের অন্ধকারময় সুরঙ্গ-পথের প্রান্তে পৌঁছে গেছে থেরেসা। চারিদিকে তার দিনের আলোর প্লাবন। মুখে লাগছে অবাধ প্রান্তরের নির্মল স্নিগ্ধ সমীরণ। শরতের শিশিরসিক্ত তরুপল্লবের রূপে চোখ জুড়িয়ে যায়। সুগন্ধি ঘাসের শ্যামলিমায় এত মাধুর্য্য।

শ্বশুরবাড়ীর কেউ থেরেসাকে বোঝে না। তাদের

জগত আর থেরেসার জগত—এ দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য! থেরেসার প্রখর বুদ্ধি শাণিত ছুরির মতোই ঝকঝকে। হৃদয়ে তার কুসুমের কোমলতা! শ্রদ্ধায় আর করুণার মিশ্রণে থেরেসা—আসল থেরেসা তৈরী। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা জীবনের স্থূল আনন্দ নিয়ে আছে। তাদের কাছে ব্যক্তির রুচিগত আচরণগত স্বাতন্ত্রের কোনই দাম নেই। পরিবারের শান্তি, পরিবারের গৌরব, পরিবারের সুখসম্পদ, পরিবারের ঐতিহ্য—এরাই সব। এই প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে স্বামীর সান্নিধ্যে যদি সে একটা নিভৃত আশ্রয় খুঁজে পেতো। কিন্তু হায়রে থেরেসার পোড়াকপাল! রাতে ঘুমের ঘোরেও স্বামী তার দেহের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়—থেরেসার মন পাওয়ার দিকে তার কোন খেয়ালই নেই। আর দিনের বেলায় বার্ণার্ড বন্দুক নিয়ে বনে-বাদাড়ে খালেবিলে পাখী শীকার করে বেড়ায়।

এমনি একটা অলস্ত অতুগৃহে যার বসতি অথচ মনের মধ্যে গতিশীল আনন্দময় মুক্ত জীবনের স্বপ্ন সে মরিয়া হয়ে এ কী কাণ্ড করে ফেললো! স্বামীর ক্লেদাক্ত আলিঙ্গন পাশ থেকে চির-মুক্তির আশায় থেরেসা পেয়ালায় স্বামীর ঔষধের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বিষ মিশিয়ে দিতে লাগলো। এই বিষ-প্রয়োগের কাহিনী পরবর্তীকালে থেরেসার নিজের মুখেই ব্যক্ত হয়েছে নিম্নলিখিত সকরুণ ভাষায়: "তোমাকে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে সমস্ত শীতকাল আমি একজন মানুষের পেয়ালায় আর্সেনিক মিশিয়ে দিতাম নিয়মিত ভাবে। আমি ছিলাম সেই মানুষটার বন্দিনী। চারিদিকে পাথরের দেয়াল—এমন একটা কারাকক্ষ থেকে হয়তো বা আমি বেরিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু সেই মানুষটার বন্ধনজাল ছিন্ন করে আমার বেরিয়ে আসবার কোনই উপায় ছিলনা।"

থেরেসা ধরা পড়ে গেল। তাকে আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারকের কঠিন কঠিন প্রশ্নবাণের সম্মুখীনও হতে হোলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে আইনের কবল থেকে মুক্তি পেলো তারই স্বামির সাক্ষ্যের জোরে। মাতৃহীনা থেরেসা আদালতের বাইরে এলো তার বাবার সঙ্গে। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে এই প্রেমহীন পৃথিবীতে কোথায় গিয়ে সে আশ্রয় নেবে? থেরেসা ঠিক করলো স্বামীর কাছেই সে ফিরে যাবে। সেখানে তার কোলের ছোট্ট মেয়েটাকে সে ফেলে এসেছে। স্বামী কি তাকে বুঝবে না? বুঝে কি তাকে ক্ষমা করবে না? ট্রেনে চেপে থেরেসা ফিরে চলেছে পতিগৃহে। সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন তার নিঃসঙ্গ জীবন শুকিয়ে মরুপ্রান্তরের মতো খাঁ খাঁ করছে। বেঁচে থেকেও সে বেঁচে নেই। থেরেসা জীবন্ত থেরেসা, পরিত্যক্তা থেরেসা, কলঙ্কিনী থেরেসা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মৃত্যুর অভিশাপ আকণ্ঠ পান করছে! কতদূরে ফেলে এসেছে থেরেসা তার নিষ্কলঙ্ক কুমারী জীবনের সেই আলোঝলমল অনাবিল দিনগুলিকে। কী নিদারুণ অন্তহীন শূন্যতার বেদনায় থেরেসার সমস্ত ভবিষ্যৎ ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। স্বামী যদি তাকে ক্ষমা না করে—সে নিষ্ঠুরতাও তার সইবে। সে তার সমস্ত অনুভূতিকে নির্মম ঔদাসীন্যে অসাড় করে দেবে। থেরেসা পৃথিবীতে থাকবে উদাসীন পাষাণ অহল্যা হয়ে!

থেরেসা যদি এই সঙ্গীহীন পৃথিবীতে একজন মানুষেরও সহানুভূতির স্পর্শ পেতো! কারও কাঁধে মাথাটি রেখে মনে করতে পারতো, এই হৃদয়হীনতার মরু-সাহারায় অন্ততঃ একটি মানুষও আছে যে তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে! বার্ণার্ড সমস্ত ভুলে গিয়ে থেরেসাকে কি অসীম ক্ষমায় আপনার বাহুচ্ছায়ায় গ্রহণ করতে পারেনা? ক্ষমাসুন্দর চোখে একটিবার যদি বার্ণার্ড তার দিকে তাকায়, শুধু নিঃশব্দে তাকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেয়—সব গ্রন্থি একনিমেষে খুলে যায়! অকূলে থেরেসা কূল পায়!

দুরু দুরু কম্পিত বুকে থেরেসা স্বামীর গৃহে প্রবেশ করলো! স্ত্রীর দিকে বার্ণার্ড একটা বারের জন্য ফিরেও চাইলোনা। তার ভাবভঙ্গী দেখেই থেরেসার আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল! এ কার করুণার উপরে থেরেসা নিজেকে নিক্ষিপ্ত করবার স্বপ্ন দেখছিল? থেরেসা এতক্ষণ কল্পনা দিয়ে যে বার্ণার্ডকে তৈরী করেছে সে অন্তকে বুঝবার অন্ততঃ চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীকে দেখেই থেরেসা বুঝতে পারলো, বার্ণার্ড এমন একজন মানুষ যে জীবনে নিজের

বাইরে কখনো আসেনি, নিজেকে অন্যের অবস্থায় ফেলে তার আচরণ বুঝবার কখনো চেষ্টা করেনি, যে সারাজীবন নিজেকে কেন্দ্র করে একটা বাঁধা-ধরা পথে শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে! থেরেসার মুখ থেকে স্বতঃই বেরিয়ে এলো, "বার্ণার্ড, আমাকে তোমার দৃষ্টি-সীমার বাইরে চলে যেতে দাও। কঠিন জবাব এলো কঠিন পুরুষের মুখ থেকে: নির্লজ্জ, বেহায়া মেয়ে, আবার কথা বলছো? চুপ করে থাকো। তোমার কাজ শুধু শোনা, আমার হুকুম তামিল কর; আমার সিদ্ধান্ত অমোঘ। থেরেসার হাসি পেলো বুদ্ধির দিক দিয়ে, ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়ে মানুষটা একদম অপদার্থ—অথচ কথাগুলো যেন নেপোলিয়নের অথবা লেনিনের মতো! যেন সিংহ চর্ম্মাবৃত একটা গর্দ্দভ! লোকটা একটিবারের জন্যেও বুঝলোনা, আঘাতের পর আঘাতে সে তার সহধর্ম্মিণীর জীবন একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, দাম্পত্যজীবনে সে কেবল নিজের প্রবৃত্তির চরিতার্থতা খুঁজেছে থেরেসাকে আঘাতের পর আঘাত দিতে দিতে এমন একটা জায়গায় এনে ফেলেছিল সেখানে একটা অন্ধকূপের অবরোধের মধ্যে তার দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। She Poisoned her husband because for his brutal lust, because under his roof she was baried alive and she lifted the stone which was keeping 'her' from air. জীবদ্দশায় যাকে বলে কবরস্থ হওয়া—থেরেসা স্বামীর বাড়ীতে ছিল সেই কবরের মানুষ। ঘরের সেই কবরের মুখে বার্ণার্ড ছিলো যেন একটা বিশমুণে পাথর। সেই জগদ্দল পাথরটাকে সরিয়ে ফেলে উপরের মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল থেরেসা। থেরেসার জায়গায় নিজেকে ফেলে তার হৃদয় দিয়ে সমস্ত বেদনাকে অনুভব করার মতো কল্পনাশক্তির বিন্দুবিসর্গও বার্ণার্ডের মধ্যে ছিল না। থেরেসার পক্ষ থেকেও কোন কথা বলবার থাকতে পারে এবং তার কথাটাও ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনে একটা সিদ্ধান্তে আসাই যুক্তিসঙ্গত—এই বোধই ছিল না বার্ণার্ডের নির্ভীক মন দিয়ে স্বাধীনভাবে সমস্ত সমস্যার, সমস্ত আদর্শের বিচার করতে গেলে যে-বুদ্ধির প্রয়োজন, যে অকুণ্ঠ বিচারশক্তি দরকার তা যদি বার্ণার্ডের থাকতো। তবুও সে যে থেরেসাকে বাঁচানোর জন্য তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিলো সে পত্নীর প্রতি প্রেমের বশে নয়। for the honour of the family I consented to cheat justice. থেরেসার দিকে চেয়ে নয়, থেরেসার প্রতি নিজের দুর্ব্যবহারের কথা ভেবে নয়, সেই অসংখ্য দুর্ব্যবহার থেরেসাকে একটা চূড়ান্ত পথ নিতে বাধ্য করেছে—এ কথা চিন্তা করেও নয়,—কেবল পরিবারের সম্মান যাতে অটুট থাকে তারই জন্য বার্ণার্ড আদালতে অপরাধিনী স্ত্রীকে নিরীহ বলে সাক্ষ্য দিয়েছে। থেরেসা শেষপর্য্যন্ত বার্ণার্ডের চাপে পড়ে যে-জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে তার বর্ণনা দেবার প্রয়োজন নেই। এই পর্য্যন্ত বললেই যথেষ্ট হবে যে এত লাঞ্ছনার পরেও থেরেসা স্বামীকে ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। প্যারিসের নরসমুদ্রের মধ্যে বার্ণার্ড থেরেসাকে রেখে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। তখনও যদি বার্ণার্ড বলতো "সবকিছুই মার্জ্জনা করলাম, চলো বাড়ী ফিরে চলো" তবে থেরেসা সানন্দে স্বামীর অনুগমন করতো। তবুও থেরেসা বললো, বার্ণার্ড, আমি যা করেছি তার জন্যে আমার অনুতাপের সীমা নেই। বার্ণার্ড শুধু বললো, সে পুরানো কথা তুলে আর কোন লাভ নেই।"

থেরেসার জীবন একটা ট্রাজেডি। জীবনের একটা, একটামাত্র চরম ভুলে নরকযন্ত্রণা সে ভোগ করে গেল। প্যারিসে একাকজীবনে তার সেই শূন্য সন্ধ্যাগুলি! নির্জ্জন রাত্রিগুলির সেই দুঃসহ নিঃসঙ্গতা! প্রাণ ভরে সে ভালো বাসতে চেয়েছিল কাউকে, যার কাছে সে নিজেকে পরমানন্দে নিবেদন করে দেবে। কিন্তু যারা তার প্রেমের জীবনে এসেছে তারা শেষপর্য্যন্ত তাকে নিয়ে এসেছে সাহারার অনুর্ব্বর ধূসরতায়। কর্দ্দমাক্ত নর্দ্দমায় তাকে নিক্ষেপ করেছে তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে। ট্রেনে যখন ফিরেছে থেরেসা মেয়ের সঙ্গে নিজের বাড়ীতে, দেখলে প্রেমিকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা কন্যা কাঁদছে। অত দুঃখের মধ্যেও মা মেয়েকে বলছে: "সে তোমার কাছে ফিরে আসবে। তখন তাকে এতবেশী ক'রে পাবে যে হাঁপিয়ে উঠবে। তখন দেখতে পাবে, সে আর সকলেরই মতো— just a great, coarse male!" স্থূল প্রকৃতির আত্ম-

কেন্দ্রিক পুরুষদের প্রেমের অভিনয় ধরে ফেলতে থেরেসার বিলম্ব ঘটেনি!

কিন্তু যে-ভালোবাসা থেরেসার রক্তে বারে বারে আগুন জ্বালিয়েছে সেই ভালোবাসার প্লাবন থেরেসাকে যখন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তখনও করুণাকে বলি দিয়ে নিষ্ঠুর কাজ করতে তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করেছে। বাইশ বছরের তরুণ জর্জ থেরেসার কাছে প্রেম নিবেদন করলো। থেরেসার উপবাসী হৃদয়েরও নিবিড় আকর্ষণ ছিল জর্জের প্রতি। কিন্তু সপ্তদশী কন্যা মারিয়াকে মা হয়ে কেমন ক'রে থেরেসা জর্জ থেকে বঞ্চিত করবে। তাই নিজের মনের গভীর কথাটা গোপন ক'রে থেরেসা বললো তার ভালোবাসার ভিখারীকে: তুমি তো মাত্র কুড়ি, আমি চল্লিশ উৎরে গেছি। মানবদেহের এ ভগ্নাবশেষ নিয়ে তোমার কোনই লাভ নেই।" তারপর স্বামীকে বিষ দিয়ে মারতে যাওয়ার কাহিনী যে সত্য—এ কথা বলতে থেরেসার প্রতিটা শিরায় টান পড়লেও সে শেষ পর্যন্ত ব্যক্ত করলো জর্জের কাছে। এ স্বীকারোক্তি তো জর্জকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যেই। কন্যার জীবনকে সুখী করবার জন্য থেরেসা তার সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। একটা জ্যোতির্ময় নির্মল অনাসক্ত জীবন যাপন করবার জন্য থেরেসা নিজের বিরুদ্ধে নিজে কী প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে গেছে।

যে-থেরেসা হৃদয়হীন ইন্দ্রিয়াসক্ত অন্তঃসারশূন্য স্বামীর ভালোবাসার রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাবার আশায় তাকে বিষ দিয়েছিলো তার শেষ জীবনের দুঃখে আমরা তার সঙ্গে কাঁদি, কর্মফলকে মানুষ যে এড়াতে পারে না, এটা বুঝি কিন্তু থেরেসাকে কোনক্রমেই ঘৃণা করতে পারিনে। টলস্টয় এ্যানাকেরেনিনাকে রেলগাড়ীর চাকার তলায় ফেলেছেন। ম্যাথুআর্নল্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, Poor Anna! ফ্রাঁসোয়া থেরেসাকে পাগলিনী করেছেন যেমন বঙ্কিমের শৈবলিনী। পাগলিনী থেরেসার দিকে চেয়ে একটা মন্তব্যই কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে: Poor Therese.

থেরেসা কাউকে পরিত্যাগ করেনি। মেয়ের কাছে জীবনের নিগূঢ় বেদনাকে ব্যক্ত করেছে থেরেসা। From the day I was born I've always been the one who was left. জন্মরাত্রে জননী থেরেসাকে ছেড়ে গেল। স্বামীকে নিয়ে নীড় বাঁধবার মিনতিতে বার্ণার্ড কান দিলো না। আমরা নিশ্চয়ই থেরেসাকে পরিত্যাগ করবো না। অপরাধ করেছিল যে থেরেসা তাকে ছাড়িয়ে আছে আর এক থেরেসা—the real Therese, এই আসল থেরেসা পজ্ঞার আলোয় দীপ্তিময়ী, অন্যের কল্যাণ করবার জন্য নিজের স্বার্থ এবং আত্মাভিমানকে বলি দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। অপরাধ শুধু তার অস্তিত্বের একটা প্রান্তকে স্পর্শ করেছে। থেরেসার অন্তরের গভীরে "a depth of purity unmovable!" সেই পবিত্রতার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায় কালি দেবে কে? The man is more than his actions. মানুষের কাজের মধ্যে তার আসল সত্তার কতটুকু ধরা পড়ে? থেরেসার সমস্ত অপরাধকে অতিক্রম ক'রে তার ব্যক্তিত্ব বা personality জেগে রয়েছে আত্মার চির নির্মল সজীবতার মধ্যে। তার সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের কাউকে পাকে টানবার সে চেষ্টা করেনি। এমন কথা আমরা অসঙ্কোচে বলতে পারি যে, একজন মানুষ সম্পর্কে আর-একজন এমন সব মন্তব্য করতে পারে যে-মন্তব্যগুলি পরস্পরবিরোধী, তবুও সেই পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের মধ্যে একটা গভীর মিল থাকতে পারে! ওটা তো কেমনভাবে আলোচ্য চরিত্রের ওপরে আমরা আলোকপাত করি সেই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যে-থেরেসা স্বামীকে বিষ খাওয়ালো সেই থেরেসাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার জো নেই। কিন্তু যে-থেরেসা কোনরকমের নির্বুদ্ধিতাকে সহ্য করতে পারে না, নিজেকে প্রতারিত করতে যে একান্ত নারাজ, করুণার বশে যে-নিজেকে নির্মমভাবে বলি দিতে পারে, চিন্তার স্বাধীনতায় যে নির্ভীক—সেই নারী কি essential Therese নয়? আর বার্ণার্ড? সমাজের চোখে সে একজন উদারচেতা ভদ্রলোক যে অপরাধিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করলো না। কিন্তু আসল বার্ণার্ড, the real Bernard যে একজন হৃদয়হীন, dull and unimaginative philistine আর যে-

মানুষ হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ করুণার দীপ-শিখা জ্বালিয়ে না রাখে, যার চেতনায় অত্যুগ্র হয়ে আছে শুধু স্বার্থ-চিন্তা সে তো মৃতেরই সামিল! নিষ্করুণ বার্ণার্ড টাকা এতই ভালোবাসে যে মৃত্যুপথযাত্রিনী স্ত্রীর শেষ অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করলো। আর মানুষের জীবনের চেয়ে টাকার মূল্য যাদের কাছে বেশী তারা তো রাস্কিনের ভাষায় শয়তানেরই বান্দা। তাই সমাজের চোখে যে-বার্ণার্ড একজন কর্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোক আসলে সে একজন অতি অপদার্থ, স্বার্থসর্বস্ব, আত্মাভিমানী হৃদয়হীন, আত্মসুখপরায়ণ বর্বর ছাড়া আর কি? গাঁয়ের রাস্তায় বার্ণার্ডের ঘোড়ার গাড়ীগুলো যেমন লিক ধরে চলতে অভ্যস্ত তার জীবনও তেমনি বাঁধা-ধরা রাস্তার একচুল বাইরে যেতে নারাজ। নতুন রাস্তায় চলতে, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সমস্যার বিচার করতে সে ভয়ে শিউরে ওঠে। আসলে বার্ণার্ড একটা বুড়ো খোকা যার personality বলে কিছু নেই। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, He needed the clearly marked ruts, করুণার তো বিন্দুবিসর্গও নেই বার্ণার্ডের হৃদয়ে। আর প্রজ্ঞা এবং করুণাই তো মানুষের সেরা দুটি গুণ।

থেরেসার জীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল না ঠিকই। ভোগ-বাসনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাটে ঘাটে সে ভেসে বেড়িয়েছে। কামনার আগুনে সে পুড়েছে। ভালোবাসার আবেগে অন্ধ হয়ে মরুপ্রান্তরে মরীচিকার পিছে পিছে সে ছুটেছে, প্রেমের চোরাবালিতে ডুবে মৃত্যুর দ্বারে সে উপস্থিত হয়েছে, জীবনের পঙ্কিল নর্দমায় ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এ সমস্তই ঘটেছে থেরেসার জীবনে। তবু পাঁকের মধ্যে থেরেসার চিত্ত কখনো তৃপ্তি পায় নি। ভোগের রজনী শেষ হয়েছে। প্রভাতে জমা-খরচের হিসাব করতে গিয়ে থেরেসার লজ্জা এবং আত্মগ্লানিই প্রবলতর হয়ে উঠেছে, ক্লেদাক্ত সত্তার অধঃপতন দেখে থেরেসা আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

এই আসল থেরেসাকে বার্ণার্ড কোন কালেই দেখলো না, চিনলোনা। থেরেসার মধ্যে যে একটি চির নির্মল চিরসুন্দর সত্তা ছিল তাকে অন্ধ বার্ণার্ড দেখতেই পেলে না। দেখতে পেলোনা বলে ভালোও বাসতে পারলো না। বার্ণার্ডকে বিয়ে করেছিলো বলেই থেরেসাকে ভালোবেসেছিল? যার সঙ্গে মালা বদল হয় তার সঙ্গে কি সকল ক্ষেত্রেই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে? মোটেই না। ছোট ছোট শূকর-ছানা গুলো খোঁয়াড়ের ঘেরার মধ্যে পরমানন্দে কচু-ঘেঁচু তুলে তুলে বেড়ায়। আপনার আনন্দের মধ্যে সে ডুবে থাকে। বার্ণার্ডও প্রবৃত্তির চরিতার্থতার সুখের কারাগারে বন্দী। ঠিক যেন হৃষ্টপুষ্ট একটি শূকর শাবক থেরেসার দেহের খোঁয়াড়ে আপনার তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত!

এতকাল ধরে পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক চলে আসছিল তার ভিত্তি ছিল authority রাজার কর্তৃত্ব, পুরোহিতের কর্তৃত্ব, জমিদারের কর্তৃত্ব, বাপের কর্তৃত্ব, স্বামীর কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই রকমের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীতে চালু থাকবার দিন অতীতের অন্ধকারে বিলীয়মান। অতীতে স্বামী যা খুসী তাই করতে পারতো। স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বামীর খেয়াল-খুসির কাছে বলি দিয়ে মনে করতো, পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য সে পালন করেছে। এই রকমের একটা দাম্পত্য-জীবনে স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে স্ত্রীর ইচ্ছার কোন সংঘর্ষের সমস্যা না থাকায় সংসারে তেমন কোন গোলযোগ বাধতো না। যেখানে স্বামীর ইচ্ছা এবং স্ত্রীর ইচ্ছা উভয় ইচ্ছারই মর্যাদা সমান বলে স্বীকৃতি পেয়েছে সেখানে একটা মিলিত সিদ্ধান্তে পৌছানো শক্ত—কারণ সেখানে সামঞ্জস্য বিধানের একটা প্রশ্ন আছে। যেখানে শুধু একটা ইচ্ছার—স্বামীর ইচ্ছার প্রাধান্য সেখানে পুতুলের সংসারে স্ত্রী স্বামীর খেলার পুতুলটি হয়ে শান্তিতে ঘরকণ্না করে যায়। ইতিহাসের সেই এক পুরাতন অধ্যায় যখন নারী ছিল বিশ্বস্ত ভৃত্যের এবং রাজভক্ত প্রজার সামিল। সতী-সাধ্বী নারী আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বলি দিয়ে স্বামী সেবায় সতত তৎপরা—এই আদর্শই সমাজ-পতিদের কাছ থেকে বাহবা পেয়েছে।

এলো যুগান্তরের ঝড়ের রথ। সেই রথের রক্তচূড়ায় উড্ডীয়মান কেতনে লেখা: freedom, স্বাধীনতা! সমস্ত বিপ্লবের প্রেরণা এসেছে তো স্বাধীনতার জন্য প্রাণের একটা গভীর আকূতি থেকে। সাহিত্যে যাঁরা সমাজ-বিপ্লবের ঝড় আনলেন তাঁদের দলপতির ভূমিকায় আমরা

দেখতে পাচ্ছি নাট্যকার ইবসেনকে। মোক্ষম প্রশ্ন রাখলেন তিনি নবযুগের সম্মুখে: Why should a woman submit to a man? ইবসেনের A dolls house নাটকের নায়িকা নোরা স্বামীর আনন্দের উৎস, তার মূল্যবান খেলনা। স্বামী তাকে ছত্রছায়ায় রক্ষা করে বাহিরের ঝড়-ঝাপটা থেকে। বাপের আদরিণী মেয়ে নোরা পিতৃগৃহে ছিলো বাপের খেলার পুতুল। স্বামীর ঘরে যখন এলো তখনও সে খেলাঘরের পুতুল হয়ে থাকলো। অবশেষে নবযুগের আলো প্রবেশ করলো তার খেলাঘরের গণ্ডীর মধ্যে। তার জীবন-তরণীর উপরে অকস্মাৎ ভেঙে পড়লো একটা ভীষণ পরিস্থিতির নিষ্ঠুর ঝড়। নির্মম সত্যের বিদ্যুদ্দীপ্তিতে নোরা বুঝতে পারলো তার বিয়েটা বিয়েই নয় এবং এতকাল ধরে সে যার সঙ্গে ঘর করে এসেছে আসলে সে একজন stranger। স্ত্রীর জায়গায় নিজেকে ফেলে যে-স্বামী তাকে বুঝবার চেষ্টা করলো না, তাকে ভালবাসলো না, তার ব্যক্তিত্বকে কোন মর্যাদা দিলো না—সে তো strangre। আর একজন অপরিচিত লোকের বাড়ীতে সে কেমন করে রাত কাটাতে পারে? কেমন করেই বা সে তার দান গ্রহণ করতে পারে? নোরা স্বামীর ঘর ত্যাগ করে চলে গেল। যে তাকে অন্তরের ভালোবাসা দিলো না তার ইচ্ছার কাছে নিজেকে বলি দিতে নোরা শেষপর্যন্ত অস্বীকার করেছে। থেরেসার বেলাতেও একই প্রশ্ন, একই সমস্যা। থেরেসা বলছে, শ্বশুরবাড়ীর লোকে আমাকে সেই চোখে দেখেছে যে-চোখে তারা একটা পবিত্র আধারকে দেখে থাকে। আমার গর্ভে আমি তাদের বংশধরকে বহন করছি—এই আমার মূল্য তাদের কাছে। ওদের কাছে আমি হচ্ছি এ জাতের দ্রাক্ষালতা মাত্র। আমার গর্ভের ফল নিয়ে ওদের যত মাথাব্যথা! I lost all sense of being an individual person. থেরেসারও যে একটা স্বতন্ত্র রুচি, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিমা, স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকতে পারে এবং সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে থেরেসা এবং আমরা প্রত্যেকেই অনুপম—এই individual worthiness-এ বার্নার্ডের কোন শ্রদ্ধাই ছিলনা। আর স্বাধীনতাই তো আমাদের মর্মের সঙ্গীত, আমাদের জীবনের আকৃতি। এই স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে থেরেসা এমন একটা পরিবেশে বাস করছিল যেখানে ব্যক্তিত্ব কেবলই চারিদিক থেকে অনাদৃত এবং আহত হচ্ছিল। সেখানে বৃহত্তর জীবনের কোন আলোর প্রবেশ ছিলনা, মন খুলে অন্যের সঙ্গে থেরেসা ভাবের বিনিময় করতে পারতো না। এই নিদারুণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওষ্ঠাগতপ্রাণ থেরেসা স্বামীকে বলছে: Doesn't it occur to you that the sort of life people like us lead is remrkab'y like death?

থেরেসা আর বার্নার্ডে যে-দাম্পত্যজীবন যাপন করছিল সে তো মৃত্যুরই সামিল। বিবাহ সেখানেই শুধু সার্থক হতে পারে যেখানে নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত কামনার মিলন ঘটেছে, সেই মিলন আনন্দ-সুধায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেই মিলিত জীবনে উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা এতই গভীর যে একজন আর একজনের স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপের কথা ভাবতেও পারে না, একজন চায় না অন্যের সঙ্গে থাকতে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুক্তজীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে—এরকম দাম্পত্যজীবন অভাবনীয় বলে বিবেচিত। স্বামী এবং স্ত্রী—এদের একসঙ্গে বেঁধে রাখবে শুধু প্রেম। সেই প্রেমের মৃত্যু ঘটলে দাম্পত্যজীবনের চিতাভস্ম নিয়ে নরনারী করবে কি? নিজের প্রেমের জীবনের প্রকাণ্ড ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে থেরেসা তাই ভাবী-জামাতাকে বলেছে, We must never forget that the person lying there at our side, within reach of our hand, is at peace with the world, fulfilled and acquiescent—that both of us would rather be where they are than anywhere else, আমরা কখনোই ভুলবো না, যে-মানুষটি আমাদের পাশে শুয়ে আছে, আমাদের নাগালের মধ্যে তার মনে পৃথিবীর কারও বিরুদ্ধে যেন কোন ক্ষোভ না থাকে, সে কৃতার্থ, যেখানটিতে সে আছে সেখানেই সে থাকতে চায়, একজন আর একজনকে ছেড়ে অন্যত্র আছে—এমন প্রশ্ন স্বামী-স্ত্রী কারও

মনে জাগে না। থেরেসা এমনি একটা দাম্পত্যজীবনের সুখস্বপ্ন দেখেছিল! কিন্তু বার্নার্ড তার ব্যক্তিত্বকে কোন সম্মানই দিল না। তার আত্মার গভীরতম আকুতি ও প্রবণতাগুলিকে সমাদর করবার কোন আগ্রহই বার্নার্ডের মধ্যে দেখা গেল না। রাসেল (Bertrand Russel) এক জায়গায় লিখেছেন : now a days many men love their wives in the way in which they love mutton as something to devour and destroy. আজকাল অনেকে তাদের স্ত্রীকে ভালোবাসে যেমন তারা ভেড়ার মাংস ভালোবাসে। স্ত্রী যেন ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য তার মৃত্যু ঘটিয়ে তবে আনন্দ।

হায় থেরেসা। যে-যুগে নারীর স্বাধীনতার কোন সমাদর ছিল না, নিজের মতো করে জীবনের অভিযান পরিচালিত করবার স্বাতন্ত্র্যে তার অধিকার ছিল না তুমি সে যুগের মৃত্যুর শাসনকে মানতে পারোনি। চেয়েছিলে প্রেমের অমৃতকে আস্বাদন করতে পুরুষের কাছ থেকে পেয়েছো শুধু বঞ্চনা। আকণ্ঠ গরল পান করেও কোন ক্ষুদ্রতায় মলিন করোনি তোমার জীবন। একটা নিদারুণ দুঃখের কমল কুড়াতে হোলো সমস্ত জীবন ভরে। তবু তোমার সমস্ত অপবাদকে অতিক্রম করে দীপ্তি পাচ্ছে আর এক থেরেসা যে বারে বারে চেয়েছে পবিত্র জীবনের নির্মল আলোয় ডানা মেলতে আর বারে বারে দুর্বার কামনার টানে নীচে নেমে এসেছে। কিন্তু পাপের কাছে, অহং-এর কাছে চরম পরাজয় স্বীকার করে থেরেসা পাঁকে কখনো ডুবে থাকতে পারেনি। থেরেসাই ভাবগ্রাহী জনার্দনের পদপাতে দেবতার নির্মাল্যের মতোই পড়ে আছে। ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর সেই অমর লাইনগুলি :

All I could never be,
All men ignored in me,
This I was worth to God whose
what the [illegible] her shaped,

উত্তর পুরুষ

কুমারলাল দাশগুপ্ত

স্থান বসবার ঘর, কাল রবিবারের দুপুর, সোফার এক প্রান্তে বসে প্রভাত, আর এক প্রান্তে বসে কুসুম। প্রভাত বৈজ্ঞানিক, কুসুম কবি। সামনে মেঝের উপর খেলা করছে পাঁচ বছরের ছেলে অসুখম।

প্রভাত। (অমুকে লক্ষ্য করে) দেখছ অমু কেমন আমার ঘড়ি আর তোমার কলমটা নিয়ে খেলা করছে! যন্ত্রপাতির প্রতি ওর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

কুসুম। ওমা, কলম দিয়ে ঘড়িটা ঠুকছে আর তুমি চুপ করে বসে দেখছ! দুটোই ভেঙ্গে যাবে যে। শীগগির কেড়ে নাও।

প্রভাত। (নির্লিপ্ত ভাবে) না, ওকে খেলতে দাও।

কুসুম। ছেলেকে আদর দিয়ে তুমি নষ্ট করছ। কাজের জিনিষ ভেঙ্গে ফেলছে তবু বকবে না। আমি কেড়ে নিচ্ছি (উঠে দাঁড়ায়)।

প্রভাত। (তাকে আবার বসিয়ে দিয়ে) বস, দেখ, ওটা অমুর ঠিক খেলা নয়, ঘড়ির যান্ত্রিক-তত্বটা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে। ঐ যে বললাম যন্ত্রপাতির প্রতি ওর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তুমি দেখ, বড় হয়ে অমু মস্ত ইঞ্জিনিয়ার হবে।

কুসুম। কি যে বল, যন্ত্রপাতির প্রতি অমুর আবার আকর্ষণ কোথায়! হ্যাঁ, একথা বলতে পার যন্ত্রপাতির প্রতি ওর একটা বিদ্বেষ আছে, হাতে পেলেই ভাঙ্গতে চায়।

প্রভাত। (হাসতে হাসতে) ভাঙ্গাটা ত অনুসন্ধিৎসার লক্ষণ! না ভাঙ্গলে ভিতরের রহস্য জানবে কেমন করে? অমুর এখন থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। যাতে ও বৈজ্ঞানিক হয় সেই চেষ্টা করব।

কুসুম। তুমি ভুল বুঝেছ। অমুর এখন থেকেই একটা artistic দৃষ্টিভঙ্গী। দেখ না, জানালার ধারে বসে ও পথের ধারে ফুলেভরা কৃষ্ণচূড়ার গাছটার দিকে চেয়ে থাকে। অমু ভাবুক হবে, সাহিত্যিক হবে।

প্রভাত। (মাথা নেড়ে) না, কৃষ্ণচূড়ার গাছের দিকে চেয়ে অমু সৌন্দর্য দেখে না, দেখে সৃষ্টির রহস্য।

কুসুম। তোমার মাথা খারাপ। সৃষ্টির রহস্যটহস্য নয়, ফুলের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে ও চেয়ে থাকে।

প্রভাত। (হেসে) একদিন তোমারই মত আর একটি মা তাঁর ছেলেকে আপেল গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভেবেছিলেন সে আপেলের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে। কিন্তু আপেলটি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলে কবিতা বা ছোট গল্প লিখল না, মাধ্যাকর্ষণ তত্ব আবিষ্কার করল।

কুসুম। সব ছেলেই নিউটন নয়, কোন কোন ছেলে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি নিশ্চয় পড়নি, পড়লে দেখতে তিনি শৈশবে জানালার ফাঁক দিয়ে পুকুর ধারের একটা বুড়ো বটগাছের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। ফলে মাধ্যাকর্ষণ তত্ব আবিষ্কৃত না হলেও গীতাঞ্জলি লেখা হয়েছিল।

প্রভাত। মাধ্যাকর্ষণের বৈজ্ঞানিক তত্ব বড় কি গীতাঞ্জলির রসতত্ব বড় তা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। আমি বলছি বর্তমান যুগটা বিজ্ঞানের, কলকব্জার। তাই ছেলেকে বৈজ্ঞানিক করতে চাই।

কুসুম। কলকব্জার যুগ বলে গর্ব কর না, কলকব্জা মানুষকে অসুর করে। আমি ছেলেকে অসুর করতে চাই নে, মানুষই রাখতে চাই।

প্রভাত। (হাসতে হাসতে) তার মানে অমুকে কবি করতে চাও?

কুসুম। হ্যাঁ, তাই ত চাই।

প্রভাত। কবি না করে ছেলেকে বরং কবিরাজ কর তাহলে দু'পয়সা রোজগার করে খেয়েপরে বাঁচবে।

কুসুম। (গম্ভীর ভাবে) কবিকে নিয়ে তামাশা কর না। জীবনকে সুন্দর আর আনন্দময় কবিই করেন।

প্রভাত। ওগো কবি, মাথার উপরে যে যান্ত্রিকপাখা ঘুরছে তাকে বন্ধ করে দেখ কি অবস্থা হয়। একটু পরে যখন দরদর করে ঘাম পড়বে তখন কবিতা পড়লে গায়ের জ্বালা জুড়োবে না।

কুসুম। কবিতা পড়লে গায়ের জ্বালা না জুড়োলেও বুকের জ্বালা ত জুড়োয়। মশায় যখন আমার প্রেমে পড়েছিলেন তখন কলেজের ফটকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘর্মাক্ত কলেবরে রোদে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে বসে যান্ত্রিক পাখার হাওয়া খেলেই পারতেন।

প্রভাত। ওটা ত একদিককার কথা, আর একদিককার কথা বলি। আমার এই বাড়ীটা যদি তিনতলা না হয়ে ছোট একখানা খোড়োঘর হোত, সন্ধ্যাবেলা যান্ত্রিক আলো না জ্বলে যদি টিমটিম করে তেলের প্রদীপ জ্বলত, আর দরজায় একখানা যান্ত্রিক যান না থেকে যদি গরুরগাড়ী থাকত তাহলে কি মহাশয়া দয়া করে আমার পাণিগ্রহণ করতেন? বলুন!

কুসুম। আহা, কি কথাই বললেন! তুমি যদি আমাকে ভাল না বাসতে তাহলে তোমার দরজায় দশখানা মোটরগাড়ি থাকলেও তোমাকে বিয়ে করতাম না। শোন বলি, আমি ছেলেকে বৈজ্ঞানিক হতে দেব না, আমি ওকে শিল্পী করব।

প্রভাত। খামখেয়ালীর মত কাজ করলে ত হবে না। যার যেদিকে ঝোঁক তাকে সেই দিকে যেতে দিলে সে বড় হয়। অনুর ঝোঁক বিজ্ঞানের দিকে, তাকে সেই দিকে যেতে দাও।

কুসুম। আমি ওর মা, আমি জানি ওর ঝোঁক কোন দিকে। আমি যখন কবিতা লিখি তখন অনু চুপ করে কাছে বসে থাকে। ওর ভিতরে যে ভাবীশিল্পী রয়েছে কবিতায় সেই আকৃষ্ট হয়।

প্রভাত। তাই যদি হয় তাহলে অনু আমার Atomic Energy-র মোটা বইখানা আলমারী থেকে রোজ টেনে নিয়ে যায় কেন? ওতে কবিতা নাই, আছে রসহীন কঠিন অঙ্ক। আমি বলবো অনুর মধ্যে যে ভাবি বৈজ্ঞানিক রয়েছে বিজ্ঞানের বই দেখলে সেই আকৃষ্ট হয়।

কুসুম। ওমা, ঐ বই নিয়ে অনু কি করে তা জানোনা বুঝি! কাল আমি ধরে ফেলেছি ও কি করে, বইএর পাতায় ছবি আঁকে।

প্রভাত। (আশ্চর্য হয়ে) ছবি আঁকে! অসম্ভব। আনো তো বইখানা, দেখি কি ছবি এঁকেছে।

কুসুম। (বই এনে হাতে দিয়ে) এই দেখো, কি সুন্দর ছবি। ছবি আঁকবার জন্য আমি অনুকে খাতা কিনে দিয়েছি। বলে দিয়েছি বইএর পাতায় যেন আর ছবি না আঁকে।

প্রভাত। (ছবি দেখে) একে তুমি ছবি বলছো? এ যে diagram-এর মত দেখাচ্ছে, যেন একটা বিরাট রকেট, অথবা সাবম্যারাইন। আমি বলছি অনু সাধারণ ছেলে নয়, ও একটা প্রতিভা।

কুসুম। (বইখানা প্রভাতের হাতথেকে নিয়ে) সত্যিই তুমি আর্টের কিছু বোঝো না। চেয়ে দেখো, পরিষ্কার একটি বকের ছবি। এই যে ঠোঁট আর এই যে লম্বা লম্বা দুটো পা। দেখো, কি সাবলীল নির্ভিক রেখার টান। আমি ছবির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বকীয়তা লক্ষ্য করছি। বইএর এই পাতাটি অবশ্য আর পড়া যাবে না।

প্রভাত। হাতের কাছে তোমার কবিতা লেখার খাতা রয়েছে, ছবি আঁকার জন্য অনু সেখানাই তো নিতে পারতো! এত কষ্ট করে, চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আলমারীর উপর থেকে বিজ্ঞানের বই নামিয়ে এনেছে কি সামান্য একটা বক আঁকবার জন্যে! উহুঁ, তা নয়।

কুসুম। হুঁ, তাই। শিল্পে ও সাহিত্যে বক সামন্য নয়। সাহিত্যের আকাশে দলে দলে বক উড়ছে দেখছো না? বলাকা মানে বক জানো তো?

প্রভাত। বেশ বক যদি চতুষ্কোণ হয় তা হলে এটি বক। আমি বলি অনুর শিশুমনে রকেটের যে ধারণা জন্মেছে এটি তাই। এই ছেলেকে বিজ্ঞান না পড়িয়ে আর কিছু পড়ালে পৃথিবীর মস্ত ক্ষতি হবে। ভাবতে পারো আইনষ্টাইন যদি অঙ্ক না কষে কবিতা লিখতেন তাহলে কি হোতো।

কুসুম। ভাবতে পারো রবীন্দ্রনাথ যদি কবিতা না লিখে অঙ্ক কষতেন তাহলে কি হোতো?

প্রভাত। শোনো বলি, রবীন্দ্রনাথ বা কোন কবিকে আমি ছোট বলিনে, তাঁদের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই।

কুসুম। আমিও নিউটন বা আইনষ্টাইনকে ছোট বলিনা, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি।

প্রভাত। আসল কথা অনু যাতে বড় হয়, একটা মানুষের মত মানুষ হয় আমি তাই চাই।

কুসুম। আমি কি তা চাই নে?

প্রভাত। তা হলে ঝগড়া মিটে গেল।

কুসুম। আমার বিশ্বাস বিজ্ঞান পড়লে অনু বড় হবে না।

প্রভাত। আমার বিশ্বাস লেখক হলে অনু বড় হবে না।

কুসুম। এই দেখ আবার ঝগড়া বাধলো।

প্রভাত। ত হলে এক কাজ করো, অনুকেই জিজ্ঞাসা করো ও কি হতে চায়।

কুসুম। কি যে বলো, ঐটুকু ছেলে ও বৈজ্ঞানিক কাকে বলে তাও জানে না, লেখক কাকে বলে তাও জানে না।

প্রভাত। (একটু ভেবে) প্রশ্নটাকে আরো সহজ করা যায়। ধরো যদি বলি "অনু, তুই কারমত হতে চাস, মার মত না বাবার মত" তা হলে?

কুসুম। (হেসে) হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞাসা করো। দেখবে ও ঠিক বলবে 'আমি মার মত হব'।

প্রভাত। আমার কিন্তু বিশ্বাস ও বলবে "আমি বাবার মত হব!"

কুসুম। জিজ্ঞাসা করেই দেখ।

প্রভাত। অনু—

অনু। কি বাবা।

কুসুম। এদিকে আয়।

(অনু উঠে এসে সামনে দাঁড়ায়)

প্রভাত। বল্‌তো অনু তুই বড় হয়ে কার মত হবি, আমার মত?

কুসুম। না আমার মত?

অনু। (পকেট থেকে একটা খেলনা পিস্তল বার করে বাপমায়ের দিকে উঁচিয়ে ধরে) দস্যু মোহনের মত।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

এক

মাছটাকে বিকাশ অনেকক্ষণ ধ'রে খেলিয়ে তুলল।

আজ নিয়ে পাঁচ দিন এই বাঁধের ধারে সে ছিপ ফেলেছে, কোনোদিন ছুটো ট্যাংরা, কোনোদিন বা সেইসঙ্গে দু-একটা ফলুই, এছাড়া আর কিছু তার কপালে জোটেনি। আজ এই প্রথম ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত একটা মাছ গাঁথতে পারার সুখটাকে সে তাই একটু সময় নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল।

তার উপর এই মাছটা আজ তাকে অসম্ভব রকম জালিয়েছে।

কোথাও কিছু নেই, থেকে থেকে ফাৎনাটা আচমকা চলে গেছে কয়েক হাত জলের তলায়। শক্ত হাতে ছিপটাকে চেপে ধরতেই টুপ করে ভেসে উঠেছে সেটা, একটু যেন লাফিয়েই ভেসে উঠেছে, মাছ যে হাওয়া হয়ে গেছে সেইটেকে ভাল করে জানান দেবার জন্যে। দুপুরে বাড়ী যাবার জন্যে তৈরি হবে যখন ভাবছিল তখন থেকে সুরু করে কতক্ষণ যে এটা চলেছে তার হিসেব নেই। বিকাশের মনে হচ্ছিল যেন মাছটা ইচ্ছে করে এটা করছে, সময় বুঝে রসিকতা করছে তার সঙ্গে, তাকে নিয়ে খেলছে। তাই সেটার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খেলে শোধ তোলবার ইচ্ছেটাও যে তার মনে একেবারে ছিল না তা নয়।

কোন্ সাত সকালে আলু-বেগুন-মুলো ভাতে ভাত খেয়ে সে বেরিয়েছে, এখন ধূ ধূ মাঠের ওপারে দূর বনরেখার গা-ঘেঁষে পশ্চিমের সারবন্দী মেঘগুলির মাথার ওপর এখানে ওখানে লাগের ছোপ লেগেছে। দুপুরের পর ক্ষিদেটা একসময় চনচনে হয়ে উঠে মরে গেছে সেই কখন। মাছটাকে টোপ খাওয়াবার উৎসাহে নিজের খাওয়াদাওয়ার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল একেবারে।

বড় নদীটার দিক্ থেকে হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ার জোর ক্রমশঃ বাড়ছিল কিছুক্ষণ ধরে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, ঝড় উঠবে কি না কে জানে। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এবার বাড়ী ফিরতে হয়। নিরুপমা খেয়েছে কি আজ দুপুরে, না ভায়ের ভাত আগলে বসে থেকেছে সারাদিন?

বিকাশের বাবা মহেন্দ্র আলিপুর পুলিশ কোর্টে কেরাণীর কাজ করতেন। পেনশন পাবার পর আর কলকাতায় বসবাস করা সম্ভব হয়নি, তাছাড়া সমস্ত জীবন শহরে কাটিয়েও শহরে জীবনটা তাঁর ধাতস্থ হয়নি ঠিক, তাই পুঁজিপাটা সামান্য যা ছিল তা নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গে তাঁর দেশের বাড়ীতে চলে এসেছিলেন। সে আজ পাঁচ বছরের কথা। তারপর বছর দুই হল বিকাশের মা মারা গিয়েছেন। তখন থেকে বিকাশের বোন নিরুপমাই বাড়ীর গৃহিণী হয়েছে, আর সেই মতই তাঁর চালচলন। বয়স সতের, তার মানে বিকাশের চেয়ে সাত বছরের ছোট, কিন্তু হলে কি হবে? মহেন্দ্র এইটেকেই একমাত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা মনে করেন ব'লে রান্নাবান্না সব সে নিজেই করে, ছোট ভাইদুটিকে সামলায়, তার উপর বাবা ও দাদার জন্যে যদি কিছু করতে পারে ত খুশী হয়ে তাও করে। অবশ্য বাবার জন্যে বেশী কিছু করতে পায় না, মহেন্দ্র চান না তার উপর প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কাজের ভার চাপাতে। কিন্তু দাদাকে সংসারযাত্রায় মায়ের অভাব কোনদিক্ দিয়েও এতটুকু বুঝতে দিতে চায় না নিরুপমা। আলিপুর পুলিশ কোর্টের নতুন উকীল বিকাশ বসু বালিগঞ্জে ভাড়া বাড়ীতে চাকর নিয়ে থাকে, ছাইভস্ম কি খেতে পায় তা সে-ই জানে। ছুটিছাটায় অল্প যে ক'টা দিন দেশের বাড়ীতে এসে থেকে যায় সেই ক'টা দিন সে যাতে একটু ভাল খায়দায়, একটু যত্ন আদর পায়, মা বেঁচে থাকলে তাই চাইতেন, নিরুপমাও তাই চায়। ছেলের খাওয়া না হলে মা কি নিজে খেতেন? খেতেন না। নিরুপমাও নিশ্চয় না খেয়েই আছে সারাদিন।

ছোট একটা মাঠ পার হয়ে বিকাশ গ্রামের পথ ধরেছে।

বিকাশের ছোট ভাই দুটির একটির বয়স সাত আর

একটির পাঁচ। তারা গ্রামেরই মাইনর স্কুলে পড়ে। মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার কোন ব্যবস্থা নেই গ্রামে, তাই নিরুপমার পড়াশোনার পাট কলকাতা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বার বছর বয়সেই চুকে গিয়েছে। লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে একই পরিবারের ছেলেতে আর মেয়েতে কোন তফাৎ থাকবে, এধরণের ব্যবস্থাতে বিকাশের মন কোনোদিনই সায় দেয়নি, তাছাড়া তার ইচ্ছে, নিজে একটি সর্ব্বগুণান্বিতা সুশিক্ষিতা বধূ ঘরে আনে। সেরকম একটি মেয়ের কথা মনে মনে সে ভেবেও রেখেছে কিন্তু সে এ বাড়ীতে এলে নিরুপমা তার কাছে নিতান্তই ছোট হয়ে থাকবে, সেইসঙ্গে বিকাশ নিজেও কতকটা ছোট হয়ে থাকবে, এ চিন্তা বিকাশের কাছে প্রীতিকর নয়, তাই তার একান্ত বাসনা নিরুপমাকে বালিগঞ্জের বাসায় নিজের কাছে রেখে পড়ায়। কিন্তু পিতা মহেন্দ্র কিছুতে তা হতে দেবেন না। পিতা-পুত্রে এই নিয়ে দু'বছর ধরেই তকরার চলছে, তবে এবারে ব্যাপারটা একটু গুরুতর আকার ধারণ করেছে, তার কারণ, নিরুপমা, যে নিজে এতকাল নিরপেক্ষ ছিল, দাদাকে এবার বিশেষ রকম পীড়াপীড়ি করে ধরেছে, বাবাকে রাজী করিয়ে সবাইকার যাতে এক সঙ্গে কলকাতায় থাকা হয় তার ব্যবস্থা করতে।

বিকাশ বলেছে, "তোকে অন্তত এবারে আমি নিয়ে যাবই।"

নিরুপমা বলেছে, "কেবল আমাকে নিয়ে গেলে কি করে হবে? অন্তু শন্তুকে কার কাছে রেখে যাব, কে ওদের দেখবে?"

বিকাশ বলেছে, "যে আদর্শে বাবা তোকে মানুষ করতে চাইছেন, তাতে এতদিনে তোর বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ধর্, তাই যদি হত তখন কে ওদের দেখত?"

মহেন্দ্রকে বলাতে তিনি বলেছেন, "তুমি ওকে নিয়ে যাবে এও কি একটা কথা হ'ল? ওখানে কার সঙ্গে ও থাকবে?"

বিকাশ বলেছে, "আমিই ত রয়েছি, আর কার সঙ্গে আবার থাকবে?"

মহেন্দ্র হেসে বলেছেন, "তুমি সারাদিন থাকবে কোর্টে, সকাল-বিকেল মক্কেলদের নিয়ে আসর জমাবে, তোমার সঙ্গটা সে পাবে কখন শুনি?"

বিকাশ, "আমার সঙ্গলাভ তার কতটা হবে সেটা বড় কথা নয়, তাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। আমি যে সময়টা মক্কেলদের নিয়ে থাকব, সে সময়টা সে পড়া করবে।"

মহেন্দ্র, "তুমি বুঝছ না, মেয়েদের ওরকম করে থাকা চলে না। তোমার ভাইরা একটু বড় হলে তাদের নিয়ে এ ব্যবস্থা চলতে পারবে।"

বিকাশ "কেন, মেয়েরা কি—"

মহেন্দ্র, "তারা মেয়ে, তাদের নিয়ে অনেক কিছু ভাবতে হয়। তোমার বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছ, তোমার সেটা বুঝতে পারা উচিত, কিন্তু পারবে না। কারণ স্ত্রীশিক্ষা বলে একটা কথা শিখেছ, সেটাকে তোমরা অত্যন্ত বেশী বড় করে দেখছ। বুঝছ না যে, এতে তোমার মা মাসী পিসী, তোমার ঠাকুমা দিদিমা, তাঁদের মা বোন এঁদের প্রতি কতবড় অসম্মান দেখানো হচ্ছে। তোমার মায়ের কথাই ধরা যাক—"

বিকাশ, "তাঁকে এ আলোচনায় মধ্যে আমি আনতে চাই না।"

মহেন্দ্র, "আমি চাই, কারণ, যাকে নিয়ে আলোচনা সে তাঁরও মেয়ে। নিরুপমা যতটা লেখাপড়া শিখেছে তিনি ততটাও জানতেন না। কিন্তু সবদিক্ দিয়ে নিরুপমা যেন তাঁর মত হতে পারে এর চেয়ে বড় কোন্ আশীর্ব্বাদ তাকে আমি করতে পারি জানি না।"

পিতার মুখে এ ধরণের কথা এর আগেও সে শুনেছে, আলোচনায় মায়ের কথা এসে পড়লে কি উত্তর দেবে ভেবে পায়নি। তবে এবার অবস্থাটার একদিক্ দিয়ে একটু পরিবর্তন হয়েছে। ওকালতিতে তার পসার জমেছে। ছোট দুটি ভাই এবং বোনটিকে নিজের কাছে রেখে তাদের সমস্ত ভার সে এখন বহন করতে পারে। তাই, যদি প্রয়োজন হয়, পিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা তার পক্ষে এখন সম্ভব, আর তাই করবার জন্যে মনে মনে সে তৈরি হচ্ছে।

অবশ্য একপাল চাকর রেখে যে সব জমি মহেন্দ্র চাষ আবাদ করান, সেগুলির ভাগে পত্তনের ব্যবস্থা করে স্বচ্ছন্দে তিনি কলকাতায়-গিয়ে ছেলের সঙ্গে বাস করতে পারেন, কিন্তু তা তিনি কখনোই করবেন না। এই জমিগুলি তাঁর হাড পাঁজরের চেয়েও বেশী হয়ে উঠেছে এখন, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হৈ হৈ করে চাকরদের পেছনে না ছুটতে পারলে তাঁর পেটের ভাত হজম হয় না যে!

যেতে যেতে বিকাশ বড় নদীটার দিকে ফিরে দেখল একবার। এতদূর থেকে নদীর জলধারা চোখে পড়ে

না, দুতিনটি নৌকোর ফুলে-ওঠা পাল কেবল দেখা যাচ্ছে। এত জোর হাওয়াতেও খুব মন্থর গতিতে চলছে নৌকোগুলো; এত মন্থর গতিতে, যে চলছে বলেই মনে হচ্ছে না। তা বর্ষার ত আর দেরি নেই? হয়ত দূরে পাহাড়ে এরই মধ্যে ঢল নেমেছে, ফুলে ফেঁপে উথাল পাথাল ছুটছে নদীর জল। সেই স্রোত ঠেলে এগোনো শক্ত হচ্ছে নৌকোগুলোর।

এমনিধারা বিরুদ্ধতার উজান ঠেলে তাকেও এখন এগোবার চেষ্টা করতে হবে কিছুকাল। বাবার সঙ্গে বিরোধের পরিণাম কি হবে শেষে পর্য্যন্ত, কল্পনাতেও আনতে পারছে না সে।

মনটাকে একটু অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা সে করছে। হাতে ঝোলান সের-দেড়েক ওজনের ঝকঝকে মৃগেল মাছটাকে আলোয় তুলে ভাল করে একবার সে দেখে নিল।

পিছনের ঐ তেঁতুল গাছটার নীচে বসে বিকাশ এই কদিন যেখানে ছিপ ফেলেছে সেই জায়গাটা বড় নদীর থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে। ছোট একটা মরা নদীর বাঁধের ধারে। বাঁধের এদিকটায় বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে বারো মাসই জল থাকে। যেদিকটা বড় নদীর দিকে, তার সবটাই এখন শুকনো খটখটে। আর দিন কয়েক পর বর্ষার জল এসে ঢুকবে সেদিক দিয়ে। বাঁধ ছাপিয়ে সে জল চলে আসবে এদিকে আর সেই সঙ্গে চলে আসবে বড় নদীর ছোটবড় নানারকমের মাছ। সমস্ত মরা নদীটা প্রাণ পেয়ে তখন ভরে যাবে সেই জলে আর মাছে। তারপর জল নেমে যাবার সময় হলে বাঁশের বাখারি দিয়ে চাটি বেঁধে দেবে চাষীরা, জলের নীচেকার বাঁধটার এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত। ধান ক্ষেতে সেঁচবার জন্যে সারা বছর যতটা জল তাদের দরকার, তা থাকবে বাঁধের এধারে, বাড়তি জল বেরিয়ে যাবে, কিন্তু বেরিয়ে যেতে পাবে না মাছগুলো।

এই কমাস ধরে বাঁধের প্রায় সব মাছই ক্ষেপলা জালে তুলে নিয়েছে চাষীরা, কিন্তু কিছু মাছ সহজে জালে পড়ে না। যে মাছগুলো চালাক তারা জাল ফেলার শব্দ পেলেই পালিয়ে গিয়ে দুই পারের কাছে হোগলাবনের মধ্যে ঢুকে থাকে। তাদেরই একটির চালাকি আজ শেষ পর্য্যন্ত চলেনি বিকাশের সঙ্গে।

এবারে সে গ্রামের কাছাকাছি এসেছে। গ্রামের এক প্রান্তের একটা বড় দীঘি, তার একধারে আম-বাগানের পাশ ঘেঁষে গোপাট, তাই দিয়ে গরুর পাল এসে গ্রামে ঢুকছে। এতক্ষণ প্রায় নিঃশব্দে আসছিল, গ্রামের পরিচিত পরিবেশের মধ্যে এসে বাছুরদের মনে পড়াতে হাম্বা হাম্বা শব্দে সচকিত করে তুলেছে চারদিক্।

দীঘির ঢালু পার বেয়ে নেমে গিয়ে একটা গরু জল খেল; দেখাদেখি আরও কয়েকটা গরু নেমে গিয়ে জল খেল, তারপর আবার হাম্বা হাম্বা করে ছুটে চলল গ্রামের দিকে।

এক গৃহস্থ-বাড়ীর গোয়ালঘরের দরজার পাশে বাঁশের খোঁয়াড়ের মধ্যে ছ'সাতটা বাছুর ছটফট করছে। মায়েদের ডাক কানে আসছে দূর থেকে, নিজেরাও চেঁচিয়ে ডেকে সাড়া দিচ্ছে।

উনিশ কুড়ি বছর বয়সের একটি চাষী ছেলে আসছিল সে পথে। বাছুরগুলোর উৎকণ্ঠা দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর তাড়াতাড়ি চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে ক্ষিপ্রহাতে খুলে দিল খোঁয়াড়ের ঝাঁপটা। বাছুরগুলো জড়াজড়ি করে বেরিয়ে যেদিক্ থেকে মায়েদের ডাক শোনা যাচ্ছিল, পড়ি কি মরি করে সেই দিকে ছুটল।

গৃহস্থ বাড়ীর একটি লোক দেখতে পেয়ে ছুটল তাদের পিছনে, কিন্তু একলা হাতে এতগুলো বাছুরকে কি করে সে সামলাবে?

ছেলেটি পিছন ফিরে দেখতে দেখতে পথ চলছিল, পড়ে গেল বিকাশের সামনে। বাঁ হাতে বড়শি ও মাছধরার অন্যান্য সরঞ্জাম আর ডান হাতে মৃগেল মাছটা নিয়ে সে আসছিল, মাছটাকে বাঁহাতে চালান করে দিয়ে খপ করে ছেলেটির একটা হাত চেপে ধরে বলল, "এই নিবারণ, বাঁদর কোথাকার, কেন ছেড়ে দিলি বাছুরগুলোকে?"

"ছাইরা দেন, ছাইরা দেন কইতে আছি," বলে নিবারণ তার হাতটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

বিকাশের ডাম্বেল ভাঁজা হাতের মোচড় খেয়ে বেঁকে গিয়ে উল্টে পড়ছে নিবারণ।

ততক্ষণে গৃহস্থ-বাড়ীর অন্য কেউ কেউ এবং পাড়ার আরও অনেকে এসে সেখানে জুটেছে। তাদের হাতে নিবারণকে ছেড়ে দিয়ে চলে এল বিকাশ। আসতে আসতে শুনতে পেল নিবারণ গর্জ্জাচ্ছে, "আচ্ছা, দেইখা লইমু।" কেউ একজন সশব্দে চপেটাঘাত করল তার মুখে।

রঘুনাথ মণ্ডল এই আটপাড়া গ্রামের একজন সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ, নিবারণ তারই ছেলে। কিন্তু সে এমন

ছেলে যে গত বৎসর রঘুর হালের গরুটা মারা যেতে সে চোখ মুছতে মুছতে মহেন্দ্রকে বলেছিল, "বাবুগো, আমার গরুটা না যাইয়া যদি ঐ পোলাটা যাইত, আমার কোন দুঃখু আছিল না।"

নিজের চোখে গাঁজা খেতে তাকে যদিও কেউ দেখেনি, তবু সবাই বলে, সে গাঁজা খায়।

বড় নদীটার ওপারে মমীনপুর গ্রাম। সে গ্রামের লোকদের সুনাম নেই একেবারে, যে জন্যে পুলিশের সঙ্গে তাদের নিত্য কারবার। কোথাও কারও গরু বা ছাগল চুরি গিয়েছে, বা সিঁধ কেটে কারও বাড়ী থেকে কেউ বাসন কোসন সরিয়েছে, কিংবা নদীর ভাঁটিতে বা উজানে গভীর রাতে কোন ব্যাপারির নৌকো লুট হয়েছে খবর পেলে পুলিশ এই মমীনপুর গ্রামে একবার এসে হানা দেবেই। স্ত্রীলোকঘটিত অপরাধেও এ গ্রামের একাধিক লোকের শাস্তি হয়েছে। এমনই একটি গ্রামের কোন একটি দলের কয়েকটি লোকের সঙ্গে নিবারণের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বলে শোনা যায়। সুতরাং গাঁজা সে খাবে তার আর বিচিত্র কি?

মনটা একেবারে খিঁচড়ে গেল বিকাশের। অনেক চেষ্টা করেও নিবারণকে কিছুতে সে ভুলতে পারছে না।

নিবারণকে গাঁজা খেতে কেউ যদিও দেখেনি, গাঁজা-খোরের মত তার চোখদুটো যে একটু লাল তা কিন্তু ঠিক। তার উপর তার ডান চোখটার ডানদিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা চাপবাঁধা রক্তের ডেলা, যা দেখলে সত্যিই ভয় করে।

বিকাশের মনে পড়ল, নিবারণের যখন বছর চোদ্দ বয়স, তখন একদিন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বেশ শক্ত একটা দড়ি গলায় দিয়ে তাদের বাড়ীর পিছনে একটা পেয়ারা গাছের ডাল থেকে ভর দুপুরে সে ঝুলে পড়েছিল। ডালটা ভেঙে পড়াতে সে-যাত্রা সে রক্ষা পেয়ে যায়। তার পড়ে যাবার শব্দ শুনে বাড়ীর লোকেরা ছুটে এসে তাড়াতাড়ি গলার ফাঁস খুলে দিয়েছিল, কিন্তু যেটুকু সময় তার দমটা আটকে ছিল তারই মধ্যে চোখের পাশে চাপ বেঁধে গিয়েছিল ঐ রক্তের ডেলাটা।

রঘুনাথ সেদিন বলেছিল, "আরে ও হারামজাদা, শয়তানের বাচ্চার কথা কইও না। ধারে কাছে আর গাছ পাইল না। ক্যান্? ঐ জামগাছটা আছিল না? কিসের লাইগা আছিল?"

যতদূর বিকাশের মনে পড়ছে নিবারণদের পাশের বাড়ীর কোনো একটি মেয়েকে উপলক্ষ্য করেই ঘটেছিল ব্যাপারটা।

তারপর এই ছ'সাত বৎসরে চরিত্রের কোনো উন্নতি হয়েছে নিবারণের, এমন কথা তার পরম বন্ধুরাও বলে না।

আজ এই আসন্ন সন্ধ্যায় সারাদিন ব্যাপী অনাহারে ক্লিষ্ট শরীরে একটা অসভ্য বাঁদর ছেলের বাঁদরামি নিয়ে কিছু বলতে বা করতে না যাওয়াই ছিল ভাল, এমনি একটা চিন্তার অবসাদে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিকাশ বাড়ী এল।

দুই

পরিপাটি করে বোনা বাখারির বেড়া, পাকা মেজে, টিনের চাল, এইরকম ছোটবড় গুটি ছয়সাত ঘর নিয়ে বিকাশদের বাড়ী। আম জাম কাঁঠাল কদম সুপারি গাছে ঘেরা ছবির মত সুন্দর বাড়ীখানি।

মহেন্দ্র তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়টাই কাটিয়েছেন কলকাতায়, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত সর্বক্ষণ আট-পাড়ার এই বাড়ীটিতে। যে বাড়ীতে বাস করতেন না, সেইটিকে বাসযোগ্য করবার চেষ্টাতে তিনি ক্রুটি ঘটতে দেননি কোনোদিন।

আর বাস্তবিক, তাঁর ছেলেমেয়েরা কলকাতায় যে-রকম করে ছিল, এখানে যে তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং অনেক বেশী ভাল খেয়ে-দেয়ে থাকতে পারছে, সে বিষয়ে অন্তত তাঁর নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ভিতরবাড়ীর পশ্চিমের ভিটের বড় ঘরটার লাগোয়া একধাপ নীচু ছোট একটি রান্নাঘর। তার সামনে একটি বঁটি এবং দুমুঠো ছাই নিয়ে বসে নিরুপমা মাছ কুটছে। একটা কুকুর এসে বসেছে, খবরদারি করতে, সামনের দিকে দুই পা মেলে। কাকরা ভাবছে, তারাই বা কম যায় কিসে? তাই তারাও একটু দূরে থেকে মাছ কোটা দেখছে। অন্তু শন্তু পাশের মাঠে খেলা করছিল, তারাও কখন একসময় সেখানে এসে জুটেছে।

দুভায়ের মধ্যে শন্তু ছোট, হঠাৎ সে ব'লে উঠল, "কি সুন্দর চকচকে দেখতে ছিল মাছটা, আঁশ ছাড়িয়ে বিশ্রী হয়ে গেল।"

অন্তু তেড়ে উঠে বলল, "আঁশ সুদ্ধু মাছ খাবি নাকি তুই, বোকা ছেলে?"

"আমি বুঝি তাই বলেছি," বলতে বলতে অন্তুর

মাথায় একটা চাটি মেরে শঙ্কু ছুটে পালাল সেখান থেকে। অঙ্কুও ছুটল তার পিছন পিছন।

বড় ঘরটার বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল বিকাশ। বলল, "কলকাতায় গিয়ে কিন্তু তুমি রান্নাঘরে ঢুকতে পাবে না।"

একটু হেসে নিরুপমা বলল, "এত বেশী কড়া শাসনে আমাকে রেখো না। বাড়ীতে ভাল মন্দ কিছু এলে রান্না একটু আধটু করবে বই কি?"

বিকাশ বলল, "আচ্ছা বেশ, ছুটির দিনে খুব যদি ইচ্ছে হয় ত রাঁধবে। পড়াশোনাটা ভাল করে করতে হবে ত?"

নিরুপমা বলল, "যাই ত আগে। যতটা বুঝছি সবাইকে নিয়ে যেতে তুমি পারবে না। বাবাকে ছেড়ে, ভাইদুটিকে ছেড়ে কি থাকতে পারব?"

ততক্ষণে নিরুপমার মাছ কোটা শেষ হয়েছে। মাছের চুপড়িটা আর বঁটিটা হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "আলনা থেকে পেড়ে এনে একটা শাড়ী আর ঐ গামছাটা দাও না দাদা আমার কাঁধে তুলে?"

শাড়ী গামছা এনে নিরুপমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বিকাশ বলল, "এই ভর সন্ধ্যেয় ঘাটে চলেছিস্ নিরু, ফিরে আসতে অন্ধকার হয়ে যাবে যে। চল্ আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি।"

নিরুপমা বলল, "না, না, তুমি ক্লান্ত হয়ে রয়েছ, তোমাকে আসতে হবে না। আমি এই যাব আর আসব।"

দুপুরে স্নানের সময় দীঘির ঘাটে পুরুষদের ভিড় থাকে। সন্ধ্যায় থাকে না। তখন মেয়েরা কেউ চুল ভিজায় না, কিন্তু ঘাটে এসে ভিড় করে; কারণ ঐ সময়টা যেমন করে খুশি সাবান মাখা যায় গায়ে, উপুড় করা শূন্য কলসী বুকে চেপে যত খুশি পা আছড়ে জল তোলপাড় ক'রে সাঁতার কাটা যায়। আর সব চেয়ে বড় কথা, মনের কথা বলা যায় বান্ধবীদের।

গ্রীষ্মের গরমে আর আগুনের আঁচে সারা দিন পুড়েছে নিরুপমা। আশা ছিল মনে, বান্ধবীদের গা ধোওয়ার পর্ব্ব শেষ হবার আগেই পৌঁছে যাবে দীঘির ঘাটে, তারপর কারও না কারও সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতরে দীঘিটা একবার এপার-ওপার করে ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ী ফিরবে। দাদা সঙ্গে গেলে সেটা ত করা যাবে না? তাই একলাই চলল সে।

মাঝপথের কামরাঙা বনটা ছাড়িয়ে খানিক দূর গিয়েই দেখল, তার বান্ধবীরা জল নিয়ে বাড়ী ফিরছে।

শৈল বলল, "যাইতে আছ যাও, কিন্তু গাঞ্জাখোর নিবারণটাকে দেইখ্যা আইলাম, ঘুরতে আছে দীঘির পারে।"

নিরুপমা বলল, "কলসীর জলটা ফেলে দিয়ে তুমি চল না ভাই আমার সঙ্গে?"

শৈল বলল, "কি যে কও। আর দেরি করলে মায়ে আমারে শেষ কইরা ফালাইব না?"

উর্মি বলল, "আরে হইবটা কি? বান্দররে আবার ডরায় নাকি মাইনষে? তোমার হাতে বঁঠিটা আছে কিসের লাইগা? দুই টুকরা কইরা কাইটা রাইখা আইতে পারবা না?"

গ্রামপ্রান্তের নির্জ্জন পোড়ো জমির পথে যেতে যেতে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল নিরুপমার। দিন শেষের আলো একেবারে ম'রে যায় নি তখনো, কিন্তু পথের পাশের ঝোপে-ঝাড়ে অন্ধকার জমা হচ্ছে। ঐ গাঁজাখোরটা যদি ঘাপটি মেরে বসে থাকে এই অন্ধকার ঝোপগুলির কোনো একটার মধ্যে, যদি হঠাৎ লাফ দিয়ে এসে তার সামনে পড়ে! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে এল দীঘির ধারে। ঘাটে এসে বসে বুঝতে পারল খুব ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

পাশের আমবাগানে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুরু হয়ে গিয়েছে তখন। হাওয়ার জোর বেড়েছে। ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে দীঘির জলে।

কাঁধে একটা দোলা দিয়ে শাড়ী গামছা ঘাটের চাতালে ফেলে উঠে দাঁড়াল সে। চারদিকটা দেখে নিল ভাল করে। না, কেউ কোথাও নেই। তবু ঠিক করল, গা ধোওয়ার চেষ্টা আজ আর সে করবে না। মাছগুলো আর বঁটিটা ধুয়ে নিয়েই বাড়ী ফিরবে।

কিন্তু একটা কি ভয় আজ যেন তাকে পেয়ে বসেছে। নিবারণের ভয়টা নেই এখন আর তত, কিন্তু অন্য নানা-রকমের ভয় মনের আনাচে কানাচে উঁকি দিচ্ছে। সধবা অবস্থায় যে সব স্ত্রীলোক মারা যায় তারা নাকি অন্ধকারে মাছের গন্ধ পেলে পেত্নী হয়ে পিছু নেয়। দীঘিতে মস্তবড় একটা মাছ নাকি আছে, দেখতে অনেকটা শাল মাছের ধরণের, এদিককার লোকেরা বলে "চুইলা গজার।" সারা গা ভরতি ঘন লম্বা চুল নাকি সেই গজার মাছটার। মানুষকে কাছে পেলে সেই চুল পায় জড়িয়ে এই চুইলা গজার তাকে গভীর জলে টেনে নিয়ে

যায়। যে জন্যে প্রায় প্রতি বছর কেউ না কেউ ডুবে মারা যায় এই দীঘির জলে।

কাপড়টাকে সামলে জলের মধ্যে দু ধাপ সিঁড়ি নেমে চুপড়িটাকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মাছগুলিকে প্রথমে ধুয়ে নিল সে। তারপর যখন ধারালো বঁটিটার দুপাশে সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে সেটাকে ধুচ্ছে তখন তার মনে হ'ল কি একটা জন্তু যেন জলের তলা দিয়ে সাঁতরে আসছে তার দিকে। আধ অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না, কিন্তু একটা কিছু আসছেই, আর সেটা বেশ বড়। সিঁড়ি উঠে পালাতে যাবে এমন সময় কি যেন একটা জড়িয়ে গেল তার পায়ে। ঠিক চুলের মত মনে হ'ল না, কিন্তু হতেও পারে চুল। ভীষণ ভড়কে গিয়ে এক ঝটকায় পাটা ছাড়াতে চেষ্টা করল, পারল না, সঙ্গে সঙ্গে একরাশ চুলের মতই কি যেন ভুশ্ করে ভেসে উঠল তার সামনে। "বাবা গো" বলে চীৎকার করে উঠে হাতের বঁটিটা দিয়ে সে কোপের উপর কোপ বসাতে লাগল সেই রাশীকৃত চুলের উপর।

প্রথম কোপটা মাথায় পড়তেই এক হাতে মাথাটা আড়াল করে নিবারণ উঠে বসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার আগেই আরও কয়েকটা কোপ পড়ল তার মাথায় ঘাড়ে ঘাড়ের পাশে।

যন্ত্রণায় আর ভয়ে পাগলের মত হয়ে শক্ত হাতে নিরুপমাকে জলে ঠেলে ফেলে দিল নিবারণ, তারপর "বাপ্‌পুইস রে, আমারে মাইরা ফালাইছে, একেকালে মাইরা ফালাইছে, তোমরা দেখ আইসা," বলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে ফাটাতে সে ঘাটের চাতালটার উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

নিরুপমাকে ভয় পাওয়াবে, খুব একটা রগড় হবে, এছাড়া আর কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না তার মনে। কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে ঘাড়ের পাশের লম্বাটে একটা ক্ষতমুখ দিয়ে।

চাতাল বেয়ে সেই রক্ত ক্রমে সিঁড়িতে গড়িয়ে এসে পড়ছে।

আধ অন্ধকারে কুচকুচে কালো দেখাচ্ছে সেই রক্তের রেখাটা।

বেকায়দায় জলে পড়ে নিরুপমা খাবি খেয়েছিল একটু। সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখে তার মনে হ'ল, যেন ওটা রক্ত নয়, একটা কাল সাপ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তার দিকে। বঁটিটা অনেক আগেই তার হাত থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল দীঘির জলে, মাছের চুপড়ি আর শাড়ী গামছা নিয়ে সে পড়ি কি মরি করে ছুটে পালাল ঘাট ছেড়ে।

প্রথমে বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিল, কোথায় আর যাবে? কিন্তু বাড়ী যাবার যেটা পথ সেই পথ দিয়ে একদল লোককে ছুটে আসতে দেখে ভয় পেয়ে অন্ধকার আমবাগানটার মধ্যে গিয়ে সে লুকোল।

আমবাগান তখন অস্থির হয়ে উঠেছে হাওয়ার দাপটে।

এদিকে নিবারণের চীৎকারের শব্দ ক্রমশঃ মৃদু হয়ে আসছে। এতক্ষণ খুব ছটফট করছিল, লোকজন এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে একটু। এখন অন্যদের চীৎকার সুরু হয়েছে। আম গাছগুলির ডালপালার অশান্ত উচ্ছ্বাস, নিরবচ্ছিন্ন ঝিল্লীরব, এ সমস্তকে ছাপিয়ে তাদের সেই চীৎকারের শব্দ কানে আসছে নিরুপমার।

"শুকনা কাপড়, শুকনা কাপড়···আরে তোর গামছা দে না রে, ওর বাবাকে খবর দে ও, রঘুনাথরে খবর দেও···থানায় যাও, তরাতরি দারোগাবাবুরে গিয়া কও··· ডাক্তারবাবুরে লইয়া আস···ডাক্তার আইসা আর করব কি···নিবারণ, নিবারণ, ও নিবারণ··· নাঃ, শেষ হইয়া গেছে, চক্ষুর তারা উইল্টা গেছে, শোয়াস নাই, দেখ না···"

একটা লণ্ঠনের আলো ফিরে ফিরে এসে পড়ছে বারবার, নিরুপমা যেখানে একটা আম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে ঠেশান দিয়ে, সেইখানে। কে একজন একবার টর্চ ফেলল সেদিকে।

আমবাগান ছেড়ে ছুটতে ছুটতে নিরুপমা ছোট নদীর দিককার মাঠটাতে এসে নামল।

শেষ হয়ে গেছে, নিবারণ শেষ হয়ে গেছে, তার শ্বাস পড়ছে না। তার মানে নিবারণকে মেরে ফেলেছে সে। মেরেই ফেলেছে একেবারে। খুন করেছে। খুন।

কি সর্বনাশ! এ কি ভীষণ সর্বনাশ হয়ে গেল আজ এই ক'টি মুহূর্তের মধ্যে, গা ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হতে এসে। তার পায়ে কি একটা জড়িয়ে গিয়েছিল, বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা তেলতেলে একটা কিছু। ওটা যে মানুষের হাত, কি ক'রে তা বুঝবে নিরুপমা? আর ঠিক তার পরেই সেই একরাশ চুল, চুল, খালি চুল, আর কিছু নয়। ভয় হয় না মানুষের? হতে ত পারত চুইলা গজার? আর তা

যদি হত ত সেটাকে মেরে না তাড়ালে নিজে সে বাঁচত কেমন করে ?

একটা ঝোপের আড়ালে ব'সে কোলে মুখ গুঁজে আকুল হয়ে সে কাঁদতে লাগল। কান্নার মধ্যে তার দাদার মুখ, অন্তু-শন্তুর মুখ, তার বাবার মুখ মনে আসতে লাগল বারবার। অস্ফুট আর্তনাদের মত ক'রে সে ডাকতে লাগল, 'অন্তু রে, অন্তু! শন্তু, ও শন্তু! দাদা, দাদা! বাবা, বাবা, বাবা গো!"

খুব ইচ্ছে করতে লাগল, একটা কোনো দূর পথ দিয়ে বাবার কাছে চ'লে যায়, গিয়ে তাঁকে সব বলে। বাবা কত রকম বিপদ্ থেকে কতবার তাদের রক্ষা করেছেন। তিনি পুলিশ কোর্টে কাজ করতেন, পুলিশের লোকেরা তাই তাঁকে কত সমীহ করে, তিনি পারবেন না আজ তাকে রক্ষা করতে? পুলিশ এলে পারবেন না তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে দিতে?

কিন্তু তারা যদি না বোঝে, তারা যদি না শোনে তাঁর কথা?

নিরুপমাদের বাড়ীর খুব কাছেই ত থানা। এতক্ষণ সেখানে নিশ্চয় খবর পৌঁছে গেছে। নিরুপমা বঁটি হাতে ঘাটে এসেছিল, সে খবর শৈল, উমা, নন্দরাণীর কাছে সবাই পেয়ে গেছে। সেই গোঁফ-ওয়ালা মোটা ভীষণ চেহারার দারোগা নিশ্চয় দলবল নিয়ে এতক্ষণ নিরুপমার খোঁজে বেরিয়েছে।

আমবাগানের মধ্যে লণ্ঠন হাতে লোক ঢুকছে। মাঠের ও পাশটা একজন কেউ টর্চের আলো এপাশে-ওপাশে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে। ঐ হয়ত দারোগা। একদল লোক চীৎকার করে দূরের আর একদল লোককে কি বলছে। এরা নিশ্চয় পুলিশের লোক।

নিরুপমাকে একবার ধরতে পেলে ওরা যদি আর না ছাড়ে? যদি হাতে হাতকড়া পরিয়ে পথ দিয়ে টানতে টানতে তাকে নিয়ে যায়? নিয়ে যেতে ত পারে?

তারপর তারা মোটা গরাদে দেওয়া অন্ধকার স্যাঁৎ-সেঁতে একটা খুপরির মতন ঘরে তাকে বন্ধ করে রাখবে। হয়ত মারধোর করবে, কিছুদিন পরে আদালতে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবে। বিচারে নিশ্চয় তার ফাঁসীর হুকুম হবে, কারণ নিবারণকে সে খুন করেছে, খুন। খুনী আসামীদের ফাঁসীই ত হয়। তারপর একদিন সকলে মিলে গলায় ফাঁস পরিয়ে তাকে মারবে। বাবা, বাবা, বাবা গো!

হঠাৎ তার মনে হল, তার বাবা বৈঠকখানা ঘরে বসে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকাচ্ছেন বাইরের দিকে আর মনে মনে ভগবান্‌কে ডেকে বলছেন, নিরু যেখানে হয় চলে যাক, ও যেন বাড়ী ফিরে এসে পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে, ফাঁসীকাঠে যেন ঝুলতে না হয় তাকে।

কোথায় যাবে, কে আশ্রয় দেবে, কি রকম করেই বা দেবে, এ সব কিছুই সে ভাবল না। পথ অপথ বিচার না করে, খানাখন্দ ডিঙিয়ে, ঝোপঝাড় ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে পালাতে লাগল। ততক্ষণে সন্ধ্যা গভীর হয়েছে, রাশি রাশি কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। বাতাসে প্রায় ঝড়ের বেগ। এই আশ্রয়চ্যুতা ভয়ার্তা বালিকার ভিতরে বাইরে সর্বত্র এখন একটা প্রলয়ের বিভীষিকা। পৃথিবীর মানুষ যেদিন প্রলয়ের সম্মুখীন হবে, কি তারা করবে? নিশ্চয় পালাতেই চেষ্টা করবে। পালিয়ে বাঁচবার মত আশ্রয় কোথাও আছে কি না, থাকা সম্ভব কি না ভাববে না, পালাবে। নিরুপমাও সেই রকম কিছু না ভেবেই পালাতে লাগল। (ক্রমশঃ)

কবিতার ধর্ম ও মর্ম

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান বাতাবরণে কেউ কেউ বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ কচ্ছেন। বলছেন এটা বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ, ভাবাবেগপূর্ণ সুকুমার কাব্যসাহিত্যের যুগ নাকি শেষ হয়ে গেছে।· উত্তরে আমরা বলি সৎকাব্যের যুগ চিরদিন আছে এবং থাকবে।

সৎকাব্যের সার্থকতা:—সাহিত্য-রসিকেরা চিরদিন বলে আসছেন—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ॥

এই কাব্যরসাস্বাদ এবং সজ্জনসঙ্গম সাহিত্যের বৈঠকে একই কালে এবং একই ক্ষেত্রে সম্ভব এবং সার্থক হয়।

মনীষীরা বলেন—

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসুচ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥

ইহকাল পরকালে যা কিছু স্পৃহণীয়, দুঃখলাঘব ও সুখ বৃদ্ধির জন্য যে মানসিক সমতা ও শান্তি প্রয়োজনীয়, তা' অবশ্যই সৎকাব্যের সেবাদ্বারা লাভ করা যায়। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি কোলরিজের স্বীকারোক্তি অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলেছেন :—

"Poetry has been to me its exceeding great reward. It has soothed my afflictions—it has endeared my solitude and it has given me the habit of wishing to discover the good and the beautiful in all that meets and surrounds me."

অর্থাৎ আমার কবিতা আমার নিজের কাছেই যেন এক পরম পারিতোষিকের মত হয়েছে। সে আমার দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছে,—আমার নিঃসঙ্গ অবকাশকে প্রিয় করেছে এবং আমাকে এক নূতন অভ্যাস দান করেছে যার ফলে, আমার পারিপার্শ্বিক সব কিছুর মধ্যে, শুদ্ধ শু[illegible] এবং সুন্দরকে অনুসন্ধান করবার জন্য আমার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি জন্মেছে।

কুকবিত্ব :—অক্ষম পাচকেরা 'ধরা-পোড়া-নুনে জল'— ব্যঞ্জন পাক করে যেমন যজ্ঞ নষ্ট করেন, এবং ক্ষুৎ-পিপাসাতুর অতিথিগণের অন্তর বাহির এককালে বি[illegible] তোলেন, অসৎকাব্যস্রষ্টা অক্ষম কুকবিগণও তেমনি কাব্যরসপিপাসুদের অন্তর বিষিয়ে তোলেন এবং কা[illegible] সাহিত্যের প্রতি একান্ত অনাস্থা ও বিরক্তি উৎপাদ[illegible] করেন। তাই আচার্য ভামহ বলেন :—

নাকবিত্বমধর্মায় ব্যাধয়ে দণ্ডনায় বা।
কুকবিত্বং পুনর্লোকে মৃতিমাহুর্মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ কবিত্ব না থাকলে অপরাধ নেই, কি[illegible] কুকবিত্ব মৃত্যুর মতই ভয়াবহ!

সমন্বয়ের যুগ—প্রকৃতপক্ষে এ যুগ সমন্বয়ের যুগ বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প এবং তৌর্যত্রি[illegible] বিদ্যা প্রভৃতি যাতে সত্য-শিব-সুন্দরের স্বাদ এবং সন্ধা[illegible] আছে, তাই এ যুগের অনুশীলন এবং গবেষণার যোগ[illegible] বিষয়।

মধ্যপন্থা—একান্ত ভাবালুতাময় আবেগ, কৃত্রি[illegible] যন্ত্রোদ্গীর্ণ কবিতার গতানুগতিকতা, কিম্বা নিতান্ত শু[illegible] নঞর্থক নেতিবিচার দ্বারা কবিরা এযুগে জনপ্রিয় হতে পারবেন না। তাই মধ্যপন্থা অনুসরণ করা এবং বর্তমা[illegible] যুগের সুখদুঃখের সংবেদনাকে রুচিকর রূপদান ক[illegible] পাঠকের চিত্তে রসসঞ্চার করাই হবে সুখকর এবং শুভঙ্কর কবিপ্রতিভা সুলভ নয়, তাই প্রাচীনেরা বলেন—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥

কবির যশ ও জনপ্রিয়তায় লুব্ধ হয়ে অথচ তাঁর দুর্লভ প্রতিভার অধিকারে বঞ্চিত হয়ে, ঢালহীন তলোয়ারহীন একশ্রেণীর নিধিরাম সর্দার, সাহিত্যের রণক্ষেত্রে সখের সিপাহীরূপে অবতীর্ণ হয়ে Don Quixote-এর মত হাস্যকর ভূমিকার অভিনয় কচ্ছেন। ভাব ভাষা এবং প্রেরণাহীন রঙবেরঙের রচনা প্রকাশ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে যা প্রদর্শিত হচ্ছে তা কবিতা নয় কাব্যের সঙ।

কাব্যের উপাদান—কাব্যের বিষয়বস্তু অসীম অনন্ত। জীবনে এবং জগতে যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর কায়মনো-বাক্যের বিষয় তা সবই কবিতার উপাদান হতে পারে। এমন কোন শাস্ত্র, শিক্ষা, বিদ্যা বা কলা নেই যা কাব্যের বিষয়ীভূত হতে না পারে। তাই কবির উপর ন্যস্ত যে ভার তাকে 'মহাভার' বলা হয়েছে :—

ন তচ্ছাস্ত্রং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন তৎকলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহোভারো মহান্ কবেঃ ॥

কাব্যের শরীর ও আত্মা :

'তস্য শব্দার্থৌ শরীরম্',—শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর এবং 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—রসাত্মক বাক্যই কাব্যের প্রাণ। ছন্দ ভাষা অলঙ্কার বা নানাবিধ আঙ্গিকের যদি কিছু অল্পতা বা অভাব থাকে, তাহলেও তা কবিতা হতে পারে, শুধু ততটুকু থাকলেই যথেষ্ট হবে যার দ্বারা পাঠকের মনে রসের আস্বাদ দেওয়া যায়, অন্তরে মোহসৃষ্টি করা যায়।

কবিতায় 'ভাব' বস্তুকে 'অবিনাভাব (sine qua non) সম্বন্ধে আবদ্ধ করা হয়েছে। ভাবের ঘরে ফাঁকি থাকা চলবে না। কাব্যসম্পদের বহু অভাব সত্বেও কবিতা কাব্যসংজ্ঞা লাভ করতে পারে—যদি থাকে তার 'ভাব হতে রূপে'—যাওয়া আসা করবার মত রসের রসদ, ভাবের সম্পদ এবং কল্পনার গতিবেগ বৈভব। আলঙ্কারিক বলেন :—

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন রসো ভাববর্জিতঃ।
পরস্পরকৃতাসিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ ॥

কাব্যের দোষ গুণ—খুব সাধারণ কথায় বলা যায় "রসাপকর্ষকা হি দোষাঃ" অর্থাৎ কাব্যের রসগ্রহণে যা বিঘ্ন ঘটায় তাই দোষ। রসের চমৎকারিত্বই কাব্যের গুণ। "রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।" রসের চমৎ-কারিত্বই সহৃদয় পাঠকের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে।

তিক্ততা কটুতা তুচ্ছতা বর্বরতা বাগাড়ম্বরপূর্ণতা অশ্লীলতা সৎকাব্যে যথাসম্ভব বর্জনীয়। কারণ "জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ"।

আধুনিক কাব্যে রুচিবিকার—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কাব্যের একটা গুণ যে কবির রচনাশক্তি পাঠকের মনকে টেনে এনে লেখকের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়, তাকে তদ্ভাবে ভাবিত করে তোলে। আধুনিক কবিতা এ দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে।" উপাদেয় বিষয়-বস্তুকেও হেয় রূপে বর্ণনা করা বর্তমান যুগের রুচি-বিকারের পরিচয় বহন কচ্ছে।

কাব্যের প্রসাদ গুণ—কবির কাব্য সকলের অন্তরে প্রবেশ করবার জন্য। "বোবায় কয় কালায় শোনে, অন্যে কি তার মর্ম জানে ?" কবিতা এরূপ হেঁয়ালী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—"কান থেকে প্রাণে পৌছবার সহজ রাস্তাটা খোঁজাই কবিতার সব চেয়ে বড় সাধনা। সেই সাধনা যদি নিজের লক্ষ্য ভুলে সম্পূর্ণ উল্টো রাস্তাতেই চলে, বোঝাতে যাওয়ার চেয়ে না-বোঝানই যদি তার লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়, পাঠকের মনে প্রবেশের পথ না হয়ে ভাষা যদি নিষেধের পাচিল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, তাহলে কবিতার কোন সার্থকতাই আছে কিনা সন্দেহ।"

"অতীতের অনুকরণও তাই যেমন নিন্দনীয় আধু-নিকতার নামে যে কোন হুজুগের ঢেউই তেমনি প্রগতির সামিল নয়।"

"নূতনত্বের নামে যে কোন বাতুলতাই এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ নয়।"

"সব কিছুর মতই সাহিত্যেও হুজুগের ঢেউ আসে। আমাদের কাব্যে বিদেশ থেকে সেই ঢেউ কিছু কাল আগে এসেছিল। যা সত্যকার সাহিত্য তা সর্বকালীন সর্বজনীন। সাময়িক বিকার বিশৃঙ্খলা সবদেশের সাহিত্যেই মাঝে মাঝে দেখা দেয়। বিদেশের সুস্থ প্রেরণাকে বাদ দিয়ে বিকারের ছোঁয়াচটুকুই যখন গ্রহণ করি, তখন সেটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

কবিতার ধর্ম ও মর্ম

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান বাতাবরণে কেউ কেউ বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ কচ্ছেন। বলছেন এটা বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ, ভাবাবেগপূর্ণ সুকুমার কাব্যসাহিত্যের যুগ নাকি শেষ হয়ে গেছে। উত্তরে আমরা বলি সৎকাব্যের যুগ চিরদিন আছে এবং থাকবে।

সৎকাব্যের সার্থকতা—সাহিত্য-রসিকেরা চিরদিন বলে আসছেন—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ॥

এই কাব্যরসাস্বাদ এবং সজ্জনসঙ্গম সাহিত্যের বৈঠকে একই কালে এবং একই ক্ষেত্রে সম্ভব এবং সার্থক হয়।

মনীষীরা বলেন—

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥

ইহকাল পরকালে যা কিছু স্পৃহণীয়, দুঃখলাঘব ও সুখ বৃদ্ধির জন্য যে মানসিক সমতা ও শান্তি প্রয়োজনীয়, তা' অবশ্যই সৎকাব্যের সেবাদ্বারা লাভ করা যায়। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি কোলরিজের স্বীকারোক্তি অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলেছেন :—

"Poetry has been to me its exceeding great reward. It has soothed my afflictions—it has endeared my solitude and it has given me the habit of wishing to discover the good and the beautiful in all that meets and surrounds me."

অর্থাৎ আমার কবিতা আমার নিজের কাছেই যেন এক পরম পারিতোষিকের মত হয়েছে। সে আমার দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছে,—আমার নিঃসঙ্গ অবকাশকে প্রিয় করেছে এবং আমাকে এক নূতন অভ্যাস দান করেছে যার ফলে, আমার পারিপার্শ্বিক সব কিছুর মধ্যে, শুদ্ধ শুচি এবং সুন্দরকে অনুসন্ধান করবার জন্য আমার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি জন্মেছে।

কুকবিত্ব :—অক্ষম পাচকেরা 'ধরা-পোড়া-নুনে জরা'—ব্যঞ্জন পাক করে যেমন যজ্ঞ নষ্ট করেন, এবং ক্ষুৎ-পিপাসাতুর অতিথিগণের অন্তর বাহির এককালে বিষিয়ে তোলেন, অসৎকাব্যস্রষ্টা অক্ষম কুকবিগণও তেমনি কাব্যরসপিপাসুদের অন্তর বিষিয়ে তোলেন এবং কাব্য সাহিত্যের প্রতি একান্ত অনাস্থা ও বিরক্তি উৎপাদন করেন। তাই আচার্য ভামহ বলেন :—

নাকবিত্বমধর্মায় ব্যাধয়ে দণ্ডনায় বা।
কুকবিত্বং পুনর্লোকে মৃতিমাহুর্মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ কবিত্ব না থাকলে অপরাধ নেই, কিন্তু কুকবিত্ব মৃত্যুর মতই ভয়াবহ!

সমন্বয়ের যুগ—প্রকৃতপক্ষে এ যুগ সমন্বয়ের যুগ বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প এবং তৌর্যত্রিক বিদ্যা প্রভৃতি যাতে সত্য-শিব-সুন্দরের স্বাদ এবং সন্ধান আছে, তাই এ যুগের অনুশীলন এবং গবেষণার যোগ্য বিষয়।

মধ্যপন্থা—একান্ত ভাবালুতাময় আবেগ, কৃত্রিম যন্ত্রোদ্গীর্ণ কবিতার গতানুগতিকতা, কিম্বা নিতান্ত শুষ্ক নঞর্থক নেতিবিচার দ্বারা কবিরা এযুগে জনপ্রিয় হতে পারবেন না। তাই মধ্যপন্থা অনুসরণ করা এবং বর্তমান যুগের সুখদুঃখের সংবেদনাকে রুচিকর রূপদান করে পাঠকের চিত্তে রসসঞ্চার করাই হবে সুখকর এবং শুভঙ্কর। কবিপ্রতিভা সুলভ নয়, তাই প্রাচীনেরা বলেন—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥

কবির যশ ও জনপ্রিয়তার লুব্ধ হয়ে অথচ তাঁর দুর্লভ প্রতিভার অধিকারে বঞ্চিত হয়ে, ঢালহীন তলোয়ারহীন একশ্রেণীর নিধিরাম সর্দার, সাহিত্যের রণক্ষেত্রে সখের সিপাহীরূপে অবতীর্ণ হয়ে Don Quixiote-এর মত হাস্যকর ভূমিকার অভিনয় কচ্ছেন। ভাব ভাষা এবং প্রেরণাহীন রঙবেরঙের রচনা প্রকাশ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে যা প্রদর্শিত হচ্ছে তা কবিতা নয় কাব্যের সং।

কাব্যের উপাদান—কাব্যের বিষয়বস্তু অসীম অনন্ত। জীবনে এবং জগতে যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর কায়মনো-বাক্যের বিষয় তা সবই কবিতার উপাদান হতে পারে। এমন কোন শাস্ত্র, শিক্ষা, বিদ্যা বা কলা নেই যা কাব্যের বিষয়ীভূত হতে না পারে। তাই কবির উপর ন্যস্ত যে ভার তাকে 'মহাভার' বলা হয়েছে :—

ন তচ্ছাত্রং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন তৎকলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহোভারো মহান্ কবেঃ॥

কাব্যের শরীর ও আত্মা :

'তস্য শব্দার্থৌ শরীরম্',—শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর এবং 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—রসাত্মক বাক্যই কাব্যের প্রাণ। ছন্দ ভাষা অলঙ্কার বা নানাবিধ আঙ্গিকের যদি কিছু অল্পতা বা অভাব থাকে, তাহলেও তা কবিতা হতে পারে, শুধু ততটুকু থাকলেই যথেষ্ট হবে যার দ্বারা পাঠকের মনে রসের আস্বাদ দেওয়া যায়, অন্তরে মোহসৃষ্টি করা যায়।

কবিতায় 'ভাব' বস্তুকে 'অবিনাভাব (sine qua non) সম্বন্ধে আবদ্ধ করা হয়েছে। ভাবের ঘরে ফাঁকি থাকা চলবে না। কাব্যসম্পদের বহু অভাব সত্বেও কবিতা কাব্যসংজ্ঞা লাভ করতে পারে—যদি থাকে তার 'ভাব হতে রূপে'—যাওয়া আসা করবার মত রসের রসদ, ভাবের সম্পদ এবং কল্পনার গতিবেগ বৈভব। আলঙ্কারিক বলেন :—

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন রসো ভাববর্জিতঃ।
পরস্পরকৃতাসিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ॥

কাব্যের দোষ গুণ—খুব সাধারণ কথায় বলা যায় "রসাপকর্ষকা হি দোষাঃ" অর্থাৎ কাব্যের রসগ্রহণে যা বিঘ্ন ঘটায় তাই দোষ। রসের চমৎকারিত্বই কাব্যের গুণ। "রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।" রসের চমৎ-কারিত্বই সহৃদয় পাঠকের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে।

তিক্ততা কটুতা তুচ্ছতা বর্বরতা বাগাড়ম্বরপূর্ণতা অশ্লীলতা সৎকাব্যে যথাসম্ভব বর্জনীয়। কারণ "জঘন্য-গুণাবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ"।

আধুনিক কাব্যে রুচিবিকার—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কাব্যের একটা গুণ যে কবির রচনাশক্তি পাঠকের মনকে টেনে এনে লেখকের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়, তাকে তদ্ভাবে ভাবিত করে তোলে। আধুনিক কবিতা এ দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে।" উপাদেয় বিষয়-বস্তুকেও হেয় রূপে বর্ণনা করা বর্তমান যুগের রুচি-বিকারের পরিচয় বহন কচ্ছে।

কাব্যের প্রসাদ গুণ—কবির কাব্য সকলের অন্তরে প্রবেশ করবার জন্য। "বোবায় কয় কালায় শোনে, অন্যে কি তার মর্ম জানে?" কবিতা এরূপ হেঁয়ালী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—"কান থেকে প্রাণে পৌঁছবার সহজ রাস্তাটা খোঁজাই কবিতার সব চেয়ে বড় সাধনা। সেই সাধনা যদি নিজের লক্ষ্য ভুলে সম্পূর্ণ উল্টো রাস্তাতেই চলে, বোঝাতে যাওয়ার চেয়ে না-বোঝানই যদি তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, পাঠকের মনে প্রবেশের পথ না হয়ে ভাষা যদি নিষেধের পাচিল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, তাহলে কবিতার কোন সার্থকতাই আছে কিনা সন্দেহ।"

"অতীতের অনুকরণও তাই যেমন নিন্দনীয় আধু-নিকতার নামে যে কোন হুজুগের ঢেউই তেমনি প্রগতির সামিল নয়।"

"নূতনত্বের নামে যে কোন বাতুলতাই এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ নয়।"

"সব কিছুর মতই সাহিত্যেও হুজুগের ঢেউ আসে। আমাদের কাব্যে বিদেশ থেকে সেই ঢেউ কিছু কাল আগে এসেছিল। যা সত্যকার সাহিত্য তা সর্বকালীন সর্বজনীন। সাময়িক বিকার বিশৃঙ্খলা সবদেশের সাহিত্যেই মাঝে মাঝে দেখা দেয়। বিদেশের সুস্থ প্রেরণাকে বাদ দিয়ে বিকারের ছোঁয়াচটুকুই যখন গ্রহণ করি, তখন সেটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

কাব্যসাহিত্যের সার্বভৌমতা :—কাব্য সাহিত্য অন্তরকে প্রসারিত করে, মনের উন্নতি বিধান করে এবং জাতীয়তাবাদের পরিধি তথা ভৌগোলিক চতুঃসীমা কিছুই স্বীকার করে না।

সাহিত্য সকল দেশের, সকল জাতির মধ্যে প্রীতির রাখী বন্ধন করে। রসপিপাসু নর-নারীর মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের দ্বারা আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করে তাই কবিগুরু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।" সাহিত্য নিষ্প্রাকার এবং নিষ্প্রত্যূহ—বিভিন্ন দেশের সামাজিক গোঁড়ামির অচলায়তনকে সচলায়তন এবং অবাধগমন করে তোলে। "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ" "এবং মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে"—তাই কবিগণ সর্বত্র অবাধে বিচরণ করে থাকেন—এবং বলেন 'সব ঠাই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া' ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় তারে আমি লব চিনিয়া সমগ্রবিশ্বে কবিগুরুর শতবার্ষিক এবং সেক্সপীয়রের তিন শত বার্ষিক স্মরণমহোৎসবই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

অনুভূতি—অনুমিতি ও অনুকৃতি : -

যা আমরা নিজেরা অনুভব করি তাই আমাদের অনুভূতি। যে সমস্ত ভাব আমরা অপরের মাধ্যমে সাংবাদিকের সংবাদে, অভিনেতার অভিনয়ে অথবা সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টির প্রসাদরূপে পাই, তাই হয় আমাদের অনুমিতি। কোন বাস্তব ঘটনা বা পূর্বসূরীদের সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি বা শিল্পকলা দেখে বা শুনে আমরা তার যে অনুকরণ করি তাই অনুকৃতি। শিল্পের মধ্যে অনুকরণ প্রায়ই কিছু না কিছু থাকে, কারণ মূলতঃ শিল্প মাত্রই প্রকৃতির অনুকরণ। যাকে আমরা প্রশংসা করি ভালবাসি যার দ্বারা আমরা মুগ্ধ হই তার সুর ছন্দ ভাষা শৈলী এমনকি পরিচ্ছদ এবং প্রসাধনপারিপাট্যও আমরা অনেক সময় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অনুকরণ করি। ইহা একদিকে যেমন স্রষ্টার শক্তিমত্তার পরিচয় অন্যদিকে আমাদের ভক্তিমত্তা ও অনুকরণপ্রিয়তার নিদর্শন।

কবির সৃজনী প্রতিভা :—

আলঙ্কারিকেরা কবিকে স্রষ্টা বা প্রজাপতি বলেছেন। তাঁর প্রতিভার কল্পনাশক্তি (Imagination) কে 'নবনবোন্মেষশালিনী' বলেছেন। এই প্রতিভা দ্বিবিধ কারয়িত্রী এবং ভাবয়িত্রী। কারয়িত্রী প্রতিভা সৃজনী শক্তি দান করে এবং তা তাঁর স্বকীয় কাব্যসৃষ্টিতে প্রেরণা দান করে।

ভাবয়িত্রী প্রতিভা সহৃদয় পাঠকপাঠিকাকে তদ্ভাবে ভাবিত করে।

পাঠকের হৃদয়ে কবি তাঁর নিজস্ব ভাব প্রতিভাসিত করেন বলেই এই শক্তিকে 'প্রতিভা' বলা হয়। ধ্বনির উত্তরে যেমন প্রতিধ্বনি হয় তেমনি ভাবের উত্তরে পাঠকের অন্তরে এক প্রতিফলিত বা প্রতিধ্বনিত ভাব সঞ্চারিত হয় (echo phenomenon).

কবি ইচ্ছাময়, তিনি ইচ্ছামাত্রে নূতন কল্পনাজগৎ বা ভাবজগৎ সৃষ্টি করে নেন। আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে বলেছেন :—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ

যথা স্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ত্ততে। অর্থাৎ অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র স্রষ্টা। তাঁর যেমন অভিরুচি তাঁর কাব্যজগৎ ঠিক সেই মতই পরিবর্তিত হয়।

সেক্সপীয়রের ভাষায় :—

"As imagination bodies forth,
The forms of things unknown,—the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy
nothing
A local habitation and a name."

কবি ঈক্ষণমাত্রেই 'সব পেয়েছির দেশ' বা 'নাই কোথাও এর দেশ' সৃষ্টি করেন,—অন্ধকারের মধ্যে যক্ষপুরীর জালাবরণে স্বর্ণলিপ্সা ও অর্থগৃধ্নুতার মূর্তিমান প্রতীকরূপে 'রাজা'কে মঞ্চস্থ করেন। কবির সপ্রতিভ কল্পনাই তাঁর আলাদীনের প্রদীপ। শ্রোতব্য এবং শ্রুত

বিষয়ের অনুধ্যানে, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে, তাকে একটু ঘর্ষণ করলেই নূতন নূতন জগৎ সৃষ্টি হয়।

প্রতিভা বা প্রজ্ঞাই কবির তৃতীয় চক্ষু, সরস্বতী কণ্ঠাভরণের টীকায় রত্নেশ্বর বলেন—

রসানুগুণশব্দার্থচিন্তাস্তিমিতচেতসঃ

ক্ষণং স্বরূপস্পর্শোত্থা প্রজ্ঞৈব প্রতিভা কবেঃ।

সা হি চক্ষুর্ভগবতস্তৃতীয়মিতি গীয়তে

যেন সাক্ষাৎ করোত্যেষ ভাবাংস্ত্রৈকাল্যবর্তিনঃ॥

রসসম্পৃক্ত শব্দার্থের চিন্তায় নিহিতচিত্ত কবির অন্তরে বস্তুস্বরূপের স্পর্শজাত যে বিশেষ চেতনা বা প্রজ্ঞার বিকাশ হয় তাহাই কবিপ্রতিভা,—ইহা যেন শিবের তৃতীয় নেত্র বা অর্জুনের 'দিব্যচক্ষু'। ইহার সাহায্যেই তিনি ত্রিকালবর্তী ভাবসমূহ ঋষির মত প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

তাই Apolloর মুখে Shelley বলতে পেরেছেন :— "I am the eye with which the universe beholds itself and knows itself divine".

দর্শনের ঋষি এবং সাহিত্যের কবি উভয়েই—সত্য-শিব-সুন্দরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধে বাঁধা। ঋষি বলেছেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—কবি গেয়েছেন, 'আনন্দলোকে দ্বার খুলেছে আকাশ পুলকময়। জয় ভূলোকের জয় দ্যুলোকের জয় আলোকের জয়'।—'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্যসুন্দর'।—'আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো',—আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো'। অথবা 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর,—ধন্য হল অঙ্গ মম পুণ্য হল অন্তর'।

রসবস্তু কাব্যে ও দর্শনে—আলঙ্কারিক বলেন যে শুধু 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' নহে সে-রসের আস্বাদন 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ

বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যোব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

সাহিত্যদর্পণ ৩।১৪

অর্থাৎ সহৃদয় পাঠক (বা নাট্যদর্শক) নিজের দেহ বা আত্মার মত অভিন্নভাবে যে রস আস্বাদন করেন,—সাত্ত্বিকভাবের উদ্রেক হয় বলে সেই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দময়, চিন্ময়, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ও ব্রহ্মাস্বাদের সহিতই তুলনীয়।

বৈদান্তিকও তাই বলেন, রসোবৈ সঃ,—'স এব রসানাং রসতমঃ' 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা স্বস্থীভবতি নন্দীভবত্যনুভবতি' (ছান্দোগ্যশ্রুতি) সুরেশ্বরাচার্য কৃত দীপিকায় পাই—

"রসাৎ সারোমৃতং ব্রহ্ম আনন্দোজ্জ্বাদ উচ্যতে

নিঃসারং তেন সারেণ সারবল্লক্ষ্যতে জগৎ।"

অর্থাৎ জগৎটা যেন নিঃসার আখের ছিবড়ের মত, আর মধুব্রহ্মই সেই নিঃসার জগতের মধ্যে রস সঞ্চার করে আখের মতই তাকে রসিয়ে তুলেছেন।

মধু ব্রহ্ম—তাই মধুমতীঋককে শ্রুতি বলেন 'মধুক্ষরন্তি তদ্‌ব্রহ্ম,—মধুক্ষরতি যদ্ ব্রহ্ম',—মধু বাতা ঋতায়তে'—বায়ুর দ্বারা মধু হিল্লোলিত তরঙ্গায়িত হচ্ছে—পৃথিবীর ধূলি পর্যন্ত মধুময় হয়ে উঠেছে,—'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'।

কাব্যের মধু—এই মধু, এই রস, এই আনন্দ স্বরূপকে কাব্যসাহিত্যের আলঙ্কারিক তার সৌন্দর্য মাধুর্যের একটু আভাস মাত্র দিয়ে, বর্ণনা করতে হার মেনে, বলেছেন 'অনির্বচনীয়'। দেবর্ষি নারদ বলেছেন 'মূকাস্বাদনবৎ'। ধ্বন্যালোকে বলা হয়েছে—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥

অর্থাৎ মহাকবিদের বাণীতে তার আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করেও এক নিগূঢ় বিচিত্র অর্থের দ্যোতনা থাকে, যেমন নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য অতিক্রম করে তাদের গঠনসৌষ্ঠবের সমষ্টির এক অনির্বচনীয় লাবণ্য প্রকাশ পায়। মেয়েলি ভাষায় মেয়েটি রূপসী না হলেও, এই লাবণ্য থাকলে, মেয়েরা তার 'আলগা ছিরি'র (শ্রীর) প্রশংসা করেন। যখন দৈহিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য থাকে এবং

সে সৌন্দর্যকেও যখন সে লাবণ্য অতিক্রম করে,—তখন বৈষ্ণব কবি তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,—

'কিবা ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায় ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়।'

তখন সত্যই সে লাবণ্য তরঙ্গ তুলে অবনীবক্ষ প্লাবিত করে। নইলে শুধু 'আলুথালু ছিরি কাজলা আঁখি মেয়ে' হয়েই সে দ্রষ্টার ক্ষণিক মনোহরণ করে মাত্র। কবি হয়তো তাকে স্মরণ করেন—'কালো? তা সে যতই কালো হোক,—দেখেছি তার কালো হরিণচোখ।' পাঠকের হয়তো সেক্সপীয়রের সনেটে বর্ণিত 'dark lady'র কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। যদিও তার রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি।

কাব্যের প্রাণ—আলঙ্কারিক বলেন—"বাগ্বৈদগ্ধ্য প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।" কাব্যে শব্দ, বাক্য এবং অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করলেও—রসই কাব্যের প্রাণ।

এই রসের কথা পূর্বেই কিছু বলেছি। কবি বলেছেন এই রস যেন 'ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মন্দির সঙ্গীত'। চিত্রশিল্পীর হাতে এই 'রস' অপরূপ ছায়া সুষমার খেলায় বিচিত্র ভাবের দ্যোতনা করে। সে যেন রূপ, অরূপ এবং অপরূপের এক মিলন মেলা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে সেই বর্ণনার বাচ্যবাচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা রক্ষা করতে হবে'

যে কাব্যে অনির্বচনীয়তা যত বেশী থাকে সেই কবিতা তত উচ্চ পর্যায়ের, তত সার্থক এবং রসোত্তীর্ণ।

সুরশিল্পীর কাছে এই রস harmony,—সে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গীতের একতান সঙ্গতি রক্ষা করে এবং নাদব্রহ্মের সন্ধান দেয়।

রসোত্তীর্ণ কাব্যঃ—কবির কল্পনা, 'স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে'—সে বিবাহ রসলোকে বহন করে নিয়ে যায় আমাদের মানস অনুভূতিকে। রবীন্দ্রনাথ তাই সংক্ষেপে বলেছেন তাঁর গানের একটীমাত্র পালা, সেটী 'সীমার সঙ্গে অসীমের' মিলনমেলা। 'অণোরণীয়ান'কে সে 'মহতোমহীয়ানে'র সঙ্গে সম্মিলিত করে ভূমার আস্বাদ দান করে। তিনি বলেছেন তাঁর 'গানের মধ্যে লক্ষিত হয়েছে, দিনে দিনে সৃষ্টির প্রথম রহস্য 'আলোকের প্রকাশ', আর সৃষ্টির শেষ রহস্য 'ভালবাসার অমৃত'।

সুন্দরের এই অপরূপ অনির্বচনীয় রস কালাবচ্ছিন্ন নয়—অচলপ্রতিষ্ঠ এবং শাশ্বত। তাই কবি Keats বলেছেন:

"A thing of beauty is a joy for ever
Its loveliness increases, it will never
Pass into nothingness"

কবি যেন বৃদ্ধিজীবী মহাজনের মত। তাঁর সৃষ্টির চমৎকারিত্ব চিরদিন চক্রবৃদ্ধি সুদে আসলকে বাড়িয়ে যেতেই থাকে, ফলে অধমর্ণ ইতিহাস কোনোদিনই তার ঋণ শোধ করতে পারে না।

কবি সত্যেন্দ্র দত্ত ফরাসী কবি পল ভার্লেকে অনুবাদ করেছেন,—

কবিতা সে হবে শুধু সঙ্গীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন
আভাসের ভাষাখানি প্রভাতের মন্থিম বাতাস
দু'পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন
বাকী যাহা, সে কেবল পণ্ডশ্রম পাণ্ডিত্যপ্রয়াস।

সার কথা এই যে—"তয়া কবিতয়া কিংবা, তয়া বনিতয়া তথা,—পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ?"—সে কবিতার মাধুরীই বা কি, আর সে রূপসীর রূপই বা কি, যে পদবিন্যাসমাত্রেই মনকে অপহরণ করে না।

কবিতার ভাষা—কবির ভাষায় অভিধার চেয়ে ব্যঞ্জনাই বেশী প্রভাব প্রকাশ করে। ধ্বনি এবং দ্যোতনা suggestiveness)ই তার প্রধান সম্পদ। কবির কাব্যের ভাষায় তাঁর জীবনরহস্যের নানান্ ভাষ্য ও টীকায় (Criticism of life—mathew Arnold) তাঁর আবেগময় পরিকল্পনার কিছু আতিশয্য থাকে (in which emotional and imaginative elements predominate) কবি সেই বিচিত্র বস্তুকে তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশানো—স্বকীয় পাকপ্রণালীতে ভিয়ান করে উপাদেয় মিষ্টান্নরূপে পাঠক পাঠিকাদের পরিবেশন করেন। ভাষার ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা ব্যতীত শুধু ছন্দ মিল উপমা অনুপ্রাস দিয়ে শুধু ধ্বনিময় ঝঙ্কারময় বাক্‌চাতুরী দিয়ে যা

হয় তা কবিতা নয়, সে শুধু পণ্ডশ্রম পাণ্ডিত্যপ্রয়াস কথার কারসাজি বা jugglery of words!

আধুনিক কবিতা ও তার 'সন্ধ্যাভাষা :—

সাড়ম্বরে প্রচার কার্য চলছে যাতে আধুনিক কবিকে দীর্ঘ ছাড়পত্র দেওয়া হয়, যাতে তাঁর ব্যাসকূটের হেঁয়ালির মত বক্তব্য তিনি যে কোন অপ্রচলিত শব্দ সংযোজনার দ্বারা ইচ্ছামত প্রকাশ করবার লাইসেন্স বা পাশ পান। এর জন্য এই হেঁয়ালির ভাষাকে 'সন্ধ্যা-ভাষা' নামে নূতন সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে তার যে 'গোয়ার্চাদ' রূপ দেখছি, তাতে তার ভাবী 'কালাচাঁদ' রূপের কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি। তমসো মা জ্যোতির্গময়—বা অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার প্রার্থনা মানুষের সহজাত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করবার প্রবৃত্তি ব্যাধিগ্রস্ত মনেরই পরিচায়ক এবং তা আত্মঘাতী অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণের পরিণাম যে "অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ—তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাঠকেরা চিরদিনই চান 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ। লেখকের লেখার স্বাধীনতা পাঠকের বোধপরতন্ত্রতাকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে পারে না,—কারণ তাহলে সেরূপ লেখা হবে acrobatic feats of words—অর্থাৎ অর্থহীন কথার সার্কাসবাজী।

আধুনিক কবিতার উৎস য়ুরোপীয় অনুপ্রেরণা প্রসূত বলেই তা হেয় বা বর্জনীয় নয়। কবিগুরুর স্বপ্নোত্থিত গিরি নির্ঝরের মত সে তার পাষাণকারা ভগ্ন করে আপনার পথ আপনি কেটে নিক্। তার আপন গতিবেগে আপনার পথ গভীর এবং প্রশস্ত করে নিতে পারলে তা অবশ্যই প্রশংসা অর্জন করবে। কিন্তু তার পাথেয় হতে হবে তার স্বীয় প্রাণশক্তি নইলে শুধু মাছি-মারাকেরাণীর মত বাগাবুলানো অন্ধ অনুকরণের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হবে সুদূরপরাহত। কয়েকটি সাধারণ অভিযোগ এ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করছি হিতাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হয়ে। প্রথম অভিযোগ 'একঘেয়েমি—প্রচলিত রীতির প্রতি অহেতুক অবজ্ঞা এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতার ফলে যে কোনো আধুনিক কবির কবিতার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করলে তা অপর যে কোনো আধুনিক কবিতার সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিলে যায়। দ্বিতীয়,—উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তির অনুপযোগিতা। তৃতীয়,—দীর্ঘ বিষয়বস্তু বর্ণনার উপযোগী আখ্যানশক্তির অভাব। চতুর্থ—অর্থ প্রতিপত্তির অক্ষমতা। কৃতবিদ্য পাঠকেরা দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা সমস্যাকণ্টকিত বিচার বিতর্ক সবই বুঝবেন,—কেবল ওই 'কবিতা'র কোনো গঠন বা অবয়ব (form) না থাকলেও শুধু কবিতার শিরোনামা দেখে লোকে তাকে কবিতা বলবে এবং তার অর্থকে 'অবাঙ্‌মনসগোচর' বলে শুধু ক্ষমা নয় সম্মান করবে এরূপ প্রশ্রয়ের কামনা কথনই যুক্তিসহ হতে পারে না। পঞ্চম,—উপমার অদ্ভুতত্ব—যেমন চীনেবাদামের খোসার মত নির্মল বাতাস! এ বিষয়ে শুধু দিগ্‌দর্শন মাত্রই করলাম কবি ও কাব্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য।

ছন্দের কথা।—বাঁধাধরা অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা স্তবকনিবদ্ধ ছন্দ ব্যতিরেকেও কবিতা হতে পারে,—যদি রচনাশৈলীতে ভাবসাম্য, সামঞ্জস্য ও সুষমতা রক্ষিত হয়। কারণ গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, বাক্যের লাবণ্যলীলভঙ্গী ও চলার গতিভঙ্গী বা ছন্দ তার অপরিহার্য সম্পদ। ছন্দ বলতে—তার উদার ব্যাপক অর্থে আমরা বুঝি একপ্রকার সুনির্বাচিত সুবিন্যস্ত পদবিন্যাসের ললিতকলা যার প্রভাবে গদ্যে পদ্যে এবং সঙ্গীতে একটি সুমধুর শ্রুতিসুখকর নৃত্যভঙ্গিমা সঞ্চারিত হয়। যার ফলে তার চলার ভঙ্গীতে লাগে তটিনীর হিল্লোল অথবা হিন্দোলের দোদুলদোলা।

ছন্দোবদ্ধ এবং ছন্দোবর্জিত কবিতার মধ্যে মনোহারিত্বের তারতম্য বোধ করার সহজ উপায়,—যে কোন উৎকৃষ্ট ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে গদ্যে রূপান্তরিত (Prose order) করে দেখা; যেহেতু সেইভাবে দেখলেই তখন তার ছন্দোহীনতার দুর্গতি ও দারিদ্র্য স্পষ্টই বোঝা যাবে এবং ছন্দের মূল্যও নিঃসংশয়ে প্রমাণ হবে।

কাব্য ও অলঙ্কার :—পূর্বেই বলা হয়েছে কাব্য একটা অখণ্ড সৃষ্টি। ব্রহ্মের মতই 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্' এবং 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্—' সুতরাং কাব্যদেহে অলঙ্কার, গুণ, রীতি, বৃত্তি, প্রভৃতির

বিভাগ প্রদর্শন নিতান্তই ব্যবহারিক এবং শিক্ষার্থীদের বোধসৌকর্যের জন্যই এর উপযোগিতা। তাই কাব্য পৃথক, এবং তার অলঙ্কার পৃথক, এরূপ কল্পনা যুক্তিসহ নহে। কাব্যে অলঙ্কারযোগ যেন painting the lily বা কুমুদ কহ্লারকে চিত্রিত করে তার শোভাবৃদ্ধির অপচেষ্টা মাত্র। তাই অলঙ্কার কাব্যের দেহে যোগকরা হয় না, অলঙ্কৃত বস্তুই কাব্যরূপে স্বীকৃতি ও মর্যাদালাভ করে। তাই কুন্তক বলেন—'সালঙ্কারস্য কাব্যতা'। ইহা নারীদেহের অলঙ্কারের মত বহিঃস্থিত পৃথক বস্তু নয়, ইহা কর্ণের সহজাত মকরকুণ্ডলের মত, অঙ্গের সহিত প্রত্যঙ্গের মত অপৃথক ভাবে সন্নিবিষ্ট।

কাব্যের ফুলফোটানো :—কবির পিপাসা এই যে তার কাব্যের মালঞ্চে ফুল ফোটাতে হবে। কারণ তার অন্তরে বিকাশ-ভিখারী অশরীরী এক শিশু বহির্জগতে প্রকাশিত হবার জন্য লালায়িত হয়ে—আর্তস্বরে রোদন করছে। তাই কাব্যমালঞ্চের মালাকর রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রত্যেক কবির অন্তরপটে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত। কবিতা রচনা যেন—ফুল ফোটা-নোরই মত। তাকে কুঁড়ির ভিতর থেকে বলপূর্বক টেনে বার করা যায় না, যেহেতু 'কবিতা বনিতা চৈব সরসা স্বয়মাগতা',—অন্যথায় 'বলাদাকৃষ্যমানা চেৎ সরসা বির-সায়তে''। তাই কবি বলেন :—

তোমরা কেউ পারবে না গো পারবে না ফুল ফোটাতে
যতই বল যতই কর,—যতই তারে তুলে ধর,—
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন আঘাত কর বোঁটাতে।
দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে,—ম্লান করিতে পারো তারে,—
ছিঁড়তে পার দলগুলি তার ধূলায় পার লোটাতে।
তোমাদের এ গণ্ডগোলে যদিই বা সে মুখটী খোলে
ধরবে না রং,—পারবে না তার গন্ধটুকু ছোটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে
সে শুধু চায় নয়ন মেলে, দুটী চোখের কিরণ ঢেলে,—
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে
যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।

রসিক পাঠক :—সুবর্ণের মত এই কাব্যরসকে কষে নেওয়ার জন্য চাই বিদগ্ধ পরীক্ষক, সমালোচক,—চাই দরদী পাঠকের পরিশীলিত রসিক মন। তাই স্বয়ং কালিদাসও নূতন কাব্য সৃষ্টিপ্রসঙ্গে সন্দিহানচিত্তে বলেছেন—"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্"। বিদ্বজ্জনের অনুমোদনই এই কাব্যের কষ্টি-পাথর। সংবেদনশীল সহৃদয়রসগ্রাহী পাঠক ব্যতীত কাব্যের আদর করবে কে? যে বিদ্যা কাব্যবিচারের কষ্টিপাথর হতে পারে সে বিদ্যা কোন্ বিদ্যা?

আলঙ্কারিক বলেন—

'সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ।'

যারা অনুরাগী সাহিত্য-রসপিপাসু তাঁদেরই রসাস্বাদন হয়,—যারা বাসনাহীন বৈরাগী তাঁরা কাষ্ঠ, দেওয়ালের ভিত্তি, অথবা পাথরের মত নিষ্প্রাণ দ্রষ্টা মাত্র, সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। তাই পণ্ডিতেরা বলেন—'বিদ্যয়া সার্দং ম্রিয়েত ন বিদ্যামূষরে বপেৎ'—অর্থাৎ নিজের বিদ্যা নিয়ে মরা ভাল, তবু ঊষর ক্ষেত্রে বিদ্যা বপন করবে না। এবং বিধাতাকে প্রার্থনা করেন—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ মা লিখ। রসিকেরা পরিহাস করে বলেন :—

"নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি"। নাগা-ফকিরের দেশে ডাইংক্লিনিং এর দোকান খোলার মত মূঢ়তা আর কি আছে?

কাব্য পাঠের প্রস্তুতি—কবির কাব্যরস বিবিধ প্রকার। আলঙ্কারিকগণ রসকে নয় প্রকার বলেছেন শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। সুতরাং কাব্যের সূক্ষ্মতর আবেদন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে হলে পাঠকপাঠিকাদেরও কিছু মানসিক প্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজন। তাঁদের অনুভবশক্তি বাড়ানো এবং অন্তরের আধার প্রশস্ততর করা প্রয়োজন। তার জন্য কাব্যসাহিত্যের শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অনুশীলন দ্বারা মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন অবশ্য প্রয়োজন (Cultivation of the faculty of poetic appreciation)

কবির কল্পনাকে কল্পনাশক্তির দ্বারাই গ্রহণ করবার জন্য এবং কবির আবেগের বা আবেগপ্রসূত আবেদন বা ধ্বনির উত্তরে দরদী অন্তরের সাড়া বা প্রতিধ্বনি তোলবার মত তাঁর যোগ্যতা থাকা চাই। এই সুযোগ্য সহৃদয় শ্রোতার অভাবেই একদিন মহাকবি ভবভূতি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন—"উৎপৎস্যতেঽস্তি মমকোঽপি সমানধর্মা, কালোহ্যয়ংনিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী" অর্থাৎ একদিন আমার কাব্যের উপযোগী কোনো শ্রোতা বা দরদী সমালোচক অবশ্যই উদ্ভূত হবেন কারণ কাল অনন্ত এবং ধরিত্রীও বিপুলা।

আমাদের মনের ক্ষেত্রকে সৎকাব্যের অনুশীলন রূপ কৃষিকার্যের দ্বারা, সৎপ্রবৃত্তিরূপ অনুকূল সারের দ্বারা সহানুভূতি রূপ জলসেচনের দ্বারা উর্বর করে তোলা চাই। নচেৎ ঊষর অন্তরে অসৎ সাহিত্যের কাঁটাগাছ গজালেও সুকুমারকাব্যের রজনীগন্ধা ফুটবে না।

কাব্যের কোনো কোনো রস সার্বজনীন এবং সর্বজনপ্রিয় যেমন স্বদেশপ্রীতির গান ও কবিতা সাধারণতঃ সকলেরই ভাল লাগে সকলকেই প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্থলে মুকুন্দদাসের গানের কথা বলা যায়: সাধারণ রচনার ফলে অসাধারণ উন্মাদনা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন এই গানগুলিতে জনগণের মনে এনে দিয়েছিল।

Shelley যে কবিদের unacknowledged administrators of the world বলেছেন তার সম্পূর্ণ সমর্থন মিলবে এই শ্রেণীর গানের প্রভাবে। উদাহরণ স্থলে ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে 'বন্দেমাতরম্'এর প্রভাব ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি,'—'সার্থক জনম আমার' প্রভৃতি অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' প্রভৃতি সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে। কিন্তু 'তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন' কিম্বা 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে' প্রভৃতি বুঝতে হলে কবির সঙ্গে 'অরূপ রতন আশা করে' একটু রূপসাগরের অতল গভীরে ডুব দেওয়া ছাড়া গতি নাই। 'অপরূপকে দেখে এলাম দুটী নয়ন ভরে' বলবার অধিকার অর্জন করতে হলে শুধু ডুব দেওয়ার নয় একটু হাবুডুবু খাওয়ার মূল্যও পাঠককে দিতে হবে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বারংবার ডুব দিতে বলেছেন 'মন রত্নাকরের অগাধ জলে' এবং ভরসা দিয়েছেন 'রত্নাকর নয় শূন্য কখন দুচার ডুবে ধন কি মেলে?'

এই ডুব দিয়ে ডুবুরির সাধনায় সিদ্ধ হলে তবে তত্ত্বদর্শনের তৃতীয় চক্ষু লাভ করা যায়।

খেয়া

শ্রীপ্রিয়তোষ ভট্টাচার্য্য

'খেয়া'র পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে যে নিসর্গপ্রীতি ও মানবপ্রীতি দেখা গিয়াছে, কবির জীবনে উহারা আলাদা আলাদা দুটি বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়; উহারা তাঁহার বিশ্বানুভূতিরই দ্বৈত প্রকাশ। নৈবেদ্যের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত এই বিশ্বানুভূতি প্রধানতঃ রোমান্টিক ভাবাপ্লুতার দ্বারা সম্মোহিত হইয়াছে এবং নৈবেদ্যে আসিয়া কবির ভাবময়তা রোমান্টিক ধর্ম ছাড়িয়া ক্রমে মিষ্টিক হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ বিশ্বানুভূতি সর্বানুভূতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। একরূপ ভাগবত-ভাব তাঁহার অন্তর চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে ক্রমে প্রেয় হইতে শ্রেয়ের অভিমুখে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। খেয়াতে আসিয়াই সেই শ্রেয়-অভিসার-পথে কবি যেন রহস্যময় 'অরূপের' দিব্য আলোকে শুচিস্নান করিয়াছেন। কী যেন এক স্পর্শে কবির তনু মন প্রাণ স্পন্দিত, স্ফুরিত ও শিহরিত হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধির প্রখরতার দ্বারা সেই অবাঙ্‌মনসগোচর অরূপকে রূপায়িত করা যায় না বলিয়াই একরূপ রহস্যময়তার আশ্রয় কবিকে লইতে হইয়াছে। সেই লীলায়িত রহস্যময়তা কি ভাবে, কি ভাষায়, কি ইঙ্গিতে, কি ইশারায় এমন কি কবির নিত্যঅনুভব-ক্রিয়ার মধ্যেও একরূপ রোমাঞ্চিত ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া কবির অন্তর্জীবনকে ধীরে ধীরে পরম বৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছে—যাহার রসপূর্তিতে দেখিতে পাই গীতালি, গীতিমাল্য ও গীতাঞ্জলির ভক্ত-অর্ঘ্যগুলি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খেয়ার যুগটি ছিল political agitation-এর যুগ। ১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন লইয়া দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার আগুন সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথকেও বেশ উত্তপ্ত করিয়াছিল। তাহার পরিচয় তাঁহার সেই সময়কার জ্বালাময়ী ভাষণ ও রচনা এবং প্রাণ-উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। ইহারই তিনচার বৎসর পূর্বে কবি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দর্শন করিয়াছিলেন প্রিয়তমা পত্নী বিয়োগের মাধ্যমে। বৎসর না ঘুরিতেই আবার, তাঁহার মধ্যমা কন্যার মৃত্যু ঘটে।

একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে স্বদেশী উত্তেজনা। এইরূপ প্রবল মানসিক অস্থিরতার পটভূমিকার মধ্যেই 'খেয়া'র উৎপত্তি। অথচ, 'খেয়া' কাব্যখানির বিষয়-বস্তুতে না আছে মৃত্যু, না আছে উত্তেজনা। আছে শুধু প্রেমাস্পদের নিকট প্রেমিক হৃদয়খানি উন্মুক্ত উজার করিয়া মেলিয়া ধরা।

> "বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে,
> তোমার এবার সময় হবে কবে!" (প্রতীক্ষা)—

এমন একটি বিস্ময়কর বৈপরীত্য কেমন করিয়া সম্ভব হইল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

কিন্তু, না। আসলে এই বৈপরীত্যই হ'ল রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের স্বরূপ লক্ষণ। বাহিরের উত্তেজনা, অস্থিরতা মানুষকে করে ব্যাকুল, কবিকে করে আত্মসমাহিত। খেয়া লিখিবার বহুপূর্বে প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' লিখিত হইয়াছিল। তখনও তাঁহার জীবনে মৃত্যু ও স্বদেশী উত্তেজনার ঢেউ এমন জোয়ার তুলিয়া আসে নাই, কিন্তু 'ভূতনাথবাবু' প্রকৃত পৌরুষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন, অসীম প্রতিভাধর পুরুষেরা অন্তরে অন্তরে বিজনবাসী, উদাসীন যোগী। নেপোলিয়ন সহস্র কর্ম ও যুদ্ধের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়াও অন্তরে অন্তরে একা, নির্জন ও উদাসীন।—আসলে ইহা রবীন্দ্রনাথেরই কবি প্রকৃতির রূপক ভাষ্য।

> "তুমি কাজ দিলে কাজেরই সঙ্গে
> দাও যে অসীম ছুটি,
> তোমার আদেশ আবরণ হ'য়ে
> আকাশ লয় না লুটি।" (খেয়া,—'ভার')

এই "কাজের সঙ্গেই অসীম ছুটি" কবির জীবনে অপূর্ব ঐক্য আনিয়া দিয়াছে বলিয়াই বাহিরের উত্তেজনা, কলরব যত বেশী প্রবল হইয়া উঠে কবির অন্তর্গভীরে যে বিশেষ তারাটি রহিয়াছে তাহা তত বেশী বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠে।

> "হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
> একতারাতে একটি যে তার
> আপন মনে সেইটি বাজা।" (সীমা)

সংসারের শোক দুঃখ মৃত্যু অথবা কলরবময় উত্তেজনা কবির বহির্যামিটিকে আন্দোলিত করিলেও তাঁহার অন্তর্যামিটি কিন্তু "আবৃত্তচক্ষুঃ" হইয়া জ্যা-মুক্ত বাণের মত অমৃতের প্রতি অন্তর্যামীর প্রতি, স্থির লক্ষ্যে ধাবিত হইয়াছে। তাই,

"হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।
এখন ঘরে আয়রে ফিরে মাঝি
আঙিনাতে আসনখানি মেলো।" (সমাপ্তি)

কারণ ইহাই বৈষ্ণবের প্রেমাভিসার; ইহাই রবীন্দ্রনাথের "গোধুলি লগন"

"আমার গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি লগন রে।"

অন্তরে অন্তরে কবি পুলকিত, কেননা তিনি অসীমের আনাগোনার ইশারা পাইয়াছেন—

"আমি বাহির হইব ব'লে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।" (ঘাটের পথ)

যিনি বসিয়া থাকেন তিনি সংসারেও নহে, সংসার-বৈরাগ্যেও নহে, উভয়ের সন্ধিস্থলে আসিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লন 'তটস্থ' কবি-বাউলকে।

"ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে।
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।" (শেষ খেয়া)

তিনি কৃপা করিয়া এমনিভাবে অনুরাগভরে ডাকিয়া লন বলিয়াই ত কবির অন্তর-ফুল ফোটে। তাঁহার তীব্র ব্যাকুলতার অশ্রুসায়রে——

"একটিমাত্র শ্বেতশতদল
আলোক পুলকে করে ঢলোঢল,
কখন ফুটিবে বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রুসাগর
—সলিল-মাঝে।" (প্রভাতে)

এই ভক্তির ফুল-ফোটানো বড় সহজ ব্যাপার নয়। কেবল, সাধন, ভজন, পূজন, আরাধনা দ্বারাই ইহা লভ্য নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন দৈবী অনুকম্পা—অহৈতুকী কৃপা।

"যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।" (ফুল-ফোটানো)

তাই কবি অন্তর ভোর হইয়া আছে বাসরঘরের নব বধূর মত। কখন তাঁহার বধূ আসিয়া তাঁহাকে জাগাইবে—

"তোরা আমায় জাগাস নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে।" (জাগরণ)

চেতন-জগতের কল কোলাহল অপেক্ষা বরং গভীর অচেতনে ঘুমাইয়া থাকিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করাও ভাল।

"ওগো আমার ঘুম যে ভাল
গভীর অচেতনে
যদি আমায় জাগায় তারই আপন পরশনে।"
(জাগরণ)

সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে এই সুখের স্বপন কবি-চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। সে ভাবিতে থাকে—

সে আসবে মোর চোখের'পরে
সকল আলোর আগে —
তাহারই রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হ'য়ে জাগে।" (জাগরণ)

এই অরূপ চেতনায় কবিচিত্ত যখন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, প্রেম-বিহ্বলতায় কবির ভাব-ব্যাকুলতা যখন মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন সুখের মোহকে ছিন্ন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল তাঁহার 'দান'! কবি চমকিয়া ওঠেন—

"এ ত মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—" (দান)

এ কিসের ইঙ্গিত? সুখ নয়, স্বপ্ন নয়, 'নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধজলের ঝারি—' এ যে ভীষণ তরবারি!

এই তরবারি একটি মূর্তিমান "অশান্তি"। মানুষ ইহাকে ভয়ে এড়াইয়া চলিতে চায়। ধর্মবোধের প্রথম যে অবস্থা 'শান্তম' মানুষ সেই অবস্থায় কেবল সুখকেই পাইতে চায়, সম্পদকেই পাইতে চায়, শিশুর মত কেবল মধুর রসভোগের তৃষ্ণাই তার লক্ষ্য, যেন সম্ভোগের কুঞ্জকাননে সুখে থাকিতে পাইলেই তাহার ধর্ম রক্ষা হইয়া যায়, দুঃখকে রুদ্রকে তাহার বড় ভয়। এই ভয়ের জন্যই ঝড়ের রাতে বজ্রের সাথে দুঃখরাতের রাজা যখন আসেন তখন মন প্রস্তুত থাকে না। কিন্তু দুঃখের মধ্য দিয়া, অশান্তির মধ্য দিয়া যে সত্য লাভ হয় না সে সত্য ত 'সমগ্র' নয়, সে ত 'অংশ'। কেবল শান্তম্ নয়, তার চেয়ে বড় সত্য শিবম্। এই শিবকে অর্থাৎ

মঙ্গলকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। অচেতন শান্তি একরূপ বন্ধন, তাই অশান্তির 'তরবারি' দ্বারা তাহাকে ছিন্ন না করিলে বন্ধন-মুক্তি ঘটে না।

এই তরবারির আর একটি ব্যাখ্যাও সম্ভব, ইহা অহংকারের নেশাকে ছিন্ন করিবার তরবারি। খেয়ার "বন্দী" কবিতায় দেখান হইয়াছে এই 'অহং' বোধের বন্ধন কেমন লোহার শিকল গড়িয়া আপনাকে আপনি বন্দী করিয়া রাখে।

"ভেবেছিলাম আমার প্রতাপ করবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন, সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনী দিন লোহার শিকলখানা
কত আগুন, কত আঘাত নাই কো তার ঠিকানা।"

শক্তি সঞ্চয় করিতে গিয়া শক্তির এত বড় অপচয় বোধকরি আর কিছু নাই। অরূপানুভূতির পথে এই বর্বর অহং শক্তি চরম বাধা। তাই চরম দুঃখের আঘাতে ঐ অহংকে ছিন্ন করিবার প্রতীক হইল ঐ তরবারি।

একটি জিনিস লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অশান্তি রুদ্রত্ব হইলেও চরম সত্য ও পরম পাওয়া কিন্তু রুদ্রত্ব নয়, "রুদ্রের প্রসন্ন মুখ।"

'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।'

রুদ্রের এই 'দক্ষিণ' মুখকে পাইতে হইলে রুদ্রের আবির্ভাবকেও স্বীকার করিতে হইবে। রুদ্রকে বাদ দিয়া যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করিয়া যে শান্তি সে ত স্বপ্ন, সে সত্য নয়। ঐ তরবারি হইল মৃদ-মুগ্ধতাকে দুঃখের চরম আঘাতে কাটিয়া ছিন্ন করিয়া সত্যের আনন্দলোকে প্রবেশের প্রতীক।

এ পর্যন্ত আসিয়া আমরা 'খেয়া' কাব্য গ্রন্থখানির একটি বিশেষ ভাবধারার সহিত পরিচিত হইলাম। পরিচিত জগতের কোলাহল ও উত্তেজনার সীমা হইতে "নীরব ব্যাকুলতার" খেয়ায় কবিচিত্ত পাড়ি দিয়াছেন অপরিচিত জগৎ অসীমের উদ্দেশ্যে। তাই গ্রন্থখানি সুরু হইয়াছে "শেষ খেয়া" দিয়া সারা হইয়াছে 'খেয়া' কবিতায়। অতএব গ্রন্থখানির ভাবগত ঐক্য ঠিক বজায় আছে, যাহার পরিচয় পাই "পথের শেষ" কবিতায়।

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি
এখন শুধু আকুল মনে যাচি।'
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।"

একটি কথা। রবীন্দ্রনাথের কোন একটি গ্রন্থকে কেবল একটি ভাবের তত্ত্বরূপ ভাবিয়া লইলে ভুল হইবার সম্ভাবনা অধিক। প্রকাশনের সময় একই সময়ের রচনা হিসাবে কবিতাগুলি যখন সংগৃহীত হয়, তখন সর্বত্রই যে একই ভাবের ক্রমবিকাশ সকল কবিতার মধ্যে ধারাক্রম বজায় রাখিয়া পরিস্ফুট হয় অথবা সকল কবিতাগুলির মধ্যেই যেন পূর্বাপর পারম্পর্য রক্ষিত হয় এমন ভাবিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে যে-গ্রন্থখানিতে অধিকতর ভাব সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে সেই "গীতাঞ্জলি"র মধ্যেও এমন দুটি কবিতা স্থান জুড়িয়া আছে যাহাদের ব্যক্তিগত মূল্য ও জনপ্রিয়তা অত্যধিক বেশী হইলেও গ্রন্থের সামগ্রিকতার দিক হইতে উহারা স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন। কবিতা দুটির একটি হইতেছে "দুর্ভাগা দেশ" অপরটি "ভারততীর্থ"।

ঠিক সেই রকমই "খেয়া" কাব্যগ্রন্থখানিতেও অরূপানুসন্ধান ও দুঃখানুভূতির সাথে সাথে কোথাও কোথাও মর্ত-প্রীতি, কোথাও বা অন্তভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 'শুভক্ষণ" 'অনাবশ্যক", "ত্যাগ", 'বালিকাবধূ", "প্রার্থনা" "সার্থক নৈরাশ্য", "সমুদ্রে", "দীঘি", "সব পেয়েছির দেশ", 'হারাধন", "কোকিল", "নীড় ও আকাশ", "লীলা" ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্ত। ইহাদের কোনটি সাহিত্যগত, কোনটি ব্যক্তিগত, কোনটি বা রূপগত। ধারাক্রমিক কোন একটি ভাবধারা ইহাদের মধ্যে ক্রমোৎসারিত হইয়া উঠে নাই। অথচ প্রত্যেকটি কবিতারই একটি বিশিষ্ট ধর্ম ও প্রভাবোৎপাদক শক্তি রহিয়াছে।

আর, এরূপ না হইয়াও উপায় নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি এমন একটি ব্যাপার যার উপরে টিকিট মারিয়া আপন ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গড়িয়া তোলা যায় না। উহা যেন বীণাপাণির বীণার বহু বিচিত্র তার। কোনটা সোনার, কোনটা তামার, কোনটা ইস্পাতের। হাল্কা, ভারী, আনন্দের অথবা বিষাদের যত রকমের সুর আছে সবই সেই বীণায় বাজিয়া ওঠে। আসলে, সেই এক শুভ্রজ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হইয়া ছড়াইয়া পড়েন, তখন তিনি নানা বর্ণের

আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন—কবি সেই বিচিত্রের দূত। তাই বিচিত্রের লীলারঙ্গ কবির চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে নব নব মূর্তিতে নতুন নতুন সুরের তরঙ্গ তুলিয়া যায়। কবির কাব্য সেই তরঙ্গের শিল্পরূপ। কবির নিজের কথায়, "যেখানে আমি থামিনি সেখানে আমি থেমেছি এমনভাবের একটি ফোটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা যায়। লেজ তোলা ঘোড়ার আকাশে-তোলা পা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে।"

'শুভক্ষণ', 'ত্যাগ' ও 'অনাবশ্যক' কবিতাত্রয়ী অনেকটা এক সুরে গাঁথা—যাহার ধর্মব্যাখ্যা ও শিল্পব্যাখ্যা উভয়েই সম্ভব। ধর্মব্যাখ্যার দিক থেকে, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণই শুভক্ষণ যদি মন বাসনাহীন হইয়া তন্মুখী হইয়া থাকে। এই শুভক্ষণটি সার্থক হয় মহৎ ত্যাগে—যাহা ফলাকাঙ্ক্ষাহীন। যাহা জগতের প্রয়োজনের হিসাবে একান্তই অর্থহীন ও অকিঞ্চিৎকর সেই স্বার্থলেশহীন ত্যাগের আনন্দই মহত্তর চরিতার্থতা দান করিতে সম্ভব। তাই কাজের জগতের মধ্য হইতেই অবকাশ কুড়াইয়া একান্ত আমার মত সংগোপনে সেই পরম একের উদ্দেশ্যে "আকাশ প্রদীপ" ভাসাইবার যে অনাবশ্যক স্মৃতিচারণ, প্রেমিকার উহাতেই চরম তৃপ্তি, পরম প্রাপ্তি। ইহাই রাগাত্মিকা ভাব-সাধনা।

আর, শিল্প-ব্যাখ্যার দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। "খেয়া'র 'অনাবশ্যক' কবিতার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে বলে মনে করিনে। আমাদের ক্ষুধার জন্যে যা অত্যাবশ্যক তার কতই অপ্রয়োজনে ফেলাছড়া যায় জীবনের ভোজে, যে ভোজ উদাসীনের উদ্দেশ্যে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে যার তাতে দৃষ্টি নেই। সেই অনাবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি; অথচ বঞ্চিত হয় সে যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

শিল্পের দিক হইতে 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতা দুটির ব্যাখ্যা শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও সুন্দর করিয়াছেন।

"সুন্দর যেদিন সৃষ্টির রাজপথে আসিয়া দেখা দেয় "রাজার দুলালের" বেশে, সুন্দরের পূজারিণী সেদিন তাহার "বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া" থাকিতে পারে না। সে মণি হয়ত কেহই কুড়াইয়া লয় না, রথচক্রের নিষ্পেষণে সে হয়ত গুঁড়া হইয়া মিলিয়া যায় রাজপথের ধূলার সঙ্গে কিন্তু তথাপি 'রাজার দুলালের' যে রহিয়াছে অমোঘ আকর্ষণ!"

খেয়ার "বালিকা বধূ" কবিতাটি নানাদিক দিয়া একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা। প্রথমতঃ ইহা একটি উৎকৃষ্ট রূপক। প্রেমঘন লীলাময়কে বঁধু কল্পনা করিয়া শিশু-শুভ্র বিশ্বাসের অনভিজ্ঞ প্রত্যয়কে বধূ কল্পনা করিবার মধ্যে একরূপ চমৎকারিত্ব দ্যোতিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দুঃখের মধ্যেই যে বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা এবং বিধিমার্গী বিষয়ীর নিকট যাহা অপরাধ, অনুরাগমার্গ বিশ্বাসী প্রেমিকের নিকট তাহাই পূজা—এই তত্ত্বটি অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করিয়াছে কবিতাটির ইঙ্গিতময় পরিবেশ সৃজনে।

"মোরা মনে করি ভয়,
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস:
এই দেখিতেই বুঝি ভালবাস,
খেলাঘর-দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে
কি যে পাও পরিচয়।"

এই নিয়ম-কানুন শাসন বিহীন অবোধ বিশ্বাসী শিশু হৃদয়ই বিশ্ব বঁধুয়ার একান্ত প্রিয় বধূ। তাহাকে লইয়া তাঁহার লীলাখেলা।

রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন মধু
ওগো বর, ওগো বধূ।

"বালিকাবধূ" কবিতাটিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবি আত্মাটিকে বধূ কল্পনা করিলেও কোন অসঙ্গতি হয় না। শিশুকাল হইতেই বিশ্বের পশ্চাতে এক বিচিত্র বিশ্ব দেবতার বিশ্বাস কবি-চিত্তে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়াছিল। রোমান্টিকতার দিক হইতে তিনিই তাঁহার জীবন দেবতা, শিল্প-প্রেরণার দিক হইতে তিনিই তাঁহার কৌতুকময়ী অন্তর্যামী; আর, নৈবেদ্য-খেয়ার যুগে তিনি তাঁহার পরাণবঁধু পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন মাধুরী বর্ণনা করা মিষ্টিক কবিদের স্বভাব। জালালউদ্দিন রুমী হইতে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রত্যেকটি মিষ্টিক কবিই তাহা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তাহাদের সগোত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আসিয়া Mysticism আরও উর্ধ্বে একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ভঙ্কিরাজ

পৌঁছিয়া 'সব আছে, সব পাইয়াছির' অটুট বিশ্বাসে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনার নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ অবোধ কবি-চিত্ত, কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই ধর্মগজতের পরমতীর্থ মাধুর্য-রাজ্যে বঁধুয়ার সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, চরম দুঃখের মধ্যেও ভগবানের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখিয়া বরং তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলে ভগবান ভক্তকে শুধু কৃপাই করেন না, ভালও বাসেন।

কবির কাব্যে বিশেষ বিশেষ 'মুডে'র মধ্যেও অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া যায়। এবং ঘটিয়া যায় বলিয়াই কবি কবিই থাকিয়া যান, তাত্ত্বিক হইয়া উঠেন না। প্রথম জীবনে মর্ত-প্রীতি কবির চেতনাকে বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বলিয়াছিলেন :

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময় :—

তিনি বলেন, "জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।" তাই, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।" বিধাতা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির চিত্তবীণাকে কি এক নিগূঢ় ছন্দে বাঁধিয়া দিয়াছেন যে কোন রুক্ষতার মধ্যে তাঁহার চিত্ত দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না, নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে আবার ইহারই মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে।'—অজিত চক্রবর্তী। ইহারই পরিচয় পাওয়া যায় খেয়ার বিভিন্ন কবিতায়।

"প্রার্থনা"—

আমি বিশ্ব-সাথে রব সহজ
বিশ্বাসে
আমি আকাশ হতে বাতাস নেব
প্রাণের মধ্যে বিশ্বাসে।

"সার্থক নৈরাশ্য"—

ধন্য ধরার মাটি,
জগতে ধন্য জীবের মেলা!
ধুলায় নামিয়া মাথা
ধন্য আমি এ প্রভাত বেলা।

"কোকিল"—

ফুল-বাগানের বেড়া হতে
হেনার গন্ধ ভাসে,
কদম-শাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে।
বধূ তখন বিনিয়ে খোঁপা
চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুল-বনে
কোকিল-কোথা ডাকে।

"লীলা"—

ওগো, এমনি তোমার ইচ্ছা যদি
এমনি খেলা তব
তবে খেলাও নব নব।
লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে
বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও যথা-তথা
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য—বিচিত্রতা।

"নীড় ও আকাশ"

তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এমনি কাঁদি এমনি হাসি,
তবুও এই ভালবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

'দীঘি' কবিতার রস যত না মিষ্টিক, তার বেশী রোমান্টিক। অতীতের সোনারতরীর "হৃদয়-যমুনার" যৌবনধর্ম উচ্চতর ভাবের পরিমার্জনে পরিশোধিত হইলে যাহা দাঁড়ায় তাহা "দীঘি"।

"শেওলা—পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে—
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।"

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে 'খেয়া'র যুগটি Political agitation-য়ের যুগ। পল্লী-সংস্কার, ন্যাশানাল কলেজ ইত্যাদি স্বদেশহিতকর কার্যে কবি প্রবল উত্তেজনায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিকের জগত এক, আর সাধক বা শিল্পীর জগত আর এক। বাস্তবের কল্পনার সংঘাত অনিবার্য। তাই শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, তাই রবীন্দ্রনাথের কাজের জগত হইতে বিদায় গ্রহণ।

তোমরা তবে বিদায় দেহো মোরে—
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে।…
আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজালো আজ বাঁশি।
লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,
একটি কথা পরাণ জুড়ে বাজে
'ভালোবাসি হায়রে ভালোবাসি'—
সবার বড়ো হৃদয়-হরা হাসি।
(বিদায়)

খেয়ার 'হারাধন' একটি বিচিত্র কবিতা। ইংলণ্ডের রোমান্টিক কবিদের কাব্য রচনার অন্যতম বিশিষ্ট ধর্ম কথিকা-সৃষ্টি (Myth Making)। এইরূপ কথিকা-সৃষ্টি কখনো কখনো নিছক সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্যও রচিত হইতে পারে, কখনো কখনো রূপকছলে তত্ত্ব প্রকাশ। এইদিক হইতে খেয়ার 'হারাধন' কবিতাটি একটি অপূর্ব কথিকা সৃষ্টি এবং এইরূপ মৌলিক একটি গীতাখণ্ড রবীন্দ্রসাহিত্যে খুব বেশী আর নাই।

আমাদের শাস্ত্রে স্রষ্টার সৃষ্টি কার্যে কোন বিরাম নাই। কিন্তু বাইবেলে ঈশ্বর প্রথম ছয়দিনে আলো, হাওয়া, জল, আকাশ ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম লইয়াছিলেন। এই কাহিনীটিকে পশ্চাতে রাখিয়া কবি কল্পনা করিলেন :

বিধি যে দিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠল ফুটে
নীল আকাশের মাঝে।

বড় বড় দেবতারা সবাই আনন্দে বাহবা দিলেন, "কী আনন্দ! একি পূর্ণ ছবি!' এমন সময় সভার মাঝে একজন বলিয়া উঠিল, "জ্যোতির মালায় একটি তারা, কোথায় গেছে টুটে।"—অমনি খোঁজ পড়িয়া গেল কোথায় সেই "হারা-তারা"। যেন তখন হইতেই এই হারাধনের মূল্য বাড়িয়া গেল অনেক পরিমাণে। সবাই ভাবিতে আরম্ভ করিল,

"সেই তারাতেই
স্বর্গ হ'ত আলো—
সেই তারাটাই সবার বড়ো।
সবার চেয়ে ভালো।"

এইরূপই হয়, এবং এইরূপ হইয়া থাকে। অতি-পরিপূর্ণতার একটি প্রত্যক্ষ-জাত অজ্ঞান আছে। পূর্ণতার মধ্যে অপূর্ণতার বোধ যদি না থাকে ত অনুভূতি ও অন্বেষণ ক্রিয়াগুলির গতি যায় রুদ্ধ হইয়া। এত বড় সৃষ্টি কার্যটির যেন অর্থই যায় চলিয়া। আনন্দ নিরেট ও পূর্ণ হইয়া উঠিলে কবির রসবোধ প্রেরণা পায় না। 'সব-কিছু-আছে'র মধ্যে 'কোথায়-যেন কি-নাই'' এই বোধই ত কবির কাব্য, শিল্পীর রূপাভিসার, জ্ঞানীর বিজ্ঞান। জগতের চলতা এই অন্বেষণের পথে ঐ 'হারাধন' খোঁজার হয়রানিতে। তাই কবি বলিতেছেন,

"সেদিন হতে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোঁজে—
তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।

ওদিকে তারার দল গভীর নিশীথে নীরব-হাসিয়া ভাবিতেছে 'মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে' সত্য কথা। বাস্তব দৃষ্টিতে সৃষ্টিতে অপূর্ণ নাই কিছুই। কিন্তু তবু অপূর্ণতার বোধ থাকিয়া যায় রসোপলব্ধিতে। হস্তপদাদি-যুক্ত মনুষ্য-অবয়ব সম্পূর্ণ হইলেও সত্য নয়, সত্য উহার প্রাণসম্পদ। সেইরূপ জগৎ সৃষ্টিতে সব কিছুই নিখুঁত হইলেও, আসলে উহারা নিরেট ও নীরস। জগৎ গতি-সম্পদে সত্য হইয়া উঠে সত্যোপাসকের রসোপলব্ধিতে। ঐ 'হারাধন' বস্তুটি হইল কবির রসোপলব্ধি। "রসো বৈ সঃ"। সেই রসকে কেবল রূপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় সুন্দর-উপাসকের গভীর রসানুভূতিতে।

খেয়ার "সব-পেয়েছির-দেশ" অজিত চক্রবর্তীর মতে 'এষহ্যেবানন্দয়তি'র উপলব্ধির কবিতা। আবার কেহ কেহ মনে করেন, অতি বাস্তবের প্রত্যক্ষ ব্যস্ততা হইতে অবসর লইয়া কবি যেন রোমান্টিক কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণসুখ উপভোগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অর্থাৎ একদল সমালোচক কবিতাটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মঞ্জুর করেন, অপর দল শিল্প ব্যাখ্যা। কবিতাটির লঘু তরল সুর ও কল্পনাবিলাস দেখিয়া ইহাকে শুধুমাত্র

রোমান্টিক Nostalgia অর্থাৎ গৃহসুখপ্রবণতার কবিতা বলা যাইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে কবিতাটি যত সহজ মনে হয় তত সহজ নয়। ইহার পশ্চাতে একটি নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে। এবং অজিত চক্রবর্তী মহাশয় অতি সুন্দরভাবে সেটি ধরাইয়া দিয়াছেন।

উপনিষদে অনন্ত সত্য স্বরূপকে আনন্দের দ্বারা উপলব্ধি করিবার কথা আছে। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ব্রহ্মের সেই আনন্দকে জানিয়া সাধক কিছু হইতেই ভয় পান না। এই জন্যই এই আনন্দকে উপনিষদ "এষঃ" বলিয়াছেন। এষহ্যে বানন্দয়তি। ইনিই আনন্দ দিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সব পেয়েছির দেশ সেই অনন্ত আনন্দের দেশ। এখানে যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়েছে তাহাই পরিপূর্ণ আনন্দ। তাই সব পেয়েছির দেশে অসাধারণত্ব কিছু নাই, হয়ত খুঁজিলে দেখিবার মত একটি জিনিসও পাওয়া যাইবে না—সেই পথের ধারে ঘাস, সেই স্বচ্ছ তরল স্রোতের ধারা, সেই গ্রামের কুটিরটি ঘেরিয়া ঝুমকা লতার দোল—অর্থাৎ সহজ সরল জীবনধারা, যাহার মধ্যে অতিপ্রাকৃত বা অসাধারণ কিছু নাই, তবু উহারই মধ্যে আছে সব-পেয়েছির সন্তোষ, উহারই মধ্যে আছে শাশ্বতী পরমা তৃপ্তি। অতএব,

ওরে কবি, এইখানে তোর কুটিরখানি তোল্।

নিরাকাঙ্ক্ষ পরমাতৃপ্তির এই নিশ্চিন্ত সন্তোষ, বুঝি ইহাই সাধকের ব্রহ্মানন্দ, শিল্পীর শিল্পলোক, কবির শান্তিনিকেতন।

অযোধ্যার নবাব

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

অযোধ্যা রাজ্যের নিবাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্। এই নবাব বংশের একাদশ ও শেষতম প্রতিনিধি।

তাঁর জীবন কথা, বিশেষ সঙ্গীত কাব্য নাটিকা সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পরিচয় গ্রহণ বক্ষ্যমান রচনার লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর জীবনের সঙ্গে অযোধ্যা তথা লক্ষ্ণৌর যে নবাবী আমল অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে, প্রসঙ্গত তার ইতিবৃত্তও বর্ণনা করতে হবে। কারণ সেই অবক্ষয়ের ধারার অন্তিম পর্যায়ের প্রতীক ওয়াজিদ আলী শাহ্।

অবশ্য শুধুই ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রতিভূরূপে নবাবের জীবনী আকর্ষক নয়। রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে অক্ষম ও প্রশাসনিক দিক থেকে প্রায় ব্যর্থ গণ্য হলেও তাঁর শিল্পী সত্তার জন্যে সাংস্কৃতিক জগতে ওয়াজিদ আলী শাহ্ স্মরণীয় হয়ে আছেন। সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁর নাম বহুদিন সঞ্জীবিত থাকবে নানা গুণের জন্যে। একদিকে রাজ্যের কর্ণধার-রূপে চরম অসাফল্য, অন্যদিকে শিল্পজীবনের বহুমুখী সার্থকতা নিয়ে তাঁর খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব।

ভারতীয় পটভূমিকায় বৃটিশ শাসন-যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রসারের সামনে নবাব ওয়াজিদ আলীর ঊর্ধ্বতন কয়েক পুরুষ আত্মসমর্পণ করে আসছিলেন। পতনের সেই অনিবার্য ধারায় চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে নবাবের ব্যক্তিত্বহীন অথচ নাটকীয় জীবনে।

অযোধ্যার নবাবীর সূত্রপাতেই যে ক্ষয়ের বীজ উপ্ত হয়েছিল কালক্রমে তা মহীরূহ আকার ধারণ করে রাজ্যের ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করে দেয়। অযোধ্যার প্রথম সুবাদার সাদৎ খাঁ বুরহান্-উল্-মুল্‌কের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌কে। মোগল শাসনের অবনতির কোন কোন প্রক্রিয়ায় যে সুবার তখ্‌ত্ ছিল পরোক্ষ অংশীদার, ভাঙনের শেষ পর্যায়ের ভাগদারও তাকে হতে হয়। তাই ওয়াজিদ আলীর পূর্ববৃত্তান্ত স্বরূপ অযোধ্যার নবাবী ইতিহাসের পরিক্রমা প্রয়োজন।

কিন্তু নবাবী পত্তন হওয়ার আগেও অযোধ্যার সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। যুগে যুগে অনেক ঐতিহাসিক পট পরিবর্তিত হয়েছে এখানকার মাটিতে। মোগল আমলের এই নবাব বংশের উত্থান-পতনের বিচিত্র কাহিনীও আগের যুগে আছে, যেমন অযোধ্যা ছিল, আফগান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভের পর। অযোধ্যা এলাকায় মুসলমান উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গ। ইসলামের আক্রমণাত্মক অনুপ্রবেশের সেই সব চিহ্নিত দিন। কিন্তু সেই তরবারির অধ্যায়ের বহু পূর্ববর্তীকালে আছে প্রাচীন যুগের অযোধ্যা। তার পরিচয় সবার। সে পরিচ্ছেদে নবাবী আমলের সঙ্গে অনুমাত্র সম্পর্কও নেই। --

ইসলামী প্রলেপের বহুকাল আগে থেকে সে অযোধ্যার অস্তিত্ব। লিপিবদ্ধ ইতিহাসের পরিধি পার হয়ে বিস্মৃত কোন্ কাল থেকে তার জীবনধারা প্রবহমান। স্মৃতি-বিস্মৃতির সেই আলো-ছায়ায় ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তী, ইতিকথা ও পুরাণ একাকার মিশে এক বিচিত্র আলো-আঁধারি রচনা করেছে আর সেই রহস্যলোকে পুরানো কালের নানা কাহিনী পল্লবিত হয়ে পর্যবসিত হয়েছে পুরাণ-কথায়।

সেই পুরাতন অযোধ্যার ঐতিহ্য।

সেকালের কোন ধারাবাহিক 'ইতিহাস' অবশ্য গ্রথিত হয়নি, যদিও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রধান পীঠস্থান অযোধ্যা। অযোধ্যার ক্ষেত্রে তাই ইতিহাস ও পুরাণ এমন অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়ে আছে যার গ্রন্থি-ছেদন প্রায় দুঃসাধ্য। সে প্রয়াস না করে অযোধ্যার সূত্রে প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের একটি প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা আমাদের লক্ষ্য।

কালজয়ী অযোধ্যার ঐতিহ্য।

পুরাকাল থেকেই স্থান মাহাত্ম্যে পূর্ণ পুণ্যতীর্থ অযোধ্যা। যে সপ্তপুরী মোক্ষদায়িনীরূপে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে বরেণ্য হয়ে আছে, অযোধ্যা তার অন্যতম বিশিষ্ট।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা,
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।"

স্মরণাতীত কাল থেকে সে অযোধ্যা রামরাজ্য এবং রামচন্দ্রের জনশ্রুতিতে জীবন্ত। রামের মাহাত্ম্যের জন্যেই এ রাজ্যের সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি। বাল্মীকি রচিত রামায়ণের বর্ণনায় অমর অযোধ্যা। আদি কবির রচনায় এ নগরীর অতি সমৃদ্ধ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। উচ্চ অট্টালিকা ও ধ্বজে শোভিত রাজবর্ত্ম। শিল্পীরা নানা-প্রকার শিল্পকর্মে নিরত। ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ শিষ্যদের বিদ্যাদান করে থাকেন। নানা দেশ থেকে বণিকদের আগমন ঘটে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বেসাতি নিয়ে। রাজপথে প্রতিদিন জলসিঞ্চনের সুব্যবস্থা।...

একটি প্রশস্ত মহাপথ অর্থাৎ বহির্দেশের পথ এবং অন্যান্য পথ নগরের অভ্যন্তরে প্রসারিত। এই সমস্ত পথই প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজিতে সুসজ্জিত। যথাযোগ্য ব্যবধানে বিপণির সারি। পুরনারীদের জন্যে পরিখা-রক্ষিত নানা স্থানে নাট্যশালা, উদ্যান ও আম্রকানন।

বহু সামন্তরাজ কর দান করতে উপস্থিত হন এই মহানগরীতে। সরযূ নদী তীরের সমৃদ্ধ জনপদ কোশল নামে সুপরিচিত। অযোধ্যা তার প্রসিদ্ধ পুরী। মনু এই মহানগরীর স্থাপনকর্তা। দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ, তিন যোজন ব্যাপী সুদৃশ্য অযোধ্যা নগরী। অমরাবতীতে যেমন ইন্দ্র, প্রাচীন ভারতের রাজকীয় ঐশ্বর্যের মহিমায় মহান এই শ্রীসম্পন্ন পুরীতে তেমনি বাস করতেন রাজা দশরথ।...

অযোধ্যার ঐতিহ্য প্রসঙ্গে রাম ও রামায়ণ মহা-কাব্যের কথা একসূত্রে গাঁথা। বাল্মীকির রামায়ণ রচিত না হলে রামচরিত্র কালসীমা অতিক্রম করে মহাভারতে এত প্রচারিত হত না। মহাকবির দৃষ্টান্ত অনুসরণে ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষায় রামায়ণ বিষয়ে নানা কাহিনী কাব্যনিষিক্ত করত না আপামর জনসাধারণের হৃদয়। রামায়ণকে যুগে যুগে সমগ্র ভারতের জন-চিত্ত একান্ত আপনরূপে গ্রহণ করেছে।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, তার সীমানা পার হয়ে এশিয়ার দেশে দেশে বিপুল গৌরবে জনপ্রিয় হয়েছে রাম কাহিনীর নানা রূপ। ভারতের নানা প্রাদেশিক সাহিত্যে যেমন, এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও তেমনি রামায়ণ নানা পরিবর্তন নিয়ে গণমানসে স্থান করে নিয়েছে। ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, মলয়, যব ও বলি দ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে পরিবর্তিত রূপে হলেও বিশেষ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে রাম-উপাখ্যান।

এই ব্যাপক প্রচারের মূলে আছে রামায়ণের মহান ভাবসম্পদ, তার প্রধান চরিত্রাবলীর দেবোপম হয়েও গভীর মানবিক আবেদন এবং মহৎ আদর্শ।

রাম চরিত্রের উচ্চ আদর্শবাদ যে আদিকবিকে রামায়ণ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বাল্মীকি ও নারদের কথোপকথন বর্ণনায় তার অপরূপ ভাষা দিয়েছেন—

"দেবতার স্তব গীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।
ভগবন, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করেনা অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজ ভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহোত্তম—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"
"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা,"
কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"

নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

কবি এখানে কাব্যের সত্যকে বাস্তব সত্যের উর্ধে স্থান দিয়েছেন। অন্যত্রও তিনি বলেছেন, "রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।"

অবশ্য রামায়ণ শুধু মহৎ কাব্য সৃষ্টি নয়। তা বিপুল পরিকল্পনার মহাকাব্য বা নানা তাৎপর্যময় 'এপিক্।' ভারতের দুই অবিনশ্বর এপিকের অন্যতম।

রামায়ণের বহু ভাষ্য রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্লেষণ করেছেন এই মহাকাব্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য। ভারতীয় সংস্কৃতির পটভূমিকায় রামায়ণের নানাভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বহু প্রকার গবেষণা প্রকাশ পেয়েছে রামায়ণ সম্পর্কে। বাল্মীকি-রামায়ণ প্রথমে ছিল পঞ্চকাণ্ডে রচনা। কোন পরবর্তী এক বা একাধিক কবি আদিকাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড তাতে যোগ করেছেন। এই উত্তর কবি ভিন্ন কালে কালে অন্য কবিদের হাতও কিছু কিছু পড়তে পারে রামায়ণের সুদীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু সব সত্বেও রামায়ণ মূলত আদিকবি বাল্মীকির সৃষ্টি রূপেই পণ্ডিতবর্গ মেনে নিয়েছেন।

একাধিক কালের কবিদের হস্তাবলেপের ফলে মূল রাম-উপাখ্যান কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে এবং কাহিনীর এই বিবর্তনের সূত্রে তার স্তরে স্তরে ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনেরও প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন কোন কোন গবেষক।

ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রের একাধিক লুপ্ত অধ্যায়ের চিহ্ন নাকি রামায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে অঙ্কিত হয়ে আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা যায় সংক্ষেপে। যথা— ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, যা প্রকাশ পেয়েছে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বৈরিতায় এবং রাম কর্তৃক কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে এই মতের অনুকূলে মন্তব্য করেছেন—"অকস্মাৎ যৌবরাজ্য অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল তাহা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রবল এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, এইজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীরপুত্রকে তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আরো কটি যুগান্তকারী পরিচ্ছেদের ইঙ্গিতে যে রাম উপাখ্যানের মধ্যে নিহিত আছে, রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন তাঁর "সাহিত্য সৃষ্টি" প্রবন্ধে। তা'হল—আর্য ক্ষত্রিয় নৃপতিদের কৃষি তথা ভূসম্পদ আহরণের প্রয়োজনে প্রচেষ্টা হল রাজ্য বিস্তারের। সেই প্রক্রিয়ায় তাঁদের সঙ্গে অনার্য রাক্ষসদের সংঘর্ষ বাধল। রাজ্যবিস্তারকামী ক্ষত্রিয় রাজাদের মুখপাত্র স্বরূপ রামচন্দ্র রাক্ষসনিধনে ব্রতী হলেন, প্রথমে পূর্ব ভারতে ও পরে দক্ষিণ অঞ্চলে। প্রথম পর্বের প্রতীক তাঁর তাড়কাবধ প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় পর্বের পরিচয় দক্ষিণ ভারতে অভিযানে। প্রথম পর্বে তাঁর সহায়ক হন কৃষি-বিদ্ রাজা জনক, যিনি নিজ হস্তে হলচালনা করতেন। ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজ্য বিস্তারের ফলে অনার্য রাক্ষসরা বিতাড়িত হয় পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে। অনার্য রাক্ষসশক্তি আর্য ক্ষত্রিয়দের রাজ্য তথা কৃষি-বিস্তারের প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ থাকায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে। 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই লাঙলের মুখে অরণ্য হটিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।"

সেজন্যেই রামচন্দ্রের রাক্ষস-বধ ব্রত। রামচন্দ্রের অধিনায়কত্বে আর্য ক্ষাত্র-শক্তির দাক্ষিণাত্যে বিজয়যাত্রা রামায়ণের একটি বৃহৎ ও যুগান্তর ঘটনা।

রামায়ণের এমনি নানা তাৎপর্য এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মতামত নিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর "রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি" পুস্তকে মনোজ্ঞ আলোচনা

করেছেন। এ সম্পর্কে অধিক উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কাব্য হিসাবে রামায়ণের রূপক অর্থ সম্বন্ধে আলোচনাও বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর।

তবে বাল্মীকি রামায়ণের বিষয়ে আর একটি আলোচ্য ক্ষেত্র আছে। তা হল—মহাকাব্য রামায়ণের তথাকথিত ঐতিহাসিকত্ব আছে কি না।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে যাঁরা গবেষণার ধারা প্রবর্তন করেন সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর কোন কোন ব্যক্তির ধারণা এই যে, রামায়ণ মহাকাব্যের উৎসে কোন বাস্তব কাহিনী বা ঘটনা নেই। রামায়ণ সম্পূর্ণ কবি কল্পনার সৃষ্টি, তার মধ্যে ইতিহাসের সত্য সন্ধান নিরর্থক।

শুধু পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তারা নন, এ বিষয়ে ভারতীয়দের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাঁদেরও অনেকের অনুরূপ ধারণা। স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি পর্যালোচনায় গুরুতর বিষয়ে তাঁরা অধিকাংশই ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের মতানুগামী, এ এক আশ্চর্যকর লক্ষণীয় ব্যাপার। প্রায় দুশতক ধরে যে মহাদেশ পাশ্চাত্যের শাসনাধীন ছিল তার সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতীচ্য মনীষীদের মনে অহেতুক উচ্চমন্যতাবোধ ক্রিয়া করে কিনা এবং এদেশীয় গবেষকবৃন্দ দুশ বৎসরের অধীনতার ফলে অর্জিত হীনমন্যতাবোধের জন্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভাবং মতামত অনুসরণ করেন কিনা—এ প্রসঙ্গ মনস্তাত্ত্বিকদের বিচার্য! আমরা শুধু প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করি, কারণ অনুধাবন করতে পারিনা। রামায়ণের ঐতিহাসিকত্ব ভিন্ন এমনি আর একটি দৃষ্টান্ত মনে আসে। প্রাচীন আর্যদের আদি বাসভূমির কথা। পাশ্চাত্যের গবেষকদের এই অভিমত যে, ভারতীয় আর্যদের পূর্বপুরুষগণ উত্তর ইউরোপের আর্কটিক অঞ্চলে কিংবা ভলগা নদীতীরে অথবা মধ্য ইউরোপের হাঙ্গারীয় ভূখণ্ডে বাস করতেন, সেখান থেকে কালক্রমে তাঁদের ভারতে আগমন ঘটে! ভারতবর্ষ কখনো ইন্দো-আর্যগোষ্ঠীর মানবদের আদি নিবাসস্থল নয়! এ দেশের নেতৃস্থানীয় ভারততত্ত্ববিদরা বেশীর ভাগই উক্ত পাশ্চাত্য মত নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন! এ বিষয়ে সমালোচনা অবশ্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক!

রামায়ণের ঐতিহাসিকত্বের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এক্ষেত্রেও ইউরোপীয় ভারততাত্ত্বিকদের মতামত প্রায় নির্বিচারে এবং নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন এদেশীয় পণ্ডিতদের অনেকে। অবশ্য রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের অনুগামী ভারতীয় ইতিহাসবিদ্‌গণও। ভারত যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং কৃষ্ণ শান্তনু, ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন পরীক্ষিৎ জন্মেজয় প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক চরিত্ররূপ দিয়েছেন।

কিন্তু রামায়ণের মূলে কোন ইতিহাসের স্বীকৃতি দানে তাঁরা কুণ্ঠিত। কারণ বোধহয় পাথুরে প্রমাণের অভাব। অবশ্য জনক রাজা তাঁদের মতে ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা অস্বীকৃত। কেননা রাম লক্ষ্মণ চরিত্রের পাশ্চাত্য ইতিহাসসম্মত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতগণেরা যে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ কিংবা নঙ্‌-অর্থক সিদ্ধান্ত করেছেন এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সাধারণের সমালোচনা স্পর্ধা বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু স্বদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার অধিকার সকলেরই আছে,, বিশেষ যখন রামায়ণের অনৈতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠার সপক্ষে কেউ উপস্থাপিত করতে পারেন নির্ভরযোগ্য প্রমাণপঞ্জী।

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে ভারততত্ত্বের বহু প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে এবং নানা বিষয়ে নতুন করে গবেষণার ক্ষেত্র বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনেক অধ্যায় এখনো অলিখিত এবং অনেক অধ্যায় পুনর্লিখনের অপেক্ষায় আছে। কোন্ প্রাচীন কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে এবং কোন্‌টি অনৈতিহাসিক সেবিষয়ে সরাসরি মতামত প্রকাশে কোন কোন বিষয়ের প্রতি অবিচার হওয়া সম্ভব। কারণ সমাজ ও সংস্কৃতির এমন কয়েকটি লুপ্ত পর্ব আছে যার উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়নি কিংবা প্রয়োজন অনুরূপ উপাদান পাওয়া যায়নি। বুদ্ধ-পূর্ব যুগের ভারত ইতিহাস একান্ত অস্পষ্ট। সর্বসম্মত উপ-

করণের অতিশয় অভাব। কিন্তু সুদূর অতীতকাল থেকে প্রচলিত হয়ে-আসা বহু লোকশ্রুতি আছে যাদের অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে যথাযোগ্য গবেষণা হয়নি। 'নাহ্যমূলাঃ জনশ্রুতিঃ'। অবশ্য সকল জনশ্রুতিই বিশেষ ভাবে বিচার বিবেচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। বিপুল পুরাণ সম্ভার নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি বৃহৎ জগৎ অনাবিষ্কৃত রয়েছে। পুরাণ আলোচনায় সন্ধানী আলোকপাতের ফলে, যে যুগের তথাকথিত ইতিহাস আজো রচিত হয়নি তার ছায়াচ্ছন্ন পথ রেখা দৃশ্যমান হতে পারে।

এই সব সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা মনে আসে রামায়ণের 'অনৈতিহাসিকতা'র প্রসঙ্গে। প্রশ্ন জাগে—রামায়ণ মহাকাব্য সৃষ্টির মূলে যে রাম কাহিনীটি, তা যখন স্মরণাতীত কাল থেকে লোকসমাজে প্রচলিত ও জীবন্ত ছিল, তাকে অলীক সাব্যস্ত করবার পক্ষেও ত কোন প্রমাণ নেই। সত্যের কোন প্রকার ভিত্তি না থাকলে কাহিনীর দীর্ঘকাল যাবৎ এত ব্যাপক প্রচলন কি করে সম্ভব? বিষয়বস্তুতে কোন কোন অংশে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও রামের উপাখ্যান মহাভারতে সংগৃহীত উপাখ্যানগুলিতে দেখা যায় এবং বৌদ্ধ পালি সাহিত্যেও। কথাটি তাৎপর্য পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—"রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে ···একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল।···রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণ কথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

রামায়ণের এই 'পূর্বসূচনাকে কি কথান্তরে বাস্তবতার ভিত্তি স্বরূপ বলা যায় না? মহাকাব্যের অবলম্বন হিসাবে মূল ঘটনা একটা কিছু ছিল। তার উপর কল্পনায় চরিত্র ও কাহিনী পল্লবিত হতে পারে, কিন্তু আদি রূপের রামায়ণ কখনোই আদ্যোপান্ত অলীক হওয়া অসম্ভব।

ইতিহাস-পূর্ব যুগের মহাকাব্যের পরিকল্পনার মূলে কোন না কোন বাস্তব বা ঐতিহাসিক কাঠামোর বীজ থাকে যার ওপর এপিক রচয়িতারা হয়ত প্রবর্ধিত কাহিনী সৃজন করেন, কিছু অতিরিক্ত চরিত্রও কল্পিত হতে পারে। কোন বৃহৎ বাস্তব ঘটনার অভিজ্ঞতা কিংবা পরম্পরাগত স্মৃতি, মহান বীর চরিত্র, ঘটনাকালীন সমাজের চিত্র, নগরী গিরি নদী যথাযথ পরিবেশ এপিক বা মহাকাব্যের ভিত্তিস্বরূপ। এপিক রচয়িতারা সম্পূর্ণত কল্পনাচারী হতেন না। একথা মহাভারত সম্পর্কে যদি সত্য হয়, রামায়ণ বিষয়েও মিথ্যা নয়। তবে বাস্তব উপাদানের ও কল্পনার পরিমাণে তারতম্য ঘটতে পারে। কিন্তু এপিক সৃষ্ট হয়না নিরালম্ব কল্পনায়। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এপিক রচনা সম্পর্কেও সম মন্তব্য করা যায়। যথা, প্রাচীন গ্রীসে হোমারের মহাকাব্যদ্বয় ইলিয়াড ও ওডিসি।

রামায়ণের মূলে যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কটি বৃহৎ ঘটনার প্রতিফলনের উল্লেখ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিরোধ, অনার্য রাক্ষসদের সঙ্গে আর্য ক্ষত্রিয় রাজাদের মুখপাত্রস্বরূপ রামচন্দ্রের সংঘর্ষ ইত্যাদি—আগে করা হয়েছে, সেসব কেন রামায়ণের ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বরূপ গণ্য হবেনা? অতীত ইতিহাসের এমন সুগ্রথিত ঘটনাবলী যে মহাকাব্যে বিদ্যমান, তা নিছক কবিকল্পনা এবং অনৈতিহাসিক কি করে বলা যায়? বরং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পর্যালোচনায় রামায়ণকে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রূপে ধর্তব্য। তত্ত্ব ও বাস্তব দু'দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের এই বাণী স্মরণীয় "রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।"

শুধু অযোধ্যার ঐতিহ্যে নয়, ভারতের দিকে দিকে রাম সীতা লক্ষ্মণের জীবন্ত জনশ্রুতি। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থানের সঙ্গে রামায়ণ কাহিনীর বহুকালাগত একাত্মতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অযোধ্যা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণতম প্রান্তে রামেশ্বর ধনুষ্কোটি পর্যন্ত রামসীতা লক্ষ্মণের স্মৃতি তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত।

এমন কি ভারতবর্ষের বহির্ভূত সিংহল দ্বীপেও। সেখানে আছে সীতা এলিয়ার (সিংহলী ভাষায় পাহাড় অর্থে এলিয়া) মন্দির। কলম্বো থেকে বড় লাইনের গাড়ীতে নানুয়া ষ্টেশন, সেখান থেকে সাত মাইল দূরে নুবারা এলিয়া। সিংহলে এই পাহাড়েরই উচ্চতা সব চেয়ে বেশি—প্রায় সাত হাজার ফুট। নুবারা এলিয়ায় পথের ধারে সীতার মন্দির। মন্দিরের অবস্থা অতি দীন বেশ, টিনের একটি চালা ঘর। কিন্তু তার মধ্যে আছে কৃষ্ণ প্রস্তরে গঠিত সীতার

মূর্তি, প্রায় চার ফুট উচ্চ। সীতা মূর্তির দু পাশে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বিগ্রহ। মন্দিরের পাশে একটি ঘরে পূজারী থাকেন। তিনিই করেন নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা। মন্দিরের পাশে একটি ঝর্ণা, তার ধারে একটি অনুচ্চ পর্বত। সেখানে ঘন জঙ্গল ছিল। এবং এইস্থানেই রামায়ণোক্ত অশোক গাছের বন. ইতি কিংবদন্তী; যদিও সেকালের অশোকের জঙ্গলের চিহ্ন আর নেই। কিন্তু লোকশ্রুতি আছে—রাবণ সীতাকে বন্দিনী করে রাখে এই স্থানেই।

কত মন্দির জনপদ গহন-অরণ্য রাম কাহিনীর নানা চরিত্র ও পর্বের স্মরণে রঞ্জিত।

সকলের কেন্দ্রবিন্দু রূপে অযোধ্যার ঐতিহ্য। ঘর্ঘরা নদীতীরের এই অযোধ্যা নগরীই সেই প্রাচীন উত্তর কোশলের রাজধানীর নাম সঞ্জীবিত রেখেছে, যদিও বর্তমানের সহরটির সে ঐতিহাসিক প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করবার কোন নিদর্শন নেই। 'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।'

ধূ ধূ বালুকার আস্তরণে গৈরিক, চর জেগে ওঠা এই ঘর্ঘরাই কি সেই সরযূ প্রবাহিনী? তার সেতুর পরপারে অযোধ্যা। প্রাচীন কালের স্মারক সব কিছুই কিন্তু এখানে অর্বাচীন। মহাবীরের বিরাট মন্দির তার নিকটে রামচন্দ্রের রাজসভা, তার জন্মস্থান—কোনটিতেই পুরাতনের চিহ্ন নেই।

রাম ও লক্ষ্মণের সরযূতে আত্মবিসর্জনের 'স্মারক'ও ত্রিকালজ্ঞ পাণ্ডারা পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রদর্শন করায় তীর্থাগত ভক্তদের। কোথায় সেই সত্যিকার রামকোট—রামের দুর্গের স্থান, যার ২০টি বুরুজের ওপর নগর রক্ষা করতেন হনুমান সুগ্রীব প্রভৃতি।

কিন্তু তবু অযোধ্যার ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্য কোন স্থানের এমন নিবিড় বন্ধন নেই। অযোধ্যার স্থানমাহাত্ম্য এখানেই। যেমন অর্বাচীন বৃন্দাবন ও স্মৃতিধন্য ব্রজভূমির ঐতিহ্য একাত্ম। সব তীর্থ নামের উল্লেখ বাহুল্য। তাদের কয়েকটি মাত্র স্মরণ করলেও বোঝা যায়, সমগ্র ভারতের অঙ্গে অঙ্গে রামায়ণের প্রধান চরিত্রাবলীর প্রতিস্মৃতি কি গভীরভাবে অঙ্কিত রয়ে গেছে। লক্ষ্মণ নামের সঙ্গে চিরবিজড়িত রয়েছে লক্ষ্ণৌ। নবাবী আমলের প্রথম যুগে সাদৎখাঁ এখানে যে প্রাসাদ নির্মাণ করেন সেই মচ্ছি ভবনের চত্বরের মধ্যে ছিল একটি পুরা স্থানের স্মরণিকা। সুদূর অতীতের কোন সময় থেকে সেখানে যে একটি নির্দিষ্ট ভূমি-গর্ভে তীর্থিকরা লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে ফুল জলের অর্ঘ নিবেদন করত, তা জানা যায় না।

তেমনি উনাও জেলার বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রামায়ণের নানা ঘটনার কিংবদন্তী। কত কাল আগে থেকে, তা কেউ জানেনা।

রাম সীতা লক্ষ্মণের বনবাস পর্বের লোকশ্রুতিতে রঞ্জিত গোদাবরী নদীতীরের দণ্ডকারণ্য নাম। গোদাবরীর ধারে সেই নামগুলির স্মরণে এক একটি তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে। দণ্ডকের সে মহারণ্য লুপ্ত হয়ে গেছে কবে। বাড়ী ঘর যানবাহনে পূর্ণ লোকারণ্য এখন সেখানে। তবু দণ্ডকারণ্য নামের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়নি। গোদাবরীর দুই তীরে সেই পঞ্চবটী ও নাসিকের নাম আজো বেঁচে আছে। এই সব বিপণির কোন স্থান একদা ত্রেতা যুগে রাম লক্ষ্মণ সীতার বনবাসধন্য ছিল, স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে। শূর্পণখার নাসিকা কর্তনের স্মরণী নাকি নাসিকা। নাসিকা ছেদনের জায়গাটিও নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়ে থাকে। যেমন দর্শনীয় স্থান আছে এখানকার সীতাগুহা, মারীচ বধের ভূমি ইত্যাদি। নাসিক ত্রেতাযুগে জনস্থান নামে পরিচিত ছিল এবং দুই ভ্রাতা খর ও দূষণ তার অধিপতি, যাদের মাতুল লঙ্কা-র রাজা রাবণ।

পঞ্চবটীতে রামচন্দ্রের স্মারক মন্দির আছে। এক ক্রোশ দূরবর্তী তপোবন, সেখানে যাবার পথের ধারে পঞ্চবটীর সেই রাম-মন্দির। মন্দিরের আকার বৃহৎ। মূল মন্দির, নাটমন্দির এবং রামচন্দ্রের মূর্তি সবই কষ্টি পাথরের। মন্দিরের নিকটেই সীতা গুহা। গুহাটি বাইরে থেকে একটি সাধারণ গৃহ মনে হয়। তার মধ্যে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় প্রায় দোতলার সমান নীচে একটি গুহায়। পাণ্ডাদের মতে শূর্পণখার নাসিকাছেদনের সংবাদে খর দূষণ রাম লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে রামলক্ষ্মণ এই গুহায় সীতাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেখান থেকে কিছু দূরে গোদাবরী নদীর সঙ্গে আর একটি নামহীন জলধারার সঙ্গম দেখা যায়। স্থানীয় জনশ্রুতি সেই সঙ্গমেরই পাশে একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করেছে রামের কুটীর-বাসের সঙ্গে চিহ্নিত করে। তারপর সেই ক্ষীণ ধারাটি অতিক্রম করে খানিক দূরে গেলে আর একটি মন্দির দেখা যায়। মারীচ বধের স্থান হিসেবেই জায়গাটির প্রসিদ্ধি; তাই এই মন্দিরে স্থাপিত আছে তীর-ধনু হস্তে

রামের দণ্ডায়মান বিগ্রহ আর তার সামনে তীরবিদ্ধ স্বর্ণ হরিণের মূর্তিও। এ অঞ্চলে রামের নাম এমনি নানা কিংবদন্তী আশ্রয় করে বেঁচে আছে জনসাধারণের মনে।

বনবাস পর্বের প্রথম দিকে যে চিত্রকূট পর্বতে রামের সঙ্গে ভরতের মিলন হয়েছিল, সেই পাহাড়ও কালক্রমে তীর্থ-স্থানে পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এই চিত্রকূট পর্বত রাম ভরতের মিলনস্মৃতিধন্য রূপে বেঁচে আছে লোকশ্রুতিতে।

এমনি ভাবে, রামায়ণে উল্লিখিত নানা ভৌগোলিক সংস্থান দূর বিস্তৃত ভারতের তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত হয়ে আছে। রাম কাহিনীর সম্পর্কে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত আরো অনেক তীর্থের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, যুদ্ধ কাণ্ড প্রভৃতিতে বর্ণিত বিষয়গুলি থেকে সেকালের ভারতের নানা অঞ্চলের নদী-গিরি নগরীর ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয়—মহাভারতের মতন—রামায়ণ থেকেও অনেকাংশে লাভ করা যায়। এত ব্যাপক একটি বিষয়ের কি কোন তাৎপর্য নেই?

পূর্ব ভারতের রাম কাহিনী লোকশ্রুতিতে বিদ্যমান রয়েছে। রাজর্ষি জনক মিথিলা বা জনকপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

সেই জনক রাজার নামের স্মৃতি রয়ে গেছে উত্তর বিহারের জনকপুরে। ভারতের প্রত্নবিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ কানিংহাম সাহেব নেপাল সীমান্তের নিকটে এই জনকপুর গ্রামটিকে এই সূত্রে সনাক্ত করেছেন। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড বিদ্যমান রয়েছে বৈদেহীর নামের স্মৃতি বহন করে।

অযোধ্যা থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্রীয় ভারত, দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে মিথিলার সীমা পর্যন্ত ওই সব তীর্থ রামায়ণের ভৌগোলিক সংস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু রাম প্রভৃতির নামের মাহাত্মে পূর্ণ আরো স্থান আছে যা রামায়ণের ভূগোল-পরিবেশের বাইরে। যথা—ভারতবর্ষের সুদূর উত্তরে, নগাধিপতি হিমালয়ের অঞ্চলে। তেমন কয়েকটি তীর্থস্থানের নামও উল্লেখ করা যায়। অবশ্য রাম উপাখ্যানের যে সব চরিত্রের সঙ্গে এই স্থানগুলি সম্পৃক্ত, তাঁদের কোন কাহিনী বা ঘটনা এখানকার জনশ্রুতিতে নেই। শুধু তাঁদের স্মরণে এক একটি দেবালয় গঠিত হয়েছে কিংবা তাঁদের নামাঙ্কিত হয়ে এক একটি স্থানের পরিচিতি গড়ে উঠেছে। দেশের দিকে দিগন্তরে জন-মনে তাঁদের যে অক্ষয় আসন, এই সব তীর্থভূমি তারই পরিচায়ক।…

হিমালয়ের দ্বারদেশে হরিদ্বার। হরিদ্বারের আট ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরের পবিত্রভূমি ঋষিকেশ। ঋষিকেশের একটি দ্রষ্টব্য ভরত মন্দির। রাম কাহিনীর অন্যতম অমর চরিত্র ভরতের স্মরণী ভারতে বেশী নেই। সেদিক থেকেও ঋষিকেশের ভরত-মন্দির উল্লেখনীয়।

হিমাচলের সানুদেশে অপরূপ নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে এবং শান্ত গ্রামনিমার পরিবেশে নিমগ্ন লছমন ঝুলা স্থানটিতে আছে লক্ষ্মণের নাম-মাহাত্ম্য।

ঋষিকেশ থেকে লছমন ঝুলা যাবার পথের ধারে দেখা যায় একটি অনন্য দেব-গৃহ। শত্রুঘ্ন মন্দির। রামায়ণে প্রায় উপেক্ষিত এই রামানুজের স্মরণে ভারতের অন্যত্র মন্দির গঠিত হয়েছে কিনা তেমন জানা যায়না, সেজন্যেও এখানকার শত্রুঘ্ন মন্দিরটি বিশেষভাবে মনে রাখবার যোগ্য।

পঞ্চ প্রয়াগের প্রথমটি হল দেবপ্রয়াগ। ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গম-তীর্থ। দেবপ্রয়াগ থেকে কেদার বদরিকাশ্রমের যাত্রাপথে আসে রাণীবাগ জনপদ। রাণীবাগ পার হয়ে জিনাস্থ নামে একটি গ্রাম আছে। জিনাস্থ নামটি নাকি জনক রাজার নাম থেকে উৎপন্ন। এখানে জনক রাজার একটি আশ্রম ছিল এবং এই স্থানে তিনি তপস্যা করেছিলেন—ইতি জনশ্রুতি। প্রাচীন মন্দিরের কিছু ধ্বংসাবশেষ, ভগ্ন বেদিকা ইত্যাদি এখানে দেখা যায়।

বদরিকাশ্রমে যাত্রাপথে শেষ পান্থশালা যেখানে, সে স্থানটি রাম ভক্ত ও সেবক হনুমানের নাম ধারণ করে আছে। এই পার্বত্য গ্রামখানির নাম হনুমান। এখান থেকে বদরি তীর্থ প্রায় দু'ক্রোশ দূর চড়াই-এর প্রান্তে। এখানকার তীব্রগতি গঙ্গাও হনুমানের নামাঙ্কিত। এখানে অনেকগুলি মন্দির আছে বটে, কিন্তু বিশাল হনুমান মন্দিরই সকলের মধ্যে প্রধান।

এমনিভাবে ভারতবর্ষের উত্তুঙ্গ উত্তর থেকে দক্ষিণের প্রান্ত-সীমায় সমুদ্র পর্যন্ত, বিস্তীর্ণ মধ্যদেশব্যাপী ও পূর্বাঞ্চলের অনেকখানি পর্যন্ত রাম কাহিনীর সংশ্লিষ্ট নামাবলীর

জীবন্ত শ্রুতি স্মৃতি। অযোধ্যার ঐতিহ্যের সূত্রে ভারতভূমির অঙ্গে অঙ্গে গ্রথিত অগণিত তীর্থ। এত স্থান মাহাত্ম্য সত্যের লেশহীন বলে কি করে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়? স্মরণাতীত কালের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিমূল না থাকলে এত কালান্তরেও এমন প্রাণপূর্ণ ঐতিহ্য কি করে বর্তমান থাকে?

রামচন্দ্র ভিন্ন আর যে কটি নামের অচ্ছেদ্য সূত্রে ভারতবর্ষের বহু তীর্থরাজি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক পরিচিত হলেন শিব ও কৃষ্ণ। দুজনেরই ঐতিহাসিকত্ব স্বীকৃত। রামের অনৈতিহাসিকতাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। যে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী রাম চরিত্র অলীক কল্পনার সৃষ্টি বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা বক্তব্যের সপক্ষে তথ্য প্রমাণ কিছু দেননি—এমন জীবন্ত শ্রুতি স্মৃতিকে অস্বীকার করতে গেলে যা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বরং পুরাণের যথোচিত গবেষণা হলে বিপরীত সাক্ষ্য প্রমাণ সম্ভবত আবিষ্কৃত হলে পুরাকালের ইতিহাসের অনেক জটিল গ্রন্থিমোচন ঘটবে।

সে পুরাতন যুগের ইতিহাস যতদিন উদ্ধার না হয়, তার হারানো সূত্রাবলীর সন্ধান না পাওয়া যায় ততদিন অনেকের কাছে রহস্যই থেকে যাবে অযোধ্যার ঐতিহ্য। পুরাণ, ইতিহাস, কিংবদন্তী ও পল্লবিত কল্পনা সব একাকারে মিশে থাকবে রাম কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে।......

অযোধ্যা যে সূর্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল তাঁদেরও ইতিহাসসম্মত বিবরণের অভাব। তাঁদের রাজত্ব-কালেই নাকি রাজধানী রূপে অযোধ্যার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়—এখানকার রাজাদের কেউ যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারায় তাঁদের রাজধানীর নাম হয়ে যায় অযোধ্যা। অতি প্রাচীন কালেই এই অযোধ্যা নগরী ভারতবর্ষের এক সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

এই সূর্যবংশীয় মহাবলী সম্রাট মান্ধাতার সময়ে উত্তর ভারত সূর্যবংশের সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। উত্তর ভারতে চন্দ্রবংশীয় রাজশক্তিকে নির্মূল করেন তিনিই। তারপর তিনি নর্মদা তীর পর্যন্ত অভিযান করেন দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য তথা আর্য শক্তিকে প্রসারিত করবার প্রেরণায়। নর্মদা তীরে মান্ধাতা ক্ষেত্র নামে যে তীর্থ স্থান, নর্মদা নদীর সেই মধ্য অঞ্চলের বৈদূর্য পর্বতে তিনি শিবযজ্ঞ সমাপন করে ওঙ্কারেশ্বরের বর লাভ করেন—তাই এই তীর্থের প্রসিদ্ধি। মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দও ছিলেন বীরত্বে পিতার যোগ্য পুত্র এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি নর্মদার দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাল্মীকি-রামায়ণের বর্ণনায় মনুকে অযোধ্যাপুরীর নির্মাতারূপে পাওয়া যায়। মনু থেকে আরম্ভ করে ১১২ পুরুষ রাজত্ব করেন এখানে। এই ধারায় শেষ রাজার নাম সুমিত্র। রাজা সুমিত্র অযোধ্যা পরিত্যাগ করে চলে যান। তাঁর পরেই আরম্ভ হয় অযোধ্যার বিলুপ্তি ও ধ্বংস। ক্রমে গৃহ প্রাসাদ ইত্যাদি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে পড়ে। একদা সুসমৃদ্ধ রাজধানী পূর্ণ হয়ে যায় গভীর জঙ্গলে। প্রাচীন কীর্তি মহাকাল নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শুধু বাঁচে জনশ্রুতি!

এমনি কত পুরাণ কথা ও কাহিনী অযোধ্যাকে অবলম্বন করে প্রচলিত রয়েছে। আর ইতিহাসের কত বিচিত্র পট পরিবর্তনও হয়েছে এই নগরীকে ঘিরে।.........

বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবকালেও অযোধ্যার কথা উত্তর ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। শাক্য মুনি স্বয়ং এখানে তাঁর নব উপলব্ধির ধর্ম প্রচার করে গেছেন।

কালক্রমে সূর্যবংশীয়রা অযোধ্যা ত্যাগ করে যাবার পর শ্রাবস্তীর রাজারা রাজত্ব করেন এখানে। তারপর অনেক দিন পর্যন্ত এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাব থাকে। আগে যে অযোধ্যার পরিচিতি ছিল কোশল নামে, বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবের যুগে তার খ্যাতি হয় সাকেত নামে। কিন্তু সে যুগে সাকেত কখনো কোন রাজার রাজধানী হয়নি। তথাগতের সমকালীন কোশল-নৃপতি প্রসেনজিতের এক রাজপুরী ছিল এখান থেকে ছয় যোজন দূরবর্তী শ্রাবস্তী নগরীতে, এখন যার নাম সাহেত। প্রসেনজিৎ জামাতা অজাতশত্রুর কোশল আক্রমণের ফলে সে শ্রাবস্তীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। বৌদ্ধধর্মের মহিমার যুগে সাকেত, শ্রাবস্তী ও বারাণসী সুখ্যাত ছিল মহানগরী রূপে।

তথাগত প্রচারিত ধর্মমতের অতি গৌরবের সময়ে, প্রিয়দর্শী বৌদ্ধ সম্রাট অশোকেরও অযোধ্যানগরে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

সেকালের অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগের সরযূতীরের নগরী সাকেত ছিল এক বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র। শুধু জলপথে নয়, স্থল পথেও। ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে পাঞ্জাব প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগের পথে অবস্থানের জন্যেই তার এই গুরুত্ব ছিল। বাণিজ্যক্ষেত্রে তার এই উল্লেখ্য স্থান বর্তমান থাকে অনেককাল যাবৎ। চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর পরবর্তী মৌর্য সম্রাটদের আমলেও সাকেতের খ্যাতি প্রধানত বাণিজ্য-কেন্দ্র রূপেই ছিল। ইতিহাসের সুপরিচিত কালে সাকেত প্রথম রাজধানী হয় পুষ্যমিত্রের সময়ে, যিনি মৌর্যরাজার সেনাপতি থেকেও চূর্ণ করেছিলেন মৌর্যশক্তিকে।

পুষ্যমিত্রের রাজধানী সাকেতে স্থাপিত হলেও তখনো পাটলিপুত্রেরই প্রাধান্য বেশী ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কোন কোন মতে পুষ্যামিত্র কিংবা তাঁর প্রতিষ্ঠিত শুঙ্গবংশের অন্য কোন রাজার রাজত্বকালে রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি এবং সেজন্যে অধিক প্রচারিত হয় অযোধ্যার নাম-যশ। এই মতে, বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যের সাহায্যে শুঙ্গবংশের রাজধানীর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছিলেন। রামায়ণের এই রচনা-কাল অবশ্য অনেকের মতে সঠিক নয়। তার অন্তত পাঁচ ছয় শত বৎসর আগে, অর্থাৎ বর্তমান কাল থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণের অস্তিত্ব ছিল, তাঁদের মতে। শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্বানদের মধ্যে আচার্য সুনীতিকুমার অন্যতম, তিনি বলেছেন, "অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে আর্যভাষায় রামায়ণ কথা তাহার প্রথম রূপ গ্রহণ করে।"

সম্রাট পুষ্যমিত্রের পুরোহিত ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত পতঞ্জলি। পতঞ্জলির বিবরণে পাওয়া যায়—যবনরাজ মিনান্দার সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করে একবার জয় করেন সাকেতকেও। তখনো সাকেতের মহিমা সবিশেষ ছিল, বোঝা যায়। পুষ্যমিত্র পতঞ্জলির সময়েও রাজধানী অযোধ্যার চেয়ে সাকেত নামে বেশি পরিচিত। বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে তখন ত বটেই, পুষ্যামিত্র শুঙ্গের দুশ বৎসর পরেও সাকেতের গুরুত্ব ছিল, বহু বিত্তশালী শ্রেষ্ঠীর শেষোক্ত কালে এখানে বসবাস ছিল।

'বুদ্ধ চরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' এই দুই বিখ্যাত কাব্য প্রণেতা কবি অশ্বঘোষ ছিলেন সাকেতের সন্তান।

সপ্তম শতকের প্রায় মধ্যভাগে চীনা পরিব্রাজক ইউয়েন-সাঙ অযোধ্যায় এসেছিলেন। সেখানে তখনও তিনি প্রায় ২০ টি বৌদ্ধ মঠ দেখেন এবং অনুরূপ সংখ্যক ব্রাহ্মণদের মন্দির।

বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ গত হলে সাকেতের গৌরবের দিনও ক্রমে অস্তাচলে যায়। সেসবের আনুপূর্বিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

তারপর বিক্রমজিৎ নামে এক পরিচয়-হীন রাজার আবির্ভাব হয় এখানে। অযোধ্যার প্রাচীন মাহাত্ম্যের কথা শুনে তিনি হয়ত স্থানটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জন-প্রবাদ এই যে, মেঘবাহন নামে এক কাশ্মীররাজ অযোধ্যা অধিকার করেছিলেন এবং তাঁর হাত থেকে এ নগরীকে যুদ্ধে পুনরুদ্ধার করেন উক্ত রাজা বিক্রমজিৎ। তিনি এখানকার বন জঙ্গল পরিষ্কৃত করে' উদ্ধার করতে সচেষ্ট হলেন অযোধ্যার লুপ্তকীর্তি। তার পুরা যুগের গৌরব বৈভবের পরিচয় চিহ্ন!

বিক্রমজিৎ নাকি প্রথমে নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির উদ্ধার করেন। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময়েও মন্দিরটি নষ্ট হয়নি কথিত আছে। উদ্ধার কার্য্যের সঙ্গে বিক্রমজিৎ নতুন নতুন বিগ্রহ মন্দিরও স্থাপন করেন।

বিক্রমজিৎ রাজত্ব করেছিলেন নাকি প্রায় ৮০ বৎসর।

জৈন সম্প্রদায়ের মন্দির বা দেবালয় অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন না কোন সময়ে। অযোধ্যা এমন একটি স্থান যেখানে প্রায় সমস্ত ধর্মীয় মতবাদের সাধনভূমি ছিল। এবিষয়ের অনেক নিদর্শন আগে দেওয়া হয়েছে, এখানে আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়।

তীর্থঙ্কর অধিনায়ক জন্মগ্রহণ করেন অযোধ্যায়। (মৃত্যু হয় পার্শ্বনাথে)। ইতোরার পশ্চিম ধারে মন্দির আছে অজিতনাথের।

তীর্থঙ্কর অভিনন্দন নাথেরও অযোধ্যায় জন্ম (এবং পার্শ্বনাথে মৃত্যু)। অযোধ্যায় সরাইয়ের কাছে অভিনন্দন নাথের মন্দির আছে।

তীর্থঙ্কর সুমন্তনাথ এবং তীর্থঙ্কর অনন্তনাথেরও জন্ম ও দেহত্যাগ যথাক্রমে অযোধ্যা ও পার্শ্বনাথে। সুমন্ত-

নাথের স্মৃতিমন্দির রামকোটে এবং অনন্তনাথের মন্দির গোলাঘাট নালার ধারে স্থাপিত আছে।

এই পাঁচটি মন্দির দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। তা ভিন্ন শ্বেতাম্বর জৈনদেরও একটি মন্দির অযোধ্যায় আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জৈন তীর্থঙ্কররা প্রাচীন হলেও তাঁদের স্মারক মন্দিরগুলি পুরাতন নয়, অর্বাচীন কালে গঠিত।

বিষ্ণুর উপাসক অর্থাৎ বৈষ্ণবদের সাতটি সম্প্রদায়ের এক একটি করে মঠ অযোধ্যায় আছে। মঠগুলি খুব পুরানো না হলেও তা থেকে বোঝা যায়, বৈষ্ণবদেরও ধর্মচর্চার একটি কেন্দ্র ছিল এই স্থান।

হনুমান-গড়ে আছে নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের মঠ। এই এই সম্প্রদায়ের চার শ্রেণী—কৃষ্ণদাসী, তুলসীদাসী, মনিরামী এবং জানকীশরণ দাসী।

রামঘাটে ও গুপ্তঘাটে নির্মোহী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের আখড়া। প্রায় সাড়ে তিনশ বৎসর আগে গোবিন্দদাস নামে এক বৈরাগী জয়পুর থেকে অযোধ্যায় এসেছিলেন। এখানে নিষ্কর ভূমি পেয়ে তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রামঘাটে।

দিগম্বরী নামে অন্য এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠও অযোধ্যায় দেখা যায়। নির্মোহী সম্প্রদায়ের গোবিন্দদাসের প্রায় সমকালেই এখানে আসেন দিগম্বরী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক সাধক। তাঁর নাম বলরাম দাস। তিনিই এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন।

এমনি ভাবে দয়ারাম দাস নামে একজন চিত্রকূট থেকে এসে স্থাপন করেন খাকী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের একটি আখড়া। খাকী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করে থাকেন। কারণ তাঁদের মধ্যে এই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, লক্ষ্মণ অঙ্গে ভস্ম মেখেছিলেন বনবাসে যাবার সময়।

দয়ারাম দাস যখন খাকী সম্প্রদায়ের আখড়া স্থাপন করেন সেই সময়েই অর্থাৎ আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কোটাবন্দী থেকে অযোধ্যায় আসেন একজন মোহান্ত। তাঁর নাম পুরুষোত্তম দাস। তিনি মহানির্ব্বাণী সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং এই সম্প্রদায়ের একটি মঠ এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রায় একই সময়ে কোটা থেকে অযোধ্যায় আসেন নিরালম্বী সম্প্রদায়ের বীরমলদাস এবং সন্তোষী সম্প্রদায়ের রতিরাম মোহান্ত। তাঁরা দুজনেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মঠ এখানে নির্মাণ করেছিলেন।

এইসব মঠ মন্দির আখড়ার বেশির ভাগ স্থাপন করা হয় এখন থেকে শ'দুই বৎসর আগে। কিন্তু ধর্ম সম্প্রদায়-গুলির ঐতিহ্য যে অনেক পুরাতন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জৈনধর্ম্মের কালও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতন আড়াই হাজার বৎসর থেকে গণনীয়।

অযোধ্যায় শিবমন্দিরও অনেকগুলি আছে, যদিও বিষ্ণু-মন্দিরের সংখ্যার অনুপাতে প্রায় অর্দ্ধেক।

প্রায় সব প্রাচীন ভারতীয় ধর্মমতেরই যে অযোধ্যায় প্রাদুর্ভাব ছিল এই দেবস্থানগুলি তারই সাক্ষ্যস্বরূপ।

যতদিন হিন্দুদের স্বাধীনতা ছিল, ততদিন রাজ্য হিসেবে যেমন, তেমনি ধর্মকেন্দ্ররূপেও অযোধ্যার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

অযোধ্যার পূর্ব্ব ইতিহাসের অনেক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে যথাস্থানে। সেখানে নবাবী আমল আরম্ভ হবার আগে অর্থাৎ হিন্দু আধিপত্যের শেষ অধ্যায়ের কিছু বিবরণ দেবার আছে।

পৌরাণিক যুগে, বৌদ্ধ যুগে, শুঙ্গ যুগে এবং অন্যান্য রাজ্য-কালের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কয়েকবার দেখা গেছে, কোন কোন রাষ্ট্রকুল বা রাজবংশের রাজত্ব শেষে; পরিত্যক্ত হয়েছে অযোধ্যা জনপদ। তখন বসবাস প্রায় লোপ পেয়ে নগরী জঙ্গলে আকীর্ণ হয়েছে। এমন একটি সময় তার জীবনে একবার এসেছিল অষ্টম শতাব্দে।

সেসময় হিমালয় অঞ্চল থেকে থারু নামে একটি অনার্য জাতি অযোধ্যায় চলে আসে। এখানে তখন জন-বসতি ছিল না বললেই হয়। সেই থারু জাতির লোকেরা বন পরিষ্কার করে বসবাস করতে থাকে অযোধ্যায়। এখানে এদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় এবং তারা আর রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়নি, কৃষিকায নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল।

থারু জাতির বাস চলেছিল প্রায় একশ বৎসর।

তারপর উত্তর পশ্চিম দিক থেকে সোম বংশীয় রাজাদের এখানে আগমন ঘটে। থারু জাতি তখন অযোধ্যা থেকে বিতাড়িত হয় সোম রাজাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে। সোমবংশীয়েরা ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী।

এগারো শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত সোম রাজাদের রাজত্ব এখানে চলেছিল।

তারপর আসেন কনৌজের রাজা চন্দ্রদেব। সোম-বংশীয় রাজাকে বহিষ্কৃত করে চন্দ্রদেব অযোধ্যা ও উত্তর কোশল অধিকার করেন।

কিন্তু চন্দ্রদেবের রাজত্ব বংশানুক্রমে স্থায়ী হয়নি। তাঁর পরে অযোধ্যা অধিকার করে ভড় নামে আর একটি অনার্য জাতি। ভড়রাও ছিল জৈন ধর্মাবলম্বী।

তারপর দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে অযোধ্যা নগরীর জীবনে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে শিহাবুদ্দিন ঘোরীর নেতৃত্বে তুর্ক আফগান বাহিনী কনৌজ জয় করে অযোধ্যা লুণ্ঠন করে। অযোধ্যায় এই প্রথম ইসলামের অনুপ্রবেশ। তখন থেকেই এই সুপ্রাচীন ভারতীয় রাজ্য মুসলমানের কবলিত থাকে।

এবারের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে পূর্ববর্তী সব যুগের রূপান্তরের গুরুতর পার্থক্য। এ এক নতুন বিজাতীয় পরিবেশ সৃষ্ট হল। অতি রূঢ় আঘাত পড়ল এতকালের জাতীয় ঐতিহ্যে। ধর্মের নামে অনেক রক্তপাত এখানেও ঘটে গেল।

অযোধ্যায় ইসলামের উপনিবেশ স্থাপনের পর এবং নবাবী আমলের ইতিহাস বিস্তারিত প্রসঙ্গ। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তার বিবরণ বিশেষ নবাবী ইতিবৃত্ত দেওয়া হবে।

নবাবী আমলে অযোধ্যা নগরীর চেয়ে লক্ষ্ণৌর কথাই বেশি থাকবে। কারণ, আঠারো শতকের মধ্যভাগে অযোধ্যায় নবাবী পত্তনের পর অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী প্রথমে স্থাপিত হয় ফৈজাবাদে। তারপর তৃতীয় নবাবের সময় থেকে লক্ষ্ণৌতে। সুতরাং নবাবী আমলের প্রথম থেকেই অযোধ্যা নগরী রাষ্ট্রকেন্দ্র হিসেবে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ঘর্ঘরা নদীতীরে একটি সাধারণ সহর হিসাবে তার অস্তিত্ব থাকে, সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্বল করে। স্থানটি শুধু তীর্থভূমিরূপেই বিরাজমান হয়।

রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার কোন অবশেষ যে সেখানে আজ নেই, একথা বলা বাহুল্য। শুধু আছে কিংবদন্তি। নবাবী শাসনের কেন্দ্র প্রথম থেকে ফৈজাবাদে থাকায় এই আমলের বিশেষ স্মারক অযোধ্যায় নেই বটে, কিন্তু তার পূর্ববর্তী মোগল বাদশাহী শাসনকালের কিছু কিছু ক্ষত চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয়নি। কারণ অযোধ্যা অঞ্চল আউধ্ পরিচিত একটি সুবা ছিল মোগল আমলে।

তীর্থ মাহাত্ম্যের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে মোগল শাসকদের হস্তাবলেপের নিদর্শন অযোধ্যাতেও দেখা গেছে। ভারতের অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতন এখানেও ইসলামের ধারক বাহকদের কীর্তি স্থাপনের লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এইসব জায়গাকেই। সেজন্যে প্রাচীন হিন্দু তীর্থস্থানের পাশাপাশি কিংবা কোথা তাকে নিশ্চিহ্ন করে নতুন শাসকশ্রেণীর তরবারির আধিপত্য স্থাপত্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। আর অন্যত্র যেমন, তেমনি এখানেও কাফেরদের কোন কোন দেবালয়ের পছন্দসই অংশ উঠিয়ে এনে কাযে লাগানো হয়েছে নতুন নতুন ইমারত গঠনে।

মোগল আমলের প্রথম যুগ থেকেই অযোধ্যায় তার পদচিহ্ন পড়তে আরম্ভ হয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মস্থানরূপে যে জায়গাটির প্রসিদ্ধি তার কাছেই নির্মাণ করা হয়েছে এক প্রকাণ্ড মসজিদ। ভারতে মোগল বাদশাহীর স্থাপন-কর্তা বাবুর অযোধ্যায় শিকারে এসে কিছুদিন থাকেন। সেই সময় মসজিদটি গঠিত হয়। মসজিদের গায়ে সন তারিখ খোদিত আছে ৯৩৫ হিজিরা অর্থাৎ ১৫২৮ খৃঃ।

রামের জন্মস্থানের কাছে এই মসজিদটি হিন্দু দেবালয়ের অনেক পাথর নিয়ে গঠন করা হয়েছে। রামের জন্মস্থান যেমন কষ্টি পাথরে তৈরি, অবিকল তার মতন কয়েকটি থাম দেখা যায় বাবুরের সময়কার এই মসজিদে।

এই মসজিদ উপলক্ষ্য করে হিন্দু মুসলমানে অনেক

বিরোধ ঘটে গেছে। পরে বৃটিশ আমলে, রামের জন্মস্থান ও মসজিদ এই দুটি জায়গার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা হয় রেলিং দিয়ে।

স্বর্গদ্বার ও রামসীতার স্থানেও আরো দুটি মসজিদ স্থাপন করা হয়। স্বর্গদ্বারের মসজিদটি আওরঙ্গজেব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রামসীতার নিকটের মসজিদ করে তৈরি হয় তা জানা যায়নি।

রামসীতার মন্দিরটি আরো একরাজা সংস্কার করিয়েছিলেন ইন্দোরের পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈ-এর পূর্বে। তারপর অহল্যাবাঈয়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি নিকটবর্তী ঘাটটিকেও সংস্কৃত করেন রামসীতার মন্দিরের সঙ্গে। তারপর ইন্দোর রাজসরকার থেকে দেবালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্যে বার্ষিক বৃত্তিরও ব্যবস্থা করে দেন। ভারতবর্ষের অনেক তীর্থক্ষেত্রে প্রাচীন দেবস্থান সংস্কার ও নতুনের নির্মাণ করে রাণী অহল্যাবাঈ স্মরণীয় করেছেন তাঁর নাম। অযোধ্যাতেও এই সূত্রে তাঁর কীর্তিস্মৃতি জাগরূক আছে।......

মোগল কর্তৃত্বের অন্তিম পর্বে বাদশা মহম্মদ খাঁর আমলে অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠা হল উজীর বা নবাব বংশের। তার আদি যুগের চিহ্নও অযোধ্যার বুকে পড়েছিল। অযোধ্যা সুবার প্রথম উজীর হন যে সাদৎ খাঁ, যাঁর থেকে লক্ষ্ণৌর নবাব বংশের উৎপত্তি—তাঁর উজীরী জীবনের প্রথম বাস ঘটেছিল নদীতীরের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অযোধ্যা নগরীতে।

অযোধ্যার নদীকূলে অনেক ঘাট অনেক নামের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে আছে। রাম ঘাট, লক্ষ্মণ ঘাট, ভরত ঘাট, শত্রুঘ্ন ঘাট ইত্যাদি। গুপ্তঘাটে একটি সুড়ঙ্গ আছে—কিংবদন্তী অনুসারে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ-বর্জনের শোকে সেই সুড়ঙ্গ-পথে গিয়ে সরযূতে আত্মবিসর্জন দেন। যা হোক, এইসব ঘাট যে সংস্কার করা অবস্থায় আছে তা নয়।

লক্ষ্মণের নামের সঙ্গে যুক্ত ঘাটের ধারে সেই প্রথম নবাব সাদৎ খাঁ নির্মাণ করেন তাঁর সরকারী আবাস। সে কুঠীর নাম—কিলা মুবারক। কিলা মুবারকে নবাব-জীবনের স্থায়িত্ব বেশিদিন নয়।

অযোধ্যার কিলা মুবারক থেকে নবাবী মহল পরে ফৈজাবাদে চলে যায়। তাই একালের ঘর্গরা নদীতীরের অযোধ্যা নগরী সেই সুদূর অতীতকালের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে নিজের মতন করে।......

কিন্তু বালুকাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নদীতটে আজো যেন বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়—

রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা। (ক্রমশঃ)

শাশ্বত নারী

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

ওরা বলে যায় হাসি
তোমার নাহিক কীর্ত্তি নাই নাই খ্যাতি
পৃথিবীতে নাই যশ নাম।
কঠিন বিমূঢ় নারী লাজনত শিরে
জানি হায় মূর্খ আমি। আমি শুধু পৃথিবীরে
মানুষেরে ভালবাসিলাম।
আমারে বিধাতা দিল হিয়া ভরে শুধু
কীর্ত্তিমোহহীন ভাষাহীন মূক প্রেম মমতা প্রণাম।

আনারকলি*

শুধু দেহখানি হায়! শুধু আনারের কলি সম
ওই তনুখানি দেখেছিলে।
শুধু ওই কালো কেশ কৃশতনু হরিণ নয়ন
চঞ্চলা কিশোরী বালা তরঙ্গেতে ছলছল নদীর মতন
তাই শুধু দেখেছিলে!
হায় হতভাগ্য নর।
দেখ নাই দুখানি বাহুর মাঝে বক্ষতলে
একটি কোমল হিয়া তোমারি মতন
কাঁপে থরথর—
প্রেমে ভয়ে আনন্দেতে।
দেখ নাই তার মাঝে বুক ভরে তারও রয়েছে সঞ্চিত
পৃথিবীর এক প্রাণ-স্রোতধারা।
হায় দুর্ভাগিনী নারী! হায় হতভাগ্য নর।
চারিদিকে তার গড়ে তোলে প্রাচীর প্রাকার-কারা
স্তূপে স্তূপে জমায়ে পাথর।
দুর্ভাগিনী চিরনারী দেহ কেঁপে ওঠে ভয়ে থরথর।
দাঁড়াইয়া ছিল পাশে তার রক্তনেত্র চিরন্তন মানুষ বর্ব্বর।
নারী লভে জীবন্ত কবর।*

* (বাদশাজাদা সেলিমের প্রিয়পাত্রী। বাদশা আকবর শার আদেশে পাথরে গেঁথে জীবন্ত-সমাধি রচিত হয়। লাহোরে কবরটা আছে)।

মাদার টেরেসা

নহে কবি মহাকবি, নহে শিল্পী নহেক বিজ্ঞানী
নয় নয় রাণী মহারাণী।
কথাকাব্যে ইতিহাসে লেখা অমর মহিমময়ী
রাজার দুহিতা,
শকুন্তলা দময়ন্তী সাবিত্রী ও সীতা।
—অপরূপ প্রেমে আর ত্যাগে
মোহে অনুরাগে।
কিংবা অপূর্ব রূপসী অমরা উর্বশী।
রচিল না কাব্য-কথা কোথা একপাতা।
শাস্ত্রে শাস্ত্রে হয়নিক মানুষের ভাগ্যের বিধাতা।
লইল না কারো শাস্তি কিংবা প্রসাদের ভার—
ইঙ্গিতে জীবন-মৃত্যু মহাকর্ণধার!

*

কোমল সুন্দর তনু। সেবায় সুন্দর
কর্মব্যস্ত দুইখানি সুকোমল কর।
মমতায় প্রাণভরা চোখে ভরা করুণার ভাষা
বুকে ভালবাসা।—
যে ভাষা বলিয়া যায় আতুরের অনাথের কানে
আমি বন্ধু তোমাদের রহিনু এখানে।

*

সে এক বিচিত্র নারী। আশ্চর্য্য তাপসী।
কোন গৃহ কোণে আহা বাঁধিল না নীড়!
শতেক বন্ধনে যেথা করিয়াছে ভিড়,
নানা পাশ-স্নেহে-প্রেমে মমতায় কোমল-কঠিন
পৃথিবীরে বেঁধে যারা রাখে চিরদিন।

*

হে নারী তপস্বিনী ত্যজি গৃহ দেশ,
অজানা এ কোন্ দেশে—সন্ন্যাসিনী বেশ
ধরি নেমে এলে টানি ললাটে গুণ্ঠন
ত্যাগ সেবা প্রেমে সিক্ত করুণ নয়ন!
মোহহীন সুখহীন খ্যাতি যশ লোভহীন হায় গৃহহীন!
এ কোন্ আনন্দ-লোকে আপনারে করিলে বিলীন!
পৃথিবীর মুগ্ধ নেত্রে বাসা বাঁধে বিশ্বের বিস্ময়।
এ আনন্দ কোথা মিলে, হে তাপসী বলো বলো
কোথা তার পেলে পরিচয়।
কভু কোথা কোন ইতিহাসে হয়ত রবে না জানি তব
পুণ্যনাম।
তবু মুগ্ধ-চিত্ত নতশিরে রাখিলাম উদ্দেশে তোমার
আমার প্রণাম।

নিবেদিতা

বহুদেশ দেশান্তরে—সাগরের পারে
অজানা সে এক দেশ তুষার নীহারে
আবৃত অরণ্য গিরি নগর প্রান্তর
ভারতের মেয়ে যেথা লভে জন্মান্তর !
প্রতীচির একখানি পুণ্য গ্রামতলে
পূতশীলা শ্বেতদ্বীপা জননীর কোলে ।
অন্তরীক্ষে বাজিল কি ভারত গগনে
দুন্দুভি মঙ্গল শঙ্খ সে পুণ্য লগনে !
সেকথা জানেনা কেউ ।
কত দিন পর
বীর সন্ন্যাসীরে হেরি হলে জাতিস্মর ।
বিস্মিত ভারত হেরে কোটি নেত্র মেলি'
এ কে আসে জন্ম-বন্ধ ছাড়ি অবহেলি !
নহেক সাবিত্রী সতী দময়ন্তী সীতা
শুভ্র প্রাণ পুষ্প নিয়ে সে নিবেদিতা ।

২

কণ্ঠে তাঁর অক্ষ মালা । করে সেবাব্রত
হৃদয়ে মমতা মধু জননীর মত
অজানা এ দেশ লাগি । নির্ভয় অন্তরে
পশেন আতুর পাশে বরাভয় করে ।—
শমদম ধর্ম কর্ম সত্য ত্যাগব্রত
দশায়ুধে দশ ইন্দ্রিয় করিয়া শোভিত :
জ্ঞানে তেজে গার্গী, ত্যাগে মৈত্রেয়ীর ন্যায়,
আপন অজ্ঞাতে হলে অমর ধরায় ।
না চাহিতে এল পাশে যশ অর্থ জন
পৃথিবীর শ্রেয় ধন প্রতিষ্ঠা আপন !
গুরু সম চাহ নাই সে সবার পানে
আছিলে বিভোর বুঝি শ্রেয়ের ধ্যানে ।
যুগে যুগে ইতিহাস গাহে কত গাথা ।
আজো সবিস্ময়ে হেরে নব লোকমাতা ।

—•—

ফৈজী বেগম*

হায় রূপবতী মেয়ে।
কিসের মতন ছিল তোমার ও রূপরাশি—
অনাদি উষার মত আরক্তিম রংএ রংএ
ঢেউ তোলা আকাশের মত ?
অথবা অস্ফুট পদ্মের মত প্রাণবৃন্ত হতে
তনুর প্রাচীর ভেদি ধীরে ধীরে উঠিলে বিকশি'
মুখখানি করিয়া উন্নত ?
ওরা ভেবেছিল রূপ বুঝি ধরে রাখা যায়
ওদের কর্কশ বাহুর মাঝে।
ওরা ভেবেছিল বুঝি লুটিয়া লইবে রূপ
তোমার ও তনু হতে আপনার গায়।

হায়—রূপবতী নারী।
রূপ তব তনু হতে পারিল না কেহ ধরিবারে।
ভয় পাছে কেহ যদি লুটে নেয় তারে
তায় রাখি কারাগারে।
গড়ে তোলে নিরন্ধ্র প্রাচীর।—
মাঝে তার ত্রস্ত আঁখি রূপসী কিশোরী!
পাশে ওঠে পাথরে পাথরে গাঁথা
রূপ ? রূপময় জীবনের সমাধি-মন্দির।

* (সিরাজ উদ্দৌলার সমসাময়িক রূপসী নর্ত্তকী ফৈজী বেগম এঁরও জীবন্ত কবর হয় নবাবের আদেশে, জনশ্রুতি আছে)।

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

October, 1920

এলাহাবাদের কাট্‌রা নামক পাড়ায় যখন প্রবেশ করলাম তখন কিন্তু ড্রেনের গন্ধে আর লোকের ভীড়ে উত্যক্ত হয়ে উঠতে হল। পা দুখানা এতক্ষণ বেশী নিশ্চিন্ত মনে বার করে রেখেছিলাম, বড় জোর তাতে পাশের একাধ দু চারটে মনুষ্য উদগ্রীব হয়ে অমন তরুণ কমলের অধিকারিণীকে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল কিন্তু এখন এত জোড়া চোখ এমনভাবে আমার চরণধ্যান আরম্ভ করল যে গুটি সুটি মেরে বসে একেবারেই নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম। কাট্‌রা পার হয়ে যখন এগিয়ে চললাম, তখন আমার বাল্যের পরিচিত স্থানগুলো আবার অল্পে অল্পে মনে পড়তে লাগল। কোম্পানী বাগানের পাশ দিয়ে চলে গেলাম, সেই তেমনি আকাশস্পর্শী হয়ে গাছের বেড়া ভিতরের বাগানের চেহারা আড়াল করে রেখেছে। রাস্তার থেকে যদি বাগানটা দেখা যেত তাতে কার কি ক্ষতি হত, তা কোনদিনই বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ City Road এর উপর একখানা বাড়ীতে চোখ পড়ল। ওমা, এই বাড়ীতে শৈশবের কতগুলো দিন যে কাটিয়েছি। তারপর হুড়মুড় করে হারান সাথীরা সব একসঙ্গে মনে এসে ভিড়ল। এই ত সেই কায়স্থ পাঠশালা যেখানের সঙ্গে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারের প্রথম ছবিগুলি জড়ান। বাড়ীটার চেহারাও প্রায় সেই রকমই আছে দেখছি। পৃথিবীতে যে জায়গাটাকে যে ঘরখানাকে প্রথম নিজের বলে চিনেছিলাম অবাক্ হয়ে দেখলাম আজ বাষ্পীয় লৌহদানব নিজের বাসা বাঁধবার জন্য আমার সেই স্মৃতির নীড়কে কোন্ বিস্মৃতির দেশে বিদায় করে দিয়েছে। বাড়ীঘর, অতবড় পেয়ারা বাগান সব উড়ে গেছে, তার জায়গায় খালি লোহা আর টিন।

শহরের বুকের উপর দিয়ে রেলের লাইন চলে গিয়েছে। উঁচু মাটির embankment এর উপর দিয়ে লাইন পাতা। কাজেই City Road এর উপর একটা ছোট সাঁকো বানাতে হয়েছে, চলাচলের পথ রাখার জন্য। এই সাঁকোর উপর দিয়ে যখন ট্রেন যেত তখন সাঁকোর নীচে দাঁড়িয়ে ট্রেনের গভীর গর্জ্জন শুনতে আর উপভোগ করতে কি ভালই বাসতাম ছেলেবেলা। Engine থেকে ছিটকে দুচার ফোঁটা গরমজল যদি গায়ে পড়ত তবে ত একেবারে রাজ্যাভিষেকের আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরতাম। আর এখন আধ-বুড়ো বয়সে সেই সাঁকোর নীচ দিয়েই গেলাম, মনটা একটু দুলল ও না। সবই দেখছিলাম সবই চিনছিলাম কিন্তু ছেলেবেলার সে মন ত আর নেই, সে পুলক ফিরে পাব কি করে?

ক্রমে চক ছাড়িয়ে অনেক চেনা দোকান ও অচেনা দোকানের পাশ দিয়ে অবশেষে বাহাদুরগঞ্জে বামনদাস বাবুদের বাড়ী এসে ত পৌঁছলাম। বাড়ীর সকলের স্বাগত সম্ভাষণে খুশী হলাম বটে, তবে সব চেয়ে খুশী হলাম যখন বাড়ীর নাতিটি দয়া করে আমাদের recognise করলেন এবং আমার কোলে উঠে আমার শাড়ীর ফুলতোলা পাড়ের ফুলগুলো তুলে নেবার জন্য বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন।

এখানে এসে আর একপালা খাওয়া দাওয়া হল, তারপর খানিক এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে শেষে অপরাহ্নে স্কুল দেখতে চললাম। মায়ের স্কুল দেখায় কোনো interest ছিল না, তিনি গৃহিনীর সঙ্গে গঙ্গা নাইতে চললেন।

স্কুলে গিয়ে ত হাজির হলাম। সবে গড়ে তোলা স্কুলের পক্ষে ছাত্রীর সংখ্যা, ঘরদোর জিনিষপত্র সবই ভালই ঠেকল। তবে আসল কথা, এ সব দেখতে ত আর আসিনি? শিক্ষয়িত্রীদের অধিকাংশই আমাদের অত্যন্তই চেনাশোনা, তাদের সঙ্গে গল্প করতেই এসেছিলাম, সেইদিকেই মন

দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে হাজার রকম topicএ গল্প করে ত বাড়ী ফিরে এলাম। কথা ছিল ফিরে এসে মাকে নিয়ে একবার খসরুবাগ দেখে আসব। কিন্তু ফিরে শুনলাম যে মারা সবে মাত্র বেরিয়েছেন, তাঁদের ফিরতে ঘণ্টা তিন-চার লাগবে। অতক্ষণ শুধু শুধু বসে কি করব? অতএব যে গাড়ী করে এই মাত্র ফিরে এলাম, সেইটাতেই আবার চ'ড়ে পাবলিক লাইব্রেরী দেখতে চললাম।

বাগানের ভিতরে ঢুকেই যেন আমার ভিতরের ঘুমে অচেতন মানুষটা জেগে উঠল। ঘন ছায়া-শীতল ঝাউবীথিকাটার দিকে চেয়ে মনে হল নিজের বিস্মৃতপ্রায় বাল্য জীবনের মধ্যে যেন ফিরে এসেছি। বাগানের মাঝখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা band stand, এটা বাদে চারিদিকেই সবুজের রাজ্য। গাছ, পাতা, ফুল, কচি ঘাস সবাই যেন এখানে চিরবসন্তকে বেঁধে রেখেছে। Band standএর অল্প দূরেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। শাদা পাথরে বাঁধান চত্বর আর রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি, দুইই বেশ ভাল দেখতে। কিন্তু শৈশবে আমি এগুলিকে যে চোখে দেখতাম সে চোখ ত আর এ জীবনে ফিরে পাব না? তখন এই বাগান সৌধ সব কিছুকে ঐন্দ্রজালিকের রাজ্য ভাবতাম, অস্ফুট ভাবের স্রোত মনের মধ্যে সারাক্ষণ নড়া চড়া করত এদের ঘিরে। উপকথার রাজার দেশ আমার এইখানেই ছিল। সে দিন নেই, সে জগৎও নেই। যে শিশুসাথীদের সঙ্গে এখানে নেচে বেড়াতাম তাদের মধ্যে দুজন ত চির নবীনতার দেশে চলে গিয়েছে আর চারজন এখন স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে কঠিন বাস্তবের রাজ্যে কোনো মতে পা ফেলে চলছে।

লাইব্রেরীর ঘরে ঢুকে বাবা আর বামনদাসবাবু বই জোগাড় করতে সুরু করলেন। লাইব্রেরিয়ান তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। আমরাও ঘুরে ঘুরে বই দেখতে লাগলাম এবং লাইব্রেরীর ঘরে আর যে কটি মানুষ বসেছিল, তারা আমাদের দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক কালের পুরনো বন্ধু উমেশ বাবু এসে হাজির হলেন। বাবাকে দেখে ত মহাখুশী হলেন, এবং আমাদের সঙ্গেও পরিচয়টা renew করে নিলেন। আমাদের গুণপনার অনেক পরিচয় তাঁকে দিয়ে দিলেন বামনদাসবাবু। আমার বই I.C.S.-এর পাঠ্য হয়েছে ইত্যাদি। অবশেষে গোটাকয়েক বই নিয়ে এবং বারান্দা corridor সব ঘুরে ফিরে দেখে আবার বেরিয়ে পড়লাম। পশ্চিমে আর যাই থাক বা না থাক স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য খুব আছে। সরকার বাহাদুর যত নূতন বাড়ী করেছেন সেগুলিতে এদেশী আদর্শটা বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছে কাজেই দেখতে খুবই ভাল। তবে শোনা যায় যে এখানে বাড়ী করতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়, কাজেই আর কিছু করাটা আর ঘটে ওঠে না। এই প্রদেশটিতে বাদশাহী চাল ও আমিরিয়ানা দেখাবার রেওয়াজ খুব ছিল। কাজেই এখানে পথে ঘাটে যে সব architectural gems গড়াগড়ি যায়, তার মত একটা কিছুও যদি আমাদের আধুনিক বাংলা দেশে থাকত, তাহলে সারাদিন লোক সেখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকত আর তার বর্ণনা ছবি ও ইতিহাসে মাসিক পত্রের পাতা কণ্টকিত হয়ে উঠত।

কোম্পানী বাগান ছেড়ে আমরা যখন খসরুবাগের দিকে চললাম তখন বামনদাসবাবু কেবলি দুধারের মন্দির আর মসজিদ দেখাতে লাগলেন। এদিক্ দিয়ে বাংলা দেশের দৈন্যটা তখন বড় বেশী মনে পড়তে লাগল। পরে দিল্লীতে গিয়ে এই ভাবটা যে আরো কত intensified হয়েছিল তা বলবার নয়।

খসরু বাগে ঢুকে গাড়ী থেকে আর নামা হল না, গাড়ীটাই একবার চট করে বাগানটা পাক দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে পড়ল। এতে তৃপ্তি যতখানি হল অতৃপ্তি হল, তার চেয়ে ঢের বেশী। বাগান, মাঠ, টেনিস কোর্ট, সমাধি মন্দির সব সিনেমার ছবির মত চোখের সামনে নেচে গেল। এইভাবে জায়গাটা আমি দেখতে চাইনি, কিন্তু তখন আর হাতে সময় ছিল না। আমাদের আবার রাতের ট্রেনে গন্দপুর ফিরে যাবার কথা।

বাহাদুরগঞ্জে ফিরে এসে মাকে নিয়ে অল্পক্ষণ পরেই আবার ষ্টেশনে চললাম। অতিথিপরায়ণ বামনদাসবাবু এবারও আমাদের সঙ্গে চললেন। টিকেট কেনা, overbridge পার হওয়া সব তাড়াতাড়ি ক'রে সেরে নিয়ে এক থার্ড ক্লাশে গিয়ে উঠলাম, ঘুমন্ত যাত্রীদের গুঁতো মেরে উঠিয়ে দিয়ে। আধঘণ্টার মামলা কাজেই কেউ প্রতিবাদ করল না।

বাবার এক পুরাতন ছাত্র জুটে গেল যাত্রীদের মধ্যে, সে ত তাঁর সঙ্গে মহোৎসাহে গল্প জুড়ে দিল। সেদিন একেবারে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, কাজেই বাইরের চাঁদের আলোর জোয়ারে দুই চোখ এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল যে ভুলেই গেলাম যে এটা থার্ডক্লাশের নোংরা গাড়ী, এবং আমার নাকের কাছে অনেকগুলি উত্তর পশ্চিমবাসী কড়া চুরুটের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যখন গদ্দপুরে পৌছলাম তখন ট্রেন থেকে নেমে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হল অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না ট্রেনটা ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেল। কারণ এখানে overbridge এর বালাই নেই, এক রেল লাইন পার হয়ে গেলে তবেই গ্রামে যাবার রাস্তা পাওয়া যায়। আমাদের গদ্দপুরবাসী চাকরের দল লাঠি সোঁটা, ভাঙা এক্কা সব কিছু নিয়ে ষ্টেশনে এসেছিল আমাদের অভ্যর্থনা করতে। এক্কার চেহারা দেখে তাতে আর নিজেদের উঠতে ইচ্ছা করল না, রশদপত্র যা কিছু আনা গিয়েছিল সব এক্কাতে তুলে দিয়ে নিজেরা হেঁটেই চললাম। আলোর বান ডাকছে চারিদিকে। এই পথটাই যে দিনের আলোয় মাড়িয়ে গিয়েছি কয়েকঘণ্টা আগে তা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ঠিক যেন চেনা জায়গাকে স্বপ্নলোকে দেখা, তাকে ধরা যায় অথচ ধরা যায়ও না।

বাড়ী পৌছে আবার রান্না বান্না করে খেতে হল। কলকাতা হলে এত উৎপাত সহ্য হত না, না খেয়েই শুয়ে পড়তাম সবাই। কিন্তু দেশটার অনেক দোষ, এখানে ক্ষিদে পেত অসম্ভব রকম এবং ক্লান্তি হত কম। কাজেই ঘরদোর খুলে কাঠের আগুন জেলে রুটি করা এবং খাওয়াটা ওখানে বেশী কিছু মনে হয়নি। হবার কথাও নয় বিশেষ, কারণ, যতদূর মনে পড়ে রুটি করার কাজটা মাই করেছিলেন এবং খেয়ে নেওয়ার ভারটাই আমরা সানন্দে গ্রহণ করেছিলাম।

গদ্দপুর থেকে যখন দ্বিতীয়বার এলাহাবাদে এলাম, সেও ঠিক একইভাবে একই পথ দিয়ে। সেদিন আবার বিলেতে চিঠি লিখবার দিন। চিঠিপত্র লিখে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এলাহাবাদে post করব স্থির করে অনেক কবিত্ব ও রসিকতা খরচ করে ভাইকে চিঠি ত লিখলাম। দুঃখের বিষয় এলাহাবাদ পৌছে বাবার কাছে খবর পেলাম যে তিনি তাড়াতাড়িতে চিঠিগুলো গদ্দপুরেই ফেলে চলে এসেছেন। সেবারকার মত ভাতো বাড়ীর চিঠি আর পেলেনই না।

বামনদাসবাবুদের বাড়ী পৌছে দেখলাম বৌঠাকরুণের অসুখ। বাড়ীর লোক তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এঁদের বাড়ী আমাদের নিজের বাড়ীর মতই হয়ে গিয়েছিল, কাজেই বেশী অপ্রস্তুত লাগল না। তবে খেয়ে দেয়ে ঠিক করলাম যে সারাদুপুর বসে না থেকে এই বেলা দিদির সহপাঠিনী ম-দের বাড়ী ঘুরে আসা যাক কারণ তাদের বাড়ী যাইনি বলে সেদিন স্কুলেই সে আমাদের ধরে খুব বকে দিল। গাড়ী নিয়ে বেরন গেল। যে ঠিকানাটা শুনে গিয়েছিলাম, সেই ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে দেখা গেল যে বাড়ীটা আমাদের মোটেই অপরিচিত নয়। একটাই compound-এ খান দুই বাড়ী ছিল। ছোটটাতে আমরা কিছুদিন ছিলাম, সেটাকে বলতাম দিমিয়ান সাহেবের বাংলো। আর বড় বাড়ীটাতে তখন থাকতেন বাবার কলেজ দিনের সহপাঠী এক ভদ্রলোক, নাম উপেন্দ্রনাথ মজুমদার। Acting Accountant General গোছের খুব একটা বড় চাকরি করতেন তিনি। তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার দাদার খুব ভাব হয়েছিল। এ বাড়ীতে যাওয়া আসা করেছি আমরা।

চাকরবাকরদের ডাকাডাকি ক'রে সন্ধান নিয়ে ত.ব ত ঘরে ঢুকলাম আমরা। ম— বন্ধুবান্ধব নিয়ে জমিয়ে বসে গল্প করছিল, আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে তাদের সভাভঙ্গ করতে হল। এ বাড়ীর কর্তা হচ্ছেন তার দাদা। তিনি তখন ঘুমাচ্ছিলেন, তাঁকে ডাকাডাকি ক'রে তুলবার বৃথা চেষ্টা ক'রে সে হাল ছেড়ে দিল। বাবা আমাদের পৌছে দিয়েই চলে গেলেন, আমরা মেয়েরা গুছিয়ে গল্প করতে বসলাম। কয়েকজন বাবু ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁদের নাকি এখানে বৈকালিক নিমন্ত্রণ ছিল। তবে গৃহস্বামী এতক্ষণে ঘুম ছেড়ে উঠে পড়াতে, তাঁব বোনকে আর নূতন অতিথিদেব অভ্যর্থনার ভার নিতে হল না।

রোদটা খানিক পড়ে আসতে বাইরে বেরিয়ে খানিক এদিক্ ওদিক্ ঘোরা গেল। দেখলাম দলে দলে লোক এলাগন রোড ধরে কোথায় যেন চলেছে। অধিকাংশই ফেজ্ পরা এবং অল্পবয়স্ক। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে সেদিন কাছেই একজায়গায় Mrs. Besant এর বক্তৃতা আছে সেটাকেই দক্ষযজ্ঞে পরিণত করবার ইচ্ছায় এঁরা

চলেছেন। ব্যাপারটা শেষ অবধি কিসে দাঁড়াল, তা আর শোনা হল না।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা অতঃপর উঠানে নেমে প'ড়ে টেনিস্ খেলতে সুরু করলেন। তাঁদের বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা খুবই ভাল খেলেন, কারণ অনেকবারই আমাদের খেলা দেখতে আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু আমরা খেলা দেখতে না গিয়ে ঘরে ঢুকে খুব এক পেট লুচি মাংস খেতে বসে গেলাম।

ট্রেনের সময় হতে তখনও দেরি ছিল অথচ আর কিছু করবারও ছিল না। ম—একদল লোককে রাত্রে খেতে বলেছিল অথচ আমাদের উপস্থিতিতে তার ব্যবস্থাদি কিছুই করতে পারছিল না, আমাদের সঙ্গেই গল্প করছিল। এমন সময় কপালক্রমে বামনদাসবাবু একখানা গাড়ী ক'রে এসে উপস্থিত হলেন। খানিকক্ষণ আলোচনার পর আমরা সেই গাড়ীখানা নিয়ে কোম্পানী বাগানে বেড়াতে চলে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এবং কাঠের মই আর ঝোলান লণ্ঠন নিয়ে Lamp Lighterএর দল রাস্তায় রাস্তায় street lampগুলি জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই লোকগুলি আর পথে জল দেবার জন্য পিছনে ঝাঁঝরা লাগান জলের গাড়ী বোধহয় উত্তর পশ্চিমের বিশেষ সম্পত্তি, আর কোথাও এদের দেখিনি। বাগানে নেমে অনেকক্ষণ বেড়ালাম। পাব্লিক লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি সব আবার ঘুরে ফিরে দেখে এলাম। কলকাতায় সৌন্দর্য্য উপভোগ করার লোকের অভাব নেই, কিন্তু সৌন্দর্য্যেরই অভাব। আর এদেশে আমার কেবলি মনে হত তার উল্টো অবস্থা। মানুষগুলো যেন কি এক রকম, কিছু যে দেখে বা বোঝে তা মোটেই মনে হয় না, অথচ দেখবার জিনিষ ত পথে ঘাটে গড়াচ্ছে। এমন সুন্দর বাগানটা তা যারা এখানে বেড়াতে আসে তারা হয় সাহেব নয় পার্সী। এখানের লোকদের যেন সখ বলেও জিনিষ নেই। বাগানটা যে আমার এত ভাল লাগে তার দুটো কারণ আছে। এক, এটা আমার শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আর একটা যে এখানে গাছপালা সবাইকে ডালপালা মেলবার জায়গা খুব দেওয়া হয়েছে, সবাইকে ঘাড়ে ঘাড়ে ঠেলে দিয়ে উৎপাত করা হয়নি। বড় বড় গাছ ঢের আছে, কিন্তু তাদের মাঝের সবুজ মাঠের ছেদগুলিও বহুসংখ্যক। লাইব্রেরীর বাড়ীটি এমন সুন্দর করে গড়া যে প্রকৃতি দেবীর রাজ্যে এই সারস্বতভবনটি বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছে, চক্ষুপীড়া সৃষ্টি করেনি। বাগানে বকুল গাছের দল খুব বেশী। এটার কথা মনে করতে হলেই সবার আগে মনে আসে ভিজে মাটি আর বকুল ফুলের মিশ্র সুবাস।

বেড়িয়ে চেড়িয়ে আবার ম—দের বাড়ী ফিরে এলাম, এবং বিদায় গ্রহণ করে ষ্টেশনে চললাম। সঙ্গে দুচারজন চেনা ব্যক্তি এলেন আমাদের তুলে দিতে। ট্রেনে ব'সে ব'সে চাঁদের আলো উপভোগ করলাম খানিক। খুকুর চিঠি এসেছিল, এতক্ষণ পড়বার সময় হয়নি, গাড়ীতে ব'সে সেখানার সদ্ব্যবহার করা গেল।

এবারেও ষ্টেশন থেকে সোনালী আলোয় রঙীন মাঠের ভিতরকার পথ দিয়ে বাড়ী এসে পৌঁছলাম। পৌঁছনর একটু পরেই বোধহয় চন্দ্রগ্রহণ সুরু হল। চাকর বাকরের দল ত ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাস্নান করতে ছুটল। আমরা বাড়ী ব'সেই গ্রহণ দেখলাম। চাঁদের একটা কোণ থেকে কাল ছায়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই সমস্তটা ছায়ায় ঢেকে গেল। বেশ মজার দেখাচ্ছিল, ঠিক যেন অনেক উপরে একটা ঘষা কাঁচের ফানুস ঝুলছে। ভিতরের আলোটা কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল, রাহুর ক্রোধ অগ্রাহ্য করেই অনেক পরে আবার অল্প অল্প ক'রে গ্রহণ ছাড়তে আরম্ভ করল, কিন্তু সবটা ছাড়ার আগেই আমরা ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে একদিন আবার ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সস্ত্রীক এসে পরের দিন তাঁদের বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। এঁরা এখানকার বেশ নামজাদা বাসিন্দা, এঁর বাবা ছিলেন জাষ্টিস্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ললিত বাবুর স্ত্রী ছবি আঁকা প্রভৃতির চর্চা করেন শোনা গেল।

পরদিন আবার এক্কা চ'ড়েই এলাহাবাদ যাত্রা করা গেল। প্রথমে বাহাদুরগঞ্জের বাড়ীতেই গেলাম। খোকাবাবুর মা কিছুটা ভালই আছেন দেখলাম, কাজেই বাড়ীর লোকেরা ততটা উদ্বিগ্ন নন। খানিক গল্প সল্প হল। আমাদের এই অবিশ্রাম এক্কা চড়াটা তাঁদের ভাল লাগে না, যদিও আমার ব্যাপারটা কিছুই মন্দ লাগছিল না।

রোদ পড়ে আসতে লাগল দেখে ঠিক করা গেল যে এখানেই একটু early tea খেয়ে খসরুবাগটা ভাল করে ঘুরে দেখে আসা যাক। ওঁদের বাড়ীর একজন খুকীকে সঙ্গে নিলাম। গাড়ী পেতে বেশ খানিকটা দেরি হল। কলকাতার থেকে এদিকে গাড়ীর সমস্যা অনেক বেশী প্রবল, পাওয়াও যেমন শক্ত, ভাড়াও তেমনি বেশী। যাক ভাগ্যক্রমে এই সময়ে শ্রীশবাবুর পুত্র ও জামাই কোর্ট থেকে ফিরে আসাতে তাঁদের গাড়ীখানাই পাকড়ান গেল। বাগানে পৌঁছেই গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম কারণ আজ আর আমার মোটেই গাড়ী চ'ড়ে বেড়াবার সখ ছিল না। খসরু বাগের বাগানটা বিরাট, তবে তার এক অংশ এখন ঘিরে নিয়ে water works করা হয়েছে। বাকি জায়গাটা অধিকাংশই ফুলের বাগান, গাছের avenue এবং খেলার ground, বাগানের ঠিক মাঝখানে সার দিয়ে চারটি সমাধি মন্দির। সমস্ত বাগানটা প্রকাণ্ড উঁচু পুরনো ঢঙের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ফুলবাগানগুলো বিশেষ যত্ন পায় ব'লে মনে হল না, কত গাছ যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, কত ফুল যে, শুকিয়ে রয়েছে নয় ঝরে পড়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অথচ লোকজন বেশ আছে, গেটের উপর নীচে বাসা বেঁধে তারা সুখেই দিন কাটাচ্ছে। ফিরিঙ্গী আর সাহেবের দল দিব্যি ফুর্ত্তি ক'রে ঠিক সমাধিগুলির সামনের মাঠটায় ক্রিকেট খেলছে। সমস্ত জায়গাটার আবহাওয়া এমনই বিষাদ-গম্ভীর, যে এই লোকগুলোর ক্রীড়াকৌতুকটা চোখে যেন বড় বেশী আঘাত করতে লাগল। শাহজাদা খসরুর করুণ ইতিহাসটা মনে কেমন একটা বৈরাগ্য এনে দিচ্ছিল। এত বড় শক্তিমান্ সম্রাটের প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র, কতখানি আশা আকাঙ্খা নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। দুনিয়ার কোনো কিছুই প্রায় তাঁর অপ্রাপ্য ছিল না। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে ভাগ্যদেবী ভ্রূকুটি কুটীল মুখে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে মানুষের সব আশাই দুরাশা। আজ সে বাদশাহও নেই, শাহজাদাও নেই, তাঁর বেগমও নেই, কেবল ইট পাথরের স্তূপ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পার্থিব গৌরবের নশ্বরতা মানুষকে বোঝাবার জন্যে। প্রথম সৌধটাতে কিছুই নেই, কেন যে গড়া হয়েছিল বুঝলাম না। তারপর দ্বিতীয়টার কাছে এলাম। এখানকার একজন guide এসে জুটল। বেশ ব্যবসা তাদের, অন্তগত গৌরবের কাহিনী আউড়িয়ে তারা দু পয়সা রোজগার করে নেয়। বেশ হাসিমুখে বলে যায়। ভাবলাম এতবার করে এই ইতিহাস আউড়ে বোধহয় ঐ করুণ কাহিনীগুলি সম্বন্ধে ওদের কোন দুঃখ বা সমবেদনার ভাব আর নেই। খসরু এবং তার মত আত্মীয়বর্গকে সে এখন নিজের stock in trade ছাড়া আর কিছু ভাবে না। তাঁরাও যে সুখ দুঃখের দোলায় দোলায়িত মানুষ ছিলেন, তা তারা ভাবে না।

দ্বিতীয় সমাধিমন্দিরটি খসরুর জননী সম্রাজ্ঞী যোধা-বাইয়ের। তাঁর সমাধির চার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি অনেক গুলি, এগুলি সবই তাঁর নাতি নাতনীদের, মরণের পরেও তাঁর কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সমাধিগুলি একতলার অন্ধকারময় ঘরের মধ্যে। প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। সেখানে আলোবাতাস অবাধে খেলছে। দেয়ালে মেঝেতে কারুকার্য্য অতি সুন্দর, তবে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। কবরগুলি কেন যে এমন আঁধারে লুকান বুঝলাম না। দিল্লীতেও দেখলাম এইরকম, উপরের তলায় সজ্জার আর সৌন্দর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য ছড়াছড়ি, কিন্তু যার নামে এত, তাঁর মর্ত্যদেহাবশেষ অন্ধকারময় বায়ুহীন গহ্বরে লোকচক্ষুর আড়ালে নিহিত। শুনলাম উপরের তলাগুলি তাঁরা বেঁচে থাকতেই তৈরী, এবং সেগুলিকে তাঁরা বাসভবনরূপে ব্যবহারও করতেন তাই এগুলি অতি সুন্দর। মাঝের সৌধটি খসরুর মাতৃষ্বসার। এইটি সবচেয়ে শিল্প সৌন্দর্য্যভূষিত। খসরু বেঁচে থাকতেই তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয়, স্বামীই তাঁর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করান। সব শেষটি তার নিজের, একান্ত অনাড়ম্বর, সাদাসিধে। তাঁর শবীরকে আদর দেখাবার কেই বা তখন বেঁচে ছিল? মহিষীর সমাধি মন্দিরের দোতলাটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যাদের রূপে বাদশাহের অন্তঃপুর আলো হয়ে থাকত, মরণের পরেও তাঁদের আদর দেখানোতে ত্রুটি হয়নি। বহুপত্নীর স্বামী হয়েও এদিকে তাঁরা অবহেলা করেননি। সর্ব্বত্রই দেখলাম প্রাচীন কীর্ত্তি-রক্ষাকারী আইনের tablet মারা রয়েছে। Lord Curzon এই উপকারটা আমাদের ক'রে গেছেন, তবে তাতে কাজ যে খুব হয়েছে তা বলা যায় না।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একদল বাঙালী পর্য্যটক ঘুরছিলেন, অধিকাংশই বেশ বয়স্ক, কচিখোকা নয়। তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনে হাসিও পাচ্ছিল, রাগও হচ্ছিল। একজন জিজ্ঞাসা করল 'খসরু বাদশা না বেগম?" আর একজন বলল "এত কবর দেখলাম, কিন্তু খসরুর বাড়ী কোথায়?" এক ভদ্রলোক উঁচু সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে এমন এক আছাড় খেলেন যে দলের মধ্যে হৈ চৈ বেধে গেল। এই রকম বেতালা ব্যাপারে আমার মনটা গেল খিচড়ে। যাহোক আমাদের বেড়ান তখন শেষ হয়ে এসেছিল, কাজেই বেশীক্ষণ আর তাঁদের performance দেখতে হ'ল না। বাড়ী ফিরে এলাম। সে রাত্রে আর গ্রামে ফেরা হলনা। বামনদাস বাবুদের বাড়ীতেই থেকে গেলাম। পরদিন সকালে উঠে চা খাওয়া সেরে Muir Central College এর tower এ আরোহণ করবার উদ্দেশ্যে যাওয়া গেল। দুঃখের বিষয় যিনি নিজের গাড়ীখানি দয়া করে দান করেছিলেন, দেখা গেল যে সে গাড়ীখানিতে mudguard নেই, কাজেই এলাহাবাদের র স্তায় সকালে বেড়াতে গিয়ে সর্কাঙ্গ প্রায় কাদার অলকাতিলকায় চিত্রিত হয়ে গেল। তবে তখন রোদ অতি প্রচণ্ড, দেখতে দেখতে কাদা শুকিয়ে গেল, এবং কাদার বুটিগুলোও শাড়ীর থেকে ঝ'রে পড়ল। কলেজের বাড়ীটা খুব বড়, দেখতেও বেশ সুন্দর, অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখলাম। কিন্তু tower এ ওঠাটা আর শেষ অবধি হ'ল না, কারণ তার সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া থাকে। একজন professor বলেছিলেন তিনি চাবি চেয়ে নিয়ে চাকর মারফৎ পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও চাবি বা চাকর কারো সন্ধান পাওয়া গেল না। অগত্যা চাবির সাহায্য না নিয়েই যতখানি ওঠা যায় উঠে চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে চ'লে এলাম। একজন দরোয়ান, সে সম্ভবত science department এ কাজ করে, সে ঘর খুলে দেখাতে খুব ব্যস্ত ছিল, কিন্তু আমরা ঘরের চেহারা দেখতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম না। কোম্পানী বাগানের মধ্য দিয়ে drive করে ফিরে চ'লে এলাম।

আজকেই আবার সেই জজসাহেবের পুত্র ও পুত্রবধূর নিমন্ত্রণ চা খাওয়ার। তাঁরাই গাড়ী পাঠিয়েছিলেন কাজেই যেতে কোন কষ্ট পেতে হল না। Hostess এসে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। ড্রয়িংরুম্ খুব সাজান বটে তবে overcrowded. গৃহিণীর আঁকা অনেক ছবি ঝুলছে। তিনি অনেক রকম ললিত কলারই চর্চ্চা করেন দেখলাম। বাবাকে সব আগ্রহ করে দেখালেন, তাঁর মতামতও জানতে চাইলেন। তাঁর একটি ছোট মেয়ে এসে এই সময় একটু welcome diversion এর সৃষ্টি করল। প্রথমে ত কিছুতেই নাম বলবে না, তখন তার বাবা বললেন, "তবে তোমার নাম কি বাঁদর?" সে চট্ করে উত্তর দিল "ছানা।"

সমস্ত ঘর দোর বেড়িয়ে ত দেখা গেল। অনেক collection আছে। অভ্র plate এ আঁকা কতকগুলি মোগল যুগের ছবি সত্যই দেখবার মত। এর পর ত চা খেতে গেলাম। জগৎতারণের কয়েকজন এই সময় এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ীর আর একজন ভদ্রলোকও এলেন, শুনলাম গৃহস্বামীর মধ্যম ভ্রাতা। তিনি অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে পৃথিবীর কোথায় কোথায় কতবড় মশা আছে তার গল্প করলেন। আমাদের দেখে মশার গল্প কেন মনে হল জানি না, বিশেষ ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট চেহারা ত আমাদের কারো নয়।

অবশেষে অনেক দেখে এবং অনেক শুনে আমরা যাবার জন্যে উঠলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহিণীর একটি বিরাট manuscript বহন ক'রে নিয়ে এলাম। বামনদাসবাবুর বাড়ীর মহিলারা খুবই interested হয়ে অনেকক্ষণ ধরে পার্টির গল্প শুনলেন। সে রাত্রেই আমাদের গদ্দপুর ফেরার কথা ছিল, কিন্তু এত রাত হয়ে গেল যে এলাহাবাদেই থেকে গেলাম। পরদিন এক্কা চড়ে দুপুরে গ্রামে ফিরলাম। সহরের এক্কাগুলি কিন্তু বাজে, প্রায় রজনী সেনের গানে বর্ণিত এক্কার মতই।

দিনকয়েক ওখানে থেকে তারপর একেবারে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে ওখান ছেড়ে চললাম। দিল্লী যাওয়া স্থির হয়ে গিয়েছিল, এবং হোটেল ইত্যাদির ব্যবস্থাও একরকম

গিয়েছিল। ম-এর আমাদের সঙ্গে যাবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ অবধি সেটা ঘটে উঠল না। যেদিন গন্দপুর ছেড়ে এলাম, তারপর দিনই দিল্লীযাত্রা করলাম। দুপুরের ট্রেনে গেলাম। যাবার সময় সে যা হুড়োহুড়ি! জিনিসপত্র যদি বা কোনমতে গোছান গেল ও গাড়ীতে তোলা হল, তা বাড়ীর মেয়েরা সঙ্গে দেবার জন্যে যে টিফিন-কেরিয়ার গোছাতে বসলেন, সে আর শেষেই হয় না। যাহোক বেরোলাম ত কোনমতে। ন-বাবুরা সঙ্গে চললেন ট্রেনে তুলে দিতে। সুখের বিষয় একখানা খালি গাড়ী পাওয়া গেল, উঠে ত বসলাম! কিন্তু সুখটা বেশীক্ষণ রইল না, কারণ একটু পরেই দুজন বাইজী তাদের বাক্স প্যাঁটরা তানপুরা ইত্যাদি নিয়ে উঠে পড়ল। ন-বাবু সকলের বিরক্তিটাকে voice দিয়ে বললেন "জ্বালাবে দেখছি।"

গাড়ী যখন ছাড়বার উপক্রম করছে তখন বামনদাস-বাবুর বড় ভাইপো শু-বাবু আর এক পোঁটলা লুচি তরকারি নিয়ে এসে হাজির, এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গোটা দুই তিন নোংরামির অবতারের মত বাচ্চা নিয়ে একজন বোরকাধারিণী মহিলা হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লেন। কাজেই খালি গাড়ীতে যাওয়ার সুখভোগ আর হল না। গাড়ী ছাড়বার উপক্রম করতেই একজন বাইজী নেমে পড়লেন, এবং আর একজন ওড়নায় মুখ ঢেকে গড়াগড়ি দিয়ে কান্না জুড়লেন। ভাবলাম, "হ্যাঁ, বাদশাহ বেগমের দেশে যে যাচ্ছি, তার উপযুক্ত যাত্রারম্ভ বটে।" শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের পিয়ারী বাইজীর কথা বোধহয় সকলেরই একবার মনে পড়ল। তবে ইনি তেমন সুন্দরী নন, বয়সটাকেও প্রথম যৌবন বলা যায় না। পরে কথা প্রসঙ্গে জানলাম যে, যিনি আমাদের সহযাত্রিনীকে send off দিতে এসেছিলেন, তাঁর নাম পিয়ারীই বটে। গাড়ী চলতে আরম্ভ করবামাত্র বোরকাধারিণী মুখের আবরণ উন্মোচন করলেন। দেখলাম চেহারায় তিনি বাচ্চাগুলির উপযুক্ত মা বটে। সকলের সব খবর ত নিয়ে ফেললেন। বাইজীকে তাঁর "বাবু"র বিষয় প্রশ্ন করে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত করে দিলেন। ভালর মধ্যে আর দুই-তিন ষ্টেশন পরেই তিনি বাচ্চাবৃন্দসহ নেমে পড়ে সকলকে নিষ্কৃতি দিলেন।

বাইজী যাচ্ছিলেন আগ্রা, কাজেই বাধ্য হয়ে টুণ্ডলা জংশন পর্যন্ত আমরা তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করলাম। প্রথম খানিকক্ষণ তিনি নিজের কোনো গোপন দুঃখে কাতর হয়ে চুপ করেই রইলেন। তবে কয়েকটা ষ্টেশন পরেই হায়দার আলি নামক তাঁর এক ভৃত্য এসে অনেক আদরযত্ন করে খাওয়াতে বোধহয় মনটা ভাল হয়ে গেল। অতঃপর তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করলেন। চেঁচে আর কেশে গাড়ীর যা ছিরি করলেন তা আর বলবার নয় এবং অবিশ্রাম দুর্গন্ধ বিড়ি খেয়ে আমার আধাধরা মাথাটাকে পুরোপুরি ধরিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ ধরে বিড়ি খায় আর ধ্যান করে এবং থেকে থেকে ভীষণ এক হাঁক দেয়, "ইয়া খুদা তেরা শুকর্ হ্যায়।" আমার ত প্রায় পিতৃনাম ভুলে যাবার জোগাড়।

শরীরটা মোটেই ভাল ছিল না, কাজেই একটু পরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু বাইজীর জ্বালায় ঘুমোবার জো কি? তিনি খানিকক্ষণ পরেই গলা ছেড়ে গান ধরলেন। চেহারাখানি যেরকম ঢাকাই জালার মত, গলাখানিও তদনুরূপ। তবে training ভালই পেয়েছে। আবার শুধু গলায় গান শানাল না, এক box harmonium টেনে বার করা হল। মহা উৎপাত। তবে একটা গান মন্দ লাগেনি, তার প্রথম লাইনটা হল "নারাজ্‌য়া হয়ে তুম্, বিনা রহা নাহি যায়।"

শুধু গেয়ে খুশী নয়, আমরা শুনে মুগ্ধ হচ্ছি কিনা তার খোঁজও নেওয়া হচ্ছিল। খানিক পরে বিড়ির stock ফুরিয়ে যাওয়াতে ঠাকুরাণী একটু দমে গেলেন। কি একটা ষ্টেশনে একটা বিড়িওয়ালাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে বিড়ি চাইলেন, কিন্তু সে ধর্ম্মের কাহিনী শুনতে রাজী হল না। আর এক ষ্টেশনে তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর কাছে টাকা আছে কিন্তু ভাঙানি নেই। তখন "এ জনাব, ইধর জরা তসরিক্ লে আইয়েগা," বলে চীৎকার ক'রে প্ল্যাটফর্ম্মে ভ্রাম্যমান দুজন মুসলমান যুবককে ডাকতে লাগলেন। খানিক হাঁকাহাঁকির পর তারা ও গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল এবং তাঁর বিপদের কথা শুনে অতি gallant ভাবে তাঁকে সাহায্য করল। তা বাইজীর ধর্ম্মজ্ঞান আছে, কোন ষ্টেশনে তাঁর ভৃত্য হায়দার আলি এসে তাদের পয়সা ফেরত দিতে পারবে সে খবর তিনি দিয়ে রাখলেন যুবকদ্বয়কে। তারা ত কান থেকে কান অবধি হাঁ করে হেসে চ'লে গেল।

হায়দার আলি এল বটে, তবে সব শুনে যা মন্তব্য করল তা অমন ধার্মিকা মহিলার অনুচরের উপযুক্ত নয়। সে বাইজীকে উপদেশ দিল যে প্রতি ষ্টেশনেই ঐ না-ভাঙান টাকাটা দেখিয়ে অন্যদের দিয়ে যা জিনিষপত্র দরকার তা কিনিয়ে নিতে। কত ষ্টেশনে কত লোকের সঙ্গেই যে ভদ্রমহিলা আলাপ করলেন তার ঠিকানা নেই।

রাত্রি এসে পড়ল। এর মধ্যে কত ষ্টেশন যে এল, গেল। বছর চোদ্দ বয়সে একবার আগ্রা দেখতে বেরিয়ে ছিলাম, তখন একবার এই পথ মাড়ান গিয়েছিল তারপর আর এমুখো হইনি। দিল্লীর যত কাছে এগোচ্ছিলাম, মনটা ততই চঞ্চল হয়ে উঠছিল, ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সত্যিই সশরীরে দিল্লী যাচ্ছি।

টুণ্ডলাতে বাইজী নেমে গেলেন, কিন্তু তখনই লটবহর ও একটি খুকী নিয়ে কয়েকজন অতিকায় মুসলমান এসে হাজির হলেন। একটি বোরকাবতীও ছিলেন সঙ্গে। মেয়েদের রেখে পুরুষগুলি অন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠল, তবে প্রতি ষ্টেশনেই একজন করে পুরুষ এসে মহিলাটিকে সাবধান করে যেতে লাগল "বেখবর শোনা মৎ।" উর্দ্দু ছাড়া সারাপথ আর কিছু শুনলাম না।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বিকট গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল! দেখলাম আলিগড়ে এসেছি। আমাদের সহযাত্রিনী নামছেন এবং তাঁদের দলের সঙ্গে পোঁট-লাবাহী কুলিদের ভীষণ সংঘর্ষ বেধেছে এবং কে একজন বারবার সকলকে "ফৌজদারি" করতে নিষেধ করছে।

আলিগড়ে আধঘণ্টা খানিক ট্রেন থামল। তখন সেখানকার universityতে শুনলাম noncooperation নিয়ে খুব তল্লা হচ্ছে।

তারপর আমাদের গাড়ীখানা female compartment কি না তারই কিনারা করার জন্যে বাবাকে কিছুটা ঘোরাঘুরি করতে হল। এবং সেটা তাই বটে, বলে স্থির হবার পর আমি বোধহয় আবার ঘুম দিলাম। আকাশ যখন ভোরের আশায় ধূসর হতে সুরু করল, ঠিক সেই সময় আমরা ভারতের রাজধানীতে এসে হাজির হলাম।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ কতবড়

শ্রীরমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

ইংরেজী ১৯২৫ সালের কথা।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে চিরউচ্ছ্বাসময়ী নীল জলরাশির বুকে সিংহল নামে যে ক্ষুদ্র দ্বীপটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে আমার কিছুদিন অধ্যাপনা করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কি বিচিত্র দেশ! মনে হয় যেন নানা রংয়ের লতা পাতা ও ফুল দিয়ে প্রকৃতি দেবী নিজের হাতে একটি অপরূপ সুন্দর বাগান রচনা করে রেখেছেন।

মহাকবি কালিদাসের ভাষায় তার পরিচয় দেওয়া যায় "তমাল তালি বনরাজি নীলা, বিহগকুজিত কানন-কুন্তলা" ক্ষুদ্র দ্বীপটি আজও আমার মনের পর্দার ওপর একখানি জীবন্ত ছবির মত আঁকা রয়েছে—জীবনে সে ছবি কখনও ম্লান হবে বলে মনে হয় না। সময়ের ব্যবধান যেন ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে আমার স্মৃতির পটে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সিংহলে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির সহিত অধ্যাপক হিসাবে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলুম সেখানে আমার সহকর্মীদের ভিতর ছিলেন একটি বলিষ্ঠ সুদর্শন ইংরেজ যুবক, বয়স ত্রিশ বা সামান্য কিছু বেশী, নাম ফ্রেডরিক স্মিথ।

আমি সিংহলে অধ্যাপক হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর ডোরা নাইটিঙ্গেল নাম্নী একটি পরমারূপবতী ইংরেজ যুবতীর সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

মিসেস স্মিথের কথা মনে হলে সেটা সব চেয়ে বড় হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটা তার শারীরিক সৌন্দর্য নয় সেটা তার অতুলনীয় সুন্দর স্বভাব যা দিয়ে তিনি তাঁর চার পাশে যারা এসে দাঁড়াত তাদের মুগ্ধ করে রাখতেন। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী গ্রাজুয়েট, ক্ষীণাঙ্গী এবং অপরূপা সুন্দরী—ঠিক যেন একটি মোমের পুতুল। স্বামী আদর করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন "হেলেন অফ দি ঈষ্ট" কিন্তু তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যের তুলনায় তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য অতি তুচ্ছ বলে মনে হত। মিসেস স্মিথ ছিলেন একটি মার্জিতারুচি স্বল্পভাষী বিদুষী ইংরেজ মহিলা। ভারতবর্ষেই তাঁর জন্ম, সুতরাং ভারতীয়দের উপর তাঁর একটা সহজাত স্নেহ এবং আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। কলেজের পাশেই একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলোতে স্বামী স্ত্রী মনের সুখে বাস করতেন। তাদের দেখে কতদিন আমার মনে হয়েছে মেঘনাদ বধ কাব্যের সেই ছত্র দুইটির কথা

—"কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে"

একথা ভাবতেও আনন্দ হয় যে ইংরেজ মহিলা হয়েও মিসেস স্মিথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একজন পরমভক্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ অবশ্য সে পরিচয়ের প্রায় সবটুকুই ছিল কবির রচনার ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে অর্জিত। যেদিন কলেজে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন বিশেষ আলোচনা হত সেদিন তিনি নিজেই এসে মেয়েদের পাশে বসে সেই আলোচনায় যোগ দিতেন এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে সময় সময় এমন সব জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসতেন যার উত্তর দিতে আমাদের অনেক সময় বিব্রত হতে হত। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে পারি না তার কারণ তাঁর ভাষার সঙ্গে আমাদের মোটেই পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর ভাষা শিখতে হবে, তবেই আমরা তাঁর অমৃতবর্ষণ লেখনীপ্রসূত কাব্য রসের অপূর্ব আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হব—অনুবাদের সাহায্যে তাঁকে বোঝা অসম্ভব। স্মিথ ছিলেন ঠিক তার উল্টো। রবীন্দ্রনাথকে তিনি অতি সাধারণ স্তরের একজন কবি বলে মনে করতেন যেমন ইংরেজী সাহিত্যে ব্লেক বা লংফেলো। বলা বাহুল্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল ইংরেজী গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি এবং তর্ক-বিতর্ক হত। স্মিথ যতই রবীন্দ্রনাথকে ছোট করতে চাইতেন, মিসেস স্মিথ ততই রবীন্দ্রনাথকে টেনে বড় করে তুলতেন এবং রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টির ভিতর থেকে বেছে মনি-মুক্তো

কুড়িয়ে স্বামীর মুখের উপর ছুঁড়ে মারতেন, অবশ্য এই বাকযুদ্ধে মিসেস স্মিথই সব সময় জয় লাভ করতেন।

একদিন এই কথা কাটাকাটি একটু বেশী দূর গড়াল, মনে হয় সেদিন রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁকে যে বাকযুদ্ধে রত স্বামী স্ত্রীর হাতে পড়ে লণ্ডভণ্ড হতে হোত তা হলফ করে বলা যেতে পারে।

অবশেষে ঠিক হোল বিষয়টি বিচার করবার ভার তাঁরা আমার উপর ছেড়ে দেবেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের মূল রচনার সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে বলে তাঁরা মনে করতেন—যদিও আমার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা তাঁদের পক্ষে বিরাট অজ্ঞতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যেন শিশুকে পর্বতের চূড়ায় উঠবার আদেশ দেওয়ার মতো, কিন্তু উপায় নেই—রাক্ষসের দেশে সহসা বিচারকের সন্ধান পাওয়া শক্ত। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর ভিতর বিতণ্ডা—পরের উপসংহারে স্থির হোল আমার বিচারের উপর আর আপীল করা চলবে না, তা যার পক্ষেই আমার judgement যাক না কেন। মিসেস স্মিথের সহিত বন্ধুপত্নী হিসাবে পূর্বেই আমার কতকটা পরিচয় ছিল, সুতরাং তিনি সম্ভবত এই প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে তাঁর অনুমোদন জ্ঞাপন করেছিলেন।

আমি অবশ্য এই ব্যাপারের কিছুই জানতুম না। হঠাৎ একদিন ক্লাশ ছুটির পর স্মিথ আমাকে অধ্যাপকদের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন "আচ্ছা দাশগুপ্ত, আমাকে বলতে পার রবীন্দ্রনাথকে সবাই এত বড় বলে মনে করে কেন? আমি ত তাঁর মধ্যে কোন অসাধারণত্বের সন্ধান পাই না—কেন তবে সবাই তাকে বিশ্ববরেণ্য কবি বলে প্রচার করে? কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব লুকিয়ে রয়েছে আমাকে দেখিয়ে দিতে পার। আমার কিন্তু মনে হয় ইংরেজী-সাহিত্যের অতি নিম্নস্তরের কবিদের সঙ্গেও তার তুলনা চলে না—Shakespeare বা Milton এর কথা ত উঠতেই পারে না।

প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে যতই পীড়াদায়ক এবং তিক্ত বলে মনে হোক না কেন ইহার মূলে যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা বিরাট অজ্ঞতা স্মিথের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা বুঝতে আমার একটুও বিলম্ব হোল না। পাছে এই অজ্ঞতা তাঁর মনের মধ্যে দানা বাঁধবার সুযোগ পায় এবং ধীরে ধীরে গভীর অশ্রদ্ধায় পরিণতি লাভ করে এই আশঙ্কায় আমি মনে মনে স্থির করলাম, যে করেই হোক স্মিথকে রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত করে তুলতেই হবে এবং এই ভেবে তাঁকে বললুম "স্মিথ, তুমি আজ আমাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ যার উত্তর এত তাড়াতাড়ি আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব—তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হলে আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে। তবে এক কাজ করা যেতে পারে, তুমি বরং কাল ভোরে আমার বাসায় একবার চলে এসো তখন এ বিষয় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে আলোচনা করা যাবে এবং সেই আলোচনার মধ্যেই তুমি হয়ত তোমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে। দাশগুপ্ত, তুমি হয়ত জান যে আমার স্ত্রীও রবীন্দ্রনাথের একজন পরম ভক্ত। তুমিই বরং কাল ভোরে আমার বাড়ী চলে এসো তাহলে মিসেস স্মিথও আমাদের এই আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন এবং তুমিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তার বক্তব্য জানবার সুযোগ পাবে। তোমার ভয় নেই আমরা তোমায় দেরী করিয়ে দেবো না। সিংহলে আসার পর থেকে আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি। এ তো আর শীতের দেশ নয় যে বেলা নটা পর্যন্ত কম্বলের নীচে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের জাল বুনবো। আমরা কাল ভোর ছটায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আমি তার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে বললুম "আচ্ছা তাই হবে"। পরদিন ভোর ছটায় সময় আমি স্মিথ-দম্পতির বাংলোতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দূর থেকেই দেখি ওঁরা দুজনেই আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন আমি সিঁড়িতে পা দিতেই দুজনেই ভারতীয় রীতি অনুসারে আমাকে শুভ প্রাতঃকাল জানালেন এবং তারপর স্মিথ আমার হাত ধরে সরাসরি তার ড্রইং রুমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাড়ীখানি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-ইংরেজ-পছন্দ—মনে হোল যেন ইউরোপের কোন সহরে কোন বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছি। দরজায় শেকল বাঁধা কুকুরটি কিন্তু আমাকে অভিনন্দন না জানিয়ে তার নিজস্ব ভাষায় অবিশ্রান্ত ভাবে ঘেউ ঘেউ করে আমাকে অবিলম্বে তার প্রভুর গৃহত্যাগ কোরবার নির্দেশ দিচ্ছিল। কুকুরটির ভদ্রতা জ্ঞানের অভাবে স্মিথদম্পতি যেন বেশ একটু লজ্জিত হয়েছিলেন বলে মনে হোল।

একটু পরেই বয়ের হাতে ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা ট্রে ভর্তি চা এবং নানাপ্রকার ভারতীয় খাবার এসে উপস্থিত হোল। স্মিথ জানতেন ভারতীয়েরা মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসে সুতরাং খুঁজে খুঁজে তিনি আমার জন্য

পূর্বেই যেগুলি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। খাবারের প্রাচুর্য আমার রসনাকে জলসিক্ত করে তুলেছিল সুতরাং বৃথা কালক্ষয় না করে আমি তার সদ্ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিলুম।

খাওয়া শেষ হলে স্মিথ বললেন, দাশগুপ্ত, এবার নিশ্চয় আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় হয়েছে। এবং আমরাও তা শোনবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছি। সুতরাং এবার সংক্ষেপে তোমার বক্তব্য জানিয়ে দিয়ে আমাদের অতৃপ্ত কৌতূহলকে তৃপ্তি দান কর।"

আমি তখন আমার নিম্ন উদর প্রদেশে আমার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করে বললুম, "স্মিথ, আমার মনে হয় খাবারের নীচে আমার সমস্ত চিন্তা চাপা পড়ে গেছে। দেখা যাক যতটা সম্ভব তাদের উদ্ধার করে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।"

তখন বেলা সাড়ে ছ'টা। ঊষার স্নিগ্ধ আলোকে রাত্রির অন্ধকারের মুখে বিদায় চুম্বন অঙ্কিত করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিহঙ্গের কাকলী, মৌমাছির গুঞ্জন সর্বোপরি ভারত মহাসাগরের জলকল্লোল তন্দ্রামগ্ন ধরণীকে আবার মুখর করে তুলেছে।

দেয়ালের গায়ে উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়ে দেখলাম সূর্যদেব তার স্বর্ণকিরণজাল বিস্তার করতে করতে পূর্ব আকাশের গায় ক্রমশঃ উপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, দেখে মনে হল কে যেন আকাশের গায় একখানি সোনার থালা ঝুলিয়ে রেখেছে।

আমি তখন স্মিথকে বললুম—"স্মিথ, জানালার ভিতর দিয়ে একবার পূর্ব আকাশের দিকে তাকাও দেখি?

আমার কথা শুনে স্মিথ আকাশের দিকে তাকাতেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আকাশের গায় কি দেখতে পাচ্ছ, স্মিথ উত্তর করলেন সূর্যদেবকে। আমি বললুম "তাকে কেমন দেখাচ্ছে? স্মিথ উত্তর করলেন, একখানি সোনার থালার মত।"

আমি তার উত্তর শুনে যেন একেবারে অবাক হয়ে গেলুম এরূপ ভান করে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললুম, "বল কি স্মিথ, সূর্য—আমাদের এই পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় আর তাকে তুমি একখানা ছোট্ট থালার মত দেখছ এ কি করে সম্ভবপর হতে পারে স্মিথ? স্মিথ যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন, হয়ত ভাবলেন আমি তার সাথে ঠাট্টা করছি, সত্যি সত্যিই এই অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যটির সঙ্গে আমার আজো পরিচয় হয় নি। তবু তার বিস্ময় চেপে রেখে হেসে বললেন, "দাশগুপ্ত, আমার ধারণা ছিল তুমি মহা পণ্ডিত —এখন দেখছি আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সূর্য আমাদের এই পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে বলেই যে তাকে আমাদের দৃষ্টিতে এত ছোট দেখাচ্ছে সে কথাও কি আজ তোমাকে আমার বুঝিয়ে বলতে হবে? স্মিথের উত্তর শুনে আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে সমস্ত দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে ভেবে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। আমিও তার কাছ থেকে এই উত্তরটি পাওয়ার জন্যই তার ওপর এই কৌশলজাল বিস্তার করেছিলুম। আমি তখন আমার সমস্ত কপট গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করে হাসতে হাসতে তাকে বললুম "স্মিথ, তুমি নিজেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ। তুমিও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছ বলেই তাঁকে তোমার কাছে এত ছোট বলে মনে হচ্ছে। তুমি অক্সফোর্ডের কৃতি ছাত্র, পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার তোমার কাছে উন্মুক্ত হলেও এ কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আজও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তোমার মোটেই পরিচয় লাভ করবার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয়নি। আগে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেষ্টা কর, তাঁর অপূর্ব কাব্য-রসের দ্বারা, তুমি তোমার শুষ্ক বিচার-বুদ্ধিকে সরস করে তোল। তখন দেখতে পাবে তুমি রবীন্দ্রনাথকে যত ছোট বলে মনে কর, তিনি তত ছোট নন—তিনি অনেক বড়। তিনি সূর্যের মতই প্রকাণ্ড। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে যেদিন তোমাদের উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসবে, সেদিন আর তুমি রবীন্দ্রনাথকে ব্লেক বলে লং ফেলোর সঙ্গে তুলনা করবার জন্য এগিয়ে আসবে না—সেদিন তাকে ছোট বলে মনে করতে গিয়ে আপনা থেকেই লজ্জায় তোমার মাথা নত হয়ে পড়বে।

ডুয়েল লড়ার গল্প

শৈবাল চক্রবর্তী

নিশিকান্তবাবু'র তিন মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের শ্বশুর-বাড়ীই হয়েছে বেশী দূরে। পাঞ্জাবের নাসিকে। জামাই সেখানে গভর্ণমেণ্ট সিকিওরিটি প্রেসে কাজ করে। বড় মেয়ে নিশিকান্তবাবু'র প্রথম সন্তান, খুব আদরের কিন্তু দূরত্বটা বড় বেশী বলে বাপ-মেয়ের দেখা-সাক্ষাৎটা কম হয়। বছরে একবার মেয়ে বাপের কাছে আসে; কম করে একটা মাস থাকে। সেই সময়টার মধ্যে অরুণার ওপর নিশিকান্তবাবু'র আদর যেন উথলে ওঠে।

তবে আগের সেই অখণ্ড আদর-সোহাগ আর মেয়ে পায় না। ইদানীং নাতনি তাতে ভাগ বসিয়েছে। ভাগ বসানো কি, অনেকের মধ্যে নিশিবাবু'র স্ত্রী পূর্ণিমা বলেন যে, সেটা ও পুরোপুরিই দখল করেছে। মেয়ে বাড়ী এলে রিটায়ার-করা নিশিবাবু ফুটফুটে নাতনিটিকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে থাকেন। সকালে চা খেয়ে উঠে সেই যে কোলে নেন তাকে, বারোটায় স্নানের সময় না হওয়া পর্যন্ত নামান না। বাজারে যান তা ও ওকে নিয়ে, রিক্সা করে ফেরেন। পাঞ্জাবে থাকে বলে ছ' বছরের মেয়েটা কথা যা বলে সব-ই হিন্দী। আর ওইটুকু মেয়ের মুখে হিন্দী ভাষাটা শোনায়ও ভাল। নিশিবাবুও ওর সঙ্গে হিন্দীতেই কথা বলেন। সে ভারী উপভোগ্য আলাপ! বাড়ী'র সবাই তা শুনে হাসে। নন্দিনী এলে নিশিবাবু আর তাঁর নাতনিকে নিয়ে পাড়ায় বেশ একটা আনন্দ আসর জমে ওঠে। নিশিবাবু'র প্রতিবেশী গোলক সরকার আর অজিতেশ রায়ও সেই যোগ দেন।

ওর নাম যেমন চেহারাও তেমনি। মায়ের রং ত পেয়েছেই মেয়েটা, তার ওপর পাঞ্জাবের জল-হাওয়ার গুণে সে রং হয়েছে আরও বেশী টকটকে।...মেয়েটা বেশ লম্বা হবে। কোঁকড়া চুলগুলি কাঁধের ওপর নেমে এসেছে। সাদা দাঁত মেলে হাসে ভারী মিষ্টি! নন্দিনী এলে এই ছোট্ট গলিটায় কিছুদিনের জন্তে ছুটির মেজাজ নেমে আসে।

কিন্তু সেবার বড় অসময়ে এল ওরা। তখন সবে শীত পড়েছে। নন্দিনী'রা এসে পৌঁছনোর কিছুদিন পরেই নিশিবাবুর স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। গত চার-পাঁচ বছর ধরে পেটের একটা ব্যথায় তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। কি হয়েছে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। সম্প্রতি ধরা পড়েছে যে, সেটা টিউমার। শুনে বাড়ীতে যে অন্ধকার ছায়া নেমে এসেছিল সেটা নিশিবাবু'র মুখেই জমাট বেঁধে রয়েছে সেইদিন থেকে। নিশিবাবু'র এমন অবস্থা হয়েছে যে স্ত্রীর সঙ্গেও ভালভাবে কথা বলতে পারেন নি। নিশিবাবু'র কেমন মনে হচ্ছিল যে সাঁইত্রিশ বছরের সাথীকে তিনি বোধহয় হারাতে যাচ্ছেন। ডাক্তার তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, ভয় নেই। এরকম কেস এখন আকছার ভাল হয়ে যাচ্ছে। আপনি হাসপাতালে বেডের জন্তে দরখাস্ত করুন এখন-ই।' নিশিবাবু মাথা ঠিক রেখে কাজ করে গেছেন। ব্যাঙ্কে'র ফিক্সড ডিপজিট থেকে টাকা তুলে-ছিলেন তিনি, স্ত্রীকে ভাল করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যখন সই করছিলেন চেকে তখন তাঁর হাত একটুও কাঁপছিল না। নিশিবাবু চেয়েছিলেন রিটায়ারমেণ্টের পরে নিরবিচ্ছিন্ন সুখভোগ করতে। তাঁর সারা যৌবনটা কেটেছে ডালহৌসী স্কোয়ারে আর তার পরের বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে মেয়েগুলোর জন্তে ছেলে ধরে আনতে। ইঁটের বদলে একটার পর একটা পাঁজর খুলে খুলে তাঁর এই বাড়ীটা গড়া। ইচ্ছে ছিল এরপর একতলা, দোতলার ভাড়া আর ফিক্সড ডিপজিটের সুদ চুষে চুষে পরম নিশ্চিন্তে তারিয়ে তারিয়ে বাকি জীবনটা খরচ করবেন। মাঝে মাঝে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ীর এরিয়েলের তারটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিশিবাবু ভাবেন, এই বাড়ীটা সত্যি তাঁর কি না! এ বাড়ীটা শেষ হতে তার কতগুলি দাঁত পড়ে গেছে, মাথার কতটা অংশ সাদা হয়ে গেছে সে গল্প তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের কাছে করেন।

সেই স্ত্রীকে তিনি আজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে এলেন। অসুখটা ডাক্তারী ভাষায় 'সীরিয়াস' বলেই তিনি সীট পেলেন, ছোটখাট ব্যায়রাম হলে তাঁকে নাম

শিখিয়ে বসে থাকতে হত রুগীর আয়ুর ওপর ভরসা করে।

স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ক'দিন আগেই ওরা এসে পৌঁছেছে। একদিক থেকে সুবিধে হল, মার অবর্তমানে অরুণা সংসারের হাল ধরতে পারবে কিন্তু অসুবিধে দেখা দিল নিশিবাবু'র দিক থেকে। এই চিন্তিত উদ্বিগ্ন মন নিয়ে উনি কেমন করে খেলা করবেন নন্দিনীর সঙ্গে? বাড়ীর সামনের ফাঁকা জমিটুকুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিশিবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

'তোর মেয়ে যেন আরও একটু লম্বা হয়েছেরে।' এবার ওরা আসার পর নন্দিনীকে দেখেই অরুণাকে উদ্দেশ্য করে বললেন নিশিবাবু।

'একটু মানে একেবারে তালগাছ হচ্ছে ত দিন দিন' অরুণা বলল, বাবার জন্যে সরবৎ করতে করতে, মাথাতেই ত বাড়ছে খালি। ছ'মাস আগের কেনা ফ্রক এখন ওর গায়ে হয় না।

রান্নাঘরটা ছাতের 'পর। তিনতলার ছাত। এক দিকে রান্নাঘর, খাবার ঘর আর একদিকে ফুলের টব দিয়ে সাজান। মাঝখানে একটু সিমেন্ট দিয়ে বাঁধান জায়গা। অবসর সময়টুকু ছাতের এই ফাঁকা জায়গায় বসে গায়ে হাওয়া লাগান নিশিবাবু।

নিশ্চিন্তে বসে কথা হচ্ছিল। কোথায় ছিল নন্দিনী ঝড়ের বেগে এসে নিশিবাবু'র ঘাড়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে বলল, 'দাদু জলদি এক্‌ঠো রুপিয়া দেও তো।'

অরুণা ধমক দিয়ে বলল, 'এই ফের! তোকে বলেছি না মামার বাড়ী এসে বাংলা বলবি।'

নন্দিনী মা'র দিকে তাকাল একবার শুধু। তারপর দাদুর সামনে হাতটা পেতে বলল 'ও দাদু দেও না—

নিশিবাবু ও'র হাতটা ধরে বললেন, টাকা দেব কিন্তু বোলো তুম কেয়া করেগা টাকা লেকে—

নন্দিনী আঙুল তুলে রাস্তার দিকে দেখিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'আইসক্রীম!'

নিশিবাবু ফোগ্‌লা দাঁতে হাসলেন, ট্যাঁকে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'আমায় বিয়ে করবি ত?'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'ওকি কথা! টাকা দিয়ে মত আদায় করে নিচ্ছ! পার ত মনকে বশ কর অন্য উপায়ে।'

নিশিবাবু বললেন, এখন দিনকাল বদলে গেছে গিন্নি, এখন খালি ভালবাসলেই কারও মন পাওয়া যায় না।' ট্যাঁক থেকে বাজারের ফেরত একটা টাকা তিনি তুলে দিলেন নন্দিনীর প্রসারিত হাতের ওপর।

আর কিছু বলার আগেই সে উধাও। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ছাতের মাঝখানে।

ওকে নিয়েই কথা হচ্ছিল পাশের বাড়ীর অজিতেশ বাবুর সঙ্গে। অজিতেশ বলছিলেন, 'ওসব হবে না নিশিবাবু, আপনার বাড়ীতে আছে বলেই যে টুকটুকে রাজকন্যাটির ওপর আপনার স্বত্ব বর্তাবে তা চলবে না। স্বয়ংবর সভার আয়োজন করতে হবে মশাই।

অজিতেশবাবু সেদিন অফিস ফেরতা নন্দিনীর জন্যে এক বাক্স চকোলেট নিয়ে এসেছিলেন। ভাল বিলিতি চকোলেট। নন্দিনীর সে কি খুসী! অজিতেশবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা যেন তার উপচে পড়ছে। মাকে বলেছিল, 'মা উ আদমী বহুৎ আচ্ছা মা, বহুৎ ভাল।

অজিতেশবাবুর সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। নিশিবাবুদের চেয়ে তিনি কিছু ছোটই হবেন। সওদাগরি অফিসের ম্যানেজার। একটিমাত্র ছেলে, তাই বোধহয় স্বাস্থ্যের অমন দীপ্তি, মুখে নির্ভাবনার প্রশান্তি।

নিশিবাবু ঘন ঘন মাথা নেড়েছিলেন। বলেছিলেন, উঁহু ওসব স্বয়ংবর-টয়ংবরের মধ্যে যাচ্ছি না আমি। আপনারা মশাই কালকের লোক হয়ে এদিকে নজর দিচ্ছেন! সাহস ত কম নয়! ও কি জানেন? ও হচ্ছে আমার কলমের গোলাপ গাছ।

কথা চলছিল পাশাপাশি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় অরুণা এসে বলল, 'বাবা শীগগির এস, মা কি রকম করছে।' তারপরই ডাক্তার ডাকা হল এবং রোগ নির্ণয় করে ডাক্তার বললেন হাসপাতালে ভর্তি করতে।

দু'দিন পরে ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল পূর্ণিমাকে; সন্ধেবেলায় টুকিটাকি দু'টো একটা জিনিষ গাড়িতে তুলে নিশিবাবু স্ত্রীকে নিয়ে রওনা দিলেন। অরুণা যেতে পারল না। দু'টি ভাই আর তার নন্দিনীকে দেখাশুনোর জন্যে তাকে থেকে যেতে হল।

ট্যাক্সির ভেতর ঢুকে হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে পূর্ণিমা তাকালেন অরুণার দিকে।

অরুণা বলল, 'ও কি মা তোমার চোখে জল কেন? ছি, কাঁদে না চোখ মোছ।'

পূর্ণিমার যেন সে কথা কানে গেল না। তিনি তাকালেন অরুণার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনতলা বাড়ীটার দিকে। বারান্দায় মেলে-দেওয়া কাপড়গুলো শুকিয়ে গেছে, এখনও তোলা হয় নি।

আর নিশিবাবু হাসি হাসি মুখে তাকিয়েছিলেন নন্দিনীর দিকে। বলছিলেন, কিরে বেটি আসবি?

নন্দিনী প্রবলভাবে মাথা নাড়ছিল। মা'কে ছেড়ে সে কোথাও নড়বে না।

সেই দিনটির পর থেকে নিশিবাবুর দিনরাত্তির হয়ে গেল হাসপাতালের ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। সকালে খাবার নিয়ে যাওয়া, দুপুরে ফ্লাস্কে করে গরম দুধ পৌঁছে দেওয়া, সন্ধেবেলা আর একবার গিয়ে হাউস-সার্জনের সঙ্গে দেখা করা এই হল তাঁর রোজকার রুটিন। বুড়ো বয়সে তিনটি জোয়ানের বল পেয়ে স্ত্রীকে যেন নতুন করে ভালবাসতে শিখলেন নিশিবাবু। সমস্ত পাড়া থেকে পৃথক হয়ে নিশিবাবু একটা মানুষ হয়ে দাঁড়ালেন হাসপাতাল আর বাড়ীর মধ্যে। আনন্দ আর নন্দিনী দুই হারিয়ে গেল তাঁর জীবন থেকে।

নন্দিনীকে ডাকত সবাই। নিশিবাবু না থাকায় তার ভাব জমল পাড়ার আর পাঁচজনের সঙ্গে। বিশেষ, অজিতেশবাবুর সঙ্গে। হাতভরে চকোলেট, ক্রীম-দেওয়া বিস্কুট পেলে কোন্ শিশু না খুসী হয়?

সবাই ওকে আদর করতে চাইত। চাইত ওর আপেলের মত গাল দু'টি টিপে দিতে কিংবা কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিতে। নন্দিনী কারো কাছেই বেশীক্ষণ থাকত না। ছুটে পালিয়ে যেত। অদ্ভুত চঞ্চলতা ওর সারা শরীরে, চোখে-মুখে। ও যেন আলো নিয়ে এসেছে এই ছোট পাড়াটায়।

ভাব সবচেয়ে জমেছিল অজিতেশবাবুর সঙ্গে। চওড়া কাঁধে ওকে বসিয়ে বড় রাস্তা থেকে এক চক্কর ছুটে আসতে একটুও হাঁপিয়ে যেতেন না অজিতেশবাবু। নন্দিনীর সঙ্গে দৌড়ের বাজী হত তাঁর। নন্দিনী দাপিয়ে ছুটে কোঁকড়া চুল নাচিয়ে কোনবার ধরতে পারত না তাঁকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলত, হাম তুমহারা সাথ নেহি খেলতা, তুম হামকো হারা দেতা।'

তা শুনে অজিতেশ হাসতেন, হাসত অরুণা বারান্দা থেকে।

আর ঠিক সেই সময়েই গলির মোড়ে ঢুকতে দেখা গেল নিশিবাবুকে। হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে ফিরছেন তিনি। ক'দিনের মধ্যে যেন একটু কুঁজো হয়ে পড়েছেন তিনি।

মোড়ের তিনতলা বাড়ীটা সজল মৈত্রের। সজলবাবু ইনকাম-ট্যাক্সের উকিল। তাঁর স্ত্রী আধুনিকা তাপসী মৈত্র রেডিওতে গান করেন। দরজা খুলে দোতলার বারান্দায় এসে তাপসী বললেন, কি খবর নিশিবাবু?

তাপসী ওপরে নিশিবাবু নীচে। তাই নিশিবাবুকে মাথা উঁচু করে কথা বলতে হল।' ভাল, তিনি বললেন, অপরেশনের পর কথা বলেছে।'

তাপসী মৈত্রের বয়স বেশী নয়। বিকেলের প্রসাধনের পর তা আরও কম লাগে। মুখে নিখুঁত উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'তাই করুন ভগবান। ভালয় ভালয় আসুন উনি।'

'আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। আমার যে কি যাচ্ছে...।'

'না, না সে ত আমরা সব সময়েই বলছি। তাপসী বললেন, 'তা আপনার মেয়ে ত এখন এখানে থাকবে?'

'হ্যাঁ। বাধ্য হয়েই থাকতে হবে। জামাইয়ের শরীর খারাপ ওকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে লিখেছে কিন্তু এদিকে এই অবস্থায় যায় কি করে?'

অজিতেশ এগিয়ে এসেছিলেন। চোখ নামিয়ে বললেন, কি স্যাণ্ডাৎ কি খবর?'

নিশিবাবুর ক্লান্ত মুখে হাসি ফুটল, 'তোমার খবর ত ভালই দেখছি, বললেন তিনি, দিব্যি কোর্টশিপ চালাচ্ছ।

অজিতেশবাবুর মুখে সর্বদাই হাসি। এক কথায় হা হা করে হেসে নিশিবাবুর হাত ধরে বললেন, 'এসো চা খেয়ে যাও।'

তাপসী মৈত্রও বলেছিলেন চা খেয়ে যেতে। ওঁর স্বামী এখনও ফেরেন নি কোর্ট থেকে। একা খেতে নিশিবাবুর অস্বস্তি লাগে। তা ছাড়া কাল স্ত্রীর অপারেশন হয়েছে আর আজ তার পক্ষে একজন সুবেশা, সুন্দরী'র ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে চা খাওয়াটা যেন রুগ্ন স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে মনে হয়েছিল নিশিবাবুর কাছে।

অজিতেশ তাঁকে হাত ধরেই নিয়ে গেলেন। তাঁর টেবিলে চায়ের পট, প্লেটে তিন রকমের বিস্কুট। অজিতেশ রুচিবান পুরুষ—তাঁর আলমারিতে রয়েছে মাদ্রাজ, উড়িষ্যার নানারকম পুতুল, দেয়ালে ঝুলছে যামিনী রায়ের ছবি।

অজিতেশ-গৃহিণী সচল হিমালয়। একবার এলেন দু'চারটি কথা বলেই দেহভার তুলে নিয়ে অদৃশ্য হলেন রান্নাঘরের দিকে।

অজিতেশ অফিসের গল্প করছিলেন।

কলকাতা ব্রাঞ্চের হেড তিনি। দেশ স্বাধীন হবার পর অফিসের কাজ চালানো দায় হয়ে পড়েছে। কখন কোন

ছুতোয় একটা হাঙ্গামা বাধানো যায়, একটা ষ্ট্রাইক করা যায় সবাই খালি সেই ধান্দায় আছে। পরিশ্রম করে ওপরে ওঠবার চেষ্টা কারো নেই।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে চুপ করে শুনছিলেন নিশিবাবু। চিরকেলে কেরাণী তিনি তাই অজিতেশের সমস্যা সম্যক বোঝা তাঁর সাধ্যের বাইরে। রিটায়ার করার দেড় বছর আগে মাত্র তিনি এ্যাকাউন্টেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অমৃতফল ভালভাবে আস্বাদ করার পূর্বেই বরাবরের ছুটি পেয়ে গেলেন তিনি অফিস থেকে।

গল্প করতে করতে বিকেল ফুরোল। অজিতেশ বাবুর পশ্চিমমুখো ঘর থেকে সূর্য্যাস্ত দেখা যায়। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিশিবাবু'র মনে পড়ল কাল পূর্ণিমাকে রক্ত দেবার দিন।

পূর্ণিমা ভাল আছেন। কাল সন্ধেবেলা তাকে দেখে এসেছেন নিশিবাবু। আজ তাই মনটা খুশী খুশী! আজ ছেলেদের হাসপাতালে নিয়ে যাবেন বলেছেন। বারান্দা থেকে নিশিবাবু দেখছিলেন নন্দিনী স্কিপিং করছে আর রোয়াকের ওপর বসে আছেন অজিতেশবাবু, মিষ্টার কৃষ্ণন, হরিপদবাবু'র ছেলে সুরেশ, উকিল কালীভূষণ সরকার। ওর কোঁকড়া চুল উড়ছে তালে তালে, ফর্সা গায়ে রোদ পড়ে তা যেন ঠিকরে পড়ছে এই ছুটির দিনের সকালে। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা ফাঁকা জমিটুকুর ওপর রবারের বল নিয়ে খেলছে। কিন্তু নন্দিনী ওদের দলে ভেড়ে নি। ওরা ওর সঙ্গে হিন্দী বলতে পারে না। দুরন্তপনায় হেরে যায় ওর কাছে

নন্দিনীর মুখ লাল! সে স্কিপিং করছে আর শুনছে! দু'শোবার করতে পারলে অজিতেশবাবু বলেছেন আজ তাকে লাইট হাউসে 'স্লীপিং বিউটি' দেখাবেন।

'তুই যাবি তো আমাদের সঙ্গে হাসপাতালে? বাড়ী ফিরে তাকে প্রশ্ন করলেন নিশিবাবু।

সে মাথা নাড়ল।

'কেন রে?

'হাম সিনেমা জায়গা আজ।'

মেয়েটা যেন খালি খেলতে আর ফুর্তি করতেই এসেছে। বাড়ীর সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই ওর। ওর মা ওকে বাথ-টবে বসিয়ে স্নান করিয়ে দিতে দিতে বলল, কেন যাবি না রে? দিদাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

নন্দিনী জানাল যে দিদাকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে যে তার নেই তা নয়। কিন্তু আজ যে অমুক আংকল তাকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবেন লাইটহাউসে। সে গুণে গুণে পুরো দুশোবার স্কিপিং করেছে। অজিতেশ-বাবু চাকরকে পাঠিয়েছেন টিকিট কেটে আনতে। ওব্বাবা লাইটহাউসে গিয়ে সিনেমা দেখবি! অরুণা চোখ বড় করে বলে। ওখানে যে আমিও কোনদিন যাই নি রে! ও বাবা শুনছ! মার সে মুখভঙ্গী দেখে নন্দিনীর কি হাসি!

পরের দিন আবার সেই গলির মোড়! আজ যেন নিশিবাবুর বুকটা টান টান! অজিতেশ আজ নন্দিনীর সঙ্গে ক্রিকেট খেলছেন। নন্দিনী ব্যাট করছে উনি দিচ্ছেন বল। বল করে করে গলদঘর্ম হয়ে গেছেন ভদ্রলোক, নন্দিনীর এখনও আউট হওয়ার নাম নেই।

নিশিবাবুকে দেখেই অজিতেশ বললেন, কি মশাই খুব যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন! বলি ডুয়েল লড়ার কি হল! আমি কিন্তু তৈরি—

'আমিও তৈরি, প্রশান্ত হাসি হেসে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন নিশিকান্ত। 'আজ এক ডুয়েলে জিতে এলাম। আসুন এবার আপনার সঙ্গে লড়াইটা করে ফেলা যাক।

'কি রকম?'

'কাল অরুণার মা ফিরে আসবে।

'বলেন কি?'

অজিতেশের সেই ডাক শুনেই বোধহয় বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন তাপসী মৈত্র। হাতে তাঁর পাউডারের পাফ্। বললেন, 'ও নিশিবাবু কি খবর?'

তেমনি গলা ওপরে তুলে নিশিবাবু বললেন, 'খবর ভাল। ডাক্তার বলেছে কাল ওকে ছেড়ে দেবে।'

'তাই নাকি, বাঃ সুখবর! আপনার দুর্ভোগ কাটল।'

'পুরোপুরি আর কাটল কই? অজিতেশ বললেন, 'এখনও যে আমার সঙ্গে ওর ডুয়েল লড়া বাকি। তাতে কি হয় কিছু বলা যায় কি? আপনি বোধহয় জানেন না ওঁর নাতনিটির দাবীদার আমরা দুজনেই।

তাপসী চোখ তুলে এক পলক তাকালেন অজিতেশের দিকে। ভাবটা যেন আমি সব জানি। নিশিবাবুকে বললেন, 'পূর্ণিমাদি'কে আনলে বোধহয় মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন···?'

'সে আর বলতে, জামাই খুব তাগাদা দিচ্ছে। আর রাখা যাবে না—।'

'উনি সেরে-সুরে আসছেন, আমাদের কিন্তু একদিন ভোজ দিতে হবে', তাপসী দাবী জানালেন খুশী খুশী গলায়।

'বেশ ত, 'তৃপ্ত, লজ্জিত মুখে বললেন নিশিবাবু।

* * *

পূর্ণিমা ফিরে এসেছেন। ডাক্তার এখনও তাঁকে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে নিষেধ করেছেন। এ অবস্থায় অরুণা যদি আরও কিছু দিন থাকত ত ভাল হত। কিন্তু তাকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। অরুণাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শোভেন তার অফিসের একটি পিয়নকে পাঠিয়েছিল। বেচারী আর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে পারছে না।

পূর্ণিমা এখনও রান্নাঘরে যেতে পারেন নি। নিশিবাবু পুরণো কুকারটাকে ঝেড়েঝুড়ে নামিয়েছেন। সেইটা নিয়ে মহা উৎসাহে রান্নায় মেতেছেন তিনি। ডিম ভাতে, আলু ভাতে দিয়ে দু'বেলা রান্না হচ্ছে, সঙ্গে থাকছে আচার আর দুধ। পূর্ণিমা শুয়ে শুয়েই নির্দেশ দেন আর নিশিবাবু নতুন শিক্ষার্থীর আগ্রহে সেইগুলি পালন করেন।

নন্দিনী চলে যেতে পাড়াটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কিন্তু শান্তি পেয়েছেন তাপসী মৈত্র। নিশ্চিন্তে 'রেওয়াজ' করতে পারছেন উনি এখন সকালে বিকেলে। পর্দা সরিয়ে দিলে তাপসী'র ঘর থেকে সোজা অজিতেশবাবু'র ঘর দেখা যায়। ভোরবেলা যখন উনি গলা সাধতে বসেন, অজিতেশ তখন স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ব্যায়াম করেন ঘরের মধ্যে। এই বয়সেও কি স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের! তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে!

পেশাদারী মঞ্চে রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়

অশোক সেন

শেক্সপীয়রকে ইওরোপ, আমেরিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে বহুদিন থেকে। কিন্তু শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা জানিয়েই ওসব দেশের লোকেরা চুপ করে বসে থাকে না এবং শুধু স্কুল কলেজের গণ্ডীর মধ্যেই তাঁর রচনাকে পাঠ্য হিসাবে আটকে রেখে দেওয়া হয় না। যাঁরা মনে করেন মঞ্চাভিনয় ব্যতিরেকেই মেণ্টাল পারফরমেন্সের সাহায্যে নাটকের রস উপভোগ করে নেবেন, তাঁরা সত্যিকার নাট্যবিদ্ নন।

স্বরলিপি পড়ে যেমন গানের রস বোঝা যায় না, তেমনি নাট্যের লিখিত অংশ বা পাণ্ডুলিপি পড়ে নাটকের নাট্যিক-রস উপভোগ করা সম্ভব হয় না। কথায় বলে, A Nation is known by its Stage। ইংরাজ জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য গুণাবলীর দিকটা বুঝতে হলে ইংলিশ ষ্টেজ এবং ইংলিশ এ্যাক্টিং দেখা দরকার—ইংরাজ জাতির শিক্ষা এবং ঐতিহ্য এদেশের মার্কেণ্টাইল অফিসের সাহেবদের দেখে বিচার করলে অত্যন্ত অন্যায় হবে।

শেক্সপীয়রকে শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা দেখিয়েই ইংরাজরা চুপ করে বসে থাকেন না—অন্যান্য দেশ থেকে যাঁরা লণ্ডনে যান, কোন না কোন পেশাদারী মঞ্চে যে কোনও সময়ে শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ তাঁরা সবসময়েই পান। তাছাড়া ষ্ট্র্যাটফোর্ড—আপন—এভন-এ শেক্সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটার ত আছেই।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা এদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে গর্ববোধ করি এবং সাঙ্কেতিক নাট্যকার হিসাবে তাঁকে বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। অথচ শিশিরোত্তর যুগে কলকাতার পেশাদারী মঞ্চগুলিতে কখনও নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয় হতে দেখি না। পেশাদারী মঞ্চ বলতে আমি, মিনার্ভা, ষ্টার, বিশ্বরূপা, রঙমহলকেই বুঝি—অর্থাৎ যারা প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার টিকিট বিক্রী করে থিয়েটার করেন। সৌভনিককে বাদ দিলাম দুটি কারণে: প্রথমত এটি ওপন এয়ার থিয়েটার (অর্থাৎ অন্য জাতের মঞ্চ), এবং দ্বিতীয়ত দু একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া এঁদের অভিনয়ে ঠিক পেশাদারী পারফেকশন অভ্ এ্যাক্টিং দেখা যায় না।

সংস্কৃতিবান বিদেশীরা যখন এদেশে আসেন তাঁদের স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয় রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চরূপায়ণ দেখবেন—কিন্তু কোন সময়েই সে সুযোগ তাঁরা পান না। পেশাদারী মঞ্চ থেকে আজকাল রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয় একেবারে উঠে গেছে। এ থেকে বিদেশীরা বেশ সহজ ভাবেই বুঝে নেন রবীন্দ্রনাট্যের প্রতি আমাদের আসল শ্রদ্ধা কতটুকু।

প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ কবির ছবি টাঙিয়ে এবং সামনে কিছু ফুল রেখে, ঘটা করে বক্তৃতার আয়োজন করে, 'রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং প্রবন্ধ লেখক'' বলে দাবি জানিয়েই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা দেখাই—আর রাতের পর রাত 'উল্কা' এবং 'তাপসী' এবং 'ক্ষুধা' ও 'সেতু' জাতীয় তথাকথিত নাটক দেখতে ভিড় জমাই। রঙ্গমঞ্চের থেকে যদি জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে আমরা যে কোন্ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছি তা সহজেই অনুমেয়।

অথচ এমন অবস্থা ত চিরকাল ছিল না। অর্দ্ধেন্দুশেখরদের আমল থেকে শিশিরযুগ অবধি রবীন্দ্রনাট্যকে ত এমনভাবে কখনও পেশাদারী মঞ্চ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়নি। অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমর দত্ত প্রভৃতি যে যুগের বিখ্যাত অভিনেতারা এবং পরবর্তীযুগে শিশির-

কুমার, তিনকড়ি চক্রবর্তী, রাধিকানন্দ, দুর্গাদাস, অহীন্দ্র সবাই পেশাদারী মঞ্চে রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয় করেছেন।

সাল, তারিখ দিয়ে পেশাদারী মঞ্চে রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়ের একটি রোজনামচার চুম্বক দিচ্ছি :

১৮৮৬ সালের ৩রা জুলাই ন্যাশনাল থিয়েটারে সর্ব প্রথম পেশাদারী মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' মঞ্চস্থ হয়—নাট্যরূপ দেন তখনকার ম্যানেজার কেদার চৌধুরী।

চরিত্রলিপি ছিল এই রকম :

বসন্ত রায়—রাধামাধব কর

উদয়—মহেন্দ্র বোস

প্রতাপ—মতি সুর

অনঙ্গমোহন—পূর্ণ ঘোষ

বিভা—হরিমতি (এই ভূমিকায় অভিনয়ের পর সবাই তাকে ডাকত 'বিভা-হরি' বলে।)

সুরমা—ছোটরাণী

রাণী—ভবতারিণী

মঙ্গলা—লক্ষ্মী

রামচন্দ্র—নীলমাধব চক্রবর্তী

রমাই ভাঁড়—নাট্যাচার্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। এমারেল্ড থিয়েটারে ১৮৯০ সালের ৭ই জুন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করা হয় পনের রাত্রির জন্য। মহেন্দ্র বোস কুমার সেনের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। বিক্রম চরিত্রে মতিলাল সুরের অভিনয়ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তাছাড়া পণ্ডিত হরিভূষণের দেবদত্ত, চুণীলাল মিত্রের শঙ্কর, কিরণশশীর রাণী এবং বিষাদকুসুমের ইলা দর্শকদের ভাল লেগেছিল।

১৮৯৪ সালের এমারেল্ডে 'রাজা বসন্ত রায়' পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। নাম ভূমিকায় পূর্ণ ঘোষ এবং সুরমা ও বিভার চরিত্রে কুসুম ও সুকুমারী ভাল অভিনয় করেন।

১৯০৪ সালের ২৭শে নভেম্বর ক্ল্যাসিকে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। ভূমিকা লিপি ছিল এই রকম :

মহেন্দ্র—অমরেন্দ্র

বেহারী—মনোমোহন গোস্বামী

বিনোদিনী—কুসুম

আশা—ব্ল্যাকী

অন্নপূর্ণা—জগত্তারিণী

রাজলক্ষ্মী—পান্নারাণী

১৯১৪ সালের ১৩ই জুন ষ্টারে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। গল্পটির মঞ্চরূপ দেন শ্রীঅমর দত্ত এবং রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাটিকার নাম হয় অভিমানিনী। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের ভূমিকালিপি ছিল :

ছিদাম—হাঁদুবাবু

দুখীরাম—ক্ষেত্রবাবু

রামলোচন—কাশীবাবু

সিভিল সার্জেন—ধীরেনবাবু

চন্দনা—কুসুমকুমারী

ললিতা—নরীসুন্দরী

রাধা—মৃণালিনী

দ্বিতীয় অভিনয়ের রাত্রি থেকে স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ ছিদামের ভূমিকায় নামতে থাকেন।

১৯১৪ সালের ৩১শে অক্টোবর ষ্টারে রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পের এ্যাডাপ্টেশন 'অকলঙ্ক শশী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যরূপ দেন। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :

জয়গোপাল—অমরেন্দ্রনাথ

দুর্লভ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

কেদার—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী

মধু ডাক্তার—হীরালাল দত্ত

ম্যাজিষ্ট্রেট—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তারিণীবাবু—কিশোর পালিত

ইনস্পেক্টর হারাণবাবু—মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু)

হরিশ ডাক্তার—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

শশী—কুসুমকুমারী

তারা—বসন্তকুমারী

সুবাসিনী—মৃণালিনী

১৯২৯ সালে বেঙ্গল স্টেজে ক্ষেত্র মিত্র মশায় তাঁর 'শেক্সপিয়ান টেম্পল' থিয়েটারের অভিনয় শুরু করেন। ঐ সালেই এখানে 'রাজা ও রাণী' মঞ্চস্থ হয়।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উপেন মিত্তিরের কর্তৃত্বাধীনে মিনার্ভায় রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য 'বশীকরণ' মঞ্চস্থ হয়। প্রধান চরিত্রে রাধিকানন্দের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য।

১৯২৫ সালের ১৮ই জুলাই আর্ট থিয়েটার ষ্টারে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভার' অভিনয় শুরু করেন। ভূমিকালিপি ছিল এইভাবে:

রসিক—অপরেশচন্দ্র
অক্ষয় – তিনকড়িবাবু
চন্দ্রবাবু—অহীন্দ্র চৌধুরী
পূর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিপিন—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
নীরবালা—নীহারবালা
নৃপবালা—ফিরোজা
শৈলবালা—সুশীলাসুন্দরী
নির্মলা –নিভাননী

'চিরকুমার সভা' সেই আমলে দর্শকদের ভেতর প্রচুর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং বহুরাত্রি ধরে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকটি প্রথমে শিশিরকুমারকে দেওয়া হয়। কিন্তু অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় করবার মত যোগ্য নট—তখন তার দলে ছিল না—অর্থাৎ একই সঙ্গে ভাল অভিনয় এবং ভাল গান গাইতে পারেন এমন একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। ফলে নাটকটি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে আর্ট থিয়েটারে শিশিরবাবু অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন চন্দ্রবাবুর ভূমিকায়। শ্রীরঙ্গমের যুগেও শিশিরকুমার কয়েকরাত্রির জন্য তিনকড়িবাবুকে নিয়ে 'চিরকুমার সভার' অভিনয় করেন। সে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। যেট এ্যাকটিং বলতে যা বোঝা যায় তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল শিশিরবাবু এবং তিনকড়িবাবুর অভিনয়ে।

১৯২৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর আর্ট থিয়েটার করে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন। তিনকড়িবাবু ডাক্তার, অহীন্দ্রবাবু যতীন, কুমার কনকেন্দ্র অখিল, সুশীলা মাসী এবং নীহারবালা হিমির ভূমিকায় রূপদান করেন।

১৯২৬ সালের ২৬শে জুন নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের শুভ উদ্বোধন হয়।

এর অনেক আগেই অবশ্য অপেশাদারী অবস্থায় শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাট্য অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' কেদারের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উচ্চ প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'বৈকুণ্ঠের খাতার এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়ীতে গগন অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।'

যাক আবার 'বিসর্জনের' কথায় ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেকবার 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করেছেন—নিজে ভূমিকা নিয়েছেন হয় রঘুপতির, না হয় জয়সিংহের।

নাট্য মন্দিরে এ নাটকের প্রথম রাত্রির ভূমিকালিপি ছিল এই রকম:

রঘুপতি—শিশিরকুমার
রাজা—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
নক্ষত্র রায়—নরেশ মিত্র
জয়সিংহ—রবীন্দ্রমোহন রায়
চাঁদপাল—অমিতাভ বসু
রাণী—চারুশীলা
অপর্ণা—ঊষা

দশম অভিনয় রাত্রে ভূমিকা বদলে শিশিরকুমার সেজেছিলেন জয়সিংহ—নরেশবাবু হন রঘুপতি।

অভিনয় এবং প্রযোজনা উভয় দিক থেকেই 'বিসর্জন' বাংলা পেশাদারী স্টেজের একটি ল্যাণ্ডমার্ক। এই

নাটকেই শিশিরবাবু সর্বপ্রথম মুভ্ লাইটের ব্যবহার করলেন বাংলা ষ্টেজে।

১৯২৬ সালের ২০শে জুলাই আর্ট থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' মঞ্চস্থ করেন। ভূমিকালিপি-সহ অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম নীচে দেওয়া হল :

মিঃ নন্দী—রাধিকানন্দ
সতীশ—অহীন্দ্র
মিঃ লাহিড়ী—কুমার কনকেন্দ্র
নেলী—নীহার
সুকুমারী—সুশীলা
চারুবালা—সরস্বতী

১৯২৭-এর ১০ই সেপ্টেম্বর আর্ট থিয়েটার কবির 'পরিত্রাণ' নাটকের অভিনয় করেন। তিনকড়িবাবুর ধনঞ্জয় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

১৯২৭-এর অক্টোবরে নাট্যমন্দিরে 'শেষরক্ষা' মঞ্চস্থ হয়—নীচে চরিত্রলিপি দেওয়া হল :

চন্দ্রদা—শিশিরকুমার
বিনোদ—রবি রায়
গদাই—শৈলেন চৌধুরী
শিবচরণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
নিবারণ—যোগেশ চৌধুরী
ললিত—রাধিকানন্দ
ক্ষাস্তমণি—চারুশীলা
কমলমুখী—কৃষ্ণভামিনী
ইন্দুমতী—প্রভা

প্রথমযুগের এ অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি—পরে বহুবার এ নাটকটি দেখেছি। গর্ডন ক্রেগ তাঁর বিখ্যাত বই 'দি আর্ট অভ দি থিয়েটারে' লিখেছেন যে, বড় অভিনেতা হতে গেলে তাঁর ভেতর জিনিয়াসিটি এবং বাবলিং পার্সন্তালিটি থাকা দরকার। এই দুটি গুণের চরমরূপায়ন দেখা যেত শিশিরকুমারের চন্দ্রদায়। শিশিরবাবু এবং রবি রায়ের 'ও ভোলা মন' কবিতাটির আবৃত্তি যে অদ্ভুত মধুর রসের সৃষ্টি করতো তা যাঁরা এ অভিনয় না দেখেছেন তাঁদের বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। এ নাটকের অভিনয়ের সময় সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ হাস্যকলরব মুখর হয়ে উঠতো এবং অনাবিল কৌতুকের আস্বাদনে দর্শকেরা সত্যিকার innocent entertainment প্রাণমন দিয়ে উপভোগ করতো। ইউরোপে ইংলিশ এ্যাকটিং এবং ফ্রেঞ্চ এ্যাকটিং এর তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা বলা হয়—ইংরাজেরা অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েদের দিয়ে মঞ্চাভিনয় করায়, তাদের দেখতে ভাল লাগে বটে কিন্তু তাদের অভিনেত্রী বলা চলে না। ফ্রান্সে যুবতীর রোলেও বয়স্কাদের নামানো হয়—অভিনয় দেখতে দেখতে অল্পবাদেই দর্শকেরা তাদের বয়সের কথা, রূপ যৌবনের কথা ভুলে গিয়ে মুগ্ধভাবে তাদের অভিনয় উপভোগ করতে থাকে। শেষরক্ষা নাটকটিতে একবার শ্রীমতী প্রভার অভিনয় করতে দেখেছিলাম। তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে—কিন্তু প্লে দেখতে দেখতে প্রভার বয়সের কথা কারোর মনেই আসছিল না।

শেষ দৃশ্যে মঞ্চ এবং অডিটোরিয়ামের সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে থিয়েট্রিক্যাল ইন্টিমেসীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিশিরকুমার এই 'শেষরক্ষায়'।

ইংরাজী ১৯২৮-এ (১৩৩৪-এর শ্রাবণে) ষ্টার থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্তের অভিনয় করেন। এ অভিনয়ের প্রধান আকর্ষণ ছিল ধনঞ্জয় বৈরাগীর পাট—বরিশালের বিখ্যাত নট মুকুন্দ দাস সেজেছিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী।

এই সময়েই মিত্র থিয়েটারে 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ হয়।

১৯২৯-এর ২৪শে ডিসেম্বর 'তপতী'র শুভ উদ্বোধন হয় নাট্যমন্দিরে। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :

বিক্রমদেব—শিশিরকুমার
নরেশ—জীবন গাঙ্গুলী
রত্নেশ্বর—রবি রায়
দেবদত্ত—যোগেশ চৌধুরী
সুমিত্রা—প্রভা
বিপাশা—কঙ্কাবতী

শিল্পরসিক দর্শকেরা উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন 'তপতী' অভিনয়ের।

এই সময় বিখ্যাত অভিনেত্রী রাধিকানন্দ সম্প্রদায় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় করেন (পৌষ-১৩০৫)।

১৯৩৩ সালে নাট্যমন্দির এবং ষ্টারের 'মিলিত শিল্পীদের প্রয়াসে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' মঞ্চস্থ হয়। বলা বাহুল্য শিশিরকুমারের কেদার হয়েছিল অনুপম।

নবনাট্যমন্দিরে শিশিরবাবু রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ করেন ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। তিনি স্বয়ং নিয়েছিলেন মধুসূদনের ভূমিকা—পরে কয়েক রাত্রি অহীন্দ্র চৌধুরীকে মধুসূদন সাজিয়ে ভাদুড়ী মশায় বিপ্রদাসের ভূমিকাতেও অনবদ্য অভিনয় প্রতিভা প্রদর্শন করেন। তাঁর মধুসূদনের রোলের অভিনয় ষোড়শীর জীবানন্দকেও পেছনে ফেলে গিয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকা ছিল এই রকম:

কুমু—কঙ্কাবতী
বিপ্রদাস—শৈলেন চৌধুরী
নবীন—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
মতির মা—রাণীবালা

অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "নবনাট্য মন্দিরে যোগাযোগ দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসম্পূর্ণপ্রায় অভিনয় সর্ব্বদা দেখা যায় না—তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতাদের মনস্তুটি না হয়ে থাকে তবে সে জন্য নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না।"

১৯৩৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর নাট্যনিকেতনে শ্রীনরেশ মিত্রের পরিচালনায় 'গোরা' মঞ্চস্থ হয়। উপন্যাসের নাট্যরূপও নরেশবাবুই দিয়েছিলেন।

ভূমিকালিপি ছিল:

আনন্দময়ী—রাজলক্ষ্মী
বরদাসুন্দরী—মনোরমা
সুচরিতা—শান্তিগুপ্তা
পরেশ—অহীন্দ্র চৌধুরী
পানুবাবু—নরেশ মিত্র
গোরা—ভূমেন রায়
মহিম—রবি রায়
বিনয়—জহর গাঙ্গুলী
ললিতা—চারুবালা

ইউরোপে যেমন শেক্সপীয়ারের নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করতে না পারলে বড় অভিনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় না, আমাদের দেশেও এই ধরণের একটা ট্রাডিশন একদিনে গড়ে উঠা উচিত ছিল যে, রবীন্দ্রনাট্যে অভিনয় করে নিজের প্রতিভা প্রদর্শন করতে না পারলে কোন শিল্পী বড় অভিনেতা বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন না।

পেশাদারী নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির নিয়মিত অভিনয় হওয়া সর্বদিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়। কারণ সাহিত্যের ভাল নাটক বলতে যা বোঝায় তা এদেশে এক রবীন্দ্রনাথই রচনা করেছেন। অহেতুক ঘটনার সমাবেশে নাটককে নাটকীয় ভাবপূর্ণ (মেলোড্রামাটিক) ও বাহ্যিক প্রদর্শনী করবার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ কখনও করেন নি। তাই তাঁর নাটকে বাহ্যিক ঘটনাবলীকে পরিবর্জন করা হয়েছে এ অভিযোগেরও কোন অর্থ নেই। রবীন্দ্রপূর্ব নাট্যকারদের নাটকে যে অনাবশ্যক বাহুল্য ক্রিয়াকর্মের প্রাবল্য দেখা যায়, কবি তার পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছেন নিজের রচনায়।

রবীন্দ্রপূর্ব বা রবীন্দ্রোত্তর নাট্যকারেরা নাটকের চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটাতে কখনও বেশি নজর দেন নি। অথচ মানুষের জীবনে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি বিশেষ স্থান আছে এবং এই শ্রেষ্ঠ দিকটির ওপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়েছেন তাঁর নাট্য রচনায়। অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম অভিব্যক্তিতেই হ্যামলেট জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যচরিত্র। অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরাট প্রাবল্যেই ঈডিপাস সর্বশ্রেণীর দর্শকদের কাছে এত প্রিয় এবং মর্মস্পর্শী। আর সেই একই কারণে রঘুপতি এবং জয়সিংহ মহৎ এবং বিরাট চরিত্র।

সংলাপ সৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। শব্দচয়ন

ক্ষমতার ওপরেই সংলাপের সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। একে কবি, তায় বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্। সুতরাং যে কোনও রচনায় শব্দ, কাব্য প্রভৃতির ব্যবহারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। রচনায় ভাব এবং ভাষার এমন চমৎকার সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার। এমন আদর্শ সংযোগ সেক্সপীয়ারের পর এক রবীন্দ্রনাথেই দেখা যায়। অনেক সময়ে অনেক শক্তিশালী নাট্যকারও শব্দ-সম্পদের দারিদ্র্যহেতু ঠিক যথার্থ স্থানে যথার্থ ভাবকে সুষ্ঠুরূপে পরিস্ফুট করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাষার রাজা, বাণীর বরপুত্র। প্রগাঢ় অনুভূতিলব্ধ ভাবধারাকেও স্বল্প কথায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। সংলাপে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। এই সব কারণেই রবীন্দ্র-নাট্যের সংলাপের এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের দেশের অন্য কোনও নাট্যকারের রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুতরাং পেশাদারী মঞ্চে রবীন্দ্রনাট্যের নিত্য নিয়মিত অভিনয় যাতে হতে পারে, থিয়েটারের মালিকদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। একজালে অভিনেতারাও তাঁদের অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখাতে পারবেন। দর্শকদের শিক্ষা এবং রুচিবোধ সৃষ্টি করবার দিকটাও পরিপুষ্ট হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের মানটাও অনেকটা তুলে ধরা হবে।

পেশাদারী মঞ্চে রবীন্দ্র-নাট্য মঞ্চস্থ করবার প্রথম এবং প্রধান অসুবিধা বোধহয় এই যে, সাধারণ দর্শকেরা এ সব নাটক নিতে চাইবেন না এবং তাতে মালিকদের আর্থিক ক্ষতি হবে।

কিন্তু এ অসুবিধা চিরকালই ছিল। শিশিরযুগেও দেখেছি দর্শক যে ভাবে দলে দলে আলমগীর, সাজাহান চন্দ্রগুপ্ত, রঘুবীর দেখতে এসে হাজির হয়েছেন, সে, ভাবে 'তপতী' বা 'যোগাযোগ' দেখতে আসেন নি। কিন্তু সে জন্যে ত শিশিরকুমার রবীন্দ্র-নাট্যকে তাঁর মঞ্চ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। মাঝে মাঝেই চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকদের শিল্প-রুচির উন্নতি করতে। তা ছাড়া সাধারণ দর্শককে টানবার মত নাটকও কবিগুরু রচনা করেছেন। 'ডাকঘর' নাটক যদি পেশাদারী মঞ্চে চালান হয় তবে কি সে নাটক দর্শক নেবেনা? ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এ নাটকের ইংরেজী ভার্সন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 'শেষরক্ষা' 'চিরকুমার সভা' 'বিসর্জন' ভাল ভাবে পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হবে বলেই আমার বিশ্বাস। 'মালিনী' নাটকটিও পেশাদারদের দ্বারা নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হওয়া দরকার। তারপর সাঙ্কেতিক নাটকগুলোর ত কথাই নেই—'চণ্ডালিকা' বা 'তাসের দেশ' যদি প্রফেশন্যাল আর্টিষ্টদের দিয়ে পাবলিক ষ্টেজে অভিনয় করানো হয় তবে দর্শক সমাগম হবে না এ কথা মানতে আমি রাজী নই।

ইউরোপের অনুকরণে আমাদের পাবলিক ষ্টেজে যদি রেপারটরী সিষ্টেমের প্রবর্তন করা হয় তা হলেও বিভিন্ন নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাট্যকে প্রোগ্রামে যুক্ত করে দেওয়া যায়।

রাশিয়াতে গিয়ে যদি চেখভের নাটকের অভিনয় দেখতে না পারি, ইংলণ্ডের ষ্টেজ থেকে সেক্সপীয়রের নাটককে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, আমেরিকায় যদি ও'নীলের নাটক মঞ্চস্থ না হয়, নরওয়ে এবং সুইডেনে যদি ইবসেন এবং ষ্ট্রীণ্ডবার্গকে বাদ দিয়ে অভিনয় ব্যবস্থা চালান হয় সেটা যেমন লজ্জার ব্যাপার, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে থিয়েটার চালান ব্যাপারটাও তার থেকে কম গ্লানিকর নয়। দেশের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র ইণ্টারন্যাশনাল প্লে রাইটকে বাদ দিয়ে দেশের মঞ্চের উন্নতি সাধন করব—এ চিন্তাটাও বাতুলতারই নামান্তর।

কলকাতার পেশাদারী মঞ্চের মালিকদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তাঁরা যেন এ বিষয়ে ঔদাস্য পরিত্যাগ করে সত্যিকার গুরুত্বের সঙ্গে এ বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন।

'তপতী' এবং 'যোগাযোগের' সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন।

নাটককে মঞ্চোপযোগী করতে হলে অনেক সময়ই এডিট করতে হয় পরিচালকের নির্দেশ অনুসারে। এ নিয়ে অনেক নামজাদা লেখক বিরক্ত হয়েছেন শিশির কুমারের উপর। কেউ কেউ হয়ত এ কারণে এত রেগে গিয়েছেন যার ফলে তাঁদের নাটক শেষ পর্যন্ত শিশির বাবুর থিয়েটারে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও সময়ে সময়ে এ নিয়ে মতদ্বৈধ হয়েছে শিশিরকুমারের এবং এই ধরণের মত-পার্থক্য হওয়াতেই শরৎচন্দ্র 'পল্লী সমাজে'র নাট্যরূপ প্রথমটায় দিয়েও ফেরৎ নিয়ে গিয়ে অন্য মঞ্চে অভিনয় করতে দেন। শেষে সেখানে নাটকটি ফ্লপ করলে পরে এটি এনে শিশিরকুমারের হাতে দিয়ে বলেন যে, শিশিরকুমার যা ভাল বোঝেন সেইভাবেই যেন নাটকটি অভিনয় করেন। সবাই জানেন 'পল্লী সমাজের' নাট্যরূপ 'রমা' শিশিরবাবুর নির্দেশে এবং পরিচালনায় বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। নাট্যাচার্যের পরামর্শেই 'দেনাপাওনার' নাট্যরূপ 'ষোড়শীর' শেষ দিকটা ট্র্যাজেডীতে পরিণত হয়।

কবিগুরু ছিলেন সম্পূর্ণ অন্যধরণের—এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির। শিশিরকুমারের নাট্য-পরিচালনার ক্ষমতা এবং অভিনয় প্রতিভা সম্বন্ধে কবি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। 'তপতী' (১ম সংস্করণ) অভিনয়ের সময় কিছু কিছু যায়গায় রি রাইট করে দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন নাট্যাচার্য এবং সেই অনুসারে কবিও সেই সব জায়গা আবার নতুন করে লিখে দেন। এই পরিমার্জিত 'তপতীই' শিশিরবাবু মঞ্চস্থ করেন। পরে ঐ পরিমার্জিত 'তপতীই' দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শিশিরবাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীঅশোককুমার ভাদুড়ী (৯নং শিবু বিশ্বাস লেন—কলিকাতা ৬, ফোন :—৫৫-৫১০৫) আমাকে বলেছেন যে প্রথম সংস্করণের 'তপতী' এবং তার সঙ্গে কবির সাদা কাগজে নিজের হাতে লেখা সংশোধিত অংশগুলি (ঐ বইয়ের সঙ্গে ষ্টিচ করা রয়েছে) তাঁর কাছে আছে।

আর এ কথাও অনেকেই জানেন না যে, শিশিরকুমার যখন 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ করেন, তখন ঐ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বহস্তে লেখা নাট্যরূপটি অশোকবাবু খুঁজে পাননি নাট্যাচার্যের মৃত্যুর পর—তবে অন্যের হাতে লেখা সেই নাট্যরূপের এ্যাকটিং কপি তাঁর কাছে আছে। কিন্তু কবির স্বহস্তে লেখা কপিটি হারিয়ে গেছে বলেই ত এত বড় একটা ব্যাপারকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এলিজাবীথান টাইমসে রচিত কয়েকটি নাটক সেক্সপীয়রের লেখা কি না সে সম্বন্ধেও ত অনেক বাক-বিতণ্ডা আছে এবং ভাষাবিদেরা বছরের পর বছর তাই গবেষণা চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগের' নাট্যরূপটিও ত একই ভাবে আমাদের দেশের ভাষা-বিদদের গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্র ভারতীর কর্তৃপক্ষীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁরা যদি শ্রীযুক্ত অশোক ভাদুড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন তা হলে আরও বিশদভাবে এ ব্যাপারের খুঁটিনাটি জানতে পারবেন। আমার নিজেরও এ কথা মনে আছে 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ হবার কিছু আগে কলেজ ষ্ট্রীটে একদিন সকালে একটি বইয়ের দোকানে শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন যে কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে—কবিগুরু তখন 'যোগাযোগের' নাট্যরূপ দিচ্ছিলেন এবং শিশিরবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দু' একটি যায়গা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য।

পরিশেষে আমার বক্তব্য যে সাল তারিখ দিয়ে রবীন্দ্রনাট্যের পেশাদারী মঞ্চে অভিনয়ের যে বিবরণী আমি দিলাম তার ভেতর যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে তবে এ বিষয়ে যাঁরা আরও তথ্য জানেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে প্রবাসী সম্পাদকের কাছে তা জানালে আরও সম্পূর্ণতা পাবে।

হুতোম ও বাংলা গদ্য

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী

কালীপ্রসন্ন সিংহ "শ্রীহুতোম প্যাঁচা" ছদ্মনামে তাঁর "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" প্রকাশ করেন—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক মন্তব্য করেছেন,—"বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী তাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন।" গত শতাব্দীর প্রথম দিকে গদ্যে ছিলো নির্দিষ্ট কোনো আদর্শের অভাব। গদ্যের বিভিন্ন আদর্শ সম্পর্কে হুতোমের বিতৃষ্ণা তাঁর মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও 'চলিত গদ্য' মুখের ভাষা হলেও গদ্যের ভারবহন ক্ষমতার দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টির ফলে মুখের গদ্যের সঙ্গে লেখা গদ্যের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিলো। সর্বপ্রথম উইলিয়ম কেরী গ্রাম্য চলিত ভাষাকে সিভিলিয়ানদের পক্ষে ব্যবহারিক জ্ঞানে চলিত রীতিকে অন্যতম রীতি বলে স্বীকার করেই 'কথোপকথন' গ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পণ্ডিত-মুন্‌শীদের মধ্যে ছিলো পাণ্ডিত্যের প্রতিযোগিতা—যে ক্ষেত্রে ভারবহনের ক্ষমতাই শিল্পগুণ বিচারের মাপকাঠি বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। তাই প্রাক্ রামমোহনযুগে চলিত গদ্যের উক্ত রীতিটির আর অনুবর্তন ঘটেনি।

চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার শব্দসম্ভারে ও বিন্যাসে। শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের আধিক্য ও অনাধিক্যে, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগতবৈশিষ্ট্যে,—বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যেই এই রীতির প্রকাশ। তাছাড়া বিন্যাসের দিক থেকেও চলতি রীতির সঙ্গে লেখ্য রীতির পার্থক্য আছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয় বা নববাবু বিলাসের গদ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বা রামমোহনের গদ্য রীতি থেকে স্থানবিশেষে অনেকটা নমনীয় হলেও তাকে কথ্যরীতি বলতে পারি নে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় কালীপ্রসন্নের 'বাবু' নাটকের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে মন্তব্য আছে,—"কলিকাতা মহানগর নিবাসী বাবুগণের কথোপকথন অজ্ঞ ভট্টাচার্য দ্বারা বিরচিত হইবার এইক্ষণে তাহা পাঠ্যযোগ্য নহে এবং কথোপকথনও বর্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে।" বাবু নাটকে কেরীর পরিত্যক্ত আদর্শ অনুসৃত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ বিভিন্ন সামাজিক নাটক প্রহসনে এই চলিত কথ্যরীতি উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে অনুবর্তিত হয়েছে।

নাটকে এই রীতির প্রয়োগ ঘটেছে নাট্য প্রয়োজনে, রীতির নিজস্ব মর্যাদায় তা প্রতিষ্ঠা পায়নি। আলালের ঘরের দুলালএর মধ্যে রীতির নিজস্ব মর্যাদা উপস্থাপিত হলেও তাকে বাংলা কথ্যরীতি বলা চলে না। প্রথম বাংলা কথ্যরীতি নিজস্ব মর্যাদায় উপস্থাপিত হয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সায়। ইতিমধ্যে কথ্যভাষা নাটকে প্রযুক্ত হলেও তার ব্যাপকতা ছিল না। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোমী গদ্যরীতি একদিকে যেমন বাংলা নাটকের কথোপকথনকে ব্যাপকভাবে স্বাভাবিক করে তুলেছে, তেমনি অন্যদিকে ভবিষ্যতে প্রমথচৌধুরীর গদ্যের সম্ভাবনাময় বীজ সাহিত্যক্ষেত্রে আহিত করেছে।

ভাষা ভাবের অনুগত হওয়া উচিত। উনিশ শতাব্দীতে অতিরিক্ত সমাজ-চেতনায় বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা এসেছিল, কিন্তু ভাবের উপযুক্ত ভাষার জন্ম না হওয়ায় ভাবের প্রকাশ অনেকটা কৃত্রিম ছিল। হুতোমই ভাবের এই কৃত্রিম প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তাঁর রীতির মাধ্যমে।

হুতোমের আগে বাংলা চলিত রীতির প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যেই দ্বিধা লক্ষ্য করা যায় তাই নাটকের সংলাপেও কথ্যভাষা অনেকটা কৃত্রিম। হুতোমের ভাষাই প্রথম আত্মপ্রত্যয়ী কথ্যভাষা। (তীব্র আত্মপ্রত্যয়ী মাইকেল মধুসূদনের প্রহসনের ভাষার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।) আঞ্চলিক ভাষা বৃহত্তর পরিধির মধ্যে উপস্থাপিত করতে অনেক সময় লেখকের সংকোচ থাকে। নাগরিকতার দম্ভ কলকাতার আঞ্চলিক ভাষাকে স্পর্শ করেছে বলে

কলকাতার ভাষা ব্যবহারে হুতোমের ক্ষেত্রে কোনো সঙ্কোচ আসে নি বরং সদর্প আত্মচেতনাই এসেছে।

ভাষা লেখক ও পাঠকের মধ্যে সেতু বন্ধন করে। হুতোমের বৈঠকী ভাষা পাঠকের সঙ্গে লেখকের যেমন হৃদয় সম্পর্ককে গাঢ় করে তুলেছে, তেমনি ভাষার গতিসম্পন্নতা লেখকের বক্তব্যকে পাঠকের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করাতে সহজেই সক্ষম হয়েছে।

মুখের ভাষাই ভাষাকে সঞ্জীবিত করে, যদিও গদ্যশিল্পে তার কিছুটা আদর্শান্বিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যখন গদ্যাদর্শ মুখের ভাষাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আদর্শকে আদর্শ হিসেবেই মূল্য দেয়, তখন ভাষা হয় মৃত। ভাষার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রথাভূত আদর্শ ও বানানের সংস্কারানুবর্তিতা প্রতিকূল। হুতোম তাঁর রচনার বানানগত সংস্কার বা লৈখিক সংস্কার সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে মুখোচ্চারিত ধ্বনি, শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গীকে প্রধান মূল্য দিয়েছেন।

শুধুমাত্র প্রচলিত শব্দ নয়,—হুতোমই সর্বপ্রথম Slang শব্দকে সাহিত্যের আসরে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি slang শব্দবন্ধকেও মূল্য দিয়েছেন। slang সম্পর্কে তথাকথিত রুচিগত সংস্কার বাংলাসাহিত্যে অতিবাস্তবতাময় প্রকাশের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে তুলতো—যদি হুতোম সমস্ত রুচিকে শিল্পের বাস্তবতার খাতিরে দূরে সরিয়ে না রাখতেন।

শেষকথা, বাংলা গদ্য যেসব ঋণকে অপরিহার্য বলে গ্রহণ করে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেগুলির মধ্যে হুতোমী ভাষার ঋণকে অস্বীকার করা বোধহয় বিদ্যাসাগরীয় ভাষার ঋণকে অস্বীকার করবারই সমপর্যায়ের। আলালী ভাষাকেও ততোখানি গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে না।

গৃহস্থের প্রেম

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

বিয়ে করে প্রেম অথবা প্রেম ক'রে বিয়ে—আমি দুইএর বাহির—ঊর্দ্ধে নই, নীচে। হবে না কেন? বাবা ইস্কুল মাষ্টার। শৈশবে বানান ভুল হলেই বলতেন "চরিত্র খারাপ হয়েছে।" চরিত্র কি বুঝবার আগেই খারাপ হওয়ার আতঙ্কে আড়ষ্ট। মা ভট্টচাজ পণ্ডিতের মেয়ে—সুরু থেকেই তাঁর শাসনে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ। কৈশোরে গুপ্ত সমিতির দাদাদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষানবিশি, কম্বলের তলায় ইট পেতে তার উপর গীতা রেখে তার উপর মস্তক রক্ষা ও শয়ন—নিমপাতা বিবপত্র ত আছেই। এ ছাড়া প্রেম আসবে কোথা থেকে? জানা অজানা মেয়ে দশ থেকে বার বৎসর বয়সেই পিত্রালয় থেকে স্থানান্তরিত ও রূপান্তরিত মন তাদের স্বামী ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে আবদ্ধ—গচ্ছিত হয় কিন্তু উঠান যায় না। এই ছিল আমাদের পরিবেশ। পথেঘাটে মেয়েরা বিরল। সিনেমাও তখন অনাস্বাদিত। যৌবনে কলেজ-জীবনে সহপাঠিনীদের ও রাজনীতি প্রাঙ্গণে সহকর্মিনীদের সান্নিধ্যে যে মাথা নাড়াচাড়া দেয়নি তা নয়, কিন্তু মায়ের আলা ও বাপের চোখ সব সময়েই ষ্টীয়ারিং ধরে। কাজেই প্রেম হল না, বিবাহের ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু পাঁচজনের মতই বাপমায়ের বাধ্য সন্তান হয়ে বিয়ে করলাম—একটি বালিকা—শিশু বললেও হয়। বধূ হয়ে আমার পাশে দাঁড়াল। নূতন অনুভূতি এল কিন্তু তা প্রেম নয়। ঘনিষ্ঠ নৈকট্যজনিত হৃদ্যতা—সে ত হবেই। একসঙ্গে বাস, সুখে দুঃখে গাঁটছড়া বাঁধা, চায়ের কাপ হাতে ক'রে এগিয়ে আসা—এসবের মধ্যে পুলক আছে, মৃদু শিহরণ আছে, অনন্ত তৃপ্তিও আছে, কিন্তু প্রেম কোথায়? ভালবাসা ত' অনেক রকমের—যে রকমটি হলে প্রেম বলা যায় তা কি হ'ল?—মনে হয় না। নূত করে শেলী, কীটস, বাইরন, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গ কালিদাস ইত্যাদির রোমাঞ্চ কাব্যগ্রন্থ পড়লাম—খো ছাদে আকাশের নীচে, মলয়ের পাশে চাঁদের আলে পড়লাম ও আওড়ালাম, আগের চেয়ে ভাবাবেশ হ' কিন্তু তার মধ্যে আমার বালিকা বধূকে পেলাম না, অব বয়সে আমাদের পার্থক্য বেশ উল্লেখযোগ্য। মনুর "ত্রিং বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং" এত না হলেও বেশ খানিকটা। তবু ত' ওয়ার্ডসওয়ার্থে লুসির মত, দান্তের বিয়েট্রীচের মত, অথবা ব্রাউনিং এভেলিন হোপের মত নিঃসঙ্গ ও ব্যবধানাশ্র মানসিকতার উদ্রেক করতে পারত। এসবের ধা কাছেও না। রান্নাঘর জুড়ে, খাবার ঘর ঘিরে, সা বাড়ীর আবহাওয়ায় দৃশ্যে-অদৃশ্যে ছড়িয়ে আছে, কি মনের কুঞ্জে সে কি বিহঙ্গিনীর ডালে?

৩

মাবাপের অনেক সন্তান ফাঁকি দিয়ে আগেই চ গিয়েছে—আমি একক ব্যতিক্রম। তাঁদের মনোব পূর্ণ করে ঠাকুরের দয়ায় তাঁদের পুত্রবধূ যৌবনের সীমা পৌঁছাইবার আগেই সন্তানের জননী হলেন। এখনক দিন হলে আমি একঘরে হতাম। তখনকার মেয়েদে সন্তানের স্বাদ অল্পে মিটত না। তাই কিছুদিনের ম আমি কয়েক সন্তানের পিতা। প্রেম যদি সৃষ্টির কা হয় তা হলে আমরা নিশ্চয়ই প্রেমিক, জন্মনিয়ন্ত্রণ করেও দারিদ্র্য বাড়ে নি। আমরা অদৃষ্টবাদী। প্র সন্তান তাঁর নিজের ভাগ্য নিয়ে এসেছে এবং তা ভাগ্যে আমাদের ভাগ্যোন্নতি। এই বিশ্বাস অন্ধ হ বদ্ধমূল। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে দাম্পত্যজীবন স

সরল মধ্যপথে চলেছে। আমার স্ত্রী সহকারী, গৃহিনী—মায়ের মৃত্যুর পরে ষোল আনা গৃহিনী। পিতার দেহান্তে এখন আবার ব্রাহ্মণীর পর্য্যায়ে। ছেলেমেয়েরা পাঁচফুলে সাজি। তাদের লেখাপড়া বিবাহব্যবস্থা ইত্যাদিতে কেটে যাচ্ছে। দাম্পত্যজীবন আসক্তি-অন্ধকার প্রাচীরে আবদ্ধ। উদ্দাম, উন্মাদিনী, বিহ্বল, বিভ্রান্তকারী, উদ্বেল প্রেম আমাদের হৃদয়-বাগিচায় প্রস্ফুটিত হয় নি। বাহির জীবনে যে সব মনোরম নারীর সংস্পর্শে এসেছি তাদের সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ মনে যখন যে রেখাপাত করেছে বিনা কুণ্ঠায় তা স্ত্রীকে জানিয়েছি। ওপক্ষে কোন বিকার দেখিনি। বোধ হয় আমার স্ত্রীর বিশ্বাস আমি প্রেম করতে অপারগ। আকাশে সূর্য্যাস্তের শোভা, মেঘের ঘনঘটার অপরূপ রূপ, প্রত্যুষে ও প্রদোষে কুসুমের সুষমা ও সৌরভ, কাকলীর কলতান, ঝর্ণার প্রাণাবেগ—এসব ত দূর থেকেই ভোগ করা যায়। রমণীর সৌন্দর্য্যও আমার কাছে তাই—সেই জন্যই কোন সঙ্কোচ ছিল না। এই সব নিয়ে এখন পরিণত বয়সে কিছু কিছু গল্প ও কবিতা লিখছি। ভালই লাগছে। বিবাহবদ্ধ জীবনের অনুরাগের পাশে পাশে ক্রোধকলহও আত্মপ্রকাশ করে। সময়ে সময়ে মনে হয় আমরা যেন রাগে প্রধান হয়ে পড়েছি। বাড়াবাড়ি এমন কিছু নয়। একজন চড়ায় উঠলে অন্যজন খাদে, লোক দেখলে দুজনেই থেমে যাই।

পর্দা নেমে এল। ব্রাহ্মণী একঘর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি ঘেরা অবস্থায় অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলছেন। অপলক শেষ চাহনি আমার দিকে। বার বৎসরের বালিকার শুভদৃষ্টির চোখ আবার দেখতে পেলাম—কৌতূহলী ও নির্বিচার সমর্পণ জড়িত। ইশারায় কথা "আবার দেখা হবে"।

৫

নিবিড়ভাবে সৌন্দর্য্যের উপাসনার একান্ত ও ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছি। কলমে আর কিছু ফুটে না। রমণীর কমনীয়তা আর চোখে ধরে না। সাহিত্যিক বন্ধুকে বিপন্ন হয়ে শুধালাম "এ আমার হল কি?" তাঁর মন্তব্য "ফুলের সৌন্দর্য্য দর্শকের মগজে; তোর মগজ হারিয়েছে।" আমার মনে হয় ঠিক তা নয়।

—যেন ঝাপসা দেখছি।

৬

দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে প্রেমপত্র লেখার সুযোগ হয়নি। কারণ ছাড়াছাড়ি ছিলনা। তা ছাড়া শ্বশুর-বাড়ী এপাড়া ওপাড়া। জেলে থাকা অবস্থায় সঙ্কোচে পারিনি—এদিকে পুলিশের, ওদিকে ছেলেমেয়েদের সেন্সরের ভয়ে!

এইবার একটা পত্র লিখেছি,

"চায়ের জল চাপাও, আসছি" পিওনের অপেক্ষায় আছি, হাতে হাতেই দিব।

গঙ্গার সুর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ঘুম যেতে চাই তোমার কোলে আজ মা, দিনের শেষে,
সুরধুনী, ঘুমপাড়ানি তোমার সুরের রেশে।
কত ডাকেই দিইছি সাড়া,
জাগিয়ে চমক, মাতিয়ে পাড়া,
তাই গিয়েছ তুমি ফিরে আমার কাছে এসে :
আজ মা আবার ডাকলে তোমার কোলে দিনের শেষে ॥

কত কিছুই চাই, দেখি মা, যেমনি পরে পাই—
চাইনি সে-সব, মায়ার ফেরেই ভেবেছিলাম—চাই।
ছায়া কায়ার মুখোস প'রে
মন ভোলায় মা, কেমন ক'রে!
কত ছলেই হাতছানি দেয় তারা মোহন বেশে—
দেখিয়ে দিতে ডাকলে তোমার কোলে দিনের শেষে ॥

যেমনি তোমার উদাস গানে উঠ্‌ল প্রাণ আজ দুলে,
ত'নে তোমার পড়ল আমার চোখের ঠুলি খুলে।
দেখতে পেলাম—মিথ্যে খেলায়
ভুলে ছিলাম আমি তোমায়,
টানলে কোলে সন্ধ্যাবেলায় তাই মা ভালবেসে—
কান্তিময়ী, শান্তি অপার বিছিয়ে আলো হেসে ॥

———

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গের নূতন অকংগ্রেসী সরকারের 'শ্রম-নীতি'

বাঙলার নূতন সরকারের নব-শ্রমনীতি ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। নূতন সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এ রাজ্যের শ্রমিক মহলে এক বিচিত্র 'নব-চেতনা' তথা 'দাবী-আদায়' পদ্ধতির সূচনা হইয়াছে, যাহার ফলে অনেকের মনে হইতেছে সরকার মালিক এবং শ্রমিকদের প্রতি অপক্ষপাতমূলক ব্যবহার করিতেছেন না। মনে এ কথাই জাগিতেছে যে সরকার বাহাদুর শ্রমিকদের প্রতি করুণার প্রাবল্যে তাহাদের হাঁস মারিয়া ডিম খাওয়াইবার আয়োজনই করিতেছেন। এ কথায় ইহা যেন কেহ মনে করিবেন না যে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী এবং অভিযোগ নাই। ইহাও সত্য যে শ্রমিকদের প্রতি সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সদয় এবং ন্যায্য ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে—এমন বহু দেশী-বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানা আছে যেখানে নিয়োগকর্ত্তারা সাধ্যমত শ্রমিকদের দিকটাও দেখিয়া থাকেন এবং তাহাদের আর্থিক তথা অন্যান্য দাবী পূরণের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যেখানে শ্রমিকদের একান্ত ন্যায্য তথা অন্যান্য সুখ সুবিধার দাবী নিয়োগকর্ত্তা স্বীকার করেন না বা করিবেন না, সেই ক্ষেত্রে দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিক অবশ্যই বিবিধ পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। ধর্ম্মঘট বা ষ্ট্রাইক করা শ্রমিকদের আইনত স্বীকৃত অধিকার কিন্তু এই ধর্ম্মঘট (এবং মালিক পক্ষের দিক হইতে লক্-আউট) ঘোষণা করিতে হইলে —কতকগুলি বিধিবদ্ধ বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হয়। যথারীতি নোটিশ দিয়া ধর্ম্মঘট এবং লক্-আ[illegible]আউট করা বেআইনী নহে।

নূতন সরকারের শাসনভার গ্রহণের সঙ্গে স[illegible] 'ঘেরাও' নামক বিচিত্র বস্তুটির প্রয়োগবাহুল্য দে[illegible] যাইতেছে। সামান্য কারণেই—কলকারখানা, আপি[illegible] এবং বিবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে—ম্যানেজার তথা অন্যা[illegible] উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ প্রায় "ঘেরিত" হইতেছেন দে[illegible] যাইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই "ঘেরাও" যে[illegible] কয়েকদিন ধরিয়াই শ্রমিকদের চালাইতে দেখা গিয়া[illegible] —এমনও হইয়াছে যে শ্রমিকদ্বারা "ঘেরিত" কর্ম্মচারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনাহারে, এমন কি পানের জল বিনা অসহায় অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। এদিকে পুলিশ, শ্রমিক মালিক সংঘাতে সরকারের হুকুম ছা[illegible] আর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না—এই হইয়াছে নূত[illegible] সরকারী বিধান! আমাদের নবীন শ্রম মন্ত্রীর মে[illegible] "ঘেরাও" বস্তুটি সবটা এবং সর্ব্বত্র নাকি বেআই[illegible] নহে। আমরা জানি না—"ঘেরাও" কোন্ সীমা পর্য্য[illegible] আইনী এবং তাহার পর বে আইনী হইবে, এবং কে ব[illegible] কাহারা ইহার বিচার করিবে। অথচ সুপ্রীম কোর্টে বিচারে এবং রায়ে—"ঘেরাও" এবং 'অবস্থান ধর্ম্মঘ[illegible] —স্পষ্টভাবে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। যাহ[illegible] হউক, এ-বিষয় চুলচেরা বিচার করিবেন আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষজ্ঞ নূতন শ্রমমন্ত্রী তথা নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের বক্তব্য এই যে—

১। মালিকপক্ষের যেমন শ্রমিক ঠেঙ্গাইবার এব[illegible] শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদে[illegible]

নিপীড়ন করিবার কোন অধিকার নাই ঠিক তেমনি শ্রমিকদেরও কোন অধিকার থাকিতে পারে না—মালিক তথা মালিক পক্ষের কর্মচারীদের, সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে, 'ঘেরাও' অথবা মারধোর করিবার, যাহা গত কিছু দিন হইতে প্রায় এপিডেমিক আকারে শিল্প জগতে দেখা যাইতেছে।

২। দেশের করদাতাদের টাকায় পুলিস বাহিনী প্রতিপালিত হয়—কাজেই প্রয়োজন বোধ করিলে শান্তি তথা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে সকল করদাতা তথা নাগরিক পুলিসের সাহায্য অবশ্যই পাইতে পারে এবং এ বিষয়ে শ্রমিক মালিকের মধ্যে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা কোন সরকারই করিতে পারেন না। একদল লোক—কয়েকজন মানুষকে বিশেষ স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্দী করিয়া রাখিবে, অথচ বন্দীরা সরকারী পুলিসের কোন প্রকার সহায়তা পাইবে না—ইহা এক বিচিত্র জুলুম বলিয়া যে-কোন সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত মানুষ ভাবিতে পারেন।

যাঁহারা 'নব-গণতন্ত্র' প্রচারে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগে এত উৎসাহ দেখাইতেছেন, পৃথিবীর কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইবে, বলিতে পারিবেন কি? এমন কি সোভিয়েট দেশেও শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং "ঘেরাও" করিবার অধিকার এক মিনিটের জন্যও কর্তৃপক্ষ সহ্য করিবেন বা করেন কি?

এই "ঘেরাও" এবং মালিক ঠেঙান নীতির পরিণতি বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী মালিকদের বহু কল-কারখানা এবং অন্যান্য বহুবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে – এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার বাঙ্গালী এবং অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিক নিযুক্ত আছে (অবশ্য উচ্চ পদগুলিতে সাধারণত বাঙ্গালীর সংখ্যা নাম মাত্র)।

যে রকম শুনা যাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, বহু মালিক পশ্চিমবঙ্গে আর ব্যবসা চালাইতে বিশেষ উৎসাহবোধ করিতেছেন না। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ হইতে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র অন্যত্র সরাইয়া লইবার কথাও বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। এ-রাজ্যে ব্যবসায় প্রসারিত করা ত প্রায় সকলেই এক প্রকার বন্ধ করিয়াছেন। বাস্তবে ইহা ঘটিলে, তাহার ফল এ রাজ্যের পক্ষে কি বিষময় হইবে—আমাদের নূতন সরকার তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখিতে হইলে—শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি এমন সরকারী নীতি থাকা প্রয়োজন যাহাতে এক পক্ষ না মনে করিতে পারে যে তাহাদের প্রতি অবিচার বা অন্যায় করা হইতেছে। এ বিষয়ে এক-তরফা দৃষ্টিভঙ্গি পরম অশান্তির কারণ হইতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা কি?

বিবিধ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে এখন মনে করিবার কারণ রহিয়াছে যাহাতে শিল্প-মালিক অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্তারা ভাবিতেছেন রাজ্য সরকার তাঁহাদের প্রতি বাক্যে সমবেদনাশীল হইলেও বাস্তবে—শ্রমিকদের প্রতি একটা অতিরিক্ত এবং অবাস্তব পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন। এ বিষয় প্রয়োজন হইলে কিছু কিছু দৃষ্টান্তও হয়ত দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রমিক মহলের সকল প্রকার দাবিকেই আমরা অযথা অসম্ভব মনে করি না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—বহুক্ষেত্রে দাবিগুলি বাস্তবের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখিয়াই করা হইয়া থাকে। বিবিধ শিল্পে, কলকারখানায় যাঁহারা অর্থ বিনিয়োগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় কিছু লাভের আশা রাখিয়াই ইহা করেন। শিল্পে দশটাকা ঢালিয়া মালিক এটুকু আশা অবশ্যই করিতে পারেন যে তাঁহার লাভের পরিমাণ অন্তত ১।২, টাকা হইবে। শ্রমিকদের দাবি মিটাইয়া দিয়া মালিক যদি শেষ হিসাবে লাভের অঙ্ক শূন্য দেখিতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে মালিক কারবার বন্ধ কিংবা অন্য কোন প্রশস্ততর ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইবেন এবং এই ব্যক্তি, কিংবা সমষ্টিগত স্বাধীনতার

বাধা দিবার কোন অধিকার কাহারো থাকিতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানেও বোধ হয় এমন কোন অধিকারের কথার উল্লেখ কোন ধারাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

বিশেষজ্ঞ মহলে শ্রমিক এবং শ্রমদাতার অধিকার-অনধিকার বিষয়ে আলোচনা হইতেছে এবং আমরা আশা করি এই বিষম সমস্যা—যাহার উপর পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নতি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভর করিতেছে, ঘেরাও লক-আউটের কারণে উপরি উক্ত ঐ দুইটি বস্তুই যেন 'ঘেরাও' এবং 'লক-আউট' হইয়া এ-রাজ্যের শিল্পের উন্নতির সহিত অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে বিপদজনক না হইয়া পড়ে।

শ্রমিক মালিক শান্তিরক্ষার জন্য সাময়িক চুক্তি একটা হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল রোগের উপশম করিতে হইলে—টোটকা ঔষধে স্থায়ী ফললাভ হইবে কি? দেশের কোন বিশেষ শ্রেণী যেন মনে না করেন যে রাজ্য সরকার একান্ত ভাবে তাঁহাদেরই সর্ব্বস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই স্থাপিত হইয়াছে এবং অন্যান্য শ্রেণী বা পক্ষদের পক্ষে এ সরকারের নিকট হইতে আশা করিবার কিছুই নাই। দেশের কোন বিশেষ শ্রেণী যেন তাঁহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া মনে না করেন। "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"—কাহারো বা কোন শ্রেণীর বিশেষ অধিকার ভুক্ত যেন না হয়। এবিষয় সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করি।

মোটের উপর কোন পক্ষেরই জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বর্ত্তমানে অচল। রাজ্য সরকার শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত করিবার সাধুপ্রয়াস করিতেছেন এবং আমরা মনে করি উভয় পক্ষের সদ্ ইচ্ছা থাকিলে শিল্পক্ষেত্রে শান্তি স্থাপিত হইবেই।

অবহেলিত কলিকাতা

প্রাসাদনগরী কলিকাতার বর্ত্তমান হাজারো প্রকার বিষম এবং দুর্বিসহ সমস্যাবলীর প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় করুণাময় কর্ত্তাদের দৃষ্টি বহুবার বহুভাবে আকৃষ্ট করা হইলেও এখন পর্য্যন্ত তাহাতে কোন প্রকার ফলোদয় ত হয়ই নাই অথচ এদিকে দিনের পর দিন এই নগরীর অবস্থা ক্রমশ আরো সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য স্বীকার করিব, কলিকাতা লইয়া পরিকল্পনা বহু হইয়াছে, কিন্তু সবই 'কাগজী'—তাহার বাস্তব রূপায়ণের কোন কার্য্যকর প্রয়াস কোন মহল হইতেই এখন পর্য্যন্ত হয় নাই—কবে যে হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। আমাদের পরিকল্পনা-বিশারদ, নেহরু-আবিষ্কৃত মহাপণ্ডিত শ্রীঅশোক মেঠা কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে প্রথম হইতেই যে প্রকার সদয় এবং অতি-উদার মনোভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে এমন ভাবা অন্যায় হইবে না যে—এই মহাশয় ব্যক্তিটি যতদিন পর্য্যন্ত না পরিকল্পনা মহামন্ত্রীর পদ হইতে বিতাড়িত হইবেন ততদিন পর্য্যন্ত কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ, কেন্দ্র হইতে কোন প্রকার আর্থিক উদারতা আশা করিতে পারে না। মহারাজ নবাশোকের ব্যবহার এবং ভাব-গতি দেখিয়া মনে হয়—কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে-অর্থ কেন্দ্র বা পরিকল্পনা মণ্ডক বরাদ্দ করিবে, তাহা যেন মহারাজ নবাশোকের খাস জমিদারী হইতে দেওয়া হইবে! পত্রিকান্তরে বলা হইয়াছে—

> চতুর্থ পরিকল্পনাকালের জন্য নিরানব্বই কোটি টাকার যে উন্নয়ন-কর্মসূচী রচিত হইয়াছিল, যোজনা-কমিশন সে-ব্যাপারে মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে রাজী হইয়াছেন। দ্বিতীয় হাওড়া ব্রীজ প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করিলেও এই বাবদে পুরা টাকাটা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পাওয়া যাইবে না। মহানগরীর পরিবহনব্যবস্থা এমনিই শোচনীয়। শহরতলির রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হওয়ায় কলিকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই যাত্রীদের ট্রেনে করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে চক্রবেড় রেল স্থাপনের প্রস্তাব এখনো যোজনা কমিশনের বিশেষ কমিটির বিবেচনাধীন। মহা-নগরের অধিবাসী ও শহরতলির যাত্রীরা শহরের

মধ্যে যে ভাবে চলাফেরা করেন, কোন উন্নত দেশ দূরের কথা, অনুন্নত দেশের অধিবাসীরাও তাহা কল্পনা করিতে পারে না। মহানগরীর যাত্রীদের তুলনায় রাস্তার সংখ্যা খুবই কম এবং সঙ্কীর্ণ। ফলে যানবাহনের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য সকালে বিকালে অনেকগুলি রাস্তায় ট্রাফিক জামের সৃষ্টি হওয়ায় যাত্রীরা ঠিক সময়ে গন্তব্য-স্থলে পৌঁছাইতে পারেন না। অনেকগুলি সেতু নির্মাণ করিয়া গঙ্গার দুই পারের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত করিতে পারিলে মহানগরীর রাস্তাঘাটের উপর চাপ অনেক হ্রাস পাইবে। কিন্তু একটি সেতু নির্মাণের ব্যাপারেই যেখানে টাকা জুটিতেছে না সেখানে আরও দুই-তিনটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব করিতেও অনেকে সাহস পান না।

মহানগরীর অধিবাসীদের অবস্থাও কম শোচনীয় নয়। শহরের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। একটি পরিবারের বদলে দুই-তিনটি নূতন পরিবার সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সেই তুলনায় নূতন বাড়ি তৈয়ারি হইতেছে না। পানীয় জলের অবস্থাও শোচনীয়। কলিকাতা শহরে তবু যেটুকু পানীয় জল পাওয়া যায় শহরতলির বেশীর ভাগ পৌরসভায় তাহার সিকিও মিলে না। এই পানীয় জলের জন্যই বৃহত্তর কলিকাতায় কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ প্রতি বৎসরই মহামারী আকারে দেখা দিয়া থাকে। বৃহত্তর কলিকাতার অন্যান্য পৌরসভা দূরের কথা কলিকাতা মহানগরীতেও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী সর্বত্র নাই। জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য খোলা ড্রেন ও খাটা পায়খানাগুলিকে শহর এলাকা হইতে বিদায় দেওয়া দরকার। কলিকাতা শহরের রাস্তায় আবর্জনা দেখিয়া যাঁহারা ইহাকে 'জাতীয় অসম্মান' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, মহানগরীর অধিবাসীরা তাঁহাদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন। রাস্তা বা বাড়ির পাশের স্তূপীকৃত আবর্জনায় যদি আমরা লজ্জিত বোধ না করি, তাহা হইলে মহানগরীর জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নের সম্ভাবনা একেবারেই অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় ব্যবস্থাও উল্লেখ করা দরকার। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা কলিকাতার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তৎপর না হইলে মহানগরীর বর্তমান গুরুত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইবে না।—

কিন্তু তাহাতে কেন্দ্রীয় কর্তা এবং মহারাজ নবাশোকের কি আসিয়া যাইবে? দিল্লীর দরবারের জৌলুষ এবং সেই সঙ্গে গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যগুলির শ্রী এবং সম্পদ ক্রমশ এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেই—ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে! তবে একথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে ভারতের সামগ্রিক শ্রী এবং আর্থিক কল্যাণ সাধনের কারণে পশ্চিমবঙ্গকে—ক্রমশ ধান চাষের জমি আরো কমাইয়া পাট (এবং চা) চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনে ভাটা পড়িয়া দিল্লীর বর্তমান বাদশাদের নবাবী চালচলন, বিদেশ ভ্রমণ (যে-কোন একটা ছুতায়) —প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় রাজ-এবং দেশকল্যাণকর বিবিধ ক্রিয়া কর্মে বাধার সৃষ্টি হইবে!

কেন্দ্রের এই সকল বিষম রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্ম্মের প্রবাহ রোধ করিয়া—কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অতি-প্রয়োজনীয় এবং রাজ্যের মরণ-বাঁচন সমস্যাবলীর সমাধানে গুরুত্ব এ রাজ্যের অধিবাসী—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কেহই স্বীকার করিবে না।

কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিতে হইলে কেন্দ্রের নিকট দয়া ভিক্ষা না করিয়া আজ জবরদস্ত উপায় অবশ্যই গ্রহণ করিতেই হইবে।

ভারতের বৈষয়িক নীতির বিষয় নব চিন্তা

পরম আশার কথা, বিলম্বে হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ কেবল আবিষ্কারই নহে, স্বীকারও করিয়াছেন যে দেশের বৈষয়িক নীতির তথা উন্নতি বর্ত্তমানে নাকি

অতি প্রয়োজন হইয়াছে। কি ভাবে ইহা সিদ্ধ করা যায়, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়গুলির সঙ্গে নাকি আলোচনাও করিয়াছেন। দুই ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার ফল জানা যায় নাই, তবে এইটুকু জানা যায় যে মন্ত্রীমহোদয়গণ এই জরুরী বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। আর একটি কথা শুনা যাইতেছে যে—নূতন বৈষয়িক নীতির প্রধান লক্ষ্য হইবে অবিলম্বে সর্ব্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যাহার ফলে চাহিদা ও যোগানের বৈষম্য দূর হইয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেও ভারতীয় পণ্যের রপ্তানিও বাড়িয়া যাইবে!

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে আমাদের পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হইলেও গত যোল বৎসরে আমরা এদিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারি নাই এবং এ কথাও এখন অবশ্যই বলা চলে, যে—আমাদের অবাস্তব পরিকল্পনা এবং তাহার শোচনীয় ব্যর্থতাই—আজ দেশের সকল অনিষ্টের, বিশেষ করিয়া আর্থিক বিষয়ে—মূল কারণ। বর্ত্তমানে যদি স্থির হইয়া থাকে যে যেমন করিয়াই হউক দেশে বৈষয়িক উন্নতি, তথা সর্ব্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, তবে সর্ব্ব প্রথমেই দিল্লীর—নবাশোক মহারাজের যোজনা ভবনের সকল জঞ্জাল হাটাইয়া সাফ করিতে হইবে। যোজনা ভবন তথা পরিকল্পনা কমিশনের সহিত বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর স্বার্থ সর্ব্বভাবে জড়িত বলিয়া আজ এত কথা বলিতে হইতেছে।

যোজনা ভবনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিষম জঞ্জাল এই ভবনের প্রায় স্বাধীন-নৃপতি শ্রীঅশোক মেটা। কাজেই এই জঞ্জালটিকে বিতাড়িত করিয়া যোজনা ভবন হইতে অন্তত ৫০০ শত কিলোমিটার দূরে রাখিতে হইবে।

অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজি দেশাইও বলিয়াছেন, তাঁহার আসন্ন বাজেট উৎপাদনভিত্তিক হইবে—উৎপাদনে উৎসাহপ্রদানের আয়োজনই তিনি করিতে চান। কিন্তু করের বোঝা যাহা ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা হাল্কা না করিয়া কি উৎপাদন-উদ্যোগের প্রসার ঘটানো যাইবে? ট্যাক্স না কমিলে সঞ্চয় বাড়িবে না, আর সঞ্চয় না বাড়িলে উৎপাদনে লগ্নী টাকা বৃদ্ধি পাইবে না। সে ক্ষেত্রে উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান শুধু একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়াইবে—সে কথা কোনও শিল্পকারই কানে তুলিবে না। বিনা মূলধনে শিল্পায়ন হয় না।

এতকাল 'ভারী' শিল্পের দিকেই পরিকল্পনা-পর্ষৎ ঝুঁকিয়াছেন। তাহাতে ঝামেলাও বেশী, ঝুঁকিও বেশী, আবার বৈদেশিক সহায়তার প্রয়োজনও বেশী। ইস্পাত যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎশক্তি ছাড়া বৈষয়িক উন্নয়ন অসম্ভব, এ কথা ঠিকই। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিলে চলে না। মোটা ভাত-কাপড় না জুটিলে খালি পেটে লোকে আর কতদিন অনাগত কালের জন্য প্রাসাদপুরী নির্মাণে মন দিতে পারে? নগদ বিদায় কিছুটা অন্তত চাই। দরিদ্র দেশের অধিবাসী যদি যোল বৎসর প্ল্যানিংয়ের পরও বুভুক্ষু থাকে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রও যদি সে না পায় তাহা হইলে সার্থকতা কোথায়? উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থ শুধু খাদ্যশস্যের ফলন বাড়ান নয়। কাপড় ও চিনির মত নিত্য-প্রয়োজনীয় শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনও বাড়াইতে হইবে। নহিলে স্বল্পবিত্ত-মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণা কোনও মতে লাঘব হইবে না।

উৎপাদন বাড়াও বলিলেই বাড়ে না। তাহার জন্য আনুসঙ্গিক সব কিছু আগে যোগাইতে হইবে, তবে উৎপাদন বাড়িবে। সবার আগে তাই দরকার অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়া কারখানাগুলিকে সুসজ্জিত করা। শিল্পপতিদের সে ব্যাপারে তৎপর হইতে হইবে। আর দরকার শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি। কী ধনতান্ত্রিক কী সমাজতান্ত্রিক কোনও দেশই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে

নাই অপটু অশিক্ষিত বা অলস কর্মীদের উপর নির্ভর করিয়া। আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন কারখানায় বসাইতে হইবে তেমনই সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ কর্মিমণ্ডলীও গড়িয়া তুলিতে হইবে। নহিলে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা নথিপত্রেই থাকিয়া যাইবে, বাস্তবে কোনও দিনই সে পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিবে না। তত্ত্বকথা দিয়া আসর জমানো যায়, কিন্তু না যায় মাঠে ফসল ফলানো, না যায় কলকারখানায় পণ্য উৎপাদন—এই সহজ তত্ত্বটা আমাদের নীতিনিয়ামকেরা যেন ভুলিয়া না যান।

অশোক মেঠার কাছে, এ-কথা হয়ত মূল্যহীন, কারণ স্বর্গত নেহরুর অতি স্নেহে লালিত আমাদের এই যোজনা বিশারদ অতি পণ্ডিত ব্যক্তিটির বোলচালে মনে হয় পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁহার কথা, মতামত এবং নির্দেশই চরম। ইহার উপর অন্য কাহারও কোন কথা বা মন্তব্য চলিবে না। মনে হয় গরীব প্রজারাও অশোক মহারাজার খাস প্রজা মাত্র এবং তাহাদের একমাত্র কর্তব্য অশোক পরিকল্পিত আসমানি পরিকল্পনার দায় মিটাইবার জন্য বিনা প্রতিবাদে চাহিদা মত কর অর্থাৎ অর্থ দান করা, পেটে না খাইয়াও।

(বি)হোল্ড দি প্রাইস লাইন !

অবশেষে আবার কাপড়ের দামও বৃদ্ধি করিতে হইল এবং ইহা নাকি মিল মালিকদের বস্ত্র উৎপাদনের লোকসানের মাত্রা কমাইবার জন্যই সরকার বাহাদুর করিতে বাধ্য হইলেন (মিল মালিকদের লাভের মাত্রা বজায় রাখিবার জন্যই যে বস্ত্র মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, এই কথাটা স্বীকার করিতে সরকারের বোধহয় লজ্জা হইতেছিল !)। কাপড়ের দাম শতকরা ৪·৫ বৃদ্ধি করা হইল এমন এক সময়ে—

যখন নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল জিনিষের দরই বাড়িতেছে। এ রাজ্যে তরি-তরকারি হইতে শুরু করিয়া মসলা, ডাল, মাছ ও সরিষার তেল সমস্ত সামগ্রীর দামই ক্রমাগত ঊর্ধমুখী। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত তাহার উপর চাপিতেছে সাধারণের ব্যবহার্য্য মোটা কাপড়ের বাড়তি দর। ব্যাপারটা যে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্যের ফলে ঘটিয়াছে এ তত্ত্ব শুনিয়া ক্রেতার দল কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইবে না, তাহাদের যন্ত্রণার উপশমও বিন্দুমাত্র হইবে না। তাহাদের ব্যাকুল প্রশ্ন হইতেছে, উৎপাদনের ঘাটতি পুরণ কেন সম্ভব হইতেছে না ? চেষ্টা করিলে কি কাপড়ের যোগান ও চাহিদার মধ্যে একটা সমতাবিধান করা যায় না ? যদি যায় (যাওয়ারই কথা) তবে এতদিন সে-চেষ্টা হয় নাই কেন ? সবই যদি আমাদের অদৃষ্টের ফেরে হয় তাহা হইলে এমন প্ল্যানিং-এর এত আড়ম্বরে কী লাভ ?

এবার দেশের সর্ব্বত্র মিলের ধুতি ও শাড়ি ক্রেতাদের আরও বেশী দাম দিয়া কিনিতে হইবে। যে সমস্ত সুতীবস্ত্রের দাম সরকার বাঁধিয়া দিয়াছেন সেগুলি সবই মোটা কাপড়। আমাদের মত গরিব ও মধ্যবিত্ত লোকেরাই সেগুলি কেনে। কাজেই দাম বাড়ার অর্থ আমাদের মত গরিব ও মধ্যবিত্তের দুর্ভোগবৃদ্ধি। একেই আমাদের ডাহিনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না। তাহার উপর কাপড়ের দাম বাড়ার ফলে আয়-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটা আরও বাড়িবে, দিন চালানোই লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

কাপড়ের দাম এবারে বাড়ানো হইতেছে মিলগুলির লোকসান কমাইবার নিমিত্ত। নানা কারণে কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় চড়া—কাজেই দাম না বাড়াইলে কাপড়ের কলের পোষাইবে না এবং না পোষাইলে উৎপাদনের স্রোতে ভাঁটা পড়িবে ফলে আজ হউক কাল হউক কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যাহাতে সেই চরম বিপর্যয় না ঘটে তাহার জন্যই কাপড়ের দাম বাড়াইতে হইতেছে—তবে যতটা মিল-মালিকেরা চাহিয়াছিলেন ততটা নয়। সুতীবস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ইহাই কৈফিয়ৎ। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অনেক গড়িমসি

করিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়াই তাঁহারা নাকি মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন!

মিলের উৎপাদন-ব্যয় যে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে সে কথা হয়ত ঠিক। কিন্তু তাহার জন্য দায়ী কে? আমাদের দেশে এ রোগও নূতন নয়, তাহার কারণও নূতন নয়। বস্তুত সাম্প্রতিক সকল বৈষয়িক ব্যাধির মূলে আছে একটি মাত্র হেতু। সেটি হইতেছে পরিকল্পনায় বিষম গলদ। কাপড়ের মিলগুলি মুশকিলে পড়িয়াছে তুলার অভাবে; কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন যন্ত্রপাতিও উৎপাদন-সঙ্কটের কারণ। এমনটা হইত না যদি মিলগুলির প্রয়োজন হিসাব করিয়া বিদেশ হইতে তুলা আমদানি করা হইত। যে উদ্যোগ হইতেছে আজ, সেটা যদি সময়ে করা হইত তাহা হইলে কোনও ঝঞ্ঝাট দেখা দিত না। যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ সম্পর্কেও ওই একই ঔদাসীন্য। কাপড় যখন আমরা বিদেশে রপ্তানি করি তখন কাপড়ের কারখানাগুলিকে দ্রুত আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করা উচিত ছিল। করিলে উৎপাদনও বাড়িত, উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পাইত। কাপড়ের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল। সে বাজারে মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি লইয়া আমরা সুবিধা করিতে পারিব কেমন করিয়া?

যে সমস্ত সুতী কাপড়ের দর বাড়ানো হইয়াছে সেগুলি কেনে যাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তাহাদের উপর হইতে মূল্যবৃদ্ধির চাপ যত হালকা করিয়া দেওয়া যায় ততই ভাল। সে কাজটা কি মিল-মালিকদের লোকসান পোষাইয়াও করা যাইত না? কাপড়ের উপর উৎপাদন-শুল্ক আছে চড়া হারে। সে শুল্ক কিঞ্চিৎ কমাইলেই তো দুই কুলই বজায় থাকিত—মিলেরা লোকসানের হাত হইতে রক্ষা পাইত এবং ক্রেতা-দেরও বেশী দাম দিতে হইত না। পাকাপাকি ভাবে বাজেট এখনও পাস হয় নাই। আর কটা দিন অপেক্ষা করিলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হইত? নিজের প্রাপ্য এক প⋅সাও সরকার ছাড়িতে চাহেন না!—অতএব জনসাধারণের (ক্রেতা)—মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গাই সরকারী বুদ্ধিতে বোধ হয় একমাত্র সহজ সম্ভব উপায়। করভার নিপীড়িত নিরীহ মানুষও শেষ পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত কম নাই, মনে রাখা দরকার।

জন-আদালতে বিচার চাই

আজ দেশের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যের বর্ত্তমান বিষম আর্থিক এবং প্রাণঘাতী সঙ্কটের মূল কারণ—পরম অযোগ্য কিন্তু নেহরু স্নেহধন্য অশোক মেহ্‌তার পদদ্ভোচিত, কিংবা তাহার অপেক্ষাও হীন মস্তিষ্কের রচিত ভুল পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং।

কোন চাবাক প্ল্যানিং কমিশনের উপর ভর করিয়াছেন জানি না, কিন্তু যোজনা ভবন ধার করিয়া ঘি খাইবার বিধান মানিয়া লইয়াছেন বলিয়াই এত অনর্থ। মুদ্রাস্ফীতির নিদারুণ চাপে কে কে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িত না, যদি পরিকল্পনার নামে এত আড়ম্বর ও ব্যয়বাহুল্য না ঘটিত! রাজ্য সরকারদের দোষ নাই, যোজনা-ভবনের সম্মতিক্রমে যে উন্নয়ন-প্রকল্পে তাঁহারা হাত দিয়াছেন সেগুলি মাঝপথে বন্ধ হইয়া গেলে বেকারি অসম্ভব বাড়িয়া যাইবে, রাজ্য জুড়িয়া দেখা দিবে অশান্তি, তাহার ফল ভুগিবে কে? শ্রীদেশাই অবশ্য রাজ্যগুলিকে খরচের ব্যাপারে সংযত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহ্‌তা সে পথ দিয়াও যান নাই। তিনি এখনও একটা সমৃদ্ধির তাজমহল নির্মাণের স্বপ্নে মশগুল হইয়া আছেন। কিন্তু তিনি বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছেন তাজমহলের সৌন্দর্য্য যতই অপূর্ব হউক না কেন, আসলে সেটি একটি কবর মাত্র। পরিকল্পনার নবরূপায়ণ অচিরে যদি না হয় তবে একটা বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠুক আর নাই উঠুক দেশসুদ্ধ লোকের কবর নিঃসন্দেহে রচিত হইবে।

'রচিত হইবে' বলিলে এখন ভুল হইবে। কারণ হাজার হাজার কোটি ধার করা টাকায় পরিকল্পনা'দর

অশোক মেঠা যে বিরাট এবং দেশব্যাপী কবর খুঁড়িয়াছেন, তাহাতেই দেশবাসীর কবর শয়নের স্থান সঙ্কুলান হইবে। অশোক মেঠা গত ১০।১৫ বৎসরে যে হাজার হাজার কোটি টাকার (ধার করা) ঘি ভস্মে ঢালিয়াছেন, তাহার একটা পূর্ণ হিসাব চাহিলে দোষ কি? পরিকল্পনার নামে যে বিষম নবাবী চালে আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রী এতদিন চলিয়াছেন এবং যাহার ফলে দেশকে এবং দেশের মানুষকে জীবন্ত কবর দিবার সুব্যবস্থাও করিয়াছেন, তাহার জন্য কি অশোক মেঠাকে কাহারও কাছে কোন জবাবদিহী—কোন দিন করিতে হইবে না? কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয় হয়ত নেহরু নির্বাচিত টার্ণ-কোট অশোক মেঠার বিষয় কোন ব্যবস্থাই (বিচারের) করিবেন না, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিমান "জনসরকার" আজ বা কাল—অশোক মেঠার বিচার করিবেই এবং তাঁহাকে জন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া প্রত্যেকটি পাই পয়সার হিসাব দিতে বাধ্য করা হইবে। মোরারজী—কামরাজ তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না।

পশ্চিম-বঙ্গ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন প্রথম হইতেই একটা বিমাতাসুলভ আচরণ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য এ-আচরণের পূর্ণ সমর্থন দান করেন কেন্দ্রীয় সরকারের অতি শক্তিশালী বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী-বিদ্বেষী দুষ্টচক্র। যেখানে প্রয়োজন দশটাকা, পরিকল্পনা কমিশন তথা কেন্দ্রীয় সরকার দুইটাকা বরাদ্দ করিতেও গররাজী ভাব দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙ্গালী সচিব এবং উচ্চ পদস্থ অফিসার না থাকাতে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর প্রতি ক্রমিক অবিচারে বাধা দিবারও কেহ ছিল না। প্রসঙ্গত বলা যায় যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে বাঙ্গালী বর্জন নীতি আজ প্রায় পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। যোগ্য বাঙ্গালীর অভাবই কি ইহার কারণ? না। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে গঠিত, তাহাতে প্রধান মন্ত্রীও অবস্থার কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন না, অবশ্য সে সাধ্যও হয়ত তাহার নাই। ব্যাপার যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে, নির্ব্বাচনে-পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও বহাল-তবিয়তী কামরাজের কুপ্রভাব মুক্ত করিতে না পারিলে, বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের 'জীবন' দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না। সে কথা যাক। এখন বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে কেন্দ্র হইতে যেমন করিয়াই হউক—ন্যায্য প্রাপ্য (অর্থ) আদায় করিতেই হইবে। বিবিধ সূত্রে, বিশেষ করিয়া পাট, চা এবং আয়কর খাতে কেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গ হইতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেন, তাহার শতকরা অন্তত ৬০।৬৫ ভাগ এ রাজ্যের প্রাপ্য এবং তাহা আদায় করিতেই হইবে—এবং আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু চেষ্টা করিলে ইহা করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কিছুদিন পূর্ব্বে রাজ্য সরকারগুলিকে ঘাটতি বাজেট যেমন করিয়াই হউক বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে—এই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দ্দেশ পালন না করার ফল হইবে কেন্দ্রের সহিত বিবাদ। কিন্তু ঘাটতি বাজেট বর্জ্জন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াই কেন্দ্র দায়মুক্ত হইতে পারেন কি? বিশেষ করিয়া এরাজ্যে অর্দ্ধ এবং প্রায় সমাপ্ত একান্ত জরুরী পরিকল্পনাগুলি, যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি এবং আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া হাতে লওয়া হয়, তাহা এখন হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিবার অর্থই হইবে পশ্চিম বঙ্গে বেপারী বৃদ্ধি করিয়া এ রাজ্যকে আরো দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে বাধ্য করা। অতএব অর্দ্ধ এবং প্রায়-সমস্ত পরিকল্পনাগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রের নিকট হইতে যেমন করিয়াই হউক রাজ্য সরকারকে আদায় করিতে হইবে। বর্ত্তমান রাজ্য সরকার অ-কংগ্রেসী, কাজেই রাজ্যের স্বার্থে এবং জনগণের হিতে বাধাজনক কোন নিষেধ, তাহা কামরাজী বা মোরারজী যাঁহারই হউক না না কেন, প্রাক্তন পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসী সরকারের মত জো হুকুম বলিয়া নতমস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের ৮।৯ কংগ্রেসী সরকারের প্রতি যে সদয় নহে তাহা ক্রমশ প্রকট হইতেছে। এ বিষয় প্রধান মন্ত্রীর মনোভাব অন্য প্রকার হইলেও, তিনি

অসহায়' বিশেষ করিয়া কায়রাজ তাঁহাকে সদাই বেকায়দায় ফেলিতে প্রয়াস করিতেছেন।

সরকারী হিসাবে শুধু মাত্র পুণ্যের পাইকারী মূল্যসূচক বা শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণ ব্যয়ের সূচক দেখানো হয়। এই হিসাব হইতে জনসাধারণের জীবনধারণ ব্যয়ের উপর পণ্যমূল্যের ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় না।

সে হিসাবের মধ্যে না গিয়া বাস্তব বাজার দর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাবে এক বছরে কলিকাতার বাজারে কয়েকটি পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের গতি এই রকম :

পণ্য	জানুয়ারী ১৯৬৬ টাকা পঃ	জানুয়ারী ১৯৬৭ টাকা পঃ
মাংস (কিলো)	৫-০০	৫-৫০
কাটা পোনা কিলো	৩-৫০	৬-০০
	৪-০০	৬-৫ ০
ডিম জোড়া	-৫০	-৫০
বাঁধাকপি কিলো	৩৬	৬০
	-৪০	৭০
পিঁয়াজ কিলো	-৫৬	-৭০
		-৭৫
আলু কিলো	-৮৮	৮০
সরষের তেল (কিলো)	৩-০০	৪-৬০
জিরা কিলো	৪-০০	৫-৫০
লঙ্কা (কিলো)	৪-০০	৭-০০
কলাই ডাল কিলো	-৮৮	১-৭০
অড়হর ডাল কিলো	১-১০	১-৩০
মুসুর ডাল কিলো	১-০০	১-৪০
মুগ ডাল কিলো	১-১০	১-৭০
মটর ডাল কিলো	৮৪	১-৩০
দুধ লিটার	-৮৪	১-৩৬
পোস্ত কিলো	৫-১০	৬০০
গুড় কিলো	১-০০	১-২০
কাপড়কাচা সাবান প্রতিটি	-৫৩	-৬৩
গায়েমাখা সাবান প্রতিটি	-৬৩	-৭৩
টুথপেষ্ট ছোট	১-০৬	১-২৫
সার্ফ ছোট	১-৩৭	১-৫৫
বল সাবান কিলো	২-০০	২-৫০
বোর্ণভিটা ১ পাঃ টিন	৫-৫০	৬৫০

ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ

গত জানুয়ারীর তুলনায় এখন রেশন এলাকাতেই প্রতি কার্ডে প্রতি সপ্তাহে ব্যয় বাড়িয়াছে ২৫-৩০ পয়সা অর্থাৎ মাসে প্রতি পরিবারে ৫ টাকা। তার উপরে চালের কালোবাজারে মাসে মাথা পিছু অন্তত ২ টাকা অর্থাৎ মোট ১০ টাকা অন্ততঃ দিতে হয়। ডাল তেল মশলা সব্জী কয়লা কাপড় প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিস বাবদ প্রতি পরিবারে মোট ব্যয় মাসে অন্ততঃ আর১০ টাকা বাড়িয়াছে এক বছরেই অর্থাৎ খাদ্য বাবদই প্রতি মাসে ২৫-৩০ টাকা ব্যয় বাড়ে নাই এমন পরিবার পাওয়া যাইবে না। ইহার উপর আছে যানবাহন শিক্ষাদীক্ষা লোকলৌকিকতা পুজাপার্বণের ব্যয়। সব কিছু ধরিলে বাড়তির অঙ্ক মাসে ৫০-৬০ টাকা হইবে। এক বছরেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহাদের কাছে এ বৃদ্ধি অস্বাভাবিক মনে হইবে না। বাড়ীর ট্যাকস অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়াছে। বাড়িয়াছে মেরামতি খরচা কাজেই এ বাড়তির ধাক্কা হইতে শুধু তাহারাই রেহাই পাইয়াছে যাহাদের অদৃশ্য আয়ের উৎস আছে। বাঁধা আয়ের চাকুরীজীবী ও দিনমজুরেদের কষ্টের আজ আর শেষ নাই।

গত এক বছরে কয়েকটি পণ্যের খুচরা দরের ওঠা নামার হিসাব :—

পণ্য	জানুয়ারী ১৯৬৬ টাঃ-পঃ	এপ্রিল ১৯৬৬ টাঃ পঃ	অক্টোবর ১৯৬৬ টাঃ-পঃ	ডিসেঃ ১৯৬৬ টাঃ-পঃ
খোলা বনস্পতি ১কিলো	৪-২০	৪-৫০	৬-০০	৫-৫০
দুই কিলো বনস্পতির টিন	১০-০৬	১০-৫০	১৩-১৮	১২ ৬০
শুকনা লঙ্কা (কিলো)	৩-০০	৪ ৬০	৮-৫০	৭-০০
সানলাইট সাবান (১২টি)	৬-৩৬	৬-৬০	৭-৯২	৭-৫৬
সাধারণ গায়েমাখা সাবান	৭-৪৪	৮-২৮	৯-০০	৮-৭৬
সরষের তেল কিলো	৩-০০	৪-০০	৪-২০	৪-৬০
দাঁতের মাজন ১টি	১-০৬	১-১২	১-১৫	১-২৫
ডাল (৫) কিলো	৫-০০	৫-৫০	৬-০০	৭-০০
আলু (৫) কিলো	৪-৪০	২-৮০	৪-০০	৫-০০
ফাইন কাপড় ৫ গজ ধুতি	১২-৬৫	১৪-০০	১৫-৪০	১৫-৪০
কয়লা ৩৭ কিলো	২-৭৫	২-৭৫	২-৮৭	২-৮৭

আয় বৃদ্ধির পরিমাণ কি প্রকার

এই মূল্য ও ব্যয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আয় বৃদ্ধির মাত্রা যাচাই করিয়া দেখিলেই জনসাধারণের দুর্গতির বোঝার স্বরূপ বুঝা যাইবে। গত এক বছরে ১৯৬৬ সালে বহু ক্ষেত্রেই বেতন বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়াছে ১০—১৫ টাকা, রাজ্য সরকারের কর্মচারী-দের বেতন ২০ টাকা প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ১৫ টাকা মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ১০ টাকা এবং অধ্যাপকদের বেতনও কিছু বাড়িয়াছে কিন্তু মাসিক ১০ টাকা ভাতা ছাড়া এখনও সে টাকা পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে সে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহারই ভিত্তিতে এ বৃদ্ধির হিসাব করা হইয়াছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে সিনেমা কর্মচারী ও কয়েকটি বণিক প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার হইল মাসে ২০ টাকা, দিনমজুরদের আয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাড়িলেও তাহাদের মোট আয় কমিয়াছে।

মূল্যবৃদ্ধির ফলে এক এক শ্রেণীর লোকের জীবন ধারণ ব্যয় পৃথক পৃথক হারে বাড়িয়াছে। তাই বেতন বৃদ্ধির হারে কিছু বৈষম্য আছে। সরকার হাসপাতালের কর্মচারী কর্মীদের বেতন পড়িয়াছে কিন্তু বেসরকারী হাসপাতালের কর্মীদের বেতন তেমন বাড়ে নাই যদিও ডাক্তারদের এক শ্রেণীর বাড়িয়াছে সকল শ্রেণীর লোকই সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে মূল্য বৃদ্ধির ফলে।

ঘাটতি

কিভাবে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে জনসাধারণ খাপ খাওয়ায়? বাড়ীভাড়া কমানো যায় না মেরামতের খরচাও না ডাক্তারও বন্ধ হয় না অসুখবিসুখ। স্কুল হইতে ছেলেমেয়েদের ছাড়াইয়া আনা হয় না, নিজেদের পোষাকপরিচ্ছদেরও হঠাৎ পরিবর্তন হয় না। সব ধাক্কা সামলাইতে হয় গৃহিনী এবং রান্নাঘরকে। সেখানে মাছের গন্ধ লোপ পায় ডাল ক্রমশ তরলতর হয় সব্জীর পরিমাণ কমিতে থাকে, এইভাবেই সবার অলক্ষ্যে পরিবর্তন আসে সাধারণ সংসারে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে তবে বাজারে মাছ মাংস দুর্মূল্য কেন? ভালো "জিনিস" নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে কেন? উত্তর সহজ। প্রথমতঃ সরকারের দাক্ষিণ্যে কালোটাকার ছড়াছড়ি। ইহা ত জানাকথা যে একজন কর্মচারী বেতন পান দেড়শো টাকা। কিন্তু তিনি যে উপরি পান মাসে পাঁচশো। তাহার হিসাব আছে? বাজারে ভীড় বাড়ায় মধ্যবিত্তরা নয়—এইসব কালোটাকার অধিকারী ও অনুচররাই। দ্বিতীয় কারণ সারা মাস মাছ না খাইয়া মাসের প্রথমে সবারই ইচ্ছা করে একটু মুখ বদলাইতে আর যদি সকলেই একদিন অন্তত ও মাছ কেনে তাহা হইলেই বা ভীড় হইবে না কেন? দামের প্রশ্নই উঠে না।

এইভাবে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় সাধারণ লোকের ব্যয়ের মাত্রা কমিয়া গিয়াছে ছোট খাট ব্যবসায়ীরা তাহা ভালভাবেই টের পাইতেছে। তাহাদের বেচাকেনা কম পরোক্ষ ক্রেতা প্রতিরোধ কয়েকটি ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছে মূল্য কমাতে। অন্ততঃ কয়েকটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই এ জন্য। কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ী কালোটাকার মালিক প্রভৃতির প্রকাশ্য অথবা গোপন প্রভাবে বাজারে ভারসাম্য নষ্ট হইতেছে। যদি এ অবস্থা আরও কিছুদিন চলে তবে দেশের সামগ্রিক ক্ষতি হইবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে। অবিলম্বে তাই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের সক্রিয় পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে :

অচিরে দ্রব্যমূল্য; বিশেষ করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যাদি, তৈল, ঘি; গরীবদের বস্ত্র, প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি, কেবল রোধই নহে, কমাইবার পন্থা বাহির না করিলে, দেশে শান্তি এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যবসায় প্রভৃতি চালানো হয়ত ক্রমে অসম্ভব হইবে। মানুষকে গত বিশ বৎসর কংগ্রেসী সরকার এবং নেতারা দিয়াছেন কেবল নীতিবাণী এবং দেশের কারণে কৃচ্ছ সাধনের পরম উপদেশ, এবং যে উপদেশ কেবল সাধারণ মানুষের পালনের জন্য, তাঁদের নিজেদের জন্য নহে। কিন্তু কংগ্রেসী-মার্কা এই বিচিত্র সদাচার-নীতি অর্থাৎ 'আমরা দিব উপদেশ আর তোমরা সাধারণ মানুষ করবে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন।'—এবার অচল হইল।

· নিজেরা দুঃখ: কষ্টের ভাগ এবং ভার না লইয়া সাধারণ মানুষদের উপর তাহা চলাইয়া দিবার প্রয়াস অতি-

চালাকদের বিরাট বেকুবী এবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের অকংগ্রেসী সরকারের নিকট জনগণ অনেক কিছু আশা করে এবং আমরাও মনে করি ইহা বেকার হইবেনা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সরকার একই সমতলে দাঁড়াইয়া, সমভাবে সকল দুঃখকষ্টের অবসানের জন্ত আন্তরিক প্রয়াস এই আশারাখি।

ভারতের কয়েকটি রাজ্য বিধান-পরিষদ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহা হয়ত কার্য্যেও পরিণত হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই অপ্রোজনীয় খরচাবহুল বিধান পরিষদ লইয়া এখনো কোন কথা শুনা যায় নাই। অর্থমন্ত্রী (রাজ্য) শ্রীজ্যোতি বসুর নিকট হইতেই এই বিধানসভা লোপের প্রস্তাব এবং তাহার কার্য্যকর ব্যবস্থা আশা করেতেছি।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে ভারতীয় সংবিধানে বিধান পরিষদকে পরীক্ষা মূলক (Exprimental) ভাবে গ্রহণ করা হয়—বাধ্যতা মূলক ভাবে নহে। ভারতের সকল রাজ্যে বিধান সভা নাই—আছে মাত্র দশটি রাজ্যে। কিছুদিন পুর্ব্বে পাঞ্জাবে বিধানসভা বাতিল করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্ত সংবিধানের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না করিয়াই, ভারতীয় সংসদ রাজ্যের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যের বিধান পরিষদ প্রবর্ত্তন বা বাতিল করিতে পারেন। এখন দেখা যাইতে পারে রাজ্যের পক্ষে বিধান-পরিষদের কোন প্রয়োজন আছে কি না?

অর্থ-বিলের উপর বিধান পরিষদের, কিছু বিলম্ব করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষমতাই নাই। বিধান সভার সম্মতি লাভের পর অর্থ-বিল বিধান-সভার অনুমোদন লাভের জন্য ঐ পরিষদে পাঠানো হয়। বিধান পরিষদ অনুমোদন না দিলে ১৪ দিন পরে, বিধান সভাতেই অর্থ-বিল গৃহীত—অর্থাৎ পাশ-হইয়া যায়। এ-বিষয়ে পত্রান্তর প্রকাশিত পত্রখানি যথেষ্ট আলোকপাত করিবেঃ—

অর্থ বিল ছাড়া অন্যান্য বিল প্রথমে বিধানসভা বা বিধান পরিষদ যে-কোন সভাতেই (হাউস) উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী এ বিষয়ে বিধান-সভার মতামতই চূড়ান্ত। বিধান পরিষদ ইচ্ছা করলে বিধানসভার যেকোন বিলের (অর্থ বিল ছাড়া) উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারেন, যেকোন বিলের (অর্থ বিল ছাড়া) প্রত্যাখানও করতে পারেন। কিন্তু বিধান-সভা বিধান পরিষদের সংশোধনী প্রস্তাব মানতে বাধ্য নন। এমন কী বিধানসভা যে-কোন বিল (অর্থ বিল ছাড়া) বিধান পরিষদে অনুমোদনের জন্যে প্রেরণের তিনমাস পর বিধান পরিষদের অনুমতি ছাড়াই একক ইচ্ছায় আইনে পরিণত করতে পারেন। তৃতীয়ত, কোন ব্যাপারে বিধানসভা ও বিধান পরিষদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটলে উভয় সভাকে একমতে আনয়নের জন্তে ভারতের সংবিধানে উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন আয়োজনেরও কোন ব্যবস্থা নেই। এদিক থেকে রাজ্য বিধান পরিষদ সংসদের রাজ্যসভা (কাউনসিল অব স্টেটস) অপেক্ষাও দুর্বল। চতুর্থত, রাজ্য মন্ত্রিসভার উপরও বিধান পরিষদের কোন ক্ষমতাই নেই। রাজ্য মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুযায়ী সমবেতভাবে সকল কার্যাবলীর জন্তে একমাত্র বিধানসভার কাছেই দায়ী। একমাত্র বিধানসভাই অনাস্থা পন্থা অবলম্বন করে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিধান পরিষদের কোন ক্ষমতা নেই।

"দেখা যাচ্ছে, কোন ব্যাপারেই বিধান পরিষদের কোন কার্যকরী ক্ষমতাই নেই। বিধান পরিষদ শুধু কোন বিলকে কার্যকরী করিতে কিছু দেরি করার ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। কিন্তু এতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভই হয় না। পরন্তু বিধান পরিষদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে কোন জরুরী বিল কার্যকরী হতে অনাবশ্যকভাবে সুদীর্ঘ তিন মাস দেরী হয়। এতে অনেক ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া বিধান পরিষদ পরিচালনার জন্তেও অযথা অনেক সরকারী টাকার অপব্যয় হয়। একথা ঠিক যে, বিধান পরিষদে অনেক জ্ঞানী (? ও গুণী ?) লোকের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু এদের কোন প্রভাব বিধানসভার সদস্যের উপর পড়ে না। যে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে বিধান

পরিষদ গঠিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বরং বলা চলে যে, বিভিন্ন রাজ্যে দলীয় সমর্থকদের অনুগ্রহ বিতরণের জন্যে এবং দলের ভেতরে বিভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যেই বিধান পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বিধান পরিষদ গঠনের পেছনে এ ছাড়া আর কোন যুক্তি আছে কি? একই বিষয়ে একই ধারায় বারবার (অথবা বাজে) বিতর্ক শোনার জন্যে, যথেষ্ট সময় ও অর্থের অপচয় করার জন্যে কোন রাজ্যেই বিধান পরিষদ রাখার কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই।"

দেশের এই বিষম অর্থ সঙ্কটের দিনে বিধান পরিষদের মত একটা বিষয় ব্যয়বহুল—কিন্তু একেবারেই অনাবশ্যক "বিধান পরিষদ" রাখায় 'অর্থ' অপচয় এবং অপাত্রে দান ছাড়া, আর কোন অর্থই খুঁজিয়া পাই না! ছিন্ন বস্ত্রে মূল্যবান বেনারসী জরীপাড় মানায় কি?

আমরা আশাকরি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান পরিষদের অবিলম্ব ফেয়ার-ওয়েল ব্যবস্থা করিয়া রাজ্যের বেশ একটা মোটা রকম আর্থিক ওয়েল ফেয়ার করিবেন।

লেখাপড়া শিল্প বার্ত্তা কলা ইত্যাদি যত কিছু শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি ধারা আছে, যাহা পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইয়া চলে। যেখানে শিক্ষা কেবলমাত্র পুরাতন আশ্রয় করিয়া স্থগিত হইয়া থাকে, নূতন পথে না চলে, সেখানে সেই শিক্ষা কেবলমাত্র পুরাতনের অনুকরণ হয়, নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও পণ্ড হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হুগলীর পাণ্ডুয়া

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবন্ধের নাম দেখে অনেকের মনেই এ প্রশ্ন আসতে পারে যে পাণ্ডুয়া হুগলী জেলারই অন্তর্গত তখন এভাবে নিবন্ধের নামকরণের সার্থকতা কি! কিন্তু সেভাবে চিন্তা করলে প্রকৃত ইতিহাসের ধারা ঠিক খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ পাণ্ডুয়া বলে একটা জায়গা মালদা জেলাতেও আছে, আবার বর্তমান হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীন হরিশপুর ও বসন্তপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী পাণ্ডুনগর বলেও এক প্রাচীন রাজার রাজধানী আবিষ্কৃত হয়েছে।

হাওড়া ও হুগলীর দুইটি স্থান পাণ্ডুয়া ও পাণ্ডুনগর একই নাম অর্থাৎ পাঁড়ুয়া বা পেঁড়ো সাধারণ লোকের উচ্চারণে এইরকম একটা নাম পরিগ্রহ করে। অনেকে মনে করেন যে যেহেতু Major Runnel হুগলীর পাণ্ডুয়ার নাম "পাঁড়ুয়া" বলে মানচিত্রে লিখে গেছেন, সেই হেতু নামটি নিশ্চয়ই প্রাচীন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলাতেও যে ঐ নামে একটি গ্রাম বর্তমান অনেকের নজরেই আসে না। আবার এই হাওড়া ও হুগলী দুইটি পৃথক স্থানের প্রতিষ্ঠাতা রাজা পাণ্ডুদাস ও রাজা পাণ্ডুশাক্য উভয়েই যেন হুগলীর পাণ্ডুয়ার সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত, অনেকেই এভাবে একটি বিচিত্র ইতিহাস গড়ে তুলতে চান।

খুবই আশ্চর্য্য লাগে এই ধরনের তথ্য দেখলে যে নামটা একই ধরনের হলে সেই সব রাজারা একই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা বলে লিখে দেওয়া হয়। আবার বাংলা দেশের সর্ব্বপুরাতন মসজিদ পাণ্ডুয়ার মসজিদ বলা হয় একথাটা সত্য কিন্তু সে পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার নয়, সেটি হচ্ছে মালদা জেলার পাণ্ডুয়া এবং সেই ভগ্ন অবহেলিত মসজিদের গৌরব অসঙ্গতভাবে আরোপ করা হচ্ছে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার উপর। আমাদের বর্তমান কালের ইতিহাস লেখক এত লঘুভাবে ইতিহাস চর্চ্চা করেন যে তাদের তুলনা করা চলতে পারে একমাত্র অত্যুৎসাহী নাট্য-রসিক যাঁর কোনও ইতিহাসে জ্ঞান নেই অথচ প্রশ্ন করলে জবাব দিতে হবে, না জানা সত্ত্বেও। তিনি যেমন চন্দ্রগুপ্তের বংশধর কে? এর উত্তর করবেন যে হয় মধু গুপ্ত, না হয় ডি-গুপ্ত। আজকালকার ইতিহাস চর্চা ঠিক এই রকমেরই নিম্নস্তরে এসে গেছে।

তাই হুগলীর পাণ্ডুয়ার অতীতের খ্যাতি বা অখ্যাতি বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে একই ধরণের নামের তিনটি জেলার তিনটি স্থানের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া প্রয়োজন।

সিংহলের "মহাবংশ" পরিচয়ে দেখা যায় যে এই মহাবংশই মহান শাক্য নামে পরিচিত হন এবং কপিলাবস্তু নামে জায়গার এই রাজবংশ রাজত্ব করেন। এই বংশেই বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। বুদ্ধদেবের কাকা ছিলেন অমৃতোদন এবং এই অমৃতোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্য ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী স্থানে এক রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে রাজধানীর নাম "পাণ্ডুয়া" নির্দিষ্ট করেন। এই ঘটনা থেকেই পাণ্ডুয়া নামের সৃষ্টি। হুগলীর পাণ্ডুয়ার এই হচ্ছে সর্ব্ব পুরাতন কাহিনী। বুদ্ধদেবের সময় এই নামকরণ হয়। এইজন্য এর প্রতিষ্ঠা অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় দশকের ঘটনা বলে গ্রহণ করা যায়। এর প্রায় দেড়শো বছর পর পাণ্ডুয়া রাজ্য ও সিংহপুর (সিঙ্গুর) রাজ্য বলে দুইটি রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই হচ্ছে মৌর্য্য বংশের অবসানের সময়ের ঘটনা অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৩য় শতকের শেষার্দ্ধের বিবরণ। এই সময়ের বা এর দেড়শো বছর আগের পাণ্ডুয়া হিসাবে তিনটি জেলার পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগরের মধ্যে হুগলীর পাণ্ডুয়ার প্রতিষ্ঠা সব চেয়ে বেশী প্রাচীন কালের ঘটনা।

হাওড়া জেলার পাণ্ডুনগর নামটি মূলতঃ রাজা পাণ্ডুদাসের দেওয়া। এই রাজা হিন্দু রাজা ছিলেন এবং হুগলীর পাণ্ডুয়ার স্থাপনার সঙ্গে এর কোনও সংশ্রব ছিলনা এবং এর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম ছিল "ভুরিশ্রেষ্ঠ"। এই রাজ্যটি পরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের শাসনে আসে এবং সম্রাট আকবর বা তাঁর রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল্লের আমলে এই রাজ্যের আয়তন অনেক ছোট করা হয়। রাজধানীর নাম ও পাণ্ডুনগর থেকে "পাণ্ডুয়া" করা হয়। পাণ্ডুনগরকে কেন এরকম নাম পরিবর্ত্তন করা হল জানা যায় না। তবে ইতিমধ্যে হুগলীর পাণ্ডুয়া (১৩৪০ খৃঃ) মুসলমানদের অধীন হওয়ায় নাম এভাবে বদলান হয় বা উচ্চারণের সুবিধার জন্য করা হয় তাহা আজও অজ্ঞাত রয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে হুগলীর পাণ্ডুয়া কোন দিনই অবস্থিত ছিলনা তাই হুগলীর পাণ্ডুয়ার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজা পাণ্ডুদাসকে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করবার কোনও কারণ নাই।

বাংলার সর্ব্বপুরাতন মসজিদ পাণ্ডুয়ার মসজিদ কিন্তু সে পাণ্ডুয়া মালদহ জেলার। এই সর্ব্বপুরাতন মসজিদের প্রতিষ্ঠার বিষয় খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজাগণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হয় জালালউদ্দিন। তিনি সম্রাট নাসিরউদ্দিনের রাজত্ব কালে বাংলার সুলতান হন এবং তাঁর রাজধানী গৌড়ে অবস্থিত ছিল। তিনি মালদা জেলার পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নামে এক সুবৃহৎ মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। এই মসজিদটি সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে প্রাচীনতম। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া দখল করে বিজয়ী সাহসুফী যে মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেন সে ঘটনা হচ্ছে পূর্ব্বের মালদার পাণ্ডুয়ার মসজিদ নির্ম্মাণের অন্ততঃ ৮০ বছর পরের ঘটনা অর্থাৎ ১৩৪০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তাই হুগলীর পাণ্ডুয়ার মসজিদ প্রাচীনতম একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই।

হুগলী ও হাওড়ার মধ্যে "পাঁড়ুয়া" বা "পেঁড়ো" এই নাম নিয়ে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান এবং এর মূলে আছে আরও কয়েকটি জিনিসের অবস্থিতি যা অবস্থা আরও জটিল করে তুলেছে। দুই জেলারই পেঁড়োর নিকটবর্ত্তী মন্দির ও গড় বিদ্যমান। অবশ্য গড়ের চিহ্ন হুগলীর পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়ায় মাত্র ৪০০৫০০ গজ লম্বা একটা মাঠের জল আটকান বাঁধ বিদ্যমান, আর একেই গড় বলে স্থানীয় লোকেরা গ্রহণ করেছেন। উভয় পেঁড়োরই নিকটবর্ত্তী "বসন্তপুর" গ্রাম। কিন্তু এত মিল থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের অধীন কোনটি এবং কোনটি ঐ রাজ্যের বাহিরে এই ভাবে সন্ধান চালালে, রাজা পাণ্ডুদাস ও রাজা পাণ্ডুশাক্য উভয়েই যে হুগলীর পাণ্ডুয়ার প্রতিষ্ঠাতা এরকম ভ্রান্ত ধারণা দূর করা সম্ভব হাওড়া ও মালদার পাণ্ডুয়া ও পাণ্ডুনগর বিষয়ে আলাদা করে বিবরণ দেওয়ার পর এখন হুগলীর পাণ্ডুয়ার বিবরণ দেওয়া যাক। রাজা পাণ্ডুশাক্য অনুমান ২য় দশকে পাণ্ডুরাজ্য স্থাপন করেন এবং রাজধানীর নাম দেন পাণ্ডুয়া। রাজা পাণ্ডুশাক্য হিন্দু ছিলেন, না বৌদ্ধ ছিলেন এ বিষয়ে মতের অমিল থাকতে পারে কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ হলেও ইনি যে বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্র হওয়ার দরুণই এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করবেন একথা মনে করার কোনও কারণ নাই। "শাক্য" পদবী ধারণ একটি বংশের ইঙ্গিত করে এবং এ বংশের সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন না। অতএব পাণ্ডুশাক্য হয়ত হিন্দুরাজাও হতে পারেন। তবে যে মন্দির ধ্বংস করে সাহসুফী মসজিদে পরিণত করেন সেই মসজিদের বিভিন্ন স্তম্ভ ও অলিন্দে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তাই অনেক ঐতিহাসিক একরকম অনুমান করেছেন যে পূর্ব্বে মন্দিরটি বৌদ্ধ রাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পরবর্ত্তীকালে উহা হিন্দু রাজাদের দখলে আসে।

সাহসুফীর আক্রমণের সময় ভারতের একটা বৃহৎ অংশ পাঠান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় যে সব হিন্দু বা মুসলমান রাজা ছিলেন তাঁরা সকলেই পাঠান সম্রাট ও তদধীন বাংলার সুলতানের রাজ্যে সামন্তরাজা হিসাবেই আপন আপন এলাকায় স্থানীয় শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন ১৪শ শতকের পাঠান সম্রাট ছিলেন ৩য় ফিরোজসাহ — এই সম্রাটের ভগ্নীর পুত্রের নাম সাহসুফি যিনি পাণ্ডুয়া

বাস করতে আসেন এবং কালক্রমে ইনিই পাণ্ডুয়া জয় করেন।

সাহ্ সুফির পাণ্ডুয়া বিজয় ও তাঁর পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় অবস্থান বিষয়ে অনেকগুলি ইতিকথা বা জনশ্রুতি প্রচলন আছে। তার মধ্যে যে জনশ্রুতি খুব বিশ্বাসযোগ্য সেই ইতিকথাটি প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে অনেকটা সংশ্লিষ্ট বলে এখানে দেওয়া হল। এই সময়ে পাণ্ডুয়ায় একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। এই রাজার অধীনে সাহ্ সুফী নামে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন যাঁর কাজ ছিল বিভিন্ন সরকারী কাগজপত্র যা পারসী ভাষায় লিখিত হইত তার অনুবাদ করা। এই কর্ম্মচারীটি তাঁর নবজাত শিশুর জন্ম উপলক্ষে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে গোহত্যা করা হয়। এই গোহত্যার বিষয় রাজার কাছে খবর আসে, ফলে রাজার সৈন্যরা সাহ্-সুফীর ঐ শিশুপুত্রকে হত্যা করে। এই ধরণের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দিল্লীর সম্রাটের সাহায্য চাওয়া হয়। দিল্লীর সম্রাটও এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এই বাহিনীর সাহায্যে পাণ্ডুয়া দখল করেন সাহ্ সুফী।

পাণ্ডুয়া দখল করে সাহ্ সুফী এর মন্দিরটি ধ্বংস করেন ও তার উপর একটি বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর অনেক সংস্কার সাহ্ সুফী নিজেও করেছিলেন তার প্রমাণও অনেক পুস্তকে পাওয়া যায়। দিল্লীর কুতুবের আকারে এই মিনারটি নির্মিত হয়। সাহ্ সুফীর নির্মিত স্তম্ভের বা মিনারের উচ্চতা ছিল ১৩৬ ফুট। মিনারের উত্তর পশ্চিম দিকে একটি প্রাচীন মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। সে মসজিদে ৬০ টি গম্বুজাকারের খিলান যুক্ত ছিল। এর মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটি এখনও বিদ্যমান। এই সমস্ত স্তম্ভযুক্ত খিলানের চারিদিকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে একদিকে যেমন এটি একটি হিন্দুমন্দির বলে মনে হবে তেমনি বৌদ্ধ স্থাপত্য বা বৌদ্ধ পদ্ধতির অলঙ্করণের কিছু কিছু চিহ্ন বেশ সুস্পষ্ট। তাই মন্দিরটি কোনও সময়ে বৌদ্ধদের আবার অপর কোন সময়ের জন্য হিন্দুদের বলে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

সুউচ্চ স্তম্ভ বা মিনার থেকে প্রায় ১৫০ গজ পূর্ব্বে একটি বড় পুকুরের পাড়ে একটি মসজিদ্ বিদ্যমান! তবে এই মসজিদের গায়ে লেখা অনুযায়ী এটিকে ২৫০ বছরের বেশী পুরাতন নয় বলেই জানতে পারা যায়। মিনার থেকে পশ্চিমে একটি অতি সাধারণ সমাধি-সৌধ আছে। এইটিই হচ্ছে সাহসুফি ওরফে সফিউদ্দিন সুলতানের সমাধি।

সাহ্ সুফীর সৃষ্ট এই মিনার এমন ভাবে প্রস্তুত ছিল যে মিনারের সুউচ্চ অলিন্দ থেকে নিকটবর্ত্তী মসজিদে নামাজের জন্য প্রথম মাজিনা বা আজান দেওয়া খুবই উপযোগী হইত। এই মিনারের কোথাও কোন লিপি নেই। সাহ্ সুফি ফকির ছিলেন তাই ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং এঁর মৃত্যু সম্বন্ধে একটি অবিশ্বাস্য গল্প আজও মুসলমানদের মুখে মুখে চলে। কথিত আছে যে সাহ্ সুফী একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য শেষ রাত্রে নামাজের জন্য প্রভুকে জাগিয়ে দিতে উঠে দেখে যে রাত একেবারে শেষ হয়ে সকাল হয়েছে। এসময়ে প্রভুকে জাগান মানে প্রভুর ধর্ম্মাচরণে গুরুতর অনিয়ম ঘটান যা একটি বড় রকমের অধর্ম্ম বলে সে মনে করে। ফলে সে অনুশোচনার বশে প্রভুকে হত্যা করে ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আত্মহত্যা করে। এই ধরনের জনশ্রুতি অনেকেরই মনে সত্য ঘটনা বলে স্থান পায় না। তবে ধর্ম্মপ্রাণ বলেই বিশ্বাস করেন।

ধর্ম্মপ্রাণ সাহ্ সুফী চেয়েছিলেন তাঁর পাণ্ডুয়া বিজয়কে এই মিনার দিয়ে একটা চিরস্থায়ী ইতিহাস সৃষ্টি করতে কিন্তু কালের ক্ষমতার কাছে সব কিছুই ধ্বংস হতে বাধ্য। তাই মিনারটি বহুদিনের অযত্নে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। তাই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এর উপরের অংশটি ভেঙ্গে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দেও যে ফটো পাওয়া গেছে তাতে ও মিনারটি ভূমিকম্পের দরুণ এটি নষ্ট হয়।

মিনারটি যত্ন সহকারে সংরক্ষণের জন্য ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইহা সরকার গ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মিনারটিকে সংস্কার করা হয়। সংস্কার করার সময় এর আগেকার

উচ্চতা ১৩৬ ফুট বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। সংস্কারের পরে উচ্চতা দাঁড়ায় ১২৫ ফুট এবং উপরের দিকে অল্প উচ্চতা বিশিষ্ট পর পর ৫টি ক্ষুদ্রাকারের শীর্ষ চূড়া দিয়ে এর উচ্চতা শেষ করা হয়েছে। এতে মোট ১৬১টি সিঁড়ি আছে এবং আগের চেয়ে যাতে সিঁড়িতে আরও বেশী আলো পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে আরও কিছু অতিরিক্ত আলো আসবার পথ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম সংস্কৃত হওয়ার পর এটি অনেকটা নতুন মিনারের আকার নেয় কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই আবার অতি প্রাচীন মিনারের আকার নেয়।

পাণ্ডুয়ার পশ্চিমে একটি সুবৃহৎ পুষ্করণী আছে যাকে পীর পুকুর বলা হয়। এর চারিদিকে অনেকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাধিও দেখতে পাওয়া যায় এবং এ দেখে মনে হয় যে যুদ্ধে হত সৈনিকদেরই সমাধি দেওয়া হয়েছে এইসব স্থানে। এখানে মাঘ মাসের পয়লা তারিখে একটি মেলা বসে। পূর্ব্বে এই মেলায় প্রচুর জনসমাগম হইত। এই মেলাটি প্রধানতঃ মুসলমানদের ধর্ম্মীয় মেলা।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে এক, বিশেষ ধরণের জ্বর হুগলী ও বর্ধমান জেলার প্রায় সমগ্র এলাকা নিয়ে বিস্তার লাভ করে। এই মহামারীর ফলে মাত্র ৭ বছরের মধ্যে পাণ্ডুয়া গ্রামের জনসংখ্যা ৭০০০ থেকে ২০০০ এ পরিণত হয়। আজও পাণ্ডুয়া হুগলীর একমাত্র মুসলমান প্রধান স্থান এবং এখানার মুসলমানেরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর। মুসলমান শাসনাধীনে বিচারক বা কাজী নিযুক্ত হয়েছেন এই গ্রামের অনেকেই। আজও অনেক অবলুপ্তপ্রায় স্মৃতি রয়েছে এই পাণ্ডুয়ায়।

পুরাতন জনপদ হিসাবে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তি মহানাদ দ্বারবাসীনী গ্রামেও কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান থাকা সম্ভব। শুধু এই সমস্ত অঞ্চল নয় হুগলী জেলার পথে প্রান্তরে আরও অনেক অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে যার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। যেমন ত্রিবেণী মাদারণ পাহাড়পুর, ছাওনাপুর রাজবলহাট প্রভৃতি। অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতা, জয় পরাজয় সব কিছুরই আজ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

অজ্ঞানবাদী বারট্রাণ্ড রাসেল

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বারট্রাণ্ড আরথার উইলিয়ম্ ইংলণ্ডের রেভেন্সক্রফ্ট নামক স্থানে ১৮৭২ সনে এক বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ দুইবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৯৩১ সনে তিনি তৃতীয় আর্ল রাসেল উপাধি পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে লর্ড রাসেল বলিয়া সম্বোধন করা তিনি পছন্দ করেন না।

বারট্রাণ্ড রাসেলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় হইতেছে অঙ্কশাস্ত্র এবং দর্শন। মাত্র এগার বৎসর বয়সে তিনি ইউক্লিড পাঠ করেন। তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ হইতে এম-এ ডিগ্রী পান এবং তাঁহার রচিত The principles of Maethmetics (১৯০৩ সনে প্রচলিত) যাহাতে তিনি অঙ্কশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র এবং প্রতীকের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন—বিশ্বের পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেডের সহযোগিতায় তিনি বিশ্ববিখ্যাত Principles Mathemetics নামক গ্রন্থ তিনখণ্ডে প্রকাশিত করেন।

ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। তিনি ছিলেন ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য, নারীদের ভোটাধিকারের প্রথম সমর্থকগণের একজন এবং এক সময়ে তিনি পার্লেমেন্টের সভ্যপ্রার্থীও হইতে পাইয়াছিলেন কিন্তু উদারনৈতিক দল তিনি স্বাধীন চিন্তাবাদী বলিয়া তাঁহার উক্ত দলভুক্ত প্রার্থী হইবার আবেদন নাকচ করিয়া দিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং যুদ্ধ বিরোধিতার 'pacifist and consciontious object) জন্য ইংরেজের জেলে কাটান। জেলে বসিয়া তিনি Introduction to Mathemetical Philosophy নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন।

তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নানা ষ্টেটে ভ্রমণ করিয়া বহু বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (চীনদেশে), লস্এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজ অব সিটি অব নিউইয়র্কে অধ্যাপনা করিয়াছেন। শেষোক্তস্থানে তিনি 'ধর্ম্ম এবং নীতি'র শত্রু বলিয়া জনসাধারণের এক প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

সাম্প্রতিককালে নিরস্ত্রীকরণ ও আনবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিরুদ্ধে তিনি প্রবলভাবে বাধা সৃষ্টি করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ১০০ জন মিলিয়া বৃটিশ সরকারের আণবিক অস্ত্র নীতির সক্রিয় বিরোধিতা করিবার জন্য যে সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে রাসেল উহার নেতা এবং পরিচালক।

১৯৬১ সনে, তাঁহার নব্বই বৎসরে পদার্পণের বৎসর। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আণবিক অস্ত্রনীতির প্রতিবাদে যে বিরাট অবস্থান-ধর্মঘট হয় তাহা পরিহার না করার দরুণ তাঁহার এক সপ্তাহ কারাবাস হয়। যে জেলে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবদ্ধ ছিলেন এবারও সেই জেলেই তাঁহার স্থান হইয়াছিল।

১৯৫০ সনে বারট্রাণ্ড রাসেল সুইডিস একাডেমি হইতে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পান। মৌলিক, বলিষ্ঠ, যুক্তিবাদী সাহিত্যিক অবদানের জন্য তাঁহার এই পুরস্কার লাভ। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নায়কগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা ও সমাজ-চিন্তা বিষয়ে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র আগ্রহের সহিত পঠিত হয়। মানবতার এবং স্বাধীন চিন্তার সমর্থক হিসাবে তিনি এ যুগে অদ্বিতীয়। তিনি পৃথিবীর নানা বিজ্ঞ-সমাজ হইতে বহু সম্মানলাভ করিয়াছেন এবং ৪৪ খানিরও অধিক মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বারট্রাণ্ড রাসেলকে ধর্ম্ম সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করা হয় তাহাতে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন নিম্নে তাহা দেওয়া হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনি অজ্ঞানবাদী এবং তাঁহার মন্তব্যগুলি বিভিন্ন বিষয়ে। উত্তরগুলি একজন অজ্ঞানবাদীর অভিমত বলিয়াই গ্রহণীয়।

অজ্ঞানবাদীরা কি নাস্তিক ?

না, একজন নাস্তিক একজন খ্রীষ্টানের মতই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর আছে কি না জানা সম্ভব। অজ্ঞানবাদী

বলে ঈশ্বরসম্পর্কীয় জ্ঞান সম্ভব নহে। অজ্ঞানবাদী ঈশ্বর আছে কি না এ সম্বন্ধে কোন মতই প্রকাশ করিবে না, সে নীরব থাকিবে। আবার ইহাও হইতে পারে অজ্ঞানবাদী বলিবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদিও অসম্ভব নয়, তবুও ইহার সম্ভাবনা খুবই কম। সে এরূপও বলিতে পারে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এত অসম্ভব যে ব্যবহারিক জীবনে ইহার বিষয়ে চিন্তা করা অবান্তর। এক্ষেত্রে অজ্ঞানবাদী নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিকের খুব কাছাকাছি। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী চতুর গ্রীক দার্শনিকগণের প্রাচীন দেবতাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মত অনেকটা। আমাকে যদি কেহ জিয়াস্, পসিডন, এবং হেরা প্রভৃতি অলিম্পিয়ান দেবতাগণকে অ-প্রমাণ করিতে বলে আমার পক্ষে উহার চরম যুক্তি দেওয়া সম্ভব নহে। একজন অজ্ঞানবাদী খ্রীষ্টানের ঈশ্বরকে গ্রীকদের দেবতার মত অসম্ভব মনে করিতে পারে, সেক্ষেত্রে কার্য্যতঃ সে একজন নাস্তিক ব্যতীত আর কিছু নহে।

আপনি ভগবানের নির্দ্দেশ মানেন না, তবে মানুষ কাহার নির্দ্দেশে নিজেদের জীবনপথে পথ চলিবে?

অজ্ঞানবাদী একজন ধর্মীয়ব্যক্তি যে অর্থে "কর্তৃত্ব" মানে সে অর্থ মানে না। তাহার মতে মানুষ নিজেই নিজের পথ চলার বিষয় বিচার করিবে। অবশ্য সে অপরের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাইবে, এবং কিছুই চরম বলিয়া বিনা যুক্তিতে গ্রহণ করিবে না। ঈশ্বরের নিয়ম কাল এবং স্থান বিশেষে পরিবর্ত্তনশীল বাইবেল হইতে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যথা মৃত কোন এক ব্যক্তির ভ্রাতা তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিবে এই সম্পর্কে।

আপনি ভাল এবং মন্দ জানিবেন কিরূপে? অজ্ঞানবাদীর নিকট 'পাপ' কি?

একজন খ্রীষ্টান ভাল বা মন্দ সম্বন্ধে যতটা নিশ্চিত অজ্ঞানবাদী ততটা নিশ্চিত নহে। অনেক খ্রীষ্টান মনে করিত ধর্ম সম্বন্ধে যাহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত নহে তাহাদের নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। অজ্ঞানবাদীরা এরূপ ব্যবস্থার বিরোধী। মানুষের মতপ্রকাশ এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে সে খুবই উদার।

'পাপ' শব্দের ব্যবহার অবান্তর মনে হয়। অবশ্য মানুষের কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য আছে। মানুষ অন্যায় করিলে তাহাকে শাস্তিও দিতে হইতে পারে ভবিষ্যতের সংশোধনের জন্য। আক্রোস বশে শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে অথচ 'পাপের' শাস্তি নরকভোগ প্রতিহিংসামূলক।

অজ্ঞানবাদী কি নিজের খুসীমত যাহা কিছু করিতে পারে?

এক অর্থে না, আবার অন্য অর্থে সকলেই নিজের ইচ্ছামত সকল কিছু করিয়া থাকে। ধরা যাউক, এক ব্যক্তি অপর একজনকে এত ঘৃণা করে যে খুন করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে হঠাৎ করে না যেহেতু ধর্ম বলে খুন করা পাপ এরূপ উত্তর পাওয়া যায়। অজ্ঞানবাদীরাও এরূপক্ষেত্রে খুন করে না মিলিত হইয়া প্রমাণ করে। উভয়ক্ষেত্রেই খুন না করিবার উদ্দেশ্য একই। আসল কথা শাস্তির ভয়। কেবল শাস্তির ভয় নহে, মৃত ব্যক্তির সেই বিভৎস চেহারা স্মরণ করিয়া মানুষ খুনে বিরত হয়। তাহা ছাড়া বিবেক বলিয়া একটা জিনিস আছে। সভ্য আইন-কানুন-সমাজে বাস করিলে এই নিষ্ঠা মানুষকে কুৎসিত লোক হইতে দূরে রাখে। অবশ্য ভগবানকে খুসী করিবার জন্য লোক অন্যায় হইতে বিরত হইতে পারে কিন্তু বন্ধুদের খুসী রাখিবার জন্য কিম্বা সমাজের প্রশংসা পাইবার জন্যও সৎ কাজ করে। নিছক নৈতিক বোধ হইতেই মানুষ সকল সময় ন্যায়ভাবে কার্য্য করিবে ইহা সব সময় ঠিক নহে।

প্রশ্নের উত্তরে রাসেল বলেন যে 'বাইবেল' তিনি ঈশ্বরের জন্য বলিয়া স্বীকার করেন না আর যীশুকে ভগবান বলিয়া মানেন না। কিন্তু অজ্ঞানবাদীরা তাঁহার জীবন ও বাণীকে যেমনটি সুসমাচারে (gospils) বর্ণিত হইয়াছে, উহার প্রশংসা করে। অনেকে যীশুকে বুদ্ধ সোক্রেটিস কিম্বা এব্রাহাম লিঙ্কনের সমপর্য্যায়ে স্থাপন করে। যীশুর বাণী চরম সত্য বলিয়া অজ্ঞানবাদী গ্রহণ করে না। যীশুখ্রীষ্ট কুমারী মেরীর গর্ভজাত বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। এ গল্প পেগানদের নিকটে ধার করা। জোরোয়াষ্টার (আবেস্তা), ইসটার (বেবিলনের দেবী) প্রভৃতির জন্ম সম্বন্ধেও এরূপ কুমারীর সন্তান প্রসবের প্রবাদ আছে। ভগবানে বিশ্বাসীরাই এইরূপ কাহিনীতে বিশ্বাসী হয়। বিজ্ঞানবাদীরা খ্রীষ্টান কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে রাসেল বলেন যে খ্রীষ্টান বলিতে যদি ভগবানে, যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস হয় তবে অজ্ঞানবাদী খৃষ্টান নয়। তবে খ্রীষ্টানদের মধ্যে একদল যথা ইউনিটেরিয়ানগণ (Unitarians) যীশুর ভগবানত্ব মানে না। অনেকের আবার ভগবান সম্বন্ধেও ধারণা বদলাইয়াছে, একটা অব্যক্ত শক্তি যথা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং অন্তর্নিহিত রহিয়া জগৎ পরিচালনা করিতেছে এরূপ কিছু, আবার

কেহ খ্রীষ্ট ধর্মকে এক প্রকার নৈতিক উপদেশ বলিয়া মানে এরূপ সম্প্রদায়ও আছে। ইহারা খ্রীষ্টীয় ধর্মের এই সকল বিশেষত্বকে, নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু, কেবল মাত্র খ্রীষ্ট ধর্মই আছে বলিয়া ভুল করে। ইহুদী, বৌদ্ধ, ইসলাম ও অন্যান্য অ-খ্রীষ্টান এই সকল জাতিও অন্যান্য বিশেষত্ব বা নীতি কথা নিজেদের ধর্মের বৈশিষ্ট বলিয়া দাবী করে। রাসেল বলেন, এরূপ অবস্থায় একজন অজ্ঞানবাদীর পক্ষে নিজেকে খ্রীষ্টান বলা চলে না।

অজ্ঞানবাদীর মানুষের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার সম্বন্ধে রাসেল বলেন যে, আত্মার কোন সংজ্ঞা দিলে প্রশ্নটা অস্পষ্ট। যদি ধরিয়া লওয়া যায় আত্মার অর্থ এরূপ কিছু অ-ভৌতিক যাহা অসত্য মানুষে থাকে এবং অমরত্বে বিশ্বাসীর ধারণা মৃত্যুর পরেও চিরদিন থাকে। 'আত্মার' এরূপ অর্থ হইলে অজ্ঞানবাদীর পক্ষে আত্মায় বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অজ্ঞানবাদী জড়বাদী (materialist) নহে। আমার মত অজ্ঞানবাদী দেহ এবং আত্মা উভয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বেশ সন্দেহশীল—অবশ্য বিষয়টি দর্শনের একটি জটিল প্রশ্ন।

মৃত্যুর পরে জীবন স্বর্গ মর্ত সম্বন্ধে রাসেল বলেন যে, বিজ্ঞানবাদী মৃত্যুর পারে কি হইবে এই বিষয়ে ইহার স্বপক্ষে না বিপক্ষে কোন প্রমাণ অভাবে, অস্তিত্ব থাকে বলিয়া স্বীকার করে না।

তবে কেহ মৃত্যুর পরেও মানুষের অস্তিত্ব আছে প্রমাণ করিতে পারিলে অবশ্য মত পরিবর্তন সম্ভব কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না হয় ততদিন দেহের মৃত্যুর পর 'প্রাণ' বা 'আত্মা' বলিয়া কিছু থাকে স্বীকার্য্য নহে।

স্বর্গ ও নরক—পুরস্কার এবং শাস্তি যে কারণেই হইয়া থাকে—মানুষকে সংশোধন করিবার জন্য নহে। কোন অজ্ঞানবাদী এই সকলে বিশ্বাস করে না।

নাস্তিকতার জন্য ভগবানের অভিশাপে তিনি ভীত কিনা প্রশ্নের উত্তরে রাসেল বলেন যে, জিয়াস, জুপিটার, ওডিন এবং ব্রহ্ম সকলই তিনি অস্বীকার করেন কিন্তু ইহাতে তাঁহার অস্বস্তি বোধহয় না। পৃথিবীর অনেক লোকই ভগবানে বিশ্বাস করে না এবং একজন দৃশ্যতঃ কেহ শাস্তি পাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। আর যদি ঈশ্বর প্রকৃতই থাকেন এই সব অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে অস্বীকার করার জন্য তিনি মোটেই বিচলিত হন না।

পৃথিবীর সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃতিতে সামঞ্জস্য (harmony) সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে এক জীব অপর জীবের প্রাণ সংহার করিয়া বাঁচিতেছে। আর সকল প্রাণীই কি দেখিতে সুন্দর? যথা ফিতা কীট (Tape worm)। আর যদি বলা হয় অসীম আকাশের সুন্দর তারকামণ্ডলী সুন্দর। ইহারও কোন কোনটার হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় এবং মহাশূন্যের অংশ বিশেষ অব্যক্ত কুজ্ঝটিকায় পূর্ণ হইয়া যায়। সৌন্দর্য্য দ্রষ্টার নিজের সৃষ্টি, ইহা বাহিরের জিনিষ নয়।

অজ্ঞানবাদী ভগবানের অসীম ক্ষমতায় এবং দৈবে বিশ্বাস করে কি না ইহার উত্তরে বলেন, দৈব বলিয়া কিছু নাই। বিশ্বাস দ্বারা রোগ আরোগ্য হয় ইহা সত্য হইলেও ইহাতে দৈবের কিছু নাই। সকল ধর্মেই এই সকল গল্প আছে, অজ্ঞানবাদী এই সকলে বিশ্বাস করে না। রোগীর নিজের মানসিক ক্রিয়ার ফলেই ইহা সম্ভব হয়।

লোকে ধর্মের পথ ত্যাগ করিলে মানবজাতি ধ্বংশ হইবার সম্ভাবনা এরূপ বলিলে রাসেল বলেন যে, মানুষের হীনবৃত্তি আছে নিঃসন্দেহ কিন্তু ইতিহাসে ধর্ম এই সকল প্রকৃতিতে সংযত করিয়াছে এরূপ দেখা যায় না বরং ইহা এই সকল কুবৃত্তিকে সমর্থন এবং আশীর্বাদ করিয়াছে। ধর্মের নামে বহু অমানুষিক নিষ্ঠুর কাজ হইয়াছে প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম তাহার সাক্ষ্য দেয়। দয়া ও সহানুভূতির প্রশ্ন তখনই আসে যখন এই সকল ধর্মীয় আদেশ অন্ধভাবে পালিত হয় না। একালে এক নূতন ধর্ম দেখা দিয়াছে সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম। ইহার আদেশ হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। এককালে যেরূপ অবিশ্বাসীকে পোড়াইয়া মারা হইত ইহাও প্রায় সেই রকম, আজ যদি খ্রীষ্টানদের মধ্য হইতে নিষ্ঠুরতা দূর হইয়া থাকে তাহা বহু স্বাধীন চিন্তাবিদ এবং সংস্কারকের জন্য। আমার মতে পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ধর্মদ্বারা মানুষের যে পরিমাণ দুঃখ নিবারিত হইয়াছে, বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী।

অজ্ঞানবাদীর নিকট জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে রাসেল বলেন, নিশ্চয়ই ব্যক্তির নিকট জীবনের একটা আদর্শ আছে কিন্তু জীবন সমষ্টির কোন আদর্শ মানিতে পারে না। ব্যক্তি আদর্শের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করে, লাভালাভ বিচার করে না।

ধর্মকে অস্বীকার করিয়া কি বিবাহ ও সতীত্বকে অস্বীকার করা হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে রাসেল

করিয়া বা প্রয়োজনমত বাড়তি কাটিয়া নিমাই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে ধরিবার জন্য সাউথ ষ্টেশনের দিকে ছুটিতে লাগিল।

গত ছ মাস ধরিয়াই নিমাইয়ের এই জীবন কাটিতেছে। ভারত-বিভাগের পর সদ্যসৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তান হইতে যখন দলে দিলে লোক ভারতবর্ষের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে, নিমাইয়ের পরিবারও তখন গ্রাম ছাড়িয়া এই আশ্রয়সংগ্রহব্যাকুল জনতার সঙ্গে যোগ দেয়। যানবাহনের অসুবিধা, পথে গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের নির্যাতন ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা কিছুই ইহাদের দমাইতে পারে নাই। আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার একটা মিশ্রিত আকুলতা ইহাদের ভারতবর্ষের দিকে ঠেলিয়া আনিতে থাকে। ইহাদের অনেকে এত করিয়াও ও শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। নিমাই-য়ের পরিবারও পারে নাই। আত্মীয় বান্ধবচ্যুত নিমাই কোনও রকমে আসিয়া ছিটকাইয়া পড়ে ভারতবর্ষের সীমানায়। সেখান হইতে সরকারী কর্মচারিরা তাকে রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে আনিয়া জায়গা দেয়। সে প্রায় স্বপ্নের মতো ঘটনা।

কিছুদিন একটা বিহ্বলতার মধ্যে কাটিল। যাহা চোখে পড়িতেছে, কিছুই যেন বাস্তব নয়! যেন একটা নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। ক্রমে নিমাই পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। বাঁচিবার আগ্রহ ক্রমে তাকে সজীব করিয়া তুলিল। রাণাঘাটের আশ্রয়-শিবির হইতে একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে কলিকাতার উদ্দেশে পলায়ন করিল।

নিমাইয়ের প্রার্থনা সফল হইয়াছে। ভদ্রলোক তার বিশীর্ণ রুক্ষ চেহারা দেখিয়া ও কথার টান শুনিয়া সহজেই বুঝিয়া লন যে, ছোকরা নির্ঘাত শিয়ালদ ষ্টেশনের অনাথ আশ্রয়প্রার্থী। ব্যাগ খুলিয়া তাকে একটি সিকি বাহির করিয়া দিয়াছেন।

ইহার অর্দ্ধেক ননীদিকে দিতে হইয়াছে তার প্রাপ্য অংশ হিসাবে। সেই নিমাইকে সাহায্য চাহিতে পাঠাইয়াছিল।

ননী তাদের গ্রামেরই মেয়ে। বছর একুশের অবিবাহিত তরুণী। নিমাইয়ের চেয়ে বছর দেড়েকের মাত্র বড়, কিন্তু কর্তৃত্ব ফলাইতে তার জুড়ি নাই। গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে সে অত্যন্ত চটপটে। এক কথা বলিলে তিন কথা শুনাইয়া দিবে। নিমাই চিরদিনই তাকে সমীহ করিয়া চলে।

নিজের অংশের দু'আনা হইতে নিমাই ফেরিওলার কাছ হইতে দু'পয়সা দামের এক আইসক্রিম কিনিয়াছে এবং দু'পয়সার চিনা বাদাম দূরদর্শিতা হিসাবে দুই পকেটে ভরিয়া রাখিয়াছে। শিয়ালদ ষ্টেশনের প্রবেশ-ফটকে ঠেস দিয়া বিচিত্র যাত্রীপরিপূর্ণ ট্রাম বাস ট্যাক্সি ও জনতার দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া সে আইসক্রীমের কাঠি চুষিতেছিল। ইতিমধ্যে সে শিয়ালদ বাজার পর্য্যন্ত যাইতে শিখিয়াছে এবং দু'দিন ট্রামগাড়ীর পাদানিতে চড়িয়া কণ্ডাক্টারের বকুনি খাইয়াছে। ইচ্ছা আছে, শীঘ্রই একদিন সহরটার ভিতরে ঢুকিয়া দেখিবে কিন্তু এখনও সাহস পাইতেছে না। ননীদিকে যে বাবুটি চাকরি দিবে বলিয়াছে, তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া সেও একটা চাকরি চাহিয়া লইবে। তখন ট্রামগাড়ীতে চড়িয়া সেও সহরের নানা জায়গা ঘুরিয়া দেখিতে পারিবে। কে জানে ননীদি বাবুকে বলিয়াছে কিনা যে, নিমাই যথেষ্ট লেখাপড়া জানে—এমন করিয়া চলিয়া আসিতে না হইলে নবগঞ্জ হাইস্কুল হইতে এবার সে স্কুল ফাইনাল দিত! কাকা বলিয়াছিলেন, স্কুল ফাইনাল পাস করিতে পারিলে নাজির বাবুকে ধরিয়া মহকুমার আদালতে তাকেও 'প্রসেস সার্ভারে'র কাজে ঢুকাইয়া লইবে। আদালতে চাকরি করা কম সম্মানের কথা নয়। কাকাকে পাঁচজনে অমনি অত খাতির করিত? কাকা সমন লইয়া গেলে আদালতে হাজির হওয়া ছাড়া আর নাকি উপায় থাকিত না! কিন্তু হায় রে সেসব! ভাবিয়া আর লাভ কি?

'দ্যান না মশয় ট্রাকটা আমি নেই?'

নিমাইয়ের ঠিক সামনে লোকটি রিকসা হইতে ফুটপাথে নামিয়াছে এবং রিকসাআলার ভাড়া মিটাইয়া পাড়ের ঢাকুনা-দেওয়া স্যুটকেসটা রিকসার পা রাখিবার জায়গা হইতে নিজ হাতে তুলিয়া লইয়াছে। চকিতে নিমাই আয়ের একটা সুযোগ আবিষ্কার করিয়া যাত্রীটির কাছে আগাইয়া গেল। ইহার গন্তব্যস্থল যে শিয়ালদ ষ্টেশন, তাহা নিঃসন্দেহ।

লোকটা একবার সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল নিমাইয়ের দিকে। কোথাকার রাস্তার ছোক্‌রা, ইহার হাতে বাক্সটি সমর্পণ করিতে বহিয়া গেছে তার। তা ছাড়া কুলিই ডাকিবে, না সামান্য কষ্ট করিয়া পয়সা বাঁচাইবে সে সম্বন্ধে সে কিছু স্থির করে নাই। ইহার মশয় ডাকটিও সে পছন্দ করে নাই। কুলির কাছ হইতে 'বাবু' ডাকই লোকে প্রত্যাশা করে।

'এক আনা দিয়েন।' নিমাই কহিল। 'কুলি ডাকলে তো চাইর আনা আদায় করবো।'

'কিন্তু কুলি তো একেবারে ভেতর পর্য্যন্ত যেতে পারবে, তোকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেবে কি?' যাত্রী তাকে পাত্তা না দিবার ভঙ্গিতে কহিল।

'দিবো। গেটের বাবুরা সক্কলেই আমাগো চিনে।' নিমাই কহিল। 'আমরা রিফুজী। এইখানেই থাকি। দ্যান না বাবু, চাইর পয়সার মুড়ি কিনা খামু...'

মুড়ি কিনিবার পয়সা তার পকেটেই আছে এবং মুড়ি কিনিবার কোনও আশু প্রয়োজনও ছিল না কিন্তু গত ছ'মাসে দয়া উদ্রেক করিবার এই কায়দাটা ইহাদের রপ্ত হইয়া গেছে।

যাত্রীমহাশয় দ্বিধায় পড়িলেন। অল্পবয়সী ছোকরা-টার চেহারা এবং আবেদনের ভঙ্গিতে একটু করুণাই বোধ করিলেন। কিন্তু যারা কথায় কথায় হট করিয়া কুলি ডাকে তিনি সে শ্রেণীর লোক নন। দোকানের জন্ম কলিকাতায় মাল খরিদ করিতে আসিয়াছিলেন, লাভের একটা অংশ কুলির হাতে তুলিয়া দিতে খুব একটা ইচ্ছা নাই। কিন্তু মাত্র চার পয়সায় হইয়া গেলে বেচারি রিফুজী ছোকরাটাকে একটু সাহায্য করিতে ক্ষতি কি? শিয়ালদহ ষ্টেশনে এরা কি অবস্থায় আছে প্রতি সপ্তাহেই ষ্টেশন দিয়া যাতায়াতের সময় একবার করিয়া স্বচক্ষে তাহা দেখিতে হয়।

'আচ্ছা নে। এক আনার বেশি কিন্তু দেব না। একেবারে ট্রেনের কামরায় চাপিয়ে দিতে হবে...'

নিমাই সাগ্রহেই হাত বাড়াইয়া আগাইয়া গেল। এখান হইতে চার পয়সা পাইলে দুই পয়সা দিয়া দুলীকেও একটা কমলা আইসক্রীম কিনিয়া দিবে। কমলা আইসক্রীম দুলীরও বিশেষ প্রিয় বস্তু, কিন্তু নিজেরটা কিনিবার সময় প্রাণ ধরিয়া নিমাই একসঙ্গে দুই দুইটা কিনিয়া পুরা এক আনা খরচ করিতে পারে নাই।

'হট্ যা ছোকরা, হট্...'

চকিতে একটা জোর ধাক্কা খাইয়া নিমাই হুমড়ি খাইয়া পড়িতে গিয়া কোনও রকমে টাল সামলাইয়া লইল। একটা পশ্চিমা রেল-কুলি ছোঁ মারিয়া যাত্রীর বাকসটি তুলিয়া লইয়াছে এবং নিমাইয়ের উদ্দেশে বিশ্রী একটা গালি নিক্ষেপ করিয়া মাথা-সহ ষ্টেশনের দিকে জোরে পা চালাইয়াছে। মাল বহন করিবার অধিকার তাহাদের—ষ্টেশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত কুলি তারা। এই অধিকার কেহ বে-দখল করিতে আসিলে তাহা কোনও রকমেই সহ্য করা হয় না।

শুধু ষ্টেশনের কুলি কেন, এ অঞ্চলের কোনও ব্যক্তিই নিজ অধিকারে হস্তক্ষেপ সহ্য করে না। প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করিয়া অনধিকারীকে নিরস্ত করিয়া থাকে। ফুটপাথে যদি চিনাবাদাম বিক্রি করিতে বস, কাছের চিনাবাদামঅলারা আসিয়া পিটাইয়া প্রতিযোগিতা দূর করিবে। যদি ফিতা বা সেফটিপিন ফিরি করিতে চেষ্টা কর, তবে ঐ সকল দ্রব্যের ফিরিঅলারা একজোট হইয়া আসিয়া নবাগত তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়া দিবে।

গত সপ্তাহে এ সম্বন্ধে নিমাইয়ের বেশ শিক্ষা হইয়া গেছে। এক বুড়া হিন্দুস্থানী খবরের কাগজওয়ালার সঙ্গে নিমাইয়ের একটু চেনার মত হইয়াছিল। বুড়ো মানুষ বোধ হয় নিমাইয়ের দুর্দশার কাহিনীতে একটু

সহানুভূতিই বোধ করিয়াছিল। হ্যারিসন ও সার্কুলার রোডের দক্ষিণপূর্ব্ব মোড়ে লোকটা সংবাদপত্র ফেরি করিত। অলস কৌতূহলে ইহার ফেরির কাজ প্রায়ই লক্ষ্য করিত নিমাই। একদিন বেলা প্রায় এগারোটার সময় হাজির হইয়া দেখে, তখনও বুড়া কাগজ ফেরি করিতেছে। অধিকাংশ কাগজ তখনও অবিক্রীত। এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। দশটার পর আগে কখনও নিমাই তাকে কাগজ লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখে নাই—তার আগেই ইহার এবং সবার কাগজ বিক্রি হইয়া যায়।

'এ ছোকরা, খবর কাগজ বিকবি? এক বিকবি তো এক পয়সা মিলবে'।

খবরের কাগজের অফিস হইতে কাগজ আনিতে আজ বুড়োর খুব দেরি হইয়া গিয়াছিল, এখন অবশিষ্ট কাগজ সবগুলি বিক্রি হইবে, এমন আশা কম।

'হ্যাঁ বেচুম' নিমাই হাতে প্রায় স্বর্গ পাইয়া কহিল। ফুটপাতে দাঁড়াইয়া গত কিছুদিন ধরিয়াই সে এই ব্যবসায়টি লক্ষ্য করিয়াছে। ইহা তাহার কাছে শুধু সহজসাধ্য নয়, বিশেষ সম্ভ্রান্তও মনে হইয়াছে। কিন্তু কোথায়ই বা খবরের কাগজ ছাপা হয়, কাহারাই বা উহা বিক্রি করিবার জন্য দেয়, কি উপায়ে উহা সংগ্রহ করিতে হয় কিছুই নিমাইয়ের জানা নাই। বুড়োর এই প্রস্তাবে সে ধন্য হইয়া গেল। বুড়ো চমৎকার লোক! আগে এক পয়সাও না চাহিয়া আধ ডজন খবরের কাগজ বিশ্বাস করিয়া তার হাতে ছাড়িয়াছে এটা কি কম কথা!

'বাবু আমি রিফুজী। দয়া কইরা একটা কাগজ কিনেন।' এই মন্ত্রটির নানা রকমের প্রয়োগ করিয়া দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিমাই গোটা চারেক কাগজ বিক্রি করিয়া ফেলিল।

'বাবু আমি রিফুজী। একটা কাগজ কিনতেই লাগব।' ট্রাম ষ্টপের কাছে সম্ভাব্য এক ক্রেতার কাছে হাজির হইল নিমাই।

'কাগজ পড়ে এসেছি। আর চাইনা ভাই।'

'অন্য কিছু নেন—ষ্টেটস্‌ম্যান, যুগান্তর...'

'কে রে তুই। কি করছিস এখেনে?' একটা নূতন ও অশুভ কণ্ঠস্বর।

নিমাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল, তার চেয়ে অনেক বড় বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা দেখিতে আরেক খবরকাগজ বিক্রেতা বগলে একগাদা দৈনিক পত্রিকা চাপিয়া রীতিমত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কাছে আগাইয়া আসিয়াছে।

বুড়া কাগজআলা, ওপাড়ের মোড়ের ঐ হিন্দুস্থানী' নিমাই ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, 'আমারে বেচতে দিছে—জিগান গিয়া...'

'বেচতে দিছে! জিগান গিয়া!' নিমাইয়ের কণ্ঠস্বরের সব্যঙ্গ অনুকরণ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা কহিল, দাঁড়া, তোর খদ্দেরকে যন্ত্রণা করা বের করচি। আনাড়ী ভূত কোথাকার—পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব ফের যদি এখানটায় আসবি...'

'বাঃ, এইটা তো সরকারী জাগা।' অন্যায় হস্তক্ষেপের একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিল নিমাই।

'বটে। সরকারী জায়গা।...ওরে গণ্‌শা আয় তো, এই উল্লুকটাকে একটু সমঝে দিই...' বলিয়া লোকটা ফুটপাথের গায়ে লাগা নোংরা চায়ের দোকানের দিকে হাঁক ছাড়িল।

গণশা এবং আরও তিন তিনটা সমব্যবসায়ী ছুটিয়া আসিল।

'কি হয়েছে রে কানাই?'

'ত্যাখনা, এই ভূতটা কোত্থেকে একগাদা খবরের কাগজ এনে সব খদ্দের ভাগিয়ে নিচ্ছে...' কানাই নালিশ করিল।

'দেনা দুটো থাপ্পড়।' বলিয়া আগন্তুক নিজেই নিমাইয়ের ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা মারিল। সমর্থনে এক-গাদা ঘুষিও চকিতে ছুটিয়া আসিল। নিমাই ফুটপাথে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। ফলে চারদিক হইতে

'কি হচ্ছে'•'কি হচ্ছে' রব উঠিল। যে ভদ্রলোকের কাছে নিমাই কাগজক্রয়ের অনুরোধ জানাইয়াছিল তিনি ঘটনাটা আদ্যোপান্ত দেখিয়াছেন। 'আহা আহা, মারছ কেন?' বলিয়া তিনি আক্রমণকারীদের নিরস্ত করিবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ট্রাম আসিয়া পড়ায় নিজের বিবেক বাঁচাইয়া তাড়াতাড়ি তাহাতে চাপিয়া বসিলেন।

অবশেষে সহৃদয় পথচারিদের সাহায্যে নিমাই যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন তার হাঁটু ও কনুইয়ের নানা জায়গায় কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং অবিক্রীত অবশিষ্ট খবরের কাগজ এবং বিক্রির পয়সা সবই হাওয়া হইয়াছে।

বুড়া কাগজঅলাকে ঘটনাটা আগাগোড়া সে সবই বলিয়াছিল। সে লোক ভাল। ক্ষতিপূরণ দাবি করে নাই, কিন্তু তারপর হইতে আর কাগজও দেয় নাই।

ইহার পর হইতে এই অদ্ভুত শহরটা সম্বন্ধে নিমাইয়ের ভয় আরও বাড়িয়া গেছে। ইহার অভ্যন্তরে ঢুকিয়া সব কিছু দেখিবার অদম্য কৌতূহলও এর জন্যই দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যথাসাধ্য সে নিজের দলের কাছাকাছিই থাকে।

কলিকাতার চলমান জীবন-দর্শন ও দু'পয়সা দামের আইসক্রীম সমাপ্ত করিবার পর নিমাই যখন নিজেদের এলাকায় ফিরিয়া আসিল, সেখানে তুমুল কলহ বাধিয়া গেছে। তাহাদের নিকট-প্ল্যাটফর্ম-প্রতিবেশী ভটচাজমশায় মহা-উত্তেজিত হইয়া খড়মহস্তে বিপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত আছেন, এই গৃহহীন মহাপরিবারের অন্যান্য কয়েকজন অতিকষ্টে তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ক্ষ্যাপা মোষের মত ভটচাজমশায় যেমন লাফালাফি করিতেছেন তাতে বেশিক্ষণ তাঁকে সামলান যাইবে এমন মনে হয় না।

'হারামজাদী মাইয়া, যত বড় মুখ না তত বড় কথা! তর থোতা মুখ খড়ম পিটাইয়া ভোতা কইরা দিমু না…'

'আন না দেখি কত বড় আপনার হিম্মত! পাঁচজনে তো দেখছে। কউক না দেখি কি দোষটা করছি? সকলের সঙ্গে একই রাস্তায় গড়াইতেছেন, এইদিকে ছোঁয়াছুঁয়ির জ্ঞান টনটনা…'

নিমাই এইবার ভটচাজমশায়ের প্রতিপক্ষকে সহজেই সনাক্ত করতে সমর্থ হইল। উদ্বিগ্ন হইয়া সে অদূরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান ননীদির দিকে সভয়ে তাকাইল। ননী তেজী মেয়ে এবং মুখরা; ঝগড়া করিতে সে-ও পিছু-পা নয়।

'ছাড়, তরা ছাড় আমারে; বাধাপ্রদানকারীদের বাহু বেষ্টন ছাড়াইবার প্রচণ্ড চেষ্টা করিয়া ভটচাজ কহিলেন। 'বান্দরী মাইয়াটারে উচিত শিক্ষা দিয়া দই …আমি কইছি দুলীরে। তুই গায়ে পইড়া আমার লগে কোন্দল করতে আলি কোন্ সাহসে? তর বাপে আমার দিকে চউখ তুইলা কথা কইত না, তুই হারামজাদী…'

'দ্যাখেন, হারামজাদী হারামজাদী কইয়েন না। গাইল আমিও পাড়তে পারি। বাবায় চউখ তুইলা কথা কইতেন না, কিন্তু তার মাইয়া ছাইড়া কথা কইব না, শুনাইয়া দিব •'

'শুনাইয়া দিবি! কি শুনাইবি শুনি? শুনাইতে পারি আমি। তর মায়ের কীর্তিকথা…'

'আহা করেন কি, ভটচাইজমশায়। চাইর দিকে যে লোক দাড়াইয়া হাসন আরম্ভ করছে। থামেন।' শান্তিস্থাপনপ্রয়াসীদের একজন কহিল।

'আরে সাধে চটি নাকি উমাচরণ?' আন্তরিক অভিযোগের কণ্ঠে কহিলেন ভটচাজমহাশয়। 'আমি দুলীরে কইছি: "ওমুন আচল উড়াইয়া চলস্ ক্যান রে ছেমরী; রান্ধা জিনিষ যে ছোওয়া হইয়া গেল বেয়াদ্দপ!" ওমনেই এই কুত্তী খ্যাক কইরা উঠল: "আরে মরণ! অখনও ছোওয়াছুয়ির জ্ঞান টনটনা!" টনটনা থাকব না ক্যান শুনি? জাইত বাচাইতেই তো পাকিস্থান ত্যাগ কইরা আইলাম! অখন কইলকাতায় আইসা সেই জাইতই খোয়ামু? তের জাইতের ভিড়ে আছি বইলা কি চণ্ডালের ছোওয়া অন্ন মুখে দিতে লাগব?…'

'এত আক্কেলও যার জাতের নাড়ী টনটনা চণ্ডাল সে! আমরা কায়েতের মাইয়া…'

আগুনে আবার ঘৃতাহুতি পড়িল। ভটচাজের ক্রোধে কিছুটা ভাটা পড়িয়াছিল, আবার তাহা প্রচণ্ড গর্জন করিয়া প্রদীপ্ত হইল। অকথ্য গালাগালিতে মুখর হইল ষ্টেশনের চৌহদ্দি। হিন্দুস্থানী কুলিরা দল বাঁধিয়া বাঙালীর ঝগড়া উপভোগ করিতেছিল, এইবার তারাও নানারকম টিপ্পনী শুরু করিল। কিন্তু ভটচাজকে আটকাইয়া রাখাই মুস্কিল। এদিকে ননীর পক্ষেও লোক দাঁড়াইয়াছে। উভয় পক্ষের চেঁচামেচি, বাহু-আস্ফালন ও ঠেলাঠেলিতে একটা প্রচণ্ড মারামারির সূচনা দেখা দিল। দর্শকদের কেহ কেহ ভয় পাইয়া 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলিয়া হাঁক দিল। এরা জানে না, এই ধরণের কলহ দিনে অন্তত পাঁচ সাত বার করিয়া বাধে। অজস্র হুঙ্কার ও তিরস্কার বর্ষণের পর উত্তেজনা কাটিয়া যায়। আবার ইহাদের দারিদ্র্য, ক্লেদ, অভিযোগ ও ভিক্ষান্নে উদরপূর্তির জীবন রুটিন-অনুসারে চলিতে থাকে। বাস্তু নাই, আব্রু নাই, শান্তি নাই, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করিবার কিছু নাই। যেমন করিয়াই হোক আগে প্রাণ বাঁচাও ; তার পর দেখা যাক কি হয়।

ভটচাজের এই উত্তেজনা আরও কতক্ষণ চলিত কে জানে, এমন সময় দুলীর জ্যাঠা পিতাম্বর পাল কোথা হইতে আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর চুলের মুঠি আঁকড়াইয়া ধরিলেন এবং এতগুলি দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে দুলীর পিঠে দুম্ দুম্ করিয়া পাঁচ সাতটা বিরাট কিল বসাইয়া দিলেন। অনাহারক্লিষ্ট নাকীসুরে কহিলেন, 'শয়তান মাইয়া, সারাক্ষণ লাফালাফি কইরা বেড়াও, চউখে দেইখা চলা ফিরা কর না? তরে কইছি কি মুখপড়ী? চুপ মাইরা এইখানে বইয়া থাকবি। এই দিকে ঐ দিকে গিয়া ছেইলা-ধরার হাতে পড় আর সব্বনাশ হউক!···আবার উঠবি তো তর ঠেংরি ভাইঙ্গা না দেই তো কি কইলাম···'

পিতাম্বরই এখন দুলীর অভিভাবক। শাসন করিবার অধিকারও তারই।

দুলী জ্যাঠার এই আদেশ সারাটা দুপুর নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করিয়াছিল। বিকালে মেইন ষ্টেশনের বাহির হইতে নিমাই তাকে একটা দু'পয়সা সাইজের বিস্কুট দেখাইয়া ডাকিল। পিতাম্বর আফিমখোরের মত ঝিমাইতেছিল—প্রায় সারাক্ষণই সে এই রকম ঝিমায়। জ্যাঠিমার কাছে প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কারণ দর্শাইয়া এবার দুলী সরাসরি বিস্কুটের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

খাদ্যের মত এমন আকর্ষণীয় জিনিষ ইহাদের কাছে আর কিছুই নয়। লোকের কাছে পয়সা চাহিতে দুলীর লজ্জা করে। সে জানে, নিমাই নানা উপায়ে দু'চার পয়সা নিত্যই সংগ্রহ করে। সেই পয়সা হইতে প্রায়ই 'লালিপাফ্', চানাচুর ও লজেঞ্জুষ জাতীয় নানা বিলাসিতার ব্যবস্থা হয়।

'ভাইগ্যে তুই আছিলি নিমাইদা, নাইলে এই সব আর খাইতে হইত না।' রাস্তা হইতে ষ্টেশনের বাঁধানো চত্বরে উঠিবার সিঁড়ির এক প্রান্তে নিমাইয়ের পাশে বসিয়া দুলী সকৃতজ্ঞভাবে কহিল। 'কেঐরে কইস না নিমাইদা, আমরা চাকরি নিমু। ননীদি সমিতির এক বাবুরে কইয়া ঠিক করছে···'

'আমি জানি।' নিজের বিস্কুটে বড় একটা কামড় লাগাইয়া নিমাই কহিল।

'জানস্! কেমনে জানস্ নিমাইদা? ননীদি কইছে বুঝি? দুলী সবিস্ময়ে কহিল। 'এই দিকে আমারে দিব্যি দিয়া কইছে কেঐরে য্যান কইনা। সমিতির বাবু কইছে, কওয়াকওয়ি হইলে তোমাগো বাপ-মায়েরা আপইত্য করব, হাসপাতালে গিয়া হৈ-চৈ লাগাইব। ফলে তোমাগোও কাম যাইব আর আমি নিজেও হাসপাতালের কর্তাদের কাছে গাইল খামু।··· দেখিস্ নিমাইদা, প্রথম মাসের মাইনা পাইলে তরে কি রকম মিঠাই খাওয়াই! যা তর প্রাণে চায় খাওয়ামু। আর শোন নিমাইদা, যাওনের ঠিক আগে চুপে চুপে আইসা আমি তরে খবর দিয়া যামু। তুই করিস কি, পিছে পিছে যাইস। জাগাটা দেইখা আসিস। কিন্তু কেঐরে কইস না। লক্ষীমার দিব্যি! কামে পাকা হইয়া আমিই জ্যাঠা-জেঠীরে ইষ্টিশান থন্ লইয়া যামু। তার আগে কিন্তু অগো কালাইয়া পালাইস না,

খবরদার! একটা ছোটখাট বাসা দেইখা রাখিস, বুঝলি নি নিমাইদা? তুই একদিন পর পরই গিয়া দেখা করিস। তখন আর যা যা কওনের কমু…'

তুলীর মা খুব ছোট বেলা হইতেই নিমাইকে জামাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা লইয়া আত্মীয়স্বজনের পরিহাসে দুজনই লজ্জা পাইত। কিন্তু সেই পারিপার্শ্বিক চুরমার হইয়া গিয়াছে। এখন উহা লইয়া দুজনের কাহারও আর কোনও সংকোচ নাই।

তুলী নিমাইয়ের বছর তিনেকের ছোট। রোগা, ফর্সা, লম্বা গড়নের মেয়েটি। বড় বড় স্নিগ্ধ চোখ। ময়লা সাড়ি ও সেমিজ পরা; চুল রুক্ষ ও আবাঁধা। কিন্তু একটু ঘষিলে মাজিলে সে যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে তাহা তার সাজ-পোশাক ও দেহের অপরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও বুঝিতে কষ্ট হয় না। ননীর মত সে চটপটে নয়, কিন্তু অনেক কমনীয় দেখিতে। ননীর মধ্যে পরিপক্কতার ভাব আছে। তুলী এখনও প্রায় নাবালিকা, লাজুক এবং ভীরু স্বভাবের।

'নিজেরা পালাইয়া আমারে পরামর্শ দেওন হইতাছে, পালাইস না খবরদার।' নিমাই প্রায় প্রতিবাদের সঙ্গে কহিল। 'মা বাপের সন্ধানে থাকতে চাও তো চাকরি লইয়াই এগো কাছে চইলা আইসো। আমি কবে আছি কবে নাই, তার কিছুই ঠিক নাই। আর দ্যাখ, পাবস্ যদি তবে আমারেও ঐখানে একটা কাম খুইজা দিস্। এমুন ভিক্ষুকের মত আর পইড়া থাকতে ইচ্ছা করে না…'

'ওমা! কি কস্ নিমাইদা!' তুলী স্তম্ভিত হইয়া কহিল। 'আমরা হাসপাতালে ঝিয়ের কাম ধরতে চলছি। তুই লেখা-পড়া জানস্ তুই ছোট কাম ধরবি কোন্ দুঃখে? সমিতির বাবু গো ধর। দেখিস, আফিসেই তর কাম হইব। ঐরে ননীদি আইতাছে। দেখলেই অখন হাজারটা জেরা করব। আমি এই দিক দিয়া সইরা পড়ি। কিন্তু যা কইলাম, মনে থাকে য্যান, নিমাই দা। বাবুটা যখন নিতে আইব, এক ফাঁকে তরে কইয়া যামুনে। চুপে চুপে আসিস কিন্তু। জাগাটা দেইখা চিনা আসবি। রাস্তাঘাট কিছু চিনি না, ডর করে। ননীদিরে এই কথা কইস না কিন্তু। তাইলে আমারে নিবই না। কয়, দেখিস্ যদি ডরাস তবে কিন্তু নিমুনা, পূবপাড়ার সন্ধ্যারে লইয়া যামু, সেও যাইতে চায়…বাবু নাকি কইছে, পরে য্যান আবার পিছাইও না, তবে হাসপাতালের কর্তা গো কাছে আমার নাক কাটা যাইব, যা ভাবনের আগেই ভাইবা দেখ…'

'আমার কইতে বইয়া গেছে।' বলিয়া নিমাই তাচ্ছিল্য-ভরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তুলীর প্রতি আর বাক্য ব্যয় না করিয়া সদর রাস্তার দিকে আগাইয়া গেল। কলিকাতা আবিষ্কার প্রথম সোপান এই রাস্তা!

(ক্রমশঃ)

———

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

উৎপাদন মন্দা ও কর্ম্মসংস্থান সমস্যা

চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের সমাপ্তি ও বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে নূতন সরকার গঠন ও প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যে সকল গুরুতর সামাজিক সমস্যা প্রশাসনিক কাঠামোটিকে কণ্টকিত করে তুলেছে তার মধ্যে খাদ্য সমস্যার পরেই সকলের চেয়ে যে সমস্যাটি সবচেয়ে গুরুতর আকার ধারণ করেছে সেটি শিল্পক্ষেত্রে শিল্পজ পণ্যাদির চাহিদায় মন্দা এবং তজ্জনিত কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রটির অনিবার্য সঙ্কোচনের আশঙ্কা।

বস্তুতঃ যাঁরা দেশের আর্থিক অবস্থা ব্যবস্থায় সম্যক সংবাদ রেখে থাকেন তাঁরা জানেন যে সমস্যাটি সহসা উদ্ভব হয় নি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের গতিতে উক্ত পরিকল্পনাকালের মধ্য ভাগ থেকেই যে শ্লাথ্য ঘটতে সুরু করেছিল এবং যার ফলে পরিকল্পনার প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে যে অন্তর্বর্তী mid term তদন্ত ও বিচার appraisement জরুরী হয়ে উঠেছিল, তখন থেকেই শিল্পপণ্যের চাহিদায় মন্দা অনুভূত হতে সুরু করেছিল। এই মন্দা বিশেষ করে ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলিকে 'প্রথমে আক্রান্ত করে। ক্রমে এর আয়তন বিস্তৃত হতে থাকে এবং কতকগুলি গুরুত্ব-পূর্ণ বৃহৎ শিল্প সংস্থাকেও আক্রমণ করতে সুরু করে।

এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে এই চাহি-দার মন্দা প্রধানতঃ পরিকল্পনার প্রকৃতি এবং বিশেষ তৃতীয় পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়নের ত্রুটি থেকে ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় রেল পরিহন ব্যবস্থা প্রকৃত সম্প্রসারণের যে আয়োজন তৃতীয় পরিকল্পনার মূ কাঠামোর core অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার উল্লে করা যেতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায় রেল পরিবহ ব্যবস্থার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ সম্প্রসারণের আয়োজ করা হয়। পরিকল্পনা রূপায়ণের ধারায় এই সম্প্রসার লক্ষ্য প্রায় সম্পূর্ণই সাধন করা হয়েছে। কিন্তু দেশে উৎপাদন সম্প্রসারণ আনুপাতিক পরিমাণে ঘটে নি। তৃতী পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল যে উক্ত পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয়ের অনুপাতে দেশের পণ্য উৎ-পাদনের বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সনের স্থির মূল্য সূচক অনুযায়ী শতকরা ৩৯ ভাগের মতন হবে এবং সেই লক্ষ্য সাধন করে আনুপাতিক নূতন লগ্নির ব্যবস্থা শিল্প প্রতিষ্ঠায় পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ priorities স্থিরীকরণ এবং পরিকল্পনাভুক্ত বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্য স্থির করা হয়। বস্তুত ঐ অঙ্কে বাস্তব উন্নয়নের পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগের বেশী হয় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের যে সকল লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল তার সার্থক রূপায়ণের জন্য আনুপাতিক পরিমাণে কয়লার উৎপাদন লক্ষ্য স্থির

করা হয়, প্রথমে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টন তারপর এই অঙ্কটিকে বাড়িয়ে ৯কোটি ৭০ লক্ষ টন উৎপাদন লক্ষ্য স্থির হয় এবং সব শেষে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টন উৎপাদন হওয়া চাই বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের প্রথম দুই বৎসরে কয়লার উৎপাদন হার ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টনের বেশী হয় নি, কিন্তু চাহিদার অভাবে—মালগাড়ী সরবরাহের ঘাটতির জন্য নয়—কয়লা খনিগুলির মুখে pit head এত প্রভূত পরিমাণ মজুদ কয়লা জমা হয়ে গিয়েছিল যে খনির মালিকেরা প্রায় সকলেই তাঁদের উৎপাদন গতি মন্দীভূত করে দিতে বাধ্য হয়।

যে সকল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বর্তমানের আর্থিক মন্দার দ্বারা বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই বৃহৎশিল্পের সরবরাহক শিল্প। উদাহরণ স্বরূপ মালগাড়ী (railway freight waggon) নির্মাণ শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। রেল পরিবহণ ব্যবস্থার আয়তন তৃতীয় পরিকল্পনা কালে যে পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছে, বর্তমানে মোটামুটি তার এক তৃতীয়াংশ ভাগ চাহিদার অভাবে অব্যবহার্য্য হয়ে পড়েছে। ফলে নূতন মালগাড়ীর চাহিদা আপাততঃ শুধু মন্দা নয়, বস্তুতঃ প্রায় সম্পূর্ণই স্থগিত হয়ে রয়েছে। রেলের মালগাড়ী নির্মাতা শিল্প গুলির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার (capacity) মোটামোটি আয়তন সমগ্র দেশে বার্ষিক প্রায় ১১০০ মালগাড়ীর (standard waggons) মতন। এই শিল্পে সামগ্রিক ভাবে কতটা পুঁজি লগ্নীকৃত রয়েছে তার সঠিক হিসাব আমাদের জানা নেই, কিন্তু মনে হয় তার অঙ্ক মোটামোটি ১০ কোটি টাকার কম হবে না। এই শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিক সংখ্যার হিসাবও বর্তমানে আমাদের জানা নেই। কিন্তু তার মোট সংখ্যা ১৫০০০ হাজারের খুব বেশী কম হবার কথা নয়। রেল-মালগাড়ীর চাহিদার অভাব ঘটায় এই শিল্পটিতে দ্রুত একটি সম্পূর্ণ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। এইরূপ একটি মালগাড়ী নির্মাতা কারখানার শ্রমিকদের কথা আমরা জানি। এই কারখানাটিতে শ্রমিকদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় পাঁচ বৎসর পূর্বে ছিল প্রায় ৩০০০, হাজার টাকার মতন। গত বৎসরে সেই কারখানাটিতেই এই গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ সঙ্কুচিত হতে হতে বার্ষিক ১২০০ টাকারও নীচে নেমে গিয়েছিল; বর্তমানে সেই কারখানাটির প্রায় তিন চতুর্থাংশ শ্রমিকদের কার্য্য থেকে বিরত করবার (lay-off) আকাঙ্খা একরকম অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে এবং সেই কারণে শ্রমিকদের দ্বারা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের (management representations) "ঘেরাও" ইত্যাদি বিধিবহির্ভূত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সুরু হয়েছে।

অনুরূপ ভাবে ছোট ও মাঝারি আকারের অসংখ্য সরবরাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদার অভাবে উৎপাদন সঙ্কোচন এবং তজ্জনিত নিয়োগ-সংকোচ ইত্যাদি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে "ঘেরাও" ইত্যাদি গোলযোগ সুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি বৃহৎ উৎপাদক শিল্পেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কোক অ্যাভেন্সে (Durgapur project) একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করা হয়েছে যে ঐ কারখানায় দৈনিক যে পরিমাণ কোককয়লা উৎপাদন করা হতো, চাহিদার অভাবে বর্তমানে তার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে দিন মজুরের (daily wage labour) নিয়োগ সংখ্যাও আনুপাতিক পরিমাণে সঙ্কুচিত করতে হয়েছে এবং সে কারণে মালিক শ্রমিক বিরোধ এই সরকারী সংস্থাটিতেও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। কোককয়লা উৎপাদন একটি বৃহৎ সরবরাহক শিল্প; এই পণ্যটি প্রধানতঃ ইস্পাত ও অন্যান্য উৎপাদক শিল্পে ব্যবহার হয়। এই সকল শিল্পে চাহিদা প্রভূত পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ায়, কোক কয়লার চাহিদাও অনিবার্য্য ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। ইস্পাত শিল্পেও এই অবস্থার প্রতিঘাত অনুভূত হতে সুরু করেছে। বেসরকারী মালেকানার অন্তর্গত বার্ণপুর ও জামসেদপুর কারখানা দুটিতে উৎপাদনের তুলনায় চাহিদার অভাবে প্রভূত পরিমাণ মাল জমা হয়ে গেছে এবং নূতন উৎপাদনের পরিমাণ সঙ্কুচিত করতে হচ্ছে। ফলে এখানেও

ব্যাপক ভাবে মালিক শ্রমিক বিরোধ ও অশান্তি সুরু হয়ে গেছে। এরূপ আরো অসংখ্য উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির আর একটি দিক মূল্যবৃদ্ধি। এই বিষয়টির উল্লেখ অনেক সরকারী নেতা, অর্থশাস্ত্রী ও শিল্পপতিদের বক্তৃতা, আলোচনা, ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্যাটির কার্য্যকারণ সূচক একটা সম্যক বিশ্লেষণের কোনো প্রয়াস আমরা আজিও এই সকল বক্তৃতাদিতে লক্ষ্য করি নাই। আপাতদৃষ্টিতে যে; বিষয়টি সবচেয়ে অদ্ভূত মনে হয় সেটি এই যে চাহিদা কমে যাওয়া বা আর্থিক মন্দার (economic recession) সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যমাণ হঠাৎ আরো প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে সুরু করেছে। আর্থিক মন্দার যে কয়টি অতীত দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, তাতে দেখতে পাওয়া যায়, যে প্রথমতঃ প্রত্যেকটি এরূপ মন্দা এক একটি আর্থিক সঙ্গতির উন্নতি কালের উচ্চতম শিখরে পৌঁছিবার পর ঘটতে সুরু হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ এই মন্দার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ পুঁজির চাহিদায় এবং পণ্যমূল্য মাণে হঠাৎ বিরাট পরিমাণে ঘাটতি।

অবশ্য আর্থিক গতির ধারায় এসকল লক্ষণগুলি সাধারণতঃ আমরা যাকে স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থা বলতে বুঝি সেই অবস্থার মধ্যেই অতীতে ঘটেছে। আমাদের দেশের বর্তমান অর্থব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থার একটি বিশেষ লক্ষণ শিল্প ও ব্যবসায়ে অবাধ প্রতিযোগিতা। আমাদের দেশে যে ভাবে এ পর্য্যন্ত আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত ও প্রযুক্ত হয়ে এসেছে তার ফলে বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রেও এই অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটিকে প্রভূত পরিমাণে সঙ্কুচিত এমন কি প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। ফলে সেইখানেই মূল্যমাণের উপর শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার নিয়ামক প্রভাবটি অনেক পরিমাণে যে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে শুধু তাই নয়, প্রায় সম্পূর্ণ নষ্টই হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠির মধ্যে পারস্পরিক মূল্য সহযোগিতার price cartel একটি শক্তিশালী ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে।

এর একটি প্রধান কারণ পরিকল্পনা রচনায় উৎপাদক-শিল্পের দিকে অসমতাকারক ঝোঁক, যার ফলে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে মন্দা। এই কারণটির ফলে গত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় থেকে অসামরিক ভোগের জন্য ভোগ্য পণ্য সরবরাহে যে ঘাটতি শুরু হয়েছিল এবং যার ফলে দেশে যে বিক্রেতার বাজার sellers market অনিবার্য্য ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল যুদ্ধোত্তর কালে এবং বিশেষ করে স্বাধীনতার পর এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রযুক্ত হতে শুরু করবার পর থেকে আজি পর্য্যন্ত সেই বিক্রেতা-বাজার অব্যাহত রয়েছে। চাহিদার তুলনায় ভোগ্য পণ্য সরবরাহে অব্যাহত ঘাটতির ফলে এই অবস্থাটি আগাগোড়া কায়েম হয়ে রয়েছে। এই অবস্থাটি আরো অবশ্য ভোগ্য পণ্যাদির সরবরাহে, বিশেষ করে খাদ্যশস্য অন্যান্য খাদ্যবস্তু বাসস্থান বস্ত্রাদি, ইত্যাদির সরবরাহে অব্যাহত ঘাটতির দরুণ মূল্যমাণের উপর মুনাফাবাজের অত্যাচার আরো সহজ করে তুলেছে।

আনুষঙ্গিক কারণ হিসাবে আরো একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশের নিদারুণ বেকার সমস্যার কারণে অনেক সরকারী ও বেসরকারী শিল্প ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সরকারী ও আংশিক ভাবে বেসরকারী ইস্পাত শিল্পেও নিয়োগ-নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। যে ধরণের যন্ত্রাদি বর্তমানে আমাদের দেশের আধুনিক সরকারী ও বেসরকারী ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে একটি বার্ষিক ১০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় উচ্চতম হারে উৎপাদন করবার জন্য মোটামুটি ৬০০০ থেকে ৭০০০ হাজার শ্রমিকই যথেষ্ট। কিন্তু বস্তুতঃ এসকল ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে যে মোটামুটি সেই স্থলে ১৭০০০ থেকে ২০০০০ হাজার পর্য্যন্ত শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ফলে মাথাপিছু উৎপাদনের হার স্বাভাবিক পরিমাণের অর্দ্ধ ভাগেরও কম হয়ে পড়েছে অন্যান্য শিল্পাদিতেও যে কিঞ্চিদধিক পরিমাণে অনুরূপ অবস্থাই ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। এর ওপর সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে অধিকাংশ শিল্পেই নানা প্রকার আবগারী শুল্ক

প্রযুক্ত হয়েছে ফলে আনুপাতিক পরিমাণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে এবং মূল্যমানে সেটি প্রতিফলিত হয়েছে।

এ সকলই কেবল মাত্র শিল্পজ সরবরাহক বা উৎপাদক পণ্যে প্রতিফলিত হয় নাই, ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও এসকল ক্রিয়া করে চলেছে। তার উপরে সরকারী রাজস্ব নীতির সরাসরি ভাবে এবং বিশেষ করে ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে সহায়তা করে আসছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োগের সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত সরকারী রাজস্ব কাঠামোর বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ১৯৫৩-৫১ সনে—অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োগের প্রথম বৎসরে—দেশের শুল্ক থেকে আদায়ী মোট রাজস্বের tax revenue মাথাপিছু পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ টাকা, ১৯৬৬-৬৭ সনের বাজেটে দেখা যায় যে এই অঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৭০ টাকায় পৌছেছে। অর্থাৎ মাথা পিছু ট্যাক্স রাজস্বের দায় এই সতের বৎসরে নয় গুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার থেকেও যে বিষয়টি বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য সেটি এই যে ১৯৫০-৫১ সনে দেশের মোট আদায়ী ট্যাক্স রাজস্বের মাত্র শতকরা ৭৭ ভাগ পরোক্ষ ট্যাক্স indirect tax থেকে আদায় হতো এবং বর্ত্তমানে এই অনুপাতটির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তার চেয়েও যে আরো গুরুতর বিষয়টির বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন সেটি এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ৭৪ ট্যাক্স রাজস্বের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই ভোগ্য পণ্যাদির উপরে প্রযুক্ত আবগারীকর, বিক্রয়কর বা অনুরূপ শুল্কের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে।

সকল সভ্যদেশেই অনুসৃত ট্যাক্স রাজস্ব নীতির মূল কাঠামোটি এই ভাবে রচিত হয়ে থাকে যাতে সামাজিক কারণে যেই যেই ক্ষেত্রে পণ্য বিশেষের ভোগ সংকোচ সামাজিক কল্যাণে বিধেয় সেই সেই বিশিষ্টক্ষেত্রাদি ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রেই ভোগ্য পণ্যাদির উপরে যথাসম্ভব আবগারী বা অনুরূপ পরোক্ষ শুল্কের প্রয়োগ পরিহার করা। জাতীয় সঙ্কটের কালে অবশ্য সাধারণতঃ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়ে থাকে, যেমন গত মহাযুদ্ধের কালে ইংলণ্ডে করা হয়েছিল যাতে ভোগ সংকোচের দ্বারা সঞ্চয় বৃদ্ধি সাধন করা যেতে পারে এবং এই সঞ্চয়টিকে অন্ততঃ আংশিক ভাবে জাতীয় সঙ্কট মোচনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অবশ্য ভোগ্য পণ্যাদির উপর এই ধরনের শুল্ক প্রয়োগ যথাসম্ভব পরিহার করা হয়ে থাকে। তার কারণ এ ধরনের শুল্কের প্রয়োজন সাধারণতঃ সরাসরি এবং অনুপাতের তুলনায় অনেক অধিক পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। আমরা এদেশে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াটির অনেক দুর্ভোগ সহ্য করেছি ; শ্রীকৃষ্ণমাচারী যখন প্রথম জাতীয় অর্থমন্ত্রীত্ব করছিলেন তখন তাঁর দ্বারা প্রযুক্ত সরিষার তৈলের উপরে মণপ্রতি আট আনা আবগারী শুল্ক চালু হবার অব্যবহিত পর থেকেই সরিষার তৈলের খুচরা বিক্রয় মূল্য সের প্রতি চারি আনা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আট আনা সরকারী রাজস্ব দিবার দায়ের অজুহাতে সরিষার তৈল উৎপাদক এবং তাহার এবং ভোক্তার অন্তর্বর্তী দালাল ও ব্যবসায়ীরা মিলে ক্রেতার নিকট থেকে ১০ টাকা আদায় করে নিয়েছে। অনুরূপ আরো অসংখ্য উদাহরণের উল্লেখ করা সম্ভব।

এ ছাড়াও আরো একটি গুরুতর বিষয়ের বিচার প্রয়োজন। আমাদের সরকারী আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার রচনা ও প্রয়োগ যে বিশেষ ধারাটি এ পর্য্যন্ত অনুসরণ করে এসেছে তাতে আধুনিক ধরণের বৃহৎ আয়তনের উৎপাদক শিল্প প্রতিষ্ঠার উপরেই বিশেষ জোর দিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কাঠামোটি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি স্থাপনের দিকেই বেশী ঝুঁকে চলেছে অথবা মোটামুটি পুঁজিঘনতার capital intencification) দিকেই অধিকতর অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিশ্ববিশ্রুত অর্থশাস্ত্রী জে কে গলব্রেইথের মতে এই প্রকারের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির অবলম্বনে শিল্প প্রয়োগ দেহশ্রমের অভাবের পূরণের প্রয়োজনেই রচিত হয়েছিল এবং অনগ্রসর অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসকলের ব্যাপক ব্যবহার বিপদের কারণ হতে পারে) "the use of advanced technology was, primarily a conce-

ssion to labour shortage and its employment in an underdeveloped or backward economy may prove to be self-defeating and ruinous)" বস্তুত: এই প্রকৃতির আর্থিক পরিকল্পনা আমাদের দেশের স্থূল এবং কায়েমী সমস্যাগুলির সমাধানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এমন কি পরিপন্থী, এটা সহজেই উপলব্ধি করতে পারা উচিত। পুঁজিঘন শিল্প ব্যবস্থায় প্রভূত পুঁজি লগ্নীর দ্বারা যৎসামান্য পরিমাণে নূতন কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যে সকল দেশে প্রভূত পরিমাণে লগ্নীযোগ্য পুঁজির সংস্থান রয়েছে কিন্তু তুলনায় কর্ম্মসংস্থানের জন্য অপেক্ষমান শ্রমিকের সংখ্যা সামান্য মাত্র, সে সকল দেশেই কেবল এই ধরনের শিল্পব্যবস্থা কল্যাণকর হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে লগ্নীযোগ্য পুঁজির সংস্থান সামান্য মাত্র অথচ বেকার বা অর্দ্ধ-বেকারের সংখ্যা অসংখ্য। সে ক্ষেত্রে আমাদের শিল্পায়োজন এমন পথে চালিত করা একান্ত আবশ্যক যাতে নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর দ্বারা যথাসম্ভব বৃহত্তম সংখ্যার কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। বস্তুত: এই পর্য্যন্ত তাহার বিপরীত ব্যবস্থাটিই ঘটে এসেছে, ফলে ক্রমে একদিকে কায়েমী স্বার্থের কবলে অধিকতর আর্থিক শক্তির জমাট concentration ঘটতে ঘটতে পনের বৎসরে আজ একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে পড়েছে যার ফলে সমগ্র ভাবে চাহিদার অভাব ঘটেছে, অথচ বাস্তব পক্ষে আমাদের সর্ব্বক্ষেত্রেই অভাব মোচনের অবস্থায় এসে পৌঁছুতে এখনো অনেক দেরী।

এই অবস্থাটির অবসান কি করে সম্ভব হতে পারে, বর্ত্তমানে সেটাই আমাদের মূল সমস্যা। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী অশোক মেহতা এবং তাঁহার অধীনস্থ সরকারী তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করেন যে বর্ত্তমান পথে পরিকল্পনা রূপায়নের ধারাটিকে আরো বেশ খানিকটা অগ্রসর করে দিতে পারলেই বর্ত্তমান সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এ অসম্ভব কল্পনা শুধু অলীক নয়, আত্মঘাতি। ইতিমধ্যে বিদেশী উত্তমর্ণের দল তাদের আপন আপন কূটনীতিক এবং আর্থিক স্বার্থের কারণে আমাদের এই ভুল এবং আত্মঘাতি পথেই আরো অগ্রসর হয়ে চলবার জন্য রসদ জোগিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

বর্ত্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পথে দুটো বিষয়ের সংযুক্ত simultaneous বিচারের প্রয়োজন; প্রথমত: আপাত: রক্ষা পাবার উপায় কি? এবং দ্বিতীয়ত কি পথে অগ্রসর হলে সুদূরপ্রসারী এবং অব্যাহত উন্নয়ন ধারা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? আমাদের আশু সমস্যা প্রথমটি; সেটির সমাধানের পথ আবিষ্কার করতে পারলে দূর পাল্লার বিষয়টি বারান্তরে বিচার করবার সময় পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি যে দেশের বর্ত্তমান শিল্পসঙ্কটটির মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী অবস্থার সহাবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। সেটি এই যে একাধারে যেমন চাহিদার অভাব শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ সঙ্কোচন করবার প্রয়োজন ঘটেছে বলে দাবী করা হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে একই সঙ্গে দ্রুতগতিতে পণ্যমূল্যমানের উচ্চতা অনবরতই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই অবস্থা থেকে একটি বিষয় অনুমান করা সম্ভব যে শিল্পোৎপাদন তথা কর্ম্মসংস্থানের আয়োজন সঙ্কুচিত করবার প্রয়োজন ঘটা সত্ত্বেও শিল্পপতিদের আর্থিক শক্তিতে, economic power কোনও ক্ষীণতা ঘটে নি। অতএব বর্ত্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার একটি মূল উপায় এই আর্থিক শক্তিতে ভাঙ্গন ধরান। বস্তুত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অধিকারে সমাজের মোট আর্থিক শক্তির অধিকাংশ পরিমাণটি কুক্ষিগত হবার ফলেই যে বর্ত্তমান অবস্থাটি ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর্থিক সচলতা (dynamics of economic activity) প্রধানত: কার্য্যকরী চাহিদার পরিমাণ ও আয়তনের উপরেই (area and content of effective demand) বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল অধিকাংশ ভোগ্য পণ্যেরই চাহিদা মূলত: বর্দ্ধমানশীল নয় প্রভূততম আর্থিক শক্তি সমস্যা সংখ্যক ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়লে চাহিদার কার্য্যকরী শক্তি অনিবার্য্য ভাবে সঙ্কুচিত হয় এবং ফলে আর্থিক অচলতার সৃষ্টি করে থাকে। অতএব বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্তি

পেতে হলে এই অবস্থাটির নিরসন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দ্বিবিধ এবং একই সঙ্গে প্রযুক্ত উপায়ে এই উদ্দেশ্যটি সাধন করা সম্ভব। প্রথমতঃ পুঁজিকর এবং সম্পদকরের কার্য্যকরী প্রয়োগ এবং দ্বিতীয়তঃ শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার পুনঃপ্রবর্ত্তন করা। এটি সহজ কাজ নয় কিন্তু জরুরী। অন্যথায় সকল শিল্প ও ব্যবসায় সরকারের আয়ত্তাধীন করে নেওয়া কিন্তু সরকারী প্রয়োগগুলির পরিচালনায় যে অক্ষমতা দুর্নীতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অন্যায়ের সঙ্গে গত পনের বৎসর ধরে আমরা উত্তরোত্তর বেশী করে পরিচিত হয়ে আসছি, তাতে এই পথে অগ্রসর হতে সত্যই ভরসা হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নূতন মূল্য সঙ্কট

নির্ব্বাচনের পর নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য শস্যের মূল্যমান আশাতীত পরিমাণে—কেবল মাত্র সাময়িক ভাবে কমিতে সুরু করেছিল। নির্ব্বাচনের সমসাময়িক চাউলের গড়পড়তা খুচরা মূল্য এই রাজ্যে ছিল ১৭৫ টাকা। নূতন সরকার গঠিত হইবার ঠিক অব্যবহিত পর থেকেই এই মূল্যমান নীচের দিকে চলিতে সুরু করে এবং সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে ১.২০ টাকায় পৌঁছিয়াছিল। তার পর কয়েক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যমান ১,২৫ হইতে ১,৫০ টাকা পর্য্যন্ত ওঠা নামা করিতে থাকে কিন্তু মোটামুটি উপরের দিকেই ঝুঁকিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ব্যক্তি বিশেষের অধিকারে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ চাউলের মজুত ২৫ কিলোগ্রামে নির্দ্দিষ্ট হবার পর থেকে গত দেড় সপ্তাহের মধ্যে এই মূল্যমান দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে এবং বর্ত্তমানে গড়পড়তা ১·৮৫।১·৯০।২·২৫ টাকা দাঁড়িয়েছে।

এর মধ্যে বিশেষ লক্ষ করবার বিষয় এটি যে পৌষ মাঘ মাসে নূতন ফসল ওঠবার পর থেকে আজ বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গত তিন চার মাসের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের কোনো খুচরা বাজারেই একটি দানা নূতন ধানের চাউল বিক্রয়ের জন্ত উপস্থিত করা হয় নি। এই বিষয়টির উল্লেখ আমরা গত মাসেও করেছিলাম। এই বিশেষ এবং অভুতপূর্ব্ব অবস্থায় একটা জিনিবই প্রমাণ করছে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চাউলের কোন ঘাটতি নেই। মূল্যমানের উঠতি পড়তি সত্বেও বাজার সরবরাহে কোন অপ্রতুলতার লক্ষণ নেই। অতএব একথা সহজেই অনুমান করা চলে যে পশ্চিমবঙ্গে মজুত চাউলের পরিমাণ যথেষ্ট, তবে ইহার অধিকাংশ অংশ মুনাফাবাজ মজুতদাররা অধিকার করে বসে আছে। বস্তুতঃ চাউলের দর পুনরায় বৃদ্ধির দিকে চলতে শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পজাত এবং কৃষিজাত সকল প্রকার অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির মূল্য দ্রুত এবং প্রভুত পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছে। যথা মিল বস্ত্রের দাম সরকারী অনুমোদনেই বৃদ্ধি পেয়েছে। সরিষার তৈলের দাম গত তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল প্রকার শব্জীর দাম, ডাইলের, মসলার দাম অনুরূপ অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পজাত শিশুভোগ্য দুগ্ধের মূল্য এই সময়ের মধ্যে উৎপাদকের তরফ থেকেই প্রায় ২৫% বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ যেন সকল প্রকার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধারণ নাগরিকদের অস্তিত্ব মাত্রও বিপন্ন করে তুলবার এক বিরাট ষড়যন্ত্র।

এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে হলে রাজ্য সরকারকে দৃঢ় হতে হবে একথা বলাই বাহুল্য। চাউল ও অন্যান্য খাদ্য শস্যের লুকানো মজুদ খুঁজে বের করে সেগুলি অবিলম্বে সরকারে বাজেয়াপ্ত করা প্রয়োজন। পুলিশের পক্ষে এ সকল মজুদ সহজেই আবিষ্কার করা যদি অসম্ভব প্রমাণিত হয় তাহলে স্পষ্টই বুঝতে হবে যে হয় আমাদের পুলিশ একেবারেই অকর্ম্মণ্য, না হয়তো তাহাদের সঙ্গে মজুতদারদের সহযোগিতা বা ভাগাভাগি রয়েছে। পুলিশের কর্ম্মকর্তাদের একথাটি স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন এবং বর্ত্তমানে তাঁহাদের অধীনস্থ পুলিশবাহিনীর দ্বারা এবিষয়ে এবং কার্য্যকরী প্রয়োজন দ্রুত অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। সেটা সম্ভব না হলে বুঝতে হবে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকারের এখনো সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন বা আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠে নি।

একটা কথা খুবই স্পষ্ট হওয়া দরকার সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই। বর্ত্তমান মূল্য সঙ্কট অর্থ সর-

বরাহের প্রাচুর্য্যের জন্যই আংশিক ভাবে ঘটেছে, কিন্তু তার পরিমাপটি এই কারণটির মন্তব্য প্রতিক্রিয়ার সীমা অতিক্রম করে আরো এগিয়ে গেছে। গত দশ বৎসরের এবং বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রযুক্ত সরকারী অর্থ সরবরাহের নীতিটিই।

এই বিষময় ফল প্রসব করেছে। প্রথমতঃ প্রচুর পরিমাণে "ডেফিসিট ফাইন্যান্স" সৃষ্ট অর্থ বাজার সরবরাহের মোট অঙ্কটি অনবরত ফাঁপিয়ে চলেছে। সেই কারণে ডেফিসিট ফ্যাইন্যান্স সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়াটি মূলতঃ মূল্য সঙ্কট সৃষ্টিকারক এই সাধারণ ধারণাটির সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত শাস্ত্রীয় পথে ডেফিসিট ফাইন্যান্স প্রতিক্রিয়াটির আশ্রয় করলে মূল্য সঙ্কট বা "ইন্‌ফ্লেশন" ঘটবেই, এমন ধারণার কোন সঙ্গত কারণ নেই। শাস্ত্রানুমোদিত উপায় অনুসরণে ডেফিসিট ফাইন্যান্সের আশ্রয় গ্রহণ করলে মূল্য সংকটের সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলাও সম্ভব। ডেফিসিট ফ্যাইন্যান্স মূলতঃ ভবিষ্যৎ উৎপাদন উন্নতিজনিত অতিরিক্ত সঙ্গতির আমানতী বন্ধকী দলিল; ইহার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর প্রয়োজনের পরিধির মধ্যে সীমিত থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি উদ্দিষ্ট অতিরিক্ত আয়ও সেই লগ্নী থেকে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে বাস্তব পক্ষে সংগৃহীত হতে শুরু করা অনুরূপ প্রয়োজন। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাটির অনুসরণে যে ভাবে ডেফিসিট ফ্যাইন্যান্স যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে তাতে এই সকল শাস্ত্রীয় বিধানের একটি অনুশাসনও মানা হয় নি। তা ছাড়া ডেফিসিট ফ্যাইন্যান্সের প্রতিক্রিয়াটির ব্যবহারের দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অর্পণ না করে, সরকার সরাসরি স্বয়ং এই দায়িত্বটি নিজ স্কন্ধে বহন করে এসেছেন। ফলে নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর প্রয়োজনের পরিধি অতিক্রম করে সরকারী ভোগ-ব্যয়ের জন্য ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটেছে। ফলে দ্রুতগতিতে এবং অসম্ভব পরিমাণে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনিবার্য্য ভাবে প্রচণ্ড "ইন্‌ফ্লেশানের" জগদ্দল চাপ দেশের সমগ্র আর্থিক কাঠামোটিকে উত্তরোত্তর হীনবল করে ফেলেছে।

কিন্তু এই অবস্থাটির সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার বর্ত্তমান ও সামগ্রিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। একদিকে পণ্যের চাহিদার অভাবে উৎপাদনের গতিবেগটিকে ক্রমেই সংযত এবং চেষ্টা করে মন্দগতি করে ফেল্‌তে হচ্ছে, অন্যদিকে টাকার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্ক রেট এখন ৭%; সিডিউল ব্যাঙ্কগুলি থেকে Secured overdraft কিংবা আমানতী ঋণের জন্য বর্ত্তমানে শতকরা ৮.৫০ পয়সা সুদের হার নির্দিষ্ট হয়েছে; বাজারে হুণ্ডীর কারবারের পরিমাণ, সামগ্রিক ভাবে বিরাট, অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা লগ্নীকৃত মোট পুঁজির পরিমাণের অন্ততঃ কয়েক গুণ বেশী,-হুণ্ডীর সুদের হার বর্ত্তমানে শতকরা ১৮ টাকা থেকে ২৪,/৩০, পর্য্যন্ত চলেছে। এই সকল পরস্পর বিরোধী ঘটনাগুলি থেকে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে বর্ত্তমান মূল্য সংকটটি কেবল মাত্র স্বাভাবিক অর্থ সরবরাহের চাপের জন্যই ঘটেনি; নানা প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে একান্ত প্রয়োজনীয় অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির সরবরাহে ঘাটতি ঘটিয়ে এই অবস্থাটির সৃষ্টি হয়েছে। এর একটা কারণ অবশ্যই অতিরিক্ত মুনাফার লোভ; কিন্তু আরো একটি যে অতিরিক্ত উদ্দেশ্যও যে বর্ত্তমানে ক্রিয়া করেছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কংগ্রেস সরকারের বিশেষ অনুগ্রহভাজন পুঁজিপতি ও মুনাফাবাজ গোষ্ঠী যে সকল রাজ্যে গত নির্ব্বাচনের ফলে অকংগ্রেস রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সর্ব্বত্রই এভাবে বর্ত্তমান সরকারকে বিব্রত এবং সম্ভব হলে বিতাড়িত করবার একটা বিরাট ষড়যন্ত্রে মেতেছেন, উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী বাজার লক্ষণ (market symptoms) গুলি অনিবার্য্য ভাবে তাহাই সূচীত করে।

বর্ত্তমানে হঠাৎ টাকার বাজার সরবরাহ খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। গত বৎসর এমনি সময়ে তাহার পরিমাণ যাহা ছিল বর্ত্তমানেও মোটামুটি সেই পরিমাণই আছে। সরকারী সংখ্যা দপ্তরের প্রকার অনুযায়ী বর্ত্তমানে চাউলের ফসলের পরিমাণ গত বৎসরের মতনই এবার। নির্ব্বাচনের সময়ে কিংবা তার পরে তাহা বাড়ে কমে নাই। বর্ত্তমানেও হঠাৎ একটা বিরাট ঘাটতি সৃষ্টি

হবার কোন কারণ ঘটে নি। অন্যদিকে টাকার বাজার চাহিদা (demand for credit) খুব বেশী—পণ্য-চাহিদার মন্দার অবস্থায় এ প্রকার জোরদার পুঁজির চাহিদার কারণ বোঝা সহজ নয়। সবকিছু মিলে একটা জট পাকান অবস্থার সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। এ জট ছাড়াতে হলে পশ্চিম বঙ্গের যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারকে দৃঢ় হতে হবে এবং উপযুক্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হলে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকেদল-নিরপেক্ষ একমত হতে হবে।

এটি করতে না পারলে বর্ত্তমান সরকারের টিকে থাকা অসম্ভব হবে। নূতন সরকার গদি অধিকার করবার পর যে আশার সঞ্চার হয়েছিল, অনিবার্য্য ভাবে বর্ত্তমান অবস্থায় তাতে ভাঁটা পড়ে আসছে। এর পর নিরাশা এবং বিরোধ অনিবার্য্য পরিণতি। এবং বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ একবার জেগে উঠলে তাকে সহজে প্রতিহত করা যাবে না। অতএব গদীতে টিকে থাকতে হলে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে অবশ্যভোগ্য পণ্যাদি এবং বিশেষ করে খাদ্য শস্যাদি যাতে সহজে এবং উচিত মূল্যে সাধারণের অধিগম্য হয় তার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কেবল প্রতিশ্রুতিতে কাজ হবে না। ফল চাই!

রামকমল সেন : প্যারীচাঁদ মিত্র, অনুবাদ—সুশীলকুমার গুপ্ত, সম্পাদনা যোগেশচন্দ্র বাগল, সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড, ২২, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। দাম ৬·৫০।

রামকমল সেন ছিলেন রক্ষণশীল তথাকথিত সংস্কারপ্রিয়। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে হইলে একথা বলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ এই রক্ষণশীল নেতারাই সে যুগে সমাজের বিবিধ কাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন। আমরা এই আলোচ্য গ্রন্থখানিতে দেখিতে পাই, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকমলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং প্রত্যেকটির ক্রমোন্নতিতে তাঁর চিন্তা ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, স্কুল সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি আজ বর্তমান রূপপরিগ্রহ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় তাঁর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "...তাঁর পাশ্চাত্ত্য-চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি আকুতি দেখেই মনে হয় বড়লাট বেণ্টিঙ্ক তৎকালীন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি কল্পে বিচার বিবেচনার নিমিত্ত যে-কমিটি গঠন করেন তাতে ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র রামকমলেরই স্থান হয়েছিল; কমিটির অপর চারজন সদস্য ছিলেন সকলেই ইউরোপীয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে বড়লাট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের আয়োজন করলেন। আর তাতে শেখাবার ব্যবস্থা হলো চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক ও সহায়ক বিবিধ বিদ্যা, যেমন রসায়ণশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা, শারীর-তত্ত্ব, শারীর-সংস্থানবিদ্যা, শল্যবিদ্যা, ভেষজতত্ত্ব প্রভৃতি। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এইরূপে আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে এতকাল যে স্বার্থ-চিন্তা করেছেন, হিন্দু কলেজের বিষয়ে এতকাল যে স্বার্থ চিন্তা করেছেন, হিন্দু কলেজের শিক্ষায় যা অংশত অনুসৃত হয়েছে, মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে তাঁর পরিপূর্ণতা…"

রামকমলের জীবন-অধ্যায়ে দেখা যায়, কি অসাধারণ পরিশ্রমে তিনি বাংলা দেশের বিবিধ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। বাংলার যা কিছু গৌরব তার মূলে ছিলেন এই রামকমল সেন। ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা দেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এক কথায়, এই রামকমলের কাছে বাংলা দেশ আজ ঋণী। তাঁরই চেষ্টায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা, পল্লী-সংস্কার, পয়ঃপ্রণালীর নূতন ব্যবস্থা, তাঁরই চেষ্টায় হাসপাতালে সকল শ্রেণী ও জাতির ভেদাভেদ না রাখিয়া ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রথা তুলিয়া দিয়া ভর্তি করিবার নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। দীঘি ও পুকুরের সংস্কার, মুদ্রাযন্ত্রের নূতন ব্যবস্থা, পল্লীর কুটির-সংস্কার সকল বিষয়েই তিনি অগ্রণী ছিলেন।

এরূপ একটি মহৎ চরিত্রের জীবন-কথা অনেকেই হয়ত জানেন না। সম্পূর্ণ জীবনী কেহ লিখিয়াও যান নাই। প্যারীচাঁদ মিত্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও ইংরাজী ভাষায়। আজ সেই বইও বাজারে নাই। সুতরাং এমন একটি চরিত্র জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। আজ সম্বোধি পাবলিকেশন ইহার অনুবাদ-গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রভূত উপকার সাধন করিলেন। যোগেশবাবুর সম্পাদনায় ইহা আরও সুসংস্কৃত হইয়াছে। তাঁহার হাতের ছাপ সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। যে পরিশ্রম করিয়া তিনি নির্ঘণ্ট, পরিচয়-লিপি সংযোজন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ-যোগ্য। ইহা না করিলে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইত।

শ্রীম দর্শন : স্বামী-নিত্যানন্দ, জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য পাঁচটাকা।

'কথামৃত'র লেখক শ্রীম আজ জনসাধারণের কাছে অপরিচিত নহেন। গ্রন্থকার ভূমিকার একস্থানে লিখিয়াছেন, "…তপস্যা বিনা শিবত্ব বিকশিত হয় না। তাই এবারের তপস্যা লোকালয়ে, হিমালয়ে নহে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির উদ্যানে, দণ্ডকারণ্যে নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচেষ্টা, 'বনের বেদান্তকে ঘরে' আনা, তাই তপস্যার এই স্থান পরিবর্তন। বনের বেদান্তকে ঘরে আনিতে তিনি কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহার উদাহরণ তাঁহার রচিত কুসুম কুঞ্জের একটি সরসসুন্দর সুবাস কুসুম—শ্রীম-র দেবজীবন।"

শ্রীমকে 'কথামৃতে'র লেখক বলিয়াই শুধু আমরা জানি, কিন্তু তিনি যে একজন বড় সাধক, এই গ্রন্থ হইতে সেকথাও আমরা জানিতে পারিলাম। অবশ্য এ গ্রন্থেও রামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গই কথিত হইয়াছে, শ্রীম এখানে ভক্ত-সাধক রূপে লীলাস্থানগুলি প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

ঠাকুরের কথাগুলি যেমন শ্রীম তাঁহার ডায়ারিতে নোট করিয়া রাখিতেন, স্বামী নিত্যানন্দও সেইরূপ কথামৃতকারের সহিত যেসব সাধু ভক্তজনের আলাপ-আলোচনা হইত তাহা নোট করিয়া রাখিতেন। এক হিসাবে এ গ্রন্থ কথামৃতেরই নূতন ভাষ্য। ইহাতে ঠাকুরের ও শ্রীমার অনেক নূতন কথাও আছে, আর আছে ঠাকুরেরই জীবন-কথা দিয়ে গীতা উপনিষদ ভাগবত পুরাণ বাইবেলের অপরূপ ব্যাখ্যা।

যাঁরা ভক্ত তাঁরা তীর্থক্ষেত্রে গিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেন। অর্থাৎ লীলা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বিচার-বুদ্ধি দিয়া ইহা বলা যায় না, এ অনুভূতির স্বাদ একমাত্র ভক্তই জানেন। ঠাকুর যেখানে যাহা করিয়াছেন, সেই স্থানে আসিলেই শ্রীম ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, স্পর্শ করিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছেন। ইহা সাধকানুভূতি। স্বামিজী এই গ্রন্থে সেইসব কথারই বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

'কথামৃত' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের এ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। কারণ কথামৃতের সঙ্গে এই গ্রন্থ অঙ্গাঙ্গী জড়িত। 'শ্রীম-দর্শন' নামের দিক দিয়াও সার্থক হইয়াছে।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩